১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা আষাঢ়—১৩৫১ দ্বাদশ ব

আশ্চর্য্য ঔষধ

গাছ-গাছড়া জাত ঔষধের বিস্ময়কর ক্ষমতা

(নিষ্ফল প্রমাণ হইলে ১০০৲ টাকা খেসারত দিব)।

'পাইলস কিওর'

যন্ত্রণাদায়ক বা দীর্ঘকালের পুরাণো সর্ব্বপ্রকার অর্শ—অন্তর্ব্বলি, বহির্ব্বলি, শোণিতস্রাবী ও বলিহীন অর্শ সত্বর আরোগ্য করে। সেবনের ঔষধ মূল্য ২৲ টাকা, মলম ১৲ টাকা।

"গনোরিয়া কিওর"

পুরানো বা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক গনোরিয়া সারাইয়া হতাশ ব্যক্তিকে নবজীবন প্রদান করে। বয়স বা রোগের অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, সর্ব্ব অবস্থায়ই কাজ দিবে। একদিনে যন্ত্রণা কমায়, পুঁজ বন্ধ করে, ঘা সারায়, প্রস্রাব সরল করে এবং প্রস্রাব সংক্রান্ত সমস্ত উপদ্রবের উপশম করে। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র

"ডেফ্‌নেস্ কীওর"

সর্ব্বপ্রকার কর্ণরোগ, শ্রবণশক্তি হানি ও ভোঁ ভোঁ শব্দের চমৎকার ঔষধ। পুঁজ পড়া ও কাণের বেদনা প্রভৃতি সারায়। শ্রবণশক্তি বাড়ায় ও শ্রবণশক্তি হানি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে। মূল্য ২৲।

"পরীক্ষিত গর্ভকারক যোগ" (বন্ধ্যাত্ব দূর করার ঔষধ)

জীবনব্যাপী বন্ধ্যাত্ব দূর করিয়া হতাশ নারীকে সন্তান দেয়। সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ, বিশেষতঃ মৃত-বৎসায় উপকার দেয় এবং সন্তান-সন্ততিকে দীর্ঘজীবি করে। এই ঔষধ ব্যবহারেচ্ছু ব্যক্তিদের রোগের বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। মূল্য ২৲ টাকা।

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল

এই ঔষধ মাত্র কয়েকদিন ব্যবহার করিলে শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল একেবারে আরোগ্য হয়। যাহারা শত শত হাকিম, ডাক্তার, কবিরাজ ও বিজ্ঞাপনদাতার চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছেন, তাহারা এই ঔষধ ব্যবহার দ্বারা এই ভয়াবহ রোগের কবলমুক্ত হউন। ১৫ দিনের ঔষধ ২॥০ টাকা

জন্ম নিয়ন্ত্রণ

জন্ম নিয়ন্ত্রণের অব্যর্থ ঔষধ। ঔষধ ব্যবহার বন্ধ করিলে পুনরায় সন্তান হইবে। মাসে ২।৩ বার এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। এক বৎসরের ঔষধের দাম ২৲ টাকা। সমস্ত জীবন সন্তান বন্ধ রাখার জন্য এক রকমের ঔষধ ২৲ টাকা। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

ভজভজ পিল

সন্ধ্যায় একটী বড়ী সেবনে অফুরন্ত আনন্দ পাইবেন। ইহা হারানো পৌরুষ ফিরাইয়া আনে ও অবিলম্বে ধারণশক্তির সৃষ্টি করে। একবার ব্যবহারে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা কখনো বিস্মৃত হইবেন না। মূল্য ১৬টী বড়ি ১৲ টাক

পাকা চুল

কলপ ব্যবহার করিবেন না, আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার দ্বারা পাকা চুল কৃষ্ণবর্ণ করুন। ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উহা বজায় থাকিবে। আপনার দৃষ্টিশক্তি বাড়িবে এবং মাথা ধরা আরোগ্য হইবে। কয়েক গাছা চুল পাকিয়া থাকিলে ২৲ টাকার শিশি ও বেশী পাকিয়া থাকিলে ৩॥০ টাকার শিশি এবং প্রায় সব চুল পাকিয়া থাকিলে ৫৲ টাকার শিশি ক্রয় করুন। নিষ্ফল হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত দিব।

আশ্চর্য্য গাছড়া

কেবলমাত্র চোখে দেখিলেই অবিলম্বে সাংঘাতিক রকমের বৃশ্চিক, বোলতা ও মৌমাছির দংশনজনিত বেদনা সারে। লক্ষ লক্ষ লোক এই ঔষধ ব্যবহারে সুফল পাইয়াছে। শত শত বৎসর রাখিয়া দিলেও ইহার গুণ নষ্ট হয় না। মূল্য—প্রতি গাছড়া ১৲ টাকা এবং একত্রে তিনটী ২॥০ টাকা মাত্র।

বাবু ব্রিজনন্দন সহায়, বি-এ, বি-এল, এডভোকেট, পাটনা হাইকোর্ট—আমি "বৃশ্চিক দংশন ম্যারানোর" গাছড়া ব্যবহারে খুব ফল পাইয়াছি। একটা ছোট মূলে শত লোক আরোগ্য হয়। এই গাছড়া নির্দ্দোষ এবং অতি প্রয়োজনীয়। জনসাধারণের ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বৈদ্যরাজ অখিল কিশোর রাম

আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ ভিষক-রত্ন

৫৩নং পোঃ অঃ কাটরী সরাই (গয়া)

এক চুমুকেই বলা যায়
টসের চা

Dutta & Co.
QUALITY SHOE MAKERS
CHEAPEST, BEST AND DURABLE
STOCKISTS: CAWNPORE -AND- AGRA SHOES.
16/1, SHYAMACHARAN DEY STREET,
COLLEGE ST. COLLEGE ROW & SHYAMACHARAN DEY ST. JUNC:
CALCUTTA.
G.D.N.

গোল্ডেন
স্যাণ্ডালউড
বিশুদ্ধ চন্দনসার সহযোগে
উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত
নূতন ও অভিনব সাবান
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

ভগ্ন স্বাস্থ্য হইতে
স্বাস্থ্য
?

রক্সোর ক্যাষ্টর অয়েল
ফ্রাঙ্ক রস্ এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা

১২শ বর্ষ, ১ খণ্ড, ১ম সংখ্যা

বিষয় সুচী

আষাঢ়—১৩৫১

[২১ পৃষ্ঠায়

বিষয়-সূচী—১৯ পৃষ্ঠার পর

[২৩ পৃষ্ঠায়

বিষয়-সূচী—২১ পৃষ্ঠার পর

চিত্র-সূচী

বঙ্গশ্রীর নিবেদন ও নিয়মাবলী

'বঙ্গশ্রী'র বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৹ টাকা। ষাণ্মাসিক ৩৷৹ টাকা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৴৹ আনা। মূল্যাদি—কর্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী, c/o মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আষাঢ় হইতে "বঙ্গশ্রী"র বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া চলে।

প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। ফেরতের জন্য ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হয়। যে-মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তদন্তের ফল আমাদিগকে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য থাকিব না।

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ও সিকি পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৩০৲, ১৫৲, ৮৲। বিশেষ স্থানের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

বাংলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্তনের নির্দ্দেশ না আসিলে পরবর্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার।

ডাক্তারেরা বলেন
শিশুর ভবিষ্যত জীবনের মূলধন!
শাটি
সোয়ান ব্র্যাণ্ড
লাইবেন
সোয়ান ব্র্যাণ্ড
ম্যানুফ্যাকচারার্স—পাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস
৬১, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বাদশ বর্ষ]

[প্রথম খণ্ড

ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

[আষাঢ়, ১৩৫১—অগ্রহায়ণ, ১৩৫১]

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

প্রবন্ধ

চতুষ্পাঠী

গল্প

সঙ্গীত ও স্বরলিপি

পুস্তক ও আলোচনা

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

আষাঢ়, ১৩৫১
১২শ বর্ষ—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা

"শ্রীদুর্গা-পূজা"র প্রয়োজনীয়তা

শ্রীসচ্চিদানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(৬)

কার্য্যকারণের শৃঙ্খলাযুক্ত বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়-বস্তু

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের ও তৎ সম্বন্ধীয় কর্ম্মিগণের দায়িত্ব বণ্টনের বিবরণ

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠান কি কি, তাহার কথা আমরা "সমগ্র মনুষ্যসমাজের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে যে অনুষ্ঠান সাধন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই অনুষ্ঠানের নাম ও ব্যাখ্যা" প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি।

মানুষের প্রয়োজনের দিক দিয়া দেখিলে ঐ অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :

(১) কাঁচামাল উৎপাদন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠান-সমূহ ;

(২) শিল্প ও কারুকার্য্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠান-সমূহ ;

(৩) বাণিজ্য কার্য্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৪) গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৫) মানুষের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ।

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর অনুষ্ঠান তিন শ্রেণীর কর্ম্মীর দ্বারা প্রত্যেক গ্রামে সাধিত হয়। এই তিন শ্রেণীর কর্ম্মীকে "সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মী", "সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মী" এবং "সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মী" বলা হইয়া থাকে।

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রেণীর অনুষ্ঠানের বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন, সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণকে বুঝাইয়া দিবার দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকে "গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য পরিচালনা-সভার" "সর্ব্বসাধারণের ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার কার্য্যবিভাগের" পরিচালকগণের হস্তে। সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রেণীর অনুষ্ঠানের বিজ্ঞান,তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধসমূহ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার পরিচালকগণের নিকট হইতে শুনিয়া লইয়া ও বুঝিয়া লইয়া উহা সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণকে শুনাইয়া দিয়া থাকেন ও বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ ঐ পাঁচশ্রেণীর অনুষ্ঠানের বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধসমূহ সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের নিকট হইতে শুনিয়া লইয়া ও বুঝিয়া লইয়া উহা সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণকে শুনাইয়া দিয়া থাকেন এবং বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ ঐ

পাঁচ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক অনুষ্ঠানটি শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার পাঁচ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ তৃতীয় শ্রেণীর কার্ম্মিগণকে যেরূপ শিখাইবার ও বুঝাইবার জন্য দায়ী থাকেন, সেইরূপ আবার তৃতীয় শ্রেণীর কার্ম্মিগণ নিজ নিজ অনুষ্ঠানসমূহ বিধিবদ্ধভাবে সম্পাদন করেন কি না তাহা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবার জন্যও দায়ী থাকেন। তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণও ঐরূপ চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের কার্য্য পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবার জন্য দায়ী থাকেন।

প্রত্যেক কুড়িটি হইতে পঁচিশটি চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর কার্য্যপরিদর্শনভার এক একটি তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীর হস্তে ন্যস্ত হয়।

প্রত্যেক কুড়িটি হইতে পঁচিশটি তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীর কার্য্যপরিদর্শনভার এক একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীর হস্তে ন্যস্ত হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্বের শ্রেণী-বিভাগানুসারে "কাঁচামাল উৎপাদন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ" চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে; যথা:

(১) কৃষিকার্য্যবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ;

(২) জলজাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ;

(৩) বন ও বাগান রক্ষা করিবার ও তৎ জাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ;

(৪) খনিজাত দ্রব্য সংগ্রহ ও উৎপাদন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগানুসারে কাঁচামাল উৎপাদন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ আট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে; যথা:

(১) কৃষিকার্য্যবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ;

(২) জলজাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ;

(৩) বন রক্ষা করিবার এবং বনজাত উদ্ভিদ্, সরীসৃপ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি রক্ষা করিবার অনুষ্ঠান-সমূহ;

(৪) বাগান নির্ম্মাণ ও রক্ষা করিবার এবং বাগানজাত উদ্ভিদাদি উৎপাদন ও রক্ষা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৫) পশু পালন করিবার ও পশু-জাত সর্ব্বশ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৬) পক্ষী পালন করিবার ও পক্ষি-জাত সর্ব্ব শ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৭) কীট পতঙ্গ-সরীসৃপ প্রভৃতি পালন করিবার এবং তজ্জাত সর্ব্বশ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৮) খনিজাত দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ ও উৎপাদন করিবার অনুষ্ঠান-সমূহ।

কাঁচামাল উৎপাদন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠান-সমূহ যেরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগানুসারে চার শ্রেণীতে এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগানুসারে আট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, সেইরূপ কাঁচামাল উৎপাদন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ চারি-শ্রেণীতে এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ আট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনাসভার "সর্ব্বসাধারণের ধন প্রাচুর্য্য সাধন করিবার কার্য্যবিভাগের" অন্তর্ভুক্ত "কৃষি-কার্য্যবিষয়ক কার্য্যশাখা," "জলজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সংগ্রহবিষয়ক কার্য্যশাখা", "বন ও বাগানজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সংগ্রহবিষয়ক কার্য্যশাখা" এবং "খনিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সংগ্রহ বিষয়ক কার্য্যশাখা"র পরিচালকগণ কাঁচামাল উৎপাদন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য দায়ী হইয়া থাকেন।

শিল্প ও কারুকার্য্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠান-সমূহ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্বের শ্রেণী-বিভাগানুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা:

(১) শিল্প ও কারুকার্য্যের অনুষ্ঠানসমূহ;

(২) বস্ত্রনির্ম্মাণ ও পরিচালনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৩) ভবন নির্ম্মাণ ও রক্ষা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগানুসারে, শিল্প ও কারুকার্য্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ আঠার শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা :

(১) খাদ্য ও পানীয় বিষয়ক শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(২) ঔষধ, পথ্য, বর্ণ ও গন্ধ, প্রসাধনবস্তু এবং উপভোগ্য বস্তু উৎপাদন করিবার রাসায়নিক শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(৩) কার্পাসবস্ত্র সম্বন্ধীয় শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(৪) রেশমবস্ত্র সম্বন্ধীয় শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(৫) পশমবস্ত্র সম্বন্ধীয় শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(৬) কুম্ভকারের কার্য্যসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ মৃত্তিকা, প্রস্তর, অস্থি প্রভৃতি জাতদ্রব্যসম্বন্ধীয়) শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(৭) ছুতারের কার্য্যসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ কাষ্ঠ, বংশ, বেত প্রভৃতি বন ও বাগানজাত দ্রব্যসম্বন্ধীয়) শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(৮) কর্ম্মকারের কার্য্যসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ লৌহজাত দ্রব্যসম্বন্ধীয়) শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(৯) কাংস্যকারের কার্য্যসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ কাঁসা, তামা, পিত্তল প্রভৃতি অন্যান্য ধাতুজাত দ্রব্যসম্বন্ধীয়) শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(১০) স্বর্ণকারের কার্য্যসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ সোণা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান্ ধাতুজাত দ্রব্যসম্বন্ধীয়) শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(১১) রত্নকারের কার্য্যসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ হীরা, মুক্তা, মণি প্রভৃতি রত্নজাত দ্রব্যসম্বন্ধীয়) শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(১২) চর্ম্মকারের কার্য্যসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ বিবিধ চর্ম্মজাত দ্রব্যসম্বন্ধীয়) শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(১৩) কাগজ, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি দ্রব্যসম্বন্ধীয় শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(১৪) যান-নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(১৫) যন্ত্র-নির্ম্মাণসম্বন্ধীয় শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(১৬) চিত্র ও বাদ্য প্রভৃতিসম্বন্ধীয় শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানসমূহ ;
(১৭) ভবন-নির্ম্মাণবিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(১৮) যন্ত্রপরিচালনা-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ।

শিল্প ও কারুকার্য্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগানুসারে তিন শ্রেণীতে এবং চতুর্থশ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগানুসারে আঠার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, সেইরূপ শিল্প ও কারুকার্য্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ তিন শ্রেণীতে এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ আঠার শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার "সর্ব্বসাধারণের ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার কার্য্যবিভাগের অন্তর্ভুক্ত শিল্প ও কারুকার্য্যবিষয়ক কার্য্যশাখা, যন্ত্র পরিচালনা-বিষয়ক কার্য্যশাখা এবং ভবন নির্ম্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক কার্য্যশাখার পরিচালকগণ শিল্প ও কারুকার্য্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য দায়ী হইয়া থাকেন।

বাণিজ্য-কার্য্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগানুসারে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা :

(১) খাল খনন করিবার ও স্থলপথ নির্ম্মাণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(২) রোগী ও ভোগীগণের পরিচর্য্যা করিবার (অর্থাৎ বস্ত্র ধৌত করার, ক্ষৌরকর্ম্ম করিবার, মাল্যগন্ধাদির ব্যবস্থা করার এবং গৃহভৃত্যাদির কার্য্য প্রভৃতি করিবার) অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৩) ক্রয়-বিক্রয় করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৪) যান পরিচালনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৫) মানুষের পরস্পরের সংবাদ আদান প্রদান করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৬) ভূমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদ প্রচার করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগানুসারে বাণিজ্য কার্য্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ আট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা :

(১) খাল খনন করিবার ও স্থলপথ নির্ম্মাণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(২) রোগী ও ভোগীগণের পরিচর্য্যা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৩) ক্রয়-বিক্রয়স্থল পরিচালনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৪) ক্রয়-বিক্রয় করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৫) জলযান পরিচালনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৬) স্থলযান পরিচালনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৭) মানুষের পরস্পরের সংবাদ আদান প্রদান করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৮) ভূমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদ প্রচার করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

বাণিজ্য-কার্য্য করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মিগণের দায়িত্বের বিভাগানুসারে ছয় শ্রেণীতে এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্বের বিভাগানুসারে আট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ বাণিজ্য-কার্য্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ ছয় শ্রেণীতে এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ আট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার "সর্ব্বসাধারণের ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার কার্য্য-বিভাগের" অন্তর্ভুক্ত "খাল-খনন ও স্থলপথ নির্ম্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক কার্য্যশাখা," "রোগী ও ভোগীগণের পরিচর্য্যা-বিষয়ক কার্য্যশাখা," "ক্রয়-বিক্রয় কার্য্য-বিষয়ক কার্য্যশাখা," "যান-পরিচালনা বিষয়ক কার্য্যশাখা," "মানুষের পরস্পরের সংবাদ আদান-প্রদান-বিষয়ক কার্য্যশাখা" এবং "ভূমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদ প্রচার সম্বন্ধীয় কার্য্যশাখার" পরিচালকগণ বাণিজ্য-কার্য্য করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ তত্ত্বাবধান করিবার জন্য দায়ী হইয়া থাকেন।

গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্ববিভাগানুসারে এক শ্রেণীর হইয়া থাকে ; যথা :

"গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার অনুষ্ঠান-সমূহ।"

চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্বের বিভাগানুসারে গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা :

(১) মল ও ধৌত জল নিকাশের পথ নির্ম্মাণ, রক্ষা ও পরিচালনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(২) পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা নির্ম্মাণ, রক্ষা ও পরিচালনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৩) গমনাগমনের পথ পরিষ্কৃত রাখিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৪) গমনাগমনের পথ আলোকিত রাখিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্বসমূহের বিভাগানুসারে এক শ্রেণীর এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্বসমূহের বিভাগানুসারে চারিশ্রেণীর হয়, গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণও সেইরূপ এক শ্রেণীর এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ চারি শ্রেণীর হইয়া থাকেন।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য পরিচালনা-সভার "সর্ব্বসাধারণের ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার কার্য্যবিভাগের" অন্তর্ভুক্ত "গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যরক্ষা-বিষয়ক কার্য্যশাখার" ভারপ্রাপ্ত পরিচালক গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য দায়ী হইয়া থাকেন।

গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ এক শ্রেণীর হইয়া থাকে। ঐ বিষয়ক দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণও এক শ্রেণীর হইয়া থাকেন।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার "সর্ব্বসাধারণের ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার কার্য্যবিভাগের" অন্তর্ভুক্ত "মানুষের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা-বিষয়ক কার্য্যশাখার" ভারপ্রাপ্ত "পরিচালক" গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য দায়ী হইয়া থাকেন।

প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক মানুষের ধনাভাব দূর করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার জন্য কয় শ্রেণীর কর্ম্মী ও কয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান থাকে তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক গ্রামে সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মী থাকে ১৫ শ্রেণীর, তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মী থাকে ১৫ শ্রেণীর এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মী থাকে ৩৮ শ্রেণীর।

প্রত্যেক গ্রামে সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের ১৫ শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিতে হয়,

চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের ৩৯ শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিতে হয়।

৩৮ শ্রেণীতে বিভক্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের মধ্যে শেষোক্ত ১০ শ্রেণীর ছাড়া বাকী ২৮ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের প্রত্যেকের স্ব স্ব শ্রেণীগত অনুষ্ঠান ছাড়া কৃষি-কার্য্যও করিতে হয়। চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের ও উপরোক্ত ২৮ শ্রেণীর প্রত্যেকের হস্তে দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকে; যথা:

(১) কৃষি কার্য্যের দায়িত্বভার।

(২) স্ব স্ব শ্রেণীগত অনুষ্ঠানের দায়িত্বভার।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের উনচল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের বণ্টনের নিয়মানুসারে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ প্রধানতঃ আটত্রিশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন বটে; কিন্তু ঐ উনচল্লিশ শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রেণীর অনুষ্ঠান বহু-সংখ্যক প্রত্যন্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের আটত্রিশ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের প্রত্যেক শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণও বহুসংখ্যক প্রত্যন্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন।

অতঃপর আমরা এই প্রসঙ্গে "কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান-সংগঠনে সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মিগণের আয়-ব্যয়ের বিবরণ" বিবৃত করিব।

পাঠকগণকে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, "কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অনুষ্ঠান-সমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টন"—প্রসঙ্গে আমরা এতাবৎ আট শ্রেণীর আলোচনা করিয়াছি; যথা:

(১) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;

(২) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;

(৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;

(৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠান-সমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;

(৫) সামাজিক গ্রামের অনুষ্ঠানসমূহের ও সামাজিক কর্ম্মিগণের দায়িত্ববণ্টনের বিবরণ;

(৬) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠান সমূহের ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মিগণের দায়িত্ববণ্টনের বিবরণ;

(৭) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মিগণের দায়িত্ববণ্টনের বিবরণ;

(৮) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মিগণের দায়িত্ববণ্টনের বিবরণ।

উপরোক্ত আট শ্রেণীর বিবরণে আমরা পাঠকবর্গকে যাহা যাহা দেখাইয়াছি, সেই সমস্তের উদ্দেশ্য কি কি তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইলে "মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের দ্বিতীয়ভাগে" আমাদের বক্তব্য প্রধানতঃ কি কি, তাহা পাঠকবর্গকে স্মরণ করিতে হইবে।

পাঠকগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "যে যে প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, সেই সেই প্রতিষ্ঠানের সংগঠনসমূহের ব্যাখ্যা করা" আমাদিগের উপরোক্ত দ্বিতীয় ভাগের প্রধান লক্ষ্য।

ইহা বলা বাহুল্য যে, যে-যে প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়—সেই সেই প্রতিষ্ঠানের সংগঠনসমূহের ব্যাখ্যা করিতে হইলে অন্যান্য অনেক আলোচনার সঙ্গে দুই শ্রেণীর বিষয়ের আলোচনা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়, যথা:

একদিকে প্রথমতঃ, প্রতিষ্ঠানসমূহের নামের, দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে যে যে অনুষ্ঠান সাধন করা হয়, সেই সেই অনুষ্ঠানের নামের এবং তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে যে যে অনুষ্ঠান সাধন করা হয়, সেই সেই অনুষ্ঠানের সাধনে যে যে শ্রেণীর কর্ম্মী নিযুক্ত করা হয়, সেই সেই শ্রেণীর কর্ম্মীর নামের বর্ণনামূলক আলোচনা, অন্য দিকে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে যে অনুষ্ঠান সাধন করা হয়, সেই সেই অনুষ্ঠানের সাধন করিলে

যে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়—তদ্বিষয়ক যুক্তিমূলক আলোচনা।

"কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টন" প্রসঙ্গে আমরা যে আট শ্রেণীর আলোচনা করিয়াছি তাহার প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য—উপরোক্ত বর্ণনামূলক আলোচনা করা।

উপরোক্ত বর্ণনামূলক আট শ্রেণীর আলোচনা এবং "কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে দেশ ও গ্রামবিভাগের বিবরণ" হইতে নিম্নলিখিত চারিশ্রেণীর কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যথা:

(১) সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যত লোক-সংখ্যা বসবাস করেন, তাঁহাদিগের সমষ্টিতে সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের লোকসংখ্যার সমগ্রত্ব অথবা সমষ্টি সাধিত হয়;

(২) যে যে ব্যবস্থায় প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃ-সিদ্ধ হয়, সেই সেই ব্যবস্থায় সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়াও স্বতঃসিদ্ধ হয়;

(৩) প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া যাহাতে স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে মুখ্যতঃ তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, যথা:

(ক) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার পাঁচটী অথবা বারটী প্রত্যন্তর শ্রেণীর অনুষ্ঠানসমূহ;

(খ) মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন যাপন করিবার সাতটী প্রত্যন্তর শ্রেণীর অনুষ্ঠানসমূহ;

(গ) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ১৫টী অথবা ৩৯টী প্রত্যন্তর শ্রেণীর অনুষ্ঠানসমূহ;

(৪) প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যাহাতে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মুখ্যানুষ্ঠান স্বতঃই সাধিত হয় তজ্জন্য গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার ও তাহার ছয়টী কার্য্যবিভাগের, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার ও তাহার নয়টী কার্য্য বিভাগের, দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার ও তাহার নয়টী কার্য্যবিভাগের এবং কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা সভার ও তাহার নয়টী কার্য্যবিভাগের সংগঠন করা হয়।

উপরোক্ত চারিশ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা সভার এবং তাহাদিগের কার্য্যবিভাগসমূহের সংগঠন সাধিত হইলে এবং তদনুরূপ কার্য্য চলিতে থাকিলে যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মুখ্যানুষ্ঠান স্বতঃসাধিত হইয়া থাকে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

"মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহের মূল নীতিসূত্র এবং ঐ অনুষ্ঠানসমূহ সাধন করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের বণ্টন" প্রসঙ্গে আমরা উহার বিশদ আলোচনা করিব। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরোক্তভাবের সংগঠন সাধিত হইলে যে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহার যুক্তিমূলক আলোচনা করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতো-ভাবে পূরণ হওয়া যাহাতে স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে তিন শ্রেণীর মুখ্যানুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই তিন শ্রেণীর মুখ্যানুষ্ঠান সাধিত হইলে যে সেই তিন শ্রেণীর মুখ্যানুষ্ঠানের প্রত্যেকটীর উদ্দেশ্য সফল হওয়া অনিবার্য্য হয়—তাহা দেখাইবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে বার শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই বার শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধনে যে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া এবং মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জন-শীল জীবন সাধন করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে সাতশ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধনে যে মানুষের কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধিত হওয়া অনিবার্য্য হয়—তাহা আমরা "চারিশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপরিচালনা-সভাসমূহের কর্ম্মিগণের শিক্ষা-পদ্ধতি ও নিয়োগ-পদ্ধতি শীর্ষক" আলোচনায় দেখাইব।

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার উদ্দেশ্যে যে ১৫ শ্রেণীর অথবা ৩৯ শ্রেণীর অনুষ্ঠান প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই ১৫ শ্রেণীর অথবা ৩৯ শ্রেণীর অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইলে যে মানুষের ধনাভাব নিবারিত হইয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা দেখাইতে হইলে ঐ ১৫ শ্রেণীর অথবা ৩৯ শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধিত হইলে সামাজিক গ্রামের কর্ম্মিগণের আয়-ব্যয়ের অবস্থা কিরূপ হয় তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত কারণে আমরা অতঃপর "কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মিগণের আয়-ব্যয়ের বিবরণ" বিবৃত করিব।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মিগণের আয়-ব্যয়ের বিবরণ

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মিগণের কাহার কি উপার্জ্জন হইয়া থাকে, তাহা বিবৃত করিতে হইলে সামাজিক গ্রামে কয় শ্রেণীর কর্ম্মী বসবাস করেন, তাহার কথা স্মরণ করিতে হয়।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে চারিশ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মী (অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর, তৃতীয় শ্রেণীর এবং চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মী) বসবাস করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া, কোন কোন সামাজিক গ্রামে সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ, প্রান্তস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ, দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ এবং কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণও বসবাস করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মিগণ যে আটত্রিশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন, সেই আটত্রিশ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মিগণের কোন্ শ্রেণীতে কিরূপভাবে উপার্জ্জন হইয়া থাকে, তাহার কথা আমরা একে একে এই আখ্যায়িকায় সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করিব। এই আলোচনা হইতে একদিকে যেরূপ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সামাজিক গ্রামের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার সহিত পরিচিত হওয়া যায়, সেইরূপ আবার ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য কথা জানা যায়। আটত্রিশ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের কথা আলোচনা করিয়া তাহার পর তাঁহাদের ব্যয়ের কথা আলোচনা করিব।

১। জলজাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণীর কার্ম্মগণের উপার্জ্জনের বিবরণ।

এই কর্ম্মিগণের উপার্জ্জন প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, যথা—

(১) কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য এবং

(২) জলজাত দ্রব্যসমূহের মূল্য।

আগেই দেখান হইয়াছে যে, এই কর্ম্মিগণ যেমন জলজাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আবার কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকেন।

কৃষিজাত কাঁচামাল ইঁহারা নিজেরা নিজেদের ইচ্ছামত বিক্রয় করিয়া থাকেন।

জলজাত কাঁচামালের প্রত্যেকটী গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভাকে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করিতে হয়। গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভা উহা নির্দ্ধারিত মূল্যে হয় জলজাত কাঁচামালসমূহের বণিকগণকে নতুবা ঐ বিষয়ক শিল্পিগণকে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

২। বনরক্ষা করিবার এবং বনজাত উদ্ভিদ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি রক্ষা বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণীর কার্ম্মগণের উপার্জ্জনের বিবরণ।

এই কার্ম্মগণের উপার্জ্জন প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, যথা :

(১) কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য এবং

(২) বনরক্ষা করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানের বেতন।

বন এবং বনজাত দ্রব্যসমূহ রক্ষা-বিষয়ক শ্রমিকগণ যেমন বন এবং বনজাত দ্রব্যসমূহ রক্ষা-বিষয়ক কার্য্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ আবার কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকেন।

সমস্ত শ্রেণীর বনই গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা সভার সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বন এবং বনজাত দ্রব্যসমূহ রক্ষা করিবার শ্রমিকগণের বেতন

উপরোক্ত কারণে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা সভায় দিতে হয়

৩। বাগান নির্ম্মান ও বাগানজাত উদ্ভিদাদি উৎপাদন ও রক্ষা বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের বিবরণ।

এই কর্ম্মিগণের উপার্জ্জন প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, যথা :

(১) কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য এবং

(২) বাগানজাত উদ্ভিদাদির মূল্য

ইঁহাদের কার্য্যও দুই শ্রেণীর যথা :

(১) কৃষি কার্য্য ও

(২) বাগানের কার্য্য।

কৃষিজাত কাঁচামাল ইঁহারা নিজেদের ইচ্ছামত বিক্রয় করিয়া থাকেন।

বাগানজাত উদ্ভিদাদির প্রত্যেকটি গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা সভাকে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করিতে হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভা উহা নির্দ্ধারিত মূল্যে ঐ বিষয়ক বণিকগণকে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

৪। পশুজাত কাঁচা মাল উৎপাদন-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের বিবরণ।

ইহাদের উপার্জ্জন দুই শ্রেণীর, যথা :

(১) কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য এবং

(২) পশুজাত কাঁচা মালের মূল্য।

কৃষিজাত কাঁচা মাল শ্রমিকগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিক্রয় করিয়া থাকেন। পশুজাত কাঁচামাল গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভাকে বিক্রয় করিতে হয়, মূল্য নির্দ্ধারিত থাকে।

গ্রামস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভা উহা ঐ বিষয়ক বণিক এবং শিল্পিগণকে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

৫ হইতে ৭। পক্ষিজাত কাঁচামাল, কীট-পতঙ্গজাত কাঁচা মাল, খনিজাত কাঁচামাল উৎপাদন বিষয়ক গ্রামস্থ তিন শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের তিন শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের বিবরণ।

ইঁহাদের প্রত্যেকের কার্য্য দুই শ্রেণীর, যথা :

(১) কৃষিকার্য্য এবং

(২) পক্ষিজাত কাঁচা মাল উৎপাদনের কার্য্য অথবা কীটপতঙ্গজাত কাঁচামাল উৎপাদনের কার্য্য অথবা খনিজাত কাঁচা মাল উৎপাদনের কার্য্য

ইহাদের উপার্জ্জনও দুই শ্রেণীর কৃষিজাত কাঁচা মাল ইঁহারা ইঁহাদের নিজেদের ইচ্ছামত বিক্রয় করিয়া থাকেন। অন্যান্য কাঁচা মাল নির্দ্ধারিত মূল্যে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভাকে বিক্রয় করিতে হয়। গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভা ঐ সমস্ত কাঁচা মাল হয় ঐ ঐ বিষয়ক বণিকগণকে নতুবা শিল্পিগণকে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

৮ হইতে ২৩। ষোল শ্রেণীর শিল্পবিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানের ষোল শ্রেণীর চতুর্থশ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের বিবরণ :

ইহাদের প্রত্যেকের কার্য্য দুই শ্রেণীর, যথা :

(১) কৃষিকার্য্য এবং

(২) ষোল শ্রেণীর শিল্পকার্য্যের কোন না কোন শ্রেণীর শিল্পকার্য্য।

ইহাদের উপার্জ্জনও দুই শ্রেণীর। কৃষিজাত কাঁচামাল ইঁহারা ইঁহাদের নিজেদের ইচ্ছামত বিক্রয় করিয়া থাকেন। শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ নির্দ্ধারিত মূল্যে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য পরিচালনা সভাকে বিক্রয় করিতে হয়। গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য পরিচালনা সভা ঐ সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য হয় ঐ ঐ বিষয়ক বণিকগণকে নতুবা কারুকরগণকে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করেন।

২৪। ভবননির্ম্মাণ-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের বিবরণ :

ইহাদের কার্য্য দুই শ্রেণীর যথা :

(১) কৃষিকার্য্য এবং

(২) ভবন নির্ম্মাণ ও রক্ষা বিষয়ক কার্য্য।

ভবন নির্ম্মাণ ও রক্ষা বিষয়ক কার্য্য দুই শ্রেণীর যথা :

(১) সরকারী এবং

(২) বেসরকারী।

ইঁহাদের উপার্জ্জন দুই শ্রেণীর, যথা :

(১) কৃষিজাত কাঁচা মালের মূল্য এবং

(২) ভবন নির্ম্মাণ ও রক্ষাবিষয়ক কার্য্যের বেতন।

যে সমস্ত শ্রমিক সরকারী ভবন নির্ম্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভা বেতন দিয়া থাকেন। আর যাঁহারা বে-সরকারী ভবন নির্ম্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগের যিনি যে যে গ্রামবাসীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন সেই সেই গ্রামবাসীর নিকট হইতে বেতন পাইয়া থাকেন।

বে-সরকারী ভবন নির্ম্মাণ এবং রক্ষার কার্য্যও গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা সভার তত্ত্বাবধারণে সাধিত হইয়া থাকে।

২৫। যন্ত্রপরিচালনা-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের বিবরণ:—

ইঁহাদের কার্য্য দুই শ্রেণীর, যথা:

(১) কৃষিকার্য্য এবং

(২) যন্ত্র-পরিচালনার কার্য্য।

যন্ত্রপরিচালনার কার্য্য সর্ব্বদাই সরকারী কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কার্য্য গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার তত্ত্বাবধারণে সাধিত হয়।

এই কর্ম্মিগণের উপার্জ্জন দুই শ্রেণীর, যথা:

(১) কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য এবং

(২) যন্ত্রপরিচালনা কার্য্যের বেতন।

২৬। খাল খনন ও স্থলপথ নির্ম্মাণ-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের বিবরণ:—

এই কর্ম্মিগণের কার্য্য দুই শ্রেণীর, যথা:

(১) কৃষিকার্য্য এবং

(২) খাল খনন ও স্থলপথ নির্ম্মাণ করিবার কার্য্য।

খাল খনন ও স্থলপথ নির্ম্মাণ করিবার কার্য্য সর্ব্বদাই সরকারী কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কার্য্যসমূহ গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার তত্ত্বাবধারণে সাধিত হয়।

উপরোক্ত কর্ম্মিগণের উপার্জ্জন দুই শ্রেণীর, যথা:

(১) কৃষিজাত কাঁচা মালের মূল্য এবং

(২) খাল খনন ও স্থলপথ নির্ম্মাণ-কার্য্যের বেতন।

২৭। বস্ত্র-প্রক্ষালন, ক্ষৌর-কর্ম্ম, মালা-গন্ধাদির ব্যবস্থা, গৃহ-ভৃত্যাদির কার্য্য প্রভৃতি রোগী ও ভোগীগণের পরিচর্য্যা-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের বিবরণ:—

এই কর্ম্মিগণের কার্য্য দুই শ্রেণীর, যথা:

(১) কৃষিকার্য্য অথবা শিল্পকার্য্য অথবা কারুকার্য্য এবং

(২) পরিচর্য্যা করিবার কার্য্য।

পরিচর্য্যা করিবার কার্য্য সর্ব্বদাই বে-সরকারী কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। উহা বে-সরকারী কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও, গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার উহা তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়।

পরিচর্য্যা-বিষয়ক সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জন দুই শ্রেণীর, যথা:

(১) কৃষিজাত কাঁচামালের অথবা শিল্পজাত দ্রব্যের অথবা কারুকার্য্যজাত দ্রব্যের মূল্য এবং

(২) পরিচর্য্যা কার্য্যের বেতন।

২৮। ক্রয় বিক্রয়স্থল পরিচালনা বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের বিবরণ:—

এই কর্ম্মিগণের কার্য্যও দুই শ্রেণীর যথা:

(১) কৃষিকার্য্য অথবা শিল্পকার্য্য অথবা কারুকার্য্য;

(২) ক্রয় বিক্রয়ের স্থল পরিচালনার কার্য্য।

ক্রয় বিক্রয়স্থল পরিচালনার কার্য্য সর্ব্বদাই সরকারী কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। মাল বহন করিবার কার্য্য ক্রয় বিক্রয়স্থল পরিচালনার কার্য্যসমূহের মধ্যে প্রধান। এই কার্য্য সমূহ গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য পরিচালনা সভার তত্ত্বাবধারণে সাধিত হয়।

উপরোক্ত কর্ম্মিগণের উপার্জ্জন দুই শ্রেণীর যথা:

(১) কৃষিজাত কাঁচা মালের অথবা শিল্পজাত দ্রব্য সমূহের অথবা কারুকার্য্যজাত দ্রব্য সমূহের মূল্য;

(২) ক্রয় বিক্রয়স্থল পরিচালনা কার্য্যের বেতন।

২৯। ক্রয় বিক্রয় করিবার অনুষ্ঠান বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের বিবরণ :—

এই কর্ম্মিগণ সাধারণতঃ কৃষিকার্য্য করিবার অবসর পান না। ইঁহারা প্রধানতঃ ক্রয় বিক্রয় করিবার অনুষ্ঠান-সমূহেই নিযুক্ত থাকেন।

ইঁহারা প্রধানতঃ ক্রয় বিক্রয় করিবার অনুষ্ঠানসমূহে নিযুক্ত থাকেন বটে, কিন্তু অবসর সময়ে ইচ্ছা করিলে কৃষি-কার্য্য অথবা শিল্পকার্য্য অথবা কারুকার্য্য করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন।

ক্রয় বিক্রয় করিবার অনুষ্ঠানসমূহ সর্ব্বদাই সরকারী কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ক্রয় বিক্রয় করিবার অনুষ্ঠান বিষয়ক সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণকে 'বণিক' বলিয়া অভিহিত করা হয়। বণিকগণ তাহাদের কার্য্যের জন্য স্ব স্ব ব্যয় নির্ব্বাহের উপযুক্ত যথেষ্ট হারে বেতন পাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ বেতনই তাঁহাদিগের উপার্জ্জনের এবং সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান পন্থা হইয়া থাকে। বণিকগণের কার্য্য গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য পরিচালনা সভার সর্ব্বতোভাবের তত্ত্বাবধারণে সাধিত হয়। প্রত্যেক পণ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য সর্ব্বতোভাবে নির্দ্ধারিত হয়। বণিকগণকে কোন লভ্যাংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় না। বণিকগণকে লভ্যাংশ গ্রহণের সুযোগ দিলে বণিকগণের লোভের উদ্রেক হওয়া অনিবার্য্য হয়। লোভের উদ্রেক হইলে বণিকগণ সদ্‌সদ্ জ্ঞানহারা হইয়া অস্বাস্থ্যকর পণ্যসমূহ পর্য্যন্ত ক্রয় বিক্রয় করিতে প্রবৃত্তি-যুক্ত হইয়া থাকেন।

বণিকগণের জীবিকার্জ্জনের সাধারণ পন্থা প্রধানতঃ বেতন বটে, কিন্তু ইঁহারাও ইচ্ছা করিলে এতদ্ অতিরিক্ত শ্রমের কার্য্যে সক্ষম হইলে কোন না কোন কাঁচামাল অথবা শিল্পজাত মাল অথবা কারুকার্য্যজাত মাল উৎপাদন করিতে পারেন এবং তাহার মূল্য উপার্জ্জন করিতে পারেন।

৩০ হইতে ৩৩। জল-যান পরিচালনা, স্থল-যান পরিচালনা, সংবাদ আদান প্রদান, এবং সংবাদ প্রচার—এই চারি শ্রেণীর অনুষ্ঠান বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থশ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের বিবরণ :—

ঐ চারি শ্রেণীর চতুর্থশ্রেণীর কর্ম্মিগণও সাধারণতঃ কৃষিকার্য্য করিবার অবসর পান না। উঁহারা প্রধাণতঃ এই চারি শ্রেণীর অনুষ্ঠানেই নিযুক্ত থাকেন।

এই চারি শ্রেণীর অনুষ্ঠানই "সরকারী কার্য্য" বলিয়া পরিগণিত হয়।

এই চারি শ্রেণীর কার্য্যের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক কার্য্যটী গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য পরিচালনা সভার এবং সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের তত্ত্বাবধারণে সাধিত হইয়া থাকে।

এই চারি শ্রেণীর কর্ম্মীরই উপার্জ্জনের ও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান পন্থা সাধারণতঃ তাহাদিগের স্ব স্ব বেতন। ইঁহারাও ইচ্ছা করিলে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে সক্ষম হইলে কোন-না-কোন কাঁচা মাল অথবা শিল্পজাত মাল অথবা কারুকার্য্যজাত মাল উৎপাদন করিতে পারেন, এবং তাহার মূল্য উপার্জ্জন করিতে পারেন।

৩৪ হইতে ৩৭। মল ও ধৌতজল নিকাশ ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা, গমনাগমনের পথ পরিষ্কারের ব্যবস্থা, গমনাগমনের পথ আলোকিত রাখিবার ব্যবস্থা—এই চারি শ্রেণীর ব্যবস্থা বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের বিবরণ :—

উপরোক্ত চারিশ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণও সাধারণতঃ কৃষিকার্য্য করিবার অবসর পান না। তাঁহারা প্রধানতঃ ঐ চারি শ্রেণীর অনুষ্ঠানেই নিযুক্ত থাকেন।

এই চারিশ্রেণীর অনুষ্ঠানই সরকারী কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

এই চারিশ্রেণীর কার্য্যের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক কার্য্যটি গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার এবং ঐ ঐ বিষয়ক—সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের তত্ত্বাবধারণে সাধিত হইয়া থাকে।

ঐ চারিশ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের ও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান পন্থা সাধারণতঃ তাঁহাদিগের স্ব স্ব বেতন। ইহারা ইচ্ছা করিলে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে সক্ষম হইলে কোন-না-কোন কাঁচামাল অথবা শিল্পজাত মাল উৎপাদন করিতে পারেন এবং তাহার মূল্য উপার্জ্জন করিতে পারেন।

৩৮। গ্রামের স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের বিবরণ :—

উপরোক্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণও সাধারণতঃ কৃষিকার্য্য করিবার অবসর পান না। তাঁহারা প্রধানতঃ গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ক কার্য্যেই নিযুক্ত থাকেন।

গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা-বিষয়ক কার্য্য সরকারী কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কার্য্য গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার এবং ঐ বিষয়ক সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের তত্ত্বাবধারণে সাধিত হইয়া থাকে।

গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান পন্থা সাধারণতঃ তাঁহাদের স্ব স্ব বেতন। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে সক্ষম হইলে কোন না কোন কাঁচামাল অথবা শিল্পজাত মাল উৎপাদন করিতে পারেন এবং তাহার মূল্য উপার্জ্জন করিতে পারেন।

সামাজিক গ্রামের ৩৯ শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের ৩৮ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের বিবরণের সারাংশ

উপরোক্ত সারাংশ লক্ষ্য করিলে নিম্নলিখিত কথাগুলি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, যথা :

(১) সাত শ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার সাত শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের মধ্যে ছয় শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের পন্থা দুই শ্রেণীর, যথা :

(ক) কৃষিজাত কাঁচামাল সমূহের মূল্য;

(খ) অন্যান্য কোন না কোন এক শ্রেণীর কাঁচামালের মূল্য।

বন রক্ষা করিবার এবং বনজাত উদ্ভিদাদি রক্ষা করিবার কার্য্যে যে সমস্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মী নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা কৃষিজাত কাঁচামালসমূহের মূল্য উপার্জ্জন করিবার সুযোগ পান বটে, কিন্তু অন্য কোন শ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার সুযোগ পান না এবং তাহার মূল্যও উপার্জ্জন করিতে পারেন না। তৎস্থলে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার নিকট হইতে একটী বেতন পাইয়া থাকেন।

(২) আঠার শ্রেণীর শিল্পের কার্য্যের আঠার শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের মধ্যে ষোল শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের পন্থা দুই শ্রেণীর, যথা :

(ক) কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য;

(খ) ষোল শ্রেণীর শিল্পজাত দ্রব্যের কোন না কোন এক শ্রেণীর শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য।

ভবন নির্ম্মাণের ও যন্ত্র পরিচালনার কার্য্যে যে দুই শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মী নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা কৃষিজাত কাঁচামালসমূহের মূল্য উপার্জ্জন করিবার সুযোগ পান বটে, কিন্তু কোন শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য উপার্জ্জন করিবার সুযোগ পান না। তৎস্থলে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার নিকট হইতে অথবা গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে একটা বেতন পাইয়া থাকেন।

(৩) বাণিজ্য-কার্য্যের আট শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রথমোক্ত তিন শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানে—যে তিন শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মী নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য এবং একটী বেতন পাইয়া থাকেন।

শেষোক্ত পাঁচ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার নিকট হইতে প্রধানতঃ একটী বেতন পাইয়া থাকেন। ইঁহারাও ইচ্ছা করিলে কাঁচামাল অথবা শিল্পজাত মাল উৎপাদন করিবার অথবা তাহার মূল্য অর্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

(৪) গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার চারি শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানে যে চারি শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মী নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের উপার্জ্জনের পন্থা সাধারণতঃ কেবলমাত্র সরকারী বেতন। ইঁহারাও ইচ্ছা করিলে কোনও না কোন কাঁচা মাল অথবা শিল্পজাত মাল উৎপাদনের এবং তাহার মূল্য অর্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

(৫) গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানে যে সমস্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মী নিযুক্ত থাকেন তাহাদিগের উপার্জ্জনের ও জীবিকা নির্ব্বাহের পন্থা সাধারণতঃ কেবলমাত্র সরকারী বেতন। ইঁহারাও ইচ্ছা করিলে কোন না কোন কাঁচা মাল অথবা শিল্পজাত মাল উৎপাদনের এবং তাহার মূল্য অর্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠান যে যে উনচল্লিশ শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানে বিভক্ত হইয়া থাকে, সেই উনচল্লিশ শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানে যে আটত্রিশ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মী নিযুক্ত থাকেন, তাহাদিগের প্রত্যেকের উপার্জ্জনের ও স্ব স্ব সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পন্থা দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে। হয় কৃষিজাত ও অন্যান্য কাঁচা-মালের মূল্য, নতুবা কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য, নতুবা কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ও বেতন, নতুবা শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য ও বেতন প্রত্যেক শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর উপার্জ্জনের পন্থা হইয়া থাকে। কর্ম্মিগণের উপরোক্ত উপার্জ্জনের পন্থায় চতুর্থ শ্রেণীর স্ব স্ব ব্যয় নির্ব্বাহ পক্ষে কোন ধনাভাবের উদ্ভব হইতে পারে কিনা, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আরও তিনটি বিষয়ের কথা পরিজ্ঞাত হইতে হয়, যথা :

(১) কাঁচা মাল উৎপাদন করিবার জমি বিভাগের কথা ;

(২) কাঁচা মাল ও শিল্পজাত মালসমূহের মূল্য নির্দ্ধারণের নিয়মের কথা ;

(৩) বেতন হার নির্দ্ধারণের নিয়মের কথা।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর বিষয়ের কথা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের কাহারও স্ব স্ব প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহপক্ষে কোনও ধনাভাবের উদ্ভব হইতে পারে কি না তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় বটে, কিন্তু মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান সাধনের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ধনাভাব নিবারণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয় কিনা, তাহা কেবল মানুষের ব্যক্তিগত উপার্জ্জনের কথা পরিজ্ঞাত হইলেই স্থির করা যায় না। উহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে স্থির করিতে হইলে একদিকে যেরূপ গ্রামবাসিগণের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপার্জ্জনের পরিমাণের কথা নির্দ্ধারণ করিতে হয়, সেইরূপ আবার প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে মোট যত সংখ্যক লোক বসবাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সমগ্র সংখ্যার স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি সাধনের জন্য যে যে দ্রব্য যত যত পরিমাণে প্রয়োজনীয় হয়, সেই সেই দ্রব্য তত তত পরিমাণে উৎপাদন করা সুনিশ্চিত হয় কিনা, তাহাও নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়। উহার জন্য "সামাজিক গ্রামের দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণের নিয়মের কথা" আলোচনা করিতে হয়।

কাজেই ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার জন্য প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে উনচল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই উনচল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধনে যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের সমগ্র মনুষ্য সংখ্যার প্রত্যেক মানুষের ধনাভাব সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হওয়া ও ধনপ্রাচুর্য্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা পাঠকবর্গকে দেখাইবার জন্য আনুষঙ্গিক ভাবে এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত চারিটী বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে, যথা :

(১) সামাজিক গ্রামের জমি বিভাগের ও অন্যান্য ব্যবস্থার বিবরণ ;

(২) কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালসমূহের মূল্য নির্দ্ধারণের বিবরণ।

(৩) কর্ম্মিগণের বেতনহার নির্দ্ধারণের বিবরণ ;

(৪) সামাজিক গ্রামের দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণের নিয়মের বিবরণ ;

সামাজিক-গ্রামের জমি বিভাগের ও অন্যান্য ব্যবস্থার বিবরণ

সামাজিক গ্রামের জমি যে যে নিয়মে বিভাগ করিলে গ্রামবাসিগণের মধ্যে কোনরূপ দ্বেষ, হিংসা অথবা ক্ষোভ থাকিতে পারে না এবং গ্রামবাসিগণের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি সাধন করিবার জন্য যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেই সেই দ্রব্যের প্রত্যেকটী প্রয়োজনানুরূপ-পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে যে যে কাঁচা মালের যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয়, সেই সেই কাঁচা মাল সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করা স্বতঃসিদ্ধ হয়, সেই সেই নিয়মের কথা আলোচনা করা আমাদিগের এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য।

সামাজিক গ্রামের জমি কোন্ কোন্ নিয়মে বিভাগ করা হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে কত শ্রেণীর জমি থাকে, এই সমস্ত জমি কোন্ শৃঙ্খলায় স্বভাবতঃ সাজান থাকে, অথবা কোন্ শৃঙ্খলায় মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীর জমি সাজাইয়া লন, প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে কত শ্রেণীর মানুষ থাকেন, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ভবনস্থান,

শিক্ষাগার, ক্রয়-বিক্রয় স্থল এবং আমোদ-প্রমোদাদির স্থান কোন্ শৃঙ্খলায় সাজান হয়, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

"দেশ বিভাগের নীতিসূত্রের" আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে খানিকটা জলভাগ এবং খানিকটা স্থলভাগ বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেক দেশের স্থলভাগ প্রধানতঃ পাঁচ অংশে বিভক্ত, যথা: (১) বাগান ও বাসভবনোপযুক্ত অংশ; (২) বনাংশ; (৩) পর্ব্বতাংশ; (৪) অনুর্ব্বরাংশ; (৫) কৃষি-যোগ্যাংশ।

প্রত্যেক দেশের স্থলভাগ স্বভাবতঃ উপরোক্ত পাঁচ অংশে বিভক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে স্বাভাবিক বন, স্বাভাবিক পর্ব্বত এবং স্বাভাবিক জলাভূমি অথবা মরুভূমি বিদ্যমান থাকে না।

ভূমির স্বভাবের শ্রেণী বিভাগানুসারে সামাজিক গ্রাম প্রধানতঃ চারি শ্রেণীর হইয়া থাকে, যথা:

(১) পার্ব্বত্যভূমি প্রধান সামাজিক গ্রাম;
(২) সমতলভূমি প্রধান সামাজিক গ্রাম;
(৩) মরুভূমি প্রধান সামাজিক গ্রাম;
(৪) জলাভূমি প্রধান সামাজিক গ্রাম।

পার্ব্বত্যভূমি প্রধান সামাজিক গ্রামে স্বভাবতঃ পার্ব্বত্য বন ও পার্ব্বত্য নদী অথবা পার্ব্বত্য জলস্রোত অথবা জলপ্রপাত বিদ্যমান থাকে।

সমতলভূমিপ্রধান সামাজিক গ্রামে স্বভাবতঃ সমতল ভূমিতে নদী ও খাল সমূহ বিদ্যমান থাকে। কোন শ্রেণীর স্বাভাবিক বন প্রায়শঃ সমতল ভূমি প্রধান সামাজিক গ্রামে বিদ্যমান থাকে না।

মরুভূমি প্রধান সামাজিক গ্রামে প্রায়শঃ কোন শ্রেণীর স্বাভাবিক বন, নদী অথবা খাল বিদ্যমান থাকে না।

জলাভূমি প্রধান সামাজিক গ্রামে স্বভাবতঃ জলাভূমির জঙ্গল অথবা বন এবং খাল সমূহ বিদ্যমান থাকে। কোন পর্ব্বতাংশ জলাভূমি প্রধান সামাজিক গ্রামে স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে না।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে মানুষের বাসভূমি যাহাতে অধিবাসিগণের প্রত্যেকের সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যকর, তৃপ্তিপ্রদ এবং প্রয়োজন সাধনের সর্ব্ববিধ দ্রব্যোৎপাদনের ক্ষমতাযুক্ত হয়, তাহা করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের বাসভূমি যাহাতে অধিবাসিগণের প্রত্যেকের সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যকর, তৃপ্তিপ্রদ এবং প্রয়োজন সাধনের সর্ব্ববিধ দ্রব্যোৎপাদনের ক্ষমতাযুক্ত হয় তাহা করিতে হইলে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যাহাতে প্রথমতঃ—পার্ব্বত্যভূমি, দ্বিতীয়তঃ—নদী অথবা জলস্রোত অথবা খাল, তৃতীয়তঃ—বন, চতুর্থতঃ—বাগান, পঞ্চমতঃ—মানুষের বাসভবন, ষষ্ঠতঃ—সাধারণ শিক্ষাগার, সপ্তমতঃ—সাধারণ ক্রীড়াস্থল, অষ্টমতঃ—সাধারণ আমোদ-প্রমোদ স্থান, নবমতঃ—কৃষিযোগ্য ভূমি, দশমতঃ—শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানের উৎপাদন ভবন, একাদশতঃ—সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় স্থল এবং দ্বাদশতঃ—সাধারণ চিকিৎসাগার বিদ্যমান থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের উপরোক্ত বার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক মানুষের বাসভবনের ব্যবস্থা ছাড়া আর বাকী এগার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা সাক্ষাৎ সম্পর্কে সর্ব্বতোভাবে কোন না কোন গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য পরিচালনা-সভার দায়িত্ব সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে কার্য্যের জন্য কোন না কোন গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য পরিচালনা-সভার দায়িত্ব থাকে, সেই কার্য্যের জন্য কোন না কোন গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা-সভার, কোন না কোন দেশস্থ কার্য্য পরিচালনা-সভার এবং কেন্দ্রীয় কার্য্য পরিচালনা-সভারও দায়িত্ব থাকে।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের উপরোক্ত বার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিবাসিগণের বাসভবনের ব্যবস্থা করা সাক্ষাৎ সম্পর্কে সর্ব্বতোভাবে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা সভার দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে বটে, কিন্তু প্রত্যেক অধিবাসী যাহাতে স্বাস্থ্যকর, তৃপ্তিকর ও প্রয়োজন নির্ব্বাহোপযুক্ত বাসভবন প্রস্তুত করিতে পারেন, তদুপযোগী বাসভূমি বিনামূল্যে সরবরাহ করা গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা সভার দায়িত্বান্তর্ভুক্ত। স্বাস্থ্যকর, তৃপ্তিকর ও প্রয়োজন নির্ব্বাহোপযুক্ত বাসভবন স্ব স্ব রুচি অনুসারে নির্ম্মাণ করা অধিবাসিগণের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। কোন অধিবাসী বিনামূল্যে বাসভূমি পাইয়াও যদ্যপি স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিকর

বাসভবন যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে নির্ম্মাণ করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি বিচারের উপযুক্ত ও দণ্ডার্হ হইয়া থাকেন। বিচারে যদি দেখা যায় যে, কোন অধিবাসীর ভবন নির্ম্মাণ না করিবার যুক্তিসঙ্গত বাধা আছে, তাহা হইলে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা সভার ঐ অধিবাসীকে ঋণ দান করিয়া তাঁহার ভবন নির্ম্মাণে অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যত পরিমাণের বাসভবনোপযুক্ত জমি থাকে এবং যত সংখ্যক সংসার ঐ সামাজিক গ্রামে বসবাস করে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া প্রত্যেক সংসারের ভাগে ঐ সামাজিক গ্রামে কত পরিমাণের বাসভবনোপযুক্ত জমি বিদ্যমান আছে, তাহা স্থির করিতে হয়। প্রত্যেক সংসারের ভাগে যত পরিমাণের বাসভবনোপযুক্ত জমি থাকে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণের জমি প্রত্যেক সংসার বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন। কোন অধিবাসীর ভবন নির্ম্মাণের রুচির তৃপ্তিসাধনের জন্য উহার অতিরিক্ত পরিমাণের জমির প্রয়োজন হইলে তাহা মূল্যের বিনিময়ে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা সভার নিকট হইতে কিনিয়া লইতে হয়। বাসভবনোপযুক্ত জমির মূল্য সর্ব্বদাই নির্দ্ধারিত থাকে।

প্রত্যেক বাসভবনের সংলগ্ন ফুল, ফল ও শাক্ সব্জীর বাগান রাখিতে হয়। প্রত্যেক বাসভবনের সংলগ্ন বাগানে জলাশয় খনন করিতে হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা সভার অনুমতি ব্যতীত যে কোন শ্রেণীর ফুল, ফল ও শাকসব্জীর চাষ, অথবা যে কোন শ্রেণীর বৃক্ষ ও বনলতার বপন অথবা যে কোন শ্রেণীর পশু ও পক্ষীর পালন বাসভবন সংলগ্ন বাগানে নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। কয়েক শ্রেণীর বৃক্ষ ও লতা এবং কয়েক শ্রেণীর পশু ও পক্ষী প্রত্যেক বাসভবনের সংলগ্ন বাগানে প্রত্যেক গ্রামবাসী রাখিতে বাধ্য হয়।

সামাজিক গ্রামের অনুষ্ঠানসমূহের শৃঙ্খলানুসারে গ্রামবাসিগণের বাসভবন শৃঙ্খলিত হইয়া থাকে।

যে সামাজিক গ্রামে স্বাভাবিক পার্ব্বত্য ভূমি থাকে না, সেই সামাজিক গ্রামে কৃত্রিম পার্ব্বত্য ভূমির রচনা করিতে হয় এবং যথাসম্ভবভাবে পার্ব্বত্য পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গের পালন করিতে হয়।

যে সামাজিক গ্রামে স্বাভাবিক নদী অথবা জলস্রোত থাকে না, সেই সামাজিক গ্রামে কৃত্রিম খাল খনন করিতে হয়। কৃত্রিম খালসমূহ যাহাতে কোন না কোন স্বাভাবিক নদী অথবা জলস্রোতের সহিত সংযুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই ব্যবস্থা সাধন করিবার জন্য সাক্ষাৎভাবে দেশস্থ কার্য্যসভা এবং গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যসভা দায়ী হইয়া থাকেন। খাল খনন কার্য্যে ছয় শ্রেণীর বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন হয়, যথা :

(১) যাহাতে যে কোন দেশের যে কোন গ্রাম হইতে যে কোন দেশের যে কোন গ্রামে দ্রুতগামী জলযানের সাহায্যে যাতায়াত করা যায় তাহার ব্যবস্থা ;

(২) যাহাতে বাসভবন সংলগ্ন এবং সরকারী বাগানের প্রত্যেক জলাশয়ে স্বাভাবিক জলস্রোত প্রবাহিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৩) যাহাতে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামস্থ প্রত্যেক টুকরা কৃষিযোগ্য জমি বার মাস রস-সিঞ্চিত থাকিতে পারে, এবং কোন ক্রমে শুষ্ক না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) যাহাতে প্রত্যেক সরকারী বাগানের ও সরকারী বনের প্রত্যেক জলাশয়ে অথবা হ্রদে স্বাভাবিক জল-স্রোতের প্রবাহ চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) যাহাতে সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক বাসভবনে সমতাপূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে, এবং অসমতা ও বিষমতাপূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৬) মানুষের প্রয়োজন ও তৃপ্তি সাধনের জন্য যে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন করিতে হইলে অথবা খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে যে সমস্ত জলজাত কাঁচা মালের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত জলজাত কাঁচামালের কোনটার কোন পরিমাণের অভাব যাহাতে কোন সামাজিক গ্রামে না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা।

যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ও তৃপ্তিপ্রদ বৃক্ষ, লতা অথবা ফল, ফুল অথবা শাকসব্জী অথবা পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গ বাসভবন সংলগ্ন বাগানে উৎপাদন করা অথবা পালন করা, অথবা রক্ষা করা নিষিদ্ধ, সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় ও তৃপ্তিপ্রদ বৃক্ষলতা, ফল, ফুল, শাক সব্জী এবং পশুপক্ষী ও কীট পতঙ্গ উৎপাদন, পালন ও রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে প্রয়োজনানুরূপ সংখ্যার ও আয়তনের

সরকারী বাগান নির্ম্মাণ করিতে হয়। কোন প্রয়োজনীয় অথবা তৃপ্তিপ্রদ বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, শাক সব্জী গৃহপালিত পশুপক্ষীর যাহাতে কোন গ্রামবাসীর কোনরূপ অভাব না হয় তাহা করা সামাজিক গ্রামস্থ সরকারী বাগান নির্ম্মাণ করিবার অন্যতম উদ্দেশ্য।

যে সমস্ত সামাজিক গ্রামে স্বাভাবিক বন অথবা জঙ্গল থাকে না, সেই সমস্ত সামাজিক গ্রামে প্রয়োজনীয় সংখ্যার ও আয়তনের কৃত্রিম বন অথবা জঙ্গলের রচনা করিতে হয়। যে সমস্ত বন্য বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ মানুষের প্রয়োজনীয় ও তৃপ্তিপ্রদ সেই সমস্ত বন্য বৃক্ষ, লতা, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ ও সরিসৃপ এই সমস্ত কৃত্রিম বন অথবা জঙ্গলে উৎপাদন ও রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হয় প্রত্যেক কৃত্রিম বন অথবা জঙ্গলে জলজাত কাঁচামাল উৎপাদন করিবার জন্য কৃত্রিম হ্রদের খনন করিতে হয়।

মানুষের প্রয়োজন ও তৃপ্তিসাধনের জন্য যে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন করিতে হইলে অথবা খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন সাধনের জন্য যে সমস্ত পশু ও পক্ষীজাত, অথবা কীট পতঙ্গজাত অথবা সরিসৃপজাত অথবা বৃক্ষলতাজাত অথবা ফলফুলজাত কাঁচা মালের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত কাঁচামালের কোনটীর কোন পরিমাণের কোনরূপ অভাব যাহাতে কোন সামাজিক গ্রামে না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে কৃত্রিম বন ও বাগান রচনা করিবার অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে প্রয়োজনানুরূপ সংখ্যার ও আয়তনের সাধারণ শিক্ষাগার, সাধারণ ক্রীড়া-স্থান, সাধারণ আমোদ প্রমোদ স্থান, শিল্প ও কারুকার্য্যানুষ্ঠানের উৎপাদন ভবন, সাধারণ ক্রয় বিক্রয় স্থান এবং সাধারণ চিকিৎসাগার রচনা করিতে হয়। ঐ সমস্ত রচনা করা কোন ব্যক্তির দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে। ঐ সমস্তের কোনটী কোন ব্যক্তিকে রচনা করিতে দেওয়া সাধারণতঃ নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। উহার প্রত্যেকটি প্রয়োজনানুরূপ সংখ্যায় ও প্রয়োজনানুরূপ আয়তনে রচনা করা সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যেক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য পরিচালনা সভার দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

যে পরিমাণ কৃষিযোগ্য ভূমি চাষ করা, গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানের আটত্রিশ শ্রেণীর চতুর্থশ্রেণীর কর্ম্মিগণের প্রত্যেক সংসারের কর্ম্মীসংখ্যার সাধ্যায়ত্ত, সেই পরিমাণ জমি প্রত্যেক চতুর্থশ্রেণীর কর্ম্মীর সংসারকে বিনামূল্যে ও বিনাকরে দেওয়া প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের সামাজিক কার্য্য পরিচালনা সভার অবশ্য দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালসমূহের মূল্য নির্দ্ধারণের পদ্ধতির বিবরণ

কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালসমূহের মূল্য নির্দ্ধারণ করা কেন্দ্রীয় কার্য্য পরিচালনা সভার দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক কাঁচামালের, শিল্পজাত মালের এবং কারুকার্য্যজাত মালের মূল্য নির্দ্ধারিত থাকে। ঐ নির্দ্ধারিত মূল্য ছাড়া অন্য কোন হারে কোন মাল কোন বণিকের ক্রয় বিক্রয় করা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। যদি কোন বণিক তাহা করেন, তাহা হইলে তিনি বিচারের এবং দণ্ডের যোগ্য হইয়া থাকেন।

কোন দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের মূল্যহার নির্দ্ধারিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মুদ্রামাণ স্থির করিতে হয়। মুদ্রামাণ (unit of money) নির্দ্ধারিত না হইলে কোন দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। ইহার কারণ মুদ্রার ব্যবহার ব্যতীত কোন দ্রব্যের ক্রয় অথবা বিক্রয় করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

সংস্কৃত ভাষায় পরিণত বয়স্কের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ গড়ে দ্বিপ্রহর সময়ে (অর্থাৎ ছয় ঘণ্টায়) যে পরিমাণের দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারেন, তাহার মূল্যমান নির্দ্ধারিত হয় এক মুদ্রা। এক প্রহর সময়ে যে পরিমাণের দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারেন, তাহার মূল্যমান নির্দ্ধারিত হয় অর্দ্ধমুদ্রা। উপরোক্ত হিসাবে চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের ছয় ঘণ্টার পরিশ্রমকে এক একটী "মুদ্রামান" (unit of money) অথবা এক একটী মুদ্রা বলিয়া ধরিতে হয়।

উপরোক্ত ভাবে চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের ছয় ঘণ্টার পরিশ্রমের উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপন্ন পরিমাণের অথবা উৎপন্ন সংখ্যার মূল্যকে "মুদ্রামান" অথবা "একটী মুদ্রা" বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য অনায়াসেই নির্দ্ধারিত হইতে পারে। উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিভিন্ন দ্রব্যের যে সমস্ত

মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, সেই সমস্ত মূল্যের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না।

প্রত্যেক দেশে অথবা প্রত্যেক গ্রামে ঐ নিয়মে মুদ্রামান এবং মূল্যমান নির্দ্ধারিত হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন গ্রামের মুদ্রা বিনিময় করিতেও কোনরূপ অসুবিধা অথবা বিশৃঙ্খলা হইতে পারে না।

মানবসমাজে যখন জমির মূল্য ও খাজনা থাকে, মাল বহনের মাশুল থাকে, মূলধনের সুদ থাকে, তখন উপরোক্ত নিয়মে মূল্যমান অথবা মুদ্রামান স্থির করিলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণে কিছু জটিলতা ঘটিলেও ঘটিতে পারে কিন্তু তখনও উপরোক্ত নিয়মে মুল্যমান অথবা মুদ্রামান স্থির করিলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব হয় না।

যখন জমি বিনামূল্যে ও বিনা খাজনায় চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণকে বিলি করা হয়, যখন মালবহনের ও মানুষের যাতায়াতের কার্য্য বিনা মাশুলে সামাজিক কার্য্য পরিচালনা সভার দ্বারা সাধিত হওয়ার ব্যবস্থা হয়, যখন শিল্পাগারের জন্য শিল্পিগণের কোন খরচ করিবার প্রয়োজন হয় না এবং উহা সামাজিক কার্য্য পরিচালনা সভার দ্বারা নির্ম্মিত হয় ও বিনা ভাড়ায় শিল্পিগণ উহা ব্যবহার করিতে পারেন, যখন কোন শ্রেণীর কাঁচামাল ও শিল্পজাত মাল উৎপাদনে কোনরূপ মূলধনের প্রয়োজন হয় না, তখন উপরোক্ত নিয়মে মুল্যমান অথবা মুদ্রামান স্থির করিলে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া অতীব সহজসাধ্য হয়।

উপরোক্ত নিয়মে মুদ্রামান ও মুল্যমান স্থির করিলে বিভিন্ন দ্রব্যের পরস্পরের বিনিময়ও সহজসাধ্য হয়। তখন মুদ্রার ব্যবহার না করিয়া এক শ্রেণীর দ্রব্যের পরিবর্ত্তনে আর এক শ্রেণীর দ্রব্যের ক্রয় এবং বিক্রয় করাও সহজসাধ্য হয়।

কর্ম্মিগণের বেতন-হার নির্দ্ধারণ-পদ্ধতির বিবরণ

"কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে কর্ম্মিসমূহের শ্রেণীবিভাগ" প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের কর্ম্মিসমূহ প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন; যথা:

(১) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ;
(২) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ;
(৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ;
(৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ;
(৫) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের কর্ম্মিগণ।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের কর্ম্মিগণ আবার প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন, যথা:

(১) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ;
(২) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ;
(৩) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ;
(৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন সাধিত করিতে হয়, এবং ঐ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান যাহাতে স্বতঃই পরিচালিত হয়, তাহা করিতে হইলে যে সমস্ত কর্ম্মীর প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত কর্ম্মী প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণীবিভাগের দিক দিয়া দেখিলে, যেরূপ প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, সেইরূপ আবার বেতনের শ্রেণীবিভাগের দিক দিয়া দেখিলে, প্রধানতঃ আট শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—কেন্দ্রীয়, দেশস্থ, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় এবং গ্রামস্থ সামাজিক এই চারি শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা সভার চারি শ্রেণীর কর্ম্মী আর গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চারি শ্রেণীর কর্ম্মী।

উপরোক্ত আট শ্রেণীর কর্ম্মিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম হারে বেতন পাইয়া থাকেন গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ, উহার কারণ—গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়া থাকে। তাঁহারা যাহা কিছু করেন, তাহার প্রত্যেকটী সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের নির্দ্দেশানুসারে সাধিত হয়। ঐ সমস্ত কার্য্যের প্রধান দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। তাহা ছাড়া যাঁহারা সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের সংসারের পোষ্যসংখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়া থাকে।

সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের বেতনের হার নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে কোন্ কোন্ দ্রব্য কত কত

পরিমাণে এক একটি মানুষের নিজ নিজ আহার ও বিহারের জন্য কত কত পরিমাণে সারা বৎসরে প্রয়োজন হইতে পারে তাহা স্থির করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, এক একটী মানুষের যদ্যপি পাঁচজন (পাঁচটী বালক-বালিকা, একটী স্ত্রী এবং ১॥০ জন অতিথি অথবা আত্মীয়-স্বজন) পোষ্য থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বসমেত ছয় জনের কোন্ কোন্ দ্রব্য কত কত পরিমাণে প্রয়োজন হইতে পারে তাহার হিসাব করা হয়। কোন্ কোন্ দ্রব্য কত কত পরিমাণে প্রয়োজন হইতে পারে তাহার হিসাব করিবার সময়ে খুব সচ্ছল ভাবে চলিতে হইলে আহার, বিহার, বাসভবন প্রভৃতির জন্য যে যে দ্রব্য যত যত পরিমাণে মানুষের পূর্ণ তৃপ্তি ও পূর্ণ স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইতে পারে, সেই সেই দ্রব্য তত তত পরিমাণে ধরা হয়। তৃতীয়তঃ, ছয় জন মানুষের যে যে দ্রব্য যত যত পরিমাণে সারা বৎসরে প্রয়োজন হইতে পারে, তত তত পরিমাণের সেই সেই দ্রব্যের মোট মূল্য কত হইতে পারে তাহা স্থির করা হয়। ছয়জন মানুষের যে যে দ্রব্য যত যত পরিমাণে সারা বৎসরে প্রয়োজন হইতে পারে তত পরিমাণের সেই সেই দ্রব্যের মোট মূল্য যাহা হয়, তাহার দেড় গুণ মুদ্রা সামাজিক কার্য্যের এক একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর কর্ম্মারম্ভ মাত্র সারা বৎসরের প্রাথমিক (initial) বেতন বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। বয়স ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বেতন প্রথমতঃ মোট মূল্যের দ্বিগুণ, তাহার পর আড়াই গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি অনুসারে উপার্জ্জনের যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে এবং একই বয়সের ও একই শ্রেণীর অভিজ্ঞতায় কর্ম্মিগণের যাহাতে অনুষ্ঠানের শ্রেণীভেদানুসারে মোট উপার্জ্জন-পরিমাণের অত্যধিক ভেদ না ঘটিতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিতে হয়। সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের একই শ্রেণীর বয়সে ও একই শ্রেণীর অভিজ্ঞতায় বাৎসরিক বেতন একই পরিমাণে নির্দ্ধারিত থাকে বটে, কিন্তু কাঁচামাল ও শিল্পজাত মাল উৎপাদন করিবার অবস্থাভেদ বশতঃ ঐ কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালের উৎপন্ন পরিমাণের ভেদ ঘটিতে পারে। তাহাতে কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালের মূল্য হইতে উপার্জ্জনের পরিমাণেরও ভেদ ঘটিতে পারে। উপরোক্ত কারণে তৃতীয় শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের কোন্ শ্রেণীর বাৎসরিক উপার্জ্জনের মোট পরিমাণ কত হইয়া থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। আট-ত্রিশ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের বিভিন্ন শ্রেণীর বাৎসরিক উপার্জ্জনের মোট পরিমাণে কোন উল্লেখযোগ্য অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলে বৎসরান্তে ক্ষতিপূরণের দ্বারা উহার সামঞ্জস্য বিধান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্ম হইতে সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মে উন্নয়ন হইয়া থাকে।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মে বেতন ও দ্রব্যমূল্য হইতে মোট যত অধিক পরিমাণের মুদ্রা বাৎসরিক উপার্জ্জন হয়, তাহার দেড়গুণ পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হয়—সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মের আদ্যাবস্থায়। তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের বয়স ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি অনুসারে ঐ পারিশ্রমিক চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিকের দ্বিগুণ ও আড়াই গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের উপার্জ্জনের পরিমাণ সর্ব্বাবস্থাতেই চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের তুলনায় যেরূপ অধিক হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার উহা প্রায়শঃ তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের প্রয়োজনাতিরিক্তও হইয়া থাকে। এই কারণে যদিও উপরোক্ত হারে তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিকের হার নির্দ্ধারিত হয়, এবং তাঁহারা ঐ হারে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা যাহাতে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত মুদ্রা পারিশ্রমিক রূপে গ্রহণ না করেন এবং উহা ত্যাগ করেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণকে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে অভিমানশূন্য, বিলাসিতা ও আড়ম্বরহীন হইতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের যিনি যত অধিক ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন, চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের নিকট তিনি যাহাতে তত অধিক সম্মানভাজন হইতে পারেন, তদুপযোগী শিক্ষা চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণকে দেওয়া হয়। এই শিক্ষার ফলে তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ প্রায়শঃ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাহাদিগের প্রয়োজনাতিরিক্ত উপার্জ্জন ত্যাগ করিয়া থাকেন।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম হইতে সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মে উন্নয়ন হইয়া থাকে।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মে বেতন ও দ্রব্যমূল্য হইতে মোট যত অধিক পরিমাণের মুদ্রা বাৎসরিক উপার্জ্জন হয়, তাহার তিন গুণ পারিশ্রমিক সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মের আদ্যাবস্থায় নির্দ্ধারিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের বয়স ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি অনুসারে ঐ পারিশ্রমিক চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিকের সাড়ে তিন গুণ ও চারিগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত পারিশ্রমিক ত্যাগ করেন, তদ্বিষয়ে যেরূপ লক্ষ্য রাখা হয়, সেইরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণও যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত পারিশ্রমিক ত্যাগ করেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম হইতে সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মে উন্নয়ন হইয়া থাকে।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মে বেতন ও দ্রব্যমূল্যের সমষ্টি হইতে মোট যত অধিক পরিমাণের মুদ্রা বাৎসরিক উপার্জ্জন হয়, তাহার সাড়ে চারিগুণ সংখ্যার মুদ্রা সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মের আদ্যাবস্থায় পারিশ্রমিক স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয়। প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের বয়স ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি অনুসারে ঐ পারিশ্রমিক চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিকের পাঁচগুণ ও সাড়ে পাঁচগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত পারিশ্রমিক ত্যাগ করেন—তদ্বিষয়ে যেরূপ লক্ষ্য রাখা হয়, সেইরূপ প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণও যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত পারিশ্রমিক ত্যাগ করেন তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্ম হইতে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মে উন্নয়ন হইয়া থাকে। গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম হইতে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মে উন্নয়ন হইয়া থাকে। গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম হইতে দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মে উন্নয়ন হইয়া থাকে। দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম হইতে কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মে উন্নয়ন হইয়া থাকে।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার চারি-শ্রেণীর কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিকও গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিকের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিকের ছয়গুণ, সাড়ে ছয়গুণ ও সাতগুণ হইয়া থাকে। গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিক হয় সাড়ে সাতগুণ, আটগুণ ও সাড়ে আটগুণ। দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিক হয় নয়গুণ, সাড়ে নয়গুণ এবং দশগুণ। কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিক হয় সাড়ে দশগুণ, এগার গুণ এবং বারগুণ।

সামাজিক কার্য্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত পারিশ্রমিক ত্যাগ করেন তদ্বিষয়ে যেরূপ লক্ষ্য রাখা হয়, সেইরূপ চারিশ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার চারি শ্রেণীর কর্ম্মিগণ যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত পারিশ্রমিক ত্যাগ করেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়।

সামাজিক গ্রামের দ্রব্যোৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির বিবরণ

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে যে যে উদ্দেশ্যে সমগ্র ভূমণ্ডলকে বিভিন্ন দেশে এবং প্রত্যেক দেশকে বিভিন্ন গ্রামে বিভক্ত করা হয়, সেই সেই উদ্দেশ্যের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যতসংখ্যক অধিবাসী থাকেন, তাহাদিগের সমগ্র সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছার ও সর্ব্ববিধ প্রয়োজনের নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে যে দ্রব্য যত যত পরিমাণে প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত দ্রব্য তত তত পরিমাণে অনায়াসে উপার্জ্জন করা সহজসাধ্য।

গ্রামবাসিগণের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক দ্রব্য গ্রামমধ্যে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সহজসাধ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, প্রথমতঃ গ্রামাভ্যন্তরস্থ কৃষি-যোগ্য ও বাগান-যোগ্য জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে অটুট থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ জল-জাত কাঁচামাল যাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য স্বাভাবিক স্রোতযুক্ত খাল ও পুষ্করিণী খনন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, বন্য বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষি, কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ-জাত কাঁচামাল যাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য কৃত্রিম বন নির্ম্মাণ করিবার, বন্য বৃক্ষ-লতা উৎপাদন ও রক্ষা করিবার, বন্য পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ও সরীসৃপ পালন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। চতুর্থতঃ, সম্ভব হইলে খনিজ পদার্থ উৎপাদন করিবার ও সংগ্রহ করিবার, নতুবা অন্যগ্রাম হইতে আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয় এবং পঞ্চমতঃ, সর্ব্ববিধ কাঁচামাল উৎপাদন করিবার, সর্ব্ববিধ শিল্প-কার্য্য করিবার, সর্ব্ববিধ কারুকার্য্য করিবার কার্য্য যাহাতে স্বতঃই যুগপৎ চলিতে পারে এবং চলে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

উপরোক্ত পঞ্চবিধ কার্য্য যাহাতে স্বতঃই যুগপৎ চলিতে থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে যেরূপ এই ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক গ্রামে সেই গ্রামের সমগ্র অধিবাসীর ইচ্ছা পূরণের ও প্রয়োজন সাধনের সর্ব্ববিধ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হওয়া অনায়াসসাধ্য হয়, সেইরূপ আবার ঐ পঞ্চবিধ কার্য্য যাহাতে স্বতঃই যুগপৎ চলিতে থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে কোন দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না এবং বহুবিধ দ্রব্যই আদৌ উৎপাদন করা অসম্ভব হয়।

উপরোক্ত পঞ্চবিধ ব্যবস্থার বুনিয়াদ—গ্রামাভ্যন্তরস্থ কৃষি-যোগ্য ও বাগানযোগ্য জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে অটুট থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা।

এই ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক গ্রামের স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি সর্ব্বতোভাবে সমান নহে। স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যতই অসমান হউক না কেন, প্রকৃতির এমনই সুন্দর নিয়ম যে, প্রত্যেক গ্রামে ও প্রত্যেক দেশে সেই গ্রামের ও সেই দেশের জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি অটুট থাকিলে, সেই গ্রামে ও সেই দেশে যতসংখ্যক মানুষ স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মানুসারে বসবাস করিতে পারেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের ইচ্ছা পূরণের ও প্রয়োজন-সাধনের প্রত্যেক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা অনায়াসসাধ্য হয়। জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে সর্ব্বতোভাবে অটুট থাকে, তাহার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিলে, এই ভূ-মণ্ডলের কোন কোন দেশে, সেই দেশে স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মানুসারে যতসংখ্যক মানুষ বসবাস করিতে পারেন, তাঁহাদিগের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা-পূরণের ও সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সাধনের জন্য যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেই সেই দ্রব্য, তাহার নয় গুণ পরিমাণে পর্য্যাপ্ত উৎপাদন করা অনায়াস-সাধ্য হয়। অন্য দিকে জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে সর্ব্বতোভাবে অটুট থাকে, তাহার ব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকিলে সমগ্র ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক গ্রামের কৃষিযোগ্য ও বাগান-যোগ্য জমির উর্ব্বরাশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে, এবং তখন এমন অবস্থার পর্য্যন্ত উদ্ভব হইতে পারে যে, কোন দেশে অথবা কোন গ্রামেই সেই দেশের অথবা সেই গ্রামের সমগ্র অধিবাসীর সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছা-পূরণের সর্ব্ববিধ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা ত' দূরের কথা, নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহও প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না।

উপরোক্ত কারণে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রামে যে যে দ্রব্যোৎপাদন করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়, সেই সেই দ্রব্য উৎপাদন করা যাহাতে অনায়াসসাধ্য হয়, তাহা করিতে হইলে প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে উপরোক্ত পঞ্চবিধ ব্যবস্থা যুগপৎ ও স্বতঃই সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে হয়।

সামাজিক গ্রামের দ্রব্যোৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির মূল নীতি, উপরোক্ত ভাবে বিধি-ব্যবস্থা এবং উপরোক্ত পঞ্চবিধ ব্যবস্থার বুনিয়াদ—গ্রামাভ্যন্তরস্থ কৃষিযোগ্য ও বাগানযোগ্য জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে অটুট থাকে তাহার ব্যবস্থা করা।

গ্রামাভ্যন্তরস্থ কৃষিযোগ্য ও বাগানযোগ্য জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যখন অটুট থাকে, তখন আবার চারিটী ব্যবস্থা

যাহাতে সাধিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিলেই প্রত্যেক গ্রামে সেই গ্রামের সমগ্র অধিবাসি-সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছা ও সর্ব্ববিধ প্রয়োজন পূরণ করিবার প্রত্যেক দ্রব্য প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে। তখন যে সমস্ত গ্রামের কৃষিযোগ্য ও বাগানযোগ্য জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক, সেই সমস্ত গ্রামের কোন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যাহাতে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যাধিক না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

ভূমণ্ডলের জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে অটুট থাকে, তাহার ব্যবস্থা যখন শিথিল হয়, তখন সর্ব্বত্রই জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাইতে থাকে এবং তখন অনেক গ্রামেই সেই সেই গ্রামের অধিবাসি-সংখ্যার প্রয়োজনীয় অধিকাংশ দ্রব্যের কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। তখন সামাজিক গ্রামের দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে প্রথমতঃ জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে অটুট থাকে, সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহার পর, দ্বিতীয়তঃ, কোন্ কোন্ দেশে কোন্ কোন্ কাঁচা মালের কত পরিমাণে অভাব হইতে পারে এবং কোন্ কোন্ দেশে ও কোন্ কোন্ গ্রামে কোন্ কোন্ কাঁচামাল সেই সেই দেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার নির্দ্ধারণ করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, যে যে গ্রামে অন্যান্য অভাবগ্রস্ত দেশের যে যে কাঁচা মাল সেই সেই গ্রামের প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হয়, সেই সেই গ্রামে একদিকে যেরূপ নিজ নিজ প্রয়োজনীয় পরিমাণের উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়, সেইরূপ আবার অভাবগ্রস্ত দেশ অথবা গ্রামসমূহের অভাব পূরণ করিবার জন্যও উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

উপরোক্ত কথাগুলি যথাযথভাবে ধারণা করিতে পারিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান ও কার্য্য-প্রযত্ন অটুট থাকিলে সর্ব্বাবস্থাতেই যে যে দ্রব্য মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা ও সর্ব্ববিধ প্রয়োজন নির্ব্বাহে প্রয়োজনীয়, তাহার প্রত্যেকটী প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয়।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মিগণের আয়-ব্যয় বিবরণের সারাংশ।

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে যে অনুষ্ঠান যে যে পদ্ধতিতে সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐ ঐ অনুষ্ঠান ঐ ঐ পদ্ধতিতে সাধন করিবার ব্যবস্থা সাধিত হইলে যে প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক মানুষের ধনাভাব নিবারিত হওয়া ও ধন-প্রাচুর্য্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মিগণের আয়-ব্যয়ের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মিগণের আয়-ব্যয়ের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহার বিবরণ প্রসঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত চারিটী বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি ; যথা :

(১) সামাজিক গ্রামের জমি-বিভাগের ও অন্যান্য ব্যবস্থার বিবরণ ;

(২) কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালসমূহের মূল্য নির্দ্ধারণের বিবরণ ;

(৩) কর্ম্মিগণের বেতন-হার নির্দ্ধারণের বিবরণ ;

(৪) সামাজিক গ্রামের দ্রব্যোৎপাদন-নিয়ন্ত্রণের নিয়মের বিবরণ।

উপরোক্ত চারিটি আলোচনার মধ্যে প্রথমোক্ত "জমি-বিভাগের কথায়" এবং শেষোক্ত "দ্রব্যোৎপাদনের নিয়ন্ত্রণের নিয়মের কথায়" যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের সমগ্র অধিবাসি-সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছা ও সর্ব্ববিধ প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয়, তাহার প্রত্যেকটি প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

"কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালসমূহের মূল্য নির্দ্ধারণের কথায়" এবং "কর্ম্মিগণের বেতনহার নির্দ্ধারণের কথায়"—

দ্রব্য-মূল্য নির্দ্ধারণ-নিয়ম এবং কর্ম্মিগণের বেতন-হার নির্দ্ধারণ-নিয়ম সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক সংসারের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন পূরণ করিয়া সচ্ছলভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় হয়, তাহার প্রত্যেকটি প্রভূত পরিমাণে ক্রয় করিতে হইলে যে পরিমাণ মুদ্রার প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ মুদ্রার কোনওরূপ অভাব কোনও শ্রেণীর কোনও কর্ম্মীর হইতে পারে না।

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য-সাধন করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে যে অনুষ্ঠান যে যে পদ্ধতিতে সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই সেই অনুষ্ঠান সেই সেই পদ্ধতিতে সাধিত হইলে যে, কোনও সামাজিক গ্রামের কোনও শ্রেণীর কোনও কর্ম্মীর কোনরূপ ধনাভাব ঘটিতে পারে না এবং প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক কর্ম্মীর ধনপ্রাচুর্য্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা উপরোক্ত কথাসমূহ হইতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে সিদ্ধান্ত করা যায়।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক কর্ম্মীর ধনপ্রাচুর্য্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হইলে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসীর ধনপ্রাচুর্য্য সাধিত হওয়াও স্বতঃসিদ্ধ হয়। ইহার কারণ কোন সমাজিক গ্রামে কোন প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসী বেকার থাকিতে পারেন না। প্রত্যেকেই কোন না কোন শ্রেণীর কর্ম্মীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকগণ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাগণ কর্ম্মিগণের সংসারসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসীর ধনপ্রাচুর্য্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক মানুষের ধনপ্রাচুর্য্য সাধিত হওয়াও স্বতঃসিদ্ধ হয়। ইহার কারণ—সামাজিক গ্রামসমূহের সমগ্র অধিবাসি-সংখ্যার সমষ্টিতে সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের মনুষ্যসংখ্যার সমগ্রত্ব সাধিত হইয়া থাকে।

"কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিভিন্নশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টন" সম্বন্ধে উপসংহার।

"কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিভিন্নশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টন" প্রসঙ্গে আমরা সর্ব্বসমেত তেরটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, যথা :—

(১) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;
(২) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;
(৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;
(৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠান-সমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;
(৫) সামাজিক গ্রামের অনুষ্ঠানসমূহের ও সামাজিক কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;
(৬) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মিগণের দায়িত্ব বণ্টনের বিবরণ;
(৭) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মিগণের দায়িত্ব বণ্টনের বিবরণ;
(৮) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মিগণের দায়িত্ব বণ্টনের বিবরণ;
(৯) কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মিগণের আয়-ব্যয়ের বিবরণ;
(১০) সামাজিক গ্রামের জমি-বিভাগের ও অন্যান্য ব্যবস্থার বিবরণ;
(১১) কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালসমূহের মূল্যনির্দ্ধারণ-পদ্ধতির বিবরণ;
(১২) কর্ম্মিগণের বেতনহার নির্দ্ধারণ-পদ্ধতির বিবরণ;

(১৩) সামাজিক গ্রামের দ্রব্যোৎপাদন-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির বিবরণ।

উপরোক্ত তের শ্রেণীর আলোচনার প্রত্যেকটী মুখ্যতঃ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের ব্যাখ্যা করিবার জন্ম রচিত হইয়াছে।

সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা করিতে হইলে প্রথমতঃ, সমগ্র ভূমণ্ডলের সম্পূর্ণ কৃষি-যোগ্য জমি যাহাতে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেকে সমানভাবে পাইতে পারেন, তাহা করিবার জন্ম সমগ্র ভূমণ্ডলকে কতক-গুলি দেশে এবং প্রত্যেক দেশকে কতকগুলি সামাজিক গ্রামে বিভক্ত করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে তিন শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়; তৃতীয়তঃ, ঐ তিন শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠান যাহাতে স্বতঃই প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সাধিত হয়, তাহা করিবার জন্ম প্রত্যেক দেশকে কতকগুলি রাষ্ট্রীয় গ্রামে ও প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামকে কতকগুলি সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামে বিভক্ত করিতে হয়, এবং প্রত্যেক সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামের অধীনে দুইটী হইতে পাঁচটী পর্য্যন্ত সামাজিক গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়; চতুর্থতঃ, ঐ তিন শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠান যাহাতে স্বতঃই প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সাধিত হয়, তাহা করিবার জন্ম সমগ্র মানবসমাজের মিলিত কেন্দ্রে, প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামে, প্রত্যেক সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামে এক একটা করিয়া কার্য্যপরিচালনা-সভার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে প্রধানতঃ যে তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, সেই তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান যাহাতে স্বতঃই সাধিত হয়, তাহা করিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র মানবসমাজের মিলিত কেন্দ্রে, প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামে এবং প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে চারি শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার রচনা করিতে হয়, সেই চারি শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার কোন্‌টীতে কি কি অনুষ্ঠান কোন্ কোন্ কর্ম্মীর দ্বারা সাধন করিলে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে উপরোক্ত তের শ্রেণীর আলোচনার প্রথমোক্ত চারি শ্রেণীর আলোচনায়।

সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে প্রধানতঃ যে তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয় সেই তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান কোন্ কোন্ প্রত্যন্তর শ্রেণীর অনুষ্ঠানে বিভক্ত করিলে এবং কোন্ অনুষ্ঠান কোন্ শ্রেণীর কর্ম্মীর দায়িত্বাধীনে স্থাপন করিলে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে ঐ তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা দেখানো হইয়াছে উপরোক্ত তের শ্রেণীর আলোচনার প্রথমোক্ত চারি শ্রেণীর আলোচনার পরবর্ত্তী চারি শ্রেণীর আলোচনায়।

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার জন্ম প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে সমস্ত অনুষ্ঠান যে-যে পদ্ধতিতে সাধন করিবার প্রয়োজন হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান সেই সেই পদ্ধতিতে সাধন করিলে যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসীর ধনাভাব সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হওয়া ও ধন প্রাচুর্য্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা দেখানো হইয়াছে উপরোক্ত তেরটী আলোচনার শেষোক্ত পাঁচটী আলোচনায়।

চারিশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপরিচালনা-সভাসমূহের কর্ম্মিগণের শিক্ষা-পদ্ধতি ও নিয়োগ-পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে যে চারি শ্রেণীর কার্য্য-পরিচালনা-সভার রচনা করিতে হয়, সেই চারি শ্রেণীর কার্য্য-পরিচালনা-সভার প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভায় যে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মী নিযুক্ত হইয়া থাকেন, সেই বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মিগণকে যে যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যে যে নিয়মে তাহাদিগকে নিয়োগ করা হয়, সেই সেই শিক্ষা-নিয়ম ও নিয়োগ-নিয়ম বিবৃত করা আমাদিগের এই আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া

প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার জন্য এবং অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার জন্য প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে যে অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই সেই অনুষ্ঠানের মূল নীতি-সূত্র কি কি তাহা উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের পশুত্ব নিবারিত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধিত হওয়া এবং অলস ও বেকার জীবন নিবারিত হইয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধিত হওয়া যে স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাও উপরোক্ত আলোচনায় প্রবিষ্ট হইতে পারিলে স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারা যাইবে।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে যে চারিশ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার রচনা করিতে হয়, সেই চারিশ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা-নিয়ম ও নিয়োগ-নিয়ম কি কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে পাঠকগণকে প্রথমতঃ, চারিশ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার নাম, দ্বিতীয়তঃ, এই চারিশ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার প্রত্যেক সভায় কত শ্রেণীর কর্ম্মী থাকে, তাহার কথা স্মরণ রাখিতে হয়।

চারিশ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার নাম :

(১) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভা ;
(২) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভা ;
(৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভা ;
(৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভা।

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভা যে যে কর্ম্মিগণের দ্বারা পরিচালিত হয় সেই সমস্ত কর্ম্মী অভিজ্ঞতা ও দায়িত্বের শ্রেণী-বিভাগের দিক দিয়া দেখিলে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :

(১) নয়টি কার্য্যবিভাগের প্রত্যেক কার্য্যবিভাগের বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালনা করিবার কর্ম্মিগণ অথবা আনুষ্ঠানিক অমাত্যগণ ;
(২) নয়টি কার্য্যবিভাগের প্রত্যেক কার্য্যবিভাগ পরিচালনা করিবার কর্ম্মিগণ অথবা বিভাগীয় অমাত্যগণ ;
(৩) নয়টি কার্য্যবিভাগের সর্ব্বতোভাবে পরিচালনা করিবার কর্ম্মী অথবা বিরাট পুরুষ।

অনুষ্ঠানসমূহের শ্রেণীবিভাগের দিক দিয়া দেখিলে আনুষ্ঠানিক অমাত্যগণ একষট্টি শ্রেণীতে, বিভাগীয় অমাত্যগণ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। বিরাট পুরুষকে একটি পৃথক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে।

দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভা, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা সভা, গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যচালনা-সভা যে যে কর্ম্মিগণের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই সমস্ত কর্ম্মীও অভিজ্ঞতার ও দায়িত্বের শ্রেণী-বিভাগের দিক দিয়া দেখিলে, কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের মত প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা :

(১) আনুষ্ঠানিক সভা-কর্ম্মিগণের শ্রেণী ;
(২) বিভাগীয় সভা-কর্ম্মিগণের শ্রেণী ;
(৩) সভাপতির শ্রেণী।

অনুষ্ঠানসমূহের শ্রেণী-বিভাগের দিক দিয়া দেখিলে দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার আনুষ্ঠানিক সভা-কর্ম্মিগণ ঊনষাট শ্রেণীর এবং বিভাগীয় সভা-কর্ম্মিগণ নয় শ্রেণীর হইয়া থাকেন ; গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার আনুষ্ঠানিক সভা-কর্ম্মিগণ সাতান্ন শ্রেণীর এবং বিভাগীয় সভা-কর্ম্মিগণ নয় শ্রেণীর হইয়া থাকেন ; গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার আনুষ্ঠানিক সভা-কর্ম্মিগণ চল্লিশ শ্রেণীর এবং বিভাগীয় সভা-কর্ম্মিগণ ছয় শ্রেণীর হইয়া থাকেন। তিন শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভারই সভাপতি এক শ্রেণীর হইয়া থাকেন।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও নিয়োগ কি কি নিয়মে সাধিত হয় তাহা বুঝিতে হইলে সামাজিক গ্রামের সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের চারি শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষা ও নিয়োগ কি কি নিয়মে সাধিত হইয়া থাকে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়। *ইহার কারণ—সামাজিক গ্রামের সামাজিক* কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মী হইয়া থাকেন। সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মী না হইয়াও সময় সময় তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীর নিয়োগ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে লাভ করিতে না পারিলে কখনও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মের শিক্ষার্থী হওয়ার প্রবেশাধিকার

পাওয়া যায় না; তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে লাভ করিতে না পারিলে কখনও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মের শিক্ষার্থী হওয়ার প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না; দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে লাভ করিতে না পারিলে কখনও প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মের শিক্ষার্থী হওয়ার প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না; প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে লাভ করিতে না পরিলে কখনও গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মের শিক্ষার্থী হওয়ার প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না; সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মীর শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে লাভ করিতে না পারিলে কখনও গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মের শিক্ষার্থী হওয়ার প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না; গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা সভার কর্ম্মীর শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে লাভ করিতে না পারিলে কখনও দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মের শিক্ষার্থী হওয়ার প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না; দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মীর শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে লাভ করিতে না পারিলে কখনও কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মের শিক্ষার্থী হওয়ার প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না।

যে কোন শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মীর শিক্ষা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষা লাভ করিতে হয় বলিয়া চারি শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের শিক্ষাপদ্ধতি ও নিয়োগ-পদ্ধতি বুঝিতে হইলে সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মি-গণের শিক্ষা ও নিয়োগ কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে সাধিত হয় তাহা পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়।

চারি শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের শিক্ষা-পদ্ধতি ও নিয়োগ-পদ্ধতি বুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষা-পদ্ধতি ও নিয়োগ-পদ্ধতি বুঝা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয় বটে কিন্তু সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষা-পদ্ধতি ও নিয়োগ-পদ্ধতি বুঝিতে হইলে মানুষকে কর্ম্মজীবনের উপযুক্ত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে কোন্ শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

এক কথায়, চারি শ্রেণীর কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মি-গণের শিক্ষা-পদ্ধতি ও নিয়োগ-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিতে হইলে, মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার জন্য এবং অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন-সাধন করিবার জন্য যে যে অনুষ্ঠানের আশ্রয় লওয়া হয়, তাহা আমূলভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয়। ঐ ব্যাখ্যায় আমরা অতঃপর হস্তক্ষেপ করিব।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার জন্য যে যে অনুষ্ঠানের আশ্রয় লওয়া হয়, সেই সেই অনুষ্ঠানের আমূল ব্যাখ্যা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানের মূলসূত্রের সহিত পরিচিত হইবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের মূলসূত্রের পূর্ব্বাংশ

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের মূলসূত্র কি কি তাহা বুঝিতে হইলে মানুষের পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের "পশুত্ব" ও "মনুষ্যত্ব" কাহাকে বলে এবং কি করিয়া এই দুই শ্রেণীর বিরুদ্ধভাব একই মানুষের ভিতর উদ্ভব হইতে পারে তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে না পারিলে মানুষের পশুত্ব দূর করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠান-সমূহের মূলসূত্র নির্দ্ধারণ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না।

মানুষের পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইলে প্রত্যেক মানুষের জীবনের সঙ্গে যে ছয়টী ভাব অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, সেই ছয়টী ভাবের সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হইতে হয়। সেই ছয়টী ভাবের নাম: (১) জন্ম অথবা উৎপত্তি, (২) অস্তিত্ব, (৩) পরিণতি, (৪) বৃদ্ধি, (৫) ক্ষয় ও (৬) মৃত্যু।

ঐ ছয়টী ভাবের সহিত পরিচিত না হইতে পারিলে মানুষের কোন্ কোন্ ভাব তাহার পশুত্বের অন্তর্ভুক্ত আর কোন্ কোন্ ভাব তাহার মনুষ্যত্বের অন্তর্ভুক্ত তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় না।

মানুষের "জন্ম" হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য্য-পদ্ধতিতে তাহা জানিতে না পারিলে মানুষের "অস্তিত্ব" সম্ভব

হয়, কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য্য-পদ্ধতিতে তাহা জানা সম্ভব হয় না। মানুষের "অস্তিত্ব" সম্ভব হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য্য-পদ্ধতিতে তাহা জানা না থাকিলে মানুষের পরিণতি সম্ভব হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য্য-পদ্ধতিতে তাহা জানা সম্ভব হয় না। মানুষের পরিণতি সম্ভব হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য্য-পদ্ধতিতে তাহা জানা না থাকিলে মানুষের বৃদ্ধি হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য্য-পদ্ধতিতে তাহা জানা সম্ভব হয় না।

মানুষের "ক্ষয়" হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য্য-পদ্ধতিতে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে মানুষের "পরিণতি" ও "বৃদ্ধি" কোন্ কোন্ কার্য্য-পদ্ধতিতে ও কি কি নিয়মে হইয়া থাকে তাহা জানিবার প্রয়োজন হয় না। উহা প্রয়োজন হয় না বটে; কিন্তু মানুষের "জন্ম" ও "অস্তিত্ব" কোন্ কোন্ কার্য্য-পদ্ধতিতে ও কি কি নিয়মে সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা জানা না থাকিলে মানুষের ক্ষয় হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য্যপদ্ধতিতে তাহা জানা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের "ক্ষয়" হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য্য-পদ্ধতিতে তাহা জানা না থাকিলে মানুষের "মৃত্যু" হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য্য-পদ্ধতিতে তাহা জানা সম্ভবযোগ্য হয় না।

জন্মাদি যে ছয়টি ভাবের সঙ্গে মানুষের জীবন অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত সেই ছয়টি ভাবের সম্বন্ধে উপরে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত কথা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ ছয়টি ভাবের সঙ্গে সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হইতে হইলে, প্রথমতঃ, মানুষের "জন্ম" ও "অস্তিত্ব", দ্বিতীয়তঃ, মানুষের "পরিণতি" ও "বৃদ্ধি", এবং তৃতীয়তঃ, মানুষের "ক্ষয়" ও "মৃত্যু" স্বতঃই সম্ভবযোগ্য হয় কোন্ কোন্ কার্য্য-পদ্ধতিতে ও কি কি নিয়মে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

মানুষের "জন্মাদি" ছয়টি ভাব স্বতঃই সম্ভবযোগ্য হয় কোন্ কোন্ কার্য্য-পদ্ধতিতে এবং কি কি নিয়মে তাহার কথা অতীব বিস্তৃত। চারিটী বেদের সংহিতাংশে, ব্রাহ্মণাংশে, আরণ্যকাংশে, প্রাতিশাখ্যাংশে, উপনিষদাংশে, গৃহ্যসূত্রাংশে এবং শ্রৌতসূত্রাংশে যে সমস্ত কথা আছে সেই সমস্ত কথার অন্যতম প্রধান অংশ মানুষের জন্মাদি ছয়টি ভাব বিষয়ক। মানুষের "জন্মাদি" ছয়টি ভাবের সমস্ত কথা ব্যাখ্যা করিতে হইলে চারিটী বেদের সাতটী অংশের প্রায় সমস্ত কথাই আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়। অতখানি আলোচনা করা আমাদিগের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে এবং উহা এই প্রবন্ধে সম্ভবযোগ্যও নহে।

মানুষের জন্মাদি ছয়টি ভাবের সহিত সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হইতে হইলে যে সমস্ত কথা জানিবার প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত কথার মধ্যে যে যে কথা প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য সেই সেই কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকবর্গকে শুনাইয়াছি। মানুষের পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইলে জন্মাদি ছয়টি ভাব সম্বন্ধীয় যে সমস্ত কথা জানা অপরিহার্য্য-ভাবে প্রয়োজনীয় কেবলমাত্র সেই সমস্ত কথা এখানে উল্লেখ করিব।

যে যে কার্য্য-পদ্ধতিতে ও নিয়মে মানুষের জন্ম ও অস্তিত্ব স্বতঃই সম্ভবযোগ্য হয়, সেই সেই কার্য্য-পদ্ধতির ও নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে "মানুষ" বলিতে কি কি বুঝায় তাহা পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়।

প্রধানতঃ, পঞ্চবিধ উপাদান (অর্থাৎ দ্রব্য), কতিপয় গুণ ও কতিপয় শক্তির মিলনে "মানুষ" গঠিত হইয়া থাকে।

মানুষের অভিব্যক্তি হয় তাহার আকৃতিতে অথবা রূপে এবং তাহার কর্ম্মপ্রবৃত্তিতে ও কর্ম্মে। মানুষের আকৃতি অথবা রূপের মূল তাহার গুণসমূহ এবং ঐ গুণসমূহের মূল তাহার পঞ্চবিধ উপাদান। মানুষের কর্ম্মপ্রবৃত্তির ও কর্ম্মের মূল তাহার শক্তিসমূহ এবং ঐ শক্তিসমূহের মূল তাহার পঞ্চবিধ উপাদান।

শুধু মানুষ কেন, এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত শ্রেণীর স্থূল-শরীর-যুক্ত পদার্থ অথবা জীব স্বতঃই উৎপাদিত হয়, তাহার প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকটী প্রধানতঃ পঞ্চবিধ উপাদান, কতিপয় গুণ ও কতিপয় শক্তির মিলনে গঠিত হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চবিধ উপাদান, গুণ ও শক্তির আদি কারণ তেজ ও রসের এক শ্রেণীর মিশ্রণ। উহা সর্ব্বব্যাপী।

যে পঞ্চবিধ উপাদানে মানুষ এবং এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পদার্থ গঠিত হইয়া থাকে, সেই পঞ্চবিধ উপাদানের প্রত্যেকটীর মধ্যে তেজ ও রস মিশ্রিত ভাবে বিদ্যমান আছে। ঐ পঞ্চবিধ উপাদানের নাম: (১) ব্যোমীয়

পদার্থ (Etherial matter), (২) বায়বীয় (aerial) পদার্থ, (৩) বাষ্পীয় (gaseous) পদার্থ, (৪) তরল (liquid) পদার্থ, (৫) স্থূল (solid) পদার্থ। এই পাঁচ শ্রেণীর উপাদানের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক উপাদান আদি-কারণ-অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণের রূপান্তর মাত্র। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রস আদি-কারণ অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে চলৎশীলতাহীন (static), অপরিবর্ত্তনশীল (constant), সমতাময় এবং সর্ব্বতোভাবে মিলিত থাকে।

মানুষের শরীরে যে ব্যোমীয় ও বায়বীয় পদার্থসমূহ বিদ্যমান আছে তৎসম্বন্ধে আধুনিক কোন বিজ্ঞানে কোন কথা পাওয়া যায় না। ঐ সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া ত দূরের কথা, ব্যোমীয়, বায়বীয় ও বাষ্পীয় এই তিন শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে যে সমস্ত পার্থক্য আছে তৎসম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের কোন জ্ঞানের সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। পাঠকগণের সুবিধার জন্য ঐ তিন শ্রেণীর পদার্থের মৌলিক পার্থক্যের কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি।

চলৎশীলতা (Dynamicity) যুক্ত বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের সমতাময় মিশ্রণকে "ব্যোমীয়" (Etherial) পদার্থ বলা হয়।

বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের সমতাময় মিশ্রণ যখন সর্ব্বতোভাবে চলৎশীলতাহীন এবং অপরিবর্ত্তনীয় (static) হন, তখন তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় "ব্রহ্ম" (অথবা constant) বলা হয়।

চলৎশীলতা (Dynamicity) যুক্ত বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের সমতাহীন তেজ-প্রধান মিশ্রণকে "বায়বীয়" (aerial) পদার্থ বলা হয়।

চলৎশীলতাযুক্ত বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের সমতাহীন রস-প্রধান মিশ্রণকে বাষ্পীয় (gaseous) পদার্থ বলা হয়।

ব্যোমীয়, বায়বীয় ও বাষ্পীয় পদার্থ কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকিলে প্রত্যেক মানুষের শরীর, গুণ ও শক্তিসমূহের মূলাধার যে উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর পদার্থ তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানে মানুষের শরীরস্থ ব্যোমীয় ও বায়বীয় পদার্থসমূহের কোন্ কথা পাওয়া যায় না বলিয়া ঐ দুই শ্রেণীর পদার্থ যে মানুষের শরীরের দুইটী প্রধান উপাদান তৎসম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গতভাবে কোন্ সন্দেহ করা চলে না। মানুষের শরীরে যদ্যপি ব্যোমীয় পদার্থ না থাকিত তাহা হইলে ঐ শরীরের নমনীয়তা (flexibility) এবং যদ্যপি বায়বীয় পদার্থ না থাকিত তাহা হইলে মানুষের পাচন-শক্তি (power of digestion) থাকিতে পারিত না।

মানুষের জন্মাদি ছয়টী ভাব স্বতঃই সম্ভবযোগ্য হয় কোন্ কোন্ কার্য্য-পদ্ধতিতে এবং কি কি নিয়মে তাহার কথা চারি শ্রেণীর বেদের চারি শ্রেণীর সংহিতা প্রভৃতিতে যেরূপ সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়, সংস্কৃত ভাষায় এবং অন্যান্য ভাষায় লিখিত আর যে সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহার কোন গ্রন্থে ঐরূপ সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। যে যে কার্য্য-পদ্ধতিতে ও নিয়মে স্বতঃই মানুষের জন্ম হয়, সেই সেই কার্য্য-পদ্ধতির ও নিয়মের কথা আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

মানুষের "জন্ম", "অস্তিত্ব", "পরিণতি" ও "বৃদ্ধির" সহিত পরিচিত হইতে হইলে ঐ চারিটী কথার প্রত্যেকটীর অর্থের সহিত সর্ব্বতোভাবে পরিচিত হইতে হয়। এই চারিটী কথার অর্থের সহিত পরিচিত হইতে হইলে প্রধানতঃ পঞ্চবিধ উপাদান, কতিপয় গুণ ও কতিপয় শক্তির মিলনে যে মানুষ গঠিত হইয়া থাকে তাহা স্মরণ রাখিতে হয়।

পঞ্চবিধ উপাদান এবং তাহাদের গুণ ও শক্তিসমূহ মিলিত হইয়া যখন মানুষের আকৃতির ও রূপের মত একটী আকৃতি ও রূপযুক্ত জীবের উৎপত্তি হয় এবং ঐ জীব মানুষের প্রবৃত্তি ও কার্য্য-ক্ষমতাসমূহের মত প্রবৃত্তি ও কার্য্য-ক্ষমতা যুক্ত হয় তখন মানুষের "জন্ম" হইয়াছে তাহা বুঝিতে হয়।

মানুষের আকৃতি ও রূপের মত একটী আকৃতি ও রূপযুক্ত জীব যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের প্রবৃত্তি ও কার্য্য-ক্ষমতাসমূহের মত প্রবৃত্তি ও কার্য্যক্ষমতা কথঞ্চিত পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার "অস্তিত্ব" বিদ্যমান আছে ইহা বুঝিতে হয়।

মানুষের আকৃতি আয়তনে যত প্রসারতা লাভ করিতে পারে, মানুষের রূপ ঔজ্জ্বল্যে যতদূর উজ্জ্বল হইতে পারে, মানুষের কার্য্য-প্রবৃত্তি সংখ্যায় যত অধিক হইতে পারে এবং মানুষের কার্য্যক্ষমতা পরিমাণে যত বৃদ্ধি পাইতে পারে, মানুষ যখন তত প্রসারতা, তত ঔজ্জ্বল্য, কার্য্যপ্রবৃত্তির

তত সংখ্যাধিক্য এবং কার্য্যক্ষমতার তত পরিমাণ লাভ করিবার অভিমুখী হয়, তখন মানুষের "পরিণতি" হইতেছে তাহা বুঝিতে হয়।

মানুষের জন্ম যে স্বতঃই সম্ভবযোগ্য হয়, তাহার সাক্ষাৎ কারণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :

(১) প্রাকৃতিক কার্য্য ;
(২) পিতৃমাতৃ-কার্য্য ;
(৩) স্বাভাবিক কার্য্য।

মানুষের জন্মের কারণ যেরূপ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, মানুষের গুণ এবং শক্তিসমূহও সেইরূপ তাহাদিগের উৎপত্তির কারণের দিক দিয়া দেখিলে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা :

(১) প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি ;
(২) পিতৃমাতৃ-গুণ ও শক্তি ;
(৩) স্বাভাবিক গুণ ও শক্তি।

প্রাকৃতিকাদি তিন শ্রেণীর কার্য্য যেরূপ মানুষের জন্মের সাক্ষাৎ কারণ সেইরূপ প্রাকৃতিকাদি তিন শ্রেণীর গুণ এবং শক্তিও প্রকারান্তরে মানুষের জন্মের কারণ হইয়া থাকে।

আমাদিগের উপরোক্ত কথা কয়টী আমরা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিব।

আদি কারণ অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আদি কারণ অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণ এই ভূমণ্ডলের কুত্রাপি পাওয়া যায় না। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের যে অবস্থা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ববিধ পদার্থে বিদ্যমান আছেন, সেই অবস্থা আদি কারণ অবস্থার পরবর্ত্তী অবস্থা। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের এই দ্বিতীয় অবস্থার কার্য্য—এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের এবং প্রত্যেক মানুষের জন্মের মূল অথবা মুখ্য কারণ। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের উপরোক্ত দ্বিতীয় অবস্থার কার্য্য যে এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের এবং প্রত্যেক মানুষের শুধু জন্মের মূল অথবা মুখ্য কারণ তাহা নহে, উহাদের অস্তিত্বের, পরিণতির এবং বৃদ্ধিরও মূল অথবা মুখ্য কারণ।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের যে দ্বিতীয় অবস্থার কার্য্য এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের এবং প্রত্যেক মানুষের জন্ম, অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধির মুখ্য অথবা মূল কারণ, সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের সেই দ্বিতীয় অবস্থাকে সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মায়া-অবস্থা (Non-variable condition) বলা হয়। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মায়া অবস্থার কার্য্যের নাম প্রকৃতি। এই হিসাবে এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের ও প্রত্যেক মানুষের জন্ম যে স্বতঃই সম্ভব-যোগ্য হয়, তাহার মূল অথবা মুখ্য কারণ "প্রকৃতি" অথবা প্রাকৃতিক কার্য্য।

প্রাকৃতিক কার্য্যের ফলে যেমন মানুষের জন্ম, অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধি স্বতঃই সাধিত হয়, সেইরূপ আবার প্রত্যেক মানুষের অবয়বে এক শ্রেণীর গুণ এবং শক্তিও ঐ প্রাকৃতিক কার্য্যের ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর গুণ ও শক্তিকে "প্রকৃতির দেওয়া গুণ ও শক্তি" অথবা প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি বলা হয়।

মূলতঃ অথবা মুখ্যতঃ একমাত্র "প্রাকৃতিক কার্য্য" এবং "প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি" হইতে মানুষের জন্ম স্বতঃই সম্ভবযোগ্য হয়।

মূলতঃ অথবা মুখ্যতঃ একমাত্র প্রাকৃতিক কার্য্য এবং প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি হইতে—মানুষের জন্ম স্বতঃই সম্ভব-যোগ্য হয় বটে কিন্তু কার্য্যতঃ পিতামাতার কোন মিলন না হইলে এবং মাতা গর্ভ ধারণ না করিলে কোন মানুষের জন্ম হয় না। কেন উহা হয় না তাহার ব্যাখ্যা করিতে বসিলে অনেক কথা বলিবার প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত কথা মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠান-সমূহের মূলসূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজনীয়। এই কারণে ঐ সমস্ত কথার আলোচনা আমরা এখানে করিব না।

পিতামাতার যৌন-মিলন না হইলে এবং মাতা গর্ভধারণ না করিলে কোন মানুষের জন্ম হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক কার্য্য এবং প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির কার্য্য না থাকিলে কোন মানুষের জন্ম হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না।

পিতামাতার যৌন মিলনের কার্য্যকে মানুষের জন্মের এক শ্রেণীর কারণ বলা হয়। পিতামাতার কার্য্যের অপর নাম পিতৃমাতৃ-কার্য্য। পিতামাতার কার্য্য যেমন মানুষের জন্মের এক শ্রেণীর কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ পিতামাতার গুণ এবং শক্তিও মানুষের অবয়বস্থ পঞ্চবিধ উপাদানের এক

শ্রেণীর গুণ ও শক্তি হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর গুণ ও শক্তিকে মানুষের পিতামাতার দেওয়া গুণ ও শক্তি অথবা পিতৃমাতৃ-গুণ ও শক্তি বলা হইয়া থাকে।

মানুষ তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার অবস্থায় যেরূপ ছোট্ট শরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ ছোট্ট শরীরের জন্মকেই মানুষের জন্ম বলিয়া ধরিয়া লইলে মানুষের জন্মের কারণ কেবলমাত্র দুই শ্রেণীর বলিয়া ধরিতে হয়; যথা: (১) প্রাকৃতিক কার্য্য এবং (২) পিতৃ-মাতৃ কার্য্য। কিন্তু যুক্তিসঙ্গতভাবে উপরোক্ত ছোট্ট শরীরের জন্মকেই পূর্ণ মানুষের জন্ম বলিয়া ধরা চলে না। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রত্যেক নিমেষে যে ছোট বড় পরিবর্ত্তনসমূহ দেখা যায়—সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনের ফলে এক অবস্থার জীবন হইতে যে আর এক অবস্থার জীবনের উদ্ভব হয়, সেই অবস্থান্তরসমূহ জীবনের সম্পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত। যুক্তিসঙ্গতভাবে এই অবস্থান্তরসমূহের প্রত্যেকটীকে মানুষের এক একটী জন্ম বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। প্রাকৃতিক কার্য্য, পিতৃমাতৃ-কার্য্য, প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি এবং পিতৃ-মাতৃ গুণ ও শক্তি উপরোক্ত অবস্থান্তরসমূহের অন্যতম কারণ হইয়া থাকে।

প্রাকৃতিক কার্য্য, পিতৃমাতৃ-কার্য্য, প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি এবং পিতৃমাতৃ-গুণ ও শক্তি যেরূপ উপরোক্ত অবস্থান্তর-সমূহের অন্যতম কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার মানুষের স্ব স্ব স্বভাবের কার্য্য এমন কি স্ব স্ব স্বাভাবিক গুণ ও শক্তি পর্য্যন্ত ঐ অবস্থান্তর সমূহের কারণ হইতে পারে এবং হয়।

মানুষ তাহার স্ব স্ব ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য যে সমস্ত কার্য্য করে, সেই সমস্ত কার্য্যকে সাধারণতঃ সংস্কৃত ভাষায় মানুষের স্ব স্ব স্বভাবের কার্য্য, অথবা স্বাভাবিক কার্য্য বলা হইয়া থাকে। মানুষের স্বাভাবিক কার্য্য এক শ্রেণীর হইতে পারে, আবার একাধিক শ্রেণীরও হইতে পারে।

মানুষ তাহার স্ব স্ব ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য যে সমস্ত কার্য্য করে, সেই সমস্ত কার্য্য যখন সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত হয়, তখন মানুষের স্বাভাবিক কার্য্যসমূহ সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহের অনুরূপ হয়। তখন নামে প্রাকৃতিক কার্য্য ও স্বাভাবিক কার্য্য পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও ফলে দুই শ্রেণীর কার্য্যই এক শ্রেণীতে পরিণত হয়।

পিতামাতা তাহাদের স্ব স্ব ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য যে সমস্ত কার্য্য করেন, সেই সমস্ত কার্য্য যখন সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত হয়, তখন পিতামাতার স্বাভাবিক কার্য্যসমূহও সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহের অনুরূপ হয়। তখনও নামে পিতৃমাতৃ-কার্য্যের শ্রেণী বৈশিষ্ট্য থাকিলেও ফলে উহার কোন শ্রেণী বৈশিষ্ট্য থাকে না।

মানুষ তাহার স্ব স্ব ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য যে সমস্ত কার্য্য করে সেই সমস্ত কার্য্য যখন প্রকৃতির কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত হয় না, তখন মানুষের স্বাভাবিক কার্য্যসমূহ একাধিক শ্রেণীর হইয়া থাকে। সেইরূপ পিতামাতা তাঁহাদের স্ব স্ব ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য যে সমস্ত কার্য্য করেন, সেই সমস্ত কার্য্য যখন প্রকৃতির কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত হয় না, তখন পিতামাতার স্বাভাবিক কার্য্যসমূহও একাধিক শ্রেণীর হইয়া থাকে।

মানুষের জন্মের কারণ যেমন প্রাকৃতিকাদি তিন শ্রেণীর কার্য্য ও তিন শ্রেণীর গুণ ও শক্তি, মানুষের অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধির কারণ, সেইরূপ তিন শ্রেণীর কার্য্য এবং তিন শ্রেণীর গুণ ও শক্তি হইতেও পারে এবং নাও হইতে পারে। সাধারণতঃ মানুষের অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কার্য্য ও প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি।

পিতার অথবা মাতার অথবা মানুষের নিজের স্বাভাবিক প্রত্যেক কার্য্য যখন সর্ব্বতোভাবে শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত হয় এবং আদৌ অসমঞ্জস অথবা বিরুদ্ধ হয় না, তখন পিতৃমাতৃ-কার্য্য এবং মানুষের স্ব স্ব স্বাভাবিক কার্য্যও মানুষের অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধির কারণ হইতে পারে।

পিতার অথবা মাতার অথবা মানুষের নিজের স্বাভাবিক কোন কার্য্য যখন কোনরূপে শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যের অসামঞ্জস অথবা বিরুদ্ধ হয়, তখন পিতৃমাতৃ-কার্য্য অথবা স্ব স্ব স্বাভাবিক কার্য্য, পরিণতি ও বৃদ্ধির কারণ হওয়া তো দূরের কথা, ঐ উভয় শ্রেণীর কার্য্যই মানুষের ক্ষয়ের কারণ হইয়া থাকে।

পিতা অথবা মাতার অথবা মানুষের নিজের স্বাভাবিক কার্য্য প্রাকৃতিক কার্য্যের বিরুদ্ধ হইলেও মানুষ কিছুদিন সুখ ও দুঃখ-মিশ্রিত জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম

হয় এবং এমন কি জীবনের কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত পরিণতি ও বৃদ্ধি পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

পিতৃমাতৃ-কার্য্যের এবং মানুষের নিজের কার্য্যের শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যের বিরুদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও যে শরীরের পরিণতি ও বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, তাহার একমাত্র কারণ মানুষের শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্য।

মানুষের শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্য কখনও ক্ষয় অথবা মৃত্যুর কারণ হয় না।

মানুষের "ক্ষয়" ও "মৃত্যুর" বিবরণ

মানুষের শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্য সর্ব্বদা শরীরের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মানুষের "ক্ষয়" ও "মৃত্যু" হওয়া সম্ভব হয় যে যে কার্য্য বশতঃ, সেই সেই কার্য্যের কথা মানুষের "ক্ষয়" ও "মৃত্যুর" কথাসমূহের মধ্যে প্রধান।

মানুষের শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্য সর্ব্বদা শরীরের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে মানুষের "ক্ষয়" ও "মৃত্যু" হওয়া সম্ভব হয় তাহার কারণ দুই শ্রেণীর, যথা :

(১) পিতৃমাতৃ-কার্য্যের এবং শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য ও উভয়বিধ কার্য্যের বিরুদ্ধতা ; এবং

(২) মানুষের নিজের স্বভাবের কার্য্য এবং শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য ও উভয়বিধ কার্য্যের বিরুদ্ধতা।

মানুষের শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্য সর্ব্বদা শরীরের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে মানুষের ক্ষয় ও মৃত্যু হওয়া সম্ভব হয় কি করিয়া, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ "ক্ষয়" ও "মৃত্যু" কাহাকে বলে, এবং দ্বিতীয়তঃ শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহ মানুষের "পরিণতি" ও "বৃদ্ধি" সাধন করে কোন্ কোন্ কার্য্য-পদ্ধতিতে—তাহার কথা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

পরিণতি ও বৃদ্ধির যাহা বিপরীত, তাহার নাম মানুষের "ক্ষয়"।

গুণ ও শক্তিসমূহের সঙ্গে সঙ্গে আকৃতি ও রূপ ধারণের সক্ষমতার, এবং কার্য্য-প্রবৃত্তি ও কার্য্যক্ষমতা রক্ষা করিবার সক্ষমতার বিলুপ্তির নাম মানুষের "মৃত্যু"।

মানুষের "মৃত্যু" দুই শ্রেণীর।

বিশেষ কোন একটী অথবা ততোধিক গুণ ও শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কোন আকৃতিবিশেষের ও রূপবিশেষের ধারণ করিবার সক্ষমতার এবং কার্য্যপ্রবৃত্তি-বিশেষ ও কার্য্যক্ষমতা-বিশেষ রক্ষা করিবার সক্ষমতার বিলুপ্তি মানুষের এক শ্রেণীর মৃত্যু। এই শ্রেণীর মৃত্যুতে মানুষের অবস্থা-বিশেষের বিলুপ্তি হইয়া অবস্থান্তর অথবা ক্ষয়কর অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। অপর শ্রেণীর মৃত্যুতে সর্ব্ববিধ আকৃতি ও রূপ ধারণ করিবার এবং কার্য্যপ্রবৃত্তি ও কার্য্যক্ষমতা রক্ষা করিবার সক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মৃত্যুর মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীর মৃত্যু প্রত্যেক মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য। প্রথম শ্রেণীর মৃত্যুর হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাওয়া মানুষের সাধ্যান্তর্গত। প্রথম শ্রেণীর মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়াকে সংস্কৃত ভাষায় "নির্ব্বাণ" বলা হয়। "নির্ব্বাণ" আর "পশুত্বের নিবারণ" একার্থক। "পশুত্ব দূর করাকে" সংস্কৃত ভাষায় "মুক্তি" বলা হয়। "সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করাকে" সংস্কৃত ভাষায় "মোক্ষ" বলা হয়।

শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহ মানুষের "পরিণতি" ও "বৃদ্ধি" সাধন করে যে যে কার্য্য-পদ্ধতিতে সেই সেই কার্য্য-পদ্ধতির কথা ধারণা করিতে হইলে ঐ প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহ যে যে পদ্ধতিতে মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখে সেই সেই কার্য্য-পদ্ধতির কথা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যের ধর্ম্ম প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর, যথা :

(১) শরীরস্থ পঞ্চবিধ উপাদানের প্রত্যেক শ্রেণীর উপাদানে যে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণ থাকে, সেই মিশ্রণের তেজের পরিমাণের ও কার্য্যের বৃদ্ধি সাধন করা ;

(২) শরীরস্থ পঞ্চবিধ উপাদানের প্রত্যেক শ্রেণীর উপাদানে যে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণ থাকে, সেই মিশ্রণের রসের পরিমাণের ও কার্য্যের বৃদ্ধি সাধন করা ;

(৩) শরীরস্থ পঞ্চবিধ উপাদানের প্রত্যেক শ্রেণীর উপাদানে যে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণ থাকে সেই মিশ্রণের তেজ ও রসের পরিমাণের ও কার্য্যের সমতা সাধন করা।

প্রত্যেক মানুষের শরীরে প্রাকৃতিক কার্য্যের উপরোক্ত তিনটী ধর্ম্মের কার্য্য যুগপৎ সাধিত হওয়া ঐ প্রাকৃতিক কার্য্যের নিয়ম।

শরীরের কোন উপাদানের তেজ কমিয়া যাওয়া অথবা তেজের বৃদ্ধি হইবার আগেই রসের বৃদ্ধি হওয়া প্রাকৃতিক কার্য্যের নিয়ম নহে।

যে মানুষের শরীরে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কার্য্যই চলিতে থাকে এবং প্রাকৃতিক কার্য্যের সহিত অসামঞ্জস্যযুক্ত অথবা প্রাকৃতিক কার্য্যের বিরুদ্ধ কোন কার্য্য চলিতে পারে না, সেই মানুষের শরীরে জন্মাবধি তেজ ও রসের পরিমাণ ও কার্য্য বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প করিয়া নিয়মিত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জীবৎকালে ঐ তেজ ও রসের পরিমাণ ও কার্য্য কখনও একবার হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি পাইতে পারে না। জীবৎকালে ঐ তেজ ও রসের পরিমাণ ও কার্য্য কখনও হ্রাস পাইলেই বুঝিতে হয় যে, শরীরের মধ্যের প্রাকৃতিক কার্য্যের সহিত অন্য কোন শ্রেণীর কার্য্যও চলিতেছে।

যে মানুষের শরীরে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কার্য্যই চলিতে থাকে এবং প্রাকৃতিক কার্য্যের সহিত অসামঞ্জস্যযুক্ত অথবা প্রাকৃতিক কার্য্যের বিরুদ্ধ কোন কার্য্য চলিতে পারে না, তাহার গুণ ও শক্তিসমূহ পরিমাণে ও বেগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পায় কিন্তু সংখ্যায় সীমাবদ্ধ থাকে। প্রাকৃতিক কার্য্য হইতে যে সমস্ত প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির উৎপত্তি হয় সেই সমস্ত প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি কখনও সংখ্যায় অসংখ্য হইতে পারে না। বৈকৃতিক কার্য্য হইতে যে সমস্ত বৈকৃতিক গুণ ও শক্তির উৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত গুণ ও শক্তি সংখ্যায় অসংখ্য হইয়া থাকে। বৈকৃতিক কোন গুণ ও শক্তি পরিমাণে ও বেগে কখনও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

যে মানুষের শরীরে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কার্য্য চলিতে থাকে, সে সারাজীবন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও যৌবন উপভোগ করিতে থাকে। তাহার যতই বয়স হউক না কেন, সে কখনও ব্যাধিগ্রস্ত অথবা জরাগ্রস্ত হয় না। তাহার শারীরিক অথবা মানসিক বল কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না; উভয়বিধ বলই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহার মৃত্যু হয় একবার এবং সেই মৃত্যু পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মৃত্যু। মানুষের পক্ষে তেজ ও রসের যে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ও বেগ লাভ করা সম্ভবযোগ্য, তেজ ও রসের সেই সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ও বেগ লাভ করিবার পর তেজ ও রসের বিচ্ছেদ ঘটে। যে মানুষের শরীরে কেবল মাত্র প্রাকৃতিক কার্য্য চলিতে থাকে, সেই মানুষের মৃত্যু হয় তাহার শরীরস্থ তেজ ও রসের উপরোক্ত বিচ্ছেদবশতঃ।

মানুষের শরীরে কেবল প্রাকৃতিক কার্য্য বিদ্যমান থাকিলে এবং যে সমস্ত কার্য্য প্রাকৃতিক কার্য্যের সহিত অসামঞ্জস্যযুক্ত অথবা প্রাকৃতিক কার্য্যের বিরুদ্ধ সেই সমস্ত কার্য্য বিদ্যমান না থাকিলে যে-মানুষের পক্ষে উপরোক্ত আকাঙ্ক্ষণীয় জীবন যাপন করা সম্ভব হয়, তাহার একমাত্র কারণ প্রাকৃতিক কার্য্য সর্ব্বদাই মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের সমতা রক্ষা করে এবং মানুষের পঞ্চবিধ উপাদানের এক যোগের, এক পরিমাণের এবং এক বেগের কার্য্যের সহায়তা করে।

মানুষের পিতামাতার স্বভাব যদ্যপি সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের স্ব স্ব শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যের অনুরূপ হয় তাহা হইলে মানুষ তাহার পিতামাতার নিকট হইতে যে সমস্ত গুণ ও শক্তি পাইয়া থাকে, সেই সমস্ত গুণ ও শক্তির কার্য্যও প্রাকৃতিক কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্য যুক্ত হয় এবং তখন পিতৃমাতৃ-কার্য্য, গুণ এবং শক্তিও মানুষের পরিণতি ও বৃদ্ধির সহায়তা করে।

সেইরূপ আবার মানুষের নিজের স্বভাব যদ্যপি সর্ব্বতোভাবে স্ব স্ব শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যের অনুরূপ হয় তাহা হইলে মানুষের স্বাভাবিক গুণ ও শক্তির কার্য্যও প্রাকৃতিক কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত হয় এবং তখন মানুষের নিজ নিজ স্বাভাবিক কার্য্য, গুণ এবং শক্তিও মানুষের পরিণতি ও বৃদ্ধির সহায়তা করে। মানুষের পিতার অথবা মাতার স্বভাব অথবা মানুষের নিজের স্বভাব যখন তাঁহাদিগের স্ব স্ব শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যের অনুরূপ না হইয়া অসামঞ্জস্যযুক্ত হয়, তখন মানুষের পিতৃমাতৃ-গুণ ও শক্তির কার্য্য এবং স্ব স্ব স্বাভাবিক গুণ ও শক্তির কার্য্য শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যের সহিত অসামঞ্জস্যযুক্ত হয়।

মানুষের পিতৃমাতৃ-গুণ ও শক্তির কার্য্য অথবা স্ব স্ব স্বাভাবিক গুণ ও শক্তির কার্য্য শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যের সহিত অসামঞ্জস্যযুক্ত হইলে মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের ও বেগের অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তির উদ্ভব

হওয়া অনিবার্য্য হয়। মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের ও বেগের অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে, শরীরস্থ ব্যোমীয়, বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানসমূহের কার্য্য, গুণ ও শক্তির প্রতি আকৃষ্টতার তুলনায় তরল ও স্থূল উপাদানসমূহের কার্য্য, গুণ ও শক্তির প্রতি মানুষের আকৃষ্টতা বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ সাধারণতঃ তরল ও স্থূল-উপাদানসমূহের কার্য্য, গুণ ও শক্তিসমূহ যত গুরু (heavy) ও যত সহজে অনুভবের যোগ্য, ব্যোমীয়, বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানসমূহের কার্য্য, গুণ ও শক্তিসমূহ তত গুরু ও তত সহজে অনুভবের যোগ্য নহে। মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের ও কার্য্যের অসমতার প্রবৃত্তির উদ্ভব না হইয়া সমতার প্রবৃত্তি বজায় থাকিলে পঞ্চবিধ উপাদানের কার্য্য, গুণ ও শক্তির প্রতি আকৃষ্টতার উপরোক্ত প্রভেদের অথবা অসমতার উদ্ভব হইতে পারে না।

পঞ্চবিধ উপাদানের কার্য্য, গুণ ও শক্তির প্রতি আকৃষ্টতার উপরোক্ত তারতম্যবশতঃ দুই শ্রেণীর ভ্রান্তিমূলক কার্য্যের উদ্ভব হয়। এক শ্রেণীর ভ্রান্তিমূলক কার্য্য মানুষের নিজ নিজ গুণ ও শক্তি সম্বন্ধে ধারণা-বিষয়ক, আর এক শ্রেণীর ভ্রান্তিমূলক কার্য্য মানুষ যে সমস্ত দ্রব্য, গুণ ও শক্তি লাভ করিবার জন্য অভিলাষ করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত দ্রব্য, গুণ ও শক্তির নির্ব্বাচন-বিষয়ক। মানুষের উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর ভ্রান্তিমূলক কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় "অভিমান" বলা হয়; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ভ্রান্তিমূলক কার্য্যকে বৈকৃতিক ইচ্ছা বলা হয়। পঞ্চবিধ উপাদানের কার্য্য, গুণ ও শক্তির প্রতি আকৃষ্টতায় উপরোক্ত তারতম্য না ঘটিয়া সমতা বিদ্যমান থাকিলে মানুষের অভিমান অথবা "বৈকৃতিক ইচ্ছার" উদ্ভব হইতে পারে না।

মানুষের অভিমান অথবা বৈকৃতিক ইচ্ছার উদ্ভব হইলে মানুষের পঞ্চবিধ উপাদানের একযোগের, এক পরিমাণের এবং এক বেগের কার্য্য অসম্ভব হয়।

মানুষের পঞ্চবিধ উপাদানের একযোগের, এক পরিমাণের এবং একবেগের কার্য্য অসম্ভব হইলে একদিকে প্রতিনিমেষে নূতন নূতন বৈকৃতিক গুণ ও বৈকৃতিক শক্তির উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করে এবং আবার তাহাদের বিলুপ্তি ঘটে; অন্যদিকে প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির পরিমাণের ও বেগের বৃদ্ধি ঘটা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইরূপে মানুষের ক্ষয় অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

উপরোক্তভাবে মানুষের ক্ষয় হইতে আরম্ভ করিলে প্রতিনিমেষে মানুষের প্রথম শ্রেণীর মৃত্যু হইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মৃত্যুও অকালে ঘটিয়া থাকে।

মানুষের মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা—

যাহা কিছু মানুষের শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যের অথবা প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির পরিমাণের ও বেগের বৃদ্ধি সাধন করিবার সহায়তা করে অথবা এক কথায় মানুষের বৃদ্ধির সহায়তা করে, তাহার নাম মানুষের "মনুষ্যত্ব"।

উপরোক্ত কথানুসারে প্রথমতঃ মানুষের তেজ ও রসের পরিমাণের ও বেগের অসমতা ও বিষমতা নিবারণ করিবার ও দূর করিবার কার্য্যসমূহ; দ্বিতীয়তঃ, ব্যোমীয়, বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানসমূহের কার্য্য, গুণ ও শক্তির প্রতি আকৃষ্টতার তুলনায় তরল ও স্থূল উপাদানসমূহের কার্য্য গুণ ও শক্তির প্রতি আকৃষ্টতার বৃদ্ধি নিবারণ করিবার ও দূর করিবার কার্য্যসমূহ, তৃতীয়তঃ—অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছা নিবারণ করিবার ও দূর করিবার কার্য্যসমূহ; চতুর্থতঃ—মানুষের পঞ্চবিধ উপাদানের কার্য্যের যোগহীনতা, পরিমাণ-প্রভেদ ও বেগ-প্রভেদ নিবারণ করিবার ও দূর করিবার কার্য্যসমূহ—প্রধানতঃ মানুষের মনুষ্যত্বের অন্তর্ভূক্ত।

মানুষের পশুত্বের সংজ্ঞা—

যাহা কিছু মানুষের শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যের অথবা প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির পরিমাণের ও বেগের ক্ষয় সাধন করে অথবা এক কথায় মানুষের ক্ষয় সাধন করে, তাহার নাম—মানুষের পশুত্ব।

প্রধানতঃ চারিশ্রেণীর কার্য্য মানুষের পশুত্বের অন্তর্ভূক্ত, যথা:

(১) মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের ও বেগের অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তি আনয়ক কার্য্যসমূহ;

(২) মানুষের শরীরের পঞ্চবিধ উপাদানের কার্য্য, গুণ ও শক্তির প্রতি সমান আকৃষ্টতা রক্ষা না করিয়া ব্যোমীয়, বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানের প্রতি আকৃষ্টতার তুলনায় তরল ও স্থূল উপাদানসমূহের প্রতি অধিকতর আকৃষ্টতার কার্য্যসমূহ;

(৩) অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার কার্য্যসমূহ ;

(৪) মানুষের পঞ্চবিধ উপাদানের যোগহীনতা, পরিমাণ-প্রভেদ ও বেগ-প্রভেদ বৃদ্ধিকর কার্য্যসমূহ।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের মূলসূত্রের উত্তরাংশ

মানুষের মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব কাহাকে বলে তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিলে কোন্ কোন্ কারণে মানুষের পশুত্বের উদ্ভব হয় এবং কোন্ কোন্ উপায়ে মনুষ্যত্ব সাধন করা সহজ-সাধ্য হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়।

মানুষের জীবনের ছয়টি ভাবের উৎপত্তি হয় যে যে কারণে এবং যে যে কার্য্য-পদ্ধতিতে, সেই সেই কারণ ও কার্য্য-পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইতে পারিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের পিতার ও মাতার স্ব স্ব জীবনের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্যবশতঃ সন্তানের শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের ও বেগের অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তি উদ্ভব হয়।

শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের ও বেগের উপরোক্ত অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তিবশতঃ, শিশুর অবয়বে যখন ইচ্ছাশক্তির ও ইচ্ছা-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়—তখন বিচারময় ইচ্ছা-শক্তির ও ইচ্ছা-প্রবৃত্তির বিকাশ না হইয়া কতিপয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তির প্রতি অনুরাগপ্রবৃত্তি আর কতিপয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তির প্রতি বিদ্বেষের প্রবৃত্তি বিকাশ হইয়া থাকে।

উপরোক্ত রাগ, দ্বেষ-প্রবৃত্তিবশতঃ মানুষের অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার উৎপত্তি হয়। অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার উৎপত্তিবশতঃ মানুষ নানা রকমের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য করে এবং শরীরস্থ পঞ্চবিধ উপাদানের যোগহীনতা-পরিমাণ-প্রভেদ, ও বেগ-প্রভেদ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং মানুষ পশুত্বময় হইয়া পড়ে।

অন্যদিকে শিশুর শরীরস্থ তেজ ও রসের মিশ্রণের পরিমাণের ও বেগের যাহাতে অসমতা অথবা বিষমতার প্রবৃত্তি প্রবিষ্ট না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, শিশুর হৃদয়ে রাগ-দ্বেষের প্রবৃত্তির প্রবেশ লাভ করা অসম্ভব হয়। শিশুর হৃদয়ে রাগ-দ্বেষের প্রবৃত্তির প্রবেশ লাভ করা সম্ভবযোগ্য না হইলে অভিমানের বীজাঙ্কুরিত হওয়া কষ্ট-সাধ্য হয়। শিশুর হৃদয়ে রাগ-দ্বেষের প্রবৃত্তির প্রবেশ লাভ করা সম্ভবযোগ্য না হইলে অভিমানের বীজাঙ্কুরিত হওয়া কষ্টসাধ্য হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে অসাধ্য হয় না। শিশুর হৃদয়ে অভিমানের বীজাঙ্কুরিত হওয়া যাহাতে সর্ব্বতোভাবে অসাধ্য হয়, তাহা করিতে হইলে শিশু তাহার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে একদিকে তাহার নিজের অবয়বের পঞ্চবিধ উপাদানের এবং গুণ ও শক্তির অবস্থা নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করিতে অক্ষম না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে, অপরের গুণ ও শক্তির অবস্থা যাহাতে বিচার করিয়া নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারে তাদৃশ-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। উপরোক্ত দুইটী ব্যবস্থা সাধিত হইলে এবং রাগদ্বেষের প্রবৃত্তির প্রবেশ লাভ করা অসম্ভব হইলে—অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার বীজাঙ্কুরিত হওয়া অসাধ্য হয়। ইহার কারণ, মানুষ যে অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার বশীভূত হয়, তাহার মূলে থাকে রাগ ও দ্বেষ এবং নিজেকে খুব প্রকৃষ্ট বলিয়া অথবা অপরের তুলনায় প্রকৃষ্টতর বলিয়া গণনা করিবার প্রবৃত্তি ও অপরকে নিজের তুলনায় নিকৃষ্টতর বলিয়া গণনা করিবার প্রবৃত্তি। মানুষ যদি স্ব স্ব পঞ্চবিধ উপাদানের এবং গুণ ও শক্তির অবস্থা নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করিতে অক্ষম না হয় এবং অপরের গুণ ও শক্তির অবস্থা নির্ভুলভাবে বিচার করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে নিজেকে অযথা প্রকৃষ্ট অথবা প্রকৃষ্টতর এবং অপরকে নিকৃষ্টতর বলিয়া মনে করিতে পারে না এবং অভিমানের বীজও অঙ্কুরিত হইতে পারে না।

মানুষ যদি অভিমানগ্রস্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে সহজে কোন বৈকৃতিক ইচ্ছা স্থান পায় না। অভিমান-গ্রস্ত না হইলে সহজে কোন বৈকৃতিক ইচ্ছা স্থান পায় না বটে, কিন্তু বাঞ্ছিত অথবা প্রয়োজনীয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তির নির্ব্বাচন-পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা থাকিলে অভিমানগ্রস্ত না হইলেও অতর্কিতভাবে বৈকৃতিক ইচ্ছার বশীভূত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়।

মানুষ যাহাতে কোন বৈকৃতিক ইচ্ছার বশীভূত না হইতে পারে এবং না হয়, তাহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ

মানুষ যাহাতে অভিমানগ্রস্ত না হয়—তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়—সেইরূপ আবার বাঞ্ছিত ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তির নির্ব্বাচন-পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহাতে অজ্ঞতা না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মানুষ যদি নিজেকে সর্ব্ববিধ বৈকৃতিক ইচ্ছার হাত হইতে মুক্ত রাখিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়।

প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোন কার্য্য যদি মানুষ না করে, তাহা হইলে তাহার পশুত্বের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয়।

মানুষের পশুত্ব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হয়, তাহা করিতে হইলে, প্রথমতঃ, মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের মিশ্রণে যাহাতে অসমতা ও বিষমতার উৎপত্তি হইতে না পারে তাহা করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, মানুষের হৃদয়ে যাহাতে রাগ-দ্বেষ স্থান না পায় তাহা করিতে হয়; তৃতীয়তঃ, যাহাতে অভিমান স্থান না পায় তাহা করিতে হয়; চতুর্থতঃ, যাহাতে বৈকৃতিক ইচ্ছা স্থান না পায় তাহা করিতে হয়; পঞ্চমতঃ, মানুষ যাহাতে তাহার শরীরস্থ প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোন কার্য্য না করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়; ষষ্ঠতঃ, মানুষের শরীরস্থ পঞ্চবিধ উপাদানের কার্য্যের যোগহীনতা, পরিমাণ-প্রভেদ ও বেগ-প্রভেদ যাহাতে ঘটিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহের মূল সূত্র সাত শ্রেণীর, যথা:

(১) মানুষের অবয়বস্থ তেজ ও রসের মিশ্রণে যাহাতে অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা;

(২) মানুষ তাহার নিজের ও অপরের শরীরের ও অন্তরের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে যাহাতে সর্ব্বতোভাবে অক্ষম না হয় এবং অল্পাধিকভাবে সক্ষম হয়, তাহার ব্যবস্থা;

(৩) মানুষ তাহার নিজের ও অপরের শরীরের ও অন্তরের গুণ ও শক্তির উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কারণ ও কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে যাহাতে সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞ না হয় পরন্তু অল্পাধিকভাবে জ্ঞানবান হয় তাহার ব্যবস্থা;

(৪) কোন্ কোন্ শ্রেণীর দ্রব্য, কোন্ কোন্ শ্রেণীর গুণ, এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর শক্তি মানুষের স্ব স্ব প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির পরিমাণের বৃদ্ধির সহায়ক, আর কোন্ কোন্ শ্রেণীর দ্রব্য, কোন্ কোন্ শ্রেণীর গুণ এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর শক্তি মানুষের স্ব স্ব প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির বিকৃতিসাধক তৎসম্বন্ধে মানুষ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞ না থাকে পরন্তু অল্পাধিকভাবে জ্ঞানবান্ হয় তাহার ব্যবস্থা;

(৫) এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত শ্রেণীর প্রকৃতিজাত ও স্বভাবজাত দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং যে সমস্ত শ্রেণীর প্রকৃতিজাত ও স্বভাবজাত গুণ ও শক্তি অনুভব করা যায় তাহার প্রত্যেকটির উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যুর মূল কারণ ও কার্য্যপদ্ধতি কি কি তৎসম্বন্ধে মানুষ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞ না থাকে, পরন্তু অল্পাধিকভাবে জ্ঞানবান্ হয়, তাহার ব্যবস্থা;

(৬) মানুষের শরীরের অথবা অন্তরের বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণের অসমতার অথবা বিষমতার উদ্ভব হইলে তাহা যাহাতে স্থায়ী না হয় এবং অনতিবিলম্বে নিবারিত হয়, তদুদ্দেশ্যমূলক চিকিৎসার ব্যবস্থা;

(৭) মানুষের কোন কার্য্যে অথবা স্বাভাবিক কোন কারণে জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অন্তরস্থ বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণের অসমতার অথবা বিষমতার উদ্ভব হইলে তাহা যাহাতে কোন কুফল-আনয়ক না হইতে পারে তদুদ্দেশ্যমূলক "যাজ্ঞিক কার্য্যের" ব্যবস্থা।

উপরোক্ত সাতটী ব্যবস্থার প্রথমোক্ত পাঁচটী ব্যবস্থা সাক্ষাৎভাবে মানুষের রাগ, দ্বেষ এবং অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার উদ্ভব যাহাতে না হয় তাহা করিবার উদ্দেশ্যমূলক; আর শেষোক্ত দুইটী ব্যবস্থা গৌণভাবে ঐ উদ্দেশ্যমূলক। মানুষের অবয়বস্থ বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণে যাহাতে অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব না হয়, অথবা অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব হইলে তাহা যাহাতে নিবারিত হয় তদুদ্দেশ্যে শেষোক্ত দুইটী ব্যবস্থার আশ্রয় লইতে হয়।

মানুষের যাহাতে রাগ-দ্বেষের উদ্ভব না হইতে পারে এবং না হয় তাহা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার অবয়বস্থ তেজ ও রসের

মিশ্রণে যাহাতে অসমতার ও বিষমতার উদ্ভব না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মানুষের যাহাতে অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব না হয় তাহা করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ মানুষ তাহার নিজের ও অপরের শরীরের ও অন্তরের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে যাহাতে সর্ব্বতোভাবে অক্ষম না হয় এবং অল্পাধিকভাবে সক্ষম হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। নিজের ও অপরের শরীরের ও অন্তরের গুণ ও শক্তির উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কারণ ও কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবের অজ্ঞতা থাকিলে এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণের জ্ঞান না থাকিলে উপরোক্ত উপলব্ধি করিবার সক্ষমতা অর্জ্জন করা সম্ভবযোগ্য হয় না বলিয়া অভিমানের প্রবৃত্তি নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন উপলব্ধি শিখিবার ব্যবস্থা করিতে হয় সেইরূপ আবার মানুষ তাহার নিজের ও অপরের শরীরের ও অন্তরের গুণ ও শক্তির উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কারণ ও কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে যাহাতে সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞ না হয় পরন্তু অল্পাধিকভাবে জ্ঞানবান্ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মানুষের কোন ইচ্ছা যাহাতে তাহার অজ্ঞাতভাবে বৈকৃতিক বলিয়া গণ্য হইতে না পারে, তাহা করিবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত চতুর্থ শ্রেণীর ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়।

কোন্ শ্রেণীর দ্রব্য, কোন্ শ্রেণীর গুণ, কোন্ শ্রেণীর শক্তি মানুষের স্ব স্ব প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির পরিমাণের বৃদ্ধির অথবা ক্ষয়ের সহায়ক তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করিবার জন্য উপরোক্ত পঞ্চম শ্রেণীর ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের অবয়বস্থ তেজ ও রসের মিশ্রণে যাহাতে অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব না হয় এবং মানুষ যাহাতে অসুস্থ না হয় তাহার জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীর ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

ষষ্ঠ শ্রেণীর ব্যবস্থার সহায়তার জন্ত সপ্তম শ্রেণীর ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের পশুত্ব যাহাতে নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে স্বতঃই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। ইহার কারণ মানুষের শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্য বিনা বাধায় চলিতে থাকিলে মানুষের প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তিসমূহ স্বতঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পশুত্বের কার্য্যসমূহ মানুষের শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহের বাধা প্রদান করিয়া থাকে। ঐ বাধাসমূহ অপসারিত হইলে প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহই মানুষের মনুষ্যত্ব সাধন করে।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের ব্যাখ্যা

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের মূলসূত্র যে সাতটী ব্যবস্থা—সেই সাতটী ব্যবস্থার প্রথম ব্যবস্থাটীর নাম—

"মানুষের অবয়বস্থ তেজ ও রসের মিশ্রণে যাহাতে অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব না হয়—তাহার ব্যবস্থা—"

কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান সাধন করিলে উপযোক্ত ব্যবস্থা সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে কোন্ কোন্ কারণে অথবা কোন্ কোন্ কার্য্যে মানুষের অবয়বে যে তেজ ও রস মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান থাকে সেই তেজ ও রস অসম ও বিষম হইতে পারে—তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

প্রত্যেক মানুষের অবয়বে যে তেজ ও রস মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান থাকে, সেই তেজ ও রস সাধারণতঃ চারি শ্রেণীর কার্য্যবশতঃ অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তিযুক্ত হয়, যথা :

(১) মানুষের পিতামাতার কার্য্যসমূহ ;

(২) মানুষের অপ্রাপ্ত বয়সে তাহার পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণের কার্য্যসমূহ ;

(৩) মানুষের প্রাপ্ত বয়সে তাহার নিজ কার্য্যসমূহ ;

(৪) জমি, জল ও হাওয়ার অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতার কার্য্যসমূহ।

প্রত্যেক মানুষের অবয়বে যে তেজ ও রস বায়বীয় অবস্থায় মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান থাকে, সেই তেজ ও রস, মাতাপিতার যে সমস্ত কার্য্যে অসমতা ও বিষমতার

প্রবৃত্তিযুক্ত হয়—সেই সমস্ত কার্য্য প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা :

(১) মাতার ও পিতার অযোগ্য-মিলন ;

(২) মাতার গর্ভাশয় গর্ভধারণযোগ্য হইলে গর্ভাশয়স্থিত তেজ ও রসের যে অসমতা ও বিষমতা প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, সেই অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তি দূর করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহেলা ;

(৩) মাতা গর্ভধারণ করিলে গর্ভধারণ বশতঃ মাতার শরীরস্থ তেজ ও রস যে অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তিযুক্ত হয়, সেই অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি দূর করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহেলা ;

(৪) মাতৃ-গর্ভস্থিত ভ্রূণ যখন তরলাকার ও স্থূলাকার ধারণ করে তখন ঐ ভ্রূণের ক্রমবিবৰ্দ্ধমান অতিরিক্ত গুরুত্ব-বশতঃ মাতার শরীরস্থ তেজ ও রস যে অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তিযুক্ত হয় সেই অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি দূর করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহেলা।

মাতাপিতার অযোগ্য মিলন কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে ইহা স্মরণ রাখিতে হয় যে, সন্তানের গুণ ও শক্তির উৎপত্তি হয়—সাক্ষাৎভাবে পিতার গুণ ও শক্তির সহিত মাতার গুণ ও শক্তির মিশ্রণে। পিতার গুণ ও শক্তি অথবা মাতার গুণ ও শক্তি অপকৃষ্ট হইলে যেরূপ সন্তানের গুণ ও শক্তি অপকৃষ্ট হইতে পারে, সেইরূপ আবার যে দুই শ্রেণীর গুণ ও শক্তির মিশ্রণ, যোগ্য মিশ্রণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, তাদৃশ যোগ্য মিশ্রণ না হইলেও সন্তানের গুণ ও শক্তি অপকৃষ্ট হইতে পারে।

প্রধানতঃ পিতার শরীরস্থ বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের সহিত মাতার অন্তরস্থ বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণে সন্তানের উৎপত্তি হয়। পিতার শরীরস্থ বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রস যখন মাতার গর্ভাশয়স্থিত বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন ঐ মিশ্রণের ফলে যদ্যপি মাতার গর্ভাশয়স্থিত বায়বীয় অবস্থার তেজ এবং রস সর্ব্বতোভাবে মিলিত হয়, তাহা হইলে সন্তানের উৎপত্তি হয়। মাতাপিতার যৌন-মিলনে যদ্যপি মাতার গর্ভাশয়স্থিত বায়বীয় অবস্থার তেজ এবং রস সর্ব্বতোভাবে মিলিত না হয়, তাহা হইলে সন্তানের উৎপত্তি হয় না। কোন গর্ভধারণ-যোগ্যা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়স্থিত বায়বীয় অবস্থার তেজ এবং রস সাধারণতঃ কখনও সর্ব্বতোভাবে মিলিত হয় না। উহারা (অর্থাৎ তেজ ও রস) সর্ব্বদাই পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধনের জন্য প্রযত্নশীল থাকে। কেবল মাত্র পুরুষের শরীরস্থ বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের কার্য্যের ফলে স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়স্থিত তেজ ও রসের সর্ব্বতোভাবের মিলন অথবা মিশ্রণ সম্ভবযোগ্য হয়। এই কারণে পুরুষের সহিত সংযোগ ব্যতীত কখনও কোন স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

গর্ভাশয়স্থিত বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের সর্ব্বতো-ভাবের মিলন অথবা মিশ্রণ ব্যতীত কখনও কোন সন্তান-সম্ভাবনা হয় না বটে কিন্তু সন্তানের শরীরে যে তেজ ও রসের উৎপত্তি হয় সেই তেজ ও রস সর্ব্বদা মিলন প্রবৃত্তিযুক্ত হয় না। কোন সন্তানের তেজ ও রস মিলনপ্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হয়। আবার কোন কোন সন্তানের তেজ ও রসে অমিলন প্রবৃত্তির আধিক্যও থাকিতে পারে। শ্রেণী-বিশেষের পুরুষের সহিত শ্রেণীবিশেষের স্ত্রীলোকের যৌন মিলন হইলে যে সন্তানের উৎপত্তি হয় সেই সন্তানের শরীরের তেজ ও রস মিলনপ্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হয়। যে শ্রেণীর পুরুষের সহিত যে শ্রেণীর স্ত্রীলোকের যৌন মিলন হইলে সন্তানের শরীরের তেজ ও রস মিলনপ্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হয়, সেই শ্রেণীর পুরুষের সহিত সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের বিবাহকে যোগ্য বিবাহ বলা হয়। যে শ্রেণীর পুরুষের সহিত যে শ্রেণীর স্ত্রীলোকের যৌন মিলন হইলে সন্তানের শরীরের তেজ ও রস অমিলপ্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হয়, সেই শ্রেণীর পুরুষের সহিত সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের বিবাহকে অযোগ্য বিবাহ বলা হয়। অযোগ্য বিবাহ অথবা অযোগ্য মিলনের ফলে যে সমস্ত সন্তানের উৎপত্তি হয় সেই সমস্ত সন্তানের শরীরস্থ তেজ ও রস কখনও মিলনপ্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হয় না। ইহার ফলে ঐ সমস্ত সন্তানের শরীরস্থ তেজ ও রস সর্ব্বদাই অসমতাযুক্ত হইয়া থাকে এবং সময় সময় বিষমতাযুক্তও হয়।

যাহাদের শরীরস্থ তেজ ও রস অসমতার অথবা বিষমতার প্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হয় তাহাদের অভিমান-প্রবৃত্তির ও বৈকৃতিক ইচ্ছার প্রবৃত্তি অনিবার্য্য হইয়া থাকে। অভিমান-

প্রবৃত্তি ও বৈকৃতিক ইচ্ছার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে মানুষের শরীরের পঞ্চবিধ-উপাদানের (অর্থাৎ ব্যোমীয়, বায়বীয়, বাষ্পীয়, তরল ও স্থূল উপাদানের) যোগবিহীন কার্য্য অনিবার্য্য হইয়া থাকে। মানুষের শরীরের পঞ্চবিধ উপাদানের যোগ-বিহীন কার্য্যের উদ্ভব হইলে পশুত্বের উদ্ভব হওয়াও অনিবার্য্য হয়।

যোগ্য বিবাহ হইলেই যে সন্তানসমূহের শরীরস্থ তেজ ও রস মিলনপ্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হয়, তাহা নহে। যোগ্য বিবাহ হইলেও অন্যান্য শ্রেণীর কারণে সন্তানসমূহের শরীরস্থ তেজ ও রস অমিলনপ্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হইতে পারে। যোগ্য বিবাহ না হইলে সন্তানসমূহের শরীরস্থ তেজ ও রস কোন ক্রমেই অমিলন প্রবৃত্তির আধিক্যহীন হইতে পারে না।

উপরোক্ত কারণে মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে স্ত্রী-পুরুষের যাহাতে অযোগ্য বিবাহ না হয় এবং যোগ্য বিবাহ হয় তাহা করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

বিবাহ অথবা যৌন মিলন বিষয়ে কোন্ শ্রেণীর পুরুষ কোন্ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের যোগ্য অথবা অযোগ্য তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় স্ত্রী ও পুরুষের শরীরের ও অন্তরের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি পরীক্ষা করা। এই পরীক্ষাকার্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার আছে। ঐ সমস্ত কথার প্রত্যেকটীই অত্যন্ত বিস্তৃত। ঐ সমস্ত কথার কোনটীই আমরা এখানে উত্থাপিত করিব না।

পশুত্ব নিবারণ অথবা দূর করিতে হইলে মানুষের শরীরের তেজ ও রসের যাহাতে অসমতা অথবা বিষমতার উদ্ভব না হয় তাহা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। মানুষের শরীরের তেজ ও রসের যাহাতে অসমতা অথবা বিষমতার উদ্ভব না হয়, তাহা করিতে হইলে কোন জনক-জননীর যাহাতে অযোগ্য বিবাহ অথবা অযোগ্য মিলন না হইতে পারে এবং না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

তরুণ-তরুণীগণের বিবাহ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য পালন বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ সাত শ্রেণীর। এই সাত শ্রেণীর অনুসন্ধানের কথা আমরা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বঙ্গশ্রীর ১৮২ পৃঃ পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি। ঐ সমস্ত কথার পুনরুল্লেখ করিব না।

"মাতার গর্ভাশয় গর্ভধারণযোগ্য হইলে গর্ভাশয়স্থিত তেজ ও রসের যে অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব হয়, সেই অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি দূর করিবার ব্যবস্থার" অপর নাম "তরুণীগণের গর্ভধারণযোগ্য-গর্ভাশয়সমূহের অস্বাস্থ্য নিবারণ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যপালন-বিষয়ক অনুষ্ঠান"সমূহ। এই সমস্ত অনুষ্ঠান মূলতঃ এক শ্রেণীর। কতিপয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম এই সমস্ত অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

মাতা গর্ভধারণ করিলে গর্ভধারণ বশতঃ মাতার শরীরস্থ তেজ ও রস যে অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তিযুক্ত হয় সেই অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি দূর করিতে হইলে এক শ্রেণীর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই এক শ্রেণীর অনুষ্ঠানের কথাও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বঙ্গশ্রীর ১৮২ পৃষ্ঠার পাদ-টীকায় বলা হইয়াছে।

মাতৃগর্ভস্থিত ভ্রূণ যখন তরলাকার ও স্থূলাকার ধারণ করে তখন ঐ ভ্রূণের ক্রম-বিবর্দ্ধমান অতিরিক্ত গুরুত্ব বশতঃ মাতার শরীরস্থ তেজ ও রস যে অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তিযুক্ত হয়, সেই অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি দূর করিতে হইলে এক শ্রেণীর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানের কথাও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বঙ্গশ্রীর ১৮৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলা হইয়াছে।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠানেরই প্রধান কার্য্য কতিপয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম।

মানুষের যাহাতে পশুত্বের উদ্ভব না হয় তাহা করিতে হইলে শৈশবাবধি শরীরের তেজ ও রসের পরিমাণেরই হউক, আর বেগেরই হউক, কোনরূপ অসমতা অথবা বিষমতার যাহাতে কোনরূপ আশঙ্কা না হয়—তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা যে অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা "পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের মূলসূত্রের" আলোচনায় দেখাইয়াছি।

এক্ষণে শৈশবাবধি কোন্ কোন্ কারণে মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতার ও বিষমতার উদ্ভব হইতে পারে এবং যাহাতে এই অসমতার ও বিষমতার উদ্ভব না হইতে পারে তাহা করিবার পন্থা কি কি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমেই দেখান হইল যে, শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার আগেই শিশুর শরীরের তেজ ও রসের যাহাতে অসমতার অথবা বিষমতার উদ্ভব না হয় তাহা করিবার উদ্দেশ্যে চারিশ্রেণীর বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়; যথা:

(১) পিতামাতার যোগ্য বিবাহ ও যোগ্যমিলন;

(২) গর্ভধারণযোগ্যা মাতার গর্ভাশয়ের তেজ ও রসের সমতা;

(৩) গর্ভের প্রথম অবস্থায় গর্ভিণী মাতার গর্ভাশয়ের তেজ ও রসের সমতা;

(৪) গর্ভের পরিপক্ক অবস্থায় গর্ভিণী মাতার গর্ভাশয়ের তেজ ও রসের সমতা।

পুরুষ ও রমণীগণের যাহাতে অযোগ্য বিবাহ অথবা অযোগ্য মিলন না হইতে পারে এবং সহজেই যোগ্য বিবাহ ও যোগ্য মিলন হয়, তাহা করিতে হইলে সাত শ্রেণীর সতর্কতা-* মূলক সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়।

সন্তানের শরীরস্থ তেজ ও রস যাহাতে কোনরূপে অসমতার অথবা বিষমতার গুণ অথবা শক্তি অথবা প্রবৃত্তিযুক্ত না হইতে পারে তাহার জন্য গর্ভ-ধারণযোগ্যা রমণী সম্বন্ধে যাহা যাহা করিতে হয় তাহা সাধারণতঃ এক শ্রেণীর অনুষ্ঠান, যথা: কতিপয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম; গর্ভিণী রমণীগণ সম্বন্ধে যাহা যাহা করিতে হয় তাহা সাধারণতঃ গর্ভের দুই অবস্থায় দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠান এবং ঐ দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠানেই কতিপয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম প্রধানতঃ সাধন করিতে হয়। গর্ভ-ধারণযোগ্যা ও গর্ভিণী রমণীগণ সম্বন্ধে যাহা যাহা করিতে হয়, তাহা প্রধানতঃ কতিপয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম বটে; কিন্তু কেবলমাত্র ঐ সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম সাধন করিলেই সন্তানের শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির আশঙ্কা তিরোহিত হয় না। ঐ জন্য প্রত্যেক বিবাহিত যুবক ও যুবতীকে কয়েক শ্রেণীর শিক্ষা দান করিবার প্রয়োজন হয়। ঐ শিক্ষা বিবাহ-সংস্কারের প্রধান অঙ্গ।

* যে যে বিষয়ে এই সাতশ্রেণীর সতর্কতার প্রয়োজন হয় সেই সেই বিষয়ের কথা আমরা জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গশ্রীতে উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া এখানে উল্লেখ করা হইল না।

প্রথমতঃ, যুবক-যুবতীগণের বিবাহ, দ্বিতীয়তঃ, গর্ভধারণ-যোগ্যা রমণীগণের গর্ভাশয় রক্ষা এবং তৃতীয়তঃ, গর্ভিণী রমণীগণের পালন—এই তিন শ্রেণীর কার্য্যে যে যে অনুষ্ঠান সাধন করিতে হয়, সেই সেই অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা না করিলে মানুষের শৈশবাবস্থায় তাহার শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা ঘটিবার আশঙ্কা তিরোহিত হয় না। উপরোক্ত অনুষ্ঠানসমূহ সাধন করিবার ব্যবস্থা না করিলে মানুষের শৈশবাবস্থায় তাহার শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা ঘটিবার আশঙ্কা তিরোহিত হয় না বটে; কিন্তু কেবলমাত্র ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করিলেই মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা ঘটিবার আশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হয় না। শৈশবাবধি বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এক একটী প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বিকাশ হইতে থাকে। মানুষ যখন শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাহার পরবর্ত্তী জীবনে যে সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তির ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রত্যেক-টীর প্রাকৃতিক গুণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যমান থাকে বটে কিন্তু কোন প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিরই বিকাশ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হয় না। বয়স বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে এক একটী করিয়া ষোল বৎসর বয়সের মধ্যে প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তি ও প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটিয়া থাকে। ষোল বৎসর বয়সের মধ্যে প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তি ও প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটিয়া থাকে বটে কিন্তু কোন শক্তি ও প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ কোন মানুষের ষোল বৎসর বয়সের মধ্যে সংঘটিত হয় না।

উপরোক্ত এক একটী প্রাকৃতিক শক্তি ও এক একটী প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রাথমিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতার আশঙ্কার উদ্ভব হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির মাত্রা যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা ঘটিবার আশঙ্কাও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এক একটী প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বিকাশের ও মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেজ ও রসের অসমতার

ও বিষমতার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায় বটে; কিন্তু কার্য্যতঃ এই অসমতা ও বিষমতা নাও ঘটিতে পারে। এক একটী প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বিকাশের ও মাত্রা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে তেজ ও রসের অসমতার ও বিষমতার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়, তাহার কারণ প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বিকাশে ও মাত্রার বৃদ্ধিতে শরীরস্থ পঞ্চবিধ উপাদানের মধ্যে ব্যোমীয়, বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানের প্রতি আকৃষ্টতার তুলনায় তরল ও স্থূল উপাদানের প্রতি অধিকতর আকৃষ্টতার আশঙ্কা ঘটিয়া থাকে। এক একটী প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বিকাশের ও মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেজ ও রসের অসমতার ও বিষমতার আশঙ্কা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা যাহাতে না ঘটিতে পারে তাহা করিবার শক্তিও সেইরূপ বৃদ্ধি পায়।

শিশুগণের ও তরুণ-তরুণীগণের প্রাকৃতিক শক্তি ও ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, যাহাতে শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা অথবা বিষমতা না ঘটিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির মাত্রার বৃদ্ধি হইলেও, শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা অথবা বিষমতা ঘটিতে পারে না। অন্যদিকে, শিশুগণের ও তরুণ-তরুণীগণের প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, যাহাতে শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা অথবা বিষমতা না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির মাত্রার বৃদ্ধি হইলে শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা অনিবার্য্য হইয়া থাকে। শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা অনিবার্য্য হইলে মানুষের অযথা অনুরাগ, অযথা বিদ্বেষ, অভিমান, বৈকৃতিক ইচ্ছা, শরীরস্থ পঞ্চবিধ উপাদানের পরিমাণের ও বেগের যোগবিহীনতা এবং পশুত্ব অল্লাধিক পরিমাণে অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

উপরোক্ত কারণে মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিতে হইলে শৈশবাবধি পুরুষ ও রমণীর কোন্ কোন্ বয়সে কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক শক্তি ও কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, তদ্বিষয়ে এবং যে যে ব্যবস্থায় ঐ ঐ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা অথবা বিষমতা ঘটিতে না পারে তাহা করা সুনিশ্চিত হয়—সেই সেই ব্যবস্থা-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়।

ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি এক বৎসর বয়স অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত প্রত্যেক শিশুর চারিশ্রেণীর প্রাকৃতিক শক্তি ও চারি-শ্রেণীর প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির উন্মেষ হইয়া থাকে, যথা:

(১) শারীরিক শক্তির (অর্থাৎ মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের শক্তির) ও শরীরজাত প্রবৃত্তির উন্মেষ;
(২) ইন্দ্রিয়গত শক্তির ও ইন্দ্রিয়জাত প্রবৃত্তির উন্মেষ;
(৩) মানসিক শক্তির ও মনজাত প্রবৃত্তির উন্মেষ,;
(৪) ইচ্ছাশক্তির ও ইচ্ছাজাত প্রবৃত্তির উন্মেষ।

এক বৎসর বয়স অতিক্রম করা অবধি পাঁচ বৎসর বয়স অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত প্রত্যেক শিশুর উপরোক্ত চারি শ্রেণীর প্রাকৃতিক শক্তির ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রাথমিক মাত্রার বৃদ্ধি হইতে থাকে।

এক বৎসরের অনধিক-বয়স্ক শিশুগণের উপরোক্ত চারি-শ্রেণীর প্রাকৃতিক শক্তির ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তাহাদের কাহারও শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের অথবা বেগের অসমতা ও বিষমতা ঘটিতে না পারে, তজ্জন্য প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে প্রত্যেক এক বৎসরের অনধিক-বয়স্ক শিশুগণের পিতামাতা ও অভিভাবকগণকে উপরোক্ত প্রতিবিধানমূলক শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতে হয় এবং চারিশ্রেণীর আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে হয়। উপরোক্ত শিক্ষা ও চারিশ্রেণীর আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মকে এক বৎসরের অনধিক-বয়স্ক শিশুপালন সম্বন্ধীয় পাঁচ শ্রেণীর অনুষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই পাঁচ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের কথা আমরা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বঙ্গশ্রীর ১৮৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি।

এক বৎসরের অধিক-বয়স্ক এবং পাঁচ বৎসরের অনধিক-বয়স্ক শিশুগণ সম্বন্ধে ঐ পাঁচ শ্রেণীর অনুষ্ঠান পালন করিবার প্রয়োজন হয়; তাহা ছাড়া, আরও অতিরিক্ত দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবারও প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠানের কথাও আমরা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বঙ্গশ্রীর ১৮৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি।

পঞ্চম বৎসর অতিক্রম করা অবধি দশ বৎসর অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালক-বালিকার শারীরিক শক্তি ও

শরীরজাত প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয়গত শক্তি ও ইন্দ্রিয়জাত প্রবৃত্তি, মানসিক শক্তি ও মনজাত প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছাশক্তি ও ইচ্ছাজাত প্রবৃত্তি, মৃদু মাধ্যমিক মাত্রায় বিকাশপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

দশম বৎসর অতিক্রম করা অবধি পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর উপরোক্ত চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি তীব্র মাধ্যমিক মাত্রায় বিকাশপ্রাপ্ত হয়।

পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রম করা অবধি উপরোক্ত চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি উচ্চ মাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চম বৎসরের অধিক বয়স্ক এবং দশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালক-বালিকাগণের শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণ অথবা বেগ যাহাতে অসমতা অথবা বিষমতা প্রাপ্ত না হয়, তাহা করিবার জন্য তাহাদিগের প্রত্যেকের সম্বন্ধে যাহাতে পঞ্চম বৎসরের অনধিক-বয়স্ক শিশুগণের মত পূর্ব্বোক্ত সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহা ছাড়া, ইহাদের প্রত্যেকের যাহাতে বয়সের উপযোগী ভাবে এবং বয়সের প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে দশশ্রেণীর অভ্যাস, দশশ্রেণীর নীতি এবং দশশ্রেণীর বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। পঞ্চম বৎসরের অধিক-বয়স্ক এবং দশ বৎসরের অনধিক-বয়স্ক বালক-বালিকাগণের শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণ ও বেগের যেমন অসমতা ও বিসমতা ঘটিবার আশঙ্কা থাকে, সেইরূপ তাহাদের অভিমান এবং বৈকৃতিক ইচ্ছার উদ্ভব হইবারও আশঙ্কা থাকে। তাহাদের যাহাতে অভিমানের উদ্ভব না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহাদিগকে দশ শ্রেণীর অভ্যাসে অভ্যস্ত করান হয়। তাহারা যাহাতে দশশ্রেণীর অভ্যাসের প্রত্যেক শ্রেণীর অভ্যাসে অভ্যস্ত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে তাহাদিগকে দশ শ্রেণীর নীতিশাস্ত্র শেখান ও পালন করান হয়। তাহারা যাহাতে অতর্কিত ভাবে বৈকৃতিক ইচ্ছার দাস না হইয়া পড়ে—তদুদ্দেশ্যে তাহাদিগকে দশ শ্রেণীর বিজ্ঞান অধ্যয়ন করান হয়।

পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্ক এবং দশ বৎসরের অনধিক-বয়স্ক বালকগণকে সাতশ্রেণীর অনুষ্ঠান, দশশ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি এবং দশ শ্রেণীর বিজ্ঞান যে-প্রণালীতে অভ্যাস করান হয় অথবা শেখান হয়, বালিকাগণকে সেই প্রণালীতে অভ্যাস করান অথবা শেখান হয় না।

বালকগণকে অনুষ্ঠানসমূহ, অভ্যাসসমূহ, নীতিসমূহ এবং বিজ্ঞানসমূহ যে-যে প্রণালীতে শেখান হয়, সেই-সেই প্রণালীর উদ্দেশ্য থাকে উহাদিগকে কর্ম্মী প্রস্তুত করা, আর বালিকাগণকে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানাদি যে-যে প্রণালীতে শেখান হয়—সেই সমস্ত প্রণালীর উদ্দেশ্য থাকে তাহাদিগকে সু-গৃহিণী প্রস্তুত করা।

নবম বৎসর বয়স অতিক্রম করিলেই বালিকাগণের স্ত্রী-জনোচিত ইন্দ্রিয়-সমূহ পরিপুষ্টি লাভ করিতে আরম্ভ করে এবং ঐ ইন্দ্রিয়সমূহের ইচ্ছাশক্তি উল্লেখযোগ্য ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। মানুষের পশুত্ব যাহাতে নিবারিত হয় এবং মনুষ্যত্ব যাহাতে সাধিত হয় তাহা করিতে হইলে যুবতীগণের স্বাস্থ্যবান্ জননেন্দ্রিয় অত্যধিকভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। এইজন্য নবম বৎসর বয়স অতিক্রম করিলেই বালিকাগণের ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যের প্রতি উল্লেখযোগ্য ভাবে লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। বালিকাগণের ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইলে দুইশ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। ঐ দুইশ্রেণীর অনুষ্ঠানের কথা জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যার বঙ্গশ্রীর ১৮৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

দশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালিকাগণকে তাহাদিগের বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত দ্বাদশশ্রেণীর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়; যথা:

(১) দশ-শ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার দ্বিতীয়াংশ;
(২) দশ-শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার দ্বিতীয়াংশ;
(৩) দশ-শ্রেণীর বিজ্ঞান-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার দ্বিতীয়াংশ;
(৪) নৃত্য-গীত বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রাথমিক অংশ;
(৫) শিল্প-কার্য্য বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমাংশ;
(৬) কারু-কার্য্য-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমাংশ;
(৭) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংগঠন বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমাংশ;
(৮) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান সংগঠন বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমাংশ;

(৯) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমাংশ ;

(১০) গৃহিণীর দায়িত্ব শিক্ষার প্রথমাংশ ;

(১১) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার ষড়বিধ নীতি ; *

(১২) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার অষ্টবিধ নীতি ; §

দশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালিকাগণকে তাহাদিগের বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত উপরোক্ত দশ শ্রেণীর শিক্ষা দিবার জন্য ছয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ছয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের কথা আমরা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বঙ্গশ্রীর ১৮৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বিবৃত করিয়াছি।

বিবাহ হইবার পর বালিকাগণকে অতিরিক্ত ছয় শ্রেণীর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয় ; যথা :

(১) বিবাহিত জীবনে রমণীগণের দায়িত্ব ও তাহা পালন করিবার সঙ্কেত-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমাংশ ;

(২) গর্ভাশয়ের স্বাস্থ্য-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমাংশ ;

(৩) গর্ভিণীর ও গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমাংশ ;

(৪) শিশুপালন-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমাংশ ;

(৫) বালক-বালিকা পালন-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমাংশ ;

(৬) তরুণ-তরুণী পালন বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমাংশ ;

বালিকাগণ যতদিন পর্য্যন্ত পঞ্চদশ বৎসর বয়স অতিক্রম না করেন, ততদিন তাঁহাদিগকে সর্ব্বসমেত উপরোক্ত আঠার শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

---

* ষড়বিধ নীতির নাম

(ক) মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে জমি অথবা জল অথবা বাতাসের কোনরূপ অসমতা অথবা বিষমতার উদ্ভব হইতে পারে, সেই সমস্ত কার্য্যের নাম ও অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রচার ;

(খ) প্রত্যেক মানুষ যে সমগ্র মনুষ্য সমাজের এক একটী অংশ এবং সমগ্র মনুষ্য সংখ্যায় যে মানব সমাজের পূর্ণতা তাহা বিস্মৃত হইয়া দেশগত অথবা বিদ্যাগত অথবা বংশগত অথবা ধনগত অথবা প্রতিষ্ঠাগত অথবা সাধনাগত অথবা অন্য কোন শ্রেণীর কারণ প্রসূত কোনরূপ অভিমান অথবা অহঙ্কার পোষণ করিবার অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রচার ;

(গ) সমতা ও স্বাবলম্বনের প্রবৃত্তির স্থলে, আত্মসম্মানের ছলে, উচ্চ, নীচ ভাব এবং স্বাধীনতা ও জাতীয়তার নামে দলাদলির ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব পোষণ করিবার অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রচার ;

(ঘ) কার্য্যকারণের বিচার বিশ্লেষণযুক্ত বিজ্ঞান, নীতি ও বিধি নিষেধ শাস্ত্রের স্থলে কাল্পনিক সংস্কার অথবা মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-নীতি ও বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রচার ;

(ঙ) প্রথমতঃ, স্বাভাবিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির মিশ্রণেই যে মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম ; দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অপকর্ষ হয় তাহাই যে ধর্ম্মের অপকর্ষ এবং তৃতীয়তঃ, যাহাতে মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ হয় তাহাই যে ধর্ম্মের উৎকর্ষ—এই তিনটী কথা বিস্মৃত হইয়া সংস্কারমূলক ধর্ম্মে বিশ্বাসী হওয়ার এবং ধর্ম্ম সংস্কার লইয়া রাগদ্বেষ পোষণ করার অথবা দ্বন্দ্ব-কলহ করার অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রচার ;

(চ) যাহাতে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি যুগপৎ সম্পাদিত হয়, তাহাই যে প্রকৃত উপভোগের—তাহা বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা বুদ্ধির তৃপ্তিজনকতা অথবা স্বাস্থ্যজনকতা উপভোগ্য মনে করার অনিষ্টকারিতা-বিষয়ক প্রচার।

§ অষ্টবিধ নীতির নাম

(১) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিতে হইলে প্রত্যেক গ্রামে প্রধানতঃ যে সপ্তবিংশতি শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রয়োজন হয় সেই সপ্তবিংশতি শ্রেণীর কার্য্য যথাসম্ভব সমান ভাবে না চালাইয়া অসমান ভাবে চালাইবার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য ;

(২) প্রত্যেক গ্রামের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে উৎপাদন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই দ্রব্য যাহাতে সেই সেই পরিমাণে গ্রামের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং অন্য কোন গ্রামের মুখাপেক্ষী হইতে না হয় তাহার জন্য প্রযত্নশীল না হওয়ার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য ;

(৩) যে যে দ্রব্য গ্রামের মধ্যে উৎপন্ন হয় সেই সেই দ্রব্যের দ্বারা যাহাতে গ্রামবাসীগণের সর্ব্ববিধ উপভোগের অভিলাষ পরিতৃপ্ত হয় তাহার জন্য প্রযত্নশীল না হইয়া অন্যান্য গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য ;

(৪) একই শ্রেণীর শ্রমের পারিশ্রমিক হার বিভিন্ন কার্য্যে সমান না হইয়া অসমান হওয়ার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য ;

(৫) কোন শ্রেণীর শ্রমিকের পারিশ্রমিক হার ঐ শ্রেণীর শ্রমিকের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন নির্ব্বাহ পক্ষে অপ্রচুর হওয়ার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য ;

(৬) যে-শ্রেণীর দ্রব্য মানুষের তৃপ্তি অথবা স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে অক্ষম পরন্তু অতৃপ্তির অথবা অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া থাকে, সেই শ্রেণীর দ্রব্য উৎপাদন করিবার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য ;

(৭) উপার্জ্জনযোগ্য বয়সপ্রাপ্ত প্রত্যেক মানুষ যাহাতে সাত শ্রেণীর শ্রমের কোন না কোন শ্রেণীর শ্রমে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য প্রযত্নশীল হন্ এবং শ্রমের দ্বারা উপার্জ্জন ছাড়া যাহাতে ধনের দ্বারা কোন ধন উপার্জ্জন সম্ভবযোগ্য না হয় তাহা না করিবার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য ;

(৮) মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ উৎপাদনের জন্য যে-সমস্ত কার্য্যধারার আশ্রয় লওয়া হয় সেই সমস্ত কার্য্যধারার কোনটী যাহাতে ঐ সমস্ত কার্য্যধারার উৎপন্ন দ্রব্যের কোনটীর কাঁচা মালে স্বাভাবিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষকারিতার অপহারক না হয় এবং জমি অথবা জল অথবা বাতাসের অসমতা অথবা বিষমতা সাধক না হয়, তৎসম্বন্ধে সতর্ক না হওয়ার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার।

বালিকাগণের বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাদিগের শিক্ষার ও অভ্যাসের জন্ম মূলতঃ দায়ী হ'ন সামাজিক গ্রামের সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ এবং সাক্ষাৎভাবে দায়ী হ'ন তাহাদিগের পিতা-মাতা প্রভৃতি পিত্রালয়ের অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ।

বিবাহের পরেও বালিকাগণের শিক্ষা ও অভ্যাসের জন্ম মূল দায়িত্ব সামাজিক গ্রামের সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। বিবাহের পর সাক্ষাৎভাবে ঐ কার্য্যের জন্ম দায়ী হইয়া থাকেন বালিকাগণের স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি শ্বশুরালয়ের অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ। বালিকাগণের শিক্ষা ও অভ্যাস ষষ্ঠ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিবা-মাত্র আরম্ভ করা হয়। উহা সাক্ষাৎভাবে অন্তঃপুর মধ্যে মাতা প্রভৃতি অভিভাবিকাগণের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। উহা কখনও সাধারণ প্রকাশ্য শিক্ষাগারে অথবা সাক্ষাৎভাবে পুরুষগণের দ্বারা সাধিত হয় না। বালিকাগণের অথবা রমণীগণের শিক্ষা পুরুষগণের দ্বারা সাধিত হইলে রমণীগণ পুরুষভাবাপন্ন হইয়া পড়েন এবং তখন উঁহারা সংসার ও সমাজের উপকারের তুলনায় অধিকতর অপকার সাধন করিয়া থাকেন। বিবাহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা পঞ্চদশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গে রমণীগণের শিক্ষার সমাপ্তি হয় না। রমণীগণের সারাজীবন অধ্যয়ন করিতে হয় এবং নূতন নূতন শিক্ষা ও অভ্যাস অর্জ্জন করিতে হয়।

দশ শ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষা, দশ শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষা এবং দশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক স্ত্রী শিক্ষা দশভাগে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। দশ শ্রেণীর অভ্যাসের, দশ শ্রেণীর নীতির এবং দশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষা, দর্শন ও অধ্যয়ন যুগপৎ যাহাতে চলিতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। উহাদের এক একটী অংশের শিক্ষা, দর্শন ও অধ্যয়ন সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরে পরিসমাপ্ত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ রমণীগণ যখন পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করেন তখন তাহাদিগের অভ্যাস, নীতি ও পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষা, দর্শন ও অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত হয়।

নৃত্য-গীতাদি অপর পনরটী বিষয়ের প্রত্যেকটী-বিষয়ক স্ত্রী শিক্ষা দুই অংশে পরিসমাপ্ত হয়। পনরটী বিষয়ের শিক্ষা রমণীগণ কুড়ি বৎসর বয়স অতিক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গে পরিসমাপ্ত করিয়া থাকেন।

কুড়ি বৎসর বয়স অতিক্রম করিবার পর প্রত্যেক রমণীকে প্রতিদিন প্রধানতঃ চারি শ্রেণীর কার্য্য করিতে হয়; যথা :

(১) সংসারের গৃহিণীপণা ;

(২) সংসারস্থ শিশু, বালক, বালিকা ও তরুণ-তরুণীগণের শিক্ষা ও অভ্যাস ;

(৩) স্ব স্ব স্বামীর উপার্জ্জনের কার্য্যের অভিজ্ঞতার্জ্জন ও তদ্বিষয়ে স্বামীকে সহায়তা করা ; এবং

(৪) অভ্যাস, নীতি ও বিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষা, দর্শন ও অধ্যয়ন।

বালকগণের বালকজনোচিত শিক্ষা সাধারণতঃ আরম্ভ করা হয় তাহাদের একাদশ বৎসর বয়সে। পঞ্চম বৎসর বয়স অতিক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গে বালকগণকে মুখে মুখে দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি এবং দশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান শেখান আরম্ভ করা হয়। সপ্তম বৎসর বয়স অতিক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে একদিকে যেরূপ লিখিতে ও পড়িতে শিখাইবার ব্যবস্থা করা হয়, সেইরূপ আবার দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি এবং দশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের প্রাথমিক অংশ পাঠ করান হয়।

একাদশ বৎসর বয়সে বালকগণের পুরুষজনোচিত ইন্দ্রিয়সমূহ পরিপুষ্টিলাভ করিতে আরম্ভ করে এবং ঐ ইন্দ্রিয়সমূহের ইচ্ছাশক্তি উল্লেখযোগ্য ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। মানুষের পশুত্ব যাহাতে নিবারিত হয় এবং মনুষ্যত্ব যাহাতে সাধিত হয় তাহা করিতে হইলে যেমন স্বাস্থ্যবান স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বাস্থ্যবান পুং-জননেন্দ্রিয়েরও প্রয়োজন হয়। এই জন্ম বালকগণ যখন একাদশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে তখন বালকগণের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্যের প্রতি উল্লেখযোগ্য ভাবে লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। বালকগণের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইলে দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠানের সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। ঐ দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠানের কথা জ্যৈষ্ঠসংখ্যার বঙ্গশ্রীর ১৮৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

তরুণ অথবা কৈশোর শিক্ষার ব্যবস্থা

একাদশ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত বালকগণকে আট শ্রেণীর শিক্ষা ও অভ্যাস করাইবার ব্যবস্থা করা হয় ; যথা :

(১) দশশ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক শিক্ষার দ্বিতীয়াংশ ;
(২) দশশ্রেণীর নীতিবিষয়ক শিক্ষার দ্বিতীয়াংশ ;
(৩) দশশ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষার দ্বিতীয়াংশ ;
(৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানসংগঠন বিষয়ক শিক্ষার প্রথমাংশ ;
(৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার প্রথমাংশ ;
(৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ শিক্ষার প্রথমাংশ ;
(৭) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার ষড়্‌বিধ নীতি ,
(৮) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার অষ্টবিধ নীতি।

উপরোক্ত শিক্ষাকে "তরুণ" অথবা "কৈশোর শিক্ষা" বলা হয়। চলতি ভাষায় ঐ শিক্ষাকে "মাধ্যমিক শিক্ষা" বলা যাইতে পারে। সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগারে তরুণগণের শিক্ষা সাধিত হয়। সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া থাকেন। সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় সামাজিক কার্য্য পরিচালনাসভার কর্ম্মিগণের হস্তে। সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগারে কোন ছাত্রের নিকট কোন বেতন চাওয়া হয় না ; প্রত্যেক ছাত্রই বিনা বেতনে সাধারণ শিক্ষাগারে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

সামাজিক কার্য্যের চতুর্থশ্রেণীর কর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা

তরুণগণ যখন ষোড়শ বৎসরে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহাদিগকে সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কার্য্য শেখান হয়। সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কার্য্যের অপর নাম "শ্রমজীবীর কার্য্য"। ষোড়শ বৎসর হইতে অষ্টাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক যুবক "শ্রমজীবীর কার্য্য" শিক্ষা করিয়া থাকেন। এই শিক্ষাও সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগারে সাধিত হইয়া থাকে। সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ শ্রমজীবীর শিক্ষার শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। শ্রমজীবীর কার্য্যশিক্ষার্থিগণের কাহারও কোন বেতন দিতে হয় না ! প্রত্যেকেই বিনা বেতনে সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগারে শ্রমজীবীর কার্য্য শিক্ষা করিয়া থাকেন।

শ্রমজীবীর কার্য্য শিক্ষায় সর্ব্বসমেত সাত শ্রেণীর বিষয় পাঠ করান ও শেখান হয় ; যথা :

(১) দশ শ্রেণীর অভ্যাস বিষয়ক তত্ত্বের তৃতীয়াংশ,
(২) দশ শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের তৃতীয়াংশ,
(৩) দশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বের তৃতীয়াংশ,
(৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান সংগঠন বিষয়ক শিক্ষার দ্বিতীয়াংশ ;
(৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংগঠন বিষয়ক শিক্ষার দ্বিতীয়াংশ ;
(৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ বিষয়ক শিক্ষার দ্বিতীয়াংশ ;
(৭) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার ঊনচল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের ঊনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের* প্রথমাংশ।

---

* ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার ঊনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের নাম।

১। কৃষিতত্ত্ব ;
২। জলজাত দ্রব্য-তত্ত্ব ;
৩। বাগান ও বাগানজাত দ্রব্য-তত্ত্ব ;
৪। বন ও বনজাত উদ্ভিদ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ-তত্ত্ব ;
৫। পশুপালন-তত্ত্ব ;
৬। পক্ষীপালন-তত্ত্ব ;
৭। কীটপতঙ্গ ও সরীসৃপ প্রতিপালন করিবার তত্ত্ব ;
৮। খণিজাত দ্রব্য-তত্ত্ব।
৯। খাদ্য ও পানীয় বিষয়ক শিল্প-তত্ত্ব ;
১০। রাসায়নিক শিল্প-তত্ত্ব ;
১১। কার্পাস বস্ত্র সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব ,
১২। রেশমবস্ত্র সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব ;
১৩। পশমবস্ত্র সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব ;
১৪। কুম্ভকারের কার্য্য সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব ;
১৫। ছুতারের কার্য্য সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব ;
১৬। কর্ম্মকারের কার্য্য সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব ;
১৭। কাংস্যকারের কার্য্য সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব ;
১৮। স্বর্ণকারের কার্য্য সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব ;*
১৯। রত্ন সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব ;

ইহা ছাড়া, শ্রমজীবীর কার্য্য শিক্ষার্থীগণের প্রত্যেকের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার ৩৯ শ্রেণীর শ্রমানুষ্ঠানের যে কোন ছয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান তিন বৎসরে অভ্যাস করিতে হয় এবং ঐ ছয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানে শ্রম-নৈপুণ্য লাভ করিতে হয়।

শ্রমজীবীর কার্য্য শিক্ষার্থীগণ যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া উনবিংশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন তখন তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে সামাজিক কার্য্যের "তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম" শিক্ষার উপযুক্ত তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। যুবকগণ সাধারণতঃ প্রকৃতির নিয়মানুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন, যথা :

(১) দৈহিক শ্রমোপযুক্ত যুবক ; এবং

(২) মানসিক শ্রমোপযুক্ত যুবক।

যাঁহারা প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া দৈহিক শ্রমের কার্য্য করিতে সক্ষম হন অথবা শিক্ষা অথবা তত্ত্বগ্রন্থসমূহ অনেকক্ষণ ধরিয়া পাঠ অথবা অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হন না, পরন্তু অক্ষম হন, তাঁহারা "দৈহিক শ্রমোপযুক্ত যুবক শ্রেণীর" অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া দৈহিক শ্রমের কার্য্য করিতে সক্ষম হন না, পরন্তু অক্ষম হইয়া থাকেন, অথচ শিক্ষা-গ্রন্থ অথবা তত্ত্ব-গ্রন্থসমূহ অনেকক্ষণ ধরিয়া পাঠ অথবা অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা "মানসিক শ্রমোপযুক্ত যুবক শ্রেণীর" অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন।

শ্রমজীবীর কার্য্যে শিক্ষার্থীগণের যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া উনবিংশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে সামাজিক কার্য্যের "তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মের" উপযুক্ত তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যে পরীক্ষা কার্য্যের ব্যবস্থা করা হয় সেই পরীক্ষা কার্য্যের প্রধান লক্ষ্য থাকে—ঐ যুবকগণের মধ্যে কে কে দৈহিক শ্রমোপযুক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত আর কে কে মানসিক শ্রমোপযুক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা নির্দ্ধারণ করা।

যে নিয়মে যুবক-যুবতীগণের বিবাহ সাধিত হয়, যেরূপ ভাবে গর্ভযোগ্যা ও গর্ভিণী রমণীগণকে পর্য্যবেক্ষণ করা হয়, যে যে সূত্রে শিশু, বালক-বালিকা ও তরুণ-তরুণীগণকে পালন ও শিক্ষিত করা হয়, তাহাতে কোন যুবকের পক্ষে দৈহিক ও মানসিক এই উভয়বিধ শ্রমের অনুপযুক্ত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। ইহা পশুত্ব নিবারণ মূলক অনুষ্ঠান সমূহের ও প্রতিষ্ঠান সমূহের বৈশিষ্ট্য।

আজকালকার ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে-সমস্ত যুবক উৎপন্ন হইয়া থাকেন তাহাদিগকে দেখিলে মনুষ্যসমাজে যে এমন শিক্ষা বিধান সংঘটিত হইতে পারে যাহাতে দৈহিক ও মানসিক এই উভয়বিধ শ্রমের অনুপযুক্ত কোন যুবক উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব হয় তাহা অনুমান করা যায় না। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ; এম্-এ; বি-এল্, ডি-এল্; ডি-এস্-সি; পি-এইচ্-ডি; ডি-লিট্ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হইয়া যে-সমস্ত যুবক গত চল্লিশ বৎসর হইতে কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছে তাহাদিগের অধিকাংশই আমাদিগের মতে শারীরিক ও মানসিক এই উভয়বিধ পরিশ্রমেরই অনুপযুক্ত হইতেছেন। ইহাদিগের অধিকাংশই যে কোন দৈহিক পরিশ্রমের উপযুক্ত নহেন তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ইঁহারা মানসিক পরিশ্রমের উপযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইঁহাদিগের অনেকেই তথাকথিত অর্থহীন নভেল, গল্পের পুস্তক, ভ্রমণ-

২০। কাগজ, কলম পেন্সিল প্রভৃতি দ্রব্য সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব,
২১। যান নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব;
২২। যন্ত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব;
২৩। তার-পথ নির্ম্মাণ ও রক্ষা সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব;
২৪। চিত্র ও বাদ্য যন্ত্রাদি উৎপাদন করিবার শিল্প-তত্ত্ব;
২৫। যন্ত্র পরিচালনা তত্ত্ব,
২৬। ভবন নির্ম্মাণ তত্ত্ব;
২৭। খাল খনন ও স্থলপথ নির্ম্মাণ-তত্ত্ব,
২৮। রোগী ও ভোগীগণের পরিচর্য্যা বিষয়ক-তত্ত্ব;
২৯। ক্রয় বিক্রয় স্থল পরিচালনা বিষয়ক-তত্ত্ব;
৩৪। ক্রয় বিক্রয় করিবার কার্য্য বিষয়ক-তত্ত্ব;
৩১। জলযান পরিচালনা বিষয়ক-তত্ত্ব;
৩২। স্থলযান পরিচালনা বিষয়ক-তত্ত্ব;
৩৩। সংবাদ আদান প্রদানের কার্য্য বিষয়ক-তত্ত্ব,
৪৪। বিভিন্ন বিষয়ক সংবাদ প্রচারের কার্য্য বিষয়ক তত্ত্ব;
৩৫। মল ও ধৌত জল নিকাশের কার্য্য বিষয়ক-তত্ত্ব;
৩৬। পানীয় জল সরবরাহের কার্য্য বিষয়ক-তত্ত্ব;
৩৭। গমনাগমনের পথ পরিষ্কার করিবার কার্য্য বিষয়ক-তত্ত্ব;
৩৮। গমনাগমনের পথ আলোকিত রাখিবার কার্য্য বিষয়ক-তত্ত্ব.
৩৯। মানুষের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার কার্য্য বিষয়ক-তত্ত্ব।

কাহিনী, বিজ্ঞান গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন বটে কিন্তু চিন্তাশীল কোন লেখার মর্ম্ম ইহারা উদ্ধার করিতে পারেন না এবং পাঠ করিবার ধৈর্য্যও ইহাদের থাকে না।

ঊনবিংশ বৎসর বয়স্ক যুবকগণের মধ্যে যাহারা সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মোপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত হন তাহাদিগকে ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার জন্য প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে কৃষিকার্য্য ছাড়া যে আটত্রিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধিত হইয়া থাকে, সেই আটত্রিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের কোন না কোন একশ্রেণীর অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করা হয়। তাহা ছাড়া প্রত্যেককেই কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত প্রচুর জমি বিনা মূল্যে ও বিনা করে দেওয়া হয়। উহাদের প্রত্যেকেরই যেমন উপরোক্ত আটত্রিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের কোন না কোন একশ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিতে হয়, সেইরূপ আবার প্রত্যেকেরই কৃষিকার্য্যও করিতে হয়। ঊনবিংশ বৎসর বয়স্ক দৈহিক শ্রমোপযুক্ত যুবকগণকে উপরোক্তভাবে কার্য্যে নিয়োগ করা সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের দায়িত্বান্তর্ভুক্ত।

ঊনবিংশ বৎসর বয়স্ক দৈহিক শ্রমোপযুক্ত যুবকগণ যখন উপরোক্তভাবে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তখন তাঁহাদিগের প্রত্যেককে যোগ্যা তরুণীর সহিত বিবাহিত হইতে হয়। বিবাহের ব্যবস্থা করা সামাজিক কার্য্যপরিচালনা সভার-কর্ম্মীগণের এবং সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্বান্তর্ভুক্ত।

প্রত্যেক বিবাহিত চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীকে ছয় শ্রেণীর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়; যথা:

(১) বিবাহিত জীবনে যুবক-যুবতীগণের দায়িত্ব ও তাহা পালন করিবার শিক্ষার সঙ্কেত-বিষয়ক প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ;

(২) জননেন্দ্রিয় ও গর্ভাশয়ের স্বাস্থ্য-বিষয়ক শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ;

(৩) গর্ভিণীর ও গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য-বিষয়ক শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ;

(৪) এক হইতে পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুর পালন-বিষয়ক শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ;

(৫) পাঁচ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক এবং এগার বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক-বালিকাগণের পালন ও শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষার—প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ;

(৬) দশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক এবং পনের বৎসরের নিম্নবয়স্ক তরুণ ও তরুণীগণের পালন ও শিক্ষা-বিষয়ক শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ।

উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর শিক্ষা সামাজিক গ্রামের কোন সাধারণ শিক্ষাগারে সাধিত হয় না। বিবাহিত চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণকে ঐ ছয় শ্রেণীর শিক্ষা তাহাদিগের ঘরে ঘরে এবং অবসর সময়ে দিবার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ ছয় শ্রেণীর শিক্ষা প্রদান করিবার দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকে সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের হস্তে।

সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মে যাঁহারা নিযুক্ত থাকেন, তাহাদিগের মধ্যে কে কে সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম শিক্ষা করিবার উপযুক্ত হন—তাহা প্রতি বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থার দায়িত্বভার অর্পিত হয়—সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে।

সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মশিক্ষা করিবার ব্যবস্থা

ঊনবিংশ বৎসরবয়স্ক যুবকগণের মধ্যে যাঁহারা মানসিক শ্রমোপযুক্ত শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত হন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্ম-নিযুক্ত যুবকগণের মধ্যে যাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম শিখিবার উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হন—তাঁহাদিগকে সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম শেখান হইয়া থাকে।

সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম শিখিবার শিক্ষা-কাল দুই বৎসর। সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগারে এই শিক্ষাকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ এই শিক্ষাকার্য্যে শিক্ষকতা করিয়া থাকেন।

সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মশিক্ষার্থীদিগের কাহারও কোন বেতন দিতে হয় না। সামাজিক কার্য্যের

তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মশিক্ষায় সর্ব্বসমেত সাত শ্রেণীর বিষয় পাঠ করান ও শেখান হয়, যথা :

(১) দশ শ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক তত্ত্বের চতুর্থাংশ ;

(২) দশ শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের চতুর্থাংশ ;

(৩) দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বের চতুর্থাংশ ;

(৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার তৃতীয়াংশ ;

(৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংগঠন বিষয়ক শিক্ষার তৃতীয়াংশ ;

(৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ বিষয়ক শিক্ষার তৃতীয়াংশ ;

(৭) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার উনচল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের উনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের দ্বিতীয়াংশ।

ইহা ছাড়া, সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম-শিক্ষার্থিগণের প্রত্যেকের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ, তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শ্রেণীবিভাগানুসারে যে পনর শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, সেই পনর শ্রেণীর যে কোন দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠান দুই বৎসরে কার্য্যতঃ অভ্যাস করিতে হয়।

সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মের শিক্ষা দুই বৎসরকাল লাভ করিবার পর, শিক্ষার্থিগণকে তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগের দায়িত্বভার সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

উনিশ বৎসর-বয়স্ক যুবকগণের মধ্যে যাঁহারা সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মশিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হন এবং ঐ শিক্ষা পাইয়া থাকেন—তাঁহারা একুশ বৎসরে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার সক্ষমতা লাভ করেন এবং ঐ নিয়োগ পাইয়া থাকেন। এই যুবকগণের নিয়োগ পাওয়া মাত্র যোগ্যা তরুণীর সহিত বিবাহিত হইতে হয়। ইঁহাদিগের বিবাহ-ব্যবস্থার দায়িত্বভার অর্পিত থাকে সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে এবং সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের হস্তে।

সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের বিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরে যেরূপ ছয় শ্রেণীর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেইরূপ তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণকেও বিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরে ছয় শ্রেণীর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ প্রধানতঃ পনের শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। পনের শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের প্রত্যেকেরই ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার কোন না কোন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের কাহারও ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার কোন না কোন শ্রেণীর অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিতে হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মি-গণের বেতনের হার তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। বেতনহারের তারতম্যের একমাত্র কারণ কর্ম্মাভিজ্ঞতা-কালের তারতম্য।

সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মে আট বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম শিক্ষা লাভ করিবার উপযুক্ত তাহা প্রতি বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। সামাজিক কার্য্য পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে উপরোক্ত পরীক্ষাকার্য্যের দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়।

সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা

সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মের শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া পরীক্ষায় নির্দ্ধারিত হন, তাহাদিগকে সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যাহাদিগের বয়স উনত্রিশ বৎসরের কম অথবা যাঁহারা সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মে অন্ততঃ পক্ষে আট বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই, তাঁহারা কখনও সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মের শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন না।

সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম শিখিবার শিক্ষা-

কাল দুই বৎসর। সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগারে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম শিখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম-শিক্ষার শিক্ষকতা করিয়া থাকেন।

সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম-শিক্ষার্থিগণের কাহারও কোন বেতন দিতে হয় না। সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম-শিক্ষায় সর্ব্বসমেত নয় শ্রেণীর বিষয় অধ্যয়ন করান ও শেখান হয়, যথা :

(১) দশ শ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক তত্ত্বের পঞ্চমাংশ ;

(২) দশ শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের পঞ্চমাংশ ;

(৩) দশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বের পঞ্চমাংশ ;

(৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার চতুর্থাংশ ;

(৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার চতুর্থাংশ ;

(৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ-বিষয়ক শিক্ষার চতুর্থাংশ ;

(৭) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন প্রাচুর্য্য সাধন করিবার ঊনচল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের ঊনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের তৃতীয়াংশ ;

(৮) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অনুষ্ঠানের বার শ্রেণীর তত্ত্বের* প্রথমাংশ ;

(৯) মানুষের অলসও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের নয় শ্রেণীর তত্ত্বের† প্রথমাংশ।

ইহা ছাড়া, সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম-শিক্ষার্থিগণের প্রত্যেকের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শ্রেণীবিভাগানুসারে যে পনের শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, সেই পনের শ্রেণীর যে কোন দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠান দুই বৎসরে কার্য্যতঃ অভ্যাস করিতে হয়।

সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মের শিক্ষা দুই বৎসর কাল লাভ করিবার পর শিক্ষার্থিগণকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগের দায়িত্বভার সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ প্রধানতঃ পনের শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। পনের শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের প্রত্যেকেরই ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার কোন না কোন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিতে হয়।

সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের কাহারও ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার কোন না কোন শ্রেণীর অনুষ্ঠান ছাড়া, অন্য কোন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিতে হয় না।

---

* মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অনুষ্ঠানের বার শ্রেণীর তত্ত্বের নাম :

১। বিবাহতত্ত্ব,
২। গর্ভধারণযোগ্য রমণীগণের গর্ভাশয়ের স্বাস্থ্য-রক্ষা-তত্ত্ব,
৩। গর্ভিণী রমণীগণের গর্ভাশয়ের স্বাস্থ্য-বিষয়ক তত্ত্ব,
৪। এক বৎসরের অনধিকবয়স্ক শিশুপালনতত্ত্ব,
৫। এক বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক এবং পাঁচ বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক শিশুগণের পালন ও শিক্ষা-বিষয়ক তত্ত্ব,
৬। পাঁচ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কা এবং দশ বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের পালন ও শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব,
৭। পাঁচ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক এবং পনের বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের পালন ও শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব,
৮। একাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের ইচ্ছা-সংযম ও ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য-রক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব,
৯। নবম বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের ইচ্ছা-সংযম ও ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ক তত্ত্ব,
১০। বিবাহিত যুবক-যুবতীগণের বিবাহ-জীবনের দায়িত্ব পালন সম্বন্ধে শিক্ষকতা-বিষয়ক তত্ত্ব,
১১। চিকিৎসা কার্য্য-বিষয়ক তত্ত্ব,
১২। যাজ্ঞিক কার্য্য-বিষয়ক তত্ত্ব।

† মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের নয় শ্রেণীর তত্ত্বের নাম :

১। সামাজিক কার্য্যে চতুর্থশ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা-বিষয়ক তত্ত্ব,
২। সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা-বিষয়ক তত্ত্ব,
৩। সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা-বিষয়ক তত্ত্ব,
৪। রমণীগণের গৃহিণীপণা শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠান তত্ত্ব,
। সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা-বিষয়ক তত্ত্ব,
। গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব,
। গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব,
। দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব,
। কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের বেতনের হার তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। বেতনহারের তারতম্যের একমাত্র কারণ কর্ম্মাভিজ্ঞতা-কালের তারতম্য।

সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মে আট বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্ম-শিক্ষা করিবার উপযুক্ত, তাহা প্রতি বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে উপরোক্ত পরীক্ষা কার্য্যের দায়িত্বভার অর্পিত হয়।

সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্ম শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা

সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মের শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া পরীক্ষায় নির্দ্ধারিত হন, তাঁহাদিগকে সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যাঁহাদিগের বয়স উনচল্লিশ বৎসরের কম অথবা যাঁহারা সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মে অন্ততঃ পক্ষে আট বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই, তাঁহারা কখনও সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মের শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন না।

সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্ম শিখিবার শিক্ষাকাল দুই বৎসর। সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগারে প্রথম শ্রেণীর কর্ম্ম শিখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মশিক্ষার শিক্ষকতা করিয়া থাকেন।

সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মশিক্ষার্থিগণের কাহারও কোন বেতন দিতে হয় না। সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মশিক্ষায় সর্ব্বসমেত দশ-শ্রেণীর বিষয় অধ্যয়ন করান ও শেখান হয়, যথা :

(১) দশ-শ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক তত্ত্বের ষষ্ঠাংশ ;
(২) দশ-শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের ষষ্ঠাংশ ;
(৩) দশ-শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বের ষষ্ঠাংশ ;
(৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার পঞ্চমাংশ ;
(৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার পঞ্চমাংশ ;
(৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ-বিষয়ক শিক্ষার পঞ্চমাংশ ;
(৭) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার উনচল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের উনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের চতুর্থাংশ ;
(৮) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অনুষ্ঠানের বার শ্রেণীর তত্ত্বের দ্বিতীয়াংশ ;
(৯) মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্ম-ব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের নয় শ্রেণীর তত্ত্বের দ্বিতীয়াংশ ;
(১০) কার্য্যপরিচালনা-সভা-পরিচালনার নয় শ্রেণীর কার্য্য বিভাগ-বিষয়ক নয় শ্রেণীর তত্ত্বের প্রথমাংশ।

কার্য্যপরিচালনা-সভা-পরিচালনার নয় শ্রেণীর কার্য্য-বিভাগ বশতঃ নয় শ্রেণীর কার্য্যের নাম :

(১) বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
(২) বিধিনিষেধ-প্রণয়ন-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
(৩) সীমানা নির্দ্ধারণ-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
(৪) বিচার-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
(৫) কোষ-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
(৬) নিয়োগ ও নির্ব্বাচন-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
(৭) বালক-বালিকা এবং যুবক-যুবতীগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
(৮) কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
(৯) সর্ব্বসাধারণের ধনপ্রাচুর্য্য সাধন-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব।

ইহা ছাড়া সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মশিক্ষার্থিগণের প্রত্যেকের, প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের যে নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিতে হয়, সেই নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের যে কোন দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠান দুই বৎসরে কার্য্যতঃ অভ্যাস করিতে হয়।

সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মের শিক্ষা দুই বৎসরকাল লাভ করিবার পর, শিক্ষার্থিগণকে প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগের দায়িত্বভার সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ প্রধানতঃ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। নয় শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের প্রত্যেকেরই পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অথবা অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার কোন না কোন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিতে হয়। ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার কোন অনুষ্ঠান সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ কখনও সাধন করেন না।

প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের বেতনের হার তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। কর্ম্মাভিজ্ঞতা-কালের তারতম্যানুসারে বেতন-হারের তারতম্য নির্দ্ধারিত হয়।

সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মে আট বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষা করিবার উপযুক্ত, তাহা প্রতি বৎসর বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা করিয়া নির্দ্ধারণ করা হয়। সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে উপরোক্ত পরীক্ষা-কার্য্যের দায়িত্বভার অর্পিত হয়।

সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা

সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মের শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া পরীক্ষায় নির্দ্ধারিত হন, তাঁহাদিগকে সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যাঁহাদিগের বয়স ঊনপঞ্চাশ বৎসরের কম অথবা যাঁহারা সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মে অন্ততঃ পক্ষে আট বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই, তাঁহারা কখনও সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন না।

কোন্ কোন্ বিষয়ের বিদ্যা এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম-শিক্ষা করিবার অথবা সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মী হইবার উপযুক্ত হওয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথমতঃ, তরুণ শিক্ষা; দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্ম-শিক্ষা; তৃতীয়তঃ, সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মশিক্ষা; চতুর্থতঃ, সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মশিক্ষা; পঞ্চমতঃ, সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মশিক্ষা; ষষ্ঠতঃ, ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা; সপ্তমতঃ মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা; অষ্টমতঃ, অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা—সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারিলে, সামাজিক কার্য্য পরিচালনা সভার কর্ম্মশিক্ষা করিবার উপযুক্ত হওয়া যায়। উপরোক্ত আটটী বিষয়ের কোন একটীর অভাব হইলে, সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার শিক্ষা পর্য্যন্ত লাভ করার অধিকারী হওয়া যায়না।

সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মী হইতে পারিলে, শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। আজকালকার শাসক-শ্রেণীর তুলনায় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের শাসকশ্রেণী যে কত অধিক বিদ্বান ও অভিজ্ঞ হইয়া থাকেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য।

সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কার্য্য শিখিবার শিক্ষা-কাল দুই বৎসর।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিখাইবার শিক্ষাগার স্থাপিত হয়। গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ সামাজিক কার্য্য পরিচালনা-সভার কর্ম্মশিক্ষার শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষার্থিগণের শিক্ষাকালের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভা বহন করেন।

সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের কর্ম্মশিক্ষায়

সর্ব্বসমেত দশ শ্রেণীর বিষয় অধ্যয়ন করান ও শেখান হয়, যথা :

(১) দশ শ্রেণীর অভ্যাস বিষয়ক তত্ত্বের সপ্তমাংশ ;

(২) দশ শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের সপ্তমাংশ ;

(৩) দশ শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বের সপ্তমাংশ ;

(৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার ষষ্ঠাংশ ;

(৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার ষষ্ঠাংশ ;

(৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ-বিষয়ক শিক্ষার ষষ্ঠাংশ ;

(৭) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার উনচল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের উনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের পঞ্চমাংশ ;

(৮) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অনুষ্ঠানের বার শ্রেণীর তত্ত্বের তৃতীয়াংশ ;

(৯) মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের নয় শ্রেণীর তত্ত্বের তৃতীয়াংশ ;

(১০) কার্য্যপরিচালনা-সভা পরিচালনার নয় শ্রেণীর কার্য্য-বিভাগ-বিষয়ক নয় শ্রেণীর তত্ত্বের দ্বিতীয়াংশ ;

ইহা ছাড়া, সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষার্থিগণের প্রত্যেকের সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের যে চল্লিশ শ্রেণীর কার্য্যশাখার পরিচালনা করিতে হয়, সেই চল্লিশ শ্রেণীর কার্য্যশাখার যে কোন দুই শ্রেণীর কার্য্য-শাখার কার্য্য দুই বৎসরে ব্যবহারিকভাবে অভ্যাস করিতে হয়।

সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মের শিক্ষা দুই বৎসর লাভ করিবার পর শিক্ষার্থিগণকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগের দায়িত্বভার গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ কর্ম্মে অন্ততঃ পক্ষে আট বৎসর ব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিখিবার উপযুক্ত, তাহা প্রতি বৎসর বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা করিয়া নির্দ্ধারণ করা হয়। গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে উপরোক্ত পরীক্ষাকার্য্যের দায়িত্বভার অর্পিত হয়।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মশিক্ষা করিবার ব্যবস্থা

সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মের শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া পরীক্ষায় নির্দ্ধারিত হন, তাঁহাদিগকে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যাহাদিগের বয়স উনষাট বৎসরের কম অথবা যাঁহারা সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মে অন্ততঃপক্ষে আট বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই ; তাঁহারা কখনও গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মশিক্ষা করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন না।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিখিবার শিক্ষাকাল দুই বৎসর।

দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালা-সভার কর্ম্ম শিখাইবার শিক্ষাগার স্থাপিত হয়। দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষার শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষার্থীগণের শিক্ষাকালের সমস্ত ব্যয়ভার দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভা বহন করেন।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মশিক্ষায় সর্ব্বসমেত দশশ্রেণীর বিষয় অধ্যয়ন করান ও শেখান হয়, যথা :

(১) দশশ্রেণীর অভ্যাস বিষয়ক তত্ত্বের অষ্টমাংশ ;

(২) দশশ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের অষ্টমাংশ ;

(৩) দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্বের অষ্টমাংশ ;

(৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন বিষয়ক শিক্ষার সপ্তমাংশ ;

(৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন বিষয়ক শিক্ষার সপ্তমাংশ ;

(৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ বিষয়ক শিক্ষার সপ্তমাংশ ;

(৭) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার উনচল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের উনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের ষষ্ঠমাংশ ;

(৮) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অনুষ্ঠানের বার শ্রেণীর তত্ত্বের চতুর্থাংশ ;

(৯) মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের নয় শ্রেণীর তত্ত্বের চতুর্থাংশ ;

(১০) কার্য্য-পরিচালনা-সভাসমূহের পরিচালনার নয় শ্রেণীর কার্য্য-বিভাগ বিষয়ক নয় শ্রেণীর তত্ত্বের তৃতীয়াংশ।

ইহা ছাড়া গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম-শিক্ষার্থিগণের প্রত্যেকের গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের যে সাতায় শ্রেণীর কার্য্য-শাখার পরিচালনা করিতে হয়, সেই সাতায় শ্রেণীর কার্য্য-শাখার যে কোনও দুই শ্রেণীর কার্য্য-শাখার কার্য্য দুই বৎসর ব্যবহারিক ভাবে অভ্যাস করিতে হয়।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মের শিক্ষা দুই বৎসর লাভ করিবার পর শিক্ষার্থিগণকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগের দায়িত্বভার দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচলনা-সভার কর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ কর্ম্মে অন্ততঃ পক্ষে আট বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিখিবার উপযুক্ত, তাহা প্রতি বৎসর বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা করিয়া নির্দ্ধারণ করা হয়। দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে উপরোক্ত পরীক্ষা-কার্য্যের দায়িত্বভার অর্পিত হয়।

দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মশিক্ষা করিবার ব্যবস্থা

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা সভার-কর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মশিক্ষা করিবার উপযুক্ত বলিয়া পরীক্ষায় নির্দ্ধারিত হন, তাঁহাদিগকে দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

যাঁহাদিগের বয়স উনসত্তর বৎসরের কম অথবা যাঁহারা গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মে অন্ততঃপক্ষে আট বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই, তাঁহারা কখনও দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষা করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন না।

দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিখিবার শিক্ষাকাল দুই বৎসর।

কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিখাইবার শিক্ষাগার স্থাপিত হয়। কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মশিক্ষার শিক্ষকতা করিয়া থাকেন।

দেশস্থ কার্য্য পরিচালনা-সভার কর্ম্মশিক্ষার্থিগণের শিক্ষাকালের সমস্ত ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভা বহন করেন।

দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষার সর্ব্বসমেত দশ শ্রেণীর বিষয় অধ্যয়ন করান ও শেখান হয়, যথা :

(১) দশ শ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক তত্ত্বের নবমাংশ,

(২) দশ শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের নবমাংশ,

(৩) দশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বের নবমাংশ,

(৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার অষ্টমাংশ,

(৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার অষ্টমাংশ,

(৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ-বিষয়ক শিক্ষার অষ্টমাংশ,

(৭) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার উনচল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের উনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের সপ্তমাংশ ;

(৮) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অনুষ্ঠানের বার শ্রেণীর তত্ত্বের পঞ্চমাংশ ;

(৯) মনুষ্যের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্ম-ব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের নয় শ্রেণীর তত্ত্বের পঞ্চমাংশ ;

(১০) কার্য্য-পরিচালনা-সভাসমূহের পরিচালনার নয় শ্রেণীর কার্য্যবিভাগ-বিষয়ক নয় শ্রেণীর তত্ত্বের চতুর্থাংশ।

ইহা ছাড়া দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্ম-শিক্ষার্থিগণের প্রত্যেকের দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা সভার-কর্ম্মিগণের যে উনষাট শ্রেণীর কার্য্য-শাখার পরিচালনা করিতে হয়, সেই উনষাট শ্রেণীর কার্য্যশাখার যে কোন দুই শ্রেণীর কার্য্য শাখার কার্য্য দুই বৎসর ব্যবহারিকভাবে অভ্যাস করিতে হয়।

দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মের শিক্ষা দুই বৎসর লাভ করিবার পর শিক্ষার্থিগণকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগের দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ কর্ম্মে অন্ততঃপক্ষে আট বৎসর ব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিখিবার উপযুক্ত তাহা প্রতি বৎসর বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা করিয়া নির্দ্ধারণ করা হয়। কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে উপরোক্ত পরীক্ষাকার্য্যের দায়িত্ব ভার অর্পিত হয়

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা

দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষা করিবার উপযুক্ত বলিয়া পরীক্ষায় নির্দ্ধারিত হন, তাঁহাদিগকে কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

যাঁহাদিগের বয়স উনআশী বৎসরের কম অথবা যাঁহারা দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মে অন্ততঃ পক্ষে অষ্ট বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই, তাঁহারা কখনও কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষা করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন না।

কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিখিবার শিক্ষাকাল দুই বৎসর। কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার অধিষ্ঠানক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কার্য্য শিখাইবার শিক্ষাগার স্থাপিত হয়। কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার বিভাগীয় অমাত্যগণ এবং বিরাট পুরুষ কেন্দ্রীয় কার্য্য পরিচালনা সভার কর্ম্মশিক্ষার শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। সময় সময় যাঁহারা কেন্দ্রীয়কার্য্য পরিচালনা-সভার কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হন, তাঁহারাও ঐ শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার আনুষ্ঠানিক অমাত্যগণকে কখনও উপরোক্ত শিক্ষকতার কার্য্য করিতে দেওয়া হয় না। কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনার-সভার কর্ম্ম শিক্ষার্থীগণের শিক্ষাকালের সমস্ত ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভা বহন করেন।

কেন্দ্রীয় কার্য্য পরিচালনা-সভার কর্ম্ম শিক্ষায় সর্ব্বসমেত দশ শ্রেণীর বিষয় অধ্যয়ন করান ও শেখান হয় যথা :

(১) দশ শ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক তত্ত্বের দশমাংশ অথবা শেষাংশ ;

(২) দশ শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের দশমাংশ অথবা শেষাংশ ;

(৩) দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিষয়ক তত্ত্বের দশমাংশ অথবা শেষাংশ ;

(৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার নবমাংশ অথবা শেষাংশ ;

(৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার নবমাংশ অথবা শেষাংশ ;

(৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ-বিষয়ক শিক্ষার নবমাংশ অথবা শেষাংশ ;

(৭) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার উনচল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের উনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের অষ্টমাংশ অথবা শেষাংশ ;

(৮) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অনুষ্ঠানের বার শ্রেণীর তত্ত্বের ষষ্ঠাংশ অথবা শেষাংশ ;

(৯) মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্ম-ব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের নয় শ্রেণীর তত্ত্বের ষষ্ঠাংশ অথবা শেষাংশ ;

(১০) কার্য্যপরিচালনা-সভাসমূহের পরিচালনার নয় শ্রেণীর কার্য্যবিভাগ-বিষয়ক নয় শ্রেণীর তত্ত্বের পঞ্চমাংশ অথবা শেষাংশ।

ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্ম-শিক্ষার্থিগণের প্রত্যেকের, কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের যে একষট্টি শ্রেণীর কার্য্যশাখার পরিচালনা করিতে হয়, সেই একষট্টি শ্রেণীর কার্য্যশাখার যে কোন ছয় শ্রেণীর কার্য্যশাখার কার্য্য দুই বৎসর ব্যবহারিক ভাবে অভ্যাস করিতে হয়।

কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মের শিক্ষা দুই বৎসর কাল লাভ করিবার পর শিক্ষার্থিগণকে কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভায় কর্ম্মীরূপে নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগের দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

যে সমস্ত কারণ দূর করা অথবা নিবারণ করা কোন মানুষের ব্যক্তিগত চেষ্টায় অথবা ব্যক্তিগত পরিশ্রমে সম্ভব-যোগ্য নহে, সেই সমস্ত কারণের কোন কারণে আট শ্রেণীর কর্ম্মিগণের কোন শ্রেণীর কোন কর্ম্মী নিজ কর্ম্ম উপার্জ্জন করিবার কার্য্য করিতে অথবা উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইলে, গ্রামস্থ কেন্দ্রীয় কার্য্য-সভা তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার লইয়া থাকেন। কোন অস-চ্চরিত্রতা অথবা অবৈধ-কার্য্য বশতঃ কাহারও কার্য্যক্ষমতার অভাব হইলে অথবা উপার্জ্জনের অসামর্থ্য ঘটিলে তাঁহার ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার কোন কার্য্য-সভা গ্রহণ করেন না। পরন্তু, তিনি বিচারের যোগ্য হইয়া থাকেন এবং দণ্ড প্রাপ্ত হন।

যে সমস্ত কারণ দূর করা অথবা নিবারণ করা মানুষের ব্যক্তিগত সাধ্যের বহির্ভূত সেই সমস্ত কারণের কোন কারণে অথবা অন্য কোন কারণে আট শ্রেণীর কর্ম্মীর কোন শ্রেণীর কর্ম্মী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পোষ্য-বর্গের ভরণ পোষণের দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় কার্য্য-সভার লইতে হয়। ঐ পোষ্যবর্গের কেহ উপার্জ্জনক্ষম হইলে কেন্দ্রীয় কার্য্যসভার ঐ দায়িত্বভার থাকে না।

আট শ্রেণীর কর্ম্মীর কোন শ্রেণীর কোন কর্ম্মী একশত কুড়ি বৎসর বয়স অতিক্রম করিলে তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর লইতে হয়। অবসর লইবার পর নিজ নিজ কর্ম্মের শ্রেণী বিভাগানুসারে বিধিবদ্ধভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়।

অবসরপ্রাপ্তির পর ইঁহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার হস্তে ন্যস্ত হয়। অবসর প্রাপ্তির পর প্রত্যেক শ্রেণীর কর্ম্মী প্রাধানতঃ পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচনায় এবং অভ্যাসে জীবনাতিবাহিত করিয়া থাকেন।

কোন সামাজিক গ্রামে অথবা কোন কার্য্যপরিচালনা-সভায় কোন শ্রেণীর কোন কর্ম্মীর অভাব হইলে ঐ অভাব অন্য কোন গ্রাম হইতে কর্ম্মী আনয়ন করিয়া পূরণ করিতে হয়।

চারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের চারি শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভাসমূহের চারি শ্রেণীর কর্ম্মীর এবং সামাজিক গ্রামের তিন শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের চারি শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষা ও নিয়োগ উপরোক্ত বিধিবদ্ধভাবে চলিতে থাকিলে কোন প্রতিষ্ঠানেই সাধারণতঃ একদিকে যেমন কোন শ্রেণীর কর্ম্মীর অভাব হয় না, সেইরূপ আবার কোন্ শ্রেণীর কর্ম্মীর সংখ্যা কখনও প্রয়োজনাতিরিক্ত হয় না।

কোন প্রতিষ্ঠানে কোন শ্রেণীর কর্ম্মীর অভাব হইলে যে সমস্ত কর্ম্মীর উপর দায়িত্বভার অর্পিত থাকে, তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ঐ অভাব পূরণ করিতে হয়।

কোন শ্রেণীর কর্ম্মীর সংখ্যা কখনও প্রয়োজনাতিরিক্ত হইলে ঐ অতিরিক্ত কর্ম্মিগণকে অতিরিক্ত সহকারী কর্ম্মীরূপে নিযুক্ত করা হয়।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের কর্ম্মিগণের বৈশিষ্ট্য ছয় শ্রেণীর, যথা :

(১) যাহাতে শরীরস্থ তেজ ও রস কখনও অসম অথবা বিষম না হয় এবং সর্ব্বদা সম থাকে তাহা করিবার পদ্ধতি ইঁহাদিগকে শিখিতে ও অভ্যাস করিতে হয়। উহা শিখিতে ও অভ্যাস করিতে হয় বলিয়া কোনরূপ অতিরিক্ত উত্তেজনা অথবা অতিরিক্ত বিষাদ এই কর্ম্মিগণকে কখনও আক্রমণ করিতে পারে না ;

(২) উত্তেজনা ও বিষাদের দ্বারা কর্ম্মিগণ কখনও আক্রান্ত হন না বলিয়া একদিকে ইহাদিগের বিচারশক্তি সর্ব্বদাই নির্ভরযোগ্য থাকে এবং ইহারা কখনও ক্রোধের বশীভূত হন না। অন্যদিকে ইহারা কখনও অযথাভাবে

কাহারও প্রতি অনুরাগযুক্ত অথবা বিদ্বেষযুক্ত হইতে পারেন না এবং হন না।

(৩) অযথা ভাবে কাহারও প্রতি অনুরাগযুক্ত অথবা বিদ্বেষযুক্ত হইতে পারেন না এবং হন না বলিয়া কর্ম্মিগণ একদিকে সকলের প্রতি সমান ভাবে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারেন এবং হইয়া থাকেন। অন্যদিকে ইহারা কখনও কোনরূপ অভিমানের অথবা অহঙ্কারের বশীভূত হইতে পারেন না এবং হন না।

(৪) কর্ম্মিগণের মধ্যে কেহ কখনও কোনরূপ অভিমানের অথবা অহঙ্কারের বশীভূত হইতে পারেন না এবং হন না বলিয়া একদিকে কোন কর্ম্মী কাহারও মনে অযথাভাবে কোনরূপ আঘাত দিতে পারেন না এবং দেন না এবং সকলেরই মনের কথায় সমান ভাবে কান দিয়া থাকেন। অন্যদিকে ইহারা কখনও কোনরূপ বৈকৃতিক ইচ্ছার বশীভূত হইতে পারেন না এবং হন না।

(৫) কর্ম্মিগণের মধ্যে কেহ কখনও কোনরূপ বৈকৃতিক ইচ্ছার বশীভূত হইতে পারেন না এবং হন না বলিয়া ইহাদিগের দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম শক্তি কখনও ভগ্ন হয় না। পরন্তু সর্ব্বদাই অটুট থাকে। ইহাদিগকে কোনরূপ অস্বাস্থ্য অথবা অশান্তির জন্য কখনও দায়িত্বভার নির্ব্বাহের কার্য্য হইতে ছুটি অথবা অবসর লইতে হয় না।

(৬) মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান যুগপৎ সাধন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয় সেই তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠানের অন্তভুর্ক্ত যত প্রত্যন্তর শ্রেণীর অনুষ্ঠান সম্পাদিত করিবার ব্যবস্থা থাকে, এক একটী করিয়া ষোল বৎসর ধরিয়া প্রায়শঃ তাহার প্রত্যেকটীর দায়িত্বভার ব্যবহারতঃ নির্ব্বাহ করিয়া এবং যাহা কিছু মানুষের জ্ঞাতব্য তাহা অধ্যয়ন করিবার পর—অভ্যস্ত হইবার পর—কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে হয়। এই ব্যবস্থার ফলে যাঁহারা কোন কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মী (অর্থাৎ শাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত) হন তাঁহারা প্রত্যেকেই একদিকে কাঁচামাল উৎপাদনের অনুষ্ঠান, শিল্পানুষ্ঠান, কারুকার্য্যের অনুষ্ঠান, বাণিজ্যানুষ্ঠান, কর্ম্মীশিক্ষানুষ্ঠান, তরুণ-তরুণীর শিক্ষানুষ্ঠান, বালক-বালিকার শিক্ষানুষ্ঠান, শিশুগণের পালন ও শিক্ষানুষ্ঠান সমূহের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়া থাকেন; অন্যদিকে মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইলে অথবা মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে সমস্ত বিজ্ঞান জানিবার প্রয়োজন হয় এবং যে সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিবার প্রয়োজন হয় তাঁহার প্রত্যেকটী জানিতে ও অভ্যাস করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের কর্ম্মিগণের উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যবশতঃ মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয় সেই সমস্ত অনুষ্ঠান স্বতঃই সাধিত হইয়া থাকে এবং সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্বতঃই পরিচালিত হইয়া থাকে। ফলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছাও সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে বর্ত্তমানে যাঁহারা ছোট বড় ভাবে শাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত—তাঁহাদিগের বৈশিষ্ট্য কি কি তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

বর্ত্তমানে যাঁহারা ছোট বড় ভাবে শাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তাঁহাদিগের কাহাকেও কখনও শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা যে সঙ্কেতে প্রতিরোধ করা যায় সেই সঙ্কেত শেখান অথবা অভ্যাস করান হয় না।

ইহাদিগের প্রায় প্রত্যেকেই কখনও উত্তেজনার, কখনও বা বিষাদের আবার, কখনও বা ঔদাসিন্যে নিমজ্জিত থাকেন। ইহাদিগের প্রায় প্রত্যেকেই মনগড়া সংস্কার বশতঃ কাহারও প্রতি অযথা অনুরাগযুক্ত আর কাহারও প্রতি অযথা বিদ্বেষযুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদিগের অনুরাগ ও বিদ্বেষের কোন যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ ইহারা দিতে পারেন না। মানুষের দুঃখ দূর করিতে হইলে যে সমস্ত বিজ্ঞান জানা এবং যে সমস্ত বিদ্যায় অভ্যস্ত হওয়া অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় সেই সমস্ত বিজ্ঞান ও বিদ্যা সম্বন্ধে ইহাদের প্রায় প্রত্যেকেই এক একটী অকাট মুর্খ অথচ ইহাদিগের প্রায় প্রত্যেকেই দম্ভ ও অহঙ্কারের এক একটী প্রতিমূর্ত্তি। জনসাধারণের মধ্যে

যাঁহারা আত্মসম্মান সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সজাগ তাঁহারা আজকালকার শাসক সম্প্রদায়ের ছোট বড় কাহারও সহিত কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন না। আজকালকার শাসক সম্প্রদায়ের প্রায় প্রত্যেকেই মানুষের মনে আঘাত প্রদান করিতে কোন সংস্কার অথবা দুঃখ অনুভব করেন না। ইহাদিগের অধিকাংশই পানদোষযুক্ত, যৌননিষ্ঠাহীন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকেন। প্রকৃতি ও বিকৃতি কাহাকে বলে তাহা ইহাদিগের না জানা থাকায় ইহাদিগের প্রায় প্রত্যেকের প্রত্যেক ইচ্ছা বিকৃতি মূলক ও বিকৃতি সাধক হইয়া থাকে। উপরোক্ত উচ্ছৃঙ্খলতা ও বৈকৃতিক ইচ্ছা বশতঃ ইহাদিগের অনেকেরই শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য প্রায়শঃ নির্ভরযোগ্য হয় না। কাঁচামাল উৎপাদনের অনুষ্ঠান অথবা শিল্পানুষ্ঠান অথবা কারুকার্য্যের অনুষ্ঠান অথবা বাণিজ্যানুষ্ঠান অথবা শিক্ষানুষ্ঠানের কোন অভিজ্ঞতা সাক্ষাৎভাবে লাভ না করিয়া আজকাল প্রায় প্রত্যেক দেশেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাসক ও বিচারক হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে, জনসাধারণের দুঃখ দূর করা অথবা সুবিচার করা যখন শাসন সম্প্রদায়ের অথবা বিচারক সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হয়, তখন কাঁচামাল উৎপাদনের অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রত্যেকটীর সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়া শাসক ও বিচারক সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

যখন উপরোক্তভাবের অনুপযুক্ত লোক সমূহের হস্তে জনসাধারণের শাসনভার অথবা বিচার ভার অর্পিত হয় তখন সর্ব্বব্যাপী অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অভাব এবং মারামারি অপরিহার্য্য হইয়া থাকে এবং জগতের সর্ব্বত্র আজকাল হইতেছেও তাহাই। [ক্রমশঃ

'লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

আষাঢ়—১৩৫১

১২শ বর্ষ, ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা

উপন্যাসের উদ্ভব ও তৎকালীন বঙ্গসমাজের পটভূমিকা

ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

অষ্টাদশ শতকের শেষ হইতে ইংরাজী শিক্ষা-সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মনে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালীর পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগের বিচ্ছিন্ন ও অনিয়মিত, স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত স্ফুরণকে সুসংবদ্ধ, কেন্দ্র-সংহত রূপ দিল। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী-সমাজে একটা অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন চলিতেছিল। রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথম ইংরেজের সহিত সম্পর্ককে ব্যবসায়িক বা অর্থ-নৈতিক ভিত্তি হইতে বুদ্ধি ও মনন-শক্তিগত ভিত্তিতে উন্নয়ন করিয়া এক বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তনের সূচনা করিলেন। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, বাঙ্গালী কেবল ইংরেজদের বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য বিস্তারের বাহন মাত্র নহে—ইংরেজের শিক্ষা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ তিনিই সর্ব্বপ্রথম আমাদের সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনায় প্রয়োগ করিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও আচারকে একদিকে খৃষ্টান মিশনারীদের অযথা আক্রমণ ও অপরদিকে গোঁড়া রক্ষণশীলদের অন্ধ ও মূঢ় বাৎসল্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে মনোভাব অবলম্বন করিলেন, যে স্বাধীন চিন্তা, দৃঢ় যুক্তিবাদ ও তীক্ষ্ণ বাস্তববোধের প্রয়োগ করিলেন, তাহাতেই বঙ্গদেশের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ চিরকালের জন্য নিরূপিত হইল।

এই বাদ-প্রতিবাদের কোলাহল-মুখর, উত্তেজিত প্রতিবেশে উপন্যাসের জন্ম হইল। দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া অনুসৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান ও আচার-ব্যবহার যখন আক্রমণের বিষয়ীভূত হয়, তখন আলোচনার ধারা যুক্তিতর্কের মন্থর প্রণালী ছাড়াইয়া হৃদয়াবেগের বেগমান প্রবাহের সহিত সংযুক্ত হয়—তথ্যবিচার সাহিত্যপদবীতে উন্নীত হয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষের সজ্জিত দীপ্তি ও শাণিত তীক্ষ্ণতা এই মানস উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ যুক্তি-তর্কের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যালোকস্পৃষ্ট বর্ষাফলকের মত ঝলকিত হয়। এই শ্লেষপ্রধান মনোভাব ক্রমশঃ অবশ্য প্রয়োজনীয়ের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া নিরপেক্ষভাবে সমস্ত সমাজ-জীবনের উপর বিস্তৃত হয়। সমাজ-জীবনের ব্যাধি-বিকার, আতিশয্য, অসঙ্গতির প্রতি মন সহসা সচেতন হইয়া উঠে—এই নব জাগ্রত চেতনার জন্য বলি খুঁজিয়া বেড়ায়। সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার শ্লেষাত্মক পর্য্যবেক্ষণ ও ইহার হাস্যোদ্দীপক বিসদৃশ দিকগুলির ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন উপন্যাসরচনার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর।

দুই

এই সময়ে সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা (১৮১৮) কিছুদিন ধরিয়া মনোমধ্যে সঞ্চিত শ্লেষ-প্রবণতাকে অভিব্যক্তির

ক্ষেত্র ও প্রেরণা যোগাইল। সংবাদপত্রের সহিত উপন্যাসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উপন্যাসের প্রথম খসড়া সংবাদপত্রের স্তম্ভেই রচিত হইয়াছে। খবরের কাগজের সম্পাদক পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য দেশের মধ্যে যাহা কিছু বিচিত্র, কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটিতেছে তাহা সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে সচেষ্ট থাকেন। নানা রকমের উড়ো পাখী, আজগুবি খবর, অপ্রত্যাশিত ও চমকপ্রদ ঘটনা, যাহা মনকে নাড়া দেয় ও হাস্য-কৌতুকের সৃষ্টি করে—এই সাংবাদিক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় বাসা বাঁধে। নানাবিধ সামাজিক সমস্যার লঘু সরস আলোচনা নানা বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষ, প্রতিপক্ষের কুৎসা রটনা ও তাহার দুর্নীতির নানা মুখরোচক উদাহরণ ইহাকে বাস্তব জীবনের সত্য ও উপভোগ্য প্রতিচ্ছবির মর্য্যাদা দেয়। সংবাদপত্রের দর্পণে সমাজ নিজ বহিরাবয়ব ও মনোবাসনার নিখুঁত প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়।

বাস্তব জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া, খনির ধারাবাহিকতা ও শিল্পী-মনের সচেতন উদ্দেশ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, এক সম্পূর্ণ অন্তঃ-সঙ্গতি-বিশিষ্ট কাল্পনিক চিত্রে সংহত হয়। ইহাই সজ্ঞান উপন্যাসসৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর। শ্রেণীবিশেষের জীবনের বিচ্ছিন্ন অধ্যায়গুলি কিরূপে কাল্পনিক চরিত্রের সমগ্রতায় পরিণত হইল, তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত পাই ১৮২১ সালে সমাচারদর্পণে 'বাবু' চরিত্র আলোচনায়। সম্পাদক তাঁহার কাগজের দুইটী সংখ্যায় ২৪শে ফেব্রুয়ারী ও ৯ই জুন ১৮২১—বড় লোকের আদুরে গোপাল, শিক্ষা-চরিত্রহীন ছেলের জীবনযাত্রা ও মতিগতির একটী সংক্ষিপ্ত ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা দিয়াছেন। এই তিলকচন্দ্র উপন্যাস-জগতের প্রায় আধুনিককাল পর্য্যন্ত প্রসারিত বাবু বংশের আদিপুরুষ। ইনি মোসাহেব মণ্ডলে পরিবেষ্টিত ও আত্মাভিমানপুষ্ট হইয়া, বাহ্য আড়ম্বরে অন্তরের অন্তঃসার-শূন্যতা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া নানা হাস্যকর অসঙ্গতির সৃষ্টি করিয়াছেন ও লেখকের বিদ্রূপ-বাণবিদ্ধ হইয়া পাঠকের শিক্ষাবিধান ও মনোরঞ্জনের দ্বৈত উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হইয়াছেন। এই আদি 'বাবুর' চরিত্রে দুঃশীলতা ও ব্যসন-বিলাস অপেক্ষা মোসাহেব-মহলে প্রতিপত্তি বজায় রাখার প্রচেষ্টার প্রতি বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে।

তিন

ইহার দুই বৎসর পরে ১৮২৩ সালে প্রকাশিত প্রমথ নাথ শর্ম্মার রচিত 'নব-বাবু-বিলাস' প্রথম উপন্যাসেই গৌরব দাবী করে। প্রমথ নাথ শর্ম্মা "সমাচার চন্দ্রিকা" ও "সংবাদ-কৌমুদী" পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক ও নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজের মুখপাত্র ধর্ম্মসভার কার্য্যাধ্যক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। সম্ভবতঃ ইনিই সমাচার-দর্পণে প্রকাশিত তিলকচন্দ্রের জীবনকাহিনীর সঙ্কলয়িতা। এই অনুমান সত্য হইলে "নববাবু-বিলাস" "সমাচার-দর্পণের" "বাবু" কাহিনীর পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—প্রথম মৌলিক পরিকল্পনার অপেক্ষাকৃত পল্লবিত বিস্তার। ইহাতে "বাবু" জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতাচার, খেয়ালী অস্থিরমতিত্ব, সৌজন্য ও সুরুচির অভাব, বাল্য-কালে হিতকর শাসন-সংযমের উল্লঙ্ঘন ও পরিণামে দুর্গতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু লেখকের প্রধান লক্ষ্য ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রস্ফূরণ নহে, সমস্ত সমাজ-প্রতিবেশের চিত্রাঙ্কন। বাবু অপেক্ষা যে সমাজে বাবুর উদ্ভব তাহার প্রতিই তাঁহার মনোযোগ বেশী।

এই সময়ের কলিকাতা-সমাজে যে বিলাস ও ব্যভি-চারের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার যে খুব প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল, তাহা মনে হয় না। যে 'বাবু' এই সমাজের বিশিষ্ট সৃষ্টি, তিনি ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ ধার ধারেন না। 'নববাবু-বিলাসের' ৩৫ বৎসর পরে রচিত "আলালের ঘরে দুলালে'র (১৮৫৭) নায়ক মতিলাল শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে কিছুদিন যাতায়াত করিয়াছিল, কিন্তু কয়েকটা ইংরেজী শব্দ ও কিছু ইংরেজী হাব-ভাব ও চাল-চলন শিক্ষা ব্যতীত তাহার বিদ্যা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। কাজেই ইহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ঠিক দায়ী করা যায় না। এই দিক দিয়া ইহাদের সহিত পরবর্তী যুগের হিন্দু কলেজে শিক্ষিত ইংরেজী আচার-ব্যবহারের সত্যকার অনুরাগী, সমাজবিদ্রোহী ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত, নিজ মতবাদের জন্য দুঃখ-

বরণে প্রস্তুত দৃঢ়চেতা যুবকসম্প্রদায়ের প্রভেদ। মতিলাল ও মাইকেল মধুসূদনের মুখে হয়ত একই রকমের বুলি, তাহাদের বিলাতী খানাপিনা ও সুরার দিকে সাধারণ প্রবণতা—কিন্তু মানষ আদর্শের দিক দিয়া ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়।

আসল কথা, বাবু-সমাজের অমিতাচারের জন্য দায়ী ইংরেজী শিক্ষা বা নৈতিক আদর্শ নহে, ইংরেজী বাণিজ্যের প্রসার। এই যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের সহিত প্রথম সম্পর্ক স্থাপনের ফলে দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটা ক্ষণস্থায়ী জোয়ার আসিয়াছিল। বাঙ্গালী বেনিয়ান এদেশে ইংরেজের পণ্যদ্রব্য প্রচলিত করিয়া ও ইংরেজের বাণিজ্য বিস্তারের জন্য কাঁচামাল যোগাইয়া তাহাদের বিপুল লাভের কিছু কিছু অংশ পাইতেছিল। এই অপ্রত্যাশিত ধনাগমের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া এই বৈদেশিক প্রসাদপুষ্ট ব্যক্তিগুলি এক নূতন অভিজাত সম্প্রদায় গঠন করিতেছিল। কেহ দালালি করিয়া, কেহ নিমক মহালের ইজারা লইয়া, কেহ বা ইংরেজের রাজস্ব সংগ্রহ-ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ইংরেজের সৌভাগ্যলক্ষ্মী যে স্বর্ণপদ্মের উপর আসীনা হইয়াছিলেন, তাহার দুই একটা পাঁপড়ি নিজ ধনভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেছিলেন। এই সময় কলিকাতার বনিয়াদি পরিবারবর্গের অভ্যুদয়ের প্রথম ভিত্তি স্থাপন হইল। মহানগরী সমুদ্রগর্ভস্থিতা ঐশ্বর্য্যদেবীর ন্যায় আকাশস্পর্শী অট্টালিকা-শ্রেণীতে নিজ সমৃদ্ধির দীপ্তি প্রতিফলিত করিয়া জন্মলাভ করিল। সমস্ত সহরের আকাশ-বাতাসে একটা আনন্দ ও উত্তেজনার তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। উচ্ছ্বসিত প্রাণস্রোত, আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-ব্যসন, ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রহসনের নানা উদ্ভাবনে, চড়কের গাজনে, বারোয়ারী উৎসবে কবির লড়াই-এ, সুরা-সঙ্গীতের উন্মত্ত ভোগলিপ্সায়—বিজয় অভিযানে নির্গত হইল। অখ্যাত ক্ষুদ্র পল্লী-সমষ্টি রাজধানীতে রূপান্তরিত হইয়া রূপের উজ্জ্বলতায়, লক্ষ লক্ষ নবাগত জনসঙ্ঘের সম্মিলিত হৃৎস্পন্দনে, বিরাট ঐক্যের সচেতনতায় যেন নব-যৌবনের দৃপ্ত শক্তিমত্তায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই আশা ও সীমাহীন সম্ভাবনার পুলকোৎফুল্ল প্রতিবেশে বাবুর উদ্ভব। সে যেন জীবনোৎসবের এই ফেনিল, মত্ত বিক্ষোভের প্রথম স্বল্পায়ুঃ রঙ্গীণ বুদ্বুদ। আর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই উচ্ছ্বাস অসংস্কৃত জীবন-প্রবাহের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির উগ্র উন্মাদনা, বিদ্রোহী নীতিবোধ ও নিগূঢ় সৌন্দর্য্যানুভূতি যুক্ত হইয়া এক উচ্চতর সৃষ্টির বীজ বপন করিবে। বাবুর স্থূল ভোগবিলাস কবি ও সমাজ-সংস্কারকের সূক্ষ্মতর জীবনরসোপভোগে পরিবর্ত্তিত হইবে। 'নববাবু-বিলাস' (১৮২৩), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৭) ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমপ্যাঁচার নক্সা' (১৮৬২), এই তিনখানি উপন্যাসে বাবু চরিত্র ও বাবু-প্রসূতি সমাজ-জীবন আলোচিত হইয়াছে। 'নববাবু-বিলাসের' কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ঠিক উপন্যাস নহে—নব-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নগরীর উচ্ছৃঙ্খল অসংযত আমোদ-উৎসবের বিচ্ছিন্ন খণ্ড-চিত্রের ও সরস ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার শিথিল-গ্রথিত সমষ্টি। ঐশ্বর্য্যের নূতন জোয়ারে নাগরিক জীবন-যাত্রায় যে সমস্ত উদ্ভট অসঙ্গতি ও রুচিবিকারের দৃষ্টান্ত, স্ফূর্ত্তি-ইয়ার্কির নূতন নূতন প্রকরণ, উপভোগের যে মত্ত আতিশয্য ভাসিয়া আসিয়াছে, লেখক তাহাদের উপর তীব্র স্নেহপূর্ণ কশাঘাত করিয়া নিজ পর্য্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য ও ভাঁড়ামির পর্য্যায়ভুক্ত অমার্জ্জিত রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিশৃঙ্খল, প্রাণবেগ-চঞ্চল দৃশ্যগুলির মধ্যে কোন ব্যক্তিত্বসমন্বিত চরিত্র সৃষ্ট হয় নাই—সুতরাং উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ চরিত্র-চিত্রণেরই ইহাতে অভাব।

চার

এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলালই' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সমধিক উপন্যাসের লক্ষণবিশিষ্ট। এই শ্রেষ্ঠত্ব—বাস্তব বর্ণনা, চরিত্র-চিত্রণ ও মননশীলতা—সমস্ত দিকেই পরিস্ফুট। ইহাতে যে বাস্তব প্রতিবেশের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা 'নববাবু-বিলাস' ও 'হুতোমের' সঙ্গে তুলনায় গভীরতর স্তরের। প্রথমোক্ত দুইটী গ্রন্থেই কেবল হাল্কা স্ফূর্ত্তির উপযোগী পটভূমিকা—গাজনতলা, কবির আসর, রাস্তার জনপ্রবাহ ও বেশ্যালয়—বর্ণিত হইয়াছে। 'আলালে'র প্রতিবেশ আরও

পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল, জীবনের নানামুখীনতাকে অবলম্বন করিয়া রচিত। ইহাতে কেবল রাস্তাঘাটের কর্ম্মব্যস্ততা ও সজীব চাঞ্চল্য নাই, আছে পারিবারিক জীবনের শান্ত ও দৃঢ়মূল কেন্দ্রিকতা, আইন-আদালতের কৌতূহল-পূর্ণ কার্য্যপ্রণালী, নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসনের যে সুকল্পিত বহির্ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ব্যক্তিজীবনের গতিছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে তাহার সম্পূর্ণ চিত্র। চরিত্রাঙ্কণে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব আরও সুপ্রকট। মানুষ যে ঘটনা-প্রবাহে ভাসমান খড়কুটা মাত্র নয়, তাহার ব্যক্তিত্ব যে নদীতরঙ্গ-প্রহত পর্ব্বতের ন্যায় কম্পিত হইলেও স্থানভ্রষ্ট হয় না—ইহাতে চরিত্র-চিত্রণের এই আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে। বাবুরাম বাবু নিজে, তাঁহার গৃহিণী ও কন্যাদ্বয়, মতিলাল ও তাহার দুষ্ক্রিয়ার সহযোগীবৃন্দ—ইহারা সকলেই ঘটনা-তরঙ্গে গা ভাসাইলেও এই তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত জলকণা মাত্র নহে—ইহারা জীবন্ত, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ, 'বাবুর' ন্যায় চর্ম্মের ক্ষীণ আবরণে ঢাকা কঙ্কাল শ্রেণীর প্রতিনিধি মাত্র নহে। তাছাড়া, লেখকের পরিকল্পনার এমন একটা সাবলীল সজীবতা আছে, যাহাতে ঘটনার সহিত পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলি আরও অধিক পরিমাণে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঠকচাচা উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত সৃষ্টি; কূটকৌশল ও স্তোকবাক্যে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতা উহার মধ্যে এমন চমৎকার ভাবে সমন্বিত হইয়াছে যে, পরবর্ত্তী উন্নত শ্রেণীর উপন্যাসেও ঠিক এইরূপ সজীব চরিত্র মিলে না। বেচারাম, বেণী, বক্রেশ্বর, বাঞ্ছারাম প্রভৃতি চরিত্রও—কেহ বা অনুনাসিক উচ্চারণে কেহ বা সঙ্গীত প্রিয়তায়, কেহ বা কোন বিশেষ বাক্য-ভঙ্গীর পুনরাবৃত্তিতে স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জন করিয়াছে। এই বাহ্য বৈশিষ্ট্যের উপর ঝোঁক ও ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন-প্রবণতায় (caricature) প্যারীচাঁদ অনেকটা ডিকেন্সের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। বরং রামলাল ও বরদাবাবু চরিত্র-স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়া ম্লান ও বিশেষত্ব-বর্জ্জিত কতকগুলি সদ্‌গুণের যান্ত্রিক সমষ্টি মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। কৃত্রিম সাহিত্যরীতি বর্জ্জনে ও কথ্য ভাষার সরস ও তীক্ষ্ণাগ্র প্রয়োগে 'আলালের' বর্ণনা ও চরিত্রাঙ্কণ আরও বাস্তবরস-সমৃদ্ধ হইয়াছে।

এই গ্রন্থে মননশীলতার পরিচয় পাই ইংরেজী সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ, অপক্ষপাত মনোভাবে, ইহার কুফলের প্রতি অন্ধ না হইয়া ইহার সুফলের সম্বন্ধে সচেতনতায়, লেখকের সমন্বয়কারী, চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে। রামলাল ও বরদাবাবু এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির শ্লাঘ্যতম ফল; তাহাদের উদার ক্ষমাশীলতা, পরদুঃখকাতরতা ও উন্নত নৈতিক আদর্শ, সনাতন ধর্ম্ম-সংস্কৃতির বিরোধী না হইলেও, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে যে সামাজিক শিথিলতা ও উন্মার্গগামী হইবার প্রচুরতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। গ্রন্থ-মধ্যে তত্ত্বালোচনার প্রাচুর্য্য—যদিও ইহা অনেকস্থলে অপ্রাসঙ্গিক ও ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের পরিপন্থী—লেখকের চিন্তাশীলতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দেয়। 'নববাবু-বিলাস' হইতে ৩৫ বৎসরের ব্যবধানে 'আলালের ঘরের দুলালে' প্রথম সম্পূর্ণাবয়ব উপন্যাসের বিবর্ত্তন বহুদিনের প্রত্যাশিত সম্ভাবনাকে সঠিক রূপ দিয়াছে। উপন্যাস হিসাবে ইহা খুব উচ্চশ্রেণীর নহে—অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত ও গভীর আলোড়ন ইহাতে নাই। মতিলালের অনুশোচনা ও সংশোধন বহির্ঘটনার চাপে, অন্তরের প্রেরণায় নহে। তথাপি 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস-সাহিত্যের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া প্রথম অনিশ্চয়তাত্মক যুগের অবসান ও আসন্ন পূর্ণ পরিণতির সূচনা ঘোষণা করে। ইহার মাত্র ৮ বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) হইতে উপন্যাসের মহিমান্বিত প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল যৌবনের

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তিন

আলকাপের আসর যখন ভাঙল, রাত তখন বারোটার কাছাকাছি। বারোয়ারী তলায় একখানা চালাঘরেই ওদের থাকবার জায়গা। ঘরখানার তিনদিক খোলা, পেছনে একটা মাটির নোনাধরা দেওয়াল। হাটের দিনে এখানে মরিচের দোকান বসে, অন্যসময় রাতচরা গরু মহিষ, কখনো বা গাড়ির বলদ স্বেচ্ছাসুখে রোমন্থন করে' রাত কাটায়। রাশি রাশি শুকনো গোবর ও গুব্‌রে পোকার ওপর চাটাই আর চট বিছিয়ে আলকাপ দলের থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছে। অবশ্য এ ব্যবস্থায় ওরা আপত্তি করেনা। বাংলা দেশের নিতান্ত অজ পাড়াগাঁ-গুলিতে এর চাইতে ভালো অভ্যর্থনা আশা করাই অসঙ্গত।

হাটের চৌহাদ্দি পেরিয়ে চারদিকে ঢালু মাঠ। শ্রাবণের ভরা বর্ষাতে মাঠগুলো প্রায় সবই তলিয়ে গেছে। আকাশ ভরা তারা ঝকমক করছে কালো জলের ওপর—হঠাৎ দেখলে সামনে যেন দুলে উঠছে সমুদ্র আর দূরে দূরে তালের বনের নীচে ঘুমন্ত গ্রামগুলো এক একটা দ্বীপ মাত্র। ছাগলের মতো গলা কাঁপিয়ে সোণা ব্যাং ডাকছে, অন্ধকারে উড়ছে অসংখ্য পোকা, আধ ডোবা শ্যাওড়া গাছের মাথায় রাশি রাশি আলোর ফুলের মতো জোনাকি জ্বলছে। শুধু একদিকে সরকারী রাস্তা, তার ওপরে বর্ষার জল ওঠেনি, বাঁধের তলা দিয়ে হু হু করে ফেণিল আর প্রখর স্রোত নেমে যাচ্ছে। কারা যেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে কোঁচ দিয়ে সেই বাঁধের নীচে মাছ মারবার চেষ্টা করছে, আর টিমটিমে আলো দুলিয়ে তিন চারখানা গোরুর গাড়ী চলেছে কুমারদহের দিকে—বোধ করি সোণাদীঘির মেলায়।

গায়ে কাপড়ের খুঁটটা ভালো করে জড়িয়ে ব্রজহরি বললে, উহুহু বড্ড শীত ধরেছে রে। এক ছিলিম তামাক সাজ্‌না রে ভূষ্‌ণা।

ভূষণ চটের বিছানায় লম্বা হয়ে পড়েছিল। বললে, এখন আর আমি উঠতে পারব না খুড়ো, সারাদিন নাচা-নাচি করে হাতে পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। তা ছাড়া অন্ধকারে কে এখন হুঁকো-কল্‌কে খুঁজে বেড়াবে। তার চে একটা বিড়ি ধরাও বরং।

—আচ্ছা দে, বিড়িই দে।

উবু হয়ে বসে ব্রজহরি বিড়ি ধরাল একটা।

—মাইরি, এ কি ল্যাঠায় পড়লুম বল্‌ দেখি ?

ভূষণার শীত করছিল। ছেঁড়া চাদরের ফাঁকে ঠাণ্ডা আটকায় না—মাঠের ভিজে বাতাস যেন মাঘের হাওয়ার মতো তীব্র আর তীক্ষ্ণ হয়ে এসে হাড়ের ভেতরটা অবধি কাঁপিয়ে তুলছিল। আরো ঘন হয়ে হাঁটুটাকে বুকের কাছ অবধি টেনে নিয়ে ভূষণ বললে, হাঁ, ল্যাঠা বইকি। আচ্ছা, সেই গানটা তোমার মনে আছে খুড়ো ?—

'শিবো হে, এ কি ল্যাঠাত্‌ ফেলিলে হামারে হে,
ভাং-ধুতুরা তুমি খিবা,
কুচনীর বাড়ীত্‌ যিবা,
কেমনে হে পূজিব তুমহারে হে—'

বিরক্ত কণ্ঠে ব্রজহরি বললে, থাম বাপু, ইয়ার্কী এখন ভালো লাগে না। ব্যাপারখানা বুঝছিস তো ? এক কোণে শুয়ে কালীবিলাস কুণ্ডু কাঁপছিল। কালীবিলাস আলকাপের দলে পনেরো টাকার হার্মোনিয়ামটা বাজায়, গৌরবে বলে, আর্গিন। বয়স হবে পঞ্চাশের কাছা-কাছি। যৌবনের প্রথম দিকটায় বাড়ী থেকে পালিয়ে কিছুদিন বরিশালের চারণ মুকুন্দ দাসের সাঁকরেদী করেছিল। সেই সময় ফরিদপুরের নড়িয়াতে 'যে ইংরাজে প্রাণের ভাইদের হত্যা করল পাঞ্জাবে, সে ইংরাজের মধুর

রবে ভোলে কোন্ পিচাশে' (পূর্ব্ববঙ্গে পিশাচকে পিচাশ বলা হয়) গানটি গেয়ে তিন মাস জেল খেটে এসেছিল পর্য্যন্ত। এই জন্য দলে তথা সমাজেও তার কিছু প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে দেশের জন্যে 'সহীদ' হতে গিয়েও জেল থেকে কালীবিলাস গাঁজা খাওয়া শিখে এল। দীর্ঘ এবং একনিষ্ঠ গঞ্জিকা সেবনের ফলে দু'বছর থেকে কাশি দেখা দিয়েছে। আজকাল মাঝে মাঝে রক্ত আসে, কাশির আস্বাদটা অস্বাভাবিক মিষ্টি বলে মনে হয়।

সমস্ত মাথাটা ভার, একটু জ্বরও হয়েছে যেন। একটা ছেঁড়া র‍্যাপার বারো মাস ত্রিশ দিনই সঙ্গে থাকে, সেইটেই ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে গম্ভীর গলায় কালীবিলাস বললে, টাকাই সব নয়। আগে কথা রাখতে হয়।

ব্রজহরি বললে, কিন্তু এক এক রাত কুড়ি টাকা করে। আলকাপ তো আলকাপ, ওর সঙ্গে আর পাঁচটা টাকা জুড়ে দিলে হারাধন সাউয়ের যাত্রার দল এসে আপখোরাকী গেয়ে যাবে।

জ্বর হলেই স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মাথার শিরাগুলো দপ দপ করে। রক্তের মধ্যে যে জ্বালা ধরে, সেটা যেন কালীবিলাসের চিন্তাধারাতেও সংক্রামিত হয়। তার সঙ্গে গাঁজার প্রভাব মস্তিষ্কের মধ্যে এখনো ঘনীভূত হয়ে আছে। এই অশ্লেষা আর মঘার একত্র সঙ্ঘটন ঘটলেই কালীবিলাস তার আদর্শমানব মুকুন্দ দাসের ওজস্বিতায় অনুপ্রাণিত বোধ করে।

—টাকা। টাকার পেছনে গোলামী করেই না দেশটা উচ্ছন্নে গেল। সেই জন্যেই তো অধিকারী মশাই (কালীবিলাস মাথায় হাত ঠেকাল) বলতেন:

সোনার পিঞ্জিরের পক্ষী সুখে নিদ্রা যায়,
সাদা ইন্দুর আইয়া রে তোর ঘরের আধার খায়
ওরে হায় হায় হায়—

কালীবিলাসকে সকলে মান্য করে বটে, কিন্তু তার কথাগুলোকে বিশেষ মূল্য দেয় না। বাস্তব জগতে চলা-ফেরা করবার পক্ষে তাদের বিশেষ কোনো দাম নেই। তারা মুকুন্দদাস নয়, দেশকে স্বাধীন করবার মহতী ব্রতও তারা নেয়নি। সংসারী মানুষ একান্ত ভাবে শান্তিপ্রিয় এবং নির্জ্জীব।

সুতরাং ব্রজহরি এমন ভাবে কথাটাকে উড়িয়ে দিলে যেন শুনতেই পায়নি।

—হাবু যে কথা বলছিস্ না?

হাবু মুচি ভূষণ মুচির মামাতো ভাই এবং দলের চিরন্তন হিরো। তা ছাড়া গানের মাষ্টার। সুতরাং তার মতামতের একটা আলাদা এবং গুরুভার ওজন আছে। নিজের এই বিশিষ্টতা সম্বন্ধে হাবুও যথেষ্ট সচেতন। সুতরাং সে সহজে মুখ খোলে না বটে, কিন্তু যখন খোলে তখন সে একেবারে মোক্ষম। আপ্তবাক্যের মতো এক একটি সারগর্ভ বাণী উচ্চারণ করে বিরাট হিমালয়ের মতো নীরব আর নিশ্চল হয়ে যায়।

হাবু বললে, ব্যাপার যা দেখছি তাতে আর ট্যাঁ-ফোঁ করে দরকার নেই। চাটিবাটি তুলে সোজা চম্পট দিলেই সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

—চম্পট? চম্পট কিসের ভয়ে?—উত্তেজিত হয়ে কালীবিলাস কী একটা বলবার আপ্রাণ চেষ্টা করলে। কিন্তু কথা এল না। উদ্গত একটা কাশির প্রবল উচ্ছ্বাসে সমস্ত চাপা পড়ে গেল। বুকে হাত দিয়ে কালীবিলাস কাশতে সুরু করে দিলে অমানুষিকভাবে। সামনেই নিম গাছে একটা ময়ূর এসেছিল নিম ফলের আশায়, কাশির শব্দে চমকে সে ঝটপট করে উড়ে গেল। কাশতে কাশতে বেদম হয়ে কালীবিলাস শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে।

ভূষণাকে গানে পেয়েছিল। গুণ গুণ করে সে তখনো গেয়ে চলেছে: শিবো হে, ভস্ম বিভূতি মাখ, আঁদাড়ে পাঁদাড়ে থাক—

ক্ষেপে গিয়ে ব্রজহরি হাতের কাছ থেকে ডুগীটা তুলে নিয়ে এল। বাঘাটে গলায় বললে, থামলি, থামলি হারামজাদা? আর একটা টাঁই মেরেছিস কি এই ডুগী তোর মাথায় ফাটিয়ে দেব। আমি মরছি নিজের জ্বালায় আর ইদিকে—

ভূষণ চিমটি কাটলে।—গান ভালো লাগছে না? একখানা নাচ দেখিয়ে দেব? গম্ভীরার একখানা ডোম কালীর নাচ?

ডুগী উদ্যত রেখেই মেঘমন্দ্রে ব্রজহরি বললে, তা হ'লে তোর বুকে উঠে চাঁড়ালে কালীর নাচ নাচতে সুরু করে দেব আমি।

ভূষণা বললে, থাক থাক। পায়ে গেঁটে বাত নিয়ে অত কষ্ট তোমায় করতে হবে না, ফুলে শেষটায় ঢোল হ'য়ে যাবে।

—রাখ, ফক্কুড়ি রাখ।—হতাশ কণ্ঠে ব্রজহরি বললে, ওরে ব্যাটা ভুষুণ্ডী, একটা বুদ্ধি বাতলে দে না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে—মরুক গে, কিন্তু আমরা উলুখড়েরা যে গেলাম। লালাজীর বায়না না নিলে এ তল্লাটের কাজ-কম্ম এই ইস্তক সব কাবাড়। ওদিকে কুমারদ'র বায়না ফিরিয়ে দিতে গেলে—

হাবু সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে সুনিশ্চিত অভিমত জানালে, বেশী কিছু হবে না, শুধু মাথাটা ফাটিয়ে সোনাদীঘির পাঁকের তলায় পুঁতে দেবে।

ব্রজহরি পাল উত্তেজনায় হঠাৎ রুদ্রকান্ত পাল হ'য়ে গেল। মাথার ঝাঁকড়া বাবরী দুলে উঠল জটার মতো। ডম্বরুর বদলে ডুগী দুলিয়ে বল্লে, যাব্—যাঃ—যাঃ! এ হচ্ছে ইংরেজের রাজত্ব। মাথা ফাটিয়ে পাঁ—থু, থু, ওয়াক!

একটা উড়ন্ত গুব্‌রে পোকা গোবরের গাদা ভ্রমে ব্রজহরির গর্জমান ব্যাদীত মুখের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করছিল। সফুৎকারে সেটাকে ভূষণার দিকে নিক্ষেপ ক'রে ব্রজহরি বললে, থু, থু, শা—। ঢোক্‌বার আর জায়গা পেলে না। ঠেলে বমি আসছে মাইরি। থু, থু—

পাশে শিবুনাথ ঘুমুচ্ছে অকাতরে। মুখে বিজাতীয় তরলতার স্পর্শ অনুভব ক'রে নিদ্রাজড়িত স্বরে বললে, আঃ, থু, থু ফেলছে কোন্ শা—?

হিংস্রভাবে শিবুকে একটা ধাক্কা দিয়ে ব্রজহরি বললে, ওয়াক। আরে ওঠ্‌না ব্যাটা গাড়োল। ইদিকে সব্বোনাশ হ'য়ে গেল, আর—.

—ধ্যাৎ—শিবু আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরল।

ভূষণা বললে, ঘুমুচ্ছে, ঘুমুক না। এই মাঝরাত্তিরে সবাইকে উদ্ব্যস্ত করছ কেন?

—হুঃ, ঘুমুচ্ছে। আমি চোখে অন্ধকার দেখছি আর এঁরা যেন শ্বশুর বাড়ীর রাজশয্যেয় গদীয়ান হয়েছেন। তবু তো রাজকন্যে জোটেনি। নাঃ, যা থাকে কপালে, কালই চলে যাই কুমারদয়।

হাবু বললে, যাও। কিন্তু লালাজীর খালি টাকা নয়, লাঠিও আছে। ফিরবে কোন্ পথ দিয়ে শুনি। হল্‌দি ডাঙার মাঠের মাঝখানে ঠেঙ্গিয়ে যদি আটা বানিয়ে দেয়—

ব্রজহরি প্রায় কেঁদে উঠল।—কী করা যায় তা হ'লে?

—কিছুই করা যায় না। শেষ রাত্তিরে উঠে সিধে আইহোর রাস্তা—বেলা উঠবার আগেই মামুদপুরের টাল পাড়ি দেওয়া। মানে মানে ঘরের ছেলের ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো।

—তবে তাই। শোডার বোতল ভাঙার মতো শব্দ করে এক দমকা ঝড়ে। হাওয়ার মতো বুকফাটা খানিকটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ব্রজহরির: কিন্তু কুড়ি টাকা করে দিত এক এক রাত্তিরে।

ভূষণ বললে, কিন্তু খুড়ী যে বিধবা হত। টাকা দিয়ে শেষকালে আমরা তোমার শ্রাদ্ধ করব নাকি। ব্রজহরি আবার রুখে উঠল, তুই হতভাগা কেবল কুডাক ডাকবি। আমি মরলে আমার শ্রাদ্ধ খাবি এই আশাতেই নোলা শানিয়ে বসে আছিস।

—বালাই ষাট ষাট। খুড়ী পাকা চুলে সিঁদুর পরুক, মুড়ো চিবুতে গিয়ে নড়া দাঁতগুলো খসে যাক।

কিছুক্ষণ সবাই নীরব আর নিস্তব্ধ হয়ে রইল। কালো রাত যেন ঝমঝম করছে। ছাগলের মতো শব্দ করে সোণা ব্যাং ডেকে চলেছে একটানা। শনশনে হাওয়ায় মাঠ ভরা কালো জলে তরঙ্গের দোলা লেগেছে। জেলা বোর্ডের বাঁধের তলা দিয়ে খরস্রোতে জল নেমে চলেছে কলকল করে। একটু দূরে বারোয়ারী তলায় বিষহরির বেদীর নীচে মিটমিট করছে প্রদীপ। কোন্ সুদূর দিগন্তে গোদাগাড়ী লাইনের একখানা রেলগাড়ী বেরিয়ে গেল, নিস্তব্ধ রাত্রির ইথারে জলভরা মাঠের ওপর দিয়ে গমগম করে ভেসে এল তার অস্ফুট প্রতিধ্বনি।

কালীবিলাস আবার উঠে বসল। কাশির ধমক

কিছুটা শান্ত হয়েছে এতক্ষণে। উত্তেজিত গলায় বললে, পালানোর মধ্যে আমি নেই কিন্তু। কথা দিয়েছ, রাখতে হবে। মরদকা বাত, হাতীকা দাঁত! কুমারদয়েই গান গাইব আমরা।

বিরক্ত হয়ে ব্রজহরি বললে, বাজে কথা কোয়োনা বুড়ো দা। আমরা তোমার মুকুন্দ দাস নাই। জেল খাটা পোষাবে না, লাঠি খেতেও পারবনা।

উদ্দীপ্ত স্নায়ুগুলোর মধ্যে জ্বালাধরা রক্ত চনচন করে উঠল কালীবিলাসের।

—খবদ্দার বেজা। আমাকে যা খুসি তাই বলবি, কিন্তু অধিকারী মশাইকে (কালীবিলাস কপালে হাত ঠেকাল) অপমান করিসনে।

ব্রজহরি ভেংচে বললে, ধ্যাত্তোর অধিকারী মশাই। তাকে নিয়ে তুমি ধুয়ে খাওগে, তার সঙ্গে আমাদের কোন্ সাতপুরুষের সম্পক্কো?

কালীবিলাসের চোখ মুখ দিয়ে আগুনের বিন্দু ঠিকরে বেরিয়ে পড়তে লাগল! তীব্র হয়ে উঠল গলার স্বর, তুই কি মনে করিস যে দশটাকা মাইনের জন্যে এত অপমান সয়ে তোর এখানে পড়ে থাকব!

নানা দুশ্চিন্তায় ব্রজহরির মাথা ঠিক ছিলনা, সমস্ত বিরক্তি আর অসন্তোষ যেন কালীবিলাসের ওপরেই গিয়ে পড়ল। তিক্ত কণ্ঠে বললে, না থাকো যাওনা চলে। পায়ে ধরে সাধছে না কেউ। একটা ভালো পরামস্যোর নামে খোঁজ নেই, সব কথায় কেবল ওই মুকুন্দদাসের ফ্যাঁকড়া!

কালীবিলাস গর্জ্জে বললে, খবদ্দার বলছি খবদ্দার। তোর দল ছেড়ে আমি চলে যাব কালকেই। কিন্তু তুই অধিকারী মশাইকে অপমান করলে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে।

ভূষণা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললে, থামো না খুড়ো। কেন খামোকা ক্ষ্যাপাচ্ছ বুড়োকে?

—না মাইরি, ভালো লাগে না। কেবল মুকুন্দদাস আর মুকুন্দদাস। অতই যদি, তা হলে বেশতো বাপু সোজা তার কাছেই চলে যাওনা। আমাদের খামোকা এত জোগাও কেন।

কালীবিলাস কী বলতে যাচ্ছিল, বলতে পারল না। অসহ্য উত্তেজনা আর দুর্ব্বার একটা কাশির উচ্ছ্বাসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কাশতে কাশতে গলা দিয়ে জলের মতো খানিকটা উত্তপ্ত তরল জিনিস বেরিয়ে এল, কাপড়ের খুঁটে কালীবিলাস মুছে ফেলল সেটাকে। অন্ধকার না থাকলে তার চোখে পড়ত সেটা আর কিছুই নয়, টাটকা তাজা খানিকটা রক্ত মাত্র।

* * *

আইহোর পথ ধরে চলতে চলতে দলটির সঙ্গে যখন প্রথম সূর্যের দেখা হল, তখন ওরা নবীপুর আর কুমার-চৌহদ্দি পেরিয়ে এসেছে। তিনদিকে ডুবার জল ভরা বর্ষায় মহাসাগরের মতো ফুলে উঠছে, ফেনিয়ে উঠছে—নদী-নালা বন-জঙ্গল সব একাকার হয়ে গেছে। দূরে ডুবার বুকে মহাজনী নৌকোর পালে সোনালি রোদ জ্বলছে। ভিজে ঘাস, পচা পাতা আর রাশি রাশি জলের অপূর্ব্ব সুগন্ধি—বিলের অজস্র তরঙ্গে কলধ্বনি, যেন গন্ধ আর ধ্বনির একটা বিচিত্র ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে। বাতাসে উড়ন্ত জলকণাগুলো এসে লাগছে চোখে-মুখে, যেন নির্ম্মল নির্ম্মেঘ আকাশ থেকে গুঁড়োয় গুঁড়োয় ঝরছে বৃষ্টির ছিটে। একটু দূরেই দিয়াড়িয়াদের গ্রাম মামুদপুর, ওখান থেকে একখানা নৌকো কেরায়া করে নিয়ে এই বিল পাড়ি জমাতে হবে।

ব্রজহরি বগলের তবলা বাঁয়া দুটো নামিয়ে একটা আমগাছের গুঁড়ির ওপরে বসে পড়ল। বললে, নে ব্যাটা মুচির পো, চিঁড়ের পুঁটলিটা বের কর। বা-বা হাঁফ ধরে গেছে। আর দ্যাখ, বুড়োদাকে চাড্ডি বেশি করে দিস। রাত থেকে বুড়োদার মাথা গরম হয়ে আছে, ক্ষিদেও নিশ্চয়—কিন্তু বুড়োদা কই?

কালীবিলাস নেই। শেষ রাত্রিতে তাড়াহুড়োর সময় কালীবিলাসও উঠেছিল, তার পোঁটলাও গুছিয়ে-ছিল তারপরে এক সঙ্গে রওনাও যে দিয়েছিল তাও ঠিক। কিন্তু এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কালীবিলাস সঙ্গে আসেনি।

ভূষণ ভীত হয়ে বললে, রোগা মানুষ, পথের মাঝ-খানে পড়ে-টড়ে নেই তো?

ব্রজহরির অনুতাপ হচ্ছিল। বললে, তাই তো। একটু খুঁজে আয় না রে।

ভূষণ খুঁজতে গেল। কিন্তু বৃথা। যতদূর চোখ চলে, ফাঁকা মাঠের মাঝখানে কালীবিলাসের কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না।

চার

রূপাপুরের কামারপাড়ার নীচে কুমার বিশ্বনাথের ঘোড়া এসে থামল।

তখন বেলা উঠেছে অনেক। মাথার ওপর দুপুরের সূর্য্য জ্বলছে। ঘোড়ার চ্যাপটা আর কালো কালো ঠোঁটের কোণে ফেনার বিন্দু দেখা দিয়েছে, ক্ষুধায় আর তৃষ্ণায় হিংস্র ভাবে কড়মড় করে চিবুচ্ছে মুখের লাগামটাকে। হাঁটু অবধি ধুলো আর কাদা। কুমার বিশ্বনাথের মুখের ওপরেও ধুলোর একটা পুরু আবরণ পড়েছে, মাথার অসংযত চুলগুলো নেমে এসেছে কপালে। চোখের দৃষ্টিতে ক্লান্তি আর উত্তেজনা।

কামারেরা উঠে দাঁড়াল শশব্যস্ত হয়ে। বিশ্বনাথকে তারা ভালো করেই চেনে, ওই ঘোড়াটাও তাদের পরিচিত। তেজী টাঙ্গন ঘোড়া, ঘাড়ের ওপর সিংহের মতো কেশরগুচ্ছ। কদম চালে যেন হাওয়ার মুখে উড়ে চলে যায়। অমন ঘোড়া এ তল্লাটে আর কারো নেই।

রূপাপুরের কামারেরা বিশ্বনাথের প্রজা নয়। তবু তারা সাদরে অভ্যর্থনা জানাল বিশ্বনাথকে। রামনাথ হাত জোড় করে সামনে এসে দাঁড়াল।

—কোন্ ভাগ্যে এখানে পায়ের ধুলো পড়ল হুজুরের ?

—বলছি।

কিন্তু বিশ্বনাথ রূপাপুরে আসবার আগে আরো একটু ভূমিকা আছে।

কুমারদহ থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে নবীপুরে পৌছ্‌লেন। এতদিন কিছু মনে হয়নি, কিন্তু আজ আসবার পথে কুমারদহের সঙ্গে নবীপুরের স্বাতন্ত্র্যটা যেন তাঁর বিশেষভাবে চোখে পড়তে লাগল। নবীপুর বেড়ে উঠছে, অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে উঠছে। দু' বছর আগে যেখানে ফাঁকা মাঠে ঘনশ্যামল ধানের শীষ মাথা তুলত, আজ সেই সব জায়গায় নতুন নতুন পাড়া বসেছে। কাঁচা ঘর, কোঠা ঘর। ঘরের দরজায় ঘোড়া বাঁধা, খচ্চর বাঁধা। ছোট বড় রাশি রাশি দোকান; পানের দোকান, বিড়ির দোকান, মনোহারী দোকান—এমন কি চায়ের দোকান পর্য্যন্ত। বাসিন্দারা অধিকাংশ হিন্দুস্থানী, বালিয়া আর আরা জেলার বাসিন্দা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় পশ্চিমের একটা শহরকে এনে কে যেন রাতারাতি উড়িয়ে এনে বাংলা দেশের এই প্রকাণ্ড ঢালু মাঠের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে। হাঁ, নবীপুরকে এখন কলকাতার কাছাকাছিই বলা যায় বই কি। আর সকলের ওপরে মাথা তুলে রয়েছে লালা হরিশরণের প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ীটা। চিলে কোঠার ওপরে রেডিয়োর তার—সেই তারের ওপরে উড়ে উড়ে জটলা করছে এক ঝাঁক কবুতর—সৌভাগ্যের প্রতীক ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কুমারদহের কথা। কুমারদহ। একটা ভাঙাচুরো এলোমেলো কঙ্কাল। রাস্তার দু' পাশে ছড়িয়ে পড়ছে বিচূর্ণ কোঠা বাড়ীর ইট পাথর। অসংলগ্ন জঙ্গলের মাঝখানে এক একটা জরাজীর্ণ বাড়ী—যেন অসুস্থতা আর বার্দ্ধক্য সর্ব্বাঙ্গে বহন করে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। বড় বড় দীঘিতে কল্‌মী-দাম, এক হাত পুরু হ'য়ে পানা জমেছে, আর সেই পানার ওপর একরাশ নীল রঙের ডিম নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে আলাদ-গোক্ষুর। ঐশ্বর্য্য নেই, আছে অরণ্য; মানুষ নেই, আছে ফেনায়িত বিদ্বেষ আর হিংসা।

নিজের অজ্ঞাতেই কখন দাঁতের চাপ এসে নীচের ঠোঁটটার ওপর পড়েছিল। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ে আচমকা কিসের একটা টক্কর লাগতেই সঙ্গে সঙ্গে একটা দাঁত সোজা বসে গেল মাংসের ভেতর। যন্ত্রণাবিকৃত মুখের রক্ত রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে ঘোড়ার রশি টানলেন বিশ্বনাথ। সামনেই লালা হরিশরণের গদী।

—রাম রাম। আইয়ে রায়জী, আইয়ে।

দু' পাশ থেকে দু'জন লোক এসে বিশ্বনাথের ঘোড়া ধরলে। সিঁড়ির সামনেই লালাজীর ভাইপো রাম

গোপাল দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল। বিড়ি ফেলে দিয়ে সসম্মানে অভিবাদন করে বললে, নমস্তে, আইয়ে, আইয়ে।

প্রতি অভিবাদন জানালেন বিশ্বনাথ। কিন্তু কিসের একটা সঙ্কোচে তিনি যেন চোখ তুলে রামগোপালের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। যে কুমারদহের জমিদার বাড়ীতে একদিন হরিশরণের পূর্ব্বপুরুষ পদসেবা করে অন্নসংস্থান করত, আজ সেই হরিশরণের কাছেই আশ্রয়প্রার্থী হ'য়ে আস্‌তে হয়েছে তাঁকে। তিনি—কুমার বিশ্বনাথ। মনে হ'তে লাগল চারদিক থেকে অসংখ্য অবজ্ঞা আর অনুকম্পার দৃষ্টি এসে তাঁর গায়ে সূঁচের মতো বিঁধছে।

প্রকাণ্ড গদী বাড়ী। প্রায় পনেরোখানা বড় বড় সিঁড়ি পার হ'য়ে উঠতে হয় দোতলা সমান উচুঁ বারান্দায়। ওপরের দিকে সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে সিঁড়ির মাথায় দু' দিকে দু'টি শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি—একটি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ আর একটি গন্ধমাদন বহনরত মহাবীর। মূর্ত্তি দু'টিই সিঁদুরে বিচর্চিত। নকল মার্ব্বেলে বাঁধানো মেজে, ফুলের কাজ করা। বারান্দার এক পাশে প্রকাণ্ড একটা লোহার দাঁড়িপাল্লা, দু'জন লোক সেখানে ধান মাপছে। আর এক পাশে আট দশটা কাপড়ের গাঁট আছে স্তূপাকার হ'য়ে। সাদা দেওয়ালের গায়ে নীল সিঁদুর দিয়ে লেখা 'লাভ শুভ' 'লাভ শুভ'। কোথা থেকে বেনেতী মসলার খানিকটা উগ্র মিশ্র গন্ধ ভেসে আসছিল।

বারান্দা পেরিয়ে লম্বা একখানা ঘর—এই গদী। ঘরে পুরু জাজিম পাতা, তার ওপর ধবধবে সাদা চাদর। তিন চারটে বিরাটকায় গির্দ্দা বালিশ এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এমনি একটা বিরাটকায় বালিশে নিজেকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে গড়গড়া টানছেন লালা হরিশরণ। পরণে সূক্ষ্ম থানের কাপড়, গায়ে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবী। লালাজীর ঠিক পেছনেই দেওয়ালের গায়ে ছোট্ট একটা কুলুঙ্গি; সেখানে লাল রঙের আর একটা ক্ষুদ্রকায় গণেশ মূর্ত্তি, রূপোর প্রদীপ, রূপোর ধূপদানী। তার ওপর বড় একটা দেওয়াল ঘড়ি আর দেওয়াল ঘড়ির দু'পাশে দু'খানা বড় আকারের ছবি—মহাত্মা গান্ধী আর পণ্ডিত জওহরলাল।

লালাজী গড়গড়া টানছেন আর ফরাসের ওপর ভিড় করে বসেছেন তাঁর কর্ম্মচারী, মোসাহেব আর প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর দল। ঠিক পাশেই নীল রঙের একটা গডরেজ সিন্দুক, একজন লোক তার ভেতর থেকে একতাড়া নোট বের করে গুনছিল।

বিশ্বনাথকে ঘরে ঢুকতে দেখেই লালাজী সোজা উঠে দাঁড়ালেন তারপর এগিয়ে এসে এবং বিশ্বনাথ কিছু বলবার আগেই দু' হাতে তাঁর পায়ের ধূলো নিলেন। বললেন, আসুন রাজাসাহেব, কিরপা করকে গরীব খানেমে পা ধারিয়ে

সাপের কামড় খাওয়ার মতো বিশ্বনাথ চমকে দু' পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, ছিঃ, ছিঃ, এ কী করছেন আপনি।

লালাজী হাসলেন—হাসিতে যেন শ্রদ্ধা আর বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, না, না, তাতে কী হয়েছে। আমরা তো আপনার চাকর, আপনার খেয়েই তো আমরা মানুষ।

লালাজীর গদীতে যারা বসেছিল, তারা তাকিয়ে আছে বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে—যেন কী একটা বিচিত্র অভিনয় দেখছে তারা। কিন্তু বিশ্বনাথের দু' কান লাল আর গরম হয়ে উঠল। কপালের ওপর ফুটে উঠল ঘামের বিন্দু। জামার আস্তিনে কপালটা মুছে ফেলে বিশ্বনাথ বললেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে লালাজী।

কথা আছে—বিলক্ষণ! আসুন, আসুন, আমার বসবার ঘরে আসুন। এ রাম দেইয়া, রাজাবাবু কো ওয়াস্তে চা লাগাও জলদি—

জী। রাম দেইয়া বেরিয়ে গেল প্রস্তুত হয়ে।

মাপ করবেন, চা আমি এখন খাব না।

চা খাবেন না, এও কি একটা কথা হল। গরীবের মোকামে যখন কষ্ট করে এসেইছেন,—লালাজী আবার হাসলেন: তখন আর একটু তক্‌লিফ—

গরীবের মোকাম—তাই বটে! কলকাতায় বিবেকানন্দ রোডে আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদ তুলেছেন লালাজী। বাংলার গভর্ণর স্বয়ং তাঁর প্রাসাদের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন। বিরাট ব্যবসা, বিশাল কারবার, লক্ষ লক্ষ টাকার তিনি মালিক। সে ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন এই গ্রাম্য বাড়ীর সর্ব্বত্রই সোণালি রঙে ঝলমল করছে। ড্রাই ব্যাটারী দিয়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে, ঘরে ঘরে ইলেকট্রিকের আলো আর পাখা। পুরু পার্শী কার্পেট। মনে পড়ল ধ্বংসশেষ কুমারদহের অপস্রিয়মান রাজপ্রতাপ।

লোভনীয় বসবার ঘরটি। লালাজীর গদী থেকে একেবারে আলাদা। গদীর প্রয়োজন ব্যবসায়িক, তার ব্যবহার স্থূল এবং সর্ব্বজনীন। কিন্তু এ একটা বিভিন্ন জগৎ। কাচের শেল্‌ফে বাঁধানো দামী ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা বই ঝকমক করছে। সোফার ওপর হরিণ আর চিতাবাঘের চামড়া বিছানো, লালাজী নিজের হাতেই এদের শিকার করেছেন। কালো আবলুস কাঠের ফ্রেমে দামী ক্লক। মেহগিনীর টেবিলে ফুলের তোড়া।

লালাজী সবিনয়ে বললেন, বৈঠিয়ে।

বিশ্বনাথ বসলেন। কিন্তু অকারণে, অত্যন্ত অকারণে তাঁর সমস্ত চোখমুখ ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠতে লাগল। লালাজী টেবিল-ফ্যান খুলে দিলেন, তবু বিশ্বনাথের মনে হতে লাগল, শরীরের ভেতর থেকে যেন অসহ্য একটা উত্তাপ বাষ্পের রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসছে, যেন তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

লালাজীর মুখে অসীম বিনয়—চোখদুটি যেন বিনয়ে ছল ছল করছে। কোমল কণ্ঠে বললেন, ফরমাইয়ে।

বিশ্বনাথ একবার শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করলেন। পিপাসায় যেন গলার ভেতরটা শুকিয়ে উঠেছে, এখন একপাত্র মদের প্রয়োজন। নিজে না এলেই বোধ করি ভালো হত। কিন্তু এখন আর ফেরবার জো নেই কোনো দিক থেকে।

বললেন, মেলা সংক্রান্ত সেই কথাটা বলবার জন্যেই—

বললেন, রাম রাম। সেজন্যে এত কষ্ট করে রাজাবাহাদুরের আসবার দরকার ছিল কী। কোনো আমলাকে পাঠিয়ে দিলেই তো হত। এই দুপুর রোদে এতখানি ঘোড়া ছুটিয়ে আসা কী রাজাবাহাদুরের সুকুমার শরীরে কখনো সয়!

—রাজাবাহাদুর···রাজাবাহাদুর!—কথাটা যেন কানের মধ্যে গিয়ে আঘাত করতে থাকে। যেন ইচ্ছে করেই লালাজী তাঁর গায়ে বিদ্রূপের চাবুক মারছেন। কিন্তু লালাজীর মুখে কোনো ভাবান্তর নেই, এতটুকু বৈলক্ষণ্য নেই কোথাও। একরাশ মাখনের মতো নরম আর কোমল প্রশান্ত মুখশ্রী, উদ্বিগ্ন শুভার্থীর মতো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

রুমালে মুখ মুছে বিশ্বনাথ বললেন, মেলাটা কি আপনি নিতেই চান?

লালাজী হাসলেন। সোনার সিগারেট কেস খুলে এগিয়ে দিলেন বিশ্বনাথের দিকে। বললেন, রাজাবাবুর মেলা আমি নিতে পারি এতবড় কথা বলব কী করে। বছর তিনেক মেলাটা গোলামের তাঁবে থাকুক, এই আর্জি। মনিবের সম্পত্তি তো চাকরেই দেখা শোনা করে, তাতে অন্যায় কিছু নেই।

ব্রজহরি পালের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দামী দুর্লভ 'বার্ডসাই' কিন্তু বিশ্বনাথ স্পর্শও করলেন না। তাঁর শিরাগুলো যেন একটা আকস্মিক বিস্ফোরণে জ্বলে উঠেছে। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনা আর উগ্রতাকে গলার নীচে ঠেলে রেখে তিনি শান্তস্বরে বললেন, মেলা না পেলে কি আপনি টাকা দিতে পারবেন না!

—কী করে দিই? আরো কোমল, অনেকটা অনুনয়ের ভঙ্গিতেই জবাব এল: আমারও বাল্‌-বাচ্ছা আছে। তাদের একটা ব্যবস্থাও তো করা দরকার। রাজাবাহাদুর নিজেই বিবেচনা করুন।

উত্তেজনা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। ফ্যানের বাতাসেও শরীরের সর্ব্বত্র প্রধূমিত উত্তাপ এতটুকু শান্ত হতে চায় না। বিশ্বনাথ রুমালে আবার চোখ মুছলেন। গলার কাছে কী একটা আটকে ধরেছে, কথা বলতে কষ্ট হয়।

—বেশ, তবে তাই।—কণ্ঠের প্রশান্তি সত্ত্বেও

বিশ্বনাথের চোখ জ্বলতে লাগল, আর লালাজীর চোখ হাসতে লাগল কৌতুকে। বিশ্বনাথ বললেন, কাগজপত্র তৈরী থাকে তো দিন। আমি সই করে দিই।

—রাম রাম সীতারাম।—লালাজী সঙ্গে সঙ্গে সংকুচিত হয়ে গেলেন: তাও কি হয়। গরীবের বাড়ীতে এসেছেন, চা-পানি খান, একটু বিশ্রাম করুন। কাগজ পত্র আর টাকা আমি কাল নিজেই লোক দিয়ে রাজবাড়ীতে পাঠিয়ে দেব।

বিশ্বনাথ সোজা হয়ে উঠে বসলেন। চোখের দৃষ্টিকে স্থির আর দৃঢ় করে রাখলেন লালাজীর মুখের ওপর: আর সে টাকা যদি আমি কেড়ে রাখি? যদি দলিল সই না করে ছিঁড়ে ফেলে দিই?

লালাজী আবার হাসলেন: তা হলে সে টাকা আমি রাজাসাহেবের নজরানা বলেই ধরে নেব।—কথাটা এসে পড়ল যেন কঠিন একটা মুষ্ট্যাঘাতের মতো। স্তব্ধ হয়ে রইলেন বিশ্বনাথ, কোনো উত্তর মুখে জোগাল না। লালাজী টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে অনুসন্ধিৎসু চোখে বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। টেবিল-ফ্যানটা অশ্রান্তভাবে কট কট করতে লাগল আর বাইরে থেকে শোনা যেতে লাগল ধান মাপার সুর: রামে রামে দো—দো-দো তিন, তিন তিন চার, চার—চার—পা—ন্

ঠিক এমনি সময় চা নিয়ে ঘরে ঢুকল রামদেইয়া। সঙ্গে সঙ্গে যেন জমাট অস্বস্তির একটা কালো দমকা হাওয়া হু হু করে দরজা দিয়ে বার হ'য়ে গেল।

এক নিশ্বাসে চায়ের পাত্র নিঃশেষ ক'রে এবং খাদ্য-দ্রব্যের একটি কণাও স্পর্শ না করে বাহিরে এসে বিশ্বনাথ ঘোড়ায় উঠলেন। সশব্দে চাবুক পড়ল, তার পরেই ঘোড়া দ্রুতবেগে উড়ে চলল সোজা রূপাপুরের পথে।

রূপাপুরের মজলিস শেষ করে বিশ্বনাথ যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন বেলা দুপুর। ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে বললেন, মনে থাকবে?

সুরচের হাতের পেশী ফুলে উঠেছে, ফুলে উঠেছে সমস্ত বুকখানা। কালো কঠিন হাত মুষ্টিবদ্ধ করে জবাব দিলে, থাকবে।

রামনাথ দাঁড়িয়েছিল মাথা নীচু করে। বিশ্বনাথ এবার তাঁকেই সম্ভাষণ করলেন।

তুমি কী বলছ ওস্তাদ?

রামনাথ মুখ তুলল। ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, আপনার হুকুম আমরা মানব।

—হাঁ। মেলা ভেঙে দিতে হবে। যেমন করে হোক। আগুন লাগিয়ে, দাঙ্গা বাধিয়ে—যেমন করে হোক। ধাক্কা সামলাতে আমি আছি। আর টাকা—সে তো আগেই বলা আছে।

—তাই হবে।—কিন্তু ঘরের দিক থেকে রামনাথ কোনো প্রেরণা পেলনা। দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবার বয়স বা উৎসাহ কোনোটাই তার আর নেই। সেদিনের উত্তপ্ত রক্ত গেছে শীতল হয়ে, যাযাবর জীবন আমের বনের ছায়ায় নিভৃতে এসে আশ্রয় নিয়েছে; ফসল কাটবার সময় অনেক আলো আর স্বপ্ন ভবিষ্যতের মোহমায়া বুলিয়ে দিয়ে যায়। তারপর রাত্রে কামিনী যখন বুকের মধ্যে একান্ত ঘন আর নিবিড় হয়ে আসে—তখন—প্রেমে, পূর্ণতায় আত্মতৃপ্ত পাশবিক জীবন। মারামারি, হাঙ্গামা কিংবা অনিশ্চয়তাকে মেনে নেবার অনুপ্রেরণা কোথায়?

তবু রামনাথ বললে, তাই হবে।

রূপাপুরের তলা দিয়ে জনস্রোতের বিরাম নেই। অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলেছে, ধূলোয় কাদায় কোলাহলে পথ মুখরিত করে চলেছে। বিশ্বনাথ আবার ঘোড়ায় চাবুক বসালেন, তারপর শেষবারের মতো মুখ ফেরাতেই রামনাথের ঘরের দাওয়ায় দেখলেন ভানীকে। একবার দুবার, তিনবার ফিরে ফিরে দেখলেন তিনি। মাথার ওপর রোদ ঝলকাচ্ছে, অনেকক্ষণ থেকে একপাত্র মদ পেটে পড়েনি। তবু—বিশ্বনাথ চকিতের জন্যে ঘোড়ার রাশ টানলেন, তারপরেই আবার হাওয়ার মতো ছুটিয়ে দিলেন তাঁর তেজী টাঙ্গন ঘোড়াটা।

ভানী কে?

তার পরিচয় যথাসময়ে দেব। আমার এই কাহিনীর সে নায়িকা, উপনায়িকাও বলতে পারেন আপনারা।

[ক্রমশঃ

মিথ্যা অভিযোগ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

মানুষের পরে মানুষের উৎপীড়ন সনাতন। দল বেঁধে মানুষ অন্য দলের মুণ্ডপাৎ করে। বিশ্বব্যাপী অশান্তির অবসানের চেষ্টা মাঝে মাঝে সহৃদয় প্রবল জাতির মনে জেগে ওঠে। আজ তেমনি এক বিশ্ব-শান্তির প্রচেষ্টায় মেদিনী কম্পমান।

আন্তর্জাতিক উৎপীড়ন কোনোদিন নির্ম্মূল হবে কিনা, সে অতি বৃহৎ সমস্যা। কিন্তু প্রত্যেক সভ্য জাতি নিজের শাসন-গণ্ডীর মাঝে দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার বন্ধ করবার সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কেবল সভ্য-জাতি কেন, প্রত্যেক সঙ্ঘের লক্ষ্য একের পরে অন্য-জনের অনর্থক অনাচার অত্যাচার প্রতিরোধ। কিন্তু অসভ্য এবং অর্দ্ধ-সভ্য সমাজের উৎপীড়ক শাসনকর্ত্তা বা শাসক সম্প্রদায় স্বয়ং। সভ্য-জগৎ সাম্যবাদী। এখানে বিধি-নিয়মের অধীন সবাই। আইন কারও কাছে মাথা নত করে না—ধনী-নির্ধন সকলকেই আইন মেনে চল্‌তে হয়।

দেশের বিধি-নিয়ম মানব-প্রবৃত্তির বিধি-নিয়মকে অবদমন করতে পারে, নির্ম্মূল করতে পারে না। দেব প্রকৃতি মানুষের মনের গভীরে উৎপীড়নের রাক্ষস লুকিয়ে আছে। জ্ঞানের আলোর আশেপাশে ঝোঁপে ঝাঁপে গাঢ় অন্ধকার সত্যের প্রবেশ-পথ বন্ধ করে। উদার জগতের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতির বাণী মানব-মনের রাক্ষসের কোঠায়ও পৌছায়, কিন্তু আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সেখানে হিংসা-অসুর ষড়যন্ত্র-তৎপর। নর-রক্ত পানে আত্ম-প্রসাদ লাভের প্রত্যাশা তার প্রকৃতি।

শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজ-নীতি এবং ধর্ম্ম সর্ব্বদাই আমাদের সহজাত আসুরী প্রকৃতিকে দমন করবার চেষ্টা করে। সভ্যনরের দেব-ভাব বোঝে, অহিংসার শান্ত নিকেতনই কাম্য বিশ্রাম স্থল। কিন্তু হিংসার দেবতা বলে, সে তো দূরের কথা। আপাততঃ অন্যের অশ্রুতে নিজের কঠোর চলার পথ একটু ধূলি-হীন করা মনোরম। অবদমিত হিংসা-বৃত্তি সদাই মাথা তুলতে চায়।

সভ্য-জগতে নিছক নিরাবরণ হিংসা মাথা তুললে, তার উপর চতুর্দ্দিক হ'তে নিন্দাবাণী, এমন কি লগুড় বর্ষণ অনিবার্য্য। আত্মীয়ের অননুমোদন, সমাজের নিন্দা, রাজ শক্তির শাসন, এমন কি নিজ-প্রকৃতির পরি-হাসের দুর্গতি এড়াবার জন্য, হিংসাকে অহিংসার মুখোস পরতে হয়। এ আত্মগোপনে হিংসা অহিংসার মহিমা-কীর্ত্তন করে। ভণ্ডামী—পুণ্যের প্রতি পাপের শ্রদ্ধা-নিবেদন। কিন্তু পাপের সেবা-নিরত দাস ভণ্ডামী। প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রে সে অনেক অন্যায় সাধতে পারে।

ধর্ম্মের নামে সমাজের চোখে ভণ্ডামী কি রকম ধূলা দেয়, সে কথা সকলে জানে। অথচ প্রত্যেকের চোখে মাঝে মাঝে সে ধূলা পড়ে। কারণ ন্যায়ের প্রতিও মানুষের শ্রদ্ধা শাশ্বত।

অন্যায় নিরাকরণ, অন্ততঃ নিবারণে, সকল সভ্য-সমাজ তৎপর। রাজশক্তি আত্মনিয়োগ করে অসাধুতা লোপের প্রচেষ্টায়। যেখানে প্রতিরোধ অসম্ভব, শাসন সেখানে পাপীকে শাস্তি দেয়। শাস্তির উদ্দেশ্য—আইন-ভাঙ্গা অপরাধীকে কষ্ট দেওয়া—যার ফলে সে আত্মশোধন করতে পারে। শাস্তির অন্যতম উদ্দেশ্য সমাজে দুষ্টের প্রাণে ভীতি সঞ্চার। দণ্ডের ভয়ে মানুষ অন্যায়ের প্রবৃত্তিকে অবদমন করে।

কিন্তু হিংসার রাক্ষস যেমন নিষ্ঠুর তেমনি কূট-বুদ্ধি। তার সুখ—উৎপীড়নে, পরের নিগ্রহ লাঞ্ছনা এবং দেহ ও মনের ক্লেশে। আইনের শাস্তি মানুষকে কষ্ট দেয়। যে প্রকৃত পাপী নয়, চক্রান্তমূলক ভ্রান্তিতে আইনের শাস্তি তাকে নিগৃহীত লাঞ্ছিত এবং ক্লিষ্ট করতে পারে। সুতরাং রাজদ্বারে মিথ্যা অভিযোগ হিংসার উৎপীড়নের একটা প্রণালী। ব্যথিতের মুখোস পরিধান ক'রে ভণ্ড রাজ-শক্তির শরণাপন্ন হয়। মিথ্যাকে সত্যের রূপ দেয়। তার ফলে অনেক নিরীহ লোক শাস্তি পায়।

রাজশক্তির এক কর্ত্তব্য—অপহৃত সম্পদের উদ্ধার। এ কর্ত্তব্য বুদ্ধি অপব্যবহারে নিযুক্ত করতে পারলে

লোভী পরধন নিজস্ব করতে পারে। পরস্বাপহরণ দণ্ডনীয়। এই নীতির উপর লোভীর লাভের জন্ম মিথ্যা অভিযোগের কু-বুদ্ধি। নিজের সম্পত্তি অন্তের কবলে, এ কথার মিথ্যা প্রমাণ দিতে পারলে, নিজে দণ্ডনীয় না হয়ে, পরের দ্রব্য নিজস্ব করা যায়। কারণ বিচারকের কর্ত্তব্য বুদ্ধি যতই সূক্ষ্ম বা তীক্ষ্ণ হ'ক, তাঁকে মানুষের কথা শুনে সিদ্ধান্ত করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ভণ্ডামীর ছদ্মবেশ যার যত পরিপাটী, তার বিজয়-সম্ভাবনা তত অধিক।

ধর্ম্ম বা নীতি সমাজকে শুদ্ধ না করলে, উৎপীড়ন অবশ্যম্ভাবী। সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিও পদে পদে কু-চক্রীর কূট-বুদ্ধির নিকট পরাস্ত হয়।

বলা বাহুল্য কুচক্রী লোভী কাপুরুষ। সম্মুখ সমরে শত্রুকে আক্রমণ করলে, জয় পরাজয়ের সমান সম্ভাবনা। কিন্তু আদালতে মিথ্যা অভিযোগ, জাল দলিল, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতির সাহচর্য্যে, বিপক্ষের হানির সম্ভাবনা অত্যধিক। সেই দুর্ব্বল অসুর মিথ্যা মামলায় বিচারালয় অপবিত্র করে। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় বল্‌তে পারি, মিথ্যা মোকদ্দমার ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত থাকে, তারা দুর্ব্বল প্রকৃতির। তারা সোজা কথা কয় না, লোকের মুখের দিকে স্পষ্ট তাকাতে পারে না। নিছক লাভের জন্ম ব্যবসা হিসাবে এরা মিথ্যা অভিযোগ করে।

এই শ্রেণীর মধ্যে অবশ্য 'ব্ল্যাকমেলার' পড়ে না। সে কুটিল বুদ্ধি, দেহের দুর্ব্বলতা বহু ক্ষেত্রে তার নাই। তেমন লোক জীবনের ভয় দেখিলে, আত্মীয়ের দৈহিক ক্ষতির বিভীষিকায় শীকারকে অভিভূত ক'রে পরস্বাপহরণ করে। একেত্রে উৎপীড়িত দুর্ব্বল। তার সামান্ত ভুল-ভ্রান্তির উপর 'ব্ল্যাকমেল' অপরাধীর মিথ্যা দোষারোপ প্রতিষ্ঠিত। এদেশে এদের অভিযান খুব বেশী নয়।

বহুদিন পূর্ব্বে এমন একজন অপরাধী সস্তার পুস্তক প্রকাশ ক'রে অনেক উচ্চপদস্থ নাগরিকের নিকট অর্থ-শোষনের চেষ্টা করেছিল। তাদের যৌন দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত ক'রে, আগামী বারে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গবে ব'লে ভয় দেখিয়ে, কিছু অর্থ পেলে, ভবিষ্যত সংখ্যায় সে সম্বন্ধে নীরব থাক্‌তো। কিঞ্চিত আদায় করতে না পারলে, কল্পিত নায়িকার সঙ্গে বিশিষ্ট নাগরিকের গুপ্ত প্রেমের চিত্র আঁকত। কাদের অর্থ লেখক নিজস্ব করেছিল, সে সংবাদ সঠিক পাওয়া যায় নি। কিন্তু যাদের বিধ্বস্ত করতে পারে নি তাদের মধ্যে একজন প্রবল ব্যক্তি ছিল। পুলিশ পুস্তিকা প্রকাশকের উপর মামলা চালায়। আমি সরকার পক্ষের উকীল ছিলাম। অপরাধীর মাস কতক জেল হ'ল। কিন্তু শুনেছি এই নোংরা পুস্তক ফেরী ক'রে সে বহু অর্থলাভ করেছিল।

আর এক শ্রেণীর মিথ্যা মামলা পুলিশ কোর্টে এবং ছোট আদালতে রুজু হত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যুক্ত প্রদেশ এবং বেহারের গ্রামের প্রবল শত্রুকে কলিকাতার আদালতের মারফত টেনে এনে নিগ্রহ করা। এখানে অভিযোগ ক'রে তাদের নামে ওয়ারেণ্ট বার করা হ'ত। লোকগুলোকে কলিকাতায় এনে বহুদিন মামলা চালিয়ে কষ্ট দেওয়া হ'ত। ছোট আদালতে এই শ্রেণীর অভিযোগের সংখ্যা এত বেড়ে উঠেছিল যে, সরকার পক্ষ থেকে বিশেষ পুলিশ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করতে হয়েছিল। কতকগুলো মিথ্যা অভিযোগীর পুলিশ কোর্টে শাস্তি হবার পর এ শ্রেণীর মমলার সংখ্যা কমেছে।

এই রকম এক শ্রেণীর মামলাকে পুলিশ কোর্টে—"উড়িয়া চিটিং কেশ"—বলা হয়। এমন নালিসের বিবরণ অতি সরল। একটি নিরীহ উড়িয়া পাচক কিম্বা জলের কলের মিস্ত্রী কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে, জোড়হাতে হাকিমের সম্মুখে অভিযোগ করে। বিবরণ তার গ্রামের দৈত্যারি মহাপাত্র দেশে যাচ্ছিল। সংসারের ইষ্টের জন্ম অভিযোগী দৈত্যারিকে এক কুঁদো মিছরী, এক জোড়া ধুতি, নিজের পরিবারের জন্ম এক খানা সাড়ি, নগদ কুড়িটি টাকা সমর্পণ করেছিল—বাদীর পুত্রকে দেবার জন্ম। অভিযোগী পুত্রের এক খণ্ড পোষ্টকার্ড পেশ করে, প্রমাণ করবার জন্ম যে সে দৈত্যারির নিকট সমর্পিত সম্পত্তি পায় নাই। অসাধু দৈত্যারি সমর্পণ অস্বীকার করেছে।

পূর্ব্বে হাকিমরা এমন অভিযোগে ওয়ারেণ্ট দিতেন। বেচারা দৈত্যারি কস্মিন্‌কালে হয় তো বাজপুরের উত্তরের ভূ-খণ্ডে পদার্পণ করে নি। এখন এমন মামলা হ'লে

দেশে তদন্তের জন্ত পাঠানো হয়। সত্য প্রকাশ পায়। ফলে "উড়িয়া চিটিংকেশ" এখন বিরল। বলা বাহুল্য, প্রকৃতপক্ষে অনেক সময় দৈত্যারি ঐ রকম গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করে। বলেছি মিথ্যা সত্যের মুখোস না পড়লে পরের ক্ষতি করতে পারে না। একটা সত্য ঘটনার কাঠামোয় মিথ্যার গল্প রচনা ক'রে দুর্বৃত্তরা স্বকার্য্য সাধন করে।

বেশ্যাপুত্রকে আইন অনুসারে খোরাকী দিতে হয়। কিন্তু সহজে লোকে জারজের পিতৃত্ব স্বীকার করতে চায় না। আমি প্রথম যখন ওকালতি আরম্ভ করি, পুলিশ কোর্টে এক দারুণ উত্তেজনামূলক মামলা চলেছিল। আমি বর্ণনায় কল্পিত নাম ব্যবহার করব। কিন্তু ঘটনা সত্য।

শ্রীমতী দোপাটিরাণী ছিল অভিযোগকারিণী। তার ছ'মাসের শিশু হাবুকে তার পিতা বরেন্দ্র খোরাকী দিতে অস্বীকার করেছে, এই ছিল দোপাটির অভিযোগ। বরেন্দ্রের উকীলের আমি সহকারী ছিলাম। অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বোসের এজলাসে মামলার শুনানী। মিঃ বোস সহৃদয় খৃষ্টান—ধার্ম্মিক, মিষ্টভাষী, মহাপ্রাণ। দোপাটি পতিতা, কিন্তু শিশু হাবু অসহায়। আমরা বুঝলাম হাকিমের দরদের স্রোত কোন্ মুখে। হাকিম হাবুর মা'র মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। কিন্তু শিশু হাবুর হাত পা ছোঁড়া লক্ষ্য করেন সস্নেহে।

চারজন তার সমশ্রেণীর স্ত্রীলোক প্রমাণ করলে যে বরেন্দ্র ব্যতীত অন্য পুরুষের সঙ্গে দোপাটীর কোনো সংস্রব ছিল না। মাঝে মাঝে বরেন্দ্রর সঙ্গে তার দু'একজন বন্ধু গান শুনতে আস্‌তো। কিন্তু কোনো লোক একেলা এলে দোপাটি তার মুখ দর্শন কর্ত্ত না, রসালাপ তো দূরের কথা।

এক ভীষণ প্রমাণ দিলে অভিযোগিনী দোপাটি, হাবুর পিতৃত্বের। মিউনিসিপ্যালিটির জন্ম রেজিষ্ট্রীতে দেখা গেল, হাবুর পিতৃ পরিচয়—বরেন্দ্র নাথ রায়। ঠিকানা মিলে গেল। বাদী পক্ষের উকীল সগর্ব্বে [illegible]—মামলা তো রুজু হয়েছে ঐ জন্ম তারিখের ছয় মাস [illegible]র। দুনিয়ায় এত আমীর ওমরাহ হোমরা চোমরা থাকতে কেরাণী বরেন্দ্রের উপর ভবিষ্যতে মিথ্যা মামলা রুজু করবার জন্ত কি শ্রীমতী দোপাটী রাণী, তার ছেলের পিতা ব'লে বরেন্দ্রের নাম রেজিষ্ট্রি করেছিল ?

ব্যাপারটা অতঃপর গুরুতর হ'য়ে দাঁড়ালো। হাকিমের শ্লেষের হাসিটুকুও শেলের মত আমাদের বুকে বিঁধলো। আমার 'সিনিয়র' অন্তরালে বরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি ?

সে বল্লে—ভগবান জানেন, আমি ও স্ত্রীলোককে চিনি না। আমার খুড়ো-শ্বশুরকে আমি রূঢ় ভাষায় বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়েছিলাম। আমার স্ত্রীও আমাকে ছেড়ে পিতৃব্য ঘরে যেতে চান নি, তাই সে মিথ্যা মামলা ক'রেছে।

ছ মাস ষড়যন্ত্র করে ?

সে বল্লে—আজ্ঞা হাঁ্যা। আমি তাকে অপমান ক'রে-ছিলাম সাত মাস পূর্ব্বে।

—বেশ কথা।

আবার আমার সিনিয়র তাল ঠুকে লেগে গেলেন। রমারম যুদ্ধ চললো। দোপাটীর সখিদের জেরা হয়, তা'রা মুখ তেড়ে জবাব দেয়। কিন্তু লড়তেই হবে। সত্যের জয় নিশ্চয় হবে।

দোপাটির জেরার সময় এক প্রকাণ্ড কাণ্ড হ'ল। আদালত গৃহে হৈ হৈ ব্যাপার। উকীলের জেরায় দোপাটি কেঁদে বল্লে—চিনি না। এই দেখুন। এটাও কি জাল !

সে বুকের কাপড় খুল্লে। টেনে জ্যাকেটের বোতাম ছিঁড়লে। সেমিজ সরালে। বুকের ওপর উল্কিতে লেখা—প্রাণের বরেণ।

ধর্ম্মপ্রাণ প্রৌঢ় খৃষ্টান হাকিম, ঢাকো, ঢাকো, ব'লে চোখ বুজলেন। দোপাটির উকীল বল্লে—না হুজুর দেখতে হবে। বিচার গৃহ তো মন্দির। সেখানে লজ্জা কি ? নেহাত বিপদে না পড়লে স্ত্রীলোক বস্ত্র সরিয়ে বুকের লেখা দেখায় না।

তারপর আর কোনো কথা চলে না। বরেন্দ্রের পক্ষের মামলা হার হ'ল। তার বিরুদ্ধে ডিক্রী হ'ল—প্রতি মাসে শ্রীমান হাবুচন্দ্র রায়কে বরেন্দ্র রায় দশ টাকা ক'রে খোরাকী দেবে। পুত্র তার।

হাইকোর্টে আপীল হ'ল।

কিন্তু হাবুচন্দ্র পরলোকগমণ করলে।

তার শোক-সন্তপ্তা জননী আমার সিনিয়রের কাছে এসে স্বীকার করলে, বরেন্দ্রের খুড়-শ্বশুরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে সে মিথ্যা অভিযোগ করেছিল। বরেন্দ্র তার অপরিচিত। ভগবান তাকে শাস্তি দিয়েছেন।

এ সব মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যহ রুজু হয় না। কিন্তু মানুষের শয়তানী অপরের উপর উৎপীড়ন করবার জন্য কতখানি মিথ্যাকে আশ্রয় করতে পারে, দোপাটি-বরেন্দ্রের মামলা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সত্য মিথ্যা জানি না। এক দিনের আদালতের মজার কথা বলি। তখন আমি অতি নবীন। খরনূহীল সাহেব হাকিম।—বাবু দ্বিভাষী। পুলিশ কোর্ট তখন লালবাজারে। দ্বি-ভাষী-বাবু এবং সে মামলার উকীল ক—বাবু উভয়েই পরলোকে।

সকাল বেলা নালিশের সময়। উকীলরা দরখাস্ত পেশ করে। ইণ্টারপ্রেটার একে একে বাদীর নাম ডাকে। বাদী কাটগড়ায় উঠে। উকীল বুঝিয়ে দেয় কি মামলা। হাকিম হুকুম দেন, আসামী তলব হবে কি পুলিশ তদন্ত হবে ইত্যাদি।

দ্বি-ভাষী ডাকলেন—সাকিনা বিবি।

বোরকা-ঢাকা একজন কাঠ-গড়ায় দাঁড়ালো।

উকীল ক—বাবু বললেন—হুজুর এর স্বামী খসরু খাঁ একে খেতে দেয় না। সে জাহাজে কাজ করে।

হাকিম যখন হুকুম লিখ্‌ছেন ইণ্টারপ্রেটার—বাবু বল্লেন—ও ক—বাবু বোরকার ভেতর থেকে আপনার মক্কেলের যে দাড়ি উকী মারছে।

আমরা সব হেসে উঠ্‌লাম। ক বাবুর মক্কেল "সাকিনা বিবি" বেশ ভাল ক'রে অবগুণ্ঠন টেনে লজ্জাবতী লতার মত দাঁড়ালো।

তার স্বামীর উপর শমন জারী হ'ল।

কু লোকে বলেছিল—মামলাটা সত্য। তবে সাকিনা বিবি পরদানসীন গৃহস্থের মেয়ে, কাছারীতে আসতে গা ছম্ ছম্ করছিল। তাই তার ভাই হালিম বোরকা ঢাকা দিয়ে সাকিনা সেজে মামলা রুজু করে গিয়েছিল। পরে মামলা মিটে গিয়েছিল। সাকিনা—খসরু সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করেছিল।

আত্মীয় বিরোধের ফলে খোর-পোষের জন্ত একটা অভিযোগের বিষয় স্মরণ হচ্ছে। চাঞ্চল্যকর সে-মামলা হ'য়েছিল লালবাজারে তদানীন্তন দ্বিতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর আবদুল সালমের এজলাসে।

এক প্রসিদ্ধ মুসলমান বংশের ধনী যুবকের নামে এই মামলা হয়। বাদিনীর পক্ষ হ'তে তার তথাকথিত ভ্রাতা নালিশ করে যে তার ভগ্নীপতি রহিম (কল্পিত নাম) সাহেব তার ভগ্নীকে নিকা করেছে। কিন্তু তারপর তাকে ত্যাগ করেছে। খানা-খোরাকী দেয় না। বেচারা পরিত্যক্তা স্বামীবিরহে এবং অনশনে কষ্ট পাচ্ছে।

মামলা খাঁ বাহাদুরের এজলাসে বদলী হ'য়েছিল। তখনকার দিনের সকল হোমরা চোমরা উকীল ব্যারিষ্টার প্রতিবাদীর পক্ষে নিযুক্ত হ'ল। বাদিনী গরীব। তার পক্ষে ছিলাম আমি এবং এক প্রবীন উকীল। আমি বুঝেছিলাম যে অভিযোগ সত্য। ধনী যুবক রহিম মোহের বশে তরুণীর পাণি গ্রহণ করেছে। এখন চোখের নেশা কেটে গেছে। ছেঁড়া জামার মত পরিণীতা স্ত্রীকে বর্জ্জন করেছে। তার ভ্রাতার কথা বার্ত্তা হ'তে ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভিন্ন মতান্তরের অবকাশ ছিল না।

প্রতিবাদী নালিশ অস্বীকার করেছিল। তার কোন শত্রু ষড়যন্ত্র ক'রে তার অপযশ করবার জন্ত এই মামলা রুজু করেছে।

সাক্ষী হ'ল। মোল্লা, উকীল বাপ প্রভৃতি যথাযথ বিবাহ প্রমাণ করলে। শেষে স্ত্রীর সাক্ষী দিবার পালা পড়লো।

বাদিনী আদালতে হাজির হ'ল, অর্থাৎ বড় ঘরের বেগম সাহেবার মর্য্যাদা অনুসারে কাছারী গৃহে এক পাল্কী প্রবেশ করলো। তার উপর আস্তরণ ঢাকা।

তার ভ্রাতা পাল্কীর মধ্যে দেখে বেগমকে সনাক্ত করলে। পাল্কীর কাছে দ্বিভাষী চৌকী নিয়ে বসলেন। তখন হাকিম বললেন—"প্রতিবাদী পাল্কীর মধ্যে দেখুক কে আছে। একজন, কি দু'জন তার নিজের বেগম কি অন্যজন।"

সত্যই তো এ তথ্য আসামী ভিন্ন প্রতিপক্ষের কারও সংগ্রহ করবার অধিকার নাই। পাল্কীর ভিতর অসূর্য্যম্পশ্যা কুল মহিলা।

অনেক আপত্তি হ'ল। বে-আইন, ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে বক্তৃতা হ'ল। মানুষের কৌতুহলও তো সহজাত। প্রতিবাদী মিঃ রহীম বাদিনীকে দেখতে সম্মত হ'ল।

সবাই স্থির। সত্য যদি স্ত্রী হয়, পরস্পরের চারিচক্ষুর মিলনে প্রেমের দেবতার ফুলশর লক্ষ্য ভেদ করবে না কে বলতে পারে। একটা বড় ঘরের কলঙ্ক মুছে যাবে। হাকিমেরও ঐ রকম একটা উদ্দেশ্য ছিল।

বুঝলাম পাল্কীর মধ্যেও বাদিনী বোরকা ঢাকা দিয়ে বসেছিল। দ্বার সামান্য উন্মুক্ত হ'ল। গোলাপী আতরের গন্ধে কাছারী কক্ষ ভরপুর হ'ল। ইণ্টারপ্রেটার অ বাবুর একাধিকবারের অনুরোধে বাদিনী মুখের কাপড় তুললে।

—"ইঃ আল্লা! তোবা তোবা বলে প্রতিবাদী রহীম দৌড়ে পালিয়ে গেল।

— "কী ব্যাপার?"—হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন।

—"ভুতনী—ভুতনী"—ব'লে রহীম চিৎকার করে উঠলো।

দ্বিভাষী বোঝালেন--পেত্নী বলছে প্রতিবাদী।

সভার গন্‌গমে ভাব পরিবর্ত্তিত হ'ল। শান্তি শৃঙ্খলা গোল্লায় গেল। হাসির রোলে আদালতের মর্য্যাদা অবলুপ্ত হ'ল। সার্জ্জেণ্ট—'চোপ, আসৃটে' বলে মুহুর্মুহু চীৎকার করতে লাগলো।

যখন বাদিনীর এজাহার হ'ল, আমি স্বয়ং লজ্জিত হ'লাম। পাল্কীর দ্বারোদ্‌ঘাটনের অবসরে আমি তার মুখ দেখেছিলাম। এক কুৎসিৎ বীভৎস চেহারা—কালো মোটা, মুখে বসন্তের দাগ। তার ভাষা, উচ্চারণ, কণ্ঠস্বর প্রভৃতি হ'তে নিঃসন্দেহে বোঝা গেল যে, সে অতি নিম্ন শ্রেণীর গণিকা।

মামলা ডিস্‌মিস হ'ল।

পরে উভয় পক্ষের তদ্বিরকারকদের মুখে শুনলাম—রহিমের ভগ্নীপতি এই মিথ্যা মামলা রুজু করিয়েছিল। প্রথমে তারা এক সুন্দরী সংগ্রহ করেছিল। চেহারা ভাল, জবান সিরিন্ দোরস্ত। কিন্তু রহীমের তদ্বিরকারকেরা তাকে ভয় দেখিয়ে, কিঞ্চিৎ অর্থব্যয়ে নিরস্ত করে'ছিল। তারপর তারা অন্য এক রমণীকে সম্মত করেছিল। তারও দশা পূর্ব্বের মত হ'য়েছিল। শেষে গোপনে হাওড়া থেকে তারা এই প্রেত রমণীকে শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছিল।

মানুষের হিংসাবৃত্তির সীমা নাই। সমাজ তাকে সংযত করে। কিন্তু চেষ্টা সকল ক্ষেত্রে সফল হয় না। আমি যে কার্য্য করি, তাতে মানুষের মনের এই কুৎসিৎ বিকাশটা পর্য্যবেক্ষণ কর্ব্বার অবসর প্রত্যহই পাই।

বন্ধু বান্ধব অনেক সময় জিজ্ঞাসা করেন—নিজের মনের উপর এর কি ফল হয়?

মানব প্রকৃতিকে সত্য ব'লে মানি তাই এসব দেখেও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাই না। মানুষ বিরোধ-ধর্ম্মী, পশুত্ব ও দেবত্বের সংমিশ্রণ। এইটাই মনুষ্য-জগতের ধারা। সে জ্ঞানের শ্বেত আলোকের আবাহন করে, আবার জ্ঞানের রশ্মিকে চোখ বুজে প্রবেশ-অধিকার দেয় না। পৃথিবীর এই ধারার নামই মায়া। সুতরাং সবার উপরে মানুষ সত্য—এ সত্যের প্রতি আস্থা হারাবার কোনো কারণ নাই। আপনাকে শুদ্ধ করা মানুষের ধর্ম্ম। তাকে ঘৃণা করা পশু-প্রবৃত্তি। পাপী ঘৃণ্য নয়, কারণ সে আমারই মত দোষ গুণে মেশানো মানুষ।

মানুষ ও পশু

[গল্প]
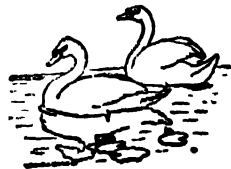
শ্রীকুমুদিনীকান্ত কর

আকুল আর্ত্তনাদ ! বিরাম নাই ! বাতাস চঞ্চল করিয়া তুলিল। গাছের পাতা যেন কাঁপিয়া উঠিল। আকাশ যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল।

—সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে ভদ্র পল্লী। পাহাড়-কাটা আঁকা-বাঁকা উচু নীচু লাল পাথরের সুন্দর পথটি পল্লীর বুক চিড়িয়া পুব থেকে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। দুই পাশে ফুল-ফল গাছে ঘেরা একই নমুনার ছোট ছোট বাড়ীগুলি ঠিক কুঞ্জেরই মতন দেখিতে সুন্দর। দুপুরের খরতর রৌদ্র। নিঝুম পল্লীটি যেন ক্লান্ত দেহে সুপ্ত। ঘন পল্লবের ছায়ায় বসিয়া মুখর পাখী নীরব। নতশির ফুলের গুচ্ছ অচঞ্চল। পথ পরিত্যক্ত। এই নির্জ্জন পথে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছিল একটী বুভুক্ষিত শীর্ণ কুৎসিৎ রাস্তার কুকুর। সে ছুটিতেছিল আর প্রতিটি গৃহের দরজার দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। সে খুঁজিতেছিল তার প্রাণ রক্ষার জন্য একটু নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু সমস্ত গৃহদ্বারই ছিল বন্ধ। এমন সময় রাস্তাটীর প্রায় পশ্চিম সীমায় একটী গৃহের দ্বার ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। একটী পাঁচ বছরের বালক ছুটিয়া বাগানের দরজা খুলিয়া রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। কুকুরটা প্রায় সেই সময়েই তাহার উপর আসিয়া ঝাপাইয়া পড়িল। বালক উহার বেগ সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। হাসিতে হাসিতে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া কুকুরটাকে কিল দেখাইয়া বলিল, 'এই ভারি দুষ্টু ত তুই, আমায় যে ওভাবে ফেলে দিলি, অ্যাঁ ? —হা-হা-হা— আচ্ছা আবার ফেল্ ত দেখি—'

কুকুরটা রাস্তার দিকে সভয়ে তাকাইয়া তিন বার ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ করিয়া উঠিল। তার পর ঘাড় নাড়িয়া তাহার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খোকা তাহার কাণ দু'টী ধরিয়া হাসিয়া বলিল, 'এই, ভয় পেয়েছিস্ বুঝি, ভারি বোকা ত তুই ? আচ্ছা দাঁড়া তবে আমি তোকে ফেলে দিচ্ছি—'

কুকুরের লেজটা ধরিবার জন্য সে হাত বাড়াইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কুকুরটা পুনরায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া ছটফট্ করিতে করিতে বালকের দুই পায়ের ফাঁকের মধ্যে কোন রকমে ঢুকিয়া উঁ-উঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বালক পিছন ফিরিয়াই দেখিল মাথায় লাল পাগড়ি, গায় কালো জামা মিশমিশে কালো একটা লোক প্রকাণ্ড তেল-কুচকুচে একটা বাঁশের লাঠি উঠাইয়াছে কুকুরটাকে মারিবার জন্য। সে চীৎকার করিয়া উঠিয়া কুকুরটাকে দুই হাতে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, 'মারিস্ নি, মারিস্ নি ওকে, যা তুই এখান থেকে, নইলে ব'লে দোব মা'কে, ভারি দুষ্টু তুই, যা—'

লোকটা বলিল, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ওটাকে খোকাবাবু, ওটাকে আমি মেরে ফেল্‌ব।'

'কেন মেরে ফেল্‌বি তুই ওকে ? ও তোর কি করেছে ? কষ্ট হবে না তোর ? ওকে মার্‌লে আমি কাঁদবো দেখিস্। যা, তুই চলে যা এখান থেকে।'

খোকা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে কুকুরটাকে বুকে আরো চাপিয়া ধরিল।

কুকুরটা খোকার ক্ষুদ্র বুকটুকুকে সারা সংসারের মধ্যে তাহার একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় মনে করিয়া উহার সঙ্গে লাগিয়া রহিল এবং থাকিয়া থাকিয়া লোকটির মুখের দিকে কাতর নয়ন তুলিয়া যেন জীবন ভিক্ষা মাগিতে লাগিল।

খোকার চোখের জল এবং কুকুরের কাতর নয়ন লোকটার অন্তরে কি জানি কি করিল! কেমন যেন একটা ব্যথায় তাহার সারা অন্তর টন্ টন্ করিয়া উঠিল! কিসের এ অনুভব! এ রকম ত তাহার কোন দিন হয় নাই! ব্যথাটা চাপা দিবার জন্যই তাহার একটা হাত যেন আপনা হইতেই বুকের উপর আসিয়া স্থির হইয়া রহিল। কি যেন সে বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু পারিতেছিল না। কি যেন তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিল। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে সে বলিল, 'খোকাবাবু, আমি যে ডোম, এগুলোকে মারাই যে আমার কাজ।'

কথাগুলি নরম। গলার সে জোর যেন আর নাই। তাহার নিজের কথায় নিজেই সে চমকিয়া উঠিল।

খোকা বলিল, 'না, তুই মারতে পারবি না আর ওদের। মারতে তোর কষ্ট হয় না ?'

খোকার যেন কত অধিকার তাহার উপর, যেন কত কালের কত ঘনিষ্ট আত্মীয়তা তাহার সঙ্গে! কি মিষ্টি কথা খোকার!

ডোম তাকাইল খোকা আর কুকুরটার পানে। তাহাদের চারিটি কাতর নয়ন এক যোগে যেন তাহাকে তীব্র ধিক্কার দিয়া উঠিল! তাহার মাথায় যেন হঠাৎ কে বড় জোরে আঘাত করিল! তাহার নিত্যকার অতি সাধারণ শিকার সামান্য একটা কুকুরকেও ত সে এত জোরে কখনো আঘাত করে না! মাথাটা তাহার ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল!...একি! তাহার শ্বাসটা যেন হঠাৎ একটু থামিয়া গেল না! একি! তাহার ভিতরটা কেমন যেন একটু মোচর দিয়া উঠিল না। একি! বাঁধা পাইয়া পাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছুটিয়া আসিতেছে না?...'নাঃ—' সে-সব যেন সে গায়ের জোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, 'না, দেখি দেখি, তুমি সরে যাও খোকাবাবু।' সে খোকাকে এক হাতে ধরিতে গেল। খোকা প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল!

ডোম একটু দূরে সরিয়া আসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, 'তা হ'লে যে আমার ভাত জুটবে না খোকাবাবু।'

খোকা অশ্রুমাখা মুখখানা তুলিয়া বলিল, 'আমার ভাত তোকে দোব খেতে মা-কে ব'লে। মারবি না ত তবে ওকে?'

ডোম লাঠি হাতে স্তম্ভিত হইয়া স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকটা আর লাঠি সমেত হাতটা একবার কাঁপিয়া উঠিল।

খোকার চীৎকারে অনেকগুলি ঘরের দরজাই পট্ পট্ খুলিয়া গিয়াছিল। লোকেরা দরজায় দাঁড়াইয়াই ব্যাপারটা একবার দেখিয়া লইল। তারপর মায়েরা ছেলে-মেয়ে সমেত একে একে আসিয়া সেখানে জড় হইল। খোকার মা, বোন, ভাইও আসিল। তাহারা অবাক হইয়া খোকার কাণ্ড দেখিতেছিল। সকলের লাল চোখ ঐ ডোমের উপর। কি আস্পর্দ্ধা ওর! সকলের চোখেরই যেন এই নীরব ভাষা। এক বৃদ্ধা কিন্তু হঠাৎ সহানুভূতির স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'আহা-হা, ওকে তোমরা কিছু ব'ল না গো ব'ল না! আর জন্মের না জানি কত মহাপাপের ফলে ওর এই জন্ম! আহা হা বেচারী!'

ডোম অদূরে একইভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। চোখে তাহার পলক নাই। দৃষ্টি তাহার স্থির হইয়া ছিল খোকা আর কুকুরের উপর।

খোকা কুকুরটাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, 'ও আর তোকে মারবে না জানিস্? আমি ওকে খেতে দোব।' কুকুরটা ডোমের দিকে চাহিয়া চোখ পাকাইয়া আক্রোশ প্রকাশ করিয়া ডাকিল, 'ঘেউ—ঘেউ।'

খোকা এবার তাহাকে একটু দূরে ঠেলিয়া নিয়া বলিল, 'এই ফেল ত আবার আমায় চিৎ ক'রে?'

কুকুরটা তাহার কাছে দাঁড়াইয়া ঘাড়টা একবার কাত্ করিল, বার কয়েক কাণ দুইটা নাড়িল, তারপর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে পায় মাথা ঘসিতে লাগিল, তারপর মাথা তুলিয়া ডাকিল, 'ঘেউ—উ—উ'। দীর্ঘ স্বর, বড় করুণ! আবার পায় মাথা রাখিল, আবার সেই করুণ ডাক ডাকিল। কৃতজ্ঞতা! চোখে যেন একটু জল! সত্যিই ত! খোকার কাছে কিন্তু ফাঁকি চলে না। বন্ধুর চোখের জল সে ধরিয়া ফেলিল। ব'লিল, 'এই, তুই কাঁদছিস্, অ্যা? দ্যাখ্ ত আমি কাঁদিনি। কাঁদলে যার চ'খে জল আসে, জানিস্?'

কুকুর 'ঘেউ' শব্দ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে দুই চারি বার ছুটাছুটি করিল, সামে আসিয়া তাহার হাত চাটিয়া দিল একবার, ঘাড় দোলাইয়া লেজ নাড়িয়া সামের একটা পা উঠাইয়া একটু বাঁকা করিয়া বাড়াইয়া দিল বন্ধুর দিকে। হি—হি—হি—হি—খোকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া তাহার পা-টা ধরিয়া বলিল, 'খেলবি? আয়।'

'গো-ও-ও-ও' শব্দ করিয়া কুকুরটা বন্ধুর পা চাটিয়া দিল। আহ্লাদ! আহ্লাদ আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া সে এবার তার ক্ষুদ্র বন্ধুটির একটী হাতে আস্তে কামড় দিল, এত আস্তে যে তাহার কচি হাতেও একটীও দাঁতের দাগ পড়িল না। শব্দ করিল, গো-ও-ও

খোকা আবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নাচিয়া নাচিয়া বলিল, "লাগেনি—লাগেনি রে—এই আরো জোরে দে—"

এই সময় হঠাৎ একটা চীৎকার শোনা গেল। 'খেল—খেল—খোকাকে খেল—" বলিয়া খোকার মা পাগলের মতন ছুটিয়া আসিল। তাহার চীৎকার শুনিবামাত্র কুকুরটা বন্ধুর হাত মুখ হইতে ছাড়িয়া দিয়াছিল। মা এক লাথি মারিয়া তাহাকে দূরে ফেলিয়া দিয়া খোকাকে বুকে তুলিয়া লইয়া দ্রুত গতিতে ঘরের দিকে চলিয়া গেল। খোকা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওকে তুমি মার্‌লে কেন? ওযে কিছু খায়নি এখনও, ওই যে—ওই—যার হাতে লাঠি, ওকে আমার ভাত দেবে খেতে···ছেড়ে দাও, যাব না আমি।"···

উত্তর স্বরূপ মা খুব কম করিয়া তিন চারিটি কিল তাহার পিঠে বসাইয়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। খোকার বুক-ফাটা কান্না কিন্তু তবুও বেশ শোনা যাইতেছিল। খোকার বন্ধু লাথির চোটে যেখানে গিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল, তখনো সেখানেই মরার মতন দাঁড়াইয়াছিল। উঁ-উঁ-উঁ—খোকাদের ঘরের দিকে চাহিয়া সে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সামনের একটা পা উঠাইয়া দু' একবার একটু বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া দোলাইয়া দোলাইয়া যেন বন্ধুকে ডাকিল। একটি প্রতিবেশিনী তিন সন্তানের মা, তাড়াতাড়ি তাহার ঘর হইতে কিছু মাছ মাখা ভাত আনিয়া তাহার মুখের নীচে রাখিয়া বলিল 'খা-।'

কুকুরটা ভাতের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া দাতার মুখের দিকে করুণ নয়নে চাহিল। তারপর খোকাদের ঘরের দিকে চাহিয়া ডাকিল, ঘেউ-উ-উ উ-। খেদোক্তি! মূকের অন্তর যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। সে ভাত ছুঁইলও না।

সকলে চলিয়া গেল। কিন্তু মূক বিষণ্ণ হৃদয় লইয়া বসিয়া রহিল তাহার সরল বন্ধুর আগমন প্রত্যাশায়।

আরো একজন গেল না। সে ডোম। সে একটু উপুর হইয়া লাঠির উপর দুইটী হাতে তার বামগণ্ড রাখিয়া তখনো একই ভাবে তাহার বধ্য জীবটী এবং খোকাদের ঘরের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে একবারও ত কেহ ফিরিয়া চাহিল না! সে ঘৃণ্য! ওই পশুটিও স্পৃশ্য! কিন্তু সে অস্পৃশ্য! সে হত্যাকারী! মানুষ হ'য়েও বৃত্তি তাহার পশুর। আর ওই পশুর যেন মানুষের আত্মা। সে ওই পশুরও নীচে—নীচে—নীচে! তবে—তবে? কি হইবে—কি হইবে তাহার? এই প্রশ্ন—এই কঠিন প্রশ্ন জাগিল তাহার অন্তরে। অন্তর জিজ্ঞাসা করিল এই প্রশ্ন অন্তরাত্মাকে; ক্লিষ্ট অন্তর খুঁজিল আশ্রয় একমাত্র আশ্রয়দাতার কাছে। হা ভগবান!—একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার বুক কাঁপাইয়া ঝরের ন্যায় হু হু করিয়া বহিয়া গেল। সে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল বাতাসের আগে পূব দিকে।

* * * *

"ভগবান! কেন হয়েছিল আমার এ জনম!" গভীর রাত্রির অন্ধকারে গাছের নীচে একাকী বসিয়া এক দুঃখী যন্ত্রণায় কাতর হইয়া দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মনে মনে এই অনুযোগ জানাইল তাহার ভগবানকে। কাতর নয়ন তাহার চাহিয়া রহিল ঊর্দ্ধপানে। গভীর নিস্তব্ধতা ঘিরিয়া রহিল তাহাকে। হঠাৎ ঠন্ করিয়া সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া খুব জোরে একটা মোটা বাঁশের লাঠি আসিয়া পড়িল লাল পাথরের পথের বুকে। তারপর একটা পাগড়ী, তারপর একটা জামা, তারপর একখণ্ড ছিন্ন মলিন পরিধেয় বস্ত্র স্তূপীকৃত হইয়া রহিল সেগুলি পথের মাঝে। লালপাগড়ীটা ছড়াইয়া পড়িয়া রহিল একটা মস্ত বড় নিস্তেজ অজগরের মতন। লেংটিসার লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। "মালেক! কোথা তুমি? পথ দেখাও।" তাহার অন্তরের আকুল আহ্বান! দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া সে তাকাইয়া রহিল ঊর্দ্ধমুখে তারা-ভরা ওই আকাশের দিকে। টস্ টস্ টস্—অশ্রু ঝরিয়া পড়িল তাহার বুকের উপর। পথের সন্ধান বুঝি তাহার মিলিল।

হঠাৎ সে দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিল পশ্চিম দিকে পাগলের মতন। একটা তীব্র আকুলতা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল।

খোকাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া তাহার অতি দ্রুতগতি হঠাৎ থামিয়া গেল। সে বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া রাস্তার

উপর ধীরে ধীরে বসিয়া কুকুরটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কুকুর তাহার একটু সামে খোকাদের ফুলবাগানটুকুর দরজার মুখে বসিয়া তখনো সেই একই ভাবে বাড়ীটার দিকে তাকাইয়াছিল। হঠাৎ সে পিছনে পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া ঘাড় ফিরাইয়া লোকটাকে দেখিয়াই প্রাণ ভয়ে চীৎকার করিতে যাইতেছিল। কিন্তু লোকটার মুখের দিকে নজর পড়িতেই তাহার ভাব যেন হঠাৎ বদলাইয়া গেল। লোকটার অবিরাম অশ্রুধারা তাহাকে যেন টানিতে লাগিল। উঁ-উঁ-উঁ—সমবেদনা! শব্দটা অস্ফুট। সে যেন ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে নড়িয়া চড়িয়া বসিল। না, তাহার ভিতরের অস্থিরতা যেন তাহাকে আর বসিতে দিল না। সে উঠিয়া নবাগতের দিকে মুখ করিয়া নীরবে ক্ষণেক দাঁড়াইল। পরে এক পা এক পা করিয়া তাহার দিকে আগাইয়া গেল। সম্মুখে আসিয়া একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উঁ উঁ উঁ—এবারও সেই অস্ফুট শব্দে গভীর সহানুভূতি! নবাগত তখনও নীরব। কুকুরের দিকে তাহার সেই করুণ অপলক দৃষ্টি! নীরব অশ্রুতে তাহার কত কথা—কত প্রশ্ন, কত উত্তর, কত ব্যথা, কত নিবেদন! মন তাহার কাঁদিয়া আকুল হইয়া লুটাইতেছিল ওই মূক পশুর পায়! তাহার নীরবতা যেন হাহাকার তুলিয়া মাগিতেছিল ক্ষমা—ক্ষমা—ক্ষমা!

কুকুর লেজ্‌ নাড়িয়া ডোমের হাত পা শুঁকিয়া মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল, ঘেউ -। পশু এবার ক্ষমা করিল মানুষকে।

তারপর দুই বন্ধু পাশাপাশি নীরবে বসিয়া রহিল সেই পথের দিকে চাহিয়া যে পথে কাল তাহাদের ক্ষুদ্র সরল বন্ধুটি তাহাদের ফেলিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল।

ভোর। খোকাদের ছোট জাম গাছটার সব চেয়ে নীচু ডালে বসিয়া একটা দোয়েল ভোরের হাওয়ায় আনন্দে মাতিয়া বড় মিঠা সুরে শিস্‌ দিয়া গান ধরিয়াছিল। কিন্তু সেই সবটুকু মিষ্টি নষ্ট করিয়া খোকাদের চালায় উড়িয়া আসিয়া বসিয়া একটা কাক অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল। ঘরের সামের একটা জানালা আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল। একখানি ক্ষুদ্র মুখ তাহার ভিতর দিয়া উঁকি দিল। বাহিরের অপেক্ষমান জীব দু'টী আনন্দে দুলিয়া উঠিল। মানুষটির মুখে আনন্দের নীরব হাসি, পশুটির মুখে আনন্দের ডাক—ঘেউ-উ-উ। হি-হি-হি-হি—খোকাও বন্ধুদের দেখিয়া আনন্দে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "এই দাঁড়া তোরা, যাচ্ছি আমি।" তাহার পিছনে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল একটী পুরুষ, তাহার পিছনে একটী নারী—খোকার মা ও বাবা। বাবা বাহিরের দিকে তাকাইয়াই সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! ছাখ—ছাখ এসে।" মা তেমনি বিস্ময়ে বলিলেন, "তাই-ত', এ যে অদ্ভুত!" তাঁহারা অবাক হইয়া ডোম এবং কুকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বাবা দরজাটা খুলিয়া দিলেন। ন্যাংটা খোকা ছুটিয়া গেল বন্ধুদের কাছে। ঘেউ-ঘেউ—করিয়া কুকুরটা পিছনের দুই পায় ভর করিয়া দাঁড়াইল একবার, তারপর খোকার গা-টা বারম্বার শুঁকিল; তারপর তাহার পায় লুটাইয়া পড়িয়া মাথাটা ঘসিতে লাগিল। খোকা তেম্নি করিয়া হাসিয়া হাসিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল, "এই, ফেলে দে ত' আমায় আবার কালকের মতন চিত্‌ ক'রে।" শুধু একবার ঘেউ করিয়া কুকুর যেন তাহার অপারগতা জানাইল।

স্বামী এবং স্ত্রী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামী স্ত্রীকে প্রতিবেশীদের দেওয়া অভুক্ত ভাতগুলি ইঙ্গিতে দেখাইলেন। স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ঘরের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছিলেন কিছু খাবার আনিতে। কিন্তু স্বামী তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "উঁহু—খোকার হাতে দিয়ে নিয়ে এস, তা' না হ'লে কুকুর ছোবেও না।" তাহাই হইল। খোকা নিজ হাতে খাইবার পাত্রটা কুকুরের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল। আজ ক'দিনের অভুক্ত কুকুর ভাতগুলি একবার শুঁকিয়া খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে কতবার সে মুখ তুলিয়া খোকার দিকে চাহিয়া ঘেউ ঘেউ করিল। তাহার কৃতজ্ঞতার যেন আর শেষ নাই।

ডোমের মুখ হাসিতে ভরা। চোখ দুটী আনন্দে উজ্জল, কিন্তু একটু আকুল। চোখের কোণে দুই বিন্দু

জল টলটলায়মান। তাহার দুটী হাত খোকার দিকে এক সময় ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়াছিল। তাহার দৃঢ় পেশীবহুল বাহুদ্বয় খোকাকে আকুল আহ্বান জানাইতেছিল। তীব্র আকুলতায় তাহার বাহুদ্বয় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কেহ তাহা লক্ষ্যও করিল না। সে একই ভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিল। হঠাৎ উহা খোকার নজরে পড়িল। হি-হি-হি-হি—হাসিতে হাসিতে চারিদিকে আনন্দের ঢেউ তুলিয়া খোকা তাহার দিকে পা বাড়াইল। বাপ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। মায়ের বুক কিন্তু দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। ও ডোম, ওর কাছে যাবে, ও ধর্‌বে, ওর চাউনিটা যেন কি রকম, খোকার যদি কিছু হয় শেষে—মমতাময়ী মায়ের প্রাণের অহেতুক ভয়। চিন্তাকুল মা পা বাড়াইলেন তাহাকে ধরিতে। বাপ তাঁহাকে চোখের ইসারায় বারণ করিলেন।

ডোম খোকাকে সন্তর্পণে বুকে রাখিয়া চোখ বুজিল। কিছুক্ষণ পর একটী মাত্র শব্দ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—আঃ! অস্ফুট শব্দ। আনন্দের স্রোতে নিমজ্জিত কণ্ঠস্বর! তাহার সে নিঃশ্বাসে ছিল পূর্ণ শান্তি!

খোকার শির চুম্বন করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে বক্ষচ্যুত করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আনন্দ! আনন্দে যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া চুয়াইয়া পড়িতেছিল। অশ্রু! দরবিগলিত অশ্রু! বিদায়—বিদায়! সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিল। শেষ বার খোকা এবং কুকুরের দিকে চাহিয়া চিরপরিচিত লাল পাথরের পথের উপর দিয়া হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিল। আর সে ফিরিয়া চাহিল না। তাহার কণ্ঠ যেন চীৎকার করিতে থাকিল—ক্ষমা ক্ষমা—ক্ষমা! অন্তরে সে শুনিল বিষাদের ধ্বনিতে ইহার প্রতিধ্বনি—ক্ষমা—ক্ষমা—ক্ষমা!

খোকা তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া গিয়া ডাকিল, 'আয়, আয়—।" তবুও সে আসে না দেখিয়া রাগ করিয়া বলিল, "বারে,—আস্‌ছে না তবু—বাবাকে তবে ব'লে দোব, তোকে মার্‌বে—।" কিন্তু তবুও সে ফিরিল না। খোকা রাগ করিয়া রাস্তার মাঝখানে পা ছুড়িতে ছুড়িতে কান্নার সুর ধরিল।

কুকুরটাও খোকার সঙ্গে গিয়াছিল। ডোম খোকাকে ফেলিয়া যখন চলিয়া গেল, তখন সে ছুটিয়া তাহার কাছে গিয়া পিছন হইতে ডাকিল, 'ঘেউ—ঘেউ—।' সাদর আহ্বান—আয়, আয়। তবুও ডোম চলিতে লাগিল। কুকুর এবার তাহার একমাত্র সম্বল নেংটির একটা কোণ দাঁতে কামড়াইয়া টানিয়া ধরিল। এবার ডোম থমকিয়া দাঁড়াইল। 'ঘেউ—ঘেউ—', কুকুর তাহার মুখের দিকে চাহিয় পুনরায় ডাকিল, 'ঘেউ—ঘেউ—আয়, আয়—ওরে ফিরে আয়—।' স্নেহের অধিকারে সে যেন জানাইল তাহার প্রাণের আবেদন। ডোম নীরবে পরম স্নেহে তাহার মাথায় দুই হাত বুলাইয়া দিয়া গ্রীবা দোলাইয়া যেন জানাইল,—'না, না, না ভাই আর ফিরব না, আমায় আর ডেক না—।' বন্ধুকে ছাড়িয়া ডোম আরো দ্রুতগতি গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। কুকুর হতাশভাবে সেখানে বসিয়া পড়িয়া সেই পথের দিকে চাহিয়া যেন বড় আকুল হইয়া কাঁদিল—উ—উ—উ!

খোকার বাবা আসিয়া খোকাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। খোকা কাঁদিয়া বলিল, 'ও চ'লে গেল কেন? ও আমার ভাত খাবে না?' বাবা বলিলেন, 'না, সে আর আস্‌বে না খোকা—'

তার পর ডোমকে আর সে অঞ্চলে কেহ দেখে নাই। কুকুরটা বারম্বার উপেক্ষিত হইয়াও জীবনদাতা খোকার সঙ্গ জীবনেও ছাড়ে নাই।

প্লেটোর সাহিত্যবিচার

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

এক

সাহিত্যের স্বরূপ লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্লেটোর বৈশিষ্ট্য নানাদিক্ দিয়া বিচার্য্য। প্রথমতঃ কবিদের বিরুদ্ধে তিনি যেরূপ বিক্ষোভ ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আর কোন শ্রেষ্ঠ লেখক করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তিনি নিজের পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র হইতে কবিদিগকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। যদি কোন কবির কোন কাব্য রাষ্ট্রে স্থান পায়, তাহা হইলেও ম্যাজিষ্ট্রেটগণ বিচার করিয়া দেখিবেন যে, ইহাতে দেবতা ও মহামানবদের জয়গান করা হইয়াছে কি না। প্লেটো কবিদের প্রতি এইরূপ প্রতিকূলতার পরিচয় দিলেও কবি ও সমালোচক সম্প্রদায় তাঁহাকে কাব্য ও সমালোচনা-জগতে বিশেষ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। কবিগণ প্লেটোকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার সকল রচনা নাটকাকারে লিখিত এবং তন্মধ্যে নাটকোচিত গুণ বর্ত্তমান। তিনি গল্প ও কিংবদন্তীর সাহায্যে নিজের মতবাদ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন এবং সেই সকল গল্প ও কাহিনী উচ্চ শ্রেণীর কবিকল্পনার পরিচয় দেয়। তাঁহার ভাষা যুক্তিতর্কের ভাষা হইলেও তাহার মধ্যে কবি-প্রতিভাদ্যোতক উজ্জ্বলতা ও সজীবতার ছাপ মুদ্রিত হইয়া আছে। তিনি কবি ও কাব্যের সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলেও সেই পক্ষপাতদুষ্ট মতবাদের মধ্যে কাব্যের স্বরূপের সন্ধান করা যাইতে পারে—ইহা সবাই স্বীকার করিয়াছেন। তাই তাঁহার মতের যথোচিত আলোচনা করা দরকার।

প্লেটোর মতের আলোচনায় একটি প্রধান অসুবিধা আছে। জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটো । কিন্তু অন্যান্য দার্শনিকেরা যেমন একটি সুনির্দ্দিষ্ট সুসম্বদ্ধ তত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং শুধু সেই মতবাদের প্রামাণ্য দেখাইবার জন্যই অপরপক্ষের মত খণ্ডন করেন এবং স্বীয় চিন্তাধারার মধ্যে স্ববিরোধিতা পরিহার করেন, প্লেটো তাহা করেন নাই। তিনি প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া সত্যের স্বরূপ অনুমান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি নাই, প্রত্যেক প্রশ্নকে তিনি নানাভাবে বিচার করিয়া আলোচনা করিয়া সত্যের সন্ধান করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এখন যাহাকে গ্রহণ করিতেছেন পরমুহূর্ত্তে তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন। কোন একটি জায়গায় যে মত প্রচার করিয়াছেন, অপর কোন প্রসঙ্গে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার সুবিখ্যাত আইডিয়াবাদ বা ভাবতত্ত্ব সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সমালোচনা তিনি নিজেই করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য অন্যান্য দার্শনিকদের মতবাদ যেমন ভাবে আলোচনা করা যায়, প্লেটোর মতবাদের আলোচনা ঠিক তেমনভাবে করা সম্ভব কি না সন্দেহ। যেখানে মনে করিতেছি যে, একটি স্থির সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছি, ঠিক সেইখানে হয়ত পূর্ব্বপক্ষের মতবাদ বিবৃত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু প্লেটো যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার খানিকটা সুবিধাও আছে। তিনি প্রত্যেক প্রশ্নকেই নানাভাবে বিচার করিয়া দেখিলেও তাঁহার সকল আলোচনার মধ্যেই কতকগুলি মৌলিক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। যেহেতু তিনি কোন পূর্ব্বপরিকল্পিত মতবাদ লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন নাই এবং যেহেতু বিরুদ্ধ মতের কথা তিনি নিজেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, তাই যে সকল সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছেন—তাহা অনিবার্য্য বলিয়া মনে হয়। অবান্তর যুক্তি ও আলোচনা বাদ দিলে যে কয়েকটি প্রধান চিন্তাধারা পাওয়া যায়, সত্যানুসন্ধানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

দুই

প্লেটোর দর্শনের গোড়ার কথা হইতেছে সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে গবেষণা। প্রত্যক্ষ জগতে অনুক্ষণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে; মনে হইতেছে, কিছুই স্থির হইয়া থাকিতেছে না। তাই প্লেটোর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন দার্শনিক প্রচার করিয়াছিলেন যে, বিশ্বব্যাপী গতিই একমাত্র সত্য। প্লেটো এই মতবাদকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

তিনি চঞ্চলের অন্তরালে স্থিরকে খুঁজিয়াছেন, বহুর অন্তরালে এককে বাহির করিতে চাহিয়াছেন; তিনি চরাচরব্যাপী পরিবর্ত্তনকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু পরিবর্ত্তমান পদার্থপুঞ্জের পশ্চাতে আবিষ্কার করিয়াছেন ভাবস্বরূপ অপরিবর্ত্তনকে। ইহা তাঁহার ভাবতত্ত্ব বা Theory of Ideas নামে বিখ্যাত। ইহার স্বরূপের একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। মিস্ত্রী অনেকগুলি খাট তৈরী করে। প্রত্যেক মিস্ত্রীই প্রতিদিন বিচিত্র রকমের খাট তৈরী করিতেছে। কিন্তু প্রত্যেকগুলিই খাট, কারণ প্রত্যেকগুলিই একটি বিশিষ্ট আইডিয়া বা পরিকল্পনা অনুসারে নির্ম্মিত হইতেছে। কোন একটি বিশিষ্ট খাট ক্ষণস্থায়ী; তাহার মধ্যে একটি শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা নির্ম্মাণ কৌশলের পরিচয় রহিয়াছে। কিন্তু যে ভাব অনুসারে এই খাট বা অন্যান্য সকল খাট নির্ম্মিত হইয়াছে—তাহা চিরন্তন, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। শুধু বস্তুজগতে কেন, মনোজগতেও ভাবের পারমার্থিকতার প্রমাণ রহিয়াছে। আমরা কোন দুইটি জিনিষ মিলাইয়া দেখি—ইহারা সমান কি না; কখনও দেখি ঠিক সমান, কখনও অল্পাধিক বৈষম্যও থাকে। কোন বিশিষ্ট সময়ে, কোন দুইটি বস্তুর সমতা যে আমরা বিচার করিতে পারি, তাহার কারণ সমতা সম্পর্কে একটি মৌলিক ধারণা বা আইডিয়া আছে। সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব, ন্যায়বিচার —এইরূপ প্রত্যেক পদার্থ বা গুণের অন্তরালেই একটি করিয়া মৌলিক আইডিয়া আছে, যাহা ব্যক্তির বা সমাজের জীবনে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রযুক্ত হইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে,এই আইডিয়া-বাদ বা ভাবতত্ত্বের মধ্যে নূতন বা মৌলিক চিন্তার এমন কি পরিচয় আছে? সমজাতীয় অনেকগুলি খণ্ড বস্তুর অন্তরালে অবশ্যই একটি সর্ব্বখণ্ডবস্তুপ্রযোজ্য সাধারণ ভাব বা General আইডিয়া থাকিবে। তাহা না হইলে তাহাদের সকলের একটি নাম থাকিতে পারে না। প্লেটোর মতের স্বকীয়তা এইখানে যে, তিনি এমন কথা মনে করেন না যে, খণ্ড বিচ্ছিন্ন বস্তুগুলি একত্র করিয়া আমরা সাধারণ ভাবগুলি আহরণ করি। বরং সাধারণ ভাবগুলি আছে বলিয়াই আমরা কোন একটি ক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োগ করিতে পারি; সামান্য হইতেই বিশেষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সমস্ত ভাবগুলি অনাদি ও চিরন্তন এবং তাহারাই খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন, তৎকালিক তৎস্থানিক ব্যাপারের প্রয়োজক। সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে একটা স্বতঃপ্রামাণ্য ভাব আছে বলিয়াই তাহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া আমরা গোলাপ ফুলের বা রমণীর চারুত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। এই সমস্ত পারমার্থিক ভাবের আদি বা অন্ত নাই। আমাদের জন্মিবার পূর্ব্বেও ইহাদের অস্তিত্ব ছিল এবং প্রাক্-সত্তাবিশিষ্ট ভাব লইয়াই আমরা জন্মগ্রহণ করি। আমরা মন দিয়া ইহাদিগকে উপলব্ধি করিলেও ইহাদের সত্তা আমাদের মনের উপর নির্ভর করে না। ইহারা বাস্তব। আমরা যাহাকে বস্তুজগৎ বলি—তাহার মধ্যে পারমার্থিক বাস্তবতা নাই; তাহা আংশিকভাবে বাস্তব। ইহার অর্থ এই যে, যে সকল ভাবের মধ্যে পারমার্থিক অস্তিত্ব আছে, প্রত্যক্ষ বস্তুপুঞ্জ বা মানবের খণ্ডিত চিন্তা ভাবনা তাহাদের অন্তর্ভূত হয়। কেমন করিয়া তাহারা এই ভাবে পারমার্থিক ভাবনিচয়ের অন্তর্ভূত হয়, তাহা প্লেটো যুক্তিতর্ক দিয়া স্পষ্ট করিতে পারেন নাই; এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারেন না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যে সকল ভাব অনাদি ও অবিনশ্বর, যাহারা মানবের জন্মের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল, যাহাদের সম্পর্কে অল্পাধিক সংস্কার লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি, তাহারা স্থির ও অপরিবর্ত্তনীয়; তাহারাই প্রকৃত পক্ষে বাস্তব। মানবের কল্পনা, ভাবনা, অনুভূতি - ইহাদিগকে বিচার করিতে হইবে ঐ সকল পারমার্থিক ভাবনিচয়ের সঙ্গে তুলনা করিয়া, ইহাদিগকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া।

প্লেটোর বিচার অনুসারে দুই স্তরের বাস্তবের সন্ধান পাওয়া গেল। প্রথমতঃ পরিচয় পাই অখণ্ড, অপরিবর্ত্তনীয় ভাবসমূহের। দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তু হইতেছে মানবের ক্ষণিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মানসিক অনুভূতি— যাহার সম্পর্ক রহিয়াছে জাগতিকতা সাংসারিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে। পারমার্থিক ভাবনিচয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। প্লেটো কল্পনা করিয়াছেন যে, স্বর্গে অবস্থানকালে ইহাদের প্রত্যেকের স্পষ্ট রূপ ছিল; কিন্তু মর্ত্ত্যে শুধু সৌন্দর্য্যের

অধিষ্ঠাতা ভাবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়াছে। চক্ষু অন্য সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা তীক্ষ্ণ; তাহার কাছে সুন্দর অনেকাংশে ধরা দিয়াছে, কিন্তু অন্য কোন ভাবই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। মানুষের মনের যে সুখ-দুঃখ অনুভব করার সামর্থ্য আছে, তাহার কোন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। সুখ-দুঃখের অনুভূতি বিশেষ সময়ে সঞ্জাত হয় বা বিলয়প্রাপ্ত হয়। যাহার উৎপত্তি বা বিনাশ আছে, তাহার কোন মৌলিক সত্তা নাই। বাস্তব সত্তা আছে শুধু আদিহীন, অন্তহীন, পরিবর্ত্তনহীন সার বস্তুর। সুখ দুঃখ মনে অনুভূত হইলেও ইহারা ক্ষণিক বলিয়া আত্মাকে ইহারা নশ্বর দেহের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়। সুখ-দুঃখ অনুভূতির আর একটি দোষ এই যে, ইহারা যখন কোন মানুষের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তখন সেই অনুভূতির প্রাবল্যের জন্য মানুষের মনের বিচার-বুদ্ধি ব্যাহত হয়; যে বস্তু অনুভূতির বিষয়ীভূত হয়, মনে হয় তাহাই একমাত্র সত্য। এই ভাবে মানুষের সত্যাসত্য বোধ ঝাপসা হইয়া পড়ে। এইখানে আমরা প্লেটোর দ্বিতীয় প্রধান মতে উপনীত হই। তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন অনুভূতির অতীত জ্ঞান বা বিচারবুদ্ধিকে। এই জ্ঞানের সাহায্যে—ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি বা সুখ-দুঃখবোধের মধ্যবর্ত্তিতা ছাড়াই মানব-মন ভাবনিচয়কে উপলব্ধি করিতে পারে। মানব মনের অধিকাংশ মৌলিক বৃত্তির আলোচনা করিয়া প্লেটো দেখাইয়াছেন যে, তাহাদের সঙ্গে জ্ঞানের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কোন কোন জায়গায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অন্যান্য যে সকল গুণের কথা আমরা বলি, তাহারা জ্ঞানেরই নামান্তর মাত্র। প্রসঙ্গান্তরে তিনি দেখাইয়াছেন যে, অন্যান্য গুণগুলি তখনই গুণপদবাচ্য হয়,যখন জ্ঞান বা বিচার-বুদ্ধি তাহাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়। ভগবান মানুষের মনে যে সকল কল্যাণকর বৃত্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন,বিচার-বুদ্ধি তাহাদের নেতা এবং বিচার বুদ্ধি বা জ্ঞানই সত্যোপলব্ধির উপায়।

জ্ঞান বা বিচার বুদ্ধির অচল কর্তৃত্ব মানিয়া লইলেও সকল সমস্যার সমাধান হয় না। একাধিক স্থানে প্লেটো সাহসকে জ্ঞানের সঙ্গে একাত্ম বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সাহস অনেক ক্ষেত্রে একটা সহসা সঞ্জাত বৃত্তিমাত্র—যাহা জ্ঞানহীন শিশু ও পশুর মধ্যেও দেখা যায়। দুই শ্রেণীর বিচারবুদ্ধিহীন সাহসকে তিনি বাদ দিতে পারেন নাই। মানবের আত্মার মধ্যেও তিনি তিনটি বৃত্তির অস্তিত্ব দেখিতে পাইয়াছেন—বিচার-বুদ্ধি, তেজ ও কামনা। সুতরাং একটি মৌলিক সূত্রের সন্ধান করা দরকার,যাহা নানা বিরোধী বৃত্তি বা শক্তির সমন্বয় করিতে পারে। প্লেটো এই মৌলিক ও পারমার্থিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন—পরিমাণ-বোধের মধ্যে। প্লেটো মনে করেন যে, এমন কোন লোক থাকিতে পারে না—যে পরিপূর্ণ ভাবে জ্ঞান বা পরিপূর্ণ ভাবে সুখ চায়। ইহাদের সামঞ্জস্যই প্রার্থনীয়; সুতরাং যে দেবতা মিশ্রণের অনুষ্ঠানের মালিক, তিনি তাঁহার জয়গান করিয়াছেন। এই সামঞ্জস্যের জন্যই মিতাচার ও জ্ঞান একাত্ম হইতে পারে। সাহস সম্পর্কে প্লেটো স্পষ্ট করিয়া এই যুক্তি দেন নাই। তবু মনে হয়, তাঁহার মতে যে সাহস নির্ব্বোধ শিশু ও পশুতেও দেখা যায়, তাহা বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেই কল্যাণকর গুণে পরিণত হয়। পরিমাণ-বোধ, সামঞ্জস্য বা সমন্বয়ের প্রাধান্যের জন্যই প্লেটো শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্গীতের প্রাধান্য দিয়াছেন। কারণ, সঙ্গীত বিভিন্ন সুরের মধ্যে সঙ্গতি আনয়ন করে, তাই ইহা মানব-মনকে নিয়মের স্বরূপ ও মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে। গণনা করিবার ও পরিমাপ করিবার শক্তি মানবের দুইটি প্রধান বৃত্তি। ইহাদের দ্বারাই সে অকল্যাণকে এড়াইয়া চলে এবং নানা প্রকারের কল্যাণকর বস্তুকে যথোপযুক্ত মর্য্যাদা দান করিতে পারে। বাহিরের এবং অন্তরের জগৎ আমাদের কাছে অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল হইয়াই থাকিত; কিন্তু সংখ্যার দ্বারা গণনা করিতে পারি বলিয়া এবং যেখানে গণনা সম্ভব নয় সেইখানে তারতম্যের পরিমাপ করিতে পারি বলিয়া অস্পষ্ট স্পষ্ট হয়, মিথ্যা ধারণা সত্যজ্ঞানে পরিণত হয়। সংখ্যার দ্বারা নির্ণয় এবং পরিমাপ বোধের দ্বারা বিচার—ইহার জন্য অনুভূতি বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং প্রকৃত জ্ঞান বা সত্যোপলব্ধি সম্ভব হয়।

এই যে মিশ্রণ, পরিমাপ ও সামঞ্জস্য—ইহার উদ্দেশ্য কি? যে সকল ভাবনিচয়কে পারমার্থিক সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেই বা কোনটিকে

সার বস্তু বলিয়া স্বীকার করিব? যদি পরিবর্ত্তমানকে ছাড়িয়া পরিবর্ত্তনাতীতকে খুঁজিতে হয়, যদি সামঞ্জস্য বা সমন্বয়কেই প্রাধান্য দিতে হয়, তাহা হইলে একটি একক মানদণ্ড বাহির করিতে হইবে—যাহা অপর সকল বস্তুর নিয়ামক। পারমার্থিক ভাবের মধ্যেও একটি অতি-পারমার্থিক ভাব আছে; প্লেটো এই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন মঙ্গলের অধিষ্ঠাতা ভাবকে। যাহা শিব তাহাই সত্য এবং তাহাই সুন্দরও বটে। কল্যাণের যে ভাব তাহাই সৌন্দর্য্য ও ন্যায়বোধের উৎস; তাহাই প্রত্যক্ষ জগতে আলোক-সম্পাত করে এবং তাহাই আত্মার জগতে বিচারবুদ্ধির প্রেরণা জোগায়।

তিন

প্লেটো নিজে কবি ছিলেন এবং কবিদিগকে তিনি ঐশী শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তবু তিনি কবিদিগকে আদর্শ রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন কেন?—প্লেটোর মতে আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষণ হইবে নিয়মতান্ত্রিকতা ও সুশৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলার নিয়ামক মানুষের বিচার-বুদ্ধি এবং ইহার উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণসাধন। কাব্য-কলা মানুষের অনুভূতিকে সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করে এবং বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। ইহার উদ্দেশ্য মানুষের তৃপ্তি বা আনন্দের সঞ্চার, তাহার কল্যাণ-সাধন নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সুখ-দুঃখের অনুভূতি যখন প্রবল হয়, তখন মানুষ সত্যোপলব্ধি করিতে পারে না; যে বস্তু সুখ বা দুঃখের কারণ, তাহাই একান্ত ভাবে সত্য বলিয়া মনে হয়; এই ভাবে যাহা মিথ্যা তাহা সারবান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যাহা ছোট তাহাকে বড় দেখায়। সুতরাং কবি অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া প্রচার করেন; তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে আনন্দ দান করা, অনুভূতিকে জাগ্রত করা। কাব্যবর্ণিত চিত্র সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও তাহাকে প্রকৃত সত্য বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। যাহারা যাদুবিদ্যা, ভোজবাজী প্রভৃতির চর্চ্চা করে, তাহারা অনেক মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলিয়া দেখায়; সেই মোহের উপরেই তাহাদের বিদ্যার ও ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভর করে। কবির কল্পনা উন্মাদনাবিশেষ; কবির নিজের বুদ্ধিই যে আচ্ছন্ন হইয়া যায় তাহা নহে, এই উন্মাদনা পাঠকের মনেও মোহের সঞ্চার করে এবং মোহের প্রভাবে অলীক পদার্থও বাস্তব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। হোমার, হেসিয়ড প্রভৃতি কবিরা দেবতাদের সম্পর্কে বহু মিথ্যা কাহিনী প্রচার করিয়াছেন, সেই সকল মিথ্যা কাহিনীর প্রভাব অকল্যাণকর। যে উন্মাদগ্রস্ত সে কখনও অপরের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা বা বিচার বুদ্ধি জাগ্রত করিতে পারে না। তাই কবির প্রভাব মানবসমাজে কল্যাণকর হইতে পারে না।

আর এক দিক্ হইতেও কবির রচনার সারহীনতা প্রমাণিত হয়। প্লেটোর মতে পারমার্থিক বিচারে শুধু এক ভাবনিচয়েরই অস্তিত্ব আছে; ইহারাই শুধু সত্য। যে বস্তুজগৎকে আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং যে বস্তুজগতে আমাদের জীবন, তাহা খাঁটি সত্য হইতে একটু দূরে অবস্থিত। তাহার সত্যতা আংশিক; যে পরিমাণে ভাবনিচয় আমাদের চিন্তা ও কার্য্যের প্রয়োজক হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই আমাদের জীবন বাস্তবতা দাবী করিতে পারে। কবির সৃষ্টি আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি। আমাদের জীবনই আংশিকভাবে বাস্তব। সুতরাং কাব্য অনুবাদের অনুবাদের মত, ইহা মূল সত্য হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। খাটের মৌলিক আইডিয়া খাঁটি সত্য, শিল্পী যে খাট নির্ম্মাণ করে তাহা আইডিয়া হইতে ব্যবহিত বলিয়া আংশিকভাবে সত্য। কবি বা চিত্রকর যে খাটের সৃষ্টি করে তাহা শিল্পীর খাটের অনুকরণ মাত্র। এই অনুকরণের মধ্যে যে সত্য আছে তাহা অকিঞ্চিৎকর। এইজন্যই যে বিচার-বুদ্ধি বা জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির দ্বারা আমরা সত্যকে বুঝিতে পারি, কাব্যে তাহা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যে অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী, যাহা সত্যোপলব্ধির পরিপন্থী, তাহাই কাব্যে প্রাধান্য পাইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে, কবি যাহা সৃষ্টি করেন তাহা তো সুন্দর, সুন্দরের কি পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই? এই বিষয়ে প্লেটোর মত সম্পূর্ণ স্পষ্ট নহে। তিনি এক প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাতা যে মৌলিকভাব, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই দিক দিয়া এই মৌলিকভাব অন্যান্য ভাব

হইতে বিভিন্ন। কিন্তু এই ভাবে সুন্দরকে অপরাপর ভাব হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলেও প্লেটো কাব্যকে সুন্দরের অভিব্যক্তি বলিয়া দেখিতে চাহেন নাই। তিনি সুন্দরকেও খুঁজিয়াছেন শৃঙ্খলার মধ্যে, সামঞ্জস্যের মধ্যে বিচার-বুদ্ধির অচল কর্তৃত্বে। সুতরাং কাব্যের মধ্যে তিনি খাঁটি সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। যদি কবি সত্যের চিত্র আঁকিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি বিচার বুদ্ধির সাহায্যেই সেই চিত্র আঁকিতে পারিবেন এবং সেই জ্ঞানসমৃদ্ধ চিত্রের স্রষ্টাকে আমরা বলিব দার্শনিক, কবি নহে। কাব্যের কাজ হইতেছে চিত্তবিনোদন করা, তাই ইহা স্তুতিবাদের পর্য্যায়ে পড়ে। এই স্তুতিবাদের মধ্যে চিত্রের চাকচিক্য ও সঙ্গীতের ঝঙ্কার থাকে। চিত্রের ঐশ্বর্য্য ও সঙ্গীতের ঝঙ্কারকে বাদ দিলে কাব্যের যে সার-বস্তু থাকে তাহা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং যে ভাবেই বিচার করি না কেন,কাব্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যদি কবিদের রচনা জ্ঞানের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সঙ্গে দার্শনিকদের কোন পার্থক্য থাকে না। আর যদি তাহাই না হয়, তাহা হইলে তাহার সারবত্তা থাকে না এবং তাহাকে মর্য্যাদা দেওয়ার কোন কারণ থাকে না।

প্লেটো কবি ও কাব্যের বিরুদ্ধে যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহার কয়েকটি মৌলিক ত্রুটি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্লেটো বলিয়াছেন যে, বিচারবুদ্ধি ও অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য আছে এবং কবিকল্পনায় বিচার-বুদ্ধির স্থান নাই। তিনি নিজেই এক প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন যে, তৎকৃত এই পার্থক্য কাল্পনিক। বাস্তবিক পক্ষে দর্শনে বা গণিতশাস্ত্রে বিচারবুদ্ধি কল্পনা ও অনু-ভূতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে বলিয়া কাব্যে কল্পনা অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কাব্য ও দর্শনের মধ্যে এইরূপ আড়াআড়ি সম্পর্ক অনুমান করা অসঙ্গত। দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক আছে, ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও আছে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটিতে যাহা থাকিবে অপরটিতে তাহা থাকিবে না এবং একটিতে যাহা থাকিবে না অপরটিতে তাহার প্রাচুর্য্য থাকিবে—এইরূপ মনে করার কি যুক্তি আছে? প্লেটো নিজেই আর্টকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—কতকগুলি আর্ট সৃষ্টি করে, কতকগুলি জ্ঞান অর্জ্জন করে। কাব্য সৃষ্টি করে, দর্শন জ্ঞান লাভ করে। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকেই নিজের নিয়মানুসারে বুদ্ধি ও অনুভূতির মধ্যে সামঞ্জস্য করে, অথবা কোন একটিকে প্রাধান্য দেয় বা পরিবর্জ্জন করে। দর্শনে বা গণিতে যে পরিমাণ বোধ, গণনাযোগ্যতা বা নিয়মানু-বর্ত্তিতা আছে, কাব্যে তাহা নাই। কিন্তু কবি বিশৃঙ্খল-বাক্ নহেন; তাঁহার রচনায় উচ্ছ্বাস থাকে, কিন্তু উচ্ছ্বাসের ও অত্যুক্তির মধ্যেও তাঁহার তালবোধ নষ্ট হয় না। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে উচ্ছ্বাসের মধ্যেও সংযম থাকে; কিন্তু সেই সংযম দর্শন বা গণিতের সংযম নহে, কাব্যেরই সংযম।

প্লেটোর মতের দ্বিতীয় দোষ এই যে, তিনি কাব্যকে বাস্তবের অনুকরণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। "অনুকরণ" বলিতে প্লেটো ঠিক কি মনে করিয়াছিলেন, ইহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে, এবং এই বিষয়ে প্লেটোর নানা প্রসঙ্গে বিকীর্ণ মতাবলীর মধ্যে স্ববিরোধিতাও আছে। কিন্তু যেখানে তিনি কবির কাব্যকে সত্য হইতে তিন ডিগ্রী দূরবর্ত্তী বলিয়া হেয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেইখানে তিনি কাব্যকে প্রত্যক্ষ জগতের নিছক নকল বলিয়াই মনে করিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন কোন বিষয়ের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে কবির কোন জ্ঞান নাই; কবি শুধু বাহির হইতেই মনুষ্যের জীবনযাত্রার নকল করিয়া যান। প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে কবির বিশেষ সংস্রব আছে, মানুষের জীবনযাত্রা হইতেই কবি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, মানুষের জীবন সম্পর্কেই তিনি কাব্য রচনা করেন এবং মানুষের মনেই তাহা আনন্দের সঞ্চার করে বা চিন্তার উদ্রেক করে। কিন্তু কবিকল্পনা প্রত্যক্ষ জগতের বা মনুষ্যচরিত্রের অনুকরণ করে না; ইহা নূতন জগতের সৃষ্টি করে। যে অর্থে প্রত্যক্ষ জগৎ সত্য সেই অর্থে কবির কাব্য সত্য নহে। কিন্তু কবির কাব্যের মধ্যে অন্যরকমের সারবত্তা আছে, যাহা মিথ্যা নহে। কবি মায়ালোকের সৃষ্টি করেন, কিন্তু "বস্তু হইতে সেই মায়া তো সত্যতর।"

সেই সত্য, যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

সত্যের একই মানদণ্ডের দ্বারা কাব্য ও দর্শন, কল্পনা ও জ্ঞানের বিচার করিতে যাইয়া প্লেটো মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি বিরোধীর পদার্থে সামঞ্জস্যে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে কল্পনা ও বুদ্ধির সঙ্গতির মধ্য দিয়াই সত্য আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

চার

এই সকল ভ্রমে পতিত হইলেও প্লেটো সাহিত্যের সৃষ্টিধর্ম্মিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এই উপলব্ধির জন্যই বহু ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহার মতবাদের বিশেষ মূল্য আছে। কবিকে তিনি উন্মাদগ্রস্ত লোকের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, কবির প্রেরণা ঐশী প্রেরণা এবং সেই প্রেরণার দ্বারা উদ্বোধিত না হইলে কোন লোক শুধু বুদ্ধির দ্বারা, শুধু কলাকৌশলের দ্বারা কাব্য লিখিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারে না। কবিপ্রতিভা একটি দৈবশক্তি, ইহা ব্যুৎপত্তি-লভ্য নহে। প্লেটো বলিয়াছেন যে, কবি যখন কল্পনার প্রেরণা অনুভব করেন, তখন তিনি নূতনের উদ্ভাবন করেন—পুরাতনের অনুকরণ নহে—এবং কবি পবিত্র, পক্ষবিশিষ্ট জীব অর্থাৎ তিনি অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। তিনি এই নালিশও জানাইয়াছেন যে, কবির কল্পনার উন্মাদনা জাগ্রত হইলে কবির চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং মন কবির নিকট হইতে বিদায় লয়। এই বিদ্বেষদিগ্ধ বর্ণনার মধ্যে কাব্যের স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। কবিকর্ম্ম অন্য সকল প্রকার কর্ম্ম হইতে বিভিন্ন, কারণ ইহা জ্ঞান নহে, ইহা সৃষ্টি। প্রসঙ্গ বিশেষে প্লেটো কবিকে রাষ্ট্র-নেতার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মোটামুটি ভাবে তিনি সর্ব্বত্র কাব্যের স্বকীয়তা ও অনন্যপরতন্ত্রতা স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি ইহাও মানিয়া লইয়াছেন যে, কবির এই শক্তি চরাচরব্যাপী, এমন কোন বাধা নাই যাহা ইহা অতিক্রম করিতে পারে না; এমন কোন পদার্থ নাই যাহা ইহা সৃষ্টি করিতে পারে না। এই অনন্তপ্রসারী শক্তি অনুকরণকারীর আয়ত্তের অতীত।

প্লেটো পারমার্থিক ভাব সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা কতদূর গ্রাহ্য—তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। ইহার অর্দ্ধেক দর্শন, অর্দ্ধেক কবিকল্পনা। কিন্তু ইহার মধ্যেও কাব্যের স্বরূপের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। প্লেটো মনে করেন যে, অশরীরী ভাব-নিচয়ই বাস্তব; সেই সকল ভাবনিচয়ের প্রয়োজনায়ই মানুষের জীবন আংশিক বাস্তবতা লাভ করে। এই পারমার্থিক জীবগুলি মানুষের জীবন হইতে স্বতন্ত্র হইলেও মানুষের মন দিয়াই তাহাদিগকে জানা যায় এবং প্লেটোর উক্তি বিস্তারিত করিয়া বলা যায় যে, মানবের জীবনের মধ্য দিয়াই ইহারা অভিব্যক্তি পাইতেছে। এই অভি-ব্যক্তি খণ্ডিত; ইহার মধ্যে খাঁটি সত্যের সম্পূর্ণরূপ পাওয়া যায় না। ইহা কি বলা যায় না যে, সত্যের যে অংশ জাগতিক জীবনে প্রকাশ পায় না, যাহা বুদ্ধির অনধিগম্য, কবি তাহাকেই উপলব্ধি করিয়া রূপ দিতেছেন এবং সেই জন্য কবির কাব্যে পারমার্থিক ভাব বা প্রকৃত সত্যের এমন একটি দিক্ প্রকাশিত হইয়াছে—যাহা বস্তুজগতে ধরা দেয়না, শুধু বুদ্ধির দ্বারা যাহাকে জানা যায় না। এই জন্যই কবিকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া মনে হয়, কারণ তাহার সৃষ্টি প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে বিভিন্ন। কিন্তু ইহাও মানিতে হইবে যে, তিনি স্রষ্টা, তাঁহার ক্ষমতার অবধি নাই, সমস্ত বিশ্ব তাঁহার রচনায় নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। প্লেটো স্বীকার করিয়াছেন যে, কবির নির্ম্মাণ বিচিত্র ও জটিল; কবি অ-সৎ (non-Being) হইতে সৎ (Being) বস্তুর সৃষ্টি করেন, তাঁহার সমস্ত শিল্পকৌশল সৃষ্টিধর্ম্মী। যাহা বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা অপ্রাপণীয়, তাহা দার্শনিকের বিচারে অ-সৎ বা অস্তিত্বহীন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্লেটোও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তাহার মধ্য হইতে কবি নূতন জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন। যাহা সৃষ্টি তাহা মিথ্যা নহে; তাহা বিচার বুদ্ধির একাধিপত্য স্বীকার করে না; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কবি-কল্পনার সৃজন-ক্ষমতা মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া প্লেটোকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, কাব্যের নিজস্ব সত্তা আছে; এই নিজস্ব সত্তার আর যাহাই অপরাধ

থাকুক, ইহা সত্য হইতে বহু দূরবর্ত্তী হইতে পারে না। ইহা পুরাতনের অনুকরণ নহে, ইহা নূতন সৃষ্টি এবং বোধ হয় প্রত্যক্ষ জগতের মত ইহা পারমার্থিক সত্যেরই পরিচয় দেয়। সেই পরিচয় তথাকথিত বাস্তব জগতের পরিচয় হইতে ভাল কি মন্দ তাহা লইয়া মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা অনস্বীকার্য্য।

প্লেটো মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছেন বলিয়া কাব্যের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। যে যুক্তির সাহায্যে তিনি কাব্যকে হেয় বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, সেই যুক্তিই তাঁহাকে কাব্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে। যিনি শত্রু হিসাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তিনিই কাব্যের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। কবিকে স্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহাকে অনুকরণকারক বলিয়া গালি দিলে সেই গালি অর্থহীন হইয়া পরে। যদি মনে করা যায় যে, প্রত্যক্ষ জগৎ ভাবনিচয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অধিগম্য, তাহা হইলে তাহার অনুকরণ করিবার জন্য ঐশী শক্তি বা সৃজনী প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। বাস্তবিকপক্ষে যাহারই অনুকরণ করি না কেন, অনুকরণ বিস্তার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিরই আবশ্যক হয়, যদিও সেই বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় অপকৃষ্ট রকমের। প্লেটো কবির স্বকীয় প্রেরণা বা inspiration-র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; এই স্বীকৃতিই তাঁহার অনুকরণতত্ত্বের মূলোচ্ছেদ করে। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা কাব্যের স্বয়ংসিদ্ধতা ও অন্য ফল নিরপেক্ষতায় (Art for Art's sake) বিশ্বাস করেন, প্লেটো তাঁরাদেরই পিতামহ। কিন্তু দার্শনিক হিসবে পার্থিব কল্যাণকে সকলের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া তিনি কাব্যের উপযোগিতা নির্ণয় করিতে পারেন নাই এবং নানা স্ববিরোধী উক্তি করিয়াছেন! কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা মানিতেই হইবে যে তিনি কাব্যের রহস্যের উপরে আলোকসম্পাৎ করিয়া তাহার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে সাহায্য করিয়াছেন।

কঙ্কাল

(গল্প)

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

পুরোণো যা কিছু, মানুষের মনেতেই নাকি দাগকেটে বসে থাকে। কথাটা সত্যিই, অন্ততঃ রমেশের কাছে সত্যি!

রমেশ!...নামটা ভদ্রগোছের! বাবা মা যখন নাম রেখেছিল, তখন ছিল তাদের সংসারে লক্ষ্মীর পাদস্পর্শ, তারপর এলো গেলো অনেকগুলো বছর। বাবা মায়ের স্নেহছায়ায় বড় হয়ে উঠেছিল,...তারও অনেকদিনের পরের কথা বলছি, যখন রমেশের জীবনে এসেছে বয়সের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ভার; এসেছে বার্দ্ধক্যের ছায়া—। সেই রমেশের কথা বলছি। আর! আর লক্ষ্মীর স্পর্শ তাদের গৃহাঙ্গণে নেই, রমেশ নামটা সাক্ষ্য দেয় মাঠের মাঝে আধবোজা অবস্থায় খর রোদে খাঁ খাঁ করা মজা তালপুকুরের মত।

রমেশের জীবনে এসেছে দারিদ্র্যের রুক্ষ স্পর্শ!...

পুরোণো জমীদার-প্রধান গ্রাম।...বিগতকালের গৌরবময় যুগের সাক্ষ্য দেয় বিশাল ভাঙ্গা বস্তীগুলো, রাস্তার দু'দিকে জীর্ণ অবস্থায় শেওলার আলিঙ্গনে কালো হয়ে অশত্থগাছের ঝোপ বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সন্ধ্যার অন্ধকারে ভূতের মত! বাবুদের বাড়ীর কাজ সেরে-সুরে রমেশ টিমটিমে লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ইট ভাঙ্গা রাস্তাটার বুকে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বাড়ীর দিকে আসে!

সারাদিনের পর ছুটি। কাজ সুরু হবে আবার সেই ভোর হতে। উঁচু পাঁচীল-ঘেরা শ্যাম-পুকুরটার পাশে আসতে আসতে রমেশের গতি আরও বেড়ে যায়—থমথমে অন্ধকার...ওখানটায় জোড়া আমগাছে নাকি ভূতের বাসা। —তা ছাড়া, অনেকখানি জায়গা জনমানবের বসতি নাই! জোরে পা চালিয়ে আসে রমেশ।

"...আচ্ছা মানুষ যা হোক! রাতে বাবুদের বাড়ীতে

থাকলেই পার !" অমৃত বলে ওঠে ! এটা তার রোজকারই কথা !

রমেশ হ্যারিকেনটা নামাতে নামাতে বলে ওঠে, "হুঃ, তুর এত মাথাব্যথা কেন বল দেখি ? চাকরী করতে গেলে পরের দিকে দেখতে হবে ত ?"

ভাত বাড়তে থাকে অমেত্ত ! এঁঠো হাতটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, "ঝাঁটা মার অমন চাকরীর মুখে, ভারি ও আমার চাকরী !"

"ছুঁচোর চাকর চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে !" বাবুদের বাতাসে হাঁড়ি নড়ছে অথচ চাকর চাই !"

গর্জ্জে ওঠে রমেশ, "চু—চুপ কর বলে দিচ্ছি। যার খাওয়া তারই নিন্দে..."

আরও কি যেন সব বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কথাটা তার মাঝে মাঝে আটকে যায়, বারকতক ঢোক গিলে অসংযত জিবটাকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করতে থাকে।

অমেত্তর অভিযোগটা সত্যিই ! রমেশ...শুধু রমেশ কেন, রমেশের বাবা চাকরী করত মুখুয্যেদের বড় তরফে ! সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা ! চারিদিকে বড় বড় তে-মহলা বাড়ী, বাড়ীর বাইরে রাস্তার দু'দিকে চকমেলান দালান। সারি সারি দোকান-পাট বসত ! পাশেই বিশাল ঠাকুরবাড়ী...নাটমন্দির ! সব কিছুই পরিচয় দেয় তাদের শৌর্য্য-বীর্য্যের, ভাগ্যলক্ষ্মীর শুভদৃষ্টির।

রমেশের এল ভাঙনের যুগ ! অজ্ঞাত প্রকৃতির নিষ্ঠুরতম পরিহাস এল অভাবনীয় রূপে

বিলাসপুরের মামলায় হেরে যাওয়ার পর থেকেই কোন অদৃশ্য পথ ধরে অন্ধকার পুরী থেকে বার হয়ে গেল ভাগ্যলক্ষ্মী ! উত্তরপাড়ার রায় বাবুরা আরও দু' একজন হয়ে উঠল প্রতাপান্বিত।

সেই ভাঙন-ধরা মুখুয্যে বাড়ীর আশে-পাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে, সেই গৌরবময় যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত, রমেশ তাদের মধ্যে অন্যতম !

মাইনে পায় না, ছ'মাস-ছ'মাস পর পায় দু'চার টাকা, কিন্তু তবুও ঐ ধ্বংসপুরীর মায়া কাটাতে পারে না, জীবন্ত প্রেতের মত সে আজও রয়েছে ওদের বাড়ীতেই !

দু'পুর গড়িয়ে এসেছে, সারা পাড়াটা দু'পুরের রোদে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে

ধূলি-ধূসরিত পথে চলেছে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে দু'একটা কুকুর। ভাঙা বাড়ীর পেয়ারা গাছে বসে ক্লান্তভাবে ডেকে চলেছে ঘুঘু...ক্লান্ত মধ্যাহ্ন আরও উদাস করে তোলে।

রমেশ ভাণ্ডারের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ! বিশাল ঘরটা ফাঁকা হয়ে রয়েছে, এক কোণে দু' একটা বস্তায় কিছু চাল-ডাল আর আটা পড়ে আছে। রমেশই দেখেছে তার ছোটবেলায় ঘরখানা বোঝাই হয়ে থাকত সারি সারি বস্তা টিনে ! দেউড়ীর দারোয়ান চাকর-বাকর সকলের সিদে দিয়ে যেতে ; একজন সরকার হিমসিম খেয়ে যেত !

"এ রমেশ...এ !" বিজাতীয় কণ্ঠে একটা চীৎকারে তার স্বপ্ন ভেঙে যায়, মুখ তুলে সামনেই তুরগসিংকে দেখে বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—"এসেছ ! কাল শত্তুর !"

কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারে না তুরগ সিং ! দেড়খানা চোক বার কতক পিট পিট করে, কোমরের ময়লা গামছাখানা দালানে বিছিয়ে আবার হেঁকে ওঠে "দেও না ভাইয়া, এ রমেশ...এ।"

তুরগ সিং বেকায় পালোয়ান ! ধ্বসেপড়া মুখুয্যে বাড়ীর ফুটো অশথ-শিকড়ের জালবোনা দেউড়ীর একচ্ছত্রাধিপতি ! সবেধন রামকানু ঐ তুরগ সিং !

ময়লা গামছাখানাতে সের খানেক চাল আর গোটাকতক আলু ফেলে দিয়ে বলে রমেশ—"ব্যস

"কেঁও ! আটা কাঁহা !" জেরা করে তুরগ সিং রমেশ বাক্যব্যয় না করে ভাণ্ডার-ঘরের দরজায় তালাটা এঁটে দিয়ে লম্বা দরদালান ঘুরিয়ে চলতে সুরু করে।

তুরগ সিং গামছাটা এঁটে বাঁধতে বাঁধতে আপন মনেই বলে ওঠে, "তুমি বড় খচরা আছে !" পুটুলিটা কাঁধে ফেলে চত্বর পার হয়ে আবার অলিগলির মধ্য দিয়ে চলতে থাকে দেউড়ীর দিকে। রমেশ চলেছে বাড়ীর দিকে। বাবুদের খাওয়া-দাওয়ার পর হয় রমেশের খাওয়ার ছুটি !

ভাঁড়ার থেকে দু' পলা তেল নিয়ে গায়ে মাথায় চাবড়িয়ে একেবারে দীঘির জলে ডুব সেরে বাড়ীর দিকে রওনা হয়।

ভয়ে ভয়ে উঠোনে পা দিতেই—যা ভয় করেছিল ঠিক তাই ! সামনেই একেবারে অমেত্ত ! কাঠখোট্টা রোদে

তারও মেজাজটা শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে! জেরা করে বসে, "সিদের চাল কই?"

আমতা আমতা করতে থাকে রমেশ—"ইয়ে ইয়ে ভঁাড়ারে আজ চাল বাড়ন্ত কি না! কাল কাল···।" থামিয়ে দেয় তাকে অমেত্ত, "বেশ, আজ আর খেও না, কাল একেবারেই খাবে।"

দাঁতের ডগায় একটু হাসি টেনে আনতে থাকে রমেশ —"হেঁ হেঁ হেঁ।"

"রতে—খবরদার বলছি, একটি ভাত ফেলবি না।" অমেত্তর হাকুনিতে রমেশ দাওয়ার দিকে চাইতে থাকে। রতন পুঁই ডাটার চচ্চড়ি আর পুঁটি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাচ্ছে!

লোলুপ লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রমেশ! সারা পেটের নাড়ীভুঁড়ীগুলো চন্ চন্ করছে,···ধীরে ধীরে এসে দাওয়ায় ব'সল।

অমেত্ত আপন মনে গর্জে চলেছে, "বাবুরা যেন ওর বাবা হয়, মাগনা খেটে দিয়ে আসছে! মাইনে নেই, সিদে নেই। ঢের ঢের লোক দেখেছি বাবা, এমন মরদ দেখিনি! বসে কেন যাও না সেই চুলোয়! সিদে না হোক এক থালা পেসাদও ত আনতে পার।"

তিক্ত-বিরক্ত হয়ে বার হয়ে পড়ে রমেশ!

দু'পুরের রোদ শ্যামপুকুরের জলে অলস শয়ন বিছায়। তীব্র রোদ জোড়া আমগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ছায়াময় ঘাসের বুকে রচনা করে আলোছায়ার মায়াজাল! দু' একটা চিল সন্ধানী দৃষ্টিতে সরপথ ঝোপের আড়াল থেকে চেয়ে থাকে জলের দিকে! ভাঙ্গা বাড়ীগুলোর পাশ দিয়ে আপন মনে চলেছে রমেশ! "এ রমেশ! এ—" তুরগ সিংএর ডাকে ফিরে চাইল রমেশ।

"···আ—এ রমেশ, আইয়ে না—এ—"

তুরগসিং একটা বিশাল কড়াই-এ করে প্রায় সব চালটাই ফুটিয়েছ। লাল চালগুলো যেন শাসনভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে! ময়লা চিটকে কাপড়খানাকে সামলে নিয়ে দু'টো ইটের উপর বসান কড়াইখানাকে কয়েকটা শালপাতার উপর উপুড় করে দিল!···

পরক্ষণেই কড়াইটাকে দূরে সরিয়ে, গলা ভাতগুলোতে খানিকটা নুণ ছিটিয়ে, গোটা দুই সিদ্ধ মুলো চিবিয়ে, মেসিনের মত কোঁৎ কোঁৎ করে চোখ বুজে গিলতে থাকে!··· বাঁ হাতটা মাটিতে থাবড়িয়ে, রমেশকে বসবার ঠাঁই বাতলে দিয়ে আবার ডান হাতের কাজে ব্যস্ত হয়! "এ-রমেশ·· এ!"

রমেশের খিদে যেন আরও তিনগুণ বেড়ে ওঠে!··· ধীরে ধীরে মুখুয্যে মশায়ের খাস কামরার দিকে পা বাড়াল।···

খাওয়া দাওয়ার পর চোখ বুজে শুয়ে রয়েছেন, অদূরে ফুড়সীটা নামান! রোজকার মত রমেশ ফুড়সীটা সেজে আগুন চাপিয়ে নলটা বাবুর হাতে ধরিয়ে দিলে বড়বাবুও চোখ বুজে সটকাটা হাতে নিয়ে টান দিতে থাকেন!···

রমেশ পা টিপতে থাকে···!

···কাজে মন বসে না···। মাঝে মাঝে থেমে যেতেই বড়বাবু বলে উঠেন—"কি রে, তোরও কি ঘুম আসছে না কি?"

···শশব্যস্তে রমেশ আবার পা টিপতে থাকে!···

ডাকবাবুর বাড়ীতে অমেত্ত কাজ করতে যায়! সকাল-বিকাল দু'বেলা—তবে রমেশের মত অমন মাগ্‌না খাটবার সৎ ইচ্ছা তার নাই!···দিঘীর ঘাটে এক গোছা বাসন-পত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি করে মেজে আবার ছুটে ফিরে আসে বাড়ীতে!

রতন বাড়ী আগলায়!···বাবাকে বাড়ীতে আসতে দেখলেই দূর থেকে তার দিকে দৃষ্টি রাখে, এ-সব অবশ্য মায়ের শিখান!···

মুখুয্যে বাড়ীতে পূজার আয়োজন সুরু হয়! ভাঙ্গা মুইয়ে-পড়া বিশাল দালানের গায়ে বাঁশ-কাঠ লাগিয়ে দিন কয়েকের মত ঝোপ-জঙ্গল কতকটা পরিষ্কার করা হয়!—চক-মিলান বাড়ীর আশে-পাশে দেওয়ালের গা ফুড়ে গজিয়ে ওঠে দূর্ব্বাঘাস, অশ্বত্থ, কালকাসিন্দের ঝাকড়া জঙ্গল।

···মুচিপাড়ার রস বায়েন বিঘেখানেক জমি পত্তনি পেয়েছিল কোন পূর্ব্বপুরুষের আমল থেকে। সেইদিন থেকে একটা কাজ তাদের চেপে রয়েছে কাঁধে জগদ্দল পাথরের মত—পুজোর ক'দিন একটা ঢাক আর কাঁসি দিতে হয়।···

রমেশের অবসর নাই, কোমরের গামছাখানা কাঁধে উঠেছে; কাপড়টা সামলে নিয়ে ছুটাছুটি করে।

মুখুয্যে মশায় একমনে ভেবে চলেছেন। দোতলায়

ছাদের উপর দাঁড়িয়ে সারি সারি ভূতোপুরীর মত আধ-ভাঙা বাড়ীগুলোর দিকে চেয়ে থাকেন—তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনেকদিন আগেকার ঘটনাগুলো—

…পূজোমণ্ডপের কোলাহল গাঁয়ের বাইরে থেকে শোনা যেত। বিলাসপুর, আকুনা, গোবরডাঙা বুধনী সব ক'টা মাহাল থেকে আসত ভারে ভারে দুধ-মাছ, ফলমূল, আতপ চাল, গোপীগাঁয়ের মুচিদের বস্তি ব্যাগপাইপের দল। সারা উঠানে আরতির সময় লোক ধরত না।…ধূপের ধুনোয় নৈবেদ্যের অন্তরালে বিশাল দেবীপ্রতিমূর্ত্তি ঝকমক্ করতে থাকত। মহিম মুখুয্যে স্বয়ং পাটের জোড় করে গদ্‌গদকণ্ঠে মায়ের চরণে প্রণতি জানাত—

"ওঁ সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

রমেশের পিছনে একজন অপরিচিত লোককে দেখে তিনি ফিরে এলেন আবার বর্ত্তমান পৃথিবীতে।

লোকটা ছোট একটা প্রণাম করে দাঁড়িয়ে থাকে।… রমেশ বলে ওঠে—"আজ্ঞে বড়বাবু এ এসেছে গোপগাঁয়ে থেকে, নোতুন জগঝম্পর দল খুলেছে, তাই এসেছে বাবুর কাছে।"

লোকটা এইবার সুরু করে—"হুজুরের দরবারে এলাম পূজোর মরসুমে!" তার কথা আর বার হয় না, হাত দু'টো কচলাতে থাকে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা হিসাবে। "হেঁ হেঁ, সারা তল্লাটের রাজা আপুনি, জানি আপনার দরবারে কিছু…।" দাঁতের ডগায় টেনে টেনে হাসতে থাকে!

মুখুয্যে মশায় গম্ভীর হয়ে ওঠেন। রমেশ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তাঁর মূর্ত্তি দেখে ভয়ে ভয়ে চুপ করে যায়। ছাদের উপর তিনজনেই নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করে সারা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে ছোট তরফ থেকে ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপের সম্মিলিত শব্দ। চতুর্থীর ঘট আসছে। সপুত্র ছোট বাবু গরদের জোড় পরে নগ্ন পদে ঘটের পিছু পিছু চলেছেন! আগে আগে সারা পাড়া মাথায় করে চলেছে ব্যাণ্ডের দল। গোপী গাঁয়ের সেই পুরোণো দল।

রুদ্ধ কণ্ঠে মুখুয্যে মশায় রমেশকে বলে ওঠেন, "আচ্ছা ওকে বায়না করে দাও গে, কাল থেকে ও আসবে।"

লোকটা আবার একটা প্রণাম করে রমেশের সঙ্গে বার হয়ে যায়। রমেশের সামনেকার দাঁত দু'টো আপনা থেকেই বার হয়ে আসে খুশীর আভায়।

"দেখলে বায়েন! মরা হাতী সওয়া লাখ। বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়। দিন যাবে কোথায়। আবার আমাদের খোকাবাবুকে দেখো নি, একেবারে বংশের নাক। দু' দু'টো পাশ দিয়ে এখনও পড়ছে।" বায়েন নীরবে ঘাড় নাড়তে থাকে।

"একটা মোটে?" বায়েন যেন একটু হতাশ হয়ে পড়ে। পূজোর বায়না মোটে একটাকা!

তার কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে রমেশ বলে ওঠে, "হ্যাঁ হ্যাঁ বায়না-পত্তর কি না, তোমার যা পাওনা তাই পাবে। লাও, জল-খাবার লাও!"

তার আঁচলে ঢেলে দেয় কতকগুলো হলদে রাঙা মুড়ী আর গোটাদুই সিড়ীর নাড়ু। ক্ষুণ্ণ মনে লোকটা বার হয়ে গেল চত্বর দিয়ে!"

একরকম ছুটতে ছুটতে তুরগসিংকে আসতে দেখে রমেশ হাসি চাপতে পারে না, ঠাকুরবাড়ীর ঝি মানদাও ভাঁড়ারে এসেছিল কি কাজে, সে হাসতে থাকে—"মর মুখপোড়া ছাতুখোর।"

"এ রমেশ—এ—থোড়া ভুজা।" মুলো খাওয়া লালচে দাঁতগুলো বের করে ময়লা গামছাটা পেতে বসে তুরগ সিং।

রমেশও মুখ ভেংচে ওঠে—"ম'ল, ব্যাটার হাড় অবধি ফাঁপা—লে বাপু, মকাইএর ছাতু লে, ও ফুলো মুড়ি পাঁচসের দিলেও তোর জলখাবার হবে না।"

দেশ থেকে নোতুন আমদানী তুরগসিং সব কথাটা রমেশের সঠিক বুঝতে পারে না, তবুও বলতে থাকে, "তুম বহুৎ খচরা আছে।"

গামছাটাতে কতকগুলো মুড়ী আর দু'টো কাঁচা লঙ্কা ফেলে দিতে, গোলগাল মুখখানা আবার চিক চিক করে ওঠে হাসির আভায়। দেড়খানা চোখ পিট পিট করতে থাকে, গলার কালকারে বাঁধা ছোট্ট তক্তিটা আলগা করতে করতে চলে যায় সে। পিছন ফিরে মাঝে মাঝে তাকায় রমেশের দিকে।

রমেশের আনন্দ দেখে কে ! এক মুখ হেসে বলে ওঠে, "দেখ দেখ অমেত্ত তুই বলিস বাবুদের হয়ে এসেছে ! ওরে জানিস না···লক্ষ্মীর ঘরের কপাট যতদিন ওদের বন্ধ থাকবে, ততদিন মা-লক্ষ্মীর বাবার সাধ্যি কি পালাই ।"

"কিছু বলে না, ভাই, না হলে ঐ ছোট তরফ রায় বাবুরা ওদের নস্যি ।"

অমেত্ত কথায় কান না দিয়ে কাপড় ক'খানা দেখে চলেছে। ক্রমশঃ নাকটা উপরে উঠে গিয়ে নাড়াচাড়া করতে সুরু করে —মাগো এই ক্যাটকেটে কাপড় আমি সাতজন্মেও পরিনি ! ছ্যাকর, এই আবার পরে। রতনের জামা দিয়েছে টুটিমুটি ।

এই দেখ ! তবু কিছুতেই মন ওঠে না। খোকাবাবু এনেছে কলকাতা থেকে, ওনারা কি আর রতনের মাপ জানে ! কিন্তু জামাখানা বলিহারী যাই !

রমেশের কথার উত্তরে ঠোঁট দুটো উল্‌টে দেয়—"আথার ছাই !" বিরক্ত হয়ে ওঠে রমেশ ! সজোরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু জিবটা আটকে যায়, চোখ দুটো উঠে পড়ে কপালে ! "তু-উর বাপ দেখেছে এমন জামা-কাপড় ।" অমেত্ত বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মত উঠে দাঁড়াতেই রমেশ ঘর থেকে বেরিয়ে হন হন করে চলতে থাকে !

গোপীপুরের বায়েন 'জগঝম্প' নিয়ে এসে পড়েছে বিপদে ! আর কোনো বাজনা নেই ; মাত্র রস বায়েনের একটা টিমটিমে তেঁতুল কাঠের ঢাক, আর তার বেটার একটা কাঁসি ! পুরুত ঠাকুরও বার কতক নৈবেদ্যের দিকে চেয়ে সাদা পৈতেটা ক্ষুন্ন মনে নামাবলীর মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। "মোটে নটা ভূজ্যি !"

খোকাবাবু দাঁড়িয়েছিলেন অদূরে। পুরুত ঠাকুরের কথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যান !

রমেশ কাঁসরখানায় একটা দড়ি বাঁধছিল ; শশব্যস্তে বলে ওঠে,"সপ্তমীর দিন ন'টা ভূজ্যি দেওয়া হয় ঠাকুর মশায় ! যার যেমন রীতি !"

আড়চোখে এক একবার খোকাবাবুর দিকে চাইতে থাকে। মনে মনে আসে কথাটা—"হাঁ হাঁ বাবা, এ শর্ম্মার কাছে পুরুতী চাল চলবে না !"

"বাজা বাজারে রস—ওহে বায়েন লাগাও তোমার জগঝম্প বেশ যুৎ করে—'লাগা ধড়াধড় মসনে কাটী', বুঝলেন খোকাবাবু, ও বায়েনের জুড়ি বাজানদার এ তল্লাটে আর নাই !"

···রমেশ বলে চলেছে।

সবচেয়ে জোর বেশী রস বায়েনের বেটার ! কাঁসিটায় প্রাণপণে আঘাত করে চলেছে, সেটা তীব্র স্বরে কেঁদে চলেছে কাঁই—কাঁই ।

এতদিন পর 'অমেত্তর' মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে ! তালপাতার ঠোঙায় মোড়া কাঁচা মাংসটা খুলে তাড়াতাড়ি করে নুন হলুদ মাখাতে থাকে ! পাশে বসে তারিফ করে রমেশ,— দেখ, বলছিলাম না খোকাবাবুর দিল আছে !

অমেত্তও স্বীকার করে কথাটা—হ্যাঁ তা বটে বৈকি ! এই রতন ঘুমোস না—মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত চাট্টি খেয়ে শুবি, ততক্ষণ ঐ থালা থেকে পেসাদ তুলে নে ।

সপ্তমীর ভোগ—বাবুদের বাড়ী থেকে রমেশ বড় এক-থালা পেসাদ ফলমূল আর খানিকটা কাঁচা মাংস নিয়ে এসেছে ।

রান্না-বান্না করতে রাত্রি হয়ে গেল অনেক ! অমেত্ত জেদ করতে ছাড়ে না রমেশকে, "উঁহু, ঐ ক'টি ভাত মাংস দিয়ে খেলে হবে না, আরও চাট্টি দিই, মাংসও লাও ।"

আসল কারণটা ধরা পড়ল তার পরদিনই ! রতনের সখ করে পোষা কালো পাঁঠাটা কাল রাত্রি থেকেই ফেরেনি। অপ্রত্যাশিত মাংস আর পেসাদ পেয়ে ছাগল খোঁজা বন্ধ হয়েছিল, আর খুঁজলেই বা পেত কোথায় ?

মুখুয্যে মশায় গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছেন, সারা গ্রামে একটাও পাঁঠা মেলেনি, আশে-পাশের গ্রামেও না। ছোট তরফ রায় বাবুদের বাড়ীতে আজ ছাগলের রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। চড়া দাম দিয়েও মেলে না ! তা ছাড়া, বেশী দাম দিয়ে ছাগল কেনার মতের বিরোধী মুখুয্যে মশায় !

চমকে ওঠেন রমেশের কথা শুনে,"বল কি, গোবিন্দ গঁরাই, এককালে আমাদের সাবেক প্রজা ছোট পাঁঠাটার দাম বললে সতের টাকা ।"

হ-চেয়ে থাকে !

খোকাবাবু নীরবতা ভঙ্গ করেন, "বলি বক্ থাকুক অত রচা করবার—" তার কথা শেষ হল না···মুখুয্যে ম'শায়ের

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়তে থাকেন তিনি, "তা হয় না—তা হয় না।"

…তাকিয়াটা ছেড়ে উঠে পড়লেন কি ভেবে, খড়ম জোড়াটায় পা ঢুকিয়ে শশব্যস্তে বার হয়ে গেলেন ভিতর-বাড়ীর দিকে।

বাইরের আকাশে চলেছে ছোট তরফের ব্যাণ্ডের গগন-ভেদী শব্দ।…একদল মেয়েছেলের কান্নার মত…মাঝে মাঝে কানে আসে ব্যাগ-পাইপের সুরটা।

বলির আর দেরী নাই!

মুখুয্যে মশায় এসে হতাশ ভাবে বসে পড়েন, তাঁর অসহায় মুখে ভেসে ওঠে শ্রীহীনতার আভাষ। দেওয়ালের বিবর্ণ ছবিগুলোর দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে তাঁর বুক বিদীর্ণ করে বার হয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস!

—"খোকা একবার পূজোর আয়োজনটা দেখগে, বলির যা হয় একটা ব্যবস্থা করছি। ওর জন্য কিছু ভয় নেই! তুমি একবার তুরগ সিংকে পাঠিয়ে দেবে এইখানে"। খোকা-বার হয়ে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে ধীরপদে নেমে যাওয়ার পর মুখুয্যে মশায় মের্জাইয়ের পকেট থেকে বেগুনী রং-এর কাগজে মোড়া একটা আংটি বার করে দেন রমেশের হাতে…

"যেমন করে হোক এর থেকে একটা ছাগল"—অবাক হয়ে ওঠে রমেশ—আংটি থেকে ছাগল!

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও দেরী করো না।" মুখুয্যে ম'শায় তাড়াতাড়ি করে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের অন্তপ্রান্তে চলে গেলেন! রমেশ আশ্চর্য্য হয়ে যায়! আয়নাখানাতে দেখা যায় মুখুয্যে ম'শায়ের গণ্ডদেশে দু'এক বিন্দু অশ্রু। সহসা আয়নার ছায়ায় রমেশকে দেখতে পেয়ে তিনি সরে গেলেন সচকিত হয়ে।

ইতাবসরে আংটিটা নামিয়ে রেখে সরে পড়ল রমেশ। তারও মনটা কেমন ভারি ভারি হয়ে যায়।

রতনের কালো নধর পাঁঠাটা শ্যামপুকুরের ধারেই চরছিল, গোটাকতক আমপাতা ভেঙ্গে তার কাছে নিয়ে যেতেই ধরা দিল। বোকা পাঁঠা কি না!

তা'ছাড়া মুখুয্যেদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলতে হবে বৈকি!

অমেত্ত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে চলেছে—"বাবুরা ওর বাবা হয় কি না! বাবুদিকেই বা কি বলব, আজ খেতে কাল নাই, আবার ঘরে পূজো—।" ধমকে ওঠে রমেশ, "এ্যাই খবরদার বলছি;"

"ভারি আমার খবরদারীওয়ালা রে, কারুর বাপের খাই না পরি, কাল থেকে চাকরী করতে যাবে ত'।"

বাধা দিয়ে ওঠে রমেশ, "আরে ম'ল! পাঁঠার দাম দেবে বলেছে।"

অমেত্তকে কথায় পারা ভার। মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে—"পাঠার দাম দেবে? একটা ধাড়ী পাঁঠা সম্বৎসর নাকে দড়ি দিয়ে খাটছে, তারই বড় দাম দেয়, ও দেবে পাঁঠার দাম।"

রতন ওদিকে দাওয়ায় এক তানে কেঁদে চলেছে…রমেশ বিরক্তিভরে বলে ওঠে, "এ্যাই! কাঁদছিস কেনে, তুর বাবা মরেছে নাকি?" অমেত্ত জবাব দেয়, "কাঁদবে বেশ করবে, অমন বাবার মুখে তিল, কুশ পিণ্ডি দেবে—"

অভিনয় বেশ জমে উঠেছে, ঠিক এমনি সময়ে এসে হাজির তুরগ সিং…দেড়খানা চোখ পিট পিট ক'রে পেটেণ্ট-মার্কা গলা বার ক'রে বলে, "এ রমেশ—এ—!" কাছেই দাঁড়িয়ে আছে রমেশ, তবুও চীৎকার থামাবার নাম নাই! উত্তর দেয় অমেত্ত।

উঠানের একপাশে পড়েছিল একটা নারকেল-শিকের ঝাঁটা, সেটাকে হাতে তুলে নিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে যায়, "দেখবি দেখবি মিনসে? ষাঁড়ের মত হাকড়াতে এসেছে।"

…তুরগসিংএর চীৎকার থেমে যায়! দু' হাত পিছিয়ে এসে ঘন ঘন ঢোক গিলতে থাকে, "আরে আরে ই কিয়া! মারে গা মারে গা তুম।" অমেত্তও হিন্দীতে সুরু করেছে, মারে গা বই কি!…পোড়ারমুখো মিনসে, যা বলগা তোর বাবুকে, 'ও কাজ করতে যাবে না'!…গেলি? উদ্যত ঝাঁটার সামনে তুরগসিং কেঁচোর মত শান্ত হ'য়ে চোখ দেড়খানা পিট পিট করতে থাকে,…পরক্ষণেই বার হয়ে যায় দ্রুতবেগে!

অমেত্তর শাসন তখনও থামে নি।

আজ বিসর্জন!…চকের ভাঙ্গা বাড়ীর চু'দিকে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে লোক।

সারা অঞ্চলটার লোক আজ ভেঙে পড়ে দীঘির ঘাটে !…ছোট তরফ—রায়বাড়ী—সেনবাড়ী-দত্তদের প্রতিমা বিসর্জ্জন হয়। তার মধ্যে সেরা জমকালো হয় ছোট তরফেরই !…বাড়ীর সামনে বিশাল চত্বরে দ্বারোয়ানদের লাঠিখেলা, তরোয়াল-খেলা অনেক কিছুই হয় !…

মুখুয্যে বাবুরা কেউ কেউ ছাতে থেকে দেখেন…মুখুয্যে মশায়ের চোখে নামে অতীতের স্বপ্নরেখা…তাঁর মনে পড়ে এই চত্বরে তাঁদেরই দারোয়ান রামদেব লছমী সিং…কালু হাড়ির লাঠিখেলা হ'ত !…তিন চার প্রস্থ বাজনা! সারা বাড়ীর মাঝে তাদের গুরু গম্ভীর শব্দ গুমরে ফিরত !…

তুরগসিং দেউড়ীর ভাঙা ছাত থেকে প্রেতমূর্ত্তির মত খালি পায়ে মাঝে মাঝে হাত পা নেড়ে চলেছে! গলায় হনুমান-মার্কা তকৃতিটা মাঝে মাঝে দুলছে।

মুখুয্যে ম'শায় আশ্চর্য্য হয়ে উঠেন, গোপীপুরের জগঝম্পের দল…ছোট তরফের দলে বাজাচ্ছে! তাঁর সারা শরীরের শিরায় শিরায় বয়ে যায় বিদ্যুৎপ্রবাহ। মাথায় যেন সব রক্তটা উঠে গিয়ে বীরদর্পে নৃত্য সুরু করেছে।

রুদ্ধকণ্ঠে তাঁর অজ্ঞাতেই তিনি চীৎকার করে ওঠেন "তুরগসিং—!" …নিজে থেকেই আবার চুপ করে যান !… তাদের দোষ নাই—পুজোর দু'টো দিন তারা বাজিয়েছে। পেয়েছে মাত্র সেই একটাকা !…নিজেরই আসে একটা লজ্জা! ধীরে ধীরে গিয়ে খাসকামরায় ঢুকলেন। এ মুখ দেখাতেও তাঁর লজ্জা হয়।…

সারা পাড়া কাঁপিয়ে ঠাকুর-বিসর্জ্জনের পর্ব্ব সারা হ'ল। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, বিশাল দীঘির নিথর জলে জাগে চাঁদের উছল স্পর্শ! পিটুলীগাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে কর্দ্দমাক্ত ঘাটের উপর! শত শত মানুষের পদতাড়নায় ঘাটের ধারে আজ দধিকর্দ্দম উৎসব।

দীঘির ঘাট জনশূন্য হয়ে এসেছে। একা দাঁড়িয়ে আছে রমেশ! তার চোখে যেন অন্য কোন জগতের ছায়া! জলের দিকে যেন আধ-ডুবন্ত মৃৎপ্রতিমার দিকে চেয়ে থাকে; জলের ধারে ঢেউয়ের দোলায় ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে ডাকের সাজ মনসা-পাতা…কলা বৌ-এর সজা দুটো বেল।

রতন তাগাদা দেয়, "ও বাবা চল গো, আর ঠাকুর আসবে না—"

ধমকে ওঠে রমেশ—"থাম না!"

রতন বাক্যব্যয় না করে জলের ধারে ডাকের সাজ কুড়োতে থাকে!

জনহীন পথদিয়ে চলেছে মুখুয্যে বাবুদের প্রতিমা! রস বায়েন নেহাৎ দায়সারা গোছের পিটিং পিটিং করে ঢাকের কাঠিটা ঠুকে চলেছে, মুখুয্যে ম'শায় আসেনি এই প্রাণহীন শোভাযাত্রায়! গম্ভীরভাবে পায়চারী করে চলেছেন বিস্তৃত হল-ঘরে, আধ-ভাঙা ঝাড়ের কাঁচের পলাগুলো ম্লান চিমনীর আলোয় যেন তাঁর দিকে ব্যঙ্গ করছে, হাঁ, সারা ধ্বংসপ্রায় বাড়ীটা যেন ব্যঙ্গ করছে তাঁকে!

খোকাবাবু প্রতিমার সঙ্গে চলেছেন। তুরগসিং এইবার মনোমত করে সাজবার সময় পেয়েছে! লাল সালুর পাগড়ী আর হাঁটু অবধি ঝুল পাঞ্জাবী পরে সুদীর্ঘ একখানা কাচা বাঁশের লাঠির ডগায় মালবাহী মটরের মত একখানা লাল কানী বেঁধে চলেছে!

কিন্তু রাস্তায় লোক কেউ নাই, তবুও ঢাক কাঁশির শব্দ ভেদ করে মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ে 'এইয়ো-ও-ও'

রমেশ চমকে ওঠে—"খোকাবাবু?" খোকাবাবু উত্তর দিলেন না, নীরবে সরে গিয়ে দূরে দাঁড়ালেন! তুরগসিং শূন্য ঘাটের ধারে বার কতক লাল-কানী-বাঁধা লাঠিখানা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে!

রমেশ চীৎকার করে ওঠে—"এই বিটকেলী দেখ ব্যাটা ছাতুখোরের।"

তুরগসিং লাঠিখানা থামিয়ে হাঁফাচ্ছে! কোন রকমে প্রতিমাখানা ঠেলে জলে ফেলে দিয়ে তারা আবার ফিরে চলে বাড়ীর দিকে! রস বায়েনের ছেলেটা চোখ বুজে কাঁসিটায় ঘা দিয়ে চলেছে—

'ট্যাঁই ট্যাঁই।'

বিরক্ত হয়ে ওঠে রমেশ—"থাম বাপু, সেই যে পেথম দিন থেকে 'নাই নাই' করছিস তোর 'নাই নাই'-এর ঠেলায় সব উবে গেল!

ছেলেটা ভয়ে কাঁসি বাজান বন্ধ করে দেয়।

দিন যায়—

শীতের সন্ধ্যা নেমে আসে ধূমাচ্ছন্ন পল্লী-আকাশ ভেদ করে মৃতপ্রায় ধরণীর বুকে! অদূরে গ্রামপ্রান্তের মাঠে

লেগেছে রিক্ত ধরণীর স্পর্শ। ধান উঠে গিয়েছে, বাকী রয়েছে ঠাই ঠাই ছোলা খাসারীর সবুজ স্পর্শ।

আখের ক্ষেতের মাথায় নীচু হয়ে নেমে আসে সন্ধ্যার গাঢ় কালিমা। সারা বাড়ীখানা নিথর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাঙ্গা পাঁচীল, ছাদের মধ্যে দিয়ে অন্ধকার ধ্বংসপুরীতে উঁকি মারে সন্ধ্যার আবছা আলো, খিলানের গায়ে পাহারা দেয় ঝাঁকড়া তেতুল গাছের দল!
…ছাদের উপর এখনও সারি সারি দাঁড়িয়ে হাত-পা-মাথাভাঙ্গা পরীর দল বিশ্বস্তভাবে আজ পর্য্যন্তও বাড়ীর শ্রীবৃদ্ধি করে চলেছে।

মূর্ত্তিমান প্রহরী রয়েছেন মুখুয্যে মশায়, শীর্ণ লম্বা চেহারা। চোখ দু'টোতে এসেছে কোন অজানা জগতের আলোর স্পর্শ। খড়মটা শেওলা পড়া ছাতে আঘাত ক'রে প্রাণহীন বাড়ীতে তোলেন প্রাণের স্পন্দন।

আজ পুণ্যাহের দিন। সারা জমিদারীর সমস্ত প্রজারা এসে দিয়ে যাবে তাদের খাজনা, কাছারী বাড়ীতে ধূলি-ধূসরিত ঘর ক'খানা পরিষ্কার ক'রে খাটখানার উপর ফরাস পাতা হয়েছে। তুরগসিং কোথা থেকে দু'টো কলার তেউড় এনে পুঁতে রীতিমত পেয়াদা সেজে তাই পাহারা দিচ্ছে! যে পাড়ার বদমাইস ছেলে, এক্ষুনি গাছকে গাছ সাফাই করে দেবে।

রমেশ গোটা দু'এক তাকিয়া এনে সামনে রেখে দিয়েছে একখানা বড় রেকাবী।

মুখুয্যে ম'শায় পিতলের রেকাবীখানা দেখে নাক সিটকান। তাঁর পিতা-পিতামহের সময়ে ওখানে বসত নহবৎ, আজ যেখানে তুরগসিং কলাগাছ আগলাচ্ছে ঐখানে। বাড়ীর বাইরে দেবদারু ডাল দিয়ে সাজান হ'ত। রাত্রিতে ঝাড় লণ্ঠনের আলোতে সারা বাড়ী ঝকমক করত। আর আজ।

রমেশ তাড়াতাড়ি করে কোথা থেকে একখানা ধোয়ান তোয়ালে দিয়ে রেকাবীখানা ঢেকে ফেলে—এইবার বুঝুক ও কিসের, চাঁদির না রূপার?

কিন্তু এত চেষ্টা সব কিছু বিফল হয়ে গেল! কেবলমাত্র কর্ত্তার আমলের সাবেক মহাল ধরমপুরের দু' চারজন এসেছিল। আর বড় একটা কেউ আসবে না! প্রজা সমস্ত ত' আর নাই।

সন্ধ্যা হয়ে আসে! সারা বাড়ীটা নীরবে চেয়ে থাকে সন্ধ্যা-আকাশের দিকে! প্রাণহীন প্রতিমার মত বসে রয়েছে রমেশ, কলাগাছ পাহারা দিয়ে চলেছে তখনও তুরগসিং, অবশ্য খোলা চোখে নয়, ভাং-এর দয়ায় ঝিমিয়ে পড়েছে!

নীরবতা ভঙ্গ করে উঠে যান মুখায্যে মশায় বাড়ীর ছাতে। সারা পৃথিবী আজ সুপ্তিমগ্ন।

রমেশের চমক ভাঙ্গে ছোট তরফের ঢোল-কাঁসির শব্দে, আজ তাদেরও উৎসব। প্রজাদি'কে একসরা করে কচুরি সিঙ্গাড়া মিহিদানা দেওয়া হচ্ছে! ও চত্বরটা ভরে গেছে তাদের কোলাহলে।

সামনের রেকাবীর দিকে চাইতেই রমেশের চোখের সামনে ফুটে ওঠে কয়েকটা মাত্র আধুলি আর দু'টো টাকা!

বিরক্তিভরে হাতের কা ছে ধামায় রাখা গুড়ের পাটালি-গুলো উঠানের দিকে পেংটি কুকুরগুলোর দিকে ছুড়তে থাকে লে লে পেরজা দি'কে আর দরকার নাই, তুরাই খা—"

চোখ বুজে ছড়াতে থাকে পাটালীগুলোকে; দু' একটা পাটালীর গুঁড়ো তুরগসিং-এর গায়ে লাগতেই সে চমকে উঠে পড়ে, "এইয়ো—উল্লুককা বাচ্ছা"। লাঠিখানা হাতে নিয়ে গজরাতে থাকে! তার দোষ নাই! পাড়ার ছেলেগুলো তাকে প্রায়ই জ্বালাতন করে! কিন্তু আসল কারণটা দেখতে পেয়েই ছুটে এসে বারান্দার উপরকার পাটালীগুলো কুড়িয়ে মুখে পুরতে থাকে…গঙ্গার ধারের ভিখিরীর মত ব্যস্ত সমস্ত ভাবে।

অমেত্ত গাছকোমর করে গাড়ী থেকে কলাই নামাচ্ছে! রতনও যা পারছে করছে! কয়েক বিঘা মাত্র জমি, তাই ভাগীদের দিয়ে চাষ করিয়ে চারটি ধান কলাই পাকড় হয়, আর অমেত্তর গতর-খাটুনিতে চলে যায় সংসার কোন রকমে! রমেশের সঙ্গে বাড়ীর কোন সম্বন্ধ নাই, দিনের মধ্যে বার দু'য়েক আসে খেতে! ব্যস্, সারাদিন পড়ে থাকে ঐখানেই!

মা ছেলেকে গাড়ী থেকে কলাইগুলো নামাতে দেখে ভাগীদার নিয়ামুদ্দি বলে ওঠে, "ওগো জিতেন, তুমিই লেগেছ,

মিতে কোথা ?" হাসতে থাকে গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে। অমেস্ত কাপড়খানা ঠিক করতে করতে জবাব দেয়,"কে জানে বাপু কোথায় ? মরদ মানুষ চরে খায় ত ; তুমি কি বলে যাও মিতেনকে কোথা গেছ।"

নিয়ামুদ্দি একটু এগিয়ে এসে নিজেই গাড়ী থেকে কলাইএর বোঝাগুলো নামাতে থাকে, গায়ে গা ঠেকে যেতেই হেসে ফেলে অমেস্ত !

নিয়ামুদ্দী প্রায় সব কলাইগুলো নামিয়ে দেয় ! "ও কি গো, তোমার ভাগ যে কম হ'ল ?"

অমেস্তর কথায় হেসে ফেলে নিয়ামুদ্দী সলজ্জ হাসি !

লাল পিটুলীজমা দাঁত ক'টা বের হয়ে আসে ; গরু দু'টোকে গাড়ীতে জুড়তে জুড়তে বলে ওঠে, "লাও গো মিতেন, তুমি লিলে কি কমে যাবে ?"

নিয়ামুদ্দীর মনটা হয়ে যায় অনেকখানি হাল্‌কা—অমেস্তর হাসি তখনও মুখ থেকে মুছে যায় নি ! পিছন ফিরে চাইতে চাইতে গাড়িটা চালিয়ে যায় !

রমেশের অবস্থাটা দেখলে কেউই হাসি চাপতে পারবে না ! বিরাট ঢোল-কোম্পানী মার্কা একটা সাবেকী কোট গায়ে ! কোটখানা নাকি খাস-বিলেতী, বড়বাবু সেবার শীতের সময় দিয়েছিলেন রমেশকে। যা গরম, সারাদিন গা গুন গুন করে ! এ হেন কোট কি না বিশ্বাস-ঘাতকতা করে বসে। দুই বিশাল পকেট বোঝাই করে নিয়েছে নোতুন বুটের ডাল—

চুপি চুপি বাড়ী থেকে বাইরে যাবে, হঠাৎ অমেস্তর গলার শব্দে সচকিত হয়ে ছুটতে থাকে ! হাতের কাজ ফেলে রেখে অমেস্তও ছোটে তার পিছু পিছু।

দু'পুরের রোদ অলস শয়ন বিছায় জোড়া আমগাছের সবুজ পাতায়। শ্যামপুকুরের ঘাটে দু'একজন লোক স্নান করছিল, সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ! কিছুদুর অবধি তাড়া করে' এসে আর পারে না অমেস্ত। রমেশ তখন নাগালের বাইরে ভীত কাতর চাউনিতে পিছুপানে চাইছে, আবার সুরু করে ছুট।

কোটের একটা পকেটের সেলাই খুলে ফাঁক হয়ে ছিল, জানে না রমেশ ! ছোলার ডালগুলো দিব্যি পড়ে আসছে, তারই জন্ত অমেস্তর ঘোড়দৌড় ! অমেস্ত তখনও থামেনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ নেড়ে চলেছে, "খাওয়াব এইবার। আখার তলের ছাই যদি পাতগোড়ায় না দিই, আমি এক বাপের বিটী লই !"

যার উদ্দেশ্যে কথাটা বলা, সে তখন মুখুজ্যে বাড়ীর ভাণ্ডারে ! মাটির সরাতে অবশিষ্ট ডাল ক'টা রাখতে রাখতে হাঁফ ছাড়ছে !

বিরক্তি ধরে যায় ঠাকুরবাড়ীর ঝি মানদার। আজ পঁচিশ বছর থেকে সে চাকরী করে আসছে, কিন্তু এমন অবস্থায় পড়েনি। গজগজ করতে থাকে—"আমার পাওনা মিটিয়ে দেক, আমি আর খাটতে লারব।"

তার দোষ নাই, আগেতে মাইনে ঠিক মত পেত না বটে, কিন্তু উসুল করে নিত চাল ডাল তেলে। আর সে উপায় নাই, বাধ্য হয়েই পথ দেখতে চায়।

রমেশ খাঁটি কথার মানুষ, বলে বসে—"আর কেনে পোষাবে গো—সুখের পায়রা তোমরা, যেদিন থেকে তিন সেরের জায়গায় তিন পোয়া হ'ল, রাতে ঠাকুরের লুচির জায়গায় রুটী হল, সেই দিনই বুঝলাম মাসীর ভাত উঠল এবারে !"

মানদা ফোঁস করে ওঠে, "আমার ত মাগে রোজগার করে না বাছা, নিজের রোজগারে পেট পোরাতে হয় ?

উত্তরের আশায় না থেকে গজ গজ করে চলে গেল মানদা।

নিস্তব্ধ বাড়ীটাতে নেমে আসে দিনের বিলীয়মান সূর্য্যের ছায়ারেখা, স্বপ্নপুরীর মত এ জগতের ধরাছোঁয়ার বাইরে ! আঁকাবাঁকা ভেঙ্গেপড়া দেওয়ালের পাশ দিয়ে শৈবালাচ্ছন্ন পিচ্ছিল পথে প্রবেশ করে না ঐ আগাছার জঙ্গল ঠেলে এ জগতের পরিবর্ত্তন।

ছাতের মাথায় হলদে রোদ ক্রমবিলীয়মান হয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে যায় সম্পূর্ণভাবে, জনমানবহীন ধ্বংসপুরীতে নেমে আসে সন্ধ্যার অন্ধকার ! সারা বাড়ীতে বিরাজ করে অখণ্ড নীরবতা। সব্বাই যেন মৃত।

সুদীর্ঘ হলঘরখানাতে জ্বলে ওঠে মৃদু শেজের আলো, কাচের আধারটার মধ্যে জ্বলে ভীরু চকিত চাহনিতে একটা মোমবাতি কম্পিত শিখায়। ফরাসের উপর পায়চারী করে চলেছেন মুখুজ্যে মশায় ! খড়মের খন খন শব্দে ঘরখানা

মুখরিত। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে তাঁর উত্তেজনার ছায়া, পদশব্দেই তা বোঝা যায়।

রমেশ গামছাখানা কাঁধ থেকে নামিয়ে অকারণে ঝাড়তে ঝাড়তে বলে ওঠে, "আমিই বলেছিলাম খোকাবাবুর চাকরী না হয়ে যায় না,...তিন তিনটে পাশ, এমন মাণিকের টুকরা ছেলে, হাজার হোক মুখুজ্যে বংশের ছেলে—"

তার কথা শেষ না হতেই ধমক দিয়ে ওঠেন মুখুজ্যে মশায়, "থাম! মুখুয্যে বংশের ছেলে আজ পর্য্যন্ত কেউ চাকরী করতে যায়নি—কেন জমিদারী দেখতে পারত না? এই বাড়ী এ সব দেখবে কে? চাকরী?"

গম্ভীর ভাবে পায়চারী করতে থাকেন মুখুয্যে মশায়। খোকা তাঁরই সন্তান, আজ পরের চাকরী করতে যাচ্ছে। আর তাই কিনা জোর গলায় জানায় বাবাকে! আমন্ত্রণ জানায় এই বাড়ী—ধ্বংসপ্রায় বাড়ী ছেড়ে দিয়ে ছেলের বাসায় থাকতে।

...রাগে দুঃখে কাঁপতে থাকেন মুখুয্যে মশায়...ছোট তরফ, রায় বাবুরা সব্বাই জানবে তাঁর এ অপমানের কাহিনী। যাঁদের বাড়ীতে খাটত আমলা, নায়েব, তাদেরই ছেলে যাবে চাকরী করতে!...

...সারা ঘরখানায় তিনি মত্ত বিক্রমে পায়চারী করে চলেছেন। সারি সারি বড় তৈলচিত্র তাঁরই পূর্ব্বপুরুষদের...। সকলেই আজ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে তাঁর দিকে...সে আজ...বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতক!!

...নীরবতা ভঙ্গ করে তিনি চীৎকার করে ওঠেন।

"টেলিগ্রাফ করে দাও, রমেশ, তাকে চাকরী ছাড়তে হবে—ছাড়তে হবে! আমি মরে গেলে সে যা খুসী করুক, আমি দেখব না, দেখতে আসব না...!

কথা শেষ হতে না হতেই তিনি এগিয়ে গেলেন খাস কামরার দিকে।...সারা শরীরে আজ নৃত্য করে তাঁর সেই আদিম সামন্ত-রক্ত। শিরায় শিরায় যেন বয়ে যায়—বিদ্যুৎপ্রবাহ।

বহু দিনের বন্ধ কাচের আলমারীটা খুলতে থাকেন। এর অর্থ জানে রমেশ। এখুন সুরু হবে...উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয়। রুদ্ধকণ্ঠে, চীৎকার করে ওঠে—"বড়বাবু বড়বাবু!!"

মুখুয্যে মশায় কোন কথায় কান দেন না! তিনি আজ সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে!...

কঠিন স্বরে ধমকে ওঠেন, "এই চুপ কর!"...তাঁর কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে রমেশ,...মনে পড়ে সেই আগেকার যুগের কথা—প্রথম সে যখন এসেছিল এ বাড়ীতে! সারা রাত্রি চলত বোতলের পর বোতল...আর বড় হলটা হয়ে উঠত ও পাড়ার বেনেদের অচলার লীলা-নিকেতন!

...গ্রামের মধ্যে...অর্দ্ধপ্রকাশ্য ভাবে সম্ভ্রান্ত মহলে যে দেহ বেসাতি করত, সেই অচলা আজও বেঁচে আছে!...

চোখের সামনে ভুত দেখলেও অতখানি আশ্চর্য্য হ'ত না রমেশ। তুরগসিং দরজার কাছ থেকে একটা সেলাম করে, সরে গেল। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে শোনা যায় তার পদশব্দ...।

...হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই অচলা...দেহে বয়সের ছোঁয়া এসেছে, তবুও অমলিন করে দিতে পারেনি তাকে, তার হাসিকে!...ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় বড় বাবুর দিকে...।

...বড় বাবুর কোনদিকে নজর নেই, বহুদিন পরে আবার হাতে বোতল পেয়ে সব ভুলে গেছেন!...গ্লাসটা হাত থেকে নামিয়ে চীৎকার করে ওঠেন—"আমি মরি, তারপর—সে যা খুসী করবে!...আমি দেখব না, দেখতে আসব না!—

রমেশ তখন এসে পড়েছে বাইরে...হলের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ধীরে ধীরে পা বাড়ায় অন্ধকারের মধ্যে!...

কানে আসে বড় বাবুর অট্টহাসি, বোধ হয় অচলাকে দেখেই—হাঃ হাঃ হাঃ...

একটা ঠিক পৈশাচিক শব্দ...। সারা মৃত পুরীটাকে সচকিত করে তোলে...। পুরোনো থামের আড়ালে কবুতর-দম্পতি ওঠে শিউরে।

অন্ধকার পুরীর মধ্যে পথ হারিয়ে হাসিটা যেন ঘুরে বেড়ায় ওর আনাচে-কানাচে...। থমথমে অন্ধকারে শিউরে ওঠে রমেশ!...

ভয় লাগে! ঘন-তমসাবৃত বাড়ীটা থেকে শত শত বাহু যেন তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তার কণ্ঠ রোধ করে দিতে চায়...। তাকে নিঃশেষ করে দিতে চায় ঐ অতৃপ্ত আত্মাগুলো! যারা তৃপ্ত হয়নি, কোন দিন হবে না!...

অনাগত কালেও যারা তৃপ্ত হবে না...সারা গায়ে ঘাম দিয়ে ওঠে রমেশের...দ্রুতপদে সিঁড়িটা থেকে নামতে থাকে...।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস-শিল্প

ডাঃ শ্রীমনোমোহন ঘোষ

প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস লিখলেও কোনো কোনো লেখক এ কথাটি স্বীকার করতে চান না। তাঁদের মতে, বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টির জন্য শ্রেষ্ঠ প্রশংসার ন্যায্য দাবীদার হচ্ছেন 'নব বাবু বিলাসে'র লেখক। কিন্তু এরূপ মত খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। অঙ্কিত চরিত্রগুলি ও তাদের কার্য্যকলাপ কথাবস্তুর (plot) মধ্যে যথাযোগ্য ভাবে বর্ণনা করা এবং চরিত্রগুলির কথোপকথনের দ্বারা সুসম্বদ্ধ ভাবে ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে উপন্যাসের উদ্দেশ্য। কাজেই দেখা যায় উপন্যাসের মোটামুটি চারটি অঙ্গ :—(১) চরিত্র-চিত্রণ, (২) বর্ণনা, (৩) বক্রোক্তি বা সংলাপ, (৪) এ তিনটি পদার্থের যথাযোগ্য সমাবেশ। এ চারটির মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ চরিত্রাঙ্কণ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগেও কিছু পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্ত, দুর্ব্বলা দাসী, ফুল্লরা এবং ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী আদি চরিত্রাঙ্কণের দৃষ্টান্ত হিসেবে নিন্দনীয় নয়। কাজেই 'নববাবুবিলাসে' বাবু চরিত্রের যে নক্সা দেখতে পাওয়া যায়, তাকে নব উদ্ভাবনের গৌরব দান করলে অন্যায় হবে। শেষোক্ত বইতে কিছু কিছু সরস বর্ণনা আছে, এটুকুই এর কৃতিত্ব। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় গদ্যের সঙ্গে পদ্যের মিশ্রণ ঘটিয়েও লেখক উপন্যাস হিসাবে এর প্রবন্ধ-গৌরব নষ্ট করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও গদ্য পদ্য মিশ্রিত চম্পূকাব্য আছে বটে, তবে সে সব কখনও প্রথম শ্রেণীর রচনা বলে গণ্য হয় নি। উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীদের সংলাপের জন্য যে কথাবার্ত্তার ভাষার প্রয়োজন, তার প্রথম নমুনা প্রকাশ করেন উইলিয়ম কেরী তাঁর সঙ্কলিত কথোপকথনে, কিন্তু এ বইকে উপন্যাসের মর্য্যাদা দেওয়া যায় না। এতে কোনো গল্পবস্তু নেই। নানা বিষয়ের কথোপকথনগুলিকে সমসাময়িক সমাজ চিত্রের ছোট ছোট নক্সা বলে গণ্য করা যায় মাত্র। প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলালে' উপন্যাস রচনার যে আদর্শ প্রবর্ত্তন করলেন, তার মধ্যে উপন্যাসের চারিটি মুখ্য অঙ্গই অল্প বিস্তর বর্ত্তমান। এ জন্যই স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম ঔপন্যাসিকের গৌরব দান করে গেছেন। চরিত্র সৃষ্টি ব্যাপারে নতুন উদ্ভাবক না হয়েও তাঁর সৃষ্ট ছোটবড় চরিত্রগুলির সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের জন্য প্যারীচাঁদ বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। 'আলালে' কোনো স্ত্রীচরিত্র তেমন ভালো ক'রে ফোটে নি, কিন্তু এ জন্যে প্যারীচাঁদকে দায়ী না ক'রে সমসাময়িক সমাজকেই দায়ী করা উচিত। 'আলালে'র অন্তর্গত সংলাপগুলি চরিত্র বিকাশের অঙ্গ হিসেবে বিশেষ উপযোগী, তবে কখনও কখনও উপদেশকথার কিঞ্চিৎ বাহুল্য বশত একটু নীরস হয়েছে। মাঝে মাঝে 'নববাবু বিলাসে'র ধরণে দুটি পদ্য বর্ণনা থাকায়ও বইখানি একটু অদ্ভুত হয়ে পড়েছে। তবু সব দিক থেকে দেখলে উপন্যাস হিসাবে 'আলালে'র প্রশংসাই করতে হয়।

কলিকাতা ও মফঃস্বলের তৎকালীন বাঙালী সমাজের যে নানা সরস প্রাঞ্জল ও চিত্রলিখিতবৎ বর্ণনায় 'আলাল' পরিপূর্ণ, তৎপূর্ব্বে রচিত কোনো বাংলা গ্রন্থে সে সকলের সন্ধান মেলে না। এ গ্রন্থের রুচিগত বিশুদ্ধিও লক্ষ্য করবার মতো। 'নববাবুবিলাস' একেবারে নগণ্য রচনা না হলেও এতে ছিল নিতান্ত কদর্য্য রুচির পরিচয়। এদিক দিয়েও প্যারীচাঁদ নূতন আদর্শের প্রবর্ত্তন করলেন। তিনি 'যৎকিঞ্চিৎ' এবং 'অভেদী' নামক যে দু'টি উপদেশাত্মক আখ্যান লিখেছিলেন, সে দুটিও উপদেশ কথার বাহুল্য বশত, সুন্দর বর্ণনা এবং সংলাপ থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসের পর্য্যায়ে দাঁড়াতে পারে নি।

প্যারীচাঁদের 'আলাল'কে সর্ব্বপ্রথম লিখিত বাংলা উপন্যাস বলা গেলেও এ-বইতে কোন উচ্চশ্রেণীর মুখ্য চরিত্র আখ্যান বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা পর্য্যায়কে ঐক্যদান করে নি। সেদিক দিয়ে 'আলাল'কে শিথিল ভাবে গ্রথিত কতকগুলি নক্শার সমষ্টি বলে মনে হয়। তবু তাঁর এই পরীক্ষামূলক গ্রন্থ যে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার পথকে খুব সুগম করেছিল, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। এ পথে অগ্রসর হয়েই বঙ্কিমচন্দ্র নিজ প্রতিভাগুণে কৃতিত্বলাভ করতে পেরেছিলেন। অবশ্য তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস Rajmohon's Wife শিল্পকৌশলের দিক দিয়ে আলালের বেশী ওপরে যেতে পারে নি। ইংরেজীতে রচিত হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিম প্রবর্ত্তিত উপন্যাস

শিল্পের আলোচনায় এ বইটিকে বাদ দেওয়া চলে না। গঠন-কলার দিক দিয়ে বইখানি বড়ই কাঁচা। এর পাত্র পাত্রী-গুলি পুতুলের মতো নির্জীবপ্রায়; কারো ব্যক্তিত্বে বৈচিত্র্য-বেশ নেই; আখ্যানে যারা একবার সাধু হিসাবে দেখা দিয়েছে তারা শেষ পর্য্যন্ত অটল অচল সাধুত্বের ছবি; আর যাদের প্রথম সাক্ষাৎ পাই দুষ্কর্ম্মার মূর্ত্তিতে, তারা উত্তরোত্তর পাপের পথেই অগ্রসর। এরূপ একটানা ভালো বা মন্দ চরিত্র আঁকার ফলে গল্পাংশে নানা বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসখানি নিতান্ত অঙ্গহীন হয়ে ছিল। উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য যথাযুক্ত পটভূমিকার আশ্রয়ে আখ্যানগত পাত্র পাত্রীদের চরিত্র বিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাপর্য্যায়ের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করা। এ দুটি জিনিষ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসে একেবারে অনুপস্থিত। এ গ্রন্থের আর এক দোষ এই যে, এতেও 'আলালে'রই মতো এমন কোনো মুখ্য চরিত্র নেই যে বর্ণিত ঘটনা নিচয়কে ঐক্য দান করেছে। সাময়িক পত্রিকায় গ্রন্থখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত এর গুণাগুণ বুঝতে পেরে ছিলেন। তাই তিনি একে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন নি।

সে যাই হোক, এ পরীক্ষামূলক লেখাটি সাফল্যলাভ না করলেও বঙ্কিমচন্দ্র তারপরে যে কয়খানি উপন্যাস ক্রমাগত লিখলেন তার মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের অভাবনীয় পরিণতি ঘটল। তাঁর কোনো কোনো বইতে গঠনগত সামান্য ত্রুটি থাকলেও উপন্যাসশিল্পের মূলতত্ত্বগুলি তাঁর বইগুলিতে প্রায় নিঃশেষে দৃষ্টান্ত লাভ করেছে। এ বিষয়টি বুঝতে হলে বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যানবস্তু নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনার দরকার। কোনো কোনো লেখক এ নির্ব্বাচনের মধ্যে বঙ্কিমের শ্রেণীগত মনোবৃত্তি ও পক্ষপাতের প্রত্যক্ষ খেলা দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে এ রকম ধারণার সমর্থন করা যায় না। 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী' 'সীতারাম' আদি প্রচারমূলক উপন্যাসগুলির কথা বাদ দিলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানভাবে ছিলেন সাহিত্যে শিল্পী। তিনি তাঁর সময়ের প্রভাবশালী শ্রেণীর বাঙালী হলেও তাঁর উৎকট শ্রেণীগত অভিমান ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দেশাগত উদার মনোভাবই ছিল তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল। চরিত্র চিত্রণে ও আখ্যানবস্তুর সংগঠনে যদি কোনো প্রভাব তাঁর রচনায় কাজ করে থাকে, তবে সে হচ্ছে তাঁর সহজাত শিল্পীসুলভ দৃষ্টি।

চরিত্র চিত্রণ উপন্যাসের এক প্রধান অঙ্গ। যে সকল নরনারীর সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার কাহিনীকে আশ্রয় করে উপন্যাস রচিত হবে, তাদের জীবন্ত রূপে চিত্রিত করা লেখকের অবশ্য কর্ত্তব্য। এ জীবন্ত চরিত্রের অর্থ এই যে, প্রত্যেক চরিত্র তার নিজের দেশ ও কালের পক্ষে এবং সাধারণ মনুষ্য চরিত্রের হিসাবে স্বাভাবিক হবে। বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই রাজা রাজোড়া, ধনী ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মাঝ থেক পাত্র-পাত্রী কল্পনা করেছেন, তার মূলে ছিল স্বাভাবিকতার দাবী। প্রত্যেক সার্থক উপন্যাসেই দেখা যায় যে, এমন দুয়েকটি পাত্র-পাত্রী আছেন যাদের চরিত্রের গতি ও বিকাশ বহুমুখী এবং জটিল। বঙ্কিম যে সময় উপন্যাস লিখতে সুরু করেন, তখনকার বাঙালী সমাজে ও চরিত্রে সবেমাত্র বৈচিত্র্য বিকশিত হতে শুরু করেছে। সে বিকাশ তখনো সম্পূর্ণ হবার বিলম্ব ছিল। নানা পারি-পার্শ্বিক অবস্থার চাপে ব্যক্তি তখনো সমাজের অজ্ঞাতে দুর্নিবার নিয়ম শৃঙ্খলা থেকে স্বাধীনতা পায় নি; কাজেই তেমন সমাজের প্রাণীদের নিয়ে জীবন্ত চরিত্র আঁকা একটু দুঃসাধ্য ছিল। এ দুরূহত্ব আবার বিশেষ ভাবে প্রকট হয়েছিল নারী চরিত্র অঙ্কণে। উপন্যাসের এক মুখ্য উপজীব্য নরনারীর ভালবাসা। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে এই ভালবাসার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে কোনো নায়িকার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার এক বিষম বাধা ছিল; কারণ, একান্ত দরিদ্র ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নারিগণ নিজেদের জীবন-সংগ্রামে ও সমাজের চাপে প্রায় ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন। সমাজের চাপ ধনী সম্প্রদায়ের উপরও খুব কম ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও সময় সময় অর্থ বলের মহিমা যে সামাজিক বাধাকে অতিক্রম বা অগ্রাহ্য করেছে, তার দৃষ্টান্ত বিশেষ বিরল নয়। একজন্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকটা বাধ্য হয়েই অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান সম্প্রদায়ের লোকদের মাঝ থেকে নিজ উপন্যাসের পাত্রপাত্রী বাছতে হয়েছে। প্রাচীন কালে যৌবন বিবাহ ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের কথা শুনতে পাওয়া গেলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিবাহপূর্ব্ব বা বিবাহ-

বহির্ভূত প্রেম এ দেশের সমাজে অত্যন্ত নিন্দার্হ ছিল। কিন্তু বিবাহ-সিদ্ধ প্রেম আদর্শ হিসেবে যতই ভালো হোক, তাকে একান্তভাবে আশ্রয় করে নাটক উপন্যাসের বিবিধ ও বিচিত্র স্বভাবানুগ চরিত্র সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। মানুষের অন্তরে যে দুর্নিবার প্রবৃত্তি নিচয় আছে, সেগুলির গতি বহুধা বিচিত্র আর সমাজ শাসনেরও বিধিনিষেধের প্রকৃতিই হচ্ছে ঐ গতিকে বাধা দেওয়া। এ দুয়ের দ্বন্দ্বে কোনো সমাজের শক্তি যদি নিরন্তর জয়ী হয়, তবে সে সমাজের কোনো নরনারীর জীবন নিয়ে সৃষ্ট নাটক বা উপন্যাস হয়ে ওঠে নিতান্ত একঘেয়ে ও অস্বাভাবিক। সংস্কৃত নাটকগুলির অধিকাংশই এর প্রধান দৃষ্টান্ত। স্বাভাবিক কারণে তাতে নরনারীর চরিত্রগত বৈচিত্র্য সুলভ নয়। কাজেই সার্থক উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে অতি সাবধানে পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচন করতে হয়েছে। তখনকার সমাজে কেন পূর্ব্ববর্ত্তী দু'পাঁচশ বছরের মধ্যেও বাংলা দেশের সনাতন প্রথা নিয়ন্ত্রিত সমাজে উপন্যাসের নায়িকা হওয়ার মত প্রাপ্ত-যৌবনা কন্যা খুঁজে পাওয়া ভার ছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনা করলেন তিলোত্তমার। এর জননী ছিলেন স্বীয় মাতার অবৈধ সন্তান। বীরেন্দ্রসিংহ স্বেচ্ছাচারী সমৃদ্ধ ভূস্বামী ছিলেন বলেই তিলোত্তমার মাতাকে বিবাহিতা স্ত্রীর মর্য্যাদা দিতে পেরেছিলেন। এরকম দম্পতির সন্তান বলেই তিলোত্তমা প্রাপ্তযৌবনা হয়েও কুমারী থাকতে পেরেছিলেন। জগৎসিংহের সঙ্গে তাঁর প্রণয়কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে স্বাভাবিক করবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে এত কল্পনা বাহুল্য করতে হয়েছিল। তিলোত্তমার বিমাতা বিমলাও ছিলেন নিজ মাতার অবৈধ সন্তান। এজন্য তাকে প্রগলভারূপে আঁকা হলেও তার চিত্র নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে সমসাময়িক পাঠকের অভ্যস্ত ধারণাকে আঘাত করে নি বা অস্বাভাবিক বিবেচিত হয় নি। আয়েসা পাঠান রাজের নিতান্ত আদরের মেয়ে, তাই তার আচরণের স্বাধীনতাকে খুব সম্ভবপর মনে না হলেও অস্বাভাবিক মনে হয় না।

পরবর্ত্তী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'র নায়িকা লোকসমাজ থেকে দূরবর্ত্তী স্থলে কেবল প্রৌঢ় বয়স্ক দুটি লোকের মধ্যে পালিত; তাই তার উপন্যাস-কথিত যৌবনাবস্থা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের মধ্যে কোনো অসম্ভাব্যতা দেখা দেয় নি। ধর্ম্মভ্রষ্টা মতিবিবিকে দিল্লীর রঙমহলের আশ্রয়ে রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র তার চরিত্রের উপন্যাস বর্ণিত বিকাশকে স্বাভাবিক করেছেন। মৃণালিনী বাংলার মেয়েই নন এবং একালেরও নন। তাই তাঁর স্বাধীন প্রেম অস্বাভাবিক লাগে না। আর পশুপতি মনোরমার যে প্রেম তা প্রথমত বিধি বহির্ভূত হলেও গ্রন্থকার দুজনের বিবাহের রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রে সে বিষয়ে দৃষ্টিকটুতা আরোপের সম্ভাবনা দূর করেছেন। এরকম 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' আদি উপন্যাসগুলির সমালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রাপ্তযৌবনা রমণীকে তিনি যে যে যায়গায় আখ্যানবস্তুতে প্রবেশ করিয়েছেন সেখানেই তারা, হয় ভিন্ন দেশের নয় ভিন্ন কালের, নয়তো দুইই, অথবা তারা দৈব দুর্ব্বিপাকে বা দুর্ভাগ্যের জন্য সমাজভ্রষ্টা।

'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি যে সব উপন্যাসে বঙ্কিম প্রায় সমসাময়িক বাঙালী সমাজের ছবি এঁকেছেন, সেখানেও অত্যাবশ্যক প্রাপ্তযৌবনা নারীচরিত্রগুলির—যাদের দ্বারা আখ্যানের ঘটনাবলি অপরিহার্য্য রূপে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—যৌবনাবস্থা কল্পনার বেলায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্যে নানা কৌশল অবলম্বন করেছেন। যেমন, কুন্দনন্দিনী ভাগ্যদোষে যৌবনে মাতা পিতাহারা ও বালবিধবা, ইন্দিরা পিতার আর্থিক দম্ভবশত দীর্ঘকাল বিরহিণী ও পিত্রালয়বাসিনী; রজনী দরিদ্র ও জন্মান্ধ, রোহিণী ও হীরা দরিদ্র গৃহস্থ-কন্যা, বালবিধবা ও উপযুক্ত অভিভাবকহীনা, এসব কারণে যৌবন সমাগমে এদের স্বসমাজদুর্লভ প্রেমোন্মত্ততায় স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয় নি।

যথোপযুক্ত বয়সের পরেই লোকের চরিত্রকে বৈচিত্র্য দান করতে পারে তার শিক্ষা-দীক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস লিখতে সুরু করেন, তখন এ-দেশে সবে মাত্র স্ত্রী-শিক্ষার সূত্রপাত হ'য়েছে। কোনও প্রকারের অল্প-বিস্তর শিক্ষা পেয়েছে এমন নারী তখনও নিতান্ত দুর্লভ। তাই 'বিষবৃক্ষে'র সূর্য্যমুখী ও কমলমণির বেলায় বঙ্কিমচন্দ্রকে মিস্ টেম্পল নাম্নী মেম শিক্ষয়িত্রীর অবতারণা করতে হয়েছিল। রজনী জন্মান্ধ ব'লে লেখাপড়ায় অজ্ঞ, সাধারণ চিঠিপত্র লেখার বেশি বিদ্যা যে ভ্রমরের ছিল তা' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পড়লে মনে হয় না। রোহিণী বা হীরা নিম্নশ্রেণীর চরিত্ররূপে কল্পিত, কাজেই

তাদের শিক্ষার কথা ছেড়ে দেওয়া যায়। এই যে সমস্ত চরিত্রের কথা বলা গেল, তাদের মধ্যে সূর্য্যমুখী ও কমলমণির চরিত্র সব চেয়ে উজ্জ্বল ও মহিমাময়। সমসাময়িক সমাজে এ রকম চরিত্র সৃষ্টির উপাদান সুলভ ছিল না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ও ভারতের অতীত ইতিহাসের ভেতর থেকে ও সেই সঙ্গে রাজপুতানার এবং উত্তর-ভারতের মোগল রাজ-অন্তঃপুরাদিতে পাত্রপাত্রীর কল্পনা ক'রে গেছেন। নিজের দেশ কাল থেকে দূরে অবস্থিত ব'লে এসব চরিত্রের স্বাভাবিকতার দাবী খানিকটা গৌণ হ'য়ে পড়েছে। যে দেশ বা কাল সম্বন্ধে পাঠকদের তথা লেখকের জ্ঞান সুপরিস্ফুট বা সম্পূর্ণ নয়, সে দেশ-কালের কোনো অবস্থা বা চরিত্রকে নিতান্ত অস্বাভাবিক মনে হওয়ার কারণ অল্পই ঘটতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র পাত্রপাত্রীদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তাঁর প্রচারমূলক উপন্যাসগুলি বাদ দিলে তাঁর সৃষ্ট কোনো চরিত্রকে অস্বাভাবিকের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের এ গুণটির পরে উল্লেখযোগ্য তাঁর চরিত্রাঙ্কন পদ্ধতি। কোনো কোনো উপন্যাসে বা তার অংশ বিশেষে তিনি নিজে প্রচ্ছন্ন থেকে চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভের সুযোগ দিয়েছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র দ্বিতীয়ার্দ্ধ, 'চন্দ্রশেখরে'র প্রথমাংশ, 'সীতারামে'র প্রথমাংশ, 'কপালকুণ্ডলা' এ বিষয়ে প্রমাণ।

আখ্যান বিকাশের এ পদ্ধতিটিকে বলা হয় নাটকীয় কৌশল। কারণ নাটক রচনার সময়ে গ্রন্থকারকে থাকতে হবে কাহিনী থেকে দূরে প্রচ্ছন্নভাবে। অথচ চরিত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি এমন সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক হবে যাতে তাদের ওপর আরোপিত উক্তি প্রত্যুক্তিগুলিতে তাদের অন্তরের গোপন তথ্য বেশ সহজেই প্রকাশ পাবে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র এ কৌশলটি সর্ব্বপ্রথম প্রয়োগ করলেও তা খুব তেমন সফল হয় নি। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসে যে যে অংশে চরিত্র বিকাশের নাটকীয় পন্থা অনুসরণ করেছেন—তা বেশ স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু 'চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিমচন্দ্র এ পন্থা খুব সফল ভাবে অনুসরণ করতে পারেন নি—যদিও সে চেষ্টা করেছিলেন। আবার 'কপালকুণ্ডলা'র ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রথমার্দ্ধে বঙ্কিম বেশ সার্থক ভাবে নাটকীয় কৌশলের সঙ্গে চরিত্রগুলিকে ফুটিয়েছেন। 'সীতারাম' উপন্যাসের একাংশও এ নাটকীয় কৌশলে রচিত। কোনও সমালোচকের মতে এ বইখানি বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আখ্যান বিকাশ ব্যাপারে নাটকীয় কৌশলের উপযোগিতা যথেষ্ট থাকলেও উপন্যাসে তাকে একান্তভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়, আর বাঞ্ছনীয়ও নয়। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে পাত্র পাত্রীদের নিগূঢ় মনস্তত্ত্ব বা কার্য্যকলাপের বাহুল্য তাদের কথাবার্ত্তায় ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। সে সকল ক্ষেত্রে লেখককে সর্ব্বজ্ঞ রূপে সে সব বর্ণনার ব্যবস্থা করতে হয়। আর কোনো কোনো জায়গায় ঘটনা বিশেষ সম্বন্ধে সুবিবেচিত মন্তব্য ও বর্ণিত কাহিনী সম্বন্ধে পাঠকের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে উপন্যাস লেখককে সাবধানে নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বর্ণনার কাজ চালাতে হয়। 'মৃণালিনী' উপন্যাসের তুর্কী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের বর্ণনা গ্রন্থকারের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ইতিহাস এ সম্বন্ধে যে অবিশ্বাস্য কাহিনীর উল্লেখ ক'রে গেছে, বাঙালীর পৌরুষ বজায় রেখে তিনি তার বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তেও এ জাতীয় প্রয়োজনে তাঁকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর বলে সমস্ত আখ্যানটিকে ও তার অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলিকে ফোটাতে হয়েছিল। নিষ্কাম ধর্ম্মের ও অনুশীলনতত্ত্বের বিগ্রহ হিসেবেই তিনি এঁকেছিলেন প্রফুল্ল বা দেবী চৌধুরাণীর চরিত্র। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে এ উপন্যাসের মধ্যে অকুণ্ঠিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছে। এগুলি ছাড়াও প্রত্যেক উপন্যাসের মধ্যে এখানে সেখানে তিনি পাত্রপাত্রীদের কার্য্যকলাপাদি সম্বন্ধে নানা ছোটখাটো মন্তব্য করেছেন যা উপাখ্যানের উপাদেয়তা বাড়াবার সাহায্য করেছে। এরকম মন্তব্যই কিয়দংশে উপন্যাসকে তার বৈশিষ্ট্য দান করে। পূর্ব্বোক্ত দুটি ছাড়াও আখ্যান বিকাশের এক তৃতীয় পদ্ধতি আছে। সে হচ্ছে আখ্যানের অন্তর্গত পাত্রপাত্রী বিশেষের দৃষ্টিতে অপরাপর পাত্রপাত্রীর কার্য্যকলাপকে দেখা। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র শেষাংশে আখ্যানটিকে প্রায়শঃ বিমলার দৃষ্টিতেই দেখেছেন, আর 'আনন্দমঠে' তিনি কাহিনীটিকে দেখেছেন তাঁর কল্পিত মহাপুরুষের দৃষ্টি দিয়ে। আখ্যান বিকাশের তিনটি পন্থা অনুসরণ করলেও বঙ্কিমচন্দ্র

কোনো উপন্যাসে কোনোটিকেই একান্তভাবে অবলম্বন করেন নি। তাতে তাঁর উপন্যাসগুলি গঠনবৈচিত্র্যের দিক দিয়ে খুব মনোজ্ঞ হয়েছে।

নিজ রচনাকে বৈচিত্র্য দান করবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র আরও নানা কৌশল আশ্রয় করেছিলেন। তাঁর কতকগুলি উপন্যাসে (যেমন দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী ও রাজসিংহ) গল্পাংশ আপাত দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন চরিত্র ও ঘটনা পর্য্যায়ের সমবায়ে তৈরী, কিন্তু তাঁর শিল্পকৌশলে এ বিচ্ছিন্নতাও ঐক্য লাভ করেছে। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে বিমলা ও আয়েষার মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই, কিন্তু উভয়ের সঙ্গে পরিচিত জগৎসিংহ এ দুই নারীকে উপাখ্যানগত ঐক্যে আবদ্ধ করেছেন। 'কপালকুণ্ডলা'য়ও নায়িকা এবং মতিবিবি পরস্পরের থেকে নানা বিষয়ে একান্ত পৃথক হয়েও নবকুমারের সম্পর্কে একত্রে মিলেছেন। 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রনাথ ও হীরা এ দুজনের নানাদিক থেকে প্রভেদ সত্ত্বেও এক দিক দিয়ে তাদের এ সাদৃশ্য ছিল যে তারা উভয়েই প্রেমের তাড়নায় আত্মহারা। এ উগ্র প্রেমতৃষ্ণাই তাদের একত্রে বেঁধেছিল কুন্দনন্দিনীরূপ সূত্রের সাহায্যে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসেও দুটি কাহিনীকে একত্রে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর এক দিকে আছে প্রতাপ-শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের আখ্যান, অপরদিকে আছে দলনী গুরগণ মীরকাশিমের কাহিনী ও তদানুষঙ্গিক নবাব ও ইংরেজের লড়াই। এ শেষোক্ত কাহিনীর যুদ্ধ ব্যাপারই দুটি আখ্যানকে একত্র করেছে। রজনী এবং রাজসিংহেও এরকম কৌশলের পরিচয় আছে।

চরিত্র-চিত্রণ ও আখ্যান বিন্যাসের কৌশল আলোচনার পরে দৃষ্টি দিতে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের আনুষঙ্গিক দেশকালের বর্ণনার ওপর। এ বর্ণনা যথোচিতভাবে করা হলেই আখ্যান বস্তুর কাঠামোটি এবং বর্ণিত চরিত্রগুলি জীবন্তবৎ প্রতিভাত হয়, আর সমগ্র আখ্যানের বিশ্বাস্যতা যথোচিত রূপ লাভ করে। এরূপ বিশ্বাস্যতার ফলে উপন্যাস বর্ণিত পাত্র-পাত্রীদের সম্বন্ধে সহৃদয় পাঠকগণ এক সমপ্রাণতা অনুভব করেন, যার দ্বারা রসানুভব সহজ হয়ে আসে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ আদি উপন্যাসের আরম্ভ ভাগের বর্ণনাগুলি মনে করা যেতে পারে। গ্রন্থগুলির অভ্যন্তর ভাগেও এরূপ বর্ণনার অসদ্ভাব নেই। 'কপালকুণ্ডলা'য় সমুদ্রতটে নায়িকার বর্ণনা,'দেবী চৌধুরাণী'তে ত্রিস্রোতার কূলে জ্যোৎস্না রাত্রে সখীসহিত নায়িকার বর্ণনা (২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ) এ কথারউত্তম দৃষ্টান্ত। এ সকল স্থলে বঙ্কিমের গদ্য কাব্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং তার ফলে সমগ্র আখ্যানবস্তু এক অপূর্ব্ব রসৈশ্বর্য্যে মণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ রসকে মাঝে মাঝে নিজ ব্যক্তিগত চিন্তার ধারায় অনুরঞ্জিত করে আরো অপরূপ করে তুলেছেন। সীতারাম উপন্যাসের উদয়গিরি ললিতাগিরি বর্ণনা (১ম খণ্ড ১৩ শ পরিচ্ছেদ) এর দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু স্থানে স্থানে দেশকালের নানা সুন্দর বর্ণনায় সমৃদ্ধ হলেও বঙ্কিমের উপন্যাস গুলি কখনো অতি বৃহৎ হয়ে ওঠে নি। এদিক দিয়ে তাঁর গুরু স্থানীয় Walter Scott-এর চেয়ে তিনি বেশি সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মাত্রাজ্ঞান বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

বঙ্কিমের সংলাপ রচনাও চিত্তাকর্ষক এবং কৌশলপূর্ণ। তাঁর এ গুণপনা সহজেই চোখে পড়ে, তাই এখানে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হল না। চরিত্র চিত্রণ, আখ্যান বিন্যাস আদির সুকৌশলের সঙ্গে এ গুণটি থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্ত্তিত বাংলা উপন্যাস শিল্পের আদর্শ অতুলনীয়। এজন্যেই বাংলা উপন্যাসশিল্পে তাঁর দান চিরস্মরণীয়। পরবর্ত্তী শক্তিমান্ লেখকরাও অল্পবিস্তর তাঁর পথেই চলেছেন।

ধর্ম ও কর্ম

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

(পাঁচ)

হষ্টেলে ফিরে বিকাশ সসঙ্কোচে তার ঘরের জানালাটা খুলে একবার ভয়ে ভয়ে চাইলো সেই বস্তীর দিকে।

ভয়ে ভয়েই— কেন না যদিও সে অনেকটা বিশ্বাস ক'রেছিল যে, তার সেদিনকার অপকীর্ত্তির কথা কিছু প্রকাশ হয় নি, তবু একটু ভয় ছিল। চাই-কি তাকে আবার সেদিকে চাইতে দেখলেই হয়তো স্বামীটির রাগ চড়ে যাবে এবং নালিশ না করুক অন্ততঃ নেপথ্যে দু'টো গালি-গালাজ করতে পারে। কেন না সে স্বকর্ণে যা শুনেছিল, তাতে তার সন্দেহ ছিল না যে, স্বামীটি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে যে, 'হোটেলের বাবুদের' সঙ্গে তার স্ত্রীর ইয়ার্কি চলে এবং এতটা এগিয়েছে তাদের ভাব যে, বাবুরা টাকা ছুঁড়ে দেয়। হয় তো টাকাটা পেয়ে সে ক্ষমা ক'রে গেছে শুধু সেবারের জন্য, কিম্বা হয় তো বা ওৎ পেতে ব'সে আছে যে একবার হাতে-নাতে ধ'রে তবে যা' করবার ক'রবে।

ভয় ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা আর একটু দেখবার কৌতুহলেরও সীমা ছিল না তাই সে সসঙ্কোচে জানালাটা খুলে একবার তাকাল।

যা' দেখলো তাতে প্রথমেই তার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

সে পরিবার আর সেখানে নেই—ঘরটা খালি প'ড়ে র'য়েছে। সেখানে এসে হৈ-চৈ ক'রছে বুড়ী একটা—এ বস্তীর বাড়ীওয়ালী। এমন বাঁজখাই গলায় সে বুড়ী সহজ কথা কয় যে,হষ্টেলের তেতলা ছেড়ে তার সেই গলাই অনেক উচ্চে ওঠে। এখন তো সে প্রাণপণে চীৎকার ক'রছে আর লাফাচ্ছে!

তার সঙ্গে একটু পরে যোগ দিল এসে সেই কাবলীওয়ালা। তার গলা, বাড়ীওয়ালীর পাশে মৃদুগুঞ্জন হ'লেও তার মিহিসুরের বাঁকা বাঁকা কথাগুলি বেশ সুস্পষ্ট।

এদের বাগ্‌বাহুল্যের সার বোঝা গেল এই যে, ভাড়াটেটি সস্ত্রীক নিঃশব্দে সটকে পড়েছে কাল রাত্রে। আগা সাহেব আরও জানালেন যে কাল তার আফিসে হপ্তা পাবার দিন শুনে আফিসে গিয়ে শুনে এসেছে যে সেখান থেকেও সে সটকেছে—ক'লকাতার বাইরে'না কি কোথায় একটা ভাল কাজ পেয়ে সে পালিয়েছে—কিন্তু ঠিকানা রেখে যাওয়া আবশ্যক মনে করে নি।

মনের বোঝা নেমে গেল। এখন বিকাশের মনে হ'ল যে এদের দারিদ্র্য ও অভাবের কথা শুনে সে এদের যতটা অসহায় ভেবেছিল, তা তারা মোটেই নয়। দেনার দায়ে গিন্নীর নোলক বাঁধা থাকতে পারে, কিন্তু কাবুলী ও বাড়ীওয়ালীর কাছে যে দেনা, যার কতকটা শোধ ক'রে দেবার জন্য একটা অর্দ্ধস্ফুট কল্পনা একবার বিকাশের মনে এসেছিল, সে দেনার ভার থেকে মুক্ত হবার জন্য তাদের, বিকাশের বা আর কারও উদারতার অপেক্ষা ক'রতে হয়নি। তার চেয়ে সহজ পথে মুক্তি পেয়েছে তারা ফাঁকি দিয়ে। বাহুল্য লটবহর ছিল না এ পরিবারের—প্রধান লগেজের মধ্যে তিনটি বাচ্চা। তাদের নিয়ে নিঃশব্দে রাত্রের অন্ধকারে সরে প'ড়ে তারা সহজেই পঞ্চাশ-ষাট টাকা ফাঁকি দিয়েছে। ঋণমুক্ত হবার এই সহজ উপায় বিকাশের মাথায় আসে নি। এ বিদ্যা যার জানা আছে তার অর্থকষ্ট হবার কোনও কথা নয়।

যা'ক, একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন থেকে যেন জেগে উঠলো বিকাশ। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়কে পায়ের জোরে পরাভূত করে আসবার আনন্দ ও গৌরবটা এ কয়দিন বিকাশ ভাল ক'রে উপভোগ ক'রে উঠতে পারে নি—আবার এই পরিবারকে নিয়ে কি ফ্যাসাদে সে প'ড়বে তারই কল্পনায়। এখন সে-আনন্দটা সে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ ক'রতে লাগলো।

মাসিমা ও মেসোমহাশয়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে সে এখনো যায় নি। ভারী সঙ্কোচ হ'চ্ছিল তার। তাদের ভোলাবার মত একটা বেশ লাগসই কাহিনী সে এখনও রচনা ক'রে উঠতে পারে নি। তার সদাই ভয় হয় যে, ফট্ করে আবার কি নূতন গল্প সৃষ্টি ক'রতে গিয়ে সূক্ষ্ম-বুদ্ধি মেসোমশায়ের কাছে ধরা প'ড়ে যাবে। তাই যা কিছু সে রচে—তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে সে—আর দেখতে পায় যে, সব রচনার মধ্যেই কোথাও না কোথাও ধরা পড়বার মত ফাঁক র'য়ে গেছে।

শেষ পর্য্যন্ত অনেক মুসাবিদা ক'রে সে মেসোমশায়কে

লিখে জানালে যে তার শরীর খারাপের কথা একেবারে মিথ্যা নয়। সে দিন খেলায় একটা ভুল করবার পর দুশ্চিন্তায় nervous breakdownএর লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল। তার ক'দিন পরেই কাশীতে খেলতে হবে, সেই জন্য সে কয়েকদিন হরিদ্বারে গিয়ে nerveটা একটু দুরস্ত ক'রে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন তাকে কিছুতে ছাড়লে না ব'লে তার সোজা কাশীতেই যেতে হ'ল। যা' হ'ক সে ফিরে এসে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ ক'রছে এবং প্রাণেপণে পড়াশুনা ক'রছে। কলেজ ছুটি হ'লেই শ্রীচরণ দর্শন ক'রতে যাবে।

প্রাণপণ করে সে পড়তে পারছিল না মোটেই। এই কয়দিনের অভিজ্ঞতা, এর ভিতর সে যা দেখেছে ও যা অনুভব ক'রেছে, তাতে তার মনের ভিতর এমন একটা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি ক'রেছিল যে, পড়ায় সে কিছুতেই মন দিতে পারতো না। পড়ার বই হাতে ক'রে সে বসে থাকতো সর্ব্বক্ষণ, কিন্তু প'ড়তো না, ভাবতো ব'সে।

অভাবের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত হ'লেও খুব নিবিড় পরিচয় হ'য়ে গেছে তার—চাক্ষুষ এবং ঔদরিক।

নীচে বস্তীর যে শ্রমিক পরিবারের চাক্ষুষ পরিচয় সে পেয়েছে, তা' থেকে কল্পনাযোগে সে অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে। ঐ শ্রমিকটি যখন আফিসে বের হয়, তখন সে ফরসা কাপড়, রঙিন সার্ট প'ড়ে কুচকুচে চুল চকচকে ক'রে মচ্ মচ্ করে জুতোর আওয়াজ ক'রে পান চিবোতে চিবোতে চ'লে যায়—যে কোনও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত। সেই চক্‌চকে আবরণের তলায় যে অভাব, তার পরিচয় পেয়েছে বিকাশ। ছেঁড়া ন্যাকরা প'রে থাকে ঘরের ভিতর স্বামী-স্ত্রী; খাবার জোটাতেই এত হিম্‌সিম্ খেয়ে যায় যে, এক পয়সার এক খুঁটি চায়ের জন্য নোলক বাঁধা রাখতে হয়। তাও কাবলীওয়ালার কাছে ধার হয়, বাড়ীওয়ালীর ছ'মাসের ঘর-ভাড়া বাকী থাকে। ফাঁকি দেবার মহাবিদ্যা আয়ত্ত না থাকলে তার যে বাঁচাই দায় হ'ত।

এদের কথা ভাবতে ভাবতে বিকাশের মনে হ'ত—এই যে জৌলুসভরা শহর, আকাশ ফোড়া এর সব প্রাসাদ, এর বুকের ভিতর কত লক্ষ লোক না জানি এমনি অভাবে নিপীড়িত হ'য়ে এমনি নানা ফিকির ক'রে অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়ে শুধু বেঁচে আছে। সকাল আটটা থেকে দশটা আর বিকেল পাঁচটার পর যে বিপুল জনস্রোত আফিস পাড়ায় হন্ হন্ ক'রে যাতায়াত করে, তাদের চেহারা হোক না হয় তো চক্‌চকে, তাদের পেটের ভিতর যে কতখানি খালি আছে, দেনার বোঝা ঘাড়ে যে কত চেপে আছে, কে জানে? হয় তো বা এদের ঘরে ঘরে লক্ষ লক্ষ নারী হাড়ভাঙা খাটুনী খেটে এদের ঠাঁট বজায় রাখছে অভুক্ত জঠরের জ্বালা জোর ক'রে চেপে।

সে জ্বালা যে কী—তা সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জেনেছে শুধু একবেলার অর্দ্ধাহারে। সেদিন সে দুটো ছাতুগুড় খেয়ে বুক ফুলিয়ে বেরিয়েছিল পথে। দু'এক মাইল যেতে না যেতে—সে কী আঁকু পাঁকু। কয়েক আনা পয়সা সম্বল নিয়ে তখন সে দেখেছিল অনাহারের বীভৎস মূর্ত্তি—কেবল ভাগ্য-ক্রমে দাঁড়িয়ে গেল সেটা শুধু কল্পনা!

তার কাছে যেটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল নিছক কল্পনা, লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে সেটা নির্ম্মম চিরন্তন সত্য! অথচ এদেরই পাশে, হাজার লোক কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে শুধু ছিনিমিনি খেলছে; যত টাকা পাচ্ছে ততই আরও চাইছে; বিলাসের পর বিলাসের আয়োজন পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠছে, আরও নূতন আয়োজন পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠছে, আরও নূতন আয়োজন এসে আহ্বান ক'রছে!

এ কী বিসদৃশ ব্যাপার! দারুণ দারিদ্র্যের এই বীভৎস মূর্ত্তির পাশে সম্পদের এত প্রচণ্ড দাপট! প্রতিকার নেই কি এর?

বইয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনে হ'ত, কেন প'ড়ছে সে? পাশ ক'রবে, পাশ ক'রে ভাল কাজ ক'রবে, উপার্জ্জন ক'রবে, ভদ্র ভাবে আরামে থাকবে—হয় তো বড়লোক হবে। কিন্তু তার আশে পাশে যখন এত অভাব, তখন তার মাঝখানে তার বড়লোক হওয়ার মানে কি? কি অধিকার আছে তার বড়লোক হবার?

এই প্রশ্নে তার মনে হ'ল আজ যে, সে এই তেতলা হষ্টেলে বাস ক'রে আরাম ক'রে প'ড়ছে—যেখানে হাজার হাজার ছেলে নানা রকম উঞ্ছবৃত্তি ক'রে কোনও মতে তাদের পড়ার খরচ জোগাড় ক'রছে; এতেই বা তার কি অধিকার? ঐ বস্তী থেকে যে সব গরীব নোংরা ছেলেগুলা বের হয়, তারা পড়ে না, প'ড়তে পায় না, কেন না তাদের বাপের টাকা

নেই। বিকাশেরও তো বাপের টাকা নেই। তার বাপ মা-ও তো তাকে একেবারে নিঃস্ব অনাথ ক'রে রেখে শিশু-কালে বিদায় নিয়েছিলেন। বিকাশ যে তবু ভদ্রলোকের মত আরাম ক'রে লেখাপড়া শিখে, সে কেবল তার মাসিমার স্নেহের উপর বাণিজ্য ক'রে। মেসোমশায়ের টাকায় তার কোনও অধিকার নেই, তবু সে তারই বলে আজ ভদ্রলোক, তারই জোরে সে প'ড়ছে। তার নিজস্ব সম্পদে সে ঐ বস্তীর ছেলেদের চেয়ে এক ফোটাও বেশী ধনী নয়।

মেসোমশায়ের এ স্নেহ ও দয়ার কি প্রতিদান দেবে, সে এই লেখাপড়া শিখে? পড়াশুনায় সে বেশী ভাল নয়। কোনও মতে পাশকোর্সে বি.এ.-টা সে হয় তো পাশ ক'রতে পারবে, কিম্বা হয় তো পারবে না। এর জন্ত মেসো-মশায়ের টাকাগুলো এমনি ক'রে অপব্যয় করবার কি অধিকার আছে তার? যদি সে কৃতি ছাত্র হ'ত, খুব ভাল ভাল ডিগ্রী পেয়ে জীবনে বড় বড় কাজ করবার অধিকার পেতো, তবে বটে এ অর্থব্যয় সে সার্থক ক'রতে পারতো, আর হয় তো বা একদিন তার অর্জ্জিত সম্পদ দিয়ে মেসো-মশায় মাসিমার ঋণ প্রচুর পরিমাণে শোধ ক'রতে পারতো। প'ড়েশুনে পাশ ক'রে সে ক'রবে হয় তো বিশ পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরী। তাতে কোনও মতে নিজের পেট চালিয়ে যেতে পারলেই ঢের, মাসিমা মেসোমশায়ের কিছু ক'রবে কি?

মনে হ'ত, নাঃ, ফিরে এসে সে ভাল করে নি। পড়া ছেড়ে গিয়েছিল, ভালই ক'রেছিল। তাতে একজামিন পাশ করবার পণ্ডশ্রম করার চাইতে হয় তো ভাল কিছু করতে পারতো সে। অন্ততঃ মেসোমশায়ের টাকার অপব্যয়টা নিবারণ হ'ত।

তার কাণে হঠাৎ ধ্বনিত হ'ল সুবোধের কথা।—সখের স্বদেশী—হাম্বাগ! রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠলো। ভাবলে—দেখিয়ে দেবে সে তার জীবন দিয়ে যে সে হাম্বাগ নয়।

দেখাবে জগৎকে কত দরদ তার প্রাণে আছে—কথা দিয়ে নয়, কাজ দিয়ে। তার জন্ত বড়লোক তার হ'তে হবে। বি-এ-টা না পাশ ক'রলে মাসিমা ছাড়বেন না, ওটাকে কোনও মতে পাড়ি দিয়ে সে প্রাণপণ ক'রে লেগে যাবে বড় লোক হবার চেষ্টায়। একজন মনীষী ব'লেছেন ক'লকাতার পথেঘাটে বাজারে-বাজারে টাকা ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হয়। বি,-এ, পরীক্ষাটা দিয়েই সে ক'লকাতার সব পথ ঝেটিয়ে বেড়াবে—দু'হাতে কুড়িয়ে তুলবে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা! টাকা হ'লে—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা হ'লে সে দেখিয়ে দেবে কেমন ক'রে টাকার সদ্ব্যবহার ক'রতে হয় গরীবের সেবা ক'রে!

কোনও মতে বি,-এ পরীক্ষার দায়টা মিটিয়ে দিয়ে এই টাকা শীকারের খেলার জন্ত সে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো।

ছয়

খবরের কাগজ বিকাশ পড়ে শুধু স্পোর্টিং-এর খবর দেখবার জন্ত, আর কোনও খবরে তার কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। একদিন কাগজের এক পৃষ্ঠায় দেখলে খুব বড় বড় অক্ষরে হেড লাইনে লেখা র'য়েছে যে, ঘোড়দৌড়ে একজন Triple tote-এ এক বাজীতে পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে গেছে। তার মনে হ'ল চট্‌পট্ বড়লোক হবার এ একটা সহজ উপায়।

একদিন সসঙ্কোচে সে ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে হাজির হ'ল গোটা তিরিশেক টাকা জোগাড় করে।

লোকে বলে আনাড়ীর হাতে দান পড়ে ভাল। রেস সম্বন্ধে আনাড়ি হ'য়ে কপাল ঠুকে বিকাশ Triple tote-এ যে বাজীটা ধ'রলে, সবাইকে অবাক্ ক'রে দিয়ে সেই দানে সেই outsider গুলোই সবার আগে উইনিং পোষ্ট পার হ'য়ে গেল। এতে তার সৌভাগ্যের মাত্রা যে কতদূর গেল তা বুঝতে পারলে প্রথম যখন তার টিকিট দাখিল ক'রতেই তাকে এক হাজার টাকার করক'রে নোট দিয়ে দিলে।

আর অপেক্ষা ক'রতে তর্ সইল না তার। সে একেবারে লাফাতে সুরু করলে! একটু পরেই সে বের হ'য়ে চ'লে গেল, ফের কোনও বাজী ধরবার কথাও তার মনে হ'ল না।

নাচতে নাচতে ফিরবার পথে সে দেখতে পেলে ময়দানের একটা নির্জ্জন জায়গায় ব'সে একটা লোক কেবলি মাথা চাপড়াচ্ছে ব'সে। কাছে গিয়ে দেখলে—একি! সেই মজুরটি, যে তার ঘরের নীচে বস্তীতে বাস ক'রতো।

তার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস ক'রলে, "কি হয়েছে তোমার?"

লোকটা বললে, "কি আর হবে? আমার মাথাটি খেয়েছি। হায় হায়, অমন ঘোড়াটা ধরলুম, সে এমনি ক'রে আমায় ধনে প্রাণে মারলে গো! হপ্তার সব কটা টাকা খেয়ে দিয়েছে। এখন কেমন ক'রে মুখ দেখাব মাগ-ছেলের কাছে! হায়, বিকাশের টাকা পাওয়ার আনন্দটা হঠাৎ চুপসে গেল। টাকাটা নিয়ে যেন সে চুরী ক'রেছে ব'লে মনে হ'ল। কত মূর্খ দরিদ্র এই লোকটার মত যথা-সর্ব্বস্ব পণ ক'রে খেলতে এসেছিল হঠাৎ বড়লোক হবার রঙিন নেশায় মেতে! কে জানে তার এই হঠাৎ পাওয়া হাজার হাজার টাকার মধ্যে এমনি কত গরীবের বুকের রক্ত ও ক্ষুধার অন্ন আছে।

পথে পাছে পকেট-মারা যায়, এই ভয়ে বিকাশ পকেটে হাত চেপে ছিল। তাতে হাজার টাকার নোটের স্পর্শ তার হাতে পুলকের বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়ে দিচ্ছিল, তার করকরানি ঢেলে দিচ্ছিল কাণে মধুর সঙ্গীত! এখন সে স্পর্শ যেন তাকে পোড়াতে লাগলো, করকরানিতে তার গা শিউরে উঠতে লাগলো।

হন্ হন্ ক'রে মাঠের ভিতর দিয়ে চ'লতে চ'লতে সে ভাবতে লাগলো। এই বেচারী শ্রমিকের অবস্থা যে কি তা' সে জানে। এর আজকের এই দুর্লোভের ফল হয় তো সপ্তাহব্যাপী অনাহার—না হয় আবার ধার—কাবলীওয়ালার কাছে। ভাবতেই তার হাসি পেল। ভাবলে ধার ক'রবে তাতে এর দুঃখ কি? শোধ তো দেবে না, আবার পালাবে কোন ধারে।

তবু, আজ বিকাশের নিজেরও তো ওই দশা হ'তে পারতো। যে ত্রিশ টাকা সে নিয়ে এসেছিল, তাই ছিল তার এ মাসের খরচার টাকা। এ থেকে কলেজের মাহিনা হষ্টেলের খরচ সব দিতে হবে, যদি এ টাকা খোয়া যেত তবে সে যে কি ক'রতো—তা' ভাবতে তার ভিরমী লেগে গেল।

বাপ! ও পথে আর নয়!

কিন্তু ও বেচারার কি হবে? ভাবতে ভাবতে অনেকটা পথ এসে পড়েছিল সে। হঠাৎ তার মনে হ'ল 'সখের দরদী'! বললে, কিছুতেই না। এই হাজার টাকা থেকে ওকে শ'খানেক টাকা দেবার দৃঢ় সঙ্কল্প ক'রে গোটা পথটা সে হেঁটে ফিরে গেল। ততক্ষণ লোকটা উঠে কোথায় চ'লে গেছে—দেখা গেল না।

এই লোকটার দুরবস্থা দেখে তার মনে যে গ্লানি হ'য়েছিল, ময়দান দিয়ে খানিকটা পথ চ'লতে চ'লতে সেটা মিলিয়ে গেল। পথে দেখলে শিক্ষানবিশ মিলিটারী পুলিসেরা এক জায়গায় ফুটবল খেলছে, একটা সাহেব তাদের খেলা শেখাচ্ছে—রেফারীও ক'রছে। সে দাঁড়িয়ে গেল। লোকগুলো নেহাৎ আনাড়ী নয়, খেলছে বেশ। দেখে তার আটা লেগে গেল। এক একটা লোকের ভুল দেখে পা দুটো নিশ-পিশ ক'রতে লাগলো।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে খেলা দেখে সে যখন ফিরলো, তখন তার মনের গ্লানির বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে গিয়ে সে বেশ ক'রে খেয়ে-দেয়ে দুটো বেশ দামী সুটের অর্ডার দিয়ে এটা ওটা কিনে প্রায় শ'খানেক টাকা খরচ ক'রে হষ্টেলে ফিরলে।

—সে হাজার টাকার পরবর্ত্তী ইতিহাস সংক্ষেপে ব'লে রাখা যাক। কথাটা প্রকাশ হ'য়ে গেল। কাজেই তার কাছে রোজ ছেলেরা খাওয়া আদায় করে, থিয়েটার দেখে, সিনেমা দেখে। অনেক কিছু চাঁদা দিতে হ'ল তাকে। বেশীর ভাগ টাকাটাই অনেকে নিলে ধার! এমনি ক'রে দেখতে দেখতে মাসখানেকের মধ্যে এ-টাকার প্রায় সবটাই শেষ হ'য়ে গেল। বিকাশ দেখতে পেলে যে হোষ্টেলের যে-সব ছেলেরা মোটা মোটা ধার নিয়েছিল, তাদের সে-টাকা শোধ দেবার গা' দেখা গেল না। বুঝলে যে, পাওনাদারকে ফাঁকি দেওয়ার বিদ্যা কিছু বস্তীবাসীর একচেটে নয়—সবাই এ-বিদ্যার উপাসক, কেবল সুযোগ পাওয়ার যা অপেক্ষা!

সে সঙ্কল্প ক'রেছিল—টাকা হ'লে সে দরিদ্রসেবায় লাগাবে। কি রকম করে সে কাজটা ক'রবে—তা ভাবতে ভাবতেই এমনি ক'রে টাকাটা ফুঁকে গেল।

সাত

বিকাশের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন এক সময় কেম্ব্রিজের ব্লু। ছেলেদের পড়াশুনার চেয়ে তাদের খেলা বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল বেশী। যারা ভাল খেলতে পারে তাদের তিনি ছিলেন মা বাপের চেয়ে বড়। তাই সুবোধ

চ্যাটার্জ্জী ছিল তাঁর নয়নের মণি, তার কথায় তিনি উঠতেন বসতেন। বিকাশও খুব প্রিয় পাত্র ছিল।

সুবোধ এম. এ. পরীক্ষা দিতেই প্রিন্সিপ্যাল তাকে পুলিশের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের চাকরী যোগাড় ক'রে দিলেন। তারপর অবশ্য এম. এ. ফেল ক'রলো। আর বিকাশ যখন বি. এ. দিলে, তিনি তখনই তাকে ডেকে একটা চিঠি দিয়ে পাঠালেন একটা বড় সওদাগরী অফিসের ছোট সাহেবের কাছে। এই ম্যাকরে সাহেব ক'লকাতার খেলা ধূলার মস্ত বড় পাণ্ডা। এক সময়ে সব খেলাতেই অল্প বিস্তর সুনাম ছিল তাঁর, এখন খেলেন শুধু ক্রিকেট ও টেনিস। ম্যাকরে প্রিন্সিপালের চিঠি পেয়ে বিকাশকে একেবারে দেড়শো টাকা মাইনের একটা চাকরী দিয়ে দিলেন—বল্লেন, অফিস টীমে তার খেলতেও হবে কিন্তু।

পরীক্ষার ফলের তখনও অনেক দেরী। বি. এ. পাশ করতে পারবে কি না পারবে সে—তাও বেশ অনিশ্চিত—ফল কথা শেষ পর্য্যন্ত সে ফেলই ক'রেছিল, কিন্তু তার প্রিন্সি-প্যাল ধ'রে ক'রে গ্রেস দিয়ে তাকে পাশ করিয়ে দিয়ে-ছিলেন। এখনি সে এমন একটা ভাল চাকরী পেয়ে গেল যা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারীরা পেলে ভাগ্য মানতো। উল্লাসে তার প্রাণ মেতে উঠলো।

মাসে দেড়শো' টাকা! তার কাছে তখন কুবেরের ঐশ্বর্য্য! এ-নিয়ে যে সে কি ক'রবে, তার অনেক রকম মুসাবিদা ক'রতে লাগলো। তা' বলে এখন তার একশো টাকার বেশী কিছুতেই লাগবে না। বাকী পঞ্চাশ টাকা কোনও রকম দরিদ্রের সেবায় লাগাবে। জনসেবার যে মহাসঙ্কল্প সে ক'রেছিল কাশীর পথে, সেটা তার মনে তখন বেশ জ্বল্ জ্বল্ ক'রছে! প্রথম মাসের মাহিয়ানার সবটা টাকাই সে মাসীমাকে দেবে। তাঁ'দের স্নেহ ও করুণার ঋণ তো ভুললে চলবে না!

মাস কাবার হ'তেই দু'দিনের ছুটি নিয়ে সে গেল মাসির কাছে রাঁচী। সেখানে তার মেসো হরিনাথবাবু ছিলেন বড় উকীল।

হরিনাথ বাবুর রোজগার প্রচুর কিন্তু তিনি ধনী নন।

তাঁর পরিবার, ব'লতে গেলে কিছুই নয়। ছেলে নেই, দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, বড়টি দুটি ছেলে-মেয়ে রেখে মারা গেছে, তারা এখানেই মানুষ হচ্ছে, জামাই আবার বিয়ে-থা' ক'রে সংসারী। ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বড় লোকের ঘরে, তার শ্বশুর এখনও দিব্যি জল জলাট হয়ে বেঁচে আছেন। কিন্তু বড় ছেলে বেঁচে থাকতে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাই নিঃসন্তান বিধবা বউয়ের শ্বশুরঘরে স্থান নেই। সে বাপের ঘরে ফিরে এসে বোনের ছেলে মেয়ে নিয়ে আছে।

এ ছাড়া, বিকাশ আছে, হরিনাথ বাবুর ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী অনেক দিন ছিলেনও, তার দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। বড় ছেলে অনন্ত বি-এ পাশ করতে না পেরে তার বদলে বিয়ে করেছে, তাঁর ছেলে-পিলেও হ'য়েছে। তার পেশা এখন এই পরিবারের ম্যানেজারী এবং প্রচুর বাবুগিরি। রাঁচী সহরে হরিনাথ বাবুর চেয়ে তাঁর ভাইপো অনন্তর দপ-দপানি ঢের বেশী।

আর আছে হরিনাথ বাবুর মুহুরী, তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়, আরও গণ্ডাখানেক হরেক রকমের লোক—যারা এখানে ছোট খাটো কাজকর্ম্ম করে, আর হরিনাথ বাবুর অন্ন ধ্বংস করে।

অপুত্রক হরিনাথ বাবুর এই বিপুল পরিবারে মানুষ হ'য়েছে বিকাশ ঠিক ছেলেরই মত। কিন্তু হরিনাথ বাবু ও তাঁর স্ত্রীর বিকাশের বিষয়ে যে কোনও বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল তা নয়। এ বাড়ীতে যে কেউ থাকে সেই যেন বাড়ীর ছেলে। শুধু খাওয়া পরা পায় এমন নয়, যখন যা খুসী চাইলেই পায়, না চেয়েও পায়।

হরিনাথ বাবু রোজগার ক'রেই খালাস। খরচ করবার ভার ঘরে তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণার, আর বাইরে অনন্তের। এরা দু'জনেই খরচে একেবারে মুক্তহস্ত। কেউ কিছু না চাইতে দেওয়ায় মস্ত আনন্দ অন্নপূর্ণার। ঘরে যখন যার যা দরকার বা দরকার নেই, অন্নপূর্ণা আগে থেকে তা তাকে গছিয়ে দেন। আর পরিবারের বাইরে দেশে বিদেশে যে আনে, যে আত্মীয় স্বজন আছে সবারই সত্য বা কল্পিত প্রয়োজনের জন্য রোজই তিনি পাঠান টাকা। আর লোক-জনকে খাওয়ানটা তাঁর ব্যাধি বিশেষ।

সবাই বলে অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা! দেবীর দানের জোগান দেন স্বয়ং যক্ষরাজ কুবের, মানুষীর জোগান-

দার মানুষ হরিনাথ এই যা তফাৎ। এ তফাৎটা যে গুরুতর কিছু সে জ্ঞান হ'তে অনেকদিন দেরী হ'য়েছিল।

বিকাশ সেই তার প্রথম মাসের মাইনের গোটা টাকাটা তার মাসীর পায়ের কাছে রেখে তাঁকে প্রণাম করলে। মাসী আশীর্ব্বাদ ক'রে টাকাগুলো তুলে নিলেন।

মেসো হেসে বল্লেন, "বা রে, সব ওঁকে দিলে, আমি একেবারে ফাঁকী।

এ কথায় বিকাশ ভারী লজ্জা পেলো। তখনি মনে স্থির ক'রলে পরের মাসের মাইনে থেকে একশো টাকা তার মেসোকে দেবে, কিন্তু তখনকার মত একটা উপস্থিত জবাব দিলে, "আপনার ও টাকার সমুদ্রে আমার এ এক ঘটি জল যে দেখাই যেতো না মেসো মশায়!"

মেসো মশায় তার পিঠ চাপড়ে বল্লেন, "বেশ! বেশ!"

মাসী বল্লেন, "আহা! তোমাকে টাকা দিয়ে কিই বা হ'ত, তুমি তো সেই আমাকেই দিতে।"

"বটে!" ব'লে মেসোমশায় হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন।

তারপর তার মাসতুত বোনের দুটি ছেলেমেয়ে অমল ও শ্যামলী এসে তাকে ধ'রলে, "মামা, চাকরী পেলে, আমাদের কিছু দিলে না?" বিকাশ ভাবলে, অন্যায় হ'য়ে গেছে, এদের জন্য কিছু আনা উচিত ছিল। সে তাদের হাতে দুটো সিকি দিয়ে বল্লে, "এখন এই নে, আবার যখন আসবো তখন জিনিষ আনবো।"

ভাগ্নে বল্লে, "মামা, আমাকে একটা ভাল র‍্যাকেট আর একটা হকি ষ্টিক দেবেন।"

বিকাশ বল্লে, "নরাণাং মাতুল ক্রমঃ, দেবো রে দেবো।"

শ্যামলী বল্লে, "আমাকে একটা Badminton set দেবে।"

বিকাশ প্রতিশ্রুত হ'ল।

অনন্ত বললে, "বিকাশ, তুমি এলে, আগে যদি জানাতে আমার একখানা ভাল র‍্যাগ আর সোয়েটারের দরকার ছিল। যাক গে, এবার তো হ'ল না, সামনের মাসে নিয়ে এসো। বাজে জিনিষ এনো না, বুঝলে!" দুটো খুব দামী মার্কার নাম ক'রে বললে, সেই জিনিষ চাই। বিকাশ এবারে চট ক'রে হাঁ বলতে পারলে না। তার টাকার উপর দাবীর পরিমাণ যে ভাবে বেড়ে যেতে লাগলো, তাতে মনে হ'ল দেড়শো টাকা মাইনের কুলিয়ে ওঠা যাবে না। সে শুধু ঘাড় নেড়ে স'রে গেল।

অনন্তের ছোট ভাই বসন্ত খুশী হ'য়ে বিকাশের কাছে এসে দাঁড়াল, বললে, "হাঁ বিকাশ দা', এবার তুমি শীল্ডে খেলবে, না?"

হেসে বিকাশ বললে, "হাঁ ভাই।"

বসন্ত যেন আহ্লাদে নেচে উঠলো। সে বললে, "বিকাশ দা, Statesman-এ তোমার খেলার কথা কি লিখেছে দেখেছ? এবারকার ফুটবল সীজনের Summaryতে।"

"না ভাই, দেখিনি তো!"

"লিখেছে, গোলকীপারের মধ্যে সবচেয়ে ভাল'র মধ্যে একজন তুমি, যদিও তুমি জুনিয়ার কম্পিটিশনে খেল। লেখক আশা করেন যে, আগামী বারে তুমি ফার্ষ্ট ক্লাশ ফুটবলে খেলে তোমার প্রতিভার উপযুক্ত পরিচয় দিতে পারবে।—কি গ্র্যাণ্ড! না বিকাশ দা?"

বিকাশ ভারী খুসী হ'ল বসন্তের এই সগর্ব্ব আনন্দ দেখে। বললে, "আচ্ছা গ্র্যাণ্ড তো আমি হ'লাম, তুমি কি? কেমন খেলছো এখন?"

"আমি!—দাদার ভাই আমি, এই বলে সবাই!" ব'লে একটু সলজ্জ ভাবে হাসলে আর তার খেলার মেডাল এনে দেখালে।

আনন্দে বিকাশ তার পিঠটা খুব জোরে চাপড়ে দিলে।

গীতা—বসন্তের বড় বোন চুপ চাপ এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বিকাশ বললে, কিরে গীতা, তোর খবর কি?

তুইও কিছু বাহাদুরী ক'রেছিস নাকি?"

গীতা একটু হেসে ব'ল্লে, "হাঁ, ক'রেছি বই কি?—চর্চ্চরী রাঁধতে শিখেছি।"

"সে তো অনেক দিনই জানিস তুই। ঘাস পাতা আর ধুলোর কত চর্চ্চরী খেয়েছি তোর।"

বসন্ত বললে, "ঈস্ বিনয় হ'চ্ছে! চর্চ্চরী শিখেছেন! কেন সেদিন যে পোলাও কালিয়া চপ কাটলেট ক'রে নেমন্তন্ন খাওয়ালি। সত্যি বিকাশ দা', ও ভারী রান্না শিখেছে। আর দেখবেন", বলে সে ছুটে একখানা বই এনে দেখালে।

সেটা প্রাইজের বই। গীতা সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে ফার্ষ্ট হ'য়ে এই প্রাইজ পেয়েছে, তাতে তাই লেখা আছে।

গীতা বসন্তের গালে মারলে এক চড়।

বিকাশ বললে, "ওরে বাপরে! এত বিদ্যের বোঝা বইতে পারবি? না বইয়ের জন্যে একটা মুটে জোগাড় ক'রে দেবো?"

গীতা বললে, "বইতে না পারি তুমি ব'য়ে দেবে।"

বসন্ত বা গীতা কেউ কিছু চায় নি, কিন্তু বিকাশ মনে মনে স্থির করলে, তাদের দুজনকেই বেশ ভাল প্রেজেন্ট দিতে হবে।

মনে মনে একটা হিসেব ক'রে দেখলে যে এদের সবাইকে মন খুসী ক'রে দিতে হ'লে আড়াই শো টাকার কম হবে না। তার মানে ছ' মাসের মাইনে থেকে জমিয়ে টাকাটা করতে হবে। স্থির ক'রলে এর পর আসবে ছ'মাস বাদে।

বাড়ীর লোকের সঙ্গে সম্ভাষনের পর বিকাশ একবার সহর ঘুরে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা ক'রতে গেল। ফিরতে সন্ধ্যে হ'ল।

বাড়ীতে উঠেই একটা বারান্দা, তারপরই হরিনাথ বাবুর বৈঠকখানা।

বৈঠকখানা বা বারান্দায় আলো জ্বলছে না দেখে বিকাশ একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। হরিনাথ বাবুর এঘরটি ঘর কখনও শূন্য বা অন্ধকার থাকতো না আগে সন্ধ্যেবেলায়। যেদিন মক্কেল না থাকে সেদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে মজলিস। হাসি গল্পে স্থানটি মুখর হ'য়ে উঠে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা পার হ'য়ে বিকাশ বৈঠকখানার সুইচ টিপে দিলে। আলো জ্বলতেই সে দেখতে পেলো ঘরটি শূন্য নয়, একখানা ইজি চেয়ারের উপর অন্ধকারে শুয়ে আছেন হরিনাথ বাবু নিঃশব্দে।

ব্যস্ত হয়ে বিকাশ গিয়ে বললে, "আপনার কি অসুখ করেছে মেসোমশায়?"

সোজা হয়ে বসে বিকাশের পিঠে হাত দিয়ে তিনি হেসে বললেন, "না বাবা, অসুখ করে নি, কিছু হয় নি, এমনি চুপ চাপ শুয়ে আছি।"

হেসেই বললেন কথা কয়টা, কিন্তু বিকাশের মনে সে হাসিটা খুব স্বচ্ছ বা সত্য বলে মনে হ'ল না।

সে আর কিছু না ব'লে অন্দরে গিয়ে মাসিমাকে ধ'রে বললে, "মাসিমা, মেসোমশায়ের কি হ'য়েছে?"

মাসিমা একটু বিস্মিত, একটু ব্যস্তভাবে বললেন, "কই কি হ'য়েছে?"

"উনি চুপচাপ ঘর অন্ধকার ক'রে বসে রয়েছেন বৈঠকখানায় ইজি চেয়ারে।"

"ওঃ! এই! ও অমনি থাকেন উনি আজকাল। ডাক্তার ওঁকে ব'লে দিয়েছে চোখটাকে বিশ্রাম দিতে তাই।"

"চোখের বিশ্রাম কেন?—অসুখ কিছু হ'য়েছে?"

"অসুখ নয়। কিন্তু বুড়ো বয়সে রাত্তিরে বেশী পড়লে যেমন হয়।"

মাসিমার কথায় তার উদ্বেগ কমলেও বিকাশ নিশ্চিন্ত হ'তে পারলে না। কেন না, সে জানে মাসিমার স্বভাব। নিরতিশয় ভাল মানুষ তিনি, দয়া ও স্নেহের অবতার, কিন্তু কোনও কিছু বেশী ক'রে গায় মাখা তাঁর অভ্যাস নেই।

হরিনাথ বাবুর বিপুল উপার্জ্জন দু' হাতে বিতরণ করবার কাজ তাঁর, তাতে তাঁর আনন্দ এবং তারই উপায় উদ্ভাবন ও তার ব্যবস্থা করা এই সবই হ'ল তাঁর দিন-রাতের চিন্তা। সংসারের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা দেখে তাঁর বিধবা মেয়ে এবং অনন্তের স্ত্রী, তাদের কেউ নিপুণ গৃহিণী নয়—মাসিমাও নন্। কিন্তু পুরোণো চাকর বামুন ওস্তাদ ও প্রভুভক্ত, তাই খাওয়া-পরার কাজ বেশ প্রাচুর্য্য ও তৃপ্তির সঙ্গেই চলে—তাতে ব্যয় কি হয় না হয় সেটা কারও দেখবার কথা নয়। কাজেই মাসিমার কোনও কিছুই গায় মাখতে হয়ও না, গায় মাখেনও না তিনি।

হরিনাথ বাবুর পরিচর্য্যার জন্য একটি পুরাতন সুদক্ষ চাকর আছে, কাজেই সেদিক্ দিয়ে মাসিমার একেবারে হাত পা ধোয়া। চাকর এসে যদি কিছু রিপোর্ট করে, তবে তিনি জানতে পারেন, হরিনাথ বাবু নিজে কখনও কোনও অভাব, অসুবিধা বা অস্বস্তির কথা বলেন না, এবং লোকটি এমন সুস্থ, এমন ব্যস্ত এবং এত তাল-ভোলা যে, তাঁর কোনও অভাব বা অস্বস্তি হ'লেও চট্ ক'রে তিনি তা' অনুভব করেন না, এবং অনুভব করলেও সেটা প্রকাশ করবার কথা তাঁর মনে থাকে না।

তাই মাসিমার কথায় বিকাশের মন খুব সুস্থির হ'ল না। সে ভাবলে, কাল সে ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করবে।

কিন্তু পরের দিন নানা গোলমালে ডাক্তারের কাছে যাওয়া হ'ল না তার, ক'লকাতার দিকে যেতে হ'ল। [ক্রমশঃ

আকবরের রাষ্ট্র সাধনা

এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেন্টাব), বার-এট-ল

তিপ্পান্ন

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় হোক, তবে জনসাধারণ যাতে সে যুদ্ধের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে আকবর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। অনিবার্য্য যুদ্ধের দরুণ ক্ষতিগ্রস্থ জমীদার, কৃষক এবং জনসাধারণের ক্ষতি পুরণের সমুচিত ব্যবস্থা তিনি করে'ছিলেন। এরূপ ব্যবস্থা তাঁর পূর্ব্বে কিম্বা পরে কেউ করেছেন বলে আমার জানা নাই। Col. Malleson লিখেছেন :—

Averse to war, except for the purpose of completing the edifice he was building, and which, but for such completion, would, he well knew, remain unstable, liable to be over thrown by the first storm, he took care that neither the owners nor the tillers of the soil should be injuriously affected by his own movements, or by the movements of his armies. With the object of carrying out this principle, he ordered that when a particular plot of ground was decided upon as an encampment, orderlies should be posted to protect the cultivated ground in its vicinity. He further appointed assessors whose duty it should be to examine the encamping ground after the army had left it, and to place the amount of any damage done against the government claim for revenue.

আকবর যখন দ্বিতীয়বার গুজরাট অভিযান করেন, তখন শত্রুকে তিনি একান্ত অরক্ষিত এবং অতর্কিত অবস্থায় পেয়েছিলেন। সুসভ্য কোন ইউরোপীয় সেনাপতি হলে শত্রুকে তৎক্ষণাৎ সমূলে ধ্বংস করতেন। মহানুভব আকবর কিন্তু সেভাবে যুদ্ধ করাকে কাপুরুষোচিত বলেই মনে করতেন। তাঁর আদেশে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে শত্রুকে জাগ্রত করা হল। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে তাকে সময় দেওয়া হল। ইতিমধ্যে আকবর নদীর অপর পারে অপেক্ষা করতে লাগলেন। শত্রু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। অদ্ভুতকর্ম্মী বাদশা তখন সন্তরণের সাহায্যে নদী অতিক্রম করে ভীম পরাক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করলেন, আর তার বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন।

ভাগ্যবান্ নরপতিরা তাঁদের বিদ্রোহী ভাইদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন ইতিহাসপাঠক মাত্রেই তা জানেন। আকবরের ব্যবহার কিন্তু তাঁর মহত্ত্বেরই অনুরূপ ছিল। আকবরের ভাই মহম্মদ হাকিম মির্জ্জা কাবুলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৫৮২ খৃঃ অব্দে তিনি ভারত আক্রমণ করেন। আকবর তাঁর প্রতিরোধার্থে অগ্রসর হন। হাকিম মির্জ্জা সাহস হারিয়ে কাবুলের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আকবর যথাসময়ে কাবুলে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তিন সপ্তাহ সেখানে অবস্থান করেন। বিদ্রোহী ভ্রাতাকে ক্ষমা করে পুনরায় তাঁকে তিনি কাবুলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এ ক্ষেত্রে অন্য কোন নরপতি যে কিরূপ ব্যবহার করতেন, তা সহজেই অনুমেয়।

পরাজিত শত্রুকে দাসে পরিণত করবার এবং তার স্ত্রী-পরিজনদের ভোগ-বিলাসের বস্তুরূপে ব্যবহার করবার যে বর্ব্বর প্রথা আবহমান কাল থেকে চলে আসছিল, আকবর সে প্রথার সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ করেন। ফলে শত্রুর আনুগত্য লাভ তাঁর পক্ষে একান্ত সহজসাধ্য হয়ে পড়ে।

চুয়ান্ন

আকবরের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী শাসনকে ভারতের সুবর্ণ যুগ বললে অতিশয়োক্তি মোটেই হবে না। তিনি দেশে যে সুখ, শান্তি, উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি এনেছিলেন ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া যায় না। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে রাজা এবং নবাব থেকে কৃষক এবং মজুর পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রজাই তাঁকে তাদের স্নেহবান্ পিতারূপে দেখতো আর তিনি তাদের নিজের সন্তান রূপে দেখতেন। তাঁদের সুখকে তিনি নিজের সুখ বলে মনে করতেন, আর তাদের দুঃখকে তিনি নিজের দুঃখ বলে মনে করতেন। তাঁর রাজ্যে শ্রেষ্ঠতম পদ সব ধর্ম্মের সব জাতির এবং সব শ্রেণীর লোকের জন্য উন্মুক্ত ছিল। প্রত্যেকেই অবাধে তার ধর্ম্ম পালন করতে পারতো। কাউকে তার ধর্ম্মের জন্য কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করতে হতোনা, কোন ও কর দিতে হতো না। প্রত্যেকের ধর্ম্মের তিনি সম্মান করতেন। প্রত্যেক ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণের সমুচিত ব্যবস্থা করতেন। দেশের সাহিত্যের, শিল্পের, কৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা তিনি সচেষ্ট থাকতেন। গুণীর সম্মান করতে কখনও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। সবল তাঁর রাজ্যে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার

করতে পারতো না। বৈদেশিক শত্রু তাঁর যুগে ভারত আক্রমণের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না। সুখ আনন্দ এবং শান্তিতে ভারতের লোকেরা তখন জীবন যাপন করতো। Col. Malleson ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলেছেন—

"When we reflect what he did, the age in which he did it, the method he introduced to accomplish it, we are bound to recognise in Akbar one of those illustrious men whom providence sends, in the hour of a nation's trouble, to reconduct it into those paths of peace and toleration which alone can assure the happiness of millions."

পঞ্চান্ন

সাধারণের ধারণা আকবর অশিক্ষিত ছিলেন। প্রশ্ন উঠে, শিক্ষা কাকে বলে? দার্শনিক সংজ্ঞার দিক থেকে দেখতে গেলে, শরীর, মন এবং ভাবের উৎকর্ষ সাধনের নামই হচ্ছে শিক্ষা। দার্শনিক প্লেটো (Plato) ব্যায়াম-চর্চ্চা, গণিতচর্চ্চা এবং সঙ্গীতচর্চ্চাকেই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলেছেন। প্লেটোর পর বহু শতাব্দী অতীত হয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু নিয়ে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভাষায় অনেক গবেষণা, অনেক আলোচনা হয়েছে। তবে প্লেটোর আদর্শ এখনও শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তিরূপে অটুট অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। বিভিন্ন ব্যায়ামচর্চ্চার সাহায্যে শরীরকে সুস্থ, সবল, মাংসপেশী-বহুল, মেদ-বর্জ্জিত এবং কর্ম্মঠ করে তোলা এখন শিক্ষার অন্যতম আদর্শরূপে সভ্য জগতে গণ্য হয়ে থাকে। সে দিক থেকে বিচার করলে, আকবরের দৈহিক শিক্ষা যে আদর্শ রকমের হয়েছিল, আমরা তা পূর্ব্বেই দেখিয়েছি। শক্তি, সামর্থ্য এবং কর্ম্মঠতার দিক থেকে আকবর তাঁর যুগে অতুলনীয় ছিলেন। সঙ্গীত-সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুকুমার ভাবের চর্চ্চা, সুকোমল বৃত্তি-নিচয়ের অনুশীলন; এদিক থেকেও আকবরের শিক্ষা অতি উচ্চাঙ্গেরই হয়েছিল। তিনি একজন অতি সমজদার সঙ্গীত রসজ্ঞ ছিলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক এবং বাদকেরা সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে থাকতেন আর তাঁদের সুমধুর সুর-লহরী সর্ব্বদা তাঁর মনকে ভাবের উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে বিচরণ করতে সাহায্য করতো। বাদশা স্বয়ং একজন উচ্চ শ্রেণীর সুর-শিল্পী ছিলেন। আবুল ফজল লিখেছেন—"বাদশা সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ অনুরাগী, আর সুর-সাধকদের তিনি যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন।" চিত্রশিল্পের প্রতিও আকবরের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং বিখ্যাত চিত্রকর আবদুস সামাদের কাছে সযত্নে তিনি চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করেন। স্থাপত্যবিদ্যার প্রতি আকবরের যে বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং স্থাপত্য-শিল্পে তিনি যে অতুলনীয় এক স্রষ্টা ছিলেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। কাব্যের প্রতিও আকবরের অশেষ অনুরাগ ছিল। কাব্যের সাহায্যে তিনি ভাবের চর্চ্চা করতেন। তাঁর রচিত কয়েটী কবিতা এখনও বর্ত্তমান আছে।

এখন গণিতের পর্য্যায়ে আসা যাক। আকবর যে একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাঁর চিতোর অবরোধের ব্যবস্থা থেকে স্পষ্টই তা বোঝা যায়। আজীবন তিনি কল-কব্জা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ছিল অনন্যসাধারণ। অনেক রকমের সুক্ষ যন্ত্রপাতি তিনি নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁকে উচ্চ শ্রেণীর একজন বৈজ্ঞানিক বললে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হবে না। সুতরাং প্লেটোর আদর্শানুযায়ী তিনি একজন অতি উচ্চ-শিক্ষিত লোক ছিলেন।

তবে শিক্ষার একটা সংকীর্ণতর সংজ্ঞাও আছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ পুঁথিগত বিদ্যাকেই শিক্ষা বলা হয়ে থাকে। সে দিক থেকে আকবরের পারদর্শিতা কত দূর ছিল?

ছাপ্পান্ন

আকবর যখন চার বৎসর, চার মাস, চার দিন বয়সে পদার্পণ করেন, পিতা হুমায়ুন তখন তাঁর হাতে-খড়ির ব্যবস্থা করেন। মোল্লা ইব্রাহিম নামক এক ব্যক্তিকে আকবরের শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। পর পর মোল্লা বায়েজিদ, মৌলানা আব্দুল কাদের প্রভৃতি আকবরকে শিক্ষা দান করেন। তবে আকবর অসাধারণ লোক ছিলেন, সুতরাং সাধারণ ধরণের শিক্ষা-প্রণালী মোটেই তাঁর মনঃপুত হয় নি। বেশীর ভাগ সময় তিনি অশ্বারোহণ, উষ্ট্রারোহণ, কুকুর-পরিচালনা, পায়রা উড়ান প্রভৃতি চিত্তবিনোদক কাজেই অতিবাহিত করতেন। নীরস পড়াশুনার চেয়ে এই সবই তাঁর বেশী ভাল লাগতো। বয়স একটু বেশী হলে পর তিনি "দিওয়ান হাফেজ" প্রভৃতি

ফার্সি কাব্যগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি শেখ মোবারকের কাছে কিছু আরবীও শিখেছিলেন।

আকবরের প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা জাগে পরিণত বয়সে, বাস্তব জীবনের তাড়নায়। আর প্রয়োজনের অনুরূপ শিক্ষা-লাভের এক অভিনব পন্থাও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার করবার জন্য আকবর ফতেপুর শিকরীর "এবাদতখানায়" বিভিন্ন ধর্ম্মের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা দার্শনিকদের আহ্বান করেন এবং তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন, তাঁদের জেরা করেন, তাঁদের সাথে তর্কবিতর্ক করে ধর্ম্ম এবং দর্শন-সংক্রান্ত বিষয়সমূহের নিগূঢ়তম তত্ত্বের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত হন।

আকবর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন ভাষাবিৎ পণ্ডিতদের সাহায্যে। সন্ধ্যার পর পণ্ডিতেরা এসে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যগ্রন্থ আকবরকে পড়ে শুনাতেন। তিনি মনোযোগের সঙ্গে তাঁদের পাঠ শুনতেন, পাঠের বিষয় নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। এই ভাবে তিনি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয় লাভ করে-ছিলেন। তাঁর বিরাট পুস্তকালয়ের কতক অংশ প্রাসাদের সদর মহলে এবং কতক অংশ অন্দর-মহলে রক্ষিত ছিল। সংগৃহীত পুস্তকাবলী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল, যথা, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভ্রমণ, কাব্য, গল্প-সাহিত্য প্রভৃতি। হিন্দী, ফার্সি, কাশ্মিরী, আরবী, সংস্কৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার পুস্তকের বিভিন্ন বিভাগ ছিল। আকবরের আদেশে পণ্ডিতেরা জ্ঞানগর্ভ পুস্তকগুলির আদ্যোপান্ত তাঁকে পড়ে শুনাতেন। পড়া যেখানে স্থগিদ রাখা হতো, সেখানে স্বহস্তে তিনি চিহ্ন দিয়ে রাখতেন, পরদিন আবার সেই চিহ্নিত স্থান থেকে পাঠ আরম্ভ হতো।

এমন কোন বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল না যে, আকবরের কাছে পঠিত হয়নি। ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যবহার শাস্ত্র, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রের সঙ্গেই আকবর এইভাবে গভীর পরিচয় লাভ করেন। ঐতিহাসিক বদায়ুনী একবার আকবরের কাছে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার ভুল বর্ণনা করেন। আকবর তৎক্ষণাৎ তাঁর ভ্রম্ সংশোধন করে দেন এবং সেই ঘটনা-সংক্রান্ত অনেক খুঁটিনাটি তথ্যের অবতারণা করেন। আকবরের ঐতিহাসিক জ্ঞান দেখে বদায়ুনী চমৎকৃত হন। সুফি ভাবমূলক ফার্সি সাহিত্য আকবরের একান্ত প্রিয় ছিল। শেখ সাদীর গুলিস্তাঁ এবং বোস্তাঁ শুনতে তিনি বড় ভাল বাসতেন। জালালুদ্দীন রুমীর মাসনাভী তাঁর কাছে নিয়মিত ভাবে পঠিত হতো। তারপর হাফেজ, খসরু, খাকানী, জামী, আনওয়ারী প্রভৃতি কবিদের রচনা তিনি একান্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। ফেরদৌসীর মহাগ্রন্থ শাহনামা শুনতেও তিনি বড় ভাল বাসতেন।

সাত্তার

সুপণ্ডিত অনুবাদকেরা গ্রীক, আরবী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার পুস্তকাবলী হিন্দী কিম্বা ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করতেন আর সেই অনুবাদ নিয়মিতভাবে বাদশাকে পড়ে শুনাতেন। যে সব পুস্তকের অনুবাদ আকবরের আদেশে হয়েছিল তাদের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল :

১। বত্রিশ সিংহাসন বদায়ুনী কর্ত্তৃক ফার্সিতে অনূদিত।

২। "হায়াতুল হায়ওয়ান" বা প্রাণীতত্ত্ব শেখ মোবারক কর্ত্তৃক আরবী হ'তে ফার্সিতে অনূদিত।

৩। অথর্ব্ববেদ—ভাবন নামক ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সংস্কৃত থেকে ফার্সিতে অনূদিত

৪। রামায়ণ—পণ্ডিতদের সাহায্যে বদায়ুনী কর্ত্তৃক ফার্সিতে অনূদিত।

৫। বাবরের আত্মচরিত—আব্দুর রহিম কর্ত্তৃক তুর্কি থেকে ফার্সিতে অনূদিত।

৬। রাজতরঙ্গিণী বা কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত—মোল্লা শাহ মোহাম্মদ কর্ত্তৃক সংস্কৃত থেকে ফার্সিতে অনূদিত।

৭। মহাভারত—দেবী ব্রাহ্মণের সাহায্যে ফায়জী কর্ত্তৃক ফার্সিতে অনূদিত।

৮। নল-দময়ন্তী—ফায়জী কর্ত্তৃক ফার্সিতে অনূদিত।

৯। লীলাবতীর বীজ-গণিত—ফায়জী কর্ত্তৃক ফার্সিতে অনূদিত।

১০। হরিবংশ—মোল্লা শেরী কর্ত্তৃক ফার্সিতে অনূদিত।

১১। ইউরোপীয় মিশনারীদের সাহায্যে রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাস ফার্সি ভাষায় সঙ্কলন করা হয়।

হিন্দুদের ধর্ম্ম এবং শাস্ত্রের বিষয় অবহিত হবার জন্য আকবর যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণের

নিকট এবিষয় তিনি নিয়মিত ভাবে পাঠ গ্রহণ করিতেন। তাছাড়া অন্যান্য পণ্ডিতের সাহায্যও তিনি নিতেন। বদায়ুনী বলেন, "বাদশা "খাবগাহ" প্রাসাদের গবাক্ষের ধারে বসতেন। মহাভারতের প্রকৃত অনুবাদক দেবীব্রাহ্মণকে একটী চারপায়ের সাহায্যে গবাক্ষের কাছে তুলে নেওয়া হতো। ব্রাহ্মণ সেই শূন্যে অবস্থান করে বাদশাহকে জ্যোতিবশাস্ত্রের বিষয়, দেবদেবীদের বিষয়; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির পূজা-পদ্ধতির বিষয় বাদশাহকে শিক্ষা দিতেন। তিনি হিন্দুদের ধর্ম্মের ব্যাখ্যা এবং তাদের ধর্ম্মের পুরাণ, উপাখ্যান প্রভৃতি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন আর বলতেন, এ সবের অনুবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

আটাশ

আকবর একান্ত ভাবে যুক্তিপন্থী, সংস্কারপ্রিয়, নূতনত্বকামী এবং উন্নতশীল নরপতি ছিলেন। তিনি যে-সব সংস্কারের প্রবর্ত্তন করেন তাদের কয়েকটীর এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে; যথা:

১। জিজিয়া করের উচ্ছেদ সাধন। মুসলমান বাদশারা হিন্দু প্রজাদের নিকট থেকে জিজিয়া নামক একপ্রকার কর আদায় করতেন। এই প্রথা হিন্দু এবং মুসলমান প্রজাদের মধ্যে অনাবশ্যক এক বিভেদের সৃষ্টি করতো। আকবর প্রথম থেকেই এই কর তুলে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। ধর্ম্মযাজকেরা কিন্তু বাদশার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উত্থাপন করেন। আকবরের সিংহাসন আরোহণের নবম বৎসরে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ধর্ম্ম-যাজকদের (আলেমদের) তখন অপ্রতিহত প্রভাব। তাঁরা বললেন জিজিয়া হচ্ছে ধর্ম্মের অলঙ্ঘনীয় বিধান। বাদশার তাতে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নাই। তখনকার মত আকবর নিরস্ত হলেন। সিংহাসন আরোহণের পঞ্চবিংশতি বৎসরে আকবর এই প্রশ্নের পুনরুত্থাপন করেন। ধর্ম্মযাজকদের তীব্র আপত্তিসত্ত্বেও এবার জিজিয়া বিরতির ফরমান তিনি জারী করেন। এই ফরমানে আকবরের এবং আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরাট পার্থক্য অতি স্পষ্ট হয়ে উঠে। সম্রাট এই ফরমানে বলেছেন, "আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে জিজিয়া কর আদায় করতেন, তার কারণ, তাঁরা বিরুদ্ধবাদীদের (অ-মোস্লেমদের) হত্যা এবং লুণ্ঠন করাকে তাঁদের স্বার্থের পরিপোষক বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, যারা তাঁদের অধীনস্থ তাদের দমনে রাখা দরকার, আর যারা তাদের অধীনে আসেনি, তাদের প্রতি বাহুবল প্রয়োগ করা দরকার। আর প্রয়োজনমত অর্থ-সংগ্রহের প্রশস্ত পথ হচ্ছে, বিধর্ম্মীদের কাছ থেকে কর আদায় করা। আর সেই করকেই তাঁরা জিজিয়া নামে অভিহিত করেছিলেন।

বর্ত্তমানে আমাদের বন্ধুত্ব, দয়া এবং জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি দানশীলতার ফলে, অ-মোস্লেমদের বৃহৎ একদল সর্ব্ববিষয়ে আমাদের সহযোগিতা করছে এবং আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করছে। এরূপ অবস্থায় কি করে তাদের আমরা লুণ্ঠন করতে পারি, কি করে তাদের হত্যা করতে পারি, কি করে তাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করতে পারি? আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সব লোক অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়, তাদের কি করে আমরা শত্রু বলে মনে করতে পারি? অ-মোস্লেমদের মধ্যে এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে অতীত কালে মারাত্মক শত্রুতা ছিল। এখন সে শত্রুতা চলে গেছে। সে হিংসা-বিদ্বেষ আর নাই। এখন সেই বিদ্বেষের ভাবকে জাগিয়ে রাখা কিম্বা তাদের ইন্ধন যোগান কি সুবুদ্ধির পরিচায়ক?" আকবরের যুক্তি যে অকাট্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কথা কে এখন অস্বীকার করতে পারে?

২। ফসলী সনের প্রবর্ত্তন: চান্দ্রমাসের হিসাবে রাজকার্য্য পরিচালনা অসুবিধাজনক হওয়ার দরুণ আকবর সূর্য্যের গতিবিধির হিসাবে বৎসর-গণনার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। আকবরের প্রবর্ত্তিত এই প্রথা ইলাহি বা ফসলী সন নামে এখনও প্রচলিত আছে। ধর্ম্মযাজকেরা যে এবিষয়ে তুমুল আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন, সে কথা সহজেই অনুমেয়। আবুল ফজল এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: মহামান্য বাদশা হিন্দুস্থানে নূতন এক অব্দের প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন ধরণের সন, তারিখ প্রভৃতি থাকার দরুণ রাজকার্য্য পরিচালনায় বিশেষ অসুবিধা হয়ে থাকে বলেই তিনি এই সংস্কারের প্রবর্ত্তন করতে চেয়েছিলেন। "হিজরী" নাম তিনি পছন্দ করতেন না। তবে অজ্ঞ জনসাধারণকে উত্যক্ত করতেও তিনি চাহিতেন না। জনসাধারণের মধ্যে এই কুসংস্কার প্রচলিত আছে যে, হিজরী সনের সঙ্গে ইস্লাম ধর্ম্মের অচ্ছেদ্য

সম্বন্ধ বর্ত্তমান। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা সহজেই বুঝতে পারেন যে, সন তারিখ প্রভৃতি সাংসারিক কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্যই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। ধর্ম্মের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

৩। হিন্দু প্রজাপুঞ্জের সন্তুষ্টি সাধনের জন্য আকবর গোহত্যা সম্পর্কে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল গো-হত্যা। আকবর যে গভীর রাজনীতি জ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, সহজেই তা অনুমান করা যায়। আকবরের পিতামহ সুলতান বাবর এবিষয়ে পুত্র হুমায়ুনকে স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। জাতীয় একতার সৃষ্টি করতে হলে আপত্তিকর আচার-অনুষ্ঠান কিছু কিছু উভয় জাতিরই বর্জ্জন করা দরকার। তাতে প্রকৃত ধর্ম্মের কোন ক্ষতি হয় না। হায়দারাবাদের মুসলিম রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ। তাতে সেখানের মুসলমানদের কোন ক্ষতি কিম্বা অসুবিধা হয় নি।

(৪) দাসত্ব-প্রথার মূলোচ্ছেদ—তখনকার যুগে বিজয়ী যোদ্ধারা পরাজিত শত্রুর স্ত্রী-পরিজনকে দাসরূপে ব্যবহার করতে পারতো এবং দাসরূপে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারতো। আকবর ফরমান জারি করে এই বর্ব্বর অনুমানুষিক প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন। ফরমানে তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "শত্রুর অপরাধ যাই হোক না কেন, তার স্ত্রী-পরিজন এবং সন্তান-সন্ততি যেথানে ইচ্ছা যাক, যেথানে ইচ্ছা থাকুক, তাহাতে কোন বিঘ্নের সৃষ্টি করা হইবে না। ইচ্ছা হয়, তারা নিজেদের বাড়ীতে থাকতে পারে, আর ইচ্ছা হয়, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। ছোট বড় কাউকে দাসে পরিণত করা হবে না। স্বামী যদি কুপথে যায়, তাতে স্ত্রীর অপরাধ কি? আর পিতা যদি রাজ-দ্রোহিতা করে, তাতে সন্তানের অপরাধ কি?

(৫) সতীদাহ-নিয়ন্ত্রণ—সতীদাহ-প্রথা হিন্দুদের মধ্যে বহুকাল থেকে চলে আসছিল। হিন্দুরা এই প্রথাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলেই বিশ্বাস করতেন। এ প্রথার উচ্ছেদ সাধন হয়, এই ছিল আকবরের ইচ্ছা। তবে একেবারে ততদূর অগ্রসর হওয়া তিনি সমীচীন বলে মনে করেন নি। তবু কিন্তু অসহায়া নারীদের কথা তিনি ভোলেন নি। তিনি ফর্ম্মান জারি করেন যে, যদি কোন বিধবা কিছুমাত্র অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তা হলে তাকে চিতায় উঠান বেআইনী কাজরূপে গণ্য হবে। আকবর কেবল ফরমান জারী করেই ক্ষান্ত হন নি। তাঁর আদেশ যাতে কার্য্যক্ষেত্রে পালিত হয়, সেদিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী জয়মল্ল (রাজা বিহারী মল্লের ভ্রাতুষ্পুত্র) বঙ্গদেশে দেহত্যাগ করেন। জয়মল্লকে আকবর বড় ভাল বাসতেন। জয়মল্লের বিধবা ছিলেন যোধপুর-রাজ উদয় সিংহের কন্যা। বিধবা রাজকুমারী চিতায় জীবন বিসর্জ্জন দিতে অস্বীকার করেন। তাঁর আচরণে সমাজ এবং বংশের লোকেরা ক্ষেপে উঠেন, এবং সকলে পরামর্শ করে স্থির করেন, বলপ্রয়োগ করে রাজকুমারীকে চিতায় চড়ান হবে। রাজকুমারীর পুত্র উদয় সিং এই বলপ্রয়োগের ব্যাপারে সকলের অগ্রণী হলেন। যথাসময় চিতা প্রস্তুত হল। বলপ্রয়োগ করে রাজ-কুমারীকে চিতায় চড়ান হল। চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হল। ঠিক এই সঙ্কটের মুহূর্ত্তে পরলোকগত জয়মল্লের পিতৃব্যের নেতৃত্বে শাহী ফৌজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হল। বাদশার আদেশে রাজপুতবীর নিগৃহীতাকে জ্বলন্ত চিতা থেকে উদ্ধার করলেন। উদয় সিংকে গ্রেপ্তার করা হল।

(৬) আকবর হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে কর আদায়ের প্রথা রহিত করেন। পাঠান বাদশারা হিন্দু তীর্থ-যাত্রীদের কাছ থেকে, তাদের আর্থিক অবস্থার অনুপাতে, নিয়মিতভাবে কর আদায় করতেন। এইভাবে কোটী কোটী টাকা প্রত্যেক বৎসর রাজকোষে আসতো। আকবর এই প্রথা সম্পূর্ণ ভাবে তুলে দিলেন। মানুষ ধর্ম্মাচরণ করবে, তার জন্য কেন তাকে কর দিতে হবে? রাজকর্ম্মচারীরা বাদশাকে বললেন, "তীর্থ করা একটা কুসংস্কার মাত্র। হিন্দুরা তীর্থ করা ছাড়বে না। সুতরাং এই উপলক্ষ্যে রাজকোষে যদি নিয়মিতভাবে অর্থাগম হয় তাতে আপত্তি কি?" মহামান্য সম্রাট উত্তর দিলেন, "হতে পারে কুসংস্কার। কিন্তু তীর্থ করা হচ্ছে হিন্দুধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ। হিন্দুরা এই ভাবেই খোদার প্রতি তাহাদের ভক্তি-ভালবাসা দেখিয়ে থাকে। সুতরাং খোদার প্রতি জাতীয় প্রথামত ভালবাসা দেখাবার পথে কোন বিঘ্নের সৃষ্টি করা রাজশক্তির পক্ষে অনুচিত।"

উনষাট

আকবর শাসনকর্ত্তা এবং রাজকর্ম্মচারীদের প্রতি বিভিন্ন সময় যেসব ফরমান বা অনুজ্ঞা পত্র জারী করেছিলেন তাদের একটা সংক্ষিপ্তসার মোহাম্মদ হোসেন আজাদ তাঁর "দরবারে আকবরীতে" দিয়েছেন। এই সব রাজলিপি থেকে আকবরের রাজনৈতিক আদর্শ অতি স্পষ্ট হয়ে উঠে। আকবর তাঁর কর্ম্মচারীদের বলেছেন: প্রজাদের অবস্থার বিষয় তোমরা সঠিক সংবাদ রাখবে। লোক-সংসর্গ থেকে দূরে থেকো না তোমরা, কেননা, তাহলে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে তোমরা অজ্ঞ থেকে যাবে। আর সে সব বিষয়ে তোমাদের সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেদের সঙ্গে সম্মান-সূচক ব্যবহার করবে। অনেক রাত্র পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকবে। সকলে দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় এবং মধ্যরাত্রে বিশ্বপ্রভুর দিকে মন সংযোগ করে তাঁর বিষয় চিন্তা করবে। নীতিগ্রন্থ, উপদেশমূলক পুস্তক, ইতিহাস প্রভৃতি নিয়মিত ভাবে অধ্যয়ন করবে। যেসব দরিদ্র ব্যক্তি এবং ধার্ম্মিক লোক কারও কাছ থেকে কিছু চায় না, তাহাদের বিষয় সর্ব্বদা সজাগ থাকবে, যেন তাহারা অভাবের দরুণ কষ্ট না পায়।যারা প্রকৃত খোদা-ভক্ত, যারা প্রকৃত ধার্ম্মিক, যারা উচ্চমনা তাদের সেবায় সর্ব্বদা তৎপর থাকবে। আর তাদের শুভাশীষ কামনা করবে। অভিযুক্তদের অপরাধের বিষয় খুব গভীরভাবে চিন্তা করে স্থির করবে, কাকে শাস্তি দেওয়া উচিত, আর কাকে ক্ষমা করা যেতে পারে।

সংবাদ আনয়নকারীদের বিষয় সর্ব্বদা সাবধানে থাকবে। যা করবে, নিজে দেখে শুনে করবে। বিচারপ্রার্থীদের অভিযোগ নিজে শুনবে। সব কাজ অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের ভরসায় ছাড়বে না। প্রজাদের যত্নের সঙ্গে পালন করবে। কৃষিকার্য্য যাতে ব্যাপক ভাবে হয়,আর পল্লীসমূহ যাতে আনন্দে থাকে, সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। দরিদ্র প্রজাদের বিষয় সর্ব্বদা খোঁজ-তল্লাস করবে। নজরানা, সেলামি প্রভৃতি গ্রহণ করবে না। সৈনিকেরা যাতে জোর-জবরদস্তি করে লোকের বাড়ীতে না উঠে সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। দেশের শাসন সৌকর্য্য দশ জনের সঙ্গে পরামর্শ করে করবে। লোকের ধর্ম্ম এবং সংস্কারে কখনও হস্তক্ষেপ করবে না। পৃথিবীর জীবন দুদিনের। তবু মানুষ সামান্য মাত্র আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে পারে না। ধর্ম্মের ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপ কি করে তারা সহ্য করবে? তাহাদের ধর্ম্ম এবং সংস্কারের মূলে নিশ্চয় যুক্তির ভিত্তি আছে। যদি তাদের ধারণা ঠিক হয়, তাহলে সংস্কারের বিরোধিতা করে তুমি সত্যের বিরোধিতা করছ। পক্ষান্তরে তোমার মত যদি ঠিক হয়, আর তাদের ধারণা যদি ভ্রান্ত হয়, তাহলে, তাদের তুমি অজ্ঞতা নামক ব্যধিগ্রস্থ বলে মনে করতে পার; আর তাদের প্রতি করুণা দেখাতে এবং তাদের সাহায্য করতে পার। তাদের বিরোধিতা করবার, তাদের সঙ্গে কলহ করবার কোন দরকার নাই। সর্ব্ব ধর্ম্মের সৎ এবং উচ্চমনা লোকদের নিজের বন্ধুরূপে গণ্য করবে।

জ্ঞানের চর্চ্চা এবং সাধনা যাতে সর্ব্বত্র হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। জ্ঞানী এবং গুণী লোকদের সম্মান করবে যাতে করে তাদের সাধনা ব্যর্থ না হয়। প্রাচীন বনেদী বংশের লোকদের প্রতিপালনের বিষয় যত্নবান হবে। সৈনিকদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখবে; তাদের কাজ-কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করবে। তুমি স্বয়ং তীরন্দাজি, বর্শা-চালনা প্রভৃতি সৈনিকের উপযোগী ক্রীড়া-কৌতুকের নিয়মিত অভ্যাস করবে। কেবলমাত্র শিকার নিয়ে সময় ক্ষেপণ করবে না। তবে শিকার প্রভৃতির অনুষ্ঠানও সৈনিক জীবনের জন্য প্রয়োজন বলে জানবে।

সহর কোতওয়ালের কর্ত্তব্য হচ্ছে, প্রত্যেক নগর, মহকুমা, গ্রাম প্রভৃতিতে যত বাড়ী আছে, বাড়ীর মালিক আছে, বাসিন্দা আছে—সবের ফিরিস্তি তৈয়ার করা এবং প্রত্যেকে যাতে সাধারণের প্রতি তার কর্ত্তব্য পালন করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। প্রত্যেক মহল্লা বা বসতির জন্য একজন করে মীর-মহল্লা বা মণ্ডল থাকা দরকার। গুপ্তচর মোতায়েন রাখবে, যাতে করে প্রত্যেক জায়গার ভাল মন্দ খবরাখবর তোমার কাছে পৌঁছুতে থাকে। লোকের উৎসব-অনুষ্ঠান, শোক-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ের খবর রাখবে। রাস্তা, গলি-ঘুলি, হাটবাজার, পুল, খেয়াঘাট প্রভৃতি স্থানের জন্য পাহারার ব্যবস্থা রাখবে। পথ-ঘাটের পাহারার এমন বন্দোবস্ত করবে, যে, যদি কোন লোক পালিয়ে ফেরার হয়, তার বিষয় তোমার কাছে সমস্ত খুঁটিনাটি খবর যেন এসে পৌঁছোয়।

চোর এলে, আগুন লাগলে, কিম্বা অন্য কোন বিপদ উপস্থিত হলে, গ্রামবাসীরা যেন পরস্পরের সাহায্য করে; গ্রামের মোড়ল এবং চৌকিদার যেন তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এইসব সঙ্কটের সময় যে ব্যক্তি আত্মগোপন করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে, সে রাজদ্বারে অপরাধী বলে গণ্য হবে। প্রতিবেশী, গ্রামের মোড়ল এবং চৌকিদারকে না জানিয়ে কেউ যেন সফরে বের না হয়; এবং কোন নূতন স্থানে উপস্থিত হওয়া মাত্র সে যেন সেই স্থানের এইসব লোকেদের সংবাদ দেয়। ব্যবসায়ী, সৈনিক, রাহি-মুসাফির প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। যে লোকের জন্য কেউ জামীন হতে রাজী নয়, তাকে পৃথক্ কোন স্থানে রাখবে। উপরোক্ত দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিরা অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করবে। সম্রান্ত ব্যক্তিরাও যাতে এসব বিষয় তাদের দায়িত্ব পালন করে, সে-দিকে লক্ষ্য রাখবে। লোকের আমদানী এবং খরচের দিকে লক্ষ্য রাখবে। যার খরচ তাঁর আমদানীর চেয়ে বেশী, নিশ্চয় জানবে তাঁর জীবনে কোন গুপ্ত রহস্য আছে। এই সমস্ত কাজ করবে দেশের সুশাসনের জন্য, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য। লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করবার উদ্দেশ্যে এসব কাজ করতে যেয়ো না।

বাজারের কেনা-বেচার জন্য বিশ্বস্ত দালাল নিযুক্ত করে দেবে। কেনাবেচা যেন গ্রামের মোড়ল এবং "খবরদারের" অজ্ঞাতসারে না হয়। ক্রেতা এবং বিক্রেতার নাম রোজ-নামচায় (Diary) লিখে রাখবে। যে ব্যক্তি গুপ্তভাবে কেনাবেচা করবার চেষ্টা করবে তার জরিমানা হওয়া দরকার।

শহরের প্রত্যেক মহল্লায় এবং শহরতলীতে রাত্রে যেন চৌকিদার পাহারায় নিযুক্ত থাকে। সন্দেহজনক, অজ্ঞাত-কুলশীল লোকেদের স্থান থেকে স্থানান্তরে তাড়াতে থাকবে। চোর, পকেটমার, ঠগ প্রভৃতির চিহ্ন পর্য্যন্ত যেন না থাকে। যদি এমন কোন লোক মারা যায় কিম্বা দেশান্তরে চলে যায় যার কোন উত্তরাধিকারী নাই, তা হ'লে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে প্রথমতঃ সরকারী পাওনা উসুল করবে, তার-পর, উত্তরাধীকারিদের খুঁজে বের করে সম্পত্তি তাদের হাতে অর্পণ করবে। যদি তল্লাস করেও কোন উত্তরাধিকারী না পাওয়া যায়, তা হ'লে সম্পত্তি সরকারী আমীনের (Trustee) কাছে জমা দেবে, আর রাজসরকারে সংবাদ পাঠাবে। প্রকৃত দাবীদার উপস্থিত হলে সম্পত্তি তাকে যেন দেওয়া হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। এ বিষয় খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গে তোমার কর্ত্তব্য পালন করবে।

মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। মদের ব্যবহার যাতে না হয়, তার জন্য কড়া ব্যবস্থা করবে। মাদক দ্রব্য ব্যবহারকারী, বিক্রয়কারী এবং প্রস্তুতকারী সকলেই আইনের চক্ষে অপরাধী এবং দণ্ডনীয়। তাদের শাস্তি এমন হওয়া উচিত যে, তাতে যেন তাদের চোখ খুলে যায়। তবে যারা মাদক দ্রব্য স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কিম্বা মনের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে, তাদের কিছু বলবে না। জিনিষ-পত্রের ওজনের দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা প্রভৃতি যাতে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকবে। অনাবশ্যক সঞ্চয়ের দিকে (Hoarding) লোক যাতে না যায় সে-দিকে লক্ষ্য রাখবে। নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে স্ত্রীলোক এবং পুরুষের ব্যবহারের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঘাট নির্ম্মাণ করবে। ব্যবসায়ীরা রাজকীয় অনুমতি ব্যতীত ঘোড়া এদেশ থেকে যেন বিদেশে রপ্তানী না করে। ভারতবর্ষ থেকে যেন দাসদাসী বিদেশে রপ্তানী করা না হয়। ক্রয়-বিক্রয় যেন শাহী মুদ্রার সাহায্যে হয়। বিবাহের বিষয় যেন রাজকর্ম্মচারীদের অবহিত করা হয়। জনসাধারণের বিবাহে, বিবাহ-অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে, বর-কন্যাকে যেন কোতওয়ালীতে উপস্থিত করা হয়। কনের বয়স, বরের চেয়ে বার বছরের বেশী হলে, বিবাহের অনুমতি দেওয়া হবে না। কেন না এরূপ বিবাহের ফলে পুরুষের স্বাস্থ্যহানি হয়। পাত্রের বয়স ১৬ বৎসর এবং পাত্রীর বয়স ১৪ বৎসর না হলে বিবাহের অনুমতি দেওয়া হবে না। চাচাতো এবং মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ, কেন না, সেরূপ ক্ষেত্রে যথোচিত যৌন আকর্ষণ হয় না। তা ছাড়া সন্তান-সন্ততি দুর্ব্বল এবং রুগ্ন হয়। হিন্দুর ছেলে যদি শিশু অবস্থায় বাধ্য হ'য়ে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে থাকে, তা হ'লে, সাবালক বয়সে সে যে ধর্ম্মে ইচ্ছা থাকতে পারে। যে কোন ব্যক্তি তার স্বাধীন ইচ্ছামত যে কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করতে পারে, কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না। মন্দির,

শিবালয়, অগ্নিমন্দির, গির্জ্জা প্রভৃতি নির্ম্মাণে মানুষের অবাধ অধিকার থাকবে। কেউ যেন তাতে বাধা না দেয়।

সূর্য্যোদয়ের সময় এবং মধ্যরাতে (সূর্য্য যখন প্রকৃত পক্ষে আবিভূর্ত হন) নহবত বাজানোর ব্যবস্থা রাখবে। আর সূর্য্য যখন কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে গমন করবেন, তখন তোপ এবং বন্দুক ছোড়ার ব্যবস্থা রাখবে (প্রহর গণনার জন্য); মানুষ এইভাবে সময়ের গতির বিষয় অবহিত থাকবে আর খোদার কাছে নিয়মিত ভাবে প্রার্থনা করতে পারবে। উৎসব, পর্ব্ব প্রভৃতি যথারীতি পালন করবে। সব চেয়ে বড় পর্ব্ব হচ্ছে নওরোজ—কেন না, এই দিন থেকেই সূর্য্যের সাম্বৎসরিক যাত্রা সুরু হয়। এ পর্ব্বের অনুষ্ঠান হবে ফারওয়ার দিন মাসের প্রথম তারিখে (১লা বৈশাখের অনুরূপ)। ঐ মাসের ১৯ তারিখও উৎসবের দিন বলে গণ্য হবে। আরও কয়েকটী তারিখে উৎসবের ব্যবস্থা করবে। প্রথমোক্ত দুই পর্ব্বে যেন রাত্রিযোগে দেয়ালীর ব্যবস্থা হয়। সূর্য্যাস্তের সময় নাকারা বাজাবার ব্যবস্থা করবে। মুসলমানদের ঈদ পর্ব্বেরও যেন যথোচিত অনুষ্ঠান হয়। আর সেই উপলক্ষে শহরে যেন শাদীয়ানা বাদ্য বাজান হয়।"

(ষাট)

আজকালকার সুসভ্য রাজ্যসমূহে ten years plan, five years plan প্রভৃতি ধারাবাহিক সংস্কার সূচির কথা শুনতে পাই। এই সব পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি। আকবরও একটী 12 years plan বা বার বৎসরের পরিকল্পনা ক'রে-ছিলেন। তবে তাঁর আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ অভিনব ধরণের। যথা—

প্রথম বৎসর—মুষিকদের কোন কষ্ট যেন দেওয়া না হয়।

দ্বিতীয় বৎসর—গরু, ষাঁড় প্রভৃতিকে যেন কোন কষ্ট দেওয়া না হয়।

তৃতীয় বৎসর—চিতা বাঘের শিকার করা যেন না হয়, এবং চিতার সাহায্যে যেন কোন শিকার না করা হয়।

চতুর্থ বৎসর—খরগোস ভক্ষণ করা যেন না হয়; এবং খরগোসের শিকার করা যেন না হয়।

পঞ্চম বৎসর—মৎস্য আহার এবং মৎস্যের শিকার বর্জ্জন।

ষষ্ঠ বৎসর—সাপকে যেন হত্যা করা না হয়।

সপ্তম বৎসর—ঘোড়াকে যেন হত্যা কিম্বা ভক্ষণ করা না হয়।

অষ্টম বৎসর—ছাগ হত্যা এবং ছাগ মাংসের আহার বর্জ্জন।

নবম বৎসর—বানরকে কেউ যেন হত্যা না করে এবং যার পোষা বানর আছে সে যেন তাহাকে মুক্তি দেয়।

দশম বৎসর—মোরগের লড়াই এবং মোরগ হত্যা যেন বন্ধ থাকে।

একাদশ বৎসর—কুক্কুরের সাহায্যে শিকার করা যেন না হয় এবং কুকুরকে, বিশেষতঃ অভিভাবকহীন কুক্কুরকে যেন যত্নের সঙ্গে রাখা হয়।

দ্বাদশ বৎসর—শূকরকে যেন কষ্ট দেওয়া না হয়।

বার বৎসর অতিবাহিত হইবার পর পরিকল্পনার কাজ আবার প্রথম থেকে আরম্ভ হবে, এই ছিল শাহিনে শাহের নির্দ্দেশ।

চান্দ্র মাসের হিসাবে আকবর আর একটী কর্ম্মসূচী প্রস্তুত করেন, যথাঃ—

(১) মহরম (প্রথম মাস)—জীব জন্তুকে কষ্ট দিবে না।
(২) সফর (দ্বিতীয় মাস)—দাসীদের মুক্তি দিবে।
(৩) রফিউল-আউল (তৃতীয় মাস)—৩০ জন সচ্চরিত্র অভাবগ্রস্ত লোককে আর্থিক সাহায্য দিবে।
(৪) রবি-উস-সানী (চতুর্থ মাস)—এ-মাসে দেহের শুচিতার দিকে লক্ষ্য রাখবে।
(৫) জামাদি-উল-আউয়াল (পঞ্চম মাস)—রেশমের বস্ত্র এবং অন্যান্য জাকজমকের পোষাক এ-মাসে বর্জ্জন করবে।
(৬) জামাদি-উল-সানী (ষষ্ঠ মাস)—এ-মাসে চামড়ার ব্যবহার বর্জ্জন করবে।
(৭) রজব (সপ্তম মাস)—সমবয়ীদের এ-মাসে সাহায্য করবে।
(৮) শাবান (অষ্টম মাস)—এ-মাসে কাহারও উপর কঠোর ব্যবহার করবে না।

(৯) রামজান (নবম মাস)—দরিদ্রদের আহার দিবে, বস্ত্র দান করবে।

(১০) শাওয়াল (দশম মাস)—প্রত্যহ হাজার বার খোদার নাম জপ করবে।

(১১) জিলকাদ (একাদশ মাস)—রাত্রের প্রথম ভাগ জাগ্রতভাবে কাটাবে, আর কয়েক জন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করবে, আর বিভিন্ন উপায়ে তাদের আনন্দ বিধান করবে।

(১২) জিলহাজ্জ (দ্বাদশ মাস)—মানুষের মঙ্গলের জন্য ইমারৎ প্রভৃতি প্রস্তুত করবে।

একষট্টি

আকবরের বিভিন্ন সংস্কার এবং বিধি-নিষেধের বিষয় বিবেচনা করলে, তিনটী আদর্শের প্রেরণা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই, যথা, (১) জাতীয় একতার প্রেরণা (২) জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মানুষের এবং মানুষেতর প্রাণীসমূহের অর্থাৎ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ প্রভৃতির মঙ্গল সাধনের প্রেরণা, এবং (৩) রাষ্ট্রীয় মঙ্গল সাধনের বিষয় ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ, মুক্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রেরণা। আজ বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগে, প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রের চিন্তা এবং কর্ম্ম নেতারাই ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ ভাবে, স্বাধীন বিজ্ঞান এবং দর্শনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় জীবনকে গঠিত করবার চেষ্টা করছেন। শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ,—প্রাচীন আচারের ইঙ্গিত এবং নির্দ্দেশ এখন আর তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান-নির্দ্দেশিত পথ থেকে বিচলিত করে না। রাজধর্ম্ম এখন সংস্কারধর্ম্ম এবং শাস্ত্র-ধর্ম্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আকবরের গৌরব এই যে, সুদূর ষোড়শ শতাব্দীতে, সমস্ত পৃথিবী যখন সংস্কার-ধর্ম্মের এবং শাস্ত্র-ধর্ম্মের অনুশাসন মেনে চলতো, দর্শন এবং বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যখন রাষ্ট্রকে পরিচালিত করবার কল্পনাও মানুষ করতে সাহস করেনি, সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে এই দূরদর্শী, অলৌকিক জ্ঞান-সম্পন্ন ভারত-সম্রাট, বৈজ্ঞানিক যুগের আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে নিজের উজ্জ্বল অন্তরের মধ্যে রূপায়িত করতে পেরেছিলেন, এবং বিঘ্নবহুল বাস্তব জীবনে অকাতরে এবং ব্যাপক ভাবে সে আদর্শের প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন।

বিখ্যাত ব্যবহারবিদ্ Sir Henry Maine ব্যবহার-শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের তিনটী স্তরের নির্দ্দেশ করেছেন। প্রথম স্তরে মানুষ শাস্ত্রের আক্ষরিক নির্দ্দেশমতই সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিচালনা করে। আক্ষরিক নির্দ্দেশ যখন জটিলতর জীবনকে পরিচালিত করতে অক্ষম হয়, তখন মানুষ দ্বিতীয় স্তরে গিয়ে পৌঁছায়, অর্থাৎ Interpretation বা ব্যবহার সাহায্যে জীবনকে পরিচালিত করে। Maine এর মতে এশিয়াবাসীরা এই দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করতে পারেন নি। কেবল ইউরোপবাসীরা তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ Legislation বা নব-সৃষ্টির স্তরে গিয়ে পৌঁছেছেন। তাঁর মতে কেবল তাঁরাই শাস্ত্রনিরপেক্ষ ভাবে বাস্তব জীবনের তাগিদের নির্দ্দেশ মত নূতন আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি Legislation সংজ্ঞা দিয়াছেন Legislation, the enactmente of a legislature which whether it takes the form of an autocratic prince or of a Parliamentary assembly, is the assumed organ of the entire society, is the last of the ameliorating instrumentalities."

Maine যদি আকবরের আদর্শ এবং রাষ্ট্রসাধনার সঙ্গে যথোচিত ভাবে সুপরিচিত হতেন, তা'হলে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হতেন যে, ইউরোপের Legislation-এর স্তরে পৌঁছোবার তিনশত বৎসর পূর্ব্বে, ভারতের এই অলোক-সামান্য সম্রাট ব্যবহার-শাস্ত্রকে এবং রাষ্ট্রজীবনকে ক্রম-বিকাশের সর্ব্বোচ্চ স্তরে, অর্থাৎ Legislation-এর পর্য্যায়ে উন্নীত করেছিলেন।

[ক্রমশঃ

চিত্রলেখা

বাণীকুমার

বসুন্ধরা একই ছবি আঁক্‌চে দিনে দিনে,
নিত্য-চেনা গান বাজে তা'র বীণে।
প্রভাতবেলায় দিগন্তরে গুঞ্জে অরুণ-বেণু,
মৌমাছিরা পথে পথে ছড়িয়ে চলে রেণু,
বহুযুগের সৃজন-প্রান্তে ঝঙ্কৃত সে-বাণী—
কতই সুরে আজ ধরণীর বক্ষে দিল আনি';
অমর প্রেমে মুগ্ধ মনে বিশ্ব-বরণ বীণা—
জ্যোতির অরূপ চিরন্তনের গোপন-প্রাণে লীনা।

গগনে কোন্ পরম জাগার চরম শুভক্ষণে,
জাগ্‌লো উষা প্রেমের সঙ্গোপনে।
আপন-হারা নিখিল মেলে স্বপ্ন-নিবিড় আঁখি,
বিস্ময়ে সব দেখ্‌লো হাতে বাঁধা আলোর রাখী,
আনন্দ যে কলোল্লাসে নাচ্‌লো সাগর-নীরে,
জয়-ঘোষণা বনে বনে মাতন শৈল-শিরে;—
প্রথম দেখার সে-মত্ততা চিত্তে কাঁপন আনে,—
এখনো তা'র ছন্দ দোলে শ্যামল-তরুণ প্রাণে।

বিচিত্রা যে-রূপের লীলায় আন্দোলিত তৃণ—
সেই মহিমা পুষ্পদলে প্রীণ।
পাতায় পাতায় গন্ধে-ভাষায় বর্ণ-আলিম্পনে—
অতুল রসের তুলির লিখন দীপ্ত প্রতিক্ষণে;
সুন্দরেরি নৃত্য-তালে নিত্য-নবীন রাগে—
ফুল-ফোটা ফুল-ঝরার সনে অমর ভঙ্গী জাগে।
দুঃখে-সুখে বরণ-মালায় সৃষ্টি-প্রলয়-মাঝে—
বিশ্বমোহন অনন্ত সুর দিক্-বেণুতে বাজে।

নীল-আকাশের গুমরে-ওঠা চির-ব্যাকুল গীতি
গাইচে ধরার অন্তরপুর নিতি।
দিন-রজনী ছন্দিত সেই বাণীর করুণ সুরে,
ভৈরবেরি ঝঙ্কার-তান তপন-সোমে ঘুরে,
কমল-বুকে গন্ধ-স্বপন—সেই ললিতা ব্যথা—
বন্দিনী সে বিন্দু হ'য়ে মধুর গোপন কথা।
বিরহিনীর আঁখির জলে উঠ্‌লো সে-গান ভরি',;
প্রেম-বেদনায় নির্জ্জন প্রাণ অমৃত শ্যাম করি'।

নারিকেলের পল্লবেতে তাল-তমালী বনে—
বিরহেরি মর্ম্মরিমা-স্বনে—
মন্দ্রিত যে-বাণী সদাই ঋতুর আবর্ত্তনে,
মধ্যদিনে কল্লোল-গান নির্ঝরে নির্জ্জনে,—
কোন্ সে রাখাল বাজায় বেণু রুদ্র-মোদন সুখে,
সেই রাগিণীর নিত্যধ্বনি ধরার গভীর বুকে,—
ইন্দ্রধনু সে-সঙ্গীতের চিত্রলিপি নীলে,—
তাই সুদূরের তৃষ্ণা-সনে অনন্ত প্রেম মিলে।

চিত্র-লেখায় মগ্নচেতন ধরার সাধনখানি—
নানান্ রূপে তুলির বাঁধন টানি'—
দিবস-রাত্রির বুকের 'পরে আঁক্‌চে অনুরাগে,
রেখায় রেখায় রঙের খেলায় গ্রীষ্মেরি তপ জাগে,
কখনো বা বাদল-দিনের প্লাবন-গানের মায়া,
শীতের কাঙাল শুভ্র বুকের শঙ্কা-ত্যাগের ছায়া,—
বসন্ত-দাক্ষিণ্যে ফুটে ছবির রঙীন্ আশা,
সুরলোকের বাণীর বিলাস আকাঙ্ক্ষারি ভাষা

ধরণী সেই রূপ-প্রকাশে রয়েছে উন্মনা,
যুগে যুগে যায়না সে-দিন গণা।
কালবোশেখীর ঝড়ের দোলায় ধরার চপল হিয়া—
অপূর্ণতার বিদ্রোহ-ক্ষোভ তুল্‌লো হিল্লোলিয়া,
চূর্ণ করে এতোদিনের সাধন-সৃজনখানি,
আবার আঁকে আগ্রহেরি অনন্ত রূপ-বাণী।
বসুধা কোন্ স্বর্গ-সুধার মিলন-প্রবাহিণী—
মর্ত্ত্য-প্রাণের গোপন-লোকে তুলছে রিণিরিণি।

সুন্দর

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

ঘাতককেও অপেক্ষা করতে হয়
বধ্যের জন্য ওৎ পেতে গোপনে।
সূর্য্যকেও অপেক্ষা করতে হয়
রাত্রি-প্রভাতের প্রত্যাশায়।
সত্যও অপেক্ষা করে' থাকে
আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজে'।
প্রেম জেগে থাকে অনির্দ্দিষ্ট কাল
শুভদৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায়।
মৃত্যুও অপেক্ষা করে দিন গুণে'।
এমন কি তুমি—তোমাকেও প্রতীক্ষা করতে হয়
অনন্তকাল ধরে'—
আমার উন্মুখ হওয়ার মুখ চেয়ে।

ত্রিভুবনে কেবল একজন অপেক্ষা করে না—
সব সময়েই তার সংক্রমণ—
প্রতিমুহূর্ত্তেই তার বৈজয়ন্তী উড়ছে:
সে সুন্দর।
সে অপেক্ষা করে না তার প্রিয়প্রাত্রর জন্যও—
এমন কি নিজের জন্যও নয়—
নিজেকে ছেড়েই সে চলে যায়—
প্রাণ বেঁচে থাকতেই চলে' যায় সে—
নিজ দেহের যৌব রাজ্য ত্যাগ করেই।
এই সংক্রান্তি, এই সমাপ্তি, এই তার দেহান্তর-লাভ
কারো মুখাপেক্ষা তার নাই।

তুমি চিরন্তন।—
কিন্তু তোমার সুন্দর ক্ষণভঙ্গুর।—
(ও কি তোমারই সৌন্দর্য্য?)
সমস্ত ছাড়তে পারি তোমার জন্য,
কিন্তু সুন্দরের জন্য তোমাকেও আমি ভুলব।

সুন্দরের অভিসারে

কিন্তু তোমাকে ভুললে সুন্দরকেও ভুলি বুঝি—
ভুল বুঝি হয়ত বা—
তোমাকে ছাড়লে সুন্দরকেও ছেড়ে যাই।
সুন্দরের আঁচল ধরে' যেতে যেতে
সৌন্দর্য্যকে কখন হারাই যে!
প্রদীপ তো আলো নয়—তার শিখাই আলো:
কিন্তু আলোকে ফেলে দীপকেই ভালোবাসি হয়ত কখন।
দীপদানকেও ভালো লাগে ক্রমে ক্রমে।
মধুর চেয়ে মধুর পাত্রকেই মিষ্টি লাগতে থাকে।

রূপের অনুসরণে রস—
রসের অন্বেষণে গন্ধকেই রস বলে' রূপ বলে' ভ্রম হয়—
সুরভির টানকে সুর বলে' ভাবি।
আস্তে আস্তে স্পর্শসুখকেই সুন্দর বলে' মনে হয় হয়ত।

চোখ ইন্দ্র।
রূপের অহল্যাকেই খুঁজে ফেরে দিন রাত।
কিন্তু সহস্রাক্ষ হলেই কি খুঁজে পাওয়া যায় রূপকে?
অপরূপকে?—
অহল্যাকে পেতে গিয়ে তার প্রস্তর মূর্ত্তি পাই।
ইন্দ্রের পিছু পিছু আসে আরো ইন্দ্রিয়রা—
তাদের দিয়ে
প্রস্তরময়ী স্পর্শকেই খোদাই করে'
মনের মত প্রতিমা করে' গড়ে তুলতে চাই বুঝি তখন?

স্পর্শ থেকে শব্দ।
তার পড়ে কেবল শব্দের মধ্যে খুঁজি সৌন্দর্য্য—
আর্টে আর কাব্যে—
সাহিত্যে আর শিল্পকলায়—
রূপ যেখানে রঙ্‌ হয়ে সুর যেখানে শব্দ হয়ে এসেছে:
শব্দরূপের মধ্যে সুন্দরের রূপ!
শব্দ-অর্থ-গন্ধ মিশিয়ে রূপের ব্যঞ্জনা:
রসের রসায়ন:
রসায়ন কিম্বা রসাতল কে জানে!
রসায়ন থেকে রসাতল কতই বা দূর?
তারপরেই তো শব্দে আর অর্থে মিশিয়ে গড়ি
আরেক মিশ্রণ:
জ্ঞান আর বিজ্ঞান—
দর্শন পুরাণ আর সংহিতা।

অবশেষে অর্থ : বিশুদ্ধ অর্থই অবশেষে।
অর্থের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে
বিষয় আর বিলাসের মধ্যে সুষমা খুঁজে বেড়াই।
অর্থে আর অনর্থে মিশিয়ে
বানাই কল আর কারখানা—
প্রাসাদময়ী নগরী আর নগরময় বস্তি
সাম্রাজ্য আর উপনিবেশ।

শেষে থাকে অনর্থ।
অনর্থ আর নিরর্থকতা।
কদর্য্যতা, জীবন্মৃতি আর অপমৃত্যু।

তিলে তিলে পলে পলে ব্যর্থ হয়ে যাওয়া—
নিঃশেষ হয়ে যাওয়া যক্ষ্মারুগীর মতন।
আর থাকে আত্মঘাত—
আত্মঘাত ও আত্মীয় হনন—
অন্য হনন আর অগণ্য হনন—
পলিটিক্স্ আর যুদ্ধ—
তার মধ্যেই পাই আমার অনন্য সুন্দরকে।

কিন্তু তুমি তখন কোথায়?
আর কোথায় তোমার সুন্দর?

জীবন-বীমা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

স্নেহের সুয়োরাণী বৃদ্ধ মাতামহে
এমন দুটোকথা ভুলিয়া যদি কহে—
যাহাতে ভ'রে উঠি হৃদয় গিরি টুটি
স্নেহের ভরা নদী সাগর পানে বহে,—

বলিও জামাতারে না করে মন ভার—
তাহারা সুতরুণ আমার দিন আর
ফুরায়ে এল ভাই, মিটাতে তাই চাই
দাদুর দাবী দাওয়া যেটুকু মিটিবার।

এই তো হাতে হাতে গরম প'ড়ে এলে
তোমার দিদিমাতা আমারে যাবে ফেলে,
হৈম গিরি বাসে হয়তো এই মাসে
এ ভাঙা তরণীরে যাবেন পায়ে ঠেলে।

তখন তুমি যদি ডাগর দুটী আঁখি
নলিনী ঢল ঢল আমার পানে রাখি'
আসিতে নিরজনে ভ্রমর গুঞ্জনে
দিতাম কানে কানে আমিও কত না কি

দুটো বা পাকা চুল তুলিয়া দিতে দিতে
চোখের দুটো কথা চোখেই শুনে নিতে
কভু বা হাতখানি হৃদয় পরে আনি
জুড়ায়ে দিতে ব্যথা বুলায়ে দিতে দিতে।

বয়সে ছোটো যারা সহজে যায় ভুলে,
আল্‌গা বাঁধা গেরো আপনি যায় খুলে;
বুড়ার হাড়ে হাড়ে জড়ায় একেবারে
স্মৃতির মাধবিকা ফুটিয়া ফলে ফুলে।

হৃদয় কটাহের দুগ্ধ সম মোর
সফেন সুধারাশি ধরিব মুখে তোর,
স্মৃতির ইন্ধনে হায় রে পোড়া মনে
আকুল বেদনায় উথলে আঁখি লোর।

বছর কুড়ি চার করিয়া দিয়া পার
এখন বসে আছি পারের পথ চেয়ে,—
তাহারি তরীখানি আমারি বলে জানি
যে জন দয়া করে আসিবে তরী বেয়ে।

কেহ বা লীলাময়ী 'করুণাময়ী' কেহ,
কেহ বা ভালোবাসা কেহ বা দিবে স্নেহ-
কাহারো আঁখিলোর পাথেয় হবে মোর,
স্মরিব মনে মনে...স্মরিবে কেহ কেহ।

তরুণ তরুণীর স্মৃতির অমরায়—
অমর হব মরি তাহারি ভরসায়—
মরণে নাহি ভয় মরণ যদি হয়
মিলিলে লিপিখানি সঠিক ঠিকানায়।

একটু মনে হয় অচেনা মহোদধি
ভবের পারাবার গরজে নিরবধি,
উঠিলে তাহে ঢেউ সাহস দিতে কেউ
অসীম সাহসিকা রহিত সাথে যদি।

যাত্রা হ'লে সুরু সভয়ে কব তা'রে—
বুকের দুরু দুরু আমার অভয়ারে
মরণ সহচরী বক্ষে ধরি ধরি
জীবন বীমা করি চলিব পর পারে।

জীবনের চরে এত চোরাবালি

আর কেন এত গুঞ্জনগীতি অভিসার আয়োজনে।
এ সব ক্ষণিক ছলনার খেলা দেয় যে দুঃখ ক্লেশ,
ভবিষ্যতের ভাবনা কেন বা নিঃসহ যৌবনে।
দিনকয়েকেই শেষ।
তোমার নয়নে পুলকের রেখা কেন যে চকিতে আঁকে।
পলকে পলকে আঁখি পল্লব প্রেমের পরাগ মাখে,
মরম বীণায় স্পন্দন জাগে তব।
কত দূরে যাওয়া কত ফিরে আসা কত জানাজানি নব।

জীবনের চরে এত চোরাবালি তবুও চল্‌তে হোলো,
ফুলঝরা রাতে মনের ছায়ায় আবেগে বল্‌তে হোলো
প্রমীলা তোমায় মোহাতুর আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি
চেতনার কলরোলে।
উদাস হাওয়ার পথে যেন কার বাজে সুদূরের বাঁশী,
মন দেয়া নেয়া তোমায় আমায় থম্‌কে থাকার মাঝে
বিরহের সুর দোলে।
বল্‌তে পারিনে বল্‌বার যাহা আছে।
সোহাগে আবেশে তোমারে সাজাতে জাগলো যে অনুরাগ
কে যেন আমায় গানের ওপারে বারে বারে দেয় ডাক্।

জীবনের স্রোতে জাগে বুদ্‌বুদ্ মিশে যায় অবশেষে,
ক্ষণিকের প্রেম বুদ্‌বুদ্ সম মন কেড়ে নেয় এসে।

দুটী প্রাণ

শ্রীভবেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, কাব্যতীর্থ

সেথা কুল্ কুল্ রবে বহিছে তটিনী...শীকর-সিক্ত তট।
ধরণীর বুকে ফুলে-পল্লবে নববসন্ত-পট॥

বাজে বীণ ওই অলি-গুঞ্জনে কোকিলের-কল-গানে।
মধুমাসে আজ মধুর মিলন বধূ-বঁধুয়ার সনে॥

সেই গঙ্গা পুলিনে বসিয়া বিজনে দুটীপ্রাণে কথা কয়
যবে সান্ধ্য-গগনে গোধূলি-লগনে মলয় পবন বয়॥

নিতি-নব রূপ, সোণার বরণ, ভুবন-মোহন সাজ।
শত বাধা দলি' কত সাধনায় যুগল মিলেছে আজ॥

সব-ইন্দ্রিয় পরাণ সহিত, নয়নে মিলায়ে চায়—
নিখিল-রাগিণী মিশায়ে কণ্ঠে দুঁহু প্রেমালাপ গায়॥

সুখে গঙ্গা পুলিনে বসিয়া বিজনে দুটীপ্রাণে কথা কয়।
যবে সান্ধ্য-গগনে গোধূলি-লগনে মলয় পবন বয়॥

সরস পরশে, শিহরি' পুলকে, রসভরে ভাবে ভোর।
হৃদয়ের ভাব, ভাষায় না ফোটে, ঝরয়ে নয়ন-লোর!

পরিরম্ভনে ছায়াছবি সম দুঁহু দোঁহে মিশি যায়—
অধর অমৃত পিয়ে মর-লোকে অমর-মিথুন প্রায়॥

ভাবে গঙ্গা পুলিনে বসিয়া বিজনে দুটী প্রাণে কথা কয়।
যবে সান্ধ্য-গগনে গোধূলি-লগনে মলয় পবন বয়॥

অনুশোচনা

শ্রীমতিলাল দাশ

কালো বলে গাল দিয়েছি তোমায় আমি প্রিয়তমে,
ভালবেসে আদর দিয়ে করিনি ত পূজা;
সতীর মত অহঙ্কারে পুড়ে গেলি মনোরমে,
স্নেহের পরশ গুটিয়ে নিলি অয়ি মৃণালভুজা।

সহজ করে পেয়েছিনু মূল্য যে তাই দেইনি কিছু
হৃদয় তব নিইনি জিনে গভীর তপস্যাতে,
মানিক পেয়ে ফেলে দিনু তাই ত শোকে মাথা নীচু,
তাইত কাঁদি চোখের জলে তিমিরঘন রাতে।

কাঙালেরি ঘরে তুমি এসেছিলে রাজেন্দ্রানী,
একটি দিনও সে কথা যে করিনি ত মনে;
প্রভু হয়ে দেমাক ভরে শুনিনিত তোমার বাণী,
সেই কথা আজ পড়ছে মনে পড়ছে ক্ষণে ক্ষণে।

প্রেমের হাটে যখন চলে পরস্পরের বিকি কিনি,
হৃদয় দিয়ে হৃদয় যখন নেই গো মোরা জিনি,
প্রেমের কমল ফোটে তখন সৌরভেতে গরবিনী,
সত্য শিবে সত্য করে লই গো তখন চিনি।

গোঁয়ার আমি গায়ের জোরে কিনতে গেনু প্রেমের হাটে,
ভেবেছিনু বিনে কড়ি সওদা নেব কিনে,
ফাঁকি দিয়ে পায় কে ধনে? পৌঁছে কে গো পারের ঘাটে,
সে ফাঁকি মোর গভীর ব্যথায় বাজে হৃদয়-বীণে।

দিয়েছিলি সুযোগ কত, একটী দিনও বুঝিনি তো
আমি যে হায় নেহাৎ বোকা ছিল না কি মনে?
অয়ি প্রিয়ে কাব্য দিয়ে মিছে ভরি শূন্য পাতা,
যে ধন গেছে ফিরবে না রে হায় ত কোনই ক্ষণে।

নিশীথে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল, এম-এ

গহিন রজনী নিঝুম ধরণী,
প্রাণে জাগে হাহাকার।
মনে হয় শুধু বিফল জনম—
ব্যর্থ জীবন-ভার।
কি লাগিয়া খাটি—কি লাগিয়া ছুটি,
কোন্ আশা নিয়ে পড়ি আর উঠি ?
রিক্ত হৃদয়—তিক্ত তীব্র
জ্বালাময় সংসার !

নিদ্রা-নিলীন নিখিল বিশ্ব,
মন করে ক্রন্দন।
শিথিল হইয়া প'ড়েছে জীবনে
যেন কোন্ বন্ধন।
কে দিল হৃদয়ে তুষানল জ্বালি'
ভরা বুক হায় কে করিল খালি ?
কোন্ অভিশাপে মরমের মাঝে
ব্যথা জাগে অনুখন ?

ফুলের সুবাস আসিছে ভাসিয়া,
নয়নে অশ্রুজল।
ভাবি ব'সে একা কেমনে নিবাই
মরমের চিতানল।
জীবনে মাধুরী আর কোথা নাই,
গেছে যাহা চ'লে আর কোথা পাই ?
চির অতৃপ্তি বহি' অন্তরে
বেঁচে আর কিবা ফল।

চাঁদের কিরণে হাসিছে ভুবন,
হৃদয়ে অন্ধকার।
সেথায় উজল আলোকের রেখা
জ্বালিবে না কেহ আর !
এ জগতে হেরি' কাহার বয়ান
উলসি' উঠিবে আবার এই প্রাণ ?
বুকের আকাশে শুকতারা সম
জাগিবে হাসিটি কার ?

জাগিওনা

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

স্মৃতির অতল পাতাল হইতে
জাগিও না কাল নাগিনী,
ঘুমাও ঘুমাও মিশরের মমী
অশরীরী হতভাগিনী।

রজনীগন্ধা ঘুমায়েছে বনে,
সে মধুসন্ধ্যা আসে না ভবনে,
কেন এসেছিলে নীরব চরণে
ওগো নব অনুরাগিণী ?
ঘুমাও ঘুমাও অরুণ-বরণী
বিস্মৃতি অবগাহিনী।

তব দংশন-বিষে মিশে তনু
সুধায় ভরিয়া ছিলে,
সে কি জ্বালা সখি সে কি রঙে রঙে
ভুবন রাঙায়ে দিলে।
আকণ্ঠ বিষ করিয়াছি পান
নীলকণ্ঠের সম,
আমারে ক্ষমিয়ো, আমারে ক্ষমিয়ো
সুন্দরী নিরুপম।
ওগো বিদেশিনী জাগিও না তুমি
ঘুমঘোরে আমি জাগি নি।

তোমার অধর-পরশে নিমেষে
জাগে নব নব রাগিনী।

হে সারথি !

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

আজিকার সংসারের কুরুক্ষেত্র রণে
সর্ব্বনাশা সংঘাতের ক্রূর দ্বন্দ্বক্ষণে
কোথা তুমি হে পার্থ-সারথি !
পাঞ্চজন্যে বাজেনা তো বিপ্লবের প্রথম আরতি
উত্তাল উদাত্ত ছন্দে ! কালজয়ী চক্রের ঘূর্ণনে
দাবানল জ্বালেনা তো বিশ্বগ্রাসী অগ্নির প্লাবনে !
—কোথায় গাণ্ডীবি তব ?
স্বর্ণরথে মদস্ফীত অশ্ববল্গা ধরি' তুমি যারে আনিলে সমরে,
বজ্রহস্তে তুলি' রুদ্রধনু, রাখি' তব চরনের 'পরে
যে তোমারে করিল প্রণাম !
আসন্ন ঝটিকা পূর্ব্বে মুহূর্ত্ত বিরাম :
তারপর তোমারি ইংগিতে
স্বর্গ মর্ত্ত্য কেঁপে ওঠা তূর্য্যের সংগীতে
কোষমুক্ত অস্ত্রের ঝঙ্কারে,
কুরুক্ষেত্র কালানল জ্বেলে দিল মৃত্যুর বহ্নিতে।

কই সে বিজয়ী বীর, বিশ্বজয়ী রথী ?
কোথায় দ্রৌপদী সতী ?
ধ্বংসের আগুনে রাঙা প্রলয়ের জ্বলন্ত বিপ্লবে
যে নারী জনম লভে
উল্কাপাত সম ?
জীবন্ত প্রলয় শিখা, রক্তলিখা কক্ষ জটা শিরে,
উন্মত্ত আনন্দে সাধে জীবনের শেষ ব্রতটিরে
বেণীর বন্ধন লাগি' দুর্ব্বৃত্তের কবোষ্ণ রুধিরে।
কই সেই চির বিপ্লবিনী ?
লাঞ্ছনার অপমানে বিশ্ববিজয়িনী
ধর্ষিতা রুদ্রানী কই ?

হে চক্রী ! বৃথা তুমি সাজায়েছ ঐ
চতুরঙ্গ সেনা সমারোহ,
অগণিত অক্ষৌহিনী, শত লক্ষ রথী,
নিস্ফল সংগ্রামে আজ একা তুমি নিঃসঙ্গ সারথী।
মিথ্যা এই অভিযান, ব্যর্থ আয়োজন,
আজও তাই মদগর্ব্বী ঘৃণ্য দুঃশাসন
সৃষ্টিরে শাসন করে লক্ষ নিষ্পেষনে,
জর্জ্জরিত বেদনার কঠিন বন্ধনে
নিষ্পিষ্ট জীবাত্মা কাঁদে ;

—দুর্নিবার দস্যুতার লুব্ধ অত্যাচারে
পশুত্বের প্রমত্ত ব্যভিচারে—
দিকে দিকে লজ্জাহীন স্বার্থের লুণ্ঠনে
আজও বিশ্ব কেঁপে ওঠে কাতর ক্রন্দনে।
প্রবলের অহংকারে, দুর্ব্বলের নিত্য অপমানে
প্রাণ মরে নিশিদিন মাথা খুঁড়ে ভাগ্যের পাষাণে।

শক্তি আজি অবসন্ন, বীর্য্য অচেতন,
নিরুপায় নিরুৎসাহে মূঢ়ের মতন
বিভ্রান্ত অর্জ্জুন কাঁদে মৌন অবসাদে।

—দ্রৌপদীরা চুল বাঁধে
অধোমুখে অপমান হীনা
নির্লজ্জ ভোগের অভিসারে মধুছন্দে বেঁধে লয় বীণা,
চিরন্ত লালসার-কলঙ্ক শয়নে
আজিও ভজন করে নিত্যদিন নিরুদ্বেগে লক্ষ দুঃশাসনে।

আজও সে অনাদি রিপু, আদিম বর্ব্বর,,
বঞ্চনার মিথ্যা ভোগে সাজানো সংসার :
নিদ্রিত দুর্জ্জয় বল, নির্জ্জিত পাণ্ডব,
নিবর্বীর্য্য নিঃস্বের কানে আবার বাজাও তব মহাশঙ্খ রব
শোনাও অমৃত গীতা ;
গত হোক ঘৃণ্য স্বার্থ ক্লিন্ন অবসাদ,
আবার জাগুক পার্থ বিপ্লবের মন্ত্র ল'য়ে কানে
দলিতা পাঞ্চালী নারী ক্ষিপ্ত অপমানে
দগ্ধ প্রাণ বেদনার ভস্মবহ্নি হ'তে
আবার লভুক জন্ম করালিনী ভুবন মোহিনী।

সর্ব্বজয়ী সংযমের বজ্রগর্ভ হ'তে
জ্বলিয়া উঠুক শক্তি পূর্ণ বীর্য্যে চির নিঃশঙ্কিনী।

কল্পনার পটে আঁকা অশরীরি দৈবমূর্ত্তি নয়,
বাস্তব সংসার প্রান্তে জাগ্রত জীবন মাঝে
জনে জনে সে শক্তির হোক অভ্যুদয়।

বিধ্বংসী এ বিপ্লবেরে—
হে নায়ক ! রূপায়িত কর নব প্রাণে,
এ যজ্ঞ সফল কর পূর্ণ কর
লক্ষ লক্ষ জীবনের নিত্য আত্মদানে !

বাংলার ঘরোয়া প্রবাদ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

জুতোর কাঁকর—না ফেলা যায়, না রাখা যায়।

পথ চলিতে চলিতে যদি জুতার মধ্যে কাঁকর প্রবেশ করে, তাহা হইলে কিরূপ অশান্তিতে পড়িতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তাহাকে জুতার মধ্যে রাখাও যায় না, আবার বাহির করিবারও অসুবিধা।

সেইরূপ বাক্যটি আমাদের সংসারের ব্যাপারেও খাটে। বর্ত্তমান যুগে অনেক স্ত্রীপুত্র জুতার কাঁকরের ন্যায় পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। তাহাদের বাড়ীতে রাখাও যায় না, দূর করিয়া দেওয়াও যায় না। রাখিলে অশান্তির জ্বালায় জ্বলিতে হয়; বার করিয়া দিলে লৌকিক গঞ্জনা ও দুর্নামের আঘাত সহ্য করিতে হয়। উভয়ই সঙ্কট অবস্থা।

ঝিকে মেরে বউকে শিখানো।

পুত্রবধূ পরের ঘরের মেয়ে; কোনও অন্যায়ের জন্য তাহাকে শাসন করার মধ্যে বিপদ আছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে, ছেলেরা বউদেরই আজ্ঞাধীন। এ অবস্থায় বউকে কিছু বলা চলিবে না। অথচ তাহাকে একটু শিক্ষা না দিলেও নয়। তাই সুচতুর গৃহিণী আপন কন্যাকে মারিয়া বউকে জানাইয়া দেন যে, এ মার আমার কন্যাকে ঠিক নয়—তোমাকেই।

"ঠাকুর ঘরে কে?"
"আমি ত কলা খাই নি!"

বুদ্ধিহীন চোর! অপরাধ করিয়া সন্ত্রস্ত চিত্তে আছে এবং কখন যে ধরা পড়ে সে জন্য সতর্ক হইয়া আছে। তাহার কলা চুরি করিয়া খাওয়াটাই তাহার সারামন অধিকার করিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। ছায়া দেখিয়াই তার কায়া কাঁপিয়া উঠিল, অর্থাৎ ঠাকুর ঘরের কথাতেই, পাকে-প্রকারে সে স্বীকার করিয়া ফেলিল যে সে নৈবেদ্যের কলাটি উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এরকম চোরকে পার আছে, কিন্তু চতুর চোরকে কায়দা করা যার তার কাজ নহে।

ঢাল নেই, তরোয়াল নেই
নিধিরাম সর্দ্দার!

পূর্ব্বকালে বাঙলায় বহুগ্রামে জমিদার-আশ্রিত 'সর্দ্দার' থাকিত; তাহারা বলবান এবং সাহসী ছিল এবং তাহাদের ঢাল তরোয়াল, লাঠি, বর্শা প্রভৃতি থাকিত। তল্লাটের লোক এই সর্দ্দারদের ভয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু নিধিরামের ঢালও নাই, তরোয়ালও নাই; এবং বোধ হয় সর্দ্দার হওয়ার উপযুক্ত শক্তি ও সাহসও নাই, আছে শুধু সর্দ্দারের শ্রদ্ধা কুড়াইতে। কিন্তু তাহা হয় না। মিথ্যার উপর কোন কিছু প্রতিষ্ঠিত হয় না। সত্য চাই।

ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।

ঢেঁকির একমাত্র কাজই শুধু ধান ভানা। ধান ভানা ভিন্ন তাহার দ্বারা আর অন্য কোন কাজই চলে না। সুতরাং, মর্ত্ত্যেও সে ধান ভানে, আর সশরীরে যদি স্বর্গে যাইতে পারে, সেখানেও তার ঐ একই কাজ। আমাদের সংসারে সমাজে বহু মানুষ-ঢেঁকি আছে, তাহাদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা।

ঢেঁকিকে থামাবো কত, নিত্য ধান ভানে।
অবোধকে বুঝাবো কত, বুঝ নাহি মানে।

ঢেকিকে থামাইয়া রাখা যায় না, গৃহস্থঘরে নিত্যই তাহাকে ধান ভানিতে হয়। তেমনি যে অবোধ, তাহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারা যায় না। বিভ্রান্ত নিত্যকর্ম্মে তাহার সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া দুর্লভ।

তরকারীর ওঁচা ঝিঙে।
পাখীর ওঁচা ফিঙে।

তরকারীর মধ্যে ঝিঙেকে ওঁচা অর্থাৎ নিকৃষ্ট বলা হইতেছে। কিন্তু সত্যই ঝিঙে নিকৃষ্ট কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। কারণ আয়ুর্ব্বেদের মতে ঝিঙের গুণ:—"ইহা শীতল, পিত্তনাশক, আগ্নেয়, জ্বর, কাস ও কৃমিনাশক, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছতা ও রক্তপিত্তে উত্তম পথ্য।"—সুতরাং ঝিঙে ত নির্গুণ নহে। তবে পাখীর মধ্যে ফিঙে পাখী হয়ত ওঁচা হইতে পারে; যেহেতু সে বুলি বলিতেও পারে না, ভাল শিস্ দিতেও পারে না; তাছাড়া তার গায়ের রং মিশ কালো। কিন্তু তার ঐ কালো রংটাই আমাদের মতো লোকের চোখে পরম সৌন্দর্য্য বিকাশ করে।

তিল কুড়িয়ে তাল।

অল্প অল্প সঞ্চয়ের দ্বারা বৃহৎ ভাণ্ডারের সৃষ্টি করা যায়। এই বাক্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। মধুমক্ষিকার মধুচক্র ইহার সুন্দর প্রমাণ।

তুমি খাও ভাঁড়ে,
আমি খাই ঘাটে।

তুমি ত ভাঁড়ে জল খাও; আমার ভাঁড়ও নাই, আমি ঘাটে গিয়া জল খাইয়া আসি। আমি যে অভাবজনিত কষ্টে মনে ব্যথা অনুভব করি, অনু-

সন্ধানের দ্বারা জানা যায় যে তাহাপেক্ষাও অভাব অন্যে ভোগ করিতেছে! আপন দুঃখকষ্ট, নীচের দিকে অপরের দুঃখকষ্টের সঙ্গে তুলনা করিলে, নিজের দুঃখকষ্ট তাহা অপেক্ষা লঘু বলিয়া মনে হয় এবং তাহাতে যথেষ্ট সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

তেল তামাকে পিত্ত নাশ···
যদি হয় বার মাস।

আমাদের দেশে দেখা যায় যে স্নানের পূর্ব্বে তৈল মাখিয়া অনেকেই এক-ছিলিম তামাক খাইয়া তারপর স্নান করিতে যান। কিন্তু ইহাতে সত্যই পিত্তনাশ হয় কিনা, তাহা তাহারাই বলিতে পারেন। কথাটার যখন সৃষ্টি হইয়াছে, তখন ইহার মধ্যে অন্ততঃ কিছু সত্য থাকা সম্ভব।

তোমার যা ভালবাসা—
কালীপূজার পাঁঠা পোষা।

কালীপূজায় বলিদানের জন্য পাঁঠা কিনিয়া লোকে তাকে ভারী যত্ন করে; উদ্দেশ্য— পাঁঠাটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয় এবং কোন প্রকার খুঁত না পায়। তাহা হইলে বলিদান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং পুণ্যময় হইবে। ইহা ছাড়া পাঁঠার প্রতি যত্ন ভালবাসার দ্বিতীয় কোন কারণ নাই। পূজক নিজের জন্যই পাঁঠাকে ভালবাসিতেছেন, পাঠার জন্য নহে। এখানে এই বাক্যের বক্তা ও তাহার প্রতি আর একজনের ভালবাসা সম্বন্ধে দুঃখ করিয়া বলিতেছে, "আমার প্রতি তোমার এই যে ভালবাসা এ ত শুধু আমাকে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়!" পূর্ব্বকালে এদেশে কাপালিকরা তাহাদের বলির মানুষের প্রতিও এরূপ ভালবাসা দেখাইত ও তাহাকে নানাভাবে তোয়াজ করিত!

তোমারও পায়ে গোদ,
আমারও জন্মশোধ।

উভয়ের বাটীতে উভয়ের যাতায়াত, উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রীতি ভালবাসার এই শেষ। তুমিও সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলে, আমিও তোমার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলাম।

"তোরা ধান ভানাবি গা?
—না-ভানাবার গা।"

কোন এক ব্যাপারে, চতুর লোক মুখে স্পষ্ট কিছু না বলিয়া ইসারা ইঙ্গিতের দ্বারা জানাইয়া দিল যে তাহার একার্য্য করিতে ইচ্ছা—অর্থাৎ গা নাই। সংসারে যাহারা বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত, তাহারাই এইরূপ করিয়া থাকে।

তোর শিল, তোর নোড়া—
তোরই ভাঙি দাঁতের গোড়া।

অর্থাৎ, তোমারই অস্ত্র লইয়া তোমাকেই আঘাত করিব। নানা বিভিন্ন বিষয়ে বাক্যটি খাটে; যেমন—তোমারই শস্যক্ষেত্র, তোমারই পরিশ্রম, তোমারই চাষ-আবাদ, তোমারই শস্য সম্ভার, অথচ তোমাকেই সে-সবে হাত করিয়া না খাইতে দিয়া মারিব।

দশচক্রে ভগবান ভূত।

দশ জনের অর্থাৎ অনেকের মিলিত যে চক্রান্ত, তাহার শক্তি অধিক। সেই শক্তির ফলে ভগবানকে পর্য্যন্ত ভূত বানান যায়।

দশে মিলি করি কাজ,
হারি জিতি নাহি লাজ।

দশজনে মিলিয়া কোন কাজ করিলে তাহা সফল হইবারই সম্ভাবনা বেশী। আর যদি না-ও সফল হয়, তাহা হইলে তাহাতে লজ্জার কিছু থাকে না, পরাজয়ের গ্লানি কোন একজনকে সম্পূর্ণ ভোগ করিতে হয় না, তাহা সকলের মধ্যে অংশ হইয়া যায়। মানুষ সামাজিক প্রাণী; সুতরাং কোন বড় কাজ সকলের মিলিত পরামর্শ মত করাই ভাল। শক্তি অতি সামান্য হইলেও, যদি তাহা দশের মিলিত শক্তি হয় তবে তদ্বারা মহৎ কাজও সমাধা হয়। এক এক বিন্দু বৃষ্টি বারি মিলিত হইয়া দেশ ভাসাইয়া দেয়।

দশের আঁটি একের বোঝা।

দশজনের দশটা আঁটি, একজনের পক্ষে বোঝা হইয়া পড়ে! এই বাক্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কাজ ভাগ করিয়া লইলে, কাহারও পক্ষে তাহা সম্পন্ন করা কঠিন হয় না, অথচ সমস্ত কাজটি নির্ব্বিবাদে ও সহজে সুসম্পন্ন হইয়া যায়।

দাতার অগ্র, বখিলের শেষ।

প্রথম থেকেই দাতার হাত খোলা। বখিলের—অর্থাৎ কৃপণের যদি বা হাত খোলে ত শেষের দিকে। যেমন, কোন ভোজের ব্যাপারে যদি সন্দেশ ইত্যাদি পরিবেশনের ভার কোন দাতা স্বভাবের লোকের উপর পড়ে, তাহা হইলে গোড়া হইতেই তিনি তাঁর দরাজ হাতে সন্দেশ বণ্টন সুরু করিবেন। পরে দেখিবেন, সন্দেশ কমিয়া আসিতেছে, অথচ বহু লোক এখনো বাকী। কিন্তু বখিলের কাজ ইহার ঠিক বিপরীত।

দাঁত আর আঁত।

দন্ত আর অন্ত্র; অন্ত্রকে এখানে হজমশক্তি বুঝিতে হইবে। মানুষের দাঁত যদি ভাল থাকে আর 'লিভার' অর্থাৎ আঁত যদি ভাল থাকে, তাহা হইলে তাহার বড় একটা রোগ হয় না। অনেকে আবার এই অর্থে এই বাক্যটিও ব্যবহার করেন—ভুড়ি আর মুড়ি'। মানে, মস্তিষ্ক এবং ভুড়ি অর্থাৎ পেট ভাল থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

দুর্জ্জনকে পরিহার,
দূর থেকে নমস্কার।

দুষ্ট লোকের সঙ্গ ত্যাগ কর এবং তাহাকে দূর হইতে নমস্কার কর। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো দুষ্টের সংস্রবে থাকে না। দুষ্টকে নমস্কার করিবার আবশ্যক হইলে দূর হইতেই নমস্কার করিয়া সরিয়া পড়ে।

দিয়ো কিঞ্চিৎ,
না কোরো বঞ্চিত।

দিবার শক্তি থাকিলে, প্রার্থীকে একেবারে রিক্ত হাতে ফিরাইয়া না দিয়া কিছু তাহাকে দিও। সে যদি দানের উপযুক্ত পাত্রও না হয়, যদি

অপাত্রই হয়, তাহা হইলেও তাহাকে কিঞ্চিৎ দিয়া বিদায় কর ; ইহাই নীতিবাক্য।

দেখিস্‌-চোর,
না-দেখিস্‌—মোর।

যেমন তোমার জিনিস ; আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাহা হস্তগত করিলাম ; সেই সময়ে তাহা যদি তোমার লক্ষ্যে পড়ে, অমনি কোন অছিলায় তাহা তোমায় ফিরাইয়া দিয়া আমার সাধুতার বাহাদুরী লইলাম।

'দেরী! তুমি কোথা ?'
'—তাড়াতাড়ি যেথা।'

অর্থাৎ যে কাজে তাড়াহুড়া করা যায়, প্রায়ই দেখা যায় যে সেইকাজেই দেরী হইয়া পড়ে।

দাতার চেয়ে বখিল ভাল—
স্পষ্ট জবাব দেয়।

কৃপণের চক্ষুলজ্জা নাই। তুমি কৃপণের কাছে গিয়া কোন বিষয়ের চাঁদা চাহিলে, কৃপণ চারিটা পয়সা দিয়া বলিল, আর পারিব না। তার স্পষ্ট কথা। ঐ চারি পয়সা নিতে হয় নাও, না নাও ত সিদে পথ দেখ, সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। আর সাধারণ লোক—তাদের চক্ষুলজ্জায় স্পষ্ট কথা বলিবার সাহস নাই। তারা হয়ত বড় রকম কিছু একটা আশা দিল ; কিন্তু একমাস ঘুরাইয়া তোমাকে কাহিল করিয়া ফেলিল। ফলে তাহার কাছ থেকে তুমি একটি পয়সাও পাইলে না, উপরন্তু সময় নষ্ট হইল।

ধরি মাছ, না ছুঁই পাণি।

জল না ঘাঁটিয়া, কাপড়-চোপড়ে কাদা না মাখিয়া মাছ ধরিয়া আনি। ইহাতে আমার কত-না বাহাদুরী ?—সত্যই বাহাদুরী বটে। এমনভাবে কার্য্যোদ্ধার করিবার শক্তি সকলের থাকে না। সকলের অলক্ষ্যে, সকলের অজ্ঞাতসারে, কোনরূপ হৈ-চৈ না করিয়া কাজ হাসিল করিয়া আসা—ইহা খুব কম লোকেই পারে।

ধান ভান্‌তে শিবের গীত।

এক বিষয়ের আলোচনায়, অন্য বিষয়ের অবতারণা বিষদৃশ্য। শিবের গীত গাহিতে হইলে শিব-মন্দিরে বা গাজনতলায় গাহিতে হয়। ধান ভানিতে ভানিতে শিবের গীত চলে না।

ধারে কাটা, আর ভারে কাটা।

ধারে কাটাই স্বাভাবিক, ভারে হয়ত কাটিতে পারে কিন্তু তেমন কাটার কোন মূল্য নাই—আদর নাই। শক্তি এবং গুণের জন্য যে পুরস্কার তাহাই যথার্থ পুরস্কার। আর পিছন হইতে সুপারিশের জোরে যে পুরস্কার, তাহার কোন সত্যিকারের মূল্য নাই।

[ক্রমশঃ]

ললিত-কলা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

ছয়

(৫) **বিশেষক-চ্ছেদ্য**—যশোধরেন্দ্র বলিয়াছেন—'বিশেষক'- শব্দের অর্থ—'তিলক', যাহা ললাটে প্রদত্ত (অর্থাৎ অঙ্কিত) হইয়া থাকে। ভূর্জ্জপত্রাদি নানা-পত্রময় তিলক অনেক প্রকারে ছেদন করা হইত। ইহাকেই 'পত্রচ্ছেদ্য' নাম দেওয়া হইয়া থাকে। মহর্ষি বাৎস্যায়ন এই সকল নানা প্রকার পত্রচ্ছেদ্যের উপযোগিতা যথাস্থানে বলিয়াছেন—'নানারূপ অভিপ্রায়ের সূচক পত্রচ্ছেদ্য নায়ক নায়িকার নিকট প্রেরণ করিবেন' ইত্যাদি। যশোধর আরও বলিয়াছেন যে—'বিশেষক'-শব্দটি আদরার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিলাসিনীগণের অতি প্রিয় ছিল বলিয়াই ইহার নাম দেওয়া হইত 'বিশেষক'।[১]

মোটের উপর 'বিশেষক-চ্ছেদ্য' হইতেছে—অলকা-তিলকা-কাটা। সে কালে সে কেবল চন্দন-কুঙ্কুমাদি-দ্বারাই তিলক রচিত হইত তাহা নহে, পক্ষান্তরে অনেক সময় ভূর্জ্জপত্র বা ঐরূপ কোন কোন সুদৃঢ় মসৃণ ও পাতলা বৃক্ষত্বক্‌ ইত্যাদিজাতীয় বস্তু নানা আকারে কাটিয়া কপালে ও কপোলে আঁটিয়া দেওয়া হইত। বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের বাঙ্গালী মেয়েদের

১। "বিশেষকতিলকো যো ললাটে দীয়তে,তস্য ভূর্জ্জাদিপত্রময়স্যানেক-প্রকারং ছেদনমেব ছেদ্যম্‌। পত্রচ্ছেদ্যমিতি যক্তব্যম্‌। বক্ষ্যতি চ—'পত্রচ্ছেদ্যানি নানাভিপ্রায়াকৃতীনি প্রেষয়েৎ' (৫।৪।১৩৮)—ইতি। সত্যম্‌। বিশেষকগ্রহণমাদরার্থম্‌, বিলাসিনীনামতিপ্রিয়ত্বাৎ"।—জয়মঙ্গলা।

৺মহেশচন্দ্র পালের কামসূত্রের সংস্করণে টীকানুবাদ-কর্ত্তা বলিয়াছেন—"এস্থলে টীকাকারের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। পত্রচ্ছেদ্য বিশেষকচ্ছেদ্যেরই একটি প্রকারভেদ বলিয়া আমরা জানি। বাৎস্যায়নেরও সেইরূপ অভিপ্রায় না হইলে দুই স্থানে দুইরূপ বলিবেন কেন ? বিশেষক-চ্ছেদ্য বলিলে বুঝিতে হইবে, যাহা কোন অভিপ্রায় বা সঙ্কেতের পরিচায়ক, অথচ সাধারণের অজ্ঞেয় ছেদ-ভেদাদি-যোগ্য চিহ্ন-বিশেষ। বর্ত্তমানকালে

মধ্যে কাঁচপোকা-সোনাপোকা ইত্যাদি পতঙ্গের পাখা কাটিয়া টিপ-পরার প্রথা খুবই প্রচলিত ছিল। তাহার পর মধ্যে কিছুদিন টিপ কাটিয়া পরার প্রথা প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। অবশ্য তাই বলিয়া সিন্দুরের টিপ পরার প্রথা কোন দিনই উঠিয়া যায় নাই। তবে টিপ-কাটার প্রথা মধ্যে প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। সম্প্রতি সিনেমার প্রভাবে আবার নানারূপ আকৃতির টিপের খুবই প্রচলন হইয়াছে। সেলুলয়েড, পাতলা কাচ, রাঙ্‌তা ইত্যাদি নানাজাতীয় পদার্থই ইহাদিগের উপাদান। আর অতি ক্ষুদ্র খড়িকার অগ্রভাগ হইতে এক বা দেড় ইঞ্চি ব্যাস পর্য্যন্ত উহাদিগের পরিমাণ। আর আকৃতির ত কথাই নাই। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত নানাবিধ শাস্ত্রীয় বা লৌকিক পদার্থের প্রতীক-রূপে যত কিছু চিহ্ন কল্পিত হইতে পারে, প্রায় সে সকল আকারেরই টিপ বর্ত্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে। কখনও কখনও একাধিক টিপের ব্যবহারও বর্ত্তমানে দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে 'বিশেষক' কপালের তিলক বা টিপ। কপালের তিলকই তিলক-জাতির প্রধান বলিয়া পরম সমাদরে সেই নামেই কলাটির নাম-করণ করা হইয়াছে —ইহাই যশোধরের নিগূঢ় অভিপ্রায়। বস্তুতঃ, এ কলাটির ব্যাপক নাম—'পত্রচ্ছেদ্য'। পত্র-লেখা, পত্র-ভঙ্গ, পত্র-মঞ্জরী ইত্যাদি ইহারই নামান্তর। কেবল কপালে কেন; কপোলে, গলায়, বাহুতে, বক্ষে ও অন্যান্য নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও পত্রচ্ছেদ্য রচনা করা হইত। কেবল যে ভূর্জ্জাদি পত্র কাটিয়া এই সব ছেদ্য রচিত হইত—তাহা নহে; গোরোচনা-কস্তূরী কুঙ্কুম-অগুরু-চন্দন ইত্যাদি নানাপ্রকার সুগন্ধি স্নিগ্ধ অনুলেপন-দ্রব্যের সাহায্যে লতাপাতার আকারে নানারূপ চিত্র-বিচিত্র অলকা-তিলকা কাটা হইত বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছিল 'পত্রচ্ছেদ্য'। প্রাচীন যুগে এই কলাটি নারীজাতির অতি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শুধু নারিগণ নহেন, কখনও কখনও পুরুষগণও ইহার চর্চ্চায় বিশেষজ্ঞতার পরিচয় দিতেন। ইহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন ছিলেন স্বয়ং বৎসরাজ উদয়ন। বর্ত্তমানে বিবাহাদির সময়ে ক'নেকে যে 'কনে-চন্দন' পরান হয় বা বরকে যে ভাবে 'বর-চন্দন' দিয়া সাজান হয়, সে কৌশলও এই প্রাচীন কলাটির ভগ্নাবশেষ বলা চলে। নানা দেশের নানা সম্প্রদায়ের উপাসকগণ, বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ ললাটদেশে যে-সকল নানা বর্ণ ও আকৃতির নানাবিধ তিলক রচনা করেন (যথা রামানুজী, মাধ্ব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিভিন্নরূপ তিলক, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের 'হরিমন্দির' বা বৈষ্ণবীর ললাটের 'রসকলি', শৈবের ললাটস্থিত ত্রিপুণ্ড্র, শাক্তের কপালে সুবৃহৎ সিন্দুরের ফোঁটা ইত্যাদি), সে সকল তিলক-রচনার কৌশলও এই কলাটির অন্তর্গত। আর গঙ্গার ঘাটে (বিশেষ ভাবে কলিকাতা ও কাশীতে) উড়িয়া বা হিন্দুস্থানী ঘাট-পাণ্ডাগণ ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে বা পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোকদিগের কপালে-কপোলে-নাসিকায় ও চিবুকে যে নানারূপ দেবতার নামযুক্ত লতা-পাতার 'ছাপা' চন্দন অথবা তিলক-মাটির সাহায্যে কাটিয়া দেয়, তাহাও বিশেষকচ্ছেদ্যেরই রূপান্তর বলিতে হইবে। বিগত যুগের

অন্ধ ও বধিরাদির শিক্ষার্থ আবিষ্কৃত সঙ্কেতলিপি প্রভৃতি এই কলারই অন্তর্গত হইবে"—(কামসূত্র, ৺মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণ, পৃঃ ৮৭)

আমাদিগের বক্তব্য এই যে, লেখক পত্রচ্ছেদ্য ও বিশেষকচ্ছেদ্যের মধ্যে যে ভেদ পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন, তাহার কোন সমর্থক দৃঢ় প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। অবশ্য ইহা অসম্ভব নহে যে, অভিপ্রায়-বিশেষের সূচক হইত বলিয়াই এইপ্রকার ছেদ্যকে 'বিশেষকচ্ছেদ্য' নাম দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া পত্রচ্ছেদ্য ও বিশেষকচ্ছেদ্যকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কলা বলার পক্ষে কোন বিশেষ যুক্তিসহ প্রমাণ নাই। মহর্ষি বাৎস্যায়ন এ স্থলে 'বিশেষকচ্ছেদ্য' ও অন্যস্থলে 'পত্রচ্ছেদ্য'—এই দুইটি নাম ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই যে ইহারা দুইটি অত্যন্ত ভিন্ন কলা—এরূপ মনে করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত প্রমাণের অভাব। ইহারা অত্যন্ত ভিন্ন হইলে চতুঃষষ্টি কলার তালিকার মধ্যে উভয়ের পৃথক্ উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত। কিন্তু তাহা না থাকায় উভয়ের প্রভেদ পরিস্ফুট নহে। অন্ধ-বধিরাদির শিক্ষার্থ ব্যবহৃত সঙ্কেত-লিপি (Code) বিশেষকচ্ছেদ্য কলার অন্তর্ভুক্ত—ইহা মনে করা যায় না। সঙ্কেত-লিপির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, চিহ্নবিশেষ অক্ষরবিশেষের প্রতীক, এমন কি, কোন কোন স্থলে চিহ্নবিশেষ শব্দ-বিশেষ বা ক্ষুদ্রবাক্য ও বাক্যাংশের প্রতীক রূপেও ব্যবহৃত হয়—(যথা, Morse Telegraph Code, Braile Code, Pitman's short-hand Code ইত্যাদি)। কিন্তু বিশেষকচ্ছেদ্য ঠিক ঐ জাতীয় নহে। ধরুন, কোন নায়ক একটি মুদিত পদ্মপুষ্প ও একটি প্রস্ফুটিত কুমুদ-পুষ্পের আকারে বিশেষক-চ্ছেদ্য কাটিয়া নায়িকার নিকট প্রেরণ করিলেন। উহাতে বুঝাইবে যে—শুক্লপক্ষে সন্ধ্যা-সমাগমে পদ্ম মুদিত ও কুমুদ প্রস্ফুটিত হইলে নায়ক নায়িকার সহিত মিলিত হইবেন। ইহা সম্পূর্ণ দ্যোতনা-ব্যঞ্জনার ব্যাপার! কোন Codeএ এতখানি অর্থ বুঝাইতে পারে না। এইরূপ সাঙ্কেতিক অভিপ্রায়-জ্ঞাপনের কথাই মহর্ষি পারদারিকাধিকরণের চতুর্থাধ্যায়ে বলিয়াছেন ও উহাই যশোধরের টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। উহা কোন নায়ক-নায়িকার পরস্পর জ্ঞাত সঙ্কেত, সর্ব্বজন-পরিচিত কোনরূপ সাঙ্কেতিক লিপি (Code) নহে!

বাঙ্গালী মেয়েরা মুখে ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে নানা বর্ণ ও আকৃতির উল্কি পরিতেন ও এখন পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী মেয়েরা যাহা পরিয়া থাকেন, যাহার প্রভাব কেবল নারীসমাজে নহে, পুরুষসমাজেও (বিশেষতঃ দেশ-বিদেশের সৈনিক-সম্প্রদায়ে) বিপুল ভাবে সংক্রামিত হইয়াছে—সেই উল্কি-পরার কৌশলও এই কলারই অন্তর্ভুক্ত—ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে। আর কোন কোন পায়ে আলতা-পরানকেও কথঞ্চিৎ ইহার মধ্যে ফেলা চলিতে পারে। তবে আমাদের মতে উহাকে অঙ্গরাগের মধ্যেই ধরা সঙ্গত।

এইবার এই প্রসঙ্গে আধুনিক ব্যাখ্যাতৃগণকে কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমাদের উক্তির সমর্থন-কল্পে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

স্বর্গত পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ইহার পরিচয়-প্রদান-কল্পে বলিয়াছেন—"পূর্ব্বকালে এ দেশের নর-নারীগণ চন্দন ও কুঙ্কমাদি দ্বারা শরীর চিত্রিত করিত। এই চিত্র-রচনার (অলকা তিলকা প্রভৃতি) কৌশল-বিশেষকে 'বিশেষকচ্ছেদ্য' বলিত। ইহা মালীর মেয়ে ও নাপ্তেনী প্রভৃতির জীবিকা ছিল। এক্ষণে লোক সভ্য হইয়াছে বলিয়া অলকা-তিলকা পরে না ও কাজে কাজেই উহা এক্ষণে জীবিকা-পদবাচ্য নহে। কেবল নাপ্তেনীরা কখন কখন আলতা পরাইয়া দুই এক পয়সা পায় মাত্র। বিশেষকচ্ছেদ্য কি, তাহা বুঝাইবার জন্য এক্ষণে একটি মাত্র নিদর্শন পাওয়া যায়। কলিকাতার ও কাশীর গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া লোকে উড়ে ও হিন্দুস্থানী ঘাটওয়ালার নিকট যে চন্দনের ছাপা পরিয়া আইসে, তাহাই পূর্ব্বকালের বিশেষক-চ্ছেদ্যের অপভ্রংশ বা অনুকরণ"।২

পণ্ডিতপ্রবর ৺পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার কামসূত্রের সংস্করণে বলিয়াছেন—"বিশেষক ললাটের তিলক,—ভূর্জ্জপত্র কাটিয়া তিলক রচনার প্রথা ছিল ;—কেবল ভূর্জ্জপত্র নহে—আরও উপকরণ ছিল, কিছুদিন পূর্ব্বে কাচপোকার টিপকাটা এই সহর অঞ্চলেও ছিল। ললাটের তিলক প্রধান বলিয়া তাহার নামই এখানে আছে ; ফলতঃ এই যে কলা, ইহার ব্যাপক নাম 'পত্রচ্ছেদ্য'। কেবল ললাটে নহে—কপোলে ও স্তন প্রভৃতিতেও এই পত্রচ্ছেদ্য রচিত হইত। পত্রবৎ আকৃতিযুক্ত কুঙ্কুমাদি অঙ্কিত তিলকও পত্রচ্ছেদ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এই শিল্প তখন অত্যন্ত উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ কলাকুশল বৎসরাজ এই তিলক-রচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন"।৩

৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় লিখিয়াছেন—"চন্দন ও কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্বারা শরীর চিত্রিত করিবার ব্যবসা-বিশেষ"।৪

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন—"বিশেষকচ্ছেদ্য বোধ হয় অলকা তিলকা প্রভৃতি দেওয়ার কার্য্য"।৫

বৎসরাজ উদয়ন এই বিশেষকচ্ছেদ্য-রচনায় সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে দৃষ্ট হয় যে—কুমার উদয়ন বাল্যকালে এক ব্যাধের হস্ত হইতে বাসুকির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাগরাজ বসু-নেমিকে রক্ষা করায় তিনি প্রীত হইয়া কুমারকে ঘোষবতী বীণা প্রদান করেন ও তাম্বূল-রচনার কৌশল ও অম্লান মালা তিলক-যুক্তির কৌশল শিখাইয়া দেন।৬ বহুদিন পরে উদয়ন যখন বাসবদত্তাকে লাবাণকে অগ্নিদাহে দগ্ধা স্থির করিয়া পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন, তখন বিবাহকালে পদ্মাবতীর ললাটে অম্লান তিলক ও গলদেশে অম্লান-মালা দেখিয়া সন্দেহ করেন যে, বাসবদত্তা সত্যই অগ্নিদগ্ধা হন নাই, কারণ ঐরূপ মালা-তিলক-রচনার কৌশল একমাত্র তিনি জানিতেন ও তাঁহার

২। শিল্প—"বার্ত্তাশাস্ত্র বা জীবিকাতত্ত্ব"—৺কালীবর বেদান্তবাগীশ মহোদয়-কর্তৃক লিখিত—শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, প্রথম খণ্ড, ১১৯২ সাল, পৃঃ ৬।

৩। কামসূত্র, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৬৩-৬৪।

৪। ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত কল্কিপুরাণ, পৃঃ ২৫, পাদটীকা। সমাজপতি মহাশয় 'ছেদ্য' শব্দটির যৌগিক অর্থটি ধরিতে পারেন নাই। ভূর্জ্জাদি পত্র নানা আকারে ছেদিত হইত বলিয়াই ইহার নাম 'পত্রচ্ছেদ্য'—ইহাই এই শব্দটির মুখ্যার্থ। চন্দন-কুঙ্কুমাদি দ্বারা তিলক অঙ্কন ইহা গৌণার্থ।

৫। কৌমুদী, পৃঃ ২৭ 'বোধ হয়' বলিবার কোন সার্থকতা নাই। বিশেষকচ্ছেদ্য আর অলকা-তিলকা একই।

৬। "বসুনেমিরিতি খ্যাতো জ্যেষ্ঠো ভ্রতাস্মি বাসুকেঃ। ইমাং বীণাং গৃহাণ ত্বং......তাম্বূলীশ্চ সহাম্লান-মালাতিলকযুক্তিভিঃ ॥—কথাসরিৎসাগর, কথামুখ-লম্বক, প্রথম তরঙ্গ, ৮০-৮১ ; নির্ণয়সাগর সং, পৃঃ ২৬। ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতে বর্ণিত আছে যে, নাগটির নাম কিন্নর ; তিনি নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। তিনি নিজ ভগিনী ললিতার সহিত উদয়নের বিবাহ দেন ও ঘোষবতী বীণা ও অম্লান মালা উপহার দিয়াছিলেন। তিলকের উল্লেখ এ স্থলে নাই।

"স কিন্নরাভিধো নাগো ধৃতরাষ্ট্রসুতঃ......
ভগিনীং ললিতাভিখ্যাং দদাবুদয়নায় সঃ ·...
তাম্বূলীস্রজম্লানাং বীণাং ঘোষবতীমপি ॥ ৫৭-৮০

বৃহৎকথামঞ্জরী, কথামুখলম্বক, প্রথমগুচ্ছ।

প্রথমা পত্নী বাসবদত্তা তাঁহার নিকট উহা শিখিয়াছিলেন— অপর কাহারও পক্ষে উহা জানার সম্ভাবনা ছিল না ৭।

বিশেষকচ্ছেদ্য, পত্রভঙ্গ, পত্রবল্লরী, পত্রলেখা, তিলক ইত্যাদির বর্ণনায় সমগ্র সংস্কৃত-কাব্য-সাহিত্য বিশেষভাবে মুখর। তিলকাঙ্কিত স্বেদবিন্দু-নিচিত যুবতী-মুখ-পদ্ম সংস্কৃত কবিগণের একটি অতি প্রিয় বর্ণনার বিষয়। পাদটীকায় কয়েকটী বিশেষ স্থল উদ্ধৃত হইল ৮।

৭। "তস্যাশ্চ মালাতিলকৌ দিব্যাবালোক্য তৌ নিজৌ ।...রাজা পদ্মাবতীং রহঃ। পপ্রচ্ছ মালাতিলকৌ কেনেমৌ তে কৃতাবিতি"॥

১৮—:০১

(কথাসরিৎসাগর, লাবাণক-লম্বক, দ্বিতীয় তরঙ্গ)

'অবন্তিকাবিরচিতাং তিলকং মালিকাং তথা।
অম্লানাং বীক্ষ্য ভূপালো বর্ণয়িত্বা ধৃতিং যযৌ॥
কথং জীবতি মে দেবী নাস্তা বেত্তি তয়া বিনা।
মালিকাং তিলকং চেদমিতি ধ্যাত্বা জহর্ষ সঃ॥ ৯৮-৯৯

৮ ১। "বিরচিতা মধুনোপবনশ্রিয়ামভিনবা ইব পত্রবিশেষকাঃ"— (রঘুবংশ, ৯।২৯) কুরবক-কুসুমবিকাশ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ঋতুরাজ বসন্ত উপবনলক্ষ্মীর পত্রলেখা রচনা করিয়া দিয়াছেন।

২। "স্বেদোদ্গমঃ কিম্পুরুষাঙ্গনানাং
চক্রে পদং পত্রবিশেষকেষু।" (কুমারসম্ভব ৩।৩৩)

কিম্পুরুষ-রমণীগণের পত্রলেখায় স্বেদোদ্গম দেখা দিল।

৩। "বিশেষকো বা বিশিশেষ যস্যাঃ
শ্রিয়ং ত্রিলোকীতিলকঃ স এব।" (শিশুপালবধ ৩।৬৩)

বধূর ললাটস্থ তিলকের ন্যায় ত্রিলোকভূষণ হরি সেই নগরীর শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

৪। 'মৃষ্টচন্দনবিশেষকভক্তিঃ" (শিশুপালবধ ১০।৮৪) সম্ভোগ দ্বারা চন্দন-তিলক-রচনা মর্দ্দিত।

৫। 'কৃতত্র কালাগুরুদত্তপত্রা" (রঘু ১৩।৫৫) কৃষ্ণাগুরু-রচিত পত্রলেখার ন্যায়।

৬। "রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ কপোলয়োঃ" (গীতগোবিন্দ ১২) — কুচযুগে ও কপোলযুগলে পত্র রচনা কর।

৭। 'কস্তূরীবরপত্রভঙ্গনিকরো মৃষ্টো ন গণ্ডস্থলে" (শৃঙ্গারতিলক ৭) — গণ্ডস্থলে কস্তূরী রচিত-পত্রভঙ্গসমূহ মর্দ্দিত হয় নাই (কাদম্বরীতেও 'পত্রভঙ্গ' বহুস্থলে বর্ণিত হইয়াছে)।

৮। "চকার বাণৈরসুরাঙ্গনানাং গণ্ডস্থলীঃ প্রোষিতপত্রলেখাঃ"— রঘু (৬।৭২) শরনিকরে অসুরাঙ্গনাদিগের গণ্ডস্থলের পত্রলেখা বিদূরিত করিয়াছিলেন।

৯। "উদ্‌বদ্ধকেশশ্চ্যুতপত্রলেখঃ" (রঘু ১৬।৬৭) কেশপাশ বন্ধনমুক্ত ও পত্ররচনা বিচ্যুত হইয়া উঠিয়াছে।

১০। "ভুজে শচীপত্রবিশেষকাঙ্কিতে" (রঘু ৩।৫৫) শচীর পত্রলেখাঙ্কিত মুখমণ্ডলের ঘর্ষণে ইন্দ্রের যে বাহু চন্দনাদির রেখাভূষিত।

১১। "কস্যাশ্চিন্মুখমনু ধৌতপত্রলেখম্" (শিশুপালবধ ৮।৫৬) কোন অঙ্গনার মুখে পত্রাবলী ধৌত হইয়া গিয়াছে।

১২। "গণ্ডেষু স্ফুটরচনাজপত্রবল্লী" (শিশুপালবধ ৮।৫৯) বধূগণের গণ্ডদেশে পত্রলেখার ন্যায় পদ্মপত্র পরিস্ফুটভাবে বিন্যস্ত হইয়াছিল।

১৩। "মুখে মধুশ্রী স্তিলকং প্রকাশ্য" (কুমারসম্ভব ৩।৩০) বসন্তলক্ষ্মী তিলকপুষ্পরূপ তিলক মুখমণ্ডলে প্রকটিত করিলেন।

১৪। "কস্তূরিকাতিলকমালি বিধায় সায়ম্" (ভামিনী-বিলাস ২৪) সখি! সন্ধ্যায় কস্তূরীতিলক রচনা করিয়াছিলে।

১৫। "চারু নৃত্যবিগমে চ তন্মুখং স্বেদভিন্নতিলকং পরিশ্রমাৎ" (রঘু ১৯।১৫) নৃত্যাবসানে পরিশ্রমবশতঃ বিগলিত স্বেদধারায় নর্ত্তকীগণের তিলক বিলুলিত হইয়া যাইত।

১৬। "কস্তূরীতিলকং ললাটফলকে
বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভম্" (শ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ)

ললাটফলকে কস্তূরীতিলক ও বক্ষে কৌস্তুভ মণি বিরাজমান।

কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হইল। এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত সংস্কৃত-কাব্য-সাহিত্যের পত্রে পত্রে ছড়ান রহিয়াছে। সে সকলের সঙ্কলনে প্রবন্ধ অযথা ভারাক্রান্ত করায় কোন লাভ নাই।

[ক্রমশঃ

পদ্মার পারে একটি গাই

শ্রীরাইচরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি-টি, বিদ্যাবিনোদ

অকূল পদ্মার পার—সন্ধ্যার কুলায়
রবি ডুবে যায় যায়, চেয়ে আছে গাই;
তৃষা মিটিয়াছে তার, জল নাহি খায়
কত কি বলিতে যেন রহিয়াছে তাই!
কেহ নাহি কাছে—গৃহগুলি অতি দূর,
মনে মনে বলিলাম এ যেন কেমন!
দিন যায়, রাত্রি আসে তবু নিদ্রা ঘোর,
দাঁড়াইয়া আছে গাই পারেতে তেমন।

জীবন্ত ছবির মত কহিতেছে কথা
শুনি তার মর্ম্মবাণী পেতে থাকি কাণ—
দূর হ'তে জানি হায় কত তার ব্যথা
অশ্রু উপহার দিয়ে জুড়ায় পরাণ।
অনন্ত স্রোতের সাথে সে যে বাক্যহারা,
জানে তার কল্লোলের তৃষাহীন ধারা।

শিশু-সংসদ

উদয়ন-কথা

প্রিয়দর্শী

(গোড়ার কাহিনী : তৃতীয় পর্ব্ব)

নড়াগিরি খেপ্‌বার দিন তিন চার পরে * একদিন উদয়ন সঙ্গীতশালায় রাজকুমারীকে বীণা-শিক্ষা দিচ্ছেন, এমন সময় তাঁর মনে হ'ল তাঁর সাম্‌নে যেন কার ছায়া এসে পড়েছে। মুখ তুলে তাকাতেই দেখেন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সাম্‌নে দাঁড়িয়ে—মুখে আঙ্গুল দিয়ে ইসারায় বৎসরাজকে কথা কইতে বারণ করছেন। বৎসরাজ বুঝ্‌লেন যে, মন্ত্রী এসেছেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হ'য়ে—তখন কথা কইলে তাঁর মতলব ফেঁসে যাবে। তাই তিনিও একটু হেসে রাজকুমারীকে বল্‌লেন—"ভদ্রে! আজ এই পর্য্যন্ত থাক। আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।" রাজকুমারী তাই শুনে বল্‌লেন—"আচ্ছা, এ বেলা আমি যাই। আপনি যদি সুস্থ থাকেন, ও বেলা সংবাদ পাঠাবেন—তা হ'লে আমি আস্‌ব। আর যদি বেশী অসুস্থ মনে করেন ত বলুন, আমি গিয়ে রাজবৈদ্যকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" উদয়ন তাড়াতাড়ি বল্‌লেন—"না, সে রকম কিছু নয়, একটু ক্লান্ত বোধ করছি—একটু বিশ্রাম করলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

রাজকুমারী চ'লে যাবার পর মন্ত্রী ম'শায় আস্তে আস্তে বৎসরাজের সাম্‌নে প্রকট হ'লেন। ততক্ষণে বিদূষকও সেখানে এসে জুটেছেন। যৌগন্ধরায়ণ বল্‌লেন—"দেব! আমি বসন্তকের কাছে আপনার বক্তব্য সব শুনেছি। আমার প্রতিজ্ঞার কথাও আপনি নিশ্চয়ই তার মুখে শুনেছেন। আজ আমি নিজে এলুম—কি উপায়ে খুব শীগ্‌গির আপনাকে ও রাজকুমারীকে নিয়ে এখান থেকে পালাতে পারি, তার একটা মুখোমুখি পরামর্শ করতে।"

উদয়ন খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—"মন্ত্রিবর! কি স্থির করলেন?—কবে কি ভাবে পালাতে হবে।"

যৌগন্ধরায়ণ—"মহারাজ! প্রদ্যোত আপনার পায়ের বেড়ী খুলে দিলেও আপনাকে বন্ধন থেকে একেবারে মুক্তি দেন নি। আপনি জান্‌তে পারছেন না বটে, কিন্তু একদল প্রহরী খুব দূরে থেকে আপনার অলক্ষ্যে আপনার উপর সদা সর্ব্বদা নজর রেখেছে। আপনি যে ভাব্‌ছেন এখন খুব সহজে পালাতে পারবেন—তা হবে না। আপনাকে এই বাড়ীর পিছনের কপাট নিঃশব্দে ভেঙ্গে বাইরে বেরুতে হবে। সে কপাট লোহার শিকলে আঁটা। কিন্তু আপনি ত লোহার শিকল ও পায়ের বেড়ী ভাঙ্গবার কৌশল জানেন। এ কাজ আপনার পক্ষে কঠিন হবে না। তারপর খিড়কীর বাগান। বাগানের শেষ সীমায় পাঁচিল। ঐ পাঁচিল ডিঙাবার কৌশলও আপনাকে শিখিয়েছি—সে কাজও আপনার কঠিন হবে না। প্রদ্যোতের প্রহরীর দল সাম্‌নের দিকে বেশী আছে—পিছনে খুব কম—দু' চারজন মাত্র। তাদের কেউ আপনাকে বাধা দিতে এলে দু'চার জনের মোহাড়া নেওয়া আপনার একার পক্ষে কিছু কঠিন হবে না। প্রদ্যোত আপনাকে কেন এতটা আঁট-ঘাট বেঁধে আটকে রেখেছেন—এর কারণ আপনি নিশ্চয় জানেন। আপনি একবার তাঁর মেয়েটিকে বিবাহ করবার সম্মতি দিলেই তিনি পরম সমাদরে আপনাকে মুক্তি দেবেন। তবে

* নড়াগিরির খেপে যাওয়ার ঘটনার কোন উল্লেখ 'কথাসরিৎ-সাগরে' বা 'বৃহৎকথামঞ্জরীতে নেই। এর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়—ভাসের 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণে।'

তাঁর জেদ যে তিনি যেচে মেয়ে দেবেন না। আর মহারাজ! আমাদেরও ত বরাবরের সঙ্কল্প আমাদের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রার্থনা করা হবে না। কাজেই আপনি যা ঠিক করেছেন—আমারও তাই মত। প্রদ্যোতের চোখে ধুলো দিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে পালাতে হবে। আপনার একা পালান কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন কাজ। মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোন দিন বাসবদত্তার সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় এটুকু বুঝতে পেরেছেন কি যে, তিনি বাপ-মা'কে ছেড়ে, এমন কি তাঁদের ঘুণাক্ষরে কোন কথা না জানিয়ে চুপি চুপি আপনার সঙ্গে পালাতে রাজি আছেন?"

উদয়ন—"মন্ত্রিবর! তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হ'য়েই আছে। তিনি ত আমার সঙ্গে এখনই পালাতে রাজি! আর তাতে তাঁর মা রাণী অঙ্গারবতীরও মত আছে। তিনি নাকি মেয়েকে বলেছেন যে, যদি আমি রাজকন্যাকে নিয়ে পালাতে পারি, তাতে তিনি এতটুকু দুঃখিত হবে না। বরং তাতে তাঁরও মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে, আর আমারও সম্মান বজায় থাক্‌বে—এইভাবে দু'দিক্ রক্ষা হবে ব'লে তিনি খুব সুখীই হবেন। অবশ্য প্রদ্যোত এতে একটু চট্‌তে পারেন। কিন্তু রাণী তাঁকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবার ভার নিয়েছেন—আর আমাদের পালাতে খুবই উৎসাহ দিচ্ছেন।"

যৌগন্ধরায়ণ—"মহারাজ! এ অতি সুসংবাদ! এবার মনে করতে পারেন যে আপনি মুক্ত। এবার বাকী ফন্দীটা আপনার কাছে জানিয়ে রাখি, শুনুন। রাজকুমারী বাসবদত্তার একটি খুব ভাল মাদী হাতী আছে। তার নাম ভদ্রবতী। তার মত জোরে ছুটতে পারে—এক নড়াগিরি ছাড়া—এমন হাতী প্রদ্যোতের গজশালায় নেই। আবার নড়াগিরি ভদ্রবতীকে একটু স্নেহের চোখে দেখে—এজন্য ভদ্রবতীর কোন অনিষ্ট সে করবে না—এ কথা নিশ্চিত। আমি তার মাহুত আষাঢ়ককে অনেক সোনার গহনা ঘুষ দিয়েছি। সে আমরা যা বল্‌ব তাই করতে রাজি। তবু যদি সে বিগড়ে যায় এই ভয়ে এখানে যে মহাপাত্র ছিল, তার অনুমতি নিয়ে আমার একজন বিশ্বাসী চরকে ভদ্রবতীর মাহুত ক'রে দিয়েছি। সে গাত্রসেবক নাম নিয়ে ভদ্রবতীর সেবা করছে।* সে সর্ব্বদা আষাঢ়ককে সেবা করছে যাতে সে কার্য্যকালে না বেঁকে বসে। তার উপর আরও একটা কাজের ভার আছে। পালাবার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকে সে মহামাত্রকে মদ খাইয়ে বেহুঁস ক'রে রাখ্‌বে। নড়াগিরি যখন খেপেছিল তখনও মহামাত্রকে এই ভাবে নেশায় চুর ক'রে রাখা হয়েছিল। নইলে এই মহামাত্র লোকটা গজশাস্ত্রে এমনই পণ্ডিত যে সে যে কোন হাতীর ভাব-ভঙ্গী দেখলেই বুঝ্‌তে পারে—হাতীটাকে দিয়ে কেউ কোন খারাপ কাজ করাবার চেষ্টা করছে কি না। কিন্তু লোকটার এক দোষ—ভয়ানক মাতাল। কাজেই খুব সহজে তার চোখে ধুলো দেওয়া যাবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজকুমারী তাঁর একজন সখী সঙ্গে সরোবরে জলক্রীড়া করবার ছলে সন্ধ্যার সময় যখন সঙ্গীতশালার পিছনের রাস্তা দিয়ে এগুতে থাক্‌বেন, ঠিক সেই সময় পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে বসন্তক ঢাক বাজিয়ে আপনাকে ইসারায় ব্যাপারটা জানাবে। বসন্তকের ঢাকের শব্দ শুনে শুনে সহরের লোকের এমন অভ্যাস হ'য়ে গেছে, যে প্রহরীরা তাতে কানও দেবে না। এই সুযোগে সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনি সঙ্গীতশালার পিছন দিক্‌কার কপাট ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়বেন। আপনার হাতে থাক্‌বে ঘোষবতী বীণা। বীণার শব্দ শুন্‌লেই ভদ্রবতী হাঁটু গেড়ে ব'সে থাক্‌বে, নড়বে না। এই অবসরে আপনি পাঁচিল টপ্‌কে বসন্তককে সঙ্গে নিয়ে ভদ্রবতীকে হাঁকিয়ে দেবেন। তখন যদি প্রহরীরা তেড়ে আসে, আমার লোকজন ছদ্মবেশে আশেপাশেই থাক্‌বে। তারা তাদের বাধা দেবে। আপনি সোজা হাতী ছুটিয়ে আপনার ব্যাধরাজ পুলিন্দকের রাজ্যে গিয়ে উঠ্‌বেন। সেখান থেকে কিছু সেনা সঙ্গে নিয়ে একেবারে কৌশাম্বীতে হাজির হবেন। যদি প্রদ্যোতের কোন ছেলে নড়াগিরিকে চালিয়ে আপনাদের ধরতে যায়,

* 'কথা সরিৎসাগর' ও 'বৃহৎকথামঞ্জরী'তে কেবল আষাঢ়কের কথা আছে। আর গাত্র সেবকের নাম পাওয়া যায় ভাসের 'প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণে'।

কোন ভয় নেই ; কারণ, ভদ্রবতীর সম্বন্ধে নড়াগিরির একটু দুর্ব্বলতা আছে। সে কিছুতেই তেমন জোরে ছুটে গিয়ে ভদ্রবতীকে আক্রমণ করবে না। আর তা ছাড়া পিছনে ত আমরা আছি। সেনাপতি রুমণ্বান্, তাঁর বাছাই করা সৈন্যেরা, আমার চরেরা, আমি—আমরা সবাই ত ছদ্মবেশে প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছি। আমাদের এড়িয়ে যাওয়া খুব সোজা কাজ হবে না।"

এইভাবে মহারাজ উদয়নের পালাবার কৌশলটি বর্ণনা ক'রে যৌগন্ধরায়ণ থাম্‌লেন। মহারাজ উদয়ন সানন্দে বলে উঠলেন—"মন্ত্রিবর! ধন্য আমি যে তোমার মত বুদ্ধিমান্ ও প্রভুভক্ত মন্ত্রী পেয়েছিলাম! আর বসন্তক ত আমার দ্বিতীয় প্রাণ—সেনাপতি রুমণ্বান্ আমার রক্ষা-কবচ! আর আপনার সেনারা—তাদের কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব, কথা খুঁজে পাচ্ছি না"।

যৌগন্ধরায়ণ বল্‌লেন, "মহারাজ! এখন আসি তা হ'লে। হয়ত এই শেষ দেখা! আপনি নিশ্চয়ই নির্ব্বিঘ্নে কৌশাম্বী পৌঁছাবেন। কিন্তু প্রদ্যোতের সেনাদের হাতে আমার প্রাণও যেতে পারে।"

রাজা, মন্ত্রী, বিদূষক—সকলেরই চোখে জল, মুখে হাসি। হাসি-কান্নার ভিতর দিয়ে পরস্পর আলিঙ্গন ক'রে তাঁরা বিদায় নিলেন।

এই ঘটনার দু'দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় রাজবাড়ীর রাণীর খাসমহলের একজন চাকর হাতীশালায় এসে গাত্রসেবকের খোঁজ করতে লাগ্‌ল। খানিক বাদে দেখে গাত্রসেবক আর মহামাত্র দুজনেই মদ খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে আস্‌ছে। রাজবাড়ীর চাকর গাত্রসেবককে একটু গরম মেজাজে জিজ্ঞাসা করলে, "রাজকুমারী সরোবরে যাবেন জলকেলি করতে। তাঁর হাতী ভদ্রবতী কোথায়? শীগ্‌গির নিয়ে চল। এতক্ষণ ছিলে কোথায়?" গাত্রসেবক জড়ান গলায় উত্তর দিল, "ছিলাম আর কোথায়? কণ্ডিল শুঁড়িনীর দোকানে আমার প্রভু মহামাত্র আর আমি একটু কারণ করছিলুম। তাতে তোমার কি হ্যা!" রাজবাড়ীর চাকর ফের বল্‌লে, "মহামাত্র ত দেখছি একেবারে বেহুঁস্। তুমি তবু এখনও খাড়া আছ। ভদ্রবতী কৈ?" গাত্রসেবক—"ভদ্রবতীকে চালাব কি ক'রে? তার অঙ্কুশ বাঁধা দিয়ে কারণ করেছি।" রাজবাড়ীর চাকর—"অঙ্কুশে কি হবে! ভদ্রবতী খুব ঠাণ্ডা হাতী, বিনা অঙ্কুশেই চল্‌বে।" গাত্রসেবক—"তারপর তার গলার অর্দ্ধচন্দ্র মালাও বাঁধা পড়েছে।" রাজবাড়ীর চাকর—"কি জ্বালা। ভদ্রবতীকে কি অর্দ্ধচন্দ্রমালা দিয়ে বাঁধ্‌তে হয়? ও এতই লক্ষ্মী হাতী যে ফুলের মালা দিয়েও ওকে বেঁধে রাখা যায়।" গাত্রসেবক—"ঘণ্টাও বাঁধা দিয়েছি।" রাজবাড়ীর চাকর—"কি গর্দ্দভ! শুন্‌ছ—যাচ্ছে হাতী জলক্রীড়া করতে। ঘণ্টায় কি হবে?" গাত্রসেবক—"তবে শোন আসল কথা! ভদ্রবতীকেই বাঁধা দিয়ে আমরা দু'জনে মদ খেয়েছি"। রাজবাড়ীর চাকর এ কথায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বল্‌লে—"বেশ করেছ! কি শাস্তি তোমাদের হয়, তা শীগ্‌গিরই দেখ্‌তে পাবে। আর কণ্ডিল শৌণ্ডিকীরই বা কি আক্কেল!—যে রাজকুমারীর হাতী বাঁধা রাখে! দাঁড়াও, সব একধার থেকে মজা দেখাচ্ছি একবার। যাই এবার রাণীমা'র কাছে!"

গাত্রসেবক তখন যেন একটু ভয় পেয়েছে এই ভাব দেখিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"তা ভাই! আমার এতে বিশেষ কোন দোষ নেই! আমি কণ্ডিল শুঁড়িনীকে এত ক'রে বল্‌লুম, 'দেখ! মূলটি নষ্ট কোরো না'। তা সে তা শুন্‌বে কেন? আর আমার প্রভু মহামাত্র এত মদ খেলেন যে তার দামে এত বড় জলজ্যান্ত হাতীটা বিকিয়ে গেল।"

এই সময় একটা হৈ হৈ শব্দ শোনা গেল রাজপথে। রাজবাড়ীর চাকর ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বল্‌লে, "ও কিসের শব্দ!" গাত্রসেবক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, "বুঝেছি, বুঝেছি। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! কণ্ডিল শুঁড়িনীর ঘর ভেঙে ভদ্রবতী নিশ্চয় পালাচ্ছে। ও তারই শব্দ।" রাজবাড়ীর চাকর—"না, না, তা নয়। ঐ যে সব লোক বল্‌ছে—'বৎসরাজ রাজকুমারী বাসবদত্তাকে সঙ্গে নিয়ে ভদ্রবতীর পিঠে চ'ড়ে পালিয়ে গেছেন। ব্যাপার কি! যাই দেখি গে।"

গাত্রসেবক—"জয় মহারাজের জয়! ওঃ! এতক্ষণে আমি দায়মুক্ত—নিশ্চিন্ত হলুম।"

ঠিক এই সময় মহামাত্র মেঝেয় গড়াতে গড়াতে জড়ান গলায় ব'লে উঠ্‌ল—"বাঃ! আমি যে বেশ শুন্‌তে পাচ্ছি, ভদ্রবতী চীৎকার ক'রে বল্‌ছে আজ রাত্রেই সে তেষট্টি যোজন পথ যাবে!"

রাজবাড়ীর চাকর—"নাঃ! জ্বালালে এই দুটো মাতালে মিলে!"

গাত্রসেবক—"বন্ধু! মাতাল তোমাদের এই মহামাত্র। আমি মাতাল নই। আমি কে শুনবে। আমি বৎসরাজ উদয়নের একজন ভৃত্য। এতদিন মাহুতের কাজে এখানে ছিলুম তাঁর পালাবার সুবিধা ক'রে দিতে। আজ আমার সে বাসনা সফল হয়েছে। যাও, বন্ধু! তোমাদের রাজবাড়ীতে এ কথা জানাও গিয়ে!"

রাজবাড়ীর চাকরটা প্রথমে খানিক বিস্ময়ে হতভম্ব হ'য়ে থেকে তারপর রাজবাড়ীর দিকে ছুট দিলে।

গাত্রসেবক—"ও কিসের গোলমাল! যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে বোধ হয়! এ কি প্রদ্যোতের সেনারা এত জয়ধ্বনি করে কেন! তবে কি মহারাজ ধরা পড়লেন না কি!"

সেই দিকে দু'জন লোক বলাবলি করতে করতে 'হাঁ, একেই বলে বীরত্ব! আমরা জান্‌তাম মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বুদ্ধিতে বৃহস্পতি! কিন্তু তিনি যে বীরত্বে অর্জ্জুনের সমান, তা জান্‌তুম না। এক অক্ষৌহিণী সেনার মোহাড়া একলা নিয়েছিলেন! তিনি এই বাধা না দিলে বৎসরাজের কি সাধ্য ছিল, পালিয়ে পার পান! একলা তরোয়াল হাতে এক অক্ষৌহিণীকে দু'দণ্ড আট্‌কে রেখেছিলেন। শেষে বিজয়সুন্দর নামে হাতীটার দাঁতে লেগে তাঁর তরোয়াল ভেঙ্গে গেল, তাই ত তিনি ধরা পড়লেন।

গাত্রসেবক—"কি সর্ব্বনাশ! এ যে হরিষে বিষাদ! প্রভুর বিপদ্‌! যাই তাঁর পাশে থাক্‌বার চেষ্টা করি গে!"

*

ওদিকে যৌগন্ধরায়ণ যেমন ফন্দী এঁটেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই কাজ ঠিক ঠিক করা হয়েছিল। সন্ধ্যার মুখেই গাত্রসেবক আর আষাঢ়ক দু'জনে মিলে ভদ্রবতীকে সাজিয়ে গুজিয়ে বার করতে যাবে—এমন সময় মহামাত্র বল্‌লেন—"এ অসময়ে হাতী নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?" গাত্রসেবক উত্তর দিলে, "রাজকুমারী জলকেলি করতে যাবেন কি না, তাই হাতী নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে।" মহামাত্র এর আগেই কিছু নেশা করেছিলেন, তবে নেশাটা তখনও তেমন জমে নি, তখনও তাঁর জ্ঞান ছিল কিছু কিছু। তিনি বল্‌লেন—"ভদ্রবতী যেন বল্‌ছে—আজ রাতে আমি তেষট্টি যোজন পথ যাব—এর মানে কি?" গাত্রসেবক দেখ্‌লে বড়ই বিপদ্‌! মহামাত্র যদি বাগড়া দেয় তবে হাতী নিয়ে পালান দায় হবে। আর মহামাত্রর কথায় যদি অন্য মাহুতেরা একটু সাবধান হ'য়ে হাতীর গতিবিধির উপর নজর রাখে, তা হ'লেও মহা মুস্কিল—সব ফিকির ভিস্‌তে যাবে। মহামাত্রের কথা শুনে এরই মধ্যে অন্য হাতীর মাহুতরা বেশ একটু কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছিল। তারা সবাই জান্‌ত যে মহামাত্র হাতীদের ভাষা বুঝ্‌তে পারে। তাই ভদ্রবতী কি বল্‌ছিল তা শোন্‌বার জন্যে তারা এসে মহামাত্রের চারদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল। গাত্রসেবক দেখলে বেগতিক! মহামাত্র আর দু'চারটে কথা বল্‌লেই আর বেরোন যাবে না। তাই সে মহামাত্রকে বল্‌লে, "প্রভু! চলুন, আপনাকে যে ভদ্রবতীর সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে, নইলে সন্ধ্যার সময় কি হাতী একলা ছেড়ে দেওয়া যায়!" মহামাত্র বল্‌লে—"আচ্ছা! সে ভাল কথা। কিন্তু বড় তেষ্টা পাচ্ছে যে।" গাত্রসেবক তাড়াতাড়ি কথা চাপা দিলে,—"শীগ্‌গির চলুন, পথে আপনাকে ঠাণ্ডা সরবৎ খাওয়াব।" মহামাত্রের নেশা তখন জম্‌তে সুরু হয়েছে। সে চুপি চুপি বল্‌লে—"গাত্রসেবক, আষাঢ়ককে হাতী নিয়ে এগুতে বল। তুমি আর আমি চল পিছু পিছু হেঁটে যাই। পথে কণ্ডিল শুঁড়িনীর দোকানে একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাবে'খন, কি বল?" গাত্রসেবক ত এই সুযোগই চাইছিল। একবার মহামাত্রকে কণ্ডিল শুঁড়িনীর দোকানে ঢোকাতে পারলে আর তাঁকে উঠ্‌তে হবে না। সে অন্য মাহুতদের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আরে! আজকে প্রভু যে সব কথা বল্‌ছেন, তা' কি আর সত্যি ব'লে ধরতে আছে! দেখছ না ওঁর পা টল্‌ছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। আজ কি উনি আর ধাতে

আছেন যে হাতীর কথা বুঝ্‌তে পারবেন। আজ মানুষের কথাই ওঁর কাণে পৌছুচ্চে না, দেখ্‌ছ ত।" মাহুতরা দেখ্‌লে, ব্যাপারটা সত্যই তাই। তাই মাতালের প্রলাপ ভেবে তারা আর মহামাত্রের কথায় কোন বিশ্বাস না ক'রে যে যার কাজে চলে গেল।

এদিকে ঠিক যেমন কৌশল করা হয়েছিল, সেই অনুসারে আষাঢ়ক রাজকুমারী বাসবদত্তা ও তাঁর সমবয়সী প্রধান সখী কাঞ্চনমালাকে নিয়ে সঙ্গীতশালার খিড়কীতে হাজির হলেন। সেখানে বিদূষকের ঢাকের আওয়াজ পেয়ে উদয়ন ঘোষবতী বীণা হাতে কপাট ভেঙে পাঁচিল ডিঙিয়ে বেরিয়ে এলেন। পরে বিদূষককে সঙ্গে নিয়ে হাতীতে উঠে মারলেন ছুট্। সে দিকের প্রহরীরা কিছুই জান্‌তে পারলে না। আর ওদিকে মহামাত্র শুঁড়িনীর দোকানে খুব নেশা ক'রে গাত্রসেবকের সঙ্গে হাতীশালায় ফিরে আসবার সময় যে ঘটনা ঘটেছিল তা আগেই বলা হয়েছে।

বৎসরাজ, বাসবদত্তা, কাঞ্চনমালা, বসন্তক আর মাহুত আষাঢ়ক—এই পাঁচজনে যখন ভদ্রবতীর পিঠে চ'ড়ে যাত্রা করলেন, তখন অন্ধকারে কেউ তাঁদের পালান প্রথম বুঝে উঠ্‌তে পারে নি। কিন্তু উজ্জয়িনীর প্রধান নগর-দ্বার ত সন্ধ্যার পর বন্ধ হ'য়ে যায়। আর তার দুপাশে সারারাত জেগে পাহারা দেয় অনেক সশস্ত্র প্রহরী। কাজেই নিরুপায় হ'য়ে আষাঢ়ক বৎসরাজের মুখের দিকে চেয়ে বললে, "মহারাজ! এতদূর ত আপনাদের নির্ব্বিঘ্নে নিয়ে এলুম। কিন্তু এবার ত ধরা পড়তে হবে। উজ্জয়িনী থেকে এখন বেরোই কি করে?"

উদয়ন হেসে উত্তর দিলেন, "কোন ভয় নেই, আষাঢ়ক! আমরা নগর-দ্বার দিয়ে বেরুব না। কোন এক জায়গা নির্জ্জন দেখে সেই ধারের পাঁচিল ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।" আষাঢ়ক [illegible] হাসি হেসে বল্‌লে—"মহারাজ! অসম্ভব কথা বল্‌ছেন। ভদ্রবতীর মত বিশটা হাতীতেও এ পাঁচিল ভাঙ্‌তে পারবে না।" বৎসরাজ বল্‌লেন—"আষাঢ়ক! তুমি শুধু দেখে যাও। আমি পাঁচিল ভাঙ্‌বার কৌশল জানি। পাঁচিলে আমি কাটু ধরিয়ে দেব। তখন ভদ্রাবতী ঠেলা মারলেই পাঁচিলের খানিকটা প'ড়ে যাবে।"

এই ব'লে যৌগন্ধরায়ণ তাঁকে পাঁচিল ভাঙ্‌বার যে উপায় শিখিয়েছিলেন সেই কৌশল উদয়ন প্রয়োগ করতেই পাঁচিল গেল ফেটে। কিন্তু পাঁচিলের গাঁথুনির মধ্যে আবার বড় বড় লোহার শিকল দিয়ে পাঁচিলকে মজবুত করা হ'য়েছে। সেই শিকলের জাল-বুনোনি ছিঁড়ে বাইরে বেরোন যায় কি ক'রে? উদয়ন হতাশ হলেন না। পায়ের বেড়ী, বাঁধনের শিকল ছেঁড়্‌বার কৌশলও তাঁর যৌগন্ধরায়ণের কাছে শেখা আছে। সেই কৌশলে মোটা মোটা শিকলগুলো সরু সূতোর মত পট্‌পট্ ক'রে ছিঁড়ে গেল। তখন আষাঢ়কের মুখে ফুটে উঠ্‌ল হাসি। সে সবেগে দিলে ভদ্রবতীকে চালিয়ে। ভদ্রবতীর মাথার এক ঠেলায় খোলা পাথরগুলো ধুপ্-ধাপ্ শব্দে প'ড়ে গেল। কিন্তু তাতে হ'ল আর এক বিপদ্! বীরবাহু আর তালভট নামে দুই সামন্ত রাজকুমার পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। তাঁরা এই পাঁচিল-ভাঙার শব্দে এলেন ছুটে। কিন্তু, উদয়ন আর এক মুহূর্ত্তও দেরী না ক'রে নিজের হাতের তরোয়াল চালিয়ে দু'জনেরই মাথা কেটে ফেল্‌লেন। কিন্তু মরবার ঠিক আগে তাঁরা দু'জনে যে চীৎকার করেছিলেন, তাতে উজ্জয়িনীর অন্যান্য প্রহরীরা সেখানে ছুটে আসে। এসে তারা দেখ্‌ল যে বৎসরাজ ততক্ষণে উজ্জয়িনীর গণ্ডী পেরিয়ে হাতী চ'ড়ে ছুটে পালাচ্ছেন। তাদের ডাক-হাঁকে প্রদ্যোতের সেনারা সব বেরিয়ে পড়ল। রুমণ্বান্ তাঁর ছদ্মবেশী সেনা নিয়ে ছিলেন নগরের মাঝে—কাজেই তিনি প্রদ্যোতের সেনাদের বাধা দিতে পারলেন না। কিন্তু যৌগন্ধরায়ণ নিজে এক মুহূর্ত্তও উদয়নকে চোখের আড়াল করেন নি। তিনি অন্যের অলক্ষিতে বরাবর বৎসরাজের পিছু পিছু আস্‌ছিলেন। এখন প্রদ্যোতের সেনারা তাঁর পিছনে ধাওয়া করছে দেখে তিনি আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না। সেই ভাঙা পাঁচিলের ওপরে দাঁড়িয়ে তরোয়াল হাতে একাই এক অক্ষৌহিণী শত্রু-সেনার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। প্রদ্যোতের দুই ছেলে

—পালক আর গোপাল—দুই হাতীতে চ'ড়ে লড়াই-এ এসেছিলেন। কিন্তু যৌগন্ধরায়ণ এমন কৌশলে এই সেনাদের আট্‌কাতে লাগ্‌লেন যে, তারা কিছুতেই সেই ভাঙ্গা পাঁচিল পেরিয়ে নগরীর বাইরে যেতে পারল না। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল—বাইরে যাবার ঐ একটি মাত্র পথ—যেখানে পাঁচিলটা ভাঙা। সেই মুখটা যৌগন্ধরায়ণ একাই এমন কৌশলে আট্‌কেছিলেন যে এক অক্ষৌহিণী সেনা তাঁর একার বীরত্বের কাছে হার মান্‌তে বাধ্য হ'ল। শেষে গোপালের হাতী বিজয়সুন্দর তার লম্বা দাঁতের আঘাত দিয়ে যৌগন্ধরায়ণের হাতের তরোয়ালখানা ভেঙে ফেল্‌লে। তখন যৌগন্ধরায়ণ হলেন বন্দী। কিন্তু দু'দণ্ড ধ'রে তিনি যেভাবে সেনাদের আটকে রেখেছিলেন তার সুযোগ পেয়ে বৎসরাজ ততক্ষণে বহু যোজন পথ চ'লে গিয়েছেন। তবু ছোট রাজকুমার পালক নড়াগিরির উপর চেপে একদল সৈন্য নিয়ে উদয়নকে ধরতে ছুটলেন সেই রাত্রির অন্ধকারে। আর গোপাল যৌগন্ধরায়ণকে নিয়ে ফিরে এলেন উজ্জয়িনীর রাজপ্রাসাদে।

*　　*　　*　　*

যৌগন্ধরায়ণের হাত-পা বাঁধা। একখানা চৌপায়ার উপর শুইয়ে তাঁকে উজ্জয়িনীর প্রধান রাজপথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু পথে বড়ই লোকের ভিড়। প্রজারা সব যৌগন্ধরায়ণকে দেখ্‌বে ব'লে কাতারে কাতারে এসে পথ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছে। সাম্‌নে দু'জন রক্ষী সেনা তরোয়াল হাতে লোক সরিয়ে পথ সাফ করছিল—"এই হঠ যাও, হঠ যাও!" বলে। চৌপায়া বইছিল জন আষ্টেক বেহারা। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে চৌপায়া কাঁধে ক'রে একরকম প্রায় দাঁড়িয়েই ছিল, তিন চার ঘণ্টাতেও ভিড় ঠেলে ক্রোশ খানেকের বেশী এগুতেই পারে নি। অথচ—চৌপায়াখানি রাস্তায় নামিয়ে যে তারা একটু জিরিয়ে নেবে, তারও উপায় ছিল না। কারণ চৌপায়া রাস্তায় নামালেই সেইখানে ভিড় এত বেশী হওয়ার সম্ভাবনা যে তার চাপে হয়ত যৌগন্ধরায়ণের আহত দেহ আরও আঘাত পেতে পারত। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় চৌপায়ার উপর শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, অথচ গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে পারা যাচ্ছে না—যৌগন্ধরায়ণের এ হ'য়ে উঠছিল অসহ্য। আর বেহারাদেরও একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চৌপায়া কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকা হ'য়ে উঠ্‌ছিল প্রাণান্তকর। তারা সকলেই ঘন ঘন হাঁফাচ্ছিল, আর তাদের সারা গা দিয়ে দর-দর ধারায় ঘাম ছুটছিল। যৌগন্ধরায়ণ তাই দেখে হাত-পা বাঁধা থাকা সত্ত্বেও অতি কষ্টে চৌপায়ার উপর সোজা হ'য়ে উঠে বস্‌লেন। তারপর বেহারাদের বললেন, "এই তোরা এইখানে চৌপাই নামিয়ে একটু জিরিয়ে নে। আমায় বরং ধরাধরি ক'রে তোরা এই চৌপায়ার উপরে দাঁড় করিয়ে দে, তা হ'লে সকলেই আমায় দেখ্‌তে পাবে।" বেহারা ত যৌগন্ধরায়ণের কথায় হাতে যেন স্বর্গ পেলে। তারা তাড়াতাড়ি চৌপাই নামিয়ে মন্ত্রী ম'শায়কে হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই খাড়া ক'রে দিলে। এতক্ষণ শুয়ে থাকার জন্য ভিড়ের লোকেরা যৌগন্ধরায়ণকে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না। এবার তাঁকে দাঁড়াতে দেখে একটু ভাল ক'রে দেখে নেবার আশায় রাস্তার ছড়ান ভিড়টা তাঁর চৌপায়ার চারপাশে যেন জমাট বেঁধে গেল। তাই দেখে তাঁর রক্ষী সেনারা তরোয়াল ঘুরিয়ে তাদের সরিয়ে দিতে লাগল "এই! হঠ যাও, হঠ যাও।"

যৌগন্ধরায়ণ হাসিমুখে তাদের বাধা দিয়ে বল্‌লেন, "ওহে বীরপুরুষ বর! আমাকে যে দেখ্‌তে চায়, সে দেখুক, তাকে বাধা দিও না। মনে মনে যদি কারও মন্ত্রী হবার বাসনা থেকে ত আমার এই অবস্থা দেখে হয় তা একেবারে সমূলে লোপ পাক, নয় ত সে বাসনা বেশ পাকা হ'য়ে উঠুক।"

তবু রক্ষীরা প্রজাদের তাড়া দিতে লাগ্‌ল—"এই! হঠ্‌ যাও। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে কি আগে কখনও দেখ নি নাকি যে এত ভিড় করেছ তাঁকে দেখ্‌তে।"

যৌগন্ধরায়ণ তাই শুনে হেসে বল্‌লেন, "দেখেছে আমায় প্রায় সকলেই, তবে এ বেশে নয়। একটা পাগ্‌লা আজ ক'দিন ধ'রে এই নগরীর রাস্তায় রাস্তায় খুব পাগ্‌লামি ক'রে বেড়াত, এ কে না জেনেছে। কিন্তু সে যে যৌগন্ধরায়ণ তা ত প্রজারা তখন কেউ বোঝে নি।"

এমন সময় একজন সেনা দূর থেকে খুব জোরে ঘোড়া চালিয়ে এসে একটু ঠাট্টার সুরে বল্লে—"মন্ত্রী ম'শায়। খুব সুসংবাদ। বৎসরাজ ধরা পড়েছেন।"

যৌগন্ধরায়ণ একথা শুনে ব'লে উঠলেন, "মিথ্যা কথা। আমার সঙ্গে তামাসা কোরো না। কয়েক দণ্ড আগে যিনি এ নগর থেকে ছাড়া পেয়ে ভদ্রবতীর পিঠে চ'ড়ে পালিয়েছেন, তিনি এক নিমিষে বহু যোজন পথ এগিয়ে গেছেন। এখন তাঁকে পিছু ধাওয়া ক'রে ধরা কোন হাতী বা ঘোড়ার পক্ষেই সম্ভব নয়। আচ্ছা বাপু, ধরলুম, তোমার কথাই সত্য। কিন্তু বল দেখি, কি ক'রে তিনি ধরা পড়লেন ?"

সেনাটি বল্লে—"মহারাজকুমার পালক নড়াগিরির পিঠে চেপে তাঁকে ধরতে বেরিয়েছিলেন কি না। তাঁরই হাতে ধরা পড়েছেন।"

যৌগন্ধরায়ণ গম্ভীরমুখে বল্লে,"হ্যাঁ! এক নড়াগিরিই পারে বটে ভদ্রবতীকে তেড়ে গিয়ে ধরতে। কিন্তু তাকে চালাবার মত উপযুক্ত মাহুত কোথা তোমাদের? ওদিকে ভদ্রবতীকে চালাচ্ছেন স্বয়ং বৎসরাজ। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নড়াগিরিকে চালাতে পারে—এমন লোক পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। তাই তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না।"

তখন সেনাটি তার মিথ্যা কথা হাতে-হাতে ধরা প'ড়ে গেল দেখে বল্লে, "আমাদের মন্ত্রী ম'শায়ের হুকুম, আপনাকে অস্ত্রাগারে বন্দী রাখ্‌তে হবে। ঐ স্থানটা খুব নিরাপদ, ওখান থেকে পালান অসম্ভব।"

যৌগন্ধরায়ণ এই কথায় হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, "বৎসরাজকে বন্দী ক'রে মন্ত্রী ম'শায়রা তাঁর পাহারার ভাল ব্যবস্থা করেন নি। এখন তিনি পালিয়েছেন ব'লে যত কড়াকড়ি আমাকে নিয়ে। এ যেন জড়োয়া গয়না চুরি যাবার পর তার বাক্সটাকে খুব যত্নের সঙ্গে রক্ষা করা হচ্ছে। চল তোমাদের অস্ত্রাগারেই নিয়ে চল।"

*

পাশের একটা সরু রাস্তা দিয়ে বেহারারা যৌগন্ধরায়ণের চৌপায়া অস্ত্রাগারে নিয়ে এল। সেখানে ঐ সেনাটি তাঁর হাত-পার বাঁধন খুলে দিলে। জিজ্ঞাসা করায় বল্লে—"মন্ত্রী ম'শায়ের এই রকমই হুকুম। এখন আপনি একটু বিশ্রাম করলেই আমাদের মন্ত্রী ম'শায় আসবেন আপনাকে দেখ্‌তে।"

যৌগন্ধরায়ণ—"কে? মন্ত্রী ভরতরোহক বোধ হয়? আমার বিশ্রাম পথেই হ'য়ে গেছে। আমি ভরত-রোহকের সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক। তাঁকে জানাও গিয়ে।"

"যে আজ্ঞা"—ব'লে সৈন্যটি চ'লে গেল।

[ক্রমশঃ

প্রার্থনা

শ্রীপ্রিয়লাল দাশ

ধূপশিখা সম নির্ম্মল কর,
চঞ্চল কর মোরে ;
জ্বলে উঠি যেন নরকাগ্নির মাঝে।
আমার প্রাণের সুপ্ত বাসনা
তোমার আরতি তরে
প্রদীপের মত জ্বলুক নিত্য সাঁঝে॥

অন্তরে মোর আসন নিও হে,
ওগো অন্তর্য্যামী,
তব রূপশিখা মুছে দিক মোর কালো।
অন্তর কর পুষ্পের মত
হে মোর জীবন-স্বামী ;
(প্রভু) অন্তরকোণে ফোটাও পথের আলো।

ফুলের জন্ম

(বিদেশী পৌরাণিক গল্প)

শ্রীনীলরতন দাশ, বি-এ

"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" সত্যই আজ যেদিকে তাকাও, দেখতে পাবে কত বিচিত্রবর্ণ গন্ধের ফুলে ফুলময়ী আমাদের জননী পৃথ্বী। লাল, নীল, সাদা, সবুজ, কত রঙ্‌বেরঙের ফুল ইন্দ্রধনুর বর্ণ এবং স্বর্গের সুষমা নিয়ে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন মর্ত্ত্যে ফুলের নাম গন্ধও ছিল না। তখন ছিল শুধু সবুজের অখণ্ড রাজত্ব, ধরিত্রীর বুকে ফুটে থাকত শুধু তৃণলতাগুল্মের গাঢ় সবুজ আভা, আর সেই সজীব শ্যামলতায় ঝল্‌মল্‌ করত স্নিগ্ধ ধরণীর সারা অঙ্গ। কেমন করে একদিন সবুজের এই অনাবিল রাজত্বের মাঝে পুষ্পরাজি আত্মপ্রকাশ করল, সেই কাহিনী আজ তোমাদের বলি।

সৃষ্টিকর্ত্তা যখন বিচিত্র রূপ রস রঙ্‌ দিয়ে গড়ে তুল্‌লেন আমাদের এই আদিম ধরিত্রীকে, তখন স্বর্গের জানালা দিয়ে দেবতারা তার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে বিস্ময়মুগ্ধ হ'লেন। তারপর যেদিন ভগবান্‌ সৃষ্টি করলেন আদিম মানবকে, সেদিন দূর থেকে তা'র অতুল রূপলাবণ্য দেখে দেবতারা হ'য়ে গেলেন বিস্ময়ে হতবাক্‌, তাঁরা স্বর্গ হ'তে নেমে এসে মেঘের ওপর চড়ে ভাল ক'রে দেখে গেলেন আদি সৃষ্টির সেই অপূর্ব্ব নরমূর্ত্তিকে। এর পর বিশ্বের সৌন্দর্য্যসাগর মন্থন করে বিধাতা যেদিন সৃষ্টি করলেন আদি মানবীকে, সেদিন সৃষ্টি-কর্ত্তাও বোধ হয় তাঁর এই সেরা সৃষ্টির জন্য গর্ব্ব ও আত্মতৃপ্তি বোধ ক'রেছিলেন। এই নূতন সৃষ্টির সংবাদ পেয়ে স্বর্গের দেবতারা আবার আনন্দে চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। তাঁরা আকাশের জানালা দিয়ে নীচে পৃথিবীর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে বার বার চেয়ে দেখ্‌তে লাগলেন। কিন্তু দূর থেকে দেখে তাঁদের সৌন্দর্য্য-পিপাসা মিট্‌ল না। তাঁরা নেমে এলেন মেঘলোকে। সেখান থেকে তাঁরা অসীম রূপ-লাবণ্যময়ী আদি মানবী মূর্ত্তির পানে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইলেন। যতই দেখেন, তাঁদের দেখবার আকাঙ্ক্ষা ততই যায় বেড়ে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ ছাড়া নীচে নাম্‌তে সাহস হ'লো না তাঁদের। তরুণ তপন এই মহিমময়ী তরুণীকে দেখবার জন্য পূর্ব্ব গগনে উঁকি মারতে লাগলেন। আকাশে তখন পেঁজা তুলার মত সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল; পৃথিবীর এক প্রান্তে উজ্জ্বল একটা সাত রঙা রামধনু উঠেছিল। প্রথমে কয়েকজন দুঃসাহসী দেবতা উড়ে এসে রামধনুর ওপরে বসলেন, তাঁদের দেখাদেখি ক্রমে ক্রমে সবাই এসে বসলেন সেখানে। দেবতাদের দেহ খুব হাল্কা বটে; কিন্তু ক্ষীণ রামধনুটির ওপর যখন তাঁরা দলে দলে এসে চাপলেন, তখন তাঁদের ভার সইতে না পেরে রামধনুটি হঠাৎ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল,—সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছচূর্ণের মত তা'র অজস্র রঙিন্‌ রেণুগুলি ছড়িয়ে পড়ল ধরিত্রীর সারা অঙ্গে। পৃথিবীর তরুলতা তখন ভাবাবেশে উন্মুখ হ'য়ে ছিল; চূর্ণ ইন্দ্রধনুর রেণুগুলিকে তারা সাদরে বরণ ক'রে নিল আপন আপন বুকে। সেই দিন হ'তে চিরশ্যামল বৃক্ষরাজিতে ফুটতে সুরু হ'লো নানা বর্ণের ফুল, আর তাদের সুবাস ছড়িয়ে পড়ল দিগ্‌দিগন্তে।

এই ফুল ফোটার কথাটি আমাদের দেশের একজন কবি কেমন সুন্দর ভাবে ব'লেছেন শোন :—

> পুষ্প আমি সুপ্ত ছিলাম কুঁড়ির আকারে,
> গন্ধ আমার বদ্ধ ছিল বুকের প্রাকারে।
> এক নিমেষে আজকে মোরে ফুটিয়ে দিলে গো,
> গন্ধ আমার ছড়িয়ে গেল বায়ুর পাথারে।

যাদের গায়ে জোর আছে

শ্রীউমেশ মল্লিক, বি-এ

ষাঁড়েশ্বরতলার ঘাট—চুঁচুড়ার চিরপ্রসিদ্ধ। ঘাটের উপর বিস্তৃত চত্বরে মহেশ্বরের প্রকাণ্ড মন্দির। পাদদেশে বৃদ্ধ বটবৃক্ষ, বিস্তৃত শাখা-প্রশাখায় মন্দিরটি যেন আশ্রিত। সম্মুখে প্রশস্ত গঙ্গা। মন্দিরের পাশ দিয়ে খাঁজ-কাটা-কাটা সুচিক্কণ দীর্ঘ সিঁড়িগুলি নেমে এসেছে গঙ্গার বক্ষে।

বৈশাখ মাস। পুণ্যলোভী স্নানার্থীর ভীড়ের আর অন্ত নেই। মোক্ষ লাভের আশায় ছুটে এসেছে নরনারী দেশ-দেশান্তরে। এই উপলক্ষে মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে এক মেলা বসেছে। দরমা-ঘেরা ছোট ছোট চাঁচি বেড়ার এক একটি সুসজ্জিত দোকান: প্রথমেই কৃষ্ণনগরের মাটির খেলনা। বিচিত্র বর্ণের নানারূপ দেব-দেবীর মূর্ত্তি। চোখে পড়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিকে মা কালীর ভয়াবহ মূর্ত্তি। তার পাশে রণ উন্মাদিনী মা দুর্গা, সতীদেহ স্কন্ধে নটরাজের নৃত্যভঙ্গিমায় মহেশ্বর, বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রভৃতি অসাধারণ মৃৎশিল্প চাতুর্য্যের পরিচয় দেয়। পরে স্বল্পপরিসর ছবির দোকান ; সর্ব্ব প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্মিতহাস্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, তার পাশে দেশগৌরব সুভাষ চন্দ্র, জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা-ভঙ্গিমায় সুরেন্দ্রনাথ, অপূর্ব্ব প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ, তেজস্বী বিবেকানন্দ, সাধক রামকৃষ্ণ প্রভৃতি। অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীর মনোহর আলেখ্য। বিক্রেতা একজন মুসলমান। পরের দোকানটি অনেকটা জায়গা জুড়ে এক কাঁচের বাসন ও খেলনা বিক্রেতার। নানা বর্ণের পুষ্পাধার, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি খেলনা, কাঁচের গেলাস, চায়ের কাপ, পিরীচ প্রভৃতিতে ভরাক্রান্ত। ক্রমে পর পর চীনে মাটির খেলনা, পাথরের বাসনের দোকান পরিপূর্ণ। মেলার পূর্ব্বদিকের সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ময়রার দোকান। পরিচ্ছন্নতার অনুকরণীয়। বড় বড় নানাবিধ অন্যান্য দোকানগুলির দ্রব্যসম্ভারে স্থানটি হয়ে উঠেছে লোভনীয়, কর্ম্মব্যস্ততায় কোলাহলে মুখর।

স্নানার্থীদের মধ্যে একটি বালিকা ও বালকের বেশ-ভূষা দেখলে মনে হয়—এরা যেন আভিজাত্য-সম্প্রদায়ের। মেয়েটি অপূর্ব্ব সুন্দরী। যেন একটি অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত পদ্ম-কোরক। অল্পবয়স্ক বালকটি তারই সহোদর। পিছনে পরিচারিকা। অদূরে অপেক্ষমান সোফার ও আরদালি। নিত্য স্নানার্থীদের মধ্যে এদের দেখা যায় না। ধীর পদক্ষেপে অনাবশ্যক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তারা ঘাটের পথে এগিয়ে চললো। সহসা নির্ম্মল প্রভাতের স্বচ্ছ আকাশ গৈরিক বসনের মত ধূলি-মলিন হয়ে উঠলো। তীব্র বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হলো কাল-বৈশাখীর ভৈরব নৃত্য। স্নানার্থীদের গাত্রে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ন বাণের মত বিদ্ধ হতে লাগলো শুষ্ক পত্র ও ধূলি। অত্যধিক ঝটিকাপ্রবাহে মুহূর্ত্তে মেলার পূর্ব্ব দিকের দরমা-ঘেরা অংশটি আবর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রকৃতির সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তির পৈশাচিক বিকট শব্দ ঊর্দ্ধ গগনে ছড়িয়ে পড়লো। লক্ষ ফণা বিস্তার করে ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত নদীও ছুটে চললো সংহার মূর্ত্তিতে। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে একটির পর একটি সিঁড়ি নিমজ্জিত হতে লাগল। ভীত ত্রস্ত স্নানার্থীরা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কোন প্রকারে প্রাণভয়ে ঘাট পরিত্যাগ করতে লাগলো। ঝটিকা-প্রবাহের মেঘধূলি-সমাচ্ছন্ন দুর্ব্বার গতিমুখে মানুষের পক্ষে পরস্পরের নিরাপত্তা রাখা হয়ে উঠলো অসম্ভব! বিক্ষুব্ধ নদীপ্রান্তে কারো কোন প্রকার চিহ্নটি পর্য্যন্ত রইল না। সেই প্রবল জলের আলোড়নের মধ্যে অসহায় দুইটি শিশু। উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল নদীবক্ষে তাদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখবার সে কি জীবন-মরণ-যুদ্ধ। শিশু দুটির মুখে ফুটে উঠেছে নিশ্চিত মৃত্যুর করাল ছায়া। ক্রমে অবসন্ন দেহে তাদের ভেসে থাকার ক্ষমতা পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হল।

ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত উত্তর-পূর্ব্ব কোণ থেকে একটি নৌকা গঙ্গার বুক চিরে আসতে দেখা গেল। স্রোতের প্রবলতায় গতি অতিমন্থর। উপবিষ্ট এক ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ। দীর্ঘদেহ যেন লৌহনির্ম্মিত! কেশদাম কাশগুচ্ছের মত শুভ্র। অঙ্গে নামাবলী, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। শিশুদের উপস্থিত বিপদ বুঝে ইষ্ট দেবতার নাম

স্মরণ করে বৃদ্ধ নদীবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে প্রলয়োচ্ছ্বাস তাঁকে কোন বাধা দিতে পারলে না। অতি-কষ্টে শিশুর কটিদেশ স্পর্শ করে বৃদ্ধ নিমজ্জমান বালকটিকে নৌকার দিকে টেনে নিয়ে গেলেন! কোন প্রকার ইতস্ততঃ না করে নদীবক্ষে বালিকাটিকে উদ্ধার করবার জন্য প্রচণ্ড ঢেউয়ের মধ্যে অগ্রসর হলেন। তখন বালিকার মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ, শ্বাস-প্রশ্বাস একরূপ নিশ্চল। অত্যধিক জলপানে শরীরে একপ্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বৃদ্ধ সবল হস্তে বালিকাটিকে কোনরূপে দৃঢ় মুষ্টিবন্ধে আবদ্ধ করে সাঁতরে চল্‌লেন। প্রবল ঢেউয়ের আঘাতে মুষ্টিবদ্ধ শিথিল হয়ে আসে! বৃদ্ধ অমানুষিক শক্তিবলে যখন বালিকাটিকে উদ্ধার করলেন, তখন নদী-বক্ষে পাহাড়ের মত ঢেউয়ের সমাবেশ। প্রচণ্ড এক ঢেউ তাঁর মাথার উপর ভেঙ্গে পড়লো। একটির পর একটি ঢেউয়ের আঘাতে বৃদ্ধ ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হলেন। প্রকৃতির পরিহাসের মত তখন ত্রিভুবন কম্পিত করে ঈশান কোণে এক বজ্রপাত হলো।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এই আত্মত্যাগী বৃদ্ধের নাম।

বর্তমান বর্ষের "লীলা পুরস্কার"

ডাঃ শ্রীমনোমোহন ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রবর্তিত "লীলা পুরস্কার" সর্বপ্রথমে পেলেন সুপরিচিত লেখিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী (জন্ম ১৮৭৪ ইং)। বাংলার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর একমাত্র পরলোকগত কন্যা লীলাদেবীর স্মৃতি রক্ষার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে যে অর্থদান করেছেন, তার থেকে তার অভিপ্রায় মত, প্রতি দু'বছর অন্তে মহিলা সাহিত্যিকদের কৃতিত্বের সম্মানার্থ এ পুরস্কারের সৃষ্টি। কিছুদিন আগে হেমলতা দেবীর গুণানুরক্ত ব্যক্তিদের উৎসাহে তাঁর সপ্ততিবর্ষপূর্তির উৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে। এ উৎসবে তাঁর প্রশংসনীয় চরিত্র, সমাজ সেবা আদি নানা গুণের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক ক্ষমতার কথাও আলোচিত হয়েছিল। তবু বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক দানের কথা বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। গোড়ার দিকে কবিতা লিখেই তিনি সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর কাব্য-গ্রন্থ "জ্যোতিঃ" ও "অকল্পিতা" ভাষা, ছন্দ ও ভাবের দিক দিয়ে অনায়াসে পাঠকের সম্ভ্রম দাবী করে। দৃষ্টিকে যাঁরা মাঝে মাঝে অন্তরের দিকে পাঠাবার সাধনা করেন, এ কবিতাগুলির বিচিত্র আধ্যাত্মিক রস তাঁদের অবশ্যই মুগ্ধ করবে—এরূপ আশা করা যায়।

"দুনিয়ার দেনা" নামক গল্পপুস্তকে পরিচয় পাই গদ্য রচনায় ও কথা-সাহিত্যে হেমলতা দেবীর কৃতিত্বের। এ বইএর ভাষাটি ভারী মধুর ও মনোজ্ঞ। গল্পগুলিতে তিনি যে বিস্ময়মিশ্রিত শান্ত রসের পরিবেশন করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ। খুব সম্ভব, বাংলার রসজ্ঞ পাঠকগণ লেখিকাকে এজন্যে দীর্ঘকাল ধরে মনে রাখবেন। তাঁর "দেহলি"ও বেশ সুলিখিত গল্পপুস্তক। তিনি "মেয়েদের কথা" নামক প্রবন্ধ পুস্তকে সহজ সরল ভঙ্গীতে সুন্দর ভাষায় মেয়েদের আদর্শ ও নানা সমস্যাদি নিয়ে যে সারবান্ আলোচনা করেছেন তা সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল পাঠকের নিকট খুবই মূল্যবান্ বিবেচিত হবে।

অতএব মনে হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অতি যোগ্য পাত্রকেই 'লীলা পুরস্কার' দিয়েছেন। ইতিপূর্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকজন মহিলাকে সাহিত্যের জন্য পদকাদি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু এক স্বর্গীয়া কামিনী রায় ছাড়া আর কারো রচনার সাহিত্যিক গুণ তাঁর রচনার গুণোৎকর্ষের সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে হয় না। একটু বিলম্ব হলেও বিশ্ববিদ্যালয় যে তাঁর গুণের সমাদর করেছেন, এজন্যে আমরা আনন্দিত।

কমরেডশিপ

(গল্প)

শ্রীমালবিকা দত্ত, বি-এ

প্রাণকৃষ্ণবাবু চটিয়াছেন: চটিবার কথাই তো। না হয় কলিকাতায় দুই দিন বোমাই পড়িয়াছে, তাই বলিয়া যেখানে তিনি সপরিবারে থাকিতে পারেন, চাকর ব্যাটা সেখানে থাকিতে পারিল না! জন্মিয়াছে যখন তখন যে মরিতেই হইবে—ইহা তো জানা কথা। কলিকাতা ছাড়িলেই কি আর মরিবে না? তাহা হইলে এত লোক মরে কেন? পরের বাড়ীতে কাজ করিয়া যাহাদের দিন চালাইতে হইবে, তাহাদের জীবনের মায়া এত বেশী হইলে চলে না। এই বোমার বাজারে ঠাকুর চাকর মেলা যা' দুর্ঘট—তাই তো তিনি ছুটি দেন নাই রমাকান্তকে। কিন্তু সাবিত্রী তাঁহার গৃহিণী হইলেও অর্দ্ধাঙ্গিনী যে নহেন, তাহার প্রমাণ দিলেন রমাকান্তকে বিদায় দিয়া: প্রাণকৃষ্ণবাবুকে শুনাইয়া শুনাইয়া সুধাকণ্ঠে অমৃত ঝরিতে লাগিল—"চাকরটাকে দু'দিন ছুটি দিতে গেলে গায় লাগে। কেন গা—না হয় ও গরীব লোক, তাই বলে ওর প্রাণের মায়াও থাকবে না? ও তো তোমাদের মত 'জাপানকে রুখতে হবে' বলে বেড়ায় না—যে জাপানকে রুখবার জন্যে বোমা মাথায় করে এখানে বসে থাকবে। ওকে তো অমনি টাকা দিচ্ছি না আমরা—যেখানে খাটবে সেখানেই টাকা পাবে। যা যা—রমা তুই চলে যা বাছা! আমার জন্য ভাবনা কি রে—তোর বাবু না গেলে তো আমি যেতে পারি না। তুই যা', দু'দিন ঘুরে ফিরে অবস্থা ভাল দেখলে চলে আসিস্।"

কাজেই প্রাণকৃষ্ণবাবু হুঙ্কার ছাড়িতেছেন: না ছাড়িয়াই বা উপায় কী। সমস্যা তো একটা নহে: রমাকান্ত বাড়ী গিয়াছে পর্য্যন্ত আর চাকর জুটাইতে পারেন নাই। ঠাকুর যত কাজই করুক, বাজারে যাওয়ার তার সময় নাই—অগত্যা গৃহিণীর মুণ্ডপাত করিতে করিতে বাজারে যাইতে হয় তাঁহাকেই। তাহাতেও কি স্বস্তি আছে? তিনি না কি রোজই ঠকিয়া আসেন, —রমাকান্ত কখনও এত খারাপ জিনিষ আনিত না—ইত্যাদি নানা অভিযোগ শুনিতে শুনিতে তাঁহার কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। দেশটা নেহাৎই সংস্কারাচ্ছন্ন, তাই সাবিত্রী রক্ষা পাইল। ভারতবর্ষ "বুর্জোবাদের নরককুণ্ড" না হইয়া "সাম্যবাদের স্বর্গপিঠ" হইলে কবেই প্রাণকৃষ্ণবাবু তাহার বিরুদ্ধে Divorce suit আনিতেন। কিন্তু তাহা তো হইবার নয়! বহু দুঃখে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয়—"দুর্গা দুর্গা!"

এই তো গেল একদিকের কথা: অন্যদিকে ব্যাপার আরও গুরুতর। তাঁহাদের পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান অনুযায়ী নোয়াখালী জেলাতে যে ১৮০০ মেয়ে দলভুক্ত করা হইয়াছে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা "পাকা সাম্যবাদী" বনিয়া উঠিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। এখন প্ল্যানের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ এই ১৮০০ মেয়ের বিবাহ দিতে আরও ১৮০০ ছেলেকে দলে টানিবার প্রস্তাব কার্য্যকরী করিতে হইবে। অথচ এ সব ছেলে কোথায় মেলে, যাহারা স্ত্রীর মতামত নির্ব্বিচারে মানিয়া নিবে। অন্যান্য জেলার খবর এতো খারাপ নয়—কিন্তু নোয়াখালীর ছেলেগুলি একেবারেই বুর্জোয়া, না হইলে এই সব আধুনিকাদের বিবাহ করিতে চায় না। গভীর দুঃখে প্রাণকৃষ্ণবাবু চোখ বুজিয়া কাহাকে স্মরণ করিলেন তিনিই জানেন।

সেদিন সকালবেলা চা খাইতে খাইতে প্রাণকৃষ্ণবাবু ভাবিতেছিলেন—এখনই তো বাজারে যাইতে হইবে। রমাকান্তটা ফিরিয়া আসিলে বাঁচা যাইত। এমন সময় কাণে আসিল…"মা-ঠাইরাণ কই ঠাউর মশাই?" কে কথা বলে? রমাকান্ত না? তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখেন রমাকান্তই বটে—ভূলুণ্ঠিত হইয়া গৃহিণীকে প্রণাম করিতেছে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন—"দুর্গা! দুর্গা!"—তা'হলে ফিরে এলি রমা?"

রমাকান্ত জবাব দিবার পূর্ব্বেই সাবিত্রী মুখ খুলিল, —"দুর্গা দুর্গা কেন গা? বল না ষ্ট্যালিন! ষ্ট্যালিন!"

প্রাণকৃষ্ণ বাবু জলিয়া ওঠেন! কিন্তু জবাব দিবার চেষ্টা করেন না, কারণ এতদিনে এই জিনিষটা অন্ততঃ তাঁহার চোখ এড়ায় নাই যে, তাঁহার মুখে খই ফুটিলে সাবিত্রীর মুখে তুবড়ী ছোটে। অগত্যা মনের রাগ মনে চাপিয়া তিনি ঘরে ঢুকিয়া পড়েন।

গৃহিণী সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেন—"ভাল ছিলি রমা? দেশের খবর কি? শুনছি তোদের জেলাতেও নাকি বোমা পড়েছে?"

—"বোমা পইড়ছে মা-ঠাইরান, ত আমাগো সহর' পড়ে ন'। ফেণীত পইড়ছে! আর আপনাগো আশীর্ব্বাদে আছিলাম ভালাই। কিন্তুক মা-ঠাইরান গো, এইবার দেশ' যেই বিপদ—যত ছেইলাধরা নাইমছে। যেরে পায় হেরেই ধর্‌যা ফালায়। আমার'ও ত ধরছিল—এক ফেরে পালাইয়া আইছি।"

—"সে কি রে? তোকে ধরল কেন?"

—"কেমতে কইমু মা-ঠাইরান? ইষ্টিশনে ত নাইম্‌ছি—হেমনি দুইডা মানুষ আইয়া কইল—কইত্থ্যন আইছ? আমি ত ভয়ে ভয়ে বাবুর নাম কইলাম—হেমনে আমারে কয়—তা'গ লগে যাইবার লাইগা! আমিও যাইতাম না—তারাও ছাইড়ত না: হেসে রমাকান্ত বলে—আমার বিয়া দিব! আমি কইলাম—কেরে? তারা কয়—বাবু বলে আমারে পাঠাইছে বিয়া করনের লাইগা। বাবুর নাম কওনে আমি তো আর ফিরতাম পারি না—গেলাম তা'গ লগে!"

—"সে কিরে? তুই বিয়ে করলি?"

—"আরে হোনেনই মা-ঠাইরান্। গেলাম ত তা'গ লগে। এক বাড়ীতে আমারে তো লইয়া গেল—ক-ত মাইয়া মা-ঠাইরান, কি কইমু! তারা আমারে কইল—কারে বিয়া করবা কও। আমি কি কইতাম পারি—হেষকালে তারাই ঠিক কইরা দিল। কিন্তুক মা-ঠাইরান, বাবু এই কা'গ লগে আমার বিয়া দিল—তারা না আইনল বামন ঠাউর—না কইরল কিছু! আমগো দো-জনেরেই ফুল পুষ্প দিল—কইল, বিয়া হইয়া গেছে। আরও য্যান কি কইল "কম-রাডশেপ"। তা' কম-সম নয় বুইজলাম মা-ঠাইরান্—রাডশেপ যে কি কইল ধইরবার নারলাম!

—"তারপর—তারপর?" সাবিত্রীও যেন ছেলে মানুষ হইয়া ওঠে।

—"হেরপর মা ঠাইরান্ বিয়া ত হইল। আমি কইলাম—আমাগো বাড়ীত যাইত হইব। তা মাইয়া ত' কিছুতে যাইত না। আমি আর থাকতাম না পাইরা কইলাম—ত আমারে বিয়া করলা কে রে? এ কথা হুইন্যা ত' কি হাসি ছুটল? কয়, বিয়া কি? এইডা ত 'কমরাডশেপ'। আমি কইলাম, হেডা আবার কি? হেরপর থাইক্যা গো মা-ঠাইরান, আমারে যে কত কি কয়—মজুর, চাষা, কত কি, আমার যদি মনে থাইকত ত কইতাম পারতাম। বেবাক ত ভুইল্যা গেছি। হেষকালে বুইজলাম যে বিয়া ত দেওন না—আমারে এক মাষ্টরনীর হাত' তুইল্যা দিছে পড়াইবার লাইগ্যা। আরে আমি যদি লেখাপড়াই করমু ত তোরা খাওয়াইবি আমার মা-ভইনেরে? তা'গরে আমার টাকা দেওন লাগে না মাস মাস? কিন্তুক কি মুস্কিল' যে পড়লাম মা-ঠাইরান—ইষ্টিশনে বেবাক সময় তা'গ লোক আছে—আইবার নারি। হেসে মনে মনে অনেক ভাইব্যা রাত থাকতে উইঠ্যা হাইট্যা পলাইয়া আইছি।"

সাবিত্রী হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"থাক থাক—তোর আর দেশে গিয়ে কাজ নেই। যা' কাজ কর্ম্ম কর গে।" রমাকান্ত যাইতে যাইতে কহিল—'কিন্তুক মা-ঠাইরান একডা কথা—!"

—"কি রে?"

—"তেমন কিছু নয়। এই রাডশেপের অর্থডা কি যদি বাবুরে জিগ্যাইয়া আমারে একটু কইয়া দ্যান! আমি ত জিগ্যাইতাম পারতাম না

—"তুই-ই জিগ্যেস করিস এক সময়। এখন যা।"—

রমাকান্ত চোখের আড়াল হইতেই সাবিত্রী সশব্দে ফাটিয়া পড়ে—"আ মরণ, কি কমরেডশিপ রে। বাড়ীর চাকরবাকরগুলোর দফা শেষ হ'বে পাঁচ বছর ধরে এমন ছেলে ধরার প্ল্যান চললে…।"

মন *

শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

যোগবাশিষ্ট অবলম্বনে পূর্ব্ব প্রবন্ধে মনের আবির্ভাব সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্রশক্তিতে যতটুকু সম্ভব বর্ণনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থিতি বিস্তৃতি এবং নিরোধ বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব।

মন দেহেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক বশতঃই কর্ত্তৃত্বজ্ঞানে সুখ দুঃখাদি ভোগ করে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় পার্থক্য এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হয়। স্বপ্নকৃত কর্ম্মদ্বারা কেহই সেই জন্ম আপনাকে অপরাধী মনে করে না। মনের স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থার বিষয় এ প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

মানসিক যে অবস্থা লইয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে তাহা দ্বিবিধ :—

(১) অজ্ঞানাবস্থা, (২) জ্ঞানভূমি।

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্ম এবং তাহার অভ্যাসের পরিণামে ভোগবাসনার বৃদ্ধি, এই অবস্থাদ্বয় অজ্ঞানভূমির স্থিতির কারণ। ইন্দ্রিয়গণের যথেচ্ছাচার যেমন বাসনা তদনুরূপ কার্য্য করা, যাহা ইচ্ছা তাহাই হওয়া, পরিণাম ও হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া বিধি নিষেধ না মানা, ভোগাশক্তির ঔৎকট্য যথা অঙ্গনাসঙ্গজাত সুখ অতি উপাদেয়, কিরূপে সেই সুখ পাওয়া যাইবে ইত্যাদি মনোভাবের কার্য্যে আগ্রহান্বিত হওয়াই ঐ অজ্ঞান ভূমিকার দৃঢ়তা জন্মায়।

শাস্ত্রোক্ত সাধন চতুষ্টয় বিশিষ্ট হইয়া শ্রবণ মননাদির প্রযত্ন ও মোক্ষাভিলাষের চেষ্টা এই দুইটি জ্ঞানভূমিকার দৃঢ়তা সম্পাদন করে।

এই উভয় মানসিক অবস্থার আধার কিন্তু সর্ব্বাধার ব্রহ্ম তাঁহারই অস্তিত্বে উভয়েরই অস্তিত্ব; তদীয় প্রকাশের উৎকর্ষাপকর্ষ হইতে ঐ অবস্থাদ্বয়ের হ্রাস ও বৃদ্ধির স্ফুরণ হয়, ঐ অজ্ঞানভূমিতে অবস্থান করিলে অবসন্ন হইতে হয়, কিন্তু জ্ঞানভূমিকায় আরোহণ করিবার প্রযত্নে শান্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে।

চিদাধারে অজ্ঞানের সংশ্রব বা অবস্থা নিম্নোক্ত সপ্তভাবে যোগবাশিষ্টে উল্লিখিত।

(১) বীজজাগ্রৎ—ব্রহ্মচৈতন্য হইতে সৃষ্টির আদিতে এবং অস্মদাদির জাগ্রতের মূলে চেতনার যে প্রথম স্ফুরণ, বা চিদাভাস সম্বলিত মায়াশক্তির আত্মবিকাশ, যাহার নাম নাই, তাহাই প্রাণ ধারণাদি ক্রিয়ার অবলম্বন, এবং তাহাই চিত্ত, জীবাদিশব্দের প্রকৃত অর্থ।

(২) জাগ্রৎ- এই বীজজাগ্রতের পরে স্বরূপের বিস্মৃতি বশতঃ সামান্যতঃ "এই আমি" "ইহা আমার" এই প্রকার যে জ্ঞান প্রস্ফুরিত হয়, তাহাকেই 'জাগ্রৎ' অবস্থা বলে

(৩) মহাজাগ্রৎ—এই জাগ্রত অবস্থায় জন্মান্তরীয় সংস্কার বিশেষের উদ্রেকে এবং অভ্যাসের দৃঢ়তায় স্থূল হইলে মহাজাগ্রৎ অবস্থা হয়। ইহাই সাধারণের মানসিক অবস্থা—জীবের অজ্ঞান ভূমিকায় অন্য তিন অবস্থা জাগ্রৎ-স্বপ্ন, স্বপ্নজাগ্রৎ, এবং সুষুপ্তি।

এই সাত অবস্থা শত শত শাখা সম্পন্ন হইয়া পড়ে, তাহা প্রত্যেকেরই ঘটিতেছে।

চিত্তবৃত্তি সমারূঢ় ব্রহ্মই জ্ঞানের প্রতিপাদ্য। অজ্ঞানের নাশক বলিয়াই তাহার নাম জ্ঞান। এবং সেই ব্রহ্মকে কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি বলিয়া বলা হইয়াছে। এই জ্ঞানভূমিকার সপ্তাবস্থা নিম্নে লিখিত হইল ;—

(১) শুভেচ্ছা,—সৎশাস্ত্র, সজ্জনসঙ্গ, এবং তাহা হইতে জ্ঞাতব্য কি, কর্ত্তব্য কি তাহা জানিবার যে আগ্রহ এবং নিত্যানিত্য বিচার পূর্ব্বক ঐ সকল বিষয়ে যে অনুসন্ধিৎসা তাহাই শুভেচ্ছা।

(২) বিচারণা,—শাস্ত্রানুশীলন, সজ্জনসঙ্গ, বৈরাগ্যা-ভ্যাসপূর্ব্বক যে সদাচারবৃত্তি দিন দিন বাড়িতে থাকে তাহাই বিচারণা।

(৩) তনুমানসা, শুভেচ্ছা ও বিচারণার ফলে জ্ঞানে ধীরে ধীরে যে বিষয়ে অনাশক্তি জন্মে এবং তৎকারণে বিষয় বাসনার ক্ষীণতাই তনুমানসা।

(৪) সত্ত্বাপত্তি,—শুভেচ্ছা, বিচারণা, ও তনুমানসা এই জ্ঞানভূমিত্রয় অভ্যাস করিতে করিতে করিতে বাহ্য বিষয়ের সংস্কার ও অল্পে অল্পে লুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহার বলে যে আত্মনিষ্ঠা জন্মে তাহাই সত্ত্বাপত্তি।

* বৈশাখ সংখ্যার প্রকাশিতের পর।

তাহার পরে অন্য তিন অবস্থার নাম অসংশক্তি, পদার্থ-ভাবনী ও তূর্য্যগা।

এই সপ্তবিধ অজ্ঞানভূমি ও সপ্তবিধ জ্ঞানভূমি জানিবার জন্য যাহাদের ঔৎসুক্য জন্মিবে, যোগবাশিষ্টের উৎপত্তি প্রকরণ পড়িবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি।

যাহার অস্তিত্ব নাই, কল্পনার বা ভ্রান্তির প্রভাবে তাহা থাকার ন্যায় কার্য্যকরী হয়। থাকুক বা নাই থাকুক, জ্ঞানে দৃঢ়ভাবে সমারোপিত হইলেই সত্যবৎ প্রতীয়মান হইয়া তাহা প্রয়োজন নির্ব্বাহে সমর্থ হইয়া থাকে। সকল কাল্পনিক অবস্থার মূলে কিন্তু এক অহংভাব বিদ্যমান। এই অহঙ্কার দেহ নহে, দেহে অবস্থিত এবং দেহ হইতে স্বতন্ত্র আপনার সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন। একমাত্র সঙ্কল্প বা বাসনাতন্তুতে নিখিল ভাবপরম্পরা আবদ্ধ রহিয়াছে। সেই সঙ্কল্প বা বাসনাতন্তু ছিন্ন হইলে বিষয়ভাব সকল কোথায় পলায়ন করে, কোথায় যায় বা তাহার কি হয়, তাহাও জানিতে পারা যায় না।

জগৎ সৃষ্টি চিদাকাশে বোধ-বিশেষের আবির্ভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সকলই চিত্তের অন্তর্গত বলিয়া এবং সেই চিত্তের আবির্ভাব কল্পনাজাত, এই কারণে অবিদ্যা, জীব এবং চিত্তশব্দের প্রকৃত ভেদ নাই। "অবিদ্যা চিত্ত জীববুদ্ধি শব্দানাং ভেদো নাস্তি বৃক্ষতরুশব্দয়োরিব।" যোঃ উঃ ১১৬।৮।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে মন ও চিত্ত শব্দের পার্থক্য সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা মনেরই অবস্থা ভেদ মাত্র। এই বোধান্তর্গত অহম্ভাবই কাল্পনিক এবং অপ্রতিষ্ঠ হইলেও সংসারপদবাচ্য। মনের বিস্তৃতির মূলকারণ অহঙ্কারের ত্রিবিধ অবস্থা—

(১) সর্ব্বত্রই আত্মচৈতন্য অবস্থান করিতেছেন। এবং আমিই সেই আত্মা এই যে অহম্ভাব তাহা বন্ধন কারণ নহে তাহা মোক্ষেরই কারণ হয়। কিন্তু এই অহঙ্কার জীবন্মুক্ত পুরুষেই বিদ্যমান, অন্যত্র নহে।

(২) আমি এই দৃশ্য বিশ্ব হইতে পৃথক, স্বতন্ত্র ও পরম সূক্ষ্ম এইভাবের যে জ্ঞান তাহা দ্বিতীয়াহঙ্কৃতি। ইহাও মোক্ষের কারণ এবং মাত্র জীবন্মুক্তপুরুষেই বিদ্যমান।

(৩) তৃতীয় অহঙ্কারই পরম শত্রু ও বর্জ্জনীয়। অর্থাৎ আমি হস্তপদাদিযুক্ত দেহী, আমি মনুষ্য, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, ইত্যাদি প্রকারের যে মিথ্যাভিমান, তাহাই তৃতীয়াহঙ্কৃতি এবং তাহাই সাধারণ মনুষ্য মধ্যে বর্ত্তমান। পুরুষ ঐ দুঃখদায়িনী তৃতীয়া অহঙ্কৃতিকে যতই পরিত্যাগ করে, মঙ্গলময় পরমাত্মা ততই নিকটবর্ত্তী হন এবং আনন্দের মাত্রা তদনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

পরমাত্মার নামান্তর অনুভূতি তিনি অনুভূতিরূপী। সর্ব্বজীবেই অনুভূতি আছে; ব্রহ্ম চৈতন্যের অবস্থিতির পরিচায়ক সর্ব্বজীবেই সেই অনুভূতি। ঐ অনুভূতি হইতে উত্থিত মন আপনা আপনিই প্রবৃত্তি বাসনার প্রভাবে চিদার্ণবে লহরীর মত আবির্ভূত হয়, এবং নিবৃত্তি বাসনার দৃঢ়তার সহিত লয় প্রাপ্ত হয়; নিজে অচেতন স্বভাব হইলেও মন ব্রহ্ম চৈতন্যের অনুগ্রহে চেতন হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতিবাচ্য হন। বাসনাভিভূত চিত্ত বা মন যাহা ভাবনা করে, তাহাই তাহার অনুভূত হয়, অবিদ্যমান হইলেও কল্পনানুযায়ী সর্ব্ববিষয় সত্যরূপে প্রতীত হয়, সর্ব্ববাসনার মূলে অহঙ্কার নিহিত থাকে; এই অহঙ্কারই শরীর ধারণ করিতেছে। মরণকালে অহং অভিমান থাকে না, দেহও বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই সময়েই ঐ অহং অভিমান এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য এক ভাবময় দেহ আশ্রয় করে।

এই অহং-ভাব অবিদ্যারই বিকার এবং চিত্ত বৈপরীত্যের ফল। এই অহং ভাবাদিময়ী অবিদ্যা চিত্ত, মন, বা বুদ্ধি আদি অন্ত মধ্যরহিত সুতরাং অনন্ত, চিত্তের প্রতিভাসে বা কল্পনানুযায়ী—পদার্থের পরিবর্ত্তন হয়। বাসনানুসারেই চিত্তের আকস্মিক উদয় হয়—এবং তাহার ব্যবহার পরম্পরা ও তদনুরূপ সত্যতায় অভ্যুদিত হয়। জগৎ কিন্তু আপনারই অন্তরে, জগদবুদ্ধি তাহার অব্যতিরিক্ত।

আকাশ বৃক্ষের বৃদ্ধি করে না, মাত্র বৃদ্ধির অনিবারক হয়। চিদ্রূপী পরমাত্মা কিছু না করিলেও অনিবারকত্ব হেতু সৃষ্টির কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন। আকাশ যেমন ঐ অনিবারকত্ব কারণে বৃক্ষের বৃদ্ধির কারণ, চিৎ ও সেই কারণেই সৃষ্টির কর্ত্তা, চিৎ, চিত্ত ও জীবাদিক্রমে মনের উৎপাদক হয়। জীববাসনাবাসিত চিৎ ও প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার চিত্ত চেত্যাদি সৃষ্টির আকারে বিবর্ত্তিত না হইয়া

থাকিতে পারে না ; যথা বীজত্বসংযুক্ত বৃষ্টি-জলবিন্দু বৃক্ষ-শস্যাদিতে প্রবেশ করে ও পুনর্ব্বার বীজত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা যেমন প্রথমে নিঃসঙ্কল্প থাকি, পরে সংকল্পদ্বারা অন্তরে বিষয়ের রচনা করি, পশ্চাৎ নির্ম্মাণ করি, জীব ও নিষ্ক্রিয়ভাব হইতে উত্থিত হইয়া সঙ্কল্প করে, এবং পরে তাহার ক্রিয়া কলাপ বিস্তার।

আত্মার জীবভাব স্বভাবসিদ্ধ, অহঙ্গাব-শূন্য জীব স্বাত্ম-দর্শনের অভাবে আপনাতে অহন্তাব ভাবনা করে। পূর্ব্ব-সঙ্কল্প-সংস্কার দ্বারাই সেই অহন্তাব উদিত হয়, কারণান্তরে নহে। বাসনার দৃঢ়তার সহিত পরং ব্রহ্ম পরম হইলেও অহন্তাবত্ব প্রাপ্ত হন। সেই অহন্তাব বাতস্পন্দের ন্যায় দেশ, কালাদিরূপে প্রস্ফুরিত এবং চিত্ত, জীব, মন, মায়া ও প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কল্পনাচ্ছাদিত চিত্তের আবরণে ব্রহ্মসত্তা জ্ঞান হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়েন। জ্ঞান এক বস্তুর অত্যাস্বাদে অন্য জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে।

মনে হইতে পারে যে যখন মনের অস্তিত্বজ্ঞান হইতেছে, যখন তাহার মূর্ত্তি জ্ঞান ভিন্ন কিছুই নহে, এবং জ্ঞান যখন আমার অন্তরেই রহিয়াছে, তখন ব্রহ্ম চৈতন্য আমার প্রত্যক্ষ ; কিন্তু তিনি অহংরূপে লব্ধ থাকিয়াও প্রকৃতপক্ষে অলব্ধ তাঁহাকে লাভ করিলেও এইরূপে লাভ করা লাভ না করার সমান।

আত্মা যত্নশতপ্রাপ্যো লব্ধেঽস্মিন্ ন চ কিঞ্চন।
লব্ধং ভবতি তচ্চৈতৎ পরমং বা ন কিঞ্চন॥

যোঃ উঃ ৮১।৯

সর্ব্বজীবই অদেহ ও চিদাকৃতি— ! চিদাত্মা কিন্তু মনের লভ্য নহে ; সাংসারিক বিচিত্র দুঃখ পরম্পরা দেহের চিদাত্মার নহে। দেহের অস্তিত্ব কিন্তু মনের উপর নির্ভর করে।

দেহের আতিবাহিকত্ব জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। সুবাসনার দৃঢ়তায় আতিবাহিকদেহ প্রাপ্ত হইলেই স্থূলদেহ বিশীর্ণ হইয়া যায়। বর্ত্তমান কাল্পনিক জ্ঞানে অহঙ্কার ও দেহ এক বলিলেই চলে। শাস্ত্রমতে কিন্তু একমাত্র আতিবাহিক দেহই আছে—আধিভৌতিক দেহ নাই। বাসনাদির দৃঢ়তায় অধ্যস্তজ্ঞানে আতিবাহিকে আধি-ভৌতিক জ্ঞান হয়, এবং অধ্যাসের উপশম হইলে প্রাক্তন আতিবাহিক উদয় হয়, মনই বাসনানুযায়ী ব্যবহার্য্য বস্তুতে আপনার অভিমত আকার সৃজন করে দেশ, কালাদির প্রতীক্ষা করে না। যেরূপে দেখে তাহাই দৃষ্ট হয় ; যে যে বিষয়কে যে প্রকারে জানে, সে বিষয় তাহার জ্ঞানে সেই প্রকারেই সমুদিত হয়, অর্থাৎ তাহাই তাহার জ্ঞানে তাহার সম্বন্ধে সত্য হইয়া দাঁড়ায়। ইন্দ্রিয়গণ থাকিলেও মন ব্যতীত প্রকৃত বস্তুদর্শন হয় না, মন হইতেই ইন্দ্রিয় উৎপন্ন, ইন্দ্রিয় হইতে মন উৎপন্ন হয় নাই। চিত্ত ও শরীর আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন, মনই বিচিত্র কার্য্যকরী হয় বলিয়া কার্য্য অনুসারে জীব, বাসনা, কর্ম্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রীয় পুরুষকার অবলম্বনে এই কল্পনাবরণ উন্মুক্ত করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, মোক্ষ অপৌরুষেয় নহে।

চিৎ বদ্ধ হয় না কিন্তু চিত্ত বদ্ধভাব ধারণ করে। সকল ভেদ জ্ঞান মনোবৃত্তির, চৈতন্যের নহে, তাহা বুদ্ধির অনতিরিক্ত। মনঃ প্রভৃতি ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয় বহির্মুখী বৃত্তিদ্বারা দেখে, শুনে ও অনুভব করে, সে সমস্ত কেবল নাম ও কেবলই কল্পনা, সুতরাং অসত্য। পুরুষকার দ্বারা বিচার ও ভাবনার সাহায্যে ঐ বাসনাময় মনকে ব্রহ্মে বিলীন করিতে পারিলে আর মন বা চিত্তের উদয় হয় না। অভ্যাস বশতঃ চিত্তও বিষয় দর্শনের অভাবে উপশান্ত হইয়া যায়।

কাল্পনিক অহঙ্কারই আত্মার সঙ্কোচক, এই অহন্তাবের ক্ষয়ের সহিত পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হন।

জল মধ্যস্থ মৃৎভাণ্ড যেমন জলের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সংসারাবস্থায় বিচিত্র ভাবরাশি বা দৃশ্যসমূহ এবং তদ্বিষয়ক বোধ, জ্ঞানের পরিপক্কতা জাত বোধের সহিত ব্রহ্মৈকরস হইয়া যায়—। আত্মতত্ত্বরূপে আত্মা চেতন এবং জগৎস্বরূপত্ব রূপে তিনি অচেতন। চিদাকাশের স্বপ্রকাশ-শক্তিতেই চিত্তের বা মনের প্রকাশ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মা ভিন্ন অন্য কাহারও স্বতঃ প্রকাশের শক্তি নাই, চিত্ত আত্মাতেই স্থিত।

যাহাদের চিত্ত ধ্যানপরিপাকে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ সমাধিবিলীন, তাহাদের দিবাও নাই, রাত্রিও নাই, দৃশ্য পদার্থও নাই এবং জগৎও নাই, তাহার কেবল আত্মাই থাকে, অন্য কিছুই থাকে না। এই প্রকৃত জ্ঞান লাভের উপায় আত্ম-বিচার। ঈশ্বরানুগ্রহে যদি এই বিচারের ক্ষমতা জন্মে তাহা হইলে আর অন্য গুরুর আবশ্যক হয় না, নিষ্কৃত আত্ম-বিচারই—পরমোত্তম গুরু বলিয়া পরিজ্ঞেয়।

> বিদিতপরমকারণাভজ্ঞাতা
>
> স্বমমনুচেতনসম্বিদং বিচার্য্য।
>
> স্বমননকলনানুসার এক-
>
> স্থিহ গুরুঃ পরমো ন রাঘবান্যঃ।
>
> যোঃ উঃ ৭৪।২৮

চিত্ত বা মন স্বস্বভাবে তরঙ্গমালার মত বিস্তৃত হইতেছে, তাহার আধার কিন্তু পরমাত্মা। বিচিত্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক দৃশ্য বিশ্ব এই মন হইতেই সমাগত। ভোগ্য বস্তুর ভাবনানুযায়ী অর্থাৎ যে প্রকার কল্পনার বস্তুর অভিলাষ হয় দেহও তদনুরূপেই স্পন্দিত হইতে থাকে। জল-পরিষিক্ত ক্রমবর্দ্ধমান লতার মত চিত্তে স্বসংকল্পজাত সুখ দুঃখাদি ভোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভয়প্রদ না হইলেও বাসনার আবেশে মন অতি ভীষণ হইয়া উঠে। বাসনার উচ্ছেদ হইলেই মনের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়। মনই দেহসম্পন্ন নর, দেহ জড় কিন্তু মন জড় নহে, আবার অজড়ও নহে। পক্ষান্তরে প্রাণ-শক্তি নিরুদ্ধ হইলেও মন বিলীন হয়, কারণ প্রাণ ও মন মূলতঃ একই বস্তু। প্রাণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, সেই প্রাণ যতক্ষণ শরীরে ক্রিয়াশীল থাকে ইন্দ্রিয়ও ততক্ষণ কার্য্য করে; ইন্দ্রিয় অবসন্ন হয় কিন্তু প্রাণের অবসাদ নাই।

মনের দেহাত্মিকা আমিত্ব বুদ্ধি অবিদ্যা, তাহার ভিত্তি বাসনা। ঐ অবিদ্যা দুঃখ প্রদানের জন্যই বর্দ্ধিত হয়, অবিদ্যা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, সেই হেতুই নিবৃত্ত হইয়া যায়, সমস্ত বাসনাই লিঙ্গশরীর আশ্রয় করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রতম শুক্ল-পীতাদি-রসবাহিনী সর্ব্বশরীর-ব্যাপিনী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ীর উপরেই সপ্তদশ অবয়ব ঘটিত লিঙ্গশরীর অবস্থান করে, সেই লিঙ্গশরীর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধির সমষ্টি মাত্র।

নীহারিকাচ্ছন্ন আকাশের মত মনঃশক্তির আবরণে জ্ঞানের মালিন্য ঘটে। মন যেখানে অহম্ভাবে পরিণত হয় সেইখানেই তাহার কল্পনানুযায়ী দৃশ্যেরও উদয় হয়। জীব চৈতন্য ও মনের অতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে। কিন্তু জীবের পক্ষে কল্পনা সত্য, ব্রহ্মের কল্পনা কল্পনাই। এই কারণেই সর্ব্বসঙ্কল্পবিরহিত অবস্থা ব্রহ্মানুভূতির একমাত্র ক্ষেত্র। নির্ম্মল ব্রহ্মপদে জীবমণ্ডলী প্রভাসিত হইতেছে। জগৎকে যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় তাহার কেবলমাত্র কারণ আত্মবিস্মৃতি। সেই বিস্মৃতির অবস্থাই মন এবং তাহাই পুনরুৎপত্তিবিধায়িনী। জীবের উৎপত্তির অপর কোন কারণ নাই, মন যাহা চিন্তা করে ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টা বা ক্রিয়া তদনুরূপই হইয়া থাকে, মনের সেই উন্মেষ সর্ব্বকর্ম্মের মূল কারণ। যে উপাধির সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, সেই উপাধির আকারে আকারিত হওয়াই চিত্তের স্বভাব।

মিথ্যা কল্পনার কবল হইতে চিত্ত ক্রমে মুক্তিলাভ করে। 'ভ্রান্তি' এই জ্ঞান হইবামাত্রই আপনা হইতেই চিত্ত ভ্রান্ত অবস্থা পরিত্যাগ করে। বর্ত্তমান জ্ঞানধারা কল্পনায় প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার স্বরূপাবস্থার অন্তরায়, এই জ্ঞান হইবামাত্রই চিত্ত অন্তর্মুখীন হয়, এই অন্তর্মুখীন হইবার সঙ্কল্প এই জন্মেই প্রয়োজন। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর ইন্দ্রিয়লয়ের জন্য পৃথক্ চিন্তার প্রয়োজন হয় না, কারণ বিষয় ও ইন্দ্রিয় একই, এক বিষয়লয় দ্বারাই ইন্দ্রিয়-লয় সিদ্ধ হয়। বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান বিচারসাপেক্ষ। সেই জ্ঞানের উন্মেষের সহিত অর্থাৎ বিষয়ের প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি হইলেই চিত্ত তাহাতে আর আশক্ত থাকে না।

বাসনাক্ষয়ে ইন্দ্রিয়ও আর বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না। বিষয়ের কাল্পনিক মূর্ত্তি জ্ঞানকে বদ্ধ রাখে। মাত্র বিষয় বন্ধের কারণ নহে। বন্ধনের স্বরূপজ্ঞান হইলেই বন্ধনের পরিত্যাগ সম্ভব হয়, নচেৎ অন্ধের পথ-পর্য্যটনের মত অভীষ্ট লাভ হয় না।

শ্রুতি ও আচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথের পথিক হইলেই অগাধ মোহ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কারণ, শ্রুতি ও আচার্য্যগণ জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা মন, চিত্ত বা বুদ্ধির অহম্ভাবাদিময়ী অবিদ্যার আবরণ অপসারিত করে।

আত্মজ্যোতিঃ প্রকাশক, বুদ্ধি প্রকাশ্য, সেই জ্যোতিঃ বুদ্ধির আকার প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি স্বভাবতঃই স্বচ্ছ এবং আত্মার অতি সন্নিহিত। এই কারণে উহা আত্মচৈতন্য জ্যোতির ঠিক অনুরূপ হইয়া থাকে, অন্ধকারে প্রদীপ যেমন সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক হয়, বুদ্ধিও তদ্রূপ আত্মার সমস্ত বিষয়-প্রতীতির প্রধান সহায় হয়। জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে বুদ্ধিই প্রধান; অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ কেবল তাহার দ্বার মাত্র।

উপরোক্ত অবিদ্যা পরিত্যাগের বাসনাই শুদ্ধা বাসনা; সেই বাসনা বা সঙ্কল্প বুদ্ধিসাধ্য। এবং তাহাই জন্ম-বিনাশিনী বলিয়া কথিত। এই অবিদ্যা-বরণ উন্মোচন স্বীয় প্রযত্নেই সিদ্ধ হয়। দেবতা, কাল কেহই কর্ম্মফলের বিঘ্ন করিতে পারেন না, তাঁহারা যথা সময়ে কর্ম্মের অনুকূলই হন। মোক্ষ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ঐ অবিদ্যার ব্যবধানে অপ্রাপ্তবৎ প্রতীত হয়।

চিত্ত বা মনোরূপ মহাব্যাধির চিকিৎসার্থ স্ব-পুরুষকারই অব্যর্থ মহৌষধ। যত্ন সহকারে অভ্যাসের সহিত চিত্তরূপ বালককে বিষয় বা বাহ্য বস্তু হইতে নিরস্ত করিয়া ব্রহ্মপদে সংযোজনের ফলে আত্মবোধ জন্মে। ব্রহ্মই মনন শক্তির উদ্রেকে মনঃপ্রাপ্ত হন। মনের প্রাতিভাসিক বা অধ্যস্ত জ্ঞানে আত্মাই মন ও জগৎ উভয়াকারে উদিত হইয়াছে। নিজকে জানিতে না পারাতেই আত্মা জীব হইয়া আছেন। সঙ্কল্পানুসারী হইয়া প্রকাশ পাওয়াই চিৎশক্তির স্বভাব, পদার্থের সত্যতাও ভাবানুগামী। শুদ্ধা বাসনার সঙ্কল্পে মন প্রথমে রাগশূন্য হয়; পশ্চাৎ বোধোদয়ে পরম পবিত্র জন্মাদিক্রিয়াশূন্য পূর্ণ শান্ত ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হেতু জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। তৎকালে মহাবিপদ উপস্থিত হইলেও তজ্জনিত শোক অনুভব করিতে হয় না। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আত্মার বিনাশ নাই, গতাগতি নাই। দেহ ক্ষয় হইলে ঐ উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীবাত্মা অনন্ত আত্মায় মিলিত হইয়া থাকে। আত্মনাশের কথা দূরে থাকুক, জ্ঞানাগ্নি ব্যতীত সংসারবিহারী মনও বিনষ্ট হয় না। দেহ-ভঙ্গ হইলে ঘটস্থ আকাশের মত দেহাভিমানী জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়। মনই মননরূপ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় মাত্র; মননমূর্চ্ছার পরেই জীবের পর-জগৎ দর্শন হইয়া থাকে, তাহাও তাহার পূর্ব্ব-সঙ্কল্পানুসারী। জীব ক্ষণকাল মাত্র মিথ্যা মরণ-মূর্চ্ছা অনুভব করিয়া প্রাক্তন ভাব বিস্মৃত হয়। এবং অন্যপ্রকার সংসার অনুভব করে।

অনুভূয় ক্ষণং জীবো মিথ্যা মরণমূর্চ্ছনম্।
বিস্মৃত্য প্রাক্তনং ভাবমন্যং পশ্যতি সুব্রতে॥

যোঃ উঃ ২০।১১

মনের অহম্ভাবজাত মমত্বই ইষ্টানিষ্টের কারণ, তাহারই সামর্থ্যে ভ্রান্ত হইয়া জীবমণ্ডলী স্বপ্নতুল্য সংসার দর্শন করিতেছে। জন্মের পর জন্ম চলে, পূর্ব্বজন্মের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের কোন কথাই স্মৃতিপটে উদিত হয় না। প্রতিজন্মে নূতন সংসার-রচনা। আসক্তির তাড়নায় সর্ব্ববিষয়েই কাল্পনিক আমিত্বের প্রভাব এত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পায়, যে তাহার মিথ্যাত্ব, পরিবর্ত্তনশীলতা, ক্ষণ-ভঙ্গুরত্ব ও আপাতরমণীয়তা জ্ঞানে স্থানই পায় না। স্বরূপোপলব্ধির বিচার হৃদয়ে জাগিলে আমি বা আমার যে কোন মূলাই নাই তাহা ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম হয়।

ব্রহ্মাকারা সম্বিৎ ও জগদাকারা সম্বিৎ এই দু'য়ের মধ্যে যাহার শক্তি অধিক হইবে তাহারই জয় অবশ্যম্ভাবী। স্বয়ং-সঞ্জাত বেগ অপেক্ষা যত্নজবেগ অধিক বলশালী। সত্যবিজ্ঞানের নিকট মিথ্যাবিজ্ঞান অত্যন্ত দুর্ব্বল। প্রযত্নোত্থিত ব্রহ্মসম্বিৎ অযত্নসুলভ জগৎসম্বিতের বেগকে জয় করিবেই করিবে। সদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ব্রহ্মসম্বিৎ বা ব্রহ্মজ্ঞান সত্য কিন্তু জগৎ জ্ঞানের রূপ কাল্পনিক বা মিথ্যা; তখন এইরূপ যত্ন করা উচিত যে, তাহাতে বাহ্যসম্বিৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বাহ্যজ্ঞান দুর্ব্বল হইলেই তাহা ব্রহ্মজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া যায়, ইহাই নিয়তির স্বভাব। নিজসম্বিতের প্রযত্ন ব্যতীত অন্য কেহ ফলদাতা নাই।

নিজে আত্মমাত্রাকার বৃত্তিধারা—এই চিন্তারূপ পৌরুষ দ্বারা চিত্তকে জয় করা যায়, শাস্ত্র ও সৎসঙ্গের প্রভাবে ধীরতা লাভ করিয়া চিন্তানলে অনুতপ্ত স্বীয় লৌহস্থানীয় মনের দ্বারা চিন্তানলতপ্ত লৌহান্তরস্থানীয় মনকে ভগ্ন করিতে হয়। চিত্তকে বালকের মত অল্পযত্নে আত্মবস্তুতে যোজিত করা যায়। পৌরুষপ্রযত্নে উদ্দীপিত করিলে চিত্তরূপ শিশু বশীভূত হইতে থাকে। আপনি আপনার

দ্বারা নিজ চিত্তকে বিশুদ্ধ করিতে হয়। বাসনাত্যাগরূপ পুরুষকারে অল্পে অল্পে মনকে শমিত করিতে হইবে, মনঃপ্রশমন ব্যতীত শুভলাভের সম্ভাবনা নাই। মন যদি প্রশমিত না হয়, গুরূপদেশ, শাস্ত্রানুশীলন এবং সকল সাধনই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সমস্তই সাধনের সাধ্য, সাধনের অসাধ্য কিছুই নাই, আপাতরমণীয় বিষয়ের দোষানুসন্ধানের ফলে যদি বিষয় অরমণীয় বলিয়া জ্ঞান জন্মে তাহা হইলেই অহঙ্কারমেঘ চৈতন্য, সূর্য্যকে আর আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। মুক্তিতে জগৎ উপশমপ্রাপ্ত হয় না; চিত্তই উপশমপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহাকে জগৎসৃষ্টি বলা যায় তাহা বস্তুতঃ চিদাকাশের বোধবিশেষের আবির্ভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বাসনার প্রাবল্যে চিত্তের জড়তা জন্মে; এবং তাহার ফলে কেবল অশান্তিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

উপনিষদে ইন্দ্রিয়গণ রথের অশ্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মন সেই অশ্বের রজ্জু এবং বুদ্ধি ঐ রথের সারথিরূপে উল্লিখিত। প্রাণ, মন ও বুদ্ধির অতীত, প্রাণ না থাকিলে বুদ্ধি ও মন কার্য্য করিতে পারে না, আবার মনঃসংযোগ ব্যতীত ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মশীলতা লোপ পায়। এই কারণেই হিন্দুশাস্ত্র মনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় পদে সংস্থাপিত করিয়াছে, বুদ্ধি মনের উপর, প্রাণ বুদ্ধির উপরে, সকলই কিন্তু এক আত্মার বিচিত্র বিকাশ, সেইজন্য যোগবাশিষ্ঠ মন ও প্রাণ মূলতঃ একই বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বিষয়-পিপাসা মন হইতেই সমুত্থিত হয়। পিপাসা না থাকিলে যেমন জলপানের ইচ্ছা থাকে না, যতদিন সংসারের সুখে সত্য বোধ থাকিবে, তাহার ক্ষণভঙ্গুরতা ও অনিত্যতা যতদিন উপলব্ধি না হইবে ততকালই ইহার রমণীয়তা অতি সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ সত্য-জ্ঞান থাকার জন্যই যাহা নিত্য তৎসম্বন্ধে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাই জন্মে না অর্থাৎ তাহা জ্ঞানের পক্ষে অসত্য হইয়া রহিয়াছে। চিত্তের এই অবস্থার ফলে হতাশা ও অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান কাল্পনিক জ্ঞানে স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা কোন কালেই সফল হইবে না। ব্রহ্ম বুঝিবার কালে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-সমন্বিত "অহং" অভিমানের আধারবিশেষকেই 'আত্মা' বুঝা হয়, এই জ্ঞানের বিষয় ক্ষুধা-পিপাসা-বিশিষ্ট বস্তু ভিন্ন অন্য কিছুই তাহার বুদ্ধি-গোচর হয় না। যে শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারা এই শরীরে উৎপত্তি হইয়াছে সেই কর্ম্মই বিপরীত জ্ঞানের হেতু। যদি আপাতরমণীয় বিষয়ে দোষানুসন্ধানপূর্ব্বক অরমণীয় বলিয়া জ্ঞান জন্মে তাহা হইলেই মনোজয় অবশ্যই সম্ভব হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আত্মশ্লাঘাহীনতা অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আত্মনিগ্রহ-বিষয় বৈরাগ্য, জন্ম-মৃত্যু জরা ও ব্যাধিতে দুঃখ ও দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, পুত্র-স্ত্রী ও গৃহাদি পদার্থে অনাসক্তি, পুত্রাদির সুখ-দুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা এবং ইষ্টানিষ্টলাভে সর্ব্বদা সমচিত্ততা সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টিদ্বারা অব্যভিচারিণী ভক্তি ইত্যাদিকে জ্ঞানরূপে অভিহিত করিয়াছেন এবং যাহা তাহার, বিপরীত, তাহাকে অজ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, ভয়—এই সমস্তই মনের পরিণামবিশেষ, 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার জ্ঞানই মনের শরীর। সর্ব্বপ্রকার বাসনা এবং বিষয়-তৃষ্ণার পশ্চাতে এই কল্পিত আমিত্ব বর্ত্তমান। এই পরিবর্ত্তনশীল কাল্পনিক আমিত্বে অনাস্থা আসিলেই মনের শরীর ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। আধারসূত্র ছিন্ন হইলেই মানসিক বিকল্প কল্পনাও তিরোহিত হইয়া থাকে। সঙ্কল্প বর্জ্জনে বায়ু-প্রবাহিত অতি ঘন মেঘের মত বাসনাসমূহ বিলীন হইয়া যায়। এই মন ক্রমে ক্ষীয়মাণ হইয়া চিত্তোপশমার্থী-দিগকে অনুপম আনন্দ দান করে। অপর পক্ষে যদি সঙ্কল্প বৃদ্ধি করা যায় এইরূপ লক্ষ লক্ষ সংসার একমাত্র চিদণুর অন্তরে কল্পিত, ব্যক্ত ও বিভক্ত দৃষ্ট হইবে, অথচ তাহাতেও সঙ্কল্পের পরিশেষ হইবে না। বাসনাশূন্য হইয়া সন্তোষমাত্র অবলম্বন করতঃ মনকে সম্যক্ প্রকারে জয় করা যায়—ইহাই যোগবাশিষ্ঠের মত।

মন যে পদার্থে ও যেরূপ বাসনায় তীব্রবেগ-সম্পন্ন হয়, তাহার নিকট সেই প্রকারই সেই পদার্থ পরিদৃষ্ট ও বাঞ্ছিত হয়। মনের সেই বাসনাজাত তীব্র বেগ জলে বুদ্‌-বুদের ন্যায় স্বাভাবিক কিন্তু উপেক্ষার প্রাবল্যে তাহার

অভ্যুদয় এবং নিরোধ-প্রযত্নে তাহার বিলয় ঘটিয়া থাকে। মনের চঞ্চলতা বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বাভাবিক। চিত্তে যে চাঞ্চল্য বা স্পন্দন শক্তি রহিয়াছে তাহাই জগতের কাল্পনিক মূর্ত্তি সৃজন করে, স্পন্দন ব্যতীত বায়ুর পৃথক অস্তিত্ব প্রতীত হয় না, সেইরূপ চিৎস্পন্দ ব্যতীত এই জগতের কোন পৃথক উপাদান বা রূপ নাই। মনের বিলয়ে সর্ব্বদুঃখপ্রশান্তি এবং তাহার স্পন্দনে দুঃখ-পরম্পরা সমুদিত হইয়া থাকে। ঐ চাঞ্চল্যবর্জ্জিত মনকে মৃত বলা হয় এবং তাহাই মোক্ষ। শাস্ত্রকারেরা এই মানস চাঞ্চল্যকেই অবিদ্যা বলেন, সকল বাসনাই এই মানস চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি, সুতরাং তাহারা অবিদ্যাপদবাচ্য। মন জাড্য অনুসন্ধানের দৃঢ় অভ্যাসে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং বিবেকানুসন্ধানের দৃঢ় অভ্যাসে চিদংশারূঢ় হয়, চিত্তের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়।

পুরুষকার প্রয়োগে এই মনকে যাহাতে নিযুক্ত করা যায়—অভ্যাস দৃঢ় হইলে তাহাই লাভ হয়। সংসারচিন্তায় নিমগ্ন মনকে যদি শাস্ত্রীয় উপায়ে বলপূর্ব্বক উদ্ধার না করা হয় তদুদ্ধারের আর অন্য উপায় থাকে না। একমাত্র মনই মনের নিগ্রহে সমর্থ।

"মন এব সমর্থং বো মনসো দৃঢ়নিগ্রহে।
অরাজা কঃ সমর্থঃ স্যাৎ রাজ্ঞো রাঘব নিগ্রহে॥"

যোঃ উঃ ১১৪

মনোহি মনসা গ্রাহ্যম্—মহাঃ শান্তিপর্ব্ব

মনদ্বারাই মনোরূপ বন্ধনরজ্জু ছেদন করিয়া আত্মাকে বিমুক্ত করিতে হয়। একমাত্র মনই বিষয়তৃষ্ণাপূর্ণ বাসনা-বর্ত্তে পতিত মানবগণের নৌকাস্বরূপ—সংসারবন্ধন মোচনের অন্য উপায় নাই।

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ গীতা ৬।৫

সংসার বাসনায় বিকার, বাসনা মৃদু হইলেও অত্যন্ত তীক্ষ্ণা অন্তঃসারশূন্যা হইলেও সারময়ীর ন্যায় প্রতীতা হয়, ভিত্তিহীন হইলেও সর্ব্বত্র বিদ্যমানার ন্যায় লক্ষিতা হইয়া থাকে, এই চিত্তস্পন্দোপজীবিনী অবিদ্যা স্বয়ং জড়রূপিণা হইয়াও চিন্ময়ীর ন্যায় এবং নিমেষাপেক্ষায়ও অস্থায়িনী হইয়াও চিরস্থায়িনীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। এই অবিদ্যা পরমাত্মার প্রসাদে বিবিধ আকার প্রসব করে এবং তাহার সাক্ষাৎলাভে বিনষ্ট হয়। নানাকারে পরিদৃশ্যমান হইলেও মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় শুষ্ক, ললনার ন্যায় চপলা ও লুব্ধা। মমতাক্ষয়ে অবিদ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আশা দ্বারা সজীব থাকে, পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও পুনঃ পুনঃ তিরোহিত হয়, কেহ প্রার্থনা না করিলেও উপস্থিত হইয়া থাকে। আপাততঃ রমণীয় হইলেও বিবিধ অনর্থদায়িনী অবিচ্ছেদে বহমান হইতেছে, দাহসদৃশ দুঃখপ্রদায়িনী জীবে আবিষ্ট হইয়া তাহাদের পরমার্থরূপ রস পান করতঃ অবিদ্যা সর্ব্বত্র ভ্রাম্যমাণা তৃণনির্ম্মিত রজ্জুর ন্যায় সংসার-সংস্কারে সুদৃঢ়া, জনগণ ইহাকেই বর্দ্ধনশীল বোধ করে, কিন্তু ইহা বর্দ্ধিত হয় না, বিষমিশ্রিত মোদকের ন্যায় আপাতমধুরা অথচ পরিণামে অত্যন্ত দারুণা—তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে ইহা যে কোথায় যায় তাহা জানা যায় না, স্রোত রুদ্ধ হইলে যেমন নদী শুষ্ক হইয়া যায়, তেমনি বিচারে এই অবিদ্যার নিরোধ এবং তন্নিরোধে মনের অভাব হইয়া থাকে। অবিদ্যার রূপ নাই, রস নাই, আকার নাই, চেতনা নাই, সত্যতাও নাই, বিনাশ প্রাপ্তও হয় না—অথচ জগৎকে অন্ধীকৃত করিয়া রাখিয়াছে জ্ঞানালোকে বিনষ্ট হয়, অজ্ঞানান্ধকারে স্ফুরিত হইয়া থাকে, কাম ও ক্রোধ তাহার অঙ্গ—তমঃ তাহার মুখ। ব্যবহারে এই অবিদ্যা করুণোৎফুল্ল-নয়না স্নেহসমুল্লসিতা গৃহিণীর ও জননীর অনুরূপ।

সকল দেহেই ব্রহ্ম বা আত্মা বিরাজমান আছেন। কিন্তু মনুষ্যদেহই মনোহর ব্রহ্মোপলব্ধির প্রধান ক্ষেত্র। বিদ্বান্ পুরুষ জীবন্ত অবস্থাতেই অমৃত বা মুক্ত হয়েন, এই বর্ত্তমান শরীরে থাকিয়াই বিমুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মভাব ভোগ করেন। "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি।" (বৃহদারণ্যক ৪র্থ ব্রাহ্মণ ৫র্থ অধ্যায়)।

যতদিন না মোহক্ষয়কারিণী আত্মদর্শনেচ্ছা উদিত হয়, ততদিন ঐ অবিদ্যা দেহাভিমানী জীবকে পাতিত করিয়া পুনঃ পুনঃ বিলুণ্ঠিত করে। বিচারের প্রভাবে সমস্ত বিষয়াসক্তিকে অভিভূত করা যায়। পরমাত্মবিষয়ক বোধ উদিত হইলে অবিদ্যা স্বয়ংই অদৃশ্য হইয়া পড়ে। চিত্তস্থ বাসনার প্রাচুর্য্যেই সংসার-বন্ধন দৃঢ় হয়; বাসনার ক্ষয় কালে নহে। ভোগাশারূপিণী অবিদ্যা পুরুষকার সাহায্যেই তিরোহিত হয়, অপর কিছুতেই নহে।

আমি মাংস নহি, অস্থি নহি, দেহও নহি—আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়বান্ অন্তঃকরণকে ক্ষীণা অবিদ্যা বলে। আত্মার অদর্শনে ঐ অবিদ্যার বিস্তৃতি এবং তাহার দর্শনে উহার বিনাশ। মন যাহা অনুসন্ধান করে, ইন্দ্রিয়গণ রাজ-আজ্ঞা পালনের মত তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করে, কিন্তু এই মন নিত্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়। কল্পনাচ্ছাদন বশতঃ ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। বাসনাই আমার পুত্র - আমার ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি রূপ অহম্ভাব করাইতেছে। কিন্তু তাহাদের আধার আত্মতত্ত্বব্যতীত অপর কিছুই নহে। দেহ ও দেহী সংশ্লিষ্ট থাকিলেও এক নহে ভস্ত্রা দগ্ধ হইলে তন্মধ্যস্থ বায়ু দগ্ধ হয় না, সেইরূপ দেহ ভগ্ন হইলে আত্মা বিনষ্ট হয় না, মন ও বিনষ্ট হয় না। অবিদ্যা মনোবৃত্তি দ্বারাই স্থূলত্ব ও বিস্তার লাভ করে। তাহার ফলেই সুখদুঃখাদি ভোগ।

দেহ জড়, সেই জন্য তাহার দুঃখই নাই। যাহাকে দেহী বলা যায়, তাহারই অবিদ্যা প্রযুক্ত দুঃখানুভূতি ঘটে। অজ্ঞানই সেই দুঃখের কারণ এবং সেই অজ্ঞানই স্থূলত্ব অবিচারের মূল। সেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থায় মন বিবিধ বৃত্তি ধারণ করিয়া নানা আকারে চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এই মনই শরীরে উদিত হয়, শোকাচ্ছন্ন হয়, ক্রন্দন করে, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, বিচলিত হয়, প্রশংসা করে ও নিন্দা করে। শরীর ঐ সকলের কিছুই করে না। গৃহস্বামী কার্য্য করে, গৃহ কিছুই করে না, জীবই দেহমধ্যে থাকিয়া বিবিধ কার্য্যে রত হয়। জড় দেহ মনের ক্রীড়নক মাত্র। সকল সুখদুঃখের কর্ত্তা ও ভোক্তা মন; মনই দেহেন্দ্রিয়ের সম্পর্কবশতঃ কর্তৃত্বজ্ঞানে দুঃখ-কষ্টাদি ভোগ করে। কর্ত্তৃত্ব দেহেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক বশতঃই জন্মে; অন্যথা নহে। এই কারণেই স্বপ্রকৃত কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম সঞ্চিত হয় না এবং তাহার ফলভোগও নাই। সঙ্কল্পাভিমানী পুরুষের চিত্ত বিবেকসম্পন্ন হইলেই সেই চিত্তে পূর্ব্বোক্ত যোগভূমিকা সকল ক্রমানুসারে আবির্ভূত হয়। যাঁহারা ভোগবিরত এবং বর্ত্তমান কাল্পনিক বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণের বশ্য নহেন, তাঁহারাই জগদাকারে দৃশ্যমানা মায়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন।

> যে তু পারং গতা বুদ্ধেরিন্দ্রিয়ৈর্ন বশীকৃতাঃ।
> ত এনাং জাগতীং মায়াং পশ্যন্তি করবিল্ববৎ॥
>
> যোঃ স্থিতি—৬৮।২

এই সৃষ্টির মূল বা সার বোধ। সেই জন্যই মনে সকল বিষয়ের অস্তিত্ব সম্ভব।

দেহাবচ্ছিন্ন পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না, দেহ ব্যাপারে লিপ্ত বা আসক্ত হন না। যেমন প্রস্তরে জল নাই, জলে অনল নাই, তেমনি স্বরূপাবস্থায় চিত্ত বা মন নাই। তথায় কল্পনা কল্পনাই, চিত্ত বা মন কল্পনা মাত্র। অধ্যাত্মশাস্ত্র ও সৎ-সংসর্গ এই দুইভিন্ন অন্য উপায়ে মহাপ্রবাহশালিনী চিত্ত, মন, বুদ্ধি বা অবিদ্যা-নদী পার হওয়া যায় না। শাস্ত্রানুশীলন ও সৎসঙ্গের প্রভাবে চিত্তশুদ্ধি জন্মে। এই মনঃ-প্রশমন সিদ্ধির উপায় মনেরই নিগ্রহ এবং স্বীয়মনই তাহা করিতে সক্ষম। এই কারণে মনই মানবগণের ভবার্ণব তরঙ্গের নৌকাস্বরূপ। ইন্দ্রিয়জয়রূপ সেতুদ্বারা ঐ ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়, মনই সর্ব্বরূপী, সেই জন্য মনেরই চিকিৎসায় প্রযত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

মনের প্রকৃত রূপ কি, তাহা জ্ঞান হইলেই বিবেকবুদ্ধি জন্মে। তখন স্বরূপ প্রত্যাবর্ত্তনের বাসনা চিত্তে উদিত হয়, ঐ মহাবাসনা উদিত হইলেই সেই বাসনা অনন্তসুখদা ও ব্রহ্মপদদায়িনী হয়। বাসনা ব্রহ্ম হইতেই আসে সত্য, কিন্তু কল্পনাবসানে ব্রহ্মকেই স্মরণ করতঃ ব্রহ্মেই লীন হয়

ভুবনত্রয় বাসনাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মে উদিত হইয়াছে। সকল বাসনাই প্রকৃতপক্ষে স্বরূপাবস্থার অভাব বশতঃ জাত; কিন্তু কল্পনার ভেদে ভ্রান্তজ্ঞানে তাহা নানা বিষয়ে ধাবিত হয়। আপনাকে চিনিলে বা স্বরূপে পৌঁছাইলেই সমস্ত জানা যায়। নিত্যানিত্য বিচারের ফলে এই মনই মুক্তির কারণ হইয়া উঠে। সাধনার ফলে মনই স্বয়ং গন্তব্য স্থানের পন্থা অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়া দেয়। এই কারণেই উপনিষৎ চিন্তাদ্বারাই প্রাণের ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

> "যেনাসৌ পশ্যতে মার্গং প্রাণস্তেন হি গচ্ছতি।"
>
> অমৃতবিন্দু ২৫ শ্লোক।

দুহিতা ও অন্যান্য পরিজন

জনৈক গৃহী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ষীয়ান ও বর্ষীয়সী—শিশুকে যেমন যত্নসহকারে লালন পালন করিতে হয়, ইঁহাদিগকেও তেমনি আন্তরিক যত্নের সহিত সেবাশুশ্রূষা করা অবশ্যক। অতি-বার্দ্ধক্য মানুষের দ্বিতীয় শৈশব (second childhood)। শিশু যেমন নিজের কোন প্রয়োজন সাধন করিতে অসমর্থ, ইহারাও সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার কার্য্যসাধনে অক্ষম না হইলেও অধিকাংশ কার্য্য ইহাদের ক্লেশসাধ্য। তদ্ভিন্ন ইঁহাদের স্মরণশক্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়—কোন্ সময়ে কোন্ কাজ করিতে হইবে, সে-বিষয়ে খেয়াল থাকে না এবং পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা লোকের নাম সহজে স্মরণ করিতে পারেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইঁহাদের স্নানাহারের ব্যবস্থা করা উচিত। নচেৎ ইঁহাদের মেজাজ খারাপ হয়। ইঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, সে-বিষয়েও অপরের দৃষ্টি আবশ্যক। ইঁহাদের মেজাজ সাধারণতঃ খিট্‌খিটে হয়, সকলের কার্য্যে ত্রুটিগ্রাহিতা ইঁহাদের স্বভাবজাত হইয়া উঠে, কোন বিষয়ে সামান্য ত্রুটী হইলেই ইঁহারা অনুযোগ ও তিরস্কার করেন। ইঁহাদের এই প্রকৃতি বিশিষ্টতা (idiosyncrasy) সহ্য করিতে হয়।

বার্দ্ধক্যে মিতাহার বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতিহার বর্ষীয়ানের পক্ষে মারাত্মক—ইহা স্মরণ রাখা উচিত। পরন্তু মিতাহারের ফলে আয়ু দীর্ঘতর হইবার সম্ভাবনা অধিক। হিন্দুবিধবাদিগকে প্রায়ই দীর্ঘায়ু হইতে দেখা যায়; ইহা মিতাহারের ফল। তাঁহারা একবেলা নিরামিষ ভোজন করেন এবং রাত্রিকালে সামান্য জলযোগ করেন। তদ্ভিন্ন ইঁহাদের উপবাস ও অর্দ্ধোপবাস বহুসংখ্যক। প্রতিমাসে দুইবার একাদশীর নিরম্বু উপবাস।

মধ্যে মধ্যে ইঁহাদের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে এবং কাছে বসিয়া ইঁহাদের সহিত কিয়ৎকাল কথোপকথন করিলে ইঁহারা প্রীত হন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ বা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া শুনাইলে বৃদ্ধারা অতিশয় সন্তোষ লাভ করেন—কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত শুনিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। কৃতবিদ্য বর্ষীয়ান কেবলমাত্র রামায়ণ মহাভারত শুনিয়াই পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারেন না। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা বা অভাব না ঘটিলে তাঁহারা নিজেরাই সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদি পাঠ করেন, কিন্তু দর্শন-শক্তি ক্ষুণ্ণ হইলে তাঁহাদের রুচিসম্মত গ্রন্থ ও সংবাদপত্র পড়িয়া শুনাইতে হয়। শুনাইবার লোকের অভাব হইলে তাঁহাদের চিত্তবিকার উপস্থিত হয়।

বৃদ্ধা পিতামহী ও মাতামহীর কাছে নাতিনাতিনীরা গল্প শুনিতে ভালবাসে। সন্ধ্যার পরে যখন তাহাদের পাঠ-অভ্যাস সমাপ্ত হয়, তাহারা পিতামহীর নিকটে (মাতামহীকে মাতুলালয়ে ভিন্ন পাওয়া যায় না) "রূপকথা" শুনিবার জন্য সমবেত হয়। উপকথার মধ্যেও শিখিবার বিষয় অনেক থাকে। তবে গল্প শুনাইতে শুনাইতে বালকবালিকাদিগকে অনেক সময়ে "জুজুর" ভয় দেখান হয়; ইহা ভাল নহে। কারণ, ইহার ফলে সুকুমারমতি বালক-বালিকার চিত্তে ভূতের ভয় প্রভৃতি বদ্ধমূল হইবার সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ জীবনে ইহারা সকল কার্য্যে সাহস-হীনতার পরিচয় প্রদান করিবে ইহাও অসম্ভব নহে। ফলতঃ হিন্দুস্থানে সাহসবিহীন ও "ভীতু" লোক বহু-পরিমানে দৃষ্টিগোচর হয়। অনেকের সৎসাহসেরও (moral courage)অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেরূপ দুরূহ, সচরাচর যে-সকল ভৌতিক গল্প

শোনা যায়, তাহা শুনিবার পর ভূতের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করাও সেইরূপ কঠিন। যাহা হউক "ধান ভানিতে শিবের গীত" গাহিবার অভিপ্রায় নাই। তবে বালক-বালিকাগণকে এমন গল্প বলিতে নাই—যাহা শুনিয়া তাহাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে। তাহাদিগকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যেও ভয় দেখান অনুচিত।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা উভয়েই নাতিনাতিনীর সংসর্গ ভাল বাসেন। সন্ধ্যাকালীন আহ্নিকপূজা সমাপ্ত হইলে ইঁহারাও রাত্রিকালের মত নিশ্চিন্ত হয়েন এবং বালক-বালিকাগণও পাঠ ও আহার সমাপ্ত করিয়া নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। আহারের অব্যবহিত পরেই শয্যা আশ্রয় করা অনুচিত। অনেকের মতে সান্ধ্য বা নৈশ আহারের পরে অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল জাগরণ আবশ্যক; কারণ, ইহাতে ভুক্তখাদ্য-পরিপাকের সৌকার্য্য হয়। এই সময়ে ছোট ছোট বালক-বালিকা বৃদ্ধার নিকট উপকথা এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্থ বালক-বালিকা বৃদ্ধের নিকট মহৎ ব্যক্তিগণের ও মহিয়সী রমণীগণের চরিত্রের ও কার্য্যাবলীর ইতিহাস আখ্যায়িকা শ্রবণ করিতে পারে। ইহাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দুই-ই লাভ করা যায়। অধিকাংশ বালক-বালিকা এইরূপ গল্প শুনিতে শুনিতে নিদ্রাগত হয়।

আধুনিক কালের বালক-বালিকা উপকথা (Folk tales) এবং পুরাকালীন আচার ও সামাজিক পদ্ধতি সম্বন্ধে উপাখ্যানাবলী (Folk love) অবগত নহে, কারণ, তাহারা এ-গুলি শুনিবার সুযোগ পায় না। সে-কালে বালিকাগণ বৃদ্ধাদের কাছে কত গাথা, কত ছড়া প্রভৃতি শুনিতে ও শিখিতে পাইত! এ-গুলি বহুকাল, হয় ত' স্মরণাতীতকাল হইতে, মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহা আক্ষেপের বিষয়, কারণ, অনেক গাথা ও ছড়া শিক্ষাপ্রদ। অনেক ব্রতকথাও এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, তবে বটতলার কল্যাণে ইহাদের অধিকাংশ মুদ্রিত হইয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; কয়েক বৎসর হইতে নানাবিধ বৃহদাকার গ্রন্থও প্রকাশিত হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বেও উল্লিখিত গল্পগুলির যথেষ্ট আদর ছিল। অনেকগুলি গল্পের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া স্বর্গীয় অধ্যাপক লাল-বিহারী দে "Folk Tales of Bengal"-নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাঞ্জল ও সহজ ভাষায় লিখিত হওয়ায় ইহা তরুণগণের সুখপাঠ্য। এক সময়ে ইহা জনপ্রিয়, অন্ততঃ তরুণগণের প্রিয় ছিল। ইদানীং গ্রন্থখানির জনপ্রিয়তা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ছেলেকে ঘুম পাড়াইবার জন্য কতকগুলি গান ও তাহাকে খেলাইবার জন্য কতকগুলি "ছড়া" দেশপ্রসিদ্ধ ছিল। এগুলি বৃদ্ধাদের কাছে শিখিতে হইত এবং বালিকারাই ইহা আগ্রহ সহকারে শিখিয়া আয়ত্ত করিত, কারণ, অধিকাংশ স্থলে, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে, যেখানে, ছেলের মাকে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিতে হয়, বালিকাগণই ছোট ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া থাকে। ছেলেকে আদর করিবার উপযোগী "ছড়া"ও প্রচলিত ছিল এবং তাহা বৃদ্ধাগণই প্রথমে শিখাইতেন। এইরূপ শিক্ষাদানের স্পৃহা বৃদ্ধাদের অদ্যাপি আছে, কিন্তু, তাঁহারা যাহাদিগকে শিখাইতে চাহেন, তাহাদের শিখিবার আগ্রহ কোথায়?

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে এবং অনেকেই অবগত আছেন যে, হিন্দু বিধবা একাদশীতে নির্জ্জলা উপবাস করিয়া থাকেন। বর্ষীয়সী বিধবাকে একাদশীর উপবাস কোন্ দিন করিতে হইবে, তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাঁহারা দিন গণনা করিয়া কতক হিসাব রাখেন, কিন্তু দিনের হিসাবে তিথির হিসাব শুদ্ধ হইতে পারে না; সেইজন্য পঞ্জিকা দেখিতে হয়। বৃদ্ধা হইলেও বিধবারা যথাসময়ে বাড়ীর অন্য কোন পরিজনকে পঞ্জিকা দেখিতে বলেন। পুত্রবধূ বা পৌত্রবধূর কর্ত্তব্য যথাসময়ে পঞ্জিকার সাহায্যে একাদশীর উপবাসের দিন পরিজ্ঞাত হইয়া পূর্ব্বদিবসে বৃদ্ধার রাত্রিকালীন জলযোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, অথচ এমন সময়েও এমন পরিমাণে বৃদ্ধাকে ভোজন করানো উচিত, যাহাতে একাদশীর মধ্যে ভুক্ত দ্রব্যের উদ্গার উত্থিত না হয়, কারণ, তাহা হইলে ব্রত ভঙ্গ হয়।

মিতাহারের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিধবাগণ যেমন নিরামিষ ভোজন ও একাহারের ফলে দীর্ঘজীবন

লাভ করেন, বৃদ্ধগণ যদি আহার বিষয়ে অনুরূপ রীতি অবলম্বন করেন, মনে হয়, তাঁহারাও দীর্ঘজীবী হইতে পারেন। নিতান্ত অথর্ব্ব না হইলে বৃদ্ধগণেরও কিছু কিছু ভ্রমণ করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। কলিকাতার পার্কগুলিতে অনেক বৃদ্ধকে দুইবেলাই বেড়াইতে ও বসিয়া থাকিতে দেখা যায়; কেহ কেহ গড়ের মাঠে, অবশ্য দৈহিক সামর্থ্য থাকিলে, বেড়াইতে যান। দেখিতে পাওয়া যায় যে, দীর্ঘকাল চাকরীজনিত পরিশ্রমের পরে যে সকল পেন্সনভোগী ব্যক্তি গৃহে শুইয়া বসিয়া আরাম ও পেন্সন ভোগ করেন, তাঁহাদের ভাগ্যে পেন্সন ভোগ অধিক দিন ঘটে না। ভ্রমণের অভ্যাস থাকুক বা না থাকুক, বৃদ্ধদিগের পক্ষে রাত্রিকালে লঘু আহার প্রশস্ত। পরন্তু, রাত্রি নয়টার মধ্যে ইহাদের আহার সমাপ্তি আবশ্যক। রাত্রি নয়টার পরে যাহা খাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয় না এবং আমে পরিণত হয়। ইহা হইতে ক্রমশঃ গ্রহণী রোগের সৃষ্টি হইতে পারে এবং তাহার ফলে বৃদ্ধের আয়ু সংক্ষেপ সম্ভাব্য। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যে সকল বৃদ্ধ স্বীয় মস্তিষ্ক সর্ব্বতোভাবে অচল করিয়া রাখেন এবং ভ্রমণে বা অনুরূপ কায়িক পরিশ্রমে বিরত থাকেন, তাঁহাদের ক্ষুধামান্দ্য অবশ্যম্ভাবী।

মৎস্য ও মাংস যে গুরুপাক ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৃদ্ধদিগের পক্ষে, (বিশেষতঃ, যাঁহাদের স্বাভাবিক দন্তের অভাব), মৎস্য-মাংস ভোজন পরিবর্জ্জনীয়, বিশেষতঃ মাংস। যাঁহারা মাংস পরিত্যাগ করিতে একেবারেই নারাজ, তাঁহারা যদি স্যুপ (soup) খাইয়া আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারেন, তাঁহাদের পাকস্থলী বিশেষ বিব্রত হয় না। পাকস্থলীকে নিয়ত বা পুনঃ পুনঃ বিব্রত করিলে উহা ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য পাকস্থলীর বিকৃতি উপস্থিত হইলে নানাবিধ ব্যাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। বালক ও যুবক জীবনীশক্তির আধিক্যপ্রযুক্ত ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বৃদ্ধের মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত। বার্দ্ধক্যে অধিকাংশ লোক বাতব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। মদ্য ও মাংস তাঁহাদের পক্ষে বিষ। মৎস্যপরিহারও বাতরোগাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী। মাংস বা অধিক পরিমাণে মৎস্য ভক্ষণ করিলে পিপাসার আতিশয্য হয়, ইহা মৎস্যমাংসের দুষ্পাচ্যতার অন্যতম লক্ষণ। কেহ কেহ বলেন মাছ না খাইলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ ও মাখন খাইলেও নিরামিষাশীর দর্শনশক্তির ব্যত্যয় হয় না। শেষোক্ত মতই যথার্থ বলিয়া অনুমিত হয়, কারণ, পুরাকালের ঋষিদের কথা না ধরিলেও, যে সকল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, অথচ, অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় নিরত এবং স্বহস্তে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতির টীকা লিখিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদিগকে দৃষ্টিশক্তির বিকার সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে শুনা যায় না।

বৃদ্ধগণ সাধারণতঃ বহুভাষী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণা এই যে, যাহাদের বয়স পঞ্চাশতের অনধিক, তাহারা স্বল্পদর্শী ও বহুবিষয়ে অনভিজ্ঞ। এইরূপ বয়োকনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সহিত যে-কোন বিষয় সম্পর্কে কথোপকথনের বা আলোচনার সময়ে তাঁহাদের সুপ্তপ্রায় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ভাবসাহচর্য্যের (association) ফলে উদ্বুদ্ধ হইয়া অর্দ্ধরুদ্ধ স্মরণদ্বারে আঘাত ও তাহা উন্মুক্ত করে এবং তাঁহাদের যে জ্ঞানধারা ভাষার সাহায্যে প্রবাহিত হয়, তাহার গতিরোধ তাঁহাদের সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। অন্য কেহ তাহার গতিরোধের চেষ্টা করিলে বৃদ্ধ যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়েন। যেমন শিক্ষক স্মৃতিনিবিষ্ট করাইবার উদ্দেশ্যে ছাত্রের নিকটে একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেন, সেইরূপ বৃদ্ধও একই উদ্দেশ্যে উত্থাপিত বিষয় সম্বন্ধে এক কথা একাধিকবার কহিয়া থাকেন; ইহাতে শ্রোতৃবর্গের বিরক্তি প্রকাশ অনুচিত। পরন্তু বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে কখনই, কোন বিষয়ে ও কোনরূপে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা উচিত নহে।

বৃদ্ধবৃদ্ধাবিষয়ক বিবৃতির সঙ্গে এ প্রবন্ধ সমাপ্ত হইল। প্রবন্ধের দীর্ঘতানিবন্ধন যদি কোন পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, তাঁহারা অন্ততঃ, "ক্রমশঃ"-র বালাই হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। যাঁহাদের শিক্ষাকল্পে প্রবন্ধটি লিখিত হইল, যদি তাঁহারা আলোচ্য বিষয়গুলি শিখিবার উপযুক্ত মনে করেন এবং উহা হইতে কথঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করেন, তাহা হইলে লেখকের উদ্দেশ্য যত্ন ও পরিশ্রম সফল হইবে।

সমাপ্ত

তীর্থযাত্রা

(গল্প)

গা সেন, এম, এ

"ছুটী,—ছুটী কোথায় বল?" মুখের চেহারাকে যথেষ্ট বিপন্ন করে অসিত মায়ার মুখের দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকালো।

"কেন? সুলতানপুর থাকতে তো দেখি ছুটীর অভাব হয় নি! তোমার বছরের পাওনা ছুটীগুলিও কী হাত খরচের টাকার মতোই হয়ে উঠলো না কী?" মায়ার কণ্ঠস্বর রীতিমতো ধারালো হয়ে উঠলো।

পুরোণো কথার জের টেনে অসিত ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলো, "ছুটী পেলেই বা টাকা কোথায়?"

আগুনের ফুল্‌কির মতো মায়ার মুখ থেকে তপ্ত বাক্যবান অসিতের গায়ে ছিটকে পড়লো, "কত চুনোপুঁটি ঘুরে এল, আর আমার বেলায়ই যত টাকার প্রশ্ন। এক পা বাড়ালেই যেখানে দিব্যি চলে যাওয়া যায়, সেখানে যাওয়ার জন্যে আমার আর খোসামুদীর অন্ত নেই। মন থাক্‌লে আবার টাকার চিন্তা ওঠে না কি? পাড়ায় কারো যেতে বাকী আছে না কী?" শাণিত চোখ নিয়ে মায়া একটু এগিয়ে এল।

"পাড়ার সবাই গেলে যে তোমারও যেতে হবে, এর কোনো মানে আছে না কী?" অসিত খেঁখিয়ে উঠলো। এবার সে রাগ করতে সুরু করেছে।

"নিজে তো দিব্বি মজা করে ফাঁকি দিয়ে একা একা 'আগ্রা ঘুরে এসেছিলে! তখন তো পাড়ার লোকের সঙ্গে তাল বজায় রেখেছিলে, আর আমার বেলায়ই বুঝি কোন মানে খুঁজে পাচ্ছ না। বৌকে বাদ দিয়ে তাজ-মহলের প্রেমে পড়তে লজ্জা করে নি তখন, না?" দরজার পর্দ্দাটাকে দু'পাক ঘুরিয়ে দিয়ে মায়া দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"কী, কী বললে তুমি?" এবার অসিতের গলার স্বরও সপ্তমে উঠলো।—"আমি ওরকম বৌ ঘাড়ে করে দেশভ্রমণে বেরুতে পারবো না।"

দূর থেকে মায়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, "চাই না, চাই না কোথাও যেতে। তোমার টাকাও বাঁচুক ঝঞ্ঝাটও কমুক। কিন্তু বিয়ে করার সময় মনে ছিল না কিছু?" শেষের দিকে মায়ার গলা অভিমানের কান্নায় বুজে এল। চোখের জলে তার বুকের আঁচল ভিজতে লাগল

ব্যাপারটা সামান্য। অসিতের কর্ম্মস্থল মিরাট থেকে বৃন্দাবন কয়েকঘণ্টার পথ। প্রতিবেশী এবং বেশিনীদের বৃন্দাবন ভ্রমণ মায়ার মনেও লোভ জাগিয়ে তুলেছিলো। তাই অসিতের কাছে ঘন ঘন তাগিদ ও অনুরোধের অন্ত ছিল না। অথচ অনুরোধ রক্ষার দিকে স্বামীর মন নেই। সেই জন্যেই মায়ার মনের ধূমায়িত বহ্নি এতকালে অগ্নি-কণা বর্ষণের শক্তিলাভ করে আজ বহ্ন্যুৎসব বাঁধিয়ে দিলো। তিক্ত হয়ে উঠলো সংসারের মধুভাণ্ড।

আজ তিন দিন কথা বন্ধ। মায়ার মনের মেঘ তার সর্ব্বাঙ্গে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। এমন একটা অসহনীয় থমথমে গম্ভীর ভাবের ভেতর থেকে অসিতেরও দিনরাত অসহ্য হয়ে উঠলো।

তৃতীয় দিন অফিস প্রত্যাগত অসিতের জলখাবার সামনে দিয়ে মায়া ধীর গম্ভীর পদে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় অসিত ডাকলো, "মায়া"—

মায়া থম্‌কে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে ফিরে তাকিয়ে বেশ সহজ গলায় বল্‌লো; 'কেন?'

সহজ স্বর শুনে অসিত প্রথম একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর একটু ইতস্ততঃ ক'রে নিজের গলার স্বরকেও যথাসম্ভব সহজ করার চেষ্টা ক'রে বল্‌লো, 'কাছে এস বল্‌ছি।'

'কেন এখান থেকেই বেশ শুনতে পাব।' —মায়ার গলার স্বর ক্রমশঃ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো।'

অসিত অতিরিক্ত সাহসী হ'য়ে খপ্‌ ক'রে মায়ার হাতটা ধ'রে ফেলে বল্‌লো; 'যেয়ো না শোন।'

'শুনছিইতো'—বলে মায়া হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো; কিন্তু অসিতের বলিষ্ঠ হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে নেওয়া তার পক্ষে কোন রকমেই সম্ভব ছিল না। মায়ার মুখ এতে যতই রাগে রঙিন হ'য়ে উঠ্‌তে লাগল,

অসিতের মুখেও ততই হাসি ও কৌতুকের আলো ঝিকমিক ক'রে উঠতে লাগলো। তরল কণ্ঠে সে ব'লে ফেল্‌লো, 'এমন রাঙা মুখ করে থাকলে শুধু হাতের বাঁধনেই ছাড়া পাবে না বল্‌ছি।'

অসিতের কথা শেষ হওয়ার আগেই তীরবেগে মায়া হাত ছাড়িয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। এদিকে ঘরের ভেতর অসিত একেবারে নিভে গেছে!—সে চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে বাইরে আস্‌তে আস্‌তে আকুল-কণ্ঠে বলে উঠল, 'মায়া, মায়া—শুনে যাও, শুনে যাও—তিন দিন ছুটী পেয়েছি—।'

'বেশ ভালো কথা, এ ছুটীতে কোথায় যাবে, বলে যেয়ো—বাক্স গুছিয়ে রাখব।'—মায়ার রোষদীপ্ত কণ্ঠের বাণী অসিতের গায়ে ছিটকে পড়লো। সে দ্রুতপদে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লো। তখন তার চোখে শ্রাবণের নিবিড় বর্ষা নেমেছে। মেয়েমানুষ বলে কী তার আত্ম-সম্মানও থাকতে নেই! —কেন? কীসের জন্যে অসিত তার সঙ্গে এমন ধারা ব্যবহার করবে!—

অসিতও এবার রীতিমতো চটে গেছে। ভারীতো! —আজ সমস্তটা দিন সাহেবের খোসামুদি করে তবেই না তিন দিনের ছুটী মঞ্জুর করিয়েছে!—আর এ ছুটী কার জন্যে? মায়ার জন্যেই তো! অসিতের কাছে সমস্ত পৃথিবী কালো হয়ে উঠলো। 'দুত্তোর ছাই'—বলে ঠক করে চায়ের পেয়ালাটা টিপয়ের ওপর রেখে আল্‌না থেকে পাঞ্জাবীটা টেনে নিয়ে অসিত বেড়িয়ে পড়লো। পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে এক সময় যখন অসিতের হুস হ'ল, তখন গীর্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারটা বাজছে। যে ঘর-কন্নাকে 'দুত্তোর' বলে অসিত বিবাগীর ভঙ্গী তুলে চলে এসেছে, সেই ঘরের ভেতরই মায়া দু'টো অপোগণ্ড শিশু নিয়ে একা একা আছে, মনে করে এবার সে অস্থির হয়ে উঠলো। পা দু'টো জোরে চালিয়ে দিয়ে অসিত ভাবতে লাগলো: মায়া, বাদল আর বেলু ছাড়া সে বেঁচে থাক্‌বে কী করে?—সে বাঁচার কী কোনো অর্থ আছে?—

এদিকে বাদল আর বেলুকে ঘুম পাড়িয়ে মায়া এঘর ওঘর করছে। অসিতের ফির্‌তে যতই দেরী হচ্ছে, ততই তার বুকের ভেতর দুরু দুরু করে উঠছে ...

...অসিতের ওপর রাগ না হয়েই বা যায় কী করে? স্ত্রীর সাধ মেটানোতেই বুঝি কাপুরুষতার লক্ষণ? তার মনের সুখ দুঃখের কাঁচা ভিৎ এর ওপর স্বামীর খেয়াল-খুসীর নৃত্য-ভঙ্গীতে-ভিৎ জখম হয়, কিন্তু কিছুই গড়ে ওঠে না।...না সে কোনমতেই এবার নরম হবে না। কথা সে কিছুতেই আর বল্‌বে না। জানেই তো এরপর সাধা-সাধির পালা আস্‌ছে!...কিন্তু এবার সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না।.. সবই অসিতের অঙ্গুলি সঙ্কেতে হবে নাকি?...

ঢং ঢং ঢং...একী এগারটা বাজল যে! অসিতের ফিরতে এখনো এত দেরী হচ্ছে কেন? এক্সিডেণ্ট হ'ল না তো? নাঃ—মায়া আর পারে না! সব রকমেই এই একটী মানুষ তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। মায়া ক্ষোভে, দুঃখে একা ঘরে বসে চোখের জলে ভিজতে লাগলো। রাত বারোটা নাগাদ অসিত বাড়ী ফিরে এল। আশ্চর্য্য! যার জন্যে মায়া এতক্ষণ কেঁদে বন্যা বইয়েছিল—তারই আগমনের পর তার চোখের কোলে পাথরের শীতলতা ও কাঠিন্যের ছাপ পড়লো।

নিশুতি রাত! জানালার পাশ দিয়ে চাঁদের আলো টুকরো টুকরো হয়ে বিছানায় ছড়িয়ে পড়েছে। অসিতের চোখেও সেদিন জ্যোৎস্নার নিদ্রাহীনতা। সে চেয়ে দেখল মায়ার মুখের ওপরও একখানি জ্যোৎস্নার আলো হেসে উঠেছে। কিন্তু একি! তার নিমলিত চোখের নীচে কালি—চিবুকের ভাঁজে যেন একটা নিরুপায় অভিমানের প্রতিরূপ। তাকে দেখে অসিতের অত্যন্ত মায়া লাগলো। সে মায়ার বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। পিঠের নীচে ও চুলের ওপরকার হাতের স্পর্শ পেয়ে মায়ার গভীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে একটু নড়ে উঠেই কাণের কাছে শুনতে পেল, 'মায়া—মায়া'—কাল ভোরে আমরা বৃন্দাবন যাব; তিন দিনের ছুটি নিয়ে এলাম—ভোরের ট্রেণ ধরতে হলে কাকভোরেই কিন্তু উঠ্‌তে হবে লক্ষ্মীটী।' মায়া ঘুমের ভেতর বৃন্দাবন যাত্রার স্বপ্ন দেখছিল; সেই জন্যেই সে

তন্দ্রাচ্ছন্ন মনে অসিতের সঙ্গে মান-অভিমানের কথাটা ভুলেই বসেছিলো। কাণের কাছে অসিতের কথা শুনে তাই সে নিদ্রাবিজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'আচ্ছা!'—তারপর অসিতের বক্ষসংলগ্ন হ'য়েই সে মহানিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো। তার চোখের জলে ভিজা চুলগুলিকে ওপর দিকে তুলে দিতে দিতে অসিতের নিদ্রাহীন চোখেও তখন শান্তির ঘুম নেমে এসেছে।

শুকতারা নিশ্চিহ্ন হবার আগেই সেদিন মায়ার ছোট্ট সংসারে সমুদ্রের কোলাহল আরম্ভ হয়ে গেল। বাক্স, বিছানা, টিফিন ক্যারিয়ার, হরলিক্স,দুধ, ফল, রুটি, মাখন, চিনি, চা, পেয়ালা, ঝিনুক, বাটি এবং বাদল, বেলুর জামা, জুতো, মোজা, টুপির অরণ্যে মায়া ডুবে গিয়ে তার মিশিরজীকে সারাটা সকাল ডাকাডাকি, বকাবকি করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। এমন একটা আয়োজন যেন মায়ারা সেদিন দিগ্বিজয়ে বেরুবে। জীবনের এমন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব দিবস সামনে এসেছে যে, মায়া তার প্রতিটি শুভমুহূর্ত্তকে যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে চায়। গাড়ী দোরগোড়ায় আসা মাত্রই বাদল ও বেলু তাতে চড়ে বসেছে। মুখের ভেতর দুটি আঙুল পূরে বেলু গাড়ীর চারিদিকে প্রতিবেশীর ভিড়ের দিকে পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। সকলেই আজ মায়াদের পরম সুহৃদ। যারা বৃন্দাবন গিয়েছে তারা ওদের পথ ও পাথেয় সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিচ্ছে। যারা বৃন্দাবন যায় নি, তারাও নানা উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। নানা কথার উপদ্রব আজ মায়া হাসিমুখে সহ্য করছে। তার জীবনে আজ যে প্রভাতসূর্য্যের সূচনা হচ্ছে, তার কাছে এসব যেন জোনাকীর দীপালি। সে যেন আজ সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে এমনি মনের ভাব। ঘরে তালা দিয়ে নিকটতম গৃহবাসী প্রতিবেশীকে বাড়ীটা সম্বন্ধে সচেতন দৃষ্টি রাখতে বলে' মায়া ও অসিত গাড়ীতে উঠতে যাবে, হঠাৎ ধূমকেতুর মত অসিতেরই অফিসের বন্ধু যতীন এসে উপস্থিত হলো। সে ঘটা করে যাত্রা দেখে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো, "কী হে অসিত, কোথাও যাওয়া হচ্ছে নাকি?"

"হুঁ।—তিনদিনের ছুটী পেলাম একবার বৃন্দাবন ঘুরে আসি গে। এত কাছে, তাই সুযোগ ছাড়তে গিন্নী কিছুতেই রাজী হলেন না।—" মায়ার দুই চোখের ভ্রূ-ভঙ্গী দেখে অসিত মাঝপথেই থেমে পড়লেন।

যতীন সহাস্যে অসিতের পিঠ চাপড়ে মায়াকে সমর্থন করে বললে, "বৌদি ঠিকই করেছেন, অসিত। যাও ঘুরে এস গে। তোমাদের 'মধু-যামিনী' সার্থক হোক্।" অসিতের আনন্দে গদগদ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে যতীন অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাড়ী ছেড়ে দিলো। কিন্তু গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অসিতের কপালে চিন্তার রেখা পড়লো। রাস্তার দু'পাশের গাছপালা, বাড়ী, দোকান—সবই আজ মায়ার চোখে বিচিত্র হয়ে দেখা দিল। সে অনর্গল অসিতকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে। "হোটেলের দরকার কি? কোথায় ওঠা হবে?—হোটেলে না ধর্ম্মশালায়; নিজেরাই রান্না করবে না হোটেলেই ব্যবস্থা হবে? শোয়ার ব্যবস্থা কী রকম হবে? বেলু বাদলকে রাখাবার জন্যে ঠিকা লোক পাওয়া যাবে কিনা—ইত্যাদি ইত্যাদি।" তিনদিনের দু-বেলার ভ্রমণের তালিকা মায়া মুখে মুখে তৈরী করে নিলো। কী উৎসাহ! মায়ার মুখের দিকে আর তাকানো যায় না—এমনি একটা চঞ্চল আনন্দ তার সর্ব্বাঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। আনন্দের আতিশয্যে অসিত যে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে, এটা মায়ার নজরেই পড়লো না।

রাস্তার একটা বাঁক ঘুরতেই দূরে ষ্টেশন দেখা গেল। বাদল-বেলুর সঙ্গে মায়াও যেন নৃত্য করে উঠলো। হঠাৎ রাস্তার ওপাশ থেকে কথা শোনা গেল, "কী হে অসিত, কোথায় চললে?"

অসিত চমকে চেয়ে দেখল তাঁদের আফিসের হেড-ক্লার্ক সুকুমারবাবু ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে অসিতের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সুকুমার বাবুকে এড়িয়ে যাওয়াও তখন কঠিন, কারণ গাড়ী একেবারে তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে শুষ্ক হাসি টেনে দু'হাত তুলে নমস্কার করতে করতে অসিত কোনরকমে বলে ফেললো, "এই—তিনদিনের ছুটি পেয়েছি জানেন তো, তাই একটু তীর্থভ্রমণে বেরুলাম।"

"বেশ, বেশ—সপরিবারে দেখছি—যাত্রাটা শুভ

হোক্”—গাড়ী অগ্রসর হয়ে গেল। গাড়োয়ানকে জোরে চালাতে ইঙ্গিত করে অসিত জানালার ফাঁক দিয়ে আড়-দৃষ্টিতে পেছনের রাস্তায় তাকিয়ে দেখল যে, সুকুমারবাবু তখনও তাদেরই চলিষ্ণু গাড়ীর দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। অসিতের অবস্থা আরোও সঙ্গীন হয়ে উঠলো—সে বিড়্‌বিড় করে শুষ্কমুখে বলে উঠল, ‘লোকটা আবার দেখে ফেল্‌লে।’ গাড়ী অনেকটা এগিয়ে গেল, হঠাৎ অসিত গাড়োয়ানকে ডেকে জোরে বল্‌লে, ‘এ—টাঙ্গেওয়ালে, টাঙ্গা ঘুমাও।—’

গাড়োয়ানটা অসিতের বিচিত্র ব্যবহার কিছু বুঝতে না পেরে থতমত খেয়ে গাড়ী ফিরিয়ে নিলো। গাড়ী ফিরতেই মায়া সচকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো। ‘এ-কী গাড়ী ফিরছে কেন?—আরে এই টাঙ্গাওয়ালে—আরে ট্রেণ যে ছেড়ে দিলো. প্রথম ঘণ্টা তো শোনা যাচ্ছে।’—

অসিত বাধা দিয়ে বলে উঠলো, ‘আরে গেলে তো ঘণ্টা শুনবো।’—

‘এ-কী?—কেন, কিসের জন্যে?’—বিস্ময়ে দুঃখে রাগে মায়ার কণ্ঠস্বর ঝাঁঝালো হয়ে উঠলো। স্বর্গের নন্দনকানন থেকে কে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে মর্ত্যের কঠিন বন্ধুর মাটীতে ফেলে দিয়ে গেছে।

অসিত বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে কোনরকমে বলে ফেল্‌লো, ‘না-না, যাওয়া হ’ল না—অফিসের দু’ দু’টা লোক দেখে ফেল্‌লে’।—

‘দেখে ফেল্‌লো তো হ’ল কী!’ মায়া প্রায় কেঁদেই ফেল্‌লো।

অসিত তেমনি বাইরের দিকে তাকিয়েই কম্পিত কণ্ঠে বলে ফেল্‌লো, ‘ষ্টেশনলিভের পারমিশনটা নিই নি—অফিসে জানাজানি হলে চাকরী নিয়েই টানাটানি। সুখের চাইতে শোয়াস্তি ভালো।’- সে আম্‌তা আম্‌তা করে থেমে পড়লো।

এর উত্তরে মায়া আর কী বলতে পারে? এখন তার চোখের সামনে দিনের সমস্ত আলো নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। এত আয়োজনের এই পরিণাম।

গাড়ী ফিরে চল্‌লো।

বঞ্চিত

শ্রীসুনীল ঘোষ

জীবনের শেষ হ’বে—এ কথা তো সহজ সরল,
আঁধার রহস্য এসে ঢেকে দেবে জগতের হাসি;
মরণের খেয়াঘাটে দেখা দেবে বিস্মৃতি অতল;
পদচিহ্ন মুছে দিয়ে কোন্ দূরে চলে যাব ভাসি।

এ তো সত্য চিরন্তর; জীবনের এই তো বিলাস;
তোমার খেলার ঘরে নিত্য চলে এই আনাগোনা;
জীর্ণ শীর্ণ অস্থি মাংস তাই আজো হ’ল না নিরাশ,
ভঙ্গুরের সাথে তাই অনন্তের নিত্য জানাশোনা।

কিন্তু একি দেখি আজ? নগ্ন যত কদর্য্যের গ্লানি:
ক্ষুধাতুর বিভীষিকা দ্বারে দ্বারে ঘুরে অন্নহারা;
তোমার ভুবনে উঠে অশ্রদ্ধেয় হতাশার বাণী,
মানুষেরে পশু করে সভ্যতার দম্ভ করে যারা।

ওদের জীবনে মৃত্যু সে যে শুধু কঠিন বঞ্চনা—
শুধু মৃত্যু, হাহাকার! দূরে হাসে দগ্ধ মরীচিকা।
আশা নাই ভাষা নাই; আত্মঘাতী জান্তব যন্ত্রণা
বাস্তবের ভালে আজ এঁকে দিল পরাজয় টিকা।
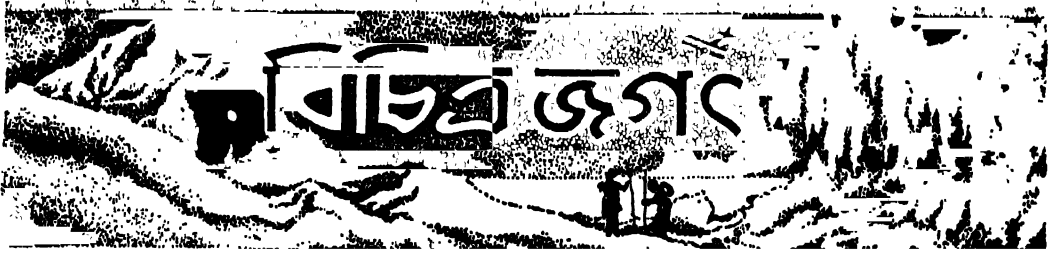
প্রাচীন মিশর

শ্রীনিখিল সেন

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত মিশরের লক্ষ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী স্থানে খনন-কার্য্য সাধিত হয়েছে। অভিসন্ধিৎসু বহু প্রত্নতাত্ত্বিক আর সহস্র সহস্র স্থানীয় অধিবাসী কাটিয়ে দিয়েছে তাদের সারাটা জীবন মরুভূমির ধু ধু বালুকারাশির গর্ভে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার লুপ্ত দ্বার উদ্‌ঘাটনে। তাঁদের এই কঠোর সাধনার ফলে যবনিকা আজ অপসারিত হয়েছে নীল নদের তীরে পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার প্রাচীন এক সুসভ্য জগতের: তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনধারার—কৃষ্টি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের ধূসর পাণ্ডুলিপির।

যে সব পণ্ডিত ধ্বংসস্তূপের অন্তরাল হ'তে প্রাচীন ইতিহাসের লুপ্তপ্রায় এই পাতাগুলি উদ্ধারের জন্য ব্রতী হয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় হার্ভার্ড-বোষ্টন মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ডক্টর রিসনারের (Reisner)। ১৯২৫ সালে তিনি প্রথম এল-গিজায় (El-Giza) তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান সুরু করেন এবং পিরামিড ত্রয়ের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু, তার পাশে আবিষ্কার করেন প্রাচীন ৪র্থ বংশের প্রতিষ্ঠাতা স্নেফ্রু (Snefru) মহিষী হাতেপ-হোরেসের কবর। কবর-খননকারী দস্যুরা যদিও তাঁর শ্বেত-পাথর-নির্ম্মিত শব-ধার থেকে মহামূল্য সবকিছুই প্রায় অপহরণ করে নিয়ে গেছে, তবুও তাঁর সোনার চেয়ার, আরাম-কেদারা, অলঙ্কারের বাক্স, আর সোনার কাজ-করা চন্দ্রাতপ প্রভৃতি যা কিছু এখনো অবশিষ্ট আছে, তার মধ্যেও সুপ্রাচীন নীল সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। মিশর সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সিসিল ফার্থের (Cecil Firth) আবিষ্কৃত তৃতীয় বংশীয় ক্যায়াও ডোজারের পিরামিডের আভ্যন্তরীণ কাঠের খোদাই কারুকার্য্য বর্ত্তমান মানুষকে পর্য্যন্তও তাক লাগিয়ে দেয়। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয় হাজার হাজার বৎসর আগেকার প্রাচীন মিশরীয়দের শিল্পনৈপুণ্যের দিকে। এই পিরামিডের ভিতরকার প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠ থেকে ১৯৩৬ সালে জেম্‌স্ কুইবেল (Quibell) প্রায় ৫০ হাজারটি জালা আর থলে ভর্ত্তি স্ফটিক ও মহামূল্য প্রস্তর (পিরামিডের রত্নসন্ধানী দস্যুরা যা ফেলে গেছে) উদ্ধার করে জাহাজে করে চালান দেন পৃথিবীর নানা যাদুঘরে আর প্রত্নতাত্ত্বিক রক্ষণাগারে।

তারপর ১৯১৪ সালে পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাসমর সুরু হয়। কিন্তু মানুষের রহস্য-সন্ধানী মন রণ-দামামায় আর কামান গর্জ্জনে দমলো না। ১৯১৪ সালে মঃ লে গ্রেণ (Legrain) এল কার্নকে আমুনের বিখ্যাত মন্দিরের উদ্ধার

মিশরের পিরামিড

কার্য্যে যেতে গেলেন। আমুনের এই মন্দিরের সামনে অষ্টাদশ বংশীয় তৃতীয় আমেন হোতেন তৈয়েরী করেছিলেন স্তম্ভের এক সুরম্য কটক। বিরাট বিরাট ওই স্তম্ভগুলি

পক্ষী শিকারে প্রাচীন মিশরীয়

প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্যের এক চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। কিন্তু সব চাইতে যুগান্তরকারী আবিষ্কার হোল মিশর সরকারী দপ্তরের মিঃ এমারীর। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি সাকারায় খনন ক'রে সন্ধান পান ঐতিহাসিক যুগের প্রথম ও দ্বিতীয় বংশীয় কায়াডও সামন্তদের ভগ্নস্তূপে পরিণত ইঁটের সমাধি-মন্দিরের। এই নীল উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীদের সুবিস্তৃত বিবরণ ডাঃ ব্রেষ্টেড্ তাঁর বিখ্যাত "প্রাচীন ঈজিপ্টের ইতিহাসে" লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, নীল উপত্যকার প্রাচীন এই বাসীন্দারা কারা? কোথা থেকেই বা হয়েছিলো তাদের আগমন এবং তাদের আকৃতি আর প্রকৃতিই বা কেমন ছিল? প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বলেন: প্রায় চৌদ্দ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের নাইল নদের উভয়পার্শ্বস্থ সমতল ভূমি ক্রমশঃ জনশূন্য শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হয়ে পড়ে। জীবন ধারণ সেখানে কঠিন হয়ে উঠে। তাই সেখানকার প্রাচীন যাযাবরী বাসীন্দারা নাইল নদের উপত্যকায় এসে বসবাস করতে সুরু করে। আর আগেকার যাযাবরী শিকারী জীবন পরিত্যাগ করে মন দেয় কৃষিকার্য্যে। ভূমধ্য-সাগর থেকে নিউবিয়াং সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে সাত শ' মাইল স্থানে প্রাচীন মিশরীয়দের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়ে পড়ে। গত কয়েক দশকের খনন-কার্য্যের ফলে যে তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় মিশরের প্রাগৈতি-হাসিক যুগ সুরু হয়েছে খৃঃ পূঃ তেরো হাজার বৎসর পূর্ব্বে। উত্তর-আফ্রিকায় তখন প্যালিওলেটিক বা আদিপ্রস্তর যুগ চলছিল। অনুন্নত চকমকি প্রস্তর আর প্যালিওলেটিক যুগের একমাত্র হাতিয়ার হাত-কুঠারের কাল পেরিয়ে নিউলোতিক বা নূতন প্রস্তর-যুগের অপেক্ষাকৃত উন্নত বা বিচিত্র ধরণের হাড়, ঝিনুক আর পাথরের নূতন নূতন অস্ত্র-শস্ত্রে শক্তিশালী হয়ে বসতি স্থাপন করতে নীল নদের প্রাচীন অধিবাসীদের লেগেছিল অনেক সহস্র বৎসর। খৃঃ পূঃ আনুমানিক ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন নূতন প্রস্তর-যুগের যবনিকা অপসারিত হোল, আমরা সবিস্ময়ে অবলোকন করলাম—প্রাচীন মিশরীয়রা সমসাময়িক পৃথিবীর তুলনায় নব সুসভ্য জাতিতে পরিণত হয়ে পড়েছে। নিজেদের প্রয়োজন-মাফিক ওরা পোড়ামাটীর বাসন-পত্র আর কাঠের ও মাটীর ঘর-দোর নির্ম্মাণ-কৌশল শিখে নিয়েছে। খাদ্য-শস্যের উৎপাদন আর সংরক্ষণ থেকে সুরু করে গবাদি পশুর পালন আর মৃত্যুর পর শবরক্ষার পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও সজাগ হয়ে উঠেছে।

কালের যাত্রা তারপর এগিয়ে চলে দীর্ঘ পদক্ষেপে। ৩৮০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মিশরীয়রা সূতা ও বস্ত্র-প্রস্তুতের কৌশল আয়ত্ত করে নেয়। সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, মৃন্ময় আর আইভরী শিল্পে হয়ে উঠে পারদর্শী। পরবর্ত্তী ছয় শ' বৎসরের মধ্যে খনিজ-ধাতু-নির্ম্মিত যন্ত্রপাতি আর অস্ত্র-শস্ত্রের প্রচলন ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে প্রাচীন মিশরে।

এবার এসে পড়ল রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা। মিশরীয়রা এতদিন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের স্ব স্ব জিলায় বা "Nome"-এ এক এক জন "nomarch"-এর অধীনে বাস করছিল স্বাধীন ভাবে। নোমার্করাই ছিল তখন দেশের প্রকৃত অধিপতি। ক্রমশঃ এই সব স্বতন্ত্র নোমার্করাই উত্তর ও দক্ষিণ—আপার ও লোয়ার ঈজিপ্টে বিভক্ত হয়ে পড়ল। দক্ষিণ বা নীল উপত্যকার মিশরীয়রা অপেক্ষাকৃত

অনুন্নত ছিল। এবং রাষ্ট্রীয় ও কৃষ্টিগত বৈষম্য বিদ্যমান থাকায় আপার ও লোয়ার মিশরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগে থাকত। এই যুদ্ধে 'আপার' ঈজিপ্টেরই জয় হয় এবং তার ফলে খৃষ্টপূর্ব প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে জন্ম হ'ল নূতন মিশরের—প্রথম ক্যারাও মেনেসের (Menes) অধীনে সমগ্র ঈজিপ্ট পরিণত হ'ল সম্মিলিত জাতিতে।

লিবিয়া, সোমালী, গালা প্রভৃতি জাতিদের মত মিশরীয়রা আফ্রিকার "হ্যামেটিক" বংশোদ্ভূত বলে প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা মনে করেন। এই "হ্যামেটিক" বংশ "পিঙ্গল" "ভূমধ্যসাগরীয়" গোষ্ঠীরই এক শাখা। উন্নতমস্তক পাতলা-গড়ন শ্মশ্রুবিহীন, মাঝারি আকৃতির এই শ্যামাঙ্গী মিশরীয়দের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সর্ব্বত্র দেখা যায়। বহু জাতি, বহু সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে প্রাচীন মিশর। এশিয়া থেকে এসে হানা দিয়েছে বলদৃপ্ত দুর্দ্ধর্ষ আরমেনিয়ানেরা; ধূলা উড়িয়ে এসেছে হিক্‌সস্‌, আসুরীয়রা; গ্রীক, রোমান আর বৈজান্তিয়ানেরা—আরব আর তুর্কীরা, কিন্তু প্রাচীন মিশরীয়দের আকার ও প্রকৃতিতে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নি। ১৯৪৪ সালের কোন মিশরীয়ের সঙ্গে খৃঃ পূঃ ১৯৪৪ সালের কোন মিশরীয়ের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না একটুও।

প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা বুদ্ধির প্রাখর্য্যে ও ঐশ্বরিক প্রতিভায় অত্যন্ত দক্ষ ও সজাগ ছিল, এ ভুল ধারণা এখনো পর্য্যন্ত অনেকেই করে থাকেন। পিরামিড যুগের মিশরীয়রা বর্ত্তমান ঈজিপ্টশিয়ানদের মত অত্যন্ত সরল, অনাড়ম্বর হাস্যমুখর আর ঘোর বাস্তবপন্থী ছিল। ওরা মোটেই কল্পনাপ্রিয় ছিল না। অরূপ কোন রহস্যের সঠিক সন্ধান ছিল তাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু কর্ম্মশক্তি ছিল তাদের অফুরন্ত; ছিল অটুট অধ্যবসায় আর অপূর্ব্ব গঠন-ক্ষমতা। বিশেষ এই গুণটির প্রভাবেই প্রাচীন মিশরীয়রা তাদের প্রচুর কাঁচামাল আর জনবলকে দক্ষতার সঙ্গে খাটাতে সক্ষম হয়েছিল নিজেদের পারিবারিক, নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় শাসন-পরিচালনার কার্য্যে। কঠোর পরিশ্রমী প্রাচীন মিশরীয়দের এ গুণটির জন্যে গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম পিরামিড। এই পিরামিড নির্ম্মাণের পিছনে তাদের তেমন কোন মেকানিক্যাল নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কপিকলের ব্যবহারও তাদের অজ্ঞাত ছিল।

প্রাচীন মিশরীয়দের ধর্ম্মবিশ্বাস অত্যন্ত প্রগাঢ় হোলেও, বিরাট কোন ধর্ম্মপ্রচার বা প্রবর্ত্তন করার মতো তাদের তেমন কোন মানসিক কিংবা আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল না। প্রাচীন মিশরের ধর্ম্মবিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করলে আপাত-বিরুদ্ধ চারটি মত বা বিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এই চারটির কোনটাই তাদের মাতৃভূমির গণ্ডি ডিঙিয়ে অন্য দেশে প্রচারিত হয়নি। প্রাচীন মিশরীয়দের পুনরুত্থান ও পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে যে ধারণার কথা আমরা জানি, সেটা ছিল তাদের ধর্ম্মবিশ্বাস আর পৌরাণিক উপাখ্যানের মতই বিচিত্র আর বিভিন্ন। তাদের বিশ্বাস ছিল:

(ক) দেহ অবিনশ্বর, লৌকিক এই দেহের অবসানের পরেও, তাদের আত্মা আর "ইগো" (Ego) অবস্থান করতে থাকবে এই পৃথিবীতে।

(খ) মৃত্যুর পরেও কবরের মধ্যে তারা পার্থিব জীবন-যাপনের বিশ্বাসী ছিল।

মানুষের স্বভাবজাত মৃত্যুভয়ই তাদের প্রথম দফা
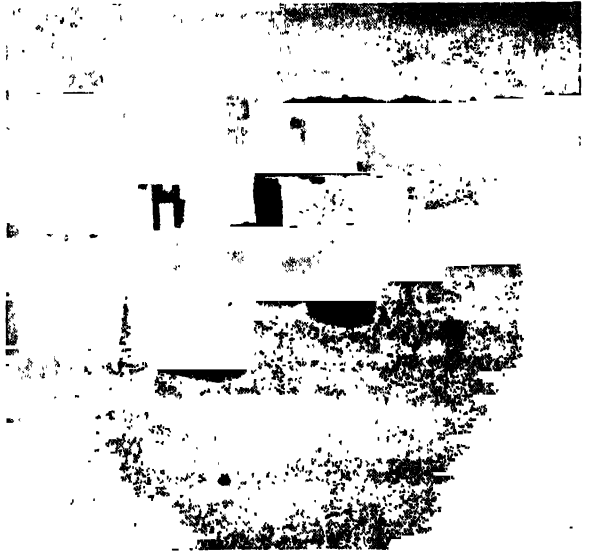
মিশর স্থাপত্যের শেষ নিদর্শন

বিশ্বাসের মূল। মৃত্যুর পরেও তারা পূর্ব্বের মত সংসারে বাস করতে থাকবে, উদ্ভট এই ধর্ম্মবিশ্বাস অজ্ঞাত, তমিস্র মৃত্যুভীতিকে লঘু করে তুলেছিল অনেকটা। শুধু এই

জন্যই প্রাচীন মিশরীয়রা হাস্যমুখর, রহস্যপ্রিয় ও অকুতোভয়ী জাতিতে পরিণত হতে পেরেছিল। মৃত্যুর পরেও কবরের মধ্যে পার্থিব জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে প্রাচীন মিশরীয়রা জীবদ্দশায় যে সব দ্রব্যাদি পেতে ভালোবাসতো ও ব্যবহার করতো পারিবারিক সে সব আসবাবপত্রে সজ্জিত করে তুলত অশরীরী আত্মার জন্য নির্ম্মিত সুরম্য একটি গৃহ। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই প্রাচীন মিশরীয়রা কাইরো থেকে সুরু করে নীল নদের ৬০ মাইলব্যাপী স্থানে সারি সারি সমাধি-মন্দির আর পিরামিড নির্ম্মাণে প্রণোদিত হয়েছিল। মহাকালের কোল হ'তে করাল মৃত্যুকে অবিনশ্বর করে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম আর বহু অর্থ ব্যয়ে একদা তারা গড়ে তুলেছিল এইসব সমাধি-গৃহ—তেল, মসলা আর ব্যাণ্ডেজের সাহায্যে এক একটি মমি। দম্ভভরে বলেছিল, মৃত্যু নেই তাদের—মরেও তারা থাকবে অমর হয়ে ভঙ্গুর এ জগতে! সেদিন বুঝি মহাকাল কুটিল হাসি হেসে উঠেছিল। ক্যারাওদের অক্ষয় কীর্ত্তি পিরামিডগুলি তাদের মৃতদেহকে ধরে রাখতে পারে নি। পিরামিডগুলি আজ কেবল কবরের রত্নসন্ধানী দস্যুদের একটি মহা শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাচীন মিশরীয়দের সমস্ত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অবদান হোল মিশরের অমর শিল্প—ট্যাকনিকেল নৈপুণ্যের খাঁটি, নিখুঁত তাদের প্রচেষ্টা। নিজের প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে—আশেপাশের জীবনের মধ্যে যা কিছু সুন্দর, মনোরম—মহাকালের আবর্ত্ত থেকে শিল্পী তাকে ধরে রেখেছেন তুলি আর ছেনির সাহায্যে আপন শাশ্বত সৃষ্টি-প্রতিভায়। নিউলেথিক শিল্পীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এখনো বহন করে চলেছে দেশ-বিদেশের বহু যাদুঘর আর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগারগুলি।

তোমারই

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

তিন

জ্যোতির নতুন জীবন আরম্ভ হল।

সুলেখার জীবন নতুন মানুষটিকে অবলম্বন করে আবার পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল।

বন্ধুর বাড়ীতে দেখা হওয়ার পর আরও অনেকদিন কেটে গেছে। দু'জনের জীবন দু'টো পথ দিয়ে এসে একটা পথে মিলল। ওরা পরস্পর পরস্পরকে সন্ধ্যার অন্ধকারে চিনেছে; জেনেছে আবছায়া অন্ধকারে, যে ওদের দু'জনের জীবনেই মিল আছে ভবিষ্যতের হিসেবে; গরমিল আছে অতীতের অঙ্কে। স্পষ্ট কোন কথা ওরা কেউ কাউকে বলে নি, কিন্তু অস্পষ্টও কিছু থাকে নি। বলার মধ্যে যার আভাষ ছিল, দৃষ্টির মধ্যে তার ছিল প্রকাশ। দৃষ্টি যেন বর্ষার ঘন কালো জীবন্ত মেঘ; কথা যেন কঠিন শীতের নির্জীব কুয়াসা।

পরস্পরকে উপলক্ষ্য করে চেনা অচেনার অভিনয়ের মধ্যে ওদের জীবন এগিয়ে চললো একই উদ্দেশ্য নিয়ে, কিন্তু সম্পূর্ণ গোপনে। সুলেখার প্রচণ্ড বাধা—সে স্ত্রী। আরও একটা কথা আছে। ওর বিয়ের রাত্রে নিমন্ত্রণের আসরে ওর এক ব্যারিষ্টার বন্ধু মৃদু ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন, সুলেখা, হাল্কা বাঁধনের গ্রন্থী সহজেই খুলে যায়, ব্যারিষ্টার মানুষ আমি, বাঁধন খোলবার ভারটা আমাকেই দিও!

উত্তরে সুলেখা বলেছিল, ধন্যবাদ, এ সৌভাগ্য আপনার কোনদিনও হবে না, একথা স্পষ্ট জেনে রাখুন!

এই ছোট্ট কথা দু'টো সুলেখার যতবার মনে পড়েছে ততবারই ও নিজেকে কঠিন ভাবে বাঁধতে চেয়েছে। এতখানি লজ্জা, এতবড় পরাজয় ও কোন রকমেই স্বীকার করবে না, মনে মনে অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছে।

ব্যারিষ্টার বন্ধুটির কথার উত্তর ও সগর্বেই দিয়েছিল। পৃথিবীর বুকের ওপর সদর্পে পা ঠুকে এতবড় কথা বলার পেছনে ছিল তার মনের কঠিন বাঁধন। আর যাই হ'ক, যে সমাজের উঁচু মাথাকে তার নিজের মনের জোর দিয়ে নিচু করেছে, সেই সমাজকে হাসবার সুযোগ সে কিছুতেই দিতে পারে না। মনের আর মানের এই দ্বন্দ্ব প্রাণের মধ্যে ওর দিল প্রকাণ্ড শক্তি। তাই বিয়ের পাঁচ বছর পরে সুলেখা যখন দেখল যে সহজ বাঁধনের গোরা ভালবাসার বাঁধন দিয়েছে খুলে, আকর্ষণ দিয়েছে কমিয়ে, তখন জোর করেই সুলেখা কর্ত্তব্যের গ্রন্থিকে শক্ত করে নিল'! সংসারের বুকে ভালবাসার পালা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের বুকে সুলেখা অভিনয়ের পালা আরম্ভ করলো! সগর্বে সমাজের সকলের সামনে সুলেখা প্রমাণ করলো—ওর বিবাহিত জীবন হ'ল সোনার রথ, কিন্তু মনে মনে ও জানল', সেই সোনার রথের চাকা অচল। বিবাহিত জীবনটা ওর হ'ল মরসুমী ফুলের বাগান, সৌন্দর্য্য আছে, সুগন্ধ নেই, চোখ ঝলসানো ঔজ্জ্বল্য আছে,

স্থিতি নেই। এমনি সব নানান কারণে সুলেখা নিজের মনের কথা জ্যোতিকেও জানাতে পারল না।

জ্যোতির ভাবনাটি একটু সেকেলে ধরণের গতিতে চলে। এ-যুগের সঙ্গে বেখাপ্পা, মানায় না। তাই বার বার ও ঠ'কে যায়। সুলেখাকে নিয়ে ওর মন তাই সমস্যায় পড়ল। জ্যোতি নিজের মনের কথা সুলেখাকে বলতে পারল' না, এমন কি আভাষেও না। কয়েকটা কথা মনের এই নতুন অলোকে অন্ধকারে গলা টিপে মারল'।

প্রথম কারণ হ'ল অনিতা। অনিতার সঙ্গে ওর সমস্ত সম্বন্ধ চুকে গেছে ঠিকই, কিন্তু মন তাতে ঘা খেয়েছে। ওর ভালবাসার কমলকলির মাঝে পোকায় কাটা ঐ একটি দাগ, কেমন করে দেবে এ ফুল ও সুলেখাকে। তাছাড়া আরও একটা বড় কারণ ছিল। জ্যোতি নিজের মনকে করে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। মনে ওর কেবলই দ্বন্দ্ব। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে যাচাই না করে ও কোন কথাই সুলেখাকে বলতে নারাজ।

এই সব নানান কথার মাঝখানে আরও একটা কথা ক্রমেই বড় হ'তে থাকে ওর মনে। সুলেখা হয়ত অসুখী সত্যিই, কিন্তু তবু সে ত' স্ত্রী। সমাজে তার স্থান আছে, সংসারে সে কল্যাণী। বিয়ে যখন তার স্বামী তাকে ভালবেসে করেছিল, তখন নিশ্চয় উপযুক্ত স্থান দেবে বলেই করেছিল! স্বামী যখন নিজেকে স্ত্রীর কাছে বিলিয়ে দেয়, তখন ঠিক কি ভাবে দেয়, তা জ্যোতি মনে মনে ঠিক জানে। ওর এ বিষয়ে ধারণাটা সেকেলে তাই ভিত্তিটা পাকা। পাকা ভিত্তির ওপর আধুনিক মনোবৃত্তিটা ঠিক খাপ খায় না, অনিতাকে জীবনের মধ্যে জড়িয়ে জ্যোতি তা জেনে নিয়েছে। পাশ্চাত্য হাওয়ার ঝড় পল্লীমায়ের বুকে ছোট্ট কুঁড়েঘরের 'স্বামী-স্ত্রী' জীবন ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। জ্যোতির ধারণাটা ঠিক পল্লী-সংসারের উপযোগী। স্ত্রী, ওর মতে সে, যে সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠে সবার আগে, এমন কি সূর্য্যেরও, শুতে যায় সবার পরে, এমন কি রাত্রিরও। গায়ে যার সংসারকে চালিয়ে নিয়ে যাবার অসীম শক্তি, মনে যার পাসাণ গলান ভক্তি; সমস্ত বাধা বিপত্তি, দ্বন্দ্বের ঝড় আর দুঃখ অশান্তিকে উপেক্ষা করেও হাসিটি যার ঠোঁটের কোনে জাগে নিশ্চিন্তে অথবা নীরবে। কথায় যে নিজেকে জাহির করে না, ব্যথায় সে নিজেকে সবার সামনে বাহির করে না। স্বার্থ যার মধ্যে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে, পরার্থ যার মধ্যে প্রবল। সন্ধ্যা দীপ জ্বালিয়ে যে শুধু স্বামীকে মনে করে না, মনে করে সকলকে,···নিজের কল্যাণ কামনা করে না, সকলের কল্যাণ কামনা করে।—যে বেল ফুলের মতন সরল, শেফালির মত রাঙাল' অথচ আম্রতরুর মতন সবাইকে ঘিরে আছে। সে রৌদ্র পায়, ছায়া দেয়, সে ঝড় মাথায় দাঁড়িয়ে আছে শুধু ফল দেবার লোভে।···

জ্যোতি জানে সুলেখা আধুনিকতার জৌলুসে উজ্জ্বল সংসারের রঙচঙে স্ত্রী। কিন্তু তবু সুলেখা মেয়েটা কেমন অদ্ভুত। সে সকলের মতন নকল নয়, এ কালের মেয়েদের মতন ডলি পুতুলের অবিকল নকল নয়। সাধারণের মধ্যে ও অসাধারণ, অসাধারণের মধ্যে ও অন্যতম; একরাশ বিলীতি ফুলের চকমকে বাগানে নিভৃতের চামেলী ঝাড়। ভোর রাতের শুকতারার মতন সে স্বতন্ত্র, রাতের অন্ধকারের কোল ঘেঁসে দিনের আলোকের আগে; স্পষ্টতার ওপরে। স্ত্রীর চাইতে মাতৃত্বের প্রভাব বেশী। বিয়ের বাসরে বৌ হ'লে ও চলনসই, ছেলের পাশে মা হলে ও পরিপূর্ণ। দৃষ্টিতে ওর রঙ মাখানো জীবনের উদ্ধত সামাজিকতার জৌলুষ নেই, আছে সীতা সাবিত্রীর ছায়া। ওর কথায় আছে প্রীতির রেশ, ওর হাসিতে আছে স্নেহের প্রভাব, ওর নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অভিমান।

জ্যোতি সুলেখাকে মনে মনে এই রকম ভাবে চিনে নিয়েছে। সুলেখা ওর কাছে তাই পরের স্ত্রী নয়, পরের সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবীর চরণে ও স্বচ্ছন্দে অর্ঘ্য নিয়ে যেতে পারে, নীরবে ঢেলে দিতে পারে, কিন্তু প্রচার করতে পারে না। মনে তাই ওর দ্বন্দ্ব। একদিকে ভালবাসা, অন্যদিকে কর্ত্তব্য। দুটোই বড়, দুটোরই ভিত্তি ত্যাগের। একদিকে ভালবাসার প্রবল স্রোত যেমন তলা দিয়ে সিঁধ কেটে ওপরে রাখে চোরা বালির স্তূপ, অন্যদিকে তেমনি ত্যাগের বোঝা ভারী হ'তে থাকে দিনের পর দিন, শেসকালে পঙ্গু করে দেয় মনের অন্য সব ভাবকে। জ্যোতি নিজের মনে মনে এই দ্বন্দ্বটাকে বড় করে তুলেছে ভেবে ভেবে। সাধারণতঃ এ অবস্থায় যা হ'য়ে থাকে, মন ওর তাতে সায় দেয় না। অথচ এমনই বিপদ, নিজের মনের মধ্যে মনের সহজ গতিটাকে গলাটিপে মেরে ফেলে গুমরে গুমরে কাঁদতেই বা কজনে পারে? বেল ফুটবে, যুঁই ফুটবে, গন্ধ তার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, কুঁড়ির বুকে সে লুকিয়ে লুকিয়ে মরবেই বা কেন? মানুস যখন সঙ্গিহীন হ'য়ে একলা পথ চলে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে তখন ছায়া যদি একটা দৈবাৎ মিলেই যায়, তাহ'লে কি ভাবতে বসবে মালিকের অনুমতির কথা?

জ্যোতি তবু কিন্তু নিজের মনকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না। ভালবাসবে তবু বলতে পারবে না, তার দৃষ্টির মধ্যে নিজের অশান্ত মনটাকে শান্ত করার উপকরণ পাবে, অথচ চাইতে পারবে না। কথা বলবে, নিজের সুখ দুঃখের কথা, অথচ লক্ষ্য স্থির করতে পারবে না, ওকে উপলক্ষ্য করতে হবে। ওর সাহচর্য্য পেলে মনে হয় দিনের গতি দ্রুত, ওর সামনে দাঁড়ালে মনে হয় পৃথিবীটা সুন্দর, বেঁচে থাকায় প্রবল আনন্দ আছে, আশা আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে ভীড় করে আসে, অথচ এমনই বিপদ, শিক্ষার প্রভাব, প্রবল সংস্কার ওর মনে কায়েমি হ'য়ে বসেছে। এ যেন ঠিক ফুলের বাগানে বড় বড় হরফের নোটিশ "ডু নট্ প্লাক ফ্লাওয়ার্স"···

দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব,···

কিন্তু নিয়তি যেখানে প্রবল, সেখানে মনও দুর্ব্বল হয়। মনের এই দ্বন্দ্বের মাঝে হঠাৎ ঝড় উঠল। নিয়তি সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্ব্বাদ করল, সেই আশীর্ব্বাদ ওদের দুজনের মিলনের সেতু হ'য়ে থাকল' সতীর রূপ নিয়ে।···

সতী সুলেখার দিদি, একমাত্র বোন।

দিদি ত' নয়, চকমকি পাথর, ধাক্কা লাগলেই আলো জ্বলে।

জীবনের গতি তার অনেক বিচিত্রতার মধ্যে দিয়ে তিরিশ বছরে চারটি ঋতু পেরিয়ে এসেছে। ষোল বছরে প্রথম বসন্ত, একুশে বর্ষা, সম্প্রতি হেমন্ত পেরিয়ে শরতের মাঝামাঝি।

সতী অপরূপ সুন্দরী। ছেলে বেলা থেকেই ও ঐ রকম। জন্ম যেদিন হল, সেদিন সংসারের আলো জলল। ও-ই পিতা-মাতার প্রথম কোল জোড়া, সংসার পূর্ণ করা শিশু।

দিদিমা ঠাকুমার দল নাতনী দেখতে এলেন সদর্পে; সগর্ব্বে বললেন, "মেয়েতো নয় হীরের টুক্‌রো, রাজ রাজার ঘরেও মেলে না হাজার তপস্যা ক'রে!" বাবার আশীর্ব্বাদ, সকলের আদর আর সবার স্নেহ কুড়িয়ে মেয়েটি বড় হতে লাগল। ঘটা করে নামাকরণ হল সতী। প্রথমে নামটা রূপ দেখেই হয়েছিল, পরে দেখা গেল গুণের সঙ্গেও খাপ খেয়েছে চমৎকার। প্রথম সন্তান হ'লে যা হয়, এক্ষেত্রেও তাই হল। পিতার আদরে সতীর আব্দার রইল সকলের ওপরে।

পোনেরোতে পা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকলেই সচকিত হ'য়ে উঠল'। হঠাৎ সকলে বললে, পূর্ণিমার চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে, উপযুক্ত আকাশ চাই, যার ওপরে মানাবে ভাল। পাত্রের সন্ধানে লোক ছুটল, ঘটক জুটল, আর লোকের মুখে মুখে ছুটল কথা। সবাই বললে, "ওমুকের মেয়ে সতী, মেয়েত' নয়, চাঁদের কণা, পটে আঁকা আল্‌পনা, স্বামীর ঘর আলো করবে, সংসারের মুখ ক'রবে উজ্জ্বল।

পাত্র ঠিক করতে গ্রাম উজার হল, সহর উজার হল, জমিদারীতে হৈ-চৈ'র অন্ত নেই, কিন্তু পাত্র মিলল না। রূপ আছে ত' গুণে কম, গুণ থাকে ত' পয়সায় কমতি। এমন মেয়েকে ত' আর হাত পা বেঁধে জলে ফেলা যায় না। পাত্র যদিও বা মনের মতন মেলে, কুষ্ঠিতে বাঁধে বিভ্রাট। বাদ-বিচার দেখে বিধাতা হাসলেন, নিয়তি পাত্র মেলাল, কিন্তু ভাগ্য মেলাল না। কুষ্ঠি লুকিয়ে বিয়ে হ'য়ে গেল ঠিক ষোল বছরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই।

বিয়ের বাতাস গায়ে লাগল যেমন বনে লাগে বসন্তের ছোঁয়াচ। সতীর দুকুল ছাপিয়ে দিয়ে যৌবনের ছোঁয়াচ এল': জীবনটা ওর কানায় কানায় উবছিয়ে উঠল। স্বামী ওর বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অর্থের সিংহাসনে কায়েমী আসন। সতীর মা বাবা অতিমাত্রায় বিনয় ক'রে বললেন, "আমাদের আর কি বলুন, ওরই বরাত? এমনটি হবে আমরাই কি জানতুম!"

পাড়ার লোকের মনে সাড়া পড়ল, বললে, "হবেই ত', মেয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করা আলোর কণা, ও মেয়ে ত' সতী।"

বছর দুই পরে ছোট্ট বেলা সতীর কোল জুড়ে এল'। সতীর মনে হ'ল জীবনটা ওর পরিপূর্ণ। বেলা এল', সঙ্গে আনল' বসন্তের শেষ বেলার শুকনো পাতা ঝরার পালা। তিনটি বছরের ছোট্ট মেয়ে আর একুশটি বসন্তের সুন্দরী স্ত্রী রেখে স্বামী ওর বিদায় নিল। সতীর জীবনে বসন্তের পালা শেষ হ'ল, নাব্‌ল বর্ষা। শুধু সতীর জীবনে নয়, সংসারেও। সংসার ভেঙ্গে পড়ল একটু একটু করে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে। জমিদারীতে ভাঙ্গন ধরল', সরিকদের মধ্যে অংশ নিয়ে বিবাদ বাঁধল', উঠল আদালতে। জমিদারী আদালতে হ'ল দু'ভাগ। দশ ছয়, উকিল বাড়ীতে হ'ল হাজার ভাগ, নয় ছয়। ভাঙনের শেষ তবু নেই, প্লাবন এল। সতীর দেহ ভাঙল', মন ভাঙল, বিশ্বাস ভাঙ্গল না। পিতার কিন্তু সব ভাঙল। নিয়তির এত বড় কষাঘাত তাঁর সহ্য হল না। দেবতার বিরুদ্ধে বজ্রমুষ্টি তুলে ধরে নিয়তিকে করলেন বিদ্রূপ, মামলার কথা শুনে বল্‌লেন, "চলুক মামলা।"

বৃদ্ধ কাকা ছিলেন শনের নূড়ীর মতন বেঁচে। অনেক সাধ্য সাধনা করলেন মামলা মুলতুবী রাখতে, কিন্তু ভাঙ্গনের নেশায় মন যখন মেতে ওঠে, বুদ্ধি তখন বিলোপ পায়! ধ্বংসের নেশা জমিদারী বিক্রমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলল। সহজ ভাবে ছাড়লে যদি যেত ছ' আনা, উকিলের আশ্রয় নিয়ে আর তাদের বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়ে গেল ষোল আনা। জমিদারীর জমি গেল, রইল কঙ্কাল! জমিদারীর মান গেল, রইল পাওনাদারদের অপমান। সরিকে সরিকে মারামারির সুযোগ নিয়ে পার্শ্বের গ্রামের জমিদার তাঁর বাগানটাকেও বিঘে কয়েক এগিয়ে নিয়ে এলেন এদের এলাকার মধ্যে। আবার মামলা, আবার উকিলবাড়ী, আবার অজস্র অর্থ স্রোতের মতন ভেসে গেল। মামলায় জয়লাভ হল, কিন্তু দেখা গেল, জমিদারীর যে অংশের জন্যে এত' মামলা মারামারি, সে অংশটার ভগ্নাংশও এদের নয়, ছ' আনাওয়ালাদের। তারা মজা দেখল', জমার খাতায় জমিটা উঠে এল'। সতীর বাবা অর্থ দাবী করলেন, হল অনর্থের সৃষ্টি। আবার মামলা।

এমনি করে মামলায় মামলায় সব গেল, ভাঙা মন শরীরকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করল, তিনি শয্যা নিলেন। সতী সংসারে পিতাকে আশ্রয় করে ছিল, মেয়ে বেলা আর মামলায় ব্যস্ত পিতার পরিচর্য্যায় তার দিন কাটত', হঠাৎ সেও বিছানা নিল'।

ওদের সংসারে এমনি করে নামল' হেমন্তের ঘন-কুয়াশা। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কালকের দিনে কি হবে কেউ বলতে পারল না! ইতিমধ্যে হঠাৎ কাকা মারা গেলেন। এতদিন পর্য্যন্ত সুলেখা বড় হচ্ছিল সবার অলক্ষ্যে। সতীর অসুখে তার ওপর পড়ল সংসারের ভার। বেলা সুলেখাকে আশ্রয় করে বড় হ'য়ে উঠল। রুগীর পরিচর্য্যা ক'রে আর ছোট্ট বেলার দেখা শুনা করে দিন গেল সুলেখার। সতীর অসুখ বাড়তে বাড়তে ওকে বাড়ী ছাড়া করল, নিয়ে গেল হাঁসপাতালে।

সেখানে মিনিটে মিনিটে ও বাঁচল মৃত্যুর দরজায় করাঘাত করে। একটু সেরে বাড়ী এসে দেখল' মা বিছানা নিয়েছেন, বেলা আর পাঁচজনের অবহেলা নিয়ে চার বছরের হয়েছে। সুলেখা সবার অমতে বিয়ে করেছে প্রায় মাসখানেক আগে। এ খবরটা সুলেখা ইচ্ছে করেই কাউকে জানায় নি, বিশেষ করে দিদিকে, কারণ সতীর বাধা ও এড়াতে পার ত' না। মাও শয্যা নিয়েছেন ঠিক এই কারণে।

সতী হাঁসপাতাল থেকে বাড়ী এসেই অনুভব করল একটা অশান্তির কাল ছায়া বাড়ীর ওপরে নির্ম্মম ভাবে ছড়িয়ে আছে।

সুলেখার সব কথা শুনে কিছু বলল' না, হাসল শুধু। ভাগ্যের যে বিড়ম্বনা একটির পর একটি ওদের আঘাত করে

চলেছে, এইটাই তার সবচেয়ে বড় আঘাত। পাছে সুলেখা কিছু মনে করে, তাই পরে হাসতে হাসতে বলেছিল, মণি ভাল বেসে বিয়ে করেছিস, ভালবাসাকে কোনদিন ছোট করিসনি যেন!

কতবড় অভিশাপ এই বিয়ে, তার আভাষ সতী ছাড়া আর কেউ সেদিন পায়নি। তাই সতীর সব চিন্তার মাঝখানে মণি রইল মধ্যমণি হয়ে। বেলা আর সুলেখাকে উপলক্ষ্য করে সতীর ভাঙা জীবন এগিয়ে চলল' একটি একটি দিনের ওপর পা ফেলে। সতীর জীবন হল ওদের দু'জনের জীবনের ভগ্নাংশ। প্রতিমুহূর্ত্তে সতীর ভয়, প্রতিদিনে সতীর শত চিন্তা···সুলেখার কপালে না জানি কি আছে।

দিন গিয়ে মাস এল', মাস গিয়ে বছর ঘুরল, শুধু ঘুরল' না সুলেখার কপালে নিয়তির করাঘাত! [ক্রমশঃ

পুস্তক ও আলোচনা

নন্দিতা ঃ শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড্ সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। দাম—১৸০ টাকা মাত্র।

সূচনা, বৃদ্ধি ও পরিণতি লইয়া প্রধানতঃ উপন্যাস বা বড় গল্পের আবয়বিক উপাদান গঠিত। বৃহত্তর সমাজ বা সংসারের পরিপ্রেক্ষিতে যে বস্তু ও ভাবরাশি স্ফুরিত হইয়া মানব-মনকে আনন্দে দুঃখে সর্ব্বদা আন্দোলিত করিয়া তোলে, বিশেষ ভাবে তাহারই পটভূমিকায় উপন্যাসের সৃষ্টি। যিনি বৃহত্তর শিল্পী, তাঁর রচনায় সেই সৃষ্টি সত্যকার রসোত্তীর্ণ ও প্রাণবন্ত হইয়া ওঠে।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকার হাতে সেই সৃষ্টিকুশলতার যাদু আছে—যাহাকে শুধু বাহিরের প্রচ্ছদপট দিয়া বিচার করা চলে না। খাঁটি উপন্যাসের উপাদানে 'নন্দিতা'র বিচিত্র ছন্দমুখর দেহাবয়ব গঠিত। লেখিকা বিচারশীল আধুনিক দৃষ্টিতে নিপুণা। প্রগতিযুগের ভাসমান কৃষ্টির উপরে আজ আমাদের সমাজ যে ভাবে দাঁড়াইয়া আছে—তাহারই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে গ্রন্থের নায়ক নায়িকারা। ডাঃ চৌধুরী, কণিকা, নন্দিতা, প্রেমাঙ্কুর, রতীন—প্রত্যেকটি চরিত্রই এই প্রগতিসভ্যতার রুগ্ন আবেষ্টনীর মধ্যে বেদিশারী চঞ্চল বিক্ষুব্ধতায় সর্ব্বাঙ্গিক বিদ্ধ। অথচ কোথাও তাহারা স্থির নয়, জীবনের আদর্শ ও ধারা তাহাদের বিভিন্নমুখী। লেখিকা নিজেকে অন্তরালে রাখিয়া বিচারশীল যুক্তির দ্বারা চরিত্রগুলিকে তাহাদের প্রতিমুহূর্ত্তের ঘাত-সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়া এমন ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহা তাঁহার গভীর সংযম ও মনন-শীলতারই পরিচয় দেয়।

নন্দিতা প্রগতিযুগের মেয়ে হইয়া প্রগতির ছাঁচে গড়িয়া উঠিলেও বার বার তার মন এই যুগধর্ম্ম সভ্যতার বিষতিক্ততার বাহিরে ছুটিয়া যাইতে চাহিয়াছে; কিন্তু একদিকে শিক্ষাগত সংস্কৃতি ও অন্যদিকে যৌবনগত চিত্ত-বৃত্তির দোটানায় পড়িয়া মনের জড়তাতেই বাঁধা পড়িয়াছে, উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এই দুর্ব্বলতাই তাহাকে পদে পদে আঘাত করিয়াছে,—যে আঘাত স্বেচ্ছায় সে সমাজের বুকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই।

গ্রন্থখানির আগাগোড়া এই দ্বন্দ্ববৈচিত্র্য। নায়ক-নায়িকার অন্তর্বিপ্লবের মধ্য দিয়া লেখিকা এমন কাব্যময় ভাষায় কাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছেন, যাহাকে বলা যায়—'লিরিক্-মুভ্ ইন্ ফিক্শন' (Lyric-move in Fiction); এবং এই লিরিক-মুভ্ বা কাব্যসম্পৃক্ত গতি আছে বলিয়াই আবহ কাহিনীর সাথে সাথে বিচিত্র চরিত্রগুলিও অনায়াসে মনের উপর রেখাপাত করে। গ্রন্থরচয়িত্রীর সার্থকতা এইখানেই।

শ্রীরণজিৎ কুমার সেন

মামা-ভাগ্নে ঃ 'ভালদা' প্রণীত শিশুগল্পিকা। দি ইয়ং পাব্লিশার্সে'র পক্ষ হইতে আজিজুল ইসলাম কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা মাত্র।

ছোটদের মনের কথা ঠিক তাহাদের উপযোগি করিয়া সহজ ও সাবলিল ভাষায় বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে শিশু-সাহিত্যের যথার্থ 'আর্ট'টি লুকান রহিয়াছে। তাহার সহিত গল্পচ্ছলে জীবনের উচ্চ আদর্শ ও মহত্তর অনুপ্রেরণা যুক্ত হইলে শিশু-জীবনের সত্যকার উৎকর্ষ সাধনের মধ্য দিয়া লেখকের সৃষ্টি সার্থক হয়।

আলোচ্য গ্রন্থ 'মামা-ভাগ্নে'তে তেমন কোন আদর্শ-সঞ্জাত অনুপ্রেরণার ইঙ্গিত না থাকিলেও লেখক অতি সহজ ও সরল ভাষায় নতুন সহরে আগত মামা নকুড়চন্দ্র ও ভাগ্নে কেবলচন্দ্রের রহস্যকর জীবন-চিত্র আঁকিয়া শিশু-চিত্তে খানিকটা হাসির উদ্রেক করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বিষয় বস্তু নির্ব্বাচনে লেখকের প্রশংসা করা যায় না। ভবিষ্যতে গ্রন্থ রচনাকালে লেখক আরও অনেকখানি আত্মস্থ হইয়া শিশু-জীবনের প্রত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট হইবেন, ইহাই আশা করি।

শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গান
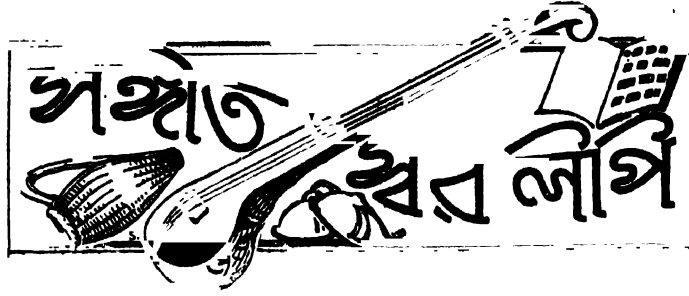
রচনা : বাণীকুমার
সুর : পঙ্কজকুমার মল্লিক

স্বরলিপি : অনিল দাস ও
বিমলভূষণ

আহা আষাঢ়ের কোন্ গোপন বাণীটি
বাজালো হৃদয়-বীণা-তার!
ওগো জানায় বিরহ করুণ বারতা,
কাঁদে মিলনের ফুলহার!

একা ব'সে আছি শুধু হাঁকে বাজ,
নয়নের জলে নাহি কোনো কাজ,
আজি জীবনের সুর বাজিল বেসুর,
মন্দির মোর কারাগার॥

কভু আসিবে না কি গো মিলন-দেবতা,
থামিবে কি মোর বীণা-তান!
শুধু অশ্রু ভিজাবে যূথীর মালিকা,
বিরহের নাহি অবসান!—

চমকিয়া উঠি আপনার গীতে,
আসিবে কি প্রিয় শেষ গোধূলিতে,
কেন গুমরি' গুমরি' মরিছে আমার
দীর্ঘ নীরব অভিসার!

—স্বরলিপি—

সা সা ‖ { সরা রমা -মা | পা পদা মা পা পণা [প]ণর্সা [প]ণ দা পদমা
আ হা ‖ { আ০ ষা০ ঢ়ে | র কো০ ন্ গো প০ ন০ বা ণী টি০০

মা মপা মা | -গা সরা গমা রগা গা রসা -া (সা সা) }
বা জা০ লো | হৃ দ০ ০য় বী০ ণা তা০ র "আ হা" }

[মা গমা পদা]
সা সদা | { দা দা -া | দা দা দা দা দর্সা ণর্সণা দা পদা [প]মা }
ও গো | { জা না য় | বি র হ ক রু০ ণ০০ | বা র০ তা }

মা মপদা মা | মপা মা গা গা মা গমা | পদা [প]মপা -া[ম]
কাঁ দে০০ মি | ল০ নে র ফু ল হা০ | ০০ ০০ র

"বাজালো হৃদয়-বীণাতার"।

পা পা পা | ণদা পদা [প]মা পদা মা পদা র্সা -া -া
এ কা ব | সে০ আ০ ছি শু০ ধু হাঁ০ কে বা জ্

দা র্রা র্রা | -া র্রা র্রা | র্সা র্সর্রর্জ্ঞা র্রর্জ্ঞা র্রা র্সনা র্সা
ন য় নে | য় জ লে | না হি০০ কো০ নো কা০ ০

-া -া -া | -া (-া -া) } | -া দা দা | দা র্সা র্সা
০ ০ ০ | ০ ০ জ } | জ আ জি | জী ব নে

া সর্ঋা র্সা | না র্সা নর্সনা | দা (পদা মপা) } | পদপা মা
র সু০ র | বা জি ল০০ | বে সু০ ০র } | সু০০ র

পা ণা ণা | ণা ণর্সা ণা | দা দা পদা | মপা -া -মা
ম ন্ দি | র মো০ র | কা রা গা০ | ০০ ০ র

"বাজালো হৃদয় বীণাতার"

সা সা || { সা সমা মা | মা মা মা | জ্ঞা মা জ্ঞমপা | পা পা পমা
ক ভু || { আ সি০ বে | না কি গো | মি ল ন০০ | দে ব তা০

মা দা দা | দা দণা দা | জ্ঞা জ্ঞমপদা মপা | -া -া পদা
থা মি বে | কি মো০ র | বী ণা০০০ তা০ | ০ ন শুধু

দা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | ণর্সর্রা র্রা র্রা | র্রর্সা র্সণা ণদা
অ ০ শ্রু | ভি জা বে | যূ০০ থী র | মা০ লি০ কা০

পা পণা ণা | দা পদা মা | ম গমপদা মপা | া (পা পা)
বি র০ হে | র না০ হি | অ ব০০০ সা০ | ন ক ভু

-া -া -া
০ ০ ন

{ পদা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | -া র্সা র্সা
{ চ০ ম কি | য়া উ ঠি | আ প না | র গী তে

দা র্ঋা র্ঋা | র্ঋা র্ঋা র্ঋা | র্সর্ঋা র্জ্ঞা র্ঋর্জ্ঞা | র্ঋা র্সা র্সর্ঋা
আ সি বে | কি প্রি য় | শে০ ষ গো০ | ধূ লি তে০

নর্সা -া -া | -া (-া -া)
০০ ০ ০ | ০ ০ ০

দা পা || { দা দর্সা র্সা | র্সা সর্ঋা র্সা | না র্সা নর্সনা | (দা পদা মপা)
কে ন || { গু ম০ রি | গু ম০ রি' | ম রি ছে০০ | আ মা০ ০র

দা পদা মা
আ মা০ র

মপা দণা ণা | ণর্সা ণা দা | দা দা পদা | মপা -া মা
দী০ ০র্ ঘ | নী০ র ব | অ ভি সা০ | ০০ ০ র

"বাজালো হৃদয়-বীণাতার"

বিজ্ঞান জগৎ

ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(দুই)

কি কারণে অণু পরমাণুর দল জড়বিশ্বে ভিত্তি প্রস্তররূপে এবং কারবারের জগতে ক্ষুদ্রতম মাপকাঠিরূপে সম্মান লাভে সমর্থ হয়েছিল, এবং শেষ পর্য্যন্ত কেনই বা ওদের এ দাবী টিকলো না, অতঃপর আমরা সেই সকল কথা, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় কতকটা বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করবো। এ জন্য প্রথমেই প্রয়োজন স্পষ্টরূপে অণু ও পরমাণুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ।

বাস্তব জগৎটা স্থূল জড়দ্রব্য নিয়ে—এই বোধ যখন শিকড় গেড়ে বসলো, তখন স্বভাবতঃই জিজ্ঞাস্য হলো, জড় পদার্থের এমন সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ রয়েছে কি, যাদের কোন ক্রমেই আর কাটা বা ভাঙ্গা যায় না এবং থাকলে তাদের স্বরূপ কি? বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক সকলের কাছেই এ প্রশ্নের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। কারবারের জগতে ব্যবহারিক সত্যই যখন ধ্রুব সত্য, তখন স্বভাবতঃই আমাদের মেনে নিতে হয় যে, জড়দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম অংশগুলি শত ক্ষুদ্র হলেও সসীমই হবে। অন্যপক্ষে, নিছক গাণিতিক সত্যের কাছে এ প্রশ্নের কোন মূল্য নেই। গাণিতিক সত্যতার অতিমাত্র ধারালো মন-গড়া ছুরিখানা বের ক'রে এবং কল্পনার সাহায্যে তা' একটা পেন্সিল বা একটি মনুষ্যদেহের ওপর অসংখ্যবার প্রয়োগ করে অনায়াসে প্রমাণ করে দেবে যে, জড়ের বিভাজ্যতার কোন সীমা পরিসীমা নেই—ক্রমাগত ভাগ করতে থাকলে এমন সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পৌঁছুতে হয়, যাদের অবস্থান থাকলেও বিস্তৃতি নেই; সুতরাং যারা জড়-বিন্দু ব'লে পরিচিত হ'তে চাইলেও সত্যই জড়ধর্ম্মী কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ এসে পড়ে। কিন্তু জড়বাদী বৈজ্ঞানিক এই আয়াসবিহীন মানসিক কসরত-টাকে হেসে উড়িয়ে দেবেন এবং কারবারের জগতের প্রত্যক্ষ-লব্ধ সত্যগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে অবিভাজ্য সসীম জরকণার জয় ঘোষণা করবেন।

বৈজ্ঞানিক বলবেন: রেখে দাও তোমার কাল্পনিক ছুরি। বাস্তব জগতে পদার্থকে চূর্ণ করবার অস্ত্র হচ্ছে ঢেঁকি বা যাঁতা এবং কাটবার অস্ত্র হচ্ছে লোহার ছুরি বা কাঁচি। আরো সূক্ষ্মতর অস্ত্রের খবরও আমরা জানি—তা' হচ্ছে তাপ ও তাড়িত-শক্তি। তড়িতরূপ অস্ত্র প্রয়োগে জড়ের বিশ্লেষণ ঘটিয়ে আমরা যে সকল ক্ষুদ্রতম কণার সাক্ষাৎ পাই, তাদের আদৌ জড়-বিন্দু বলা চলে না। সর্ব্বাংশে ক্ষুদ্র হইলেও এবং এমন কি, প্রচণ্ড শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থান করলেও, ওরা অসীম ক্ষুদ্র নয়। সসীমতার ছাপ নিয়েই ওরা কারবারের জগতে আনাগোনা করে। আকৃতি বা আয়তনে কিম্বা স্বাভাবিক চাল-চলনে দৃশ্যমান জড় বস্তুগুলির সঙ্গে ওদের প্রকৃতিগত ভেদ নেই—যা' কিছু ভেদ পরিমাণ নিয়ে। এককভাবে ইন্দ্রিয়ের অগোচর হলেও ওদেরই সমষ্টিকে আমরা জড় দ্রব্যরূপে প্রত্যক্ষ ক'রে থাকি। চঞ্চলতা ওদের বিশিষ্ট ধর্ম্ম। দল বেঁধে আঘাত ক'রে ওরা আমাদের স্পর্শবোধকে জাগ্রত করে এবং ওদেরই অদৃশ্য লম্ফন, ঝম্পন, কম্পন বা ঘূর্ণন গতির তারতম্য থেকে আমরা গোটা পদার্থটাকে গরম বা ঠাণ্ডা, জ্যোতিষ্মান্ বা জ্যোতিহীন রূপে অনুভব ক'রে থাকি। কারবারের জগতে ওরা মস্ত ব্যাপারী। সবাই কর্ম্মক্ষম, সবাই ব্যস্ত। ওদেরকে আমরা

কোন ক্রমেই অগ্রাহ্য করতে পারিনে। গাণিতিকের কাল্পনিক ছুরির আঘাত ওদেরকে আদৌ স্পর্শ করে না।

এই যুগে কণাগুলির জীবন কাহিনী অতি বিচিত্র। কারবারের প্রকারভেদ নিয়ে ওদের মধ্যে ছোট বড় ভেদ রয়েছে। ফলে এক শ্রেণীর জড়কণাকে বলা যায় 'অণু' বা Molecule এবং অপর এক শ্রেণীকে বলা যায় পরমাণু বা Atom. অণু ও পরমাণুর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও বহু বিষয়ে বৈষম্য রয়েছে। প্রধান পার্থক্য ওদের ক্ষুদ্রতার সীমা নিয়ে। অণু সূক্ষ্ম, পরমাণু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। সাধারণতঃ দু'চারটা কিম্বা দশ বিশটা পরমাণু দল পাকিয়ে এবং বিশিষ্ট বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে বদ্ধ হয়ে এক একটি অণু গঠন করে। দু'টা বিভিন্ন প্রকৃতির পরমাণুর (যেমন কার্ব্বণ ও অক্সিজেন পরমাণু) মধ্যে যে আকর্ষণ, তাহাকে বলা যায় রাসায়নিক আকর্ষণ বা Chemical Attraction এবং দু'টা সমজাতীয় পরমাণুর (যেমন দু'টা অক্সিজেন পরমাণুর) মধ্যে যে আকর্ষণ, তাকে বলা যায় সংসক্তি বা Cohesion, ক্ষেত্র বিশেষে দু'শো, চারশো এমন কি দশ বিশ হাজার পরমাণুও দলবদ্ধ হয়ে এক একটি অণু গঠন ক'রে থাকে। আবার গোটাকতক এমন পদার্থও আছে, যাদের অণুর ভেতর একাধিক পরমাণু খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের বেলায় অণু ও পরমাণু একই জিনিস এবং উভয়ে একই ক্ষুদ্রতার সীমা নির্দ্দেশ করে থাকে। এক পারমাণবিক অণুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে কেবল কোন কোন মূল পদার্থের ভেতরেই। অন্যপক্ষে যৌগিক পদার্থের (Compoundএর) অণুর ভেতর অন্ততঃ দু'রকমের দু'টা পরমাণু না থাকলে চলে না। এর কারণ অতি স্পষ্ট। নিছক পুরুষদের বা নিছক নারী-সমাজের নাচে নৃত্যপরায়ণ ক্ষুদ্রতম অংশটি একটি মাত্র পুরুষের বা একটি মাত্র নারীর আকার ধারণ করতে পারে, (অবশ্য একাধিক পুরুষ বা একাধিক নারী হতেও আপত্তি নেই) কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের বল-নাচে ঐ ক্ষুদ্রতম অংশের ভেতর অন্ততঃ একটি পুরুষের ও একটি নারীর সাক্ষাৎলাভ ঘটবেই। যৌগিক পদার্থ মাত্রই অন্ততঃ দু' রকমের দুটা মূল পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন,সুতরাং এই মিলন ব্যাপারে উভয়ের যে সকল ক্ষুদ্রতম অংশগুলি নায়ক নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ ক'রে, তাদের যদি ঐ পদার্থদ্বয়ের পরমাণু বলা যায়, তবে ঐ যৌগিক পদার্থের অনুরূপ ক্ষুদ্রতম অংশের ভেতর অন্ততঃ দু'টা বিভিন্ন প্রকৃতির পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়। বস্তুতঃ ড্যাল্টনের মতে পরমাণু বলতে মূল পদার্থের ঐরূপ অংশগুলিকেই বোঝায়। ফলে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশরূপে পরমাণুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ওদেরকে কেবল বিশ্ব-রচনার শেষ ইষ্টকখণ্ড রূপে কল্পনা করলেই চলে না, পরন্তু বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয় চঞ্চল কণারূপে ওদের কারবারের দিকটাকেই। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে এই কারবার দু'টা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে থাকে, যাদেরকে আমরা বলতে পারি ওর সামাজিক রূপ ও সাংসারিক রূপ। এ হলো স্থূল বর্ণনা। বিজ্ঞানের ভাষায় এদের যথাক্রমে বলা হয়ে থাকে ভৌতিক পরিবর্ত্তন (physical change) এবং রাসায়নিক পরিবর্ত্তন (Chemical change) এই দু' শ্রেণীর পরিবর্ত্তনকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের দু'টা মস্ত বিভাগ—ভূতবিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞান (Physics) এবং রসায়ন বিজ্ঞান (chemistry) কাকে অণু বলব, কাকে পরমাণু বলব, এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই—

ভৌতিক পরিবর্ত্তনে ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম জড়ের এইরূপ ক্ষুদ্রতম অংশগুলির নাম 'অণু'; এবং রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে অংশ গ্রহণ করতে পারে, জড়ের এইরূপ ক্ষুদ্রতম অংশগুলির নাম 'পরমাণু'।

ভৌতিক ও রাসায়নিক কারবারে পার্থক্য কি? এর উত্তরে বলা হয়, ভৌতিক পরিবর্ত্তনে পদার্থের ধর্ম্ম বা প্রকৃতি বদলায়না; আর রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের বিশিষ্ট লক্ষণই হচ্ছে পদার্থের নিজস্ব প্রকৃতির পরিবর্ত্তন-সাধন। বলতে পারা যায়, বিয়ের পরে অনেকের যেমন হয় কতকটা সেই-রকম। আসল মানুষটি তাই থাকে, তবু যেন এক নূতন মানুষ—নূতন রং নূতন ঢং। যে ধরনের কারবারে পদার্থের ধর্ম্মের কোন পরিবর্ত্তন হয়না, তা'র সবই ভৌতিক পরিবর্ত্তনের অন্তর্গত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, জল পড়া, পাতা নড়া, ফুল ফোটা, গান গাওয়া, হাটা চলা, লম্ফন, ঝম্ফন, পদার্থের ভূ-পতন, ট্রেণে ট্রেণে কলিশন, অণুতে অণুতে ঘাত প্রতিঘাত, ধূমকেতুর আবির্ভাব, উল্কাপাত, গ্রহণ, চন্দ্রের ভূ-প্রদক্ষিণ, পৃথিবীর সূর্য্য-প্রদক্ষিণ, কঠিন পদার্থের গলন, তরলের বাষ্পীভবন, তাপ ও আলোর সঞ্চালন, বিদ্যুতের প্রবাহ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি ভৌতিক পরিবর্ত্তনের অন্তর্গত। এই ধরনের

ব্যাপারে যে সকল জড়দ্রব্য অংশ গ্রহণ করে, তারা তাদের নিজস্ব ধর্ম্ম এবং ব্যক্তিত্ব হারায় না। ওদের মধ্যে আবার যারা সব চেয়ে ছোট, তারাই উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে, নাম গ্রহণ করেছে অণু। জড়দ্রব্য শত সহস্র রকমের, সুতরাং অণুও শত সহস্র রকমের। কেউ বা যৌগিক অণু, কেউ বা মৌলিক অণু, কারো ভেতর পরমাণুর সংখ্যা একটি মাত্র, কারো ভেতর দু'টি চারটি বা শত সহস্রটি।

অন্যপক্ষে যে ধরণের কারবারে পদার্থের ধর্ম্ম বদলে যায়, তা'র সমস্তই রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের অন্তর্গত। রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের বিশিষ্ট উদাহরণ হচ্ছে দহন। বস্তুতঃ বিজলী বাতির কথা ছেড়ে দিলে প্রায় সকল দহন কার্য্যকেই রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের অন্তর্গত করা যায়। কার্ব্বণ বা কয়লা পুড়ে যখন ছাই হয়, তখন কার্ব্বনের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেনের এমন নিবিড় সংযোগ ঘটে যে, তখন ওদের কারুরই আলাদা অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়না, অথচ কেউ ওরা ধ্বংস হয়না। উভয়ে মিলে গঠণ করে কার্ব্বনিক এসিড নামক গ্যাস যা' অদৃশ্য হাওয়ার আকারেই হাওয়ার সাথে মিশে যায় এবং যা'র ধর্ম্ম অক্সিজেন গ্যাসের ঠিক বিপরীত ;—কারণ অক্সিজেন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপকেও জ্বালিয়ে তোলে আর কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস অত্যুজ্জ্বল দীপ শিখাকেও নিবিয়ে দেয়। এই ধরনের সংযোগকে বলা যায় রাসায়নিক সংযোগ। কার্ব্বন বা অক্সিজেনের এক কণাও বিনষ্ট হয়না, অথচ সংযুক্ত অবস্থায় ওদের প্রকৃতি যেন বদলে যায়। আবার ঐ যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ ঘটিয়ে ওর মূল উপাদান দু'টাকে পৃথক করতেও পারা যায়। তখন ওদের পূর্ব্ব ধর্ম্ম আবার পূর্ণ মাত্রাতেই ফুটে ওঠে। এই দুই প্রক্রিয়াকে বলা যায় যথাক্রমে রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণ (বা সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ)। উভয় ব্যাপারই ঘটে, আমাদের মেনে নিতে হয়, ঐ দুই মূল পদার্থের এমন সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মিলন ও বিচ্ছেদের কাহিনী রচে যাদের কখনো চোখে দেখবো ব'লে আমরা আদৌ আশা করতে পারিনে, অথচ তারা যে অসীম ক্ষুদ্র নয়, পরন্তু কর্ম্মজগতে, আমাদের মতই কারবারী (এবং এমন কি, হয়ত আমাদের মতই সুখ দুঃখের অধীন) তা'ও ব্যবহারিক সত্যের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে না মেনে পারা যায়না। রাসায়নিক কারবারে যা'রা এইরূপ সসীমতার ছাপ নিয়েই ক্ষুদ্রতম কণারূপে পরিচিত হতে চায় তাদেরকেই উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে বলা যায় পরমাণু। পরমাণু মাত্রই মূল পদার্থ। যে অর্থে কার্ব্বন বা অক্সিজেন মূল পদার্থ, কার্ব্বন-পরমাণু অক্সিজেন-পরমাণুও সেই অর্থেই* মূল পদার্থ—কারো ভেতর থেকেই দু'রকমের দু'টা (বা বহু রকমের বহু) পদার্থ বেরিয়ে আসার কথা নেই। মূল পদার্থ যত রকমের পরমাণুও তত রকমের এবং এ পর্য্যন্ত যতটা জানতে পারা গেছে, উভয়েই ৯২ রকমের, অর্থাৎ প্রায় শত রকমের। মাত্র বিরানব্বই রকমের বিরানব্বইটি পরমাণু, কিন্তু প্রত্যেকেই ওরা দলে ভারী—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি। ওরাই পরস্পরের আকর্ষণে বদ্ধ হয়ে এবং দু'চারটা বা দশ বিশটা করে' দল পাকিয়ে গঠন করেছে কত সহস্র রকমের অণু। আবার কত কোটি কোটি অণু জোট পাকিয়ে গড়ে তুলেছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক একটি জড় পদার্থ এবং তাদের সমষ্টি এই বিরাট জড়জগৎ। এই হলো জড়বাদীর জগৎচিত্র। এই জগতের পরমাণুরূপী অবিভাজ্য ইষ্টক খণ্ডগুলি নিজেরা অবিকৃত থেকে জগতের ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস রচনা করে এবং ব্যবহারিক জগতে ক্ষুদ্রতম মাপকাঠিরূপে বিশিষ্ট মর্য্যাদাও দাবী করে।

ওপরে পরমাণুর যে সংজ্ঞা দেওয়া গেল, তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ড্যাল্টন (১৭৬৬—১৮৪৪)। প্রকৃত পক্ষে পরমাণুর কল্পনা বহু পুরাতন এবং এ কল্পনা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দেশেই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। গ্রীক পণ্ডিত ডেমোক্রাইটাসের পরমাণু এই কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছিল, যে, সমগ্রভাবে জড়জগতের সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই। ওদের মূল উপাদান হচ্ছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা, যাদের কোন ক্রমেই কাটা যায়না। জন্ম মৃত্যু বা জরা ঐ সকল কণাকে স্পর্শ করতে পারেনা। এদের নাম অ্যাটম (Atom) বা পরমাণু। Atom (অ্যাটম্) কথার অর্থ হচ্ছে—that which can not be cut (যা'কে কাটা যায়না)। দু'হাজার বৎসরেরও আরো পূর্ব্বে ডেমোক্রাইটাস শিখিয়েছিলেন :

'প্রকৃত পক্ষে পরমাণু ছাড়া আর কোন বাস্তব পদার্থ নেই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলিকে বাস্তব পদার্থ ব'লে মনে হয়, কিন্তু তা' ভুল। পরমাণু এবং পরমাণুতে পরমাণুতে ফাঁক—এই হলো জগতের খাঁটি রূপ'।

জড়দ্রব্য মাত্রেরই যে বস্তু: এইরূপ সসীম ও অবিভাজ্য অংশ রয়েছে, তার কোন প্রমাণ প্রাচীনেরা দেন নি। প্রমাণ উপস্থিত করলেন ড্যাল্টন—রসায়ন বিজ্ঞানের তরফ থেকে। ড্যাল্টন দেখলেন যে, অন্ততঃ রাসায়নিক কারবারে জড় দ্রব্যের ঐরূপ অবিভাজ্য অংশের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি পরমাণুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করলেন এই বলে যে, পরমাণু বলতে বুঝতে হবে পদার্থের সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে যারা রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং যাদের চেয়ে ছোট কিছু পারেনা। তিনি আরো বললেন যে, কোন বিশিষ্ট মূল পদার্থের (যেমন সোনার) পরমাণুগুলি সর্ব্বাংশে সমান। ওদের সবারই ওজন বা গুরুত্ব সমান এবং অন্যান্য ধর্ম্মেও কোন পার্থক্য নেই; কিন্তু বিভিন্ন মূল পদার্থের (যেমন সোনা, রূপা, লোহা, তামা, গন্ধক, কার্ব্বন, পারদ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন প্রভৃতির) পরমাণুদের গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন এবং অন্যান্য ধর্ম্মও বিভিন্ন। পরমাণুর বিশিষ্ট ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করা গেল ওর গুরুত্বকে; কারণ দেখা গেল, অন্যান্য ধর্ম্মের কথা না তুলেও, এক গুরুত্বের দিক থেকেই পরমাণুতে পরমাণুতে পার্থক্য নির্দ্দেশ করা যেতে পারে।

মোটের ওপর ড্যাল্টনের পরমাণু শুধু এই দাবীই জানাতে পারলো যে, রাসায়নিক কারবারে ওরাই হচ্ছে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ। বস্তুতঃই ওরা অবিভাজ্য কিনা এবং বিভাজ্য হলে ঐ টুকরা অশংগুলি অন্য কোন কারবারে অংশ গ্রহণ করে কিনা, ড্যাল্টনের পরমাণুবাদ তার কোন উত্তর দেয় না। তবু সর্ব্বশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ তখন থেকে মেনে নিলেন যে, প্রাচীনেরা যে একান্ত অবিভাজ্য পরমাণুর কল্পনা করেছিলেন, ড্যাল্টনের পরমাণুতেই তা' বাস্তবরূপ গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ প্রাচীনদের পরমাণু ও ড্যাল্টনের পরমাণু একই পদার্থ। এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত না হলেও অস্বাভাবিক নয়। মানবচিত্ত স্বভাবতঃই সসীম পদার্থ নিয়ে কারবার করতে চায়। অসীম ছোট ও অসীম বড়; উভয়েই আমাদের নাগালের বাইরে। সুতরাং ড্যাল্টন যখন তাঁর পরমাণুবাদ প্রচার করলেন এবং দেখা গেল যে, এই মত মেনে নিলে রাসায়নিক সংযোগ বিশ্লেষণের নিয়মগুলির—বিশেষতঃ বিশিষ্টানুপাতের ও গুণানুপাতের নিয়ম দু'টার (Laws of Definite and Multiple Proportion) সঙ্গত ও সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তখন স্বভাবতঃই এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, সত্যিকার 'অকাট্য' পরমাণু বলতে যদি কিছু থাকে তবে ড্যাল্টনের পরমাণুই সেই পদার্থ।

যে-সকল পরীক্ষামূলক সত্যকে ভিত্তি ক'রে ড্যাল্টনের পরমাণুবাদ প্রতিষ্ঠালাভে সক্ষম হয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ঐ নিয়ম দু'টা। সুতরাং ঐ নিয়মদ্বয় সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনার দরকার। উক্ত বিশিষ্টানুপাতের নিয়মটা এই :— যখন দু'টা বিশিষ্ট মূল পদার্থ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে,তখন মিলনটা ঘটে উভয়ের যথেচ্ছ পরিমাণের মধ্যে নয়, পরন্তু উভয়ের ওজনের মধ্যে একটা বিশিষ্ট অনুপাতের মর্য্যাদা রক্ষা করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারা যায় যে, যদি একটা পাত্রের ভেতর যথেচ্ছ পরিমাণের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তবে যদিও, যথেচ্ছ পরিমাণ বলে, ওদের ওতঃপ্রোত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশবার পক্ষে কোন বাধা হবে না, তবু এই মিশ্রণটা হবে একটা ভৌতিক পরিবর্ত্তন (Physical change) এবং এর ফলে পাওয়া যাবে একটা সাধারণ মিশ্রপদার্থ (Mechanical Mixture) যা'র ভেতর ঐ দুই গ্যাসের ধর্ম্ম (নাইট্রোজেন জলন্ত দীপশিখাকে নিবিয়ে দিতে চায় আর অক্সিজেন তা' আরো উজ্জ্বল ক'রে তোলে) পরস্পরের আড়ালে থেকেও উঁকি মারতে থাকে; কিন্তু যদি ওদের পরস্পরের রাসায়নিক সংযোগের সুযোগ ঘটে এবং ফলে সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম্ম বিশিষ্ট একটা যৌগিক পদার্থের—ধরা যাক্ নাইট্রোজেন-মনোক্সাইড নামক গ্যাসের সৃষ্টি হয়, তবে দেখা যাবে যে, মিলনটা ঘটেছে ঐ দুই গ্যাসের ওজনের মধ্যে ৭ : ৪ এই অনুপাতটা বজায় রেখে; অর্থাৎ যেন, প্রতি সাত সের, সাত তোলা বা সাত গ্রেণ ওজনের নাইট্রোজেনের সঙ্গে চার সের, চার তোলা বা চার গ্রেণ ওজনের অক্সিজেন মিলে ঐ বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করেছে। আরো দেখা যাবে যে, ওদের বাড়তি ওজনটা—যদি কারো কিছু থাকে—আলাদা হয়ে অমনি পড়ে রয়েছে। রাসায়নিক সংযোগের এই হ'ল একটা বিশেষত্ব এবং একেই আমরা বলেছি বিশিষ্টানুপাতের নিয়ম। কিন্তু কেন এ নিয়ম? কেন ঐ গ্যাস

দু'টো (নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন) আমার ইচ্ছামত অনুপাতে —যে অনুপাতে ওদেরকে আমি পাত্রের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছি ঐ অনুপাতে—মিলিত হয়ে ঐ বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থকে (নাইট্রোজেন-মনোক্সাইডকে) গড়ে তোলে না? এ প্রশ্নের উত্তরের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে ঐ দুই গ্যাসই অন্যান্য অনুপাতেও পরস্পরের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হতে পারে কি, এবং তা'র ফলে নূতন নূতন যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হয় কি? এর উত্তর—হ্যাঁ। পরীক্ষিত সত্য এই যে, ওরা পরস্পরের সঙ্গে ৭ : ৮, ৭ : ১২ প্রভৃতি অনুপাতেও মিলিত হয়ে থাকে এবং ফলে যে-সকল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাদের নাম দেওয়া হয় যথাক্রমে নাইট্রোজেন-দ্বি-অক্সাইড, নাইট্রোজেন-ত্রি-অক্সাইড প্রভৃতি। সুতরাং নাইট্রোজেন-মনোক্সাইড থেকে আরম্ভ ক'রে দ্বি-অক্সাইড, ত্রি-অক্সাইড ক্রমে চলতে থাকলে আমরা দেখতে পাই যে, এই সকল যৌগিক পদার্থের উৎপাদনে যে যে পরিমাণের অক্সিজেনের আবশ্যক হয়, তাদের ওজনের অনুপাত হচ্ছে ৪ : ৮ : ১২ ইত্যাদি বা ১ : ২ : ৩ ইত্যাদি। এই নিয়ম কেবল নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের বেলায়ই নয়, অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধেও খাটে। এই নিয়মকেই আমরা বলেছি গুণানুপাতের নিয়ম। সাধারণ ক্ষেত্রে নিয়মটাকে এইরূপে প্রকাশ করা যায় :—যখন একটা মূল পদার্থের একটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের সঙ্গে আর একটা মূল পদার্থের বিভিন্ন ওজন মিলিত হয়ে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়, তখন দ্বিতীয় পদার্থের বিভিন্ন ওজনগুলির মধ্যে ১ : ২ : ৩ এইরূপ সরল গুণিতকের সম্বন্ধ বজায় রেখে ঐ সকল মিলন ঘটে থাকে। প্রশ্ন এই, অক্সিজেনের (বা অন্য কোন মূল পদার্থের) এ প্রবৃত্তি কেন? অক্সিজেন ঘটিত যৌগিক পদার্থগুলির অন্তর্গত অক্সিজেনের মাত্রা ধারাবাহিকভাবে ক্রমাগত বেড়ে না গিয়ে ধাপে ধাপে বাড়ে কেন? এ প্রশ্নেরও উত্তরের প্রয়োজন।

উভয় প্রশ্নেরই উত্তর পাই আমরা ড্যাণ্টনের পরমাণুবাদ থেকে। কারণ, যদি ঐ মতবাদ অনুসারে অনুমান করা যায় যে, পদার্থ মাত্রেরই পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ সসীম এমন সকল অংশ রয়েছে, যাদের চেয়ে ছোট কিছু রাসায়নিক কারবারে অংশ গ্রহণ করতে পারে না এবং এ-ও স্বীকার ক'রে নেওয়া যায় যে, একই মূল পদার্থের সকল পরমাণুর ওজন সমান ও বিভিন্ন মূলপদার্থের পরমাণুর ওজন ভিন্ন ভিন্ন এবং তার জন্য ওদের অন্যান্য ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন, তবে রাসায়নিক সংযোগ বিশ্লেষণ ব্যাপারগুলি কেন ঐ নিয়ম দু'টাকে মেনে চলে, তা' বুঝতে আমাদের মোটেই বেগ পেতে হয় না। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে সংযোগটা ঘটে উভয় পদার্থের গোটা গোটা পরমাণুর মধ্যে, যারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও সসীম এবং কারবারের জগতে যাদের আমাদের মতই এক একটা বিশিষ্ট আকৃতি, আয়তন ও ওজন রয়েছে। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নাইট্রোজেন-পরমাণুর সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অক্সিজেন-পরমাণু মিলেই নাইট্রোজেন-মনোক্সাইড নামক ঐ বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হতে পারে। যদি ঐ নাইট্রোজেন-পরমাণুগুলি অপর কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অক্সিজেন-পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়, তবে তার থেকে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হবে, তার ধর্ম্ম আর নাইট্রোজেন-মনোক্সাইডের ধর্ম্ম ঠিক এক হতে পারে না। তা' হবে একটা ভিন্ন পদার্থ। এই হ'ল বিশিষ্টানুপাতের নিয়ম। আবার নাইট্রোজেনের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেনের ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর মিলনও খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু এর ফলে যে-সকল যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হবে, তাদের অন্তর্গত অক্সিজেন-পরমাণুও ১, ২ প্রভৃতি পূর্ণ-সংখ্যাক্রমেই বাড়তে থাকবে; সুতরাং ওদের অন্তর্গত অক্সিজেনের ওজনও ধাপে ধাপে বা একটা সরল গুণানুপাতের নিয়ম মেনে বাড়তে থাকবে। এইরূপে উভয় নিয়মেরই একটা সহজ ও সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল এবং ফলে ড্যাণ্টনের পরমাণুবাদের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। সকল যুক্তিতর্কের মূলে রইল এই অনুমানটা যে, পরমাণু শত ক্ষুদ্র হলেও অসীম ক্ষুদ্র নয়, সুতরাং কারবারের জগতে ওরা ব্যবহারযোগ্য ক্ষুদ্রতম মাপকাঠি হবারই ক্ষমতা রাখে। এইরূপে এই মতবাদ থেকে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে, পরমাণু সসীম এবং অন্ততঃ এতটা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যে প্রত্যেকে এক একটা নির্দ্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য ওজনের ছাপ বহন ক'রে রাসায়নিক কারবারে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে থাকে—ঠিক যেমন দাম্পত্য সম্বন্ধ সংস্থাপন (বা খণ্ডন) ব্যাপারে যার যার আকৃতি আয়তন ও গুরুত্ব বজায় রেখেই

উভয় পক্ষ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত (বা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন) হয়ে থাকে।

উক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, যদি দু'টা মূল পদার্থের পরমাণুকে "ক" ও "খ" বলা যায় এবং ওদের পাশে ১, ২ প্রভৃতি অঙ্ক বসিয়ে ওদের সংখ্যা নির্দেশ করা যায়, তবে উভয় পদার্থের মিলনের ফলে যে-সকল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, তাদের ক্ষুদ্রতম অংশগুলিকে ক১ খ১, ক১ খ২, ক১ খ৩, প্রভৃতি দ্বারা অর্থাৎ অঙ্ক-সমন্বিত কতকগুলি যুক্তাক্ষর দ্বারা মূর্ত্তি দান করা যেতে পারে। রসায়ন বিজ্ঞানে এই পদ্ধতিই অবলম্বিত হয়ে থাকে। যৌগিক পদার্থের অণু বলতে এই সকল ক্ষুদ্রতম অংশকেই বুঝায়। এদের চেহারা দেখে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই সকল যৌগিক অণু বিভাজ্য, এবং বিশিষ্টানুপাত ও গুণানুপাতের নিয়ম দু'টাকে অঙ্গের ভূষণ ক'রেই ওরা এই সকল মূর্ত্তি গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। এ-ও সহজে বুঝা যায় যে, এই সকল যৌগিক অণু যখন অপর কোন অণু বা পরমাণুর সঙ্গে রাসায়নিক কারবারে লিপ্ত হয়, তখন ওদের অন্তর্গত পরমাণুগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পুরাণো অণু ভেঙ্গে যায় এবং ওদের পরমাণুগুলি নূতন একদল পরমাণুর সঙ্গে মিলে মিশে নূতন অণু গঠন করে। এই ভাঙাগড়ার ইতিহাস নিয়েই রসায়ন-বিজ্ঞান। কিন্তু যতক্ষণ কোন রাসায়নিক পরিবর্ত্তন না ঘটে, ততক্ষণ এই অণুগুলি ঐ যৌগিক পদার্থের অবিভাজ্য এবং ক্ষুদ্রতম অংশরূপে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা ও ঠোকাঠুকি ব্যাপারগুলি—যাদের আমরা বলেছি ভৌতিক ব্যাপার (Physical Phenomena)—সম্পন্ন ক'রে থাকে; এবং এরই জন্য বৈজ্ঞানিকগণ ভৌতিক কারবারকে ভিত্তি ক'রে অণুর এবং রাসায়নিক কারবারকে ভিত্তি ক'রে পরমাণুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন।

আবার যৌগিক পদার্থের অণুর মত মূল পদার্থেরও অণু রয়েছে। এরাও ভৌতিক কারবারে অবিভাজ্যতার দাবী নিয়েই চলা-ফেরা করে। তফাৎ এই যে, যদিও যৌগিক অণুর গঠনে, কম পক্ষে অন্ততঃ দু'রকমের দু'টা পরমাণুর প্রয়োজন, মৌলিক অণুর ভেতর একাধিক পরমাণু নাও থাকতে পারে। একথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। মৌলিক অণু মূল পদার্থ, সুতরাং ওর ভেতর ওর একটা মাত্র পরমাণু থাকতেও যেমন বাধা নেই, একাধিক পরমাণু জোট পাকিয়ে থাকতেও আপত্তি হতে পারে না। সুতরাং 'ক' পদার্থের অণুগুলির সম্ভবপর আকার হবে ক১ ক২ ক৩ প্রভৃতি এবং 'খ' পদার্থের পক্ষে খ১ খ২ খ৩ প্রভৃতি। এইরূপ প্রত্যেক মূল পদার্থের পক্ষে। বহু মূল পদার্থের অণু, যথা, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতির অণুগুলি দ্বি-পারমাণবিক; সুতরাং এই সকল পদার্থকে হা, অ, না, প্রভৃতি অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করলে এদের অণুদের চেহারা হবে হা২, অ২, না২ প্রভৃতি।

আমরা বলেছি পরমাণুর বিশিষ্ট ধর্ম্ম হচ্ছে ওর ওজন। প্রত্যেক পরমাণুরই অবশ্য এক একটা বিশিষ্ট আকৃতি, আয়তন ও বস্তুমান রয়েছে, কিন্তু ড্যাল্টনের সময় পরমাণুর এই সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। পরমাণুর আকৃতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালেও কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। ওরা গোলাকার না ডিম্বাকার না ইটের মত অষ্টকোণ-বিশিষ্ট তা' আজও জানতে পারা যায়নি। সকল পরমাণুর একই চেহারা কি না, কিম্বা পরস্পরের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে ওদের চেহারা বদলে যায় কি না তারও কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। তবে বদ্‌লে যাওয়া যে স্বাভাবিক তা' নানা কারণেই মেনে নিতে হয়। প্রাচীনদের পরমাণু অবশ্য অজর ও অপরিবর্ত্তনীয় তনু রূপেই পরিচিত হতে চেয়েছিল, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে ঐরূপ মূর্ত্তি অচল। ঘাত-প্রতিঘাতে অণু ও পরমাণুর চেহারা কিছু না কিছু বদ্‌লে যাবে, নিউটনীয় বল-বিজ্ঞান এইরূপই দাবী করে। ওদের গোলাকার কল্পনা ক'রে, আধুনিক বিজ্ঞান বহু অণু ও পরমাণুর ব্যাস ও আয়তন এবং কারো কারো বস্তুমান ও গুরুত্বও আলাদাভাবে নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ড্যাল্টনের সময়ে কোন পরমাণুরই নিজস্ব বস্তুমান বা নিজস্ব গুরুত্ব জানা ছিলনা। তখনকার বৈজ্ঞানিকগণ কারবার করতেন পরমাণুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে। তাঁদের পরিমাপ থেকে এটা জানা গেল যে, হাইড্রোজেন পরমাণুই সব চেয়ে হাল্কা পরমাণু এবং ওর ওজনটাকে ১ সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ ক'রে অন্যান্য অনেক পরমাণুতেই তাঁরা এক একটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের ছাপ এঁকে দিতে সক্ষম হলেন। নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুতে ওজনের ছাপ পড়লো যথাক্রমে ১৪ ও ১৬। এর অর্থ এই যে,

এই পরমাণুদ্বয়ের ওজন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন-ঘটিত যৌগিক পদার্থগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কল্পনা করা যেতে পারে ;—যদি অনুমান করা যায় যে দু'টা নাইট্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেনের একটা, দুটা ও তিনটা পরমাণু সংযুক্ত হয়ে যথাক্রমে নাইট্রোজেন, মনোক্সাইড, দ্বি-অক্সাইড ও ত্রি-অক্সাইডের অণু গঠিত হয়েছে, তবে এই সকল যৌগিক অণুর অন্তর্গত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের ওজনের অনুপাত হবে যথাক্রমে ২৮ : ১৬, ২৮ : ৩২ এবং ২৮ : ৪৮ অথবা ৭ : ৪, ৭ : ৮ এবং ৭ : ১২ অর্থাৎ পরীক্ষা থেকে এদের ওজনের মধ্যে যে সকল অনুপাত দেখতে পাওয়া যায়, তা'ই। ফলে এই সকল যৌগিক পদার্থের অণুর চেহারা হবে যথাক্রমে না২ অ১, না২ অ২, এবং না২ অ৩। এইরূপে রসায়নবিদ্‌গণ বিভিন্ন যৌগিক অণুর চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই সকল চিত্র থেকে কোন্ অণুর ভেতর কোন্ কোন্ পদার্থের কতটি ক'রে পরমাণু বসবাস কচ্ছে, তা' আমরা দৃষ্টিপাত মাত্র বুঝে নিতে পারি।

প্রশ্ন হতে পারে, এক জাতীয় কোন একটা পরমাণু ভিন্ন জাতীয় একটি মাত্র পরমাণুর সঙ্গেই সর্ব্বদা মিলিত না হ'য়ে কখনো তা'র একটির সঙ্গে, কখনো দু' তিন বা দশ বিশটির সঙ্গে মিলিত হতে চায় কেন, এবং ফলে নূতন নূতন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে কেন? অথবা, ভিন্ন ভাবে বলতে গেলে, বিশিষ্টানুপাতের নিয়মই একমাত্র নিয়ম না হয়ে আবার গুণানুপাতের নিয়ম কেন? এর কোন উত্তর নেই। এর জন্য পাল্টা প্রশ্ন করতে হয়, মানুষের ভেতর সকলেই একপত্নীক না হয়ে, কেউ কেউ বা দ্বি-পত্নীক বা ত্রি-পত্নীক হতে চায় কেন? মানুষের বেলায় এই পার্থক্য নির্দ্দেশের জন্য আমরা 'সঙ্গ-স্পৃহা' কথাটা ব্যবহার ক'রে বলতে পারি যে, এক-পত্নীক ব্যক্তির সঙ্গ-স্পৃহার মাত্রা ১, এবং দ্বি-পত্নীক, ত্রি-পত্নীক প্রভৃতির বেলায় ঐ মাত্রা হচ্ছে ২, ৩ প্রভৃতি। পরমাণুদের বেলায়ও এ কথা খাটে। ওদের সঙ্গ-স্পৃহার বিজ্ঞানসম্মত নাম হচ্ছে 'ভ্যালেন্সি' (Valency). উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গ-স্পৃহা ১, অক্সিজেন পরমাণুর ২, নাইট্রোজেন পরমাণুর ৫, এইরূপ। যৌগিক পদার্থের সংখ্যাবাহুল্যও ঘটেছে প্রধানতঃ এই জন্য। সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, 'ক' ও 'খ' যদি দু'টা ভিন্ন-জাতীয় পরমাণু হয় এবং প্রত্যেকের সঙ্গ-স্পৃহা ১ পরিমিত হয়, তবে উভয়ের মিলনের ফলে এক রকমের একটা যৌগিক অণুই গঠিত হতে পারে—যা'র চেহারা হবে ক১ খ১। কিন্তু 'ক' এর সঙ্গ-স্পৃহা যদি ১ না হ'য়ে ৩ হয় তবে 'ক' পরমাণুটা 'খ' পদার্থের একটা, দু'টা বা তিনটা পরমাণুর পাণি গ্রহণ ক'রে তিন রকমের যৌগিক অণু গঠন করতে পারে—ক১ খ১, ক১ খ২, ক১ খ৩। নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন ঘটিত যৌগিক পদার্থগুলির মধ্যে আমরা এইরূপ চেহারাবিশিষ্ট অণুদেরই সাক্ষাৎ পাই···অবশ্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে নয়, মানস-প্রত্যক্ষে। এইরূপে যৌগিক অণু ও যৌগিক পদার্থের সংখ্যাবাহুল্য ঘটেছে। কোন কোন অণুতে, আমরা বলেছি, পরমাণুর সংখ্যা দশ বিশ হাজারও হতে পারে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণের গোপিনীর সংখ্যা ছিল নাকি ষোল হাজার। বাস্তব জগতে কার্ব্বণ বা কালো কয়লাই এ-বিষয়ে কতকটা শ্রীকৃষ্ণ-ধর্ম্মী। কয়লার পরমাণুকে কেন্দ্র ক'রেই অন্যান্য পরমাণুর দল (প্রধানতঃ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণুগুলি) ভিড় জমায় বেশী। ফলে, কার্ব্বণঘটিত অণুগুলির ভেতর পরমাণুর সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই খুব বেশী এবং ওদের রকমারিরও অন্ত নেই। আশ্চর্য্য এই যে, জৈবদেহ মাত্রেরই কার্ব্বণ একটি মূল উপাদান। কার্ব্বণের সঙ্গে প্রাণধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ আছে কি? বিজ্ঞান বলে—থাকতে পারে কিন্তু জানি নে।

ওপরের কথাগুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই: অণু ও পরমাণু উভয়ই কারবারের জগতে পরিচিত হতে চায় পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশরূপে। যারা ভৌতিক কারবারের পক্ষে ক্ষুদ্রতম মূর্ত্তি নিয়ে উপস্থিত হয়, তাদের বলা যায় অণু, আর যারা আরো ভেতরের ব্যাপারে, অর্থাৎ রাসায়নিক কারবারে, ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিত্ব নিয়ে আনাগোণা করে—তারা হচ্ছে পরমাণু। সুতরাং অণুর তুলনায় পরমাণু সাধারণতঃ ছোট। এর ব্যতিক্রম ঘটে শুধু এক পারমাণবিক অণুদের (Monatomic Molecule-দের) বেলায়। যৌগিক পদার্থের অণু স্বভাবতঃই যৌগিক পদার্থ এবং মূলপদার্থের অণু মূল পদার্থ। উভয় শ্রেণীর অণুই যেমন ভৌতিক কারবারে, সেইরূপ রাসায়নিক কারবারেও অংশ গ্রহণ ক'রে থাকে। ভৌতিক কারবারে সাধারণতঃ অণুগুলি ভাঙ্গে না। এ-ক্ষেত্রে ওরা

নিজস্ব ধর্ম্ম বজায় রেখেই পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা বা ঠোকাঠুকি করতে থাকে। সাধারণ ছুরি কাঁচির পক্ষে অণুগুলি পরমাণুর মতই 'অকাট্য'। তবু তড়িৎরূপ সূক্ষ্ম অস্ত্রের প্রয়োগে কিম্বা জলের ভেতর অতিমাত্র দ্রবণের ফলে ওরা যে ভেঙে যায়, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু অণুর সংসারে ভাঙন ধরে বিশেষ ক'রে রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণ ব্যাপারে—যেমন ধরেছিল বিনোদিনীর আবির্ভাবে মহেন্দ্রের সংসারে কিম্বা সুরেশের আনাগোনার ফলে মহিমের সংসারে। এ-পক্ষে মিলন, ও-পক্ষে বিচ্ছেদ। ফলে যে গৃহদাহ ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাই মূর্ত্তি গ্রহণ করে রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের আকারে আর তারি আগুন ফুটে ওঠে সর্ব্বপ্রকার দহন, পচন, জারণ, মারণ, ভস্মীকরণ ব্যাপারে। ব্যাপারগুলো করুণ হলেও একটু সান্ত্বনা এই যে, এ-সকল ব্যাপারে ঘরই ভাঙে কিন্তু যাদের নিয়ে ঘর সংসার, তারা ভাঙে না—অণুগুলি চূর্ণ হয় কিন্তু ভেতরকার পরমাণুগুলি ঠিকই থাকে।

অন্যপক্ষে, পরমাণুর বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত সাংঘাতিক ব্যাপার, এবং তা'র জন্য যে আয়োজনের প্রয়োজন তার উদ্দেশ্য হবে মূল পদার্থের মৌলিকত্ব এবং পরমাণুর পরমাণুত্বের বিলোপ সাধন। তাই শঙ্কা-বিচলিত বৈজ্ঞানিকগণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন—সাবধান, পরমাণুর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে যেও না। পৃথিবীতে এমন কোন অস্ত্র নেই যা' পরমাণুদের দু'টুকরা করতে পারে। পরমাণু অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অমর, বিশ্বসৌধের আদি ও অন্তিম ইষ্টকখণ্ড এবং কারবারের জগতের ক্ষুদ্রতম মাপকাঠি। জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশ সসীমই বটে। ব্যবহারিক সত্যই সত্য। নিছক গাণিতিক সত্যকে ভিত্তি ক'রে বৈজ্ঞানিকের জগৎ রচিত হতে পারে না। কি বিচিত্র ও কি প্রকাণ্ড এই জড়জগৎ! কিন্তু সকল বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে মাত্র শত রকমের শতটি পরমাণু। শত পরমাণুর ওপর সংখ্যা ফলিয়ে এবং সঙ্গ-স্পৃহা মূলক ওদের মিলন ব্যাপারে সমবায় ও বিন্যাসের (Combination এবং Permulation-এর) রকমারি ঘটাবার সুযোগ দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে না হতেই ডাল্টনের পরমাণু তার ভঙ্গপ্রবণতা প্রচার ক'রে বিজ্ঞান জগৎকে জানিয়ে দিল যে, পরমাণু জড়বিশ্বের শেষ প্রস্তরখণ্ডও নয় এবং কারবারের জগতের ক্ষুদ্রতম মাপকাঠিও নয়। অতঃপর আমরা পরমাণুর ভাঙনের কাহিনী বিবৃত করবো।

[ক্রমশঃ]
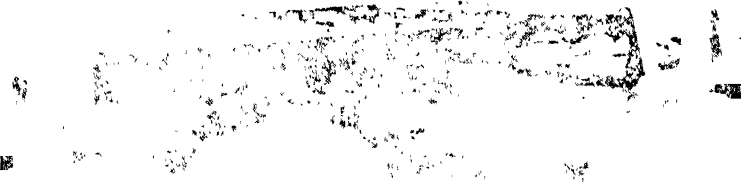
আমাদের নববর্ষ

বর্ত্তমান আষাঢ় সংখ্যা হইতে বঙ্গশ্রী দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। দেশ ও জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উচ্চ আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই দীর্ঘ একাদশ বর্ষকাল আমরা বঙ্গশ্রীকে সৎসাহিত্যের মণিমঞ্জুষায় সাজাইয়া বাংলা তথা ভারতের অন্তরের প্রত্যন্ত নিবিড়ে পৌছাইতে চেষ্টা করিয়াছি। যাঁহারা আমাদের শুভানুধ্যায়ী, যাঁহারা আমাদিগকে এই দীর্ঘ একাদশ বর্ষকাল নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, আজ দ্বাদশ বৎসরের পথে চলিতে যাইয়া তাঁহাদিগকে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, ভবিষ্যতেও তাঁহারা আমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সাহায্য করিয়া দেশ ও জাতির হিতসাধনই করিবেন।

দেশবাসী সর্ব্বসাধারণকে আমাদের সাদর অভিনন্দন ও প্রীতিনমস্কার জ্ঞাপন করি।

কাগজ সমস্যা

কাগজের অভাব বর্ত্তমানে গুরুতর সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বেসামরিক জনসাধারণের প্রয়োজনে, কিঞ্চিদধিক প্রায় দুই লক্ষ টন কাগজ পাওয়া যাইত। তন্মধ্যে ৫০ হাজার টনের অধিক কাগজ এক এই দেশেই প্রস্তুত হইত। যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু পূর্ব্বের তুলনায় দেশের মিলগুলির উৎপাদন কিছু বাড়ে। এই বাড়তি-মুখে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ টন, যাহার সহিত বেসামরিক জনসাধারণের প্রয়োজন বাদেও গভর্ণমেণ্টের ও সামরিক কর্ত্তাদের অত্যধিক চাহিদা আসিয়া যুক্ত হইয়াছে তীব্র ভাবে। ফল স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে এই যে, দেশে প্রস্তুত ১ লক্ষ টন কাগজের মধ্যে ৭০ হাজার টন কাগজ গ্রহণ করিতেছেন গভর্ণমেণ্ট নিজে এবং বাকী মাত্র ত্রিশ হাজার টন বেসামরিক জনসাধারণ পাইতেছেন। দুই লক্ষ টন কাগজের স্থলে ৩০ হাজার টন কাগজ লইয়া আজ দেশবাসী সর্ব্বসাধারণকে যে কি কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়া কাটাইতে হইতেছে, তাহা শুধু অনুমেয়ই নহে, প্রত্যেকেই প্রতিদিনের ভুক্তভোগী। এই ভাবে যখন দেশের শিক্ষা এবং অবশ্য-করণীয় কার্য্যগুলি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, তখন আবার শুনিতেছি, বর্ত্তমান বৎসরে কাগজের উৎপাদন প্রায় ৩০ হাজার টন কমিয়া যাইবে। এখানে স্বভাবতঃই সংশয় হইতেছে, বেসামরিক জনসাধারণের প্রয়োজনীয় ৩০ ভাগ কাগজও সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হইয়া না যায়। কারণ সরকারী পক্ষ তাঁহাদের (ইচ্ছানুরূপ আইনতঃ প্রাপ্ত!) ৭০ ভাগের এক কড়াও ছাড়িবেন বলিয়া অন্ততঃ সুস্থ মনে ভাবা যায় না। ইতিপূর্ব্বে জনসাধারণের প্রয়োজনে উৎপাদিত কাগজের ৫০ ভাগ দিবার অনুমোদনের জন্য বারংবার গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানান হইয়াছে। কিন্তু তাহা শুধু অরণ্যেই রোদন হইয়াছে; ফল হয় নাই।

দেশের জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গভর্ণমেণ্ট এখনও সুবিবেচকের পরিচয় দিউন, ইহাই আমাদের সম্মিলিত জাতির পক্ষ হইতে দাবী জানাইতেছি। নতুবা খাদ্য সামগ্রীর মতো কাগজের ক্ষেত্রেও আজ যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎফল অন্ধকারময়।

ইতালীর নতুন মন্ত্রিসভা

ইতালীস্থ মিত্রপক্ষের হেড্ কোয়ার্টার্স হইতে ঘোষিত বিগত ৬ই জুনের রয়টারের বিশেষ সংবাদে প্রকাশ, বাদোগ্লিও মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন, এবং ইতালীয়ান লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ জেনারেল যুবরাজ উম্বার্ত্তো তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়া গত ৯ই জুন ইতালীর ভূতপূর্ব্ব প্রধান

মন্ত্রী আইভান্‌নো বোনোমিকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্ত আহ্বান করিয়াছেন। এই সংগঠনে মন্ত্রিগণ রাজানুগত্যের শপথ গ্রহণ না করিয়া দেশানুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবেন বলিয়া সিনর বোনোমি সর্ত্তবদ্ধ। তবে সর্ত্তের সঠিকতা সম্বন্ধে জানা না গেলেও বিগত ৯ই জুনের রোমের সংবাদে জানা যায়, নবতম মন্ত্রিসভা গঠনে দপ্তরহীন সাতজন মন্ত্রীই তালিকার শীর্ষস্থানে রহিয়াছেন। তন্মধ্যে আছেন কাউণ্ট্‌ স্ফোর্জা, অধ্যাপক বেনেদেত্তো ক্রোচে এবং কমুনিষ্ট্‌ নেতা সিনর পালমিরো তোগলিয়াত্তি। কাউণ্ট্‌ আলেসান্দ্রো সমর ও বিমানসচিব এবং এড্‌মিরাল দেকুতে নই নৌসচিব পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাংলার দুর্ভিক্ষ

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ বাংলা দেশের প্রায় কোটী নরনারীকে ধ্বংস করিয়া যে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা দেখাইয়া গিয়াছে, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দেও তাহার দ্বিগুণ দুর্ভিক্ষ যে এখনও বাংলায় বর্ত্তমান আছে, ইহা দেখিয়া আমরা আতঙ্কিত হইতেছি। এখনও বাংলা দেশের কোন কোন স্থানে বাট টাকা পর্য্যন্ত চাউলের মণ বিকাইতেছে। চট্টগ্রামের শোচনীয় অবস্থার কথা বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনা করিতে দেওয়া হয় নাই। নোয়াখালী প্রভৃতি জিলায় যেখানে সবচেয়ে বেশী ধান জন্মে, সেখানে এখনই ২০।২২৲ টাকা চাউলের মণ। চাউল বহু স্থানে পাওয়া যায় না, সরকারও এই বিষয়ে যে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, তাহা মনে হয় না। শুধু চাউল কেন, সমগ্র বাংলাদেশে সকল জিনিষই পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে। ডাল, সরিষার তেল, দুগ্ধ, ঘৃত, তরিতরকারী, মৎস্য—আজ সবই দুর্মূল্যের চরম সীমায় উঠিয়াছে। শনি ও মঙ্গলের কোপে যেন দেশটা জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্‌ হইয়া যাইতে বসিতেছে। বাংলা সরকার ইহার কি প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা তাহা জানিতে পারি কি ? সমগ্র বাংলায় দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। বুভুক্ষু ও নিষ্পিষ্ট বাংলার এই শ্মশান-বিভীষিকায় গভর্ণমেণ্টের সাম্রাজ্যবাদী-মন কি এখনও একবার ভীতিশঙ্কায় দুলিয়া উঠিতেছে না ?

কলেরা ও মহামারী

আমরা বাংলার মফঃস্বল অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতিদিনই খবর পাইতেছি, সর্ব্বত্রই কলেরার প্রকোপ বাড়িয়া গিয়াছে; গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান হইতে চলিয়াছে। এখনও স্থানে স্থানে কলেরার সঙ্গে বসন্তরোগেরও প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে ; পূর্ব্ববঙ্গে কুমিল্লা প্রভৃতি জিলায় ঐ সঙ্গে দুরন্ত জ্বর রোগেও বহু লোক মারা গিয়াছে, এখনও রোগের প্রাদুর্ভাব কমে নাই। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, এই সকল গ্রহ উপগ্রহের চাপে বাংলা যে শ্মশান হইতেছে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহার কি প্রতিকার করিতেছেন, বাংলার প্রজাগণ তাহা জানিবার অধিকারী। বাংলার নিরাপত্তা ও ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা বিষয়ে গত দীর্ঘকাল যাবৎ বহু আলোচনা ও বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-জয় আমরা কামনা করি বটে, কিন্তু বাংলার স্বাস্থ্যসম্পদ ও আহার্য্য হারাইয়া বাংলার পূর্ণ জীবন-সঞ্জীবন ভিন্ন সর্ব্বাগ্রে অন্ত কোনো কামনা ও দাবীই আমাদের থাকিতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে এখনও তৎপর হউন, ইহাই প্রার্থনা করি।

আসাম সীমান্ত

আসাম ও মণিপুর অঞ্চলে এখনও ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। এখানেও জাপানীগণ অনবরত নূতন সৈন্য আমদানী করিতেছে। উত্তর ব্রহ্মে জেনারেল ষ্টীলওয়েলের সৈন্তগণ মোগাউং উপত্যকার পূর্ব্বদিকে কুমোন পাহাড়ে যুদ্ধ করিতেছে। মংদ-বুথিডং অঞ্চলেও ইংরেজ পক্ষ মাঝে মাঝে আক্রমণ চালাইতেছে; প্রশান্ত মহাসাগরে ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জ ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকানরা আক্রমণ চালাইতেছে।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন

গত ৬ই জুন তারিখ বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে মিত্র অভিযানের স্মরণীয় দিন হিসাবে স্থান লাভ করিবে। ঐ দিন প্রাতে ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে জেনারেল আইসেন হাওয়ারের নেতৃত্বাধীনে বৃটিশ ছত্রিবাহিনী এবং নৌবহরের সাহায্যে বহু মার্কিন সৈন্ত অবতরণ করিয়া বহু প্রত্যাশিত

দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি করিয়াছে। মিত্রবাহিনী ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ১২ মাইলের অধিক অগ্রসর হইয়াছে এবং ৬০ মাইল বিস্তৃত সেতুমুখ স্থাপন করিয়াছে। শেরবুর উপদ্বীপ অঞ্চলে যুদ্ধের তীব্রতা খুবই প্রচণ্ড এবং শেরবুর বন্দরের পতন আশঙ্কা করা যাইতেছে। এই স্থানের যুদ্ধের অবস্থা বর্ত্তমানে মিত্রপক্ষের বিশেষ অনুকূল বলিয়া দেখা যাইতেছে। এই বহু প্রত্যাশিত দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সূচনা দেখিয়া ভবিষ্যত ইয়োরোপের অবস্থা সম্পর্কে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। ইয়োরোপকে চক্রশক্তির হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য অনুরূপ আরও সীমান্ত খোলা হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ইতালীয় সীমান্ত

ইতালীয় সীমান্তের যুদ্ধের গতি কয়েক সপ্তাহ যাবত মন্থর গতিতে অগ্রসর হওয়ায় সাধারণের যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা রোম নগর মিত্র-বাহিনীর হস্তগত হওয়ায় বিদূরিত হইয়াছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রোম নগরী যুদ্ধের তাণ্ডব লীলাস্থলী না হইয়া অক্ষত অবস্থায় তাহার প্রসিদ্ধি বজায় রাখিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিয়া আমরা যুদ্ধরত জাতিগুলিকে তাহাদের ব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। ইতালীর রণক্ষেত্রের সমর-গতি এখন হইতে দ্রুততর হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

শত্রু অঞ্চলে অভিযানের পূর্ব্বে বিমান বহরে বিস্ফোরক বোমা সন্নিবেশ করা হইতেছে।

ধাঁধা
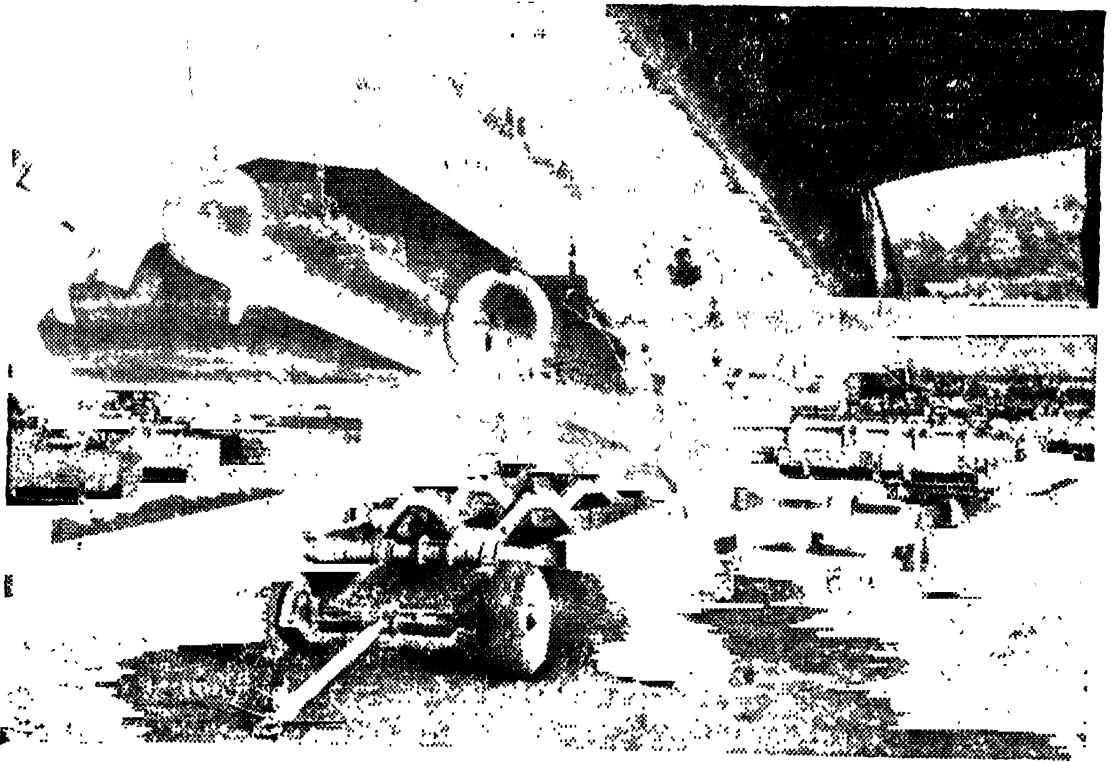
ম্যাক্সিম গোর্কি জুতো সেলাই থেকে আরম্ভ ক'রে রুশিয়ার একজন যুগনমস্ত লেখক ও শ্রেষ্ঠ নাগরিক হয়েছিলেন। তাই ব'লে কেউ যদি জুতো সেলাই করাকেই জীবনের 'ম্যাক্সিম' ব'লে গ্রহণ করে—আমরা হয় ত' তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে পারব না। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় অপূর্ব্ব তেজস্বিতা দেখিয়ে লোভনীয় চাকুরীতে ইস্তফা দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর জীবনের উহা এক স্মরণীয় অধ্যায় হ'লেও আমাদের সাধারণের পক্ষে তার অনুসরণ করা যে অনেক কারণেই নিরাপদ নয়—সে কথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা চলে। মুক্তকণ্ঠে অজস্র নৈতিক (?) নিন্দা আমরা করতে পারি (কেন না, তা' সুলভ ও নিরীহ পন্থা), কিন্তু তার সেই সম্প্রদর্শিত তেজস্বিতার দাম সেদিন থেকেই যাচাই করতে হবে দ্বার হ'তে দ্বারান্তরে নাতিগম্ভীর গর্জ্জনের কাছে—অন্ততঃ এ-যুগে এর ব্যতিক্রম বিরল ঘটনা বললেও অত্যুক্তি হয় না। দৃষ্টান্ত মহৎ হ'লেও তার অনুসরণ ক'রে মহৎ হওয়ার দৃষ্টান্ত খুব বেশী নয়।

যেমন জলের রং বদলায়—জলের পাত্রের সঙ্গে, তেমনি নীতিও পরিবর্ত্তিত হয় স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে। এমন কোন অক্ষয় নীতি আজও বোধ হয় জন্মায় নি, যা' সময়ের সমবয়সী অথবা কালের কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রেও যার খাদ ধরা পড়ে নি।

সবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে, এ শুধু ব্যবহারিক সত্যই নয়, সবল ইচ্ছা দুর্ব্বল ইচ্ছাকেও পিষে মারে। জন্মোত্তর আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলি দেখতে পায়—নির্দ্দিষ্ট ছক-আঁকা বহু পদচিহ্নে বিবর্ণ ধূসর সড়ক—জীবন আমাদের কাছে সেই একটানা পাকা রাস্তা আর তার নির্ম্মম অভিযান ছাড়া আর কিছুই নয়। দিগন্তবিসারী সোনার ফসল ক্ষেতের পাশ ঘেঁসে-যাওয়া মেঠো পথ সে নয়, দু'ধারে যার নামহীন ফুল ফোটে আর ঝ'রে যায় নিঃশব্দে। এ-যেন য়্যাস্‌ফাল্টমের তপ্ত রাস্তা—নীতির ভারী রোলার এর বুক পিষে দেয়—সফলতার ট্র্যাফিক গর্জ্জন বহু ক্ষীণ কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ দেয় ডুবিয়ে। গণিতের সূক্ষ্ম হিসাব যেন তেমনি নির্ম্মম—কোথাও এক চুল ফাঁক থাকবার যো নেই। কিন্তু গণিতের হিসাব দিয়ে আর যাই হোক্, জীবনের হিসাব মিলানো যায় না। মনে হয়, ভুলকে ভুল ব'লে চেনবার গোড়াতেই কোথায় যেন আমাদের মস্ত একটা ভুল র'য়ে গেছে।

আমাদের দেশে বহু ত্যাগের দৃষ্টান্ত, বহু পরার্থপরতার উদাহরণ আছে—মহদুদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জ্জনের সে কি অকুণ্ঠ উদারতা! কিন্তু এই সস্তা প্রশংসার ঘোলাটে পর্দ্দা সরিয়ে আমরা ত' দেখতে পাই যে, বেশী তাঁরা দিয়ে শুধু যান নি, ফিরিয়েও পেয়েছেন তার চেয়ে বেশী।

জগতের সব চেয়ে বড় ত্যাগীকে সে জন্য বেশী ভোগী বললে আর যাই হোক্ মিথ্যা বলা হবে না। ত্যাগ হয় ত' আসলে ভোগেরই প্রণামী অথবা তার রাজ-সিংহাসন। রাজর্ষি জনক শুধু ত্যাগীই নন, মস্ত বড় ভোগীও বটেন—শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান ভক্ত ছিলেন এমন একজন, যার আরাধনা-প্রণালী আধুনিক নব্য সমাজও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবে।

আটপৌড়ে জীবনেও ত' আমরা দেখতে পাই যে, নীতির ধাঁধাঁ আমাদিগকে কত হয়রান ক'রে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশ করেছে. এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সংসারে যে-জন নিজেকে বঞ্চিত ক'রে পরের বাহবা কুড়িয়েছে, প্রকারান্তরে সংসারকে অন্যায় ভাবে সেই-ই ঠকায় বেশী। সে আত্মত্যাগী নয়, আত্মপ্রতারক অথবা নির্ব্বোধ। উদাহরণ-স্বরূপ এমন একটা বিশেষ লোকের কথা আজ বলব সংসারের প্রতি যার দরদের অভাব নেই, এবং পরিজনের প্রতি ভালবাসা তার সত্যিই অকৃত্রিম ও নিরেট। সংসারের অবস্থা তার স্বচ্ছল ছিল না। দেখা গেল, সংসারের অন্নসংস্থান করতে গিয়ে নিজের যে সময়মত এবং দরকারমত স্নানাহার প্রয়োজন, তা সে ভুলে গেছে—পরিজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নিজের স্বাস্থ্য স্বস্তি বিসর্জ্জন দিতে সে ত্রুটি করে নি, কঠোর ও অনিয়মিত পরিশ্রমে তার স্বাস্থ্য গিয়েছে ভেঙ্গে, হজমশক্তি হয়েছে দুর্ব্বল, রক্ত গেছে কমে—ডাক্তার তাকে আজকালকার সেরা টনিক **ভাইনো-মল্ট** খেতে বলেছেন, কিন্তু এ সামান্য অর্থ ব্যয় পর্য্যন্ত সে অনাবশ্যক অপব্যয়ের সামিল মনে করে—এত সূক্ষ্ম তার হিসাব-জ্ঞান—এত গভীর তার সংসারের প্রতি দায়িত্ববোধ! বাঙ্গালীর ঘরে এমন ব্যক্তির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কারও সন্দেহ থাকে না। আশা করি, তার উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সাড়ম্বর উপসংহার সম্বন্ধে আপনাদের এখনও সংশয় জাগে নি। কিন্তু দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে, এই আত্মবিস্মৃতি অথবা আত্মপ্রবঞ্চনার ফলে তার স্বাস্থ্য গেল চিরতরে ভেঙ্গে, মন গেল অসুস্থ হ'য়ে আর সেই ছিদ্রপথে জীবনের মারাত্মক শত্রু এসে দিল হানা। যে-সংসারের জন্য নিজেকে সে একদিন নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চনা করেছিল, তাকে সে করল বঞ্চিত এবং জীবনের পরিসমাপ্তি হ'ল এসে এক করুণ ট্র্যাজেডিতে, যার পুনরাবৃত্তি বাঙ্গালীর জীবনে অনিবার্য্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

কলিকাতা হইতে শিলং যাইবার থ্রু টিকেট্
শিয়ালদহ ষ্টেশনে পাওয়া যায় এবং শিলং হইতে কলিকাতা আসিবার থ্রু টিকেট্ শিলং অফিসে পাওয়া যায়। আমাদের ১১নং ক্লাইভ রো-স্থিত অফিসে পাণ্ডু হইতে শিলং অথবা রিটার্ণ টিকেটের ভাড়া লইয়া রসিদ দেওয়া হয় এবং ঐ রসিদের পরিবর্ত্তে পাণ্ডুতে টিকেট্ পাওয়া যায়।
এই অফিস হইতে রিজার্ভও করা হয়।

দি কমার্শিয়াল ক্যারিয়িং কোং
(আসাম) লিমিটেড্

দি মেট্রোপলিটন্ ইন্সিওরেন্স হাউস্
১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

চা -ই…

শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হ'লে প্রত্যহ ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই। খোলা মাঠে ব্যায়াম, বিশুদ্ধ হাওয়া ও সূর্য্যের আলো বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। সেই সঙ্গে ভাল আহার্য্যও চাই। পুষ্টিকর খাদ্যে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও কর্ম্মঠ করে—সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক সৌন্দর্য্যও বাড়ায়।

ঘি-ই শ্রেষ্ঠ খাদ্য

কে. ভি. আপ্পারাও কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং ... সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুরভিত
আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল
"কল্যাণী"
জুয়েল অব ইণ্ডিয়া

অলঙ্কারে বৈচিত্র্য
MBS
অলঙ্কার নির্মাণে — ডিজাইনের
সৌষ্ঠব মনোরম কাজ এবং
স্বর্ণের বিশুদ্ধতাই আমাদের
বৈশিষ্ট্য। আমাদের দোকানে
নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র
গিনি স্বর্ণের নানাবিধ হাল
ফ্যাসনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের
বাসনাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত
থাকে এবং অর্ডার দিলেও অল্প
সময়ে পছন্দ মত জিনিষ তৈয়ারী
করিয়া দেওয়া হয়। মফস্বলের
অর্ডার ভি পি ডাকে পাঠান
হয়। পুরাতন স্বর্ণের পরিবর্ত্তে
নূতন অলঙ্কার পাওয়া যায়।
কাজেও তুলনায় মজুরী সুলভ
এবং প্রত্যেকটি অলঙ্কারের
গ্যারান্টি থাকে।

সূচী-পত্র

শ্রাবণ—১৩৫১

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

শিলং-সিলেট্ লাইনের টিকেট সমূহ আমাদেরশিলং অফিস এবং সিলেট্ অফিসে পাওয়া যায়। সিলেট্ লাইনে শিলং যাইবার থ্রু-টিকেট্ এ. বি. জোনের ষ্টেশন-সমূহ হইতে পাওয়া যায়। শিলং হইতে সিলেট্ লাইনে এ. বি. জোনের ষ্টেশনসমূহের থ্রু-টিকেট্ শিলং অফিসে পাওয়া যায়।

দি ইউনাইটেড্ মোটর ট্র্যান্সপোর্ট

কোম্পানী লিমিটেড

দি মেট্রোপলিটন্ ইন্সিওরেন্স হাউস

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

কলিকাতা হইতে শিলং যাইবার থ্রু-টিকেট্ শিয়ালদহ ষ্টেশনে পাওয়া যায় এবং শিলং হইতে কলিকাতা আসিবার থ্রু-টিকেট্ শিলং অফিসে পাওয়া যায়। আমাদের ১১, ক্লাইভ রো-স্থিত অফিসে পাণ্ডু হইতে শিলং অথবা রিটার্ণ টিকিটের ভাড়া লইয়া রসিদ দেওয়া হয় এবং ঐ রসিদের পরিবর্ত্তে পাণ্ডুতে টিকেট্ পাওয়া যায়। এই অফিস হইতে রিজার্ভও করা হয়।

দি কমার্শিয়াল ক্যারিয়িং কোং

(আসাম) লিমিটেড্

দি মেট্রোপলিটন্ ইন্সিওরেন্স হাউস

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

আমরা নাম মাত্র খরচায়—

আপনার পার্শেল ইত্যাদি শিয়ালদহে

এবং

শিয়ালদহ হইতে কলিকাতার যে কোন স্থানে

সর্ব্বদা পৌঁছাইয়া দিয়া থাকি।

দি কমার্শিয়াল ক্যারিয়িং কোং

(বেঙ্গল) লিমিটেড্

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

"দুর্গা-পূজা"র প্রয়োজনীয়তা

(৬)

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

কার্য্যকারণের শৃঙ্খলাযুক্ত বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়-বস্তু

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় ভাগ

জন-সভা সমূহের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন-পদ্ধতি, সংগঠন-পদ্ধতি ও কার্য্য-পদ্ধতির বিবরণ

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে এক দিকে যেরূপ প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে তিন শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠান যাহাতে যুগপৎ সাধিত হয় এবং চারি শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভা যাহাতে বিধিবদ্ধ ভাবে যুগপৎ পরিচালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়, সেইরূপ আবার জনসভাসমূহ যাহাতে যুগপৎ রচিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবারও প্রয়োজন হয়।

জন-সভাসমূহের শ্রেণীবিভাগ

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে সমস্ত জনসভা রচনা করা একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয় হয়, সেই সমস্ত জনসভা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীর, যথা :

(১) গ্রামস্থ সামাজিক জনসভা;
(২) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভা;
(৩) দেশস্থ জনসভা;
(৪) কেন্দ্রীয় জনসভা।

জন-সভাসমূহের প্রয়োজনীয়তা

জনসভা সমূহের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে, সংগঠনে এবং কার্য্য পরিচালনায় যে যে পদ্ধতির অবলম্বন করা হয় সেই সেই পদ্ধতির বিবরণ স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে, মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে জনসভা সমূহের রচনা করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয় কেন তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়। জনসভা সমূহের রচনা করা একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয় হয় কেন, তাহা বুঝিতে হইলে, মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার মূলসূত্র যে তিনটি তাহা পাঠকগণের স্মরণ করিতে হয়। এই তিনটি মূলসূত্রের কথা বঙ্গশ্রীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ১৫২ পৃষ্ঠায় বিবৃত করা হইয়াছে।

ঐ তিনটি মূলসূত্রের শেষ সূত্রানুসারে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে যে শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান রচনা করিলে সমগ্র মানব সমাজের প্রত্যেক মানুষ ঐ প্রতিষ্ঠানকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হন এবং স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ঐ প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশ সমূহ পালন করেন, সেই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান রচনা করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, যাহাতে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে তিন শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠান যুগপৎ স্বতঃই সাধিত হয় তাহা করিবার জন্য, সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভা, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভা, দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভা, এবং কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভা—এই চারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান রচিত হইলেই মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভব হয় এবং এই চারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানকে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে ইহাও মনে হয় যে, জন-সভা সমূহের রচনা নিষ্প্রয়োজনীয়।

যাহাতে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে তিন শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠান যুগপৎ সাধিত হয়, তাহার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র চারি-শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার রচনা করিলে সমগ্র মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বটে কিন্তু কার্য্যতঃ উহা নাও হইতে পারে।

চারি শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার কোন শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভায় কোন কর্ম্মী যাহাতে কোন ক্রমে যথেচ্ছা ব্যবহার না করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা না থাকিলে কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের যথেচ্ছাচারী হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। কার্য্যপরিচালনা-সভা-সমূহের কোন কর্ম্মী যাহাতে যথেচ্ছা ব্যবহার না করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা না থাকিলে কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের যেরূপ যথেচ্ছাচারী হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ জন-সম্প্রদায়েরও যথেচ্ছাচারী হইবার আশঙ্কা থাকে। ইহার কারণ মানুষের স্বভাবের নিয়মানুসারে শাসক সম্প্রদায় যথেচ্ছা-চারী হইলে শাসিত সম্প্রদায়ও যথেচ্ছাচারী হইয়া থাকেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে কার্য্য-পরিচালনা সভাসমূহের প্রত্যেক কর্ম্মী যে পদ্ধতিতে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন এবং যে পদ্ধতিতে কার্য্য-পরিচালনা সভাসমূহের কর্ম্মি-

গণের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, তাহাতে কোন কর্ম্মীর যথেচ্ছাচারী হওয়া খুব সহজসাধ্য নহে। যথেচ্ছাচারী হওয়া সহজসাধ্য নহে বটে কিন্তু অসাধ্য নহে। কার্য্য-পরিচালনা সভাসমূহের নিম্নতন কর্ম্মিগণ যাহাতে যথেচ্ছাচারী না হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে উপরিতন কর্ম্মিগণের যতই লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় না কেন, ঐ ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণের উপর আংশিকভাবে দায়িত্বভার অর্পিত হইলে কার্য্য-পরিচালনা সভাসমূহের যথেচ্ছাচারিতা যত সুনিশ্চিতভাবে নিবারিত হইতে পারে অন্য কোন উপায়ে তাহা হইতে পারে না। ইহার কারণ কার্য্য-পরিচালনা সভার কোন কর্ম্মী কোনরূপে যথেচ্ছাচারী হইলে জনসাধারণ উহার জন্য যত সত্বর ও যত অধিক পরিমাণে ভুক্তভোগী হইয়া থাকেন অন্য কেহ তাহা হন না।

উপরোক্ত কারণে, যে কোন কার্য্য-পরিচালনা সভার যে কোন কর্ম্মী সামান্য মাত্রও যথেচ্ছাচারী হইলে জনসাধারণের যে কেহ যাহাতে অবাধে ও অনায়াসে ঐ কর্ম্মীকে বিচারের যোগ্য ও দণ্ডপ্রাপ্তির আশঙ্কাগ্রস্ত করিয়া তুলিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা একান্তভাবে প্রয়োজন হয়। প্রধানতঃ ঐ ব্যবস্থা করার জন্যই জনসাধারণের প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া জনসভাসমূহের রচনা করা মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থায় একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়। উপরোক্তভাবে জনসভাসমূহের রচনা না করিলে একদিকে যেরূপ কার্য্য-পরিচালনা সভাসমূহের কর্ম্মিগণের যথেচ্ছাচারী হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়, সেইরূপ আবার কার্য্য-পরিচালনা সভাসমূহের কার্য্যসমূহসম্বন্ধে জনসাধারণের কাহার কাহার ঔদাসীন্যের আশঙ্কাও থাকিয়া যায়।

যে কোন কার্য্য-পরিচালনা সভার যে কোন কর্ম্মী সামান্যমাত্রও যথেচ্ছাচারী হইলে জনসাধারণের যে কেহ যাহাতে অবাধে ও অনায়াসে ঐ কর্ম্মীকে বিচারের যোগ্য ও দণ্ডপ্রাপ্তির আশঙ্কাগ্রস্ত করিয়া তুলিতে পারেন তাহার ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা যেরূপ জনসভা-রচনায় অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেরূপ আবার জনসাধারণের কেহ যাহাতে উত্তেজনা অথবা বিদ্বেষ বশতঃ কার্য্যপরিচালনা সভার কোন কর্ম্মীকে অযথা অথবা অসঙ্গতভাবে বিপন্ন করিতে না পারেন তাহার দিকে লক্ষ্য রাখাও জনসভা-রচনায় অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়।

জন-সভাসমূহ রচনা করিবার উদ্দেশ্য

প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য জনসভাসমূহের রচনা করা হয়, যথা:

(১) সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে কেন্দ্রীয় কার্য্য পরিচালনা সভাকে সর্ব্বতোভাবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে প্রলুব্ধ হন এবং কোন মানুষ যাহাতে কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা সভার কোন কার্য্য সম্বন্ধে কোনরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন না করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা;

(২) প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে নিজ নিজ দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা সভাকে সর্ব্বতোভাবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে প্রলুব্ধ হন এবং কোন মানুষ উহার কোন কার্য্য সম্বন্ধে যাহাতে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা করা;

(৩) প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে নিজ নিজ গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা সভাকে সর্ব্বতোভাবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে প্রলুব্ধ হন এবং কোন মানুষ যাহাতে ঐ কার্য্য-পরিচালনা সভার কোন কার্য্য সম্বন্ধে কোনরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা করা;

(৪) প্রত্যেক সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার গ্রামের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে নিজ নিজ গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা সভাকে সর্ব্বতোভাবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে প্রলুব্ধ হন এবং কোন মানুষ যাহাতে ঐ কার্য্য-পরিচালনা সভার কোন কার্য্য সম্বন্ধে কোনরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা করা;

(৫) কোন কার্য্য-পরিচালনা সভার কোন কর্ম্মী অথবা কোন সামাজিক গ্রামের জনসাধারণের কেহ যাহাতে কোন গ্রামে যথেচ্ছাচারী না হইতে পারেন ও না হন এবং কর্ম্মিগণের ও জনসাধারণের প্রত্যেকেই যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা সভার নির্দ্ধারিত বিধি-নিষেধ পালন করেন তাহার ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত পাঁচশ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কেবলমাত্র জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া জনসভাসমূহের রচনা করা হয় এবং ঐ জন-সভা-সমূহকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

প্রত্যেক জন-সভার সংগঠনের মূল দায়ীত্ব থাকে তিনশ্রেণীর, যথা:

(১) প্রত্যেক জনসভার অন্তর্গত জনসাধারণ যাহাতে ঐ জনসভার সংশ্লিষ্ট কার্য্য-পরিচালনা সভাকে সর্ব্বতোভাবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা;

(২) প্রত্যেক জনসভার অন্তর্গত জনসাধারণের কেহ যাহাতে ঐ জনসভার সংশ্লিষ্ট কার্য্য-পরিচালনা সভার কোন কার্য্য সম্বন্ধে কোনরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা করা;

(৩) প্রত্যেক জনসভার অন্তর্গত জনসাধারণের কেহ অথবা ঐ জনসভার সংশ্লিষ্ট কার্য্য-পরিচালনা সভার কেহ যাহাতে কোনরূপ যথেচ্ছাচারী না হইতে পারেন এবং প্রত্যেকেই যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কেন্দ্রীয় কার্য্য-

পরিচালনা সভার প্রত্যেক বিধি ও প্রত্যেক নিষেধ পালন করেন তাহার ব্যবস্থা করা।

জনসাধারণ ছাড়া অপর কাহাকেও জন-সভার সভ্য না করিবার উদ্দেশ্য

কেবলমাত্র জন-সাধারণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষগণের প্রতিনিধি লইয়া জনসভাসমূহের রচনা করা হয় কেন এবং অন্য কোন শ্রেণীর মানুষকে কোন জন-সভার সভ্য হইতে দেওয়া হয় না কেন তৎসম্বন্ধে স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে হইলে কোন্ শ্রেণীর মানুষকে জনসাধারণ বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা সর্ব্বপ্রথমে পরিজ্ঞাত হইতে হয়। প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সামাজিক কার্য্যের যে-সমস্ত চতুর্থ-শ্রেণীর কর্ম্মী (অথবা শ্রমিক) থাকেন তাঁহাদিগকে "জন-সাধারণ" বলিয়া গণ্য করা হয়।

কেবলমাত্র সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণকে "জনসাধারণ" বলিয়া ধরা হয় কেন, আর কাহাকেও জন-সাধারণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয় না কেন, তাহা না বুঝিতে পারিলে চারি শ্রেণীর জনসভা রচনা করিয়া কি প্রণালীতে উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধন করা হয়, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা সম্ভবযোগ্য হয় না।

কেবলমাত্র সামাজিক কার্য্যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণকে "জনসাধারণ" বলিয়া ধরা হয় কেন এবং অপর কাহাকেও জনসাধারণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয় না কেন তাহা বুঝিতে হইলে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে কোন্ শ্রেণীর লোক বিদ্যমান থাকেন অথবা থাকিতে পারেন—তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করার প্রয়োজন হয়।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামেই প্রধানতঃ চারি শ্রেণীর লোক বসবাস করেন, যথা :

(১) সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ ও তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ ও তরুণ-তরুণীগণ ;

(২) সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ ও তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ ও তরুণ-তরুণীগণ ;

(৩) সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ ও তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ ও তরুণ-তরুণীগণ ;

(৪) সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ ও তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ, ও তরুণ-তরুণীগণ।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কোন শ্রেণীর মানুষবিহীন কোন সামাজিক গ্রাম কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে থাকিতে পারে না। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কোন শ্রেণীর মানুষবিহীন কোন সামাজিক গ্রাম থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু কোন কোন সামাজিক গ্রামে ঐ চারি শ্রেণীর মানুষ ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মানুষও থাকিতে পারে।

যে সমস্ত সামাজিক গ্রামে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা সভা অধিষ্ঠিত থাকে, সেই সমস্ত সামাজিক গ্রামে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ, তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ এবং তরুণ-তরুণীগণও বসবাস করিয়া থাকেন।

যে সমস্ত সামাজিক গ্রামে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভা অধিষ্ঠিত থাকে, সেই সমস্ত সামাজিক গ্রামে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ এবং তরুণ-তরুণীগণও বসবাস করিয়া থাকেন।

যে সমস্ত সামাজিক গ্রামে দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভা অধিষ্ঠিত থাকে, সেই সমস্ত সামাজিক গ্রামে দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ, তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ এবং তরুণ-তরুণীগণও বসবাস করিয়া থাকেন।

যে সামাজিক গ্রামে কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভা অধিষ্ঠিত থাকে, সেই সামাজিক গ্রামে কেন্দ্রীয় কার্য্যপরি-চালনা-সভার কর্ম্মিগণ, তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ এবং তরুণ-তরুণীগণও বসবাস করিয়া থাকেন।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সামাজিক কার্য্যের চারি শ্রেণীর কর্ম্মীর কোন শ্রেণীর কর্ম্মী ছাড়া কোন সামাজিক গ্রাম সাধিত হয় না এবং সর্ব্বসমেত আট শ্রেণীর কর্ম্মীর অতিরিক্ত কোন শ্রেণীর মানুষ কোন সামাজিক গ্রামে থাকিতে পারে না।

যে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে বসবাস করেন, তাহাদিগের জীবিকার্জ্জনের বৃত্তি অথবা জীবন যাপনের কর্ম্ম প্রণালীর দিক দিয়া দেখিলে তাহারা চারি শ্রেণী হইতে আট শ্রেণীতে পর্য্যন্ত বিভক্ত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহা-দিগের গুণ ও শক্তির শ্রেণীর বিভাগের দিক দিয়া দেখিলে তাঁহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন।

এক শ্রেণীর মানুষ মানুষের মত স্বভাবযুক্ত হইয়া কেবল মাত্র নিজদিগকে এবং নিজ নিজ সংসারভুক্ত মানুষগণকে পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইঁহারা নিজদিগকে এবং নিজ নিজ সংসারভুক্ত মানুষগণকে পরি-চালনা করিবার গুণ ও শক্তি দ্বারা অপরকে অথবা অপরের সংসারভুক্ত মানুষকে পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তিযুক্ত নহে। এই শ্রেণীর মানুষকে সংস্কৃত ভাষায় "শূদ্র" বলা হয়।

আর এক শ্রেণীর মানুষ মানুষের মত স্বভাবযুক্ত হইয়া যেমন নিজদিগকে এবং নিজ নিজ সংসারভুক্ত মানুষগণকে

পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ আবার অপরকে এবং অপরাপর সংসারভুক্ত মানুষগণকেও পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর মানুষকে সংস্কৃত ভাষায় "আর্য্য" বলা হয়।

যে শ্রেণীর মানুষ কেবলমাত্র নিজদিগকে ও নিজ নিজ সংসারভুক্ত মানুষগণকে পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং অপরকে ও অপরাপর সংসারভুক্ত মানুষগণকে পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তিবিহীন হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের গুণ ও শক্তিকে সাধারণ-মানুষের গুণ-শক্তি বলা হয়। এই শ্রেণীর মানুষ কেবলমাত্র সাধারণ-মানুষের গুণ ও শক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন বলিয়া ইহাদিগকে লৌকিক ভাষায় "জনসাধারণ" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

সংস্কৃত ভাষাসম্মত লৌকিক ভাষানুসারে যাঁহারা জনসাধারণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য, তাঁহারা অপরকে ও অপরাপর সংসারভুক্ত মানুষগণকে পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তিবিহীন হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহারাও মানুষের মত স্বভাবযুক্ত (অর্থাৎ হিংস্র প্রবৃত্তি অথবা পরশ্রীকাতরতা প্রবৃত্তি অথবা নিজ গুণ ও শক্তি সম্বন্ধে অহঙ্কারের প্রবৃত্তি বিহীন) হইয়া থাকেন এবং নিজদিগকে ও নিজ নিজ সংসারভুক্ত মানুষগণকে পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন। পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠান সমূহ যখন মনুষ্য সমাজ হইতে বিলুপ্ত হয় তখন মনুষ্যাবয়বে এমন জীবও দেখা যায় যাহারা হিংস্র প্রবৃত্তি, পরশ্রীকাতরতার প্রবৃত্তি এবং নিজ স্রষ্টার কথা বিস্মৃত হইয়া নিজ গুণ ও শক্তি সম্বন্ধে অহংকারের প্রবৃত্তিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহারা মনুষ্যাবয়বযুক্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে মানুষের স্বভাবযুক্ত নহে।

ইহারা সংস্কৃত ভাষাসম্মত লৌকিক ভাষায় জনসাধারণ শ্রেণীর মানুষের অন্তর্ভুক্ত নহে। সংস্কৃত ভাষাসম্মত লৌকিক ভাষায় ইহারা মনুষ্যাবয়বী পশু অথবা মনুষ্যাবয়বী ম্লেচ্ছ অথবা মনুষ্যাবয়বী চণ্ডাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

কোন্ শ্রেণীর গুণ ও শক্তিযুক্ত হইলে মানুষকে জনসাধারণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা যায়, তাহা ধারণা করিতে পারিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে যাঁহারা সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মী কেবলমাত্র তাঁহারাই জনসাধারণ শ্রেণীর অথবা শূদ্র-শ্রেণীর মানুষের অন্তর্ভুক্ত ; আর কোন শ্রেণীর কর্ম্মী জনসাধারণ (অথবা শূদ্র) শ্রেণীর মানুষের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহারা প্রত্যেকেই "আর্য্য" শ্রেণীর মানুষের অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ (অথবা দূর) করিবার অথবা সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সংগঠনে কেবলমাত্র জনসাধারণ শ্রেণীর প্রতিনিধিগণকে লইয়া "জনসভা"সমূহের রচনা করা হয় কেন এবং আর্য্য শ্রেণীর মানুষগণের কাহাকেও কোন জনসভার কোন সভ্যত্ব দেওয়া হয় না কেন, তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সংগঠনের প্রাথমিক লক্ষ্য কি কি তাহা পরিজ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন হয়।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সংগঠনের যাহা যাহা প্রাথমিক লক্ষ্য, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারিটী, যথা :

(১) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করা ;
(২) মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্ম-ব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করা ;
(৩) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করা ;
(৪) সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শূদ্রত্ব হইতে আর্য্যত্বে উন্নয়ন সাধন করা।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কার্য্য সাধন করিবার দায়িত্বভার অর্পিত হয় চারি শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের হস্তে এবং ঐ চারি শ্রেণীর কার্য্যের ফলভোগী হন প্রাথমিক ভাবে সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ। চারি শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের দায়িত্বভার যথাযথভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে কি না তাহা তাহাদিগের প্রতি অথবা তাঁহাদিগের বিভিন্ন কার্য্যের প্রতি সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের মনোভাব কোন্ শ্রেণীর, তৎসম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে বুঝিতে পারা যায়। কার্য্য-পরিচালনা-সভাসমূহের কর্ম্মিগণ সম্বন্ধে এবং তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধে সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের মনোভাব কোন শ্রেণীর তাহা না বুঝিতে পারিলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে সাধন করা হইতেছে অথবা যথাযথভাবে সাধন করা হইতেছে না, তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় না।

কার্য্যপরিচালনা-সভাসমূহের কর্ম্মিগণের ব্যক্তিগত ব্যবহার সম্বন্ধে এবং তাহাদিগের কার্য্য সম্বন্ধে সামাজিক কার্য্যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের মনোভাব কোন শ্রেণীর, প্রধানতঃ তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের প্রতিনিধি লইয়া জনসভা-সমূহের রচনা করা হয়। কার্য্যপরিচালনা-সভাসমূহের কোন কর্ম্মীকে যে কোন জনসভার সভ্যত্ব দেওয়া হয় না তাহার উদ্দেশ্যও প্রধানতঃ কার্য্যপরিচালনা-সভাসমূহের কর্ম্মি-গণের ব্যক্তিগত ব্যবহার সম্বন্ধে ও তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধে সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের মনোভাব কোন শ্রেণীর তাহা পরীক্ষা করা।

সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ ও কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ মিলিত হইয়া কোন জনসভার

সভ্য হইলে উপরোক্ত মনোভাব সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

জন-সভাসমূহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার সঙ্কেত

কোন্ কোন্ শ্রেণীর সূত্রানুসারে কার্য্য করিয়া চারিশ্রেণীর জনসভা তাহাদিগের প্রত্যেকের তিনশ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকেন তৎসম্বন্ধে আমরা অতঃপর একে একে আলোচনা করিব।

কেন্দ্রীয় জনসভার তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয় তজ্জন্য উহার রচনার পাঁচ শ্রেণীর সূত্র অবলম্বন করা হয়। যথা :

(১) কেন্দ্রীয় জনসভা যাহাতে কেবলমাত্র সামাজিক গ্রামের সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের প্রতিনিধিগণের দ্বারা রচিত হয় এবং যাহাতে অন্য কোন শ্রেণীর কোন কর্ম্মীর কোন প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্য না হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হয় ;

(২) সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর প্রতিনিধি যাহাতে কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্য হইতে পারেন ও হন এবং কোন চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর কোন প্রতিনিধি যাহাতে এই কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্যত্ব পাইতে বাধা প্রাপ্ত না হন তাহার ব্যবস্থা করা হয় ;

(৩) কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্যগণ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের কাহারও কোন অসুবিধাকর অথবা অপ্রীতিকর অবস্থার কথা উল্লেখ করিলে কেন্দ্রীয় কার্য্য পরিচালনা সভার কর্ম্মিগণ যাহাতে এই অসুবিধাকর অথবা অপ্রীতিকর অবস্থা দূর করিবার জন্য অথবা নিবারণ করিবার জন্য অনতিবিলম্বে প্রযত্নশীল হন এবং যাহাতে এই সম্বন্ধে উপরোক্ত কোন কার্য্যে কোনরূপ অবহেলা না করিতে পারেন ও না করেন তাহা করিবার ব্যবস্থা করা হয় ;

(৪) কেন্দ্রীয় জনসভার প্রত্যেক সভ্য যাহাতে প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্য পরিচালনা সভার প্রত্যেক শ্রেণীর কর্ম্মীর বিরুদ্ধে প্রয়োজন হইলে অবাধে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারেন এবং ঐ অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে যাহাতে প্রত্যেক কার্য্য পরিচালনা সভার প্রত্যেক কর্ম্মী দণ্ড প্রাপ্ত হন তাহা করিবার ব্যবস্থা করা হয় ;

(৫) কেন্দ্রীয় জনসভার কোন সভ্য যাহাতে কোন শ্রেণীর কার্য্য পরিচালনাসভার কোন শ্রেণীর কর্ম্মীর বিরুদ্ধে যুক্তিবিরুদ্ধ কোনরূপ অসঙ্গত অভিযোগ উপস্থিত করিতে না পারেন ও না করেন এবং কোনরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ অসঙ্গত অভিযোগ উপস্থিত করিলে যাহাতে অভিযোগকারী ঐ সভ্য দণ্ড প্রাপ্ত হন তাহা করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর প্রতিনিধি যাহাতে কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্য হইতে পারেন ও হন কেবলমাত্র তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে সমগ্র মানবসমাজের জনসাধারণের প্রত্যেকে কেন্দ্রীয় পরিচালনা সভাকে অল্পাধিক ভাবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে প্রলুব্ধ হইয়া থাকেন। তাহারপর আবার যদি অপর চারিটী ব্যবস্থা সাধিত হয় তাহা হইলে যে সমগ্র মনুষ্য সমাজের জনসাধারণের প্রত্যেকে কেন্দ্রীয় পরিচালনা-সভাকে সর্ব্বতোভাবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে প্রলুব্ধ হন এবং উহার কোন কার্য্য সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারেন না তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সিদ্ধান্ত করা যায়।

কেন্দ্রীয় জনসভার প্রত্যেক সভ্য যাহাতে প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার প্রত্যেক শ্রেণীর কর্ম্মীর বিরুদ্ধে প্রয়োজন হইলে যুক্তি সঙ্গত অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারেন এবং ঐ অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে যাহাতে প্রত্যেক কার্য্য-পরিচালনা-সভার প্রত্যেক কর্ম্মী দণ্ডপ্রাপ্ত হন তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে যে কোন কার্য্যপরিচালনা-সভার কোন কর্ম্মীর কোনরূপে যথেচ্ছাচারী হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না, তাহা অনায়াসে নিঃসন্দিগ্ধভাবে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

কেন্দ্রীয় জনসভার কোন সভ্য যাহাতে কোন শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার কোন শ্রেণীর কর্ম্মীর বিরুদ্ধে অযথাভাবে কোনরূপ অসঙ্গত অভিযোগ উপস্থিত করিতে না পারেন ও না করেন এবং কোনরূপ অসঙ্গত অভিযোগ উপস্থিত করিলে যাহাতে অভিযোগকারী ঐ সভ্য দণ্ড প্রাপ্ত হন তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে জন-সাধারণের কাহারও যে কোনরূপ যথেচ্ছাচারী হওয়া সম্ভব-যোগ্য হয় না তাহাও অনায়াসে নিঃসন্দিগ্ধভাবে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

কেন্দ্রীয় জনসভার তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয় তজ্জন্য উহার রচনায় যেরূপ পাঁচ শ্রেণীর সূত্র অবলম্বন করা হয়, সেইরূপ দেশস্থ জনসভার, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার এবং গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয় তজ্জন্য উহাদের প্রত্যেকের রচনায় উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর সূত্র অবলম্বন করা হয়।

জন-সভাসমূহের নির্ব্বাচন পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিবার পদ্ধতি

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর সূত্র অনুসারে চারিশ্রেণীর জন-সভার সভ্য নির্ব্বাচন পদ্ধতি, সংগঠন পদ্ধতি ও কার্য্যপরিচালনা পদ্ধতি কিরূপ ভাবে কার্য্যতঃ পরিচালিত হয় তাহার কথা আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ, গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার, দ্বিতীয়তঃ, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার তৃতীয়তঃ, দেশস্থ জনসভার এবং চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। ইহার কারণ গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন পদ্ধতি বুঝা যায় না, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন পদ্ধতির সহিত পরিচিত না হইতে পারিলে, দেশস্থ জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন পদ্ধতি বুঝা যায় না, এবং দেশস্থ জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন পদ্ধতির সহিত পরিচিত না হইতে পারিলে, কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন পদ্ধতি বুঝা যায় না।

কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইলে প্রথমতঃ, গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হয়; তৃতীয়তঃ, দেশস্থ জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হয়; দেশস্থ জনসভাসমূহের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলে কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন করা সম্ভব হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্য-নির্ব্বাচন, সংগঠন ও কার্য্য-পদ্ধতির বিবরণ

সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার গ্রামস্থ জন-সভার সভ্যনির্ব্বাচন-পদ্ধতির বিবরণ

প্রত্যেক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য পরিচালনা-সভার সংশ্লিষ্ট যে জন-সভার রচনা করা হয়, সেই জন-সভাকে "গ্রামস্থ সামাজিক জনসভা" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যে কয়টী সামাজিক গ্রাম এক একটী সামাজিক কার্য্য পরিচালনার গ্রামের অন্তর্ভুক্ত থাকে সেই কয়টী সামাজিক গ্রামের সমগ্র জনসাধারণ-সংখ্যার প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া "গ্রামস্থ সামাজিক জন-সভা" রচিত হয়।

সাধারণতঃ প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের জনসাধারণ (অর্থাৎ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থশ্রেণীর কর্ম্মিগণ) যে আটত্রিশ শ্রেণীতে বিভক্ত থাকেন, সেই আটত্রিশ শ্রেণীর জনসাধারণের আটত্রিশ জন প্রতিনিধি গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া এক একটী সামাজিক গ্রামের সমগ্র জনসাধারণ-সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের জনসাধারণ যে আটত্রিশ শ্রেণীতে বিভক্ত থাকেন, সেই আটত্রিশ শ্রেণীর কোন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে দলাদলি থাকিলে সেই শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যে কয়টী দল থাকে সেই কয়জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়; সেই শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যে কয়টী দল থাকে সেই কয়জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার ব্যবস্থা না থাকিলে ঐ শ্রেণীর জনসাধারণের সমগ্র সংখ্যার প্রত্যেকের প্রতিনিধি গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ইহা মনে করা চলে না। অন্যপক্ষে, যে শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে দলাদলি থাকে, সেই শ্রেণীর জনসাধারণের প্রত্যেক দল হইতে এক একটী করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলে, সেই শ্রেণীর জনসাধারণের সমগ্র সংখ্যার প্রত্যেকের প্রতিনিধি গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে মনে করা চলে।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের জনসাধারণ যে আটত্রিশ শ্রেণীতে বিভক্ত থাকেন, সেই আটত্রিশ শ্রেণীর জনসাধারণের কোন শ্রেণীর মধ্যে যখন কোন দলাদলি থাকে না, তখন ঐ আটত্রিশ শ্রেণীর জনসাধারণের কেবলমাত্র আটত্রিশ জন প্রতিনিধি গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন; এবং ঐ আটত্রিশ জন প্রতিনিধি ঐ সামাজিক গ্রামের জনসাধারণের সমগ্র সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন।

কিন্তু যখন কোন সামাজিক গ্রামের জনসাধারণের আটত্রিশ শ্রেণীর কোন এক অথবা একাধিক শ্রেণীর মধ্যে দলাদলি উপস্থিত হয়, তখন আর ঐ আটত্রিশ শ্রেণীর জনসাধারণের কেবলমাত্র আটত্রিশ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন না। দলাদলির সংখ্যানুসারে প্রতিনিধির সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন সামাজিক গ্রামের আটত্রিশ শ্রেণীর জনসাধারণের প্রতিনিধির সংখ্যা আটত্রিশজনের অধিক নির্ব্বাচিত হইয়াছে দেখিলেই বুঝিতে হয় যে, সেই সামাজিক গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে রাগ-দ্বেষ এবং দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে। তখনই জনসাধারণের দ্বন্দ্ব-কলহের ও রাগ-দ্বেষের প্রবৃত্তি দূর করিয়া ঐ গ্রামের সামাজিক কার্য্যের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের এবং গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের ও গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের অধিকতর প্রযত্নশীল হইতে হয়।

কোন গ্রামের আটত্রিশ শ্রেণীর জনসাধারণের কোন শ্রেণীর প্রতিনিধির সংখ্যা দুই জনের অধিক হইলে সেই শ্রেণীর জনসাধারণের গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যত্ব করিবার অধিকার বিলুপ্ত হয়।

কোন গ্রামের আটত্রিশ শ্রেণীর জনসাধারণের কোন শ্রেণীর জনসাধারণের প্রতিনিধির সংখ্যা একজনের অধিক হইলে সেই শ্রেণীর জনসাধারণের সংশ্লিষ্ট সামাজিক কার্য্যের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ এবং এমন কি গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার ও গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা সভার কর্ম্মিগণ পর্য্যন্ত বিচারের যোগ্য ও দণ্ডপ্রাপ্তির যোগ্য হইয়া থাকেন। এই বিচারে উপরোক্ত সামাজিক কার্য্যের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ

এবং গ্রামস্থ সামাজিক ও গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ "পঞ্চম" (অর্থাৎ সমাজের ক্ষয়কারক) বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকেন এবং অপ্রিয় আহার-বিহার অথবা আংশিক আহার-বিহারে সমাজের ঘৃণার যোগ্য হইয়া দিন যাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

কোন গ্রামের কোন একশ্রেণীর জনসাধারণের পরস্পরের মধ্যে অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে কোনরূপ দলাদলির উদ্ভব না হয়, তদুদ্দেশ্যে কঠোর দণ্ডের বিধান থাকায় এবং সামাজিক কার্য্যের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের এবং কার্য্য-পরিচালনা সভাসমূহের কর্ম্মিগণের কঠোর দৃষ্টি থাকায় কার্য্যতঃ কোন গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে সভ্যনির্ব্বাচন লইয়া কোনরূপ দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্ভব হইতে পারে না এবং হয় না।

সভ্য নির্ব্বাচনের সময় উপস্থিত হইবার আগেই সামাজিক কার্য্য-পরিচালনাসভার নিয়োগ ও নির্ব্বাচন বিভাগের পরিচালক সভ্য নির্ব্বাচন বিষয়ে কোন দ্বন্দ্ব-কলহের আশঙ্কা আছে কি না তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। যদি দেখা যায় যে, কোনরূপ দ্বন্দ্ব-কলহের অথবা দলাদলির আশঙ্কা আছে, তাহা হইলে সভ্য নির্ব্বাচনের নির্দ্ধারিত দিনের আগেই সামাজিক কার্য্যের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও অন্যান্য চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের সহায়তায় গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনাসভার কর্ম্মিগণ ঐ দ্বন্দ্ব-কলহের অথবা দলাদলির সর্ব্ববিধ কারণ দূর করিয়া দেন।

উপরোক্ত ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের আটত্রিশশ্রেণীর জনসাধারণের পক্ষ হইতে আটত্রিশ জন প্রতিনিধি গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হ'ন।

এক একটী সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার গ্রামে যে কয়টী সামাজিক গ্রাম অন্তর্ভুক্ত থাকে, তত সংখ্যক আটত্রিশ জন সভ্য লইয়া একটী "গ্রামস্থ সামাজিক জন-সভা" রচিত হয়।

পাঠকগণকে স্মরণ করিতে হয় যে, প্রত্যেক সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার গ্রামে হয় দুইটী, নতুবা তিনটী, নতুবা চারিটী, নতুবা পাঁচটী পর্য্যন্ত সামাজিক গ্রাম অন্তর্ভুক্ত থাকে। গ্রামস্থ সামাজিক জন-সভার সভ্যসংখ্যা ৭৬ জন অথবা ১১৪ জন অথবা ১৫২ জন অথবা ১৯০ জন হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলেই চারিটী সামাজিক গ্রাম লইয়া এক একটী সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার গ্রাম গঠিত হইয়া থাকে। এই হিসাবে, অধিকাংশ স্থলেই গ্রামস্থ সামাজিক জন-সভার সভ্য-সংখ্যা হয় ১৫২ জন।

সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার গ্রামস্থ জনসভার সংগঠন-পদ্ধতির বিবরণ

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের পনেরটী শ্রেণীবিভাগানুসারে যেরূপ ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ পনের শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের পনের শ্রেণীবিভাগকে ভিত্তি করিয়া গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যগণকে পনের শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভাসমূহের আলোচ্য বিষয় সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা:

(১) জনসাধারণের ধনগত অবস্থা সম্বন্ধে ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন প্রাচুর্য্য সাধন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক পনের শ্রেণীর অনুষ্ঠানসমূহের ফলাফল;

(২) জনসাধারণের কর্ম্মশিক্ষা-বিষয়ক অবস্থা সম্বন্ধে অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠানসমূহের ফলাফল;

(৩) জনসাধারণের গর্ভিণীগণের, শিশুগণের, বালক-বালিকাগণের, তরুণ-তরুণীগণের এবং অবিবাহিত যুবক ও অবিবাহিতা যুবতীগণের অবস্থা সম্বন্ধে পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক বার শ্রেণীর অনুষ্ঠানসমূহের ফলাফল;

(৪) জনসাধারণের প্রতি সামাজিক কার্য্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের এবং অন্যান্য কার্য্যপরিচালনা-সভাসমূহের কর্ম্মিগণের ব্যবহারের ফলাফল।

উপরোক্ত পনের শ্রেণীর সভ্য, একজন সভাপতি, একজন সহকারী সভাপতি এবং তিনজন সভা-বিবরণ-লেখক লইয়া প্রত্যেক "গ্রামস্থ সামাজিক জন-সভা" গঠিত হইয়া থাকে।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যগণ মিলিত হইয়া নিজদিগের মধ্য হইতে সভাপতির, সহকারী সভাপতির এবং সভা-বিবরণ-লেখকগণের নির্ব্বাচন সাধন করিয়া থাকেন।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যনির্ব্বাচন সাধারণতঃ প্রত্যেক তিন বৎসরে একবার করিয়া সাধিত হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার অধিবেশন সাধারণতঃ প্রত্যেক তিন মাসে একবার করিয়া সাধিত হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন, সভাপতি প্রভৃতি কর্ম্মী নির্ব্বাচন এবং অধিবেশন প্রভৃতি কার্য্যের দায়িত্বভার (অর্থাৎ ঐ সমস্ত কার্য্য যথাসময়ে ও যথানিয়মে সাধিত হইতেছে কিনা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার দায়িত্বভার) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা সভাসমূহের নিয়োগ ও নির্ব্বাচনবিভাগের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার গ্রামস্থ জন-সভার কার্য্য-পদ্ধতির বিবরণ

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যনির্ব্বাচন সাধারণতঃ তিন বৎসরে একবার করিয়া সাধিত হইয়া থাকে। যদি

কোন কারণে—সভ্যগণের মধ্যে কোনরূপ দ্বন্দ্ব-কলহের অথবা দলাদলির প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, তাহা হইলে যে কোন একজন অথবা একাধিক জন সভ্যের আবেদনে এবং এমন কি জনসাধারণের যে কোন একজনের আবেদনে যে কোন সময়ে সভ্যনির্ব্বাচন-কার্য্য সাধিত হইতে পারে। যখনই কোন এক অথবা একাধিক গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন করা হয়, তখনই ঐ ঐ গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় জনসভার এবং দেশস্থ ও কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্যগণের পুনর্নির্ব্বাচনের প্রয়োজন হইতে পারে এবং হইয়া থাকে।

যখন কোন গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার কোন সভ্য অথবা কোন সামাজিক গ্রামের কোন শ্রেণীর জনসাধারণের কেহ সাধারণ-নিয়ম-বহির্ভূত কোন সময়ে কোন গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্য নির্ব্বাচনের জন্ম আবেদন করেন, তখন প্রথমতঃ ঐ আবেদন কোনরূপ উত্তেজনা অথবা দ্বেষ-হিংসামূলক কিনা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা হয়। অনুসন্ধানে ঐ আবেদন যত্থপি উত্তেজনা অথবা দ্বেষ-হিংসামূলক বলিয়া সন্দেহ করিবার যোগ্য হয়—তাহা হইলে ঐ আবেদনকারীকে বিচারের সম্মুখীন হইতে হয় এবং বিচারানুসারে প্রয়োজন হইলে—এমন কি কঠোরতম দণ্ডভোগ করিতে হয়।

যদি অনুসন্ধানে অথবা বিচারে দেখা যায় যে, ঐ আবেদন উত্তেজনা অথবা দ্বেষ-হিংসামূলক নহে—পরন্তু যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত, তাহা হইলে প্রথমতঃ সামাজিক কার্য্যের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ এবং সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ মিলিত হইয়া আবেদনকারীর অভিযোগের কারণসমূহ দূর করিবার জন্ম এবং ঐ আবেদনকারীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ম প্রযত্নশীল হইয়া থাকেন। যত্থপি আবেদনকারীর অভিযোগের কারণসমূহ দূর করা সম্ভব না হয়, অথবা আবেদনকারী প্রতিনিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে সভ্যগণের পুনঃ নির্ব্বাচন সাধন করিতে হয়।

এতাদৃশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্য্যপরিচালনা-সভাসমূহের কর্ম্মিগণ ও সামাজিক কার্য্যের আর্য্যগণ স্ব স্ব দায়িত্ব নির্ব্বাহে অবহেলার অথবা অক্ষমতার দোষে দুষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন এবং বিচারের ও দণ্ডের যোগ্য হইয়া থাকেন। উপরোক্ত দুষ্টতার জন্ম তাঁহারা সমাজের ক্ষয়কারী (অথবা পঞ্চম) বলিয়া গণ্য হইয়া পঞ্চমের কার্য্যের দণ্ড পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকেন।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সংগঠনে গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার নিয়মবিরুদ্ধ সময়ে সভ্য নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে উপরোক্ত কঠোরতাময় বিচার ও দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা থাকায় কোন নিয়মবিরুদ্ধ সময়ে সভ্যনির্ব্বাচনের কার্য্যতঃ কোন প্রয়োজন হয় না এবং কার্য্যতঃ প্রতি তিন বৎসরে একবার করিয়া সভ্যনির্ব্বাচন-কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যনির্ব্বাচন সাধারণ নিয়মানুসারে যদিও প্রতি তিন বৎসরে একবার করিয়া সাধন করিতে হয়, তথাপি যেমন জনসাধারণের অথবা সভ্যগণের কোন একজনের আবেদনে উহা যখন তখন সংঘটিত হইতে পারে, সেইরূপ ঐ জনসভার অধিবেশন—যাহা সাধারণ নিয়মানুসারে প্রতি তিন মাসে একবার করিয়া হইবার কথা, তথাপি উহা যে কোন একজন অথবা একাধিকজন সভ্যের আবেদনে যখন তখন সংঘটিত হইতে পারে।

জনসভার অধিবেশনের নিয়ম জনসভার সভ্যনির্ব্বাচনের নিয়মের অনুরূপ।

যখন কোন সভ্য নিয়মবহির্ভূত কোন সময়ে কোন গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার অধিবেশনের জন্ম আবেদন করেন, তখন প্রথমতঃ ঐ আবেদন কোনরূপ উত্তেজনা অথবা দ্বেষ-হিংসামূলক কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা হয়। অনুসন্ধানে ঐ আবেদন যত্থপি উত্তেজনা অথবা দ্বেষ-হিংসামূলক বলিয়া সন্দেহ করিবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে ঐ আবেদনকারীকে বিচারের সম্মুখীন হইতে হয় এবং বিচারানুসারে প্রয়োজন হইলে এমন কি কঠোরতম দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

যদি অনুসন্ধানে অথবা বিচারে দেখা যায় যে ঐ আবেদন উত্তেজনা অথবা দ্বেষ-হিংসামূলক নহে, পরন্তু যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত তাহা হইলে প্রথমতঃ সামাজিক কার্য্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ এবং সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ মিলিত হইয়া আবেদনকারীর অভিযোগের কারণসমূহ দূর করিবার জন্ম এবং ঐ আবেদনকারীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ম প্রযত্নশীল হইয়া থাকেন। যত্থপি আবেদনকারীর অভিযোগের কারণসমূহ দূর করা সম্ভব না হয় অথবা আবেদনকারী প্রতিনিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে আবেদনকারীর আবেদনানুসারে গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার অধিবেশন সাধিত করিতে হয়।

আবেদনকারীর অবেদনানুসারে যখন-তখন গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার অধিবেশন সাধিত করিতে হইলে ইহা বুঝিতে হয় যে, কার্য্যপরিচালনা-সভাসমূহের কর্ম্মিগণ ও সামাজিক কার্য্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ তাঁহাদিগের স্ব স্ব দায়িত্ব নির্ব্বাহে অবহেলা অথবা অক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; তখন ঐ কর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ অবহেলা অথবা অক্ষমতার জন্ম সাক্ষাৎ অথবা গৌণভাবে দায়ী বলিয়া স্থির করা হয়, তাঁহাদিগের অপরাধের বিচার করা হয়, বিচারে এমন কি কঠোরতম দণ্ড পর্য্যন্ত প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

উপরোক্ত ভাবে কঠোরতম দণ্ডের ব্যবস্থা থাকায় সামাজিক কার্য্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ এবং

কার্য্যপরিচালনা-সভাসমূহের কর্ম্মিগণ মিলিত হইয়া এত সুচারুভাবে তাঁহাদিগের দায়িত্বভার নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন যে, জন সাধারণের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহের ও দ্বেষ-হিংসার প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাপিত হইয়া যায় এবং কখনও কোন সামাজিক জনসভার কোন অধিবেশন কোন নিয়মবিরুদ্ধ সময়ে কার্য্যতঃ সাধিত করিবার প্রয়োজন হয় না।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও সভাবিবরণ-লেখক প্রভৃতি কর্ম্মী নির্ব্বাচনের ভার সাধারণতঃ গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু তাঁহারা ঐ নির্ব্বাচন ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া সাধন করিতে সক্ষম না হইলে, গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার সভাপতি (অর্থাৎ প্রধান পরিচালক) উহা সাধন করিয়া থাকেন।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যগণ ঐ নির্ব্বাচন ঐক্য-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সাধন করিতে না পারিলে সামাজিক কার্য্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ এবং সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা সভার কর্ম্মিগণ তাঁহাদিগের স্ব স্ব দায়িত্ব নির্ব্বাহে অবহেলার অথবা অক্ষমতার দোষে দুষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। সামাজিক কার্য্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের এবং সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার কর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা উপরোক্ত অবহেলার ও অক্ষমতার দোষে দুষ্ট বলিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রকাশ্য ভাবে বিচার করা হয় এবং তাঁহাদিগকে বিচারানুসারে দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে।

এতাদৃশ বিচার ও দণ্ডের ব্যবস্থা থাকায় গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভাপতি প্রভৃতি কর্ম্মিগণের নির্ব্বাচনকার্য্য ঐ জনসভার সভ্যগণ সর্ব্বতোভাবে ঐক্য-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সাধন করিয়া থাকেন।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যগণ জনসভার অধিবেশনে যে চারি শ্রেণীর আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেক আলোচনা শৃঙ্খলিত ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত থাকে। প্রথমতঃ, সামাজিক গ্রামে ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয় তাহার কোন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অথবা কোন্ অনুষ্ঠানসাধনের কোন প্রণালী সম্বন্ধে কোন শ্রমিকের কোন অভিযোগ আছে কি না তাহার আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত সামাজিক কার্য্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের এবং সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ সামাজিক গ্রামের উপরোক্ত অনুষ্ঠানসমূহ পরিচালিত করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের কাহারও কোনও ব্যবহার সম্বন্ধে কোন শ্রমিকের কোন অভিযোগ আছে কি না তাহার আলোচনা করা হয়।

যদিও গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কোন কর্ম্মীকে গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার কোন সভ্যত্বের স্থান দেওয়া হয় না, তথাপি সামাজিক জনসভার প্রত্যেক অধি-বেশনে সামাজিক কার্য্যপরিচালনা সভার কর্ম্মিগণের উপস্থিত থাকিতে হয় এবং জনসভার সভ্যদের উপরোক্ত অভিযোগ-সমূহ মনোযোগের সহিত লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

জনসভার সভ্যগণের উপরোক্ত অভিযোগসমূহের মধ্যে কোন্ কোন্ অভিযোগ যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত, তাহা সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার বিচারবিভাগের বিচার করিতে হয়। ঐ সমস্ত অভিযোগের যে যে অভিযোগ যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত বলিয়া উপরোক্ত বিচারবিভাগ সিদ্ধান্ত করেন, সেই সমস্ত অভিযোগের প্রত্যেকটীর কারণ যাহাতে অনতিবিলম্বে দূর করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার পরিচালকবর্গের দায়িত্বসমূহের অন্যতম দায়িত্ব।

উপরোক্ত অভিযোগসমূহের কোন অভিযোগের কোন কারণ পরবর্ত্তী তিন মাসের মধ্যে দূরীভূত না হইলে সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ তাঁহাদিগের স্ব স্ব দায়িত্ব নির্ব্বাহে অবহেলার ও অক্ষমতার দোষে দুষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। এই দুষ্টতার জন্য তাঁহাদিগের বিচার করা হয় এবং বিচারানুসারে তাঁহাদিগের দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

গ্রামস্থ জনসভার সঙ্গত অভিযোগের কারণসমূহ অনতি-বিলম্বে দূরীভূত না হইলে যেরূপ গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের এবং গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের বিচার করা হইয়া থাকে ও বিচারানুসারে তাঁহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে, সেইরূপ গ্রামস্থ জনসভা কোন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অথবা উহার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে কোন সঙ্গত অভিযোগ উত্থাপিত করিলেই উপরোক্ত সামাজিক কার্য্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ এবং গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণ স্ব স্ব দায়িত্ব নির্ব্বাহে অবহেলা ও অক্ষমতার দোষে দুষ্ট বলিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া থাকেন। দায়িত্ব নির্ব্বাহে অবহেলার অথবা অক্ষমতার দোষে দুষ্ট বলিয়া সন্দিগ্ধ হইলেই ঐ কর্ম্মিগণের বিচার করিবার ও বিচারানুসারে দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

সামাজিক কার্য্যের প্রথম অথবা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর কোন কর্ম্মীর অথবা সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কোন কর্ম্মীর কোন ব্যবহারের বিরুদ্ধে সামাজিক জনসভার কোন অধিবেশনে ঐ জনসভার কোন সভ্য কোন অভিযোগ উপস্থিত করিলে ঐ অভিযোগ কোন উত্তেজনা অথবা হিংসা-দ্বেষপ্রসূত কি না তৎসম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করা হয়। ঐ অভিযোগ কোন উত্তেজনা অথবা হিংসা-দ্বেষ-প্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইলে অভিযোগকারীর বিচার করা হয় এবং বিচারানুসারে অভিযোগকারীকে দণ্ড দেওয়া হয়। ঐ অভিযোগ কোন উত্তেজনা অথবা হিংসা-দ্বেষ-প্রসূত বলিয়া

সন্দেহ করিবার কারণ না থাকিলে যে যে কর্ম্মীর ব্যবহারের বিরুদ্ধে গ্রামস্থ জনসভার সভ্যবৃন্দের কেহ অভিযোগ উপস্থিত করেন সেই সেই কর্ম্মীর বিচার করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং এমন কি কর্ম্মিগণকে ক্ষয়কারী পঞ্চমের দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

উপরোক্ত অনুসন্ধান, বিচার এবং দণ্ডের ব্যবস্থা থাকায় গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের প্রত্যেকের এবং গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের প্রত্যেকে একদিকে যেরূপ জনসাধারণের প্রতি প্রত্যেক বিষয়ক ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকেন, সেইরূপ আবার জনসাধারণের সম্বন্ধে যে তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে কিনা—তদ্বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ সম্বন্ধেও অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই সতর্কতার ফলে গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার কোন সভ্য কোন কর্ম্মীর বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ কার্য্যতঃ উত্থাপিত করিবার কোন সুযোগ লাভ করিতে পারেন না।

রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ জন-সভার সভ্য নির্ব্বাচন, সংগঠন ও কার্য্য-পদ্ধতির বিবরণ

রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ জন-সভার সভ্যনির্ব্বাচন-পদ্ধতির বিবরণ

প্রত্যেক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার সংশ্লিষ্ট যে জনসভার রচনা করা হয়—সেই জনসভাকে "গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভা" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যে কয়টি সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রাম এক একটী রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা-গ্রামের অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই কয়টি সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামের জনসভার সমগ্র সভ্যসংখ্যার প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভা রচিত হয়।

সাধারণতঃ প্রত্যেক সামাজিক কার্য্যপরিচালক গ্রামের জনসভায় যে পনের শ্রেণীর সভ্য থাকেন, সেই পনের শ্রেণীর সভ্যের পনেরটী প্রতিনিধি প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনার গ্রামের জনসভায় সেই সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার গ্রামের জনসভার প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন।

যে কয়টী সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রাম একএকটী রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-গ্রামের অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই কয়টী "গ্রামস্থ সামাজিক জনসভা" এক একটী গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার অন্তর্ভুক্ত থাকে। যে কয়টী গ্রামস্থ সামাজিক জনসভা এক একটি "গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার" অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই কয়গুণ পনের জন সাধারণতঃ এক একটী গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্য হইয়া থাকেন।

এক একটী গ্রামস্থ সামাজিক জনসভায় যে পনের শ্রেণীর সভ্য থাকেন, সেই পনের শ্রেণীর সভ্যের কোন শ্রেণীর সভ্যের মধ্যে কোনরূপ দলাদলি থাকিলে ঐ গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার প্রতিনিধির সংখ্যা পনেরটীর অধিক হয়। কোন গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার পনের শ্রেণীর সভ্যের কোন শ্রেণীর সভ্যের মধ্যে কোনরূপ দলাদলির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইলে, ঐ দলাদলির কারণ সম্বন্ধে কঠোর অনুসন্ধান করিবার ব্যবস্থা করা হয়—এবং গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের মধ্যে অথবা গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যগণের মধ্যে যাহারা কোনক্রমে অপরাধী বলিয়া সন্দেহের পাত্র হয়, তাহাদিগের বিচার করিবার ও কঠোর দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করা হয়। যে গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার পনের শ্রেণীর সভ্যের কোন শ্রেণীর সভ্যের মধ্যে কোনরূপ দলাদলির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, প্রয়োজন হইলে গ্রামস্থ জনসভায় সেই গ্রামস্থ জনসভার প্রতিনিধিত্ব পর্য্যন্ত স্থগিত করা হয়। এতাদৃশ কঠোর ব্যবস্থার ফলে কোন গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার পনের শ্রেণীর সভ্যের কোন শ্রেণীর সভ্যের মধ্যে কোনরূপ দলাদলি কার্য্যতঃ অসম্ভব হয় এবং প্রত্যেক গ্রামস্থ সামাজিক জনসভা হইতে আঠার জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্যত্ব করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্যমণ্ডলীকে ঐ রাষ্ট্রীয় গ্রামের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র সামাজিক গ্রামসংখ্যার সমগ্র জনসাধারণ-সংখ্যার প্রত্যেকের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ইহার কারণ প্রত্যেক সামাজিক জনসভা তদন্তর্গত সমগ্র সামাজিক গ্রামসংখ্যার সমগ্র জনসাধারণ সংখ্যার প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া রচিত হয়, এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় জনসভা উপরোক্ত সমগ্র প্রতিনিধিসংখ্যার প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া রচিত হয়।

জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন করিবার মূলসূত্র মূলতঃ সামাজিক জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন করিবার মূলসূত্রের অনুরূপ।

রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ জন-সভার সংগঠন-পদ্ধতি ও কার্য্য-পদ্ধতির বিবরণ

"রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ জনসভার" সংগঠন-পদ্ধতি ও কার্য্য-পদ্ধতি মূলতঃ গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সংগঠন পদ্ধতি ও কার্য্য-পদ্ধতির অনুরূপ হইয়া থাকে।

দেশস্থ জন সভার সভ্য নির্ব্বাচন-পদ্ধতি, সংগঠন-পদ্ধতি ও কার্য্য-পদ্ধতির বিবরণ

দেশস্থ জন-সভার সভ্য নির্ব্বাচনপদ্ধতি

প্রত্যেক দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার সংশ্রবে যে জন-সভার রচনা করা হয় সেই জনসভাকে "দেশস্থ জনসভা" নামে অভিহিত করা হয়।

যে কয়টী রাষ্ট্রীয় গ্রাম লইয়া এক একটী দেশ গঠিত হয়, সেই কয়টী রাষ্ট্রীয় জনসভার প্রতিনিধি লইয়া এক একটী "দেশস্থ জনসভা" গঠিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্যগণ প্রধানতঃ পনের শ্রেণীতে বিভক্ত থাকেন। ঐ পনের শ্রেণীর সভ্যের পনেরটী প্রতিনিধি সাধারণতঃ দেশস্থ জনসভায় প্রত্যেক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সমগ্র সভ্যসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন।

উপরোক্ত হিসাবে যে কয়টি রাষ্ট্রীয় গ্রাম এক একটী দেশের অন্তর্ভুক্ত, সেই কয়গুণ পনের জন সভ্য লইয়া এক একটী দেশস্থ জনসভা গঠিত হয়।

দেশস্থ জনসভার সভ্য নির্ব্বাচনের-সংগঠনের ও কার্য্যের পদ্ধতির মূলসূত্র প্রধানতঃ গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্য-নির্ব্বাচন-সংগঠন ও কার্য্য-পদ্ধতির মূলসূত্রের অনুরূপ।

কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্য নির্ব্বাচন-পদ্ধতি, সংগঠন-পদ্ধতি ও কার্য্য-পদ্ধতির বিবরণ

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার সংশ্রবে যে জনসভার রচনা করা হয় সেই জনসভাকে "কেন্দ্রীয় জনসভা" নামে অভিহিত করা হয়।

যে কয়টী দেশ লইয়া সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্রত্ব সাধিত হয়, সেই কয়টী দেশস্থ জনসভার প্রতিনিধি লইয়া কেন্দ্রীয় জনসভা গঠিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক দেশস্থ জনসভার সভ্যগণ প্রধানতঃ পনের শ্রেণীতে বিভক্ত থাকেন। ঐ পনের শ্রেণীর সভ্যগণের পনেরটী প্রতিনিধি সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় জনসভার প্রত্যেক দেশস্থ জনসভার সমগ্র সভ্য-সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হিসাবে যে কয়টী দেশ লইয়া সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্রত্ব, সেই কয়গুণ পনেরজন সভ্য লইয়া কেন্দ্রীয় জনসভা রচিত হয়।

কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্যনির্ব্বাচন-পদ্ধতি, সংগঠন-পদ্ধতি ও কার্য্য-পদ্ধতির মূলসূত্র প্রধানতঃ গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্যনির্ব্বাচন-পদ্ধতি, সংগঠন-পদ্ধতি ও কার্য্য-পদ্ধতির মূল-সূত্রের অনুরূপ।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার, দেশস্থ জনসভার এবং কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্যনির্ব্বাচন-সংগঠন ও কার্য্য উপরোক্ত পদ্ধতিতে সাধিত হইলে প্রত্যেক জনসভা রচনা করিবার যে তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্যের কথা বলা হইয়াছে সেই তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া যে সুনিশ্চিত হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

চারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ের স্থান নির্দ্ধারণ করিবার নীতিসূত্র

চারিশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের নাম ও বিবরণ

যে চারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ের স্থান নির্দ্ধারণ করিবার নীতিসূত্রের প্রয়োজন হয়, সেই চারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের নাম :

(১) "কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভা" ও "কেন্দ্রীয় জনসভা"। এই দুইয়ের মিলিত প্রতিষ্ঠানের নাম—"কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান"।

(২) "দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভা" ও "দেশস্থ জনসভা"। দুইয়ের মিলিত প্রতিষ্ঠানের নাম—"দেশস্থ প্রতিষ্ঠান"।

(৩) "গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভা" ও "গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভা"। দুইয়ের মিলিত প্রতিষ্ঠানের নাম—"গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান"।

(৪) "গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভা" ও "গ্রামস্থ সামাজিক জনসভা"। দুইয়ের মিলিত প্রতিষ্ঠানের নাম —"গ্রামস্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠান"।

প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যালয়ের স্থান নির্দ্ধারণ করিবার সাধারণ সূত্রের পূর্ব্বাংশ

এই চারি শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কার্য্যক্ষেত্র মূলতঃ কতিপয় সামাজিক গ্রাম। যে সমস্ত সামাজিক গ্রাম লইয়া উপরোক্ত চারি শ্রেণীর এক এক শ্রেণীর এক একটী প্রতিষ্ঠান রচিত হয়, সেই সমস্ত সামাজিক গ্রামের মধ্যে যে সামাজিক গ্রামটী সর্ব্বাপেক্ষা কেন্দ্রীয়, সেই সামাজিক গ্রামে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। যে সামাজিক গ্রাম হইতে কোন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের স্থান ও বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সমস্ত সামাজিক গ্রামের সমতাসমূহ মোটামুটীভাবে সমান রকমে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বিচার করা সুনিশ্চিত হয়, সেই সামাজিক গ্রামকে ঐ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল বলিয়া ধরা হয়। কোন প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় হইতে তদন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সমস্ত সামাজিক গ্রামের সমতাসমূহ বিচার করা সম্ভব-যোগ্য এবং অনায়াসসাধ্য না হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ বিধি-নিষেধ এবং তদন্তর্ভুক্ত কোন্ গ্রাম সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন্ কোন্ বিধি-নিষেধ হওয়া উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করা কার্য্য-পরিচালনা-সভাসমূহের কর্ম্মিগণের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না। সমস্ত সামাজিক গ্রামের সাধারণ ভাবে কি কি বিধি-নিষেধ হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের

বিশেষ বিশেষ ভাবে কি কি বিধি-নিষেধ হওয়া উচিত তাহা অভ্রান্ত ভাবে নির্দ্ধারিত না হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না।

উপরোক্ত কারণে প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যালয়ের স্থান নির্দ্ধারণ করিবার প্রধান সূত্র—প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত সামাজিক গ্রামসমূহের মধ্যে যে সামাজিক গ্রাম কেন্দ্রস্থানীয় সেই সামাজিক গ্রাম নির্দ্ধারণ করা এবং ঐ সামাজিক গ্রামে ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় স্থাপন করা।

ইহা ছাড়া,যে সামাজিক গ্রামে কোন কার্য্য-পরিচালনা-সভার অথবা কোন জন-সভার কার্য্যালয় স্থাপিত হয় সেই সামাজিক গ্রাম যাহাতে কোনরূপ অস্বাস্থ্যকর অথবা অত্যধিক শীতলতা ও অত্যধিক উষ্ণতা বশতঃ অধিবাসিগণের অপ্রীতিকর না হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন হয়। আধুনিক কালে ভূমণ্ডলের বিভিন্ন ভাগের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য যেরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে যে-সামাজিক গ্রামে কোন কার্য্য-পরিচালনা-সভার অথবা কোন জন-সভার কার্য্যালয় স্থাপিত হয় সেই সামাজিক গ্রাম যাহাতে অস্বাস্থ্যকর অথবা কোনরূপ অপ্রীতিকর না হয় তাহা করা অবস্থাবিশেষে খুবই কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। উহা মনে হইতে পারে বটে কিন্তু মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার সংগঠনে সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে এমন ব্যবস্থা করা হয় যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামই আদর্শভাবের শান্তি ও শৃঙ্খলার এবং স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হইয়া থাকে।

আধুনিক ভূমণ্ডলের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ ও কোন কোন অংশ এত শীতল যে ঐ উষ্ণতা ও শীতলতা অনেক মানুষেরই অপ্রীতিকর হয় এবং অনেকেই ঐ উষ্ণতার ও শীতলতার তীব্রতা সহ্য করিতে পারেন না। উহা লক্ষ্য করিলে ইহা মনে হইতে পারে যে, যে-সামাজিক গ্রাম কোন শ্রেণীর কার্য্য-পরিচালনা-সভার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক গ্রাম-সমূহের কেন্দ্রস্থানীয়, সেই সামাজিক গ্রামকে সর্ব্বাবস্থায় ইচ্ছামত উষ্ণতা ও শীতলতার তীব্রতাবিহীন করা সম্ভব-যোগ্য নাও হইতে পারে। জল-হাওয়ার আধুনিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে উহা মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সংগঠনে জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতা নিবারণ করিবার জন্য এবং সমতা রক্ষা করিবার জন্য এমন ব্যবস্থা করা হয় যে, ভূমণ্ডলের কোন অংশেই উষ্ণতা অথবা শীতলতা অসহ্য রকমের তীব্র হইতে পারে না এবং হয় না। ভূমণ্ডলের কোন অংশেই উষ্ণতা অথবা শীতলতা যাহাতে অসহ্যকর অথবা অপ্রীতিকর না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে উষ্ণতার অথবা শীতলতার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি স্বতঃই সংঘটিত হয় প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ কার্য্য-নিয়মে তাহা বিশদভাবে ও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে জানা অপরিহার্য্য রকমে প্রয়োজনীয় হয়। প্রাকৃতিক যে যে কার্য্যনিয়মে উষ্ণতার অথবা শীতলতার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি স্বতঃই সংঘটিত হয়, সেই সেই কার্য্য-নিয়মের বিবরণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (অর্থাৎ বেদের) একটী অংশ। আধুনিক কালে মনুষ্য-সমাজ ঐ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কথা প্রায়শঃ বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া এখন আর ভূ-মণ্ডলের কোন অংশের উষ্ণতা অথবা শীতলতা প্রয়োজনানুরূপ ভাবে নিবারণ করা সম্ভব হয় না।

প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ কার্য্য নিয়মে উষ্ণতার অথবা শীতলতার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি স্বতঃই সংঘটিত হয় তাহার কথা আধুনিক-কালের মানব-সমাজ প্রায়শঃ বিস্মৃত হইয়াছেন বটে কিন্তু মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সংগঠনে বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী এবং বিবিধ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষায় যে দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞান পাঠ করান হয় সেই দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞানে ঐ সমস্ত কথা সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায়। তখন প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ কার্য্যনিয়মে উষ্ণতার অথবা শীতলতার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় তাহা যেমন মানব-সমাজের প্রায় প্রত্যেকেরই জানা থাকে, সেইরূপ আবার ঐ উষ্ণতার ও শীতলতার তীব্রতা কিরূপে নিবারণ করিতে হয় তাহার সঙ্কেতও মানব-সমাজের প্রায়শঃ জানা থাকে। পদার্থ-বিজ্ঞানের এই পরিপূর্ণতার ফলে সমগ্র ভূমণ্ডলের কোন সামাজিক গ্রামেই উষ্ণতার অথবা শীতলতার তীব্রতা ঘটিতে পারে না।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় যে সামাজিক গ্রামে স্থাপিত করা হয়, সেই সামাজিক গ্রামে যাহাতে কোন সময়েই উষ্ণতার অথবা শীতলতার তীব্রতা না ঘটিতে পারে তদ্বিষয়ে যেরূপ লক্ষ্য করিতে হয় সেইরূপ আবার ঐ সামাজিক গ্রাম যাহাতে প্রতিষ্ঠানান্তর্গত সমস্ত সামাজিক গ্রামের কেন্দ্রস্থানীয় হয় তাহাও লক্ষ্য করিতে হয়।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় নির্দ্ধারণ কার্য্যে ভূমণ্ডলের মহাসমুদ্র-ভাগ, পৃথিবী-ভাগ এবং আকাশ-ভাগ স্বতঃই কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন ও পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা বিদিত হইবার অপরিহার্য্য আবশ্যকতা

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় সমগ্র ভূমণ্ডলের সম সামাজিক গ্রামের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত করিতে হয়। সমগ্র ভূমণ্ডল যে সমস্ত সামাজিক গ্রামে বিভক্ত হইতে পারে, কোন্ সামাজিক গ্রাম সেই সমস্ত সামাজিক গ্রামের কেন্দ্রস্থল তাহা নির্দ্ধারণ করা আপাতদৃষ্টিতে খুবই কষ্টসাধ্য। কো একটী স্থানের সমগ্র আয়তনের কোন্ অংশ সেই সমগ্র আয়তনের কেন্দ্রস্থানীয় তাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানানুসা

নির্দ্ধারণ করিবার প্রধান উপায় ঐ স্থানের সমগ্র আয়তনের জরীপ করিয়া তাহার মান-চিত্র (অথবা নক্সা) প্রণীত করা এবং জ্যামিতির সাহায্যে কেন্দ্রস্থান নির্দ্ধারণ করা। কোন্ সামাজিক গ্রাম সমগ্র ভূমণ্ডলের সমস্ত সামাজিক গ্রামের কেন্দ্রস্থানীয় তাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের জরীপ-কার্য্যের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য নহে। ইহার কারণ, সমগ্র ভূমণ্ডলের আয়তন (area) ও মানচিত্র (map) সর্ব্বদাই অল্পাধিক ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্থলভাগের যে অংশ আজ জলে নিমজ্জিত, কয়েক বৎসর পরে তাহা স্থলভাগে পরিণত হইতে পারে। আবার স্থলভাগের যে অংশ আজ লোকালয়ে পরিপূর্ণ কয়েক বৎসর পরে তাহা জলে নিমজ্জিত হইতে পারে।

কোন্ সামাজিক গ্রাম সমগ্র ভূমণ্ডলের কেন্দ্রস্থানীয় তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ভূমণ্ডলের মহাসমুদ্রভাগ, পৃথিবীভাগ (অর্থাৎ স্থলভাগ) এবং আকাশভাগ স্বতঃই কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে তাহা সর্ব্বাগ্রে বিদিত হইতে হয়। ভূমণ্ডলের মহাসমুদ্রভাগ, পৃথিবীভাগ এবং আকাশভাগ স্বতঃই কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন ও পরিবর্ত্তিত হয় তাহা বিদিত হইতে পারিলে, মহাসমুদ্রভাগের, পৃথিবীভাগের, আকাশভাগের এবং সমগ্র ভূমণ্ডলের পূর্ণ ও স্থায়ী আয়তন (area) কতখানি এবং উহাদের প্রত্যেকটির পূর্ণরূপ কোন্ কোন্ শ্রেণীর তাহা সম্পূর্ণভাবে জানা সম্ভবযোগ্য হয় এবং তখন সমগ্র ভূমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোন্ সামাজিক গ্রাম তাহাও নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারণ করা যায়।

ভূমণ্ডলের মহাসমুদ্র-ভাগ, পৃথিবী-ভাগ এবং আকাশ-ভাগ স্বতঃই যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন ও পরিবর্ত্তিত হয়, সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়মের বিবরণ

ভূমণ্ডলের মহাসমুদ্রভাগ, পৃথিবীভাগ এবং আকাশভাগ স্বতঃই যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন ও পরিবর্ত্তিত হয় সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়মের বিবরণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (অর্থাৎ বেদের) অন্যতম অংশ। বেদ ছাড়া বিভিন্ন ভাষায় রচিত আর যে-সমস্ত বিজ্ঞানের গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহার কোনখানিতে উপরোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বিশ্বাসযোগ্য কোন বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ভূমণ্ডলের মহাসমুদ্রভাগ, পৃথিবীভাগ এবং আকাশভাগ স্বতঃই যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন ও পরিবর্ত্তিত হয় সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়মের কথা আমরা আমাদিগের এই প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। পাঠকগণের সুবিধার জন্য এই সমস্ত আলোচনার প্রধান কথাসমূহের পুনরুল্লেখ করিব।

এই ভূমণ্ডলের পৃথিবীভাগের (অথবা স্থলভাগের বা Natural Solids-এর) উৎপত্তি হয় উহার মহাসমুদ্রভাগের (অথবা তরল ভাগের বা Natural liquids-এর) উৎপত্তি হইবার পর। মহাসমুদ্রভাগ এবং পৃথিবীভাগের উৎপত্তি হইবার পর অচর উদ্ভিদ্ শ্রেণীর পদার্থসমূহের উৎপত্তি হয়। মহাসমুদ্রভাগ, পৃথিবীভাগ এবং অচর উদ্ভিদ্ শ্রেণীর পদার্থসমূহের উৎপত্তি হইবার পর চরজীবসমূহের উৎপত্তি হয়। মহাসমুদ্রভাগের, পৃথিবীভাগের, অচর উদ্ভিদ্ শ্রেণীর পদার্থসমূহের এবং চরজীবসমূহের উৎপত্তি হইবার পর ভূমণ্ডলের আকাশভাগের উৎপত্তি হয়। ভূমণ্ডলের আকাশ বলিতে বুঝায় নীলাকাশের নিম্নবর্ত্তী শুভ্রাকাশকে।

এই ভূমণ্ডলের পৃথিবীভাগের অচর উদ্ভিদ্ শ্রেণীর, চরজীবের এবং আকাশের স্বতঃই উৎপত্তি হওয়ার সাক্ষাৎ কারণ মহাসমুদ্রের উৎপত্তি। মহাসমুদ্রের (অথবা তরল ভাগের) উৎপত্তি না হইলে পৃথিবীর (অর্থাৎ স্থূল অবস্থার) অচর পদার্থাবস্থার, চরজীব অবস্থার এবং আকাশ অবস্থার উৎপত্তি হইতে পারে না। অন্যদিকে মহাসমুদ্রের অথবা তরল অবস্থার উৎপত্তি হইলে স্থূল অবস্থা প্রভৃতি আর চারিটী অবস্থার স্বতঃই উৎপত্তি হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভবযোগ্য হয়।

উপরোক্ত কারণে, কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে এই ভূমণ্ডলের মহাসমুদ্র, পৃথিবী ও আকাশের স্বতঃই উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে, তাহা সর্ব্বাগ্রে নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

মহাসমুদ্রের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন স্বতঃই সাধিত হয় কোন্ কোন্ কারণে ও কোন্ কোন্ নিয়মে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে পৃথিবীর (অর্থাৎ স্থলভাগের) উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন স্বতঃই কোন্ কোন্ কারণে ও কোন্ কোন্ নিয়মে হইয়া থাকে তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয়। পৃথিবীর উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন স্বতঃই কোন্ কোন্ কারণে ও কোন্ কোন্ নিয়মে হইয়া থাকে তাহা অভ্রান্তভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে এই ভূমণ্ডলের অথবা এই পৃথিবীর প্রকৃত রূপ কি তাহাও অভ্রান্তভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয়। অন্যথা এই পৃথিবীর প্রকৃত রূপ কি তাহা অভ্রান্তভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। পৃথিবীর উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন স্বতঃই কোন্ কোন্ কারণে ও কোন্ কোন্ নিয়মে হইয়া থাকে তাহা অভ্রান্তভাবে নির্দ্ধারণ করিবার পন্থা স্থির না করিয়া পৃথিবীর রূপ কমলালেবুর মত—ইহা সিদ্ধান্ত করা ভ্রান্তিহীনও হইতে পারে এবং ভ্রান্তিযুক্তও হইতে পারে।

সমগ্র ভূমণ্ডলের অথবা এই পৃথিবীর সমগ্র রূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে উহার কেন্দ্রস্থান কোন্ সামাজিক গ্রাম তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয়—ইহা আমরা আগেই বলিয়াছি। মহাসমুদ্রের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন স্বতঃই কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে সাধিত হয় তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে

হইলে এই ভূমণ্ডলের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে এবং ঐ কারণের কারণ (causes of all causes) সম্বন্ধে কয়েকটী উল্লেখ-যোগ্য কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হয়।

উপরোক্ত উল্লেখযোগ্য কথা কয়টী আমরা এক্ষণে লিপিবদ্ধ করিব।

সাক্ষাৎভাবে এই ভূমণ্ডলের উৎপত্তির ও পরিবর্ত্তনের কারণ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থা (Variable or dynamic condition of the mixture of heat and moisture.) ইহার অপর নাম "ব্যোমীয়" (Etherial) অবস্থা।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থার উৎপত্তি হয় এবং অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে বলিয়া এই ভূমণ্ডলস্থ জলভাগ, স্থলভাগ, উদ্ভিদ শ্রেণীর, চরজীব শ্রেণীর এবং আকাশের উৎপত্তি এবং অস্তিত্ব সম্ভবযোগ্য হয়। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থার উৎপত্তি না হইলে এবং ঐ চলৎশীল অবস্থার অস্তিত্ব বিদ্যমান না থাকিলে এই ভূমণ্ডলের জলভাগ অথবা স্থলভাগ অথবা উদ্ভিদ শ্রেণীর অথবা চরজীব শ্রেণীর অথবা আকাশের উৎপত্তি অথবা অস্তিত্ব সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না এবং হইত না।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থা সাক্ষাৎভাবে এই ভূমণ্ডলের উৎপত্তির ও পরিবর্ত্তনের কারণ বটে—কিন্তু সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থা যে সম্ভবযোগ্য হয় তাহার কারণ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য এবং অটল অবস্থা, (constant and static condition of mixture of heat and moisture)। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য এবং অটল অবস্থা এই ভূমণ্ডলের সর্ব্ববিধ পদার্থের উৎপত্তির কারণের কারণ (causes of all causes)।

এই ভূ-মণ্ডলে যাহা কিছু স্বতঃই উৎপন্ন হয় এবং যাহা কিছুর অস্তিত্ব স্বতঃই রক্ষিত হয় তাহার প্রত্যেকটীর উৎপত্তি ও অস্তিত্বের সাক্ষাৎভাবের কারণ যে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থা এবং ঐ চলৎশীল অবস্থার কারণ যে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য এবং অটল অবস্থা, তাহা এক্ষণে সমগ্র ভূ-মণ্ডলের সমগ্র মানবসমাজের কেহই বিদিত নহেন। উহা এক্ষণে সমগ্র ভূ-মণ্ডলের সমগ্র মানবসমাজের কেহই বিদিত নহেন বটে, কিন্তু ঐ কথা ছয় হাজার বৎসর আগে সমগ্র ভূ-মণ্ডলের সমগ্র মানবসমাজের পরিণতবয়স্ক প্রায় প্রত্যেকেই বিদিত ছিলেন। ছয় হাজার বৎসর আগে সমগ্র ভূ-মণ্ডলের সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেকেই যে এই ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তির ও অস্তিত্বের উপরোক্ত কারণ ও কারণের কারণ সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হইতে পারে।

মহাসমুদ্রের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন স্বতঃই কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে সাধিত হয় তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ এই ভূ-মণ্ডলের উৎপত্তির কারণ ও কারণের কারণ সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার সাক্ষাৎ ভাবে এই ভূমণ্ডলের কারণ হইতে মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হইবার কারণ কি কি তাহাও পরিজ্ঞাত হইতে হয়। আনুষঙ্গিক ভাবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সাক্ষাৎভাবে যাহা যাহা এই ভূ-মণ্ডলের কারণ হইতে পারে মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হইবার কারণ তাহাই। এই ভূ-মণ্ডলের যাহা কিছুর উৎপত্তি ও অস্তিত্ব স্বতঃই ঘটিয়া থাকে তাহার প্রত্যেকটীর উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর কারণ।

এই ভূ-মণ্ডলে যাহা কিছুর উৎপত্তি ও অস্তিত্ব স্বতঃই ঘটিয়া থাকে, তাহার প্রত্যেকটির পরিণতি, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুও স্বতঃই ঘটিয়া থাকে। উহার প্রত্যেকটীর পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু যে স্বতঃই ঘটিয়া থাকে সাক্ষাৎভাবে তাহার কারণ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের প্রবাহের অবস্থা এবং উহার "বাষ্পীয়" অবস্থা। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের প্রবাহের অবস্থার অপর নাম উহার "বায়বীয়" অবস্থা। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের "বায়বীয়" অবস্থাও উহার এক শ্রেণীর "চলৎশীল" অবস্থা। বায়বীয় অবস্থাও সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের এক শ্রেণীর চলৎশীল অবস্থা বটে, কিন্তু উহার যে চলৎশীল অবস্থা সাক্ষাৎ-ভাবে এই ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তির ও অস্তিত্বের কারণ, সেই "চলৎশীল অবস্থা" ও "বায়বীক অবস্থা"র মধ্যে পার্থক্য আছে। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের যে চলৎশীল অবস্থা এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থের উৎপত্তির ও অস্তিত্বের কারণ, সেই চলৎশীল অবস্থায় চলৎশীলতা (Dynamicity) বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু ঐ চলৎ শীলতা কেবল মাত্র অবয়বের স্ব স্ব স্থানেই নিবদ্ধ থাকে। ঐ চলৎ-শীলতায় অবয়বের কোন অংশ তাহার স্বস্থান চ্যুত হইয়া অন্যস্থানে গমন করিতে পারে না। 'বায়বীয়' অবস্থায় অবয়বের প্রত্যেক অংশ স্থান-চ্যুত হইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎ-শীল অবস্থায় (variable conditionএ) অথবা (Etherial conditionএ) তেজ ও রসের সমতা বিদ্যমান থাকে। "বায়বীয়" অবস্থায় তেজ ও রসের ঐ সমতা বিদ্যমান থাকে না। পরন্তু অসমতা বিদ্যমান থাকে। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের বায়বীয়

অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণে তেজাধিক্য বিদ্যমান থাকে। আর সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের "বাষ্পীয় অবস্থায়" তেজ ও রসের মিশ্রণে রসাধিক্য বিদ্যমান থাকে।

এইখানে লক্ষ্য করিতে হয় যে, সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য ও অটল অবস্থায় যেরূপ তেজ ও রসের মিশ্রণে সমতা বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ ঐ মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থায়ও তেজ ও রসের মিশ্রণে সমতা থাকিতে পারে। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের যে অবস্থায় ঐ মিশ্রণের চলৎশীলতা সত্ত্বেও উহাদের সমতা বিদ্যমান থাকে, সেই অবস্থাকে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল (অর্থাৎ variable or etherial) অবস্থা বলা হয়।

এই ভূমণ্ডলে যাহা কিছুর উৎপত্তি ও অস্তিত্ব স্বতঃই ঘটিয়া থাকে তাহার প্রত্যেকটীর পরিণতি, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুও যে স্বতঃই ঘটিয়া থাকে সাক্ষাৎভাবে তাহার কারণ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের "বায়বীয়" ও "বাষ্পীয়" অবস্থা বটে কিন্তু ঐ পরিণতি, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর কারণের কারণ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য অটল অবস্থা (constant condition) হইতে উহার চলৎশীল অবস্থার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার (Non-variable conditionএর) উৎপত্তি।

এই ভূমণ্ডলে যাহা কিছুর উৎপত্তি ও অস্তিত্ব স্বতঃই ঘটিয়া থাকে তাহার প্রত্যেকটীর পরিণতি, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর কারণ যেরূপ সাক্ষাৎভাবে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের বায়বীয় ও বাষ্পীয় অবস্থা এবং ঐ কারণের কারণ যেরূপ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য অটল অবস্থা হইতে উহার চলৎশীল অবস্থার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার উৎপত্তি, সেইরূপ সাক্ষাৎভাবে মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হওয়ার কারণ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের বায়বীয় ও ও বাষ্পীয় অবস্থা এবং ঐ কারণের কারণ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য অটল অবস্থা হইতে উহার চলৎশীল অবস্থার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার উৎপত্তি।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য ও অটল অবস্থা (Constant and static condition) হইতে চলৎশীল অবস্থার গুণ, শক্তির ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার (Non-variable conditionএর) উৎপত্তি হয়। ঐ চলৎশীল অবস্থার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থা (Non-variable condition) হইতে চলৎশীল অবস্থার (Variable and Dynamic conditionএর) উৎপত্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থা (Variable and Dynamic condition) হইতে ক্রমে ক্রমে বায়বীয় ও বাষ্পীয় অবস্থার উৎপত্তি হয়।

তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল, বায়বীয় ও বাষ্পীয় অবস্থার বিদ্যমানতা বশতঃ উহার তরল (অর্থাৎ মহাসমুদ্রাবস্থা) ও স্থূল অবস্থার (অর্থাৎ পৃথিবী অবস্থা) এবং ক্রমে ক্রমে অচর উদ্ভিদ্ শ্রেণীর ও চরজীব শ্রেণীর এবং ভূমণ্ডলের আকাশ-অবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই ভূমণ্ডলের অচর উদ্ভিদ্ শ্রেণীর ও চরজীব শ্রেণীর উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু যে স্বতঃই সংঘটিত হয়, সাক্ষাৎভাবে তাহার একমাত্র কারণ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের উপরোক্ত ত্রিবিধ অবস্থার (অর্থাৎ চলৎশীল, বায়বীয় ও বাষ্পীয় অবস্থার) বিদ্যমানতা এবং উপরোক্ত ত্রিবিধ অবস্থার বিদ্যমানতার কারণ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের নিত্য অটল অবস্থার এবং চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার বিদ্যমানতা। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য অটল অবস্থা হইতে উহার চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার উৎপত্তি হয় বলিয়াই উহার চলৎশীল, বায়বীয় ও বাষ্পীয় অবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ঐ ত্রিবিধ অবস্থার উৎপত্তি হয় বলিয়াই তরল (অর্থাৎ মহাসমুদ্র), স্থূল (অর্থাৎ পৃথিবী), উদ্ভিদ্, চরজীব ও আকাশ-অবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং উদ্ভিদ্ শ্রেণীর ও চরজীব শ্রেণীর অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু স্বতঃই ঘটিয়া থাকে।

মহাসমুদ্রের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন স্বতঃই সাধিত হয় কোন্ কোন্ নিয়মে তাহা স্থির করিতে হইলে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য-অটল অবস্থা হইতে উহার চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ ঐশী নিয়মে এবং উহার চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষাবস্থা হইতে চলৎশীল, বায়বীয় ও বাষ্পীয় অবস্থার উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা নির্দ্ধারণ করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য অটল অবস্থাকে ঋষিগণের সংস্কৃত ভাষায় "ব্রহ্ম" বলিয়া অভিহিত করা হয়। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ-অবস্থাকে সংস্কৃত ভাষায় "ব্রহ্ম-রূপ" এবং স্থানবিশেষে "মায়া" নামে অভিহিত করা হয়।

যে সমস্ত কার্য্যবশতঃ "ব্রহ্ম" হইতে "ব্রহ্ম-রূপের" অথবা "মায়ার" উৎপত্তি হয় এবং যে-সমস্ত কার্য্য-ব্রহ্মের বিদ্যমানতা ছাড়া আর কোন কারণের অথবা পদার্থের বিদ্যমানতা বশতঃ ঘটিতে পারে না, সংস্কৃত ভাষায় সেই সমস্ত কার্য্যের নিয়মের নাম 'ঐশী-নিয়ম'। যে সমস্ত কার্য্য "ব্রহ্ম-রূপের" অথবা "মায়ার" বিদ্যমানতা বশতঃ ঘটিয়া থাকে, সংস্কৃত ভাষায় সেই সমস্ত কার্য্যের নিয়মের নাম "প্রাকৃতিক নিয়ম"।

আমাদিগের বিচারানুসারে গত তিন হাজার বৎসর হইতে পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় "ব্রহ্ম", "ব্রহ্ম-রূপ" এবং "মায়া" এই তিনটী শব্দের তাৎপর্য্য যথাযথভাবে বুঝিতে না পারিয়া মানবসমাজকে নানারকমভাবে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। উপরোক্ত ঐশী নিয়ম ও প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ জানা থাকিলে একদিকে যেরূপ মহাসমুদ্রসমূহের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব স্বতঃই সাধিত হয় কোন্ কোন্ নিয়মে, তাহা জানা সম্ভবযোগ্য হয় সেইরূপ আবার মানুষের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধি স্বতঃই সংঘটিত হয় কোন্ কোন্ কারণে এবং ক্ষয় ও মৃত্যুই বা সংঘটিত হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যায়। কোন্ কোন্ ঐশী ও প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু স্বতঃই ঘটিয়া থাকে তাহা অভ্রান্তভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে মানুষের বৃদ্ধি হয় কোন্ কোন্ সঙ্কেতে এবং ক্ষয় হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহাও অভ্রান্তভাবে নির্দ্ধারণ করা সুনিশ্চিত হয়। মানুষের বৃদ্ধি অথবা উন্নতি হয় কোন্ কোন্ সঙ্কেতে এবং ক্ষয় হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা অভ্রান্তভাবে নির্দ্ধারণ করা সুনিশ্চিত হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিধিমূলক ও কোন্ কোন্ নিষেধমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তাহাও অভ্রান্তভাবে নির্দ্ধারণ করা সুনিশ্চিত হয়।

অন্যদিকে কোন্ কোন্ ঐশী ও প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু স্বতঃই সংঘটিত হয়, তাহা অভ্রান্তভাবে জানা না থাকিলে মানুষের বৃদ্ধি অথবা উন্নতি কোন্ কোন্ সঙ্কেতে সুনিশ্চিত হয় এবং মানুষের ক্ষয় কোন্ কোন্ কারণে ঘটিয়া থাকে তাহা স্থির করা সম্ভবযোগ্য হয় না। উহা স্থির করিতে না পারিলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে যে বিধিমূলক ও নিষেধমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় সেই সেই ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করাও সম্ভবযোগ্য হয় না।

আনুষঙ্গিকভাবে আমাদিগের বিচারানুসারে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, কোন্ কোন্ ঐশী ও প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের ও ভূমণ্ডলের অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু স্বতঃই সংঘটিত হয় তাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আদৌ জানা নাই এবং উহা জানা না থাকায় যে যে ব্যবস্থায় মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়—বর্ত্তমান বিজ্ঞানে সেই সেই ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। যে যে ব্যবস্থায় মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সুনিশ্চিত হয় সেই সেই ব্যবস্থা স্থির করিতে হইলে কোন্ কোন্ ঐশী ও প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের ও ভূমণ্ডলের অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু স্বতঃ সংঘটিত হয় তাহা স্থির করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

মহাসমুদ্রসমূহের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন (অর্থাৎ জোয়ার-ভাটা প্রভৃতি) স্বতঃই সাধিত হয় কোন্ কোন্ ঐশী ও প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা স্থির করিতে হইলে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের প্রথমতঃ, নিত্য-অটল-অবস্থা, দ্বিতীয়তঃ, চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ-অবস্থা, তৃতীয়তঃ, চলৎশীল অবস্থা, চতুর্থতঃ, বায়বীয় অবস্থা, এবং পঞ্চমতঃ, বাষ্পীয় অবস্থা এই ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কোথায় বিদ্যমান আছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর অবস্থারই বিবিধ শ্রেণীর কার্য্য এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক প্রকৃতিজাত পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান আছে। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর অবস্থার বিবিধ শ্রেণীর কার্য্য এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক প্রকৃতিজাত পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু ঐ পাঁচ শ্রেণীর অবস্থার কোন শ্রেণীর অবস্থারই অফুরন্ত ভাণ্ডার এই ভূমণ্ডলের কোন প্রকৃতিজাত পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান নাই। যে নীলাকাশ এই ভূমণ্ডলের জল-ভাগ ও স্থল-ভাগ, উদ্ভিদ-ভাগ, চরজীব-ভাগ এবং আকাশ-ভাগকে সর্ব্বতোভাবে ঘিরিয়া রহিয়াছে, সেই নীলাকাশের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের ঐ পাঁচ শ্রেণীর অবস্থার প্রত্যেক শ্রেণীর অবস্থার অফুরন্ত ভাণ্ডার বিদ্যমান আছে।

রাত্রিকালে নীলাকাশকে যে অবস্থায় এই ভূমণ্ডল হইতে দেখা যায়, সেই অবস্থা সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল (অথবা variable) অবস্থা। ঐ নীলাকাশকে সর্ব্বতোভাবে ঘিরিয়া রহিয়াছে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ-অবস্থা (অথবা non-variable condition)। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের "চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ-অবস্থাকে" সর্ব্বতোভাবে ঘিরিয়া রহিয়াছে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য অটল-অবস্থা (constant static condition)।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল (variable) অবস্থার পশ্চাতে যে উহার অপর দুইটি অবস্থা পরে পরে বিদ্যমান আছে, তাহা মানুষ কোন যন্ত্র অথবা সাধারণ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। উহা কোন মানুষ কোন যন্ত্র অথবা সাধারণ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু মানুষের চক্ষু যাহাতে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থার পশ্চাৎ দেখিতে সক্ষম হয়, তাহা করিবার সঙ্কেত আছে। ঐ সঙ্কেতের সাহায্যে চক্ষুকে প্রস্তুত করিতে পারিলে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল (variable) অবস্থার পশ্চাতে যে উহার অপর দুইটি অবস্থা পরে পরে বিদ্যমান আছে, তাহা মানুষ নিজ চক্ষুর দ্বারাই দেখিতে

পায়। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের ঐ অপর দুইটি অবস্থা মানুষ নিজ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে সক্ষম হউক আর নাই হউক, ঐ দুইটি অবস্থা যে নীলাকাশের পশ্চাতে বিদ্যমান আছে, তাহা অনায়াসে বিচার করিয়া বুঝা যায়। ভূমণ্ডল সর্ব্বদাই নীলাকাশ দ্বারা ঘেরা রহিয়াছে, এবং ঐ নীলাকাশের প্রতিবিম্বে এই ভূমণ্ডলে নীলবর্ণের প্রাবল্য হওয়ার কথা, অথচ দিনের বেলায় শ্বেত বর্ণের প্রাবল্য এবং রাত্রিবেলায় কালবর্ণের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। এতাদৃশ বিরুদ্ধাবস্থা কেন হয়, তাহার বিচার করিতে বসিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য-অটল-অবস্থা শুভ্র স্ফটিকের মত উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া দিনের বেলায় সমগ্র ভূমণ্ডলে শ্বেতবর্ণের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ-অবস্থা উজ্জ্বল কাল-বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া রাত্রিবেলায় কালবর্ণের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়।

দিনের বেলায় নীলাকাশকে যে অবস্থায় এই ভূমণ্ডল হইতে দেখা যায়, সেই অবস্থা সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের বাষ্পীয় অবস্থা। বাষ্পীয় অবস্থার পশ্চাতে বিদ্যমান থাকে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের বায়বীয় অবস্থা।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের বাষ্পীয় অবস্থা হইতে মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হয়।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের উপরোক্ত পাঁচটি অবস্থা নীলাকাশে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। ঐ পাঁচটি অবস্থা নীলাকাশে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু এক সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের এক নিত্য-অটল-অবস্থা ছাড়া আর কোন অবস্থাই সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে অপরিবর্ত্তিত থাকে না। আর চারিটী অবস্থারই প্রতি নিমেষে অল্পাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে বাষ্পীয় অবস্থার বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে; এই বৃদ্ধির ফলে ঐ সময়ে মহাসমুদ্রের ভাঁটা হইতে থাকে এবং রাত্রিকালের নীলাকাশ প্রত্যুষে বাষ্পীয় অবস্থার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবৃত হইয়া থাকে; দিবা দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তেজ ও রসের মিশ্রণের বাষ্পীয় অবস্থা জলাকারে পরিণত হইতে থাকে। এই পরিণতির ফলে একদিকে মহাসমুদ্রসমূহের জল বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উহাদের জোয়ার হয়, অন্য দিকে সন্ধ্যার সময় রাত্রিকালের নীলাকাশ পুনরায় মানুষ দেখিতে পায়।

আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের প্রথমতঃ, নিত্য-অটল-অবস্থা হইতে চলৎ-গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার; দ্বিতীয়তঃ, গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থা হইতে চলৎশীল অবস্থার; তৃতীয়তঃ, চলৎশীল অবস্থা হইতে বায়বীয় অবস্থার; এবং চতুর্থতঃ, বায়বীয় অবস্থা হইতে বাষ্পীয় অবস্থার উৎপত্তি হয়। নীলাকাশের মধ্যে উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কার্য্যের অস্তিত্ব সর্ব্বদাই যুগপৎ বিদ্যমান আছে। ঐ চারি শ্রেণীর কার্য্যের উৎপত্তি হইতে মহাসমুদ্রসমূহের উৎপত্তি হয় এবং ঐ চারি শ্রেণীর কার্য্যের এবং মহাসমুদ্র-সমূহের যুগপৎ অস্তিত্ব বশতঃ প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় বাষ্পীয় অবস্থার একবার বৃদ্ধি ও একবার হ্রাস ঘটিয়া থাকে। বাষ্পীয় অবস্থার বৃদ্ধি ও হ্রাস বশতঃ মহাসমুদ্রসমূহের প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার করিয়া ভাঁটা ও একবার করিয়া জোয়ার ঘটিয়া থাকে। মহাসমুদ্রসমূহের জোয়ার-ভাঁটার নাম মহা-সমুদ্রসমূহের "পরিবর্ত্তন"।

কোন্ কোন্ ঐশী ও প্রাকৃতিক নিয়মে মহাসমুদ্রসমূহের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন হয় তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিলে যে যে ঐশী ও প্রাকৃতিক নিয়মে এই ভূমণ্ডলের স্থল-ভাগের অথবা পৃথিবী-ভাগের উৎপত্তি হয়—সেই সেই ঐশী ও প্রাকৃতিক নিয়মের কথাও ধারণা করিতে পারা যায় এবং তখন কোন্ সামাজিক গ্রাম সমগ্র ভূমণ্ডলের কেন্দ্র-স্থানীয়, তাহাও নির্দ্ধারণ করা যায়।

যে যে ঐশী ও প্রাকৃতিক নিয়মে মহাসমুদ্রসমূহের উৎপত্তি হয় সেই সেই ঐশী ও প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে নীলাকাশের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের চলৎশীল অবস্থার, বায়বীয় অবস্থার ও বাষ্পীয় অবস্থার যে যে স্তর বিদ্যমান আছে, সেই সেই স্তরের সর্ব্বত্রই অণ্ডাকারের (eliptical) চলৎশীলতা বিদ্যমান থাকে। অণ্ডাকারের চলৎশীলতা চারি শ্রেণীর, যথা:

(১) শঙ্খাকার, (২) চক্রাকার, (৩) গদাকার এবং (৪) পদ্মাকার। ঐ চারিশ্রেণীর অণ্ডাকারের চলৎশীলতা ছাড়া উর্দ্ধাধঃ আকারের কোন চলৎশীলতা নীলাকাশের কোন স্তরে বিদ্যমান থাকে না। মহাসমুদ্রসমূহের উৎপত্তি হওয়ার পর উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার উৎপত্তি হয়। নীলাকাশের নিম্নস্থ আকাশের যে অংশ শুভ্রাকারের, সেই অংশে চারিশ্রেণীর অণ্ডাকারের চলৎশীলতা ছাড়া উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতা বিদ্যমান আছে। ঐ অংশকে আমরা এই প্রবন্ধে "ভূমণ্ডলের আকাশ" বলিয়া অভিহিত করি-তেছি।

অণ্ডাকারের চলৎশীলতা হইতে উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎ-শীলতার উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে (process of works-এ) তাহা বুঝিতে না পারিলে এই ভূমণ্ডলের স্থলাংশের (অথবা পৃথিবীর) উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে তাহা বুঝা যায় না। এই ভূমণ্ডলের স্থলাংশের (অথবা পৃথিবীর) উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে তাহা বুঝিতে হইলে অণ্ডাকারের চলৎশীলতা (eliptical movements) হইতে উর্দ্ধাধঃ আকারের (upward and

downward) চলৎশীলতার উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে তাহা বুঝা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। আমরা অতঃপর ঐ বিষয়ের আলোচনা করিব।

মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হইলে জলের গুরুত্ব বশতঃ নীলাকাশের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থার (variable condition) যে স্তর বিদ্যমান আছে সেই স্তরের উপর অতিরিক্ত চাপ নিপতিত হয়। নীলাকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থার (variable condition-এর) স্তরের উপরস্থিত অতিরিক্ত চাপ ক্রমে ক্রমে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার (Non-variable condition-এর) স্তরকে অতিক্রম করিয়া নিত্য-অটল-অবস্থার (constant condition-এর) স্তরে উপনীত হয়। উপরোক্ত অতিক্রমণের অবস্থায় মহাসমুদ্রসমূহের তলদেশের তরলাবস্থার মধ্যে বিবিধ রকমের রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্য্যসমূহ হইতে থাকে। ঐ সমস্ত রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্য্য প্রধানতঃ চতুর্দ্দশ শ্রেণীর।

নীলাকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থার স্তরের উপরিস্থিত মহাসমুদ্রসমূহের অতিরিক্ত গুরুত্বের অতিরিক্ত চাপ নিত্য-অটল-অবস্থার স্তরে উপনীত হয় বটে, কিন্তু উহা ভেদ করিতে সক্ষম হয় না পরন্তু অক্ষম হয়। ইহার কারণ নীলাকাশের বহিঃস্থিত সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য-অটল-অবস্থার (constant and static condition-এর) স্তর অভেদ্য ও অনতিক্রমণীয়। প্রথমতঃ, সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য-অটল-অবস্থার অভেদ্যতা, দ্বিতীয়তঃ, মহাসমুদ্রসমূহের অতিরিক্ত গুরুত্বের অতিরিক্ত চাপজাত বেগ এবং তৃতীয়তঃ, চতুর্দ্দশ শ্রেণীর রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্য্য—এই তিন শ্রেণীর কারণ বশতঃ নীলাকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের যে মিশ্রণে অণ্ডাকারের চলৎশীলতা ছাড়া অন্য কোন চলৎশীলতা বিদ্যমান থাকে না, সেই মিশ্রণে ঊর্দ্ধাকারের চলৎশীলতা উৎপত্তি হয় এবং উহা এই ভূমণ্ডলের আকাশের প্রাথমিক অবস্থায় উপনীত হয়। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের ঊর্দ্ধাকারের চলৎশীলতাযুক্ত উপরোক্ত আকাশাবস্থায়, পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ শ্রেণীর রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্য্যপ্রযুক্ত গুরুত্ব-বিশিষ্ট (weighty) পদার্থসমূহ বিদ্যমান থাকে। এই গুরুত্ব-বিশিষ্ট পদার্থসমূহের বিদ্যমানতা বশতঃ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের ঊর্দ্ধাকারের চলৎশীলতাযুক্ত উপরোক্ত আকাশাবস্থায় যেমন ঊর্দ্ধাকারের চলৎশীলতা বিদ্যমান থাকে সেইরূপ আবার যুগপৎ অধঃ আকারের চলৎশীলতাও বিদ্যমান থাকে। এইরূপে অণ্ডাকারের চলৎশীলতা হইতে ঊর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার উৎপত্তি হয়।

যে নীলাকাশ এই ভূমণ্ডলকে অণ্ডাকারে সর্ব্বতোভাবে ঘিরিয়া রহিয়াছে সেই নীলাকাশে যে কেবল মাত্র অণ্ডাকারের চলৎশীলতাই বিদ্যমান আছে এবং ঊর্দ্ধাধঃআকারের কোন চলৎশীলতা বিদ্যমান নাই তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত নীল আকাশে যদ্যপি ঊর্দ্ধাধঃআকারের চলৎশীলতা বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে এই ভূমণ্ডল যে যে অবস্থায় তাহাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে সেই সেই অবস্থায় বিদ্যমান থাকিতে পারিত না। এই বিষয়ে আর অধিক কথা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা চলে না এবং প্রয়োজনও নাই।

এই ভূমণ্ডলের আকাশে যেমন অণ্ডাকারের চলৎশীলতা বিদ্যমান আছে, সেইরূপ আবার ঊর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতাও বিদ্যমান আছে।

এই ভূমণ্ডলের আকাশে, মহাসমুদ্রের উপরিভাগ হইতে খানিকদূর ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার মধ্যে ঊর্দ্ধাকারের চলৎশীলতা অধিকতর প্রভাবযুক্ত; যতদূর পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধাকারের চলৎশীলতা অধিকতর প্রভাবযুক্ত, ততখানি দূরত্বের উপরিস্থিত খানিকদূর ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার মধ্যে ঊর্দ্ধাকারের চলৎশীলতা এবং অধঃ আকারের চলৎশীলতা সমান প্রভাবযুক্ত। এই ভূমণ্ডলের আকাশের সর্ব্বোপরিস্থিত অংশে যে ঊর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতা আছে সেই ঊর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার মধ্যে অধঃ আকারের চলৎশীলতাই অধিকতর প্রভাবযুক্ত। এই ভূমণ্ডলের আকাশের বিভিন্ন অংশে যে উহার ঊর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার উপরোক্ত তিন শ্রেণীর তারতম্য বিদ্যমান থাকে তাহার প্রধান কারণ দুই শ্রেণীর, যথা: (১) মহাসমুদ্রসমূহের অন্তরস্থিত পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ শ্রেণীর রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্য্যসমূহ এবং (২) নীলাকাশের বিভিন্ন অংশে তাহার অণ্ডাকারের চলৎশীলতার বেগের বিভিন্নতা।

প্রথমতঃ, নীলাকাশের অণ্ডাকারের চলৎশীলতা হইতে ভূমণ্ডলাকাশের ঊর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে ও কোন্ কোন্ নিয়মে এবং দ্বিতীয়তঃ, ভূমণ্ডলাকাশের ঊর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার ঊর্দ্ধাকারের ও অধঃ আকারের চলৎশীলতার প্রভাবের তারতম্য হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে ও কোন্ কোন্ নিয়মে—এই দুই শ্রেণীর বিষয় স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিলে এই ভূ-মণ্ডলের স্থূলভাগের অথবা পৃথিবীর স্বতঃই উৎপত্তি হয় ও অস্তিত্ব বজায় থাকে কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে ও কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা ধারণা করিতে পারা যায়।

ভূমণ্ডলাকাশের ঊর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার উৎপত্তি হইলে, মহাসমুদ্রসমূহের তলদেশে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের

মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থার অথবা ব্যোম-অবস্থার যে স্তর বিদ্যমান আছে সেই স্তরের কেন্দ্রস্থিত বিন্দু হইতে ঊর্দ্ধমুখী নীলাকাশস্পর্শী চলৎশীল অবস্থার সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণ-নির্ম্মিত একটী সরলরেখার উৎপত্তি হয়। এই সরলরেখা ভূমণ্ডলের স্থূলভাগের অথবা পৃথিবীভাগের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া থাকে। সাক্ষাৎভাবে যে তিন শ্রেণীর কারণ বশতঃ নীলাকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণে ঊর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার উৎপত্তি হয়, সেই তিন শ্রেণীর কারণ এবং অণ্ডাকারের নীলাকাশের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্ম উপরোক্ত তেজ ও রসের মিশ্রণ-নির্ম্মিত সরল রেখার উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। এই সরল রেখা সংস্কৃত ভাষায় "ব্যোম-কক্ষা" নামে অভিহিত হয়। ইংরাজী ভাষায় পৃথিবীর Axis বলিতে যাহা বুঝা উচিত সংস্কৃত ভাষায় তাহারই নাম "ব্যোম-কক্ষা"।

যে চারি শ্রেণীর কারণে ব্যোম-কক্ষার উৎপত্তি হয় সেই চারি শ্রেণীর কারণ বশতঃই ব্যোম-কক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া ব্যোম-কক্ষার বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর অণ্ডাকারের চলৎশীলতার উৎপত্তি হয় এবং চতুর্দ্দশ শ্রেণীর রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্য্যবশতঃ ভূমণ্ডলের স্থূল অথবা পৃথিবীভাগের বিভিন্ন শ্রেণীর উপাদানের ও বিভিন্ন শ্রেণীর গঠনের উৎপত্তি হয়।

ব্যোম-কক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া ব্যোম-কক্ষার বিভিন্ন প্রদেশে যে বিভিন্ন শ্রেণীর অণ্ডাকারের চলৎশীলতার উৎপত্তি হয়, সেই বিভিন্ন শ্রেণীর অণ্ডাকারের চলৎশীলতার বহিঃস্থিত সীমানার মিলনে পৃথিবীর (অর্থাৎ এই ভূমণ্ডলের স্থূলভাগের) আকার নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ শ্রেণীর আবয়বিক ও রাসায়নিক কার্য্যবশতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত শ্রেণীর উপাদান ও গঠনের উৎপত্তি হয় সেই সমস্ত শ্রেণীর উপাদান ও গঠনই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর উপাদান ও গঠন।

ব্যোম-কক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া ব্যোম-কক্ষার বিভিন্ন প্রদেশে যে বিভিন্ন শ্রেণীর অণ্ডাকারের চলৎশীলতার উৎপত্তি হয় সেই বিভিন্ন শ্রেণীর অণ্ডাকারের চলৎশীলতা ব্যোম-কক্ষার পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চাৎ, উত্তর, ঊর্দ্ধ এবং অধঃ এই ছয় দিকেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। এই সীমাবদ্ধতার কারণ ব্যোম কক্ষার চারি শ্রেণীর কারণের চারি শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা ; যথা :

(১) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য-অটল-অবস্থার অভেদ্যতা জনিত প্রতিক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা ;

(২) মহাসমুদ্রসমূহের অতিরিক্ত গুরুত্বের অতিরিক্ত চাপ-জাত বেগের সীমাবদ্ধতা ;

(৩) চতুর্দ্দশ শ্রেণীর রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্য্যের পরিমাণের ও বেগের সীমাবদ্ধতা ;

(৪) অণ্ডাকারের নীলাকাশের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মের পরিমাণের ও বেগের সীমাবদ্ধতা।

প্রথমতঃ, মহাসমুদ্রসমূহের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব ; দ্বিতীয়তঃ, ঊর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার উৎপত্তি ও অস্তিত্ব ; তৃতীয়তঃ, প্রাথমিক ভূ-মণ্ডলাকাশের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব ; চতুর্থতঃ, ব্যোম-কক্ষার উৎপত্তি ও অস্তিত্ব এবং পঞ্চমতঃ, ভূ-মণ্ডলের পৃথিবীভাগের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব—এই পাঁচটী বিষয়ক তত্ত্ব অত্যন্ত দুরূহ। ঐ পাঁচ শ্রেণীর তত্ত্ব স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে হইলে প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের অবয়বস্থ রসের কার্য্যের অথবা রসায়ন শাস্ত্রের (Chemistryর) ; দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের অংশসমূহের কার্য্যের অথবা প্রাকৃতিক যন্ত্র-বিজ্ঞানের (Natural Mechanics-এর) ; তৃতীয়তঃ, প্রাকৃতিক স্থিতিবিদ্যার (Natural Statics-এর) এবং প্রাকৃতিক গতিবিদ্যার (Natural Dynamicsএর) এবং চতুর্থতঃ, জ্যোতির্ব্বিদ্যার (Astronomyর) এবং পঞ্চমতঃ, শরীর ও মনের তত্ত্ববিদ্যা উপলব্ধি করিবার (Physical & mental function's realisationএর) অধ্যবসায়ী ছাত্র হওয়া অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। উহা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সাধারণতঃ সম্ভবযোগ্য নহে। উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর বিষয়ের বিদ্যাও উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া মহাসমুদ্র প্রভৃতির উৎপত্তি ও অস্তিত্ব-তত্ত্ব স্পষ্টভাবে ধারণা করা খুবই দুরূহ বটে, কিন্তু ঐ পাঁচশ্রেণীর উৎপত্তি ও অস্তিত্ব-তত্ত্ব ধারণা করিতে না পারিলে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ের স্থান নির্দ্ধারণ করিবার নীতিসূত্র বুঝিয়া উঠা সম্ভবযোগ্য হয় না।

যাঁহারা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ের স্থান নির্দ্ধারণ করিবার নীতিসূত্র বুঝিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে উপরোক্ত প্রণালীতে উহা বুঝিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ের স্থানের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে কয়েকটি আনুষঙ্গিক কথা

যে স্থান এই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ, সেই স্থান ব্যোম-কক্ষার ঊর্দ্ধ-কুক্ষি-গত স্থূল ভাগের শেষ সীমানা এবং ঐ স্থানই সর্ব্বতোভাবে ভূমণ্ডলের পৃথিবীভাগের কেন্দ্রস্থলীয়। ঐ স্থান কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান।

ঐ স্থান হইতে একদিকে যেরূপ সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত সামাজিক গ্রামের স্থানগত উপাদান, গুণ ও শক্তিসমূহের মধ্যে কোন্ কোন্ উপাদান, গুণ ও শক্তি সমান অথবা সাধারণ (common) তাহা নির্দ্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য হয়, সেইরূপ আবার প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের স্থানগত উপাদানে, গুণে ও শক্তিতে কি কি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে তাহা নির্দ্ধারণ করাও অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, সমগ্র পৃথিবীতে যে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ বিদ্যমান

থাকে সেই সমস্ত শ্রেণীর মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি-সমূহের মধ্যে কোন্ কোন্ গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সাধারণ অথবা সমান (common) এবং কোন্ কোন্ গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের শ্রেণীত্ব সাধন করিবার উপাদান, তাহা নির্দ্ধারণ করাও ঐ স্থান হইতে অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর কারণে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কোন্ কোন্ বিধি-নিষেধ সাধারণভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত এবং কোন্ দেশে অথবা কোন্ কোন্ গ্রামে কোন্ কোন্ বিধিনিষেধ বিশেষভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত, তাহা এইস্থান হইতে অপেক্ষাকৃত নিখুঁতভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয়।

মহাসমুদ্রসমূহ হইতে এই ভূমণ্ডলের স্থলভাগের উৎপত্তি স্বতঃই সাধিত হয় যে যে কার্য্যক্রমে এবং ঐ স্থলভাগের বিভিন্ন শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অস্তিত্ব রক্ষিত হয় যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে, সেই সেই কার্য্যক্রম ও প্রাকৃতিক নিয়ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, যে স্থান অথবা যে বিন্দু সমগ্র ভূমণ্ডলের পৃথিবীভাগের কেন্দ্রস্থানীয়, সেই বিন্দুর পশ্চাৎভাগের কুক্ষিগত আয়তন (area)* সমগ্র পৃথিবীভাগের মধ্যে স্বতঃই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উর্ব্বরাশক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কুক্ষিগত আয়তনের প্রত্যেক অংশই পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুলনায় স্বতঃই অধিকতর উর্ব্বরাশক্তিযুক্ত হয়। কুক্ষিগত আয়তনের মধ্যে আবার পশ্চাৎভাগের কুক্ষিগত আয়তন স্বতঃই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম উর্ব্বরাশক্তি-যুক্ত হইয়া থাকে। পশ্চাৎভাগের কুক্ষিগত আয়তনের প্রকৃতিগত উর্ব্বরাশক্তির প্রকৃষ্টতা এত অধিক যে, যে-সমস্ত দ্রব্য মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যপ্রদ ও তৃপ্তিপ্রদ সেই সমস্ত দ্রব্য সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য যে যে পরিমাণে আবশ্যক সেই সেই পরিমাণের তিন গুণ পরিমাণে এক পশ্চাৎভাগের কুক্ষিগত আয়তন হইতে অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে। অবশ্য মানুষের অনাচার অথবা অসঙ্গত ব্যবহার বশতঃ জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা অথবা বিষমতার উৎপত্তি হইলে উহা সম্ভবযোগ্য হয় না। যে যে স্থান লইয়া পশ্চাৎভাগের ও উত্তরভাগের কুক্ষিগত আয়তন গঠিত হইয়া থাকে, সেই স্থানসমূহ এই ভূমণ্ডলের সমগ্র পৃথিবীভাগের কেন্দ্রীয় স্থানের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে; ইহার কারণ কুক্ষিগত স্থানের আরম্ভ হয় ব্যোম-কক্ষার পূর্ব্বদিক হইতে এবং উহা অতিক্রম করে পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে পশ্চাতে, পশ্চাৎ হইতে বামে এবং বাম হইতে উর্দ্ধে। পূর্ব্বভাগের কুক্ষিগত আয়তন পৃথিবীর সর্ব্বনিম্নভাগে, দক্ষিণভাগের কুক্ষিগত আয়তন পৃথিবীর উর্দ্ধাধঃ দূরত্বকে চারিভাগে বিভক্ত করিলে যে চারিটী ভাগ হয় তাহার দ্বিতীয় ভাগে, পশ্চাৎভাগের কুক্ষিগত আয়তন উহার তৃতীয় ভাগে, এবং বাম ভাগের কুক্ষিগত আয়তন উহার চতুর্থভাগে অবস্থিত থাকে।

এই ভূমণ্ডলের সমগ্র পৃথিবী ভাগের কেন্দ্রীয় স্থানে যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় স্থাপিত করিতে হয়, তাহার অন্যতম কারণ পশ্চাৎ ভাগের কুক্ষিগত স্থানের উপরোক্ত প্রকৃষ্টতম প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় উপরোক্ত কেন্দ্রীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, মানুষের অনাচার অথবা অসঙ্গত ব্যবহার বশতঃ সমগ্র পৃথিবীর প্রাকৃতিক উৎপাদিকা-শক্তির বিরুদ্ধতা ঘটিলে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-পরিচালনা-সভার-কর্ম্মিগণ পশ্চাৎভাগের কুক্ষিগত স্থানের নৈকট্য বশতঃ উহার প্রাকৃতিক উৎপাদিকা-শক্তির বিরুদ্ধতাসমূহ অনায়াসে অপসারিত করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন এবং অনায়াসে পৃথিবীর অভাবগ্রস্ত দেশসমূহের কাঁচামালের অভাব দূর করিতে কৃতকার্য্য হন।

আমাদিগের বিচারবুদ্ধি অনুসারে এই ভূমণ্ডলের সমগ্র পৃথিবী-ভাগের সর্ব্বোচ্চ শিখর মাউণ্ট এভারেষ্ট (অথবা গৌরীশঙ্কর অথবা কৈলাস-পর্ব্বত)। ঐ কৈলাস-পর্ব্বত সমগ্র পৃথিবীভাগের কেন্দ্রস্থান।

পূর্ব্ব-ভাগের কুক্ষিগত স্থান—উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার কতিপয় অংশ এবং তন্মধ্যবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ লইয়া অবস্থিত।

দক্ষিণভাগের কুক্ষিগত স্থান—প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ এবং অষ্ট্রেলিয়ার কতিপয় অংশ লইয়া অবস্থিত।

পশ্চাৎভাগের কুক্ষিগত স্থান—ইণ্ডো-চায়না, মালয়, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের কতিপয় অংশ লইয়া অবস্থিত।

উত্তর ভাগের কুক্ষিগত স্থান—প্রধানতঃ পঞ্চনদের অংশ ও কাশ্মীর লইয়া অবস্থিত।

---

* "কুক্ষিগত আয়তন" মহাসমুদ্র হইতে যখন এই ভূমণ্ডলের স্থলভাগের উৎপত্তি হয় তখন ঐ স্থলভাগ সর্ব্বপ্রথমে পাক দেওয়া (spiral) চলৎশীলতায় (Dynamicityতে) উৎপত্তি হইতে থাকে, তাহার পর চতুর্দ্দশ শ্রেণীর রাসায়নিক ও আকারিক কার্য্যের এবং স্থলভাগের গুরুত্বের (weightএর) প্রতিক্রিয়া বশতঃ পৃথিবীর রূপের পূর্ণতা সাধিত হয়। উপরোক্ত পাক দেওয়া চলৎ-শীলতা বশতঃ পৃথিবীর প্রাথমিক রূপ পাক দেওয়া অথবা পেঁচাল (spiral) হইয়া থাকে। পৃথিবীর এই পাক দেওয়া অথবা পেঁচাল প্রাথমিক রূপ অথবা স্থানকে সংস্কৃত ভাষায় "কুক্ষি" বলা হয়। পৃথিবীর পেঁচাল প্রাথমিক সমগ্র স্থানকে "কুক্ষিগত আয়তন" বলা হয়। পৃথিবীর পেঁচাল প্রাথমিক স্থানের আরম্ভ হয় ব্যোমকক্ষার পূর্ব্বদিক হইতে, উহা দ্বিতীয়তঃ উপনীত হয় দক্ষিণ দিকে; তাহার পর উহা তৃতীয়তঃ ব্যোমকক্ষার পশ্চাতে উপনীত হয়; চতুর্থতঃ দক্ষিণে; পঞ্চমতঃ উর্দ্ধে এবং ষষ্ঠতঃ অধঃদিকে উহার প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। সমগ্র স্থানকে যেমন কুক্ষিগত আয়তন বলা হয়, সেইরূপ এক একদিকের স্থানকে সেই দিকের কুক্ষিগত আয়তন বলা হয়।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ের স্থান নির্দ্ধারণ করিবার নীতিসূত্র সম্বন্ধে এই আখ্যায়িকায় যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত কথার তাৎপর্য্য এবং অপরিহার্য্য ভাবের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিলে দেখা যায় যে,—কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ের সর্ব্বোপযুক্ত স্থান "গৌরী-শঙ্কর"। স্থান নির্দ্ধারণ করিবার নীতি-সূত্রানুসারে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ের সর্ব্বোপযুক্ত স্থান "গৌরী শঙ্কর" বটে, কিন্তু ঐ কার্য্যালয়ে যাহাতে সর্ব্ব শ্রেণীর মানুষ প্রয়োজনানুসারে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের পক্ষে "গৌরী-শঙ্করে" যাতায়াত করা অনায়াসসাধ্য হয় না, পরন্তু কোন কোন শ্রেণীর মানুষের পক্ষে সময় সময় উহা অসাধ্য হইয়া থাকে। এই কারণে যদিও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ের সর্ব্বোপযুক্ত স্থান "গৌরী-শঙ্কর", তথাপি গৌরী-শঙ্করে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় স্থাপন করা সম্ভবযোগ্য হয় না; কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-পরিচালনা-সভার অমাত্যগণের গবেষণাগার গৌরী-শঙ্করে স্থাপিত করিয়া উহার কার্য্যালয় স্থাপন করিতে হয়—হিমালয়ের পাদদেশে; ব্যবহারতঃ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ের সর্ব্বোপযুক্ত স্থান "কাশীধাম"—অথবা "বারাণসী"। "বারাণসী" অথবা "কাশীধাম"কে ব্যবহারতঃ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ের সর্ব্বোপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবার যুক্তি এই যে, উহা একদিকে যেমন যাতায়াতের পক্ষে সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের পক্ষে অনায়াসসাধ্য, সেইরূপ আবার গৌরীশঙ্করের পরেই উহা সমগ্র পৃথিবীভাগের কেন্দ্রীয়।

আনুষঙ্গিকভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে আগামী সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্যে পুনরায় সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী কোন যুদ্ধের আশঙ্কা উদ্ভূত না হইতে পারে এবং যাহাতে মানুষ আবার অনাশঙ্কিত মনে শান্তির আস্বাদ উপভোগ করিতে পারে তাহার কোন ব্যবস্থার কথা যদি দূরদর্শিতাযুক্ত কোন মানুষের প্রাণে উদয় হয়—তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, যাহাতে মানুষের প্রাণের রাগ-দ্বেষের অথবা উত্তেজনা-বিবাদের প্রবৃত্তি সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সংযত থাকিতে বাধ্য হয় এবং যাহাতে উহা কোনক্রমে অসংযত না হইতে পারে তাহার আয়োজন না করিতে পারিলে উপরোক্ত ব্যবস্থা হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবযোগ্য নহে।

যাহাতে মানুষের প্রাণের রাগ-দ্বেষের অথবা উত্তেজনা-বিবাদের প্রবৃত্তি সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সংযত থাকিতে বাধ্য হয় এবং যাহাতে উহা কোনক্রমেই অসংযত না হইতে পারে তাহার আয়োজন করিতে হইলে, প্রথমতঃ—অস্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ—ভূমণ্ডলের সমগ্র পৃথিবীভাগকে দেশবিভাগের বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে কতকগুলি দেশে বিভাগ করিতে হইবে। তাহার পর গ্রামবিভাগের বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে প্রত্যেক দেশকে কতকগুলি রাষ্ট্রীয় গ্রামে, এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামকে কতকগুলি সামাজিক গ্রামে বিভাগ করিতে হইবে। তাহার পর দুইটী হইতে পাঁচটী পর্য্যন্ত—সামাজিক গ্রাম লইয়া এক একটী সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রাম গঠিত হইবে। তৃতীয়তঃ—প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যাহাতে তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান অর্থাৎ (১) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ (২) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ এবং (৩) মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার অনুষ্ঠান-সমূহ, স্বতঃই সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যাহাতে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান স্বতঃই সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে—

প্রথমতঃ, প্রত্যেক সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামে, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনার গ্রামে, প্রত্যেক দেশে এবং অস্থায়ী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে একটী করিয়া অস্থায়ীভাবের কার্য্যপরিচালনা-সভা গঠিত করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামের অস্থায়ী কার্য্যপরিচালনা-সভায় যাহাতে ছয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান[১] সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনার গ্রামের, প্রত্যেক দেশের, অস্থায়ী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক অস্থায়ীভাবের কার্য্যপরিচালনা-সভায় যাহাতে নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান[২] সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, যাহাতে কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের অথবা জনসাধারণের কেহ যথেচ্ছাচারী না হইতে পারেন এবং জনসাধারণের প্রত্যেকে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রত্যেক কার্য্যপরিচালনা-সভাকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন এবং উহার নির্দ্দেশ অথবা বিধি নিষেধ চালনা করেন, তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক কার্য্যপরিচালনা-সভার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া এক একটি জনসভার রচনা করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে মুদ্রামান ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মীর উপার্জ্জনহার যাহাতে এক নিয়মে নির্দ্ধারিত হয় এবং যাহাতে কোন শ্রেণীর কর্ম্মীর ধনাভাবের কোন আশঙ্কা না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১। বঙ্গশ্রী 'বৈশাখ' ৫১ সংখ্যা ১৪৪, ১৪৫, ও ১৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২। বঙ্গশ্রী বৈশাখ ৫১ সংখ্যা ১৪৬, ১৪৮ ও ১৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠতঃ, সমগ্র পৃথিবীর কোন সামাজিক গ্রামে যাহাতে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও তদন্তর্ভুক্ত অন্যান্য শ্রেণীর অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধিত হইতে না পারে অথবা উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান (অর্থাৎ সামাজিক গ্রামের প্রতিষ্ঠান, সামাজিক কার্য্যপরিচালনার প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনার প্রতিষ্ঠান, দেশীয় কার্য্যপরিচালনার প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান) ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান যাহাতে স্থাপিত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সপ্তমতঃ, কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কেন্দ্রীয় জনসভার কার্য্যালয় যাহাতে বারাণসীধামে স্থাপিত হয় এবং কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের গবেষণাগার যাহাতে গৌরীশঙ্করে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপরোক্ত দশ শ্রেণীর ব্যবস্থা সাধিত হইলে যেমন বর্ত্তমান সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী যুদ্ধের অবস্থা যাহাতে আগামী সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্যে পুনরায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে কোন যুদ্ধের আশঙ্কা উদ্ভূত না হইতে পারে এবং প্রত্যেক দেশের মানুষ আবার আশঙ্কাবিহীন মনে প্রকৃত শান্তির আস্বাদ উপভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইতে পারে, সেইরূপ ঐ দশ শ্রেণীর ব্যবস্থা সাধিত না হইলে অন্য কোন ব্যবস্থায় এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না।

গত ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের অবসানে যে শ্রেণীর League of Nations জেনেভাতে স্থাপিত হইয়াছিল, সেই শ্রেণীর League of Nations এর দ্বারা যে সমগ্র মানব জাতির কোন শ্রেণীর শান্তি সুনিশ্চিত হইতে পারে না—তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানের জন্যও পুনরায় League of Nations স্থাপিত করিবার প্রস্তাব কোন কোন দেশের রাষ্ট্রীয় গুরুগণ উত্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহারা ভবিষ্যতে League of Nationsকে অধিকতর সামরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। যাঁহারা League of Nationsকে অধিকতর সামরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানবজাতির শান্তি সুনিশ্চিত করিতে পারা যায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে উহা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় কিনা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। মানব-চরিত্রের ও মানব-মনের প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, পাশবিক বলের—শক্তির উৎকর্ষের দ্বারা পাশবিক প্রবৃত্তিরই উৎকর্ষ সাধিত হয়। পাশবিক শক্তির উৎকর্ষের দ্বারা অথবা পাশবিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কখনও মনুষ্যোচিত শক্তির ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব হয় না। মনুষ্যোচিত শক্তির ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত না হইলে কখনও মানুষের সর্ব্বতোভাবের শান্তি সাধিত হইতে পারে না ও হয় না। মনুষ্যোচিত শক্তির ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিতে করিতে হইলে মানুষের পাশবিক শক্তি ও প্রবৃত্তি নিবারণ করা ও দূর করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

যাঁহারা ইতিহাসের ছাত্র তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, মানব-সমাজে যখন হইতে সামরিক বল বৃদ্ধি করিবার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতে বর্ত্তমান ভাবানুসারে মানুষের সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তখন হইতে মানুষের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। মানুষের অভাব ও অশান্তিও তখন হইতে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমাদিগের সিদ্ধান্তানুসারে League of Nationsকে অধিকতর সামরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলে মানব-সমাজের শান্তি সুনিশ্চিত করা সম্ভবযোগ্য হইবে না। মানব-সমাজের শান্তি সুনিশ্চিত করিতে হইলে সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেক দেশের মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত League of Nations-এর রচনা করিতে হইবে এবং ঐ League of Nationsকে প্রকৃত মনুষ্যোচিত বলের উপর স্থাপিত করিতে হইবে।

ব্যাসদেবের কথাসমূহ হইতে সংগ্রহ করিয়া আমরা যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কথা বলিতেছি সেই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ইংরেজীতে League of Nations বলা যাইতে পারে। উহা প্রকৃত মনুষ্যোচিত বলের উপর স্থাপিত League of Nations-এর চিত্র। যে কোন মানুষ অথবা যে কোন জাতি ঐ শ্রেণীর League of Nations স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিলে প্রত্যেক দেশের মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ঐ শ্রেণীর League of Nations-এ যোগদান করিতে বাধ্য হইবেন। তখন উহা সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত League of Nations হইয়া দাঁড়াইবে।

আমরা যে League of Nations-এর অথবা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের চিত্র পাঠকবর্গকে দেখাইতেছি, সেই League of Nations-এর অথবা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় ভারতবর্ষে বারাণসীধামে স্থাপন করিতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের শাসনভার দেশ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যাঁহারা সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাসন-ক্ষমতা-যুক্ত তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে।

সমগ্র মানবসমাজের বিভিন্ন দেশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাসন-ক্ষমতাযুক্ত যে-সমস্ত মানুষ আছেন তাঁহারা মিলিত হইয়া যদ্যপি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের রচনা করেন এবং ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় স্থাপন করেন, তাহা হইলে যে সমস্ত কারণে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি হ্রাস-

প্রাপ্ত হইয়াছে সেই সমস্ত কারণ অনায়াসে এক বৎসরের মধ্যে দূর করা অনায়াস-সাধ্য হইতে পারে। যে সমস্ত কারণে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে সেই সমস্ত কারণ দূর করিতে পারিলে সমগ্র ভূমণ্ডলের বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কাঁচামালের অভাব আছে সেই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কাঁচামালের অভাব এক ভারতবর্ষ হইতেই সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভব হইতে পারে। সমগ্র ভূমণ্ডলের বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কাঁচামালের অভাব আছে সেই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কাঁচামালের অভাব দূর করা সুনিশ্চিত হইলে একদিকে কোন দেশেরই অন্য কোন দেশ দখল করিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করিবার কোন অজুহাত থাকিতে পারিবে না এবং অন্যদিকে মানুষের দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে প্রত্যেক সামাজিকগ্রামে যে তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়, সেই তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা অনায়াস-সাধ্য হয়।

সমগ্র মানবসমাজের বিভিন্ন দেশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাসন-ক্ষমতাযুক্ত যে-সমস্ত মানুষ আছেন, তাঁহারা মিলিত হইয়া যদ্যপি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের (অথবা League of Nations-এর) রচনা করেন কিন্তু উহার কার্য্যালয় যদ্যপি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে যে-সমস্ত কারণে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই সমস্ত কারণ সর্ব্বতোভাবে নির্দ্ধারিত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। সেই সমস্ত কারণ সর্ব্বতোভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য না হইলে তাহা দূর করাও সম্ভবযোগ্য হয় না। তাহা দূর করা সম্ভবযোগ্য না হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের বিভিন্ন দেশে যে-সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কাঁচামালের অভাব আছে সেই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কাঁচামালের অভাব দূর করাও সম্ভবযোগ্য হয় না। সমগ্র ভূমণ্ডলের বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত কাঁচামালের অভাব আছে সেই সমস্ত কাঁচামালের অভাব দূর না হইলে বিভিন্ন দেশের মানুষের বিভিন্ন দেশ দখল করিবার ও বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করিবার প্রবৃত্তি দূর হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। ইহার ফলে একদিকে যেরূপ যুদ্ধের প্রবৃত্তি দূর করা সম্ভবযোগ্য হয় না সেইরূপ আবার প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয় সেই তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করাও সম্ভবযোগ্য হয় না।

কাজেই ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় যাহাতে ভারতবর্ষে স্থাপিত হয় তাহা করা মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যালয়ের স্থান নির্দ্ধারণ করিবার সূত্রের শেষাংশ

যাহা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ের স্থান নির্দ্ধারণ করিবার সূত্র, তাহাই দেশীয় প্রতিষ্ঠানের, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের এবং গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ের স্থান নির্দ্ধারণ করিবার সূত্র।

সমগ্র ভূমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সামাজিক গ্রামের কেন্দ্র স্থান যে প্রণালীতে নির্দ্ধারণ করিতে হয়, সেই প্রণালীতেই প্রত্যেক দেশস্থ প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত সামাজিক গ্রামসমূহের, প্রত্যেক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত সামাজিক গ্রামসমূহের এবং প্রত্যেক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনার প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহের কেন্দ্রস্থান নির্দ্ধারণ করা যায়।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহের এবং প্রতিষ্ঠান-সমূহের মূল নীতি-সূত্র

অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও নীতি-সূত্র এই তিনটী শব্দের অর্থ

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহের এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল নীতি-সূত্র কি কি তাহা বুঝিতে হইলে "অনুষ্ঠান" "প্রতিষ্ঠান", এবং "নীতি-সূত্র" এই তিনটী শব্দের অর্থ বুঝিতে হয়।

কোন কারণ বশতঃ মানুষ যখন কোন উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়, তখন ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শৃঙ্খলিতভাবে মিলিত হইয়া যে-সমস্ত কার্য্য মানুষ করিতে থাকে সেই সমস্ত কার্য্যকে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের "অনুষ্ঠান" বলা হয়।

ঐ উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠানসমূহ সাধনের জন্য কর্ম্মিগণের যে সমস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ সঙ্ঘ রচিত হয় সেই সমস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ সঙ্ঘের এক একটীকে এক একটী "প্রতিষ্ঠান" বলা হয়।

কোন উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইলে ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিবার মূল সঙ্কেত কি কি তাহা সর্ব্বপ্রথমে নির্দ্ধারণ করিতে হয়। মূল সঙ্কেত কি কি তাহা নির্দ্ধারিত হইলে ঐ সমস্ত মূল সঙ্কেত কার্য্যে পরিণত করিয়া, উদ্দেশ্য যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহা করিতে হইলে ঐ সমস্ত মূল সঙ্কেত অনুসারে কয়েকটী অনুষ্ঠান সাধন করা ও কয়েকটী প্রতিষ্ঠান রচনা করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজন হয়। যাহা ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিবার মূল সঙ্কেত তাহার নাম ঐ উদ্দেশ্যসাধক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল নীতি-সূত্র।

আজকাল নানাবিধ অনুষ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ নীতিসূত্র সম্বন্ধে নানা রকমের কথা নানা রকমের সুধীগণ বলিয়া থাকেন। আমাদিগের মতে ঐ সুধীগণের অনেকেরই

নীতিসূত্র (Principles of programmes and assemblies) বলিতে যে কি বুঝায় তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা থাকে না। সাধারণ বক্তাগণও "নীতিসূত্র" (Principles) এই শব্দটীর অর্থ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কোন ধারণা অর্জ্জন না করিয়া "নীতিসূত্র" সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় অনেক অপ্রাসঙ্গিক (irrelevant) কথা কহিয়া থাকেন।

প্রধানতঃ উপরোক্ত দুই কারণে সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে "নীতিসূত্র" শব্দটীর সংজ্ঞা বুঝা অপেক্ষাকৃত দুরূহ হয়। আমাদিগের পাঠকগণকে আমরা সতর্ক হইয়া "নীতিসূত্র" শব্দটীর সংজ্ঞা ধারণা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহের এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতিসূত্র কি কি তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে যে যে কারণ বশতঃ মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, সেই সেই কারণের ব্যাখ্যা আগেই করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষ যখন কোন রকমের দুঃখ ভোগ করে, তখন যাহাতে মানুষের দুঃখ দূর হয় অথবা কোন দুঃখের উদ্ভব না হয় তাহা করিবার উদ্দেশ্যে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। মানুষের দুঃখের প্রধান কারণ তাহার "অভাব"। মানুষ তাহার স্বাস্থ্য অথবা তৃপ্তির জন্য যখন যে যে বস্তু পাইবার ইচ্ছা করে, সেই সেই বস্তুর কোনটী না পাইলে অথবা কোনটী পাইতে বিলম্ব হইলে অথবা কোনটী পাইতে ক্লেশ হইলে মানুষের অভাব-বোধের উৎপত্তি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসিয়া মানুষকে আচ্ছন্ন করে। মানুষের জীবনের প্রতিপদ-বিক্ষেপে দুঃখের আশঙ্কা থাকে বলিয়াই দুঃখ আসিলে তাহা যাহাতে দূর করা যায় এবং দুঃখ যাহাতে না আসিতে পারে তাহা করিবার উদ্দেশ্যে মানুষের যাহাতে কোন রকমের অভাবের উদ্ভব না হয় তাহার পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। মানুষের যাহাতে কোনরকমের অভাবের উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার পরিকল্পনা মনুষ্যসমাজে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

মানুষের সর্ব্ববিধ-ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার সম্ভব-যোগ্যতা

আজকাল মানুষের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, প্রত্যেক মানুষের অভাবের শ্রেণী ও মাত্রা যেরূপ দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা দেখিলে কোন মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা যে সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার পরিকল্পনা সম্ভবযোগ্য—ইহা মনে হয় না। আপাতদৃষ্টিতে ইহা মনে হয় যে, মানুষের ইচ্ছা-সমূহের শ্রেণী ও মাত্রা অসংখ্য; তদনুসারে অভাবের শ্রেণী এবং মাত্রাও অসংখ্য হইতে বাধ্য; এবং মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া অসম্ভব।

আপাতদৃষ্টিতে মানুষের ইচ্ছা-সমূহের শ্রেণী ও মাত্রা অসংখ্য বলিয়া মনে হয় বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ও দার্শনিকের বিশ্লেষণ-শক্তির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে মানুষের ইচ্ছা-সমূহের শ্রেণীও অসংখ্য নহে এবং মাত্রাও অপরিমিত নহে।

মানুষের ইচ্ছা-সমূহ মূলতঃ তিন শ্রেণীতে আবদ্ধ। হয় দ্রব্যার্থক, নতুবা গুণার্থক, নতুবা শক্ত্যর্থক ইচ্ছা ছাড়া কোন মানুষের আর কোন শ্রেণীর ইচ্ছার উদ্ভব হইতে পারে না।

কোন মানুষের কোন শ্রেণীর ইচ্ছার মাত্রাও অপরিমিত হইতে পারে না। তিন শ্রেণীর ইচ্ছার মধ্যে দ্রব্যেরই হউক, আর গুণের হউক, আর শক্তিরই হউক, মানুষ হয় তাহার নিজের নিজের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তির জন্য, নতুবা তাহার প্রিয়জনের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তির জন্য, নতুবা তাহার শরণাগত জনের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তির জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কোন মানুষের নিজের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তির জন্য, অথবা প্রিয়জনের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তির জন্য, অথবা শরণাগত জনের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তির জন্য, কোন দ্রব্য অথবা কোন গুণ অথবা কোন শক্তি অপরিমিত পরিমাণে প্রয়োজনীয় হয় না। কোন দ্রব্যের অথবা কোন গুণের অথবা কোন শক্তির যখন কোন মানুষের অভাব থাকে, তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ঐ অভাব পূরণের জন্য অপরিমিত পরিমাণের দ্রব্য, গুণ, ও শক্তি প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজনীয়। যখন মানুষের অভাব থাকে তখন উহা মনে হয়, বটে কিন্তু যখন অভাব পূরণের ব্যবস্থা হয় এবং ঐ অভাব পূরণের জন্য পরিবেশন হইতে থাকে, তখন প্রত্যেক মানুষই "আর না, আমি আর চাই না" এবম্বিধভাব অতি অনায়াসে পোষণ ও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। যখন কেহ ভূরি ভোজনের আয়োজন করেন তখন উপরোক্ত কথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সমগ্র ভূমণ্ডলের মনুষ্যসংখ্যা অসংখ্য নহে। কোন একটী মানুষের তৃপ্তি ও স্বাস্থ্যের জন্য অভিলষিত অথবা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের অথবা গুণসমূহের অথবা শক্তিসমূহের পরিমাণ অপরিমিত হয় না।

উপরোক্ত কথা হইতে ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, মানুষের ইচ্ছাসমূহ আপাতদৃষ্টিতে অসংখ্য বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছাসমূহের শ্রেণী যেরূপ সীমাবদ্ধ সেইরূপ ঈপ্সিত দ্রব্য, গুণ ও শক্তিসমূহের পরিমাণও সীমাবদ্ধ। ইচ্ছাসমূহের শ্রেণী এবং ঈপ্সিত দ্রব্য, গুণ ও শক্তিসমূহের পরিমাণ যখন সীমাবদ্ধ তখন মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাভাবে পূরণ করা অসম্ভব—এবম্বিধ সিদ্ধান্ত

অনায়াসে করা চলে না। পরন্তু, মানুষের নিজের এবং তাহার সর্ব্ববিধ ইচ্ছা পূরণের সর্ব্ববিধ দ্রব্য, গুণ ও শক্তির উৎপাদন যে জল, মাটী ও হাওয়া হইতে সম্ভব হয়, সেই জল, মাটী ও হাওয়ার উৎপত্তি ও পরিণতি প্রকৃতির যে-যে নিয়মে স্বতঃই সাধিত হইয়া থাকে, সেই-সেই নিয়মের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা খুবই সম্ভব। মনুষ্যসমাজে যখন মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা অবিদ্যমান থাকে এবং যখন অধিকাংশ মানুষ নানারূপ অভাবে হাবুডুবু খাইতে থাকে, তখন ইহা বুঝিতে হয় যে, মনুষ্যসমাজ প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধ ভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

একটি অথবা একাধিক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থায় সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা খুবই সম্ভবযোগ্য বটে, কিন্তু সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে কোন দেশের কোন একটি অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের সর্ব্বাবধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। কোন দেশের কোন একটী অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে যে কোন দেশের কোন একটী অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভবযোগ্য হয় না—তাহার প্রধান কারণ এই যে, কোন একটী অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের ঈপ্সিত সর্ব্ববিধ দ্রব্য, গুণ ও শক্তির সর্ব্বশ্রেণীর অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্য, গুণ ও শক্তির প্রাচুর্য্য সাধন করিতে হইলে প্রত্যেক স্থানের জমি, জল ও হাওয়ার মধ্যে যে তেজ ও রসের মিশ্রণ থাকে সেই মিশ্রণের মধ্যস্থ তেজের পরিমাণের অথবা রসের পরিমাণের যাহাতে একটীর তুলনায় আর একটীর বৃদ্ধি সাধিত না হইতে পারে এবং না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। প্রত্যেক স্থানের জমি, জল ও হাওয়ার মধ্যে যে তেজ ও রসের মিশ্রণ থাকে সেই মিশ্রণের মধ্যস্থ তেজের পরিমাণের অথবা রসের পরিমাণের একটির তুলনায় আর একটীর বৃদ্ধি সাধিত হইলে একদিকে হাওয়া যেরূপ অতি-রিক্ত গরম অথবা ঠাণ্ডা এবং অস্বাস্থ্যকর ও অপ্রীতিকর হয়, সেইরূপ আবার জমি ও জলের প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কোন স্থানের হাওয়া অস্বাস্থ্যকর অথবা অপ্রীতিকর হইলে সেই স্থান হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত মানুষের ঈপ্সিত সর্ব্ববিধ গুণ ও শক্তি সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। কোন স্থানের জমি ও জলের প্রাকৃতিক উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইলে ঐ স্থানের কোন একটী মানুষের পক্ষেও কোন কৃত্রিম উপায়ে ঈপ্সিত সর্ব্ববিধ দ্রব্য সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যরক্ষায় উপযোগী ভাবে অথবা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। প্রকৃতির নিয়ম-সম্ভূত উপরোক্ত কথাগুলি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের জানা নাই। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ঐ কথা কয়েকটী জানা নাই বটে, কিন্তু ঐ কথাকয়েকটী সর্ব্বতোভাবে সত্য। হাওয়ার তেজের তুলনায় রসের আধিক্য হইলে হাওয়া যে অতিরিক্ত শীতল হয় এবং রসের তুলনায় তেজাধিক্য হইলে হাওয়া যে অতিরিক্ত গরম হয়, হাওয়া অতিরিক্ত গরম অথবা শীতল হইলে উহা যে অস্বাস্থ্যকর ও অপ্রীতিকর হয়, হাওয়া অস্বাস্থ্যকর ও অপ্রীতিকর হইলে কোন কৃত্রিম উপায়ে যে মানুষের শরীরের ও মনের স্বাস্থ্য অথবা ঈপ্সিত গুণ ও শক্তি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা ও বৃদ্ধি করা সম্ভবযোগ্য হয় না, তাহা যে কেহ নিজ নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুমান করিতে পারেন। জমির মধ্যে রসের তুলনায় তেজাধিক্য ঘটিলে যে জমির প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহা মরুভূমির অবস্থা হইতে এবং তেজের তুলনায় রসাধিক্য ঘটিলে যে জমির প্রাকৃতিক উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তাহা জলাজমির অবস্থা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়। জমির প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে যে মানুষের সর্ব্ববিধ ঈপ্সিত দ্রব্য ঐ জমি হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না, তাহাও মরুভূমির এবং জলাভূমির অবস্থা হইতে অনুমান করা যায়। জমির প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে ঐ জমি হইতে কৃত্রিম উপায়ে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয়—সেই সমস্ত দ্রব্যের কোনটী যে মানুষের স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না, পরন্তু প্রত্যেকটী যে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তাহা আজকালকার বিজ্ঞান হইতে মানুষ যে সমস্ত সংস্কার লাভ করিয়াছে, সেই সমস্ত সংস্কারের ফলে বুঝিতে অক্ষম হইয়াছে। উহা এক্ষণে মানুষের বুঝা অসাধ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু এই ভারতবর্ষে চল্লিশ বৎসর আগে যে সমস্ত খাদ্য-

শস্য বৈজ্ঞানিক কোন উপায়ের বিনা সাহায্যে উৎপন্ন হইত সেই সমস্ত খাদ্যশস্য হইতে উৎপন্ন খাদ্যসমূহের স্বাদের সহিত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপন্ন খাদ্যশস্য হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন খাদ্যের স্বাদ তুলনা করিলে উহা অল্পাধিকভাবে বুঝা সম্ভবযোগ্য হয়।

জলের মধ্যে তেজের তুলনায় রসের আধিক্য ঘটিলে অথবা রসের তুলনায় তেজের আধিক্য ঘটিলে যে জলের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহা কতিপয় শ্রেণীর ডোবার ও কতিপয় শ্রেণীর নলকূপের জল সেচন করিয়া জমিকে কৃষিযোগ্য করিবার চেষ্টা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

কোন একটী স্থানের একটী অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের ঈপ্সিত সর্ব্ববিধ দ্রব্য, গুণ ও শক্তির প্রাচুর্য্য সাধন করিতে হইলে ঐ স্থানের জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা যাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা যে অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, তাহা বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইতে পারে। জমি, জল ও হাওয়ার এবং তাহাদের উৎপাদিকা শক্তির প্রাকৃতিক উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধে যে সমস্ত কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই সমস্ত কথায় উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখান হইয়াছে। আমরা ঐ সমস্ত কথার পুনরুল্লেখ করিতে চাই না।

জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা যাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা যে, যে কোন মানুষের অভিলষিত ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তির প্রাচুর্য্য সাধন করিবার ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় তাহা স্বীকার করিয়া লইলেই ইহা দেখা যায় যে, কোন একটী দেশের একটী অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলেই সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ—

কোন এক স্থানের জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা যাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত করিতে হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের কোন স্থানের জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা যাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। সমগ্র ভূমণ্ডলের কোনও স্থানের জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা যাহাতে ঘটিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের জমির, জলের ও হাওয়ার অধঃগুপ্ততা নিবন্ধন যে-কোন একটী স্থানের জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা হইতে অল্পাধিক পরিমাণে সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র জমি-ভাগের, সমগ্র জল-ভাগের এবং সমগ্র হাওয়া-ভাগের তেজ ও রসের মিলিতভাবে অসমতা সংঘটিত হইতে পারে। সমগ্র ভূমণ্ডলের কোনও স্থানের জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা যাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত করিতে হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, যে দেশের যে মানুষের ঐ ব্যবস্থা সাধিত না হয়, সেই দেশের পক্ষে এবং সেই মানুষের পক্ষে কোন না কোন একটী স্থানের জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয়।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত হইলেই যে সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক স্থানের জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতার আশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হয়, তাহা নহে। ঐ আশঙ্কা সর্ব্বতো-ভাবে যদিও নিবারিত হয় না, তথাপি কোন একটী দেশের কোন একটী অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলেই সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। নতুবা, কোন ক্রমেই সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র জমি, জল ও হাওয়া-ভাগের অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতার আশঙ্কা নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

কেহ কেহ মনে করেন যে জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা প্রাকৃতিক কারণে ঘটিয়া থাকে এবং ঐ অসমতা নিবারণ করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত নহে। এই মতবাদ সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে। জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা প্রাকৃতিক কারণে ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ অসমতা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কারণেই ঘটে না। উহা যেমন প্রাকৃতিক কারণে ঘটিয়া থাকে সেইরূপ আবার মানুষের কৃত কার্য্যে ঘটিতে পারে ও ঘটিয়া থাকে। প্রাকৃতিক কারণে জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা যখন ঘটে তখন প্রকৃতির কার্য্যেই আবার স্বতঃই ঐ তেজ ও রস সমতাবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের কৃত কোন কার্য্য বশতঃ তেজ ও

রসের অসমতা ঘটিতে থাকিলে ঐ অসমতা স্বতঃই দূর হয় না। উহা দূর করিতে হইলে উহা দূর করিবার পন্থা মানুষের জানিবার প্রয়োজন হয় এবং ঐ পন্থানুসারে মানুষের কার্য্য করিতে হয়। উহা দূর করিবার জন্ম মানুষের ব্যবস্থা সাধিত না হইলে উহা দূর করা সম্ভব হয় না। প্রাকৃতিক কারণে জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের যে অসমতা ঘটে সেই অসমতা প্রাকৃতিক কার্য্যের নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। উহা যখন তখন ঘটিতে পারে না এবং ঘটে না। উহা নিবারণ করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত নহে। তেজ ও রসের ঐ অসমতা আবার স্বতঃই প্রাকৃতিক নিয়মে সমতাপন্ন হয় বলিয়া উহা নিবারণ করিবার জন্ম মানুষের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রাকৃতিক কারণে জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রস যে অসমতা নিয়মিতরূপে ঘটিয়া থাকে সেই অসমতার ফলে জমি, জল ও হাওয়ার উৎপাদিকা ও স্বাস্থ্য-প্রদায়িকা শক্তি কথঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহা হয় বটে—কিন্তু উৎপাদিকা ও স্বাস্থ্যপ্রদায়িকা শক্তির ঐ হ্রস্বতা পূরণ করা সর্ব্বতোভাবে মানুষের সাধ্যান্তর্গত। ঐ হ্রস্বতা যাহাতে পূরণ করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত এবং মানুষের ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে উহা সমগ্র ভূ-মণ্ডলের জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতার আশঙ্কা নিবারণ না করিতে পারিলে যেমন কোন এক অথবা একাধিক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভবযোগ্য হয় না, সেইরূপ সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে কোন এক অথবা একাধিক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, মানুষের মধ্যে কাহারও কাহারও কতিপয়সংখ্যক অভাবের বিদ্যমানতা অনিবার্য্য হয়। যাহারা অভাবগ্রস্ত তাহারা অভাবশূন্য মানুষগণকে হয় প্রতারণা করিয়া, নতুবা লুণ্ঠন করিয়া, নতুবা চৌর্য্যবৃত্তি গ্রহণ করিয়া, হয় অভাবগ্রস্ত নতুবা অশান্তিগ্রস্ত করিয়া থাকেন। এই কারণে কতিপয়সংখ্যক মানুষের অভাবগ্রস্ততা বশতঃ অভাবশূন্য মানুষগণও পুনরায় অভাবগ্রস্ত ও অশান্তিগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

কোন এক দেশের একটী অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে যে সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহার কারণ সম্বন্ধে যে-সমস্ত কথা বলা হইল সেই সমস্ত কথা হইতে দেখা যায় যে, উহার কারণ দুই শ্রেণীর; যথা :

(১) জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতার আশঙ্কা নিবারণ করিবার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা ;

(২) অভাবগ্রস্ত মানুষের প্রতারণা-প্রবৃত্তি, চৌর্য্যপ্রবৃত্তি ও লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি নিবারণ করিবার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কারণ ছাড়া আরও একাধিক শ্রেণীর কারণ বশতঃ সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে কোন এক দেশের কোন একটী অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে যে অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, সেই সেই অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মূল নীতিসূত্র কি কি তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে না পারিলে উপরোক্ত কারণসমূহ বুঝা যায় না। কাযেই অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলসূত্রের কথা না বলিয়া আমরা ঐ সমস্ত কারণের কথা আলোচনা করিতে পারি না। পাঠকগণকে শুধু এইটুকু জানিয়া রাখিতে হয় যে, কোন মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে উহা কেবলমাত্র কোন একজন মানুষের চেষ্টায় সাধিত হইতে পারে না। উহার জন্ম সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের চেষ্টা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। মানুষের সমাজের মধ্যে কোথায়ও দ্বেষ-হিংসা থাকিলে মানুষের সর্ব্বতোভাবের কোন শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধতা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের কোন সঙ্ঘবদ্ধতা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে একদিকে যেরূপ মানুষের দ্বেষ-হিংসা-প্রবৃত্তির সর্ব্বতোভাবে সংযত করিবার প্রয়োজন হয় সেইরূপ আবার স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রত্যেক মানুষ যাহাতে সঙ্ঘের জন্ম কার্য্য করে তাহার প্রবৃত্তি অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হয়। উভয়তঃই কাহারও সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, নতুবা যাঁহারা ঐ ব্যবস্থার বাহিরে থাকেন তাঁহাদিগের রাগ, দ্বেষ ও হিংসা-প্রবৃত্তি অনিবার্য্য হয় এবং মানুষের সঙ্ঘবদ্ধতা অসম্ভব হয়।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার অভাবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম

যাঁহারা মনে করেন যে, সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা না হইলেও একরকম ভাবে জীবন কাটাইয়া দেওয়া সম্ভবযোগ্য, তাঁহাদিগকে মনুষ্যত্বরূপে পশুর প্রবৃত্তিযুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। সমগ্র মনুষ্য-

সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা মনুষ্য-সমাজে অবিদ্যমান থাকিলে, মানুষের অবস্থা পশুপক্ষীর অবস্থা অপেক্ষাও হীন হয়। আমাদিগের এই কথার সত্যতা সর্ব্বশ্রেণীর মানুষ সর্ব্বসময়ে বুঝিতে সক্ষম হয় না বটে, কিন্তু ঐ কথা যে সত্য তাহা বর্ত্তমান সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী যুদ্ধকালীন মানুষের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার অভাব থাকিলে, কোন দেশের কোন মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া সম্ভবযোগ্য ও সুনিশ্চিত না হইলে, কোন না কোন শ্রেণীর অভাব অনিবার্য্য হইয়া থাকে। মানুষের কোন না কোন শ্রেণীর অভাবের উৎপত্তি হইলে, মানুষের পরস্পরের মধ্যে অযৌক্তিক অনুরাগ ও দ্বেষ অনিবার্য্য হয়। অযৌক্তিক অনুরাগ ও দ্বেষ অনিবার্য্য হইলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে একদিকে হিংসা ও মতানৈক্য এবং অন্যদিকে উত্তেজনা—বিষাদ, শ্রম—আলস্য অনিবার্য্য হয়।

উত্তেজনা—বিষাদ অনিবার্য্য হইলে ক্রমে ক্রমে দ্বন্দ্ব-কলহ, মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ অনিবার্য্য হয়। শ্রম—আলস্য অনিবার্য্য হইলে সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে অনাহার, অর্দ্ধাহার, ব্যাধি-গ্রস্ততা, ভয়সঙ্কুলতা, অশান্তি ও অকালমৃত্যু অপরিহার্য্য হইয়া থাকে।

সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিলেই যে কার্য্যতঃ প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা পূরণ হয়, তাহা নহে। তখনও যাঁহারা অভ্যাসের ও শিক্ষার দুষ্টতাবশতঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে অল্পাধিকভাবে অভাবগ্রস্ত হইতে হয়।

সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার অভাব হইলে মানুষের অভাবগ্রস্ততার ব্যাপকতা ও তীব্রতা যত অধিক হয় ঐ ব্যবস্থার অভাব না হইলে মানুষের অভাব-গ্রস্ততার ব্যাপকতা ও তীব্রতা তত অধিক কখনও হইতে পারে না। ঐ ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান থাকিলে প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষই সর্ব্ব শ্রেণীর অভিলষিত দ্রব্য, গুণ ও শক্তির অভাবশূন্য হইয়া থাকেন।

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম—

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতো-ভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে যে সমস্ত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয় তাহা মুখ্যতঃ সাত শ্রেণীর, যথা :

(১) কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ;

(২) সমগ্র ভূমণ্ডলকে কতকগুলি দেশে, প্রত্যেক দেশকে কতকগুলি রাষ্ট্রীয় গ্রামে, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামকে কতক-গুলি সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামে, প্রত্যেক সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামকে কতকগুলি সামাজিক গ্রামে বিভাগ করিবার অনুষ্ঠান ;

(৩) সমগ্র ভূমণ্ডলের সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্যপরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় "কার্য্যপরিচালনা-সভার", প্রত্যেক দেশের কার্য্যপরি-চালনার জন্য "দেশস্থ কার্য্যপরিচলনা-সভার", প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামের কার্য্যপরিচালনার জন্য "রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার" এবং প্রত্যেক সামাজিক কার্য্যপরি-চালনার গ্রামের কার্য্যপরিচালনার জন্য "সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার গ্রামস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার" প্রতিষ্ঠান;

(৪) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কার্য্যসমূহ নয়টী কার্য্য-বিভাগে* প্রত্যেক দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কার্য্য-সমূহ নয়টী কার্য্যবিভাগে* প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কার্য্যসমূহ নয়টী কার্য্যবিভাগে* এবং প্রত্যেক সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার কার্য্যসমূহ ছয়টী কার্য্য বিভাগে* বিভক্ত করিবার অনুষ্ঠান।

---

* কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার, প্রত্যেক দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্য-বিভাগের নাম :

(১) বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;
(২) বিধি-নিষেধ প্রণয়ন-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;
(৩) সীমানা রক্ষা-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;
(৪) বিচার-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;
(৫) কোষ-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;
(৬) নিয়োগ ও নির্ব্বাচন-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;
(৭) জনসাধারণের সাধারণ শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;
(৮) জনসাধারণের ও কর্ম্মিগণের কর্ম্মশিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;
(৯) জনসাধারণের ধনপ্রাচুর্য্য সাধনবিষয়ক কার্য্যবিভাগ।

একই রকমের লেন-দেনের জন্য তিন শ্রেণীর (অর্থাৎ কেন্দ্রীয়, দেশস্থ এবং রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ) কার্য্যপরিচালনা-সভার নয় শ্রেণীর কার্য্যবিভাগ গঠিত হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার প্রত্যেক বিভাগীয় দায়িত্ব বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ "কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টন" শীর্ষক আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার ছয়টী কার্য্য-বিভাগের নাম :

(১) বিচারবিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;

(৫) প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে ঐ গ্রামস্থ প্রত্যেক অধিবাসীর যুগপৎ যাহাতে ধনাভাব নিবারিত অথবা দূরীভূত হইয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধিত হয়, পশুত্ব নিবারিত অথবা দূরীভূত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধিত হয় এবং অলস ও বেকার জীবন নিবারিত অথবা দূরীভূত হইয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধিত হয়—তাহা করিবার উদ্দেশ্যে তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান ;

(৬) প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের অষ্টাদশ বৎসর বয়সের উর্দ্ধবয়স্ক পুরুষগণকে চারি শ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মীতে বিভক্ত করিয়া প্রথম শ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মিগণের হস্তে পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার এবং অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার ; এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মিগণের হস্তে ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার দায়িত্বভার অর্পণ করিবার অনুষ্ঠান ;

(৭) মুখ্যতঃ যাহাতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মিগণের এবং চারিশ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণের অথবা চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মিগণের কেহ যথেচ্ছাচারী না হইতে পারেন এবং গৌণতঃ যাহাতে জনসাধারণের প্রত্যেকে চারিশ্রেণীর কার্য্য-পরিচালনা-সভার প্রত্যেক নির্দ্দেশ (অর্থাৎ বিধি-নিষেধ) স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পালন করেন এবং তজ্জন্ত কাহাকেও প্রত্যক্ষতঃ অথবা পরোক্ষতঃ কোন রকমের ভয় দেখাইবার প্রয়োজন না হয়, তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক কার্য্য-পরিচালনা-সভার সংশ্রবে জনসাধারণের প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া এক একটি করিয়া জনসভার প্রতিষ্ঠান।

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতো-ভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় যে সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হইল, সেই সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার মুখ্যানুষ্ঠান—প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান। ঐ তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান যাহাতে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে স্বতঃই সাধিত হয় এবং ঐ তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটীর সর্ব্ববিধ উদ্দেশ্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় তদ্বিষয়ে সুনিশ্চিত হইবার জন্ত আর ছয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হয়।

(২) কোষবিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;

(৩) নিয়োগ ও নির্ব্বাচন-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;

(৪) জনসাধারণের সাধারণ শিক্ষা ও সাধনাবিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;

(৫) জনসাধারণের ও কর্ম্মিগণের কর্ম্মশিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;

(৬) জনসাধারণের ধনপ্রাচুর্য্য সাধন-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ।

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলনীতিসূত্রের পূর্ব্বাংশ

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতো-ভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থায় যে-সমস্ত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সাধন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মূল নীতিসূত্র কি কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার মূল সঙ্কেত কি কি—তাহা সর্ব্বাগ্রে নির্দ্ধারণ করিতে হয়। সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার মূল সঙ্কেত কি কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মানুষের ইচ্ছা ও অভাব মূলতঃ কয় শ্রেণীর—তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

আগেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা মূলতঃ তিন শ্রেণীর ; যথা—(১) দ্রব্যার্থক ইচ্ছা, (২) গুণার্থক ইচ্ছা ও (৩) শক্ত্যর্থক ইচ্ছা। মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা যেরূপ তিন শ্রেণীর, সেইরূপ মানুষের যে সমস্ত রকমের অভাব হইতে পারে ও হয়, সেই সমস্ত রকমের অভাবও মূলতঃ তিন শ্রেণীর ; যথা : (১) দ্রব্যমূলক অভাব (২) গুণমূলক অভাব ও (৩) শক্তিমূলক অভাব। মানুষের ইচ্ছা অথবা অভাব যে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর অতিরিক্ত হইতে পারে না তদ্বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারা যায়।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সঙ্কেত কি কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার আদৌ প্রয়োজন হয় কেন, তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার আদৌ প্রয়োজন হয় কেন, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমরা এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভে "মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছি। ঐ আলোচনায়

আমরা বলিয়াছি যে, "মানুষের যাহাতে কোন রকমের অভাবের উদ্ভব না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার পরিকল্পনা মনুষ্যসমাজে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়।"

মানুষের বাস্তবজীবন লক্ষ্য করিলে ইহা মনে করিতে হয় যে, মানুষের যদ্যপি কোন রকমের অভাবের উদ্ভব না হইত, তাহা হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার কোন পরিকল্পনার আদৌ কোন প্রয়োজন হইত না। মানুষের জন্ম, পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু যেরূপ প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ স্বতঃই হইয়া থাকে, সেইরূপ যদি প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ স্বতঃই কোন রকমের অভাবের উদ্ভব না হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা স্বতঃই সর্ব্বতোভাবে পূরণ হইত, তাহা হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার কোন পরিকল্পনার আদৌ কোন প্রয়োজন হইত না।

কাযেই ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মানুষের নানাবিধ অভাব স্বতঃই উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং অভাবই মানুষের দুঃখের কারণ হয় বলিয়া, মানুষের যাহাতে কোন রকমের অভাবের উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় এবং ঐ ব্যবস্থারই অপর নাম "মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা"।

উপরোক্ত কথা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। উহা বুঝা যায় বটে কিন্তু স্বতঃই মানুষের অভাবসমূহের উৎপত্তি হয় কেন তাহা পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সঙ্কেত কি কি হওয়া উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না।

স্বতঃই মানুষের অভাবসমূহের উৎপত্তি হয় কেন তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে স্বতঃই মানুষের ইচ্ছাসমূহের উৎপত্তি হয় কেন তাহা নির্দ্ধারণ করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়। ইহার কারণ—স্বতঃই মানুষের অভাবসমূহের উৎপত্তি হয় কেন তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে কোন্ কোন্ কারণে স্বতঃই মানুষের ইচ্ছাসমূহের অপূরণ হওয়া সম্ভব হয় তাহা জানা আবশ্যকীয় হয় এবং ইচ্ছাসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা জানা না থাকিলে স্বতঃই ইচ্ছাসমূহের অপূরণ হওয়া সম্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা জানা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের ইচ্ছাসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে মানুষের অভাবসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়। মানুষের ইচ্ছাসমূহের ও অভাবসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সঙ্কেত কি কি হওয়া উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়। মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সঙ্কেত কি কি হওয়া উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রয়োজনীয় সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠানের নীতিসূত্র কি কি হওয়া উচিত, তাহাও নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্দ্ধারণ করা যায়।

স্বতঃই মানুষের ইচ্ছাসমূহের উৎপত্তি হয় কেন, তাহার সম্পূর্ণ তত্ত্ব সংস্কৃত ভাষায় লিখিত চারিটী বেদ ছাড়া আর কোন ভাষায় লিখিত আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত চারিটী বেদ ছাড়া আর কোন ভাষায় লিখিত আর কোন গ্রন্থে ঐ তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু যখন যে ইচ্ছার উৎপত্তি হয়, সেই ইচ্ছা মনের মধ্যে কিরূপভাবে কার্য্য করে, তাহা যদ্যপি মানুষ উপলব্ধি করিতে অভ্যাস করে, তাহা হইলে উপরোক্ত উপলব্ধির অভ্যাসদ্বারা ঐ তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয়। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত চারিটী বেদের সংস্কৃত ভাষা যে-পদ্ধতিতে পড়িতে হয় ও বুঝিতে হয় সেই পদ্ধতির সহিত এখন আর কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পরিচিত নহেন। মানুষের ইচ্ছা মানুষের মনের মধ্যে যে যে ভাবে কার্য্য করে সেই সেই ভাব সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে যে যে সঙ্কেতের প্রয়োজন হয়, সেই সেই সঙ্কেতের সহিতও এখন আর কোন মানুষ সর্ব্বতোভাবে পরিচিত নহে। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর পরিচয়ের অভাববশতঃ মানুষের ইচ্ছাসমূহের স্বতঃই উদ্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্দ্ধারণ করা আধুনিক কালের কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না। উহা সম্ভবযোগ্য হয় না বটে, কিন্তু মানুষের ইচ্ছাসমূহ স্বতঃই উদ্ভূত হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে, মানুষের অভাবসমূহের স্বতঃই উদ্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। মানুষের অভাবসমূহের স্বতঃই উদ্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সঙ্কেত নির্দ্ধারণ করা যায় না। মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সঙ্কেত নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে যে সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সাধন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠানের মূল নীতি-সূত্র নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

মোট কথা, মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে যে সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান

সাধন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠানের মূল-নীতি-সূত্র কি কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মানুষের ইচ্ছাসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

মানুষের ইচ্ছাসমূহের ও বিবিধ শ্রেণীর অভাবের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তৎসম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের যখন অভাব হয়, তখন তাহার ব্যাখ্যা করিবার অন্যতম উপায়—মানুষের ও অন্যান্য যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয়, সেই সমস্ত পদার্থের উপাদানের ও উপাদানের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্য, গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের ব্যাখ্যা করা। ইহার কারণ, মানুষের উপাদানে যদ্যপি তাহার ইচ্ছাসমূহের বীজ বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে তাহার কোন শ্রেণীর ইচ্ছার উৎপত্তি হইতে পারে না এবং ঐ কারণে উপাদানসমূহের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব স্বতঃই সাধিত হয় কোন্ কোন্ নিয়মে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে ইচ্ছাসমূহের উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। আমরা অতঃপর মানুষের ও অন্যান্য প্রকৃতিজাত পদার্থের উপাদানের ও উপাদানের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্য, গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কয়েকটী উল্লেখ-যোগ্য কথা পাঠকগণকে শুনাইব।

মানুষের ও অন্যান্য প্রকৃতিজাত পদার্থের উপাদান ও তদন্তর্ভুক্ত দ্রব্য, গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের কয়েকটী উল্লেখযোগ্য কথা

মানুষের ইচ্ছাসমূহের সহিত মানুষের অবয়ব অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। মানুষের অবয়ব যদি বিদ্যমান না থাকিত তাহা হইলে মানুষের কোন বিষয়ে কোন ইচ্ছা করা সম্ভব-যোগ্য হইত না। মানুষের অবয়বের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইচ্ছাসমূহেরও পরিবর্ত্তন স্বতঃসিদ্ধ হয়। বালকের ইচ্ছা আর যুবকের ইচ্ছা, এই দুইএর মধ্যে যে সমস্ত পার্থক্য দেখা যায় তাহার মৌলিক কারণ বালকের অবয়ব আর যুবকের অবয়বের পার্থক্য। অবয়বের পার্থক্যানুসারে ইচ্ছা-সমূহের পার্থক্য স্বতঃসিদ্ধ হয় বলিয়া ইচ্ছাসমূহের উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মানুষের অবয়বের মূল উপাদান কি কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়। মানুষের অবয়বের মূল উপাদান তিন শ্রেণীর, যথা :—

(১) দ্রব্যগত উপাদান, (২) গুণগত উপাদান এবং (৩) শক্তিগত উপাদান। এই তিন শ্রেণীর উপাদানের প্রত্যেকটী আবার পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। পাঁচ শ্রেণীর দ্রব্যগত উপাদানের নাম—(১) স্থূল দ্রব্যগত উপাদান, (২) তরল দ্রব্যগত উপাদান, (৩) বাষ্পীয় দ্রব্যগত উপাদান, (৪) বায়বীয় দ্রব্যগত উপাদান এবং (৫) ব্যোমীয় দ্রব্যগত উপাদান। পাঁচ শ্রেণীর গুণগত উপাদানের এবং শক্তিগত উপাদানের নাম ও দ্রব্যগত উপাদানসমূহের নামের অনুরূপ হইয়া থাকে। যথা—স্থূল দ্রব্যগত গুণ, তরল দ্রব্যগত গুণ, স্থূল দ্রব্যগত শক্তি, তরল দ্রব্যগত শক্তি—ইত্যাদি।

মানুষের অবয়ব তাহার গুণ ও শক্তির সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত বলিয়া মানুষের নানা রকম পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। কোন রকম পদার্থ (অর্থাৎ দ্রব্য অথবা গুণ অথবা শক্তি) লাভ করিবার প্রবৃত্তির নাম ইচ্ছা। সংক্ষেপতঃ মানুষের ইচ্ছাসমূহের উৎপত্তির কারণ মানুষের অবয়বস্থ গুণ ও শক্তি। মানুষের অবয়বে যদ্যপি গুণ ও শক্তি না থাকিত তাহা হইলে মানুষের কোন কাম অথবা ইচ্ছার উৎপত্তি হইতে পারিত না, এবং মানুষ নিষ্কাম অথবা কামনাশূন্য হইতে পারিত। কিন্তু গুণ ও শক্তিশূন্য মানুষ হইতে পারে না। তাহার কারণ দ্রব্য, গুণ ও শক্তি ছাড়া কোন প্রাকৃতিক অবয়ব হইতে পারে না। যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় এবং যে সমস্ত পদার্থ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার সাধন করিবার শক্তিযুক্ত, সেই সমস্ত পদার্থের অবয়বের গুণ ও শক্তির বিদ্যমানতা বশতঃ স্বতঃই তাহাদিগের নানা রকম পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব স্বতঃই সাধিত হয় না, পরন্তু কোন না কোন মানুষের নৈপুণ্য বশতঃ সর্ব্বতোভাবে মানুষের দ্বারা সাধিত হয় এবং যাহাদিগকে চলতি ভাষায় কৃত্রিম অথবা মৃত পদার্থ বলা হয়, সেই সমস্ত পদার্থের কোন প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় না এবং তাহাদের কোন প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় না বলিয়া তাহাদিগের কোন ইচ্ছারও উদ্ভব হয় না। ঐ সমস্ত কৃত্রিম পদার্থের যে কোন প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় না—তাহার কারণ ঐ সমস্ত পদার্থের নানাবিধ গুণ থাকে বটে কিন্তু তাহাদিগের স্বতঃই কোন নিজস্ব শক্তির উদ্ভব হয় না। যখন মানুষ ঐ কৃত্রিম পদার্থ-সমূহের মধ্যে শক্তি সঞ্চারণ করে কেবলমাত্র তখনই উহাদের শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। মানুষ যত পরিমাণের শক্তি কৃত্রিম পদার্থে সঞ্চারিত করে, কেবলমাত্র তত পরিমাণের শক্তিই কৃত্রিম পদার্থের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে এবং তাহার একটুও বেশী শক্তি কোন কৃত্রিম পদার্থের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে না।

যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় এবং যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইলে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার সাধন করিবার শক্তিযুক্ত হইয়া থাকে, কেবল মাত্র সেই সমস্ত পদার্থের স্বতঃই অন্যান্য রকম পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় কিন্তু যাহারা কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার

করিবার শক্তিযুক্ত হয় না, তাহাদিগের নানারকমের শক্তির উদ্ভব স্বতঃই হইয়া থাকে বটে কিন্তু তাহাদিগেরও অন্য কোন পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় না।

যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় তাহাদিগের স্বতঃই নানা রকমের শক্তির উদ্ভব হইবার কারণ এই যে, যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় সেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি হয়—সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের পাঁচ শ্রেণীর অবস্থার (constant, non-variable, variable, aerial and gaseous condition of all pervading mixture of heat and moisture-এর) কার্য্য (work) বশতঃ। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণে উপরোক্ত পাঁচশ্রেণীর অবস্থার কার্য্য এই ভূমণ্ডলে স্বতঃই চলিতে থাকে বলিয়া এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় সেই সমস্ত পদার্থের শক্তিও স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণে উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর অবস্থার কার্য্য যত শ্রেণীর হইয়া থাকে, মানুষের কার্য্য কখনও তত শ্রেণীর হইতে পারে না এবং সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের পাঁচ শ্রেণীর অবস্থার কার্য্য যেরূপ স্বতঃই চলিতে থাকে মানুষের কোন কার্য্য সেরূপ স্বতঃই চলিতে পারে না বলিয়া মানুষ যে সমস্ত কৃত্রিম পদার্থের উৎপাদন করে সেই সমস্ত কৃত্রিম পদার্থের কোনটার কোন শক্তি স্বতঃই উদ্ভব অথবা সঞ্চারিত হইতে পারে না।

এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় তাহাদিগের প্রত্যেকটার গুণ এবং শক্তির উদ্ভবও স্বতঃই সাধিত হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব সর্ব্বশ্রেণীর প্রাকৃতিক পদার্থের হয় না। অন্যান্য পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় কেবলমাত্র সেই শ্রেণীর প্রাকৃতিক পদার্থের, যে শ্রেণীর প্রাকৃতিক পদার্থের প্রকৃতির নিয়ম ব্যভিচার করিবার শক্তির উদ্ভব হয়।

পদার্থের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধে উপরে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত কথা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত কৃত্রিম ও প্রকৃতি-জাত পদার্থ দেখা যায়, তাহার প্রত্যেকটীরই গুণ বিদ্যমান থাকে কিন্তু প্রত্যেকটিরই স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে না। কৃত্রিম পদার্থের প্রত্যেকটিরই গুণ বিদ্যমান থাকে কিন্তু কোনটীরই স্বভাবজাত শক্তি অথবা প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকিতে পারে না ও থাকে না। স্বভাবজাত শক্তি অথবা প্রবৃত্তি বিদ্যমান না থাকিলে অন্যান্য পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তিও (অর্থাৎ ইচ্ছাও) কোনরূপে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। এই কারণে কোন শ্রেণীর কৃত্রিম পদার্থের কোনরূপ স্বাধীন ইচ্ছা থাকিতে পারে না ও থাকে না।

প্রকৃতিজাত প্রত্যেক পদার্থেরই স্বাভাবিক শক্তি থাকে বটে কিন্তু অন্যান্য পদার্থ লাভ করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সর্ব্বশ্রেণীর প্রাকৃতিক পদার্থের থাকে না। যে শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থ স্বতঃই প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তিযুক্ত হয়, কেবলমাত্র সেই সমস্ত পদার্থের অন্যান্য পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির (অর্থাৎ ইচ্ছার) উদ্ভব হয়। যে সমস্ত প্রকৃতিজাত পদার্থের প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তির উদ্ভব হয়, কেবলমাত্র সেই সমস্ত প্রকৃতিজাত পদার্থের স্বতঃই প্রবৃত্তিসমূহের উদ্ভব হয় এবং কেবলমাত্র তাহারাই অন্যান্য পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত (অর্থাৎ ইচ্ছাযুক্ত) হইয়া থাকে।

এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত পদার্থ দেখা যায়, সেই সমস্ত পদার্থের মধ্যে যাহারা চরণ-শক্তিযুক্ত এবং যাহাদিগকে চলতি ভাষায় চরজীব বলা হয়, কেবলমাত্র তাহারা প্রকৃতির নিয়ম-সমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। এই হিসাবে প্রকৃতিজাত পদার্থসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র চরজীবগণের স্বতঃই নানাবিধ পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় এবং কেবলমাত্র তাহারাই স্বতঃই অন্যান্য পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত (অর্থাৎ ইচ্ছাযুক্ত) হইয়া থাকে।

চরজীবগণ যে স্বতঃই প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তিযুক্ত হইয়া থাকে তাহার কারণ—তাহাদিগের অবয়বস্থ পাঁচ শ্রেণীর দ্রব্যগত উপাদানের মধ্যে ব্যোমীয়, তরল ও স্থূল দ্রব্যগত উপাদানের গুণ ও শক্তির তুলনায় বায়বীয় ও বাষ্পীয় দ্রব্যগত উপাদানের গুণ ও শক্তির আধিক্য। ঐ আধিক্য বশতঃ চর জীবগণের চরণ-শক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে এবং ঐ আধিক্য বশতঃই তাহারা প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তিযুক্ত এবং নানাবিধ পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত (অর্থাৎ ইচ্ছা করিবার প্রবৃত্তির সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত) হইয়া থাকে।

চরজীবগণের ভিতর মানুষের অবয়বস্থ ব্যোমীয়, তরল ও স্থূল উপাদানসমূহের গুণ ও শক্তির তুলনায় বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানসমূহের গুণ ও শক্তি যত অধিক, অন্যান্য চরজীবের অবয়বস্থ ব্যোমীয়, তরল ও স্থূল উপাদানসমূহের গুণ ও শক্তির তুলনায় বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানসমূহের গুণ ও শক্তি তত অধিক হয় না। এই কারণে প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তি মানুষের যত অধিক হইতে পারে, অন্যান্য কোন শ্রেণীর চরজীবের ঐ শক্তি তত অধিক হইতে পারে না। মানুষ ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর চরজীবের প্রকৃতির নিয়ম-সমূহের ব্যভিচার করিবার প্রাকৃতিক শক্তিবশতঃ চরণ-শক্তির এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ পদার্থ লাভ করিবার

প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু যে সমস্ত পদার্থ স্ব স্ব অবয়বের স্বাস্থ্য অথবা তৃপ্তি সাধনের বিরুদ্ধ, সেই সমস্ত পদার্থ লাভ করিবার কোন প্রবৃত্তি মানুষ ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর চরজীবের স্বতঃই কখনও উদ্ভব হয় না। যে সমস্ত পদার্থ স্ব স্ব অবয়বের স্বাস্থ্য এবং তৃপ্তি সাধনে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম—মানুষ ছাড়া অন্যান্য চরজীবের কেবলমাত্র সেই সমস্ত পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির স্বতঃই উদ্ভব হইয়া থাকে। যে সমস্ত পদার্থ স্ব স্ব অবয়বের স্বাস্থ্য এবং তৃপ্তি সাধনে সর্ব্বতোভাবে অক্ষম, সেই সমস্ত পদার্থ লাভ করিবার ও ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি একমাত্র মানুষের স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে। যে সমস্ত পদার্থ (অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও শক্তি) স্ব স্ব অবয়বের স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে সাধনে অক্ষম, কেবল মাত্র আংশিকভাবে তৃপ্তি সাধনের জন্য সেই সমস্ত পদার্থ লাভ করিবার ও ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি, আবার, যে সমস্ত পদার্থ স্ব স্ব অবয়বের সর্ব্বতোভাবের তৃপ্তি সাধনে অক্ষম, কেবলমাত্র আংশিকভাবে স্বাস্থ্য সাধনের জন্য সেই সমস্ত পদার্থ লাভ করিবার ও ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি একমাত্র মানুষের স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে।

প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার প্রাকৃতিক শক্তি বশতঃ প্রত্যেক শ্রেণীর চরজীবের চরণ-শক্তির এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির স্বতঃই উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু একমাত্র মানুষ ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর চরজীবের নিজ নিজ অবয়বে প্রকৃতির নিয়ম রক্ষা করিবার বিরুদ্ধ গুণ ও শক্তিযুক্ত (অর্থাৎ বৈকৃতিক) কোন শ্রেণীর পদার্থ (অর্থাৎ কোন শ্রেণীর দ্রব্য, গুণ ও শক্তি) লাভ করিবার অথবা উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি স্বতঃই উদ্ভূত হয় না। নিজ নিজ অবয়বে প্রকৃতির নিয়ম রক্ষা করিবার বিরুদ্ধ গুণ ও শক্তিযুক্ত (অর্থাৎ বৈকৃতিক) পদার্থসমূহ (অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও শক্তিসমূহ) লাভ করিবার অথবা উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি একমাত্র মনুষ্যজাতির স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহার কারণ মানুষের অবয়বস্থ বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানের গুণ ও শক্তির পরিমাণের তুলনায় ব্যোমীয়, তরল ও স্থূল উপাদানের গুণ ও শক্তির পরিমাণের পার্থক্য যত অধিক, অন্যান্য শ্রেণীর চরজীবের অবয়বস্থ বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানের গুণ ও শক্তির পরিমাণের তুলনায় ব্যোমীয়, তরল ও স্থূল উপাদানের গুণ ও শক্তির পরিমাণের পার্থক্য তত অধিক হয় না। উপরোক্ত আধিক্য বশতঃ প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তি মানুষের যত অধিক হইতে পারে এবং হয়, অন্যান্য শ্রেণীর চরজীবের ঐ শক্তি তত অধিক হইতে পারে না এবং হয় না।

প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তির আধিক্য বশতঃ বৈকৃতিক পদার্থসমূহ লাভ করিবার অথবা উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি যেমন একমাত্র মনুষ্য জাতির স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ উপরোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তিকে সংযত করিবার শক্তি এবং প্রবৃত্তিও ব্যভিচার করিবার শক্তির আধিক্যবশতঃ একমাত্র মনুষ্যজাতির স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে। বৈকৃতিক কোন পদার্থ লাভ করিবার অথবা উপ-ভোগ করিবার কোন প্রবৃত্তি যেমন মনুষ্য ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর চরজীবের স্বতঃই উদ্ভূত হয় না, সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তিকে সংযত করিবার শক্তি এবং প্রবৃত্তিও মনুষ্যজাতি ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর চরজীবের স্বতঃই উদ্ভূত হয় না।

বৈকৃতিক কোন পদার্থ লাভ করিবার অথবা উপভোগ করিবার কোন প্রবৃত্তি মনুষ্যজাতি ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর চরজীবের স্বতঃই উদ্ভূত হয় না বটে, কিন্তু মনুষ্যজাতি যখন প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তিকে সংযত করিবার শক্তির ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন না করিয়া বৈকৃতিক পদার্থসমূহ লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি-সমূহকে প্রশ্রয় প্রদান করে, তখন মানুষের কার্য্যবশতঃ প্রত্যেক শ্রেণীর জীবেরই বৈকৃতিক গুণ ও শক্তির উদ্ভব হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর চরজীবেরই বৈকৃতিক পদার্থসমূহ লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার প্রবৃত্তিসমূহের উদ্ভব হয়।

মানুষের ও অন্যান্য শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থের উপাদানের ও উপাদানের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্য, গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা উপরে বলা হইল, সেই সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলে মানুষের ইচ্ছাসমূহের এবং অভাব-সমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়। ঐ সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলে একদিকে যেমন মানুষের ইচ্ছাসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে—তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, সেইরূপ আবার মানুষের ইচ্ছাসমূহের শ্রেণীবিভাগের কারণ কি কি এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছার বৈশিষ্ট্য কি কি তাহাও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছার বৈশিষ্ট্য কি কি তাহা বুঝিতে পারিলে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর অভাবের উৎপত্তি হয় কেন —তাহা বুঝিতে পারা যায়।

মানুষের ইচ্ছাসমূহের যে স্বতঃই উৎপত্তি হয় তাহার মূল কারণ

মানুষের ইচ্ছা সমূহের যে স্বতঃই উৎপত্তি হয়, তাহার মূল কারণ—

মূলতঃ চারি শ্রেণীর কারণ বশতঃ মানুষের ইচ্ছাসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয়, যথা :

(১) অবয়বস্থ সাধারণ গুণ*সমূহের বিদ্যমানতা ;
(২) অবয়বস্থ সাধারণ শক্তিসমূহের বিদ্যমানতা ;
(৩) প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তিসমূহের বিদ্যমানতা। ইহার অপর নাম "ব্যভিচার-মূলক" শক্তি ;
(৪) প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তিসমূহ সংযত করিবার শক্তিসমূহের বিদ্যমানতা। ইহার অপর নাম "সংযম-মূলক" শক্তি।

অবয়বস্থ সাধারণ গুণসমূহের বিদ্যমানতা বশতঃ অবয়বস্থ সাধারণ শক্তিসমূহের উৎপত্তি হয়। অবয়বস্থ সাধারণ শক্তিসমূহের উৎপত্তি বশতঃ সাধারণ প্রবৃত্তিসমূহের উৎপত্তি হয়।

মানুষের অবয়ব মূলতঃ তিন শ্রেণীর উপাদান (যথা দ্রব্য, গুণ ও শক্তি) দ্বারা গঠিত হয় বলিয়া মানুষ মূলতঃ ঐ তিন শ্রেণীর পদার্থ লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত হইয়া থাকে। এই কারণে ইহা বলা হয় যে, মানুষের ইচ্ছা মূলতঃ তিন শ্রেণীর, যথা :

(১) দ্রব্যার্থক ইচ্ছা, (অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি) ;
(২) গুণার্থক ইচ্ছা, (অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর গুণ লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি) ;
(৩) শক্ত্যার্থক ইচ্ছা, (অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর শক্তি লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি)।

প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তি এবং ঐ ব্যভিচার করিবার শক্তিসমূহকে সংযত করিবার শক্তি মানুষের অবয়বে বিদ্যমান থাকে বলিয়া মানুষের উপরোক্ত তিন শ্রেণীর ইচ্ছার প্রত্যেকটী দুইটী করিয়া প্রত্যন্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। দ্রব্যার্থক ইচ্ছাসমূহ কখন কখন প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যভিচার প্রণোদিত হইয়া বিকৃতি সাধক দ্রব্যসমূহের লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হয়, আবার কখন কখন ঐ ব্যভিচার শক্তির সংযম সাধনে প্রণোদিত হইয়া সংযম সাধক দ্রব্যসমূহ লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হয়। গুণার্থক এবং শক্ত্যার্থক ইচ্ছাসমূহও ঐরূপ দুইটী প্রত্যন্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।

তিন শ্রেণীর ইচ্ছাই যখন ব্যভিচার সাধক হয়, তখন পরিণতি মানুষের অনিষ্টজনক হয়, আর যখন সংযমসাধক হয়, তখন পরিণতি মানুষের ইষ্টজনক হয়।

দ্রব্য-শ্রেণীর, গুণ-শ্রেণীর ও শক্তি-শ্রেণীর ছাড়া আর কোন শ্রেণীর পদার্থ সাধারণতঃ মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইতে পারে না। তাহার কারণ মানুষের অবয়বে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় ও বিদ্যমান থাকে, তাহার প্রত্যেকটী মূলতঃ হয় দ্রব্য-শ্রেণীর নতুবা গুণ-শ্রেণীর নতুবা শক্তি-শ্রেণীর। শুধু মানুষের শরীরে কেন, এই ভূমণ্ডলে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, নতুবা যাহা যাহা মানুষের কথার বিষয় হয়, তাহা মূলতঃ—হয় দ্রব্য-শ্রেণীর, নতুবা গুণ-শ্রেণীর নতুবা শক্তি-শ্রেণীর। দ্রব্য, গুণ ও শক্তি ছাড়া আর কোন পদার্থ এই ভূমণ্ডলে পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তি ও কর্ম্মকে আপাত-দৃষ্টিতে পৃথক শ্রেণীর পদার্থ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম গুণ ও শক্তিরই বিকাশ এবং তাহাদিগকে মৌলিকভাবের কোন পদার্থ বলিয়া মনে করিবার যুক্তি পাওয়া যায় না। একে মানুষের অবয়বে দ্রব্যশ্রেণীর, গুণ-শ্রেণীর ও শক্তি-শ্রেণীর পদার্থ ছাড়া আর কোন শ্রেণীর পদার্থ পাওয়া যায় না, তাহার পর এই ভূমণ্ডলে দ্রব্য, গুণ ও শক্তি শ্রেণীর বহির্ভূত কোন পদার্থ হইতে পারে না—এই দুই কারণে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, দ্রব্য, গুণ ও শক্তি ছাড়া আর কিছু মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইতে পারে না ও হয় না।

মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছা যে দুইটী প্রত্যন্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে এবং ঐ প্রত্যন্তর শ্রেণী বিভাগের মূল কারণ যে মানুষের অবয়বস্থ ব্যভিচার শক্তির ও সংযম শক্তির বিদ্যমানতা—তাহা আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। মানুষের ব্যভিচার শক্তির বিদ্যমানতা বশতঃ স্বতঃই মানুষের অভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর, সংযম শক্তির বিদ্যমানতা বশতঃ সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভবযোগ্য হয়।

মানুষের অভাবসমূহের যে স্বতঃই উৎপত্তি হয়—তাহার কারণ

মানুষের অবয়বে স্বতঃই প্রাকৃতিক নিয়মে দুইটী বিরুদ্ধ শ্রেণীর শক্তির (অর্থাৎ ব্যভিচার শক্তির ও সংযম শক্তির) উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু ঐ দুইটী বিরুদ্ধ শ্রেণীর শক্তি স্বতঃই সমান পরিমাণের হয় না। মানুষের অবয়বের ব্যোমীয়, তরল ও স্থূল উপাদানের গুণ ও শক্তির তুলনায় বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানের গুণ ও শক্তির আধিক্য বশতঃ স্বভাবতঃ মানুষের সংযম-শক্তির তুলনায় ব্যভিচার শক্তি অধিকতর প্রবল হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ সংযম-শক্তির তুলনায় ব্যভিচার শক্তি অধিকতর প্রবল হয় বটে, কিন্তু শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা ব্যভিচার শক্তির হ্রাস সাধন করা, সংযম শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা এবং ব্যভিচার শক্তির তুলনায় সংযম শক্তির প্রাবল্য সাধন করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত হইয়া থাকে। শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা ব্যভিচার

* "সাধারণ গুণ" "সাধারণ শক্তি"—যে শ্রেণীর গুণ ও যে শ্রেণীর শক্তি চর ও অচর প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের অবয়বে বিদ্যমান থাকে, সেই শ্রেণীর গুণ ও সেই শ্রেণীর শক্তিকে "সাধারণ গুণ" ও "সাধারণ শক্তি" বলা হয়।

শক্তির হ্রাস সাধন করা, সংযম শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা এবং ব্যভিচার শক্তির তুলনায় সংযম শক্তির প্রাবল্য সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু যে শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা উহা করা সুনিশ্চিত হয়, সেই শিক্ষা ও সাধনার পদ্ধতি, প্রকৃতির সর্ব্ববিধ নিয়ম সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে, নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে নির্দ্ধারণ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। স্বভাবতঃ (অর্থাৎ কোনও শ্রেণীর শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা না থাকিলে এবং শিক্ষা না পাইলে) সংযম-শক্তির তুলনায় মানুষের ব্যভিচার শক্তি যেরূপ প্রবল হইয়া থাকে, সেইরূপ যে শিক্ষা ও সাধনা মানুষের সংযম-শক্তির বর্দ্ধক না হইয়া ব্যভিচার-শক্তির বর্দ্ধক হয়, সেই শিক্ষায় এবং সাধনাতে মানুষের সংযম-শক্তির তুলনায় ব্যভিচার-শক্তি অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে শিক্ষা এবং সাধনাতে মানুষের ব্যভিচার শক্তির তুলনায় সংযম শক্তির বৃদ্ধি সাধন করা সহজসাধ্য ও সুনিশ্চিত হয়, সেই শিক্ষা ও সাধনার পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ববিধ প্রাকৃতিক নিয়ম সর্ব্বতোভাবে জানিবার প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত কথা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যখন মনুষ্য-সমাজে মানুষের সংযম-শক্তির বৃদ্ধির ও ব্যভিচার-শক্তির হ্রাসের সহায়ক শিক্ষা ও সাধনার অভাব বিস্তৃতিপ্রাপ্ত হয়, অথবা যখন ব্যভিচার-শক্তির বৃদ্ধির ও সংযম-শক্তির হ্রাসের সহায়ক শিক্ষা ও সাধনার প্রভাব বিস্তৃত হয়, তখন মানুষ স্বতঃই প্রকৃতির নিয়মের ব্যভিচার সাধন করিতে আরম্ভ করে। প্রকৃতির নিয়মের ব্যভিচার সাধিত হইতে থাকিলে সর্ব্বাগ্রে মানুষের বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর বিকৃত প্রাপ্ত হয় এবং যে সমস্ত পদার্থ (অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও শক্তি) মানুষের অপকারক, সেই সমস্ত পদার্থকে মানুষ উপকারক বলিয়া মনে করিতে থাকে ও সেই সমস্ত পদার্থ লাভ ও উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। ইহার কারণ মানুষের বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি স্বতঃই প্রকৃতির নিয়মে সাধিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির নিয়মানুগত কার্য্য অটুট ভাবে সাধিত না হইলে কোন মানুষের যথেচ্ছাচার দ্বারা মানুষের বুদ্ধির অথবা মনের অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা শরীরের উৎপত্তি অথবা উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না।

মানুষের বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে মানুষ জমি, জল ও হাওয়ার অস্তিত্ব ও পরিণতির প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার সাধন করিতে আরম্ভ করে। জমি, জল ও হাওয়ার অস্তিত্ব ও পরিণতির প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার সাধিত হইতে থাকিলে জমি, জল ও হাওয়া হইতে মানুষের স্বাস্থ্যের ও তৃপ্তির সহায়ক যে সমস্ত দ্রব্য, গুণ ও শক্তি প্রাকৃতিক নিয়মে সহজেই উৎপাদন করা অনায়াসসাধ্য হয়, সেই সমস্ত দ্রব্য, গুণ ও শক্তি উৎপাদন করা কষ্টসাধ্য হয় এবং তৎস্থলে মানুষের অস্বাস্থ্যকর ও আপাত-তৃপ্তিকর দ্রব্য, গুণ ও শক্তিসমূহ উৎপন্ন হইতে থাকে। তখন মানুষ তাহার বুদ্ধির, মনের ও ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি হেতু জমি, জল ও হাওয়ার দেওয়া দ্রব্য, গুণ ও শক্তি যে মানুষের অস্বাস্থ্যকর ও প্রকৃতপক্ষে অতৃপ্তিকর হইয়াছে তাহা বিচার করিতে এবং বুঝিতেও অক্ষম হইয়া থাকে। জমি, জল, ও হাওয়ার অস্তিত্ব ও পরিণতির প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার সাধিত হইতে থাকিলে যে মানুষের স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিকর দ্রব্য, গুণ ও শক্তিসমূহ উৎপাদন করা অসম্ভব হয়, তাহার কারণ জমি, জল ও হাওয়ার এবং তাহাদের উৎপাদন করিবার ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার গুণ ও শক্তি প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। জমি, জল ও হাওয়ার এবং তাহাদের উৎপাদন করিবার ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার গুণ ও শক্তি প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই উৎপন্ন না হইলে কোন মানুষের পক্ষে যথেচ্ছাচার দ্বারা উহাদের কোনটী উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। যাহা-যাহা মূলতঃ প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়, তাহার কোনটী প্রাকৃতিক নিয়মের কোন ব্যভিচারের দ্বারা কখনও উৎপন্ন করা অথবা রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও হয় না।

জমি, জল ও হাওয়া হইতে মানুষের স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিকর দ্রব্য, গুণ, ও শক্তিসমূহ উৎপাদন করা অসম্ভব হইলে মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর অভাব অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

উপরোক্ত কারণে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়—মানুষের অভাবের উৎপত্তি হয় মূলতঃ দুইশ্রেণীর কারণ বশতঃ, যথা :

(১) মানুষের সংযমশক্তির তুলনায় ব্যভিচারশক্তির বৃদ্ধি বশতঃ, আর—

(২) জমি, জল ও হাওয়ার এবং তাহাদের উৎপাদন করিবার ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার গুণ ও শক্তির অস্তিত্ব ও পরিণতি যে-যে প্রাকৃতিক নিয়মে সাধিত হয়, সেই-সেই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার সাধন বশতঃ।

উপরোক্ত দুইশ্রেণীর কারণের উৎপত্তি না হইলেও মনুষ্যসমাজে ব্যক্তিগতভাবের অভাব অন্যান্য কারণে উৎপন্ন হইতে পারে। ব্যক্তিগতভাবের অভাব অন্যান্য কারণে উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু ব্যাপকভাবের কোন শ্রেণীর অভাব ঐ দুইশ্রেণীর কারণের উৎপত্তি না হইলে উৎপন্ন হইতে পারে না। মূলতঃ উপরোক্ত যে দুইশ্রেণীর কারণে মনুষ্যসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর অভাব ব্যাপকভাবে উৎপন্ন হয়, সেই দুইশ্রেণীর অভাব দুইটী যমজ ভ্রাতার মত। একশ্রেণীর কারণের উৎপত্তি হইলেই স্বতঃই আর একশ্রেণীর কারণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার সঙ্কেত

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূর হয় এবং কোন শ্রেণীর অভাব যাহাতে উদ্ভূত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। সর্ব্বশ্রেণীর অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূর হয়, এবং কোনশ্রেণীর অভাব যাহাতে উদ্ভূত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে বসিলে ঐ ব্যবস্থা কখনও সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। ইহার কারণ—অভাবের আশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত না হইলে মানুষের কোন কোন ইচ্ছা পূরণ না হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়।

উপরোক্ত কারণে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে যুগপৎ চারিশ্রেণীর নীতি অবলম্বন করিতে হয়, যথা :

(১) যে-যে-শ্রেণীর কার্য্যপ্রণালীতে মানুষের অবয়বস্থ সংযম শক্তির (অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তিসমূহকে সংযত করিবার শক্তির) তুলনায় ব্যভিচার শক্তির (অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যভিচার করিবার শক্তির) বৃদ্ধি পাইতে পারে সেই-সেই শ্রেণীর কার্য্যপ্রণালীর কোনটী যাহাতে মানুষের কোন কার্য্যে কোন মানুষ অবলম্বন না করিতে পারে এবং না করে তাহার নীতি ;

(২) যে যে শ্রেণীর কার্য্য-প্রণালীতে মানুষের অবয়বস্থ ব্যভিচার-শক্তির তুলনায় সংযম-শক্তির বৃদ্ধি পাইতে পারে, সেই সেই শ্রেণীর কার্য্য-প্রণালীর প্রত্যেকটী যাহাতে মানুষের প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক মানুষ অবলম্বন করিতে পারে এবং করে তাহার নীতি ;

(৩) জমি, জল ও হাওয়ার এবং তাহাদের উৎপাদন করিবার ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার গুণের ও শক্তির অস্তিত্ব ও পরিণতি যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয়, সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়মের কোন ব্যভিচার যে যে কার্য্য-প্রণালীতে আদৌ সাধিত হইতে পারে সেই সেই কার্য্য-প্রণালীর কোনটী যাহাতে কোন মানুষ মানুষের কোন রকমের কার্য্যে অবলম্বন না করিতে পারে এবং না করে তাহার নীতি ;

(৪) জমি, জল ও হাওয়ার এবং তাহাদের উৎপাদন করিবার ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার গুণের ও শক্তির অস্তিত্ব ও পরিণতি যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রত্যেকটীর সহিত সঙ্গতি যে যে কার্য্যপ্রণালীতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইতে পারে সেই সেই কার্য্য-প্রণালীর প্রত্যেকটী যাহাতে প্রত্যেক মানুষ মানুষের প্রত্যেক রকম কার্য্যে অবলম্বন করিতে পারে এবং করে তাহার নীতি।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর নীতির নাম মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার সঙ্কেত।

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল নীতিসূত্রের উত্তরাংশ

যে চারিশ্রেণীর নীতি মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার সঙ্কেত সেই চারিশ্রেণীর নীতিই সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান-সমূহের চারিশ্রেণীর মূল নীতিসূত্র।

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতো-ভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার যে সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক হয় সেই সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-প্রণালী কি কি হওয়া উচিত এবং তাহাদের বিধি ও নিষেধ কি কি হওয়া উচিৎ তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্ম ঐ চারিশ্রেণীর নীতিসূত্র অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থায় যে সমস্ত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান রচনা করা হয় তাহাদিগের কার্য্য-প্রণালীর ও বিধিনিষেধের নীতিসূত্র সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত না হইলে প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া সন্দেহজনক হইয়া থাকে। অন্যদিকে উপরোক্ত নীতিসূত্র সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া সুনিশ্চিত হয়।

(ক্রমশঃ

দ্বাদশ বর্ষ   শ্রাবণ—১৩৫১   ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা

ইতিহাসের ইঙ্গিত

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল

Man is explicable by nothing less than all his history. —Emerson.

প্রায় ২২শ' বছর আগেকার কথা। চীনদেশের সম্রাট তখন ওয়াং চেং (খ্রীঃ পূঃ ২৪৬—খ্রীঃ পূঃ ২০৯)। তিনি চী'ন বংশের চতুর্থ সম্রাট ছিলেন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি শিহ্ হুয়াঙ্ তি নাম গ্রহণ করলেন। এ নামের অর্থ হল প্রথম সম্রাট। কিন্তু শুধু নাম গ্রহণ করেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না—কাজেও তিনি প্রথম সম্রাট বলে পরিচিত হতে সংকল্প করলেন। তিনি চাইলেন—তাঁর আগে দু'হাজার বছর ধরে যে সব সম্রাট চীনে রাজত্ব করেছেন, যে সব মনীষী তাঁদের সাধনার দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের সবার কথাই লোকে ভুলে যাক্—অতীতের স্মৃতি মানুষের মন থেকে মুছে যাক্—ইতিহাস বিলুপ্ত হোক্, তাঁর থেকেই হোক ইতিহাসের আরম্ভ। কাজেই তিনি কড়া আদেশ জারী করলেন—'যারা অতীতের দোহাই দিয়ে বর্ত্তমানকে ছোট করে দেখবে, তাদের আত্মীয়-স্বজনসুদ্ধ সবাইকে হত্যা করা হবে।'* শুধু হুকুম জারী করেই তিনি নিশ্চিন্ত রইলেন না—তা' যাতে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয় তার দিকেও তিনি প্রখর দৃষ্টি রাখলেন। ফলে সব লোকজনেরা—যে সমস্ত গ্রন্থে অতীতের কথা লেখা আছে, যাতে কনফ্যুসাস প্রমুখ মনীষীদের নীতি-দর্শনের কথা লিপিবদ্ধ আছে,—তা নির্ম্মমভাবে পুড়িয়ে ফেলতে লাগলো। রেহাই পেল কেবল চিকিৎসাশাস্ত্র আর খান কয়েক বিজ্ঞানের বই। জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রমাদ গণলেন, তাঁরা তাঁদের অমূল্য গ্রন্থরাজি মাটির নীচে লুকিয়ে রাখতে লাগলেন। তা করতে গিয়ে যাঁরা ধরা পড়লেন, রাজার হুকুমে তাঁদের জীবন্ত অবস্থাতেই পুতে ফেলা হল। এখানে বলে রাখা ভাল যে, একটা ব্যাপারে এই রকম অদ্ভুত খেয়ালের পরিচয় দিলেও শিহ্ হুয়াঙ্ তি খুব পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। তিনি সমগ্র চীন—এমন কি আনাম পর্য্যন্ত তাঁর শাসনাধীনে এনেছিলেন। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের অন্যতম সুবৃহৎ চীনের প্রাচীরের পত্তনও তিনিই করেন। কিন্তু শিহ্ হুয়াঙ্ তি'র অতীতকে মুছে ফেলবার এত যে প্রচেষ্টা, তা কিন্তু ব্যর্থ হল তাঁর রাজত্বকালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই। মাটির নীচে প্রোথিত পুঁথিপত্র আবার বেরিয়ে এল—ইতিহাস আবার তার আত্মপ্রতিষ্ঠা করল।১

এ ঘটনার উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে, আজও পৃথিবীতে শিহ্ হুয়াঙ্ তি'র অনুরূপ মনোবৃত্তির অভাব নেই। সুশিক্ষিত লোকের মধ্যেই এখনও এমন অনেক লোক মিলে, যাঁদের পৃথিবী আরম্ভ হয়েছে তাঁদের জ্ঞান হওয়ার সময় থেকে। এমন লোকও আছেন যাঁরা শিহ্ হুয়াঙ্ তি'র ক্ষমতা না থাকলেও মনে অতীতের প্রতি একটা তীব্র বিরাগ পোষণ করেন এবং অতীতই যে সমস্ত অনিষ্টের গোড়া—এমনতর মতবাদ প্রচার করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্তু সত্যিই কি তাই ?

মানুষের যা কিছু হবার এবং যা কিছু করবার, তা অতীতেই হয়ে গেছে, অতীতই ছিল মানুষের সোনার যুগ, তখনই হয়েছিল মানুষের চরম উন্নতি, বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য শুধু অতীতের আদর্শের দিকে তাকিয়ে থাকা, আর তারই গুণগান করা—এ শ্রেণীর যে একটা মনোভাব আছে এবং তা যে সত্যই অনিষ্টকর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ রকমের ভ্রান্ত চিন্তা ও ধারণা মানুষের মন থেকে যত শীগ্ গির দূর হয় ততই ভাল। কারণ, সমষ্টিগত ভাবে মানুষ যে এগিয়ে চলেছে, অতীতের মানুষের চেয়ে আজের মানুষ যে নানাভাবেই উন্নত, একথা যাঁরা অতীত ও বর্ত্তমানকে খতিয়ে দেখবেন, তাঁদেরই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা আপত্তি তুলে বলবেন, অতীতের মানুষ অনেক বেশী সরল ছিল, আজের মানুষের চেয়ে তাদের সাহস ছিল অনেক বেশী, অল্পেই তারা পরিতুষ্ট থাকত, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধারায় যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরা যৌবনকে শৈশবের চেয়ে মানুষের উন্নততর অবস্থা বলে স্বীকার করেন কিনা জানি না। যদি করেন তা হলে তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা যায়, শৈশবের সারল্য, বিবেচনাহীন সাহসিকতা, অক্ষমতাপ্রসূত সন্তোষ কি সত্যই উন্নততর জীবনের পরিচায়ক ? ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি তা না হয়, তা হলে জাতির ক্ষেত্রেই বা ওগুলোকে উন্নততর গুণ বলে মেনে নিতে হবে কেন ? কিন্তু তাঁদের যদি বক্তব্য হয় যে, শৈশবই যৌবনের চেয়ে উন্নততর অবস্থা—'মাগো আমায় দয়া করে শিশুর মত করে রেখো'—'আমার শরীর বাড়ুক তায় ক্ষতি নাই মনটি আমার শিশুর রেখো'—এই যদি হয় তাঁদের প্রার্থনা, তা'হলে তাঁদের বিশ্বাস আর শিশুর মন নিয়ে তাঁরা থাকুন। তাঁদের সঙ্গে কোন তর্ক আমরা করব না, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করব যে, মানবজাতির শৈশবের চেয়ে আজ মানুষ অনেক এগিয়ে এসেছে এবং যে সোনার যুগের কথা মানুষ বলে, তা মানুষের অতীতে নয়, ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত রয়েছে।২ একটা কথা মনে রাখতে

---

* "Those who shall make use of antiquity to belittle modern times shall be put to death with their relations."

১। Glimpses of World History by Jawaharlal Nehru, revised edition June, 1939, pp. 68—69.

২। Poets dream of a golden age when the world was young and men lived in innocent peace

হবে যে, মানুষ সৃষ্টির সর্ব্বশেষ জীব এবং সে তার কৈশোর অবস্থাই এখনও অতিক্রম করে নি।৩ কাজেই তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিরাশ হবার কোন কারণ তো নেই-ই, বরং আশান্বিত হবার কারণ রয়েছে যথেষ্ট।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠবে—অতীতকে যদি আমরা ছাড়িয়েই এসে থাকি, তা হলে অতীতকে দিয়ে আর প্রয়োজন কি? কেউ কেউ কবির কথার পুনরাবৃত্তি করে হয় তো বলবেন—"Let the past bury its dead" আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, অতীতকে যাঁরা বর্ত্তমানের ঘাড়ে বোঝার মত চাপিয়ে দিতে চান, যাঁরা মনে করেন বর্ত্তমান মানুষের বাসের পক্ষে একটা নিতান্তই অনুপযোগী কাল, মানুষের জীবনের যত কিছু কাম্য—যত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সব অতীতে শেষ হয়ে গেছে এবং কথায়, চিন্তায় এবং ব্যবহারে অতীতের অনুসরণ করেন বলে যাঁরা গর্ব্ব বোধ করেন, তাঁদের দলে আমরা নই। কিন্তু তবুও আমরা মনে করি, অতীতের প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন কি, এক কথায় তার জবাব দিতে হলে বলতে হয়—বর্ত্তমানকে ভাল করে বোঝবার জন্যে—আর ভবিষ্যৎকে গড়বার জন্যেই অতীতের প্রয়োজন। কিন্তু এ জবাব এমনই সংক্ষিপ্ত যে, এতে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। কাজেই কথাগুলো আর একটু পরিষ্কার করে বোঝবার চেষ্টা করব।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকেই তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জীবিকার সংস্থান করতে, হিংস্র জন্তু, নৈসর্গিক উৎপাত প্রভৃতির থেকে আত্মরক্ষা করতে, নিত্য নূতন পরিমণ্ডলের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে, জীবনযাত্রাকে স্বচ্ছন্দতর ও সুন্দর করে তুলতে কত উপায়ই যে তাকে উদ্ভাবন করতে হয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। পাথর, ধাতু, আগুন, তীর ধনুক, বন্দুক, কামান, পশুবাহিত শকট, বাষ্পীয় এঞ্জিন, এরোপ্লেন এই সবই মানুষকে করতে হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে, জীবনকে স্বচ্ছন্দতর করবার অভীপ্সা থেকে। মানুষের এই অগ্রগতির ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, পূর্ব্বগামীদের অভিজ্ঞতাই তাকে

and happy plenty. Sober science tells a different tale and teaches that everywhere the earliest men were rude savages, dwelling in caves or huts, ignorant even of the use of fire and the commonest arts of life." The Oxford Students' History of India—By Vincent A. Smith. 12th edition, 1929, page 24.

৩। A Short History of the World by H. G. Wells (Penguin Books) revised edition 1938. p 310. —*Man is still only adolescent.* His troubles are not the troubles of senility and exhaustion but of increasing and still undisciplined strength. When we look at all history as one process,......... when we see the steadfast upward struggle of life towards vision and control, then we see in their true proportions the hopes and dangers of the present time. *As yet we are hardly in the earliest dawn of human greatness.*" (Italics mine).

সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার ভিত্তি যুগিয়েছে। সভ্যসমাজে বর্দ্ধিত কোন অপরিণতবয়স্ক বালককে যদি রবিন্‌সন্ ক্রুশোর মত একটা নির্জ্জন দ্বীপের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া যায় তা হলে ঐতিহ্যের সংস্পর্শ-চ্যুত সেই বালক যে আদিম মানববালকদের মতই অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়বে, তা বলা বাহুল্য মাত্র। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের যদি এগিয়ে চলতে হয়, তবে পূর্ব্বগামীদের সঞ্চয় সম্বল করেই নূতন সঞ্চয়ের পথে অগ্রসর হ'তে হ'বে। তা না হ'লে —তাঁরা যে পথে হেঁটে গেছেন, সেই পথেই হয়তো বৃথা আবার আমাদের নূতন ক'রে হাঁটতে হবে, তাঁরা যে ভুল করেছেন হয়তো সেই ভুলেরই আবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তা' হ'লেই দেখা যাচ্ছে অতীতের সাধনা যাতে বর্ত্তমানের কাছে ব্যর্থ না হয়, একই সাধনার পুনরাবৃত্তি ক'রে শ্রমের অপচয় করা না হয়, তার জন্যে জানা প্রয়োজন আমাদের অতীতকে। তা ছাড়া, পূর্ব্বগামীরা অতীতে চলবার পথে যে সব ভুলচুক করেছেন, সেইসব ভুলচুক আমরাও নূতন ক'রে না করি, তার জন্যেও ইতিহাসকে জানার ও বোঝার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, বর্ত্তমানকে ঠিকভাবে বোঝবার জন্যই ইতিহাস আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। মনে করা যাক, আমরা কোন আধুনিক ভাস্করের ক্ষোদিত একটা মূর্ত্তি নিয়ে আলোচনা করছি। ভাস্কর্য্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে যদি আমাদের পরিচয় না থাকে, তা' হ'লে বর্ত্তমানের এই তক্ষণ-শিল্প পূর্ব্বাবস্থা থেকে কতখানি অগ্রসর হয়েছে, কোন্ দিকে অগ্রসর হয়েছে, কি বিষয়ে অগ্রসর হয়েছে, আদৌ অগ্রসর হয়েছে কি না, যতটা অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল তা হয়েছে কি না, অগ্রসর না হয়ে পিছিয়েই পড়েছে কি না—ইত্যাদি কোন বিচারই আমরা করতে পারব না। ঐ তক্ষণ-শিল্পকে যেমন তেমন ভাবেই (as it is) মেনে নিতে হবে। এরূপ মেনে নেওয়া যে মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রত্যক্ষ অবমাননা, সে কথা বোধ হয় না বললেও চলে। কাজেই বর্ত্তমানকে বোঝার জন্য ইতিহাসের অপরিহার্য্যতা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। আর এই ঐতিহ্যবোধ থেকেই যে আমরা— ভবিষ্যতে এর রূপ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা করতে পারি এবং এই ঐতিহ্যজ্ঞান ছাড়া যে সে রূপ-পরিকল্পনা সম্ভব হয় না, সে কথাও বোধ হয় দুর্ব্বোধ্য নয়। ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ রুশ লেখক এম, এল, পক্রভ্‌স্কি কয়েকটি সুন্দর ও সুচিন্তিত কথা বলেছেন। এখানে তা উদ্ধৃত করে দিলাম। তিনি বলেছেন:—"কয়েক দশক বা শতকের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে, গভীর অভিনিবেশ করতে পারলে সে বিধানও আমাদের অজানা থাকে না। ভবিষ্যতে কয়েক হাজার বছরে মানব-সমাজ কি রূপ গ্রহণ করবে, তা আমরা স্পষ্ট না দেখতে পেলেও সমাজের বিকাশ কোন্ পথ দিয়ে হ'বে, সে বিষয়ে একটা ধারণা করতে পারি। এ জ্ঞানের গুরুত্ব হচ্ছে এই যে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি থাকলে ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি অর্জ্জন করা সম্ভব হয়—পরে কি ঘটবে, পূর্ব্ব থেকে তার আভাস থাকলে আমরা ভবিষ্যতের জন্য তৈরী থাকতে পারি, অনেক বিপদ এড়িয়ে যেতে পারি, অনেক সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে

পারি। অতীত সম্বন্ধে জ্ঞান হচ্ছে ভবিষ্যৎকে আয়ত্ত করার প্রকৃষ্ট উপায়।"[৪]

কিন্তু ইতিহাস জানলেই তার সম্যক্ প্রয়োগ ও ফললাভ আমরা করতে পারি না। তার জন্যে প্রয়োজন ইতিহাস-বিশ্লেষণের। কিন্তু এই বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি মানুষ খুব বেশী দিন আগে আবিষ্কার করেনি। এর জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হ'য়েছিল—ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত। এই আবিষ্কারের সর্ব্বপ্রথম গৌরব যদিও জার্ম্মান দার্শনিক হেগেলের প্রাপ্য, তথাপি হেগেলের প্রদর্শিত পথের দোষ-ত্রুটী সংশোধন করে তাকে সত্যিকারের বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র গৌরব দিতে হয় অন্যতম জার্ম্মান মনীষী কার্ল মার্কস্‌কে।

৪। "ইতিহাস"—এম এন পক্রভ্‌স্কি লিখিত ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। চতুরঙ্গ, আশ্বিন, ১৩৪৮ পৃঃ ২৪।

ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করবার যে পদ্ধতিটি তিনি দেখিয়েছেন, ইংরেজীতে তার নাম হ'ল dialectical materialism, বাংলায় বলা যেতে পারে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। ইতিহাসকে এই পদ্ধতিতে যে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে বলা হয় materialistic study of history বা ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা। সত্যিকারের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার জন্য এই পদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে পরিচয় নিরলস অধ্যয়ন ও সতর্ক অনুশীলন ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা যেতে পারে—এ পদ্ধতিকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে হ'লে প্রয়োজন—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের। যাঁরা ইতিহাসকে বইয়ের পাতায় আবদ্ধ না রেখে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করতে চান, তাঁরা ইতিহাসের ইঙ্গিত ঠিকভাবে বোঝবার জন্য সে প্রয়াস যে করবেন, এ আশা আমরা নিশ্চয়ই পোষণ করবো।

অগস্ত্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ফিরে এসো হে মুনিবর,
আমরা তোমায় পিছন ডাকি।
বিন্ধ্য উঠুক তায় ক্ষতি নাই
দেখবে—হলো বিশ্বটা কি?
কাঁপ ধরেছে ভূমণ্ডলে
উঠছে ফুলে পল-বিপলে,
দম্ভী এবং দর্পীদলের
আস্ফালনের নাই কো বাকি।

সূর্য্যকে নয়—উঠছে এরা
ভগবানকে রোধ করিয়া।
শ্রান্ত নহে অবিশ্রান্ত
হিংসা গরল উদ্গীরিয়া।
এই ধরণী চূর্ণ করি'
নূতন করে তুলবে গড়ি'
ছুটেরা সব স্রষ্টার ঋণ—
দেবে বেবাক্ শোধ করিয়া।

এসো তুমি, হয় তো তোমায়
দেখবে না অবজ্ঞাভরে,
মদোদ্ধতের গর্ব্বিত শির
দাও লুটায়ে ধূলার 'পরে।
বিনাশ কর দুষ্কৃতিকে,
ফিরাও ফিরাও ভ্রান্তদি'কে,
গণ্ডূষে সব শক্তি তাদের
নিমেষে লও শোষণ করে'।

দিনের প্রহরে নাহি প্রাণের প্রহরী

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জ্যামিতিক সমস্যার মত
জটিল হয়েছে মোর চিন্তাসূত্রগুলি।
স্তব্ধতায় চিত্ত অবনত,
বেদনার মেঘে মেঘে অদৃশ্য অঙ্গুলি
দিয়ে যায় আলোর কম্পন।
আমার মনের ভার ঘন গুরু জানি না কখন!
কিছুতে যায় না মন পথপাশে বসে আমি একা,
দিনের প্রহরে নাহি প্রাণের প্রহরী।
বাহিরে আকাশ ডাকে,—নৃত্য করে কেকা,
টহল দিতেছে বায়ু বৈরাগীর রূপ ধরি'।
জনহীন গ্রামখানি যেন উদাসিনী
সীমন্তিনীসম কার প্রতীক্ষায় বিরলে একাকী!
কোথায় কাঁদিছে যেন উড়ে যাওয়া কার প্রাণপাখী,
অরণ্য হয়েছে পথ, হাটে নাহি আর বিকি-কিনি।
থেমে গেছে কলকণ্ঠ, বহে ক্ষীণ নদী
দীর্ঘশ্বাস ওঠে নিরবধি।
অনাদি বিরহী যেন মৌন ধ্যানে,—শিরে তার ভাবনার জটা,
দিগন্তপ্রসারী মাঠ, শূন্য হৃদি তার।
শ্রাবণ এসেছে আর মেঘেদের ঘটা,
আমার দিন বুঝি গেল রে আমার!

আলোছায়া (গল্প)

শ্রীরমেন মৈত্র

"ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার খবর বেরিয়ে গেল। ভাল ভাবেই পাশ করেছি। আরও কিছুদূর পড়বার ইচ্ছে আছে। বি, এ-টা অন্ততঃ পাশ না ক'রে ছাড়ছি না। এখন হাতে প্রচুর সময়। দিনগুলো বড় দীর্ঘ আর নিজেকে ভারী অলস বলে মনে হচ্ছে। সমস্ত দিনটা বেজায় গরম। দৈনন্দিন রুটিন শুনবেন? সমস্ত দিনটা ঘরের মধ্যে, ঘুমিয়ে, কিংবা বই পড়ে কিংবা রেডিও শুনে একরকম কাটিয়ে দিই। তারপর বিকেলের দিকে ইডেন-গার্ডেনে কিংবা গঙ্গার ধারে খুব খানিকটা বেড়িয়ে আসি; কিংবা টেনিস খেলে কাটিয়ে দিই সুনীলদা'দের বাড়ীতে। কোনদিন সিনেমা বা ফ্যান্সি টুরেও যাই। তারপর রাতে কোন কোনদিন বই নিয়ে বসি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা পড়তে পড়তে যখন অনেক রাত হয়ে যায়, যখন রাতের হাওয়ার সঙ্গে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে, তখন শয্যা নিই। কোনদিন অর্গ্যানের সামনে বসে রবীন্দ্রনাথের গান তুলবার চেষ্টা করি, গ্রামোফোন রেকর্ড শুনি, বা রেডিওতে বড় বাজিয়ে'র সেতার শুনি। আপনি বোধ হয় শোনেন নি, মিউজিক কনফারেন্সে এবার আমি সেতারে ফার্ষ্ট হয়েছি। মাসখানেকের মধ্যে আর একবার এলাহাবাদের একটা function-এ যাবার কথা আছে। ইচ্ছে আছে যাবো। রেওয়াজ এখন কিছুদিন বন্ধ রেখেছি। মনটা আগে খানিকটা হাল্কা হোক, তারপর রেওয়াজ ধরব। এলাহাবাদ থেকে সোজা কলকাতায় আসবো। কাল খবরের কাগজে আপনার খেলার কথা পড়ছিলাম। আজকাল ফুটবলে খুব নাম করছেন শুনছি। খুব খেলাধুলায় মেতে আছেন, না? প্রায়ই আপনার নাম কাগজে দেখি। ডাক্তারি ছেড়ে দিয়েছেন না কি? বাড়ীর সকলে এখনও আপনার নাম করেন। কলকাতায় এলে দেখা করবেন কিন্তু। ভুলবেন না।"

অমিতার বিশাল পত্র! রাজশেখর আর পড়িলেন না, পাতা উল্টাইয়া গেলেন।...রাজশেখর যখন ডাক্তারি পরীক্ষা দেন, তখন এই অমিতা চ্যাটার্জ্জির শিক্ষার ভার তাঁহার হাতে আসিয়া পড়ে। অমিতা তখনও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয় নাই। বড়লোক না হইলেও গরীবের মেয়ে সে ছিল না। পিতা অর্থব্যয় করিয়া কন্যাকে তাই সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। রাজশেখর কাছাকাছি থাকিতেন। কাজেই তাঁহার উপরি দশটাকা লাভের পথ সুগম হইয়া গেল। তাঁর পড়ানোর গুণেই হোক আর শিক্ষার্থীর আপনার বুদ্ধিবলেই হোক্ অমিতা সে বৎসর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিল। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে রাজশেখর কয়েকদিনের ছুটি লইয়া বাহিরে খেলিতে চলিয়া গেলেন। সেবারের খেলায় রাজশেখর আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এতদিনেও ভুলেন নাই। অমিতার চিঠি পড়িয়া সেই সব কথাই আজ আরও বেশী করিয়া মনে পড়িয়া গেল। তাহার লেখা এই পুরাণো চিঠিগুলিকে রাজশেখরের যেন মনেই ছিল না। আজ সহসা ফাইল উল্টাইতে উল্টাইতে চিঠি-গুলিকে তিনি আবিষ্কার করিলেন! তাহার মধ্যে কয়েকটা পড়িলেন, কয়েকটা পড়িলেন না। কারও খানিকটা পড়িলেন মাত্র। চিঠির তারিখ দেখিয়া বুঝা গেল দশবৎসর আগে এমনই একদিনে অমিতা তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছিল। তাঁহার চাকরীতে বহাল হইবার মাসকয়েক পরের চিঠি! সত্যি, দশবৎসর আগেকার চিঠির কথা কাহারও মনে থাকে? রাজশেখর ভাবিবার চেষ্টা করিলেন তাঁহার শিক্ষকতার কাহিনী। মনে পড়ে, রাজশেখর তখন চাকরীর জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই মিলিতেছে না। কলিকাতার মত বৃহৎ জায়গায় রাজশেখরের মত কত ডাক্তার নিত্য গজাইয়া উঠিতেছে। সেখানে তাঁহার স্থান সহজে মিলিবে কি করিয়া। রাজশেখর কিন্তু দমিয়া যান নাই। সুযোগ পাইলেই দরখাস্ত করিতেন। অবশেষে ভাবনার একদিন অবসান হইল। চাকরী মিলিল বিদেশে। হোল্ড্ অল ও স্যুটকেশ লইয়া অধ্যাপনা কার্য্যে যবনিকা টানিয়া দিয়া একদা তিনি নূতন চাকরীতে বহাল হইয়া সুদূর পশ্চিমে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় অমিতার শিক্ষার ভার লইবার জন্য ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্যামলালকে বলিয়া গেলেন। শ্যামলাল নিরীহ ও শিক্ষিত, পড়াইবে ভাল। অমিতা বাহিরের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই তো জীবনের প্রথম দিক, তারপর কর্ম্মজীবন, আর আজ! রাজশেখরের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। ফাইলের কাগজ উল্টাইয়া চলিলেন। কত পুরাণো কথা, কত কাহিনী, কত এন্‌গেজমেণ্টের তারিখ, ক্যাস-মেমো চাপা পড়িয়া গেল। একসময়ে তাঁহার হাত আর এক জায়গায় আসিয়া থামিল। আর একখানি চিঠি, অমিতা লিখিতেছে—

"কাল টেনিস্ টুর্ণামেণ্টে সুনীলদা'দের বাড়ীতে হেরে গেলাম, হাতে খুব লেগেছে! আপনি তো ডাক্তার। যদি কোন ওষুধ আপনার জানা থাকে, তাহলে শীগ্‌গির আমাকে লিখে জানাবেন। আপনার উত্তরের আশায় রইলাম। চব্বিশে তারিখে কলকাতা রেডিও থেকে রাত সাড়ে সাতটায় সেতার বাজাচ্ছি, শুনবেন। শুনে জানাবেন, কেমন লাগল। আপনার খেলাধুলা হচ্ছে কেমন? ছেড়ে দেননি তো?, আপনার খেলা কখনও দেখতে পেলুম না। এবারে কোথায় খেলছেন, জানিয়ে দেবেন।—

হাঁ, মজার কথা শুনুন! সেদিন সুনীলদা, আমি, ঝুণু, মা, আর বড়মামা সকলে মিলে সুনীলদা'দের মোটরে ক'রে বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে ফিষ্ট করতে গিয়েছিলাম। ফিরবার সময়ে পথে গাড়ী গেলো খারাপ হ'য়ে। তখন রাত হয়ে গেছে। অত রাতে গাড়ী সারাবার লোক পাওয়া গেল না। সুনীলদা' আর বড়মামা শেষে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে। রাত দু'টোর সময় পৌঁছেছিলাম সেদিন। তারপরের দিন গায়ে, হাতে যা ব্যথা হোল, ওঃ! সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর ফিষ্ট-এ যাচ্ছি না। পড়াশুনো আরম্ভ করে দিয়েছি। সময় বড় কম। এবার ভাল করে না পড়লে বোধহয় ভাল Marks রাখতে পারবো না। এই সময়ে আপনি থাকলে তবু খানিকটা উপায় করে দিতে পারতেন। তা এখন আপনি ঘোর সংসারী হয়ে পড়েছেন। আপনার ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? তাদের আমার স্নেহাশীষ দেবেন।"

এক নিঃশ্বাসে রাজশেখর এতখানি পড়িয়া গেলেন। চিঠিতে নূতনত্ব কিছুই নাই। ছেলেমানুষিতে ভরা। তবুও পড়িতে কেমন

একটা আনন্দ লাগে। পুরাণো জিনিষের প্রতি এইরকমই একটা মমতা থাকা বোধ হয় সনাতন রীতি। জিনিষ পুরাণো হইলে সেই জন্যেই কি তাহার দাম বাড়ে? কে জানে। প্রতিটি দিনের কথা রাজশেখর আর একবার ভাবিবার চেষ্টা করিলেন। দিনগুলির কথা অবছা আবছা মনে পড়ে, কিন্তু দশ বৎসর আগে দেখা অমিতার সেই মুখখানা তাঁহার কিছুতেই মনে পড়ে না। সে মুখ কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। সে দিনের জীবনের সঙ্গে আজকের জীবনের কোন সাদৃশ্য নাই, সেদিনের ভাবনা ছিল একরূপ, আজকের ভাবনা অন্যরকম। সেদিনকার জীবন-নদীর উদ্দাম স্রোত আজ শান্ত হইয়া আসিয়াছে···সেখানে আসিয়াছে গভীরতা। সুতরাং সেদিনের অমিতাকে মনে না পড়াটা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যজনক নহে। বিশেষতঃ ডাক্তারের পক্ষে! তা' ছাড়া চাকরীতে ঢুকিবার পর তাহাকে অনেক স্থানে ঘুরিতে হইয়াছে। অমিতা প্রথম প্রথম অনেক চিঠিই লিখিয়াছিল। সবগুলির জবাব দেওয়া তাঁহার হইয়া উঠে নাই। তারপর কোথা হইতে কোথা বদলি হইয়া রাজশেখর ঘুরিয়াছেন, সে সকল অমিতাকে জানানো হয় নাই। সেও তাঁহার ঠিকানা পায় নাই। সে আজও হয়ত ভাবিতেছে তাহার মাষ্টারম'শাই ইচ্ছা করিয়া চিঠি লিখেন না। রাজশেখরের একবার ইচ্ছা হইয়াছিল অমিতাকে জানাইবেন যে তিনি শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেছেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত,···চিঠি লেখা তাহার হইয়া উঠে নাই।

দীর্ঘ সাত বৎসর পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আজ হঠাৎ ফাইল উল্টাইতে উল্টাইতে অমিতার চিঠি দেখিয়া রাজশেখরের তাহাকে মনে পড়িয়া গেল। কে জানে অমিতা এখন কোথায়? হয়ত এতদিনে সে এক ধনীর সংসারের কর্ত্রী হইয়া

আবশ্যকীয় একখানা কাগজ ফাইল হইতে বাহির করিয়া, ফাইল তুলিয়া রাখিয়া রাজশেখর আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ অবধি ঘুম আসিল না। অজস্র বাজে ভাবনা মাথার মধ্যে আসিয়া ভিড় করিল। সামনে বর্ষা আসিতেছে! ডাক্তারখানার সামনের রাস্তাটা ভাল করিয়া না তৈয়ারী করিলেই নয়। পাশের ঘরটার ইলেক্‌ট্রিক আলোর বাল্‌ব্‌টা খারাপ হইয়াছে, নূতন একটা বাল্‌ব কিনিতে হইবে। স্মিথ্‌ ষ্ট্যানিস্‌ট্রিটের দোকান হইতে কতকগুলি ওষুধপত্র কালই আসিয়া পড়ার কথা। সেগুলি বুঝিয়া পড়িয়া খালাস করিতে হইবে। এ মাসের বিলিতি ম্যাগাজিনগুলো আসিতে দেরী করিতেছে কেন? কয়েকটা চিঠি লিখিলে কেমন হয়। একটু অবসর রাজশেখরের নাই। খালি কাজ আর কাজ। সকাল হইতে না হইতেই এন্‌গেজমেণ্ট।

সকালে উঠিয়া সর্ব্বপ্রথমে বাহিরে কোথায় একটা রোগী দেখিবার জন্য রাজশেখর প্রস্তুত হইলেন। 'এন্‌গেজমেণ্ট বুক'এ সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে যাইতে হইবে 'নিবারণ' নামে এক ভদ্রলোকের ছেলেকে দেখিবার জন্য। ভদ্রলোক কাল আসিয়া নাকি রাজশেখরের দেখা পান নাই। তাই ভৃত্যের হাতে একটা চিঠি লিখিয়া ডাক্তারবাবুকে দিবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন। রাজশেখর তখন বাড়ী ছিলেন না, থাকিলে টাকা-পয়সার কথাও কহিয়া রাখিতে পারিতেন। এ অঞ্চলে ডাক্তারকে বড় একটা কেহ টাকা দিতে চাহে না। দু'একবার রাজশেখর নিজেও ইহা দেখিয়াছেন। তাই তাঁহার মনের ভিতর একটা অজানা আশঙ্কা বারবার আসিয়া উঁকি দিতেছিল। প্রথমতঃ, এতখানি পথ তাঁহাকে যাইতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ মোটর-বাইকের অনেকটা পেট্রোল খরচ হইবে। উপযুক্ত ও ন্যায্য দাম পাওয়া যাইলে, তাহার কিছুই আসিবে যাইবে না। কিন্তু ঐ ন্যায্য দামটুকু পাওয়া লইয়াই তো যত কথা। সহজে যে দাম পাওয়া যাইবে না, রাজশেখর তাহা জানিয়াও সাজ-সজ্জা করিয়া প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। আজ তিনি শুধু রাজশেখর বলিয়া কলিকাতার ডাক্তার মহলে পরিচিত নন···আজ ডাঃ মিটার। মানুষকে রোগ-মুক্ত করিবার বিনিময়ে প্রাপ্ত পারিশ্রমিকের জোরে, এই টালিগঞ্জের রাস্তার উপর তাঁর এই সুসজ্জিত গৃহ গড়িয়া উঠিয়াছে। বাড়ীর ফটকের গায়ে লেখা—"ডাঃ আর মিটার"।

নিবারণবাবুর বাড়ী খুঁজিয়া লইতে তাহার বেশী দেরী হইল না। বাড়ীখানি বহুদিনের। অযত্নে স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সেই ফাটলের মধ্য হইতে কয়েকটা চারাগাছ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে! জানালার কাঠগুলি বহু পুরাতন। বাড়ীর বাহিরে চার-পাঁচটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাজশেখর তাহাদের সম্মুখে আসিয়া সাইকেল থামাইলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—"নিবারণবাবুর কোন্ বাড়ী?"

ছেলেমেয়েগুলি পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না। রাজশেখর অভয় দিলেন—"বল না, ভয় কি?"

ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত বড়, সে এবার আগাইয়া আসিল। তারপর ম্লান চোখ দু'টি তুলিয়া ভয়ে ভয়ে কহিল—"বাবা বাড়ীতে আছেন। ডেকে দেবো।"

তাহার গায়ের পুরাতন, ময়লা কোটটার পানে চাহিয়া রাজশেখর কহিলেন—"গিয়ে বল, ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

"আচ্ছা" বলিয়া ছেলেটি চলিয়া গেল। রাজশেখর বাহিরে দাঁড়াইয়া বাড়ীর আশে-পাশে একবার চোখ বুলাইয়া লইলেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলিকে একবার দেখিলেন! বোধ হয় নিবারণ বাবুরই ছেলে-মেয়ে। মনের আশঙ্কাটা তাঁহার বদ্ধমূল হইতে চলিয়াছে। কিছু আজ মিলিবে বলিয়া বোধ হয় না। সকালে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলেন কে জানে।...ছেলেটি ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"আসুন, বাবা ভেতরে।"

"চল" বলিয়া রাজশেখর ছেলেটিকে অনুসরণ করিলেন, যাইতে যাইতে কহিলেন—"তোমার নাম কি?"

"অলক! অলক ব্যানার্জ্জি।"

"কি করো, পড়ো"?

"আগে পড়তাম স্কুলে, এখন বাড়ীতে পড়ি। এই যে, এই ঘরে—"

স্বল্পান্ধকার রুদ্ধ একটা ঘরে রাজশেখর ঢুকিলেন। বিশ্রী একটা গন্ধ। রাজশেখরের কাছে এ গন্ধ নূতন নয়। বুঝিলেন রোগীকে

এখানেই রাখা হইয়াছে। রোগীর মা বোধ হয়, অবগুণ্ঠন টানিয়া মুখ নীচু করিয়া পীড়িত পুত্রের শিয়রে খাটের এক প্রান্তে বসিয়াছিলেন। একটি প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক ঘরের ভিতর পায়চারি করিতেছিলেন, সম্ভবতঃ ডাক্তার বাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাজশেখরকে ঢুকিতে দেখিয়া তিনি সামনে আগাইয়া আসিয়া বিমর্ষ মুখে কহিলেন, "বসুন"!

রাজশেখর বসিলেন না, কহিলেন, "আপনার নামই নিবারণ বাবু"।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, নিবারণ ব্যানার্জ্জি"—বলিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া নমস্কার করিলেন, তার পর কহিলেন, "আপনাকে খবর দিয়েছিলাম, পেয়েছিলেন তা হলে।"

রাজশেখর উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, এখন অবস্থা কি রকম?" কই আপনার ছেলে কোথায়? ঘরের একটা জানালা খুলে দিন।"

নিবারণ ব্যানার্জ্জি মুখ তুলিলেন, কোন কথা কহিলেন না। রাজশেখর নিজেই আসিয়া ঈষৎ খুলিয়া দিলেন। তার পর রোগীর শয্যার দিকে আগাইতেই নিবারণ ব্যানার্জ্জি কহিয়া উঠিলেন, "কাল রাতে মারা গেছে। বলিয়া একটু চুপ করিয়া আবার কহিলেন, "রাত্তিরের দিকে যদি একবার আসতেন তা' হোলে—অবিশ্যি আপনার কষ্ট খুবই হোত, রাস্তা তো ভাল না।"

"হুঁ" বলিয়া রাজশেখর বিছানায় যেখানে নিবারণের মৃত পুত্র কাপড়-ঢাকা অবস্থায় পড়িয়াছিল সেইখানে আগাইয়া গেলেন। পার্শ্বোপবিষ্টা মাতাকে কহিলেন, "সরুন, দেখি।"

"দেখবার তো আর কিছুই নেই।" নারীকণ্ঠের আওয়াজটা যেন কিছু দৃপ্ত। রাজশেখর দমিয়া গেলেন। কি ভাবিয়া কহিলেন, "তবুও আমার একবার দেখা দরকার।"

"তা জানি! ঠিক সময়ে আসা দরকার মনে করেন নি। জানি, আপনারা ডাক্তার মানুষ, আপনাদের সময়ের দাম আছে, কিন্তু একটা মানুষের জীবনের দাম কি তার চেয়েও বেশী নয়?"

"ভগবানের হাতে সব। আমি এলেও বোধ হয় কিছু বেশী করতে পারতাম না।"

"ভগবানের হাত! মানুষ যখন নিজের অক্ষমতায় লজ্জিত হ'য়ে পড়ে, তখন ভগবান আর অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু আমার ক্ষতির যে কোন সান্ত্বনাই আমার নেই।"—বলিয়া চুপ করিয়া হঠাৎ রাজশেখরের মুখের দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিতে লাগিলেন।

রাজশেখর বলিলেন, "তা এমন করে বসে থাকলে তো চলবে না। একটা বিহিত করতে হবে। আপনি উঠুন। ব্যাপারটা আমার দেখতে দিন। যা ফিরবে না—"

"মাষ্টার মশাই!"

রাজশেখর সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমার ছেলে কেন চলে গেল, "মাষ্টার মশাই!"

"অমিতা! তুমি! আমি জানতাম না তুমি এখানে আছো।"

"জানলেও চিনতেন না। কিন্তু আমার কি উপায় হবে?"

"খবর দাওনি কেন আগে?" রাজশেখর শুষ্ক কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

নিবারণ বাবু সমস্ত ব্যাপারটা এতক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এইবার তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গেলেন। অমিতার কান্না উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। আর রাজশেখর বোধ হয় ভাবিতেছিলেন, এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? জীবনের প্রথমভাগে যাহার এত উচ্চাভিলাষ, উচ্চশিক্ষা, তাহার আজ এ অবস্থা হইল কি করিয়া? প্রথম জীবন যে খেলাধুলা, লেখাপড়া, হাস্য-কৌতুক ও গানের মধ্য দিয়া কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে আজ অজ্ঞাতকুলশীলের মত গৃহের কোণে দিনের পর দিন এইভাবে কাটাইতে হইতেছে কেন? বাল্যের সুখময় আলোকিত দীপ্ত জীবনের কি দুঃখময় ছায়া! ইহা অভিশাপ, না ভাগ্য! শিক্ষা ও শালীনতার কি চরম পরিণতি এমনই!

"মাষ্টার মশাই"—

রাজশেখর অমিতার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

"বলুন না মাষ্টার মশাই, আমার ছেলের কি হয়েছিলো?"

"কে দেখছিলেন আগে?"

"কেউ না। দেখাতে পারিনি। ডাক্তারকে ডাকতে পারিনি।"

"হুঁ"—বলিয়া রাজশেখর উঠিলেন—"অনর্থক আমার এখানে থাকায় কোন ফল হবে না।"—বলিয়া বাহিরে আসিয়া মুখ নীচু করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। নিবারণবাবু দূরের গাছপালার দিকে তাকাইয়া স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজশেখর সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অমিতা ভিতর হইতে ধরা গলায় কহিল—"দাঁড়ান, যাবেন না।"

রাজশেখর নিবারণবাবুকে কহিলেন—"তাড়াতাড়ি সৎকার করবার ব্যবস্থাটা করুন। আমি এখানে থাকলে আপনাদের অনেক ক্ষতি হবে! তা' ছাড়া লোকও জোগাড় করতে হবে। যাবার পথে আমি জন-কয়েক লোককে বলে যাচ্ছি। তারা এসে আপনাকে সাহায্য করবে। বুঝলেন?"

নিবারণবাবু ঘাড় নাড়িলেন। তারপর কহিলেন—"যা যা করবার সব বলে দিয়ে যান, আমি তো বিশেষ কিছুই জানি না।"

"কিছু ভাববেন না।"—

"ডাক্তারবাবু"—

রাজশেখর মুখ তুলিলেন। অমিতা ধীরে ধীরে তাঁহার কাছে আসিল—কহিল, "আপনাকে প্রণাম করা হয় নি"—বলিয়া রাজশেখরের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর একখানা পাঁচটাকার নোট বাহির করিয়া কহিল,—"এই নিন্।"

রাজশেখর স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে কহিলেন, "থাক্, ও তোমার কাজেই লাগবে।"

"না, আপনাকে নিতেই হবে।"

"আমার দরকার নেই। রেখে দাও সময়ে অসময়ে—"

"না, সত্যি আপনাকে নিতেই হবে, মানে, আমার দেওয়া উচিত।"

রাজশেখর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "তার মানে?"

"মানে খুব সহজ"—বলিয়া অমিতা একটু চুপ করিল। তারপর কহিল, "কষ্ট ক'রে এতদূর এসেছেন। মরা ছেলেকে একবার দেখেছেন। নিন, ধরুন।"

"তুমি ভুলে গেছ অমিতা—যা বলি, আমি তাই করি। টাকা নেব না বলেছি যখন তখন কোনমতেই নেব না। ছেলেমানুষী কোর না।"

"বুঝেছি"—বলিয়া অমিতা আবার থামিল, ক্ষণপরে বলিল, "আপনার ভিজিট কত তা আমি জানি। কিন্তু আমার অবস্থা আপনি তো—"

"অমিতা"—রুদ্ধ আক্রোশে রাজশেখর চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মুখখানা লাল করিয়া পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তিনি একেবারে বাহিরের মোটর-বাইকের উপর বসিলেন। তাঁহার মনে হইল চোখ দুইটা তাঁহার আজ বুঝি কোন বাধা মানে নাই। নিজেরই অগোচরে কখন সহসা কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ দুইটা ভাল করিয়া মুছিয়া লইলেন; তারপর মোটর-বাইকে ষ্টার্ট দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। একবারও ফিরিয়া তাকাইলেন না। আবার অলক্ষ্যে একটা নিঃশ্বাস তাঁহার বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে দাঁড়াইয়া বিমূঢ়ের মত অমিতা এতক্ষণ দেখিতেছিল। রাজশেখর চলিয়া যাইবার পরও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সহসা দ্রুত ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

নিবারণবাবু মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বাহির হইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"ভাখ, অলক, তোর মা আবার কাঁদতে সুরু করল।" তারপর স্বগতই কহিলেন,—"খামখা কেঁদে কি লাভ যে হয়, তাও বুঝিনে!"

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী (উপন্যাস)

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পাঁচ

প্রায় চল্লিশ ঘর কামারের বসতি গ্রামে। আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কুড়ি বছরেও বাঁধা ঘরবাড়ী ওদের মূলটাকে মাটির মধ্যে বেশিদূর থিতিয়ে দিতে পারে নি। আর পাশাপাশি ভাবে ঘরবাড়ী করে বাস করবার ইচ্ছা থাকলেও তার কি জো আছে আজকাল। একটু বেশি সজীব হয়ে যারা বাঁচতে চায়, প্রতি পদে পদে বাইরের সংঘাত এসে খর্ব্ব করতে চায় তাদের। চুরি-ডাকাতি করলে ইংরেজের আইন চারিদিক থেকে বাহু বাড়িয়ে আসে, খাজানার গোলমাল করলে জমিদারের রক্তচক্ষু আত্মপ্রকাশ করে নানা খুটিনাটি অত্যাচারের রন্ধ্র পথে। খাঁচার ভেতরে বন্দী সিংহ যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, ততক্ষণ তাকে নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না; কিন্তু রক্তের মধ্যে যখন তার অরণ্যের আহ্বান মর্ম্মরিত হয়ে ওঠে আর তার প্রচণ্ড শক্তি লোহার গরাদগুলোকে ভেঙে চুরমার করবার মতলব করে, তখন তার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

তরণী, শম্ভু, কেশোলাল—আরো কতজন। কেউ জেলে, কেউ দ্বীপান্তরে, কেউ কেউ বা এখানে ফেরারী। ওই সব ফেরারীদের সন্ধানে পুলিশ এখনো মাঝে মাঝে রূপাপুরে এসে হানা দিয়ে যায়। বিশেষ করে কেশোলাল। দু' দু'টো খুনে' মামলার সে আসামী। ডাকাতি করতে গিয়ে বাড়ির কর্ত্তার গলাটাকে সে পোঁচিয়ে পোঁচিয়ে কেটেছিল, যেমন করে লোকে মুর্গী জবাই করে—অনেকটা সেই রকম। তারপর তাকে ধরতে এল চৌকীদার। চৌকীদারের নাম আলী মহম্মদ; দশাসই জোয়ান, দশটা বাঘে তাকে খেতে পারে না। দু'বার সে নিছক বাহুবলে জাপটে চোর-ডাকাত ধরে ফেলেছে। কিন্তু নিতান্ত কুক্ষণেই সে কেশোলালকে ধরবার জন্যে এগিয়ে এসেছিল। অব্যর্থ লক্ষ্যে কেশোলাল ল্যাজা ছুঁড়ল। আলী মহম্মদ মাটিতে পড়ল, আর উঠল না।

তারপর থেকে কেশোলাল নিরুদ্দেশ। পুলিশের রাগ তার ওপরেই সব চাইতে বেশি; তার মাথার ওপর ঝুলছে দশহাজার টাকার পুরস্কার। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে ধরা পড়েনি। কেউ বলে—সে নাকি জাহাজের খালাসী হয়ে বিলেত চলে গেছে, কেউ বলে নাগা সন্ন্যাসী সেজে সে হিমালয়ে ধ্যান-ধারণায় মন দিয়েছে। কিন্তু এর কোনোটাই যে সত্যি নয়, রূপাপুরের কামারেরা তা জানে। কেশোলালের মতো মানুষ তো চুপ করে থাকবার পাত্র নয়। জীবনকে সে রূপান্তর দিয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু সে জীবন স্তিমিত ধ্যান-ধারণার নয়, খালাসী হয়ে জাহাজের চুলোয় কয়লা ঠেলাও নয়।

সাত আট বছর পেরিয়ে গেল, রূপাপুরের কামারেরা কেশোলালকে প্রায় ভুলতে বসেছে। কিন্তু রামনাথ ভোলে নি। তারই সার্থক মন্ত্রশিষ্য ছিল কেশোলাল। স্বপ্নের মধ্যে সে রক্ত মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে ওঠে কিন্তু তাই বলে কি কেশোলালের সঙ্গে তার তুলনা চলে। একবার সখ করে অনেকখানি কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেয়েছিল সে। কষ বেয়ে টপ টপ করে পড়ছে রক্ত, রক্তাক্ত দাঁতের সঙ্গে মাংসের ছিবড়েগুলো জড়িয়ে রয়েছে—, প্রকাণ্ড মুখখানায় আকর্ণ রক্তিম হাসি হেসে কেশোলাল বলেছিল—একবার মানুষের মাংস খেয়ে দেখতে হবে, স্বাদ কেমন লাগে।

সেই কেশোলাল।

আর একজন তাকে ভোলে নি, সে তার বউ জানী।

বিশ-বাইশ বছর বয়স হবে ভানীর। মোটা খাটো চেহারা, সমস্ত শরীরে মেদ নয়, মাংসের প্রাচুর্য্য। পুরুষের মত শরীরের গঠন—অসুরের মতো খাটে, রাক্ষসের মতো খায়। কোনো মেয়ে যে এক সঙ্গে এই পরিমাণ খেতে পারে এ যেন নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। হাসলে গালের দু'পাশে মাংসের পিণ্ড গোল হয়ে ফুটে ওঠে আর তাদের আড়ালে ছোট ছোট চোখ দু'টো প্রায় তলিয়ে যায় তার। পায়ের পাতা দু'টো অস্বাভাবিক বড়, ভারী শরীর নিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ভানী যখন চলতে থাকে, তখন মনে হয় যেন হাতী আসছে।

বেশি কথা বলে না, বোঝেও না। অর্থহীন খানিকটা হাসি দিয়েই সচরাচর সব কথার জবাব দিতে চায়। নিঃসঙ্গ ঘরে একলা দিন কাটায়, অন্য কামারদের খুঁটিনাটি কাজকর্ম্ম করে দেয়, খেতে পায়। স্বামীর বিরহে সে যে খুব বেশি মর্ম্মপীড়া বোধ করছে না—তাকে দেখলেই সে কথা মনে হয়। প্রচুর স্বাস্থ্য এবং আকণ্ঠ আহারে নিজের ভেতরেই সে সব সময়ে পরিতৃপ্ত হয়ে আছে। কাজকর্ম্ম না থাকলে ঘরের দাওয়ায় বসে গলার নানা রকম সুর করে, কোকিল ডাকে, শিস্ দেয়, বলে 'বউ কথা কও!' খামোকা একটা কুড়ুল নিয়ে কাঠের গুঁড়ি চ্যালা করতে লেগে যায়। স্নান করতে গিয়ে অন্য বউঝিদের ধরে চুবিয়ে দেয়, ডুব দিয়ে এসে পা ধরে টানে, শুকনো কাপড়ে পাঁক ছিটিয়ে দেয়।

মেয়েরা রাগ করে।—অত যে হাসিস, লজ্জা করে না!

লজ্জা? কিসের লজ্জা? ভানীর হাসি তাতে বন্ধ হয় না। মাংসের ঢিবির আড়ালে প্রায় তলিয়ে যাওয়া চোখ দু'টো মিটমিট করে বলে, "কেন?"

সোয়ামীর পাত্তা নেই সাত বছর, কোন্ সুখে আছিস তুই?

ভানীর চোখ-মুখে ছায়া পড়ে, হাসির রেখাটা হ্রস্ব হয়ে আসে ক্রমে। বলে, 'সাত বছর পাত্তা নাই থাকল, আসবে তো একদিন।'

—ছাই আসবে। এতদিনে সে করে—

আর একজন বাধা দিয়ে বলে, থলেই বা; তোকে কি আর ঘরে নেবে ভেবেছিস তুই।

—নাঃ ঘরে নেবে না? কে তবে রেঁধে দেবে শুনি? কে পাখার বাতাস দেবে, পা টিপে দেবে কে? রাগ হলে লাথি মারবে কাকে?

এর পরে যে কথাটা মনে আসে মেয়েরা তা বলতে পারে না। দুঃখ হয়, সংকোচ হয়, লজ্জা হয়। ভানী কিন্তু নির্ব্বিকার।

—তোদের সোয়ামীর চাইতে আমার সোয়ামী আমাকে ঢের বেশী ভালোবাসে।'

বুদ্ধিহীন সরলতা অন্য মেয়েদের মনে সহানুভূতির একটা প্রতিক্রিয়া আনে। একজন বলে, 'বাসেই তো।'

ভানী বলে, তার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে।

মেয়েরা মনে মনে বলে, যমালয়ে। প্রকাশ্যে জবাব দেয়, নিশ্চয়।

পুকুরপাড়ে আমগাছে কোকিল ডাকছে। ভানী উৎকর্ণ হয়ে শোনে,. তার পরেই তার শিশুর মতো অস্থির আর চঞ্চল মনটা চলে যায় সেই দিকেই। উঁচু কণ্ঠে সাড়া দিয়ে বলে—কু-উ-উ।

কোকিলটা চটে গিয়ে আরো ওপরে স্বরগ্রাম তোলে, ভানীর গলাও তার সঙ্গে পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়ে। বলে—কামিনী দি, এবার আমি একটা কোকিল পুষব।

মেয়েরা মনে মনে আবার বলে, মরণ! তারপর কলসীতে জল ভরে নিয়ে যে যার ঘরে চলে যায়। বেলা বাড়ছে, মরদগুলো ভোর না হতেই হাপরে বসেছে। ক্ষিদের সময় ভাত ঠিক মতো না পেলে হাতুড়ি পিটিয়ে ওদের মাথাগুলোকে ভেঙে দেবে। ভানীর মতো মনের আনন্দে কোকিল ডাকলে তাদের চলে না।

তবু মেয়েরা রাগ করে না ওর ওপরে। করুণা হয়, সহানুভূতি হয়। কি চমৎকার আত্মতৃপ্ত হয়ে আছে ভানী! নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ, নিঃসন্দেহ। নিজের ভালোমন্দ নিজের মান-সম্মান কোনো কিছুই তলিয়ে বুঝবার মতো ক্ষমতা তার নেই। কেশোলাল কোনো দিন ফিরবে না, ফিরলে তার ফাঁসি অনিবার্য্য। আর যদি এমন হয়, কোনো দিন চুপি চুপি সে ফিরেও আসে, তা হলেও সে ভানীকে কোনোমতে ঘরে নেবে না। নিজের ক্ষতির কথা ভানী বুঝতে পারেনি বটে, কিন্তু ওরা তো সবই জানে। জবানবন্দী দেবার জন্যে পুলিশের লোক এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। তখন ভানীর বয়স অল্প—চৌদ্দ-পনেরো বছরের বেশী হবে না। জবানবন্দী সে কি দিয়েছিল কেউ জানে না, কিন্তু তিন চার দিন পরে যখন সে ফিরে এল, তখন দশ মাইল দূরের থানা থেকে হেঁটে আসবার ক্ষমতা তার ছিল না, তাকে আনতে হয়েছিল গাড়ীতে এবং দু'দিন যাবৎ সে অচৈতন্য হয়ে ছিল। থানার দারোগা থেকে দারোগার গাড়ীর গাড়োয়ান পর্য্যন্ত কেউই তার নিরুপায় দেহটার ওপর পাশবিক চণ্ডপাত করতে ছাড়ে নি।

সকলে মনে করেছিল—ভানী বাঁচবে না, কিন্তু শরীরের প্রচুর প্রাণশক্তিই তাকে বাঁচিয়ে তুলল। আর শুধু শারীরিক ভাবেই নয়; যে স্বাভাবিক অপমান এবং ঘৃণায় রূপাপুরের কামারের মেয়েরা পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করতে পারত—অন্ততঃ একটা অসহ্য আত্মগ্লানিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকত তাদের চেতনা, সে অপমান, সে গ্লানি ভানী অনায়াসেই কাটিয়ে উঠেছে, অপরিমেয় একটা জীবনী-শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সামান্য কালির ছিটার মতো যে দাগ তার গায়ে লেগেছিল, অত্যন্ত সহজেই তা ধুয়ে মুছে নির্ম্মল হয়ে গেছে,—শারীরিক একটা দুর্ঘটনার মতোই সে মেনে নিয়েছে সেটাকে।

তাই ভানীর হাসিতে কখনো এতটুকু ছন্দপতন ঘটে না, তাই সে বুঝতে পারে না কোন্ অপরাধে কেশোলাল ঘরে নেবে না তাকে। কিন্তু অন্য মেয়েরা তার মতো নির্ব্বোধ নয়। ভানীর অদৃষ্ট ভেবে তাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কত বড় সর্ব্বনাশ যে তার হয়ে গেছে, সে'কথা বলতে গিয়েও ওরা থমকে থেমে যায়—থাক্ না! ভুলেই যদি আছে, তা হলে আর মনে করিয়ে দিয়ে কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কী।

পুরুষেরা অবশ্য সবাই সে দৃষ্টিতে ভানীকে দেখে না। কারো

সহানুভূতি হয়, কেউ কেউ দুঃখ করে; আবার ভানীর অসংযত চলাকেরা, নিজের সম্পর্কে অসতর্ক অচেতনা, কারো কারো মাথার মধ্যে আগুন জালিয়ে দেয়। মাংসল পরিপূর্ণ দেহটার দিকে তরুণ-সম্প্রদায় মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে—ভানী তো রাত্রে একাই থাকে।

কিন্তু বছর দুই আগে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে, তারপর থেকে ভানীর ঘরে কেউ আর ঢুকতে সাহস করে না।

সারাদিন ঢেঁকি কুটে এক সের চালের ভাত খেয়ে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছিল ভানী। অনেক রাত্রে ঝাঁপের দড়ি কেটে কে তার ঘরে ঢুকল। চকিত স্পর্শে ভানীর গভীর নিদ্রা দূর হয়ে গেল, মাথার কাছ থেকে পিতলের একটা ঘটি তুলে নিয়ে সজোরে অন্ধকারের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আঘাত বসিয়ে দিলে।

কুড়াল ধরা, জাঁতা ভাঙা কঠিন হাত—উত্তেজনার আধিক্যে আঘাতটা মারাত্মক হয়ে বসল। ভানীর গায়ের ওপর থেকে ভারী একটা জিনিষ প্রবল আর্তনাদ করে পড়ে গেল মাটিতে, তারপর বিদ্যুৎগতিতে উঠে ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। আলো জেলে ভানী দেখলে ঘরটা রক্তে ভাসছে।

পরদিন সকালে ব্যাপারটা তার ভালো করে মনেই পড়ল না। আর বৈজু কামার মাথায় একটা রক্তাক্ত ন্যাকড়া জড়িয়ে তিন দিন পড়ে রইল বিছানায়। অন্ধকারে ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়েই তার এই দুর্দশা। দৈব-দুর্বিপাকে এমন কত বিড়ম্বনা মানুষকে ভোগ করতে হয় যে!

তারপর থেকে ভানী মোটামুটি শান্তিতেই দিন কাটিয়ে আসছে। আকার-ইঙ্গিত দু' চারজন মাঝে মাঝে করে বটে, কিন্তু বেশী কাছে এগিয়ে আসবার সৎসাহস আর নেই কারো। সে সব ইঙ্গিত ভানী ভালো করে বুঝতেও পারে না, পুরুষের মতো স্বাস্থ্য, পুরুষের মতো জীবন-যাত্রা মনের দিক থেকেও তাকে অনেকখানি স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। যে সমস্ত ইঙ্গিত ও কথাবার্তায় অন্য মেয়েরা লজ্জায় মুখ তুলতে পারতো না, তাদের সমস্ত শিরা স্নায়ুগুলো চমকে উঠত, সেগুলো ভানীর কাছে নিছক ঠাট্টা আর অর্থহীন মুখভঙ্গী বলেই মনে হয় শুধু। কিন্তু কেশোলালকে সে ভুলতে পারেনি।

ভালো করে মনে কি পড়ে? সবটা পড়ে না—সাত আট বছরের ব্যবধান একটা সূক্ষ্ম পরদার মতো তার ওপরে নেমেছে, তার অন্তরালে সে সব দিনগুলো দেখা যায় ছায়ার মতো, কতক দেখা যায়, কতক দেখা যায় না। তা ছাড়া ভানীর বয়স তখন বেশী নয়, আর বয়সের অনুপাতে বুদ্ধিও ছিল অপরিণত। তরল অগঠিত চিন্তার ওপরে সে দিনের স্মৃতি কোনো রেখাপাত করেনি, দাগ কাটতে না কাটতেই মিলিয়ে গেছে। কেশোলাল লাথি মেরেছে তাকে, নির্যাতন করেছে নানারকম, কঠিন হাতে টেনে টেনে মাথার চুল অর্দ্ধেকের বেশী উপড়ে ফেলেছে, আর—আর ভালোবেসেছে নির্মমভাবে, নিষ্ঠুরভাবে—রূপাপুরের কামারেরা যেমন ভাবে ভালোবেসে থাকে।

তারই এক একটা দিন হঠাৎ অতিরিক্ত উজ্জ্বল হয়ে দৃষ্টির সামনে ঝলমল করে ওঠে যেন। যেন পাতলা পর্দাটা জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গিয়ে সূর্য্যের আলো গিয়ে প্রসারিত হয় তাদের ওপরে। দাওয়ায় ব'সে আপন খেয়ালে কোকিল ডাকতে ডাকতে ভানী হারিয়ে ফেলে নিজেকে।

ভানীকে বেদম প্রহার করে বেরিয়ে গেছে কেশোলাল, ফিরেছে অনেক রাতে! গায়ের ব্যথায় চোখের জল ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছে ভানী, আচমকা জেগে উঠেছে কেশোলালের নিষ্পেষিত সোহাগের উদগ্র উচ্ছ্বাসের মাঝখানে।

রুদ্ধশ্বাসে কেশোলাল বলেছে, খুব রাগ হয়েছে, না? আচ্ছা, এবার হাট থেকে তোর জন্যে ডুরে শাড়ী কিনে আনব আর সোনা-দীঘির মেলা থেকে কিনে দেব নানারঙের কাঁচের চুড়ি।

কোথায় সেই কেশোলাল। বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেছে একদিন! অত বড় মানুষটা, অমন শক্তিমান, হাতুড়ির মুখে যার আগুন ছুটত আর চারিদিকের সমস্ত মানুষ-জানোয়ার তটস্থ থাকত যার ভয়ে, একদিন এক দমকা হাওয়ার মতোই বিলীন হয়ে গেল সে। সমস্ত রূপাপুর, শুধু রূপাপুর কেন, আশেপাশের সব অঞ্চলগুলো যে জুড়ে থাকত,—আজ কোনোখানে তার এত-টুকু পাত্তা পাওয়া যায় না। এও কি সম্ভব! ভানীর ভারী বিস্ময় বোধ হয়।

সামনে দিয়ে মানুষের শোভাযাত্রা। গাড়ীর মিছিল। কত লোক চলেছে, কত অসংখ্য লোক। দূর বিদেশ থেকে সব আসছে—দেখলেই বোঝা যায়। মানুষগুলোর হাঁটু অবধি ধুলো, জামা কাপড় লাল আর ময়লা হয়ে গেছে। চোখে মুখে গভীর ক্লান্তি। মাথার ওপর জ্বলছে জ্যৈষ্ঠের সূর্য্য, এখনো বৃষ্টি নামেনি, ফাটা মাঠগুলোর ফাটল দিয়ে আগুন উঠছে, পথের পাশে মরা বিলগুলো শুধুই কাদা। লোকগুলো তৃষ্ণার্ত্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সেই শুকনো বিলগুলোর দিকে, রূপাপুরের দীর্ঘ তাল গাছগুলোর কৃপণ ছায়া তাদের মনে ক্ষণিক বিশ্রাম নেবার প্রলোভন জাগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই তাদের। গরুর গাড়ীর চাকায় ধুলো জমে সেগুলো আকারে যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে, চাকার ভেতর থেকে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে উঠছে একটা কাতর আর্তনাদ। গরুগুলো পা ভেঙে ভেঙে এগিয়ে চলেছে মন্থর গতিতে, যেন অন্তিম যাত্রায়; মহিষের গালের দু' পাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে সাদা ফেনা।

সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভানীর কত কী মনে হয়। মনে হয় যেন পৃথিবীতে আর কোন লোক বাকী নেই, সবাই দল বেঁধে আজ সোনাদীঘির মেলার দিকেই এগিয়ে চলেছে। এত লোকও কি আছে সংসারে। সঙ্গে সঙ্গে মনের সামনে ভেসে ওঠে আর একজনের কথা—সে কেশোলাল।

কেশোলাল। সে কোথায় আজকে? সেও কি এমনি দুপুরের রোদে আজ পথ চলেছে ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়ার মতো? প্রখর রোদের জালায় পুড়ে যাচ্ছে মাথার ওপরটা, তৃষ্ণায় শুকিয়ে এসেছে কণ্ঠ, কিন্তু কোনোখানে এতটুকু ছায়া নেই, জল নেই একটি বিন্দুও। তবু সে চলেছে, চলেছে—তার চলার শেষ নেই। দু' দু'টো খুন করেছে সে, ডাকাতি করেছে সে, পুলিশ তাকে এক-বিন্দু বিশ্রাম দেবে না, এ কথা ভানীও জানে।

যে লোকগুলো চলেছে, তাদের দিকে ভানী আকস্মিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়। কে জানে, এদের মধ্যেও হয়তো কেশোলাল থাকতে পারে, হয়তো এদের সঙ্গে পা মিলিয়ে সেও চলেছে মেলায়। কিন্তু ভানী কি তাকে চিনতে পারবে? ওই যে লোকটা অতি কষ্টে কুঁজো হয়ে পথ চলছে, ওই কি? কিন্তু কেশোলালের তো অত বুড়ো হবার কথা নয়। কিংবা ওই কে একজন এক মুখ দাড়ি নিয়ে সতর্ক চোখে চারদিক তাকাতে তাকাতে চলেছে, ওই যে কেশোলাল হতে পারে না, এমন কথা কে বলবে। সাত আট বছর আগেকার কথা, ভানীর তাকে ভালো করে মনে পড়ার কথা নয়।

কামিনী এল পিছন থেকে।

—এত করে কী ভাবছিস ভানী।

চিন্তার সুর কেটে গেল। ভানী জবাব দিলে না, তাকিয়ে রইল বড় বড় নির্ব্বোধ চোখ মেলে।

—এমন করে বসে আছিস যে? ক্ষিদে পেয়েছে? চল এক ধামি মুড়ি দেব তোকে। আমার এক কাঠা ধান কিন্তু ভেনে দিতে হবে।

—আঃ। —ভানীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা।

কামিনীর বিস্ময় বোধ হ'ল। —ভাবছিস্ কী, সোয়ামীর কথা নাকি?

ভানী এবারেও জবাব দিলে না, তেমনি করেই তাকিয়ে রইল, কিন্তু এবারে তার নির্ব্বোধ চোখে কী যেন একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল কামিনীর কাছে।

সহানুভূতি এল কামিনীর। সত্যিই ভানীর বড় দুর্ভাগ্য। আরো নিজের সঙ্গে তুলনা করলে সে দুর্ভাগ্যের রূপ আর রেখাটা যেন বড় বেশী স্পষ্ট, বড় বেশী প্রকট হয়ে ওঠে। রামনাথ তাকে পাগলের মতো ভালোবাসে, অস্বাভাবিক সোহাগের উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন করে রাখে। আর একা ঘরে রাত কাটায় ভানী; নিজের কোনো জীবন নেই—সকলের সঙ্গে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেকেই সে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রেখেছে, ভুলিয়ে রেখেছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত কামিনী চুপ করে রইল।

—কাল তো সব মেলায় যাচ্ছে। যাবি তো তুই?

অনাসক্ত কণ্ঠে ভানী বললে, গিয়ে কী হবে?

—খালি খালি পড়ে থাকবি কেন? কত জিনিষ আসবে মেলায়, কত দেখবার জিনিষ। নাচ গান আরো কত কী।

ভানীর মনে পড়ে গেল সোনাদীঘির মেলা থেকে কেশোলাল তারজন্যে বেলোয়ারী কাঁচের রং-চঙে শাড়ী কিনে আনত; একবার সুন্দর শিশিতে করে ভালো তেল নিয়ে এসেছিল; মাথায় মাখলে তার মিষ্টি গন্ধটা দু'দিন পর্য্যন্ত ভানীকে আচ্ছন্ন করে রাখত। কিন্তু ভানী তো তেল মাখতে জানত না, জটাবাঁধা চুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় তেল গড়িয়ে পড়ত তার গায়ে। কেশোলাল আদর করে বলত, তুই একটা জংলী, এ সব বাবুগিরি করা তোর কাজ নয়।

পর্দ্দার আবরণটা ছিঁড়ে আরেক ঝলক আলো এসে পড়ল।

ভানী হঠাৎ যেন জেগে উঠল; জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো কামিনীর মুখে।

—আচ্ছা দিদি—

—কী বলবি?

—মেলায় তো অনেক লোক আসে, তাই না?

—আসে বই কি।

—তা হলে, তা হলে, সেও তো আসতে পারে?

এতক্ষণে কামিনী সব বুঝতে পারল। ভানীকে বাইরে থেকে যা দেখায় সে তা নয়। তার মনের প্রচ্ছন্ন প্রান্তে প্রান্তে এখনো কেশোলাল আসন জুড়ে রয়েছে, তাকে সে ভুলতে পারে নি। আবার সহানুভূতির একটা প্লাবন এসে তার মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেল। এখনো প্রতীক্ষা করে আছে, কেশোলাল আসবে, ওকে নিয়ে আবার ঘর বাঁধবে। কিন্তু—

কিন্তু সে কথা বলে কী হবে। কামিনী আস্তে আস্তে বললে, আশ্চর্য্য তো কিছু নয়, কত লোক আসে, কেশোলালও আসতে পারে হয়তো।

ভানী সতৃষ্ণ নয়নে সামনের জনতার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে, চলো দিদি, তোমার ধান ভেনে দিই।

এইবার কামিনীই বললে, নাঃ, সে থাক এখন।

ক্রমশঃ—

প্রান্তর

শ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত

বিলাসী ফাগুন ছুঁয়ে গেল এসে চাঁদের চুল,
কিশোর পাতারা সাড়া দিলো বুঝি বসন্তের;
ভীরু ভ্রমরের বাসর সাজালো রসিক ফুল,
স্বপ্ন বুঝিবা রং পেলো নীল দিগন্তের।

সবুজ ফরাসে মিষ্টি আলোর ভরা-জোয়ার,
ঘুমিল চোখে নেমেছে কখন স্নিগ্ধ ঘুম;
নগরীর বক্ষে এখনো চাঁদের খোলা-দুয়ার—
পৃথিবীর পথে সুপ্তি এখনো স্থির নিঝুম।

সাদা বোশনারে ঢেকে গ্যাছে বুঝি দিগ্বলয়,
নরম চুলের গন্ধে তোমার রাত মাতাল;
খোঁপার ফুলেতে জোনাকীর ভ্রমে সমন্বয়,
অস্ফুট ধ্বনি সব ধমনীতে আজ দামাল।

প্রান্তরে আজ রেখে আসি চলো কল্পনার
গভীর আবীরে রাঙানো রাতের স্নিগ্ধ রূপ;
সবুজ ঘাসের বুক চিরে আজ পথ-রেখায়
উজ্জ্বল স্মৃতি সূর্য্যের মতো জ্বলুক ধূপ।

আকবরের রাষ্ট্র সাধনা

এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেন্টাব) বার-এট-ল

(বাবট্টি)

এশিয়া মহাদেশের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের রাজন্যেরা সাধারণতঃ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন আচার ধর্ম্ম পালন করে, শাস্ত্রের বিধান রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রয়োগ করে। তাঁদের আচার নিষ্ঠার দরুণ জনসাধারণ তাঁদের দেবতার আসনে বসিয়াছে, কবি এবং সাহিত্যিকেরা তাঁদের মহিমা কীর্ত্তন করেছেন, পুরোহিত, আলেম, কথক প্রভৃতিরা আদর্শ নরপতিরূপে, আদর্শ মানবরূপে সমাজের সম্মুখে তাদের উপস্থিত করেছেন। আকবর যদি সেই সহজ পথ অবলম্বন করতেন, তা'হলে তিনিও জনসাধারণের পূজনীয় এক দেবতারূপে তাদের ভক্তি অর্ঘ্য পেতেন, আচার পন্থী ঐতিহাসিকেরা সংস্কার পন্থী ধর্ম্মযাযকেরা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন। তিনি কিন্তু লোকের প্রশংসার চেয়ে অন্তর-দেবতার নির্দ্দেশের অনুসরণ করাকেই তাঁর কর্ত্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছিলেন, আর এই অন্তর-দেবতার নির্দ্দেশে, যেখানে তাঁকে আচার কিম্বা লিখিত শাস্ত্র বাক্যের পরিপন্থী হতে হয়েছে, সে পথ অবলম্বন করতে কখনও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি।

সাধারণ নরপতিরা রাজ্যার কর্ত্তব্যের এবং খোদার নির্দ্দেশের সন্ধান করেছেন, সনাতন আচারে অথবা লিখিত শাস্ত্র বাক্যে; আর আকবর সে সবের সন্ধান করেছেন তাঁর অন্তরের প্রেরণায়। আকবর এবং আওরঙ্গজেবের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য আমরা এইখানেই দেখতে পাই। হিন্দু-বিদ্বেষী বলে আওরঙ্গজেবের একটা কুখ্যাতি অ-মোস্লেম সমাজে প্রচলিত আছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না, কোন বিশেষ জাতির প্রতি তিনি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করতেন না। তবে তিনি একান্ত ভাবে আচার নিষ্ঠ একজন সুন্নী মুসলমান ছিলেন, আর সেই হিসাবে ভিন্ন ধর্ম্মের আচার, রীতি নীতি প্রভৃতি থেকে মুক্ত থাকবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকতেন। এবিষয়ে তিনি ছিলেন আকবরের সম্পূর্ণ বিপরিত ধরণের মানুষ। আওরঙ্গজেবের রাজ্যশাসন যে পক্ষপাতীত্ব দোষদুষ্ট ছিল না, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা সমসাময়িক লেখকদের বর্ণনায় পাই।

Alexander Hamilton নামক একজন ইংরাজ পরিব্রাজক আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারত ভ্রমণে আসেন। তিনি লিখেছেন :—

The religion of Bengal by law established is Mahometan, yet for one Mahometan there are above hundred pagans, and the public offices and posts of trust are filled with men of both persuasions.

... ...

Every one is free to serve and worship God in his own way. And presecutions for religion's sake are not known among them."—Vide—Hamilton's A New Account of the East Indies.

Sir T. W. Arnold তাঁর The Preaching of Islam গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"In an interesting collection of Aurangzeb's orders and despatches, as yet unpublished, we find him laying down what may be termed the supreme law of toleration for the ruler of people of another faith. An attempt had been made to induce the emperor to deprive of their posts two non-Muslims, each of whom held the office of pay-master, on the ground that they were infidal Parsis, and their place would be more fittingly filled by some tried Muslim servant of the Crown; moreover, it was written in the Koran "O, believers take not my fo and your foe for friends." The Emperor replied, "Religion has concern with secular business, and in matters of this kind bigotry should find no place. He too appeals to the authority of the sacred text which says : "To you your religion, and to me, my religion" and points out that if the Verse his petitioner had quoted were to be taken as an established rule of conduct "then ought we to have destroyed all the Rajas and their subjects. Government posts ought to be bestowed according to ability and from no other considerations."

Ovington নামক ইংরাজ পরিব্রাজক আওরঙ্গজেবের যুগে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি লিখেছেন :

"The Great Mogal is the main ocean of justice. He generally determines with exact justice and equity, for there is no pleading of peerage or privilege before the emperor, but the meanest man is as soon heard by Aurangzeb as the chief Omrah; which makes the Omrahs very circumspect of their actions and punctual in their payments,"—Vide Ovington's Voyage to Suratt in the year 1689.

ফরাসী পরিব্রাজক Bernier লিখেছেন :

"The great Mogal, though he be a Mahamedan, suffers there heathens (Hindoos) to go on in their old superstitions, because he will not, or dareth not cross them in the exercise of their religion."

(তেষট্টি)

তবে একথা সত্য যে আওরঙ্গজেবের সধর্ম্মনিষ্ঠা রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তাঁকে এমন এক পথে নিয়ে গিয়েছিল, যে, তার ফলে হিন্দু প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে হিন্দু প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। আর সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য এবং বিদ্রোহীদের শাস্তি বিধানের জন্য অনেক সময় তিনি এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, যা থেকে (সে যুগে একান্ত স্বাভাবিক হলেও) প্রথম দৃষ্টিতে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়, হিন্দু বিদ্বেষের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এসব কাজ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এসবের কারণ ছিল রাজ্য শাসন এবং বিদ্রোহ দমন। হিন্দু দলন নয়। একথা ভুললে চলবে না যে, যে শরিয়েতের আওরঙ্গজেব একান্ত ভক্ত ছিলেন এবং যে শরিয়েতের ভিত্তিতে তিনি রাষ্ট্র-শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাতে হিন্দু দলনের নির্দ্দেশ কোথাও নাই। তবে আকবরের উদার সার্ব্বজনীন নীতি ছেড়ে লিখিত শাস্ত্র বাক্যের অনুসরণ করতে গিয়ে আওরঙ্গজেব মহা ভুল করেছিলেন, আর সেই ভ্রান্তি থেকেই এসেছিল তাঁর রাষ্ট্র জীবনের ব্যর্থতা। আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত জীবন (অন্ততঃ সিংহাসন আরোহণের পর থেকে) ছিল একজন সাধক দরবেশের, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি জটিল ভারতীয় জীবনের তাগিদে সাড়া দিতে পারেন নি, আর সে জীবনের জন্য যে উদার, সার্ব্বজনীন মনোবৃত্তির দরকার, সে মনোবৃত্তি দেখাতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে আকবর ছাড়া কয়জন নরপতি তা দেখাতে পেরেছেন? আওরঙ্গজেব ছিলেন মানুষ আর আকবর ছিলেন দেবতা—আলোচ্য দুই মোগল সম্রাটের পার্থক্য এইখানে। দেবতার কুহেলিকামুক্ত আবহাওয়ায় বিচরণ করবার ক্ষমতা মানুষের নাই।

(ক্রমশঃ

উদয়ন-কথা

প্রিয়দর্শী

তৃতীয় পর্ব (গোড়ার কাহিনী)

এদিকে ভরতরোহক পথে আসতে আসতে ভাবছিলেন, "যৌগন্ধরায়ণ বন্দী বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমারই যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। নকল নীল-হাতী দিয়ে আমরা ধরতে চেয়েছিলাম বৎসরাজকে। ধরা পড়েছিলেনও তিনি। কিন্তু যৌগন্ধরায়ণের কৌশলে তিনি উদ্ধার পেয়েছেন, তবে এর জন্য স্বয়ং যৌগন্ধরায়ণকে স্বাধীনতা ও মন্ত্রিত্ব হারাতে হয়েছে। কিন্তু যাই হোক্! প্রভুর জন্য এরকম আত্মত্যাগ এ কলিযুগে দুর্লভ"!

অস্ত্র-শালায় ঢুকে তিনি দূর থেকে হেঁকে বললেন, "কৈ, কোথায় মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ"?

যৌগন্ধরায়ণ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "এই যে আসুন, মন্ত্রিবর"!

ভরতরোহক—"মন্ত্রিবর! এতদিন 'যৌগন্ধরায়ণ, যৌগন্ধরায়ণ' নামটিই শুধু শুনে আসছিলুম—দর্শনের সৌভাগ্য ত হয় নি। আজ আপনার দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছি"।

যৌগন্ধরায়ণ—"পরিহাসে প্রয়োজন কি, মন্ত্রিবর! আমার দর্শন যদি আপনার এতই কাম্য হয়, দেখুন আমাকে তা হ'লে ভাল ক'রে—প্রভুর উদ্ধারের চেষ্টায় স্বয়ং বন্দী, দেহ ক্ষত বিক্ষত—রক্তে ভাসছে সারা শরীর। তবে বীর-মাত্রেরই এই অবস্থা কাম্য"।

ভরতরোহক—"আপনি ত বীরের মত প্রভুর উদ্ধার করেন নি—করেছেন চোরের মত। মানুষকে ঘুষ দিয়ে হাতী নিয়ে পালান কি বীরের ধর্ম? প্রকৃত বীর যে সে কি হাতীর ব্যাপারে এরকম ছলনা করে"?

যৌগন্ধরায়ণ—"হাতী নিয়ে ছলনার পথ দেখিয়েছেন ত আপনারাই। বৎসরাজকে যে কপট হাতীর সাহায্যে ধরেছিলেন, সেটা কি খুব বীরোচিত কাজ হয়েছিল"?

ভরতরোহক—"আচ্ছা, ও কথা ছাড়ুন। আমাদের মহারাজ অগ্নি সাক্ষী ক'রে নিজের মেয়েটিকে বৎসরাজের শিষ্যা ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁকে চুরি করে নিয়ে পালান কি রাজধর্ম।"

যৌগন্ধরায়ণ—"মন্ত্রিবর! আপনি ব্যাপারটা বুঝেও বুঝছেন না। কোন্ কালে কে কোথায় অগ্নি সাক্ষী ক'রে গুরুবরণ ক'রে থাকে? অগ্নি সাক্ষী হয় ত শুধু বিয়ের সময়। এই অগ্নি-সাক্ষীতেই বৎসরাজ বাসবদত্তার শুভ গান্ধর্ব-বিবাহ হ'য়ে গিয়েছে। আপনি জেনে রাখুন মন্ত্রী ম'শায়, ভরত-বংশের নিয়ম এই যে ঐ বংশের কোন রাজা এক বিবাহিতা পত্নী ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোককে কখনও ললিত-কলা শিক্ষা দেন না। নিজের ধর্মপত্নীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ত কোন দোষের নয়।"

ভরতরোহক—"এই ক'দিন আগেও আমাদের মহারাজ বৎসরাজের কত সমাদর ক'রে তাঁর বাঁধন খুলে দিয়েছিলেন। সে সম্মানের এই কি উপযুক্ত প্রতিদান"!

যৌগন্ধরায়ণ—"মন্ত্রী ম'শায়! আপনি একটু পক্ষপাত করছেন আপনার মহারাজের প্রতি। নড়াগিরি যখন খেপে যায়, তখন তাকে এক বৎসরাজ ছাড়া আর কেউ বাগ মানাতে পারবে না জেনে নিতান্ত দায়ে পড়েই মহারাজ প্রদ্যোত বৎসরাজের বাঁধন খুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর তার ফলে মহারাজ প্রদ্যোতের উপকারই কি কম হ'য়েছিল? প্রথমে ত তাঁর নিরীহ প্রজারা, যারা ধনে-প্রাণে মরতে বসেছিল, তারা সকলেই বেঁচে গেল। তার পর, প্রদ্যোতের আপনার লোকদের প্রাণ ও যশ বজায় রইল। কেন না—হাতীটা বশ না মানলে তাঁরা নিশ্চয়ই পারতেন না—তাতে তাঁদের বদনাম হ'ত 'অপদার্থ' ব'লে। আর সেই অপবাদ দূর করতে গিয়ে তাঁরা বার বার নড়াগিরি ধরবার চেষ্টা করতেন, তাতে হয়ত কারুর কারুর প্রাণও যেত। আর তা ছাড়া, শেষ অবধি হয় ত লোকের প্রাণ বাঁচাতে হাতীটাকেই মেরে ফেলতে হ'ত—সে ক্ষতি মহারাজ প্রদ্যোতের বুকে শেলের মত বাজ্‌ত। কাজেই বৎসরাজকে মুক্তি দিয়ে উজ্জয়িনীপতি বৎসরাজকে সম্মান দেখান নি, নিজেরই স্বার্থসিদ্ধি ক'রে নিয়েছিলেন"।

ভরতরোহক—"আচ্ছা, সে ত না হয় মেনে নিলুম যে—নড়াগিরিকে ধরার সময় বৎসরাজকে মুক্তি দিয়ে মহারাজ তাঁর স্বার্থসিদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু তার পরেও ত আর তাঁকে বন্দী ক'রে রাখেন নি—অতিথির মতই রেখেছিলেন"।

যৌগন্ধরায়ণ—"আবার বন্দী করলে তাঁর অকীর্ত্তিতে দেশ ছেয়ে যেত যে! কৃতজ্ঞতা ব'লেও ত একটা জিনিষ আছে। রাজা হ'য়ে তাঁর কৃতঘ্নতা করা সাজে কি"?

ভরতরোহক—"মন্ত্রিবর! আপনি যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় আপনি রাজনীতি শেখেন নি কোন দিন। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যুদ্ধে বন্দী শত্রুর প্রতি কি রকম ব্যবহার করবার উপদেশ দেয় রাজনীতি"?

যৌগন্ধরায়ণ—"বধ"।

ভরতরোহক—"তা হ'লে বলুন, মন্ত্রিবর! বৎসরাজ যদি আমাদের মহারাজের কাছে বধের যোগ্য হ'ন, তবে আমাদের মহারাজ কেন তাঁকে এতটা সমাদর করলেন"?

যৌগন্ধরায়ণ—"কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্যে"।

ভরতরোহক—"কিসের কৃতজ্ঞতা?"

যৌগন্ধরায়ণ—"মহারাজ প্রদ্যোতের প্রাণরক্ষা করার দরুণ কৃতজ্ঞতা"।

ভরতরোহক সবিস্ময়ে বললেন—"এও আপনি সম্ভব মনে করেন না কি"?

যৌগন্ধরায়ণ—"নিশ্চয়। যখন বৎসরাজ নড়াগিরির পিঠে—আর আপনাদের মহারাজ নিরস্ত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে হাতীর পায়ের কাছে, তখন বৎসরাজ একবার একটু ইঙ্গিত করলেই নড়াগিরি আপনাদের মহারাজের দেহ পিষে ফেলতে পারত। আপনারা এ রহস্যটুকু না বুঝে থাকুন, আপনাদের মহারাজ যে বুঝেছিলেন, তা বৎসরাজের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞ আচরণ দেখেই বেশ বোঝা যায়"।

ভরতরোহক কথা-কাটাকাটিতে যৌগন্ধরায়ণকে এঁটে উঠতে না পেরে এইবার যৌগন্ধরায়ণকে ব্যঙ্গ ক'রে ব'লে উঠলেন—"তা যা-ই বলুন মন্ত্রী ম'শায়! আপনি কি এখনও আশা করেন যে আবার কৌশাম্বী ফিরে যাবেন"?

যৌগন্ধরায়ণ একটু হেসে বললেন—"আপনি এবার হাসালেন, মন্ত্রী ম'শায়। আপনাদের সামনেই যখন নির্ভয়ে দাঁড়াতে পেরেছি, তখন কৌশাম্বী ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে এমন কি একটা কঠিন কাজ"!

ঠিক এই সময়ে রাজবাড়ী থেকে একজন কঞ্চুকী এসে মন্ত্রী ভরতরোহকের কানে কানে কি যেন বললেন। তাই শুনে মন্ত্রী বললেন—"আপনি খুলে বলুন সব কথা"।

তখন কঞ্চুকী এক সোনার গাড়ু (ভৃঙ্গার) যৌগন্ধরায়ণের সামনে রেখে বললেন—"মন্ত্রী ম'শায়! মহারাজ জানিয়েছেন—'আপনি আপনার প্রভুকে অদ্ভুত কৌশলে উদ্ধার করেছেন, শত্রু আপনাদের প্রতি যে ছলনা করেছিল, তার উপযুক্ত পাল্টা জবাব আপনি শত্রুকে দিয়েছেন, আপনার কীর্ত্তি এই ব্যাপারে আগের চেয়েও বেড়ে গিয়েছে। আপনার প্রভুভক্তির তুলনা হয় না। শুধু প্রভুভক্তি নয়, আপনার প্রভু যা যা চেয়েছেন—আপনি প্রাণপণে তাঁর সে সব ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন, আর আমার বহুদিনের সঙ্কল্প যে বৎসরাজের হাতে

আমার মেয়েটিকে সম্প্রদান করি—আমার সে সঙ্কল্প আপনি পূর্ণ করেছেন। এজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতাও নেই। আপনি আমার কোন অপকার ত করেননি—বরং উপকারই করেছেন। তাই আমার বন্ধুত্বের নিদর্শন এই ভৃঙ্গার আপনাকে উপহার দিলুম। অনুগ্রহ ক'রে আপনি এটি স্বীকার করলে কৃতজ্ঞ হব"।

যৌগন্ধরায়ণ—"এইবারেই ত বিপদে পড়লুম! নড়াগিরিকে খেপিয়ে দিতে যে সব ঘর জ্বালিয়েছিলুম—সে গলির স্মৃতি এখনও প্রজারা ভোলে নি। উজ্জয়িনীর মন্ত্রীদের কূট কৌশল সব ব্যর্থ করেছি—সে জন্য তাঁদের হৃদয়ে এখনও ব্যথা বাজ্‌ছে। এর জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে বধ-দণ্ড আশা করছিলাম—সে বধ হ'ত আমার পক্ষে অমরত্ব। তার বদলে কিন্তু এল মহারাজ প্রদ্যোতের সম্মান—উপহার। এ অসহ্য! অপরাধী শত্রুকে সম্মান দেখান মানেই তাকে বধ করা। শিরশ্ছেদ তার পক্ষে পুরস্কার! নাঃ! এ ভৃঙ্গার কখ্‌খনো নেওয়া হবে না"।

হঠাৎ রাজপ্রাসাদ থেকে হাসির সঙ্গে চাপা-কান্না-মিশান শব্দ উঠ্‌তে শুনে ভরতরোহক ও যৌগন্ধরায়ণ দু'জনেই বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। ভরতরোহক কঞ্চুকীকে বললেন—"ঠাকুর! আপনি শীগ্‌গির জেনে আসুন, ব্যাপারটা কি"!

কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে কঞ্চুকী বল্‌লেন—"মেয়ের জন্যে উতলা হয়ে মহারাণী অঙ্গারবতী প্রাসাদের ছাদের উপর থেকে ঝাঁপ দেতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁকে পিছন থেকে ধ'রে ফেলে মহারাজ প্রদ্যোত বল্‌লেন—তোমার মেয়ের বিয়ে ত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম-মতে হ'য়েই গিয়েছে। তুমিই ত তার পথ নিজে প্রশস্ত ক'রে দিয়েছ। এখন আবার এ আনন্দের সময় কান্নাকাটি পাগ্‌লামি কেন? এস আমরা উজ্জয়িনীতে দু'জনের ছবিতে ছবিতে বিয়ে দিয়ে উৎসব করি। আর গোপালকে পাঠাই কৌশাম্বীতে। পালক নড়াগিরির পিঠে চেপে তাড়া করেছে মেয়ে-জামাইকে। গোপাল তাকে গোলমাল বাধাতে বারণ ক'রে ফিরিয়ে আনুক—আর সঙ্গে বাসবদত্তাকে যথাশাস্ত্র সম্প্রদান ক'রে বিয়ের কাজটা শেষ ক'রে আসুক। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ তার আগেই এই খবর নিয়ে কৌশাম্বী চ'লে যান"।

"তাই না কি!"—ব'লে যৌগন্ধরায়ণ লাফিয়ে উঠ্‌লেন। "মহারাজ কুটুম্বিতা করছেন। তবে ত মর্য্যাদা হিসাবে ভৃঙ্গারটা নিতে হয়"।

"এই নিন"—ব'লে কঞ্চুকী ভৃঙ্গার এগিয়ে দিলে।

ভরতরোহককে আলিঙ্গন ক'রে মহারাজ প্রদ্যোতকে কঞ্চুকীর মুখে অভিবাদন জানিয়ে হাতীর পিঠে যৌগন্ধরায়ণ কৌশাম্বীতে যাত্রা করলেন।

এদিকে বৎসরাজ অন্ধকারে ভদ্রবতীকে জোরে চালিয়ে বনের মধ্যে কিছুদূর মাত্র গিয়েছেন, হঠাৎ পিছনে মেঘের ডাকের মত প্রকাণ্ড এক হাতীর গম্ভীর আওয়াজ তাঁর কানে এল। বুঝ্‌লেন—এ নড়াগিরি—তাঁদের পিছু নিয়েছে। নড়াগিরির পিঠে কে অন্ধকারে চেনা যাচ্ছিল না বটে; কিন্তু তিনি বুঝ্‌লেন যে নড়াগিরির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে ভদ্রবতী কখনই পারবে না। কাজেই তিনি তখন মরিয়া হ'য়ে ধনুক-বাণ নিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরী হ'য়ে রইলেন। সেনাপতি রুমণ্বান্ তাঁর সেনাদের নিয়ে পিছু পিছু যে ছুটে আস্‌ছিলেন—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। কাজেই তাঁর ভরসা ছিল যে এক আধ দণ্ড একলা লড়তে পারলে পিছনের সাহায্য এসে পৌঁছুবে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে নড়াগিরি শুঁড় তুলে গর্জ্জন করতে করতে প্রবল বেগে এগিয়ে এল। আষাঢ়ক তখন চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"মহারাজ! এ যে নড়াগিরি দেখ্‌ছি। এ আপনি নিজে সাম্‌লান—এর মুখ থেকে বাঁচান আমার কর্ম্ম নয়"। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার! নড়াগিরি শ'দুই হাত দূরে এসেই হঠাৎ থেমে গেল—তার মাহুতের শত চেষ্টাতেও সে আর এক পাও এগুতে চাইলে না। এমন কি তার সে দুর্দ্দান্ত ভাবও যেন কোথায় উড়ে গেল—যেন পোষা হরিণের বাচ্চা—এমনই শান্ত ভাব দেখাতে লাগ্‌ল।

আষাঢ়ক বল্‌লে—"মহারাজ! আমাদের খুব ভাগ্য ভাল যে ভদ্রবতীর পিঠে চেপে আমরা বেরিয়েছিলুম। ভদ্রবতীর গায়ের গন্ধ পেয়ে নড়াগিরি থেমে গেছে—ভদ্রবতীকে ও খুব ভালবাসে কিনা, তাই ভদ্রবতীকে নড়াগিরি কখনও আক্রমণ করবে না। তবে নড়াগিরির পিঠে দেখ্‌ছি মহারাজকুমার পালক। তাঁর সঙ্গে আপনারা বোঝাপড়া করুন"।

ইতিমধ্যে মহারাজ উদয়ন ধনুকবাণ জুড়েছেন দেখে বাসবদত্তা কেঁদে উঠ্‌লেন—"মহারাজ! দাদাকে যেন মেরে ফেল্‌বেন না"। উদয়ন বল্‌লেন—"আমি যদি ওঁকে না মারি আগে ত উনি আমাকে মারবেনই। ঐ দেখ, উনিও আমার দিকে বাণ লক্ষ্য করছেন"। তাই শুনে বাসবদত্তা হাতীর পিঠে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—পালকের বাণের সাম্‌নে বুক পেতে দিয়ে হাত জোড় ক'রে দাঁড়ালেন। পালক বাণ ছুড়তে গিয়ে দেখলেন সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে তাঁর আদরের ছোট বোনটি যাকে উদ্ধার করবার জন্য এত কাণ্ড। কি আশ্চর্য্য! তিনি ত বিস্ময়ে হতভম্ব—হাতের বাণ হাতেই র'য়ে গেল। এই অবস্থায় তাঁকে পেয়ে বৎসরাজ সুযোগ ছাড়লেন না। চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে তাঁর ধনুকের ছিলে কেটে ফেল্‌লেন নিজের বাণ দিয়ে। ঠিক এই সময় পিছন থেকে গোপাল এসে পড়লেন, তাঁর সব চেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়া সুগ্রীবের পিঠে চ'ড়ে। তিনি খুবই কম সময়ের মধ্যে এসে পড়তে পেরেছিলেন। দুই ভাইএ মিলে কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর পালক যখন শুন্‌লেন যে, তাঁর বাবা প্রদ্যোত বরং এ ব্যাপারে দুঃখিত ত হনই নি, বরং সুখীই হয়েছেন, তখন তিনি আর করেন কি! নিরীহ ভাল মানুষটির মত উজ্জয়িনী ফিরে যেতে রাজি হলেন।

দুই ভাই গোপাল আর পালক নড়াগিরির পিঠে চেপে উজ্জয়িনীর দিকে রওনা হয়েছেন, এমন সময় সসৈন্যে রুমণ্বান্ এসে হাজির—পিছনে পিছনে যৌগন্ধরায়ণ। যৌগন্ধরায়ণের সারা দেহে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখে বৎসরাজ জিজ্ঞাসা করলেন—"মন্ত্রিবর! এ কি"! যৌগন্ধরায়ণ সব ঘটনা খুলে বল্‌বার পর বসন্তককে অনুরোধ করলেন—"বন্ধু! তুমি একবার পুলিন্দকের রাজ্যে এগিয়ে গিয়ে মহারাজের আস্‌বার কথা জানাও"। তারপর সেনাপতির দিকে ফিরে বল্‌লেন—"রুমণ্বান! তাই তুমি শীগ্‌গির কৌশাম্বী চ'লে যাও। প্রজাদের এ সুখবর দাও গে"। এবার তিনি মহারাজকে বল্‌লেন—"মহারাজ! আপনি বেশ ধীরে সুস্থে আসুন—আস্‌বার সময় আপনার বন্ধু পুলিন্দকের রাজধানী দিয়ে ঘুরে আস্‌বেন, কারণ আমার কথা দেওয়া আছে। আমি এগিয়ে যাই, রাজ্যের সীমানায় আমায় অপেক্ষা করতে হবে, উজ্জয়িনীর দূত আস্‌বে, তাকে সঙ্গে নিয়ে কৌশাম্বীতে যাব। এর মধ্যে আপনি বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে একটু জিরিয়ে রাজধানীতে এসে পৌঁছুতে পারবেন"।

বসন্তক, রুমণ্বান্ ও যৌগন্ধরায়ণ সকলেই এগিয়ে চ'লে গেলেন। বৎসরাজ খুবই সুখী—বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালাকে নিয়ে ভদ্রবতীর পিঠে চ'ড়ে ধীরগতিতে এগিয়ে চল্‌লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত শেষ হ'য়ে গেল। প্রায় দুপুর হয় হয়—হাতীটা ঠিক তেষট্টি যোজন চ'লে এসেছে উজ্জয়িনী থেকে। হঠাৎ আষাঢ়ক বল্‌লে—"মহারাজ! দূরে একটা সরোবর দেখা যাচ্ছে। হাতীটা একদমে এতটা পথ এসেছে; ও একটু জল না খেয়ে আর চল্‌বে না। আপনারা সকলে এইখানেই সরোবরের ধারে নেমে স্নান ক'রে একটু জিরিয়ে নিন—আমি দেখি যদি আপনাদের জন্যে কিছু ফলমূল যোগাড় করতে পারি কি না। ততক্ষণ ভদ্রবতীও জলে নেমে একটু খেলা করুক"। এই ব'লে আষাঢ়ক বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সকলে হাতীর পিঠে থেকে নাম্‌তেই সে খুব আগ্রহে জলের মধ্যে নেমে গেল। কিন্তু খানিকটা জল খেতে না খেতেই সেইখানে চ'লে পড়ল। সরোবরের জলে ব্যাধেরা বিষ মিশিয়ে রেখেছিল। তাই খেয়ে ভদ্রবতীর জীবন শেষ হ'ল। কিন্তু নিজের জীবন দিয়েও সে উদয়ন, বাসবদত্তা প্রভৃতির

প্রাণ বাঁচিয়ে দিলে। জল বিষাক্ত জেনে তাঁরা আর সে জল ছুঁলেন না। এমন সময় আবাঢ়ক ফল-মূল নিয়ে ফিরে এল। হাতীর দুর্দশা দেখে সকলেই 'হায় হায়' করছেন, এমন সময় এক পরমাসুন্দরী বিদ্যাধর-কন্যা সেইখানে আবির্ভূত হ'য়ে বললেন,—"বৎসরাজ! আমি এক বিদ্যাধর-বধূ—নাম আমার মায়াবতী। আজ আপনার সেবা পেয়ে আপনার কিছু উপকার করেছি। আপনার কৃপায় আজ আমি শাপমুক্ত হলুম। এ উপকারের প্রত্যুপকার আমি করব আপনার ছেলে হ'লে। এই যে রাজকন্যা বাসবদত্তা, ইনি আপনার রাণী হবেন। ইনি সাধারণ মানবী নন—শাপভ্রষ্টা দেবী। বিশেষ কারণে মানুষের ঘরে এসে জন্ম নিয়েছেন। এঁর গর্ভে আপনার যে ছেলে হবেন, তিনি সমস্ত বিদ্যাধরদের একচ্ছত্র সম্রাট্ হবেন। সেই সময় আমি আবার আসব।" এই বলে শাপমুক্তা ভদ্রবতী অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

তখন বৎসরাজ আর কি করেন! পায়ে হেঁটেই ক'জনে চলতে লাগলেন। পুলিন্দকের রাজ্যের কাছে বরাবর এসে পৌঁছেছেন, এমন সময় একদল দস্যু এসে তাঁদের ঘিরে ফেললে। বৎসরাজ একলাই তাদের সঙ্গে লড়তে আরম্ভ করলেন। তাঁর বাণ খেয়ে একশ' পাঁচ জন ডাকাত প্রাণ হারাল। এমন সময় বসন্তকের সঙ্গে ব্যাধরাজ পুলিন্দক সসৈন্যে এসে উপস্থিত। বাকী দস্যুদের তাড়িয়ে দিলেন ব্যাধরাজ। তারপর উদয়নকে প্রণাম ক'রে নিজের রাজধানী সমাদরে নিয়ে গেলেন। সে দিনটা ভীল-রাজধানীতেই আনন্দ উৎসবে কেটে গেল।

পরের দিন সকালে দেখা গেল প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, সেনাপতি রুমধান্, কৌশাম্বীর প্রধান প্রধান প্রজানায়কেরা, সেনাদল সকলে মিলে দলে দলে এগিয়ে আসছে মহারাজ উদয়নকে প্রত্যুদ্গমন ক'রে নিয়ে যেতে। এমন সময় উজ্জয়িনী থেকে একজন বণিক্ এসে উপস্থিত হলেন। প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি এসে জানালেন যে উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত তাঁর জামাই বৎসরাজ উদয়নের উপর খুবই খুসী হ'য়ে একজন দূত পাঠিয়েছেন। সে দূত একটু আস্তে আস্তে আসছে। আমি একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছি আপনাদের এ সুসংবাদটি দেব বলে। এই বলে বণিক্ নিজের কাজে চলে গেল।

তখন যৌগন্ধরায়ণ বললেন, "মহারাজ! চলুন, আমরাও আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। কৌশাম্বীরাজ্যের সীমানায় পৌঁছে সেইখানে দূতের জন্য অপেক্ষা করা যাবে"।

উদয়ন রাজী হলেন। তখন সকলে মিলে কৌশাম্বীর দিকে যাত্রা করেন। যাবার সময় উদয়ন পুলিন্দককে ছাড়লেন না—সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে গেলেন।

কৌশাম্বী রাজ্যের সীমানায় গিয়ে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন যে, প্রজারা রাজ্যের সীমা থেকে আরম্ভ ক'রে রাজধানী পর্য্যন্ত সারাপথটি লতা-পাতা, ফুল-মালা দিয়ে সাজিয়েছে। পথের মাঝে মাঝে বিচিত্র তোরণ, তার মাথায় পতাকা। চারিদিকে নানা রকম আনন্দের বাজনা বাজছে—সমস্ত রাজ্যে যেন আনন্দের স্রোত বইছে।

রাজ্যের প্রথম তোরণের নীচে সকলে উজ্জয়িনীর রাজদূতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে চণ্ডমহাসেনের মহাপ্রতীহার এসে পড়লেন। রাজা উদয়ন, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতিকে প্রণাম জানিয়ে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "মহারাজ! আপনি যে আমাদের রাজকন্যাকে হরণ ক'রে এনেছেন—এতে আমাদের মহারাজ বিন্দুমাত্র দুঃখিত হন নি—বরং খুব আনন্দিত। তিনি বলেছেন, 'বোলো বৎসরাজকে যে আমি ত অগ্নিসাক্ষী ক'রে আমার মেয়েকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছি। কাজেই তিনি আমার মেয়েকে হরণ ক'রে নিয়ে গেলেন ব'লে যেন আমাদের কাছে কোন লজ্জা না করেন। তবে একটি কথা—বৎসরাজ যে আমার মেয়েকে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করেছেন—তা আমার অনুমানেই জানা আছে। কিন্তু আমার অনুরোধ যে তিনি যেন গান্ধর্ব্ব-বিবাহ ক'রেই ক্ষান্ত না থাকেন। নিজের রাজধানীতে পৌঁছে যেন আমার মেয়েকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করেন। কন্যা-সম্প্রদানের জন্য আমি খুব শীগ্গিরই আমার ছেলে গোপালককে পাঠাচ্ছি কৌশাম্বীতে। তার যাওয়া পর্য্যন্ত বৎসরাজ যেন অপেক্ষা করেন'। মহারাজ! আমাদের মহারাজের বক্তব্য আপনার কাছে নিবেদন করলুম। এখন আপনার যা অভিরুচি"।

মহাপ্রতীহারের কথায় উদয়ন ত খুবই আনন্দ করলেন। রাজকুমারীও পরম আনন্দে প্রতীহারকে ডেকে তাঁর বাপের বাড়ীর সকলের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। সে দিনটা ঐভাবে আমোদে আহ্লাদে কেটে যাবার পর দ্বিতীয় দিন সকালেই উদয়ন প্রস্তাব করলেন—মহাপ্রতীহার! আমরা তা'হলে রাজধানীতে এগিয়ে যাই। তবে কুমার গোপালকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আপনি, মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ আর আমার পরম বন্ধু ও হিতৈষী ব্যাধরাজ পুলিন্দক এইখানেই কয়েকদিন অপেক্ষা করতে থাকুন"।

সকলেই এ প্রস্তাবে রাজি। উদয়ন কৌশাম্বীতে পৌঁছে দেখলেন, আগে থেকেই খবর পেয়ে রাজধানীর প্রজারা বিবাহ উৎসব আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। চারিদিকে নাচ-গান খাওয়া-দাওয়া হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড! কয়েক দিনের মধ্যেই উজ্জয়িনী থেকে গোপালক এসে উপস্থিত হলেন। প্রদ্যোত তাঁর সঙ্গে মেয়ে জামাইকে যৌতুক দেবার জন্য অজস্র রত্ন সোনা-রূপার গহনা—হাতী-ঘোড়া দাস-দাসী প্রচুর খাবার জিনিস পাঠিয়েছেন। তাই দেখে যৌগন্ধরায়ণ প্রস্তাব করলেন, "মহারাজ! রাজ্যের সমস্ত প্রজা আ-বাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলে আপনার বিবাহ-মহোৎসবে যোগ দিয়ে নিমন্ত্রণ-ভোজন করুক। তারা বহুদিন আপনার অদর্শনে কাতর ছিল, এখন ক'দিন খাওয়া-দাওয়া ক'রে একটু আনন্দ পাক"। উদয়ন সানন্দে সম্মতি দিলেন। সাতদিন ধ'রে রাজ্যের কোন প্রজার বাড়ী আর হাঁড়ী চড়ল না।

তারপর একদিন শুভলগ্নে কুমার গোপালক তাঁর আদরের ছোট বোন বাসবদত্তাকে যথাবিধি বৎসরাজের হাতে সম্প্রদান করলেন। রাজপুরোহিত যখন বর-কনের গাঁটছড়া বাঁধছিলেন, তখন বিবাহ-মণ্ডপে দাঁড়িয়ে রাজ্যের প্রজারা বলাবলি করছিল—যেন সাক্ষাৎ রতি আর কামদেব এসে পৃথিবীতে মিলিত হয়েছেন।

কৌশাম্বীতে কদিন পরম সুখে কাটিয়ে বৎসরাজের নূতন সম্বন্ধী কুমার গোপালক উজ্জয়িনী ফিরে গেলেন তাঁর বাপ-মাকে এই বিবাহের খবর দিতে। মহারাজ উদয়ন তাঁর নূতন রাণী বাসবদত্তাকে নিয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। [গোড়ার কাহিনী সমাপ্ত]

কণিকা

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

শকুনি সে যতই উঠুক নভে
দৃষ্টি তাহার রহে শ্মশান পানে,
ভোগী যে জন যতই করুক তপ
সংসারে তার কেবলই মন টানে।

মাটির মাঝে অশথ রহি' তবু
আকাশ পানে তুলল মাথাটিকে,
সবার মাঝে থেকেই মহৎ হওয়া
যায় গো যদি ইচ্ছাটুকু থাকে।

(আট)

৬। তণ্ডুল-কুসুম বলি-বিকার—যশোধরের মতে ইহার মধ্যে দুইটি কলা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—(ক) তণ্ডুল-বিকার ও (খ) কুসুম-বলি-বিকার। 'বলি' অর্থে পূজার উপহার। টীকাকার অর্থ করিয়াছেন—(ক) সরস্বতী-ভবনের বা কামদেব-মন্দিরের মণিময় কুট্টিমে১ নানাবর্ণে রঞ্জিত অখণ্ড তণ্ডুল ভাগে ভাগে সাজাইয়া নানা আকৃতি-বিশিষ্ট পদার্থের প্রতিকৃতি রচনা; (খ) আর শিবলিঙ্গাদির পূজায় নিমিত্ত নানাবর্ণ কুসুম গ্রহণপূর্ব্বক ভাগে ভাগে আকৃতিতে সাজাইবার কৌশল। নানা টীকাকার বলিতেছেন—এই যে ফুলগুলি স্তরে স্তরে সাজান হইবে, তাহাতে সূত্র-সংযোগ থাকিবে না—বিনা সূতায় গাঁথিতে হইবে। কারণ সূতা দিয়া গাঁথিলেই উহার কৌশল মাল্যগ্রথন-বিকল্প-নামক (চতুর্দ্দশ-সংখ্যক) পৃথক্ একটি কলার অন্তর্ভুক্ত হইবে; আর ভাগে ভাগে স্তরে স্তরে সাজাইবার কৌশলই গ্রথন হইতে পৃথক্ এই কলার বিষয়২।

মতান্তরে, এই কলাটির মধ্যে তিনটি ছোট কলার সমাবেশ আছে—

(ক) তণ্ডুল-বিকার—(১) আস্ত আস্ত চাল সাজাইয়া পদ্ম, হাতী, ঘোড়া ময়ূর ইত্যাদি নানারূপ ফুল-পশু-পাখী ইত্যাদির প্রতিকৃতি রচনা। সে যুগে সাধারণতঃ দেব-দেবীর মন্দিরে নানারূপ মণি মুক্তা দিয়া বাঁধান মেঝের উপর অখণ্ড তণ্ডুল সাজাইয়া এই সকল আকৃতি (figure) রচনা করা হইত। (২) কেহ কেহ বলেন—ইহার অর্থ অন্যরূপ। চাল গুঁড়াইয়া নানা প্রকার ফুলের রসে তাহা রঙ করিয়া তাহার সাহায্যে নানাবিধ মণ্ডল বা আকৃতি রচনার কৌশল এই কলার বিষয়। (৩) আবার অপর কোন কোন ব্যাখ্যাতার মতে চাল বাটিয়া ও জলে গুলিয়া সেই পিটুলিগোলা দিয়া আলিপনা দেওয়ার কৌশল এই কলার অন্তর্গত। (৪) আবার অন্যমতে—চাল ডাল ইত্যাদি ভোজ্যদ্রব্য নৈবেদ্যের আকারে নিপুণভাবে সাজাইবার কৌশলই ইহার বিষয়। এখনও নৈবেদ্য নানা আকারে সাজান হইয়া থাকে—মন্দিরের আকারে, গোল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ ইত্যাদি নানাভাবে। অন্নকূট ইত্যাদি উৎসবে অন্নাদি ভোজ্যদ্রব্য যে নানা আকারে সাজান হয়, তাহার কৌশলও এই কলার অন্তর্গত।৩

(খ) কুসুম বিকার—(১) নানা বর্ণ ও আকৃতির পুষ্পগুলিকে ভাগে ভাগে স্তরে স্তরে পৃথক্ পৃথক্ বা মিশ্রভাবে গুছাইয়া উহার সাহায্যে দেববিগ্রহকে নানা ভাবে সাজাইবার কৌশল। আজকাল দেখা যায়—৺কাশীধামে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথদেবের, ৺পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর, এমন কি এই কলিকাতা মহানগরীর নানা দেবালয়েও (যথা—৺কালীঘাটে ৺শ্রীশ্রীকালীমাতার, বাগবাজারের ৺শ্রীশ্রীমদনমোহন দেবের ও কাশী-মিত্রের শ্মশানঘাটে ৺শ্রীশ্রীশ্মশানেশ্বর দেবের) দেব-বিগ্রহগণের রাজবেশ শৃঙ্গার বেশ ইত্যাদি নানারূপ সজ্জা প্রধানতঃ নানাবিধ ফুলের সাহায্যেই রচিত হইয়া থাকে। এই সকল কুসুম-সজ্জার কৌশল কুসুম-বিকারের অন্তর্ভুক্ত। (২) বিনাসূত্রে পুষ্পের মালা বা হার গাঁথিয়া দেব-বিগ্রহের সজ্জা করার কৌশল এই কলার বিষয়—এইরূপ মতও কেহ কেহ পোষণ করেন। (৩) অন্যমতে—ফুলের তোড়া বাঁধা বা পাখা তৈয়ারী করা অথবা কোন পাত্রে জল দিয়া তাহাতে নানা আকারে ও বিচিত্র কৌশলে ফুল সাজাইবার কৌশল। পূজার উদ্দেশ্যে পুষ্পপাত্রে ভাগে ভাগে নানা জাতীয় ফুল সুন্দরভাবে সাজাইবার কৌশলও ইহার অন্তর্গত৪। Flower vase এ সুনিপুণ ভাবে নানাবর্ণের ফুল সাজানও এই কলার অন্তর্গত। নানাবর্ণ ও আকৃতির ফুলের সাহায্যে দেবমন্দিরের দ্বারদেশ, মন্দিরের ভিত্তি-গাত্র, দেবতার বেদিকা বা সিংহাসন সাজাইবার কৌশলও এই জাতীয়। বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে ফুল দিয়া বাড়ীর দ্বারদেশ বা উৎসব-প্রাঙ্গণ বা গৃহসজ্জাও এই কলার অন্তর্গত। পুষ্পদ্বারা রঙ্গমঞ্চাদির সজ্জাও ইহার সজাতীয়।

(গ) বলিবিকার—দেবপূজার নৈবেদ্য নানা আকারে থরে থরে সাজাইবার কৌশল। অথবা অন্নকূটাদি উৎসবে অন্ন ব্যঞ্জন-পায়সাদির সাহায্যে পাহাড়, নদী, সরোবর ইত্যাদির সৃষ্টি। অথবা নৈবেদ্যের মত নানা আকারে নিপুণভাবে সাজাইয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদির পরিবেষণ। কেহ কেহ তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা মণ্ডল রচনা, বা কুসুম রাগ-রঞ্জিত তণ্ডুল-বাটা (পিটুলি) জলে গুলিয়া তদ্দ্বারা আলিপনা দেওয়ার কৌশল এই কলার অন্তর্গত মনে করেন৫।

এইবার আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণের মত নিম্নে সংগৃহীত হইতেছে।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"অখণ্ড তণ্ডুল দ্বারা পদ্মাদি রচনা, বিনা সূত্রে কুসুমাবলী-দ্বারা ভূতলে লতা-প্রতান-নির্ম্মাণ, তণ্ডুলাদি চূর্ণ-দ্বারা মণ্ডল-রচনা, কুসুম-রসে তাহার রঞ্জন—এ সকল শিল্প ইহারই অন্তর্গত"৬।

৺কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—"পূজা কি যাগ-যজ্ঞের সময় তণ্ডুলের নৈবেদ্য-রচনা, পুষ্পের স্তবক-রচনা, উপহার-দ্রব্যের সংস্থান রচনা। পূর্ব্বকালের অকর্ম্মণ্য ব্রাহ্মণেরা এই কার্য্য করিত। এখন আর ইহা নাই, একেবারে লোপ হইয়াছে"।৭

১। কুট্টিম—বাঁধান মেঝে; সিমেণ্ট, মোজায়েক, মার্ব্বল, প্রস্তর ইত্যাদি দিয়া বাঁধান মেঝে। ৺মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণে বলা হইয়াছে—'মণিময় চত্বর প্রদেশে (সানবাঁধান উঠান)'।

২। অখণ্ডতণ্ডুলৈর্নানাবর্ণৈঃ সরস্বতীভবনে কামদেবভবনে বা মণি-কুট্টিমেষু ভক্তিবিকারাঃ। অত্র গ্রথনং মাল্যগ্রথন এবান্তর্ভূতম্; ভক্তি-বিশেষেণাবস্থাপনং কলান্তরম্"—জয়মঙ্গলা।

ভক্তি—(১) বিভাগ, ভাগ, ভাগে ভাগে বা স্তরে স্তরে সাজান—texture, arrangements, সাজ গোজ—decoration, embelishment.

জয়মঙ্গলার মূল বক্তব্য এই যে সূতা দিয়া ফুল গাঁথা হইলে উহা 'মাল্য গ্রথন' কলার মধ্যে পড়িবে। আর না গাঁথিয়া ফুল কেবল সাজাইলে উহা গ্রথন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এই কুসুমবলিবিকার কলার মধ্যে পড়িবে।

৩। (৪) শ্রেণীর মতাবলম্বিগণের সিদ্ধান্তে এই কলাটির তিনটি ক্ষুদ্র বিভাগ আর সম্ভব হয় না—হয় মাত্র দুইটি—(১) তণ্ডুল-বিকার ও (২) কুসুম-বলি-বিকার। (১) (২) (৩) শ্রেণীর মতানুসারিগণের মতে ইহাতে তিনটি অবান্তর কলার অন্তর্ভাব।

৪। আমি স্বয়ং আমার এক যজমান-গৃহে একটি উড়িয়া মালীকে এমন সুন্দর ভাবে পূজার পুষ্পপাত্র সাজাইতে দেখিয়াছি যে, হঠাৎ একটু দূর হইতে দেখিলে একখানি ছবি বলিয়া ভুল হইত।

৫। যাঁহারা নৈবেদ্য সাজানকে 'তণ্ডুল-বিকারে'র অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করেন, তাঁহাদিগের মতে 'বলি-বিকার' আর একটি স্বতন্ত্র কলা নহে—তণ্ডুল-বলি-বিকার ও কুসুম-বলি-বিকার এই দুইটি মাত্র কলা।

৬। কামসূত্র, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬৪। ৺তর্করত্ন মহাশয় ইহার তিনটি বিভাগই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলি-বিকারের মধ্যে কেবল নানাবর্ণের মণ্ডল রচনাই ধরিয়াছেন—নৈবেদ্যকে বাদ দিয়াছেন।

৭। শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, ১২৯২, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬। ৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতেও ইহার মধ্যে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলা। তবে তিনি যে কেন বলিলেন—এখন আর ইহা নাই, একেবারে লোপ হইয়াছে—তাহা বুঝা যায় না। এখনও এসকল কৌশলের পরিচয় বহু ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। আর 'অকর্ম্মণ্য ব্রাহ্মণেরা এই কার্য্য করিত'—ইহাও বলা অনুচিত। যাহারা এরূপ শিল্প-কুশল তাহাদিগকে 'অকর্ম্মণ্য' বলা যায় কিরূপে? বরং 'মূর্খ' বলিলেই শোভন হইত।

৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মতে—"পূজা-যাগ-যজ্ঞের সময়ে নৈবেদ্য প্রভৃতির রচনা, পুষ্প প্রভৃতির সংস্থানরূপ ব্যবসায়"।৮

কলা—তণ্ডুল-বলি-বিকার ও কুসুম-বলি-বিকার।

৺কুমুদচন্দ্র সিংহের মতে—"ইহা বোধ হয়, আলেপন দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য ও মালা গ্রথন কার্য্য"।৯

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলে বলি-কর্ম্মের পক্ষে পর্য্যাপ্ত পুষ্প চয়নের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আর মৃচ্ছকটিকে পাওয়া যায়—দ্বিজ চারুদত্তের গৃহ দেহলীতে প্রদত্ত ভূত-বলি হংস ও সারসে ভোজন করিত।১০

কুসুম সজ্জার বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর। উহার আর বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

৭। পুষ্পাস্তরণ—'আস্তরণ' শব্দের অর্থ আবরণ, আচ্ছাদন, চাদর। জয়মঙ্গলা টীকাতে বলা হইয়াছে—সূচী ও সূত্রের সহযোগে নানা বর্ণের কুসুম গ্রথিত করিয়া বাসগৃহ ও দেবতার উপস্থান-মণ্ডপাদি সজ্জিত করার কৌশল—ইহারই অপর নাম 'পুষ্পশয়ন' বা ফুলের বিছানা।১১ মালাগাঁথা এ কলার অন্তর্গত নহে—উহা 'মাল্য-গ্রথন-বিকল্পের অন্তর্ভুক্ত। এ কলাটির মূল বিষয় হইতেছে ফুল দিয়া বিছানা তৈয়ারী করা। ফুলের সাজ ও ফুলের গহনা, ফুল দিয়া বাড়ী-ঘর-দ্বার সাজান, ফুলের তোড়া বাঁধা ইত্যাদি কার্য্যও ইহার অন্তর্গত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

৺ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এ প্রসঙ্গে যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য—পুষ্পদ্বারা শয্যারচনা-শিল্প। ফুল পাতিলেই শয্যা রচনা হয় না; এমন কৌশলে এই পুষ্প-বিন্যাস হইত, যাহা দেখিলে শুভ্রবসনাচ্ছাদিত সোপধান পুরু বিছানা বলিয়া বা নানা বর্ণের উৎকৃষ্ট গালিচা বলিয়া ভ্রম হইত"।১২

যেমন নানা রঙের ফুল-লতা-পাতা-কাটা চাদর গালিচা ইত্যাদি বিছাইয়া শয্যা রচনা করা হয়, সেইরূপ কেবল নানা বর্ণের ফুল সুকৌশলে সাজাইয়াও ফুলের কৃত্রিম বিছানা তৈয়ারী করা যাইতে পারে। তবে কেবল এলোমেলো ভাবে কতকগুলি ফুল ছড়াইয়া রাখিলেই বিছানা হইবে না। এমন কৌশলে ফুলগুলি সাজাইতে হইবে যে, কিছু দূর হইতে সহসা দেখিলে নানা রঙের ফুল-কাটা, গালিচা বা চাদর বলিয়া ভ্রম হইবে। শয়ন-গৃহে বা দেবতার উপাসনা-মন্দিরে এইরূপ 'ফুল-শয্যা' তৈয়ারী করার কৌশল এককালে খুবই আদৃত হইত।

মতান্তরে' এ কলাটিতে বাগানে নানারূপ ফুলের কেয়ারী করা বুঝাইয়া থাকে।

৺কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে 'ফুলের শয্যা ও ব্যজন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা। মালীরা এই কার্য্য করিত। এখনও ফুলের স্তবক (তোড়া) পাখা ও হার প্রভৃতি রচনা করিয়া মালীরা উপার্জ্জন করিয়া থাকে"।১৩

৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের মতে—"ফুলের শয্যা আস্তরণ প্রভৃতির রচনা"।১৪

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—"সূচ-দ্বারা সেলাই করত নানা বর্ণে পুষ্পের মালা রচনা কার্য্য"।১৫

৮। দশনবসনাঙ্গরাগ—টীকাকার বলিয়াছেন, 'রাগ' শব্দটি 'দশন' 'বসন' ও 'অঙ্গ' এই তিনটী শব্দের সহিতই যুক্ত করিয়া অর্থ বিশ্লেষণ করিতে হইবে। অঙ্গরাগ—কুঙ্কুমাদি-দ্বারা অঙ্গ-মার্জ্জনা। সাধারণভাবে 'রঞ্জন-বিধি' এই নাম দেওয়াই উচিত ছিল। তাহা না দিয়া দশন-বসন-অঙ্গ-শব্দগুলি প্রযুক্ত হওয়ায় আদরের আধিক্য সূচিত হইতেছে; কারণ বিলাসিনী নারীগণের নিকট দশনাদির সংস্কার অত্যন্ত অভীপ্সিত।১৬

টীকাকারের মতে, এই কলাটির মধ্যেও ছোট ছোট তিনটি কলার একত্র সমাবেশ—(১) দশনরাগ—দাঁত রং করা। অনেক সময় দাঁতে সোনালী-রূপালী রঙ ও অন্যান্য অনেক প্রকার চিত্র-বিচিত্র করা হইত। আমাদের বাঙ্গালা দেশে কিছুদিন আগেও মেয়েদের মধ্যে মিশি দেওয়ার প্রথা ছিল। উদ্ভট কবিতাতেও 'গৌড়াঙ্গনাদিগের দন্তে কামদেবের বসতি—এই মর্ম্মে গৌড়-কামিনীগণের দশনরাগের প্রশংসার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।১৭ অনেক অসভ্য আদিমজাতির মধ্যে আজিও লাল নীল ইত্যাদি নানা রঙে দুইপাটী দাঁত চিত্রিত করার প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও সোনা বা রূপা দিয়া অথবা সোনালী-রূপালী সিমেণ্ট দিয়া বাঁধাই বা দাঁতের গর্ত্ত ভরাট করা হইয়া থাকে; কখনও কখনও বা সোনালী জলে বা সিমেণ্টে দাঁত গিল্‌টি করা হয়। খোট্টা-মারবাড়ীগণও অনেক সময় সম্মুখের দাঁত ছিদ্র করিয়া উহাতে সোনা পুরিয়া ভরাট করে—যাহার দিবার উদ্দেশ্য। তবে আজকাল এসকল কার্য্য দন্ত-চিকিৎসকগণই প্রায় একচেটিয়াভাবে করিয়া থাকেন।

(২) বসনরাগ—কাপড় ছোবান, কাপড়ের পাড় ছোবান, কাপড়ের খোলে নানারূপ ফুল-লতা-পাতা ছোবান, গায়ের কাপড় (বিশেষ শীতবস্ত্র) রঙ করা ইত্যাদি ইহার বিষয়। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে বলে dyeing. এককালে রঙ-করা ফুলদার মিহি ঢাকাই শাড়ী ইত্যাদির চলন খুব বেশী ছিল। আজকাল উহার পরিবর্ত্তে নানা রঙে ছোবান সিল্ক বা খদ্দরের শাড়ী, চাদর, শাল ইত্যাদি বাজারে খুবই চলিতেছে। এসকলই বসনরাগের দৃষ্টান্ত। এসম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

৮। কল্কি-পুরাণ, প্রথম অংশ, পৃঃ ২৩। ইহার মতে দুইটীমাত্র।

৯। কৌমুদী, পৃঃ ২৭। মালাগ্রথন যে এই কলাটির বিষয় নহে—উহা মাল্য-গ্রথন-বিকল্পের অন্তর্গত—ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

১০। "অবচিতানি বলি-কর্ম্ম-পর্য্যাপ্তানি কুসুমানি (অবইদাইং বলি-কম্মপজ্জত্তাইং কুসুমাইং)" অভিজ্ঞান-শকুন্তল, অঙ্ক ৪।

"যাসাং বলিঃ সপদি মদগৃহদেহলীনাং হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিলুপ্তপূর্ব্বঃ" মৃচ্ছকটিক ১।৯। এ স্থলে 'বলি' অবশ্য ভূত-বলি; পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত ভূত-যজ্ঞের অঙ্গরূপে প্রদত্ত।

১১। "নানাবর্ণৈঃ পুষ্পৈঃ সূচীবানাদিবদ্ধৈরত্যাস্তৃতৈ' র্বেশ্ম বাসগৃহোপস্থান-মণ্ডপাদিষু, তচ্চ পুষ্পশয়নমিত্যপরা সংজ্ঞা"—জয়মঙ্গলা।

সূচী-বানবদ্ধ সূচী ও সূত্র দ্বারা সেলাই করা।

উপস্থান-মণ্ডপ—পূজার দালান। উপস্থান দেবপূজা।

১২। কামসূত্র, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬৪।

১৩। শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, ১২৯২ সাল, পৃঃ ৬। কেবল মালীরা এই কার্য্য করিত—ইহা বলা অনুচিত। ইহা যখন একটি কলা, তখন কলাভিজ্ঞ ও কলাভিজ্ঞা নরনারীগণ নিশ্চয়ই ইহার অভ্যাস করিতেন। মালীদের ইহা জীবিকার উপায় হইতে পারে, কিন্তু কলা হিসাবে ইহা কলাবিদ্‌গণের অভ্যাসার্থ।

১৪। কল্কিপুরাণ, প্রথম অংশ, পৃঃ ২৩। ফুলের আস্তরণ রচনা এ কলার বিষয় নহে। উহা অন্য কলার অন্তর্গত (শেখরকাপীড়যোজন দ্রষ্টব্য)।

১৫। কৌমুদী, পৃঃ ২৮। পুষ্পের মালা রচনা এ-কলার বিষয় নহে—ইহা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

১৬। "রাগশব্দঃ প্রত্যেকং যোজ্যতে। তত্রাঙ্গরাগোঽঙ্গমার্ষ্টিঃ কুঙ্কুমাদিনা। রঞ্জনবিধিরিতি বক্তব্যে দশনাদিগ্রহণমাদরার্থম্—বিলাসিনীনাং দশনাদিসংস্কারস্যাত্যন্তাভীষ্টত্বাৎ"—জয়মঙ্গলা।

১৭। বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনকজনপদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে।
দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং সুবিন(ত) ভুজবনে চোৎকলপ্রেয়সীনাম্।
তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজলঘনরুচৌ কেরলীকেশপাশে
কর্ণাটীনাং মুখেন্দৌ স্ফুরতি রতিপতিগুর্জ্জরীণাং স্তনেষু॥

(৩) অঙ্গরাগ—অঙ্গরাগের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই। অঙ্গরাগ করার প্রথা সেকালেও ছিল, একালেও আছে, পরবর্ত্তী কালেও থাকিবে। তবে সেযুগে যে সকল পদার্থ অঙ্গরাগের উপকরণ বলিয়া গণ্য হইত, এখন সে সকল উপাদান পুরাতন অচল হইয়া গিয়াছে। নিত্য নূতন অঙ্গরাগের উপকরণ আবিষ্কৃত হইতেছে। দেশী বিদেশী প্রসাধনের দ্রব্যে বাজার পূর্ণ! সে যুগে অধরোষ্ঠে দেওয়া হইত লাক্ষারাগ, পাউডারের পরিবর্ত্তে বিলাসিনীগণ বদনে মাখিতেন লোধ্র-পুষ্পের রেণু, চরণ রঞ্জিত হইত লাক্ষারস-সিক্ত অলক্তক-রাগে, আর গাত্র-মল দূরীকরণ উদ্দেশ্যে নিয়মিত-ভাবে 'ফেনক' ব্যবহৃত হইত।১৮ আজকাল যেমন ঠোঁটে 'লিপ্ ষ্টিক্' ঘষা হয়, সেকালেও সেরূপ অধরোষ্ঠ-রাগের অভাব ছিল না। পাতলা করিয়া আল্তার রঙ্ ঠোঁটে লাগাইয়া তাহার উপর সিক্থকগুটিকা (মোমের গুলি) দিয়া মাজিয়া দিলে উহা বেশ চিক্কণ রক্তবর্ণ দেখাইত। সেকালের অঙ্গরাগের কি কি উপাদান ছিল ও কি ভাবে কোন্‌টি কোন্ অঙ্গে লাগাইতে হইত, তাহার একটি বিস্তৃত বিবরণ কামসূত্রের 'নাগরক-বৃত্তে'র মধ্যে পাওয়া যায়।১৯

সিক্থকগুটিকা—মোমের গুলি। অলক্তক-পিণ্ড দিয়া ওষ্ঠাধর রঞ্জনের পর সিক্থকগুটিকা ঘষিলে লিপষ্টিক্ ঘষার কার্য্য হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে কিছুদিন পূর্ব্বেও সিন্দুর, নানাবিধ তৈল, দুধের সর, মাখন, বেসন, ময়দা ইত্যাদি খাঁটি দেশী দ্রব্য অঙ্গরাগের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইত। উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ইত্যাদি দক্ষিণ অঞ্চলে দরিদ্র স্ত্রীলোকগণ অর্থাভাবে অঙ্গরাগের অন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া হলুদ বা ঐরূপ সুলভ অথচ স্বাস্থ্যকর পদার্থের সাহায্যে অঙ্গরাগ সমাধা করিয়া থাকেন।

১৮। ফেনক—যাহাতে ফেনা জন্মায়, এরূপ কোন তৈলাক্ত পদার্থ, সাবানের মত জিনিষ – (কাঃ সূঃ (১।৪।১৭)

১৯ নাগরকবৃত্ত বা সেকালের বাবুয়ানা—কামসূত্র প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে সকল পদার্থ অঙ্গরাগের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইত, কেবল বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করাই সেগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। শরীরের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গের লোমকূপগুলি পরিষ্কার রাখা ও অঙ্গরাগ মাখিবার কালে অঙ্গ-মর্দ্দন-দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন ও যথাযথ ভাবে রক্ত সঞ্চালন, স্বাস্থ্যের অনুকূল অথচ সুগন্ধি ও হৃদ্য নানা দ্রব্যের অনু-লেপন-দ্বারা শরীরের সুস্থতা ও সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রসন্নতা সম্পাদন ইত্যাদি ছিল তৎকালে অঙ্গরাগের উদ্দেশ্য।

৺ তর্করত্ন মহাশয়ের মতের সহিত যশোধরের মতের ঐক্য বর্ত্তমান—"এক কথায় ইহা রঞ্জনশিল্প নামে অভিহিত" ।২০

৺ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—"পূর্ব্বকালের লোকেরা দাঁতে নানা প্রকার ছক কাটিত, গাত্রে উল্‌কি পরিত, সে সকল এক্ষণে সভ্য-সমাজ হইতে দূর হইয়াছে। বস্ত্র-রঞ্জন ও অঙ্গরাগের মধ্যে আল্‌তা পরা এই দুইটি বিলাসিনীরা অদ্যাপি বজায় রাখিয়াছেন" ।২১

৺ সমাজপতি মহাশয়ের মতে—"দশন, বসন ও অঙ্গরঞ্জনের বিদ্যা বা ব্যবসায়" ।২২

৺ কুমুদচন্দ্র সিংহের মতে---"দন্তে, বস্ত্রে এবং অঙ্গে (শরীরে) নানাপ্রকার বর্ণযোগ" ।২৩

২০। কামসূত্র, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬৪

২১। শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, পৃঃ ৭ ; ইঁহার মতে—উল্‌কি-পরাও অঙ্গরাগের মধ্যে গণনীয়। আমাদিগের মনে হয়, উল্‌কি-পরা বিশেষকচ্ছেদ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিলেই শোভন হয়]

বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিয়াছেন, "অঙ্গরাগের মধ্যে এক আল্‌তা পরা মাত্র বিলাসিনীরা অদ্যাপি বজায় রাখিয়াছেন"। তাহা কি ঠিক? আজকাল অঙ্গরাগের বহর অনেক বেশী।

২২। কল্কিপুরাণ, ১ম অংশ, পৃঃ ২৩

২৩। কৌমুদী, পৃঃ ২৮

মর্ম্ম ও কর্ম্ম (উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

আট

বিকাশ একটা সস্তা মেসেই বাসা নিলে। তার বন্ধুরা তাকে বলে, "এত টাকা মাইনে পাও, একটা বাড়ী ভাড়া কর না।"

সে কিছু বলে না, মুখ টিপে হাসে। সংক্ষেপে খরচ চালায়, বাকী টাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখে—দু মাস বাদে সবার জন্য প্রেজেণ্ট নিয়ে যেতে হবে, তার জন্য টাকা চাই।

খুব টানাটানি ক'রেও দু'মাসের ভিতর টাকাটা জমলো না, আর এক মাস অপেক্ষা ক'রতে হ'ল।

তিন মাস পর রোজ আফিস থেকে ফেরবার পথে সে কতক জিনিষ কিনে এনে মজুদ করতে আরম্ভ ক'রলে। যে যা চেয়েছিল সব কেনা হ'ল, আর বসন্তের জন্য কেনা হ'ল একখানা খুব ভাল টেনিস র‍্যাকেট। গীতার জন্যে হ'ল একটা চুণি বসান সোণার ইয়ার-টপ্। কেনা কাটা হয়ে গেলে শুক্রবারের জন্য ব্যগ্র প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে লাগলো সে। শনিবারটা ছুটি নিয়ে সে শুক্রবারই যাবে রাঁচী।

এবার সে এসে সবাইকে যার যার জিনিষ বিলিয়ে দিলে। আর সবাই খুসী হ'ল, কেবল হ'ল না অনন্ত আর গীতা। অনন্ত তার রাগ আর সোয়েটারটা বার বার টিপে টিপে দেখে বললে, "এঃ! একদম ঠকিয়েছে। কোথাথেকে কিনেছিস?"

বিকাশ একটা বড় দেশী দোকানের নাম ব'ললে, অনন্ত ব'ললে, "যা ভেবেছি। এসব জিনিষ সাহেবী দোকানে কিনতে হয়। একই দোকানের এক মার্কার জিনিষ দেশী আর বিলাতী দোকানে কোয়ালিটির আকাশ পাতাল তফাৎ হয়। যা'ক, যা' এনেছ এই বেশ। সাহেব বাড়ী থেকে আনলে দামও বেশী লাগতো, হয় তো কুলোতে পারতে না।"

বিকাশের তুচ্ছ দেড়শো' টাকা রোজগারের উপর স্পষ্ট কটাক্ষপাত। পরের দিন বিকাশ দেখলে অনন্ত এক বন্ধুকে সেই রাগ ও সোয়েটার দিয়ে দিলে অশ্রদ্ধা ক'রে। বিকাশ মনঃক্ষুণ্ণ হ'ল, রাগও হ'ল তার। সে কিছু বললে না।

গীতার অসন্তোষটা হ'ল ভিন্ন রকমের। কাণের টপটা দেখে সে বললে, "দিব্যি টপটা। কত দিয়ে কিনলে?"

"পঁচিশ টাকা।"

"ও বাবা! হাঁ বিকাশ দা', কত টাকা তুমি রোজগার কর যে সবাইকে এমনি সব দামী দামী—জিনিষ দিচ্ছ? হাজার দু'হাজার? ছিঃ এমন অপব্যয় ক'রো না। নিজে হয়তো সেখানে পেট শুকিয়ে প'ড়ে থাক। না হবে কেন? যে ঘরে মানুষ হয়েছ তার হাওয়া যাবে কোথায়?" বলে সে হেসে উঠলো।

এই তিরস্কারে বিকাশের মনের ভিতর খোঁচা লাগলো, বিশেষ ক'রে

এই জন্তে যে এই তিরস্কারটা সম্পূর্ণ সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সে অনুভব ক'রলে যে গীতা যা' বলেছে ঠিক, কিন্তু তবু সে তাকে আদর ক'রে একটা জিনিষ দিতে এসেছে, তাতে এ কথা তাকে বলাটা অমার্জ্জনীয় রূঢ়তা! যোলো বছরের মেয়ের পক্ষে এ সব কথা তার বয়োজ্যেষ্ঠকে বলা একটা বেয়াড়া রকমের জ্যাঠামো। তা ছাড়া তার খুব বেশী ক'রে মনে হ'ল এই কথা যে, গীতাও তার দাদা অনন্তের মতই তার সামান্ত রোজগার নিয়ে একটু টিটকারী দিয়ে গেল। ভাবটা এই যে, তুমি আমাদের বাড়ীর কর্ত্তার মত দু'হাজার টাকা রোজগার তো কর না, সামান্ত দেড়শো টাকা রোজগার তোমার, তোমার এসব দেবার স্পর্দ্ধা কেন?

বিকাশ যেটাকে ঠাওরালে তার রোজগারের স্বল্পতার উপর প্রচ্ছন্ন টিটকারী, তাতে সে এত চটে গেল যে সে এ কথার কোনও একটা জবাব দিতে পারলে না, মুখ ক'রে চলে গেল। মনে মনে মনে সে তখনি প্রতিজ্ঞা ক'রলে, বড়লোক হ'তে হবে তার, মেসোমশায়ের চেয়ে অনেক বেশী বড় লোক হতে হবে, তবে এদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল মেশোমশায় না বড় লোক আছেন, তিনি দেড়শো টাকা রোজগারকে তুচ্ছ ক'রতে পারেন, কিন্তু এরা দু'টি ভাইবোন, মেসোমশায়ের অনুগ্রহপুষ্ট পরান্নভোজী হয়ে এদের এতখানি তেজ কিসে? সাধে কি বলেছেন কবি, "দীপ্তসূর্য্য সহ্য হয় তপ্ত বালি চেয়ে।"

হরিনাথবাবু অফিস থেকে ফিরে খেয়ে দেয়ে সুস্থির হ'লে বিকাশ অত্যন্ত সসংকোচে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেসোম'শায়কে সে তার এক মাসের মাইনে প্রণামী দিতে এসেছে। এতক্ষণ সে এই টাকাটা দেওয়ার কল্পনায় খুব উল্লাস ও তৃপ্তি অনুভব ক'রছিল। কিন্তু এখন যেন সংকোচে তার হাত-পা' পেটের ভিতর ঢুকে যাচ্ছিল। বিশেষতঃ অনন্ত ও গীতার কথা শুনে তার মনে হচ্ছিল যে, মেসোম'শায়কে সামান্ত এই দেড়শো টাকা দিতে যাবার স্পর্দ্ধায় তিনি হয় তো তাকে টিটকারী দেবেন না, হয় তিরস্কার করবেন।

হরিনাথবাবু আজও একলা ব'সেছিলেন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের ভিতর তাঁর বৈঠকখানার ইজি চেয়ারে—একা। বিকাশ এসে কম্পিত হস্তে আলোর সুইচ টিপে দিয়ে তাঁর পায় প্রণাম ক'রে মেসোম'শায়ের ইজিচেয়ারের হাতলের উপর দেড়শো টাকার নোট রেখে দিয়ে নত মস্তকে দাঁড়াল।

হরিনাথবাবু উঠে ব'সলেন। টাকার দিকে চেয়ে পরম আনন্দে হেসে উঠে বিকাশকে একেবারে বুকের ভিতর টেনে নিলেন। যখন তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন, তখন বিকাশ দেখতে পেল তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, কিন্তু চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু।

কিছুক্ষণ কোনও কথা বল্‌লেন না মেসোম'শায়। নিঃশব্দে টাকাগু'ল নিয়ে তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে রেখে চাবী বন্ধ করে দিলেন। এটা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক, টাকা পেলে তিনি তা' বন্ধ না করেই দিয়ে দেন মাসীমার কাছে। তার পর সে টাকার আর কোনও খোঁজখবর নেন না।

অনেকক্ষণ মনে হ'ল তাঁর কণ্ঠরোধ হ'য়ে ছিল। যখন তিনি কথা কইতে পারলেন তখন বল্‌লেন, "জানিস ছোকরা, তোর এ টাকার দাম কত?——আমার কাছে এর এক এক টাকার দাম লাখ টাকা। এ টাকা খরচ হবে না। একে আমি খুব দামী album-এ বাঁধিয়ে রেখে দেবো। কেন জানিস? সারাজীবন আমি কেবল দিয়েই গেছি, রোজগার যা' ক'রেছি এক পয়সাও রাখি নি, দিয়েই গেছি—কিন্তু কেউ আমাকে ভালবেসে বা কৃতজ্ঞতাবশে একটি কাণা-কড়িও দেয় নি। জীবনে এই আমার প্রথম ভালবাসার উপহার।" বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

বিকাশ চিরদিন মেসোম'শায়কে জানে হাস্যময় রসিকতায় একেবারে উইট্ বুড। পাত্রাপাত্র-নির্বিশেষে সবার সঙ্গে তিনি কথা কম পরিহাস ক'রে, হাসি ছাড়া কথা নেই তাঁর। তাঁর এরকম ভাবাবেগ, তাঁর চোখে জল বিকাশ দেখেও নি, দেখবে ব'লে কল্পনাও করে নি কোনও দিন। তাই সে একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু আনন্দে গর্ব্বে তার বুক ফুলে উঠলো।

জন্ম সে পেয়েছে বাপ-মার কাছে, কিন্তু তার জীবন বলতে যা কিছু সবই তার মেসোম'শায়ের দান। শিশুকাল থেকে সে তাঁর অন্নে পুষ্ট, তাঁর সম্পদে সম্পন্ন। শিক্ষা যা কিছু পেয়েছে সে তাঁরই দয়ায়, আর তার খেলা, যা থেকে বলতে গেলে আজ তার প্রতিষ্ঠা---সেও মেসোম'শায়ের শিক্ষা ও উৎসাহের কাছে সম্পূর্ণ ঋণী। এ জন্ত কৃতজ্ঞ সে ছিল চিরদিনই, কিন্তু আজ তার মেসোমশায় তাঁর অন্তরের রুদ্ধ একটা কপাট খুলে তাঁর অন্তর যেমন করে মেলে দিলেন, তার কাছে তাতে তার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন ও প্লাবিত ক'রে বয়ে গেল এমন একটা প্রীতি ও সহানুভূতির বন্যা, যা সে জীবনে কোনও দিন অনুভব করে নি।

হরিনাথ বাবু আবার সেই ইজিচেয়ারে বসে তার হাত ধ'রে তাকে চেয়ারের হাতলের উপর বসালেন, তার হাতটা চেপে ধ'রে। সেই হাতের ভিতর দিয়ে বিকাশ অনুভব করলে তাঁর অন্তরের আবেগের মৃদু কম্পন।

হরিনাথ বাবু বলে গেলেন, "তুই হয়তো ভাবছিস যে, এত টাকা রোজগার করি আমি, তবু এ পাবার জন্য হাংলাপানা আমার কেন? কিন্তু বাবা, যে টাকা আমি রোজগার করি সে সবই রোজগার আমার পরিশ্রমের দাম। তার ভিতর স্নেহ নেই এক ফোঁটা। তার দামের সঙ্গে তুলনায় স্নেহের দান যে কাণাকড়ি, তারও দাম অনেক বেশী। সেইটে আমি পাইনি সারা জীবন, তাই তারই জন্তে আমার বুকভরা আছে তৃষ্ণা। পৃথিবীর সবার মুখের দিকে আমি আকুল ভিক্ষা নিয়ে চেয়ে দেখেছি এই স্নেহ ও প্রীতির দানের আশায়, পাই নি। পেলাম শুধু তোর কাছে। তাই আজ আমার এত আনন্দ। আশীর্ব্বাদ করি বাবা, বেঁচে থাক, সুখী হও, আর এমনি সুখ তুমি চিরজীবন সবাইকে বিতরণ কর।"

বিকাশের চোখ এবার জলে ভরে উঠলো, তারও কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল বাষ্পে। সে কম্পিত কণ্ঠে ব'ল্লে, "আপনার আশীর্ব্বাদ মেসোম'শায় ব্যর্থ হবে না।" ব'লে সে প্রণাম করলে আবার।

বাড়ীর ভিতর সে গেল না, গেল বাইরে। হাটতে হাটতে সে চ'ললো পথ দিয়ে।

তার অন্তর এতখানি পরিপূর্ণ হ'য়ে ছিল যে বাইরের সম্বন্ধে তার কোনও জ্ঞান ছিল না। মেসোমশায়ের সম্পন্ন আনন্দময় জীবনে যে এতবড় একটা নিঃসঙ্গ শূন্যতা চেপে র'য়েছে তা সে কোনও দিন কল্পনাও করে নি। আজ সে পেলো তার নিবিড় পরিচয়।

তাতে তার প্রান্ত করুণায়, স্নেহে তার অন্তর ভ'রে উঠলো।—সে যে তার এই রিক্ততার ভিতর এক ফোঁটা আনন্দ ভরে দিতে পেরেছে তাতে সে কৃতার্থ মনে ক'রলো আপনাকে।

চ'লতে চ'লতে সে এসে প'ড়ল রাচী পাহাড়ের-পাদমূলে। এইখানে এসে সে থমকে দাঁড়াল।

চারিদিকের সমতলের মাঝখানে এই পর্ব্বত আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে অনেক দূরে। অবিসম্বাদিত গৌরবে সে মহান, তার উচ্চতার আশে পাশে একটা ছোট টিলাও নেই তার গৌরবের নিঃসঙ্গতা দূর করবার। বিকাশের মনে হ'ল এই পাহাড়টা হরিনাথ বাবুর প্রতীক। তার বিস্তীর্ণ পরিবারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি এই তুঙ্গ শৃঙ্গের মত সগৌরবে। কিন্তু কি নিঃসঙ্গ তাঁর ঐ মহত্বের শিখর!

সে প্রতিজ্ঞা ক'রলে মেসোমশায়ের জীবনের এই উদাস রিক্ততা সে দূর ক'রে দেবে তার একান্ত স্নেহ ও সেবা দিয়ে। টাকা পয়সায় কাঙাল

তিনি নন, তবু সে কি পারবে না কোনও দিন তাঁকে এই টাকা রোজগারের ব্যর্থ ক্লান্তি থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি ও আনন্দের ধারায় অভিষিক্ত ক'রে রাখতে ?

মনে মনে কত কল্পনার ছবি রঙিন হ'য়ে ফুটে উঠলো। স্বপ্ন দেখলে সে যে হঠাৎ সে হ'য়ে উঠেছে মেসো মশায়ের চেয়ে ধনী···সে এসে তাঁকে বলছে, আপনি আর কাজ করবেন না, আমার সংসারে প্রভু হ'য়ে ব'সে আমার রোজগারের সব টাকা নিয়ে যা খুসী করুন। ভাবতে তার সর্ব্বশরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো।

বিকাশ যে আফিসে কাজ করে, তার বিপুল কারবারের একটা বড় অংশ পাটের রপ্তানী। সেই পাটের কারবারেই এখন বিকাশ কাজ করে, আর এখানে ইতিমধ্যেই তার আলাপ হ'য়েছে অনেক দালাল, মহাজন ও আড়তদারদের সঙ্গে। তাদের কাছে অনেক কাহিনী শুনেছে। পাটের কারবারে কতলোক যে রাতারাতি ধনী হ'য়েছে, কত বা ফকীর হ'য়েছে সে খবর কে জানে। বিশেষ ক'রে ফাটকা খেলায়, প্রায় কিছুই সম্বল না নিয়ে একটা season-এর কেনা বেচায় লক্ষ টাকা করা যায়, এ খবর সে শুনেছে।

...যদি সে তেমনি হঠাৎ লক্ষপতি হ'য়ে পড়ে। তা' হ'লে সে তার লক্ষ টাকা যদি এনে দিতে পারে মেসোম'শায়ের হাতে তবে কি তৃপ্তি, কি আনন্দে ভরে উঠবে তাঁর চিত্ত।

পরের দিন যখন সে ক'লকাতার ট্রেণে উঠলো, তখনও তার এ রঙিন স্বপ্নের আমেজ সম্পূর্ণ কাটে নি। সে মনে মনে স্থির ক'রলে একবার ফাটকার বাজারটায় টোকা মেরে দেখতে হবে। কে জানে হয় তো অদৃষ্ট খুলেও যেতে পারে।

চটপট ধনী হবার স্বপ্ন সে দেখতে লাগলো। আজকের এ স্বপ্নে দরিদ্র সেবার কল্পনা নেই—নিজের সুখের চিন্তা নেই—আছে মেসোমশায়ের তৃপ্তি ও আনন্দ ভরা অন্তর দেখবার আশা ও আনন্দ।

ক'লকাতায় এসে একজন পরিচিত পাটের কারবারীর সঙ্গে আলাপ হ'ল তার আফিসেই।

সে বল্লে, "এখন ফাটকার বাজার যা মন্দা যাচ্ছে, এই সময় যদি কিছু কিনে রাখা যায় তবে লোকসান হ'তে পারে না, কেন না দর এর চেয়ে নীচে কিছুতেই নামবে না। যদি নামে তো দু-চার আনা। বেশ কিছু বেড়ে যাবারই বেশী সম্ভাবনা। হাজার টাকার ঝুঁকি যদি নিতে পারেন, তবে বরাতে থাকলে অনেক টাকা পেতে পারেন।

হাজার টাকা! কোথায় পাবে সে? বছর খানেক বাদে হয় তো সে হাজার টাকা জমাতে পারে, কিন্তু তখন পাটের এ বাজার তো থাকবে না!

কিন্তু যতীনবাবু সদাশয়। তিনি হিসাব ক'রলেন বিকাশ দেড়শো টাকা মাইনে পায়, আরও মাইনে বাড়বে, একে হাজার টাকা ধার দিলে আদায় হওয়া সম্ভব। হেসে বল্লেন, "আমি ধার দিচ্ছি হাজার টাকা!"

ফাটকা বাজারে পাটের কেনা বেচা হয় কোটি কোটি টাকার। তার জন্ত পাটের দরকার হয় না। ব্রোকারদের মধ্যস্থতায় পাট কেনা বেচার চুক্তি হয়, নির্দ্দিষ্ট তারিখে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বেল দেবার চুক্তি। অধিকাংশ স্থলেই এ চুক্তি অনুসারে পাট সত্যি সত্যি বিক্রী হয় না, নির্দ্দিষ্ট দিন এলে তার ডেলিভারীও দিতে হয় না। যে দরে বেচবার চুক্তি হল, নির্দ্দিষ্ট তারিখে যদি তার চেয়ে বেশী দর হয় তবে বিক্রেতা ক্রেতাকে দেয় difference অর্থাৎ বাড়তি দামের পরিমিত টাকা। যদি দর কম থাকে তখন ক্রেতা difference দিয়ে খালাস হয়। নির্দ্দিষ্ট তারিখ থাকে তিন মাস বা ছ'মাস পরে। কাজেই ফাটকা বাজারে পাটের একটি আঁশেরও মালিক না হ'য়ে লোকে লক্ষ মণ পাট বেচে আর এক গাঁইট পাট কেনবার ইচ্ছা না ক'রলেও লক্ষ গাঁইট কিনিতে পারে।

বিকাশ এই অর্থ নিয়ে ফাটকার বাজারে খেলতে সুরু ক'রলে। বিকাশ পাট জন্মে দেখেছে কি না সন্দেহ, কিন্তু তার ব্রোকার তার হিসাবে বিস্তর পাট বেচা কেনা করতে লেগে গেল—সত্যি কিনবে ব'লে নয়—difference নিয়ে লেন দেন করবে ব'লে।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে তার ভাগ্যের যে পরিচয় সে পেয়েছিল, সে ভাগ্য এ জুয়াখেলাও তার সঙ্গে ছোট খাট কাজ থেকে সুরু করে ক্রমে সাহস করে সে আট দশ হাজার গাঁইটের কেনা বেচা আরম্ভ করলে। আর দেখা গেল সঙ্গে সঙ্গে পাটের দর তর্ তর্ করে বেড়ে যেতে লাগল আর সে তাতে দুই সপ্তাহ অন্তর difference পেতে লাগল বিস্তর টাকা।

বাজারে সামান্ত একটু মন্দা পড়তেই সে সব পাট বেচে দিলে। তাতে লাভ লোকসান খতিয়ে তার ব্যাঙ্কে দু'মাসের মধ্যেই জমলো ছ'কা দশ হাজার টাকা।

উল্লাসে বুক ফুলিয়ে সে ভাবলে, "এই শনিবার যাব মেসোম'শায়ের কাছে দশ হাজার টাকার চেক নিয়ে।" আর গীতার মুখের উপর একবার সে চেকটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। দেখাবে সে শুধু মাসে তুচ্ছ দেড়শো টাকা মাইনের কেরাণী নয়—হাজার হাজারের খবরও সে রাখে। সামান্ত একটা পঁচিশ টাকার টপ সে দিতে পারে!

দেখে গীতার পরাভূত গর্ব্ব মাটিতে মিশে যাবে এ কথা ভাবতে বিকাশের খুব আনন্দ বোধ হল।

ব্যগ্রভাবে সে শুক্রবারের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

শুক্রবার সকাল এলো—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এলো সর্ব্বনেশে টেলিগ্রাম।

মেসোম'শায়ের এপোপ্লেক্সী হ'য়েছে, অবিলম্বে যেতে হবে বড় ডাক্তার নিয়ে।

মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না ক'রে বিকাশ তার চেক বই হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়লো। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে দৈনিক হাজার টাকা ফি দিয়ে কলকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে সঙ্গে করে সে ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হ'ল রাঁচী।

[ক্রমশঃ

নব পরিচয়

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল

ও'মালা এ-গলে দিও না,
ও জ্বালা সহিব কেমনে ?
রজনী যে হ'ল উজলা
গন্ধে মদির ফুলবনে।

ও কথা আমারে বল' না,
ও ব্যথা বহিব কেমনে ?
কুলু কুলু বহে তটিনী
এস বসি তৃণ-আসনে।

ফিরায়ে লও তব ফুলহার,
মুছে ফেল দিঠে মনোভার।
অনায়াসে সহজ দিশি
ভুঞ্জিব মোরা দু'জনে।

মালা নয় ও যে আলাফল,
কথা নয় ব্যথা জেগে রয়।
আজ শুধু নব পরিচয়,
উদিল কি চাঁদ গগনে ?

তিন

বাঙ্‌লার প্রবাহিণী-প্রকৃতি

বাঙ্‌লার নদ-নদীর প্রবাহিণী-প্রকৃতিকে এই দেশের ভাগ্য নিয়ন্তারা নানারূপে ক্লিষ্ট ক'রে তুলছে। সেইজন্তে বাঙ্‌লার স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি দিনে দিনে ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে উঠছে। সমস্ত প্রাচীন প্রামাণিক তথ্য থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে এই বাঙ্‌লা ছিল স্বাস্থ্য-ধন্য ও সুসমৃদ্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে এক প্রত্যক্ষদর্শী বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের অভিমতে প্রকাশ—'বাঙ্‌লা মিশরের চেয়ে সমৃদ্ধতর', তিনি দুইবার বাঙ্‌লাদেশ পরিভ্রমণে এই ধারণা গঠন করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও অপর এক বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ হুগ্‌লী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলাগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে ব'লে গেছেন যে—অঞ্চলের আকার-বিস্তার অনুপাতে সারা হিন্দুস্থানের মধ্যে হাওড়া-হুগ্‌লী-বর্দ্ধমান উৎপাদনশীল কৃষি-বিষয়ক মূল্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করে; কিন্তু এই উক্তি আজ মিথ্যা হ'য়ে গেছে, ঐ অঞ্চল বর্ত্তমানে স্বাস্থ্য ও জমির অনুর্ব্বরতা বিষয়ে নিকৃষ্ট হ'য়ে উঠেছে—এ খুব অতিরঞ্জিত কথা নয়। বাঙলার পূর্ব্ববিভাগ তা'র নদীগুলি দ্বারা পুষ্ট হ'চ্চে ব'লে আজিও সমৃদ্ধিশালী ও স্বাস্থ্যপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক কালের পরিস্থিতিতে দুর্ভাগ্যের ভ্রূকুটিও বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারবে না, এর কারণ নির্ণয় করা খুব দুরূহ নয়, অবস্থাগতিকে বাধা-বিপত্তি এসে প'ড়ে স্বভাব-সিদ্ধ স্বাস্থ্যও নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে, জমির উর্ব্বরতাও কিঞ্চিৎ বাধাতাগ্রস্ত হ'য়ে পড়ছে। তবে এ আশঙ্কা অল্পদিনের, এই অঞ্চলের নদীর বদান্ততা স্বাভাবিক জীবনী-শক্তি বাঁচিয়ে রাখবে ব'লেই বিশ্বাস হয়। বাঙলার অন্যান্ত অংশে জল-সঙ্গতির কোনো অভাব নাই, কিন্তু দুষ্ট জল-বণ্টনের ফলে স্বাস্থ্য ও জমির উর্ব্বরতার উত্তরোত্তর ক্ষয় হচ্চে। কতকগুলি নদী দিয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত জল প্রবাহিত হ'য়ে প্রায়ই ভয়ঙ্কর বন্যায় অনর্থপাতের সৃষ্টি করছে, আর কোনো কোনো স্থলে স্বাভাবিক নাব্য স্রোতস্বতীর মধ্য দিয়ে জলপ্রবাহ এতোদূর হ্রাস পেয়েছে যে—অনেক ক্ষেত্রে পল্লী-অঞ্চলের জল-নির্গমের কাজও সেই সকল সরিৎ দ্বারা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। এর মধ্যে অনেক নদীই প্রকৃতি-চালিত নিয়মে পূর্ব্বাপর প্রবাহিত হ'তে পারলে যে যে অঞ্চল দিয়ে তাদের গতি—সেই সমস্ত স্থানে উপ্‌চে প'ড়ে গঙ্গা ও দামোদর প্রভৃতি নদীর প্রচুর পলি-দানে প্রাচুর্য্যে ও স্বাস্থ্য-ধনে উজ্জীবিত রাখতে সমর্থ হোতো। কিন্তু ভাগ্যবশে এই নদীগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বদ্ধবদ্ধ জলকুণ্ডে পরিণত হয়েছে—যার ফলে মশকবংশ বৃদ্ধি পাচ্চে। এই কারণে বাঙ্‌লার বহু জেলা—বিশেষতঃ পশ্চিম ও মধ্য ভাগের স্থান—অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হ'য়ে উঠেছে; সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যাও কমে যাচ্চে, আর জমিও ক্রমশঃ চাষ-আবাদের অভাবে পতিত হ'তে চলেছে।

প্রাগুব্য সকল জল-সঙ্গতির এইরূপ ত্রুটীযুক্ত অসম্পূর্ণ সন্নিবেশ হেতু বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় এসে পৌঁছুতে হয়েছে। আমরা জানি—স্বাভাবিক প্রণালীতে 'ব'-দ্বীপ গঠন-কার্য্যে মানুষের মধ্যস্থতা এর জন্য আংশিক দায়ী, আর দায়ী প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে—মানুষ বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে—নদীর অববাহিকা-অঞ্চল-বর্ত্তী (বেশীর ভাগ বাঙ্‌লার প্রত্যন্ত বিভাগে) সুবিস্তীর্ণ জঙ্গল ধ্বংস করে, আর ভূমির উপরের স্তর ক্ষয়-সাধন প্রভৃতি কাজে। এই কার্য্য-কারণে বন্যার সর্ব্বোচ্চ সীমা চিহ্ন আরো বর্দ্ধিত হয়, অনাবৃষ্টি-ঋতুর প্রবাহ হ্রাস পায়, আর স্রোতোবেগ যে পরিমাণ পলি ধারণ করতে অক্ষম—তার চেয়েও বেশী পলি স্রোতে বাহিত হ'য়ে নদী-গর্ভকে ভরাট ক'রে দিয়ে। বাঙ্‌লার প্রান্তসীমার মধ্যে মানুষের মধ্যস্থতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—প্রধানতঃ পশ্চিম বাঙ্‌লার ও অংশতঃ মধ্য বাঙ্‌লার বন্যারোধী বাঁধগুলি লক্ষ্য করলে; এর ফলে এ অঞ্চলের খরস্রোতা ও জোয়ার-ভাঁটা-খেলা নদীগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাঁধ-সকল বন্যার জল-নির্গম-প্রবাহিকা বিচ্ছিন্ন ক'রে প্রকৃতির দেওয়া সার থেকে জমিকে বঞ্চিত ক'রে তুলেছে, তদুপরি স্বাভাবিক জল-নির্গম জাল ও অঞ্চলবর্ত্তী পয়ঃপ্রণালীগুলিকে ধ্বংস ক'রে আজকের এই শোচনীয় অবস্থায় এনে পৌঁছে দিয়েছে। গঙ্গা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি সদাস্রোতা নদীগুলি অনেকাংশে প্রাকৃতিক কারণে ব্যাহত হয়েছে। এই সকল নদীর গতি-পরিবর্ত্তনের ফলে স্বাভাবিক জল-নির্গম পথ ও পয়ঃপ্রণালীর অধোগতি লক্ষ্য করা গেছে, এই কারণবশতঃ মধ্য ও উত্তর বঙ্গ আর ময়মনসিংহ জেলার কিছু কিছু অংশের স্বাস্থ্য-সম্পদ ও মাটির উৎপাদন-শক্তি অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।

এই সমস্যার সমাধান রয়েছে—বাঙলার প্রচুর জল-সঙ্গতির ন্যায্য ও পক্ষপাতশূন্য সন্নিবেশ করার 'পরে। বাঙ্‌লার পল্লী সংস্কার ও উন্নতির জন্য এই কার্য্যরীতি গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

বাঙ্‌লার নদীগুলির প্রবাহ-প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করলে এই বিষয়টি পরিষ্কার হ'য়ে উঠতে পারে।—প্রথম শ্রেণীর সদাস্রোতা নদীর মধ্যে গঙ্গা সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। এক্ষণে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র আমাদের আলোচ্য বিষয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিস্তানদীর গতি-পরিবর্ত্তনের জন্য উত্তর বঙ্গের দুর্দ্দশার সূত্রপাত,—ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে বর্ত্তমান যমুনার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান স্রোতোধারার গতি-পরিবর্ত্তন। আংশিক ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলাকে দুর্গতি স্পর্শ করেছে,—আর ষোড়শ শতাব্দীতে গঙ্গার মুখ্যস্রোত পদ্মা দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে মধ্যবাঙ্‌লার অবস্থান্তর ঘটিয়েছে।

তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের গতি-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোনো তর্ক উঠতে পারে না, কারণ এ ঘটনা বেশীদিন আগে ঘটে নাই।

তিস্তানদীর গতি-পরিবর্ত্তনের ফলে উত্তরবঙ্গের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটেছে—সেইটেই এখন বক্তব্য বিষয়।

তিস্তা ঃ তিস্তা সম্ভবতঃ ত্রিস্রোতারই অপভ্রংশ। এই নদী পূর্ণভবা, আত্রেয়ী, করতোয়া প্রভৃতি শাখা সমন্বিত হ'য়ে উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এই সমস্ত শাখা-নদী নিম্নদিকে উত্তরবঙ্গের পশ্চিম-সীমা-বাহিনী মহানন্দা নদীর সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে, তখন হুরসাগর নাম নিয়ে বর্ত্তমান গোয়ালন্দর নিকটবর্ত্তী জাফরগঞ্জে গঙ্গার স্রোতোধারা নিঃশেষ ক'রে দিয়েছে। হুরসাগর নদের আজিও অস্তিত্ব আছে—এই নদ গঙ্গার একটি প্রবাহিকা-সরিৎ, বোড়াল নদ, আত্রেয়ী, যমুনা বা যমুনেশ্বরী (যমুনেশ্বরী—যে নদীপথে এখন ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত—সেই প্রধান যমুনা নয়), আর করতোয়ার সম্মিলিত জলধারা,—কিন্তু গঙ্গায় মিলিত না হ'য়ে এই নদ প্রধান যমুনায় এসে মিশেছে—গোয়ালন্দে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম থেকে কয়েক মাইল ঊর্দ্ধে। বর্ত্তমানে পূর্ণভবা মহানন্দার উপনদী। মহানন্দা আর হুরসাগর নদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত না হ'য়ে স্বাধীনভাবে গোদাবরির কাছে গঙ্গায় এসে মিলিত হয়েছে।

এটা বেশ বোঝা যাচ্চে যে—তিস্তা তা'র কয়েকটী শাখা নদী ও মহানন্দার সহায়ে উত্তরবঙ্গ গঠন ক'রে তুলেছে! উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত ভূভাগ থেকে প্রতীত হয় যে—প্রাচীন যুগে আরো কয়েকটী নদী এই গঠন-কার্য্যে সহায় হয়েছিল। এই সম্পর্কে এক পাশ্চাত্ত্য বিশেষজ্ঞের অভিমত—যে কোশী নদী এখন ভাগলপুরের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত, পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গে প্রবাহিত হ'য়ে উক্ত নদীগুলির নিম্নবাঁকে এসে মিশতো, অতএব কোশী উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চল গঠনে সহায় ছিল—বলা যেতে পারে। ব্রহ্মপুত্র নদ-ও মেঘনার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য মৈমনসিংহ দিয়ে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হবার আগে উত্তরবঙ্গ গঠনে সহায়ক ছিল। অবশ্য এ-টি বিশেষজ্ঞদের অনুমান মাত্র—এ সম্বন্ধে প্রমাণ-প্রয়োগের অবকাশ আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গঙ্গা পদ্মাবাহিনী হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পদ্মা নদীও খুব সম্ভব উত্তর বঙ্গের দক্ষিণাংশ নির্ম্মাণে সাহায্য এনে দিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিস্তানদীতে ভীষণ বান ডাকে, সেই থেকে পূর্ব্বদিকে একটি পুরাতন পরিত্যক্ত পথ দিয়ে এই নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হয়, আর তা'র মিলন হয় বাহাদুরাবাদের কাছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ ঘটেছে ব'লেই মনে হয়। বাংলার বিবরণ-সংগ্রহে তা'র প্রমাণ পাওয়া যায় এই : "১১৯৪ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের যে ভয়াবহ বন্যা রংপুরের ইতিহাসে স্মরণীয় হ'য়ে রয়েছে—সেই বন্যার সময়ে তিস্তানদী তা'র প্রবাহ-পথ সহসা পরিত্যাগ ক'রে প্রবল স্রোতোধারা একটি পূর্ব্বতন ক্ষুদ্র শাখাসরিৎ দিয়ে চালিত করে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ছুটে চ'লে ব্রহ্মপুত্রে এসে পড়ে। সমস্ত মাঠ ও দেশের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে নিতে বন্যাস্রোত দিকে দিকে বেগে প্রবাহিত হয়।"

গতি-পরিবর্ত্তনের আগে তিস্তা ও মহানন্দার বর্ত্তমান উপনদী পূর্ণভবা আত্রেয়ী ও করতোয়ার মধ্য দিয়ে সমগ্র জলভার উজাড় ক'রে দিত, এই জলধারা গিয়ে পড়তো গঙ্গানদীতে। সেদিন উত্তরবঙ্গ বহুসংখ্যক প্রবাহিকা ও পয়ঃপ্রণালী দ্বারা আকীর্ণ ছিল, তাই এই সরিৎগুলির কার্য্যকারিতার গুণে সমগ্র অঞ্চল ছিল স্বাস্থ্যপূর্ণ ও সঙ্গতি-সম্পন্ন। তিস্তার গতি পরিবর্ত্তিত হবার পর থেকে হিমালয়ে গৃহীত ফসপ্রসূ পলি-বাহী মুখ্য জলধারা সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হ'য়ে গেছে। সেই জন্য এই সরিৎগুলি ক্রমশঃ মজে যেতে বসেছে, আর অসমান জল-নিকাশের কারণে এ-গুলি স্রোতোহীন হ'য়ে পড়ছে,—দেশেরও স্বাস্থ্য ও উর্ব্বরতা দ্রুতগতিতে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। জল নিকাশের স্বচ্ছন্দ গতি মন্দ হবার আর একটি কারণ ঊর্দ্ধদিকে উচ্চভূমিস্থ জল-চাপের অভাব, ফলে দাঁড়াচ্ছে এই যে—গঙ্গা-যমুনার বন্যাস্রোত পিছন দিকে ঠেলে এসে উত্তরবঙ্গের জল-নির্গম-পথগুলিকে পলিপঙ্কে রুদ্ধ ক'রে দিচ্ছে।

এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বৃষ্টিধারা-নিকাশ-ক্ষম উপযুক্ত জল-নির্গম সরিতের অভাবে বন্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, উপরন্তু গঙ্গা-যমুনার বন্যা-স্রোত উচ্চ ও প্রবল হ'য়ে উঠলে—এই অঞ্চলের দুর্গতির আর সীমা থাকে না। বন্যা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আর্ত্তদের কোনো রকম সাহায্য দেওয়া কঠিন হ'য়ে ওঠে। যতদূর সম্ভব পূর্ব্বাবস্থা যদি ফিরিয়ে আনতে পারা যায়—তা' হ'লে এই সমস্যার সমাধান হ'তে পারে,—এর অর্থ...নদীগুলির পুনরুজ্জীবন ও সেগুলির মধ্য দিয়ে তিস্তার স্রোতের কিয়দংশ পরিচালিত করা। এই তিস্তানদীর স্রোতঃপ্রবাহ ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে মিশে কোনো উপকারেই আসছে না—বরং যমুনার উত্তরপার্শ্বে বন্যার বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হ'য়ে উঠেছে। তিস্তার গতি-ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে পলি সমৃদ্ধ বন্যার সহায় উত্তরবঙ্গের উর্ব্বরতা ও শস্য-উৎপাদন-শক্তি ফিরিয়ে আনা যাবে, সঙ্গে সঙ্গে জল-নির্গমপ্রণালীগুলিকে কার্য্যকরী ক'রে তোলা সম্ভব হ'বে, সুগতি প্রবাহিকার সাহায্যে জমিতে পলি গচ্ছিত রেখে জল হবে নির্গত। উত্তরবঙ্গের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করবার জন্য আরো কারণ নির্গমের দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। কিন্তু পয়ঃপ্রণালীর উৎকর্ষ আনতে পারলেই সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করা সম্ভব হ'য়ে উঠবে।

তোমারই (উপন্যাস)

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

সুলেখার বিয়ের পর একটি বছর কেটে গেছে। কত লোকে কত কথা বললো, সুলেখার বিয়ের কথা নিয়ে কত আলোচনা চললো, লোকের মুখে মুখে কথাটা ঘুরতে ঘুরতে সতীর কানে আগুন ছড়িয়ে দিল। সুলেখা যত শুনল' ঐ সব কথা ততই মনটাকে শক্ত করে নিল। ওদের সমাজের সমস্ত আইনের ওপর ও কালির আঁচড় বুলিয়েছে, লোক-লৌকিকতার সমস্ত বাঁধন খুলিয়েছে ওদের কথার মালা গলায় ক'রে—সেই কথাকে ভয় পেলে এখন চলবে না, মনকে তাই ও নতুন ছাঁদে ঠেলে নিল। সতী কিন্তু চিরকালই অতীত কালের সংস্কারের অহংকার করে। ওর মন যতই সুলেখাকে শক্ত করে তুলে ধরতে চেষ্টা করে সহজ ভালবাসার তাগিদে, ততই বাইরের প্রচণ্ড সমালোচনার স্পর্শে ভেঙে ভেঙে পড়ে। পাড়ার পাঁচজন চড়া গলায় নিন্দে করছে বলে নয়, ওর মন থেকে থেকে এরই মধ্যে অশুভ একটা কালো ছায়া দেখে ভয় পেয়ে শিউরে উঠছে।

সুলেখাকে সতী বারবার ভাবে জিজ্ঞাসা করবে, ও সুখী কি না, কিন্তু পারে না। একটা ভয় ওর গলা টিপে ধরে। সুলেখা মাঝে মাঝে যাই যখন এ বাড়ীতে আসে, সতী তখন হতবাক্ হ'য়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। সুলেখা যদি জিজ্ঞেস করে কোনো কথা, চমকে উঠে ভাঙা ভাঙা উত্তর দেয়, এ কথায় সে কথায় সুলেখার স্বামীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়।

সুলেখার স্বামীকে দেখতে ভাল। যারা সুলেখাকে ভালবাসে, যারা সুলেখার সমাজের পিঠে চাবুক মারাকে সমর্থন করে, তারা বলে সুলেখার পছন্দ আছে। সতীও কখনও জানতে দেয় যে সুলেখার স্বামীকে ও দেখতে পারে না। তাকে দেখলেই সতীর মনে পড়ে এরই সঙ্গে ভাগ্য জড়িয়ে নিয়ে সুলেখার ভাগ্যটা আজ নির্দ্দেশহীন ছুটে চলেছে, আজ সুলেখার জীবনে এরই কালো ছায়া পড়েছে!

আজ সুলেখার প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী।

সকাল থেকেই সতীর মনটা খুব খারাপ। ঘুম থেকে উঠেই জানালার বাইরে প্রথম চোখে পড়ল' ল্যাম্প-পোষ্টের তারের ওপর ঝুলছে একটা মরা কাক। তাকে ঘিরে অজস্র কাক গোলমাল করছে। বাঙালীর মেয়ে, অন্ধ কুসংস্কার ঘিরে আছে অন্ধের দৃষ্টিতে চিরন্তনী অন্ধকারের মতন। অচল মনটার ওপর নিষ্ঠুর কষাঘাত করলে সকালের ঐ দৃশ্য।

অস্পষ্টে সতী বলে উঠল, "ভগবান"........

বিছানা ছাড়বার আগে ছোট্ট মেয়ে বেলার গায়ে চাদরটা ঠিক করতে গিয়ে বেলার গায়ে হাত পড়ল। গাটা গরম। জ্বর হয়েছে। মার স্পর্শ পেয়েই 'মাগো' বলে বেলা পাশ ফিরে শুলো। মনটা সতীর আরো খারাপ হ'য়ে উঠল।

আজ বরাতে না জানি কি আছে!

দরজার বাইরে পা দিতেই সতীর চোখে পড়ল' বাড়ীর পোষা পেশোয়ারী বেড়ালটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ভাবে শুয়ে আছে বারান্দার কোণে। থমকে দাঁড়াল' সতী। আড়ষ্ট মনটা অচল হ'য়ে উঠল। অস্পষ্ট ডাকল' নাম ধরে। বেড়ালটা নিশ্চল পাথরের মতন। সভয়ে এগিয়ে গিয়ে সতী দেখল' বেড়ালটা মরে গেছে।

মনটা ওর ভয়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল। এমন দিনে সুলেখার বিবাহ-বার্ষিকী! কি যে সব ভগবানই জানেন?

কোন রকমে সতী মনটাকে শক্ত করে বেঁধে নিল'। বাড়ীতে ওই কর্ত্রী। ওর ওপর ভর ক'রে সমস্ত সংসারটা চলে। ওর ভেঙে পড়লে চলবে না।

কাজের ভীড়ের মধ্যে সতী নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাইলে, কিন্তু পারলে না। থেকে থেকে ও যে জানালার বাইরে চেয়ে চুপ করে কি ভাবছে, দৃষ্টি যে ওর গতিহীন, অনির্দ্দিষ্ট, তা মার নজরে পড়েছে। তিনি যে জিজ্ঞাসা করবেন সে সাহসও নেই। তবু সাহস করে জিজ্ঞাসা করে বকুনি ছাড়া কিছুই মিলিল না। সতী ধমক দিয়ে উঠল, বললে "কিছু না।" তারপর আরও দু'তিনটে প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু শেষকালে না পেরে বলে উঠল, 'সমস্ত দিনটা বক্ বক্ করবে, না আমার কাজ করতে দেবে!

আর কোন রাহু, কোন দুর্ঘটনার রাহু ওর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অমনভাবে নিষ্পেষিত করছে?

রাত্রের নির্জ্জনতায় চুপচাপ শুয়ে শুয়ে সতী তাই ভাবছিল। ভাবনার ওর শেষ নেই। কেন এল না সুলেখার স্বামী? এই একটি প্রশ্নকে ঘিরে কত সহস্র উত্তর, কিন্তু কোনটিই ওর মনে ধরে না। যতবারই ও যতরকম উত্তর ঠিক করে, কোথাও না কোথাও একটা কাঁটা থেকে যায়। মন কিছুতেই মানতে চাইছে না যে ওর শরীরটা খারাপ। আজ সকাল থেকে ওর মন থেকে থেকে বেঁকে বসেছে। কালো আকাশের গায়ে বিদ্যুতের কষাঘাতের মতন ওর অন্ধকার মনের ওপর অকল্যাণের আশঙ্কা থেকে থেকে রেখা এঁকেছে।

সতী হঠাৎ চমকে উঠল।

কোন্ শব্দে পৃথিবীর ধ্যান ভাঙল?

কে যেন কাঁদছে? কোন শব্দ নেই, কোন ইঙ্গিত নেই, কিন্তু আভাষ আছে স্পষ্ট। এ যেন সেই অনুভূতি, যা ঘুমন্ত মানুষের মনে জাগে, যখন কারো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তার ওপর।

রাত্রির অবসাদে এক বিষাক্ত তীর সতীর মনে বিঁধল' নতুন ক'রে।

সুলেখা? সতীর মনটা ভেঙে খান খান্ হ'য়ে গেল।

সতীর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সুলেখার ওপর।

কোন শব্দ নেই···নিস্তব্ধ।

সতী আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দাঁড়াল' সুলেখার বিছানার ধারে। সুলেখা ওপাশ ফিরে শুয়েছিল, দিদির ঠাণ্ডা হাতখানা কপালের ওপর পড়তেই ও যেন ভেঙে পড়ল। বড় বড় কালো চোখের কোণ দিয়ে গড়ি'য়ে পড়ল একটি একটি অশ্রুবিন্দু। একটি, দুটি···আরো একটি·· তারপর আরো অনেক।

কান্নার আজ কোন মানা নেই।

বাইরের পৃথিবী আরও গভীর নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। তারাগুলোর মধ্যে অস্পষ্ট নীরবতা, অন্ধকার আরও তীব্র। আলোগুলো মুখোস প'রে রাস্তাগুলোকে পরিহাস করছে। রাস্তার ধারে ধারে গাছগুলো এক একটা কালো ভূতের মতন। সবাই আজ ওযা ভয়ের চিহ্ন আঁকা স্পষ্ট অকল্যাণ। ওপাশের বড় চুনবালী খসা পুরাণো বাড়ীটাও ঠিক তাই। অন্ধকারের মধ্যে আবছায়া দেখাচ্ছে যেন প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপ।

সতী বিছানার ওপর বসে পড়ল'। সুলেখা ওর কোলের মধ্যে মুখটা তুলে দিল। কান্নাটা সেইখানেই ও লুকোবে—যেমন করে পারে।

এদের দু'জনের কোন ভাষা নেই। ভাসা ভাসা চাউনি, সতীর আশ্বাসে সহানুভূতি। কি বলবে সতী? কাঁদবে? সমস্ত পৃথিবীটাই ত কাঁদছে।

সুলেখা কাঁদছে, সতী কান্না চেপে কান্না দেখছে। ঘড়িতে তিনটে বাজল'।

সুলেখা অনেকক্ষণ কাঁদল, অনেক চেষ্টা করেও কোন মতে নিজেকে সামলাতে পারল' না।

সতী বললে, "ঘুমো লেখা!"

সুলেখা অস্পষ্ট বললে, "তুমি ঘুমোতে যাও দিদি"···

"তুই ঘুমো দেখি!"...সতী বললে "কাঁদলে কি হবে, নিজেকে জীবনের কাছে ছোট করা ছাড়া ত' কিছুই নয়!"

সুলেখা কিছু বললে না, কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। "কি হয়েছে লেখা, আমাকে বল, মন তোর কিছু হাল্‌কা হবে!" কি করে বোঝাবে, কি বলবে? সুলেখা ভাবতে থাকে। দিদিকে বললে মন তবু ওর হাল্‌কা হবে, কিন্তু কি করে বোঝাবে?

যে কথা জড়িয়ে আছে ওর অনাগত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তের সঙ্গে, যে অশ্রু রেখার আলপনায় ওর হয়ত বাকি জীবনের সান্ত্বনা, কেমন করে আজ সে কথা ও দিদিকে বলবে? কোন মুখে বলবে ও, সর্ব্বসহা, সর্ব্বহারা বোনটিকে ওর ভাগ্যের পরিহাসের কথা। ওর জীবনের যে কাকতী সর্ব্বগ্রাসী হ'য়ে ওর মন প্রাণ, ওর সমস্ত অস্তিত্বকে, ওর নারী জীবনের চরম সার্থকতাকে গ্রাস করছে, সে কথা কেমন করে দিদিকে বলবে? কেমন করে বোঝাবে জীবনে ওর কি নেই, কিসের ওর অভাব! ওর সুন্দর স্বামী, ওর অর্থের স্বচ্ছলতার হাসিমাখা সংসার, কিন্তু কিসের শূণ্যতা সব অর্থহীন প্রলাপ করে দিয়েছে!

নিস্তব্ধ, নিঝুম পৃথিবী, রাত্রি যেন পুত্রহারা জননীর মতন। বাইরের অনন্ত নীরবতার মধ্যে নৃশংস যে সুর আজ সেটা এক হ'য়ে মিশে গেছে ওদের মনের সঙ্গে। দুটোর মধ্যে ঐক্য, দুটোর মধ্যে মিল, দুটোর মধ্যে কানাকানি, জানাজানি। মনের মধ্যে ওদের ঝড়, প্রকাশ করবার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু কেমন করে, কেন, কি হবে?

সতী সস্নেহে আবার বললে, "বললি না তো?"

সুলেখা বলবে। না বললে ওর চলবে না। জন্মাবার পর থেকে দিদি ছিল ওর ছায়া, আজ পর্য্যন্ত তার চেয়ে আপন আর কেউ হয়নি। ওকে বলবে, ওকে জানাবে নিজের ভাগ্যের কথা, জানাবে নিয়তির ব্যঙ্গ কেমন করে অঙ্গ হয়ে মিশে গেছে ওর জীবনের সঙ্গে। জানাবে জীবনের সব চেয়ে পূর্ণতার মধ্যে কতখানি শূন্যতা গোপন থাকতে পারে। দিদিকে আজ ও সব কথা বলবে, মনটাকে হাল্‌কা করবে, জীবনটাকে শক্ত করবে, ধৈর্য্যটাকে প্রখর করে নেবে। নিয়তির পরিহাসকে ও পরিহাস করবে, সহ্য করার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে, দিদির স্নেহের আড়ালে, সহানুভূতিতে, নিজের শূন্যতার অসহ্যতাকে জুরিয়ে নিবে।

আজ ও বলবে বলবে বলবে। সবাইকে বলবে। সবাইকে জানাবে নিজের গোপন কথা। যে কথা আজ প্রায় একবছর ও মনের মধ্যে চেপে নিয়ে কেঁদে বেড়িয়েছে গোপনে, সবার সামনে সুখ আর শান্তির মুখোস প'রে।

থেমে থেমে সুলেখা বলতে থাকে, "বাইরের দৃষ্টিতে আজকের দিনের প্রাচুর্য্য অপরিসীম, কিন্তু এর মধ্যে আছে গভীর শূন্যতা। সকলের দৃষ্টিতে আজকের দিনের মধ্যে যে রঙ সোনালী, আমার জীবনের কানায় কানায় আজ তার ধূসর প্রতিবিম্ব।"

দিদি চুপ করে শোনে· তারায় তারায় সুলেখার কথার প্রতিধ্বনি।

সুলেখা একটু থেমে আবার বলতে আরম্ভ করে, "তার প্রতি আমার ভালবাসার প্রথম সংসারের উজ্জ্বল আলোকে, কল্পনায় আড়াল করা জীবনের কৌতুহলী রূপে। ছোট্ট সংসার, ছোট্ট তার পরিসর। তার মাঝে আমাদের ঘেঁসাঘেঁসি। সংসারের প্রতি কোণে কোণে স্ত্রীর শ্যামল রূপের বিকাশ, স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য, স্বামী চিরাচরিত শৃঙ্খলহীনতাকে প্রশ্রয় দিয়ে তাকে সংসারের আবেষ্টনী দিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা। কল্পনা করতাম"—সুলেখা তারার দিকে অসহায়ের মতন চেয়ে বলে চলে, 'ওকে নিয়ে গড়া আমার এই ছোট্ট সংসারের মধ্যে স্থান করে নেবে ছোট্ট শিশু। একদিন আমাদের মধ্যে ভালবাসার সংযোগকে সে সুন্দর ও সার্থক করে তুলবে তার সরল হাসি দিয়ে, তার আবির্ভাবে অল্প পরিসর সংসার হবে অপরিসীম। ছোট্ট বেলায় পুতুল খেলায় যে নারী-জীবনের সহজ প্রকাশ আমার মনে ছিল, তারই পরিপূর্ণ রূপ আমার কল্পনাকে রাঙিয়েছিল। একদিন আমার এই আশা পূর্ণ হবে, এই ছিল মনের কোণে সন্ধ্যা-প্রদীপের মতন সযত্নে জ্বালিয়ে রাখা আশা। এই আশায় ও-ই ছিল আমার কেন্দ্র।...তারপর? তারপর কি বলবে?......

সতী নীরবে সবই শুনছে। কি শুনছে ও? ও ত সবই জানে। প্রাণে তার জাগ্রত নারী। একদিন ও যৌবনের শত স্বপ্ন নিয়ে ও নিজেও ত' সংসারের কোণে কোণে নিজেকে বসিয়েছিল। ওর মধ্যেকার চিরদিনের যে নারী, সংসারের যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেও ত একদিন রূপ নিয়েছিল সংসারের শত সৌন্দর্য্যের মধ্যে। আজকে বিশ্বের চোখে স্নেহের কথা বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তার প্রাণ ত হারিয়ে যায় নি। তবে

আজ কোন রাহু, কোন দুর্ঘটনার রাহু ওর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অমনভাবে নিষ্পেষিত করছে?

রাত্রের নির্জনতায় চুপচাপ শুয়ে শুয়ে সতী তাই ভাবছিল। ভাবনার ওর শেষ নেই। কেন এল না সুলেখার স্বামী? এই একটি প্রশ্নকে ঘিরে কত সহস্র উত্তর, কিন্তু কোনটিই ওর মনে ধরে না। যতবারই ও যতরকম উত্তর ঠিক করে, কোথাও না কোথাও একটা কাঁটা থেকে যায়। মন কিছুতেই মানতে চাইছে না যে ওর শরীরটা খারাপ। আজ সকাল থেকে ওর মন থেকে থেকে বেঁকে বসেছে। কালো আকাশের গায়ে বিদ্যুতের কষাঘাতের মতন ওর অন্ধকার মনের ওপর অকল্যাণের আশঙ্কা থেকে থেকে রেখা এঁকেছে।

সতী হঠাৎ চমকে উঠল।

কোন্ শব্দে পৃথিবীর ধ্যান ভাঙল?

কে যেন কাঁদছে? কোন শব্দ নেই, কোন ইঙ্গিত নেই, কিন্তু আভাষ আছে স্পষ্ট। এ যেন সেই অনুভূতি, যা ঘুমন্ত মানুষের মনে জাগে, যখন কারো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তার ওপর।

রাত্রির অবসাদে এক বিষাক্ত তীর সতীর মনে বিঁধল' নতুন ক'রে।

সুলেখা? সতীর মনটা ভেঙে খান্ খান্ হ'য়ে গেল।

সতীর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সুলেখার ওপর।

কোন শব্দ নেই···নিস্তব্ধ।

সতী আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দাঁড়াল' সুলেখার বিছানার ধারে। সুলেখা ওপাশ ফিরে শুয়েছিল, দিদির ঠাণ্ডা হাতখানা কপালের ওপর পড়তেই ও যেন ভেঙে পড়ল। বড় বড় কালো চোখের কোণ দিয়ে গড়ি'য় পড়ল একটি একটি অশ্রুবিন্দু। একটি, দুটি···আরো একটি ··তারপর আরো অনেক।

কান্নার আজ কোন মানা নেই।

বাইরের পৃথিবী আরও গভীর নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। তারাগুলোর মধ্যে স্পষ্ট নীরবতা, অন্ধকার আরও তীব্র। আলোগুলো মুখোস প'রে রাস্তাগুলোকে পরিহাস করছে। রাস্তার ধারে ধারে গাছগুলো এক একটা কালো ভূতের মতন। সবাই আজ ওরা ভয়ের চিহ্ন আঁকা স্পষ্ট অকল্যাণ। ওপাশের বড় চুনবালী খসা পুরাণো বাড়ীটাও ঠিক তাই। অন্ধকারের মধ্যে আবছায়া দেখাচ্ছে যেন প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপ।

সতী বিছানার ওপর বসে পড়ল'। সুলেখা ওর কোলের মধ্যে মুখটা তুলে দিল। কান্নাটা সেইখানেই ও লুকোবে—যেমন করে পারে।

এদের দু'জনের কোন ভাষা নেই। ভাসা ভাসা চাউনি, সতীর আগাধে সহানুভূতি। কি বলবে সতী? কাঁদবে? সমস্ত পৃথিবীটাই ত কাঁদছে।

সুলেখা কাঁদছে, সতী কান্না চেপে কান্না দেখছে। ঘড়িতে তিনটে বাজল'।

সুলেখা অনেকক্ষণ কাঁদল, অনেক চেষ্টা করেও কোন মতে নিজেকে সামলাতে পারল' না।

সতী বললে, "ঘুমো লেখা।"

সুলেখা অস্পষ্ট বললে, "তুমি ঘুমোতে যাও দিদি"···

"তুই ঘু মা দেখি।"...সতী বললে "কাঁদলে কি হবে, নিজেকে জীবনের কাছে ছোট করা ছাড়া ত' কিছুই নয়।"

সুলেখা কিছু বললে না, কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। "কি হয়েছে লেখা, আমাকে বল, মন তোর কিছু হাল্কা হবে।" কি করে বোঝাবে, কি বলবে? সুলেখা ভাবতে থাকে। দিদিকে বললে মন তবু ওর হাল্কা হবে, কিন্তু কি করে বোঝাবে?

যে কথা জড়িয়ে আছে ওর অনাগত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে, যে অশ্রু রেখার অলপনায় ওর হয়ত বাকি জীবনের সান্ত্বনা, কেমন করে আজ সে কথা ও দিদিকে বলবে? কোন মুখে বলবে ওর সর্ব্বসহা, সর্ব্বহারা বোনটিকে ওর ভাগ্যের পরিহাসের কথা। ওর জীবনের যে ফাঁকটা সর্ব্বগ্রাসী হ'য়ে ওর মন প্রাণ, ওর সমস্ত অস্তিত্বকে, ওর নারী জীবনের চরম সার্থকতাকে গ্রাস করছে, সে কথা কেমন করে দিদিকে জানাবে? কেমন করে বোঝাবে জীবনে ওর কি নেই, কিসের ওর অভাব। ওর সুন্দর স্বামী, ওর অর্থের স্বচ্ছলতায় হাসিমাখা সংসার, কিন্তু কিসের শূন্যতা সব অর্থহীন প্রলাপ করে দিয়েছে।

নিস্তব্ধ, নিঝুম পৃথিবী, রাত্রি যেন পুত্রহারা জননীর মতন। বাইরের অনন্ত নীরবতার মধ্যে নৃশংস যে সুর আজ সেটা এক হ'য়ে মিশে গেছে ওদের মনের সঙ্গে। দুটোর মধ্যে ঐক্য, দুটোর মধ্যে মিল, দুটোর মধ্যে কানাকানি, জানাজানি। মনের মধ্যে ওদের ঝড়, প্রকাশ করবার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু কেমন করে, কেন, কি হবে?

সতী সস্নেহে আবার বললে, "বললি না তো?"

সুলেখা বলবে। না বললে ওর চলবে না। জন্মাবার পর থেকে দিদি ছিল ওর ছায়া, আজ পর্য্যন্ত তার চেয়ে আপন আর কেউ হয়নি। ওকে বলবে, ওকে জানাবে নিজের ভাগ্যের কথা, জানাবে নিয়তির ব্যঙ্গ কেমন করে অঙ্গ হয়ে মিশে গেছে ওর জীবনের সঙ্গে। জানাবে জীবনের সব চেয়ে পূর্ণতার মধ্যে কতখানি শূন্যতা গোপন থাকতে পারে। দিদিকে আজ ও সব কথা বলবে, মনটাকে হাল্কা করবে, জীবনটাকে শক্ত করবে, ধৈর্য্যটাকে প্রখর করে নেবে। নিয়তির পরিহাসকে ও পরিহাস করবে, সহ্য করার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে, দিদির স্নেহের আড়ালে, সহানুভূতিতে, নিজের শূন্যতার অসহ্যতাকে জুড়িয়ে নিয়ে।

আজ ও বলবে বলবে বলবে। সবাইকে বলবে। সবাইকে জানাবে নিজের গোপন কথা। যে কথা আজ প্রায় একবছর ও মনের মধ্যে চেপে নিয়ে কেঁদে বেড়িয়েছে গোপনে, সবার সামনে সুখ আর শান্তির মুখোস প'রে।

থেমে থেমে সুলেখা বলতে থাকে, "বাইরের দৃষ্টিতে আজকের দিনের প্রাচুর্য্য অপরিসীম, কিন্তু এর মধ্যে আছে গভীর শূন্যতা। সকলের দৃষ্টিতে আজকের দিনের মধ্যে যে রঙ সোনালী, আমার জীবনের কানায় কানায় আজ তার ধূসর প্রতিবিম্ব।"

দিদি চুপ করে শোনে · তারায় তারায় সুলেখার কথার প্রতিধ্বনি।

সুলেখা একটু থেমে আবার বলতে আরম্ভ করে, "তার প্রতি আমার ভালবাসার প্রথম সংসারের উজ্জ্বল আলোকে, কল্পনায় আড়াল করা জীবনের কৌতূহলী রূপে। ছোট সংসার, ছোট্ট তার পরিসর। তার মাঝে আমাদের ঘেঁসাঘেঁসি। সংসারের প্রতি কোণে কোণে স্ত্রীর শ্যামল রূপের বিকাশ, স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য, স্বামী চিরাচারিত শৃঙ্খলহীনতাকে প্রশ্রয় দিয়ে তাকে সংসারের আবেষ্টনী দিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা। কল্পনা করতাম"—সুলেখা তারার দিকে অসহায়ের মতন চেয়ে বলে চলে, 'ওকে নিয়ে গড়া আমার এই ছোট সংসারের মধ্যে স্থান করে নেবে ছোট্ট শিশু। একদিন আমাদের মধ্যে ভালবাসার সংযোগকে সে সুন্দর ও সার্থক করে তুলবে তার সরল হাসি দিয়ে, তার আবির্ভাবে অল্প পরিসর সংসার হবে অপরিসীম। ছোট্ট বেলায় পুতুল খেলায় যে নারী-জীবনের সহজ প্রকাশ আমার মনে ছিল, তারই পরিপূর্ণ রূপ আমার কল্পনাকে রাঙিয়েছিল। একদিন আমার এই আশা পূর্ণ হবে, এই ছিল মনের কোণে সন্ধ্যা-প্রদীপের মতন সযত্নে জ্বালিয়ে রাখা আশা। এই আশায় ও-ই ছিল আমার কেন্দ্র।...তারপর? তারপর কি বলবে?......

সতী নীরবে সবই শুনছে। কি শুনছে ও? ও ত সবই জানে। প্রাণে তার জাগ্রত নারী। একদিন ওর যৌবনের শত সুরভী নিয়ে ও নিজেও ত' সংসারের কোণে কোণে নিজেকে বসিয়েছিল। ওর মধ্যেকার চিরদিনের যে নারী. সংসারের যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেও ত একদিন রূপ নিয়েছিল সংসারের শত সৌন্দর্য্যের মধ্যে। আজকে বিশ্বের চোখে সৌন্দর্য্যের কথা বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তার প্রাণ ত হারিয়ে যায় নি। তবে

আশা আকাঙ্ক্ষা যে নিয়তির পদাঘাতে চূর্ণ হয়েছে, সেই নিয়তিকে ব্যঙ্গ করে আজও তেমনি ভাবেই বেঁচে আছে—যেমন সহজ ভাবে সে জেগে উঠেছিল। কোথায় নারীর সব চাইতে শূন্যতা, তা ত ওর সব চাইতে উজ্জ্বল করেই জাগা আছে।

বেলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে, জ্বর তার কমেছে বোধ হয়। সতী লেখার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে ওরই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

সুলেখা বলে চলে, "আমার আশা আকাঙ্ক্ষা আজও তেমনি ভাবেই উজ্জ্বল হ'য়ে আছে, কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে সে আশা প্রবল হ'য়ে উঠেছিল, সে তা চূর্ণ করে দিয়েছে। নিয়তির এ নিষ্ঠুর পরিহাস। ওকে দিয়ে আমার আশা কোনদিনও পূর্ণ হবে না। দুর্ব্বল পঙ্গু।" একটু থেমে আবার বলে, "আজকের দিনের মধ্যে তুমি চেয়েছিলে স্বপ্নের জাগরণ, আমি দেখেছি তার মৃত্যু। আজ আমার বিবাহ বার্ষিকী নয়, আমার আমিত্বের আজ প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী।"

আর বলতে পারে না সুলেখা। কান্নার প্রবল বেগ গলাটা ওর সবলভাবে টিপে ধরেছে।

পৃথিবী থমকে দাঁড়িয়েছে। আজ সময়ের গতি স্তব্ধ। পৃথিবীর শিরায় শিরায় নিরাশার কষাঘাত। রাত্রির কালোরূপ আজ নির্ম্মম, নিষ্ঠুর।

সতী কাঁদবে না। কান্না দিয়ে বরণ করবে না ত্যাগের নতুন বিড়ম্বনাকে। সঙ্কল্পের বাঁধ দিয়ে বাঁধবে, কিন্তু কাঁদবে না কাঁদবে না কাঁদবে না, কিছুতেই কাঁদবে না। ...

গান

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

ধরে হিমাদ্রি ছত্র শিরে,
চরণ ধোয়ায় সিন্ধু,
মলয় করে চামর ব্যজন,
আলো দেয় রবি ইন্দু

জয় ভারত! জয় ভারত!
তুমি এক, তুমি আদি
ভারতবাসী এক ভাষাভাষী
এক ঈশ্বরবাদী।

খৃষ্টান, শিখ, জৈন, পার্সি,
মুসলমান, হিন্দু!
উচ্চ রেখো জয়-পতাকাটি
...

প্রাণ নিতে কাছে প্রাণ দিতে নাচে
প্রতি শোণিতের বিন্দু;
জয় ভারত! জয় ভারত!
তুমি এক তুমি আদি।

ভারতবাসী এক ভাষাভাষী
এক ঈশ্বরবাদী
খৃষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, পার্সি
...

সাময়িকপ্রসঙ্গ ও আলোচনা

পরলোকে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

জন্ম
২রা আগষ্ট, ১৮৬১

মৃত্যু
১৬ই জুন, ১৯৪৪

ভারতের রাসায়নিক, শিক্ষাব্রতী ও দেশকর্ম্মী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আর ইহজগতে নাই।

শিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে, শিক্ষায়, ব্যবসায়ে, ত্যাগে ও মুক্তি-সংগ্রামে—জাতীয় জীবনের সর্ব্বদিকে যিনি আজীবন সমগ্র বাঙালী ও ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নিঃস্বার্থ জীবনের অবসরে আপন গ্রন্থাগারের একান্ত নিভৃতে কাটাইয়াছেন, ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন জাতির ভাগ্য হইতে তাঁহাকে অকস্মাৎ দূরে সরাইয়া লইল। আজ হইতে ঠিক উনিশ বৎসর পূর্ব্বে এই ১৬ই জুন তারিখেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আমরা হারাইয়াছিলাম।

আমরা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

বাংলায় দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাস

১৯৪৩ সালেই বাংলার দুর্ভিক্ষের চূড়ান্ত হয় নাই। ক্রমাগত তাহার জের চলিতেছে। গত বৎসর মহানগরীর রাজপথে ভিখারীদের যে অনাহার-ক্লিষ্টতা ও মৃত্যুলীলা চলিয়াছিল, তাহা মাঝখানে গভর্ণমেণ্টের অপসারণ প্রথায় কিছুকালের জন্য প্রসমিত থাকিলেও সম্প্রতি আবার ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছে। কলিকাতায় এখনও চাউলের মূল্য ১৬৲ টাকার নীচে নামিল না। মফঃস্বলের অধিক স্থলেই ১২।১৩৲ টাকা করিয়া এখনও চাউল বিক্রয় হইতেছে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী অঞ্চলে চাউলের ভীষণ অভাব দৃষ্ট হইতেছে। বাংলার লাট মিঃ কেসি আশ্বাস দিয়াছেন—বর্ত্তমান ১৯৪৪ সাল দুর্ভিক্ষ হইতে (একরূপ) মুক্ত। কিন্তু বাংলার চতুর্দ্দিকে এখনই যে অবস্থার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে ভরসার লক্ষণ অত্যন্ত ক্ষীণ। রাজপথ আবার ধীরে ধীরে ভিখারীর কান্নায় ভরিয়া উঠিতেছে। গভর্ণমেণ্ট এদিকে পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক হউন, ইহাই প্রার্থনা করি।

চীনের মুক্তিসংগ্রাম

বর্ত্তমান বর্ষের ৭ই জুলাই হইতে চীন-জাপান যুদ্ধের অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হইল। ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই জাপান চীনের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং ক্রমাগত এই সুদীর্ঘ সাত বৎসর ব্যাপী জাপান তাহার যুদ্ধ-মত্ততার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চীনবাসী কঠিন অধ্যবসায়, একাগ্র তপস্যা ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় শক্তির দ্বারা নিজেদের স্বদেশ-ভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় শত্রুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। অধ্যবসায় ও তপস্যার জয় অবশ্যম্ভাবী।

উড়ন্ত বোমা

মহাযুদ্ধের গতিপথে সম্প্রতি হিটলারের বহু প্রকাশিত গোপন অস্ত্র—উড়ন্ত বোমার ভীতি সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে। রয়টারের বিভিন্ন ঘোষণায় যখন আমরা মুহূর্মুহু মিত্রপক্ষের জয়ের পথে ক্রমশঃ অগ্রসরের সূচনা লক্ষ্য করিতেছি, ইহারই মধ্যে উড়ন্ত বোমার আকস্মিক আক্রমণে লণ্ডন নগর আবার বিধ্বস্ত হইয়া চলিয়াছে। শিশু-বৃদ্ধদের অপসরণ চলিতেছে। সুতরাং বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী যুদ্ধ যে শীঘ্র সমাপ্তির পথে আগাইয়া যাইবে, তাহা আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতেছে না। এখনও সুদীর্ঘকাল মিত্রশক্তিকে বুদ্ধি ও শক্তি খাটাইতে হইবে বলিয়া জেনারেল আইসেনহাওয়ারও সম্প্রতি জার্ম্মান-যুক্তিকে বিচার করিয়া বক্তব্য করিয়াছেন।

প্রাণের আনন্দ
পূর্ণ স্বাস্থ্যেই
সম্ভব !
যদি আপনি
ম্যালেরিয়ার হাত
হইতে মুক্তি চান
শ্রেষ্ঠ মহৌষধ
পান করুন
কল্পতরু
আয়ুর্ব্বেদ ভবন
কল্পতরু প্রাসাদ
২২৩, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
কলিকাতা

যুদ্ধের দিনেও

"বঙ্গলক্ষ্মী"র আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধসমূহ
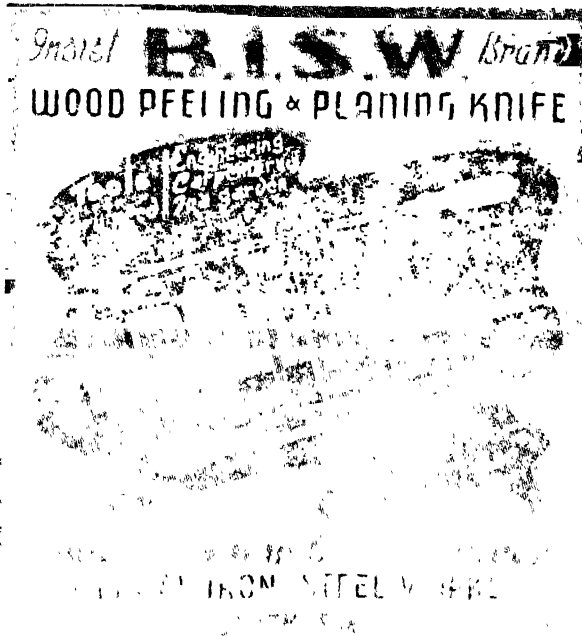
পূর্ব্বানুরূপ বিশুদ্ধ উপাদানে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ
কবিরাজমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে।

যুদ্ধের অজুহাতে ঔষধের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি করা হয় নাই।

এ কারণ, **"বঙ্গলক্ষ্মী"র ঔষধ সর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্য।**

অল্পমূল্যে বিশুদ্ধ ঔষধ পাইতে হইলে
"বঙ্গলক্ষ্মী"রই কিনিবেন।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন্ মিল্স, মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোং
প্রভৃতির পরিচালক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

বঙ্গলক্ষ্মী আয়ুর্ব্বেদ ওয়ার্কস

অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধপ্রস্তুতকারক

প্রধান কার্য্যালয়—১১নং **ক্লাইভ রো, কলিকাতা।** কারখানা—**বরাহনগর।**

শাখা—৮৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, বাগেরহাট, বরিশাল, যশোহর, মাদারীপুর ও ধানমণ্ডি

THE CENTRAL GLASS INDUSTRIES LTD.

Manufacturers of

CHIMNEYS, BOTTLES, PHIALS, GLASSES, TUMBLERS, JARS and various kinds of quality glass-ware.

The Company that gives you goods by latest machines.

CITY OFFICE :	WORKS :
7, SWALLOW LANE, CALCUTTA.	*P. O. BELGHURIA, 24, PARGANAS.*
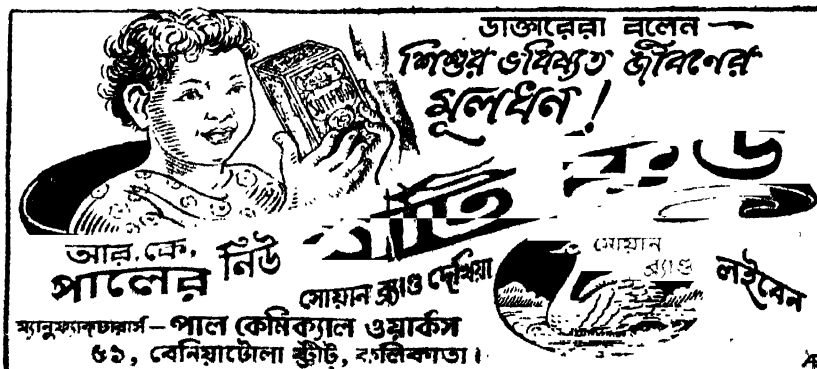
BLOCKS
DESIGNS
PRINTING
SLIDES
TAGS

বর্ত্তমান কালে যুদ্ধ জয় ও ব্যবসায় উন্নতির একমাত্র উপায় সুন্দর ব্লক ও নিখুঁৎ প্রিণ্টিং

আমরা অভিজ্ঞ কারিকর দ্বারা লাইন, হাফ্‌টোন, কালার, ষ্টিরিও, ইলেক্‌ট্রো, সেলাইড, ডিজাইন এবং কালার প্রিণ্টিং করিয়া থাকি।... ... ...

DAS GOOPTA & Co

PROCESS ENGRAVERS. COLOUR PRINTERS

PHONE B.B. 5432

DAS GOOPTA & Co

42-HURTOOKI BAGAN LANE. CALCUTTA

TO GET FAITHFUL REPRODUCTION

A nice picture, True-To-Original solely depends on better blocks and neat printing. So many persons take excellent care of their advertisement pictures, but neglect the block-making and printing. To get better result of your advertisement campaign, you should rely on our skilled men who are always ready to help you with their expert advice and will do justice to the original in reproducing its proper tone value, depth of etching, neat but bright and charming prints.

Make us responsible for all your process works and colour printings

TELEPHONE
B·B·601

EPRODUCTION

PROCESS ENGRAVERS ***Syndicate*** **COLOUR PRINTERS**

7·1 CORNWALLIS STREET · CALCUTTA

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই...

শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হ'লে প্রত্যহ ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই। খোলা মাঠে ব্যায়াম, বিশুদ্ধ হাওয়া ও সূর্য্যের আলো বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ্। সেই সঙ্গে ভাল আহার্য্যও চাই। পুষ্টিকর খাদ্যে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও কর্ম্মঠ করে—সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক সৌন্দর্য্যও বাড়ায়।

বি-ই শ্রেষ্ঠ খাদ্য

..GASREE—Sraban 1351. Each Copy As. -/9/- প্রতি সংখ্যা ॥/০ Regd. No. C. 2064.

কে. ভি. আপ্পারাও কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ— ৯০, লোয়ার সারকুলার রোড কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস

দ্বাদশ বর্ষ ভাদ্র—১৩৫১ ১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা

ভারতবাসী প্রত্যেকেই ফ্যাসী বিরোধী। স্বাধীন ভারত জাপানী আদর্শের ডিক্টেটর বরদাস্ত করবে না। যে-দেশ সামরিক এবং বৃহৎ ব্যবসায়ের দ্বৈত ডিক্টেটরী দ্বারা শাসিত সে-দেশ থেকে স্বাধীনতা দানের আশ্বাস যেমন হাস্যকর তেমনি ভূয়ো। জাপান থেকে আমাদের কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই।
জয়ের মারফতে ..... স্বাধীনতা
AAA 1018

Dutta & Co.
QUALITY SHOE MAKERS
CHEAPEST, BEST AND DURABLE
STOCKISTS. CAWNPORE -AND- AGRA SHOES.
16/1, SHYAMACHARAN DEY STREET,
COLLEGE ST. COLLEGE ROW & SHYAMACHARAN DEY ST, JUNC.
CALCUTTA.

এম বি সরকার এণ্ড সন্স

সন এণ্ড গ্রাণ্ডসন্স অব লেট বি. সরকার

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা

১২৪, ১২৪-১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

শিলং-সিলেট্ লাইনের টিকেট্ সমূহ আমাদের
শিলং অফিস এবং সিলেট্ অফিসে পাওয়া যায়। সিলেট্ লাইনে শিলং যাইবার থ্রু টিকেট্ এ. বি. জোনের ষ্টেশন-সমূহ হইতে পাওয়া যায়। শিলং হইতে সিলেট্ লাইনে এ. বি. জোনের ষ্টেশনসমূহের থ্রু টিকেট্ শিলং অফিসে পাওয়া যায়।

দি ইউনাইটেড্ মোটর ট্র্যান্সপোর্ট

কোম্পানী লিমিটেড্

দি মেট্রোপলিটন্ ইন্সিওরেন্স হাউস্
১৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

গ্রাম—ধনের ধন
ফোন :
ক্যাল ৩৭৩৪
—স্থাপিত—
১৯২৯
আয়করমুক্ত শতকরা ৫৲ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে
— শাখা সমূহ —
কলিকাতা
মাণিকতলা
শ্যামবাজার
কলেজ ষ্ট্রীট
বড়বাজার
ধর্ম্মতলা
শিয়ালদহ
বালিগঞ্জ
পোস্তা
বাঙ্গলা
মেদিনীপুর
বালিচক
শালবণী
আলমগড়া
গড়বেতা
ঘাঁটাল
বাঁকুড়া
বিষ্ণুপুর
মিরকাদীম
কৃষ্ণনগর
খুলনা
বাগেরহাট
আসাম
তেজপুর
হবিগঞ্জ
বিহার
পাটনা
রাঁচী
সেণ্ট্রাল অফিস শীঘ্রই ৮০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে
স্থানান্তরিত করা হইবে
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীযুত কালীচরণ সেন।

বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি ও শাড়ী

আগেকার দিনের মতই টেঁকসই
ও সস্তা

কিন্তু কোন মিলের পক্ষেই আজ আর যথেষ্ট
বস্ত্র প্রস্তুত করিবার উপায় নাই।
আমরাও আপনাদের চাহিদা
মিটাইতে পারিতেছি না।

প্রয়োজন না থাকিলে
আপনি নূতন বস্ত্র কিনিবেন না, যাহা আছে
তাহা দিয়াই চালাইতে চেষ্টা করিবেন।

কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে
সেলাই করিয়া পরুন। এই দুর্দ্দিনে
তাহাতে লজ্জিত হইবার কিছু নাই।

**যদি নিতান্ত প্রয়োজন হয়
আমাদের স্মরণ করিবেন।**

বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

মানব-সমাজের বর্ত্তমান সমস্যার পূরণে মানুষের পশুত্বের বিকাশ নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করিবার প্রয়োজনীয়তা

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

আমাদিগের বিচারানুসারে মানব-সমাজের বর্ত্তমান সময়ে প্রধান সমস্যা দুইটী; যথা—

(১) সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের শান্তি স্থায়ীভাবে স্থাপন করা; এবং

(২) সমগ্র মানব-সমাজব্যাপী নানাবিধ অভাব সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিয়া মানুষের সর্ব্ববিধ প্রয়োজনের প্রাচুর্য্য সাধন করা।

উপরোক্ত দুইটি সমস্যা অনতিবিলম্বে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য না হইলে মানুষের হাহাকার ক্রমশঃ সর্ব্বত্রই আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং মানব-সমাজের নরকত্বের অবসান ঘটিবে না।

উপরোক্ত দুইটী সমস্যা অনতিবিলম্বে পূরণ হওয়া অপরিহার্য্য-ভাবে প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু ঐ দুইটী সমস্যা পূরণ করিবার সঙ্কেত মানব-সমাজের বর্ত্তমান সারথিগণের চক্ষুর সম্মুখে নাই। ঐ দুইটী সমস্যা যুগপৎ পূরণ করিতে না পারিলে কোনটীরই পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। বর্ত্তমান মানবসমাজে যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞান নামে পরিচিত, তাহা দ্বারা ঐ দুইটী সমস্যার কোনটীই পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। পরন্তু ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্য লইলে ঐ দুইটী সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি হওয়া অনিবার্য্য হয়।

আমাদিগের বিচারানুসারে জার্ম্মানীর বৈজ্ঞানিকগণ ও রাষ্ট্রপুরুষগণ গত এক শত বৎসর হইতে (প্রিন্স্ বিসমার্কের অভ্যুদয় হইতে) সাক্ষাৎভাবে জার্ম্মানগণের ও অতর্কিতভাবে সমগ্র মানব-সমাজের সমস্যা পূরণ করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। প্রধানতঃ তাঁহাদিগের ও ইংরাজ রাষ্ট্র-পুরুষগণের চেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে যাহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান বলা হয় তাহার কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বর্ত্তমান মানব-সমাজে যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞান নামে পরিচিত তাহা দ্বারা আমাদিগের কথিত দুইটী সমস্যার কোনটীই যে সমাধান করা যায় না, তাহার সাক্ষ্য জার্ম্মান ও ইংরাজ-সারথিগণের গত একশত বৎসরের চেষ্টার ফল। গত একশত বৎসরের মানব-সমাজের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, গত একশত বৎসরে আজকাল যাহাকে "ধন" বলা হয় তাহা ব্যক্তিগত ভাবে কোন কোন মানুষের প্রত্যেক দেশেই কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক দেশেই অভাবগ্রস্তের সংখ্যা ও অভাবের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সমগ্র মানব-সমাজে যে এই এক শত বৎসরে দ্বেষ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলহ, মারামারি, যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ও যুদ্ধ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্ত্তমান মানব-সমাজ যে শান্তিপ্রিয় মানুষের বাসের অযোগ্য হইয়াছে, তাহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

আমাদিগের কথিত দুইটী সমস্যার সমাধান করিবার পন্থা পাওয়া যায় কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ব্যাসদেবের লেখায়।

ঐ লেখা পড়িয়া আমরা যাহা বুঝিয়াছি তদনুসারে মানব-সমাজের বর্ত্তমান সমস্যা সমাধান করিবার একমাত্র পন্থা—যাহাতে মানুষের পশুত্বের বিকাশ সর্ব্বতোভাবে নিবারিত ও দূরীভূত হইয়া সর্ব্বতোভাবের মনুষ্যত্ব সাধন করা স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

ব্যাসদেবের কথানুসারে মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধন করিতে হইলে প্রথমতঃ, যে যে অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের আশ্রয় লইলে মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধন করা স্বতঃসিদ্ধ হয়, সেই সেই অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সন্ধান করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, যে যে ব্যবস্থায় ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান স্বতঃই মানবসমাজে পরিগৃহীত হইতে পারে, সেই সেই ব্যবস্থার পরিকল্পনা স্থির করিতে হয়।

ব্যাসদেবের লেখায় মানুষের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা পাওয়া যায় সেই সমস্ত কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা দূরের কথা, মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব যাহাতে বিকাশপ্রাপ্ত হয় তাহা করিতে হইলে মনুষ্য-সমাজে ঐ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবের সংগঠনের প্রয়োজন হয়। প্রকৃত মনুষ্যত্ব যাহাতে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য বিশেষভাবের ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজে সাধিত না হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব স্বতঃই কখনও বিকাশপ্রাপ্ত হয় না। সর্ব্বব্যাপী প্রকৃতির যে যে নিয়মে এই ভূ-মণ্ডলে আকাশ, বায়ু, বাষ্প, জল, স্থল, উদ্ভিদ্, পশু-পক্ষি প্রভৃতি এবং মানুষ স্বতঃই উৎপন্ন হয়, সেই নিয়মানুসারে মানুষের অবয়বে যেমন পশুত্ব স্বতঃই বিদ্যমান থাকে সেইরূপ আবার মনুষ্যত্বও স্বতঃই বিদ্যমান থাকে। মানুষের অবয়বে যেমন পশুত্ব স্বতঃই বিদ্যমান থাকে সেইরূপ মনুষ্যত্বও স্বতঃই বিদ্যমান থাকে বটে কিন্তু মানুষের অবয়বে পশুত্ব স্বতঃই যেরূপ প্রবল হইয়া থাকে মনুষ্যত্ব স্বতঃই সেইরূপ প্রবল হয় না। মানুষের অবয়বে পশুত্ব স্বতঃই যেরূপ প্রবল হয় মনুষ্যত্ব স্বতঃই সেইরূপ প্রবল হয় না বটে কিন্তু বিশেষ-ভাবের সংগঠন মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের আয়োজনের ফলে কোনও মানুষের যাহাতে পশুত্বের বিকাশ আদৌ না হইতে

পারে তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভবযোগ্য হয় এবং এমন কি কোন কোন মানুষ পশুত্ব সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া নিজদিগকে পশুত্ব-বিবর্জ্জিত পূর্ণ মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন। কোনও মানুষ যাহাতে পশুত্বের কার্য্য আদৌ না করিতে পারেন কেবল মাত্র তাহারই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবের ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান না থাকিলে পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব মিশ্রিত মানুষের দ্বারা মানবসমাজ পরিপূর্ণ হয়। পশুত্ববিবর্জ্জিত পূর্ণ মানুষের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভবযোগ্য হয়।

কোনও মানুষ যাহাতে পশুত্বের কার্য্য আদৌ না করিতে পারেন কেবলমাত্র তাহারই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবের ব্যবস্থা মনুষ্য-সমাজে বিদ্যমান না থাকিলে পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব মিশ্রিত মানুষের দ্বারা মানবসমাজ পরিপূর্ণ হয় বটে কিন্তু তখন প্রকৃত মনুষ্যত্বের কার্য্য আদৌ চলিতে পারে না ও চলে না; পরন্তু প্রধানতঃ পশুত্বের কার্য্যই মানবসমাজে চলিতে থাকে; ইহার কারণ পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব মিশ্রিত মানুষের মধ্যে স্বভাবগত পশুত্ব স্বতঃই মনুষ্যত্বের তুলনায় প্রবল হয়। উপরোক্তভাবে প্রধানতঃ পশুত্বের কার্য্য মানবসমাজে চলিতে থাকিলে একদিকে মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলহ, মারামারি ও যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া থাকে এবং অন্যদিকে যে প্রতিষ্ঠা, ধন-প্রাচুর্য্য, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ও জ্ঞান-তৃষ্ণার পরিপূর্ণতা প্রত্যেক মানুষের অভীষ্ট সেই প্রতিষ্ঠা, ধন-প্রাচুর্য্য, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ও জ্ঞান-তৃষ্ণার পরিপূর্ণতা কোনও মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে জুটা সম্ভবযোগ্য হয় না।

কোনও মানুষ যাহাতে পশুত্বের কার্য্য আদৌ না করিতে পারেন কেবলমাত্র তাহারই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবের ব্যবস্থা মনুষ্য-সমাজে বিদ্যমান না থাকিলে উপরোক্ত ভাবে মনুষ্যসমাজের সর্ব্বত্র ক্রমশঃ হাহাকার হৃদয়বিদারক ভাবে উত্থিত হয়। ব্যাসদেবের লেখা হইতে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে মনুষ্যসমাজের সর্ব্বত্র যখন হাহাকার হৃদয়বিদারক ভাবে উত্থিত হয় তখন মানুষের আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায়—তিন শ্রেণীর কার্য্য করা; যথা—

(১) শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে কর্ত্তৃপক্ষের মিলিত হওয়া,

(২) মনুষ্যসমাজের কোনও মানুষ যাহাতে পশুত্বের কার্য্য আদৌ না করিতে পারেন, কেবলমাত্র তাহারই উদ্দেশ্যে শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে কর্ত্তৃপক্ষের মিলিত হইয়া বিশেষভাবের ব্যবস্থা করা,

(৩) মনুষ্যসমাজে যাহাতে পশুত্ববিবর্জ্জিত পূর্ণ মানুষের উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

আজকাল মনুষ্যসমাজে যে সমস্ত মতবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সেই সমস্ত মতবাদ লক্ষ্য করিলে ইহা মনে করিতে হয় যে, আজকালকার মতবাদানুসারে ঐ তিনটী কার্য্যের কোনটীই সম্ভবযোগ্য নহে।

ঐ তিন শ্রেণীর কার্য্যের কোন শ্রেণীর কার্য্য যে সহজসাধ্য নহে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদিগের বিচারানুসারে ঐ তিন শ্রেণীর কার্য্যের কোন শ্রেণীর কার্য্যই সহজসাধ্য নহে বটে কিন্তু উহাদের কোন শ্রেণীর কার্য্যই মানুষের সাধ্যাতিরিক্ত নহে, পরন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্যই মানুষের সাধ্যান্তর্গত। ঐ তিন শ্রেণীর কার্য্যকে মানুষের সাধ্যের বহির্ভূত মনে করা মানব-প্রকৃতির জ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

ব্যাসদেবের উপরোক্ত কথাসমূহের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে হইলে তাঁহার ভাষানুসারে মানুষের পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলা হয় তাহা সর্ব্ব প্রথমে বুঝিবার প্রয়োজন হয়।

ব্যাসদেবের ভাষানুসারে মানুষের "পশুত্ব" ও "মনুষ্যত্ব" কাহাকে বলা হয় তাহার কথা অতঃপর আমরা আলোচনা করিব।

কোন ব্যক্তিবিশেষের অথবা কোন সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে মানুষের দ্বেষ-প্রবৃত্তির নাম মানুষের পশুত্ব। মানুষের পশুত্বের অভিব্যক্তি হয় তাহার দ্বেষ-হিংসার কার্য্যে অথবা দ্বন্দ্ব-কলহ এবং বিচ্ছেদের কার্য্যে।

মানুষের পরস্পরের দ্বেষ-প্রবৃত্তি দূর করিয়া মিলন সাধন করিবার প্রবৃত্তির নাম মানুষের মনুষ্যত্ব। মানুষের মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি হয় পরস্পরের বিচ্ছেদ দূর করিবার কার্য্যে।

আমাদিগের বিচারানুসারে যে মিলনের কার্য্যে কোনরূপ দলাদলি হইতে পারে সেই মিলনের কার্য্য আপাত-দৃষ্টিতে মিলনের কার্য্য হইলেও উহা বস্তুতঃপক্ষে মানুষের মনুষ্যত্বের কার্য্য নহে। উহাতে বিচ্ছেদের কার্য্য থাকে। যে মিলনের কার্য্যে কোনরূপ বিচ্ছেদের অথবা কোনরূপ দ্বেষ-হিংসার কার্য্য থাকে না, সেই মিলনের কার্য্যের নাম মানুষের "মনুষ্যত্বের কার্য্য"। সমগ্র মানব-সমাজের একতায় মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা অভিব্যক্তি লাভ করে।

ব্যাসদেবের কথানুসারে মানুষের পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলা হয় তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে মানুষের "প্রবৃত্তি" কাহাকে বলা হয়, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ, মানুষের "পশুত্ব" ও "মনুষ্যত্ব" এই উভয়ই তুই শ্রেণীর "প্রবৃত্তি"।

"প্রবৃত্তি" কাহাকে বলা হয় তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয় বটে কিন্তু "শক্তি" ও "কার্য্য" কাহাকে বলা হয় তাহা জানা না থাকিলে "প্রবৃত্তি" কাহাকে বলা হয় তাহা বুঝা যায় না। ইহার কারণ, ব্যাসদেব যাহাকে শক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন মানুষের অবয়বে তাহার উৎপত্তি হইলে মানুষের "প্রবৃত্তির" উৎপত্তি এবং মানুষের "প্রবৃত্তির" উৎপত্তি হইলে মানুষ তাঁহার প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। মানুষের "প্রবৃত্তি"র কারণ তাহার "শক্তি" এবং "প্রবৃত্তির" পরিণতি হয় মানুষের "কার্য্যে"। মানুষের "প্রবৃত্তির" উৎপত্তি না হইলে মানুষের কোন শ্রেণীর "কার্য্য" হয় না এবং মানুষের "শক্তির" উৎপত্তি না হইলে মানুষের কোন শ্রেণীর প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় না।

মানুষ যখন মাতৃগর্ভে থাকেন তখন তাঁহার কোন "শক্তি" থাকে না। সর্ব্বব্যাপী প্রকৃতির কয়েকটী দ্রব্যের কয়েকটী "কর্ম্মের ফলে মাতৃগর্ভে মানুষের অবয়বের ও ঐ অবয়বের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের উৎপত্তি হয় ও গঠন পূর্ণতা লাভ করে। মানুষের অবয়বের ও তাহার ভাগসমূহের উৎপত্তির ও গঠনের পূর্ণতার কার্য্য প্রধানতঃ সর্ব্বব্যাপী প্রকৃতির কার্য্যের

দ্বারা সাধিত হয়। মানুষের অবয়বের ও তাহার ভাগসমূহের উৎপত্তির ও গঠনের কার্য্য পর্য্যন্ত মানুষের নিজের কোন শক্তি অথবা প্রবৃত্তি অথবা কার্য্য থাকে না।

ঐ অবয়বের ও তাহার ভাগসমূহের উৎপত্তির ও গঠনের কার্য্য মাতৃগর্ভে যতখানি পূর্ণতা লাভ করিতে পারে ততখানি পূর্ণতা লাভ করিবার পর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতির সূচনা হয়। মাতৃগর্ভে শিশুর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতির সূচনা অথবা উন্মেষ হয় বটে কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে ঐ প্রয়োজনানুভূতির এমন কি শিশুজনোচিত পূর্ণতা হয় না; প্রয়োজনানুভূতির উন্মেষ হইলেই শিশু আর মাতৃগর্ভে থাকিতে পারে না; তখনই ভূমিষ্ঠ হইতে বাধ্য হয়। মাতৃগর্ভে শিশুর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতির সূচনা হইলে মাতার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতি হইতে মাতৃগর্ভস্থ শিশুর চক্ষু প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতির পার্থক্য হইবার সূচনা হয়। মাতার ও গর্ভস্থ শিশুর উপরোক্ত প্রয়োজনানুভূতির পার্থক্যের সূচনা হইলে পার্থক্যের ঐ সূচনা-নিবন্ধন শিশুর পক্ষে আর মাতৃ-গর্ভে থাকা সম্ভবযোগ্য হয় না। ভবিষ্যৎ মানুষ শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হন।

শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়েও শিশুর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের প্রয়োজনানুভূতির শিশুজনোচিত পূর্ণতা হয় না; তখনও উহা সূচনার অথবা উন্মেষের অবস্থায় থাকে। তখনও যে শিশুর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের প্রয়োজনানুভূতি শিশুজনোচিত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, তাহা যে-কোন শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্বীকার করিতে হয়।

শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের মুক্ত বাতাসের সহিত সংশ্রব বশতঃ ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতি শিশুজনোচিত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ ঐ ঐ চক্ষু, কর্ণ,হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতিসমূহের তৃপ্তির প্রয়োজনবোধের উৎপত্তি হয়।

ব্যাসদেবের কথানুসারে মানুষের অবয়বের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতিকে মানুষের "শক্তি" বলা হয়। আর ঐ ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতিসমূহের তৃপ্তির প্রয়োজনবোধকে মানুষের প্রবৃত্তি বলা হয়।

মানুষের "শক্তি" ও "প্রবৃত্তি" এই উভয়েরই শিশুজনোচিত ভাবে উৎপত্তি হয়, ভবিষ্যৎ মনুষ্য যখন শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হন তাহার পর। মানুষের শৈশবাবস্থা হইতে যৌবন পর্য্যন্ত বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের "শক্তি" ও "প্রবৃত্তি" এই উভয়ই স্বতঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মানুষ যখন শিশুরূপে মাতৃগর্ভে থাকেন তখন তাঁহার "শক্তি" ও "প্রবৃত্তি" এই উভয়ের কোনটীই শিশু-জনোচিত ভাবে উদ্ভূত হয় না।

মানুষের অবয়বের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতিসমূহের এবং ঐ প্রয়োজনানুভূতি-সমূহের তৃপ্তিবোধসমূহের উৎপত্তি হইলে প্রথমতঃ, ঐ প্রয়োজনানুভূতি সমূহের তৃপ্তি বোধ সমূহের পূরণের জন্য উপরোক্ত চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের অবয়বে তাহাদের স্ব স্ব তৃপ্তিবোধানুযায়ী স্বতঃই কতকগুলি আবয়বিক কার্য্য আরম্ভ হয়; দ্বিতীয়তঃ, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়বের ভাগ-সমূহ স্বতঃই তাহাদের স্ব স্ব তৃপ্তিবোধানুযায়ী স্ব স্ব তৃপ্তিবোধের পূরণের জন্য কতকগুলি পদার্থ নির্ব্বাচন করে।

চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগসমূহের স্ব স্ব প্রয়োজনানুভূতির প্রথম উৎপত্তি হয় স্বতঃই। ঐ ভাগসমূহের স্ব স্ব প্রয়োজনানুভূতির তৃপ্তি বোধেরও প্রথম উৎপত্তি হয় স্বতঃই। ঐ তৃপ্তিবোধের উৎপত্তি হওয়ার পর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়বাংশের স্ব স্ব আবয়বিক কর্ম্মেরও প্রথম উৎপত্তি হয় স্বতঃই। ঐ আবয়বিক কর্ম্মের উৎপত্তি হওয়ার পর তৃপ্তি-বোধের পূরণের জন্য পদার্থ নির্ব্বাচনের প্রথম কার্য্যও স্বতঃই হইয়া থাকে। এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যের কোন কার্য্যেই প্রথমতঃ মানুষের কোন ভাল মন্দ বিচারের কার্য্য থাকে না। বিচারের কার্য্য হয় ঐ চারিটি কার্য্যের প্রাথমিক উৎপত্তি হওয়ার পর। কোন্ কারণে স্বতঃই ঐ চারি শ্রেণীর কার্য্য সম্ভবযোগ্য হয় ও অনিবার্য্য হয় তাহা বুঝিতে হইলে যে যে প্রাকৃতিক কর্ম্মবশতঃ মানুষের মাতৃগর্ভে উৎপত্তি হওয়া ও অস্তিত্ব রক্ষা হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় সেই সেই প্রাকৃতিক কর্ম্মের সহিত পরিচিত হইতে হয়।

মানুষের অবয়বের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব প্রয়োজনানুভূতির তৃপ্তিবোধের পূরণের জন্য, ঐ তৃপ্তিবোধানুযায়ী চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ভাগসমূহের অবয়বে স্বতঃই যে সমস্ত আবয়বিক কর্ম্ম হইয়া থাকে, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগসমূহের সেই সমস্ত আবয়বিক কর্ম্মকে ব্যাসদেবের ভাষানুসারে মানুষের "কাম-প্রবৃত্তি" অথবা "কাম" বলা হয়।

চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগসমূহ, তাহাদের স্ব স্ব তৃপ্তিবোধানুযায়ী, স্ব স্ব তৃপ্তিবোধের পূরণের জন্য স্বতঃই পদার্থ নির্ব্বাচনের যে কার্য্য করিয়া থাকে, তৃপ্তিবোধের পূরণার্থক পদার্থ নির্ব্বাচনের সেই কার্য্যকে মানুষের "ইচ্ছা-প্রবৃত্তি" অথবা ইচ্ছা বলা হয়।

চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগসমূহ, তাহাদের স্ব স্ব তৃপ্তিবোধানুযায়ী স্ব স্ব তৃপ্তিবোধের পূরণের জন্য পদার্থ নির্ব্বাচনের যে যে কার্য্য ভাল-মন্দ বিচারপূর্ব্বক করিয়া থাকে, তৃপ্তিবোধের পূরণার্থক পদার্থ নির্ব্বাচনের সেই সেই কার্য্যকে মানুষের "ইচ্ছা প্রবৃত্তি" অথবা ইচ্ছা বলা হয় না। ঐ শ্রেণীর কার্য্যকে "ইচ্ছার কার্য্য" বলা হয়। বিচারের কার্য্য হয় ইচ্ছার প্রাথমিক কার্য্যের উৎপত্তি হওয়ার পর।

সংক্ষেপতঃ, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগ-সমূহের স্ব স্ব প্রয়োজনানুভূতির নাম—"মানুষের শক্তি"; চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগসমূহের স্ব স্ব প্রয়োজনানুভূতির তৃপ্তিবোধের নাম "মানুষের প্রবৃত্তি"; চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগসমূহের, স্ব স্ব তৃপ্তিবোধের

পূরণার্থে স্বতঃই যে-সমস্ত আবয়বিক কর্ম্ম হইয়া থাকে সেই সমস্ত আবয়বিক কর্ম্মের নাম "মানুষের কাম"; চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগসমূহের, স্ব স্ব তৃপ্তিবোধের পূরণার্থ স্বতঃই পদার্থ নির্ব্বাচনের যে কার্য্য হয় সেই কার্য্যের নাম "মানুষের ইচ্ছা"।

মানুষ তাহার ইচ্ছা পূরণের জন্য যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন সেই সমস্ত কার্য্যের নাম "মানুষের কার্য্য"।

মানুষের "শক্তি", মানুষের "প্রবৃত্তি", মানুষের "কাম", মানুষের "ইচ্ছা" এবং মানুষের "কার্য্য"—এই পাঁচটী কথার অর্থ এবং প্রাথমিক উৎপত্তির ধারা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যায় যে, ঐ পাঁচটীর কোনটীরই মানুষের অবয়ব যখন মাতৃগর্ভে গঠন লাভ করিতে থাকে তখন উৎপত্তি হয় না। মাতৃগর্ভে মানুষের অবয়বের গঠনের যতখানি পূর্ণতা হইতে পারে ততখানি পূর্ণতা হওয়া মাত্রই মানুষ মাতৃগর্ভে পৃথক হইয়া শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হন এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরেই শক্তির উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করে। মাতৃগর্ভে মানুষের "শক্তি"র উৎপত্তি হয় না বটে কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরেই শক্তির উৎপত্তি হয়। শক্তির উৎপত্তি হইলেই যে শক্তির বিকাশ হয়, তাহা নহে। শক্তির বিকাশ হয় প্রবৃত্তির উৎপত্তিতে। শক্তির প্রাথমিক বিকাশকে "প্রবৃত্তি" বলা হয়। "কাম"ও এক হিসাবে শক্তির বিকাশ কিন্তু উহা শক্তির প্রাথমিক বিকাশ নহে। প্রবৃত্তির প্রাথমিক বিকাশ কাম। "শক্তির" প্রাথমিক বিকাশকে যেরূপ "প্রবৃত্তি" বলা হয় সেইরূপ "প্রবৃত্তির" প্রাথমিক বিকাশকে "কাম" বলা হয়। প্রবৃত্তির প্রাথমিক বিকাশকে যেরূপ কাম বলা হয় সেইরূপ কামের প্রাথমিক বিকাশকে "ইচ্ছা" বলা হয় এবং "ইচ্ছার" প্রাথমিক বিকাশকে ইচ্ছা পূরণের "কার্য্য" বলা হয়।

শিশুগণ যখন হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহাদিগের ইচ্ছাপূরণের "কার্য্য" আরম্ভ হয়। হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিশুগণের "কার্য্যের" উৎপত্তি হয় না। শিশুগণের ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই তাঁহাদিগের শক্তির "উৎপত্তি" হয় এবং হামাগুড়ি দিতে পারা পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে প্রবৃত্তি, কাম ও ইচ্ছার উৎপত্তি হয়।

শুধু যে শিশুগণেরই শক্তি, প্রবৃত্তি, কাম ও ইচ্ছা থাকে তাহা নহে।

শৈশবে প্রথম যখন ইচ্ছার বিকাশ হয় অর্থাৎ ইচ্ছা পূরণের কার্য্য আরম্ভ হয় তদবধি মানুষ তাঁহার মরণ পর্য্যন্ত আজীবন যে-সমস্ত কার্য্য করেন তাহার প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গেই সেই-সেই কার্য্যবিষয়ক শক্তি, প্রবৃত্তি, কাম ও ইচ্ছা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকে।

প্রথমতঃ, অতর্কিতভাবে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতির স্ব স্ব প্রয়োজনানুভূতির অর্থাৎ শক্তির উৎপত্তি হয়; দ্বিতীয়তঃ, অতর্কিতভাবে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতির স্ব স্ব প্রয়োজনানুভূতির তৃপ্তিবোধের অর্থাৎ প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়; তৃতীয়তঃ, অতর্কিতভাবে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদাদির তৃপ্তিবোধানুযায়ী তৃপ্তিবোধের পূরণার্থ আবয়বিক কর্ম্মের অর্থাৎ কামের স্বতঃই উৎপত্তি হয়; চতুর্থতঃ, অতর্কিতভাবের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদাদির তৃপ্তিবোধের পূরণার্থ পদার্থনির্ব্বাচনের প্রাথমিক কার্য্যের অর্থাৎ ইচ্ছার স্বতঃই উৎপত্তি হয়। ইচ্ছার উৎপত্তি না হইলে ইচ্ছা পূরণের কোন কার্য্য হইতে পারে না এবং হয় না।

ইচ্ছার উৎপত্তি না হইলে মানুষের ইচ্ছা পূরণের জন্য পদার্থ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোন ভাল-মন্দ-বিচার-কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না ও হয় না। কাহারও আদেশ পালনের কার্য্যেও প্রথমতঃ ইচ্ছার উৎপত্তি হইয়া থাকে। নতুবা আদেশ পালন করিবার কার্য্য করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

মানুষের শক্তি, মানুষের প্রবৃত্তি, মানুষের কাম, মানুষের ইচ্ছা ও মানুষের কার্য্য কাহাকে বলে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যায় যে, মানুষের দ্বেষ-প্রবৃত্তি তাহার স্বভাবগত এবং উহা অন্যান্য প্রবৃত্তির তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল।

মানুষের দ্বেষ-প্রবৃত্তি যে তাহার স্বভাবগত এবং উহা যে অন্যান্য প্রবৃত্তির তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল, তাহা যুক্তিযুক্ত হইলে মানুষের পশুত্ব যে তাহার স্বভাবগত ও উহা যে তাহার অন্যান্য প্রবৃত্তির তুলনায় প্রবল, ইহা প্রমাণিত হয়।

মানুষের দ্বেষ--প্রবৃত্তি স্বতঃই কিরূপে প্রাবল্য লাভ করে তাহা আমরা অতঃপর ব্যাখ্যা করিব।

মানুষের "ইচ্ছা" কাহাকে বলে এবং উহার উৎপত্তি হয় কোন কার্য্যধারায় তাহা বুঝিতে পারিলে দেখা যায় যে, সুখের ইচ্ছা মানুষের অবয়বের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। ইহার কারণ, মানুষের ইচ্ছার উৎপত্তি হয় তাহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতির অংশের স্ব স্ব তৃপ্তিবোধের পূরণার্থক পদার্থ নির্ব্বাচনের কার্য্যে। সুখের ইচ্ছা মানুষের অবয়বের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকে বলিয়া দুঃখে দ্বেষও মানুষের অবয়বের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকে।

ইহার কারণ—মানুষ তাহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি এক একটি অবয়বাংশের তৃপ্তিবোধের পূরণের জন্য যে সমস্ত পদার্থ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থে ঐ সমস্ত অবয়বাংশের তৃপ্তি হইলে মানুষ যেমন সুখলাভ করেন সেইরূপ আবার তৃপ্তি না হইলেই দুঃখ বোধ করিয়া থাকেন। সুখলাভ করা যেমন মনুষ্যের ইচ্ছার বিষয়, সেইরূপ দুঃখ-দ্বেষও মনুষ্যের ইচ্ছার একরকম বিষয়।

ব্যাসদেবের ভাষানুসারে "মানুষের কাম" ও "মানুষের ইচ্ছা"কে মানুষের প্রবৃত্তির মাত্রা বিভাগ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই হিসাবে মানুষের স্বভাবের অভিব্যক্তি হয়—প্রধানতঃ দুইটি প্রবৃত্তিতে; একটির নাম "সুখেচ্ছা-প্রবৃত্তি" আর একটির নাম "দুঃখ-দ্বেষ-প্রবৃত্তি"।

সুখেচ্ছা প্রবৃত্তিতে ও দুঃখ-দ্বেষ-প্রবৃত্তিতে যে মানুষের স্বভাবের অভিব্যক্তি হয় তাহা যে-কোন শিশুর চরিত্র লক্ষ্য করিলে অস্বীকার করা যায় না।

দুঃখ-দ্বেষ-প্রবৃত্তির মধ্যে যে দ্বেষ-প্রবৃত্তি থাকে—সেই দ্বেষ-প্রবৃত্তিকে ব্যাসদেবের ভাষানুসারে "পশুত্ব" বলা হয় না। দুঃখ-দ্বেষ-প্রবৃত্তিতে কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে অথবা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের বিরুদ্ধে কোনরূপ দ্বেষ-প্রবৃত্তি থাকে না।

দুঃখ-দ্বেষ-প্রবৃত্তিতে কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে অথবা কোন সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে কোনরূপ দ্বেষ-প্রবৃত্তি থাকে না বটে কিন্তু ঐ দুঃখ-দ্বেষ-প্রবৃত্তির বিদ্যমানতাবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে এবং ক্রমে ক্রমে সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে মানুষের দ্বেষ-প্রবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী হয়।

দুঃখ-দ্বেষ-প্রবৃত্তির বিদ্যমানতাবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে এবং ক্রমে ক্রমে সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে মানুষের দ্বেষ-প্রবৃত্তি যে অবশ্যম্ভাবী হয় তাহার প্রধান কারণ—চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ, প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের বিভিন্ন ভাগসমূহের স্ব স্ব তৃপ্তিবোধের বিভিন্নতা। যে বস্তুতে মানুষের চক্ষুর তৃপ্তিবোধের পূরণ হয় সেই বস্তুতে কর্ণ, হস্ত ও পদ প্রভৃতির তৃপ্তিবোধের পূরণ সাধারণতঃ হয় না। চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের বিভিন্ন ভাগসমূহের বিভিন্ন তৃপ্তিবোধের পূরণের জন্য মানুষ নানা রকমের পদার্থ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন কিন্তু ভ্রমহীন বিচারবুদ্ধির উৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত কোন পদার্থে মানুষের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের বিভিন্ন ভাগসমূহের সর্ব্বতোভাবের তৃপ্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। অবয়বের একটী ভাগের তৃপ্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হইলে আর একটী ভাগের তৃপ্তি হওয়া সম্ভব-যোগ্য হয় না—এইরূপ অবস্থার উৎপত্তি হয়। বিশেষভাবের সুচিন্তিত শিক্ষা ও সাধনার পদ্ধতি বিদ্যমান না থাকিলে এবং উহা অবলম্বন না করিলে ভ্রমহীন বিচার-বুদ্ধির উৎপত্তি স্বভাবতঃ হয় না। এই কারণে যদিও মানুষ শিশুরূপে প্রধানতঃ সুখেচ্ছা-প্রবৃত্তি লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, কার্য্যতঃ তাঁহার সুখেচ্ছা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় না; এবং ঐ সুখেচ্ছা প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় না বলিয়া তাঁহার দুঃখবোধ অধিকতর প্রবল হয়। উপরোক্ত কারণবশতঃ দুঃখবোধ অধিকতর প্রবল হইলে মানুষ নিজেকে দায়ী না করিয়া তাঁহার পারিপার্শ্বিকগণকে দায়ী করিবার প্রবৃত্তি-যুক্ত হইয়া থাকেন; এবং অতর্কিতভাবে মানুষের মনে হয় যে, তিনি ছাড়া তাঁহার পারিপার্শ্বিকগণের সকলেরই সুখেচ্ছা পূরণ হইতেছে ও পারিপার্শ্বিকগণের সকলেই তাঁহার তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন।

উপরোক্ত কার্য্যধারায় মানুষের জন্মগত সুখেচ্ছা প্রবৃত্তিবশতঃ শৈশবকালেই দুঃখ-দ্বেষ-প্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলভাবে উদ্ভূত হয় এবং ঐ দুঃখ-দ্বেষ-প্রবৃত্তিবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে এবং ক্রমে ক্রমে সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে অতর্কিতভাবে দ্বেষ-প্রবৃত্তিও স্বভাবতঃ প্রবলভাবে উদ্ভূত হইয়া থাকে। দ্বেষ-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইলেই দ্বেষ-প্রবৃত্তির বিকাশ হয় না। দ্বেষ-প্রবৃত্তির বিকাশ হয় দ্বেষের কার্য্যে।

ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে এবং ক্রমে ক্রমে সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে অতর্কিত ভাবে দ্বেষ-প্রবৃত্তি মানুষের শৈশব হইতে স্বভাবতঃ প্রবলভাবে উদ্ভূত হইয়া থাকে বলিয়া পশুত্বকে মানুষের স্বভাবগত বলা হয়। ইহার কারণ ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে এবং সম্প্রদায়-বিশেষের বিরুদ্ধের দ্বেষ-প্রবৃত্তির নাম মানুষের পশুত্ব।

মানুষের পশুত্ব যেরূপ স্বভাবগত, মানুষের মনুষ্যত্বও সেইরূপ স্বভাবগত। ইহার কারণ মানুষের জন্মগত সুখেচ্ছা প্রবৃত্তির বিদ্যমানতা বশতঃ শৈশব কালেই ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে এবং ক্রমে ক্রমে সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে যেরূপ দ্বেষ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় সেইরূপ মানুষের জন্মগত সুখেচ্ছা প্রবৃত্তির বিদ্যমানতা বশতঃই শৈশব কাল হইতে দ্বেষ-প্রবৃত্তি দূর করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে।

মানুষের পশুত্ব যেরূপ স্বভাবগত মানুষের মনুষ্যত্বও সেইরূপ স্বভাবগত বটে, কিন্তু পশুত্ব যেরূপ শৈশব হইতেই স্বভাবতঃ বিকাশ লাভ করে মনুষ্যত্ব সেইরূপ শৈশব হইতেই স্বভাবতঃ বিকাশ লাভ করে না। ইহার কারণ ব্যক্তিবিশেষের ও সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে মানুষের দ্বেষ-প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ যত প্রবল হয় ঐ দ্বেষ প্রবৃত্তি দূর করিবার প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ তত প্রবল হয় না।

ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে অথবা সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে মানুষের দ্বেষ-প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ যত প্রবল হয় ঐ দ্বেষ-প্রবৃত্তি দূর করিবার প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ তত প্রবল হয় না বটে, কিন্তু ঐ দ্বেষ-প্রবৃত্তি দূর করিবার প্রবৃত্তিও মানুষের স্বভাবেই বিদ্যমান থাকে। ঐ দ্বেষ-প্রবৃত্তি দূর করিবার প্রবৃত্তিও মানুষের স্বভাবেই বিদ্যমান থাকে বলিয়া মানুষ চেষ্টা করিলে ঐ দ্বেষ-প্রবৃত্তি দূর করিবার প্রবৃত্তিরও বিকাশ সাধন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।

উপরোক্ত কথা হইতে ইহা বুঝিতে হয় যে, মানুষের পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব উভয়ই স্বভাবগত বটে, কিন্তু পশুত্ব স্বভাবতঃ বিকাশ লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যত্ব স্বভাবতঃ বিকাশ লাভ করিতে পারে না ও বিকাশ লাভ করে না। মানুষের মনুষ্যত্ব যাহাতে বিকাশ লাভ করিতে পারে তাহার জন্য মানুষের চেষ্টা অথবা ব্যবস্থা করিতে হয়।

মানুষের পশুত্ব যেরূপ স্বভাবতঃ বিকাশ লাভ করিয়া থাকে মানুষের মনুষ্যত্ব যে সেইরূপ স্বভাবতঃ বিকাশ লাভ করে না তাহা যে কোন বালকের স্বভাব লক্ষ্য করিলে অস্বীকার করা যায় না।

মানুষের মনুষ্যত্ব যাহাতে বিকাশ লাভ করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা অথবা ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে মানুষের পশুত্বের কার্য্য যাহাতে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ মানুষের পশুত্বই প্রবলতর এবং স্বভাবতঃ বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। পশুত্বের কার্য্য দূর করিবার ব্যবস্থা না করিলে মনুষ্যত্ব কোন ক্রমেই বিকাশ লাভ করিতে পারে না। পশুত্বের কার্য্য দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা না করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করিবার ব্যবস্থা করিলে যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় সেই মনুষ্যত্ব অবিমিশ্র খাঁটি মনুষ্যত্ব হইতে পারে না। উহার সহিত পশুত্বের জঁ্যাজাল অপরিহার্য্যভাবে থাকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সহিত পশুত্বের জঁ্যাজাল থাকিলে পশুত্বই কার্য্যতঃ প্রবলতা লাভ করে। ইহার কারণ মানুষের পশুত্ব স্বভাবতঃ তাঁহার মনুষ্যত্বের তুলনায় প্রবলতর।

মানুষের পশুত্ব স্বভাবতঃ তাঁহার মনুষ্যত্বের তুলনায় প্রবলতর বটে, কিন্তু মানুষ যদ্যপি উহা নিবারণ করিবার ও দূর করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে উহা বিকাশ লাভ করিতে পারে না।

মানুষের পশুত্বের বিকাশ যাহাতে দূরীভূত হইতে ও নিবারিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা যদ্যপি বিশেষভাবে সাধিত না হয় তাহা হইলে মানুষের পশুত্বের বিকাশ হওয়া অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

পশুত্বের বিকাশ যাহাতে নিবারিত ও দূরীভূত হয় তাহার ব্যবস্থা হইলেই পশুত্ব নিবারিত ও দূরীভূত হয় না। ব্যাসদেবের ভাষানুসারে "পশুত্বের বিকাশ নিবারণ করা" আর "পশুত্ব নিবারণ করা" এই দুইটী কথা একার্থক নহে। দ্বেষের প্রবৃত্তি যাহাতে দ্বেষের কার্য্যে পরিণত না হয় তাহা করিতে পারিলেই পশুত্বের বিকাশ নিবারিত হয়। পশুত্ব নিবারণ করিতে হইলে দ্বেষের প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত যাহাতে না থাকে তাহা করিবার প্রয়োজন হয়। পশুত্বের বিকাশ নিবারিত হইলেও পশু-প্রবৃত্তি অথবা দ্বেষ-প্রবৃত্তি মানুষের থাকিতে পাবে। কিন্তু পশুত্ব নিবারিত হইলে পশু-প্রবৃত্তি অথবা দ্বেষ-প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না। মানুষ যদ্যপি মানুষের পশুত্বের বিকাশ নিবারণ করিবার ও দূর করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে মানুষের পশুত্বের বিকাশ নিবারণ করা যেরূপ সম্ভব হয় সেইরূপ পশুত্ব স্বভাবগত হইলেও সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করা এবং দূর করাও সম্ভবযোগ্য হয়।

মানুষ যদ্যপি মানুষের পশুত্বের বিকাশ নিবারণ করিবার ও দূর করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে মানুষের স্বভাবগত পশুত্ব সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করা ও দূর করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু মানুষের স্বভাবগত পশুত্ব সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করা ও দূর করা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের স্বভাবগত পশুত্ব সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করা ও দূর করা কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা সম্ভবযোগ্য হয় না। উহার জন্য ব্যক্তিগত সাধনার প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিগত যে সাধনায় মানুষের স্বভাবগত পশুত্ব সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভবযোগ্য হয় সেই সাধনা প্রত্যেক মানুষের সাধ্যান্তর্গত নহে।

ঐ সাধনা যে প্রত্যেক মানুষের সাধ্যান্তর্গত হয় না তাহার প্রধান কারণ দুই শ্রেণীর, যথা :

(১) জন্মভূমির স্থানগত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ;
(২) মাতাপিতার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যসমূহ।

ঐ দুই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সময় সময় মানুষের শক্তি ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিবার বিঘ্ন প্রদায়ক হইয়া থাকে এবং ঐ সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করা সর্ব্বক্ষেত্রে সম্ভবযোগ্য না-ও হইতে পারে।

ব্যক্তিগত যে সাধনায় মানুষের স্বভাবগত পশুত্ব সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভবযোগ্য হয় মানুষের পশুত্বের বিকাশ নিবারণ করিবার ও দূর করিবার ব্যবস্থা মানবসমাজে না থাকিলে, সেই সাধনা অবলম্বন করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না।

ইহার কারণ একদিকে পশুত্ব যাহাতে বিকাশ হইতে স্বতঃই নিবৃত্ত থাকে নিজেকে তদুপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিতে না পারিলে পশুত্বের বিকাশ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না এবং পশুত্বের বিকাশ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য না হইলে পশুত্ব সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করা অথবা দূর করা সম্ভবযোগ্য হয় না ; অন্যদিকে, সমাজমধ্যে বিনা বাধায় কাহারও পশুত্বের বিকাশ সম্ভবযোগ্য হইলে প্রত্যেকেরই পশুত্বের বিকাশের আশঙ্কা থাকে।

মানুষের মধ্যে যখন পশুত্ব বিদ্যমান থাকে তখন ব্যক্তিবিশেষের অথবা সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে যেরূপ দ্বেষ-প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে সেইরূপ আবার কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অথবা কোন কোন ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ প্রবৃত্তিও বিদ্যমান থাকে। সময় সময় কোন কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে অথবা সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রবৃত্তিও থাকিতে পারে।

অনুরাগ-প্রবৃত্তি অথবা ঔদাসীন্য-প্রবৃত্তি ছাড়া কখনও দ্বেষ-প্রবৃত্তি থাকিতে পাবে না। এই কারণে মানুষের পশুত্বে কখনও কেবল মাত্র দ্বেষের পাত্র থাকে না। যেমন দ্বেষের পাত্র থাকে, সেইরূপ ভালবাসার পাত্রও থাকে এবং সময় সময় ঔদাসীন্যের পাত্রও থাকিতে পারে।

মানুষের মধ্যে যখন প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় তখন কেবলমাত্র অনুরাগের পাত্র থাকে, কোনরূপ দ্বেষের অথবা ঔদাসীন্যের পাত্র প্রকৃত মনুষ্যত্বযুক্ত মানুষের থাকিতে পাবে না এবং থাকে না।

উপরোক্ত কথাসমূহ হইতে ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে মানুষের পশুত্ব যাহাতে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে না পারে তাহা করা মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। উহা করিতে হইলে মানুষের দ্বেষের প্রবৃত্তি যাহাতে দ্বেষের কার্য্যে পরিণত না হইতে পারে এবং না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। মানুষের দ্বেষের প্রবৃত্তি যাহাতে দ্বেষের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে ও পরিণতি লাভ না করে তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে মানুষের সাধ্যায়ত্ত। ঐ ব্যবস্থা সাধিত হইলে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ স্বঃতই সাধিত হয়। মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ যাহাতে স্বঃতই সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ হওয়া অথবা মারামারি হওয়া অথবা যুদ্ধ হওয়া অসম্ভবযোগ্য হইতে পারে এবং মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ ও সর্ব্ববিধ অভাব সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে।

মানুষের পশুত্ব যাহাতে বিকাশ প্রাপ্ত না হইতে পারে অথবা উহা যাহাতে দূরীভূত হইতে বাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা মনুষ্য-সমাজে বিদ্যমান না থাকিলে যে একদিকে মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য হয় এবং অন্যদিকে মানুষের আকাঙ্ক্ষনীয় প্রতিষ্ঠা, ধনপ্রাচুর্য্য, ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতা অসম্ভবযোগ্য হয় তাহার যুক্তিবাদ সম্বন্ধে আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

মানুষের পশুত্ব যাহাতে দূরীভূত হইতে বাধ্য হয় এবং বিকাশ-প্রাপ্ত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা মানবসমাজে না থাকিলে

প্রথমতঃ, মানুষের স্বতঃই দ্বেষ-হিংসা-প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়; দ্বিতীয়তঃ, দ্বেষ-হিংসার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া সম্ভব হয়; তৃতীয়তঃ, দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে মারামারির প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়; চতুর্থতঃ, মারামারির প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে, যুদ্ধ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়।

পরশ্রীকাতরতাকে আমরা "দ্বেষ-প্রবৃত্তি" বলিয়া থাকি; পরের অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তিকে আমরা হিংসা-প্রবৃত্তি বলিয়া থাকি; অসাক্ষাতে নিন্দা ও প্রতিনিন্দা করিবার প্রবৃত্তিকে আমরা দ্বন্দ্ব প্রবৃত্তি বলিয়া থাকি; সাক্ষাতে অথবা মুখোমুখী কথা-কাটাকাটি করিবার প্রবৃত্তিকে আমরা কলহ-প্রবৃত্তি বলিয়া থাকি; লাঠি প্রভৃতি কোনরূপ অস্ত্রের সাহায্য না লইয়া এবং বিশেষ ভাবের কোনরূপ দলবন্ধনে বদ্ধ না হইয়া কেবলমাত্র হাত, পা, দাঁত ও নখ প্রভৃতির সাহায্যে দুই পক্ষের ঘাত-প্রতিঘাত করিবার প্রবৃত্তিকে আমরা মারামারির প্রবৃত্তি বলিয়া থাকি; দলবন্ধনে বদ্ধ হইয়া অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে যে মারামারি হয় সেই মারামারির প্রবৃত্তিকে আমরা যুদ্ধ-প্রবৃত্তি বলিয়া থাকি। "দ্বেষ", "হিংসা", "দ্বন্দ্ব", "কলহ", "মারামারি" ও "যুদ্ধ" কাহাকে বলে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলে, দ্বেষ হইতে যে হিংসার, হিংসা হইতে যে দ্বন্দ্বের, দ্বন্দ্ব হইতে যে কলহের, কলহ হইতে যে মারামারির এবং মারামারি হইতে যে যুদ্ধের উদ্ভব হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব এবং উহা যে হইয়া থাকে তাহা সাধারণ বিচার-বুদ্ধির দ্বারাও বুঝিতে পারা যায়।

মানুষের পশুত্ব যাহাতে বিকাশ লাভ করিতে না পারে অথবা উহা যাহাতে দূরীভূত হইতে বাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা মনুষ্য-সমাজে বিশেষভাবে বিদ্যমান না থাকিলে মনুষ্যসমাজে যুদ্ধ প্রবৃত্তি ও যুদ্ধ যে অনিবার্য্য হইয়া থাকে তাহা মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতে পারে।

মানুষের পশুত্ব যাহাতে বিকাশ লাভ করিতে না পারে অথবা উহা যাহাতে দূরীভূত হইতে বাধ্য হয় তাহার কোন শ্রেণীর ব্যবস্থা যে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের কুত্রাপি বিদ্যমান নাই তাহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

মানুষের পশুত্ব যাহাতে বিকাশ লাভ করিতে না পারে এবং উহা যাহাতে দূরীভূত হইতে বাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে মানুষের স্বভাবগত দ্বেষের প্রবৃত্তি যাহাতে দ্বেষের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা যে করিতে হয় তাহা আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি।

মানুষের স্বভাবগত দ্বেষের প্রবৃত্তি যাহাতে দ্বেষের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা মানবসমাজে না থাকিলে শুধু যে দ্বেষ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলহ, মারামারি ও যুদ্ধপ্রবৃত্তি অনিবার্য্য হয় তাহা নহে। মানুষের স্বভাবগত দ্বেষের প্রবৃত্তি যাহাতে দ্বেষের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা মানবসমাজে না থাকিলে যাহা যাহা মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় তাহার কোন একটিও সর্ব্বতোভাবে পাওয়া কোন একটি মানুষের পক্ষেও সম্ভবযোগ্য হয় না। পরন্তু প্রত্যেক মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া থাকে। কি কি যে মানুষের আকাঙ্ক্ষার যোগ্য তাহা পর্য্যন্ত মানুষ নির্ব্বাচন করিতে অক্ষম হইয়া থাকেন। এবং এমন কি যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষার অযোগ্য তাহা পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া মানুষ মনে করিতে আরম্ভ করেন। এক এক শ্রেণীর পদার্থকে মানুষ আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া মনে করেন; কিছুদিন ঐ সমস্ত পদার্থের ব্যবহার করেন: অবশেষে দেখিতে পান যে, ঐ সমস্ত পদার্থ মানুষের প্রয়োজনের তৃপ্তিসাধন করিতে অক্ষম; আবার নূতন নূতন শ্রেণীর পদার্থ মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া স্থির করা হয়; কিছুদিন পরে আবার ঐ সমস্ত ত্যাগ এবং আবার নূতনের গ্রহণ। প্রতিনিয়ত রুচির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়েন।

আমাদিগের বিচারানুসারে মানুষের যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষার পদার্থ তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা:

(১) প্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য্য;
(২) ধনের প্রাচুর্য্য;
(৩) ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি;
(৪) জ্ঞানের পরিতৃপ্তি।

মানুষের স্বভাবগত দ্বেষের প্রবৃত্তি যাহাতে দ্বেষের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা মানবসমাজে না থাকিলে মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় উপরোক্ত চারি শ্রেণীর পদার্থের কোন শ্রেণীর পদার্থেরই আকাঙ্ক্ষা কোন মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও পরিতৃপ্ত হয় না। ইহার কারণ—যে কোন মানুষের যে কোন শ্রেণীর পদার্থের আকাঙ্ক্ষার সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্তি সাধন করিতে হইলে জ্ঞান বিজ্ঞানের পূর্ণতা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয় এবং মানুষের স্বভাবগত দ্বেষের প্রবৃত্তি যাহাতে দ্বেষের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা মানবসমাজে না থাকিলে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হওয়া কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও হয় না।

মানুষ চাহেন প্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য্য; সমাজের প্রত্যেকে যাহাতে আকৃষ্ট হন ও উৎকর্ষ স্বীকার করেন তাহা হয় জ্ঞাতভাবে নতুবা অজ্ঞাতভাবে প্রত্যেক মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। উহা আকাঙ্ক্ষার বিষয় বটে, কিন্তু যখন মানবসমাজে মানুষের পশুত্ব-প্রবণতার বাধাপ্রদায়ক ব্যবস্থার অভাব হয়, তখন প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই প্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য্যের স্থলে অপ্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য্যলাভ করিতে হয়। প্রত্যেকের আকৃষ্টতার স্থলে অধিকাংশের অনাকৃষ্টতা অথবা ঔদাসীন্য দেখা দেয়। যে কনিষ্ঠ ভাই-ভগিনীগণ, সন্তানগণ ও কর্ম্মচারীগণের স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইবার ও উৎকর্ষ স্বীকার করিবার কথা তাহারা পর্য্যন্ত প্রকাশ্যতঃ বিদ্রোহী না হইলেও প্রায়শঃ মনে মনে অগ্রজ, অগ্রজার, পিতামাতার ও প্রভুর বিরুদ্ধবাদী এবং নিন্দাপ্রয়াসী হইয়া থাকেন।

ধনের প্রাচুর্য্য স্থলে ধনাভাব এবং এমন কি সর্ব্বতোভাবের দারিদ্র্য সর্ব্বত্র দেখা দেয়।

ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির স্থলে প্রায় প্রত্যেক মানুষের প্রায় প্রত্যেক ইন্দ্রিয় পূর্ণ সক্ষমতার অভাবযুক্ত অথবা অক্ষমতাযুক্ত হইয়া পড়ে।

জ্ঞানের পরিতৃপ্তির স্থলে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা অসম্ভব বলিয়া মানুষের সংস্কার হয়।

যে সমস্ত কথা ও কার্য্য সর্ব্বতোভাবে কাল্পনিক ও অর্থহীন, সেই সমস্ত কথাকে জ্ঞানের কথা মনে করিয়া মানুষের পরিতৃপ্তির স্থলে অপরিতৃপ্তি অথবা বিরক্তি বৃদ্ধি পায়।

মানুষের স্বভাবগত দ্বেষের প্রবৃত্তি যাহাতে দ্বেষের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে মানবসমাজে তাহার ব্যবস্থার অভাব হইলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ-হিংসার প্রবৃত্তি এবং দ্বন্দ্ব-কলহের কার্য্য অনিবার্য্য হয়।

দ্বেষ-হিংসার প্রবৃত্তি ও দ্বন্দ্ব-কলহের কার্য্য আরম্ভ হইলে কাহারও প্রতিষ্ঠা অপ্রতিহত থাকা অসম্ভব হয় এবং ক্রমে ক্রমে অপ্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য হয়। প্রকৃতপক্ষে ধনাভাব না থাকিলেও দ্বেষ-হিংসা-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইলে স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে তুলনামূলক উচ্চ-নীচভাবের উদ্ভব হয় এবং তুলনামূলক অভাববোধ অনিবার্য্য হয়। তুলনামূলক অভাববোধের উৎপত্তি হইলে জাঁকজমক দেখাইবার প্রবৃত্তি ও কার্য্য অনিবার্য্য হয়। জাঁকজমক দেখাইবার প্রবৃত্তি ও কার্য্য আরম্ভ হইলে নিষ্প্রয়োজনীয় ব্যয়বাহুল্য অনিবার্য্য হয়। নিষ্প্রয়োজনীয় ব্যয়বাহুল্য আরম্ভ হইলে ধনাভাব ও ক্রমে ক্রমে দারিদ্র্য অনিবার্য্য হয়।

দ্বেষ-হিংসার প্রবৃত্তি ও দ্বন্দ্ব-কলহের কার্য্য আরম্ভ হইলে মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের উত্তেজনা ও বিষাদ অনিবার্য্য হয়। মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের উত্তেজনা ও বিষাদ হইতে থাকিলে ঐ ইন্দ্রিয়সমূহের সক্ষমতার ক্ষয় এবং ক্রমে ক্রমে সক্ষমতার অভাব ও অক্ষমতার উৎপত্তি অনিবার্য্য হয়।

মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের উত্তেজনা ও বিষাদ বিদ্যমান থাকিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বুঝিতে অথবা উপলব্ধি করিতে ভ্রম হওয়া অনিবার্য্য হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বুঝিতে অথবা উপলব্ধি করিতে ভ্রম আরম্ভ হইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথায় পরিতৃপ্তি লাভ করা অসম্ভব হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথায় পরিতৃপ্তি লাভ করিতে না পারিলে ঐ সম্বন্ধে অবহেলা অনিবার্য্য হয়। প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথায় অবহেলা আরম্ভ হইলে ক্রমে ক্রমে যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুষ্ট অথবা যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরোধী, তাহাকে সময় সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিয়া মনে করা অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যখন মানবসমাজে মানুষের স্বভাবগত দ্বেষের প্রবৃত্তি যাহাতে দ্বেষের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থার অভাব হয় তখন একদিকে দ্বেষ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলহ, মারামারি ও যুদ্ধ যেমন মানবসমাজে ব্যাপকতা লাভ করে, সেইরূপ আবার মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় প্রতিষ্ঠা, ধন-প্রাচুর্য্য, ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতাও মানুষের ভাগ্যে অসম্ভব যোগ্য হয়।

মানুষের স্বভাবগত দ্বেষের প্রবৃত্তি যাহাতে দ্বেষের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা মানবসমাজে বিদ্যমান না থাকিলে মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা, ধন-প্রাচুর্য্য, ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতা যে মানুষের ভাগ্যে অসম্ভবযোগ্য হয়, আমাদিগের বিচারানুসারে মানব-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে তাহার উদাহরণস্বরূপ লওয়া যাইতে পারে।

যে শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয়, সেই প্রতিষ্ঠার অভাব যে বর্ত্তমান মানব-সমাজে প্রত্যেকের বিদ্যমান আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, আমাদিগের ঐ কথা সর্ব্বতোভাবে নির্ভুল নহে; হিটলার, চার্চ্চিল, রুজভেল্ট প্রভৃতি মানব-সমাজের সারথিগণের প্রতিষ্ঠা লোভনীয় এবং সর্ব্বতোভাবে দুষ্টতামুক্ত। উহা লোভনীয় এবং সর্ব্বতোভাবে দুষ্টতামুক্ত কি না তৎসম্বন্ধে মানব-সমাজের সারথিগণ যেরূপ নির্ভুলভাবে সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম, আমরা সেইরূপ নির্ভুলভাবে সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম নহি। আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান মানব-সমাজে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে পোষকতা করিবার লোক যেমন বিদ্যমান থাকেন, সেইরূপ প্রত্যেকেরই প্রতিষ্ঠার বিপক্ষতা অথবা শত্রুতা করিবার লোকও বিদ্যমান থাকেন। শত্রুতাহীন প্রতিষ্ঠা যেরূপ আকাঙ্ক্ষণীয় হয়, শত্রুতাযুক্ত প্রতিষ্ঠা সেইরূপ আকাঙ্ক্ষণীয় হইতে পারে না এবং হয় না। আমাদিগের বিচারানুসারে শত্রুতাহীন প্রতিষ্ঠা আজকাল কাহারও ভাগ্যে হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে এবং ঐ কারণে আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় প্রতিষ্ঠা আজকালকার মানব-সমাজে মানুষের ভাগ্যে অসম্ভবযোগ্য হইয়াছে।

ধনপ্রাচুর্য্য আজকালকার মানুষের ভাগ্যে অসম্ভবযোগ্য হইয়াছে এই কথাও একশ্রেণীর মানুষের মতবাদানুসারে পাগলের উক্তি বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে। যখন চারিদিকে কোটী কোটী মুদ্রা ছাপাইবার কার্য্য চলিতেছে এবং ঐ কোটী কোটীর ভাগ কোটী কোটী মানুষ লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী সংখ্যায় পাইতেছেন তখন 'আজকালকার মানুষের ভাগ্যে ধন-প্রাচুর্য্য অসম্ভব' এতাদৃশ উক্তিকে পাগলের উক্তি বলিয়া মনে করা আপাতদৃষ্টিতে অলীক নহে। আমাদিগের মতবাদানুসারে মুদ্রার সংখ্যাদ্বারা ধন-প্রাচুর্য্য অথবা ধনাভাব স্থির করা যায় না। ধন-প্রাচুর্য্য অথবা ধনাভাব স্থির করিবার মাপকাঠী আমাদিগের মতবাদানুসারে প্রধানতঃ দুইটি, যথা: (১) প্রয়োজনীয় ও আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তুর প্রাচুর্য্য অথবা অপ্রাচুর্য্য, এবং (২) ধনাভাবের সর্ব্বতোভাবের নিবৃত্তি অথবা বিদ্যমানতা। প্রয়োজনীয় ও আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তুর প্রাচুর্য্য থাকিলে এবং ধনাভাবের সর্ব্বতোভাবের নিবৃত্তি হইলে মুদ্রার সংখ্যা অল্প হইলেও ধন-প্রাচুর্য্য আছে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। আর প্রয়োজনীয় ও আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তুর অপ্রাচুর্য্য এবং ধনাভাবের বিদ্যমানতা থাকিলে মুদ্রার সংখ্যা অগণিত হইলেও ধনাভাব আছে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

আজকালকার রেশনিং-এর দিনে প্রয়োজনীয় ও আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তুর কাহারও অপ্রাচুর্য্য নাই—ইহা মনে করিবার দুঃসাহস আমাদিগের নাই। কোটীপতিরও আজকালকার দিনে ধনাভাবের

অভাব থাকে ইহাও আমাদিগের মনে হয় না। আমাদিগের মতে যাহারা আজকালকার দিনে দরিদ্রশ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁহাদিগের অভাব কয়েক শত অথবা কয়েক সহস্র মুদ্রার। অবশ্য ঐ সামান্য-সংখ্যক মুদ্রার অভাবই তাঁহাদিগের পক্ষে খুব তীব্র। যাঁহারা কোটীপতি, তাঁহাদিগের কয়েক শত অথবা কয়েক সহস্র অথবা কয়েক লক্ষের অভাব থাকে না বটে কিন্তু তাঁহাদিগের অভাব থাকে কয়েক কোটীর। যিনি কোটীপতি তাঁহার ঘরে ভিখারী দরিদ্রের খাদ্যের অভাব অথবা সাধারণ বিলাসীর বিলাসদ্রব্যের অভাব থাকে না, কিন্তু তাঁহার মন খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, কোটীপতির অভাবের সংখ্যা ও পরিমাণ যেরূপ অধিক, দরিদ্রের অভাবের সংখ্যা ও পরিমাণ কখনও তত অধিক হইতে পারে না ও হয় না।

যখন প্রগতিশীল বিজ্ঞান অগণিত রকমের বস্তু মানুষের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য উৎপাদন করিতেছে ও সরবরাহ করিতেছে তখন মানুষের ভাগ্যে আকাঙ্ক্ষণীয় ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি অসম্ভবযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে—এতাদৃশ মতবাদ পোষণ করা আপাত-দৃষ্টিতে যে দুঃসাহসের অথবা পাগলামীর পরিচয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমাদিগের মতবাদানুসারে ঘরে এবং নিজের হাতের কাছে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির যোগ্য অগণিত পরিমাণের এবং সংখ্যার বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রিয়সমূহ যদি ঐ সমস্ত বস্তু উপভোগ করিবার ও পরিতৃপ্তি লাভ করিবার সক্ষমতার অভাব-যুক্ত অথবা অক্ষমতাযুক্ত হয় তাহা হইলে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির-যোগ্য বস্তুর সংখ্যা অগণিত হইলেও তাহার কোন সার্থকতা থাকে না। আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান মানব-সমাজের মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহ প্রায়শঃ ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করিবার ও পরিতৃপ্তি লাভ করিবার সক্ষমতার অভাবযুক্ত এবং অক্ষমতাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারই জন্য আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি আজকালকার মানব-সমাজে অসম্ভব-যোগ্য হইয়াছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতা যে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে তদ্বিষয়ে কোন মতবিরুদ্ধতার বালাই নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ত্তমান সারথিগণ নিজেরাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধন করা মানুষের সাধ্যের বহির্ভূত।

মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা দ্বেষ-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্য্যে অথবা দ্বেষের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে একদিকে যেরূপ মানব-সমাজে দ্বেষ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলহ, মারামারি ও যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়, সেইরূপ মানব-সমাজে যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ব্যাপকতা লাভ করিলেও ঐ ব্যবস্থা সাধন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। ঐ ব্যবস্থা সাধিত না হইলে অন্য কোন উপায়ে মানব-সমাজের বিভিন্ন জাতির পরস্পরের কোন শ্রেণীর যুদ্ধের স্থায়ী ভাবের কোন শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না ও স্থায়ীভাবে শান্তি স্থাপিত হয় না।

মানুষের পরস্পরের যুদ্ধের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হইবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে অন্য কোন উপায়ে যে মানব-সমাজের বিভিন্ন জাতির পরস্পরের কোন শ্রেণীর যুদ্ধের স্থায়ী ভাবের কোন শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না তাহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য গত আড়াই হাজার বৎসর-ব্যাপী মানবসমাজের যুদ্ধের ইতিহাস।

গ্রীকগণের অভ্যুদয়কাল হইতে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ-কালের পরিমাণ প্রায় ২৫০০ বৎসর। গ্রীকগণের অভ্যুদয় হইতে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত মানবসমাজের বিভিন্ন জাতির উত্থান ও পতনের ইতিহাস শৃঙ্খলিতভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ঐ সুদীর্ঘকালে মানবসমাজের বহু জাতির উত্থান ও বহু জাতির পতন ঘটিয়াছে। যখন যে জাতির উত্থান ঘটিয়াছে, তখনই সেই জাতিকে বিব্রত ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে একটী অথবা একাধিক জাতি দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং দুই পক্ষের পরস্পরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। অভ্যুদয়শীল জাতি যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে বিধ্বস্ত না হইয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই অভ্যুদয়শীল জাতির বিরুদ্ধের যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হয় নাই। মধ্যে মধ্যে দুই পক্ষের ক্লান্তির জন্য যুদ্ধের তীব্রতা সাময়িকভাবে নিবারিত হইয়াছে এবং ইতিহাসে যুদ্ধের ঐ সাময়িক নিবারণকে "যুদ্ধের শান্তি" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে যখনই যে জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, সেই জাতির সর্ব্বতোভাবে পতন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধের যুদ্ধ নির্ব্বাপিত হয় নাই। এক গ্রীকগণ ছাড়া কোন জাতির অভ্যুদয়কাল চারি শত বৎসরের অধিক দীর্ঘতা লাভ করিতে পারে নাই। গ্রীকগণের অভ্যুদয় সাড়ে ছয়শত বৎসরের অধিক দীর্ঘ হয় নাই।

গত আড়াই হাজার বৎসর কালের মানবসমাজের ইতিহাস যে অবিরত যুদ্ধের ইতিহাস এবং ঐ সুদীর্ঘকালের মধ্যে মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা দ্বেষ-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্য্যে অথবা দ্বেষের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার কোনও ব্যবস্থা যে মানবসমাজে সাধিত হয় নাই—তাহা কোন ক্রমে অস্বীকার করা যায় না।

মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা দ্বেষ-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তিবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত যুক্তিবাদ হইতে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে নিম্নলিখিত ছয়টী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়; যথা :

(১) মানুষের দ্বেষ-প্রবৃত্তিরই অপর নাম মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা পশুত্ব;

(২) মানুষের মনুষ্যত্বের তুলনায় তাহার পশুত্ব স্বভাবতঃ অধিকতর প্রবল;

(৩) মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে বিশেষ ভাবে মানবসমাজে তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে এবং স্বভাবের উপর নির্ভর করিলে মানুষের দ্বেষ-প্রবৃত্তি, হিংসা-প্রবৃত্তি, দ্বন্দ্ব-প্রবৃত্তি, কলহ-প্রবৃত্তি, মারামারির প্রবৃত্তি এবং যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে।

(৪) মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে বিশেষ ভাবে তাহার ব্যবস্থা সাধন না করিয়া যাহাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় তাহার ব্যবস্থা সাধন করিলে খাঁটি মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না; পরন্তু পশুত্বই মানুষের স্বভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে;

(৫) মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে বিদ্যমান না থাকিলে একদিকে দ্বেষ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলহ, মরামারি ও যুদ্ধ এবং অন্যদিকে, প্রত্যেক মানুষের অপ্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য, ইন্দ্রিয়ের অপরিতৃপ্তি ও কু-জ্ঞান সমগ্র মানব-সমাজময় ব্যাপকতা লাভ করিয়া থাকে ;

(৬) মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে সাধিত না হইলে কোনও শ্রেণীর যুদ্ধেরই স্থায়ী ভাবের শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না।

মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা দ্বেষ-প্রবৃত্তির কুফল এবং উহার বিকাশ দূর করিবার সুফল কি কি হইতে পারে তাহা বিচার করিয়া দেখিলে আরও পাঁচটী বিষয় পরিস্ফুট হয় ; যথা :

(১) প্রত্যেক শ্রেণীর যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে জয় করিবার একমাত্র পন্থা মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে সাধন করিতে পারা এবং করা ;

(২) মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে সাধন করিতে না পারিলে এবং না করিলে অন্য কোন উপায়ে কোন শ্রেণীর যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়ী হওয়া যায় না ;

(৩) মানুষের অপ্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য, ইন্দ্রিয়ের অপরিতৃপ্তি ও জ্ঞানাভাব দূর করিয়া প্রকৃত প্রতিষ্ঠা, ধন-প্রাচুর্য্য, ইন্দ্রিয়সমূহের পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করিবার এক মাত্র পন্থা মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে সাধন করা ;

(৪) মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে সাধিত হইলে মানুষের অপ্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য, ইন্দ্রিয়ের অপরিতৃপ্তি ও জ্ঞানাভাব দূর করিয়া প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা, ধন-প্রাচুর্য্য, ইন্দ্রিয়সমূহের পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করিবার ব্যবস্থা যুগপৎ সাধিত হয় ;

(৫) মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে সাধিত করিতে না পারিলে ও না করিলে অন্য কোন উপায়ে মানুষের অপ্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য, ইন্দ্রিয়ের অপরিতৃপ্তি ও জ্ঞানাভাব দূর করিয়া প্রকৃত প্রতিষ্ঠা, ধনপ্রাচুর্য্য, ইন্দ্রিয়সমূহের পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করিবার ব্যবস্থা করা কোন-ক্রমে সম্ভবযোগ্য নহে।

মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা দ্বেষ-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের অথবা দ্বেষের কার্য্যে পরিণত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাহা চিন্তা করিতে পারিলে দেখা যায় যে, ঐ ব্যবস্থা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্বের মেরুদণ্ডস্বরূপ। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব না থাকিলে যেমন মানুষের অস্তিত্ব থাকা সম্ভবযোগ্য নহে, সেইরূপ মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা দ্বেষ-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের অথবা দ্বেষের কার্য্যে পরিণত না হইতে পারে মানব-সমাজে বিশেষভাবে তাহার ব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকিলে কোনও মানুষের পক্ষে প্রকৃত মানুষের মত জীবন ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

মানুষের পশুপ্রবৃত্তি অথবা দ্বেষ-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের অথবা দ্বেষের কার্য্যে পরিণত না হইতে পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে বিদ্যমান না থাকিলে মানুষের অবস্থা বন্য পশু-পক্ষীর অবস্থার সহিত তুলনায় হীনতর হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, বন্য পশু-পক্ষিগণ অনাহারে অথবা অর্দ্ধাহারে বিনষ্ট হইতে পারে না। তাহাদিগের অনাহার অথবা অর্দ্ধাহার ঘটিতে পারে না। তাহারা জরা অথবা ব্যাধি নিবন্ধন স্ব স্ব কর্ম্মে অক্ষম হইতে পারে না। তাহারা পরস্পরের প্রতি স্বভাবতঃ বৈরীভাব পোষণ করিতে পারে না। তাহারা পরস্পরের প্রাণ-হত্যা করিবার জন্য কৌশল-নিরত হইতে পারে না।

বন্য পশু-পক্ষিগণের মধ্যে অনাহার, অর্দ্ধাহার, জরা, ব্যাধি, পরস্পরের মধ্যে বৈরীভাব, পরস্পরের হত্যা-লোলুপতা অসম্ভবযোগ্য বটে, কিন্তু মানুষ যখন স্ব স্ব দ্বেষ প্রবৃত্তিকে দ্বেষের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে অক্ষম হন, তখন মানুষের মধ্যে উহার প্রত্যেকটীই সম্ভবযোগ্য হয়।

মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা দ্বেষ-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের অথবা দ্বেষের কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা যে কেবলমাত্র ব্যাসদেবের গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা নহে। বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট ও নবীমহম্মদ প্রভৃতি প্রত্যেক মহামানবের বাণীতে দ্বেষ-হিংসা-প্রবৃত্তির সংযমের আবশ্যকতার কথা পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত মহামানবের প্রত্যেকেই দ্বেষ-হিংসা-প্রবৃত্তির সংযমের প্রয়োজনীয়তাকে নিজ নিজ বাণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন।

দ্বেষ-হিংসার সংযমের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপরোক্ত তিন জন মহামানবের আর ব্যাসদেবের কথা প্রায় একই রকমের। দ্বেষ-হিংসার সংযমের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপরোক্ত তিনজন মহামানবের আর ব্যাসদেবের কথা প্রায় একই রকমের বটে কিন্তু দ্বেষ-হিংসার সংযম কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার সাহায্যে স্বতঃই সাধিত হইতে পারে তাহা এক ব্যাসদেবের লেখা ছাড়া আর কাহারও বাণীতে পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া, ব্যাসদেব ছাড়া আর তিনজন মহামানবের কথানুসারে দ্বেষ-হিংসার সংযম ধর্ম্মসাধনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। উহা ছাড়া যে মানুষের মনুষ্যজনোচিত সাংসারিক অথবা সামাজিক অস্তিত্ব থাকা আদৌ সম্ভবযোগ্য নহে তাহা ব্যাসদেবের কথায় যত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় তত স্পষ্টভাবে আর কাহারও কথায় বুঝা যায় না।

মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা দ্বেষ-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের অথবা দ্বেষের কার্য্যে পরিণত না হইতে পারে মানবসমাজে

বিশেষভাবে তাহার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ও না করিলে যেমন কোন মানুষের পক্ষে প্রকৃত মানুষের মত জীবন ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না এবং সেই জন্য ঐ ব্যবস্থা বর্ত্তমান মানব-সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আবার বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য ঐ ব্যবস্থা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের স্থায়ীভাবের শান্তির কথা মানবসমাজের সারথিগণের মুখে শুনা যাইতেছে বটে কিন্তু উহা হওয়া সহজসাধ্য নহে। এই যুদ্ধের স্থায়ী ভাবের শান্তি ত দূরের কথা, অস্থায়ী ভাবের শান্তিও সহজসাধ্য নহে বলিয়া আমরা মনে করি।

আমরা কেন এইরূপ মনে করি, তাহার কথা একে একে অতঃপর আলোচনা করিব।

প্রথম আলোচনা করিব যুদ্ধের স্থায়ী ভাবের শান্তি হওয়া সহজসাধ্য নহে বলিয়া আমরা মনে করি কেন, তাহার কথা; তাহার পর এই যুদ্ধের অস্থায়ী ভাবের শান্তিও সহজসাধ্য নহে উহা মনে করি কেন, তাহার কথা।

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী মহাযুদ্ধের শান্তি স্থায়ী ভাবে স্থাপন করিতে হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সাধন করিতে না পারিলে ও না করিলে এই যুদ্ধের শান্তি স্থায়ীভাবেও স্থাপিত হইতে পারে না। সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী নানাবিধ অভাবের উদ্ভব হওয়া সম্ভব হইয়াছে কেন, তাহার সন্ধান করিলে দেখা যায় যে, মানুষের প্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য্য, ধনের প্রাচুর্য্য, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির প্রাচুর্য্য এবং জ্ঞানের প্রাচুর্য্য সাধন করিবার জন্য মানব-সমাজে বর্ত্তমান সময়ে যে যে ব্যবস্থা আছে সেই সেই ব্যবস্থার কোনটাই মানুষের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির প্রাচুর্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইতে পারে না, পরন্তু প্রত্যেক ব্যবস্থাতেই অদূরদর্শিতা বশতঃ মানুষের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির অভাবের উৎপত্তি হওয়া অনিবার্য্য। মানুষের প্রতিষ্ঠা-প্রাচুর্য্য, ধন-প্রাচুর্য্য, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির প্রাচুর্য্য এবং জ্ঞানের প্রাচুর্য্য সাধন করিবার জন্য বর্ত্তমান মানব-সমাজে যে সমস্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে তাহার প্রত্যেকটীর ভিত্তি আমাদিগের বিচারানুসারে দূরদর্শিতার অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ ব্যবস্থাসমূহ দূরদর্শিতার অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বর্ত্তমান মানব-সমাজে কোন দেশে কোন মানুষের ভাগ্যে অভীষ্টানুরূপ প্রতিষ্ঠা, ধনপ্রাচুর্য্য, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি অথবা জ্ঞানের পরিতৃপ্তি হইতেছে না; পরন্তু অধিকাংশ মানুষেরই নিন্দনীয় ভাবের দারিদ্র্য অনিবার্য্য হইয়াছে। ঐ ব্যবস্থাসমূহের ভিত্তিতেই যে দূরদর্শিতার অভাব বিদ্যমান আছে তাহা বর্ত্তমান মানব-সমাজের সারথিগণের সর্ব্বতোভাবে মতবাদ-সম্মত কি না তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই ব্যবস্থাসমূহের ভিত্তিতেই দূরদর্শিতার অভাব বিদ্যমান আছে তাহা মানব-সমাজের বর্ত্তমান সারথিগণের মতবাদসম্মত হউক আর নাই হউক ঐ ব্যবস্থাসমূহের আংশিক দুষ্টতা যে তাঁহাদিগের অনেকেই স্বীকার করেন তাহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাঁহাদিগের অনেকেই ঐ ব্যবস্থাসমূহের আংশিক দুষ্টতা যে স্বীকার করেন, তাহার সাক্ষ্য তাঁহাদিগের নূতন নূতন পরিবর্ত্তনের পরিকল্পনা। ঐ ব্যবস্থাসমূহের দুষ্টতা যদ্যপি অনুভূত না হইত তাহা হইলে পরিবর্ত্তিত পরিকল্পনাসমূহের উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হইত না।

যে সমস্ত ব্যবস্থার বিদ্যমানতা বশতঃ এতাদৃশভাবে সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী সর্ব্বতোভাবের অভাবসমূহের উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হইয়াছে, সেই সমস্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে না পারিলে ও না করিলে সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের কোন শান্তি অথবা সন্ধি স্থায়ী ভাবে স্থাপিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। ইহা আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

আমাদিগের মতবাদানুসারে মানব-সমাজের গত আড়াই হাজার বৎসরের ইতিহাসে যে সমস্ত যুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায় সেই সমস্ত যুদ্ধের যে শ্রেণীর অস্থায়ী ভাবের শান্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হইয়াছে, সেই শ্রেণীর অস্থায়ী ভাবের শান্তিও, মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব দূর করিবার যে সমস্ত ব্যবস্থা বর্ত্তমান মানব-সমাজে বিদ্যমান আছে সেই সমস্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে, সাধিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। আমাদিগের বিচারানুসারে ভূমণ্ডলের ভূমি, জল ও হাওয়ার অত্যন্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং ঐ পরিবর্ত্তনবশতঃ মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার সর্ব্ববিধ প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে-যে কাঁচামালের প্রয়োজন, সেই-সেই কাঁচামালের প্রত্যেক শ্রেণীর ও কোন শ্রেণীর কাঁচামালের প্রাচুর্য্য এখন আর কোন দেশে পাওয়া সম্ভবযোগ্য নহে।

আমরা উপরোক্ত মতবাদ পোষণ করি বলিয়া আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব দূর করিবার যে-সমস্ত ব্যবস্থা বর্ত্তমান মানবসমাজে বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অস্থায়ী ভাবের শান্তিও সাধিত হইতে পারে না।

মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব দূর করিবার যে-সমস্ত ব্যবস্থা মানব-সমাজে বিদ্যমান আছে সেই সমস্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অস্থায়ী ভাবের শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না কেন, তাহা বুঝিতে হইলে, মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব কেন হইতে পারে ও হয় তাহা সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে হয়।

মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব কেন হইতে পারে ও হয় তাহা জানা থাকিলে বর্ত্তমান ভূমণ্ডলে কাঁচামালের অভাব হওয়া যে অনিবার্য্য তাহা বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান ভূমণ্ডলে কাঁচামালের অভাব হওয়া কেন অনিবার্য্য তাহা বুঝিতে পারিলে কেন আমাদিগের মতবাদানুসারে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অস্থায়ী ভাবের শান্তি স্থাপিত হওয়া সহজসাধ্য নহে, তাহা বুঝা যাইবে।

মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব কেন হইতে পারে ও হয় তাহার কথা আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

ইহা বলা বাহুল্য যে, যাঁহাদিগের মতবাদানুসারে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধিবশতঃ মানুষের অভাবের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাঁহাদিগের মতবাদের সহিত আমাদিগের মতবাদের বিরোধিতা আছে।

মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব কেন হইতে পারে ও হয় তাহার কথা বুঝিতে হইলে, হাওয়া, জল ও ভূমির স্বতঃই উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হয় কোন্ কোন্ নিয়মে তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

আমাদিগের বিচারানুসারে চলৎশীলতার কর্ম্ম (Dynamicity), সর্ব্বাবয়বিক কর্ম্ম (Whole-bodied work), খণ্ডাবয়বিক কর্ম্ম (Part-bodied work) এবং যোগ-বিয়োগের কর্ম্ম (Work of Integration & differentiation) যে-যে নিয়মবশতঃ এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক স্বাভাবিক পদার্থের মধ্যে প্রতিনিয়ত স্বতঃই চলিয়া থাকে সেই-সেই নিয়মবশতঃ হাওয়া, জল এবং ভূমির স্বতঃই উৎপত্তি হইয়া থাকে। হাওয়া, জল এবং ভূমির উৎপত্তির পর উদ্ভিদ্ এবং মনুষ্যেতর চরজীবের উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়। হাওয়া, জল এবং ভূমির স্বতঃই উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য না হইলে উদ্ভিদ্ এবং মনুষ্যেতর চরজীবের স্বতঃই উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। হাওয়া, জল এবং ভূমির স্বতঃই উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য না হইলে যেমন কোন উদ্ভিদ্ ও মনুষ্যেতর চরজীবের উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না, সেইরূপ উদ্ভিদ ও মনুষ্যেতর চরজীবের উৎপত্তি না হইলে মনুষ্যজাতিরও উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। প্রত্যেক স্বাভাবিক পদার্থের মধ্যে চলৎশীলতার কর্ম্ম, সর্ব্বাবয়বিক কর্ম্ম, খণ্ডাবয়বিক কর্ম্ম ও যোগ-বিয়োগের কর্ম্ম এবং হাওয়ার ও জলের, ভূমির, উদ্ভিদ্শ্রেণীর, মনুষ্যেতর চরজীবের এবং মানুষের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ নিয়মে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, যে নীলাকাশ এই ভূমণ্ডলকে অণ্ডাকারে ঘিরিয়া রহিয়াছে সেই নীলাকাশের চলৎশীলতার কর্ম্ম (dynamicity), সর্ব্বাবয়বিক কর্ম্ম (whole-bodied or elliptical work) খণ্ডাবয়বিক কর্ম্ম (part-bodied or parabolic and hyperbolic work) এবং যোগ-বিয়োগের কর্ম্ম-(work of integration and differentiation)-বশতঃ এই ভূমণ্ডলের হাওয়ার (atmosphere) এবং জলের (oceans and water-এর), ভূমির (earth and land-এর), উদ্ভিদ্শ্রেণীর (plants and shrubs-এর), মনুষ্যেতর চরজীবের (animals, birds and fishes-এর) এবং মানুষের স্বতঃই উৎপত্তি হয়।

এই ভূমণ্ডলের হাওয়ার, জলের, ভূমির, উদ্ভিদ্শ্রেণীর, মনুষ্যেতর চরজীবশ্রেণীর এবং মানুষের এই ছয় শ্রেণীর পদার্থের উৎপত্তির ও ঐ উৎপত্তির আয়তন পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধবিশিষ্ট হাওয়ার যে আয়তনের স্বতঃই উৎপত্তি হয়, জলের সেই আয়তনের উৎপত্তি হইতে পারে না; জলের যে আয়তনের (area) উৎপত্তি হয়, ভূমির সেই আয়তনের উৎপত্তি হইতে পারে না; ভূমির যে আয়তনের উৎপত্তি হয়, উদ্ভিদের সেই আয়তনের উৎপত্তি হইতে পারে না, উদ্ভিদের যে আয়তনের উৎপত্তি হয়, মনুষ্যেতর চরজীবশ্রেণীর সেই আয়তনের উৎপত্তি হইতে পারে না। মনুষ্যেতর চরজীব শ্রেণীর যে আয়তনের উৎপত্তি হয় মনুষ্যজাতির সেই আয়তনের উৎপত্তি হইতে পারে না।

এই ভূমণ্ডলে সর্ব্ববিধ উদ্ভিদ্শ্রেণীর প্রত্যেকটীর যে যে আয়তন থাকে সেই সেই আয়তনের সমষ্টিকে উদ্ভিদ্শ্রেণীর আয়তন (area) বলা হয়।

এই ভূমণ্ডলে যত শ্রেণীর মনুষ্যেতর চরজীব আছে তাহার প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকটীর যে আয়তন (area) থাকে সেই আয়তনের সমষ্টিকে মনুষ্যেতর চরজীবশ্রেণীর আয়তন (area) বলা হয়।

এই ভূমণ্ডলে যত সংখ্যক মানুষ থাকেন সেই সমগ্র সংখ্যার প্রত্যেক মানুষের যে আয়তন (area) থাকে, সেই আয়তনের সমষ্টিকে মনুষ্যজাতির আয়তন বলা হয়।

এই ভূমণ্ডলের হাওয়া, জল, ভূমি, উদ্ভিদ্শ্রেণী, মনুষ্যেতর চরজীব এবং মানুষ যে যে নিয়মে স্বতঃই উৎপন্ন হয় সেই সেই নিয়মের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, মনুষ্য-সংখ্যার উৎপত্তি কখনও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় আবার কখনও ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধি এবং হ্রাস—এই দুইই সীমাবদ্ধ। মনুষ্যসংখ্যার উৎপত্তি স্বতঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, মনুষ্যেতর চরজীবশ্রেণীর, উদ্ভিদ্শ্রেণীর, ভূমির, জলের এবং এই ভূমণ্ডলের হাওয়ার উৎপত্তিও স্বতঃই বৃদ্ধি পায়। মনুষ্যসংখ্যার উৎপত্তি হ্রাস পাইতে থাকিলে, মনুষ্যেতর চরজীবশ্রেণীর, উদ্ভিদ্শ্রেণীর, ভূমির, জলের এবং এই ভূমণ্ডলের হাওয়ার উৎপত্তি স্বতঃই হ্রাস পায়। এক শ্রেণীর পদার্থের উৎপত্তির বৃদ্ধি আর এক শ্রেণীর পদার্থের উৎপত্তির হ্রাস—ইহা কখনও হইতে পারে না ও হয় না।

উপরোক্ত উৎপত্তির পরিমাপক (unit for measurement of the increase and decrease) তাহাদিগের স্ব স্ব আয়তন (area)। এক একটী অবয়ব যতখানি বায়বীয় (gaseous space) স্থান অধিকার করে, ততখানি বায়বীয় স্থানের নাম তাহার আয়তন (area)।

মনুষ্যজাতি যখন যে আয়তনে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, মনুষ্যেতর চরজীব তখনই সেই আয়তনের তিন গুণ আয়তনে, উদ্ভিদ্শ্রেণী মনুষ্যজাতির আয়তনের সাতাইশ গুণ আয়তনে, ভূমি মনুষ্যজাতির আয়তনের দুইশত তেতাল্লিশ গুণ আয়তনে, জল মনুষ্যজাতির আয়তনের সাত শত উনত্রিশ গুণ আয়তনে এবং এই ভূমণ্ডলের হাওয়া মনুষ্যজাতির আয়তনের ছয় হাজার পাঁচ শত একষট্টি গুণ আয়তন স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপরোক্ত কথাগুলি প্রাকৃতিক পদার্থের প্রাকৃতিক রসায়ন-সম্বন্ধীয় গণিতশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে

প্রাকৃতিক পদার্থের প্রাকৃতিক রসায়নসম্বন্ধীয় গণিতশাস্ত্রের কোন কথা এখন আর মানবসমাজের প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক পদার্থের প্রাকৃতিক রসায়নসম্বন্ধীয় গণিতশাস্ত্রের কোনও কথা পাওয়া যাক্ আর নাই যাক্, প্রাকৃতিক পদার্থের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকটীতে যে প্রাকৃতিক রস বিদ্যমান থাকে এবং ঐ প্রাকৃতিক রসের মধ্যে যে অয়ন (অর্থাৎ work and movement) বিদ্যমান থাকে এবং ঐ অয়ন যে স্বতঃই শৃঙ্খলিত নিয়মানুসারে চলে এবং উহার যে গণিত শাস্ত্র হইতে পারে এবং ঐ গণিতশাস্ত্র যে রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধে অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় তাহা কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না! প্রচলিত রসায়নশাস্ত্রসম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে ঐ গণিতশাস্ত্রের অভাব উহার অবিশ্বাসযোগ্যতার ও ভিত্তিহীন প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক। মনুষ্যজাতির উৎপত্তির আয়তন যে উপরোক্ত গাণিতিক নিয়মে, মনুষ্যেতর চরজীবের, উদ্ভিদ্-শ্রেণীর, ভূমির, জলের ও এই ভূমণ্ডলের হাওয়ার উৎপত্তির আয়তনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট তাহা অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত আছে এবং প্রমাণিত হইতে পারে। উহার যে সমস্ত যুক্তি আছে সেই সমস্ত যুক্তি সকলের পক্ষে বুঝা সম্ভবযোগ্য নহে। তাহা ছাড়া, এই সমস্ত যুক্তি দেখাইতে গেলে "প্রাকৃতিক পদার্থের প্রাকৃতিক রসায়ন সম্বন্ধীয় গণিতশাস্ত্রে"র আদ্যন্ত কথা বলিতে হয়। তাহা এই প্রবন্ধে সম্ভবযোগ্য নহে।

মনুষ্যজাতির উৎপত্তির আয়তন যে সর্ব্বদাই উপরোক্ত গাণিতিক নিয়মে মনুষ্যেতর চরজীবের উদ্ভিদ্‌শ্রেণীর, ভূমির, জলের ও এই ভূমণ্ডলের হাওয়ার উৎপত্তির আয়তনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট তাহা স্বীকার করিয়া লইলে এই ভূমণ্ডলে সমগ্র মনুষ্যসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পায় না কেন, মনুষ্যজাতির প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর কাঁচামাল যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হইতে পারে ও হয়, সেই সেই শ্রেণীর কাঁচামালের কোনটীর অথবা কোন শ্রেণীর কাঁচামালের কোন প্রয়োজনীয় পরিমাণের কখনও অভাব হইতে পারে না—ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়।

এই ভূমণ্ডলে সমগ্র মনুষ্যসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শ্রেণীর কাঁচামালের কোনটীর অথবা কোন শ্রেণীর কাঁচামালের কোনও প্রয়োজনীয় পরিমাণের কখনও কোনও অভাব স্বভাবতঃ হইতে পারে না, অথচ বর্ত্তমান সময়ে ঐ অভাব কেন সম্ভবযোগ্য হইয়াছে তাহার কথা আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

মনুষ্যজাতির উৎপত্তির আয়তন সর্ব্বদাই গাণিতিক নিয়মে মনুষ্যেতর চর-জীবের, উদ্ভিদ-শ্রেণীর, ভূমির, জলের ও এই ভূমণ্ডলের হাওয়ার উৎপত্তির আয়তনের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বটে এবং স্বভাবতঃ কখনও প্রকৃতিজাত ঐ ছয় শ্রেণীর পদার্থের পূর্ব্বোক্ত গাণিতিক সম্বন্ধের কোনও ব্যভিচার হয় না বটে, কিন্তু মানুষের কার্য্যে ঐ গাণিতিক সম্বন্ধের ব্যভিচার হইতে পারে এবং হইয়া থাকে।

হাওয়া, জল, ভূমি, উদ্ভিদ্ শ্রেণী, মনুষ্যেতর চর-জীব শ্রেণী এবং মনুষ্যজাতি—এই ছয় শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় মূলতঃ কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয়। ঐ ছয় শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় যে মূলতঃ প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় এবং কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ ছয় শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থের উৎপত্তি প্রভৃতি স্বতঃই সাধিত হয় সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়ম মনুষ্যজাতির জানা থাকিলে ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মানুষের পক্ষে চলা সম্ভব হয় এবং মনুষ্যজাতির কোন কাঁচা মালের অথবা প্রয়োজনীয় কোনও শ্রেণীর পদার্থের কোনরূপ অভাব ঘটিতে পারে না। কিন্তু যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ ছয় শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থের উৎপত্তি প্রভৃতি স্বতঃই সাধিত হয়, সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়ম মনুষ্যজাতির জানা না থাকিলে ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয় এবং ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী হয়।

যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে হাওয়া, জল, ভূমি, উদ্ভিদ, পশু-পক্ষী ও মনুষ্যজাতির উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধি স্বতঃই সাধিত হয়, সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার হইলে মানুষের নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাব অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে।

প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার সাধিত হইলে যে মানুষের নানাবিধ অভাব অবশ্যম্ভাবী হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না।

মানুষের অবয়বে স্বভাবতঃ দুই রকম কর্ম্ম আছে। মানুষ যখন শয়ন করিয়া থাকেন অথবা নিদ্রা যান তখন স্বভাবতঃ যে শ্রেণীর কর্ম্ম হয়, মানুষ যখন চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ও পদ প্রভৃতি দ্বারা কার্য্য করেন তখন সেই শ্রেণীর কর্ম্ম হয় না। মানুষ যখন চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ও পদ প্রভৃতির দ্বারা কার্য্য করেন, তখন মানুষের সাধারণতঃ মনে হয় যে, তিনি নিজেই ঐ কার্য্য করিতেছেন কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত কার্য্যের মূলেও স্বভাবের কর্ম্ম বিদ্যমান আছে। চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ও পদ প্রভৃতির মূলে স্বভাবের কর্ম্ম না থাকিলে মানুষের ইচ্ছামত চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ও পদ প্রভৃতির কোন কার্য্য করা সম্ভবযোগ্য হয় না। স্বভাবের কর্ম্ম না থাকিলে মানুষের চোখের দৃষ্টি-সামর্থ্য, মানুষের কাণের শ্রবণ-সামর্থ্য, মানুষের পায়ের হাটিবার সামর্থ্য মানুষ নিজে উৎপাদন করিতে পারেন না।

মানুষের শয়নের অথবা নিদ্রা যাওয়ার কর্ম্মে মানুষের বিশ্রাম হয়, আর তাহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ও পদ প্রভৃতির কার্য্যে তাঁহার শ্রম হয়। এই দুই শ্রেণীর কর্ম্মের ভিতর সামঞ্জস্য না থাকিলে মানুষের ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য্য হয়। ঐ দুই শ্রেণীর কর্ম্মের ভিতর সামঞ্জস্য না থাকিলে যে মানুষের ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য্য হয়, তাহা কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না!

প্রকৃতিজাত বিভিন্নশ্রেণীর পদার্থের দিকে লক্ষ্য করিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক শ্রেণীর পদার্থের নিজ নিজ অবয়বের মধ্যে যেমন একাধিক শ্রেণীর স্বাভাবিক কর্ম্ম বিদ্যমান

থাকে, সেইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থের বিভিন্ন অবয়বের পরস্পরের মধ্যেও একাধিক শ্রেণীর প্রাকৃতিক কর্ম্ম বিদ্যমান থাকে।

মানুষের অবয়বের মধ্যস্থ দুই শ্রেণীর কর্ম্মের ভিতর সামঞ্জস্য না থাকিলে যেমন মানুষের ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়, সেইরূপ প্রকৃতিজাত প্রত্যেক শ্রেণীর পদার্থের অবয়বের মধ্যস্থ স্বাভাবিক কর্ম্মসমূহের এবং বিভিন্নশ্রেণীর পদার্থের বিভিন্ন অবয়বের পরস্পরের মধ্যস্থিত প্রাকৃতিক কর্ম্মসমূহের সামঞ্জস্য না থাকিলে প্রকৃতিজাত প্রত্যেক শ্রেণীর পদার্থের ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়।

হাওয়ার (atmosphere-এর) ব্যাধিগ্রস্ততায়, হাওয়া মানুষের নানাবিধ ব্যাধির কীটাণু-পরিপূর্ণ হইয়া থাকে এবং উহাতে অস্বাভাবিক রকমের উষ্ণতার ও শীতলতার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, হাওয়া স্বভাবতঃ মৃত্তিকার যে উৎপাদিকা-শক্তি প্রদান করিবার সক্ষমতাযুক্ত হয়, হাওয়ার সেই স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস-প্রাপ্ত হয়।

জলের ব্যাধিগ্রস্ততায় জলও মানুষের নানাবিধ ব্যাধির কীটাণু-পরিপূর্ণ হয়। জল স্বভাবতঃ মানুষের খাদ্য পাচনের জন্য যে সামর্থ্য-যুক্ত থাকে, জল ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাহার সেই পাচনসামর্থ্য হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে। জলে স্বভাবতঃ মৃত্তিকার উৎপাদন-সামর্থ্য প্রদান করিবার সামর্থ্য থাকে। জল ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাহার স্বাভাবিক উৎপাদন-সহায়ক-সামর্থ্য হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। জলের ব্যাধি উৎকট হইলে মৃত্তিকার উৎপাদিকা-সামর্থ্য বৃদ্ধি করা ত দূরের কথা, উহার মধ্যে মৃত্তিকার উৎপাদিকা-সামর্থ্য হ্রাস করিবার সামর্থ্যের উৎপত্তি হয় এবং মৃত্তিকা হইতে বিষাক্ত পদার্থসমূহ উৎপাদন করিবার সহায়ক হয়।

ভূমি ব্যাধিগ্রস্ত হইলে উহার উৎপাদিকাশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও উহা যাহা যাহা উৎপাদন করে তাহা অতর্কিতভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের অপকার-সাধক হইয়া থাকে।

উদ্ভিদশ্রেণীর পদার্থ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে উহা মানুষের স্বাস্থ্যের উপকারক না হইয়া অপকারক হইয়া থাকে।

মনুষ্যেতর চরজীব ব্যাধিগ্রস্ত হইলে উহাদের স্বভাবে অধিকতর হিংস্রতার উৎপত্তি হয় এবং ঐ মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণীর মধ্যে যে-সমস্ত চর-জীব মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই সমস্ত চর-জীব মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে মানুষের বুদ্ধির (অর্থাৎ স্বাভাবিক কার্য্য-কারণ বিচারশক্তির) হ্রাস অনিবার্য্য হয়।

প্রথমতঃ, প্রকৃতি-জাত প্রত্যেক শ্রেণীর পদার্থের অবয়বের মধ্যস্থ স্বাভাবিক কর্ম্ম-সমূহের সামঞ্জস্য ; দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্নশ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থসমূহের বিভিন্ন অবয়বের পরস্পরের মধ্যস্থিত প্রাকৃতিক কর্ম্মসমূহের সামঞ্জস্য ; এবং তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থের ব্যাধিগ্রস্ততা—এই তিনটি বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলে বর্ত্তমান ভূমণ্ডলে মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া কেন সম্ভবযোগ্য নহে—তাহা বুঝিতে পারা যায়।

মনুষ্যজাতির, মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণীর, উদ্ভিদশ্রেণীর, ভূমির, জলের ও হাওয়ার উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, স্বতঃই কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে সাধিত হয়, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান বিজ্ঞানে যে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

প্রকৃতিজাত প্রত্যেক শ্রেণীর পদার্থের অবয়বের মধ্যে যে কত শ্রেণীর স্বাভাবিক কর্ম্ম আছে এবং ঐ কর্ম্মসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার সঙ্কেত যে কি, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান বিজ্ঞানে যে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না তাহাও সর্ব্বজনবিদিত।

বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থসমূহের বিভিন্ন অবয়বের পরস্পরের মধ্যে যে কত শ্রেণীর প্রাকৃতিক কর্ম্ম আছে এবং ঐ সমস্ত কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবারই বা সঙ্কেত যে কি, তৎসম্বন্ধেও যে বর্ত্তমান বিজ্ঞানে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না, তাহাও সর্ব্বজনবিদিত।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের Chemist, Physicist এবং Industrialistগণ হাওয়া, জল ও ভূমির অবয়বের উৎপত্তি, অস্তিত্ব ও পরিবর্ত্তসমূহ প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় তৎসম্বন্ধে কোন সংবাদ পরিজ্ঞাত না হইয়া, হাওয়া, জল ও ভূমির অবয়বে যথেচ্ছা ব্যবহার গত একশত বৎসর হইতে অতিরিক্ত মাত্রায় করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত যথেচ্ছাচারের ফলে ভূমি, জল ও হাওয়া উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে—ইহা আমাদিগের সিদ্ধান্ত। ভূমি, জল ও হাওয়া উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া একদিকে কাঁচামাল-রূপে যাহা যাহা উৎপন্ন হইতেছে তাহার কোনটী মানুষের স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার উপযোগী নহে, অন্যদিকে, সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ প্রচুর পরিমাণে কোন কাঁচামাল পাওয়া অসম্ভবযোগ্য হইয়াছে।

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের Chemist, Physicist এবং Industrialistগণের অনাচার যদ্যপি না চলিত এবং ভূমি, জল ও হাওয়ার অবয়বের অন্তরস্থ স্বাভাবিক কর্ম্মসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য মানুষের যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা যদ্যপি মনুষ্য-সমাজ পালন করিতেন, তাহা হইলে প্রত্যেক দেশেই, সেই দেশের লোকসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাউক না কেন—সমগ্র লোকসংখ্যার প্রয়োজনের দ্বিগুণ পরিমাণে কাঁচামাল অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারিত। কোন কোন দেশে প্রয়োজনের নয় গুণ পর্য্যন্ত পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারিত।

বর্ত্তমান ভূমণ্ডলের জমি, জল ও হাওয়া যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে এখন আর মানুষের আহার-বিহারের জন্য যে সমস্ত বস্তু অবশ্য প্রয়োজনীয় সেই সমস্ত বস্তুর কোনটীরও কাঁচামালের সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী গুণ ও শক্তি-যুক্তভাবে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য নহে। যাহাও বা উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য, তাহাও সমগ্র মানব-সমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার যে পরিমাণ অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেই পরিমাণের অর্দ্ধেক হইতে পারে না ও হয় না।

যে সমস্ত দেশে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের Chemistry, Physics ও Industry উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে সে সমস্ত দেশের Chemist, Physicist ও Industrialist-গণের কার্য্যতৎপরতার ফলে সেই সমস্ত দেশে তৎ তৎ দেশীয় সমগ্র লোক-সংখ্যার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পাঁচভাগের এক ভাগও উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না এবং উৎপন্ন হয় না।

এখন আর সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র লোকসংখ্যার সর্ব্ববিধ প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য কাঁচামালের যে পরিমাণ অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেই পরিমাণের অর্দ্ধেকও উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য নহে কেন, তৎসম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত কথা বলিলাম সেই সমস্ত কথা কাহারও কাহারও কাছে অবিশ্বাসযোগ্য হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র লোকসংখ্যার সর্ব্ববিধ প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য কাঁচামালের যে পরিমাণ অবশ্য প্রয়োজনীয় সেই পরিমাণের অর্দ্ধেকও যে গত ১৯৩৩ সাল হইতে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হইতেছে না, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

মানুষের প্রয়োজনানুরূপ কাঁচামাল যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্দ্ধেকও উৎপাদন করা সম্ভব হইতেছে না এই সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিলে প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের হয় বেকারাবস্থা, নতুবা দারিদ্র্য, কেন অনিবার্য্য হইয়াছে, এত ঘন ঘন কেন সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী যুদ্ধ হইতেছে এবং ইতিপূর্ব্বে যেরূপ যুদ্ধসমূহের অস্থায়ীভাবের শান্তিও স্থাপনা করা সম্ভবযোগ্য হইত এখন আর সেই অস্থায়ী ভাবের শান্তিও স্থাপনা করা কেন সম্ভবযোগ্য নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আমাদিগের বিচারানুসারে প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্যের ও বেকারাবস্থার প্রধান কারণ—ভূমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অভাব। জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অভাববশতঃ এক একজন কৃষক যত পরিমাণের জমি হইতে উৎপাদন করিতে স্বভাবতঃ সক্ষমতাযুক্ত সেই পরিমাণের জমি হইতে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ কোন দেশের কোন কৃষক পরিবারের প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে প্রচুর হওয়া অসম্ভবযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই অপ্রাচুর্য্যের ফলে একদিকে প্রত্যেকের ধনাভাব অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে, অন্যদিকে কৃষিকার্য্য ছাড়া অন্যান্য প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্য জনসাধারণের লোভনীয় হইয়াছে এবং কৃষিকার্য্য সর্ব্বত্র লোকসানের কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। কৃষিকার্য্যে যতসংখ্যক মানুষের স্বাস্থ্যপ্রদ কর্ম্মনিয়োগ হওয়া সম্ভব, অন্য কোন কার্য্যে তত সংখ্যক কর্ম্মনিয়োগ হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। প্রত্যেক দেশে কৃষিকার্য্য লোকসানের কার্য্যে পরিণত হওয়ায় অধিকাংশ মানুষের বেকারাবস্থা ও দারিদ্র্য প্রত্যেক দেশে অনিবার্য্য হইয়াছে।

এত ঘন ঘন যে যুদ্ধ হইতেছে তাহারও প্রধান কারণ—আমাদিগের বিচারানুসারে জমি, জল ও হাওয়ার উপরোক্ত উৎকট ব্যাধি। প্রত্যেক দেশের রাজ্য-পরিচালকগণের অনেকেই মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, নিজ নিজ রাজ্যের কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণের অভাববশতঃ নিজ নিজ রাজ্যে কাঁচামালের অভাব ও দারিদ্র্য ঘটিতেছে। তাঁহাদিগের মতবাদানুসারে অপর রাজ্যের ভূমি ও বাজার কাড়িয়া লইতে না পারিলে নিজ নিজ রাজ্যের জনসাধারণের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করা সম্ভবযোগ্য নহে। এইরূপে প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হইতেছে। প্রত্যেক দেশেই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের Chemist, Physicist ও Industrialistগণের কার্য্যতৎপরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে ভূমি, জল ও হাওয়ার উৎকট ব্যাধিও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, মানুষের দারিদ্র্যও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বীরগণের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ও মারণ-যন্ত্রের আবিষ্কারও বৃদ্ধি পাইতেছে।

"ইতিপূর্ব্বে যেরূপ যুদ্ধসমূহের অস্থায়ী ভাবের শান্তি স্থাপন করা সম্ভবযোগ্য হইত, এখন আর সেই অস্থায়ী ভাবের শান্তিও স্থাপন করা সম্ভবযোগ্য নহে"—আমাদিগের এতাদৃশ মতবাদের কারণ দুই শ্রেণীর।

এক, আমাদিগের বিচারানুসারে ভূমি, জল ও হাওয়ার উপরোক্ত উৎকট ব্যাধির এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বেকার-অবস্থা ও দারিদ্র্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসাধারণের দারিদ্র্য গত যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, সেই অবস্থার তুলনায় এক্ষণে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত যুদ্ধের অবসান হওয়ার পর দলভগ্ন সৈনিকগণের কর্ম্মনিয়োগের ও খাদ্যার্জ্জনের ব্যবস্থা করা যতখানি দুরূহ হইয়াছিল, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান সময়ে ঐ দুরূহত্ব আরও অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দুই, যুদ্ধাবস্থাও অভূতপূর্ব্ব রকমের জটিলতা ধারণ করিয়াছে। মিত্রপক্ষ যেরূপ শক্তিশালী, অ্যাক্সিস্ পক্ষও এই যুদ্ধে সমান শক্তিশালী হইয়াছেন। কোন পক্ষেরই কোন পক্ষকে পরাজয় স্বীকার করান সহজসাধ্য হইতেছে না ও হইবে না।

দুই পক্ষই অতর্কিতভাবে দেখিতেছেন যে, পরাজিত হইলে স্ব স্ব জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইবে না এবং দুই পক্ষই অস্বাভাবিক রকমের প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের চূড়ান্ত হইলে মনুষ্যজীবনের প্রয়োজনের কথা জনসাধারণ বিস্মৃত হন এবং তখন এতাদৃশ অস্বাভাবিক রকমের প্রাণপণ যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের অভূতপূর্ব্ব রকমের জটিলতার প্রধান কারণ দারিদ্র্যের অভূতরকমের তীব্রতা।

দলভগ্ন সৈনিকগণের কর্ম্মনিয়োগের ও খাদ্যার্জ্জনের ব্যবস্থা করার দুরূহত্ব প্রকৃতির নিয়মানুসারে যুদ্ধ-সারথিগণের মন অতর্কিত ভাবে একদিকে যুদ্ধাবসান করিবার বিরুদ্ধে দখল করিয়া বসিয়াছে, অন্যদিকে যুদ্ধজয়ের চূড়ান্ত বার্ত্তা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভবযোগ্য হইতেছে না। কোন পক্ষের যুদ্ধজয়ের চূড়ান্ত বার্ত্তা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভবযোগ্য হইলে, জনসাধারণের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও হয়ত তাহাদিগের নিকট একটা কৈফিয়ত দেওয়া ও যুদ্ধের অবসান ঘটান সম্ভবযোগ্য হইতে পারিত। যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ অন্যায় করিলে স্বতঃই তাহাকে ব্যাধিগ্রস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হয় এবং মানুষ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে সুস্থ ও শান্ত হইতে পারেন, সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে—এই যুদ্ধের কোন পক্ষের যুদ্ধ-জয়ের চূড়ান্ত বার্ত্তা সহজসাধ্য নহে বলিয়া—আমাদিগের বিশ্বাস। ঐ বিশ্বাসবশতঃ আমরা মনে করি যে, এই যুদ্ধের অস্থায়ী ভাবের শান্তিও সম্ভবযোগ্য নহে।

প্রথমতঃ, কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় এতাদৃশ যুদ্ধের শান্তি দুই পক্ষেরই সম্মানজনক ভাবে সাধিত হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় কয়েক সহস্র বৎসরের জন্য মানুষের যুদ্ধ-প্রবৃত্তির অবসান ঘটিতে পারে; এবং তৃতীয়তঃ, কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষের প্রতিষ্ঠাবিষয়ক, ধন-প্রয়োজন-বিষয়ক, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিবিষয়ক ও জ্ঞানেচ্ছার পরিতৃপ্তিবিষয়ক অভাবের আশঙ্কা পর্য্যন্ত নিবারিত হইতে পারে, তাহার কথা মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশের পন্থায় পাওয়া যায়।

মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের পন্থা আমরা মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের বর্ণনায় এই বৎসরের 'বঙ্গশ্রী'র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ—এই চারি সংখ্যায় শুনাইয়াছি।

আমাদের সূত্র

১। মানুষ প্রকৃতির নিয়ম বুঝিতে পারিয়া প্রকৃতিকে অনুসরণ করিলে তাহার ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে কুত্রাপি কোন কষ্ট অথবা অভাব অনুভব করে না। তাহার যত কিছু কষ্ট তাহার কারণ, প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাব এবং অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির বিরোধিতা করিয়া চলা।

২। প্রকৃতি সমাজের (তথাকথিত) নিম্নতম শ্রমজীবীকে যাহা যাহা দিয়াছেন তদ্দ্বারাই শ্রমজীবী সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে তাহার নিজ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কৃষ্টি লাভের তারতম্যানুসারে মানুষের সংসারপালনের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ যে মানুষের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান যত বাড়িয়া যাইবে তাহার তত বেশী সংখ্যক সংসার-পালনের সামর্থ্য বাড়িয়া যায়। আমাদের দৃষ্টান্ত, পশুপক্ষীর জীবন। যদি কৃষ্টি ব্যতীত কাহারও বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব করা প্রকৃতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে পশুপক্ষীর বাঁচিয়া থাকাই সম্ভব হইত না। অন্য দিকে মানুষের বেলা মানুষ কৃষ্টি ছাড়া বাঁচিতে পারিবে না আর পশুপক্ষী কৃষ্টি ছাড়াও বাঁচিতে পারিবে—ইহা প্রকৃতির নিয়ম যদি বলা হয়, তাহা হইলে প্রকৃতিকে খামখেয়ালী বলিতে হয়।

৩। যাহাতে একমাত্র প্রকৃতির দেওয়া সামর্থ্য দিয়াই প্রত্যেক মানুষ বিনা কৃষ্টিতে তাহার শ্রম দ্বারা নিজ নিজ সংসারের অবশ্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য অর্জ্জন করিতে পারে এবং কৃষ্টির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উপার্জ্জন অধিকতর হয়, তাহার ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করা মানুষের সমাজে অথবা রাষ্ট্রবন্ধনে একান্ত কর্ত্তব্য।

বঙ্গশ্রী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪১।

দ্বাদশ বর্ষ ভাদ্র—১৩৫১ ১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা

দু'টি কথা

অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে মাতৃভাষার স্থান অতি অল্প। উচ্চ শিক্ষার বাহন বৈদেশিক ভাষা; কাজেই ছাত্রদিগকে সমস্ত বিষয়ই বিজাতীয় ভাষায় অধ্যয়ন করিতে হয়। মাতৃভাষাকে দয়া করিয়া এক কোণে একটুখানি ঠাঁই দেওয়া হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাতে তাহার দৈন্যটাই বেশী করিয়া চোখে পড়ে। একদিন ছিল, যখন এই ব্যবস্থা আমরা নতমস্তকে মানিয়া লইয়াছিলাম, যদিও পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার কখনও দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। কিন্তু হাওয়া বদ্‌লাইয়াছে। এতদিনে আমরা বুঝিতে শিখিয়াছি যে, মাতৃভাষা মাতৃস্তন্যের ন্যায়। মাতৃস্তন্য ব্যতীত যেমন শিশুর দেহগঠন হয় না, তেমনই মাতৃভাষা ব্যতীত মানসিক পুষ্টিসাধনও সম্ভব নয়। ভাষাজননীর অমৃত উৎস-যেখানে শুষ্ক, মন সেখানে আপনার খাদ্য আহরণে সমস্ত শক্তি ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলে। তাই এখন মাতৃভাষাকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার একটা প্রবল চেষ্টা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে এবং তাহারই ফলে বাংলা দেশে এই চেষ্টা কতকটা ফলবতী হইয়াছে। বেহার এবং অন্যান্য প্রদেশেও যে সেই পন্থা অনুসৃত হইবে, তাহার সূচনাও দেখা দিয়াছে।

ইংরাজি ভাষার নিগড় হইতে তরুণ মনকে কিয়ৎপরিমাণে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে কলেজে কলেজে আজকাল ছাত্রগণের নিজ নিজ মাতৃভাষার ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছাত্রগণ এইরূপ আপন আপন মাতৃভাষায় ভাবপ্রকাশের আনন্দ উপভোগ এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যসেবার সুযোগ লাভ করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। সকলেই যে সাহিত্যিক প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এরূপ মনে করা বাতুলতামাত্র; কিন্তু তাহা হইলেও এবং বৈদেশিক পরিবেষ্টনমূলক যে কারণটির উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ছাড়িয়া দিলেও এইরূপ সমিতি বা সঙ্ঘের যে যথেষ্ট সার্থকতা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না, বিশেষতঃ প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রদের পক্ষে। কারণ, উপরে সাধারণ ভাবে যে সব কথা বলা গেল, তাহা বাঙ্গালী ছাত্রদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য ত বটেই; কিন্তু তা' ছাড়া আরও কয়েকটি কারণে তাঁহাদের নিকট ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। প্রথমতঃ মাতৃভূমির শ্যামল অঙ্ক হইতে বিচ্যুত হওয়ার ফলে আমাদের মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পর্ক অবশ্যম্ভাবী রূপে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রবাসীর হৃদয়ে মাতৃভাষা-প্রীতি নিত্য জাগরূক রাখিবার জন্য এইরূপ সমিতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু ইহাপেক্ষা আরও একটি গুরুতর কারণ আছে, যাহার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমাদের মাতৃভাষা-প্রীতির পরিচয় দেওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

এই প্রদেশের স্কুল-কলেজে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রী বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভ করিবার অধিকার পাইবে কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, যে-সকল বাঙ্গালী এই প্রদেশের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষাদি সকল বিষয়ে এই দেশেরই ভাষা গ্রহণ করিবেন ইহাই তাঁহারা আশা করেন; অবশ্য যাঁহারা তাহা ইচ্ছা না করেন, তাঁহাদের জন্য বাংলা ভাষাতেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। তাঁহাদের এইটুকু অনুগ্রহের জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু ইহার অন্তরালে তাঁহাদের যে মনোভাবটি উঁকি মারিতেছে, তাহাতে শঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাঁচিতে হইলে সঙ্ঘশক্তির প্রয়োজন। বাংলার বাহিরে আমাদের এই কলেজে বাংলা-সাহিত্য-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মূলে এইরূপ একটা উদ্দেশ্য যদি নিহিত থাকে, তাহা-হইলে নিশ্চয়ই তাহা দূষণীয় নয়। শুধু সাহিত্যসেবা নয়, কারণ, তাহা নিভৃত সাধনার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু সমবেত ভাবে মাতৃভাষার সেবা করিয়া যদি আমরা মাতৃভূমিকেই বেশী করিয়া ভালবাসিতে পারি, যদি এইরূপে আমাদের মায়ের সঙ্গে প্রেমের নিগূঢ় সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি, তাহা হইলে এই সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে।

স্বদেশপ্রীতি বাঙ্গালীর যেমন মজ্জাগত, তেমন বুঝি ভারতের অন্য কোন প্রদেশবাসীর নয়। স্বদেশপ্রেমের বন্যা বাংলা দেশ থেকেই বহিতে আরম্ভ করিয়া আজ সমগ্র ভারত প্লাবিত করিয়াছে। আর ইহার সূত্রপাতে স্বদেশ বলিতে একদিকে যেমন আমাদের হৃদয়-মনকে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসারিত করিয়া দিয়াছি, অপরদিকে তেমনই আবার বাংলার মাটি, বাংলার জলকে অতি নিবিড়ভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়াছি—একথা স্বীকার করিতেও আমাদের কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই। বন্দেমাতরম্ গান বাংলা-দেশকে লইয়াই রচিত হইয়াছিল। বঙ্গ আমার, জননী আমার বলিয়া আমরা মাতৃপূজার বোধন-সঙ্গীত গাহিয়াছি। তার পরে যখন রাজপুরুষের নির্ম্মম খড়্গাঘাতে মাতৃ-অঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী যে কেমন করিয়া মায়ের ছিন্ন অঙ্গ জোড়া দিয়া আপনার পণ রক্ষা করিয়াছিল—সেই ইতিহাসও ত বেশী দিনের নহে। তাই বলিতেছি, বাঙ্গালী যেখানেই থাকুক না কেন, সে কি তার জন্মভূমিকে ভুলিতে পারে? তার পরে তার ভাষা। এমন মিষ্টি ভাষা জগতে কি আর আছে? এ যে তার স্বদেশেরই বাণীমূর্ত্তি। কত কবি কত সাধক তাঁহাদের হৃদয়-রক্ত দিয়া বঙ্গবাণীর চরণ পূজা করিয়াছেন। বাঙ্গালী সেই ভাষা-জননীকে ভাল না বাসিয়া কি থাকিতে পারে? রাজনীতির ভূত খুব উগ্র হইয়া তার

স্কন্ধে চাপিলেও তার পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ যখন নিষ্পেষিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে এমন উপায় অবলম্বন করিতে হয়, যাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত প্রেমবহ্নি নির্বাপিত হইয়া না যায়, তাহার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত না লাগে। আজিকার এই উৎসব যদি আমাদিগকে এই কথা ভাল করিয়া স্মরণ করিয়া দিতে সাহায্য করে, তাহা হইলে ইহা সত্যই সার্থক হইবে বলিয়া মনে করিব।

আমি তরুণ ছাত্রদের নিকট সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা প্রচার করিতেছি না। ভারতবর্ষই আমাদের সকলেরই স্বদেশ, কিন্তু বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি, এই কথাই আমি বলিতে চাই। হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতেও আমার আপত্তি নাই, যদিও সকল প্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দী ইংরাজিকে স্থানচ্যুত করিতে পারিবে কি না সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমার শিক্ষায় দীক্ষায় আমার মাতৃভাষাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। বরং মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছি বলিয়া মায়ের ভাষাটুকুমাত্র অবলম্বন করিয়া তাহাতেই আমরা হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ও প্রীতি নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিব। কাহারও প্রতি আমাদের ঘৃণা বা বিদ্বেষ নাই। স্বদেশের ভাই-বন্ধু ছাড়িয়া আমরা এখন যাহাদের সঙ্গে বাস করিতেছি, তাঁহারাও আমাদের নবলব্ধ ভাই-বন্ধু। "দূরকে করেছি নিকট বন্ধু, পরকে করেছি ভাই।" একই ভারতমাতার সন্তান আমরা—আমাদের আচারে ব্যবহারে একথা যেন আমরা কখনও ভুলিয়া না যাই। বাঙ্গালীর একটা দুর্নাম আছে যে, তাহারা বড় আত্মম্ভরি; নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া গিয়া ভিন্ন প্রদেশবাসীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইতে পারে না। তাই যেখানেই বাঙ্গালী যায়, সেইখানেই যায় তার কালীবাড়ী, তার বারোয়ারী, তার সঙ্গীতসমাজ আর তার বাংলা স্কুল। এই সব লইয়া প্রবাসে সে তার স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে। ভাষা সম্বন্ধেও তাই। সিন্ধি, পাঞ্জাবি, মাড়োয়ারি, ভাটিয়া সকলেই কেমন সহজেই নিজ নিজ ভাষা ভুলিয়া হিন্দীভাষা গ্রহণ করিয়া লইতে পারেন। এই বিষয়েও বাঙ্গালীর অক্ষমতা প্রচুর। এ সমস্তই সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে বাঙ্গালীর আত্মম্ভরিতা বা দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। প্রকাশ পায় তার অসীম স্বজাতিপ্রীতি আর তার নিজের ভাষার প্রতি প্রাণের টান। সে যাহা হউক, আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, বাঙ্গালীর সম্বন্ধে এই দাম্ভিকতার অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আমাদের এই ছাত্রসঙ্ঘের ভার প্রতিষ্ঠান সেই দিক দিয়া অনেক কাজ করিতে পারেন। সাম্প্রদায়িক প্রীতিবর্দ্ধনের একটা সহজ উপায় পরের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ। নিজের ভাষা ও সাহিত্য আমাদের গর্ব্বের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অপরের ভাষা ও সাহিত্য অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবার অধিকার আমাদের নাই। ব্যবহারিক জীবনে আমাদিগকে হিন্দী একরকম সকলকেই শিখিতে হয়। তাহাই একটু ভাল করিয়া শিখিলে ক্ষতি কি? এইরূপ ক্রমে যদি হিন্দী-সাহিত্যের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হই এবং আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের ভাল ভাল জিনিস অনুবাদ করিয়া যদি বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে ধরিতে পারি, তাহা হইলে হয়ত আমাদের পরদেশী বন্ধুদের সঙ্গে সম্প্রীতি আরও বেশী বর্দ্ধিত হইবে এবং ইহাই যে একান্ত বাঞ্ছনীয় তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে?

পরিশেষে তরুণ ছাত্রমণ্ডলীকে আমি আজ এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, প্রবাসে তাহাদিগকে যেমনই নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে, তেমনই তাঁহাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে যেন তাঁহাদের কার্য্য-কলাপে দেশ-জননীর শুভ্র আসনে বিষাদের কালিমা পতিত না হয়। যে উদ্যম, যে উৎসাহ, যে প্রেরণা লইয়া কিঞ্চিদূর্দ্ধ দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা এই বাংলা-সাহিত্যসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা যেন শুধু হাসিখেলা, শুধু মিছাকথা, ছলনায় পর্য্যবসিত না হইয়া কর্ম্মের বন্ধুর পথে আপন সার্থকতা লাভ করে। তরুণেরাই দেশের ভরসাস্থল, সে কথা যেন তাঁহারা ভুলিয়া না যান। বাঙ্গালীর অদৃষ্টাকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র দুরবস্থার নির্ম্মম পীড়নে এই দুর্ভাগ্য জাতি নৈরাশ্যের গভীর কূপে নিমজ্জিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভগ্নোদ্যম, জরাজীর্ণ জাতির অন্তরে আশা ও উদ্দীপনার বাণী প্রচার করিতে আমি আজ তরুণদিগকে আহ্বান করিতেছি। ইহা যে তাঁহাদেরই কাজ। মাতৃস্তন্যের স্নেহক্ষীরধারা হইতে বঞ্চিত আমরা। তাঁহাদের পূত হৃদয়ে গোমুখী হইতে ভাবগঙ্গা প্রবাহিত হইয়া জাতির মানসক্ষেত্র প্লাবিত ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলুক। তবেই এই উৎসব, এই আয়োজন সার্থক হইবে।✽

✽ ভাগলপুর কলেজের বাংলা-সাহিত্যসঙ্ঘের বাৎসরিক অধিবেশনে লেখককর্ত্তৃক পঠিত।

ফুল ফোটে—সে কি জানে!

বন্দে আলী মিয়া

শতেক তারার মাঝে
তুমি পূর্ণিমা-চাঁদ,
তোমারে ঘেরিয়া কাঁদে
মোর স্বপনের সাধ।

তব প্রিয় নাম স্মরি'
জাগি সারা বিভাবরী,
চেয়ে থাকি—যদি পাই
তব প্রেম-পরসাদ।

ফুল ফোটে সে কি জানে
ভালোবাসে কে গো তায়।
কার আঁখি ছল ছল
হলো তীব্র বেদনায়।

দূর হতে তুমি মম
চির প্রিয়—প্রিয়তম,
তোমারে যে ভালো লাগে
সে কি মোর অপরাধ!

'ঠক্ জুয়াচোর নিকটেই আছে, সাবধান!' (গল্প)

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

অশোকের শিলালিপি নয়, বরং একটু পোকাবহই বই কি, উপরোক্ত ভাষায় বা ঐ মর্মের অনুশাসন ইষ্টিশনে, পোষ্টাফিসে—কোথায় না দেখেছেন বজ্রীদাস বাবু? কিন্তু দেখেও যেন দেখেন নি। কিন্তু সেদিন তিনি স্বচক্ষে দেখতে পেলেন!

দেখতে পেলেন যখন তাঁর চোখের উপরই কাণ্ডটা পরিদৃশ্য হোলো। পরিদৃশ্য হোলো কি অদৃশ্য হোলো, চুল চিরে বলা কঠিন। প্রত্যক্ষরূপে অদৃশ্য হোলো কি অদৃশ্যরূপে প্রত্যক্ষ হোলো, হলপ করে বলা যায় না। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা ধাঁধাঁর মত।

কোথায় যেন যাবেন, কিন্তু হাওড়া ষ্টেশনের টিকিট-ঘরে বেজায় ভীড়। কে যায় তার মধ্যে, কার সাধ্য? একজন ভদ্রলোক অযাচিত ভাবে এগিয়ে এসে তাঁর টিকিট করে দিতে চেয়েছে।

বজ্রীদাস বাবু অম্লানবদনে সেই পরোপকার-প্রবণ অসাধ্য-সাধকের হাতে তাঁর টিকিটের টাকা সমর্পণ করেছেন। এবং বলা বাহুল্য, টিকিট পাওয়া দূরে থাক, আর তার টিকি দেখতে পান্‌নি। বিনা টিকিটেই তাঁকে বাড়ী ফিরতে হয়েছে।

ভারী তাজ্জব বাত! লোকটা কিউ-এর মধ্যে ঢুকল তাঁর স্বচক্ষে দেখা—ভীড় ঠেলে তাকে ব্যূহর মধ্যে প্রবেশ করতে তিনি দেখেছেন—ব্যূহ থেকে নির্গমনের যে একমাত্র পথ সেখানেও তাঁর খরদৃষ্টি ছিল—এর মধ্যে এবং চকিতের মধ্যে লোকটা লোপাট। কিউয়ের মধ্যে সেঁধিয়ে লোকটা গেল কোথায়, তার কোনো কিউ তিনি পান না। কোশ্চেনের গোড়ায় Q-এর মত কথাটা তাঁর মনে প্রশ্ন হয়ে বাজতে থাকে!

আর তার পরেই একটা নোটিশ-বোর্ডে উপরোদ্ধৃত সদুত্তরটি তাঁর নজরে পড়েছে। কিন্তু তখন আর সাবধান হবার কিছু ছিল না।

কিন্তু নিজের স্বার্থরক্ষার দায় না থাকলেও অপরকে সাবধান করার দায়িত্ব অভিজ্ঞতালব্ধ লোকের থেকেই যায়। কাজেই পাড়াগাঁ থেকে সদ্য আগত নিজের ভাগ্নে জীবনলালকে বোঝাতে তিনি কিছুমাত্র কসুর করছিলেন না।

"এই সহরের চতুর্দ্দিকেই বদলোক।"—বল্‌ছিলেন বজ্রীদাস: "অলিতে গলিতে পোষ্টাপিসে ইষ্টিশনে। সহরটার হাড়ে হাড়ে বদমাইসি! পোষ্টাপিসে যাও, কেউ না কেউ গায়ে পড়ে তোমার মনি-অর্ডার করে দিতে আসবে। ইষ্টিশনে গেলে তো কথাই নেই। টিকিট ঘরের কাছে যত লোক টিকিট কেনার তালে ঘুরচে, টিকটিকির মত ছুটফট করছে, তারা কেউ টিকিট কেনার পাত্র না। ওইরকম ভাব দেখাচ্ছে বটে কিন্তু কেউ তারা টিকিট কিনবে না। অন্য মৎলবে তারা ওৎ পেতে রয়েছে—সব আস্ত আস্ত এক একটা জোচ্চোর। আমি দেখে এমন কি না-দেখেই এখান থেকেই বলে দিতে পারি।" এই বলে বজ্রীদাস বাবু মুখখানা কিরকম যেন করেন।

"তোমার কোনো ভাবনা নেই মামা।" জবাব দেয় জীবনলাল।

"নাঃ, ভাবনা নেই। কী যে বলিস্। ভিন্ন রাত্তির আমার ভাবনা। নেহাৎ তোকে পাড়াগেঁয়ে পেয়ে কখন কে ঠকিয়ে দেয়। যত সব রাঘী আর ঘুঘু কত ফিকিরে ঘুরছে পথে-ঘাটে। আনাড়ি গোছের কেউকে পেলে কি আর রক্ষে আছে? দেখতে না দেখতে তাকে শিকার করে' বসেছে। ভালোয় ভালোয় তোকে দিদির আঁচলে ফেরৎ পাঠাতে পারলে বাঁচি।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালেন বজ্রীদাস। জীবনলালকে জীবন্ত ফেরৎ পাঠানো যাবে কি না ভেবেই হয়ত নিশ্বাসটা পড়ে।

"তুমি দেখে নিয়ো, কেউ আমাকে ঠকাতে পারবে না।" ভাগ্নে আশ্বাস দেয়। "অতো সহজ পাত্র আমি নই।"

"নাঃ পারবে না! বলে তোর চেয়ে কত বড় বড় ওস্তাদকে ওরা চরিয়ে খাচ্ছে। ওরা আবার পারবে না!" এই বলে পারৎপক্ষে ওরা কতরকম পারে তার আরো কতকগুলো দৃষ্টান্ত তিনি হাজির করেন। কেমন করে ওরা চকচকে পেতলকে সোনা বলে চালাতে আসে, দশ টাকার নোটকে চোখের ওপরে ডবোল করে' দেখিয়ে দেয়, তিনখানা তাস ফুটপাথে বিছিয়ে কতরকম কেরামতি করে—ইত্যাদি নানাবিধ রোমাঞ্চকর কাহিনীপরম্পরার তিনি বর্ণনা করে' যান্।

জীবনলাল হাঁ করে' শোনে। শুনতে শুনতে আরো হাঁ হয়ে যায়। মামার হুঙ্কার বুজে এলেও তাঁর হাঁকার বোজেনা। ও বাবা! এত ঠক্ জোচ্চোর এখানে পদে পদে? চার ধারে আর্সোলার মত ঘুর্ ঘুর্ করছে, কোনখানে পা ফেলবার যো নেই! ওরে মামারে!

"শুনেছি নাকি ভুলিয়ে-ভালিয়ে চা-বাগানে ধরে ধরে চালান দেয়? মা বল্‌ছিল।" বলে জীবনলাল। সম্বোধনে মামার আধখানা হলেও বোধশক্তিতে মা যে মামার কম যান্ না, এইটে জানানই বোধ হয় ওর উদ্দেশ্য।

"তোর মা তো সব জানে!" বজ্রীদাস মুখ বিকৃত করেন। "সে দিত আগে। চপ্ কাট্‌লেট চা-টা খাইয়ে বাগিয়ে নিয়ে চা-বাগানে চালান দিত বটে। সেসব ছিল বটে আগে, কিন্তু এখনকার—'এসব দৈত্য নহে তেমন'। এরা তাদের ওপরে যায়। এরা তোমাকে আস্ত রেখেই তোমাকে অন্তঃসারশূন্য করে দেবে—গজভুক্ত কপিত্থ দেখেছিস্? দেখিস্‌নি? আমিও দেখিনি, তবে শুনেছি—গজরা আর দিগ্‌গজরাই নাকি কেবল দেখেছে—সে ভারী ভয়ানক! এসব ঠক্-জোচ্চোররা তোকে সেই কপিত্থ করে দেবে—চালান্ না দিয়েই তোর যা কিছু সব আমদানি করে' নেবে। তুই টেরও পাবি না। যদি পাস্, পাবি অনেক পরে—কিন্তু তখন আর পেয়ে লাভ?"

বজ্রীদাসের সমস্ত মুখখানা একখানা প্রশ্নপত্র হয়ে ওঠে, যার বিরুদ্ধে জীবনলালের এতটুকু মুখকে একেবারেই সদুত্তর বলে' গ্রাহ্য করা যায় না।

কলকাতায় প্রথম ক'দিন জীবনলালের খুব ভয়ে ভয়ে কাটল। রাস্তায় বেরুলে সে দেখে দেখে পা ফেলেচে, কি জানি কোন্

আধুনিক ঠগীকে ভুলে কর্ণন্ মাড়িয়ে ফ্যালে! চার ধার তাকিয়ে তাকিয়ে সে হাঁটে—ওইজাতীয় কোনো কিছু তার পিছু নিয়েছে কিনা! কারুর সঙ্গে একটি কথা বলার তার সাহস হয় না। এমন কি, রাস্তায় ঘাটে যে সব প্রস্তরমূর্ত্তিদের দেখা পায়, তাদের কাছে ফিস্ ফিস্ করতেও ভয় খায় সে। আর, প্রত্যেকদিন বাড়ী ফিরে মামার কাছে তার নিরাপদ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করে। ঠক্ জোচ্চোর দূরে থাক, পুলিস-পাহারাওয়ালাকে পর্য্যন্ত কেমন করে এড়িয়ে সে ফিরে এসেছে—তারই রোমাঞ্চকর ফিরিস্তি!

চতুর্থ দিনে জীয়নলাল ভারী গোলে পড়ল। মোড় ভুল করে' রাস্তা হারিয়ে ফেল্‌ল জীয়নলাল। কিন্তু কাউকে ডেকে যে পথের নিশানা জেনে নেবে তার ভরসা হয় না, কি জানি, তাদের দয়ায় আরো ভুল পথে পা দিয়ে শেষটায় চা-বাগানেই গিয়ে পৌঁছুতে হয় যদি! মা বলেছে চা-বাগানের কথা, আর মামা বলেছে টাকা বাগানোর কথা—দু'টো কথাই বলতে গেলে এক কথা—সমান ভয়াবহ, সামান্য বানানের হেরফের কেবল। তা, বানানের হেরফেরে বানানোর কোন গলদ হবে না—বেচারা জীয়নলালকেই বোকা বানিয়ে ছাড়বে, যে পথ দিয়েই যাও!

এইরূপ সাত পাঁচ ভেবে জীয়নলাল কারো কাছে টু শব্দ না করে' সারা বিকেলটা পথে পথেই ঘুরল। ঘুরতে ঘুরতে তার খিদে পেয়ে গেল খুব। পকেটে টাকা ছিল, একটা খাবার দোকান পছন্দ করে ঢুকে পড়ল। ঢুকে পড়ে চপ, কাট্‌লেট কারি কোর্ম্মা যত রকমের খাদ্য তার মনে ধরল, পেটে ধরাবার কাজে সে লেগে গেল।

তার ছোট্ট টেবিলটায় একাই ছিল সে, কিন্তু এতক্ষণ পরে আর একজন এসে বসেছে। বসেই চায়ের ফরমাস্ দিয়েছে লোকটা।

জীয়নলাল উস্‌খুস্ করতে থাকে। এই অবাঞ্ছিত আবির্ভাব কোথাথেকে আবার? নিত্য স্মরণীয়দের কেউ কিনা তাই বা কে বলবে? মামা তো বারবার করে' ব'লে দিয়েছেন যে, ঠক্ জোচ্চোররা সর্ব্বদা নিকটেই আছে, সাবধান! ফাঁক পেলে, তারা পকেট্ মারতেও দ্বিধা করে না, কোন উচ্চবাক্য না করেই হাল্‌কা করে' চলে যায়।

লোকটা আধাবয়সী—কেমন যেন লোকটা! জীয়নলালের সামনে বসে চায়ে চুমুক মারে আর কি রকম অর্দ্ধবিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকায়। তাক্ করে নাকি?

জীয়নলালের ভাল লাগে না, কিন্তু তখনো তার পেটের খিদে অর্দ্ধেক মরেনি—এখনই এই ভোজরাজ্য ছেড়ে উঠে যায় কি করে? জীয়নলাল লোকটার দিকে না তাকাবার চেষ্টা করে, কিন্তু পেরে ওঠে না। ওই কটাক্ষ দেখে ভ্রুক্ষেপ না করা ভারী কঠিন।

"আপনার মুখ যেন ভারী চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে এর আগে?" চায়ের কাপ নামিয়ে লোকটা কথা পাড়ে হঠাৎ।

শুনেই তো জীয়নলালের হয়ে গেছে! যখন গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে এসেছে, তখন আর সন্দেহের বাকী নেই। একেবারে নির্ঘাৎ—হুম্, তার মামার সমস্ত কথা একসঙ্গে তার মাথায় এসে বোঁ বোঁ করে' ঘুরতে থাকে।

জীয়নলাল জলের গেলাসটা চোঁ চোঁ করে শেষ করে' উঠে-পড়ে। উত্তরে একটি কথাও না বলে' কাউন্টারে গিয়ে দাম দিয়ে সোজা দরজার দিকে এগোয়। যেতে যেতে মনে মনে জানায় "আমার মুখ আগে দেখেছ তুমি বলছ, এইবার আমার পিঠটাও তাহলে দেখো! দেখে চিনতে পারো কিনা দ্যাখো। আমার সঙ্গে চালাকি? বটে? অতো বেশি বোকা পাওনি আমায়! অতোখানি পাড়াগেঁয়ে আমি নই।"

কিন্তু লোকটাও তার পেছনে পেছনে আসে। জীয়নলাল কোন্‌দিকে যাবে, কি করবে ভেবে পায় না। ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে হারিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু লোকটার দৃষ্টি হারানো কঠিন। সে ঠিক তার অনুসরণ করছে।

জীয়নলাল বোঁ করে' একটা পার্কে ঢুকে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে। বসে ঠাণ্ডা হয়ে ইতিকর্ত্তব্য ভাববার চেষ্টা করে। এদিকে সে লোকটাও পার্কের মধ্যে সেঁধিয়েছে।

জীয়নলাল অদূরে উক্ত অভ্যুদয় না দেখেই উঠে পালাবার চেষ্টা করছে, লোকটা হাত নেড়ে তাকে বারণ করে। মাভৈঃ ঘোষণার মত অনেকটা যেন তার ইঙ্গিত।

জীয়নলালকে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসতে হয়। লোকটা এসে তার পাশে বসে। পাশে বসে গাঢ়স্বরে জানায়: "আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। আপনি চৌধুরী বাড়ীর ছেলে, চিনতে পেরেছি এতক্ষণে। ৺দিগম্বর চৌধুরীর একমাত্র ছেলে আপনি।"

জীয়নলাল প্রতিবাদ করতে যায়, কিন্তু ওর গলা থেকে কোনো রা বেরয় না। লোকটিই বল্‌তে থাকে:

"তাইতো ভাবছিলাম যে, কেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আপনার সেরেস্তায় সেদিন যখন গেছি তখনই তো আপনাকে দেখেছিলাম। বেশী দিনের তো কথা নয়।"

জীয়নলাল কোনরূপে "না—না—না" উচ্চারণ করতে পারে মাত্র।

কিন্তু লোকটা তার না-কারকে আমল না দিয়ে আরো নানা কথা বলে যায়:

"আমার প্রস্তাবটা কি এর মধ্যে আপনি পুনর্ব্বিবেচনা করেছেন? আপনার বেলতলার বাড়ীটা যখন আমি কিনতে চেয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন ভেবে চিন্তে পরে আমাকে জানাবেন। আশা করি এখন আর আপনার কোনো অমত নেই।"

জীয়নলাল বল্‌তে যায়: "কিন্তু মশাই আমি তো"—৺দিগম্বর চৌধুরীর কোন দিগন্তেই যে ও নেই, এই কথাটাই জানাতে ও চেষ্টা করে।

কিন্তু ভদ্রলোক কোন কথা শোনেন না। "না, আপনার কোন আপত্তি আমি শুনব না। এক্ষুণিই কথাটার একটা নিষ্পত্তি করে' ফেল্‌তে চাই। বায়নায় পাঁচশো টাকা আমার

নিকটেই আছে, আপনি দয়া করে' টাকাটা নিন, কথাটা তাহলে পাকাপাকি হয়ে যাক।" এই বলে ভদ্রলোক কোনো ওজর না শুনে এক তাড়া নোট জোর করে' জীয়নলালের হাতে গুঁজে দিয়ে—পাছে দিগম্বর-তনয় মত বদলে ফ্যালে—এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে ওখান থেকে উধাও হয়ে গেল।

জীয়নলাল বাড়ী ফিরল অনেক রাতে। পথের সন্ধান পেতে তার কম পরিশ্রম হয় নি। বাড়ীশুদ্ধ সবাই জেগে বসেছিল ওর অপেক্ষায়। বদ্রীদাস তো ওকে খরচ লিখেই রেখেছিলেন। ওর মার কাছে কি কৈফিয়ৎ দেওয়া যায়, সেই কথাই মনে মনে আঁচছিলেন তিনি বসে' বসে'।

"কোথায় ছিলি এতক্ষণ?" জীয়নলালকে দেখে তিনি জীয়ন কাঠির ছোঁয়া পেলেন। বাড়ীশুদ্ধ সবাই সজীব হয়ে উঠল এক পলকে।

"একটু ব্যবসা-বাণিজ্য করছিলাম মামা।"

"ব্যবসা-বাণিজ্য?" মামার চোখ কপালে গিয়ে ওঠে: "তোকে বার বার পই পই করে' বারণ করে' দিয়েছি না যে যত বোড়েল লোক সব [illegible] আর করে ফাঁকি-জোকবা দিয়ে টাকা আদায় করে এখানে? সাধ করে তাদের খপ্পরে তুই পড়েছিস? কতো টাকা ঠকিয়ে নিল শুনি?"

"ঠকিনি বিশেষ।' তবে মামা একটা কথা বলব। ঠকার চেয়ে না ঠকানো এখানে বেশী শক্ত। এই জ্ঞান আমার হয়েছে। এই মাত্র আমি আমার বেলতলার বাড়ীখানা বেচে—ঠিক বেচিনি বেচার বায়না পাঁচশো টাকা নিয়ে আসছি। এই ভাখো।"

"হ্যাঁ? শেষটায় তুই—আমার ভাগ্নে হয়ে—তুই শেষটায় জোচ্চোর হলি? তুইই লোক ঠকাতে সুরু করলি অবশেষে?" ভূরি ভূরি নোট তাঁর চোখের সামনে, তাঁর চোখ ভুরুর কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকেচে।

"আমি ঠকিয়েচি কি না ঠিক বলতে পারি না, তবে আমি লোকটাকে না ঠকাতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম। এমন কি এ কথাও বলেছিলাম যে ৺দিগম্বর চৌধুরীর কোনো কুলে কেউ আমি নই। কিন্তু লোকটা আমার কথায় কর্ণপাতই করল না, আমি কি করব?"

আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা

এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেন্টাব), বার-এট-ল

(চৌষট্টি)

ঐতিহাসিক Stanley Lane-Poole আওরঙ্গজেবের বিষয় যা লিখেছেন তার মধ্যে অতিশয়োক্তি কিছুই নাই। তিনি বলেন: ধর্ম্মভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, আওরঙ্গজেব বিলাসিতা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করেন; তিনি একবার নিজেকে ফকিররূপে বর্ণনা করেছিলেন; তাঁর জীবনধারণ-প্রণালী প্রকৃতপক্ষে ফকিরের মতই ছিল। কোন প্রাণীর মাংস তিনি কখনও ভক্ষণ করেননি, আর নির্ম্মল জল ছাড়া অন্য কোন পানীয় তিনি ব্যবহার করতেন না। ফলে, Taverier বলেন, তিনি কৃশকায় এবং মেদবর্জ্জিত হয়ে পড়েন; আর তাঁর উপবাসের আতিশয্যও তাঁকে একান্ত কৃশ করে তুলেছিল।

... ...

পায়গম্বরের নির্দ্দেশ, প্রত্যেকে কোন না কোন ব্যবসায় লিপ্ত থাকবে—নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে, তিনি অবসর সময় মানুষের ব্যবহারের জন্য টুপি প্রস্তুত করতেন। অবশ্য একথা সহজেই অনুমান করা যায়, যে, দিল্লীর আমীর-ওমরাহেরা সেই রকম আগ্রহের সঙ্গেই তাঁর প্রস্তুত টুপি খরিদ করতেন; যে রকম আগ্রহ মস্কোর মহিলারা দেখিয়েছিলেন কাউন্ট-টলষ্টয়ের প্রস্তুত বুট জুতার জন্য। সমস্ত কোরাণগ্রন্থ যে কেবল তাঁর মুখস্থ ছিল তা নয়, তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে দুইবার তিনি সমগ্র কোরাণ লিপিবদ্ধ করেন এবং সুন্দরভাবে সাজিয়ে সেই হস্তলিখিত কোরাণ মক্কা এবং মদিনায় ভক্তি-অর্ঘ্যরূপে পাঠিয়ে দেন।

... ...

মোগলেরা তাঁদের ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম দেখলেন একজন গোঁড়া মুসলমানকে তাঁদের বাদশারূপে—যে ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান নিজেকে তেমনি কঠোরভাবে দমন করতেন, যেমনভাবে তিনি তাঁর পার্শ্ববর্ত্তী লোকদের দমন করতেন; যিনি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত বিপন্ন করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি অবশ্যই জানতেন, ভারতবর্ষের মত বিভিন্ন ধর্ম্ম এবং বিভিন্ন জাতি-সম্বলিত দেশে, সহনশীলতা, আচার-ব্যবহারের ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে নেওয়া দেওয়া এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের তুষ্টি বিধানই হচ্ছে রাজ্যশাসনের সহজ এবং প্রশস্ত পথ।...এ জ্ঞান সত্ত্বেও তিনি শাস্ত্র-নিষ্ঠার পথ স্বেচ্ছায় অবলম্বন করেছিলেন, আর দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রাজত্বে, অদমনীয় সঙ্কল্পের দ্বারা সেই পথেই নিজেকে পরিচালিত করেছিলেন। ধর্ম্মের উজ্জ্বল অনলশিখা, মৃত্যুর সময়, যখন তাঁর বিরাট বাহিনী দাক্ষিণাত্য ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল, ঠিক সেই রকম তীব্র ভাবেই এই নবতি বর্ষ বৃদ্ধের অন্তরে জলছিল, যেভাবে সে আগুন জলেছিল, এই মারাত্মক দেশে, সুদূর সেই অতীতে, তাঁর যৌবনকালে, যখন তিনি রাজপ্রতিনিধির জমকালো পোষাক বর্জ্জন করেছিলেন এবং তার স্থলে একজন কপর্দ্দকহীন দরবেশের হীন পোষাক পরিধান করেছিলেন।

এ সব তিনি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিম্বা রাজনৈতিক চাল হিসাবে করেন নি। যাকে সত্য বলে জেনেছিলেন, তারই নির্দ্দেশের তিনি অনুসরণ করেছিলেন। সহজাত এক অদমনীয় ইচ্ছাশক্তি নিয়ে আওরঙ্গজেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাথমিক জীবনেই তিনি তাঁর জীবনাদর্শ নির্ব্বাচিত করেছিলেন, আর এই আদর্শের উপলব্ধির জন্য তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রত্যেকটী রূপ, প্রত্যেকটী কলাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সাহস সাধারণ ধরণের ছিল না। যুদ্ধে তিনি

অসমসাহসিকতার পরিচয় দিতেন। এ কথা তখনই বলা হয়ে যায়, যখন আমরা বলি যে, তিনি বিশ্ববিশ্রুত সিংহবিক্রম মোগল রাজবংশের একজন বংশধর ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বিস্ময়কর শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন বংশের লোকদের মধ্যেও তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের একজন ছিলেন। বালখের যুদ্ধের সময়, যুদ্ধের অবস্থা যখন একান্ত সঙ্গীন, শত্রু যখন পঙ্গপাল এবং পিপীলিকার মত শাহী ফৌজকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে; চারিদিকে কেবল অস্ত্রের ঝনঝন এবং ইস্পাতের ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে, ঠিক সেই চরম সঙ্কটের মুহূর্ত্তে, ডুবন্ত সূর্য্য সান্ধ্য-উপাসনার সময় জানিয়ে দিলেন। যুদ্ধের এই তুমুল কলরবে তিলমাত্র বিচলিত না হয়ে আওরঙ্গজেব অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন, আর একান্ত সহজ ভাবে নামাজের বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায় আত্মনিয়োগ করলেন; ঠিক যেমন ভাবে তিনি দিল্লীর জামে মসজীদে শান্তির দিনে করতেন। উজবেগ সর্দ্দার বাদশার এই আচরণ দেখে সবিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন "এ রকম লোকের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার মানে হচ্ছে মৃত্যুকে ডেকে আনা।"

আওরঙ্গজেবের মনে নরপতির কি উচ্চ আদর্শ ছিল, আমরা তা দেখতে পাই তাঁর একটী পত্রে, যা তিনি তাঁর এক ওমরাহকে লিখেছিলেন, যখন এই ওমরাহ বাদশার অহর্নিশি রাজকার্য্যে আত্মনিয়োগ করার বিষয় তাঁর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। আওরঙ্গজেব সেই পত্রে বলেন "বিশ্বনিয়ন্তা আমাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন দশের জন্য জীবন ধারণ করতে এবং কাজ করতে; নিজের জন্য জীবন ধারণ করতে এবং কাজ করতে পাঠাননি। 'আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় চিন্তা না করা, সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যদি আমার প্রজাদের মঙ্গলের জন্য একান্ত ভাবে প্রয়োজন না হয়। প্রজাদের শান্তি এবং শ্রীবৃদ্ধি, এই হচ্ছে আমার চিন্তা এবং ভাবনার একমাত্র বিষয়বস্তু; আর এ সবকে অবহেলা করা যেতে পারে কেবল ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠার জন্য, রাজকীয় শাসন অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, অথবা রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।" শাহজাহানকে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন, তাতেও এই আদর্শই ব্যক্ত হয়েছে। তিনি পিতাকে লিখেছেন: সর্ব্বশক্তিমান খোদা তাঁর আমানত (Trust) তারই কাছে অর্পণ করেন, যে প্রজাদের মঙ্গল সাধন করে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। জ্ঞানী লোকের কাছে এ কথা একান্ত স্পষ্ট বলেই প্রতীয়মান হয় যে, নেকড়ে বাঘ কখনও আদর্শ মেষপালক হতে পারে না। আর ভয়াতুর, দুর্ব্বলমনা মানুষ কখনও সাম্রাজ্যের গুরু দায়িত্ব বহন করতে পারে না। বাদশাহীর অর্থ হচ্ছে প্রজাদের অভিভাবকত্ব করা। বিলাসে মগ্ন থাকাকে এবং স্বেচ্ছাচার করাকে রাজ্যশাসন বলা যায় না।"

... ...

একজন মুসলমান ঐতিহাসিক যিনি আওরঙ্গজেবের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন, তাঁর কর্ত্তব্য জ্ঞানের জন্য, তাঁর আত্মসংযমের জন্য এবং তাঁর ন্যায়বিচারের জন্য, তাঁর অতুলনীয় সাহসের জন্য, তাঁর সহনশীলতার জন্য এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তার জন্য, তিনিই বলেছেন আওরঙ্গজেবের সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে, আর তাঁর সব প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে। আওরঙ্গজেবের জীবন হয়েছে ব্যর্থতার বিরাট এক দৃষ্টান্ত। তবে একথাও সত্য যে, তাঁর ব্যর্থতার মধ্যেও তাঁর বিরাটত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গৌরব এইখানে যে, স্বার্থের খাতিরে তিনি নিজের আত্মাকে কখনও প্রতারিত করেন নি; স্বার্থের খাতিরে তিনি কখনও ধর্ম্মের পতাকা ছেড়ে যাননি। ভারতের এই মহাকায় Puritan (ত্যাগী পুরুষ) সেই বিরল উপাদানে প্রস্তুত হয়েছিলেন, যে-উপাদানে প্রস্তুত হন সেই সব মহামানবেরা, যাঁরা এই পৃথিবীতে শহিদের (martyr) রক্তমণ্ডিত মুকুট অর্জ্জন করেন।

(পঁয়ষট্টি)

আওরঙ্গজেবের অকৃত্রিম ধর্ম্ম এবং শরিয়েতনিষ্ঠা তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে ব্যর্থতা আনয়ন করেছিল। তিনি হিজরীর প্রথম শতাব্দীর জীবনের তাগিদে সৃষ্ট নিয়মাবলীকে হিজরীর একাদশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ ভিন্ন বেষ্টনীর মধ্যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের জীবনে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। ফলে, অবশ্যম্ভাবী ভাবে এসেছিল দেশের মধ্যে অসন্তোষ আর রাষ্ট্রসাধনায় ব্যর্থতা, হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে হয়তো জিজিয়াকর অপরিহার্য্য ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দুরা আকবরের উদার নীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যকে তাঁরা ধর্ম্মনিরপেক্ষ জাতীয় সাম্রাজ্য বলে মনে করতেন। মোগল সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্য অকাতরে তাঁরা প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেন। সেই প্রাণের চেয়ে প্রিয় জাতীয় সাম্রাজ্যে, হঠাৎ যখন তাঁদের মধ্যে এবং বাদশার সমধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে অনাবশ্যক একটা পার্থক্যের রেখা টানা হল, তখন তাঁদের মনের অবস্থা যে কিরূপ হয়েছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ধর্ম্মের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে মতবাদের একতার প্রয়োজন হয়তো হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে ছিল। কিন্তু সহস্রাধিক বৎসর পরে মানুষ যখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখেছে, স্বাধীন মত পোষণ করতে অভ্যস্ত হয়েছে, যুগধর্ম্মের প্রয়োজনে যখন নূতন নূতন মতবাদ পৃথিবীতে এসে দেখা দিয়েছে, এগার শত বৎসর পূর্ব্বের পরিস্থিতি এখনকার জন্যে যে বিধি-নিষেধের সৃষ্টি করেছিল সে পরিস্থিতি যখন চলে গিয়েছে, আর তার যায়গায় সম্পূর্ণ নূতন ধরণের পরিস্থিতি এসে দেখা দিয়েছে, তার নূতন প্রয়োজন, তার নূতন তাগিদ নিয়ে সেই সম্পূর্ণ অভিনব পরিস্থিতির মধ্যে একজন রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যুগধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করে দেশকে এবং প্রজাবর্গকে সুদূর অতীতের সেই বিগত পরিস্থিতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করার মানেই হচ্ছে ব্যর্থতাকে আহ্বান করা। আওরঙ্গজেবের অতুলনীয় চরিত্রবল সত্ত্বেও তাঁর সাধনা তাই ব্যর্থ হয়েছিল।

তার পর জীবন্ত মানুষ সব যুগেই যুগধর্ম্মাবলম্বী। যুগধর্ম্মের প্রকৃত প্রয়োজন যে কি, অনেক সময় হয়তো তারা তা বোঝে না, কিন্তু যুগধর্ম্মের আহ্বান ছাড়া অন্য কিছুর আহ্বানে অন্তর তাদের সাড়া দেয় না। কোন মহাপুরুষ যুগধর্ম্মের আহ্বান তাদের যখন শুনান, তারা সত্যই তখন জেগে উঠে, আর অসম্ভবকে সম্ভব

করে তোলে। যুগধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য তারা সব কিছু দিতে প্রস্তুত হয়! দ্বিধাহীন ত্যাগ, নেতার প্রতি অপরিসীম ভক্তি, আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা—মানুষের শ্রেষ্ঠতম গুণনিচয় তখন তাদের মধ্যে এসে দেখা দেয়। তাদের সামবায়িক শক্তি বিশ্ব-বিজয়ী রূপ ধারণ করে।

পক্ষান্তরে যারা মরা মানুষ জীবন্মৃত, তারা বাহ্যতঃ আচার-নিষ্ঠ হয় বটে, কেন না, জীবনযাত্রার সেই হচ্ছে সহজতর পথ—life of least resistence; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু কোন ডাকেই তারা সাড়া দেয় না। যারা তাদের উপর ভরসা ক'রে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, তাঁদের শেষে দারুণ ব্যর্থতার—শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়। আওরঙ্গজেবের অতীতমুখী মন তাঁকে এই পথেই নিয়ে গিয়েছিল, আর তার ফলে এসেছিল অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা, নিদারুণ নৈরাশ্য। মৃত্যুশয্যায় তিনি লিখেছিলেন "একা আসিয়াছিলাম, একাই চলিয়া যাইতেছি। আমি বুঝিতে পারিলাম না, কে আমি, কেন আসিয়াছিলাম, কি কাজ করিলাম—"

পক্ষান্তরে, চিরনবীন আকবরের জীবনে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের এক আদর্শবাদীর সাক্ষাৎ পাই। রাষ্ট্রের জন্য কি করা উচিত তার সন্ধান তিনি কোন শাস্ত্রবাক্যে করতেন না, তার সন্ধান তিনি করতেন, নিজের পরিচ্ছন্ন অন্তরের উজ্জ্বল লিপিকায়; বিধিনিষেধের সন্ধান তিনি অতীত যুগের কোন শাস্ত্রব্যবস্থায় করতেন না, তার সন্ধান তিনি করতেন, যুগের জীবন্ত প্রয়োজনের মধ্যে, যুগের কোলাহলময় দাবীর মধ্যে; সমাজজীবন, ব্যবহারিক জীবন, রাষ্ট্র জীবন কি চায়, তার জন্য তিনি অতীতের সমস্তার দিকে, অতীতের ব্যবস্থার দিকে দেখতেন না; তার জন্য তিনি দেখতেন, বাস্তব মানুষের বাস্তব সুখ-দুঃখের দিকে, তাদের অভাবের দিকে, তাদের অভিযোগের দিকে, তাদের অন্তরের চাহিদার দিকে। রাষ্ট্রকে তিনি নিজের ধর্মের কিম্বা নিজের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানরূপে দেখতেন না, তাকে তিনি সমগ্র দেশের, সর্ব্ব ধর্ম্মের, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সামবায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে দেখতেন। সমর্থনের জন্য প্রথমতঃ তিনি স্বধর্ম্মের গোঁড়া ধার্ম্মিকদের কাছে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর তীক্ষ্ণ সহজ বুদ্ধি এ সত্যটা বুঝে নিলে, যে, সমর্থন তিনি উচ্চানুভূতিহীন জড় প্রকৃতির আচারপন্থীদের কাছ থেকে কখনও পাবেন না; সমর্থন তিনি পাবেন, ভবিষ্যৎমুখী, উদারপন্থী, জীবন্ততরুণমনা লোকদের কাছ থেকে। আকবর এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোক নিয়েই নিজের দল গঠন করলেন। দেশময় উৎসাহ এবং উদ্দীপনা এসে দেখা দিল। উপযুক্ত নেতার অধীনে প্রগতি-পন্থীদের সামবায়িক শক্তি সর্ব্বজয়ী হয়ে উঠল। জাতীয়তার আদর্শ ভারতবর্ষে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হল। চিরকালের তরে ভারতের এক আদর্শ যুগ রচিত হল—আদর্শ একজন নায়কের নেতৃত্বে। [ক্রমশঃ

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী (উপন্যাস)

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(ছয়)

কালো একখানা মেঘের মতো মুখ নিয়ে বিশ্বনাথ ফিরলেন। কাছারীতে খবর নিয়ে শুনলেন ব্যোমকেশ এখনো আসেনি।

জমাদার বললে, ম্যানেজার বাবুকে ডেকে আনব হুজুর?

—থাক, দরকার নেই।

দেউড়ি পেরিয়ে, রাঘবেন্দ্র রায়বর্ম্মার ভাঙা রংমহল ছাড়িয়ে অন্তঃপুরের দিকে পা' বাড়ালেন বিশ্বনাথ। অন্তঃপুরের এই একটা জীবন—যা বিশ্বনাথের প্রায়ই মনে পড়ে না এবং বিশ্বনাথকে দেখেও মনে পড়ে না কারো। বরেন্দ্রভূমির রুক্ষ রিক্ত মাঠের ওপর দিয়ে হাওয়ার মতো যার ঘোড়া উড়ে যায়, আর রেসের ঘোড়ার দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে উড়তে থাকে যার মন, অন্তঃপুরের একটা নিভৃত পরিবেশের আর প্রগাঢ় একটা বিশ্রান্তির মধ্যে তাকে যেন ভাবা চলে না। কাল থেকে মহাকাল পেরিয়ে চলে ক্লান্তিহীন পৃথিবী—চলে জীবন। ঘুমিয়ে পড়বার সময় নেই তার। কিন্তু বিশ্বনাথের জীবন কি পৃথিবীর মতো নিয়ন্ত্রিত—অথবা শৃঙ্খলিত তার কক্ষপথের সীমানায়? সে জীবন উল্কার মতো—লক্ষ্যভ্রষ্ট একটা আগ্নেয় তীরের মতো—মৃত্যুর অতলতায় যার নির্ব্বাণ।

তবু রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে আছে অন্তঃপুর। আর সেখানে আছেন অপর্ণা।

আফ্রিকার কালো সিংহের মতো উদগ্রযৌবনা ওঁরাও মেয়েদের বাহুবন্ধনে জড়িয়ে রাত্রির নেশা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। দেহ-যমুনায় বাঁধভাঙা বন্যা। কিন্তু এমনও সময় আসে, যখন বন্যার জল থিতিয়ে ঘরে যায়, পঙ্কলিপ্ত দেহমন মাঝে মাঝে কী একটা দাবী করে অসহায় শ্রান্তিতে। তখন অপর্ণাকে মনে পড়ে যায়।

অপর্ণা কিন্তু অভিযোগ করেন না অনুযোগ করেন না কখনো। কলকাতায় এবং কলেজে নাগরিক জীবন কাটিয়ে ঘটনাচক্রে তিনি রায়বর্ম্মাদের কুলবধূ হয়েছেন—নিঃসঙ্গ অন্তঃপুরে তাঁর একাকী দিন কাটে। বিয়ের পরেই টের পেয়েছিলেন অপর্ণা—এ তাঁর কঙ্কাল-বাসর। এখানে প্রাণ নেই, এখানে ছন্দ নেই—এখানকার জীর্ণরিক্ত প্রাসাদে প্রাসাদে শুধু মৃত অতীতের প্রেতচ্ছায়া। আর স্বামী! অপর্ণা হিন্দুর মেয়ে, স্বামীর সমালোচনার অধিকার তাঁর নেই।

বিশ্বনাথ যখন অন্তঃপুরে ঢুকলেন, তখন অপর্ণা কি একখানা বই পড়ছিলেন।

বিশ্বনাথ অন্তঃপুরের ঘরটার দিকে ভালো করে তাকালেন। আশ্চর্য্য, এই ক' মাসের মধ্যেই রাশি রাশি বই কিনেছে অপর্ণা। টেবিলে, শেল্‌ফে, বিছানার ওপর অসংখ্য বই ছড়ানো। এত কী পড়ে অপর্ণা, এত পড়তে কেমন করে ভালো লাগে!

বিশ্বনাথ এগিয়ে এলেন—আস্তে একখানা হাত রাখলেন অপর্ণার কাঁধের ওপর। চমকে মুখ তুলে তাকালেন অপর্ণা, লুটিয়ে পড়া আঁচলটাকে বুকে তুলে নিলেন, তারপর বললেন, কে, কুমার-বাহাদুর? এতদিন পরে কি দাসীকে মনে পড়ল?

বিশ্বনাথ কথাটাকে মনে করলেন চমৎকার রসিকতা। আকর্ণ

বিস্তীর্ণ খানিকটা হাসিতে তাঁর সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গেই অপর্ণা অনুভব করলেন, শরীরে ও মনে আসুরিক শক্তি থাকলেও বিশ্বনাথ কি অস্বাভাবিক স্থূল—কি অশোভন পরিমাণে অমার্জিত। উঁচু উঁচু দাঁতগুলো উদ্ঘাটিত হয়ে যায়, গলা পর্য্যন্ত দেখা যায় মোটা জিভ্‌টাকে—চোখ হু'টোকে কী পরিমাণে ঘোলা আর দীপ্তিহীন দেখা যায়।

বিশ্বনাথ প্রসন্নমুখে বললেন, কী বললে? দাসীকে? তুমি তো বেশ কথা শিখেছ অপর্ণা—হেঃ—হেঃ—হেঃ।

অপর্ণা বললেন, হঠাৎ এই অনুগ্রহ কেন? কোনো আদেশ আছে?

বিশ্বনাথ আবার হেসে উঠলেন, হেঃ—হেঃ—হেঃ। তারপর কৌচের ওপর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন অপর্ণার পাশেই। অপর্ণা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন না, সরেও গেলেন না। জীবন-সম্পর্কে তাঁর একটা নির্বেদ এসেছে।

লোলুপভাবে অপর্ণার সুগোল সুন্দর শুভ্র একখানি হাত নিজের হাতে টেনে আনলেন বিশ্বনাথ। বললেন, তুমি অমন ছাপার হরফে কথা কোয়ো না অপর্ণা, ভালো বুঝতে পারি না। আমরা চাষাভূষো মানুষ—লেখাপড়া জানিনে।

এটা বিশ্বনাথের বিনয়—বৈষ্ণবী ধরণের বিনয়। রাজকুমার কলেজে এক সময়ে তিনি বছর পাঁচেক পড়াশোনা করেছিলেন, কিন্তু পাশ করতে পারেন নি। পাশ করবার জন্যে অবশ্য মনের দিক থেকে তাঁর কোনো জোরালো তাগিদও ছিল না। তাই বলে বিশ্বনাথ সত্যিই নিজের সম্বন্ধে এমন দৈন্য পোষণ করেন না। দেবীকোট রাজবংশ নিজেদের ছোট বলে মনে করতে জানে না—এটাকে স্ত্রীর সঙ্গে যৎসামান্য রসিকতা বলেই মেনে নেওয়া উচিত।

—কী পড়ছিলে?

—বই একখানা।

—বই তো বটে, কিন্তু কী বই? উপন্যাস না কি?

গভীর বিস্ময়ে বিশ্বনাথ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।—উপন্যাস নয়? তবে কি ধর্ম্মের বই পড়ছিলে! গীতা? ভাগবত? কংসবধ?

—না, তাও নয়।

—তাও নয়? তবে কী বই?—বিশ্বনাথের বিস্ময় ঘনীভূত হল। উপন্যাস নয়, ধর্ম্মের বই নয়, তবে আর কি পড়বার থাকতে পারে ছনিয়ায়? বিশ্বনাথ নিজে অবশ্য কিছুই পড়েন না, কিন্তু তাই বলে কোন খবরও তিনি রাখেন না না কি? উপন্যাস আর ধর্ম্মের বই বাদ দিলে মাত্র হু'টো জিনিস রইল সংসারে—খবরের কাগজ আর হোমিওপ্যাথি।

—দেখি, দেখি বইখানা—হাত বাড়িয়ে বিশ্বনাথ অপর্ণার কোলের ওপর থেকে বইখানা নিয়ে এলেন। ওঃ বাবা, এ যে ইংরেজি। অপর্ণা কলেজে পড়েছে বটে, তাই বলে ইংরেজি বই পড়েও সে রস পায়! বিশ্বনাথ একবার সশ্রদ্ধ আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, তারপর বইয়ের লাল রঙের মলাটটির দিকে মনোনিবেশ করলেন।

—এ যে মস্ত দাড়িওয়ালা মাথা একটা। কার ছবি? রবি ঠাকুরের না কি?

অপর্ণার চাপা ঠোঁটের কোণ হু'টো সামান্য একটু বিচ্ছুরিত হল মাত্র। মৃদুকণ্ঠে অপর্ণা জবাব দিলেন—না, রবি ঠাকুরের নয়।

—তবে, তবে কার?—বিশ্বনাথ এবার বানান করে বইয়ের নামটা পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন: প্রিন্, প্রিন্, প্রিন্ কাই-পনেস্ সফ্ মার্—মার্—এক্স্—আই—এস্—

অপর্ণা রক্ষা করলেন স্বামীকে। বললেন, থাক্, এই বেলা হু'টোর সময় আর তোমাকে এ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'তে হবে না। এখন দয়া করে স্নান করতে যাও।

কথা নেই, বার্ত্তা নেই, বিশ্বনাথের চোখ হঠাৎ দপ দপ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে যেন মনে পড়ে গেল সোণাদীঘির মেলার কথা, মনে পড়ল লালা হরিশরণের কথা, মনে পড়ল চারদিক থেকে আসন্নপ্রায় ছুর্দ্দিন আর দুর্গতির কথা। চরম অসম্মানের মধ্যে সব হারিয়ে যেতে চলেছে, তলিয়ে যেতে চলেছে দেবীকোট রাজ-বংশের এই ঐশ্বর্য্য—এই প্রতাপ। আর সমস্ত অপমানের মধ্যে অপর্ণাও আজ সুর মিলিয়েছে, বিশ্বনাথ মূর্খ, ইংরেজি পড়বার যোগ্যতা তাঁর নেই, এ সত্য কি তাঁর স্ত্রীও প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

আশ্চর্য্য, বিশ্বনাথ কি ভুলে গিয়েছিলেন যে তাঁর মাথার ওপর ধারালো একখানা খড়্গ যে-কোনো সময়ে নেমে পড়বার জন্যে উদ্যত হয়ে আছে? তিনি কি ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর যথাসর্ব্বস্ব নিঃশেষে আত্মসাৎ করবার জন্যে সাপের মতো প্যাঁচ কষছেন লালাজী? আর মাত্র দু' ঘণ্টা আগেই তিনি রূপাপুরের কামারদের উদ্বুদ্ধ করে এসেছেন—ভাঙতে হবে সোণাদীঘির মেলা—লাঠির মুখে ভেঙ্গে ছত্রাকার করে দিতে হবে এবার। দেখা যাবে, ওই মেলা থেকে কত টাকা কুড়িয়ে নিতে পারে লালা হরিশরণ?

অন্তঃপুরে আসা মাত্র অপর্ণাকে দেখে তিনি কি সব ভুলে গিয়েছিলেন? তাঁর মন কি আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে? তাই অপর্ণার কাছ থেকে এই অবজ্ঞা—এই পুরস্কার! বিশ্বনাথ বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বিশ্বনাথের ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন অপর্ণা। সবিস্ময়ে বললেন, এখন আবার কোথায় চললে? খাবে না, স্নান করবে না?

বিশ্বনাথ জবাব দিলেন না। অপর্ণা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন, শুনতে পেলেন সিঁড়ি দিয়ে উদ্ধত পদধ্বনি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

কাছারীর দিকে পা বাড়াতেই মতিয়া সামনে এসে দাঁড়াল।

—একটা লোক দেখা করতে চায় হুজুর।

—কে?

—আল্‌কাপের দলের লোক—কী একটা জরুরি কথা বলবে।

—জরুরি কথা?—বিশ্বনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, ডেকে নিয়ে এসো।

জরুরি কথা, জরুরি কথা। বিশ্বনাথের মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে যেন শব্দ হু'টো অনুরণন জাগাতে লাগলো। তাঁর জীবনের নিভৃতি নেই, নিঃসঙ্গতা নেই, অন্তঃপুরের জীবনে তাঁর সান্ত্বনা নেই—সেখানে অপর্ণাও তাঁকে ব্যঙ্গ করে। জীবনের স্রোত কোথাও তো থেমে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করতে পারে না, তাকে চলতে হয় অবিরাম—সংঘাতে সংকুল, তরঙ্গে ফেনিল। [ক্রমশঃ

নারীর কর্ত্তব্য

শ্রীমতী প্রতিভা বোস

সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে জগতের আদি পিতার সদ্য বিকশিত দৃষ্টি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনীটির অন্বেষণেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর সেই সম্মিলিত দৃষ্টিতে ধরা দিয়াছিল নিখিল ভুবনের অনন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার। বিধাতা পাঠাইয়াছিলেন প্রাণ এবং সেই প্রাণকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে উদ্যম, বীর্য্য, আকাঙ্ক্ষা শক্তি কোন কিছু দিতেই তিনি কার্পণ্য করেন নাই, কিন্তু দেখিলেন যে তাঁহার সেই দান প্রাণকে আতিথ্য দান করিতে পারে না, সৃষ্টিকে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত উদ্দাম করিয়া তোলে। তাই তিনি প্রাণের আতিথ্য লইয়া পাঠাইলেন নারীকে। নারীর প্রথমা প্রতিমা ও মানব-সন্তানের মাতারূপে ইভ দিলেন তখন দেখা। ভগবানের দানের আদেশ মাথায় লইয়া নারী আসিয়াছে, তাই জগতে তাহার দানের স্রোত দুকূল প্লাবিয়া ছুটিয়েছে, ছুটিবেও।—

> "দিলে তুমি দিলে, শুধু দিলে
> কভু পলে পলে তিলে তিলে
> কভু অকস্মাৎ বিপুল প্লাবনে
> দানের শ্রাবণে—
> *   *
> দানের রতন———লাগিয়েছি ধূলার খেলায়
> অযত্ন হেলায়।
> আলস্যের ভরে ফেলে গেছি ভাঙ্গা ঘরে
> তবু তুমি দিলে, শুধু দিলে, শুধু দিলে
> তোমার দানের পাত্র নিত্য ভরে উঠিছে নিখিলে।"

এ দানপাত্র অনাথপিণ্ডদদুহিতা সুপ্রিয়ার ভিক্ষালব্ধ বস্তুতে পরিপূর্ণ নয়, এ পূর্ণ আপন অন্তরের উজ্জ্বল মহিমায়।

পুরুষের মতে নারী চিরদিনই বৈচিত্র্যময়ী, রহস্যময়ী। কবি ও দার্শনিকের দল বহু চিন্তাতেও নারী-চরিত্রের তল পান নাই। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতেও বাহির হইয়াছে, "নারীকে কে চিনিতে পারে।" কিন্তু নারী যতো বড় সমস্যাই হউক না কেন, পুরুষ নারীকে কখনও বর্জ্জন করিয়া চলিতে পারে নাই, পারিবেও না। বিধাতা কেবলমাত্র আপন খেয়াল চরিতার্থ করিতেই ইভের সৃষ্টি করেন নাই।

সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া যে সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারের স্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিয়েছে, তাহা লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, এই ধারায় মিশ্রিত রহিয়াছে পুরুষের শক্তির সহিত নারীর স্নেহ-মমতা, পুরুষের বুদ্ধির সহিত নারীর ধৈর্য্য, করুণা। কর্ম্মের ক্ষেত্রে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, রণের ক্ষেত্রে, সকল স্থানেই দেখি যে, নারীর এই মাধুর্য্যই পুরুষের শক্তির প্রধান উৎস।

কিন্তু পরোক্ষভাবে এ দানেই নারীর কর্ত্তব্য ফুরায় নাই। পুরুষের সমশক্তি লইয়াও স্থানে স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুরুষের শক্তি লইয়া নারীর এইরূপ প্রকাশ আমরা বহুস্থানে দেখিয়াছি। ভাস্করাচার্য্য আর্য্যভট্ট যে শক্তিপ্রদর্শনে আজ এইরূপ মহান খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, খনা, লীলাবতী কি সে শক্তি তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে কম প্রকাশ করিয়াছেন? প্রতাপাদিত্য ও আকবরের মত ক্ষমতা দেখাইবার বিরাট ক্ষেত্র লাভ করেন নাই বলিয়াই কি রাণী ভবানী ও অহল্যাবাই তাঁহাদের তুলনায় হীনশক্তি-বিশিষ্ট ছিলেন? স্বয়ং বীর্য্যবান রামের অনার্য্য জাতির সহিত যুদ্ধের তুলনায় সহায়-সম্পদহীন বেহুলার প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া যাত্রা কি ম্লান হইয়া উঠে? প্রভেদ কেবলমাত্র ইহাই যে একের শক্তি বাহুর, অপরের শক্তি অন্তরের। এ শক্তির খেলার বৃহৎ ক্ষেত্র ছাড়িয়া দিই, আমাদের সংসারের স্বল্প-পরিসর ক্ষেত্রেও কতরূপেই না ইহার অমোঘ প্রভাব দেখিতে পাই।

রবীন্দ্রনাথের 'দুইবোনে' দেখিয়াছি নারীকে তিনি দুই দলে ভাগ করিয়া বসন্ত ও বর্ষা এই দুই ঋতুর সহিত তুলনা দিয়াছেন। ইন্দ্রধনুর রঙে রঙীন বসন্ত দেয় দেখা, সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। শীতের হিমশীতল অঙ্ক হইতে নবসিঞ্চিত প্রাণে প্রকৃতি জাগিয়া ওঠে। নবীন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া রঙীন নেশায় মাতাল হইয়া ওঠে। নারী-প্রকৃতিতেও বসন্তের ন্যায় এক অমোঘ প্রভাব আছে, যাহা পুরুষকে নিমেষেই উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারে। প্রকৃতি কোন্ পাখীর সঙ্গীতে প্রাণময় হইয়া উঠিবে, তাহা যেরূপ বসন্তের অজানা নয়, পুরুষের হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রীতে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে তাহা তালে তালে বাজিয়া উঠিবে তাহাও সেইরূপ নারীর অজানা থাকে না। আর যে নারীর উপমা বর্ষাঋতু সে আপনাকে প্রকাশিত করে আর-একরূপে। বর্ষার নবীন বারিধারার ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে আপনাকে বিগলিত করিয়া "শ্যামল মেঘের স্নিগ্ধ প্রসাদ" বর্ষণ করিয়া জীবনকে সে ফলে শস্যে সুন্দর করিয়া তোলে। বনস্পতির পাতায় পাতায় সজীবতার যে সবুজ বর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে, ক্ষুদ্র নব দূর্ব্বাদলেও সেই বর্ণেরই দেখা পড়ে।

> "একজন
> উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
> নিয়ে যায় প্রাণমন হরি –
> আর জন ফিরাইয়া আনে
> অশ্রুর শিশির স্নানে
> স্নিগ্ধ বাসনায়।
> হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়।"

একজনের অন্তরের কথা বিদ্যুতের চঞ্চল সৌন্দর্য্য, আর একজনের অন্তরের কথা কল্যাণের শান্তশ্রী।

এ সংসারে এ দুইয়েরই আবশ্যক আছে। প্রকৃতিতে ঋতুবৈচিত্র্য না থাকিলে তাহা যেরূপ নিরানন্দ ও ম্লান হইয়া উঠিত, নারী-চরিত্রেও এই বৈচিত্র্য না থাকিলে তাহা সংসারকে আনন্দ দিতে পারিত না। একটানা স্রোতে জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "দুই বোনে" শশাঙ্কর স্ত্রী শর্ম্মিলাকে বর্ষাঋতুর সহিত উপমা দিয়াছেন, আর ঊর্ম্মিলাকে ফেলিয়াছেন বসন্তের দলে। কিন্তু শর্ম্মিলার সেই নির্ব্বাক্, সেবাময়ী শান্তচরিত্রের মধ্য দিয়াও শশাঙ্ককে আনন্দ দিবার, তাহাকে উদ্দীপ্ত করিবার প্রয়াসকারী মূর্ত্তি মাঝে মাঝে বসন্তের সাজসজ্জা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। শর্ম্মিলা সফল হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার দিক হইতে চেষ্টার কোন ক্রটী হয় নাই। তাহার সেই অক্লান্ত বর্ষার শান্তসৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া স্থানে স্থানে ঊর্ম্মিলার বাসন্তী মূর্ত্তিও তাই দেখি উঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছে। আর ঊর্ম্মিলার মধ্যে শর্ম্মিলার যে প্রকাশ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে কাহারও কোন কষ্ট হয় না। এই বর্ষা ও বসন্ত নারীচরিত্রে সমভাবে বিরাজমান। সৃষ্টিকর্ত্তার এ এক অপূর্ব্ব কৌশল।

নারীর মধ্যে আর একটী রূপও ফুটিয়া উঠা উচিত। ইহাকে যদি ঋতুর সহিত তুলনা দিতে হয় তাহা হইলে নিদাঘ ব্যতীত অপর কিছুরই সহিত দেওয়া চলে না। এ নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে ভূমি চৌচির হইয়া যায়, মেরুপ্রদেশের তুহিনশীতলতা মুহূর্ত্তে উত্তপ্ত হইয়া ওঠে। জীজাবাঈর হৃদয়ের এই তাপ একদিন অপমানিত, ক্লান্ত কলঙ্কিত মারাঠাজাতিকে আহত অগ্নির ন্যায় উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইতিহাসের ঘটনা-পরম্পরা বিশ্লেষণ করিয়া ঐতিহাসিক দেখাইয়াছেন যে, নারীর সামান্য ভ্রূভঙ্গের তাপে কত রাজ্য ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, কত সৈন্য মরণাবর্ত্তে ডুবিয়া গিয়াছে। এ তাপ সামান্য নয়। প্রকৃতিকে গ্রীষ্মের তাপ, বর্ষার দান, বসন্তের আনন্দ যেরূপ পরিপূর্ণ করিয়া তোলে, নারী-হৃদয়কেও এই ভাবগুলি সেইরূপ সুন্দর করিয়া তোলে। স্থান, কাল, পাত্রভেদে বর্ণরূপা বর্ণে বর্ণে ফুটিয়া উঠে। আমাদের শাস্ত্রকার নারীর দশরূপ কল্পনা করিয়াছেন। নিখিল বিশ্বে একবার দৃষ্টিপাত করিলে, এ কল্পনা যে কত সত্য তাহা

উপলব্ধি করিতে পারিব। মাতৃরূপে নারী আত্মদান করিতেছে, ভগ্নীরূপে স্নেহ বিতরণ করিতেছে, কালভৈরবীরূপে রুদ্রের ধ্বংসলীলা আরম্ভ করিয়াছে, পত্নীরূপে শক্তিসঞ্চার করিতেছে, কন্যারূপে চিত্তের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া সেবা করিতেছে।

নারীজীবনের একটি প্রধান কথাও এই "সেবা"। সেবায় আত্মদান করিয়া নারী আজ যে মহান সার্থকতা লাভ করিয়াছে, আর কোন পথে সে তাহা করিতে পারে নাই। "যাত্রী"তে পড়িয়াছি পুরুষ শূন্যহস্ত জগৎকে দেখাইয়া সগর্ব্বে বলে—"আমি কর্ম্মের চক্র"। আর নারীর সেবারত হস্তের কঙ্কণের মৃদু শব্দ তাহার অন্তরের বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া জগৎকে জানায় "আমি সেবার যন্ত্রী"। কিন্তু জয় কাহার? ঈশ্বরের এক হস্তের বিষপাত্র হইতে রোগ, শোক, যন্ত্রণা প্রভৃতি পৃথিবীর বুকে ঝরিয়া পড়িতেছে, আর অপর হস্তের অমৃতময় ঝারি হইতে নারীর জীবনধারা গলিয়া ঝরিয়া ধরার বক্ষে প্রবাহিত হইতেছে। আপন অন্তরই তাহার পথপ্রদর্শক ভগীরথ। তিলে তিলে বিকাশের আত্মদানে কূলে কূলে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া, দুই তীরকে সেবার অমৃতময় বারিসিঞ্চনে স্নিগ্ধ করিয়া ধীর গতিতে অগ্রসর হওয়াই এই ধারার ধর্ম্ম। এই স্রোতধারার তীরের একটী ক্ষুদ্র বালুকণা উত্তপ্ত হইলেও তাহাকে আপন স্নেহোদকে অভিষিক্ত করিয়া শীতল করিয়া তোলাই তাহার কর্ত্তব্য। সুভদ্রার স্নেহময়ী সেবাপরায়ণা মূর্ত্তি, তাহার শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ না করিয়া অক্লান্ত সেবা এ স্থানে যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়া দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে পাশ্চাত্য জগৎ যে মহান স্থানে আসন দিয়াছে, আর কোন নারী অন্য কোন গুণে সে স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন?

সকলের বক্ষেই স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রেম স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু পুঞ্জীভূত করিয়া রাখার মধ্যেও সার্থকতা নাই—সার্থকতা—সন্তানের নিমিত্ত স্বতঃস্ফূর্ত্ত মাতৃস্তন্যের পীযূষধারার অবিরলভাবে ক্ষরণে। সুভদ্রার অক্লান্ত সেবায় সুলোচনা যখন আপত্তি করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিয়াছিল "আমার স্বধর্ম্ম আমি পালন করিব না?" কিন্তু সেই স্বধর্ম্ম কি? তাহার উত্তরও তাঁহার নিকট হইতে আমরা পাই

"আমরা নারী—বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু-মিত্র নাই
বরিষার ধারাসম অজস্র জননীপ্রেম
ঢালিয়া চলে যাই।"

এ ধর্ম্ম "রাজার প্রসাদ হইতে দীনের কুটীরে" সর্ব্বত্র সমানভাবে পালনীয়। এই "সেবা"র সহিতই আর একটী ধর্ম্ম নারীজীবনের সহিত ওতপ্রোত-ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে, তাহা "ত্যাগ"। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ যখন প্রথমে ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের ও তাঁহাদের গৃহের নারীগণের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল 'ত্যাগ'। এ ভারতভূমি সে ত্যাগের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল, ভোগের উপর নহে। কিন্তু ত্যাগের সে চিত্র আজ পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গিয়াছে। আজ চতুর্দ্দিকেই আপন আপন অধিকার বজায় রাখিবার কি দুর্দ্দম বাসনা ফুটিয়া উঠিয়াছে! কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, সকল ক্ষেত্র হইতেই যেন ত্যাগের আদর্শ চিরতরে বিদায় লইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার একটী ক্ষীণধারা আজও অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় নারীচিত্তে প্রবহমানা হইয়া রহিয়াছে। অতিশিক্ষিতাগণের বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রের কথা না হয় দূরেই রহিল, অশিক্ষিতা অন্তঃপুরচারিণী সামান্য নারীর মধ্যেও ত্যাগের এই ছবি কি পরিপূর্ণ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে! সে জানে না ত্যাগ কাহাকে বলে, ত্যাগ যে কত মহান, কত মাধুর্য্যময় তাহাও তাহার অজ্ঞাত, তথাপি এই ত্যাগের মধ্য দিয়াই সংসার-তরণী চালাইয়া আপন কর্ত্তব্য সে সম্পাদন করে। তাহার সে ত্যাগ পূর্ণতা লইয়াই তাহার নিকট ধরা দেয়।

নারী আর এক মূর্ত্তিতে জগৎকে আপন পরিচয় দেয়। সে মূর্ত্তি জননীর। কিন্তু জননীর এ মূর্ত্তি কেবলমাত্র স্নেহকাতরা প্রতিমাই নয়। আমাদের জগজ্জননীর যে কত রূপ! প্রসন্ন দৃষ্টি হইতে স্নেহ ঝরিয়া পড়িতেছে, স্নিগ্ধ হাস্য বরাভয় দান করিতেছে, অপর দিকে দশভুজার দশপ্রহরণ চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে, হাতের ত্রিশূলের সূচ্যগ্রভাগ পাপাচারী অসুরের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া মৃত্তিকাকে শোণিতসিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এইত আমাদের নারীর আদর্শ! এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, এই মূর্ত্তিতে যিনি সন্তানের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার সন্তানই একদিন জগতে সর্ব্বপরিচিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে।

সমগ্র মারাঠাজাতি একদিন যাহার দত্ত মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই শিবাজীকে তাহার মাতার অন্তরের নারীপ্রকৃতি ভিন্ন আর কে গড়িয়া তুলিয়াছিল? অসংখ্য সন্তান নিত্য জন্মগ্রহণ করিতেছে, অজস্র মাতাও তাহাদিগকে লালন পালন করিতেছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের ন্যায় সন্তান কয়জন মহিলা জগৎকে দান করিতে পারিয়াছেন? বিদ্যাসাগরের নামে আজ সমগ্র বঙ্গদেশ শ্রদ্ধায় অবনত হয়, কিন্তু তাঁহার জীবনের পশ্চাতে মাতার যে বিরাট অনুপ্রেরণা ছিল, যে সতর্ক যে কর্ত্তব্যপরায়ণ, সে স্নেহকাতর হৃদয় ছিল, তাহার পরিমাণ করিবে কে? নেপোলিয়ানের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার মাতার প্রভাব জাজ্বল্যমান রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রথম পৃষ্ঠাতেই আমরা ইহার পরিচয় পাই। "Hann that rocks the cradle rules the nation" এ সত্য তাঁহার জীবনে যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আর কাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে?

ভারতবর্ষ আজ স্বরাজ চাহিতেছে। দেশ সেবকগণের 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে আজ চতুর্দ্দিক কাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু দেশমাতার অঞ্চলের প্রান্ত-টুকুও তাহারা ধরিতে পারিতেছেন না। কেন? দেশের মাতাদের বাদ দিয়া কল্পনাঙ্কিত দেশমাতার কল্পিত চরণ বন্দনার নিগুণ চর্চ্চা চলিতেছে, তাই দেশমাতাও আজ মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের বন্ধনে আজ অসংখ্য মাতা শৃঙ্খলিত। তাহাদিগকে মুক্তি না দিলে দেশমাতার শৃঙ্খলবদ্ধ পদদ্বয় কোনরূপেই মুক্ত হইবে না। কোনরূপেই নয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।" কিন্তু সেই জ্ঞানের আলোতে আজ পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধিকার বেশী—অনেক বেশী। কারণ পুরুষ সৃষ্টি নারীর হাতে—পুরুষের হাতে নয়। এ জ্ঞান আহরণ করা নারীর তাই প্রধান কর্ত্তব্য। জাতির ভবিষ্যৎ যে তাহার হাতে।

কিন্তু নারীর এই শক্তির মূল্য কেবল মাত্র তাহার সন্তান গঠনের ক্ষমতার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবেনা। তাহার আপন শক্তিকে সে আপন কাজে লাগাইয়াও সার্থক করিয়া তুলিবে। এ স্থানে বেহুলার আদর্শ এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। নারীর বাহু যতখানি শক্তি ধারণ করিতে পারে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাহার ততখানি শক্তিকেই কার্য্যে প্রযুক্ত করিয়া বেহুলা মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছিল। নারীর বাহুর এ শক্তি যেন পুরুষের বীর্য্যের মানদণ্ড। আমাদের উপাস্য দেবতার এক হস্তে স্থিত পদ্ম, আর এক হস্তে ধৃত গদা। এই পদ্মই ঐ গদাকে পূর্ণতা দেয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দান জগতে অতুল। কিন্তু এ দানের পশ্চাতে রাণী রাসমণি ও যোগেশ্বরী ভৈরবী-ব্রাহ্মণীর প্রভাব যে কত বৃহৎ তাহা নির্দ্ধারণ করিবে কে? মহাভারতে দ্রৌপদীর দানও ত কম নয়। পঞ্চ পাণ্ডবকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন ত তিনিই। এই পঞ্চজনের মধ্যে কখন যে ষষ্ঠজন হইয়া তিনি আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না, অথচ এই দ্রৌপদীকে বাদ দিয়া মহাভারত দেখিতে গেলে তাহার বাকী থাকেই বা কতটুকু?

জীবনের ক্ষেত্রে পুরুষ পরামর্শ পায় নারীর নিকটে। কোন স্থানে আঘাত পাইলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটীয়া আসে তাহার পাশে। নারীও আপন করের কোমল স্পর্শে তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া তোলে, তাহার ক্ষতে প্রলেপ লাগায়। এই কল্যাণী মুর্ত্তিও পুরুষের জীবনের একটী দিককে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। নারীর প্রভাব পুরুষের উপর সামান্ত নয়। নারীর মুখের একটী কথা পুরুষের জীবনকে কিরূপ আমুল পরিবর্ত্তিত করিতে পারে 'বিল্বমঙ্গল'ইত তাহার প্রধান নিদর্শন।

মানুষমাত্রেই ভুলের বশবর্ত্তী, পুরুষ ও ভুল করে, নারীও ভুল করে। নারীর ভুল পুরুষ চিরকাল সংশোধন করিয়া আসিয়াছে এ প্রথা আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে নারীরও পুরুষকে সংশোধন করিবার পূর্ণ অধিকার আসিয়াছে, সীতা রামচন্দ্রের কোন ভুল দেখিয়াছিলেন কিনা জানি না কিন্তু একথা বলিতে পারি যে কোন ভুল দেখিলে তিনি তাহা সংশোধন করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমানে সে সীতা ও সে রামের যুগ নয়। পুরুষের আদর্শ আজ পরিবর্ত্তিত ; নারীর আদর্শও তাই। আজ বহির্জগতের নিত্য নব চিত্র দর্শনে মনে হয় বর্ত্তমান যুগের পুরুষের অন্তরে এতখানি শক্তি নাই যে সে আপনাকে সুসংবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। নির্ভুল ভাবে কাজ করিতে পারে। তাই নারীকে আজ পুরুষের ভুল সংশোধন করিতে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। মুহূর্ত্তে পুরুষ উদ্দাম হইয়া উঠে। তাহার নেশাকৃষ্ট মন সীমার গণ্ডী ছাড়াইয়া বেগে ধাবিত হয়, তখন নারী আসিয়া শাসন-রশ্মি আপন হাতে গ্রহণ করিয়া তাহার গতিকে প্রতিহত করিয়া তোলে। কিন্তু সে ভুল করিয়াছে বলিয়া তাহাকে প্রতিহত করিয়াই রাখে না, গতিতে যতি মিশাইয়া তাহাকে শান্ত, সুন্দর করিয়া তোলে। পুরুষের ভুল সংশোধন করিয়া জগতে একজন নারী চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যশোবন্ত সিংহের পত্নী রাণী বিন্দুমতী। সম্মুখ সমরে পরাজিত পতি যখন শৃগালের ন্যায় দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত, তখন রাণীর আদেশে দুর্গদ্বার তাঁহার নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল! কর্ত্তব্যকে পরিহার করিয়া স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন, আর পত্নী তাহা স্বচক্ষে দেখিবেন! তাই বীরাঙ্গনা দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "কর্ত্তব্য সাধন না করিয়া যিনি ফিরিয়া আসেন তিনি আমার স্বামী নন।" সে দৃঢ়স্বরে আপন ভুল বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে যশোবন্ত সিংহ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে ছুটিলেন। নারীর এ মূর্ত্তিও বর্ত্তমান যুগে একান্তভাবে কাম্য। আমাদের গণেশজননী দুর্গা কেবলমাত্র শিবের অঙ্কশায়িনীই নহেন। কখনও তিনি শিবের ঘরণী কখনও গৃহিণী, কখনও মহিষমর্দ্দিনী, কখনও বা শিবের বক্ষোপরিবিহারিণী। এই আদ্যাশক্তি জননীর অনুকরণে নারীকেও তাই কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাইতে হইবে।

ভুল সংশোধনের নারীর আর একটী পথও রহিয়াছে। তাহার গাম্ভীর্য্যময় মৌনতাও এক ব্রহ্মাস্ত্র। এই মৌনতায় ঔদাসীন্য অনেক ভুলকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছে। অনেক অত্যাচারীর কুকর্ম্মে উদ্যত হস্তকেও শিথিল করিয়া দিয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

"যখন ক্ষমা করো তুমি
　　সব অভিমান ত্যজে,
কঠিন শাস্তি সে যে
কঠোর আঘাতে যখন নীরব রহো।
　　সেই বড়ো দুঃসহ।

এই মৌনতার ভিতর দিয়া একটুকু তাপ কাহারও গায়ে না লাগিতে দিয়া বিশৃঙ্খলা দূর করার ক্ষমতার প্রকাশও কম লাগেনা। এইরূপে আর একদিক দিয়াও তাহার শক্তি নামের স্বার্থকতা ফুটিয়া উঠে।

নারীর আর একটী প্রধান কর্ত্তব্য সকল অবস্থার সহিত মানাইয়া চলা। এ শক্তি কেবলমাত্র তাহারই আছে। তিলে, তিলে, অন্তরের স্নেহরস ক্ষরণে পিতামাতা কন্যাকে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে বড় করিয়া তোলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁহাদের তাহাকে অন্যের হাতে দান করিতে হয়। বিচ্ছেদের বেদনা লইয়া সেই কন্যা সম্পূর্ণ একাকী অবস্থায় অন্য এক আবেষ্টনীর মধ্যে গিয়া পড়ে। এক বৃক্ষের ফল উপড়াইয়া অন্য বৃক্ষের শোভা বর্দ্ধনের জন্যে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার ব্যথা যে কত অসহনীয়, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা কবীন্দ্রের "বধূ"তেই পাই। কিন্তু তাহারই মধ্যে তাহাকে অপরের গৃহাবেষ্টনীর সহিত মানাইয়া চলিতে হয়। এ ক্ষেত্রে উপমা দেওয়ার কোন আবশ্যক নাই। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আমরা চোখের উপর দেখিতে পাই। অন্তরে বাহিরে এইরূপ মানাইয়া চলা ত অল্পশক্তিবিশিষ্টের কাজ নয়। নারীর মধ্যে এই ক্ষমতা যে কিরূপ আছে তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী"তেই সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

দেবী চৌধুরাণীর নামে ইংরাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত, তাহার অধীনে ছিল শত শত পাইক বরকন্দাজ। স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া সে তাহাদের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য করিত—কত জাঁকজমক, কত আড়ম্বর! কিন্তু এই দেবী চৌধুরাণীই যখন প্রফুল্লরূপে সীমন্তে অর্দ্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া ব্রজেশ্বরের গৃহলক্ষ্মীরূপে দেখা দিল, তখন পাঠকসম্প্রদায়ের অনেককেই চক্ষু কচলাইতে হইয়াছিল—'এই সেই কি না!' কোথায় তাহার রাণীত্ব, কোথায় বা প্রভুত্ব! একমনে সে গৃহকর্ম্মে রত। প্রসন্নবদনে এই পারিপার্শ্বিক অবস্থান্তর গ্রহণ কেবলমাত্র নারী শক্তিতেই সম্ভব, এবং তাহার প্রকাশও তাহার কর্ত্তব্য। জগতে যে অবস্থাই আসুক না কেন, প্রসন্নবদনে তাহাকে গ্রহণ করিব, ইহাতে আমরা নীচু হইয়া পড়িব না—এশক্তি কেবল মাত্র আমাদেরই মধ্যে নিহিত আছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা নারীকে বর্ণনা করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন—"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী অবনী বহিয়া যায়।" সেকালের কাব্য এই নারীর রূপগুণের প্রশংসায় পূর্ণ। সংস্কৃতকাব্য কেবলমাত্র মাল্য-চন্দন বনিতা দিয়াই গঠিত, এবং বনিতার স্থানই তাহার মধ্যে প্রধান, মাল্যচন্দনের প্রয়োজন ত তাহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির নিমিত্ত। কালিদাসের মহাকাব্যে দেখিয়াছি নারীর এইরূপ ক্ষমতা ছিল, যে তাহার নূপুর-অলঙ্কৃত পদের এক আঘাতে অশোকবৃক্ষের দেহ পুষ্পবিকশিত হইয়া উঠিত, এবং পুরুষ সে পদকে পূজা করিতেও ইতস্ততঃ বোধ করিত না, কিন্তু আজ সেই মাল্য-চন্দন দিয়া ঘেরা জগতে নারী থাকিতে চায় না। সে আদর্শও আজ তাহার আকাঙ্ক্ষিত নয়—কাব্যজগৎকে সে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যোগাইয়া আসিয়াছে, আজ সময় আসিয়াছে বাস্তব জগৎকে অনুপ্রেরণা যোগাইবার। সংস্কৃত কাব্যে প্রধান স্থান পাইয়াই সে সন্তুষ্ট নয়।

সে পদদলিত হইতেও চায় না, মাথায় উঠিতেও চায় না। সে চায় সর্ব্বক্ষেত্রে সমভাবে কার্য্য করিবার পূর্ণ অধিকার। নারীকে বাদ দিয়া ভারতের মুক্তি খুঁজিতে যাওয়ায় সে মুক্তির আলো আজ আলেয়া হইয়া উঠিয়াছে। তাই নারীর মুক্তিই আজ সর্ব্বাগ্রে কাম্য। কবি বলিয়াছেন,

"আন উষর দেশে প্রাণবন্যা ধারা
এস উষার বেশে ভাঙ আঁধার কারা।"

সেই উষার বেশেই আজ নারীকে আপনাকে প্রকাশ করিতে হইবে। এ জগতের উদার ক্ষেত্রে তাহারও যে প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন ত তাহার ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গৃহবেষ্টনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—সে প্রয়োজন বিস্তৃত, তাহার গৃহের অঙ্গনের বাহিরে যে আলোকিত বৃহৎ পৃথিবী পড়িয়া আছে, সেইখানে —সেই নিখিল জগতে "জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের নানা সংযোগ সম্বন্ধে নানা প্রবর্ত্তনায়" বিশ্বমানবকে জাগরিত করায়, উদ্বুদ্ধ করায় ও চেতনা দেওয়ায়।

পট-পরিবর্ত্তন (গল্প)

শহরের উপকণ্ঠস্থিত ক্ষুদ্র গ্রামখানার মধ্যে এক সময়ে মিত্ররাই ছিল সম্পন্ন গৃহস্থ; কিন্তু বর্ত্তমানে 'পাশা উল্‌টিয়া' গিয়াছে। নামটা অবশ্য এখনো আছে—মিত্রবাড়ী, কিন্তু বাড়ী বলিতে আর কিছুই নাই। এককালে অন্দর মহলের যে প্রশস্ত ও সুসজ্জিত কক্ষগুলিতে সকলে শয়ন করিত, এখন সেগুলি নিজেরাই মাথা গুঁজিয়া, পা-হাত-পা এলাইয়া, ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়াছে। তা' ছাড়া, বংশের মধ্যে এখন শয়ন করিবার লোকেরও অভাব। মাত্র দুইটি প্রাণী এখন বর্ত্তমান—জলধর আর শশধর। ইহারা সহোদর ভাই। জলধর জ্যেষ্ঠ, শশধর কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠের বয়স ৪০; কনিষ্ঠ তাহার অপেক্ষা ৪।৫ বৎসরের ছোট।

ধর ভ্রাতৃদ্বয়, অর্থাৎ জলধর ও শশধর তাহাদের জীবনে অনেক কিছুই করিয়াছে এবং অনেক কিছুই করে নাই। যাহা করে নাই, তাহার মধ্যে তিনটী জিনিস প্রধান। তাহারা লেখাপড়া শিক্ষা করে নাই, বিবাহ করে নাই এবং চাকুরী বা কোনরূপ কার-কারবার করে নাই। পৈতৃক ভূসম্পত্তির যাহা-কিছু অবশিষ্ট ছিল,, তাহাই দুই ভ্রাতায় ভাগ করিয়া লইয়াছে এবং তাহাতেই একপ্রকারে তাহাদের ভরণ-পোষণ চলিয়া যায়। হয় ত ইহাদের বেশ সচ্ছলেই চলিতে পারিত, যদি পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া না ফেলিত। বর্ত্তমানে গ্রামের বাহিরে, রেললাইনের দুইধারে যে দুইখানি বড় বাগান আছে, তাহাই মাত্র ইহাদের ভরসা। বাগান দুইখানি হইতে বৎসরে প্রত্যেকের যে ৩০০,৩৫০্ টাকা আয় হয়, তদ্দারাই কোনরূপে উভয়ের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

বার-বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরখানা ছিল সুপ্রশস্ত হলঘরের মত। এই সখের ঘরখানার পিছনে স্বর্গগত কর্ত্তারা বহু যত্ন এবং অর্থব্যয় করিয়াছিল; তাই ঘরখানাও নিমকহারামী না করিয়া তাঁহাদের এই দুই বংশধরকে অসময়ে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিল। ঘরের মাঝ বরাবর দেবদারু-তক্তার একটা পার্টিসন দিয়া, ও-ধারটায় থাকিত—জলধর; এধারটায় থাকিত—শশধর। পার্টিসনের মাঝখানে ছোট্ট একটা দরজা বসানো ছিল। এই দরজাটা কখনো কখনো খোলা অবস্থায় থাকিয়া দুই ভ্রাতার মধ্যে সম্প্রীতি ঘোষণা করিত; আর তালাবদ্ধ থাকিলেই বুঝা যাইত, উভয়ের মধ্যে সাময়িক মনোমালিন্য ঘটিয়াছে।

সেদিন পার্টিসনের দরজা খোলা ছিল। জলধর ঘরের এককোণে ষ্টোভে চায়ের জল গরম করিতে করিতে খোলা দরজার ফাঁকে শশধরের দিকে চাহিয়া কহিল,…

কিন্তু আগে ইহাদের আকৃতি ও স্বভাবগত একটু পরিচয় না দিলে সমস্ত ব্যাপারটা হয়ত ঘোলাটে থাকিয়া যাইতে পারে; সুতরাং সেটা শুধু আবশ্যকই নয়—অত্যাবশ্যক।

দুই ভ্রাতার মধ্যে বয়সের পার্থক্য বেশী না থাকিলেও, দৈহিক গঠনের পার্থক্য খুব বেশী। জলধর খর্ব্বকায়, শশধর দৈর্ঘ্যে ছয়ফুট তিন ইঞ্চি। জলধরের দেহ বেশ মাংসল, কিন্তু শশধরের দেহ শুধু হাড়সার, অর্থাৎ জীর্ণ-শীর্ণ হাড়মাত্র-সার। জলধরের গোঁফ-দাড়ী কামানো, মাথায় ফ্যাসন-করা ছোট-বড় চুলে টেরি কাটা; আর লম্বা-লম্বা চুল এবং গুম্ফশ্মশ্রুর প্রাচুর্য্যে মেঘাবৃত শশধরেরই মত শশধরের বদনমণ্ডল আচ্ছাদিত।

শশধর একটু সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। তাহার পরণে গেরুয়া। জপ-তপ সাধু-সন্ন্যাসী, দেব-দেবীতে ভক্তি, গীতা-পাঠ, নিরামিষ আহার প্রভৃতি লইয়া তার দিন কাটে। জলধর ও-সবের ঘোর বিরোধী। জপ-তপের ধার ধারে না, সাধু-সন্ন্যাসী ও গেরুয়ার উপর সে ভীষণ চটা এবং মাছ মাংস পিঁয়াজ ডিম না হইলে তাহার খাওয়াই হয় না।

আমাদের এই কথাগুলি বলিবার অবসরে জলধরের চায়ের জল গরম হইয়া ফুটিয়া উঠিল এবং তাহাতে এক চামচ চা দিয়া সে সসপ্যানের মধ্যে মামলেটের ডিম দুইটা ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল, "তুই যা খাস্, ঐ খেয়ে মানুষ কখনো বাঁচে! পেট ভরে মাছ-মাংস খা, একটু ফিট্ ফাট্ বাবুগিরির ওপর থাক, তবে ত জীবনটা সুখের হবে। সন্ন্যাসীর মতো ঐ ভাবে দিন কাটানো মানে পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়।"

শশধর বোধ হয় এই সকালবেলাটায় মনে মনে নাম জপ করিতেছিল; দাদার এই অপ্রীতিকর উপদেশবাণী শুনিয়া অর্দ্ধোস্ফুট উচ্চারণে শুধু কহিল, "নারায়ণ! নারায়ণ!"

চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে জলধর কহিল, "আগে নিজের মধ্যে যে আত্মা-নারায়ণ আছে, ভাল খেয়ে পোরে তার তোয়াজ কর্, তারপর বাইরের নারায়ণের ভজনা করিস্।" বলিয়া মাখন-দেওয়া একখণ্ড রুটী মুখে ফেলিয়া চিবাইতে চিবাইতে কহিল, "ভগবানকে ডাকতে হয় ত, সাদা কাপড়ে ডাকলেই ত হয়, গেরুয়ার ভেক না হোলে বুঝি হয় না?"

শশধর মনে মনে নাম-জপ করিলেও, কথাগুলি কানে তাহার বিষ ঢালিয়া দিল, তথাপি সে বিষ হজম করিয়া সে তাহার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

মামলেটটা মুখে দিয়া জলধর আবার কহিল—"সব সহ্য করতে পারি বাবা, গেরুয়াধারী আর ভণ্ডামী কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।"

এইবার শশধর আর চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিল না; ফোঁস্ করিয়া বলিয়া উঠিল—"অসহ্য হয় ত, এদিকে আর চেও না; দরজাটা বন্ধ করে রাখলেই পার।" বলিয়া ক্রোধকম্পিত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঝনাৎ করিয়া পার্টিসনের দরজাটায় শিকল ও তালা লাগাইয়া দিল।

তারপর তাহার আর জপে মন বসিল না। জলধর কিন্তু চা, টোষ্ট, মামলেট প্রভৃতি লইয়া সুন্দররূপে তাহার কাজে মন বসাইয়া দিল।

মিনিট পাঁচ সাত পরে ও-ঘরে 'ব্রেক-ফাষ্ট' সারিবার পর জলধর একটা সিগারেট হাতে লইয়া গুন্-গুন্ গান ধরিল—'তোমায় চিনেছি চিনেছি চিনেছি—ওগো বিদেশিনী'। সেই সময়ে এ ঘরে বিপিন ব্রহ্মচারী নামে গেরুয়া পরা এক সন্ন্যাসী প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ! ভাল আছ বাবা?

শশব্যস্তে শশধর গাত্রোত্থান করিয়া সন্ন্যাসীর পাদমূলে প্রণাম করিল; কহিল—নারায়ণের অংশসম্ভূত আত্মার কখনো অমঙ্গল আছে বাবা? তার ওপর আপনাদের কৃপা এবং আশীর্ব্বাদ।"

সন্ন্যাসী আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন—"কারো কৃপা আশীর্ব্বাদে কিছু হয় না, বাবা; নিজের গাঁঠে টিকিটের ভাড়া না থাকলে গাড়ীতে উঠবে কি করে। তাই নিজের পুঁজি চাই, তপস্যা চাই। সৃষ্টিকর্ত্তাকেও এই জগৎ তপস্যার দ্বারা সৃষ্টি করতে হয়েছিল।"

ও-ঘরে তখন জলধর 'বিদেশিনী'কে ছাড়িয়া দিয়া মনে মনে বলিল—"ইচ্ছে করে, আমার এই সিগারেটের আগুন দিয়ে যতসব ভণ্ডদের গেরুয়া পুড়িয়ে দি।" বলিয়া বিষাক্ত দৃষ্টিতে কট্‌মট্ করিয়া এ-ঘরের দিকে বার-দুই চাহিল।

এ-ঘরে তখন শশধর ও সন্ন্যাসীর মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বের গভীর আলোচনা চলিতেছিল।

— — —

সহসা জাপানের সহিত আমাদের রাজার যুদ্ধ বাধিল। সঙ্গে সঙ্গে সারা বাঙলায় একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কলিকাতা এবং তাহার উপকণ্ঠ-বাসীরা যুদ্ধের ভয়ে ভীত হইয়া দূর-দূরান্তরে পালাইতে আরম্ভ করিল। পালাইবার ঢেউ এ গ্রামেও আসিয়া লাগিল। কয়েকদিন হইতে পার্টিসনের দরজা উন্মুক্ত ছিল। জলধর এদিকে চাহিয়া শশধরকে জিজ্ঞাসা করিল—'তুই কোথাও পালাবি না কি?"

শশধর কহিল—"আমি কোথাও যাচ্ছি না; নারায়ণের পায়ের তলায় আছি, তাঁর পায়ের তলাতেই থাকবো। তিনি রাখেন, থাকবো; না রাখেন, পালিয়েও রক্ষা পাব না। তুমি কোথাও যাবে না কি?"

একটু হতাশার স্বরে জলধর কহিল—"হাতে ত আর পয়সা-কড়ির জোর নেই যে, কোথাও যাব; সুতরাং এইখানেই পড়ে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই।"

ইহারই কিছুদিন পরে শশধরের নামে একখানা সরকারী চিঠি আসিল। চিঠির মর্ম্ম এই যে, রেললাইনের পশ্চিম দিকে শশধরের যে ৭০ বিঘার বাগান আছে, যুদ্ধের কাজে সরকার তাহা গ্রহণ করিবেন এবং এজন্য সরকার শশধরকে প্রতিমাসে দুইশত টাকা হিসাবে ভাড়া দিবেন। এই সংবাদে—শশধর নয়—জলধর লাফাইয়া উঠিল এবং এই লম্ফ আনন্দের ফলে নয়, হিংসার ফলে। সেই দিনই জলধর পাটিসনের দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং দিনকতক খুবই চেষ্টা করিয়া ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল, যাহাতে তাহার বাগানটাও সরকারকর্ত্তৃক গৃহীত হয়। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না।

পরের মাসে শশধরের কাছে পুনরায় এই মর্ম্মে এক সরকারী পত্র আসিল যে, তাহার জমীর উপর যে নানাজাতীয় দুইশত বৃক্ষ আছে, ঐগুলি তক্তা করিবার উদ্দেশে সরকার কিনিয়া লইলেন এবং উহার সরকারকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মূল্য দুই হাজার তিনশত টাকা—জেলার কালেক্টরী হইতে যেন তুলিয়া লওয়া হয়।

এই ব্যাপারে একদিকে শশধরের আঙ্গুল ফুলিয়া যেমন কলাগাছ হইল, অপরদিকে তেমনি জলধরের আঙ্গুল চুপসাইয়া খড়কে কাটির মত হইয়া গেল।

শশধর দুই হাজার তিনশত টাকা—বাক্সে পুরিয়া মনে মনে নারায়ণকে স্মরণ করিয়া কহিল—"তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!"

শশধরের কিন্তু কাজ বাড়িয়া গেল। মাসান্তে জেলার সদরে গিয়া ভাড়া আনিতে হয়। সাহেব-সুবোর কাছে গিয়া দাঁড়াইতে হয়, মাঝে মাঝে বাগান সম্বন্ধে সরকার যাহা আদেশ করেন, তাহা তামিল করিতে হয়। তাহার একমাথা চুল ও দাড়ি-গোঁফ দেখিয়া সাহেব সুবারা তাহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। ক্রমে অবস্থা এমন হইল যে গেরুয়া পরিধান করিয়া সাহেবদের কাছে যাওয়া খুব অসুবিধা হইল। তখন একদিন শশধর তিনটার জোড়া ধোলাই ধুতি, লংক্লথের পাঞ্জাবী, ভাল একযোড় সু প্রভৃতি কিনিয়া আনিল। মনে মনে সেদিনেরই মত নারায়ণ স্মরণ করিয়া কহিল—"তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

তাঁর ইচ্ছায় ক্রমে ক্রমে শশধরের দাড়ি-গোঁফও গেল, হেয়ার-কাটিং সেলুনের কাঁচি ও ক্লিপের তলায় পড়িয়া তাহার একমাথা ঝাকড়া-ঝাকড়া চুলও নবরূপ ধারণ করিল। সাহেবরা দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে কহিল—"নাউ ইউ লুক্, অল্ রাইট্!"

শশধর সেদিন ধোপ-দস্ত ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবী প্রভৃতিতে ভূষিত হইয়া সদর হইতে তাহার বাগানের ভাড়া আনে, সেদিন ঘরে ফিরিয়া তাহার বাক্সে সঞ্চিত ২৩০০ শত টাকার সহিত ঐ ২০০ শত টাকা মিশাইয়া এই আড়াই হাজার টাকার নোট পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে নাড়াচাড়া করে। নিত্য এই নাড়াচাড়া করিবার ফলে বাজারের ভিন্ন ভিন্ন দোকান হইতে নানাবিধ দ্রব্য তাহার বৈরাগী-ঘরখানির মধ্যে আসিয়া জমিতে লাগিল; যথা,—আয়না, বুরুস চিরুণী, কামাইবার সেট্, পাথর বসানো আংটি, রিষ্ট ওয়াচ, ফাউন্টেন-পেন, চায়ের সরঞ্জাম, টর্চ, সিগারেটের টীন, টিকে, তামাক, গড়গড়া প্রভৃতি। এই সঙ্গে আরও আসিল—চাল, ডাল, ঘি, ময়দা, সুজি, চিনি, মিছরী, মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ প্রভৃতি এবং তাহার সহিত আসিল একজন হিন্দুস্থানী পাচক ও একজন ভৃত্য। ইহারা সদলবলে আসিয়া শশধরের গেরুয়া, গীতা, খড়ম, কুশাসন, নারায়ণ, এবং নাম-জপ প্রভৃতিকে ক্রমে ক্রমে কোণ-ঠাসা করিয়া ফেলিল এবং শেষে গলা টিপিয়া হত্যা করিল।

এদিকে যুদ্ধের ফলে এবং কতকগুলি হীনপ্রবৃত্তি নীচাশয় শ্রেণীর ব্যবসাদারের স্বার্থপরতায় জন্য জীবনধারণোপযোগী সকল দ্রব্যই দুর্মূল্য হইয়া উঠিল। চারি টাকা মণের চাউল হইল ৩০।৫০৲ টাকা এবং কোন কোন স্থলে ৭০।৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত। চারি আনা সেরের মিছরী হইল ২।০।২৲ টাকা। দুই টাকা জোড়া ধুতির মূল্য চড়িল ৮৲ টাকায়। যে সাগুর দাম ছিল চৌদ্দ পয়সা সের, তাহার দাম হইল ৮৲ টাকা সের। একটি সুপারীর দাম হইল দুই পয়সা, একটি পাতি নেবুর দাম হইল দুই আনা। শাকসব্জী ও তরীতরকারী, তেল-নুন, মসলাপাতি প্রভৃতি সকল জিনিষের দামই ঐরূপ অসম্ভব হারে বাড়িয়া উঠিল। কয়লা, কেরোসীন, স্পিরিট—স্বর্গীয় বস্তুতে পরিণত হইল। মোট কথা, জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক প্রত্যেকটি জিনিষেরই আটগুণ দশগুণ মূল্য বাড়িয়া উঠিল। অত্যন্ত দরিদ্র যাহারা, তাহারা এই সাংঘাতিক আঘাতের ধাক্কা খাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কাতারে-কাতারে, হাজারে-হাজারে, লক্ষে-লক্ষে, পথে-ঘাটে-মাঠে পড়িয়া মরিতে লাগিল। মধ্যবিত্তেরা কোন দিন অনাহারে, কোন দিন বা অর্দ্ধাহারে থাকিয়া ধুঁকিতে লাগিল। জলধরও সেই সঙ্গে ধুঁকিতে লাগিল।

দেশের এই ঘোর দুর্ভিক্ষের ফলে, জলধরের সব জলটুকুই শুকাইয়া গিয়াছিল। তাহার আর সে টোষ্ট-মামলেট-চা-সিগারেট নাই, সে বাবুগিরী নাই। একখানি মাত্র শতছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিয়া এবং এক সন্ধ্যা মাত্র কাঁচকলা ভাতে ভাত খাইয়া তাহার দিন কাটে। মাথায় একমাথা ঝাঁকড়া চুল; তৈলাভাবে তাহাতে জট্ বাধিয়াছে। পচা নারিকেল তৈলের সের দুই টাকা, আড়াই টাকা। নাপিতের কাছে কামাইতে ও চুল ছাঁটিতে গেলে এক টাকার কাছাকাছি ব্যয় হয়, সুতরাং একরাশ দাড়ি-গোঁফ জলধরের মুখখানাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। জুতাজোড়া একেবারেই ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে আর কাজ চলে না। নূতন একজোড়া জুতার দাম ১০৲ ১৩৲ টাকা। বিছানা-পত্র শতছিন্ন হইয়া, তোষক-বালিসের খেরো-ছিট কাটিয়া, তুলা বাহির হইয়া, সব জঞ্জালে পরিণত হইয়াছে। নূতন কিনিবার আর উপায় নাই, অগ্নি মূল্য। তাই সে সব ঘরের এক কোণে গাদা করিয়া রাখিয়া, একখানা মাদুর মাত্র তাহার শয্যা হইয়াছে। এই দুর্ব্বিসহ অন্নবস্ত্রের কষ্টের মধ্যে পড়িয়া তাহার সেই নাদুস-নুদুস্ দেহ হাড়-সার হইয়াছে।

শশধর কিন্তু খুব তোয়াজেই থাকে। মনের নূতন আনন্দ এবং উৎসাহে তাহার সেই শীর্ণ দেহে মাংস লাগিয়াছে। সর্ব্বদাই-তাহার অন্তরে স্ফুর্ত্তির ফোয়ারা ছুটিতেছে। দুর্ভিক্ষ যেন আশীর্ব্বাদী পুষ্প-স্বরূপ তাহার মস্তকে আসিয়া বর্ষিত হইতেছে।

সেদিন জলধরের একমাত্র ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রখানি একেবারে ফাঁসিয়া গিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিল। গামছাখানা পরিয়া জলধর তাহা সেলাই করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কাপড়খানা এতই জীর্ণ যে তাহাতে আর সেলাই চলে না। ও-ঘর হইতে শশধর তাহা দেখিয়া কহিল—"দাদা, আমার গেরুয়া ৪ খানা ত পড়েই রয়েছে; ও আমি পরিও না; পরবও না; তুমি নিয়ে পরতে পার।"

কিন্তু এই ঘোরতর দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে পড়িলেও শশধরের উপর জলধরের অভিমান ছিল পূর্ণ মাত্রায়। তাহার সহিত হিংসার ভাবও মিশ্রিত ছিল। অথচ লজ্জানিবারণের জন্য বস্ত্রেরও একান্ত প্রয়োজন। গেরুয়া মন্দ হইবে না; সাদা কাপড় দুইদিনেই ময়লা দেখাইবে; ধোপার বাড়ী কাচিতে দিলেই কাপড় পিছু দুই আনা তিন আনা লইবে। গেরুয়া হইলে ময়লা কম দেখাইবে; তা' ছাড়া ঘরে একটু সাবান ঘসিয়া লইলেই চলিবে।

সুতরাং শশধরের কথায় জলধর বলিল—"গেরুয়া চারখানা? তা দিতে পারিস। আর আমি ভাবছি, আমার ট্রৌজ্‌টা শুধু শুধু পড়ে থেকে ত নষ্ট হচ্ছে, ওটা তুই নে, তোর এখন খুব কাজে লাগবে।" শশধর বুঝিতে পারিল, দাদা এমনি-এমনি তাহার গেরুয়া চারখানা লইবে না, তাই ট্রৌজ্‌ দানের প্রস্তাব। যাহাহউক, শশধর ট্রৌজটা লইল এবং তাহার গেরুয়া চারিখানা জলধরকে দিয়া দিল। গেরুয়ার সঙ্গে শশধর তাহার খড়ম জোড়াটাও জলধরকে দিল, কহিল—"শুধু পায়ে থাক, এটাও ব্যবহার করতে পার।"

বিকালের দিকে গেরুয়া পরিয়া ও খড়ম পায়ে দিয়া ঘরের সামনেকার রোয়াকে পায়চারী করিতে করিতে জলধর শশধরের উদ্দেশ্যে কহিল—"তোর গীতাখানা ত আর তুই পড়িস্ না; আমায় দিস্ ত, একটু একটু পড়বো; তবু কতকটা সময় কাটবে।" শুনিবামাত্র শশধর কুলুঙ্গী হইতে গীতাখানা বাহির করিল এবং তাহার মলাটের বহুদিন সঞ্চিত ধুলা ঝাড়িয়া জলধরের হাতে দিল। সেই সঙ্গে তাহার নাম-জপের মালাগাছটাও দিয়া কহিল—"শুধু গীতা দিতে নেই, এটাও রাখ।"

পরদিন সকালে শশধরের ভৃত্য টেবিলের উপর একখানা ডিশে ডিমের মামলেট্ এবং আর একখানাতে দুইখানা টোষ্ট ও দুইটা সন্দেশ এবং তার সঙ্গে এক কাপ চা রাখিয়া যখন গড়-গড়ার মাথা হইতে কলিকাটা লইয়া তামাক সাজিতে গেল, তখন শশধর চিরুণী-ব্রুস হাতে আরসীর সামনে দাঁড়াইয়া গুন-গুন স্বরে জলধরের সেই গানখানাই গাহিতেছিল—সেই, 'তোমায় চিনেছি, চিনেছি, চিনেছি—ওগো বিদেশিনী!'

ঠিক এই সময়ে বহুদিন পরে বিপিন ব্রহ্মচারী এ-ঘরে ঢুকিতে গিয়া থতমত খাইয়া পিছাইয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিলেন—'এরা কি ঘর বদল করিল?' তখন এক-পা এক-পা করিয়া ও-ঘরের খোলা দরজার সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের ভিতর তখন অনাহারক্লিষ্ট, ক্ষীণ দেহ জলধর একমাথা সজট চুল ও একমুখ দাড়ী গোঁফ লইয়া, গেরুয়া পরিয়া মৃত্তিকাসনে বসিয়াছিল। তাহার এক পার্শ্বে খড়মজোড়াটি এবং অপর পার্শ্বে গীতাখানি রক্ষিত ছিল; আর হাতে ছিল—নাম-জপের মালাছড়াটি।

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত বিপিন ব্রহ্মচারীর মুখ হইতে অর্দ্ধোস্ফুট উচ্চারিত হইল—"ব্যাপার কি?"

তাঁহার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া জলধর কহিল—"ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়; সংসার-নাটকের পট-পরিবর্ত্তন!—পট-পরিবর্ত্তন!"

বিপিন ব্রহ্মচারী হতভম্বের মত তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

কণ্ঠরোধ (গল্প)

শ্রীজনরঞ্জন রায়

প্রভাত দস্তিদার পালটি ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে কল্পনাকে বিবাহ করিয়া তাহার শিলঙের বাগান বাড়ীতে 'হনিমুন' করিতে আসিয়াছেন। প্রথম মিলনের উচ্ছল আনন্দে দুইজনে ভরপুর। সে বিবাহের যৌতুকে যে মোটরগাড়ী পাইয়াছে তাহাতে উভয়ে একটা পাহাড়ের ঢালুপথে ওঠানামা করিতেছে। কল্পনা গাড়ী চালাইতেছে। পাহাড়ের চড়াই পথে যতদূর গাড়ী ওঠে, উঠাইয়া ব্রেক কষিয়া দিতেছে। তারপর গাড়ী আস্তে আস্তে পিছাইয়া সমতলে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। জ্যোৎস্নাময় মধ্যরাত্রি। প্রভাত চোখ বুজিয়া ইহা উপভোগ করিতেছে। হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া কল্পনা জিজ্ঞাসা করিল—

কিসে তোমার রোমাঞ্চ হচ্ছে মিষ্টার দস্তিদার? ওপরে চড়াইয়ে উঠছি যখন, তখন?…না যখন পেছিয়ে এসে আস্তে আস্তে নিথর হয়ে যাচ্ছি তখন? প্রভাত উত্তর করিল—

তোমাতে আমাতে এই চাঁদের আলোয় ওপরে ওঠার আনন্দে এক রকম রোমাঞ্চ হচ্ছে…আবার নীচে নামার আনন্দে অন্য রকম রোমাঞ্চ হচ্ছে!—দু'বারে দু' রকমের পুলক আসছে।

নামতেও পুলক?

হাঁ। ওঠা যদি সত্যি হয় নামাও সত্যি।…জীবন নাট্যের সুরুতেই বুঝছি নামতে হবেই হবে।…ওঠার যদি আনন্দ হয়…তবে নামার দুঃখ কিসে?

না না, নিথর নিস্পন্দতা আমি চাই না।…নামাটাকে এত সহজে আমি মেনে নেবো না।…উঠবো…উঠবো। …লাফিয়ে পড়বো এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে।…লাফাতে গিয়ে আমার গাড়ী ভাঙলো…পাঁজর ভাঙলো—তবু আমি লাফালাম!…কোথায় তুমি?…কোথায় যেন তুমি ছিটকে গেলে।…ওগো কোথায় তুমি?

প্রভাতের কণ্ঠলগ্ন হইয়া আবিষ্টের মতো কল্পনা স্থির নিস্পন্দ হইল। প্রভাত অস্থির হইয়া বলিতে লাগিল—

তোমার কি এপিলেপ্‌টিক্ ফিট্ আছে?…আমি বাগানে গেলে দুপুরে কি সব সাহিত্য যে পড়?…সেই সব মাথায় ঘুরতে থাকে!

প্রভাত ধীরে ধীরে তার স্ত্রীর মাথাটি কুশন বালিশের উপর রাখিল। তারপর মৃদুবেগে নিজে গাড়ী চালাইয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

কল্প। তাহার স্বামীর বাড়ীতে কলিকাতায়। প্রসাধন কক্ষ হইতে বিলাস কক্ষে আসিতেছে। কণ্ঠে ঝঙ্কার। সুরভিত পবনে সুরলহর কাঁপিতেছে। সে লীলায়িত হস্তে অলসভরে কোন্ যন্ত্রটি কাণের কাছে লইল। আয়া একটি টিপাইয়ের উপর ধূমায়মান চায়ের পেয়ালা রাখিয়া গেল। কল্পনা তার স্বামীকে আফিসে ফোন করিল। উত্তর পাইল—

২৫ নম্বর!

২৫ নম্বর?…আমি তোমার গলা চিনিনে বুঝি।

তারপর বলো।…খাস কামরায় 'ড্রিক্' নিয়ে চলেছি…।

চন্দননগরে চলাম - সেখানে কনফারেন্স পাঁচটায় যে…।

কৈ আসবার সময় সে কথা আমায় বলনি তো?…সিনেমার আর বিকেলের 'শো'তে বক্সের টিকিট কিনেছি যে দু'জনের। হ্যালো…হ্যালোঃ…?

প্রভাত আর কোনো উত্তর পাইল না। তার চোখ কপালে উঠিল। ফোন দানিতে যন্ত্রটি রাখিল, আবার তুলিল। তার হাত কাঁপিতেছে। ফোনে সে ডাকিল—

চন্দননগর পুলিশ?

হাঁ বলুন, আপনি কে?

আমার পরিচয় লিখে নিন…। আমার স্ত্রী কল্পনা দস্তিদার কনফারেন্সে চলেছেন আমার মিনার্ভা গাড়ীতে।…এত নম্বর।…তাঁকে বলবেন ফিরতে।…আমি পছন্দ করছি না তাঁর ব্যবহার…।

বেশ।

হাঁ, আরো দেখুন…বলবেন ও রকম গান গাওয়া…।

হ্যালো···হ্যালো ?...

চন্দননগর ষ্ট্র্যাণ্ডের পাশে প্যারী হোটেল। সেখানে আসিয়া কল্পনা বিশ্রাম ও বেশবিন্যাস করিয়া কনফারেন্সে যাইবে। তাহাকে প্রত্যুদগমন করিতে পদ্মকাটা-ব্যাজধারী কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা হোটেলের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। তারা কিছু অধীর, কারণ পাঁচটা বাজে। ধূলিপটল উড়াইয়া বাঁক ঘুরিয়া কল্পনার গাড়ী গঙ্গার ধারে এই ষ্ট্র্যাণ্ডে উঠিল। ধামার মতো গোল টুপি মাথায় চন্দননগরের একটি কালো পুলিশ হাত তুলিল। ব্রেক কষিয়া উপেক্ষার মৃদুহাসি সহ গ্রীবা বাঁকাইয়া কল্পনা বলিল—

কি বিড়ম্বনা···কণ্ঠরোধের আদেশ বুঝি···এখানেও! আমি মানতে রাজী নই।

না, সরকারী আদেশ নয়...আদেশ আপনার স্বামীর।···তিনি আপনাকে ফিরতে বলেছেন···আপনার ব্যবহার তিনি পছন্দ করেন না...।

গাড়ী বেগে বাহির হইয়া গেল। চন্দননগর হইতে কল্পনা তার স্বামীর আফিসে কলিকাতায় ফোন্ করিতেছে। ফোন ধরিয়াছে খোদ প্রভাত। আফিসের উড়িয়া বেহারা রাধুদাস। কল্পনা তার স্বামীকে না বলিয়া বেয়ারাকে বলিতেছে—

কে রাধুয়া ?...পুলিশকে দিয়ে আমায় আটকানো অত্যন্ত ধৃষ্টতা।···যে পুরুষ এ রকম করতে পারে, তার ঘরে থাকা আমার চলে না।···কি মধ্যযুগীয় অসভ্যতা!...রাধুয়া, পাড়ি থাকলো পুলিশের জিম্মায়।

মণিমা · মণিমা? ··সাহেবো চন্দননগরকু বাহিরিলে।···হালো মণি মালো ?...

একখানি টেক্সিতে করিয়া প্রভাত দস্তিদার চন্দননগরে বাহির হইল।

কনফারেন্স বসিয়াছে। মণ্ডপমধ্যে সভাপতির অদূরে ঐক্যতান বাদন সহ কল্পনা দস্তিদারের সমাপ্তি সংগীত হইতেছে—

স্বাধীনতা পণ—স্বাধীনতা পণ—স্বাধীনতা পণ।
তার কাছে সব তুচ্ছ, তুচ্ছ প্রেম-প্রীতি-ধন-জন।

গানের আবেগে মণ্ডপের আকাশ-বাতাস কম্পিত। প্রভাত পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কল্পনার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইতেছে।...হাততালির ধ্বনি চলিতেছে।···পালা শেষের ধন্যবাদ দিতে উঠিয়াছেন অভ্যর্থনা বিভাগের কর্ম্ম সচিব। তিনি কল্পনার গানের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—

ভাষা জুয়ায় না, কি বলিয়া প্রশংসা করি···উঁার সংগীত আজ সভাকে প্রাণ দিয়াছে।···যেন মিসেস্ দস্তিদারের প্রাণের কথা এই স্বাধীনতা···।

প্রভাত দস্তিদারের কানে অগ্নি শলাকা স্পর্শ করিল—'মিসেস্ দস্তিদারের প্রাণের কথা এই স্বাধীনতা''—এই কথাগুলি। তার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে মণ্ডপের একটা কাঠের খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে বলিল তরুণী পরস্ত্রীকে উস্কানি দিয়ে মাথা খায়···কি অসভ্য এই সব নেতা!

কল্পনা দস্তিদারের কানে বিদ্যুৎ স্পর্শ করিল—'মিসেস দস্তিদারের প্রাণের কথা এই স্বাধীনতা' কথাগুলি। সে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। মনে মনে বলিল—মধ্যযুগীয়দের আবেষ্টনীতে কূপমণ্ডুক হয়ে থাকা তার পক্ষে পোষাবে না!

...   .

মিসেস্ কল্পনা দস্তিদার এখন কল্পনা দেবী নামে পরিচয় দিতেছে। স্বামীর কাছে কলিকাতায় নয়, এখন হুগলী জেলায় বাপের বাড়িতে বসবাস। প্রয়াগ হইতে নাগপুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ—গানের জন্য তার ডাক পড়ে। অবাধ গতি। কার গানে দেশ মাতিতেছে। তার পিতামহ ছিলেন কলিকাতা মোদপটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এখন তার ভাই কিশোর সেই প্রতিষ্ঠানের মালিক। দিদির বিদ্যাবুদ্ধির উপর কিশোরের অগাধ শ্রদ্ধা। আজ রবিবার, দোকান বন্ধ। কিশোরের একটি সন্তান, পাঁচ বছরের মেয়ে 'নমু'। পিসী আসার পর তার কাছেই থাকে। সেদিন দুপুরবেলা নিজের ঘরে কিশোর স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। পা টিপিয়া তার স্ত্রী ঘরে ঢুকিল, আস্তে আস্তে দরজায় খিল দিল। কিশোর চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল—

দিদি কোথায় ?

নমুকে নিয়ে শুলেন।

আচ্ছা দিদিতো দিল্লী-দিল্লীতে বড় রাজা-গজার মজলিসে বেড়িয়ে বেড়াম —কিন্তু তোমার ঐ একরত্তি নমুকে পেলে সব ভুলে যান কেন বলতো ?

মেয়ে মানুষ, পেটের যে নেই, মায়া যাবে কোথায় ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কিশোর পাশ ফিরিয়া শুইল। অনেকক্ষণ উভয়ে নির্ব্বাক। তার স্ত্রী তার গায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

কি ভাবছো ?

নাঃ...ঘুম আসছে না।

তা নয়, তুমি ভাবছো। কি ভাবছো বলবো ?···ঠাকুর জামাই সন্ধ্যের সময় আসবেন তাই ভাবছো। আমি ঐ চিঠিখানা পড়েছি...।

দেখ, তোমারই বা বিদ্যে কতটুকু আর আমারই বা বিদ্যে কতটুকু ? কিন্তু যাদের বিদ্যেবুদ্ধি আছে তারা কেন এমন হয়!

কিন্তু ঠাকুরজামাই লোক খুব ভাল। ঠাকুরঝি উঁাকে ছেড়ে এলেন পাঁচ বছর···তবু তিনি ঠিক কর্ত্তব্য ক'রে যাচ্ছেন। সেই মাসে মাসে টেড়শো ক'রে পাঠাচ্ছেন। তোমরা ফেরৎ দাও কিন্তু তিনি পাঠাচ্ছেন।

একটি ছোট 'হু' দিয়া কিশোর উঠিয়া পড়িল। সে নীচে নামিয়া গেল। বাহিরের বসিবার ঘরের পাশে অন্দরের সংলগ্ন 'জামাই বাবুর ঘর' নামে পরিচিত ঘরটি কিরূপ ঝাড়ামুছা হইতেছে তাহা দেখিতে গেল। তার বাবা একমাত্র জামাতার বসিবার জন্য কৌচ-চেয়ার-টেবিল দিয়া আধুনিক ধরণে এই ঘরটি সাজাইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে আজ এ ঘরে হাত পড়িয়াছে। উপর হইতে কল্পনা ডাকিল—

কিশোর ?

আজ্ঞে।

এই চিঠির কথা আগে আমাকেই জানানো উচিত ছিল।···দেখ, কেউ যেন আমার খবর নিতে ওপরে না আসে।···আজ আমার কণ্ঠরোধ করেছে সরকার।...রুদ্ধকণ্ঠ বিহঙ্গিনীকে লোকে খাঁচায় ভরে বিদ্রূপ করতে চায়··· অপমান করতে চায়···। কিশোরের মনে অভিমান আসিল। দিদিকে সে ভয় করে। তবু সে ডাকিল—

দিদি, দিদি ?...বাবা বলে গেছেন তিনি আমার বড় ভাই···পাঁচ বছর পরে তিনি আসছেন...আমি কি উঁাকে অপমান কোরবো ?...

খুকীকে কোলে নিয়া কল্পনা উপরে দাঁড়াইয়া ছিল তা ক'কোলে নিয়াই সে ঝড়ের মতো নিজের ঘরে চলিয়া গেল। গিয়া সশব্দে দরজায় খিল দিল। খুকীকে আরও বুকে জাপটিয়া নিয়া মেজের বিছানাটায় আছড়াইয়া পড়িল। এই মেজের বিছানাতেই সে পাঁচ বৎসর কাটাইতেছে। তখন ঘরের মধ্যে যে কিশোরের স্ত্রী ছিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তারপর চোখের ধারা···বুক ফাটা শব্দ। সান্ত্বনা দেয় কে? পালঙ্কের উপর বিছানা করিতেছিল কিশোরের স্ত্রী। সে সেখানে বসিয়াই ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। একটু সামলাইয়া নিয়া কল্পনা বলিল—

"বৌ তুমি এ ঘরে ?···কি করছিলে ?"

"আপনার পালঙে বিছানা পাতছিলাম···ঠাকুরজামাই আসবেন যে।"

খুকীকে নিয়ে তুমি ওঘরে যাও···আমার একটু কাজ আছে।

আ, দিদি ও থাক।…ঐ নীচে গাড়ির শব্দ হোলো…ঠাকুরজামাই এসেছেন, আমি খাবার কোরতে যাই।

নীচে শোনা গেল—আমার কর্ত্তব্য ভেবে আমি এলাম কিশোর।

কিশোর শুধু বলিল—আমাকে সেই ছোট ভাইটিই ভাববেন।

উভয়ে নীচের সেই ঘরে। উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তারপর সেই যে মৌন হইল যেন পাথর নিশ্চল। ঘড়িতে বড় কয়টা সব বাজিয়া গিয়াছে। ছোট টেবিলটার উপর চা-খাবার সব পড়িয়া আছে। প্রভাত-দাদার পোষাক পড়িতে যাইতেছিল। কিশোর বলিল,—পোষাক পড়ছেন যে?

যাই।

এখন তো ট্রেণ নেই, রাত একটা, ভোর সাড়ে পাঁচটায় ট্রেণ, কিছু খান, বাড়ী থেকে এনে দিই।

আবার কি আনবে? এই তো জলখাবার রয়েছে, এরই একটু খাচ্ছি।

কিশোরের চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। প্রভাত বলিতে লাগিল—তুমি শোওগে কিশোর, আমার তো সেই ভোরে যাওয়া।

… … …

কিশোর ঘরে আসিলে তার স্ত্রী বলিল—এতো খাবার কোরলাম।

কিশোর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। তার স্ত্রী আবার বলিল—ঠাকুরঝির কিন্তু ঘরের দোর খোলা আছে। কিশোরের হৃদয় কাটিয়া একটা শব্দ বাহির হইল—ওঃ

* *

ইহার পর দুই বৎসরের অধিক কাটিয়াছে। একদিন কাগজে বাহির হইল—বড় দিনের ছুটিতে বঙ্গীয় মহিলা সম্মেলন। সভানেত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্তা কল্পনা দেবী। স্থান ও সময় পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। উদ্যোক্তৃগণকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি যে তাঁহারা এই প্রসিদ্ধ দেশসেবিকাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদান করিয়াছেন'।

কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ পার্কে সভা বসিয়াছে। সভানেত্রীকে বরণ করিতে উঠিয়া একটি তরুণী বলিলেন—

দেশসেবার নতুন আদর্শ দেখিয়েছেন যিনি, ঘরকন্না, স্বামী, আত্মসুখ এসব কিছুর উপরে দেশমাতার সেবা জীবনের ভেতর যিনি প্রমাণ করেছেন তাঁহাকে শুধু কি আমরা 'মার্টার' ব'লে ক্ষান্ত হবো, বীর ব'লে ক্ষান্ত হবো? না, না। তাঁকে সম্মান কোরতে হবে তাঁর পথকে বরণ কোরে নিয়ে। আমাদের প্রত্যেককে প্রতিজ্ঞা কোরতে হবে তাঁর পথে চ'লতে। মধ্যযুগীয় হিন্দু নারীর সংস্কার তাঁকে বাধা দিতে পারে নি দেশসেবার মহত্ত্বের কাজে। ভারতের মুক্তিকামী সহিদদের মধ্যে তিনি অন্যতম। আজ আমরা তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা অর্ঘ্য দান কোরে ধন্য জ্ঞান করছি। দেশের দাবীর চাপে সরকার এত দিনে তাঁর ওপর থেকে বাক্‌রোধ আদেশ প্রত্যাহার কোরতে বাধ্য হয়েছে। তাঁর বেদীতলে বসে' বাঙলার নারী-সমাজ আজ তাঁর বাণী শোনবার প্রত্যাশা করছে।…

তারপর করতালির মধ্যে কল্পনার অভিভাষণ আরম্ভ হইল। তার বৈধব্য-বেশ। সে বলিল—বন্ধুগণ, কি জন্য আপনারা আজ আমায় এ সম্মান দিলেন আমি তা' বুঝতে পারছি না। আপনারা ভুল কোরেছেন—ভুল বুঝেছেন। আমিও জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটায় ভুল কোরলাম। ভুল ভাঙল যখন, তখন আর উপায় নেই। প্রাণের দেবতাকে উপেক্ষা কোরে…ঘরের বিগ্রহকে বাদ দিয়ে যারা কল্পিত দেশ-বিগ্রহকে বড় কোরে দেখে, তাদের এই দশাই হয়। আপনারা সে কল্পনা-রাজ্যে বেড়াবেন না। প্রাণের রসবস্তু উপচিত হয়…উন্নত হয়…পুষ্ট হয়—বাড়ে, স্বাধীনতার মধ্যে। তাই স্বাধীনতা এতো বড় জিনিষ। সেই স্বাধীনতা পাওয়ার মানে প্রাণকে শুকানো নয়। হিন্দু নারীর প্রাণবস্তু তার স্বামী দেবতা। আমি সেই আদর্শকে উপহাস কোরে আমার রসহীন প্রাণের রুদ্র ভৈরব দীপকের জ্বালা নিয়ে এতদিন ছুটে বেড়িয়েছি রসবস্তুর সন্ধানে। কিন্তু বিফল হয়েছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ আমি আমার প্রাণবস্তু হতে বঞ্চিত। এতো দিনে সত্যই আমার কণ্ঠরোধ হ'ল। আর তো আমার কণ্ঠে আসবে না 'বসন্তের' শিহরণ, 'হিন্দোলের' মোহন গাম্ভীর্য্য, 'শ্রী' রাগের মধুর অনুভূতি।…আমার কণ্ঠ-রোধ হয়েছে…কণ্ঠ-রোধ হয়েছে…।

কল্পনার গলার স্বর ভারি হইয়া গেল। সে আর বলিতে পারিল না—বসিয়া পড়িল। সে বসিতে না বসিতে তরুণী সম্প্রদায় দলে দলে সভা ত্যাগ করিল। পরদিন রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলি চাপা ভাষায় সভানেত্রীর প্রশংসাই করিল। একজন বলিল—'কল্পনা দেবীর জীবন-কথা নয়া-যুগে একটি শুভ স্থাপন করিল পুরাতনের অবহেলিত অতি সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর'। আর একজন বলিল—'বাঁধ ছাড়িলে বান হয়, বৈধব্যের আঘাতে এত কঠিন পাষাণের বাঁধও ভাঙিল'। জাতীয়তাবাদী একখানি পত্রিকা বলিল—'বঙ্গীয় নারী-যজ্ঞ পণ্ড—সভানেত্রীর ভাষণে অসংগতি—'।

তোমারে ঘিরিয়া

রেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল'

তোমারে ঘিরিয়া যত সুর যত গান
চিরদিন জেগে থাকে;
সে সুর-লহরী গুঞ্জরি' ওঠে—
সে গান পাখীর ডাকে।

তবু জেগে রয় অকথিত বাণী,
অগীত ছন্দ মন জানাজানি,
নীহারিকা-পথে ক্ষীণ সুরখানি
নয়নে নিদালী আঁকে।

চেনা ও অচেনা
এই নিয়ে খেলি খেলা,
মানে অভিমানে
কেটে যায় সারা বেলা।

কি কহিতে চাই
জানি না তাহার ভাষা,
কি লভিতে চাই—
মেটে না পাওয়ার আশা।

বুক জুড়ে শুধু বাঁধিয়াছে যেন বাসা
ভালবাসা কোন্ ক'কে।

কোন্ ফুলে

কোন্ ফুলে তোর সাজাই চরণ
কি দেব' তাই বল?
দেবতা নে কাল্ ধুতুরা
নে এই বিল্বদল।

ধূর্জ্জটী তোর জটার তলে
মন্দাকিনীর স্রোত চলে,
আনবো কি সেই গঙ্গাবারি,
না, মোর নয়ন জল?

বুকের শিলায় ঘষা আমার
দুঃখেরই চন্দন,
ভুজঙ্গ যাঁর অঙ্গে তাঁরে
কি দেই আভরণ?

কটি-তটে লোটে যাঁহার
বন্য বাঘের ছাল,
প্রলয়কালের নৃত্যতালে
নিত্য চরণ-তাল;

কণ্ঠে যাঁহার সঞ্চিত বিষ
তাঁর চরণে তুই সঁপে দিস্
জন্ম-মরণ, মন্দ ভাল,
জন্ম জীবন জল!!

ললিত-কলা

শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী

নয়*

মহর্ষি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে একটি সূত্র দৃষ্ট হয়—"নিত্যং ক্রীড়াজীবিকয়োঃ" (পাঃ ২।২।১৭)। পরবর্ত্তী কালের ব্যাখ্যাকারগণ ক্রীড়ার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—'উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা' —যে-খেলায় উদ্দালক-পুষ্প ভাঙ্গিয়া উহার সাহায্যে আভরণ-নির্ম্মাণ ও লোফালুফি ইত্যাদি নানারূপ কৌশল প্রদর্শিত হয়। আর জীবিকার উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে—'দন্তলেখক'। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তৎকালে এক শ্রেণীর লোক দন্তের উপর লিখিয়া বা দন্ত চিত্রিত করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। কাশিকা-বৃত্তিতে 'দন্তলেখক' ব্যতীত 'নখলেখক'—এই অতিরিক্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। দন্তের ন্যায় নখের উপর লিখিবার বা নখগুলি নানা বর্ণে রঞ্জিত ও চিত্র-বিচিত্র করিবার প্রথাও নিশ্চয়ই তৎকালে ছিল—আর উহারই অভ্যাসে এক এক শ্রেণীর লোক জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। এখনও কোন কোন সম্প্রদায় মেহেদী-পাতার রসে অথবা আলতায় পা ও হাতের আঙ্গুলের ডগা ও নখগুলি রঞ্জিত করিয়া থাকেন। আর অতি-আধুনিক যুগে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে এ দেশের নারী-সমাজেও নানারূপ nail-polish ইত্যাদি জাতীয় পদার্থের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

৯। মণি-ভূমিকা-কর্ম্ম—যশোধর বলিয়াছেন—'মণিভূমিকা'-শব্দের অর্থ 'কৃতকুট্টিমা ভূমি'১। গ্রীষ্মকালে শয়ন ও পান-গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে মরকতাদি বিভিন্ন মণি-খচিত মেঝে নির্ম্মাণ—ইহাই এই কলাটির বিষয়।২

মণি-বসান মেঝে গ্রীষ্মকালেই আরাম-দায়ক। খালি মেঝের উপর গ্রীষ্মকালে শোয়া-বসা ও পান-ভোজন করিতে ভাল লাগে। সেই মেঝের উপর যদি আবার স্ফটিক, মরকত, পদ্মরাগ ইত্যাদি মণি বসান থাকে, তাহা হইলে সেই সকল শৈত্য-গুণ-কারক মণির প্রভাবে মেঝে আরও শীতল ও সুখপ্রদ হইয়া উঠে। নানাবর্ণের পাথরের মেঝে, মোজাইকের মেঝে, চীনা-মাটির (পোর্সিলেন) টালি-বসান মেঝে, নানা রঙের পালিশ-করা সিমেণ্টের মেঝে, দেওয়াল ইত্যাদি আজকাল খুবই প্রচলিত। কিছুদিন পূর্ব্বে সিমেণ্টের উপর নানা রঙের কাঁচের টুকরা লতা-পাতা-পাখী ইত্যাদির আকারে বসান হইত। কলিকাতার জৈন মন্দিরগুলি (পরেশনাথের মন্দির ইত্যাদি) ও মারবাড়ীদিগের অনেকের বাড়ী ইহার দৃষ্টান্ত। আরও কিছুদিন পূর্ব্বের প্রথা ছিল—মার্ব্বল পাথরের সহিত সত্য সত্য মণি-মুক্তা-হীরকাদি বসান। আগ্রার তাজমহল এই রূপেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন অবশ্য সে সকল আসল মণি-মুক্তা তাজমহলের মেঝেয় বা দেওয়ালে আর বসান নাই। আসল মণি-মাণিক্য-মুক্তাগুলি উঠাইয়া লইয়া তাহাদিগের স্থানে ঝুটা পাথর আর কাঁচ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেকালের অনেক হিন্দু দেবমন্দিরেও এ প্রকার মণি-মুক্তার কাজ ছিল। বর্ব্বরের অত্যাচারে ও বিলুণ্ঠনে ও লোভীর লোলুপতায়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কতকটা কালের করাল প্রভাবেও আজ আর সে সকলের চিহ্নমাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না। কবিরাজ রাজশেখর বলিয়াছেন যে—সে কালের রাজা-কবিগণের সভায় এক হস্ত উচ্চ মণি-মুক্তা বসান একটি করিয়া বেদী থাকিত। তাহার উপর রাজসিংহাসন স্থাপিত হইত। উহার উপর রাজা উপবেশন করিতেন। সভায় কাব্যের আলোচনা ও বিচার হইত—উপযুক্ত কবিগণ সম্মান ও পুরস্কার লাভ করিতেন। মহাকবি কালিদাস মেঘদূতে অলকাপুরীস্থিত বাপীর সোপানপথ মরকত-খচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।৩

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"ঘরের মেঝে মণিময় করিবার অর্থাৎ মুক্তা বা মরকতাদি মণি-দ্বারা শীতল মেঝে তৈয়ার করিবার শিল্প,—মর্ম্মর প্রস্তরের মেঝে সকলেই দেখিয়াছেন—সেই দৃষ্টান্তে মণির মেঝে বুঝিয়া লইতে হইবে"।৫

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—"মণি অর্থাৎ প্রস্তর। তদ্দ্বারা চত্বর, পিণ্ডিকা, প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করণ"।৫

৺সমাজপতি মহাশয়ের মতে—"প্রস্তর হইতে মূর্ত্তি প্রভৃতির নির্ম্মাণ, ভাস্করবিদ্যা"।৬

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—"গ্রীষ্মকালে শয়ন, উপবেশন ও পান-ভোজনাদির জন্য চত্বরকে যে মরকতাদি মণিদ্বারা সুশোভিত করা হয়, তাহাকে মণিভূমিকা-কর্ম্ম বলে। বিবিধ-বর্ণের প্রস্তরখণ্ড দ্বারা পুষ্প, ফল ও পত্রাদির অনুকল্প প্রস্তুত করত চত্বরে সন্নিবেশ করা"।৭

১০। শয়ন-রচনা—টীকাকার বলিয়াছেন—যিনি শয়ন করিবেন, শীত-গ্রীষ্মাদি কাল-ভেদানুসারে তাঁহার অনুরাগ-বিরাগ, উদাসীনতা ইত্যাদি মনোগত অভিপ্রায়ানুযায়ী ও আহারের পরিণাম বশতঃ শয্যা-রচনার কৌশল।

১কুট্টিম—বাঁধান মেঝে। এখন যেরূপ সিমেণ্ট, মোজাইক বা মার্ব্বল প্রস্তর দিয়া মেঝে বাঁধান হয়, তৎকালে সেইরূপ মরকতাদি মণি-দ্বারা চত্বর বা ঘরের মেঝে বাঁধান হইত। গ্রীষ্মকালে উহাতে শোয়া-বসা-পান-ভোজনের সময় প্রচুর আরাম পাওয়া যাইত।

২"মণিভূমিকা কৃতকুট্টিমা ভূমিঃ। গ্রীষ্মে শয়নাপানকার্থং তস্যাং মরকতাদিভেদেন করণম্"—জয়মঙ্গলা।

৩"মধ্যেসভং চতুস্তম্ভান্তরা হস্তমাত্রোৎসেধা সমণিভূমিকা বেদিকা"—কাব্যমীমাংসা, রাজশেখরকৃতা, দশম অধ্যায় (রাজচর্য্যা কবিচর্য্যা), বরোদা, ২য় সং, পৃঃ ৫৪।

"বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা"—মেঘদূত।

৪কামসূত্র, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬৪।

৫শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬। বেদান্তবাগীশ মহাশয় এ স্থলে 'মণি' অর্থে মূল্যবান্ প্রস্তর বা রত্ন না বুঝিয়া মর্ম্মরাদি সকল প্রকার প্রস্তরই বুঝিয়াছেন। আর 'ভূমি' অর্থে কেবল 'মেঝে' না ধরিয়া প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি অর্থও করিয়াছেন। কিন্তু টীকাকারের অর্থ যে অন্যরূপ তাহা আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। এ মতে 'মণি' অর্থে মরকতাদি ও 'ভূমি' অর্থে বাঁধান মেঝে (কুট্টিম)।

৬কল্কিপুরাণ, পৃঃ ২৩। ইনি বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুগামী ইহা স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন।

৭কৌমুদী, পৃঃ ২৮

টীকাকারের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে—দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে শয্যা-রচনার কৌশল ভিন্ন ভিন্ন রূপ হওয়া প্রয়োজন। দেশের আবহাওয়া ও প্রথা, সময়ের গতিক ও লোকের রুচি ভেদেই বিছানা নানাভাবে পাতা হইয়া থাকে। আর যিনি শয়ন করিবেন, তাঁহার মনোভাবের উপরও বিছানা পাতা অনেকটা নির্ভর করে। তাহা ছাড়া, আহারের পরিণাম বুঝিয়াও শয্যা রচনা করা উচিত।

কোন দেশের আবহাওয়া শীতল, কোন দেশের নাতিশীতোষ্ণ, কোন দেশের উষ্ণ, আবার কোন দেশের বা অত্যুষ্ণ। এ কারণে দেশভেদে শয্যা ভিন্নরূপ হইতে বাধ্য। শীতপ্রধান দেশে লেপ-তোষকের বাহুল্য, নাতিশীতোষ্ণে সাধারণ বিছানা, উষ্ণদেশে শীতলপাটি, আবার গ্রীষ্মবহুল দেশে খালি মেঝের উপরই শয়ন করার প্রথা দৃষ্ট হয়। আবার যে দেশ গ্রীষ্মকালে উষ্ণ, শীতকালে শীতল, সে দেশে শীত-বসন্ত-গ্রীষ্ম ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ শয্যা রচনা করিতে হয়। শীতের সময় লেপ, গ্রীষ্মে শীতলপাটি আর বসন্তে সাধারণ ভাবের বিছানা পাতিতে হয়। আবার কোন দেশের লোক পালঙ্কের নরম বিছানা পছন্দ করেন, কোন দেশে বা সাধারণ তুলার বিছানা, কোন দেশে বা শক্ত কাঠের উপরই লোকেরা শয়নে অভ্যস্ত। আবার ব্যক্তিগত ভাবেও দেখা যায় যে—কোন ব্যক্তি দেড়হাত পুরু নরম গদীতে না শুইলে ঘুমাইতে পারেন না, আবার কেহ বা ফুটপাথে সিমেন্টের উপর বা লোহার বেঞ্চে শুইয়াও অঘোরে নিদ্রা যাইতে পারেন। কেহ দুগ্ধফেননিভ সুকোমল পুষ্পাচ্ছাদিত শয্যায় শয়নে আরাম পাইয়া থাকেন। কেহ বা পুষ্পগন্ধের মধ্যে শুইয়া নিদ্রা যাইতে পারেন না—মৎস্যাদি আমিষগন্ধ ব্যতীত তাঁহার নয়নে নিদ্রা আসে না। আবার দেখুন, যাঁহার মন বেশ প্রফুল্ল আছে, তাঁহার যেরূপ শয্যায় প্রীতির উদ্রেক হইবে, কোন কারণে যাঁহার মন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেরূপ বিছানা তাঁহার কখনও পছন্দ হইবে না—কিছুতেই হইতেও পারে না। আবার যিনি উদাসীন, তাঁহার নিকট সকল প্রকার শয্যাই সমান। আরও একটি কথা,—যদি গুরুপাক আহার করা হইয়া থাকে—প্রচুর পরিমাণে মৎস্য-মাংস-লুচি-পোলাও ইত্যাদি খাওয়া হয়—তাহা হইলে পুরু বিছানায় শুইলে যেন শয্যাকণ্টক উপস্থিত হয়। সে ক্ষেত্রে বরং ঠাণ্ডা মেঝেয় শুইলে গাত্রদাহ হয় না। পক্ষান্তরে, যিনি পরিমিত আহার করিয়া শয়ন করেন, তাঁহার পুরু বিছানায় বেশ সহজে নিদ্রা আসে। উত্তমরূপে মনোমত করিয়া বিছানা পাতিবার কৌশল সত্যই একটি বিশিষ্ট কলা। মনের মত বিছানায় শুইলে যে আরাম পাওয়া যায়, তাহাতে মনটি প্রফুল্ল থাকায় বেশ সুনিদ্রা হইয়া থাকে। শরীরের ক্লান্তি দূর হইয়া দেহ মন দুইই বেশ ঝরঝরে হয় ও পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই কারণে বিছানা পাতিবার কৌশল কলা-হিসাবে আমাদিগের সকলেরই জানা থাকা উচিত। টীকাকার এই কথাগুলিই সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন।৮

৮"শয়নীয়স্য কালাপেক্ষয়া রক্তবিরক্তমধ্যস্থাভিপ্রায়াদাহার-পরিণতিবশাচ্চ রচনম্"—জয়মঙ্গলা।

কাহারও কাহারও মতে—ইহার মধ্যে খাট-পালঙ্ক তৈয়ারী করার কৌশলও অন্তর্ভুক্ত।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"অনুরক্ত, বিরক্ত ও উদাসীন পাত্র ভেদে ও কাল ভেদে বিভিন্ন প্রকার শয্যা রচনা বিধান"।"৯

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—"খাট, পালঙ্ক, তক্তাপোষ প্রভৃতি শয়নীয় দ্রব্য নির্ম্মাণকরণ"।১০

৺সমাজপতি মহাশয় বেদান্তবাগীশ মহাশয়েরই অনুগামী—"খট্টা প্রভৃতি শয়নের উপকরণ নির্ম্মাণ করিবার ব্যবসায়"।১১

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—শয়নকারীর তৎকালিক মনের ভাব বুঝিয়া যে শয্যা রচনা করা হয়, তাহা। শীত গ্রীষ্মাদি ভেদে ও আহারের তারতম্যানুসারে রক্ত, বিরক্ত ও মধ্যস্থ এই এই তিনপ্রকার শয্যা রচনা কর্ম্ম। (এগুলির ঠিক অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারি নাই)।"১২

১১। উদক-বাদ্য—টীকাকার বলিয়াছেন—জলে মুরজাদি যন্ত্রের বাদ্যের ন্যায় বাদ্য সৃষ্টি করা।১৩

জলের উপর করতল-পৃষ্ঠের আঘাত করিয়া মৃদঙ্গ-মুরজাদি ঢক্কা-জাতীয় বাজনার বোলের মত আওয়াজ বাহির করিবার কৌশল। অথবা নানা আকারের জলপাত্র জলে ভরিয়া তাহাদিগের গাত্রে কৌশলে আঘাত-পূর্ব্বক নানারূপ সুমিষ্ট স্বর বাহির করার কৌশল। বর্ত্তমানে ইহারই নাম 'জলতরঙ্গ'। সাধারণত ধারণা আছে যে, ফ্রাঙ্কলিন্ নামক কোন একজন বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞ জলতরঙ্গের আবিষ্কারক। কিন্তু এই কলাটির বিবরণ পাঠ করিলে সে ধারণা যে ভ্রমাত্মক তাহা বুঝা যায়।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"জলে করতাড়নাদি করিয়া তাহা হইতে মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি উৎপাদন"।১৪

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—"জলে কোন পাত্র বাদন কিংবা পাত্রে জল রাখিয়া নানা ভাগে বাদ্য করণ। পাঠকগণ বোধ হয় জলতরঙ্গ নামক উদকবাদ্য অবগত আছেন"।১৫

৺সমাজপতি মহাশয়ের মতে—"জলে বাদ্য বাদনের কৌশল"।১৬

"শীতগ্রীষ্মাদি কালভেদের অনুসারে রক্ত (অনুরাগ-সম্পন্ন) বিরক্ত (বিরাগ-সম্পন্ন—ক্রুদ্ধ) ও মধ্যম (অনুরাগ বা বিরাগহীন—উদাসীন) অভিপ্রায় বশতঃ ও আহারের পরিণাম বুঝিয়া শয্যা রচনা করা, অর্থাৎ শয়নকারীর তৎকালিক মনের ভাব বুঝিয়া তদনুরূপ শয্যা প্রস্তুত করা"—৺মহেশ পালের সংস্করণ।

৯ বঙ্গবাসী সং, কামসূত্র, পৃঃ ৬৪

১০ শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, পৃঃ ৬

১১ কল্কিপুরাণ, পৃঃ ২৩

১২ কৌমুদী, পৃঃ ২৮। আমরা সবিস্তার টীকাকারের আশয় বিবৃত করিয়াছি।

১৩ "উদকে মৃদঙ্গবদ্বাদ্যম্"—জয়মঙ্গলা।

১৪ বঙ্গবাসী সং, কামসূত্র, পৃঃ ৬৪

১৫ শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, পৃঃ ৬

১৬ কল্কিপুরাণ, পৃঃ ২৩

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—"জলতরঙ্গাদি বাদ্য অথবা জলে মৃদঙ্গাদি বাদ্যের ন্যায় বাদ্য করা" ।১৭

১২। উদকাঘাত—হস্ত ও যন্ত্রদ্বারা উৎক্ষিপ্ত জলদ্বারা তাড়ন—ইহাই টীকাকারের মত ।১৮

পিচকারী ব্যবহার না করিয়া কেবল দুইটি করতলের সাহায্যে অপরের গাত্রে জল ছিটাইবার কৌশল। সাধারণতঃ, জলাশয়ের স্নানের সময় জলক্রীড়ার অঙ্গরূপে এই কলাটির প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। শুধু দুইটি হাতের সাহায্যে এমন কায়দায় জল ছুড়িতে পারা যায় যে, সেই জলধারা পিচকারী হইতে নির্গত জলধারার মত ইচ্ছামত উপরে নিম্নে সম্মুখে বা পশ্চাতে যে দিকে ইচ্ছা পড়িতে পারে। এই ছিটান জলধারার স্থিরতা বা স্থায়িত্ব ও বেগ যত অধিক হইবে, বুঝা যাইবে যে কলাটি ততই সুন্দররূপে আয়ত্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে—নানারূপ কায়দায় পিচকারী দেওয়া ও জলের ফোয়ারা তৈয়ারী করাও এই কলার অন্তর্গত। মতান্তরে, 'জলস্তম্ভ-বিদ্যা'ও ইহার অঙ্গ।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"করতলদ্বয় পিচকারীর ন্যায় করিয়া তাহার দ্বারা অন্যের গাত্রে জলক্ষেপ। এই নিক্ষিপ্ত জলধারার স্থিরলক্ষ্যতা বেগাধিক্য বা দূরগামিত্বের তারতম্যে এই শিক্ষার উৎকর্ষ অপকর্ষ স্থির হয়" ।১৯

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—"প্রাচীন পুস্তকে উদকঘাত শব্দের 'জলস্তম্ভ-বিদ্যা" এইরূপ অর্থ দেখা যায়। মহাভারতে লেখা আছে, দুর্যোধন জলস্তম্ভ-বিদ্যা জানিতেন, তদ্বলে তিনি দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন উদকঘাত শব্দের অন্য কোন অর্থ আমরা জানি না। জলমগ্ন জাহাজের বস্তু উত্তোলনকারী ডুবুরিরাই এক্ষণে জলস্তম্ভ-বিদ্যার অনুকরণ করিয়া থাকে মাত্র" ।২০

৺সমাজপতি মহাশয় বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র করিয়াছেন—"মহাভারতে দুর্যোধন জলস্তম্ভে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, কথিত আছে, ইহা সেই জলস্তম্ভ রচনার কৌশল, প্রাচীন পুস্তকে এইরূপ বর্ণিত হয়" ।২১

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—"হস্ত ও যন্ত্রদ্বারা উৎক্ষিপ্তাবক্ষিপ্ত জলদ্বারা তাড়ন" ।২২

৺মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণের অনুবাদে দৃষ্ট হয়—"হস্ত ও যন্ত্রদ্বারা উৎক্ষিপ্ত ও অবক্ষিপ্ত উদকদ্বারা তাড়ন। (ইহাকে ক্বচিৎ জলস্তম্ভ নামে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সন্তরণ দেওয়া ও জলোন্মজ্জনাদি বিষয়ে পটুতা লাভ করা "২৩

১৭ কৌমুদী, পৃঃ ২৮

১৮ "হস্তযন্ত্রমুক্তৈরুদকৈস্তাড়নম্। তদুভয়ং জলক্রীড়াঙ্গম্" —জয়মঙ্গলা।

১৯ বঙ্গবাসী সং কামসূত্র, পৃঃ ৬৪

২০ শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, পৃঃ ৬

২১ কল্কিপুরাণ, পৃঃ ২৩

২২ কৌমুদী, পৃঃ ২৮

২৩ কামসূত্র, ৺মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণ, পৃঃ ৮৮, ৮৯

১৩। চিত্র যোগ—'চিত্র অর্থে নানাপ্রকার। যোগ—উপায়। নানা ব্যাখ্যাতা নানা ভাবে এই কলাটির অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন। টীকাকার যশোধরেন্দ্র বলিয়াছেন—নানা প্রকারে পরের দৌর্ভাগ্য সম্পাদন, একেন্দ্রিয়-পলিতীকরণ ইত্যাদি ব্যাপার। ঈর্ষ্যাবশে ও পরকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল উপায় প্রযুক্ত হইত। এই সকল বিচিত্র যোগের কথা মহর্ষি 'ঔপনিষদিক' অধিকরণে বলিবেন বলিয়া টীকাকার উপসংহার করিয়াছেন। 'কৌচুমার-যোগে'র অন্তর্ভুক্ত এইগুলি হইতেই পারে না; কারণ কুচুমার এগুলির উল্লেখ করেন নাই আর একারণেই ইহারা পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে।২৪

প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় যাহাকে বলে 'ঔষধ করা' বা 'গুণ করা'—এ কলাটি তাহারই প্রাচীন রূপ মাত্র। কোন একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক পতিপ্রেমে বঞ্চিতা। অথচ তাহার নবীনা সপত্নী পতির প্রেমে ধন্যা। ঈর্ষ্যান্বিতা অধিকবয়স্কা সপত্নী এমন ঔষধ প্রয়োগ করিল, অথবা এরূপ তুক্-তাক্ মন্ত্র-তন্ত্রাদির প্রয়োগ করিল যে—পতিসুখে সুখিনী তরুণী সুন্দরী সপত্নীও অকস্মাৎ পতির বিষ-নয়নে পড়িল—পতি আর তাহাকে ভালবাসিতে লাগিল না—পতির সহিত তাহার বিচ্ছেদ সংঘটিত হইল।২৫ এইরূপ দুর্ভাগ্যের উদয় করিয়া দেওয়ার নাম 'দৌর্ভাগ্যকরণ'। আর 'একেন্দ্রিয়-পলিতীকরণ' হইতেছে—একটি ইন্দ্রিয়ের হানি ঘটান, যথা অন্ধ করিয়া দেওয়া, পাগল করিয়া দেওয়া, পুরুষত্বের হানি করা। এগুলি প্রায় ঔষধ-প্রয়োগেই ঘটিয়া থাকে।২৬ টীকাকার বলিয়াছেন—ঈর্ষ্যাবশে, অথবা পরকে প্রতারিত বা অন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল 'ঔষধ করা' হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া কাল চুল সাদা করা, সাদা চুল কলপ ইত্যাদি দিয়া কাল করা, তামাকে সোনা করা, অদৃশ্য হইয়া যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপার—যাহাতে পরের চক্ষুতে ধাঁধা লাগে—সে সকলও ইহার অন্তর্গত।২৭ নানারূপ দ্রব্যগুণে এ সকল কার্য্য সাধিত হয়। কামসূত্রের 'ঔপনিষদিক' অধিকরণে (৭ম অধিকরণে) চিত্রযোগের অতি বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে টীকাকার কুচুমারের প্রসঙ্গ অবতারিত করিয়াছেন। 'কুচুমার' নামক মহর্ষি কামশাস্ত্রের একজন প্রাচীন একদেশী আচার্য্য—বাৎস্যায়নেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনিই প্রথম ঔপনিষদিক অধিকরণের উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে

২৪ "নানাপ্রকারদৌর্ভাগ্যৈকেন্দ্রিয়পলিতীকরণাদয়ঃ, ঈর্ষ্যয়া পরাতিসন্ধানার্থাঃ। তানৌপনিষদিকে বক্ষ্যতি। এতে চ কৌচুমারযোগেষু নান্তর্ভবন্তীতি পৃথগুক্তাঃ, কুচুমারেণ তেষামনুক্তত্বাৎ" ।—জয়মঙ্গলা।

২৫ এই প্রকার ব্যাপারের নামই 'গুণ' করা।

২৬ এই সকল ব্যাপারের নাম 'ঔষধ' করা। প্রায় গুণ করা বা ঔষধ করার মূল হেতু—ঈর্ষ্যা।

২৭ এইরূপ ব্যাপারের নাম 'পরাতিসন্ধান' বা পরের চোখে ধূলা দেওয়া—ধাঁধা লাগান। এইগুলি ঈর্ষ্যামূলক নাও হইতে পারে। ভেল্কি দেখানই ইহাদের উদ্দেশ্য।

সকল ঔষধের কথা বলেন নাই, সেইগুলিই 'চিত্রযোগে'র অন্তর্গত। কুচুমার-কথিত যোগগুলি ২১ সংখ্যক কলায় 'কৌচুমার-যোগ' নামে আখ্যাত হইবে।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"বিবিধ প্রকার মন্ত্র-তন্ত্র এবং ঔষধ যাহার দ্বারা যুবাকে অঙ্গনাসঙ্গে অশক্ত করা যায় এবং কৃষ্ণ কেশকে শুক্ল কেশে পরিণত করা যায় ইত্যাদি ঔপনিষদিক অধিকরণে বিবৃত হইবে, কিন্তু কুচুমার-যোগ মধ্যে এসকল অন্তর্ভুর্ক্ত হয় না" ।২৮

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—"অদ্ভুত কার্য্য প্রদর্শন। ইহা একপ্রকার বাজী" ।২৯

২৮ বঙ্গবাসী সং কামসূত্র, পৃঃ ৬৪

২৯ শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, পৃঃ ৬

৺সমাজপতি মহাশয়ের মতে—"বোধ হয় ভোজবাজী" ।৩০

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—"প্রচলিত ভাষায় ইহাকে ঔষধ করা বলে…এটি কামশাস্ত্রের প্রয়োগ-বিশেষ" ।৩১

৩০ কল্কিপুরাণ, পৃঃ ২৩

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও সমাজপতি মহাশয় যে কামসূত্রের টীকা দেখেন নাই—তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহাদিগের মতে—চিত্রযোগ নানারূপ অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন—ভেল্‌কি, ভোজবাজী, ভানুমতীর খেল ইত্যাদি। কেমিক্যালের সাহায্যে যে সকল ম্যাজিক দেখান হয়, সেগুলিও এই কলাটির অন্তর্গত হইতে পারে।

৩১ কৌমুদী, পৃঃ ৩১

[ক্রমশঃ

মর্ম্ম ও কর্ম্ম (উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

নয়

চিকিৎসায় যা কিছু সম্ভব, করা হ'ল। অকাতরে অর্থব্যয় ক'রে অক্লান্ত পরিশ্রম ও শুশ্রূষা ক'রে বিকাশ হরিনাথ বাবুর সেবা ক'রলে কিন্তু পাঁচ দিন কোনও মতে টিকে থেকে শেষে হরিনাথ বাবু মারা গেলেন।

প্রথম অজ্ঞান হওয়ার পর ক্রমে ব্যাধি একটু উপশম হবার রকম হ'য়েছিল, কিন্তু জ্ঞান আর তাঁর হ'ল না, কাউকে একটিও কথা ব'লে যাবার অবসর তিনি পেলেন না।

শ্রাদ্ধ হ'য়ে যাবার পর ক্রমে তাঁর টাকা-কড়ির খবরাখবর করা হ'লে যা' দেখা গেল তাতে সবাই মাথায় হাত দিয়ে ব'সলো।

মেসোম'শায় নিজে কিছু ব'লে যেতে পারেন নি। তাঁর কাগজপত্র ঘেঁটে এবং তাঁর মুহুরীর কাছে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, তাঁর মক্কেলদের কাছে তাঁর পাওনা ছিল পাঁচ ছ' হাজার, কিন্তু অন্য মক্কেলদের তাঁর কাছে পাওনাও প্রায় সেই পরিমাণ। লাইফ ইন্সিওরেন্সে তাঁর পাওনা হবে মাত্র হাজার আষ্টেক। বিকাশ সব চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেল এই দেখে যে, হরিনাথ বাবু বিস্তর দেনা ক'রেছেন। তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স ছিল কিন্তু তার কতক তিনি অল্প টাকায় পেড আপ্ ক'রেছেন আর বাকীগুলি থেকে ধার ক'রেছেন এত যে তা' থেকে পাওয়া যাবে মাত্র আট হাজার টাকা। তা ছাড়া বাইরেও তাঁর দেনা দেখা গেল বিস্তর। মক্কেলদের অনেক টাকা তাঁর হাতে আসতো, তার হিসাব-নিকাশ ক'রে দেখা গেল যে তা' থেকেও তিনি বিস্তর ধার নিয়েছেন। তা' ছাড়া মহাজনের কাছেও টাকা ধার ক'রেছেন। এ সব দেনা হ'য়েছে দুই বৎসরে।

সমস্ত ব্যাপারটা বিকাশের চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। এ দুই বৎসর হরিনাথ বাবুর আয় ক্রমাগত কমে এসেছে। সঞ্চয় তিনি কোনও দিন করেন নি, যখন যা পেয়েছেন হাত খুলে খরচ ক'রেছেন—অর্থাৎ খরচ ক'রতে দিয়েছেন অন্নপূর্ণা দেবীকে। আয় যখন কমে গেল তখন অন্নপূর্ণার ব্যয়ের পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে কমেনি, ফল কথা আয় কমবার খবরও তিনি জানতেন না। তখনও চাইবা মাত্র বা না চাইতেই মেসোম'শায় তাঁকে টাকা দিতেন ঠিক আগের মতই। আর তিনিও খরচ ক'রতেন অকুণ্ঠিত প্রাচুর্য্যের সহিত।

হরিনাথ মূর্খ ছিলেন না। তিনি জানতেন যে, উপার্জ্জন থেকে এই ব্যয়ভার বহন করবার শক্তি তাঁর নেই। কিন্তু অন্নপূর্ণাকে তিনি জানতেন—জানতেন যে, অন্নপূর্ণার অযাচিত-দান ক্ষুণ্ণ ক'রলে তাঁর প্রাণে ব্যথা লাগবে। অভাবের নিঃশ্বাস মাত্র তাঁর গায় লাগলে তাঁর যে দুঃখ হবে তা' নিবারণ করবার একটা দুর্দ্ধর্ষ প্রতিজ্ঞা নিয়ে অভাব ও আগামী দুর্ভাগ্যের সমস্ত আঘাত হরিনাথ পেতে নিয়েছিলেন নিজের বুকে, ভবিষ্যতের দিকে চাইতে সাহস করেন নি, বর্ত্তমানে এ বিপদ কিসে ঠেকান যায় তাই হ'য়েছিল তাঁর এক চিন্তা।

এই সব কথা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো বিকাশের চিত্তে। এখন সে বুঝতে পারলো কেন হরিনাথ একলা অন্ধকার ঘরে ব'সে থাকতেন সন্ধ্যা বেলায়।

ভারী দুঃখ হ'ল তার—আগে কেন সে এ কথা বোঝে নি। তবে হয় তো সে তার উপার্জ্জনের ভরসা দিয়ে মেসোম'শায়ের দুশ্চিন্তার ব্যথা কমাতে পারতো। চাই কি আরও দুঃসাহসিক চেষ্টা ক'রে এত উপার্জ্জন ক'রে তাঁকে দিতে পারতো যাতে তাঁর জীবন হয়তো এত শীঘ্র নষ্ট হ'ত না।

যা' হ'ক, মোটের উপর দেখা গেল, সব দেনা-পত্তর দিয়ে থুয়ে হরিনাথের রাঁচীর বাড়ীখানা থাকে, আর থাকে কিছু ভূসম্পত্তি,—দেশে ও রাঁচীতে যার পরিচয় বা পরিমাণ বিকাশ কিছুই জানতে পারলে না। তার খবর জানে শুধু অনন্ত—কিন্তু সে নীরব!

বিকাশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলে মেসোম'শায়ের কিছুই সে ক'রতে পারেনি; কিন্তু যে কঠোর ব্রত নিয়ে তিনি শেষ জীবন ক্ষয় ক'রেছেন তার উদ্‌যাপন যতদূর সাধ্য সে নিজে করবার চেষ্টা ক'রবে। যতদূর তার সাধ্য—অন্নপূর্ণার অন্নাভাব—কোনও কিছুর

অভাব যেন কোনও দিন না হয়, এই হবে তার জীবনব্যাপী সাধনা। মেসোম'শায়ের আশীর্ব্বাদ তার মনে হ'ল, ভরসা হ'ল সেই আশীর্ব্বাদ নিয়ে সে তাঁর পরিবারকে অন্ততঃ আনন্দ দান ক'রতে পারবে।

তাই বিকাশ তার মাসিমাকে বল্লে, "চলুন মাসিমা, আমার সঙ্গে ক'লকাতায় আমার কাছে। মেসোম'শায় গেছেন, আমি আপনাদের সন্তান, অযোগ্য হ'লেও আপনাদের সেবা করবার অধিকার আমার আছে। চলুন।"

মাসিমা কেঁদে বল্লেন, "যাব কোথায় বাবা? খাব কি? কেমন ক'রে চ'লবে সংসার?"

"সে ভার আমার মাসিমা। আপনাদের আশীর্ব্বাদে সে ভার বইবার শক্তি আমার আছে।"

"কিন্তু কেমন ক'রে যাই বল। এত বড় সংসার, এতগুলি আমাকে আশ্রয় ক'রে আছে"—

"ক'লকাতায়ও আপনাকে আশ্রয় ক'রে যারা থাকবার তারা থাকবে, আপনারই সংসারে। আমি বলি এ বাড়ীখানা বেচে ফেলে যে টাকা হবে তাই নিয়ে ক'লকাতায় চলুন, আপনার আশীর্ব্বাদে যাতে আপনার কোনও কষ্ট না হয় সে উপায় আমি ক'রতে পারবো।"

এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে মাসিমার সময় লাগলো। তাঁর এতদিনকার সাধের ঘরবাড়ী ছেড়ে যেতে তাঁর প্রাণ আবার নূতন করে স্বামীর বিরহে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি সম্মত হ'লেন।

কিন্তু বাগড়া দিলে অনন্ত। সে বল্লে, "জ্যেঠাম'শায়ের এত বড় নাম, এতখানি সম্মান—এ বাড়ীখানা বেচে নিঃশেষ ক'রে দিতে সে কিছুতেই দেবে না। এ ওজুহাত যখন বিশেষ টে'কবার সম্ভাবনা রইল না, তখন সে স্বমূর্ত্তি প্রকাশ ক'রে বল্লে, এ বাড়ী তো জ্যেঠাম'শায়ের একার নয়—যৌথ পরিবারের সম্পত্তি, তাতে তার ও বসন্তের অর্দ্ধেক ভাগ, তাদের সম্মতি ছাড়া এটা বেচা হ'তে পাবে না।

কথাটা শুনে মাসিমা সিংহীর মত গর্জ্জে উঠলেন, বল্লেন, "বটে, অংশ আছে ওর। যখন ওর বাপ এসেছিল এখানে, তখন সে ছিল নেংটে ভিখারী। দেশের সম্পত্তি সব লাটে উঠিয়ে তিনি এসেছিলেন দাদার ভাই হ'তে। তাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'রেছি, তার ছেলেপিলেদের মানুষ ক'রেছি—ওকে সব বিষয়ে কর্ত্তা ক'রে রেখেছি—এখন বলে কিনা ওর সম্পত্তি। কাণা-কড়িও পাবে না ও—বেচে ফেল বাড়ীখানা, দেখি ও কি ক'রে। অংশীদার ঘুচিয়ে দাও।"

বিকাশ কিন্তু ঝগড়াটা চাপা দিলে। সে উকীলদের কাছে শুনলে যে, বাড়ীতে তার মাসিমার শুধু জীবন-স্বত্ব। তিনি মারা গেলে পাবে তাঁর দৌহিত্র অমল। মাসিমার দান-বিক্রীর অধিকার নেই, কাজেই তিনি বেচলে বাড়ীর দাম হবে না। তাই বাড়ী বেচবার কথা একেবারে চাপা দিয়ে সে বাড়ী ভাড়া দেবার প্রস্তাব করলে।

অনন্ত বল্লে, "ভাড়া দেওয়া চলবে না। আমার ক'লকাতার জল সইবে না। আমি এখানেই থাকবো।"

বিকাশ এইবার মুখ ফুটে কথা কইলে, বল্লে, "থাকবেন যে খাবেন কি? এতদিন তো একপয়সা রোজগার করলেন না, এখানে চলবে কিসে? বরং ক'লকাতায় গিয়ে একটা রোজগারের চেষ্টা করুন। এখন তো আর মেসোম'শায় নেই যে অঢেল টাকা এনে দেবেন।"

খুব তীব্র দৃষ্টিতে বিকাশের দিকে চেয়ে অনন্ত বল্লে, "কী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। দেড়শো টাকার মাইনের কেরাণী হ'য়ে মাথা কিনে বসেছেন। ফের অমন কথা বল্বি তো তোর মুখ ভেঙে দেবো, জানিস?"

বিকাশের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠলো, সে আত্মসংবরণ করতে পারলে না, ভ্রূকুটি ক'রে অশ্রদ্ধার হাসি হেসে বল্লে, "মুখ ভেঙ্গে দেবেন? পারবেন? সে শক্তি আছে আপনার?"

অনন্ত তেড়ে-ফুঁড়ে গেল বিকাশকে মারতে। তার গাল লক্ষ্য ক'রে অনন্ত যে ঘুসি তুলেছিল, বিকাশ তাকে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে অনন্তের দুই হাত ধরে তাকে প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ফরাসের উপর।

অনন্ত দেখলে, আর অগ্রসর হওয়া বাতুলতা। বিকাশের বলিষ্ঠ বাহুর কাছে তার আস্ফালন শুধু লাঞ্ছনার আমন্ত্রণ। তাই যদিও তার লেগেছিল খুব অল্পই, তবু সে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগলে, যেন বিকাশ তার হাড়গুলি একদম চুরমার ক'রে ভেঙ্গে দিয়েছে।

বিকাশ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। মাসিমার কাছে গিয়ে বল্লে, "থাক গে মাসিমা এবাড়ী, আপনি চলুন।"

দশ

ক'লকাতায় গিয়ে বিকাশ একশো টাকা ভাড়ায় একখানা বাড়ী নিলে। মাসিমাকে আনতে গিয়ে দেখলে যে, তাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়ে এবং নাতি-নাতনী ছাড়াও এলো বসন্ত, গীতা এবং অনন্তের বড় ছেলে। সে ভেবেছিল এরা সব অনন্তের সঙ্গেই থাকবে, কিন্তু না এরা মাসিমাকে ছাড়ে, না মাসিমা ছাড়েন এদের।

মেসোম'শায়ের মৃত্যুর পর আবেগের মুখে বিকাশ মাসিমা ও তাঁর পরিবারের সমস্ত অভাব দূর করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার পর মাথা ঠাণ্ডা হ'তেই এ দায়িত্বের কথা মনে হ'তে তার বুক কেঁপে উঠলো। সে ভাবলে যে, তার পক্ষে এই হাতী পোষার চেষ্টা একটা দুঃসাহসের কাজ। হরিনাথবাবুর পরিবারের স্বচ্ছলতার ভিতর যারা মানুষ, তাদের খুব বেশী কষ্ট সইতে বলতে সে পারবে না। অথচ এই বৃহৎ পরিবার ক'লকাতায় রেখে পালন করবার শক্তি তার নিতান্ত অপ্রচুর। তার স্থায়ী আয় মাসে দেড়শো টাকা। ফাটকায় তার যে দশ হাজার টাকা লাভ হ'য়েছিল তার আট হাজারের বেশী খরচ হ'য়ে গেছে মেসোম'শায়ের চিকিৎসায়, শ্রাদ্ধে আর তাঁর পরিবার ক'লকাতা আনতে। তার হাতে এখন আছে মাত্র হাজার দু'য়েক।

তবু বিকাশ বল্লে, কোনও চিন্তা নেই, একটা উপায় হবেই। তার মনে পড়লো মেসোম'শায়ের শেষ আশীর্ব্বাদ। মনে হ'ল, যে মহাপ্রাণ ধনী পরিজন ও দরিদ্রের সেবায় নিঃস্ব হ'য়ে সংসার

ত্যাগ ক'রে গেছেন, তাঁর আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হবে না, হতে পারে না। তাঁর পরিবারকে অন্ততঃ আনন্দ বিতরণ করবার শক্তি সে পাবে।

ভেবে চিন্তে সে গেল আবার পাটের ফাটকার বাজারে। ব্রোকারের কাছে খবরাখবর নিয়ে জানলে যে বাজার এখন বড় খারাপ, কখন কি হয় বলা যায় না। যতীনবাবু, যিনি তাকে প্রথম এ বাজারে নামান, তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি বললেন, "খবরদার বিকাশবাবু, এখন ছোঁবেন না পাট। একটা প্রকাণ্ড জুয়াখেলা শীগ্‌গির হবে বোধ হচ্ছে। এখন কাজ করতে পারবে শুধু বড় বড় কুমীরেরা—চুণো-পুঁটির ও বাজার থেকে তফাৎ থাকাই ভাল।"

ভড়কে গেল বিকাশ এ খবর শুনে। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে সে সামান্য এক হাজার বেল বেচতে অর্ডার দিয়ে এলো ব্রোকারকে। একটু পরে ব্রোকার বললে, "বেচা হয়েছে।" কি হয় না হয় ভাবতে ভাবতে বিকাশ অফিসে গেল।

আজই তার ছুটি ফুরিয়েছে, আজই সে প্রথম অফিসে এলো। তার যাবার একটু পরেই আফিসের একটা চাপরাশী তার কাছে একখানা কাগজ নিয়ে এলো। সেটা পড়ে বিকাশ লাফিয়ে উঠলো।

তাড়াতাড়ি একটা সই ক'রে দিয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে আবার সে কাগজখানা পড়তে লাগলো।

সে যখন কাজে ভর্ত্তি হয় তখন ছয় মাসের জন্য প্রোবেশনার বা শিক্ষানবীশরূপে তাকে নেওয়া হ'য়েছিল। কথা ছিল যে ছয় মাস পরে তাকে একটা স্থায়ী চুক্তি ক'রে চাকরী দেওয়া হবে। মেসোমশায়ের ব্যাধি ও মৃত্যুর গোলযোগে বিকাশের খেয়াল ছিল না যে তার ছয় মাস পূর্ণ হ'য়ে গেছে এখন তার স্থায়ী চুক্তির জন্য সাহেবের কাছে একটু তদ্বির করা দরকার।

এই কাগজে সে দেখতে পেলো যে তদ্বিরের অভাবে তার কোনও ক্ষতি হয় নি। তাকে আড়াই শো থেকে পাঁচ শো টাকার গ্রেডে পাঁচ বছরের চুক্তিতে নিযুক্ত করা হ'য়েছে।

এ খোস খবরটা মাসিমাকে জানাবার জন্য উৎসাহে অধীর হ'য়ে আফিসের ছুটি হ'তেই সে একখানা ট্যাক্সী ভাড়া ক'রে চ'ড়ে ব'সলো।

চ'লতে চ'লতে তার মনে হ'ল যে এ কনট্রাক্টটা যখন হ'লই তখন মিছামিছি ফাটকার বাজারে কাজটা না ক'রলেই হ'ত! কে জানে কত টাকা লোকসান দিতে হবে তাতে।

তারপর তার উল্লাস হঠাৎ ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে উঠলো তার মেসোমশায়ের কথা ভেবে। যিনি তাঁর এ উন্নতির সংবাদে সব চেয়ে খুসী হ'য়ে তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রতেন তিনি আজ নেই। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে স্মরণ ক'রলে তার রোজগারের দেড় শো টাকা পেয়ে তিনি কি আনন্দ কি কৃতার্থতা দেখিয়েছিলেন। সে তো অবসর পেলো না তাঁর সে আনন্দ বাড়াবার। আর, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে ভাবলে, তার এ উন্নতির সংবাদ নিয়ে সে যদি মেসোম'শায়কে ব'লতে পারতো যে আমার যা কিছু সবই আপনার, তবে কি মেসোমশায় আপনাকে দুশ্চিন্তায় অমন ক্ষীণ করতে পারতেন? না অত শীঘ্র মারা যেতেন?

তার সেই দেড় শো টাকা মেসোমশায় সত্যই খরচ করেন নি। তাঁর ড্রয়ার খুঁজে বিকাশ দেখতে পেয়েছিল একখানা সুদৃশ্য এলবামে তিনি এঁটে রেখেছিলেন সে নোট কয়খানা ফটোগ্রাফের মত ক'রে, তার উপর লেখা ছিল, "বিকাশের দেওয়া উপহার ১৫০৲"!

বাড়ী এসে যখন সে খবরটা দিলে তখন সবাই বললে 'বেশ', মাসিমাও বললেন, 'বেশ', কতকটা আসান হবে তোর, কিন্তু তেমন উল্লাস ক'রলে না কেউ। গভীর বেদনার সঙ্গে সে কল্পনা করতে লাগলো কি আনন্দ করতেন তাঁর মেসোমশায় যদি তিনি এ খবর শুনতে পেতেন।

সব চেয়ে অসহ্য হ'ল তার গীতার কথা। তার মাইনে বাড়বার খবর পাবার পর গীতা এসে তাকে বললে, "বিকাশ দা' আমার একটা কথা শুনবে?"

"কি কথা?"

"থাক, নাই বললাম, হয় তো তুমি বলবে জ্যাঠামী করছি।"

বিকাশ একটু লঘু স্বরে বললে, "তা' অবিশ্যি বলবো, কিন্তু তাই বলে কথাটা শুনলে হানি কি?"

"বলছিলাম কি? মাইনে বাড়লো বলে তুমি সাত তাড়াতাড়ি আবার বাড়ীর সবার জন্যে প্রেজেণ্ট আনতে ছুটো না। মিছামিছি টাকা খরচ কেন করবে? অমন রোজগার যে জ্যাঠাম'শায় করতেন, সব কোথায় গেল দেখলে তো? তুমিও সেই ভুলটা করো না। বাড়তি টাকাটা রেখে দিও ব্যাঙ্কে।"

"দেখ, তোর এ কথাটা জ্যাঠামীরও ওপরে উঠেছে, এ যেন ডেঁপোমী! বলেই হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বললে, "আর দেখ একটা কথা তুই সর্ব্বদা মনে রাখিস। মেসোম'শায় মানুষ ছিলেন না, দেবতা—দধীচির মত ত্যাগী। তাঁকে কোনও দিক দিয়ে খাটো করে বা তাঁর কাজের উপর কোনও সমালোচনা করে কোনও কথা অন্ততঃ আমার কাছে তুই বলিস না—আমি তাঁর নামে এমন কোনও কথা কোনও দিন শুনতে চাই না।"

গীতা আর কিছু না ব'লে চ'লে গেল।

এই ষোল বছরের মেয়েটার এতটা ধৃষ্টতায় সে ভয়ানক বিরক্ত হয়ে গেল। গীতা যা' বললে সে ছাঁকা সত্যি কথা, বুদ্ধিমানের যুক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ উপদেশ সে তাকে দিতে আসে কি সাহসে? আর তা' ছাড়া যতই বুদ্ধিমানের যুক্তি হ'ক, তার কথা মানবার উপায় বিকাশের নেই। মাসিমা চিরজীবন মেসোম'শায়ের রোজগারের সব টাকা খরচ করে এসেছেন। অনন্ত অবশ্য তাঁর কাছ থেকে অনেক টাকাই নিয়ে খরচ ক'রেছে, কিন্তু তাঁর হাত দিয়ে ছাড়া মেসোম'শায়ের কোনও টাকাই যায় নি। এখন তাঁকে বিকাশ কোন প্রাণে বলবে যে, আমার এই সামান্য আড়াই শো টাকা আপনি খরচ ক'রতে পারবেন না। এই সামান্য টাকা খরচ ক'রে তাঁর কোনও তৃপ্তিই হবে না, কিন্তু তার যা সাধ্য তা সে করবে মাসিমার অভিশপ্ত জীবনে তৃপ্তি দেবার জন্য।

বিকাশ স্থির করলে গীতার স্ববুদ্ধির যুক্তি সে শুনবে না, তার মাইনের সব টাকাই সে মাসিমাকে দেবে। তিনিই সব খরচ করবেন। ভাবলে এই গীতা মেয়েটার মনে কৃতজ্ঞতা নেই এক ফোঁটা। মাসিমার অপব্যয়ের কথা সে তোলে কিসে? গীতার সাড়ী জামা গয়নার যে বাহুল্য সে যে সেই অপব্যয়েরই ফল।

মাস কাবার হবার আগেই বিকাশের হাতে এসে পড়লো অনেকগুলি টাকা।

একদিন যতীনবাবু তাকে বললেন, "দেখলেন তো বিকাশবাবু, যা' বলেছিলাম তাই। বড় বড় ব্যবসায়ীরা মিলে হুড় হুড় ক'রে রোজ পঞ্চাশ সাট হাজার গাইট বেচে দামটা কি ভীষণ নামিয়ে দিয়েছে! সাধে আমি আপনাকে এই বাজারে খেলতে বারণ করেছিলাম।"

বিকাশ হেসে বললে, "আমি কিন্তু আপনার পরামর্শ মানিনি যতীন বাবু—আমি বেচেছিলাম এক হাজার গাইট।"

"বেচেছিলেন? তবে তো কেল্লা মেরে দিয়েছেন! গাইট পিছু দশ টাকা—দশ হাজার টাকা পেয়েছেন তা' হলে।"

হেসে বিকাশ বললে, "তা' পেয়েছি।"

"খুব জোর কপাল আপনার। ফাটকার বাজারে আপনি ছুঁলেই দেখছি টাকা আসে।"

"তাই দেখছি। শুধু ফাটকা নয়—একবার রেস খেলেছিলাম, তাতে পেয়েছিলাম একদানে এক হাজার।"

"বটে। বেশ। কিন্তু কপালের উপর খুব বেশী ভরসা করবেন না। লক্ষ্মী যে কখন হাসান কখন কাঁদান তার ঠিকানা নেই। এখন যখন আপনার দিন চলছে ভাল, তখন এ টাকাটা দিয়ে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নতুন স্কীমে খানিকটা জায়গা কিনে ফেলুন।"

যতীনবাবু সেই দিনই বিকাশকে নিয়ে গিয়ে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের দশ কাঠা জমী কিনিয়ে দিলে। বিকাশ আট হাজার টাকা নগদ দিলে, বাকীটা কিস্তীবন্দী করে নিলে।

বাড়ী ফিরে সে দু' হাজার টাকার নোট মাসিমার হাতে দিলে।

মাসিমা আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন, "দু' হাজার টাকা পেলি কোথায় রে?"

"দু' হাজার নয় মাসিমা, পেয়েছি দশ হাজার—আট হাজার টাকায় দশ কাঠা জমী কিনেছি আর এ দু' হাজার বাড়ীতে এনেছি।"

মাসিমা বললেন, "বেশ করেছিস। তা রেখে দেগে।"

বিকাশ বললে, "আমি রেখে দেবো কি মাসিমা? আপনি রাখুন, আপনি খরচ করবেন। ভেবেছেন আমি খরচের ঝক্কি পোহাতে যাব?"

মাসিমা এইবারে হেসে বললেন, "পাগল ছেলের কথা শোন! ঠিক তোর মেসোর ছবি। তা' বেশ। ও গীতা, এ টাকাগুলো তুলে রাখ তো মা।"

গীতা এলো, মাসিমার হাত থেকে দু' হাজার টাকার নোট নিয়ে গেল, অত্যন্ত অপ্রসন্ন চিত্তে। একটা ক্লিষ্ট অপ্রসন্ন দৃষ্টি হেনে গেল বিকাশের দিকে।

বিকাশের মনটা খুসী হ'ল এই ভেবে যে, এটা গীতার সেদিনকার জ্যাঠামীর খুব মুখের মত জবাব হ'ল।

গীতা এর শোধ তুললে পরের দিন বিকাশের হাত দিয়েই। ওই দু' হাজার টাকার বেশীর ভাগই সে মাসিমার কাছে নিয়ে কিনলে গয়না—বেশীর ভাগ তার নিজের আর কিছু শ্যামলীর।

গয়না কিনে খুব খুসী মনে হাসতে হাসতে সেগুলো যখন গীতা সিন্দুকে তুলছে তখন বিকাশ এসে বললে, "আমার কাছে যে বড় লেকচার ঝাড়ছিলি পয়সার অপব্যয় না কত্তে, এখন তো টাকা আসতেই তুই দিব্যি মোটা টাকা বাজে খরচ করিয়ে ছাড়লি গীতা!"

গীতা হেসে চোখ ঘুরিয়ে বললে, "তা কি করবো? তুমি যখন টাকার হরিবলুটই দেবে তখন আমি যা পারি কুড়িয়ে নেবো না? জান তো? মেয়ে মানুষ রোজগার করে না, তারা এমনি কুড়িয়ে বড়মানুষ হয়।"

গীতার উপর হ'ল বিকাশের দারুণ ঘৃণা। কি ছোট মন, কি নীচ, কি স্বার্থপর মেয়েটা! আবার মুখে মুখে কী বুলি তার? বিকাশের টাকার জন্য কী দরদ!

সুবোধ চ্যাটার্জীর কথাটা মনে হ'ল তার. 'সখের দরদী।' সে কথা বিকাশের সম্বন্ধে খাটে না, খাটে গীতার সম্বন্ধে।

[ক্রমশঃ

গান

শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য, বি-এ,

আমার ফুলে গাঁথা মালা
তুমি নিলে,
তোমার ফুলে আমার ডালা
ভরে' দিলে।

এই যে দেওয়া, এই যে চাওয়া,
এরই মাঝে পরম পাওয়া,
তাইতো সুরে আকাশ ছাওয়া
মোর নিখিলে।

তোমায় যখন হারাই আমি,
আমায় তুমি ডাকো,
তোমায় ভুলে থাকি যদি,
তুমি ভোলো নাকো।

এই যে ভোলা, এই যে ডাকা,
এরই মাঝে ভ'রলো ফাঁকা
তাল-বেতালের দ্বন্দ্বে মাখা
সুরের মিলে।

বেয়াড়া বর্ম্মণের ডায়েরী

শ্রীনরেশ চন্দ্র পাল

এক

বক্তব্যের চেয়ে ভূমিকা দীর্ঘ করিয়াছি নেহাৎ দায়ে ঠেকিয়া। নহিলে G.B.S.-এর অনুকরণ করিবার কোন অভিপ্রায়ই ছিল না। মূল গোপন করিতে পারিলেই মৌলিক হওয়া যায়। কিন্তু করিতে পারিলে ত! এই মহাবাক্য যাঁহার লেখনীনিঃসৃত, সেই C.E.M. Joad মহাশয়ও পারেন নাই। তাঁহার নাকাল হওয়ার ইতিহাস তিনি স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। সমালোচক ও তাঁহাদের গুপ্তচরদের শকুনিদৃষ্টি সন্ধানী আলোর মত চরাচর ঝাঁটাইয়া ফিরিতেছে। সাহিত্যের রাজপথে চোরাই মালের কারবার কোন কালেই সহজ ছিল না। এখন ত অলি-গলিও আর নিরাপদ নয়। সুতরাং বামাল শুদ্ধ ধরা পড়িবার আগেই কবুল খাইতেছি। সততার সুনামের আশায় মৌলিকতার মোহ কাটাইলাম।

অপ্রত্যাশিতভাবে কিঞ্চিৎ মাল হস্তগত হইয়াছিল। কাঁচা মাল অবশ্য—ডায়েরীরূপবীজাকারে ভবিষ্যৎ সাহিত্যমহীরুহের সুমহতী সুপ্ত সম্ভাবনা। আমি ত একেবারে লাফাইয়া উঠিয়াছিলাম। এবার আমায় পায় কে? সাহিত্যিক হইবার সাধ আছে, অথচ কল্পনা আমাকে ছুঁইয়াও যায় নাই। এদিকে নিজের জীবনটা এমন গদ্যময় যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বাড়াইয়া গুছাইয়া গল্প বানাইবার আশা বহুদিন ত্যাগ করিয়াছি। এমন সময় দিলা এই সুযোগ! বুঝিতে পারিলাম সদ্ভাবে সাধুভাবে জীবন যাপন করিলে ভগবান একভাবে না একভাবে পুরস্কার দিয়া থাকেন। হরি হে, তুমিই সত্য। প্রচুর মাল-মশলা ত হাতের কাছে জুটাইয়া দিলে, এবার সাহিত্য-সৌধ গড়িয়া তুলিতেই যা দেরী। দিনু ঠাকুর, সমালোচককে কি তুমিই ঠেকাইতে পারিবে। যদি ধরা পড়ি? ভাবিয়া, হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। শেষে কবুল খাওয়াই ঠিক করিলাম।

ব্যাপারখানা এই। আমার এক বন্ধু গৃহশিক্ষকতা করিতেন। অবসর-সময়টার বাড়াইবার জন্ম নয়, পড়ার খরচ চালাইবার জন্যও নয়। এ ছিল তাঁর একমাত্র পেশা এবং ক্রমে হইয়া উঠিয়াছিল অতিপ্রবল নেশা। সম্প্রতি নেশা এবং পেশা শুদ্ধ লোকান্তরিত হইয়াছেন। স্বর্গে নরকে যেখানেই যান, ছাত্রছাত্রী-দল নিশ্চয়ই জুটাইয়া লইবেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনবৎসরাধিক কাল মহামান্য সম্রাটের অতিথি ছিলেন, অল্পদিন হইল মুক্তি পান। অবশ্য আতিথ্য হইতে মুক্তি নহে। রাজার অতিথিশালা হইতে একেবারে খাস অতিথিশালার অর্থাৎ হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন মাত্র। সেখানেই ধীরে ধীরে জীবনদীপ নিবিয়া গেল। খবর পাইয়া আমার কর্ম্মস্থল হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। সামান্য জিনিষপত্রের বিলি-ব্যবস্থা করিয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়াছি। সঙ্গে বন্ধুর একখানা ডায়েরী।

সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের নাতিক্ষুদ্র সহর। কায়ক্লেশে দিনপাত করি। প্রথমে শুধু বীমার দালালীই করিতাম। তারপর পাঁচ সাতটা কোম্পানীর জিনিষপত্রের এজেন্সী নিই। তাহাতেও শানায় না দেখিয়া হোমিওপ্যাথী ধরিয়াম। কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে প্রথমে খান পাঁচেক বই ও ওষুধের বাক্স, পরে একটি উপাধি সংগ্রহ করিয়া সকাল সন্ধ্যা রোগীর জন্ত ধর্ণা দিয়া থাকি। কিন্তু কপালে করলাভাজা! অবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন বহুধিকৃত প্রাইভেট মাষ্টারী সুরু করিতে হইয়াছে।

অলস মধ্যাহ্নে ডিস্পেন্সারী নামলাঞ্ছিত অখণ্ডকসমাকুল (নীচের তলায় কতকগুলি আস্তাবল) কক্ষে বসিয়া আনমনে ডায়েরীর পাতা উল্টাইতেছিলাম। অকস্মাৎ এক জায়গায় চোখ ঠেকিয়া গেল—আমার নামে লেখা একখানা চিঠির নকল। নকলখানি পড়িয়াই আমার চিঠির বস্তার সন্ধানে গেলাম। চিঠি জমাইবার আমার বাতিক আছে। বাক্স-পেটরায় স্থান হইতে ছিল না বলিয়া শেষকালে বস্তাবন্দী করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু ও হরি, আমার অনুপস্থিতির ও কাগজের দুর্ম্মূল্যতার সুযোগে হিসাবী গৃহিণী তাহা সওয়া ন' আনা সের দরে কাবাড়ীর নিকট বিক্রী করিয়া ফেলিয়াছেন। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার ডায়েরীতে মনোনিবেশ করিলাম। যথন বন্ধু উক্ত পত্র দেন, আমি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিই, কিন্তু পত্রোক্ত ব্যাপারের শেষ পরিণাম কি হইয়াছিল তিনি লিখেন নাই।

চোখের সুমুখে যেন বায়োস্কোপের ছবি ভাসিয়া যাইতেছে, একের পর এক, অবিচ্ছিন্ন, অমলিন। কি প্রগাঢ় ভালবাসাই ছিল আমাদের। কিশোর বয়সে তাঁহাকে কত যে প্রেমপত্র লিখিয়াছি, মনে হইলে হাসি পায়। গৌরবর্ণ, গোলগাল নাদুস-নুদুস চেহারা। আলাদা আলাদা করিয়া দেখিলে কোন অঙ্গে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না, অথচ সব মিলাইয়া এক অপূর্ব্ব আকর্ষণের কেন্দ্র ছিলেন বন্ধুবর। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আকর্ষণ চোখ দু'টিতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ইদানীং শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষের দীপ্তি যেন একটু অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল, চোখ হইতে স্বপ্নালুভাব কাটিয়া গিয়া এক বুভুক্ষু তীব্রতা বিকীর্ণ হইত।

চালচলন কথাবার্ত্তা সবই ছিল অদ্ভুত ধরণের। চরিত্র আরও চমকপ্রদ। অথবা হয়ত নিবিষ্ট চিত্তে দীর্ঘকাল দেখিলে জগতের সবকিছু অনন্যসাধারণ মনে হয়। যাই হোক, একই মানুষের মধ্যে যুগপৎ এত বিভিন্ন বিপরীতমুখী ভাবের সমাবেশ হইতে পারে, তাহা তাহাকে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন হইত। ভাল যে সে ভালই, মন্দ যে, সে শুধু মন্দ—এই রকম অতিশয় সরল ধারণা যাহাদের, তাঁহার পরিচয় পাইলে তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন হইতেন। উচ্চ আদর্শ, মহৎ কর্ম্মের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় বার বার পাইয়াছি অথচ এমন ব্যবহারও দেখিয়াছি, যাহাকে ক্ষুদ্রাশয়তা না বলিয়া উপায় নাই। বাল্যকালে এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আওতায় বাড়িয়া উঠাতে ত্যাগ-বৈরাগ্য-সংযমের মাহাত্ম্যবোধ তাঁহার রক্তধারায় মিশিয়া গিয়াছিল। এ দিকে সাধারণ মানুষের মত ভোগলিপ্সাও ছিল বেশ প্রবল; অথচ ভোগের কোন সুযোগই উপস্থিত হয় নাই। একদিকে মনের মধ্যে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে অতৃপ্ত বুভুক্ষা—পরস্পরবিরোধী এইসব প্রবৃত্তি ও অবস্থার চাপে তিনি এক বিচিত্র জীবে পরিণত হইয়াছিলেন। আমার মনে হইত, কালক্রমে বার্দ্ধক্য আসিলে যদি তাঁহার শরীর ন্যুব্জ হইয়া পড়ে, তবে শরীর প্রশ্নবোধক চিহ্নের

আকার লইয়া তাঁহার মানসিক ব্যাকুল জিজ্ঞাসার যথাতথ প্রতীক হইয়া দাঁড়াইবে। তীক্ষ্ণ আত্মবিশ্লেষণ-ক্ষমতা থাকায় তাঁহার যন্ত্রণা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ ও সাহিত্য-প্রীতির সঙ্গে নানারকমের স্থূল আসক্তি আসিয়া জুটিয়াছিল। এই ভাবে নানা অতৃপ্ত তৃষ্ণা, বিপরীত ঘটনা ও অমীমাংসিত জিজ্ঞাসার ঘাত-প্রতিঘাতে বাত্যাতাড়িত তরণীর মত টলমল করিতে করিতে অকস্মাৎ মৃত্যুর অতলে তলাইয়া গেলেন। জীবনসমুদ্রে যে উদ্‌ভ্রান্ত পথিক দিশা হারাইয়াছিল, জীবন হইতে অধিকতর রহস্যময় মৃত্যুরাজ্যে প্রবেশ করিয়া সে কি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে ?

তিন

ডায়েরী ত' নয়, যেন বিধ্বস্ত জীবনের Lumber-room. সমস্তই যেমন এলোমেলো অগোছালো, তেমনি বিচিত্র। আমি ত তাঁহার স্বভাব জানিতাম সুতরাং বিস্মিত হইলাম না। কোন কাজেই শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিয়া থাকা তাঁহার ধাতে ছিল না। গীতাপাঠ, ব্রহ্মচর্য্যপালন, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ, পলিটিক্স এবং অপেক্ষাকৃত কম প্রশংসনীয় অনেক ব্যাপারে প্রবল উৎসাহে ঝাঁপ দিতেন কিন্তু কোথাও শেষ রক্ষা করিতে পারিতেন না। পড়াশোনা লইয়াই থাকিতেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, খান দুই চার উপন্যাস ব্যতীত আর কোন কিছুই শেষ পর্য্যন্ত পড়েন নাই। তবু, মলাট-লইয়া কারবার হইলেও একরকমের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আন্তরিক তন্ময়তার বলে চিন্তাশীল বিদ্বান্ বলিয়া লোকের মনে ভ্রান্তি উৎপন্ন করিতেন। তাঁর স্বাভাবিক অস্থিরতার পরিচয় পাইতেছিলাম ডায়েরীর পাতায় পাতায়। এলোমেলো, অসংলগ্ন ও অসমাপ্ত অবস্থায় হইলেও মালমশলা এত বেশী যে 'দু'দশখানা টুইশন বধ' মহাকাব্য লিখা যাইতে পারে। এই সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আর এক সম্ভাবনাও আমার মনে উঁকি দিতেছিল।

নূতন লেখকের লেখা বৃহত্তর সাহিত্যসমাজে যে পরিমাণে অবজ্ঞাত হয়, পরিচিত মহলে তদধিক কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে। মুষ্টিমেয়ের আগ্রহে অপরিমেয়ের অবহেলা পোষাইয়া যায়। কিন্তু বন্ধুমহলে চাঞ্চল্যসৃষ্টি সব সময়ে সুবিধাজনক হয় না। এই ডায়েরীতে যেসব ব্যাপার দেখিতেছি, গল্প সাজাইয়াও যদি নিজের নামে চালাই, তবে শুধু কাল্পনিকতার দোহাই দিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিব না। অপাঙ্‌ক্তেয় হওয়া অনিবার্য্য। বলা বাহুল্য, প্রায় সবই যৌন ব্যাপার। তবে শুধু তাই নয়। তাহা হইলে সাহিত্যের উপাদান বলিতাম না। "Sails of his ship were filled with every wind that blew"—জীবনসমুদ্রে যে দিকে যত হাওয়া বয় সব একসঙ্গে আসিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র তরণীর ক্ষুদ্রতর পালে লাগিয়াছিল। মন্দ মধুর হওয়া এবং নির্ম্মম ঝঞ্ঝা—সব।

বিভূতিবাবুর 'নীলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসের নায়কটিও প্রাইভেট টিউটার কিন্তু কত তফাৎ। আজকাল ত অনেক গল্পের নায়কই তাই। অধ্যয়নকক্ষ মিলনকুঞ্জে পরিণত। কিন্তু উপাদানের বা উপলক্ষ্যের জন্য নয় বিভূতিবাবু লেখার অসামান্যতায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে আমার কিছু বলিবার থাকিতে পারে না—বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক তাঁহার প্রশস্তি গাহিয়াছেন। তবে নায়কটির দূরতম প্রতিধ্বনিও বাস্তব জীবনে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। যে মনন-শীলতা, সূক্ষ্ম রসানুভূতি তাহার মধ্যে পাই, তাতে তাহাকে স্পর্শ-সুকুমার কবি মনে হয়। চিন্তায় যে শুচি শুভ্র অনবদ্য শালীনতা রহিয়াছে, তাহা পরমসংযত ভদ্রমনোবৃত্তির পরিচায়ক। মানুষের মধ্যে অনুক্ষণ যে পশু জাগ্রত, তাহার অস্তিত্বই সে অবগত নয়। আবার কেমন রসিক, প্রত্যুৎপন্নমতি। যথাসময়ে যথা-স্থানে ওজন করিয়া লাগসই কথাটি তৎক্ষণাৎ বলা, কখনো বেচাল না হওয়া, কোন অবস্থাতেই অপ্রস্তুত না হওয়া—চিন্তায় ভদ্র, বাক্যে-কর্ম্মে ধীর, আচরণে সংযত, একাধারে কবি দার্শনিক বিচক্ষণ এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ আমি ত দেখি নাই। অবমানিত, অন্নের জন্য আ[illegible]কাঙ্খী, চাকরের অধম বলিয়া গণ্য টিউটার-শ্রেণীর মধ্যে ত' দূরের কথা, অনেক উচ্চ স্তরেও বোধ করি এমন অন্তরে-বাহিরে সুমার্জ্জিত মহাপুরুষের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। তা ছাড়া মহাপুরুষের মনেও কাদার ছোপ কিছু না কিছু লাগে। নীলাঙ্গুরীয়ের নায়ক যেন একেবারে মালিন্য-মুক্ত। হয়ত বিভূতি-বাবুর সেইরকম অভিজ্ঞতাই হইয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র এই অসাধারণত্ব সত্ত্বেও এত জীবন্ত যে, মনে হয় সামনে মডেল বসাইয়া তিনি ছবি আঁকিতেছেন। কিন্তু অধিকাংশই এরকম নয়। কেরাণী মজুর ইত্যাদির জীবন যেমন নানাদিক হইতে সাহিত্যের মাল-মশলা যোগাইতেছে, টিউটার নামধেয় ক্রমবর্দ্ধমান মনুষ্যসমাজের জীবনে সেইরকম উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দেখিতে পাই লেখকগণের একই ঝোঁক। তাহারা কোনরকমে ছাত্রী-মাষ্টারের বিবাহ দিতেই ব্যস্ত। জানা দরকার, বিবাহের চেয়ে বড় ও ছোট এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির অনেককিছু ইহাদের ভাগ্যে ঘটে।

আমার বন্ধুর মধ্যে এই দুর্লভ শুচিতা ছিল না। সম্পদ্ যথেষ্টই ছিল কিন্তু দৈন্য ছিল তার বেশী। বিভূতিবাবুর লেখনী অমর হউক। তাঁহার নিকট সবিনয় প্রার্থনা—তিনি এমন একটি চরিত্র আঁকুন যাহার মধ্যে শক্তির পরিচয় আছে কিন্তু দৌর্ব্বল্যও আছে, জীবনযুদ্ধে যে শুধু ভাগ্যবিড়ম্বনায় নহে, নিজ দোষেও পরাজিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আমরা দেখিব, character is destiny (চরিত্রই ভাগ্যবিধাতা) ।

ডায়েরী মাত্রই বোধ হয় অল্পবিস্তর এই ধরণের। স্যামুয়েল পীপ্‌স (Samuel Papys)এর ডায়েরীর কথা সর্ব্বজনবিদিত। এমন যে আমিয়েল (Amiel) তাঁহার জর্ণালেও একটি অবৈধ প্রণয়কাহিনী আছে।

কথায় কথা আসিয়া পড়ে। কলেজ ছাড়ার পর হইতে মা সরস্বতীকে তাকে তুলিয়া রাখিয়াছি। সাময়িক পত্র-পত্রিকার মারফত এই অভিযোগ শুনিতে পাই, বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতার বান ডাকিয়াছিল; এখনও তাহাতে তেমন ভাটা পড়ে নাই। অনেক ভাবিয়াছি কিন্তু অশ্লীলতা সম্বন্ধে মন স্থির করিতে পারি না। মোহিতবাবুর "সাহিত্যে অশ্লীলতা" পড়িয়া আরো গুলাইয়া গিয়াছি। অশ্লীল নামে কুখ্যাত খান দু'চার বাংলা বই পাইলে পড়িয়া দেখি। কিন্তু নিজের কিনিবার পয়সা নাই। কিনাইতে

পারি—এতদূরে এমন লোকও নাই। যারা পয়সা খরচ করিতে পারে, তারা স্বভাবতই উঁচা জিনিষ না কিনিয়া এমন বই কিনিতে চায়, যাহা বার বার পড়িবার প্রয়োজন হয়। যাহা হউক, ইংরেজীতে যেমন, বাংলা সাহিত্যে এখনও তেমন বে-আব্রু হইতে পারিয়াছে কি? দেশী ছবিতে যখন এখন পর্য্যন্ত চুম্বন চলে নাই, হয়ত দেশী উপন্যাস আরও দু'এক ধাপ অগ্রসর হইলেও বিদেশী বিবস্ত্রতা হইতে বেশ দূরেই আছে।

'হয়ত', বলিয়াছি নাও হইতে পারে। কারণ প্রগতির বাড় বড় বাড়। ধাঁ করিয়া বাড়িয়া যায়। কোন দেশে যখন নূতন কিছু আরম্ভ হয়, তাহার বিকাশে যথেষ্ট সময় লাগে। অন্যত্র যখন তাহার অনুকরণ হয়, তখন তার সিকি ভাগও লাগে না। অনুকরণকারীরা ধাপে ধাপে ত অগ্রসর হয় না—এক লম্ফে ফলটা পাড়িয়া লয়। দৃষ্টান্ত স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার। বিলাতে সাফ্রাজিট আন্দোলন কম বিক্ষোভ সৃষ্টি করে নাই। এদেশে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার প্রায় বিনা আন্দোলনে শাসনবিধানে স্বীকৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, এক বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পাশ্চাত্য জীবনচরিত ও আত্মজীবনীতে যেমনধারা নগ্নতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার কাছে ঘেঁষিবার সাধ্য এখনো অনেকদিন আমাদের হইবে না। বিশ্রুতকীর্ত্তি বায়রণের কথা না হয় উত্থাপন নাই করিলাম। অনেকে পয়সা কামাইবার জন্য অশ্লীল কাহিনী নিজের নামে প্রচার করে—অভিজ্ঞতা না থাকিলেও গল্প বানাইয়া কবুল খায়। (যৌন শাস্ত্রের বইতে যে ধরণের আত্মকাহিনী থাকে, তাহা বোধ হয় অধিকাংশই এইরকম)। সেই সবও ছাড়িয়া দিতেছি। অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ লোক—ইসাডোরা ডানকান প্রভৃতিও আলোচনার অযোগ্য। কিন্তু জগদ্বিখ্যাত ছিদ্রান্বেষী জি, বি, এস, নিজের যে প্রাক্‌বিবাহ যৌন অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়াছেন (Frank Harris কৃত জীবনী দ্রষ্টব্য), তাঁহার ও অস্কার ওয়াইল্ডের জীবনী লেখক Frank Harris যে আত্মকথা লিখিয়াছেন, ইথেল ম্যানিন, জর্জ্জমুর প্রভৃতির যে সব স্বীকারোক্তি আছে, এমন কি সুপ্রসিদ্ধ যুক্তিজীবী (Rationalist) C. E. M. Joad নিজের 'যুদ্ধং দেহি' গোছ আত্মজীবনীতে (Belligerent autobiography) নিজের যৌন-জীবন সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা এদেশের কোন বিখ্যাত লোক করিতে পারিবে না। (ওদেশেও এ সব কবুল খাওয়ার রেওয়াজ অল্পদিন হইল বাড়িয়াছে মনে হয়। বায়রণের সম-সাময়িক মহাপুরুষম্মণ্য ওয়ার্থসওয়ার্থ এক অবৈধপ্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন এবং সারাজীবন কপটতার আবরণ পরিয়াই কাটাইয়াছিলেন। বেশীদিন হয় নাই, মহাপুরুষের মুখোস খসিয়াছে। যে প্রণয়িনী ও ঔরসজাত কন্যাকে ত্যাগ করিয়া কবিবর পালাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদের বিবরণ জানা গিয়াছে)। আমাদের দেশে নবীন সেনের "আমার জীবনে" বিবাহবহির্ভূত প্ল্যাটোনিক প্রেমের একটা ইঙ্গিত যেন ছিল বলিয়া স্মরণ হইতেছে। তবে ইহার সঙ্গে বিদেশী লেখকের সোল্লাস স্বীকারোক্তির তুলনাই হইতে পারে না। গান্ধিজীর আত্মকথায় আত্মগ্লানিপূর্ণ যে উল্লেখ আছে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। জওহরলাল আপন জীবন-কথায় যৌনজীবন সম্বন্ধে প্রায় নীরব?

এই নীরবতার জন্য অবশ্য কোন নালিশ নাই। নগ্নতার কোন সাহিত্যিক মূল্য আছে কি না তাহাও এ স্থলে বিচার্য্য নহে। আমার বক্তব্য এই ছিল যে, আমার বন্ধুর ডায়েরীতে যাহা আছে, তাহা নিজের নামে প্রকাশ করিলে একেবারে অপাঙ্‌ক্তেয় হইতে হয়। সুতরাং শুধু যে সততার খাতিরে পরধন আত্মসাৎ করিলাম না, ইহা বলিলে সততারই অপলাপ হইবে।

চার

ভূমিকা আর শেষ হইতেছে না। বাংলা বলিতে পাইনা বহুকাল। এই বিশ বৎসর পেটের মধ্যে যাহা জমিয়া আছে, সব একসঙ্গে ঠেলিয়া উঠিতে চায়। তাই গল্প লেখার অছিলায় যেন কাগজের সঙ্গেই গল্প করিয়া চলিয়াছি। এদিকে গল্পটি যে মন্ময় প্রবন্ধের রূপ ধরিতেছে সে খেয়াল নাই।

বন্ধুর ডায়েরী হইতে যে ঘটনাটি উপহার দিতেছি, তাহাই সব চেয়ে নির্দ্দোষ। এই রকম গল্প আমি পড়িয়াছি অনেক। বাংলা দেশের প্রায় অর্দ্ধেক গল্পের নায়ক নায়িকাই ত শিক্ষক ও ছাত্রী। তবু লিখিতেছি কেন? এই জন্য যে এই প্রথমবার এমন একটি প্রণয় কাহিনী পাইলাম, যাহা সত্য ঘটনা বলিয়া আমি মানিতে বাধ্য। আমার বদ্ধমূল ধারণা বাস্তব জীবনে গল্পের মত কিছু ঘটে না। মধ্যবয়স অনেকদিন পার হইয়াছি কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণতর কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও কস্মিনকালে ঘরে বাহিরে কুত্রাপি নাটক-নভেলের মুখর (demonstrative) প্রেম চাক্ষুষ করি নাই। ভালবাসা সম্বন্ধে কথা কহিতে হয়, ইনাইয়া বিনাইয়া নানাছাদে প্রেম নিবেদন করিতে হয়, ইহার মধ্যে কোথায় যেন একটু বিসদৃশতা লুকাইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের, স্ত্রীর নামে লেখা, যেসব পত্র ইদানীং বাহির হইয়াছে, তাঁহাদের সাহায্যে আমার কথা স্পষ্ট করিতে পারিব। স্ত্রীর নামে লেখা কবির পত্র;—বিজ্ঞাপন পড়িয়াই উত্তেজিত হইয়া অর্ডার দিলাম। বই আনাইয়া দেখি—না ভাল একটা সম্বোধন, না কিছু। ছত্রিশখানা পত্র কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটা ভালবাসার কথা কোথাও কি থাকিতে নাই! সম্বোধনটা মামুলীর চেয়েও মামুলী—ভাই ছোট বউ, ভাই ছুটী। কিন্তু নাই থাকিল মুখরতা। এই পত্রগুলি পাঠে মনে হয় না কি যে প্রতিছত্রে আত্মসমাহিত প্রেমপাত্র উপচাইয়া পড়িতেছে—কূলপ্লাবিনী সুরধুনী যেন শতধারে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের সংসারকে পুণ্যস্নান করাইতেছেন। জীবনে ত এই, কিন্তু কল্পনায়? শেষের কবিতার অতি সূক্ষ্ম মাদক মনো-বিলাস। মানুষগুলি যেন জন্ম হইতেই কথার মারপ্যাচ অভ্যাস করিয়াছে।

যাহা বলিতেছিলাম। যেহেতু মাষ্টার ছাত্রীর প্রেম এই পশ্চিমাঞ্চলে এখনও দৃষ্টিকটু ব্যাপার, সেইজন্য গল্পের আবরণেও ঐ ঘটনাগুলি নিজের নামে চালাইবার লোভ সম্বরণ করিলাম। আড়ালে আবডালে লোকচক্ষুর অন্তরালে ব্যাপার বোধ করি

সর্ব্বত্রই সমান কিন্তু শিক্ষক ছাত্রীর প্রেম বা বিবাহ এখনও এদিকে খোলাখুলিভাবে পাঙ্‌ক্তেয় হইয়া উঠে নাই। হিন্দী উর্দ্দু গল্প উপন্যাসে বহুদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু কই বিশ বৎসরের মধ্যেও ত এই লক্ষাধিক লোকের নগরে অমন বিবাহ চোখে পড়িল না। অথচ টিউটার-ব্যাধি এখানে বাংলার চেয়ে কম ব্যাপক নয়। অথবা হয়ত বাংলা দেশেও গল্পেই শুধু হয়, জীবনে হয় না। কলিকাতা হইতে আগত বন্ধুরা যে সব রোমাঞ্চকর গল্প বলেন, সংবাদপত্রে যাহা মাঝে মাঝে পড়া যায়, তাহা বোধ হয় ব্যতিক্রম মাত্রই। সত্য হইলে যে তেমন আপত্তি আছে তাহা নয়। প্রেমজ বিবাহ প্রচলিত হইলে অভিভাবকেরা অন্ততঃ কন্যাদায় ও বরপণ হইতে অব্যাহতি পাইবেন (এক বন্ধু বলেন, তিনি টুইশনের জন্য গেলে বাড়ীর কর্ত্তা গোত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহিত জানিতে পারার অল্পদিন পরেই তাঁহার সেই কাজ যায়)।

তবে একটা কথা। সাহিত্যে আজ চলিলে জীবনে কাল চলিবে। সাহিত্য ও জীবন পরস্পর-নিয়ামক। লেখকেরা হয়ত আজ শুধু নিজের অতৃপ্ত ভোগলিপ্সাকে শান্ত করিবার উপায় খুঁজিতেছেন, কল্পনায় ধ্যান করিয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতেছেন। ক্রমে এই রকম লেখার ফল ফলিবে। সাহিত্যে যে আকাঙ্ক্ষা ভাবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, কালে তাহাই সমাজ-জীবনে রক্তমাংসের মূর্ত্তি ধরে। সাহিত্যের দ্বারা সমাজের এই ভোলবদল সহসা হয় না বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে যে হয়, তাহার প্রমাণ আমিও পাইয়াছি। ইহা ভাষা বদলের দৃষ্টান্তমাত্র। ভাববদল তার পরের ধাপ।

আগে বলিয়াছি আমি মাঝে মাঝে টুইশনি করি। বাংলা দেশ হইতে আগত একটি মেয়ে অল্পদিন পরীক্ষার আগের দিন পনেরো, আমার কাছে পড়িয়াছিল। এদেশে চোখ ঝলসানো রং দেখি নিটোল স্বাস্থ্য দেখি, দীর্ঘায়ত পালোয়ানি চেহারা দেখি কিন্তু অমন স্নিগ্ধ লাবণ্য দেখি না। মেয়েটি তন্বীও ছিল না, শিখরিদশনাও নয় পক্কবিম্বাধরটর ত নয়ই। কিন্তু শ্যামা বটে। বাংলা মায়ের শ্যামলতারই প্রতীক। এমন নয়ন জুড়ানো সজল সুকোমল আভা বহুকাল দেখি নাই। রোদের চশমা (sunglass) চোখে লাগাইয়া দেখিলে যেমন চরাচর বড় স্নিগ্ধ লাগে, তাহার দৃষ্টি দিয়া দেখিতে পাইলে সবকিছু তেমনি কোমল ঠেকিবে, মনে হইত। সেই লাজনম্রা কিশোরীই কিন্তু একদিন আমার পিলে চমকাইয়া দিল।

অনেকদিন আগেই পড়ানো শেষ হইয়াছিল। বিকালের দিকে খেলার মাঠে পায়চারী করিতেছি, দেখি রাণী আমারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে। কিন্তু একি! সঙ্গে দুই মিলিটারী যে! দস্তুর মত বিস্মিত হইলাম। বাপ, মা, মেয়েকে চোখে চোখে রাখেন, একেলা বাহির হইতে পারে না। আমার মনে পড়ে, পড়ানো বন্ধ হওয়ার দিন সাতেক পরে তাহার সঙ্গে দৈবাৎ রাস্তায় দেখা হইয়াছিল। দুই একটা কথা হইয়াছে কি না হইয়াছে, এমন সময় থমথমে মেঘের মত মুখ রাণীর বাবা উপস্থিত। আমার নমস্কার গ্রাহ্যই করিলেন না। মেয়েটিকে ধমক দিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিলেন। বুঝিলাম পড়াইয়াছি ত পড়াইয়াছি, এখন আর পরিচয় রাখা চলিবে না। প্রায় পঞ্চাশ হইলেও আমি যথেষ্ট পরিমাণে সন্দেহাতীতভাবে বৃদ্ধ নহি—এইজন্য বোধকরি পড়াইবার সময় একটি ছোট মেয়ে কামরায় উপস্থিত থাকিয়া পাহারা দিত।

সেই রাণী আসিতেছে দু'জন মিলিটারীর সঙ্গে। কাছে আসিলে দেখিলাম পুরুষই বটে তবে বড় ছেলে গোছ পুরুষ। একজনের চেহারার সঙ্গে রাণীর এমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য যে মনে হইল বুঝি ভাই বোন। ভাবিলাম, হবেও বা, আমি ত আর ওদের সকলকে চিনি না। কিন্তু ভুল বুঝিয়াছিলাম।

ততক্ষণে তাহারা একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। রাণী পরিচয় করাইয়া দিল—

মাষ্টারমশায়, ইনি আমার বন্ধু সুবিমল চৌধুরী আর ইনি...।"

আর ইনি! আমার কানে আর কিছুই গেল না। বন্ধু! এ যে দস্তুর মত উপন্যাসের ভাষা।

কিন্তু এবারও ভুল বুঝিয়াছিলাম। জানিতে পারা গেল উপন্যাস টুপন্যাস কিছু নয়। শুধু ঐ ভাষাই। ছেলে বেলা দুজন একসঙ্গে মানুষ হইয়াছে। বাপ মা বহুদিন দেখিয়া দেখিয়া শেষকালে সন্দেহ করা ছাড়িয়া দিয়াছেন। মেয়েটির যে নিষ্পাপ মুখচ্ছবি, তাহাতে অতিবড় সন্দিগ্ধচেতারও সন্দেহ পরাজিত হইতে বাধ্য। কিন্তু বন্ধু! বুঝিলাম উপন্যাস জীবনে প্রবেশ না করিলেও, উপন্যাসের ভাষা ঠোঁটে আশ্রয় নিয়াছে। আবার ভাবিলাম সেই ভাল। অমুকদার চেয়ে বন্ধুতে ন্যাকামি অনেক কম। কথাটি এক অনিশ্চিত দ্বিধাগ্রস্ত সম্বন্ধকে শুধু রূপ দেয় নাই, মূল্যও চুকাইয়া দিয়াছে। কথাটাই দাম। আর কিছু দিতে হইবেনা।

কিন্তু সকলেই এই অবস্থায় ত নয়। সকলেরই সজাগ-দৃষ্টি বাপ মা নাই, সকলের জীবধর্ম্মের তাড়নাও সমান নয়। তাই দেখিতে পাই, দুই একটি করিয়া বুভুক্ষুজীব মনোবিলাসী "সোসাইটি"তে শিক্ষাদানের অছিলায় নাসিকাগ্র ভাগ ঢুকাইতেছেন এবং তাহার ফলে উদ্বাহ উদ্বন্ধন, কেরোসিন, লেক এবং সিনেমায় তারকায়িত অবস্থার উদ্ভব হইতেছে।

যাহা বলিতেছিলাম—দূর ছাই, আচ্ছা গেরোয় পড়িয়াছি যাহোক! এখন প্রাণ লইয়া পালাইতে পারিলেই বাঁচি।

দুইটি নামকরণ করা চাই। বন্ধুর নাম ব্যোমকেশ বর্ম্মণ—ডাক নাম বড়ু! তিরিক্ষী মেজাজের জন্য আমরা বলিতাম বেয়াড়া। গল্পের নাম? গল্পের নাম—কি রাখি বলুন ত? বেয়াড়া ত কিছু বলিয়া যান নাই। ভাবিতেছিলাম, আজকালকার ফ্যাশনমত সংস্কৃত অথবা বাংলা কবিতাংশ বসাইয়া দিব। বাংলার চেয়ে সংস্কৃতের দিকে ঝোঁক বেশী, কারণ সংস্কৃত প্রায় কিছুই জানি না। যে শ্লোক মনে পড়িতেছে, তাহার তিন চতুর্থাংশ ত ব্যবহার হইয়া গিয়াছে। পাছে বাকীটুকুও হাতছাড়া হয়, তাই আমার অধিকার ঘোষণা করিতেছি। যাহাদের গরজ আছে, তাহারা জানিয়া রাখিলে ভাল হয় যে "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং—" শ্লোকের চতুর্থপাদ আর বেওয়ারিশ মাল নহে।

গল্প? সে হবে এখন পরে।

কেরাণীর রবিবার (গল্প)

শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কেরাণীর রবিবার—একটা দিনের মত দিন। দেবব্রত শনিবার অফিস ক'রে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতে ফিরতে চিন্তা করে। অফিস সেই ক্লাইভ ষ্ট্রীটে, আর দেবব্রত থাকে হাতীবাগানে, মনের আনন্দে দেবব্রত মেছোবাজার কলুটোলার ভেতর দিয়ে হেঁটে কলেজ ষ্ট্রীটে এসে পড়ে, যতই কষ্ট হ'ক কাল রবিবার সমস্ত মজুরী পুষিয়ে যাবে। দেবব্রত মনে মনে ভাবে, বড়লোকের বড় বড় পার্টির চেয়ে কেরাণীর রবিবার কোন অংশে কম নয়। অফিসের বড় বাবু, ছোটবাবু, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সব মনে করেন—কেরাণী, তবেই আর কি? তার সুখদুঃখ রোগ শোক বলে কোন জিনিষ নেই, যেন সে স্প্রীং-এর দম দেওয়া পুতুল। কি আশ্চর্য্য! বড়লোকদের কি Superiority of Complex, যে হেতু সে ৭৫৲ টাকার কেরাণী, বড় বাবুদের কাছে তার জীবনের কোন মূল্য নেই কি ধারণা! তারও স্ত্রী আছে, একটি আদরের শিশু-সন্তান আছে আর সব চেয়ে বড় কথা এখনও যৌবন তার কানায় কানায়। বড় বাবুর আর কি, চারটে বাজতে না বাজতে বাড়ীতে দৌড় মারবেন, তারপর স্ত্রীকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোবেন; যত বিপদ দেবব্রতের যাবার সময় বলে যাবেন—ওহে, ঘোষ, আজকের ২নং ফাইলের সেই এ্যাকাউণ্টস্‌টা একেবারে শেষ করে যাবে, কাল বড় সাহেবের কাছে পেশ করতে হবে। ভুলো না, একটু খেকে খেটে শেষ করে দিও। কতক্ষণই বা লাগবে, তোমরা ইয়ংম্যান, তোমাদের বয়সে আমরা, বুঝলে কি না ঘোষ—বলে হেঃ হেঃ করে হেসে বার হয়ে গেলেন।

অফিসে বহু কেরাণী। সুনীল আছে, বাগচী রয়েছে, সুবোধ মিত্তির ভাল লোক বলে খ্যাতি আছে, কিন্তু সব ব্যাটাকে ছেড়ে বেঁড়ে বেটাকেই ধর। কি কুক্ষণেই দেব্রবত বি-কম্ পাশ করেছিল, আজ বেশ উপলব্ধি করে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘরে ঢুকে বললেন—তোমাদের মধ্যে আজ কে 'ওভার ডিউটি' করতে রাজী?

বাগচী তাড়াতাড়ি বলে—স্যার দেবব্রত ঘোষ রাজী, সে খুব খুসী মনে ডিউটি করবে। তার কোন কাজ নেই।

উঃ কি আর বলবে! যখন বাঙ্গালীর ছেলে, চাকরী করেই খেতে হবে আর ৭৫৲ টাকার ওপরই নির্ভর করছে স্ত্রী আর পুত্রের ভার, তখন চোখ বুজে সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত দেবব্রত অফিসে থাকে; সকলে বলে—দেবু regular—কখনও লেট হয় না, সব চেয়ে আগে আসে!

মনে মনে হাসে দেবব্রত। কেরাণীর জীবন, তোমরা অফিসাররা কি বুঝবে, প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য মিঠে পাখার বাতাসের লোভে দেবু কেরাণী ছুটে আসে। তাই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাখার তলায় থাকে। সত্যি ঠিকই বলে তার স্ত্রী অরুণা, যে, দেবব্রতকে পাবার পর তার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। দেবব্রত ভাবে কেরাণীর ঘোড়া রোগ। কি ভুলই করে গেছেন বাবা বিবাহ দিয়ে।

কলেজষ্ট্রীটের মোড়ে এসে দেবব্রত অফিসের চিন্তা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে! আর না, কেরাণীর অফিস তো আছেই, রোজ সেই একঘেয়ে কলুর বলদের মত জীবন। কোন রকমে আটটায় স্নান করে দুটি ভাতে ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে অরুণাকে কত বাক্যবাণে বিদ্ধ করে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু কি ধীর কি শান্ত, অরুণার রাগ বলে কোন জিনিষ নেই, বেশ হাসি মুখে বলে—একটু বসে বসে খাও, আলুর তরকারী এই হয়ে এল।

তার উত্তরে রেগে দেবব্রত বলেছে—হ্যাঁ, তোমার বাবার জমিদারি, বসে বসে খাচ্ছি এর পর চাকরী গেলে খাইও বসে বসে।

রান্নাঘর থেকে অরুণা উত্তর করে—সকলের অফিস বেলা দশটায়, তোমার পোড়া অফিসের বেয়াড়া টাইম কেন বলত?

দেবব্রত নিজেকে অপ্রস্তুত মনে করে। ফ্যানের হাওয়ার জন্যে সে একঘণ্টা আগে যায় অথচ তার স্ত্রী তার স্বামীপুত্রের সুখের জন্য দু বেলা এই দারুণ গরমে হাঁড়ি ঠেলছে। মনে মনে ভাবে দেবব্রত—কি স্বার্থপর পুরুষ জাত—লজ্জায় যেন সে মিসে যায়। অনেকবার দেবব্রত অফিস থেকে ফিরে এলে অরুণা অনুরোধ করেছে—চল না গো, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্—ঘোড়ার ডিম, একা একা কি ভাল লাগে?

দেবব্রত ক্লান্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে মাদুর পেতে মেঝেতে গা এলিয়ে দিয়েছে, হাতে তালের পাখা, সমস্ত শরীরে তার ক্লান্তি, বলে—পাগল হয়েছ? কেরাণীর স্ত্রীর আবার হাওয়া খাওয়া কি? তার চেয়ে পতি-দেবতাকে পাখার বাতাস কর, পুণ্যি হবে।

এক এক সময় অরুণা রেগে যায়—ভাল হবে না বলে দিচ্ছি, বার বার সেই হাড় জ্বালানি মাস পোড়ানি কথা কেরাণী কেরাণী—

পাখার বাতাস খেতে খেতে দেবব্রত বলে—অন্যায় কিছু বলেছি?

অরুণা বলে—তা হ'ক, কেরাণী কেরাণী করতে পারবে না—

দেবব্রত বলে—মিথ্যে লুকিয়ে লাভ কি বল?

অরুণা বলে—আর ঐ ক্যাম্বিসের জুতো, ছাতা বগলে—দু'চোখে দেখতে পারি না—ও কাজ ছাড়।

দেবব্রত বলে—পাগল হয়েছ, তুমি ক্ষেপেছ? কেরাণীর সুখেদুঃখে, রোগে, শোকে, ঝড়, বৃষ্টি, রোদে ঐ একমাত্র সম্বল ছাতাটি আর ক্যাম্বিসের জুতোটি।

নাঃ, কাল রবিবার, অফিসের চিন্তা নেই ওপরওয়ালাদের বকুনি রক্তচক্ষু নেই, সহকর্ম্মীদের বিদ্রূপ নেই, এ যেন ভিস্তির একঘণ্টার জন্য হুমায়ুনের বাদশাহীর আগ্রার বাদসা হওয়া।

কাল বেলা পর্য্যন্ত সে ঘুমুবে, বেশী বেলা হলে অবশ্য অরুণা রাগ করবে। ঠেলে ডাকবে—ওগো, ওঠ, ওঠ, ৯টা বাজে, বাবাঃ লোকে এত ঘুমুতেও পারে? খোকাকে একটু পড়াবে, বাজার যাবে, রান্না হতে যে বেলা দুটো বাজবে?

দেবব্রত হাই তুলবে, আড়মোড়া ভাংগবে, একটু রাগ দেখিয়ে বলবে—এমন করছ যেন বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে—কেরাণীর রবিবার, একটু বেলা করে ঘুমব তাও যো নেই। তুমি এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে কেন? তোমার স্বামীর চেয়েও কি সংসারের কাজ বড়? ছুটির দিনও তোমায় পাওয়া যাবে না?

অরুণার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠবে, সুন্দর গালে টোল খেয়ে যাবে, বলবে—ছি ছি, খোকা বড় হয়েছে, স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে তোমার এখনও—

রবিবার কেরাণীর দাড়ি কামাবার দিন। দেবব্রত হপ্তায় একদিন দাড়ি কামায়—যুদ্ধের বাজারে ব্লেডের যা দাম, রোজ কামান অসম্ভব। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কামাবে, খোকা এসে খানিকটা বিরক্ত করবে, মুখে সাবান মাখবে, অরুণা বকুনি দেবে—বাবা, যা সময় নিচ্ছ দাড়ী কামাতে, তাতে ঐ সময়ে জগতের বড় বড় কাজ করা চলে।

হেসে দেবব্রত বলবে—আমার দরকার নেই অতো বড় বড় কাজ করে। কেরাণীর আবার বড় কাজ, কি যে বল তুমি।

বেলায় বাজারে যাবে সে। অন্যদিন তো মাছ খাবার উপায় নেই অফিসের জন্য—মাছ কুটতে কুটতেই সময় হয়ে যায়। তারপর আছে এক মুখরা ঝি—দশটা কথা শোনায়। কিন্তু আজ রবিবার, দেবু কেরাণী কাকেও পরওয়া করে না। রুই মাছ কিনবে, পরিষ্কার ঝোল হবে, কৈ মাছ নেবে ঝাল হলুদের জন্য, চিংড়ি মাছের মলু, অরুণা চমৎকার রাঁধে, আর শেষপাতে দৈ, সন্দেশ আর বোঁদে। বাস্ আবার কি চাই? হ্যাঁ, কলাপাতা সঙ্গে নেবে, তা হলেই নেমন্তন্ন, নেমন্তন্ন atmosphere হবে সাধে মনীষীরা বলে গেছেন—"মনটাই সব"।

অরুণা বাজার দেখে মুখটা হাঁড়ির মত করবে, দশটা কথা শোনাবে কিন্তু তাতে কি? স্ত্রীর কাছে বকুনি খাওয়ায় একটা অনাবিল আনন্দ আছে—যা বাগচী, সুনীল, সমর ব্যাচিলার হয়ে বোঝে না, শুধু হিংসাই করে।

কি হয়েছে, দমকা খরচা হয়েছে তো? কেরাণীর জীবনে দাব দেনা অর্থকষ্ট আছে, থাকবেও। একটা রবিবার, হপ্তায় মাত্র একটা দিন, তাও আবার কেরাণীর। এতো আর রোজ নিত্যি নয়, অন্য দিন তো সাদাসিদে ভাবে কাটে। ৬ টা দিন তো ববাদ্দ অফিসের কাজে,হপ্তায় ১টি দিনও যদি স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির দিকে উৎসর্গ না করা গেল তো এ জীবনের দাম কি? বাজুক বেলা ২টা, ওখানেই তো জীবনের আনন্দ। একটা দিন সে খাঁচার পাখীর মত মুক্ত, এখানে তার ভয় দেখাবার কেউ নেই, আজ সে কাউকে পরওয়া করে না—'I am the monarch of all I survey.'

বৈচিত্র্যহীন জীবনের একটি দিনের জন্য যেন ছন্দ:পতন। ছন্দ: পতনের একটা অপরূপ আবেশ আছে, মধুর আমেজ আছে, যা একমাত্র দেবব্রতই বোঝে। আজ রবিবার, সকলে বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, সমস্ত সহর উৎসবে নাচছে, আর যত দোষ দেবব্রতর বেলায়; কারণ সে গরীব,সে ৭৫৲ টাকার কেরাণী। আরে বাপু চুরী করা পয়সা নয়, ঠকিয়ে লাভ করা নয়, রীতিমত 'hard earned money'—একান্ত নিজের, তাতেও জবাবদিহি! বড় লোকদের এতই অসহ্য যে একজন গরীব আনন্দ করতে পারবে না! শাসক সম্প্রদায় এত দূর স্বার্থপর! মানুষ মানুষকে দাবিয়ে রাখা নির্য্যাতন করার উদাহরণ বোধ হয় আর কোথাও নেই?

বেশ করে একঘণ্টা ধরে সে স্নান করবে সাবান মেখে কলের তলায়। রগড়ে রগড়ে ৭ দিনের জমা পুরু ধুলোগুলো গা থেকে তুলবে। হায়! এমন অফিস যে নিজের সুখ-সুবিধার দিকে দেখলেও সহস্র জবাবদিহি। কেরাণী! তবে আর কি? পরিষ্কার থাকাও তার অধিকারের বাইরে!

অরুণা তাড়া দেবে—ওগো, দুটো বাজল, রান্না তৈরী, বাবা: স্নান করতেও এত সময় লাগে?

দেবব্রত গা রগড়াতে রগড়াতে বলবে—তাড়া দাও কেন বল তো? রবিবারের দিনটা আজ,—পরমানন্দে স্নান করছি, তাতেও বাধা। না:, নিজের স্ত্রী যদি এতদূর অবুঝ হয়, চলে কি করে?

আজ কোন কথা দেবব্রত শুনবে না। অরুণা, খোকা সকলকে নিয়ে একসঙ্গে খেতে বসবে। অরুণা রাগ করবে, কিন্তু দেবু কেরাণী আজ কাকেও ভয় করে না। সে বলবে—রান্নার জিনিষগুলো হাতের কাছে নিয়ে এস, সব একসঙ্গে বসা যাক্। নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে একসঙ্গে খেতে বসবার অধিকার তাও কি আমার নেই?

এ যেন নেমন্তন্ন—মিঠে পান কিনে নিয়ে এসেছে—স্ত্রীর সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসে দেবু অফিস, দুঃখ-কষ্ট সব ভুলে যায়। মনে করে তার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। অনেক তপস্যা করে সে অরুণার মত স্ত্রী পেয়েছে। ভগবান একটা দিক পুষিয়ে দিয়েছেন। আজ সে রান্নার স্বাদ পাচ্ছে—অন্য দিন তার খেয়ালই থাকে না, সে ঘাস খাচ্ছে, না ভাত ডাল খাচ্ছে। দেবু কেরাণীকে পায় কে? মিঠে পানের সঙ্গে একটি সিগারেট ধরিয়ে ঢেকুর তোলে, নিজেকে মনে করে একটা কেষ্ট-বিষ্টু। অরুণা বলে—ওগো, পেট ভরল তো?

দেবু টান দিয়ে বলে—পেট খুব বেশীই ভরেছে, ভয় হচ্ছে—পেটে এখন ভালমন্দ সইলে হয়।

অরুণা রেগে যায়, হাত ধুতে ধুতে বলে—তোমার জীবনে কখনও উন্নতি হবে না। কেরাণী কেরাণী করে যে নিজেকে এত ছোট করে রাখে, ভগবান তার কখনও ভাল করেন না!

দেবব্রত হো: হো: করে হেসে ওঠে—তুমি অফিসে যাও, দেখো সেখানে লেখা আছে বড় বড় অক্ষরে Babu Debabrata Ghosh, Accounts' clerk. আমাদের বুঝলে Mr. হবারও উপায় নেই, ওটা আমাদের ওপরওয়ালাদের একচেটে। অর্থাৎ কেরাণী is equal to কুকুর-বেড়াল, ভদ্র লোক হবার চেষ্টা কেন? আমরা যদি ভদ্রলোক হবার চেষ্টা করি, Mr. লিখি, আমাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অরুণা এবার সত্যি সত্যিই রেগে উঠে বলে—বাড়ীতে আমরা স্বাধীন, আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, এটা অফিস নয়।

ঝি এসে উপস্থিত হয়—একে মুখরা ঝি, তার ওপর এত বেলায় রবিবারের ভালমন্দ খাওয়ার জন্য দু'চার খানা বাসন বেশী দেখে সত্যি মুখর হয়ে উঠেছে। ঝঙ্কার দিয়ে ভাঙা গলায় বলে ওঠে—আমার পোষাবে না মা বলে দিচ্ছি। একে এত বেলা,

তারপর এত বাসন আমার গতরে পোষায় না, আপনারা অন্য ঝি দেখুন।

চটে ওঠে দেবব্রত। হতে পারে সে কেরাণী, নিজের বাড়ীতে সে যাই হ'ক অন্তত ঝির মনিব! সে উত্তর দেয়—মিছি মিছি চেঁচিও না ঝি। একদিন রবিবার না হয় বেলাই হয়েছে, আর না হয় দু' এক খানা বাসন বেশী, হয়েছে, তাতে অত চটবার কি আছে? অন্য দিন যখন এর আধখানা বাসন থাকে, তখন তো বল না যে 'আপনাদের বাড়ীতে কাজ কম।' মাইনে পাও না? অমনি কাজ করছ? না আমার মাথা কিনেছ?

অরুণা এসে বাধা দেবে—ছি ছি এ সব ঝি-চাকর, এদের মধ্যে তুমি কেন? ছোট হয়ে যাবে যে? যা বলবার আমি বলব।

ঝি ততক্ষণে মণিবের তাড়া খেয়ে কলতলায় গিয়ে বসেছে। ঝির সাড়া-শব্দ নেই দেখে দেবব্রত বলে—দেখ অরুণা, অফিসের বড় বাবুরা যেমন তাড়া দিয়ে আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে, তেমনি এদেরও মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া উচিত। দেখ, এখন কেমন চুপটি করে কাজ করছে?

খোকার চোখে ঘুম নেই। বারান্দায় দেশলাইয়ের বাক্সগুলো জড় করে "কু ঝ্যাক, ঝ্যাক' করে রেল গাড়ী খেলছে। দেবব্রত ডাকে—'একটু শোবে এস বাবা, শরীর ভাল হবে।'

খোকা উত্তর দেয়—তোমরা ঘুমাও বাবা, আমার রেলগাড়ী এখন খুব জোরসে চলছে, লাহোর এসে গেছে কি না?

বিছানায় শুয়ে দেবব্রত ঘামছে, বার বার অরুণাকে ডাকছে—কৈ গো, না, রবিবারও তোমায় পাওয়া যায় না, সাধে বলে কেরাণীর জীবন।

অরুণা কাপড়গুলো পাট করে রাখছে—শুকিয়ে গেছে। ঝির আজ বেশী কাজ, কিছু বল্লেই তেড়ে উঠবে। স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে পাখা নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। হাওয়া করতে থাকে, কখন বা স্বামীর পিঠের ঘামাচি মেরে দিতে থাকে। দেবব্রত মাঝে মাঝে অরুণার হাতখানি নিজের বুকের কাছে টেনে নেয়, আবার তাড়া খেয়ে ছেড়ে দেয়। কি করছ? ঝি ঘোরাঘুরি করছে খোকা দেখছে, দিন দিন তুমি—

দেবব্রত মনের দুঃখে বলে—কেরাণীর তাড়া খেয়ে খেয়ে জীবন গেল। ঘরে বাইরে সব জায়গায় তাড়া। এই যদি তোমার স্বামী বড় অফিসার কি ব্যারিষ্টার হ'ত, দিতে পারতে এমন তাড়া? হায়রে দেবু কেরাণী!

অরুণা চাপা গলায় বলে—কি ছেলে মানুষ তুমি! আমি বুঝি তাই বল্লুম! বলে স্বামীর মাথায় হাত বুলোতে থাকে।

দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে আসে। হঠাৎ অরুণা বলে—চল, আজকে সিনেমা দেখে আসি।

দেবব্রত বলে, সিনেমা, না ওখানে আমরা যাব না। আমাদের সিনেমা বড় লোকদের নিয়ে, সেখানে চাই কোট, হ্যাট, প্যাণ্ট, ড্রয়িং রুম, ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট সিগারেট, বড় বড় পার্টি, ডিনার', লাঞ্চ—সেখানে আমাদের বড় বেমানান মনে হবে, যেন আমরা গরীব কেরাণী বলে আমাদের ব্যঙ্গ করছে। আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গরীবদের, আমাদের সিনেমায় কোন স্থান নেই। ওটাও বড়লোকদের এক চেটে। তার চেয়ে চল ঝিল্লি-ঝিল্লি পার্কে খানিকটা বেড়িয়ে আসা যাক্, ভগবানের রাজত্বে খোলা হাওয়ায় যাবার অধিকার কেরাণীরও আছে।

অরুণা বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চল। খোকাকে সাজিয়ে নি। আমিও শাড়ী বদলে নি, চল, তাই বেড়িয়ে আসা যাক্।

হাতীবাগানের একটি ছোট বাড়ীর কাছে আসতেই দেবব্রতর চমক ভাঙ্গে। কড়া নাড়তে থাকে, ডাকে—অরুণা, অরুণা দোর খোল।

খোকা দৌড়ে আসে, দোর খুলে বলে—বাবা তুমি এসেছ? কলতলায় মা-মণি পড়ে গিয়ে বড্ড লেগেছে, কপাল কেটে ভীষণ রক্ত পড়ছে, খুব চিৎকার করছে মা-মণি যন্ত্রণায়। উঠতে পারছে না।

দেবব্রত বলে—তোমার মা-মণির এত লেগেছে? চমৎকার! চমৎকার!··· যেখানে ভগবান গরীব কেরাণীকে ব্যঙ্গ করে সেখানে এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে? মানুষ মানুষকে ব্যঙ্গ করলে সহ্য করা যায় কিন্তু ভগবানও যদি ছোট-বড়র বিচার করেন, সেখানে—

সহস্র অভিমানে চোখের জল ঠেলে আসে দেবব্রতর—হায় রে! কেরাণীর আবার রবিবারের স্বপ্ন!

গরুড়ে আমন্ত্রণ

কাদের নওয়াজ

কাতর স্বরে তোমায় ডাকি,
নারায়ণেই বহন করি
এস আমার গরুড় পাখি!
ধরা তোমার "বিনতা" মা,
দুঃখ যে তার আর সহে না
ঘুচাও বেদন কাঁদন তাহার
অমৃতেরই ভাণ্ড আনি'।

আসে প্রলয় আকাশপথেই,
ছুটছে রণ-ক্ষেত্র 'পরেই
নর-শোণিত খরস্রোতেই।
বাঁচাও মরে নিখিল-শরণ!
কান্ত-উছল উজল নয়ন—
বারেক দেখাও ধরার পরেই,
আনো আনো শান্তিবাণী।

ক্ষুধায় মরে প্রাণ যে শিশুর,
দুধ নহে গো খুদ শুধু দাও,
কোথায় আছ আজকে 'বিদুর'!
ধরার হৃদি-কালিন্দী মাঝ
কালিয়া-নাগ রয় যদি আজ
বিনাশ কর বল যে তাহার
রাখালেরই রাজায় আনি'।

সাপের পিছে পাঠাও নকুল,
ধানের চেয়েও অধিক যে চাই
বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল,
পাষণ্ডেরে চাবুক হানো,
শান্তি আনো, শান্তি আনো;
এস গরুড় ধরার 'পরেই
ডাকছে তোমায় সকল প্রাণী।

উদয়ন-কথা

প্রিয়দর্শী

বাসবদত্তার স্বপ্ন

প্রথম পর্ব

বৎসরাজ উদয়ন অবন্তিরাজপুত্রী বাসবদত্তাকে বিবাহ করবার পর নূতন রাণীকে ছেড়ে আর এক তিল সময়ও কাটাতেন না। দিন-রাত তিনি অন্তঃপুরেই থাকতে আরম্ভ করলেন—রাজকার্য্যের দিকে তাঁর আর মোটেই দৃষ্টি রইল না। এ অবস্থায় মহামন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের উপরই রাজ্যভার এসে পড়ল—আর প্রধান সেনাপতি রুমণ্বান্ এই কাজে তাঁকে যতটা সম্ভব সাহায্য করতে লাগ্‌লেন। কিন্তু যৌগন্ধরায়ণ যত বড়ই কূটবুদ্ধি মন্ত্রী আর রুমণ্বান্ যতই সাহসী সেনাপতি হোন্ না কেন, তাঁরা ত রাজা নন কেউই। প্রজারা তাঁদের শাসনে অবশ্য বেশ সুখেই ছিল, আপদে বিপদে অভিযোগ জানালে সুবিচারও পেত ঠিক, তবু তারা চাইত রাজা নিজে রোজ এসে সিংহাসনে বসুন, নিজের কাণে প্রজাদের সব অভাব-অভিযোগ শুনে বিচার করুন, মন্ত্রী-সেনাপতিরা রাজার সহকারী হ'য়ে রাজকার্য্যে সহায়তা করুন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, একটি দিন এক ক্ষণের তরেও রাজার দর্শন মিলবে না—রোজ রোজ মন্ত্রী-সেনাপতির সামনে গিয়ে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াতে হবে—এই ব্যাপারটাই ক্রমশঃ প্রজাদের কাছে হ'য়ে উঠতে লাগল অসহ্য। ধীরে ধীরে তাদের ভিতর একটু অসন্তোষের মৃদু গুঞ্জন দেখা দিল। তখন চতুর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বুঝলেন—গতিক সুবিধার নয়; এবার মহারাজ উদয়নকে যে কোন কৌশলে অন্তঃপুরের আওতা থেকে রাজসভায় টেনে বা'র ক'রে আনতে হবে, না হ'লে প্রজাদের অসন্তোষ ক্রমে বিদ্রোহে পরিণত হ'তেও হয়ত বিশেষ দেরী হবে না।

এই ভেবে তিনি একদিন গভীর রাত্রিতে সেনাপতি রুমণ্বানকে নিজের বাড়ীতে ডেকে আন্‌লেন। নির্জ্জন ঘরে দুই বন্ধু মুখোমুখি ব'সে অনেক ক্ষণ ধ'রে রাজ্যের হিত-চিন্তায় নানারকম পরামর্শ করতে লাগলেন।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন—'শোন বন্ধু রুমণ্বান্! আমাদের মহারাজ পাণ্ডবদের বংশধর। কুলক্রমে সমস্ত পৃথিবীর উপর একচ্ছত্র সম্রাট হওয়াই তাঁর শোভা পায়। কিন্তু সে দিকে তাঁর মোটেই দৃষ্টি নেই—উলটে আজ ক' বছর ধ'রে তিনি প্রজাদের কাছেই অদৃশ্য হ'য়ে পড়েছেন। আমাদের হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্তে মেয়ে-মহলে আছেন—নাচ-গান নিয়ে। কখনও যদি বাইরে বেরোন ত সে কেবল মৃগয়ায় যাবার জন্যে। আমরা অবশ্য যথাসাধ্য রাজকার্য্য চালাচ্ছি—কিন্তু লক্ষণ বেশ দেখা যাচ্ছে যে প্রজারা তাতে সন্তুষ্ট নয়। অতএব, বন্ধু! এমন একটা ফন্দী আঁটো দেখি, যাতে ক'রে এই পর্দ্দানসীন রাজাটিকে আবার লোক-সমাজে টেনে বার করা যায়। শুধু তাই বা কেন, পিতৃ-পিতামহের আমলে যেমন সমস্ত পৃথিবী তাঁদের শাসনে ছিল, ঠিক তেমনই ইনিও আবার যাতে সসাগরা ধরার আধিপত্য ফিরে পান, তার ব্যবস্থা করা দরকার'।

রুমণ্বান্ শুনে বললেন—মন্ত্রিবর! আমার মাথায় ফন্দী আসে কম। গায়ের জোরে যতটা হয়, তা আমি প্রাণ-পণেও করতে রাজি। কিন্তু ফন্দী ত কিছুই বুদ্ধিতে যোগাচ্ছে না। তবে যদি বলেন ত একবার অন্তঃপুরে ঢুকে গিয়ে মহারাজের হাত ধ'রে টেনে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিই'।

যৌগন্ধরায়ণ শুনে হেসে বল্‌লেন—'তা তুমি পার বন্ধু! কিন্তু অন্তঃপুরে ঢুকবে কি ক'রে? এ ত আর প্রদ্যোতের সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ নয় যে মরিয়া হ'য়ে অস্ত্র চালাবে। যখন দেখবে যে অন্তঃপুরের দোরে প্রমীলার রাজ্যের মত নারী-বাহিনী সশস্ত্র দাঁড়িয়ে, তখন তাদের সঙ্গে লড়বার মুখ থাকবে কি তোমার'?

সেনাপতি সবিস্ময়ে মন্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে একটু লজ্জিতভাবে বল্‌লেন—'তাই না কি! কি আপদ্। মেয়েদের সঙ্গে লড়ব কি! ছিঃ!'

যৌগন্ধরায়ণ—'তবেই বোঝ ভায়া! ব্যাপারটা কতদূর ঘোরাল হ'য়ে উঠেছে। দেখ বন্ধু, এরকম সোজা চালে রাজা মাত হবেন না। খুব সন্তর্পণে ঘুঁটি চালতে হবে, যাতে আমাদের বল না মারা যায়'।

রুমণ্বান্—'শুনি মন্ত্রিবর! আপনার চালটা কি রকম'?

যৌগন্ধরায়ণ—'দেখ সেনাপতি! মহারাজের সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্য পাবার পথে দুটি কাঁটা এতদিন ছিল। একটি তার আপনি উঠেছে—বুঝতেই পারছ এটি উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডমহাসেন প্রদ্যোত—নূতন রাণীর বাবা। তিনি এখন আর মহারাজের শত্রুতা করবেন না—এটা নিশ্চিত। আর একটি কাঁটা বাকী আছে—সেটি মগধরাজ দর্শক*। তাঁকে কোন রকমে মহারাজের সঙ্গে কোন একটা সম্বন্ধে বাঁধতে পারলেই নিশ্চয় কাজ হাসিল হবে। শুনেছি তাঁর একটি ভগিনী আছেন পরমা সুন্দরী—নাম তাঁর পদ্মাবতী। তাঁর সঙ্গে আমাদের মহারাজের বিয়ের ঘটকালিতে নামব ভাবছি'।

এই সময় রুমণ্বান্ খুব উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ব'লে উঠলেন—'হাঁ হাঁ! ঠিক ঠিক। তা' ছাড়া আমি আরও শুনেছি যে পদ্মাবতীকে যিনি বিবাহ করবেন, তিনি হবেন রাজচক্রবর্ত্তী। তবে মন্ত্রিবর। একটা মস্ত সমস্যা! মহারাজ আমাদের বাসবদত্তাকে যে রকম ভালবাসেন, তাতে এরকম সতীনের মুখে নিজের আদরের ছোট বোন্‌টিকে সঁপে দিতে মগধরাজ রাজী হবেন কেন? আপনার ঘটকালি সফল হবার ত কোন সম্ভাবনাই দেখ্‌ছি না'।

যৌগন্ধরায়ণ মৃদু হেসে উত্তর করলেন—'বন্ধু! সোজা আঙুলে কি আর ঘি উঠবে? একটু কৌশল করতে হবে। মহারাজকে

*মহাকবি ভাস তাঁর 'স্বপ্নবাসবদত্ত' নাটকে বলেছেন—পদ্মাবতী মগধরাজ দর্শকের ভগিনী। পক্ষান্তরে, ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' ও সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরে' পাওয়া যায় যে পদ্মাবতী মগধাধিপতির কন্যারত্ন। কথাসরিৎসাগরে মগধেশ্বরের নামও দেওয়া আছে—'প্রদ্যোত'। খুব সম্ভবতঃ ইহা ভুল। কারণ, দর্শক ও পদ্মাবতী ভ্রাতা-ভগিনী। দর্শকের পিতার নাম ছিল—অজাতশত্রু বা কুনিক (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৪—৫২৭)।

কোন ছলে অন্তঃপুর থেকে একবার সরিয়ে দিতে হবে। তারপর রাণীকে কোথাও লুকিয়ে রাখা যাবে। শেষে রাণীর বাসস্থানে আগুন লাগিয়ে মহারাজকে জানাতে হবে যে নূতন রাণী হঠাৎ আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। এ শুন্‌লে মহারাজ হতাশ হ'য়ে অগত্যা রাজকার্য্যে মন দেবেন। আর এদিকে রাণীর পুড়ে মরার খবর আগুনের মতই হু-হু ক'রে চারদিকে রাষ্ট্র হ'য়ে পড়বে। এমন মুখরোচক সংবাদ মগধরাজের কানে পৌছাতেও দেরী হবে না। তখন অবসর বুঝে মহারাজকে রাজী করিয়ে আমি যদি মগধরাজের কাছে কথাটা পাড়ি, সে অবস্থায় ত আর মগধরাজ আমাদের মহারাজের মত সুপাত্রকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না'।

রুমথান্ মাথা চুলকে বল্‌লেন—'তা বটে! কিন্তু একটা কথা কি জানেন মন্ত্রিবর! এত বড় একটা দুঃসাহসের কার্জ করাটা কি ঠিক হবে'?

যৌগন্ধরায়ণ—'কেন হবে না শুনি? তবে শোন সেনাপতি। আমি এর আগেই মগধরাজের কাছে গিয়ে পদ্মাবতীকে চেয়েছিলুম মহারাজের জন্যে। তাতে মগধরাজ কি উত্তর দিয়েছিলেন—শুনবে'?

রুমথান্ আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—'তাই না কি! কি—কি উত্তর দিয়েছিলেন'?

যৌগন্ধরায়ণ—'বল্‌লেন তিনি—"তোমাদের বৎসরাজ বাসবদত্তাকে বড় ভালবাসেন। পদ্মাবতীকে আমি তাঁর হাতে দিলেও তিনি বাসবদত্তার ভালবাসাতেই মুগ্ধ থাক্‌বেন—পদ্মাবতীর দিকে একবারও ফিরে চাইবেন না। পদ্মাবতী আমার আদরের ছোট বোন—তাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। তাকে এভাবে যাবজ্জীবন অসুখী আমি কি ক'রে করি? ঈশ্বর না করুন, যদি কোন দিন বাসবদত্তার কিছু মন্দ হয়, তখন আপনার কথা বিবেচনা ক'রে দেখব"। এখন দেবী বাসবদত্তা পুড়ে মরেছেন এই সংবাদ চারদিকে একবার রটাতে পারলেই মগধরাজ আমার প্রস্তাবে রাজী হবেন। আর বিয়ের পর ত বাসবদত্তাকেও এনে হাজির ক'রে দেব। দুই রাণী ও সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্য হাতে পেলে তখন আমাদের মহারাজও এ ষড়যন্ত্রের জন্য আমাদের উপর বিরক্ত হবেন না—এটাও ঠিক'।

সেনাপতি বল্‌লেন—'কিন্তু একটা ভয়! হঠাৎ বাসবদত্তার মৃত্যুর সংবাদে মহারাজের মনে এমন আঘাত লাগতে পারে, যাতে তাঁর জীবন-সংশয় পর্য্যন্ত হ'তে পারে'!

যৌগন্ধরায়ণ—'আরে পাগল না কি! মহারাজ যে আমাদের বীরের বংশ—নিজে বীর! স্ত্রী-বিয়োগে মারা পড়ে না বীর। রামচন্দ্র কি সীতাকে হারিয়ে হা-হুতাশ ক'রে মারা গিছলেন, না শত্রু-বধের জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছিলেন যুদ্ধে। দেখো সেনাপতি! এতে শেষে ভালই হবে'।

রুমথান্—'আমি দাদা! তোমার মত অত বুদ্ধি ধরি না। তবে দেখো শেষটা যেন না পস্তাতে হয়'।

যৌগন্ধরায়ণ—'হাঁ একটা কথা! রাণীকে আমাদের ষড়যন্ত্রের দলে নিতে হবে। তিনি হয় ত সতীনের আশঙ্কায় একটু মনে কষ্ট পাবেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী ও পতিব্রতা। স্বামীর ভাবী মঙ্গলের জন্যে সাধ্বী নারী এটুকু আত্মদান করবেন বৈ কি! আর রাণীর ভাই গোপালকে আমাদের দলে নিতে হবে। তা হ'লে উজ্জয়িনীরাজ, তাঁর রাণী আর ছেলেদের কাছ থেকে কোন ভয়ের আশঙ্কা থাক্‌বে না'।

রুমথান্—'তবে গোপালকে অবিলম্বে ডেকে পাঠান মন্ত্রি-ম'শায়। তাঁর যদি এতে মত থাকে, তবে কাজ আরম্ভ হোক'।

যৌগন্ধরায়ণও 'আচ্ছা' ব'লে সে রাত্রির মত পরামর্শ শেষ করলেন। [ক্রমশঃ

আমার দেশ

শ্রীনীলরতন দাশ, বি-এ

আমার দেশের সূর্য্যকিরণ ছড়ায় কত স্বর্ণরেণু,
মাঠে মাঠে ধেনু চরায় বাজিয়ে রাখাল মোহন বেণু।
কান্তারে ফোটে নানাবিধ ফুল, গন্ধে মাতায় প্রাণ;
বনে বনে শ্যামা দোয়েল কোয়েল বুলবুলি করে গান।

আমার দেশের ফুলে ফুলে মধু, ফলে ফলে রস শাঁস;
সরোবরে কেলি করে পানকৌড়ি চখাচখী আর হাঁস।
ঝর্ণা হেথায় হর্ষে উছলি' শিলার বক্ষে লুটে!
সিন্ধুর ডাকে উতরোল নদী লহরী তুলিয়া ছুটে।

আমার দেশের সুনীল গগন মেঘের মিনার গড়ে,
ধূসর পাহাড় শিখরে তাহার তুষার-কিরীট পরে।
হীরা-পান্নার জ্যোতিসম নভে লক্ষ তারকা জ্বলে;
বনানীর বুকে জ্যোছনাধারায় আলোছায়া-খেলা চলে।

আমার দেশের দীঘিভরা জল বারোমাস সুশীতল,
ভ্রমরে ডাকিয়া মধু করে দান বিকশিত শতদল।
তেপান্তরের মাঠের মধ্যে বটের স্নিগ্ধ ছায়া,—
শ্রান্ত পথিকে আদরে ডাকিয়া জুড়ায় ক্লান্তকায়া।

আমার দেশের ভাই-ভগিনীর বুকভরা প্রীতি স্নেহ,
জায়া-জননীর মায়া-ভালবাসা ভুলিতে পারে না কেহ;
এ দেশের বুকে জন্ম আমার তারই কোলে যেন মরি;
এ দেশের ঘরে আসি যেন ফিরে জনম জনম ধরি'।

রাজপুত্র

—বাণীকুমার

[প্রথম পর্ব্ব]

…সঙ্গীত-সূত্রপাত…

[মায়ের কোলে ব'সে তোমরা রাজপুত্তুরের গল্প শুনেছ। তোমরা যখন এই রাজপুত্তুরের কথা শুনবে, তখনি মনে হ'বে—তার সঙ্গে তোমাদের কত চেনা। সে যে চিরকালের নিত্যদিনের রাজপুত্তুর। রাজপুত্তুর লেখাপড়া করে, কাজে মেতে ওঠে, আবার তার পড়ার শেষে ছুটিও মেলে। সেই ছুটির মধ্যে সে এমনি বীরের খেলা খেলে, যে খেলায় সে সংসারটাকে চিনে নিতে পাবে। দৈত্যপুরীর খোঁজ নিতে কি তোমাদেরও সাধ যায় না? —সেই তেপান্তরের মাঠ, সেই সাত-সমুদ্দুর তেরো নদী, সেই মায়াবতী, সেই রাজকন্যা,—সব গোড়াকার আর সব শেষের রূপ-কথা তো এই!…

তোমরা তৈরী হ'য়ে নিয়েছ? রাজপুত্তুরের সঙ্গে তোমরাও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়্‌বে এসো…ঐ শোনো…]

(রাজপুত্র ও সঙ্গীদল)—গান

ওরে—রে—রে ভাই!
ছুটির বাঁশীর সুর নীল-গগনে,
বনে বনে আর বাতাসে বাতাসে পাহাড়ে নির্ঝরে
মনে মনে।
ছাড়া পাখীর মত আনন্দরে,
আমার পরাণ আজি নেচে ফেরে,—
সপ্ত সমুদ্দুরে পাড়ি দেবো দূরে—
প্রবাল-ঘেরা শ্যামল দ্বীপের কোণে।
অসীমকালের রাজটীকা ভালে, (তোমার)
অগম-পথে কে দীপটি জ্বালে!
কেন এ বাঁধন তবে—মুক্তি পেতেই হ'বে,
চঞ্চলতা জাগে ক্ষণে ক্ষণে।

রাজপুত্র। সত্যি কথা। আর সোনার খাঁচায় পোষা পাখীর মত প'ড়ে থাক্‌তে মন চায় না—মাধব!—পুঁথির পড়া সার ক'রেচি—এবার বেরিয়ে পড়্‌তে চাই। চাই ছুটি।

মাধব। বলো কি—বন্ধু!—এ-সাধ আবার কেন? রাজপুত্তুরের বাইরে বেরোনো মানেই তো দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো!—ওতে অনেক বিপদ! পথ-ঘাটের সঙ্গে তোমার কতটুকু চেনা আছে?

রাজপুত্র। চেনা করতেই তো সব ছেড়ে বেরোতে চাই।

মাধব। পথে যদি বাধা আসে?

রাজপুত্র। সব বাধা চুরমার ক'রে দোবো। তেপান্তরের মাঠ দেখে রাজকুমার কখনো ফেরে না, সাতসমুদ্দুর তেরো নদী সে পার হ'য়ে যায়। পথে চলায় ভয় রাজপুত্তুর জানে না।…তাই আমার পণ—দৈত্যকে করবো জয়, রূপোর কাঠিতে ঘুমপাড়ানো রাজকন্যাকে জাগাবো সোনার কাঠি ছুঁইয়ে, তাকে করবো উদ্ধার …সারা পৃথিবীকে নোবো চিনে।

মাধব। মহারাজের মত যাবে? বিশেষ রাণীমা-র?

রাজপুত্র। মত তাঁদের দিতেই হ'বে…এ-যে চিরদিনের নিয়ম। রাজপুত্তুরকে এই রাজ্যটুকুর মধ্যে বেঁধে রাখ্‌বে কে? জানো না—রাজপুত্তুর একলা দাঁড়িয়ে কি পণ করে?

মাধব। কথাগুলো আমার কেমন কেমন লাগচে—রাজকুমার! ঘরের এই আরাম—এই আমোদ—

রাজপুত্র। থামো! অনেকদিন পণ্ডিতরা আমাকে ভুলিয়েচে—পুঁথি মুখস্থ করিয়ে, আর নয়! আমার মন আড়ষ্ট হ'য়ে যাচ্চে।

মাধব। সর্ব্বনাশ! এমন আরামকেও ঠেলে ফেল্‌তে সাধ যায়?

রাজপুত্র। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! মায়ের আঁচলে বাঁধা থাক্‌লে কি চলে? সমস্ত কুড়েমির বেড়া ভাঙ্‌তে হ'বে। রাজপুত্রের প্রতিজ্ঞা কি জানো না?

মাধব। কি—আবার!

রাজপুত্র। শোনো—তবে!

(রাজপুত্র ও সঙ্গীদল)—গান

মায়ের আঁচল নয় বীরেরি ছায়া!
সোনার খাঁচার মত ঘরেরি মায়া।
অলস খেলাখানি—
ভাঙিতে হ'বে জানি,—
হানিতে হ'বে নিতি বাধারি কায়া।

গুরুম'শায় হিতৈষী। আরে—চুপ্—চুপ্! তোমাদের এতো উল্লাস কিসের?—মহারাণীর মন খুব খারাপ!

মাধব। কেন—গুরুম'শায় হিতৈষী ঠাকুর?

হিতৈষী। জানো না? মহারাজ যে রাজকুমারকে পৃথিবী বেড়াতে পাঠাচ্চেন! যাত্রার আয়োজন সব ঠিক!

মাধব। অ্যাঁ—বলেন কি—গুরুম'শায়! তা' হ'লে নিতান্তই যাত্রা করতে হবে?

হিতৈষী। হ্যাঁ—স্বয়ং মহারাজের ইচ্ছা—

মাধব। কিন্তু এতো শীগ্‌গির কেন? রাণীমার মনটা একটু ভালো হ'লে না হয়…

রাজপুত্র। মাধব, ঘরের কোণে লক্ষ্মীর নিরীহ বাহন পেঁচাটি হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে চাও কেন?—গুরু হিতৈষী, আমি গোড়া থেকেই জানি—বাবা আমাকে দেশ বেড়াতে পাঠাবেন। আমিও প্রস্তুত।

মাধব। কিন্তু মহারাণীর মনটা যে বড্ডই খারাপ!…ঐ যে রাণীমা!…দেখ্‌চো—মুখখানা যেন কান্না-কান্না ভাব!

রাজপুত্র। মাধব! ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে তোমার এতো ভয় কেন?

মাধব। ভয়…ভয় আবার কিসের! কিন্তু মন উতলা… রাণীমা যে কাঁদচেন!

রাজপুত্র। তুমিও যে কাঁদ্‌তে ব'সে গেলে! ছিঃ! স'রে যাও, মাকে আমি বুঝিয়ে বল্‌চি!···মা—তোমার চোখে জল কেন?

রাণী। বাছা—তুই নাকি আমাকে ছেড়ে দেশ বেড়াতে যাবি?—

রাজপুত্র। সব রাজপুত্তুরই তো যায়—মা! মায়ের আঁচল ধ'রে ঘরে ব'সে থাক্‌লেই কি মানুষ হওয়া যায়?

রাণী। বলিস্ কি রে! তুই যে আমার ননির পুতলি, সংসারের তুই কি জানিস্—বাছা! তোকে কোন্ প্রাণে নানান বিপদের মুখে ছেড়ে দোবো?—

রাজপুত্র। যার বিপদ নেই—তা'র ভরসাও নেই মা! সাহসের শিক্ষা ঘরে ব'সে কি হয়? মা-গো—তুমি তো জানো,—রাজপুত্তুর কখনো হার মানে না! আমি দেখ্‌তে চাই—নানা রাজ্য—নানা দেশ—নানা মানুষ···কত আনন্দের মেলা!

রাণী। ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে কি আনন্দ মিল্‌বে? রূপকথা প'ড়ে প'ড়ে এই সব কল্পনা ক'রে রেখেচিস্ বুঝি? গুরুম'শায়, রাজকুমারকে সুবুদ্ধি দিয়ে মানুষ ক'রে না তুলে, তাকে কেবল রূপকথা আর ইন্দ্রজালের গল্প পড়িয়েচো? ওর মাথা গেছে খারাপ হ'য়ে।

হিতৈষী। মহারাণী, আগে সব পাঠ শেষ ক'রে—তবে রূপকথার গল্প পড়ানো হয়েছে। সে-পড়া রাজপুত্রের খেলা।

রাণী। এ যে সর্ব্বনেশে খেলা! ও কি শেষে রূপকথার রাজপুত্তুর হ'তে চায়? সোনার মাণিককে আমার পথের ধূলোমাটিতে ছেড়ে দোবো?

মাধব। আমিও তাই বলি—রাণীমা! রাজকুমার আমার কথা কানেই তুল্‌চে না!

রাজপুত্র। থামো—মাধব!···মা, আমি রাজার ছেলে: আমি যদি ঘরে ব'সে থাকি—লোকে নিন্দে কর্‌বে। তুমি ভাব্‌চো কেন? আমি দৈত্য জয় ক'রে ঘুমন্তপুরী থেকে রাজকন্যাকে যয়ে নিয়ে আসবো। নইলে কিসের রাজপুত্র আমি?

রাণী! না: তুই বুঝবি নারে মায়ের প্রাণ! যাই মহারাজের কাছে! তিনি যদি আমার কথা রাখেন! কুলদেবতার পূজো সাজাই গে—আরতির কাজল দোবো তোর চোখে পরিয়ে—দেবতাকে মনের কথা জানাবো—তখন বাইরের টানে তোর আর মন তুল্‌বে না! মা-কে ফাঁকি দিয়ে ছেলে চলে যাবে ঘর ছেড়ে! দেখি—কেমন ক'রে যাস্?

রাজপুত্র। মা—আমি যাবোই যাবো! কেউ আমাকে ধ'রে রাখ্‌তে পারবে না।

রাণী। বুঝেছি—তোর ঘরের সুখে অরুচি হয়েচে—তাই অজানা পথের দুঃখ-কষ্ট সেধে নিতে চাস্!

রাজপুত্র। হ্যাঁ মা: সেই আমার সঙ্কল্প! কি রকম তা' শুনবে?

(রাজপুত্র ও সঙ্গীদল)—গান

যদি পথে আসে বন-গহন—
অগম-সাগরে ঢেউয়ের রণ—
একাকী—একাকী
নব পথ আঁকি'—
যেতে হ'বে দূরে রাখিতে পণ।
কালো পাথরের ভাঙি ভ্রূকুটি—
পাহাড়ে ফাটায়ে চল্‌বো ছুটি'।
ভাঙিতে—গড়িতে
লবো শেষে জিতে—
জয়ধ্বজায় ঢাকি' গগন।

রাণী। না—না, তুই কিছুতেই শুনবি না রে! ওগো মহাদেবতা—আমার ছেলেকে ঘরে বেঁধে রাখো—বাঁধন করো আরও শক্ত—সমারোহ ক'রে তোমার পূজো দোবো!

রাজপুত্র। যতই পূজো দাও—সে বাঁধনে আমাকে বাঁধ্‌তে পারবে না, মা!

রাণী। ওরে বাছা আমার—অমন নিষ্ঠুর কথা আর শোনাস্ নি!

রাজপুত্র। আমি রাজপুত্তুর—আমি কি মা-র আঁচল-ধরা দুধের ছেলে? গুরুঠাকুর—আমাদের যাত্রার আর কত দেরী?—

হিতৈষী। বোধ হয় আর বেশী দেরী নেই—মহারাজের তাই ইচ্ছা। চলো—আমরা পাঠাগারে একবার যাই—দরকারী পুঁথি-পত্তরগুলো গুছিয়ে নিতে হ'বে। পথে অনেক কাজে লাগ্‌তে পারে!

রাজপুত্র। চলুন—গুরুদেব! আয়োজন করিগে! মা-র কান্নায় রাজপুত্তুর কি ভোলে?—পাহাড়-চুড়ো কি ঝর্ণাকে ধ'রে রাখ্‌তে পারে? মেঘের জল কি মেঘের বাঁধন মানে? মাধব!

মাধব। অ্যাঁ—!—! কি বন্ধু?

রাজপুত্র। তুমি আমার সঙ্গী হ'বে তো?—

মাধব। অ্যাঁ—হ্যাঁ—অ্যাঁ তা' ছাড়া আর উপায় কি! যেতেই হ'বে—আমি যে তোমার বয়স্য!

রাজপুত্র। তা' হ'লে চ'লে এসো!

মাধব। চলো...চ—লো...হ্যাঁ—কি বলে—চ—লো...ঐ-যে মহারাজ আস্‌চেন! একবার—দেখা ক'রে ব্যাপারটার ভালো-মন্দ চুল চিরে বিচার ক'রে... তারপর না হয়—যা হোক্ একটা...

রাজপুত্র। না মাধব—এখন নয়··যাত্রার সময় দেখা কর্‌বো। এসো!—

[রাজপুত্র মাধবের হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে প্রস্থান কর্‌লে
—তাদের পিছু পিছু হিতৈষী ঠাকুরও চল্‌লো···
—রাজা প্রবেশ কর্‌লেন]

রাজা। রাণী—কাঁদ্‌চো কেন?

রাণী। ছেলেকে রাজ্যের বাইরে পাঠানোই কি তা' হ'লে ঠিক কর্‌লে—মহারাজ?

রাজা। রাজকুমারকে দেশভ্রমণে পাঠাতেই হ'বে, নইলে তা'র শিক্ষা বাকী থেকে যাবে। তোমার কান্না শোভা পায় না, রাণী! বই প'ড়ে যা' শেখা যায়—রাজপুত্র পণ্ডিত গুরুর কাছে সব শিখেছে। এখনো অনেক শিখ্‌তে হ'বে, অনেক দেখ্‌তে হ'বে। এই পৃথিবীটাকে সে ভালো ক'রে জানুক্। আদুরে বাছা হ'য়ে ঘরে থেকে সে কি করবে?—

রাণী। ঘরের বাইরে কত বিঘ্ন—কত আপদ! অতটুকু ছেলে—এতো বড় পৃথিবীকে জান্‌বার কি দরকার?—সেইজন্যে এই কষ্ট সেধে নিলেই কি জীবনে খুব দাম মিল্‌বে? তোমার কি তাই ধারণা?—কুমারকে নানা বিপদ, নানা লোভের মাঝখানে যেতে দিতে আমার মন চায় না। বাইরের জগতের ওপর আমার কোনো বিশ্বাস নেই।

রাজা। সাহসের শিক্ষা ঘরে ব'সে হয় না—রাণী! মানুষের জীবন যদি চিরকালের হোতো—তা' হ'লে আমরা ছেলেকে ঘরের মধ্যে আদরে, যত্নে বসিয়ে রাখ্‌তে পার্‌তুম। সে যদি নিজে মানুষ হ'য়ে না ওঠে, কে তাকে রক্ষা করবে? বাপ-মার স্নেহ জীবনের হাজার দুঃখ, অনিষ্ট, অমঙ্গল বা মন্দকে ঠেকিয়ে রাখ্‌বার জন্যে ছেলের চারধারে দেওয়াল খাড়া করতে পারে, কিন্তু সে-স্নেহ ছেলের চারপাশে একটা ভুলের জগৎ সৃষ্টি করে—সে জগৎ সত্য নয়। আমাদের মৃত্যুর পর রাজপুত্রকে লাখো লাখো প্রজার ওপর ব'সে রাজ্য চালাতে হ'বে—একলা। তখন তা'কে চিনে নিতে হ'বে প্রকৃত বন্ধু কে!

রাণী। তবে এই সমস্ত পণ্ডিত ম'শায় এতোকাল কি শিক্ষা দিলে?

রাজা। শিক্ষা ঠিকই দিয়েচে—সেই চিরকালের একঘেয়ে শিক্ষা। এখন গুরুম'শায় আর পুঁথির ওপর চ'টে গিয়ে সরস রূপকথা আর মনোহর ইন্দ্রজালের গল্প পড়্‌তেই রাজপুত্রের খুব আনন্দ। তাই আমার ইচ্ছা—রূপকথার রাজপুত্র আর সত্যিকারের রাজপুত্রের মধ্যে কি প্রভেদ—সে জানুক্!

রাণী। সে কি! আবার রূপকথার দেশের খোঁজ নেবার জন্যে কুমার ছেলেমানুষ হ'তে চায় না-কি?

রাজা। একেবারেই নয়…পুঁথির পাঠ আর অভিজ্ঞতার পাঠ এক জিনিস বলা যায় না। প্রথমেই আমাদের শক্ত মাটির 'পরে সুনিশ্চিত হ'য়ে দাঁড়াতে হ'বে—এই হোলো ঠিক রাস্তা, তারপরে সেই মাটির ওপর ছড়াতে হ'বে আরও নরম মাটি, সেই মাটিতেই ফুল ফুটে ওঠে! কোমল ফুলের বুকে কঠিন পাথর-কুঁচি বিছিয়ে দেওয়া নয়, কিংবা ভারী একটা পাষাণ চাপিয়ে দেওয়া নয়!

রাণী। বুঝলুম—কিন্তু মানুষের জীবনে এ-কথা খাটে না। আমাকে বলো, রাজন্—আমাদের ছেলের দেশ-ভ্রমণের সঙ্গে এ-র কি যোগ আছে?

রাজা। কুমারের ভ্রমণ সত্য আর অলীকের মধ্যে যে সেতু তৈরী করবে—সেই সেতু আমাদের গ'ড়ে দিতে হবে—ঐ ছেলেরই মুখ চেয়ে। মানুষের জীবনই তেমনি একটি সেতু, যা' সত্য আর আর মিথ্যার মাঝখানে পাতা রয়েছে।…ঐ যে রাজকুমার, সহচর মাধব আর অধ্যাপক হিতৈষী!

[যাত্রার বেশে রাজপুত্র—মাধব ও হিতৈষীর প্রবেশ। মাধবের কাঁধে একটা বড় পোঁটলা ও হিতৈষীর বগলে ও কাঁধে দপ্তরের বোঝা]

রাণী। বাছা আমার—! সত্যিই কি ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়্‌বি?

রাজপুত্র। হ্যাঁ মা, আমি প্রস্তুত হয়েছি। এবার তোমার আশীর্ব্বাদ চাই!

রাণী। এই বিদায় দেওয়া যে কত কঠিন!

রাজা। জানি তুমি মা—কিন্তু রাণী তুমি, এ-কথা মনে রেখো! রাজপুত্রকে বুকে তুলে নিয়ে তার মাথায় কল্যাণ-হাত বুলিয়ে দাও! ওর সাহস বা উৎসাহ চোখের জল ফেলে কেড়ে নিয়ো না!

রাজপুত্র। মহারাণী—মা—আমি খুসি-মনে যাচ্ছি, বিশ্বস্ত অনুচরেরা আমার সঙ্গী, আমার শিক্ষক আর বন্ধু মাধব আমার কাছে কাছে থাক্‌বে।

রাণী। বুঝেছি বাছা! তোমাকে ধ'রে রাখ্‌তে চাই না। মহারাজের সাধ—তুমি দশের হ'বে—দেশের হ'বে। আমি ভয় ক'রে আর অকল্যাণ করবো না—কপালে দোবো শ্বেতচন্দনের তিলক, শ্বেত উষ্ণীষে পরাবো শ্বেতকরবীর গুচ্ছ, কুলদেবতার আরতির কাজল দোবো তোমার চোখে পরিয়ে—পথে দৃষ্টির বাধা কেটে যাবে।…সব বেঁধে নিয়েছ? কিছু নিতে ভুল হয় নি তো?

রাজা। অতো সব বোঝা কিসের?

হিতৈষী। আজ্ঞে মহারাজ, এ-সব পুঁথি—ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাধুচরিত, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, মানচিত্র…

মাধব। আর আজ্ঞে, এ-সব খাবারের পুঁট্‌লি—এইগুলোই আমাদের সবচেয়ে বেশী দরকারে লাগ্‌বে, তাই বোঝাটা একটু ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

রাণী। কুমার, এই সোনার মোহরগুলো আমি জমিয়েছি, তুমি রাস্তায় খরচ করবে—এই নাও! আর শোনো, তোমরা তোমাদের রাজপুত্রের ওপর বিশেষ মনোযোগ রেখো! এতটুকু ভুল যেন না হয়!

হিতৈষী। মহারাণী, কোনো ভাবনা নেই! রাজপুত্র পরম জ্ঞানী হ'য়ে ফিরবে।

মাধব। কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হ'বে না—রাণী-মা! আপনার দিব্যি! কুমারকে আমি আরও ভারী—আরও মোটা ক'রে ফিরিয়ে আন্‌বো।

রাণী। সেইটেই খুব বেশী দরকার মাধব! দেখো: রাজপুত্র সমুদ্রের মাছ, বুনো চামরী গায়ের দুধ, মায়াবৃক্ষের ফল, কল্কে ফুলের মধু—এ-সব যেন না খায়! এ সমস্ত জিনিসে কুমারের বড় লোভ। হ্যাঁ: বেশী ক'রে পোষাক-আষাক নেওয়া হয়েছে?

হিতৈষী। সমস্ত রকম সজ্জা! হ্যাঁ—তা'—কোনো ত্রুটী নেই —মহাদেবী!

রাণী। আমি নিজের হাতে তিন বারো ছত্রিশটি উত্তরীয়ে যে চিকন তুলে দিয়েছিলুম—তোমার ব্যবহারের জন্যে—বৎস, সেগুলো কোথায়?

রাজপুত্র। এই যে মা! কিন্তু আমি শুনেছি যে রাজপুত্র—বাইরে যখন যায় সে সময়ে তার সাজের বাহার থাকে না! সে যদি সঙ্গে নেয়, তা' একটিমাত্র উত্তরীয়—ইন্দ্রধনু রঙের। রূপকথায় তো এ সমস্ত কিছুই পড়িনি। রাজপুত্র পক্ষীরাজের পিঠে চলে—ঘন বনের মধ্য দিয়ে, খাড়া পাহাড়ে রাস্তা কেটে, ভীষণ ঝড়-জল মাথায় ক'রে—তেপান্তরের মাঠ পার হয়, বড় বড় নদ-নদী সাঁতারে পেরিয়ে যায়, আবার সামনে পড়ে অতল সমুদ্দুর—তরী বেয়ে কূলে গিয়ে পৌঁছোয় সে, শেষে পাড়ি দেয় রাক্ষস-পুরীর দুর্গ-দ্বারে। কিন্তু রাজপুত্রের বেশ-ভূষা এতো কাণ্ড ক'রেও একেবারেই মলিন হয় না।

মাধব। আচ্ছা, এতো কাণ্ড না ক'রেও রাজপুত্তুরের বন্ধুদেরও কাপড়-চোপড় নষ্ট হয় কি? কেন না আমার দু'টি মাত্র জামা, এইটিই যা একটু ভালো। তাই বলছিলুম এই পোষাকটা নষ্ট হ'য়ে গেলে প্রাণে বড় কষ্ট পাবো!

রাজা। আর দেরী কোরো না! শুভযাত্রার সময় হ'য়ে এসেছে! সন্ধ্যা হবার আগেই যাত্রা করো!

রাণী। রোজ খবর পাঠিয়ো দূত-মুখে, হংস-মুখে, কপোত-মুখে! আশীর্ব্বাদ করি পথ শুভ হোক্! হ্যাঁ, দেবতার নির্ম্মাল্য তুলে নাও—উত্তরীয়ের খুঁটে বেঁধে রাখো। এসো, এসো! হ্যাঁ—হ্যাঁ: তোমরা মকরধ্বজ আর বৈদ্য-বড়ি নিয়েছ তো?

রাজা। ওঃ—নারী—নারী—দুর্ব্বলা নারী! তোমরা কিছুতেই মন শক্ত করতে পারো না!

হিতৈষী। মহারাজ, মায়ের এই ভালোবাসা, এই আদর-যত্নের চেয়ে কি জগতে আর কোনো জিনিস বড় আছে?

রাজা। জানি। কিন্তু ছেলেকে সত্যিকারের মানুষ ক'রে তুলতে হ'লে মা-কে হ'তে হবে কঠিন। মা-র আশীর্ব্বাদে সন্তানকে কোনো অমঙ্গল স্পর্শ করতে পারবে না।

রাণী। মঙ্গল শাঁখ বাজাও! (শঙ্খধ্বনি)

রাজা। বাজাও ভেরী—!

সকলে। শুভ হোক্—শুভ হোক্—শুভ হোক্ পথ!

(ভেরীনাদ)

[সম্মেলক গান]

রাজপুত্তুর যায় যায় যায় রে—
সোনার নায়ে।
চললো তরী ঐ শান্ত বায়ে।
বিধাতারি বর গলায় মালা, (তা'র)
আশা-অভয় নিয়ে রচা ডালা,
ব্রহ্মাস্ত্র রয় তা'র গোপন তূণে,
শক্তি যে বুকে তা'র রয় লুকায়ে।

* * *

[রাজপুত্র ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লো। কত দেশ-দেশান্তর ঘুরে সে এসে পড়লো এক বিচিত্র দেশে—যেখানে বাধা নেই, বন্ধ নেই—যেন ঝিমিয়ে-পড়া চেতনার রাজ্য। সেই দেশে চোখে পড়ে দু'টি মাত্র পথ: একটি কাঁটায় আর পাথরে ভরা,—অপরটি ফুল-বিছানো। সকলে পড়লো সমস্যায়: কোন্ রাস্তা তা'রা বেছে নেবে!]

[দুলকী-তালে সঙ্গীত···

হিতৈষী। রাজকুমার, দেশ-দেশান্তর তো অনেক ঘুরলে, এমন বিচিত্র দেশ কখনো দেখেছ?

রাজপুত্র। নতুন দেশই তো দেখতে সাধ ছিল, গুরু হিতৈষী!—এখানে বাধা নেই, বন্ধ নেই! কি বলো মাধব?

মাধব। হ্যাঁ—যেন ঝিমিয়ে-পড়া রাজত্ব—কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা ঠেকচে,—গা-টাও একটু-আধটু ছম্ ছম্ ক'রে উঠচে!

হিতৈষী। কেন—ভূত-পত্নীর দেশ ব'লে তোমার মনে হ'চ্চে নাকি? ভূত তাড়াবার আমি মন্তর জানি। কিন্তু এই দেশে দেখতে পাচ্চি—দুটি মাত্র রাস্তা। একটি কাঁটায় আর পাথরে ভরা, আর একটি ফুল-বিছানো রাঙা মাটির পথ।—এখন মহাসমস্যা, কোন্ পথে আমরা চলবো?

[সঙ্গীত-বৈচিত্র্য—যুগপৎ শুভ ও অশুভ ইঙ্গিত··

মাধব। সত্যিই তো, মাথা গুলিয়ে যাবার যোগাড়—আমরা এলুম কোথায়?

রাজপুত্র। হ্যাঁ, কোথায় এসেছি আমরা? নাম-না-জানা দেশ!—আপনি বললেন, গুরু হিতৈষী—আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে একটা গাঁয়ে এসে পৌঁছুবো—কই?—এখন দেখুন, আমরা পথ হারিয়েছি!

হিতৈষী। পথ হারিয়েছি! তা'হ'লে প্রমাণ দিতে হ'বে পুঁথি থেকে! আমাকে এখুনি ভূ-পরিচয়ের মানচিত্রটা দেখতে হ'চ্চে, এতে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য-নগর, পথ-ঘাটের নিখুঁৎ-নক্সা আঁকা আছে। ভয়-ভাবনা নেই—পুঁথি সহায়।

মাধব। হ্যাঁ, গুরুম'শায়, বুঝিছি দৌড়টা! আমি আগেই বলেছিলুম—আমরা ঠিক রাস্তা না ধ'রে বেচাল হ'য়ে পড়ছি!—

হিতৈষী। সকল দেশের সেরা পণ্ডিতরা মিলে সারা পৃথিবীর যে নক্সাটা তৈরী করেছেন, তা'র ওপর বিশ্বাস না রেখে, তোমার ছেলেমানুষী কথায় বিশ্বাস করতে হ'বে—বলতে চাও, মাধব?

মাধব। গরীবের কথা কি না!—তবে আমার ওপর বিশ্বাস রাখলে—খুব ভালোই হোতো!—

হিতৈষী। কেন—বলোতো?

মাধব। কারণ—আমি একশোবার এ-রকম রাস্তায় পায়ে হেঁটেচি—কি দিনে—কি রাতে।

হিতৈষী। সে-রকম রাস্তা চলার কোনো দাম নেই, কারণ তোমার গতির কোনো ঠিক-ঠিকানা থাকে না।

মাধব। যাই বলুন—গুরুম'শায়, মানচিত্রের নক্সা দেখে অঙ্ক ক'সে কি রাস্তা মাপা যায়? কে জানে—কোন্ চুলোর দোরে এসে পড়েছি?

হিতৈষী। ভাববার কি আছে? সামনে মাত্র দু'টি রাস্তা, এখানে আমাদের তাই বেছে নিতে হ'বে।

মাধব। বলুন—একটি রাস্তা বেছে নেবো। এটাকে কি ঠিক রাস্তা বলা যায়? এই রাস্তা দিয়ে মানুষের চলাচল আছে ব'লে তো মনে হয় না! যেন একটা গোলকধাঁধা, আঁকাবাঁকা, ঠিক যেন মানুষ-ধরা ফাঁদ, কাঁটা-গাছে ভরা, পাথর-কুঁচিতে জরোজরো! ঐ দিকের রাস্তাটাই—রাস্তা, ঐটেতেই আমরা চলবো। পায়ে চলার পথ—একেবারে সোজা চ'লে গেছে, যেন একটা লাল সরলরেখা, কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন! এই রাস্তায় যাত্রা করলে নিশ্চয় আমরা কোনো একটা বড় নগরে পৌঁছে যাবো।—

রাজপুত্র। মূর্খ তুমি! ঐ রকম সাজানো ফুল-বিছানো পথ দেখলেই সকলের ইচ্ছে হয়—ঐ পথেই হাঁটি। কিন্তু এ রাস্তায় চলার লোভ ছাড়তে হবে। জানো না, সমস্ত গল্পেই বলা আছে—দেখতে ভালো রাস্তাগুলো বিপদ এনে দেয়? এ-সব রাস্তা কোনো ভীষণ রাক্ষস বা দৈত্যের দুর্গপুরীতে নিয়ে যাবার ফাঁদ! পথিকরা সেখানে যেই পৌঁছোয়, অমনি তাদের পেটে পূরতে রাক্ষসটা এক তিলও দ্বিধা করে না। এ পথ—বিপথ। আর কাঁটায় ভরা দেখতে খারাপ রাস্তাগুলো পরীদের বাগানে কিংবা বড় বড় রাজবাড়ীতে পৌঁছে দেয়, যেখানে রাজকন্যারা মালা গেঁথে রাজপুত্রদের অপেক্ষায় ব'সে থাকে!

মাধব। তুমি যা বলচো, হয়তো সত্যি হ'তে পারে। কিন্তু বন্ধু, ও গল্পকথায় বিশ্বাস করা যায় না। নিয়ম—ঐ বিশ্রী রাস্তাটা বিশ্রী, আর ঐ সুশ্রী রাস্তাটা সুন্দর! প্রাণ গেলেও ঐ খোয়া-ভরা রাস্তায় হাঁটতে পারবো না!

রাজপুত্র। ভীরু তুমি! তোমরা চিরদিনই বাঁধা-ধরা রাস্তা দিয়ে চলবে জানি! সাহস নেই তোমাদের। কিন্তু রাজপুত্র ও রাস্তায় চলে না। আমি যাবো ঐ পাথুরে পথ ধ'রে!

হিতৈষী। রাজকুমার—থামো—থামো! দিক ভুল হ'য়ে গেছে··দাঁড়াও—ভূগোল দেখে ঠিক করি—মানচিত্রে নগর উপনগরের নক্সা দেখি—কোন্ রাস্তায় চলা উচিত—তার পরে—

রাজপুত্র। না, না, আমাকে ছেড়ে দাও!

মাধব। ওরে বাবা—বিপথে কেমন ক'রে যেতে দোবো?

হিতৈষী। যেয়ো না রাজকুমার—চিরচলার পথে চলাই ভালো।

রাজপুত্র। ও কথায় আমার মন ভুলবে না! আমি যাবো! তোমরা থাকো ব'সে।

[রাজপুত্র ছুটে বেরিয়ে গেল]

মাধব। শুনলে না! চললো ছুটে? রাজপুত্তুর হ'লেই কি এমনি সাহসের বড়াই ক'রে থাকে?···আরে—কে আসচে ঐ বাঁকা পথটা দিয়ে? কোনো রাজকন্যে নাকি? রাজপুত্তুরকে ডাকি—! ও বন্ধু—বন্ধু!

[রাক্ষসী রম্ভা—বনফুলের চুড়ো ক'রে মাথায় মহুয়া ফুলের মঞ্জরী ঝুলিয়ে—কাণে দু'টি কড়ির ঝুমকো ঝুলিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। দুই হাতে সাপের আকারে লতার প্যাঁচ···গলায় বড় বড় প্রবালের হার।

রম্ভা। কা'কে ডাকছো? তোমরা বুঝি পথ হারিয়ে ফেলেছ? এখানে যে আসে—তোমাদের মত সকলেই দিশেহারা হ'য়ে যায়!

মাধব। হ্যাঁ, তাইতো ঘটেছে আমাদের বরাতে! কিন্তু আমার বন্ধুটি যে দিশেহারা হ'য়ে ছুটে চলেচে—ঐ ঘোরালো রাস্তাটা দিয়ে! সেইজন্যে আমরা বড় ভাবনায় প'ড়ে গেছি!

রম্ভা। যার যা' রাস্তা—যে যায় তা'কে যেতে দাও! মুখ্যু যারা—তা'রাই ভাবে। যদি ভালো চাও, তোমরা চ'লে এসো আমার সঙ্গে!

মাধব। কেন বলো দেখি? চেনা নেই, শোনা নেই—হঠাৎ এ আপ্যায়নের মানে কি? রাক্ষসপুরীতে নিয়ে যাবে নাকি? খুব মায়া-বিদ্যে শিখেছ, যা' হোক্!

রম্ভা। তুমি তো ভারী বোকা দেখচি! লোকের ভালো করতে গেলে মন্দ হয়! আমাদের মস্ত বড় বাড়ী এই পথের পারে, সেখানে গেলে আদর-যত্নই পাবে!

মাধব। তাই নাকি? সত্যি বলচো? তা' তোমায় দেখে অবিশ্বাস করতে মন চাইচে না! ক্ষিদেতে প্রাণ আইঢাই করচে, তা' হ'লে দানাপানির লোভে তোমার সঙ্গে যেতেই হোলো! দেখো—শেষে যেন না প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়!

রম্ভা। না গো না! হ্যাঁ: তুমি নাচতে গাইতে জানো তো? আমার স্বামী বড্ড আমোদ ভালোবাসে।

মাধব। ও:—তোমার স্বামী আছে নাকি? বেশ, বেশ! আমি নেচেকুঁদে তা'কে আমোদে হাবুডুবু খাইয়ে দেবো।

রম্ভা। কি রকম?

মাধব। যেমন—আমার একটা মস্ত গুণ···

গান

অতি বড় সেয়ানা
　　এই আমি গো একটা!
ভয় যদি আসে কাছে মারি তিন গাঁট্টা।
যবে বুদ্ধির প্যাঁচ ঝাড়ি পটকায় পিত্ত,
ঘুরপাক খায় যত রাসকেল্ দৈত্য,
তিন ফুঁকে তিন লাকে করে দিই চ্যাপ্টা।

(হো:-হো:-হো:-হো:-হো:—গোগ্ গো-গোগ্ গো-গো:)

রম্ভা। বা: বা:! তুমি তো বেশ মজাদার লোক! শুকনো আসর বেশ রসালো করতে পারো, দেখছি! এসো এসো! রাস্তার দো-মাথায় ব'সে কাণে কলম গুঁজে পুঁথি হাঁটকাচ্চে—ঐ প্রবীণ পাকাটি কে? তোমার সঙ্গী তো? ওকেও ডাকো না, আসুক্!

হিতৈষী। না, আমি এ যায়গা ছেড়ে এক পা'ও নড়বো না। মানচিত্র দেখে রাস্তা ঠিক করবো—তবে উঠবো। তোমরা যে রাস্তাতেই যাও, এখানে এসে সকলকেই ঠেকতে হবে!

মাধব। তা' হ'লে থাকো—আঁক কসো আর জঙ্গলে বাতাস খাও!

গান

ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্
পাগ্‌লা ভোলার চর,
হুম্ হাম্ হুম্
করবে ঘাড়ে ভর।
খাও ভূতের কিল্
ধরবে পেটে খিল্
শিঙে ফোঁকো ব'সে—
ভরবে না উদর।
(না-না-না—আ-আ-আ-আ)

[রাজপুত্র রূপকথায় পড়েছে যে কাঁটা-পথে গেলে পরীর রাজ্যে পৌঁছানো যায়। তাই সেই রাস্তা ধ'রে রাজপুত্র ঘোড়ায় চ'ড়ে চলেছে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, ঘন বন পার হ'য়ে—কোন্ অজানা দেশের খোঁজে। সে আঁকা-বাঁকা পথ চলতে চলতে এধার-ওধার কেবল চেয়ে দেখে—কোথায় মায়ার খেলা। কিন্তু পথের খবর পাওয়া যায় না। রাজপুত্র দেখে—চারদিকে বন। দূরে রাখাল হাঁকে—তা'র বাঁশী বাজে, কাঠুরিয়া যেন কোথায় কুঠার হেনে গাছের ডাল কাটে—চোখে পড়ে না। শেষে রাজপুত্র এসে পড়্‌লো এক সবুজ বনের কাছে। সেখানে দেখা গেল—একটি সরু পথ। পথের ধারে ঘাস উঠেছে—গাছের ছায়ার তলায়, তারই পাশ দিয়ে নেচে চলেছে—একটি ছোট্ট তরতরে নদী। সেই নদীর বাঁকে একখানি কুঁড়েঘর। কুঁড়ের বেড়ার ওপর দুলছে ঝুমকোলতা, শোনা যাচ্চে—মৌমাছিদের গুঞ্জন। বকুলতলার ছায়ায় ব'সে কে যেন গুণ্ গুণ্ স্বরে গান গেয়ে চরকা কাটছে। হঠাৎ রাজপুত্রের প্রাণে কিসের গন্ধ, কা'র বাঁশী ভেসে এলো। রাজপুত্রের আশা—হয়তো সে যা' চায় তাই পেয়েছে। ঐ কুঁড়েঘর—ঐ বকুলতলা।...]

[মৃদুস্বরে—সঙ্গীত...

রাজপুত্র। তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, ঘন বন পার হ'য়ে চলেছি কোন্ অজানা দেশের খোঁজে। কিন্তু কোথায় পরীরাজ্য, কোথায় রাজ-প্রাসাদ? আঁকা-বাঁকা রাস্তা—এধার-ওধার চেয়ে দেখ্‌ছি—কোথায়-বা মায়া-ধেনু চিবুচ্ছে ঘাস, কোথায়-বা মরীচি-মায়ার বাড়ী?

[একটি গান ভেসে এলো]

মায়াবিনী। (গান)

সবুজ এ-বন মৃগনাভি-গন্ধে ভুরভুর।
রাজপুত্তুর আর তুমি যাও কতদূর!
ক্ষেতেতে নেই চাষ তবু ঐ ভরা যে ফসল,
লুকিয়ে কোথায় বাজায় রাখাল
বাঁশীটি উতল,
কাঠুরিয়া কুঠার হানে পড়ে নাকো চোখে,
অলিবালা তোলে নিতুই গুঞ্জন মধুর।
তরতরে ঐ নদীর বাঁকে আছে কুঁড়েখানি—
ঝুমকোলতা দুল্‌চে সেথা'
দিতেছে হাতছানি,
বকুলতলার ছায়ায় ব'সে
চরকা কাটে মেয়ে,
গুণ্‌গুণিয়ে মায়াবতী তুলচে
মায়ার সুর।

রাজপুত্র। কোন্ মায়াবিনী গান গেয়ে ঠিকানা জানিয়ে দিলে আমাকে?—সত্যিই তো—এই নদীর বাঁকে কি চমৎকার কুঁড়েঘরটি!... ঐ যে ব'সে কে? ঐ কি মায়াপরী?

পথধাত্রী। কে আসে গো—কে আসে?—এস্ত গো নবীন—এসো আমার কুঁড়েঘরে! কতকাল আমি এখানে একলা ব'সে গান সাধি—আর চরকা কাটি, কেউ আসে না। রাজপুত্তুরদের পায়ে পথের কাঁটা ফোঁটে, তাই আর আস্‌তে পারে না তা'রা।—আমার বড় দুঃখু—বড় দুঃখু! তুমি কি রাজপুত্তুর?

রাজপুত্র। ঠিক চিনেছ তো তুমি! আমিও তোমাকে চিনেছি! আমি এসেছি, তোমার দুঃখ ঘুচিয়ে দোবো। আচ্ছা যাদুকরী—যাদুর মায়া এতোদিন বাঁচিয়ে রেখেছ কোন্ মন্ত্রের গুণে?

পথধাত্রী। যাদুর মায়া আবার কি? এমন ক'রে এই মায়ায় কেন বাঁধা পড়ে আছি—তুমি বুঝি সেই মায়ার কথাই কুঁড়ের বল্‌চো?

রাজপুত্র। যা-ই বলো—আমি এই পাতার কুটীরটি দেখেই চিনতে পেরেছি—জেনেছি—এখানে কোনো মায়াপরী থাকে! পথের পাশে নদীর ধারে ঘাটের ওপরটিতে এই কুঁড়েঘর—চাঁপা আর বকুল গাছের ছায়ায়। বেড়া বেয়ে অপরাজিতা ফুল ফুটেচে। দুয়ারের সামনে চালের গুঁড়ো দিয়ে শঙ্খচক্রের আল্‌পনা। এ সব দেখেও আমার ভুল হ'বে? নিশ্চয় তুমি মায়াপরী! রাজপুত্তুরের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে—এবার তোমার সব মায়াজাল ছিঁড়ে দোবো।

পথধাত্রী। এমন তো অদ্ভুত কথা কখনো শুনি নি! বল্‌চো কি রাজপুত্তুর? আমি মায়াবিনীও নই—পরীও নই!

রাজপুত্র। ওঃ—আমার মন ছলনা করচো? তা' করো, এ-মন টল্‌বে না। এখন্ কি করতে হবে বলো? দৈত্য জয় করতে হবে? মারতে হবে রাক্ষস? যক্ষকে যুদ্ধে হারিয়ে তার সমস্ত ধন-দৌলত তোমার হাতে তুলে দিতে হ'বে? তোমাকে যাদু ক'রে রেখেছে এই রকম মায়াবুড়ির সাজে সাজিয়ে? বলো—কি করলে তুমি মুক্তি পাবে? আবার ফিরে পাবে তোমার আসল রূপ? উঠবে ফুটে যেন নির্মাল্যের ফুল! হাতে শাদা শাঁখা, গলায় পদ্মবীজের মালা, পরণে লালপেড়ে শাড়ী!

পথধাত্রী। আর সেদিন ফিরবে না, রাজপুত্তুর!

রাজপুত্র। তবে আমি কিসের রাজপুত্তুর!—তোমার ওপর কোনো ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচ কি রাক্ষসের যে মায়া ঘিরে রয়েচে—সে ভাঙতেই তো এখানে আমার আসা! আমি তোমাকে কোঠাবাড়ী বানিয়ে দোবো গজদন্তের দেওয়াল দিয়ে!

শাঁখের গুঁড়োয় মেঝেটি হবে দুধের ফেনার মত শাদা, মুক্তোর ঝিনুক দিয়ে তার কিনারায় এঁকে দোবো পদ্মের মালা।···আমার কথা শুনে হাস্‌চো? আমি সব পারি—আমি রাজপুত্র।

পথধাত্রী। গল্পে তুমি এ-সব কথা পড়েছ? তাই এই ভুল বক্‌চো—বারংবার। আমি পথের ধারে থাকি একলা, দুখিনী আমি। সংসারটা কি—চিনতে পারলে—ও-সমস্ত মিথ্যে কল্পনা তোমার মাথায় আর বাসা বাঁধ্‌বে না। এসো ঘরের ভেতর! ক্ষিদে পায় নি? রাস্তা হেঁটেচো!—সামান্য দু'চারটি ফল আছে, তাই খাও! আমি গরীব—বেশী কিছু নেই।

রাজপুত্র। আমাকে ছলো—ছলো—কত ছলনা জানো, দেখ্‌বো আমি—যাদুকরী! কিন্তু আমি তোমার নকল রূপ খসিয়ে দোবোই। সেইদিন তুমি আমার হাত ধ'রে নিয়ে যাবে আমার স্বপ্নের রাজকন্যার কাছে।

পথধাত্রী। সে তো আশার মত আশা! রাজপুত্তুরকে রাজ-কন্যার কাছে নিয়ে যাবো বৈ কি!

[এমন সময়ে দ্বারে আঘাত পড়লো]

রাজপুত্র। কে দরজায় ঘা' দেয়? রাজপুত্তুর জেগে রয়েছে, ভয় নেই?

পথধাত্রী। কে রে?

রাখাল। দরজা খোলোগো বুড়িমা! আমি রাখাল ছেলে!

পথধাত্রী। কেনরে? কি বলচিস?

রাখাল। এখানে কোনো রাজপুত্তুর এসেচে?

পথধাত্রী। কেন বল্ দিকিনি!

রাখাল। খবর পেলুম গো! আমি রাজপুত্তুর দেখ্‌তে এয়েচি।

পথধাত্রী। আয় আয় ভেতরে আয়!

রাজপুত্র। তুমি রাখালছেলে···যে মাঠে বটের ছায়ায় ব'সে বাঁশী বাজায়?

রাখাল। হ্যাঁগো: ও কে, বুড়িমা? ওই কি রাজপুত্তুর?

পথধাত্রী। হ্যাঁ, রাজপুত্তুর।

রাখাল। রাজপুত্তুর! সত্যি সত্যি? এই রাজপুত্তুর? তুমি ময়ূরপঙ্খী নায়ে চ'ড়ে এসেচো? আগে লোক পিছে লস্কর কই? ডাইনে-বাঁয়ে বাজনা-বাদ্যি কই?

রাজপুত্র। রাজপুত্র যখন রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে দৈত্য ভূমে বেরোয়, তখন সে একলা হাঁটে পথ। তুমি রাখালছেলে কি না, তাই জানো না!

রাখাল। তোমার কাছে সাত রাজার ধন মাণিক আছে?

রাজপুত্র। সেই খোঁজেই তো বেরিয়েছি!

রাখাল। সে কি গো, তোমার কাছে রতন নেই? তবে কেমন রাজপুত্তুর?

রাজপুত্র। রতন আছে অনেক। চাই একটা রতন? নেবে? এই নাও, একটা সোনার মোহর।

রাখাল। আমায় দিলে? সত্যি তা' হ'লে তুমি রাজপুত্তুর! কিন্তু এখানে তো তোমার আর থাকা ভালো নয়! আমি শুনে এলুম বনের ধারে ব'সে—কাঠুরেগুলো যুক্তি করচে, বলচে তা'রা—'রাজপুত্তুর গেচে মায়াবুড়ির বাড়ী, তাকে আমরা ধরবো'। তাই না শুনে আমি রাজপুত্তুর দেখতে ছুটে আস্‌চি।

পথধাত্রী। তা' হ'লে তো আর রক্ষে নেই! রাজপুত্তুর, আর নয়! ও লোকগুলো দুষমন, পয়সার জন্যে সব করতে পারে!

রাজপুত্র। যে আসে আসুক্, রাজপুত্তুর ডরায় না। আসুক্ দৈত্য, আসুক্ রাক্ষস! তাদের পথের সামনে তুমি আগুনের পাঁচিল্ তুলে দাও!

(দূর থেকে শিঙার আওয়াজ)

পথধাত্রী। জীবনটা রূপকথা নয়, রাজকুমার! রাখাল যাদের কথা বললে—তা'রা লোভে প'ড়ে মানুষ খুন করে। কত সোনারচাঁদ কুমার পথ হারিয়ে ওদের হাতে প্রাণ দিয়েছে। পালাও—পালাও, এখানে আর নয়!···ঐ বুঝি শিঙা বাজ্‌চে! আমার কথা রাখো' রাজপুত্তুর! প্রাণ বাঁচাও!

রাজপুত্র। রাজপুত্তুর আমি! আমি বীর কি না—পরখ্ করতে চাই!

পথধাত্রী। এ কি পাগল! তা'রা দূরে রয়েচে, এখনো পালাও!

রাখাল। হ্যাঁ: হ্যাঁ তাই চলো! তোমাকে আমি দৈত্য-পুরীতে নিয়ে যাবো, আমি সোজা রাস্তা জানি।

রাজপুত্র। দৈত্যপুরী? সে কোথায়? রাজকন্যা সেখানে বন্দী হ'য়ে আছে বুঝি?

রাখাল। তা' জানিনি! তুমি যাবে? আমরা রাস্তা জানি। দৈত্যের বউ'রত্তা খুব খাওয়াতে ভালোবাসে। যাবে তো চলো!

(শিঙা ক্রমোচ্চ)

পথধাত্রী। তাই ভালো! আমিও সঙ্গে যাবো। রাজ-পুত্তুরকে দেখে আমার মায়া জেগেছে। ওকে বাঁচাতেই হবে!

রাজপুত্র। জানি, তুমি আমাকে বাঁচাবে। আরও জানি, তোমার জন্যে শেষে আমার রাজকন্যার দেখা পাবো।

রাখাল। এসো গো শীগ্‌গির এসো! শিঙে শুনতে পাচ্চো? ঐ এলো, ঐ এলো এগিয়ে!

রাজপুত্র। চলো, কোথায় দৈত্যপুরী! দেখাও পথ!

[এর পরেই দৈত্যপুরীতে গিয়ে আমরা পৌছুবো। রাজপুত্র সেখানে উপস্থিত হ'লেই আবার গল্প আরম্ভ করা যাবে।]

ধেনুদলে লও ডাকি'

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

সাঁঝের সোনালি স্বপ্নে শিহরে দিবসের আলো-আঁখি,
হে রাখাল তব বেণুটি বাজাও, ধেনু দলে লও ডাকি'।
শ্যামল তৃণের পেলব পরশে
মাতিল যে-মন মধুর হরষে,—
গৃহপথ পানে মন্থর তানে তাহারে টানিবে না কি!
হে রাখাল, তব ধেনুদলে তবে বেণুরবে লও ডাকি'।

দূরে তটিনীর কল্লোল কাঁদে মূরছি' তটের তলে।
ওপারের গ্রামে বিদায়-ব্যাকুল শেষ খেয়া-তরী চলে।
তমাল-কুঞ্জে অঞ্চল টানি'
ঘনালো ছায়ার কালো মায়াখানি,
কদম্ব-বনে উদাস পবন শিশিরের কণা মাখি'।
হে রাখাল; তব বেণু-নিঃস্বনে ধেনুগণে লও ডাকি'।

অসহায় রাতি ঝিল্লীর তানে আকাশে গুমরি' বাজে।
চকিত আলোর জোনাকী চমকে বিজন তিমির মাঝে।
দীঘিতে কমল মুদিল নয়ন,
পান্থ খুঁজিছে স্বপ্তি-শয়ন,—
শূন্য-পথের ক্লান্তি টানিয়া ফিরিছে নীড়ের পাখী।
হে রাখাল, তব বেণুরবে তবে ধেনুদলে লও ডাকি'।

তোমার চোখের সীমানা ছাড়ায়ে ধেনু চরে হেথা-হোথা,—
একা ফিরিবার সাধ্য কি তার, পথ খুঁজে পাবে কোথা?
তোমার আঁখির উজল কাজলে
তার জীবনের আশ্রয় ঝলে।
তাই বেলাশেষে একান্তে এসে বেদনায় ওঠে হাঁকি'।
হে রাখাল, তবে ধেনুসবে তব বেণুরবে লও ডাকি'।

আরো কিছু

শ্রীপ্রশান্তি দেবী

আরো কিছু কাছে এসো, বাসরের শয়নে,
চেয়ে থাক উৎসুক ঘননীল নয়নে।
জ্যোৎস্নার বরণে,
আঁকা ওই শাড়ীখানি থাক তব পরণে।

সজ্জিত সুন্দর আজিকার লগনে
বঙ্কিম ভুরু দুটি আঁকা প্রেম-স্বপনে,
কুঙ্কুম রচনে,
অধরের মধু যেন রক্ষিত গোপনে।

রাত্রির নীরবতা ঘিরে আছে দু'জনে,
পাশাপাশি মোরা দোঁহে রত প্রেম-কূজনে,
লাজারুণ আননে
প্রণয়ের অঞ্জন রূপায়িত নয়নে।

কাছে এসো আরও কিছু পাশাপাশি শয়নে,
আপনা হারাতে চাই মিলনের লগনে,
মধুময়ী স্বপনে,
রাঙায়ে উঠুক রাতি স্বর্ণের বরণে।

পরজন্মে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

জানি না আবার এই দুর্লভ জনম
হবে কি না এ সুন্দর ধরণীর 'পরে
কোনো দিন। উচ্ছ্বসিত এই মনোরম
জীবনের সুধা-রস পরিতৃপ্তি ভরে
করিব কি পান আর?—কে দিবে উত্তর!
এমনি তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা,
মৃদুমন্দ শঙ্খধ্বনি,—ঝিল্লী কলস্বর,—
মৃত্তিকার গৃহখানি নিস্তব্ধ নিরালা,—
ভাবি মনে মিলিবে কি কভু এর পর?
তুমিও কি এইরূপ সর্ব্বকর্ম্মশেষে
বিথারি' ভ্রমর-কৃষ্ণ অলকের থর,
স্মিতমুখে সকৌতুকে দেখা দিবে এসে
বাসকশয্যায়? সান্দ্র নিশার তিমিরে
যুগল হৃদয়-স্পন্দ বাজিবে কি ধীরে?

পল্লীর ব্যথায়

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী

বিদ্রোহী মোর চেতনা, ব্যর্থ পরাজয়
অর্থলোভ চারিদিকে করিছে হুঙ্কার;
দেবতা পলায় ত্রাস সব করি' ক্ষয়,
আমরা মানুষ নহি—স্বার্থের বিকার।
কুকুর শৃগাল আজ টানিতেছে শব,
শ্মশানে মানুষ নাই করিবে যে তাড়া,
কহোব প্রতীক্ষা নিয়ে পড়ে আছে সব,
বন্ধুহীন বান্ধবের চোখে অশ্রুধারা।
মৃত যারা মুক্ত আজ অনলে সলিলে—
পেটের জ্বালায় কভু নাহি দিবে প্রাণ,
বহু গৃহী স্তব্ধ হয়ে সম্মান দলিলে
অপাত্রে অস্থানে হায় পড়ে র'ল দান।
'ওরে নাই', 'ওরে নাই' গেল গেল পণ
যারা আছো ধরে রাখ—বাঁচুক জীবন।

কাচিনদের দেশ

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

আমরা ব্রহ্মদেশ ভ্রমণের সময় কাচিনদের দেশে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলাম বলিয়া তাহাদের বিচিত্র আচার-ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। কাস্তার-কুন্তলা পর্ব্বতমালার দুর্গম ও দুরারোহ ক্রোড়দেশে এই পার্ব্বত্য সম্প্রদায় বাস করে। আসাম ও ব্রহ্মের মধ্যবর্ত্তী আরণ্য প্রদেশেও আমরা কাচিনদিগকে দেখিতে পাই বটে কিন্তু এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত বাসস্থলী দেখিতে হইলে এবং কাচিনতত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত হইবার কামনা করিলে আমাদিগকে ব্রহ্মের উত্তর সীমান্তের নিবিড় অরণ্যাবৃত পর্ব্বতাকীর্ণ অঞ্চলে গমন করিতে হইবে।

আমরা মান্দালয় হইতে উত্তর-শান-ষ্টেটস নামক শান-সম্প্রদায়-অধ্যুষিত রাষ্ট্রসমূহের ভিতর দিয়া কাথা নামক নগরে পৌঁছিয়াছিলাম। মান্দালয় হইতে কাথা ইরাবতীবক্ষে ষ্টিমারযোগে ভ্রমণের স্মৃতি আমাদের মানসপটে চিরকাল অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। কাথার অনতিদূরে চীনসীমান্তের সন্নিকটবর্ত্তী ভামো। কাথায় আমরা জলপথ পরিত্যাগ করিয়া রেলপথে মিৎকিনা বা মিয়িৎকিয়িনায় যাই। মধ্যে মোগোয়াং নামক স্থানে একদিন ছিলাম। কাচিনদের দেশ কাথা হইতে আরম্ভ বলিলে ভুল হয় না। কাথাবাসী কাচিনদিগকে "কাথা কাচিন" বলা হয়। কাথা হইতে প্রত্যেক ষ্টেশনে কাচিনকুলী আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আরোহীদিগের মধ্যেও কাচিনের সংখ্যা কম নয়। মিয়িৎকিয়িনা বা মিৎকিনা শব্দের অর্থ বড় নদীর নিকটবর্ত্তী নগর। কাথা-কাচিনদিগকে 'চিংপ'ও বলা হয়। সমগ্র কাচিন সম্প্রদায়কেও চিংপ বলা হইয়া থাকে। চিংপ শব্দের অর্থ মানুষ। কাচিনদের মধ্যে একটা প্রবচন প্রচলিত আছে—চিংপ মাত্রই মানুষ কিন্তু সকল মানুষ চিংপ নয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপনাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, স্রষ্টার সর্ব্বাপেক্ষা অনুগৃহীত বলিয়া মনে করে—এই সত্য সংশয়াতীত।

কাথা-কাচিন, মারু-কাচিন ও খাকুকাচিন—কাচিনদিগকে এই তিনটী উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। প্রথমে কাথাকাচিন, মধ্যে মারু-কাচিন এবং সর্ব্বশেষে বা কাচিনদের দেশের সর্ব্বোত্তর সীমায় খাকুকাচিনগণ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। 'চিংপ' শব্দটি চৈনিক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কাচিন সম্প্রদায় মোঙ্গোলীয় বা তার্ত্তার জাতির অন্তর্ভুক্ত তাহা ইহাদের আকৃতি দেখিলে বেশ বুঝা যায়। নৃতত্ত্ববিদ্ বা জাতিতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণের মতে কাচিন জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা দূর অতীতে তিব্বত হইতে ব্রহ্মের উত্তর সীমান্তে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। লিসু, নাং প্রভৃতি পার্ব্বত্য সম্প্রদায়রাও চিংপ, সে বিষয়ে সংশয় নাই। পার্থক্যের ভিতর লিসু ও নাংগণ দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে নিম্নবর্ত্তী প্রান্তরে প্রায়ই অবতরণ করে না, কাচিনগণ কুলির বা অন্য কোন কাজ করিবার জন্য ব্রহ্মের অন্যান্য অংশে দলে দলে আসিয়া থাকে। পরে দৃঢ়দেহ লিসু ও নাংদিগকে ব্রহ্মের সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিবার জন্য যে চেষ্টা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছে। ব্রহ্ম-ভ্রমণের সময় সৈনিক সাজে সজ্জিত লিসু ও নাংগণ আমাদের অন্তরে প্রবল কৌতূহল জাগ্রত করিয়াছিল। যেমন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আফ্রিদি, কাফির প্রভৃতি শতাধিক সম্প্রদায়ের বাসস্থলী, তেমনই তাহার পর্ব্বতাকীর্ণ উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তও বহু বিচিত্রাকৃতি পার্ব্বত্য জাতির অবস্থান-স্থান। তবে নৃতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতদের পক্ষে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অপেক্ষা উত্তরপূর্ব্ব সীমান্ত গভীরতর গবেষণার ক্ষেত্র বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অত্যন্ত ঊষর কিন্তু ভারতের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্ত অতিশয় উর্ব্বর।

রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে মোগোয়াং হইতে মিয়িৎকিয়িনা যাওয়া আদৌ সহজ ছিল না। শ্বাপদসঙ্কুল জনমানবহীন নিবিড় বনানীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইত। মিয়িৎকিয়িনা ঐ নামীয় জিলার হেডকোয়ার্টারে পরিণতি পাওয়ায় এবং রেলপথ প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে ভ্রমণকারীদের পক্ষে বিশেষ কোন আশঙ্কার কারণ নাই বলিলেই হয়। আমাদের এক প্রবীণ বন্ধু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই পথে গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে পদে পদে বিপদের যে কাহিনী আমরা শুনিয়াছিলাম ; তাহাতে রেলপথ না থাকিলে এই পথে আসিবার সাহস আমাদের কখনই হইত না। ঐ বন্ধুকে বহুবার ব্যাঘ্রের দ্বারা বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। রাত্রিতে বস্ত্রাবাস বিস্তৃত করিবার পর চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতে হইত।

আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন রেলপথ স্থাপিত হওয়ায় জল পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইলেও বর্মার উত্তরাংশের অধিকাংশ স্থানে তখনও সভ্যতার আলোক

দরবার বেশে তরুণ কাচিন সর্দ্দার

দেখা দেয় নাই। অবশ্য এখনও এমন জায়গা আছে যাহাকে সভ্যজগতের বাহিরে বলা চলে। মিয়িৎকিয়িনা পর্য্যন্ত সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত বলিলে ভুল হয় না। পরে দুর্গম নিসর্গের বুকে যে প্রদেশ পরিদৃষ্ট হয় তাহাই প্রকৃত কাচিনদের দেশ। রেঙ্গুন হইতে মিয়িৎকিয়িনার দূরত্ব প্রায় ৭ শত মাইল। মিয়িৎকিয়িনা হইতে ৩০ মাইল দূরে মালিহকা ও নমাই নদী সম্মিলিত হইয়া ইরাবতী নাম ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণে আগাইয়া সমগ্র ব্রহ্মদেশকে অভিষিক্ত করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্রহ্মদেশের সভ্যতা বা সংস্কৃতি ইরাবতী নদীর নিকট কতখানি ঋণী, তাহা এই নদীর বক্ষে যে কোন

. . . . . যোগে ভ্রমণ করিলে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। ইরাবতীর উভয় তীর শোভিত করিয়া যে অগণিত প্যাগোডা নির্ব্বাণের প্রতীকরূপে শান্তগম্ভীর মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান, উহারাই ব্রহ্মদেশীয় বিচিত্র সংস্কৃতির অভিনয়ভূমি বলিলে ভুল হয় না। রেলপথ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের একমাত্র উপায় ছিল ইরাবতীবক্ষে বাহিত নানাজাতীয় নৌকা। রেলপথ প্রসারিত হইলেও ইরাবতীর গুরুত্ব হ্রাস হয় নাই। আজিও ইরাবতীই ব্রহ্মের ক্ষেত্রসমূহকে শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে এবং উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ প্রভৃতি পণ্য ইহার বক্ষ দিয়াই একস্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হইতেছে।

মালিহকা ও নমাই নদীর সঙ্গমস্থলের পর যে প্রদেশ আমরা প্রাপ্ত হই, উহার অধিকাংশই দুর্গম বটে কিন্তু নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই সকল স্থান সভ্যজগতের অজ্ঞাত ছিল বলা চলে। কেবল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল উডথর্প এবং মেজর ম্যাক-গ্রেগর কর্তৃক এক প্রকার অভিযান এই প্রদেশের রহস্য জানিবার জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা আসাম-সীমান্তের সাজিয়া নামক স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্রের বক্ষ দিয়া কাম্পতিশান উপত্যকায় আগমন করিয়াছিলেন। এই উপত্যকাটি মালিহকা হইতে ২ শত মাইল দূরে বিরাজিত। এইস্থানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে কাচিনদের দেশে হকা বলিলে নদী, জুপ বলিলে সঙ্গমস্থল এবং বুম বলিলে পাহাড় বুঝায়।

শিশুপৃষ্ঠে কাচিন-তরুণী

আজকাল মিচিনা হইতে ৫৭ মাইল দূরবর্তী ভিয়াংহকা পর্য্যন্ত মোটরযোগে যাওয়া চলে। দূরত্ব ৫৭ মাইল। আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন মোটর সার্ভিস প্রবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। আমরা সেই স্থানটিকে ভিয়াংহকা বলিতেছি—মালিহকার সহিত যেখানে ভিয়াংহকা বা ভিয়াং নদী মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থল হইতেও এমন একটি পথ আছে যাহার উপর দিয়া আরও কিছুদূর পর্য্যন্ত মোটর চালান চলিতে পারে। সাধারণতঃ সুপ্রাবুম নামক স্থানটি পর্য্যন্ত এই জাতীয় যান যাইয়া থাকে। সুপ্রা একটি বুম বা পাহাড়ের নাম। সেই পাহাড়ের উপর সুপ্রাবুম নামক লোকালয়। ইহাকে নাগরিক এবং সামরিক উভয় প্রকার বসতি বলা চলে। উক্ত ৫৭ মাইল মোটরে ভ্রমণ করিবার সময় পার্ব্বত্য প্রকৃতির যে অপরূপ রূপ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল তাহাকে শান্ত-সুন্দর না বলিয়া ভীমকান্ত বলিলেই বোধ হয় ভাল হয়। সমগ্র পথটিই নিবিড় বনানীর বক্ষে বিসর্পিত বলিয়া শ্বাপদসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে কিন্তু যাঁহারা মোটরযানে যান, তাঁহাদের সেরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। বেগবতী পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীর সহিত সাক্ষাৎ প্রায়ই হইয়া থাকে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেইদিকেই পাহাড়ের পর পাহাড়—যেন গহনাবৃত গিরিগণের মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে। একদিকে মালিহকা, অন্যদিকে নমাই নদী, মধ্যে মারুকাচিনদের দেশ। ত্রিকোণাকৃতি বলিয়া মারুকাচিনদের বাসভূমি এই অঞ্চলটিকে 'ট্রায়াঙ্গল' বা ত্রিকোণাকার ক্ষেত্র আখ্যায় অভিহিত করা হইয়া থাকে।

মালিহকার সহিত তিয়াংহকার সঙ্গমস্থলকে তিয়াংজুপ বলা হয়। আমরা তিয়াংজুপ নামক স্থানটিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে নজপজুপ নামক একটি জায়গায় কয়েক মিনিট ছিলাম। এখানে মিলিটারী বা সামরিক পুলিশের একটি থানা আছে এবং ডাকঘরও রহিয়াছে। আমাদের কয়েক মিনিট থাকার উদ্দেশ্য—সেই ডাকঘরে পত্রাদি প্রেরণের ব্যবস্থা করা। উত্তরস্থ দুর্গমতর প্রদেশে পত্র প্রেরণের সুযোগ আর নাও মিলিতে পারে। নজপজুপ হইতে তিয়াংজুপের দূরত্ব ১২ মাইলের বেশী নয়। পূর্ব্বে এই সকল অরণ্যাবৃত ও পর্ব্বতাকীর্ণ প্রদেশে আদৌ পথ ছিল না। মাদ্রাজ পায়োনীয়র নামক সৈন্যসঙ্ঘের অন্তর্গত দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ন নামক সেনাদলের দ্বারা পথ সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। শস্ত্রের সাহায্যে পথ প্রস্তুত না করিয়া নিবিড় বনানীর ভিতর আগাইয়া যাইবার কোন উপায় তাহাদের ছিল না। এই প্রদেশে বৃক্ষ ও ব্রততীর এরূপ প্রাচুর্য্য যে পদে পদে বাধা পাইতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়াও থাকা যায় না। বিশাল বনস্পতির বক্ষকে প্রকাণ্ডকায় অজগরের ন্যায় জড়াইয়া রহিয়াছে বিরাট ব্রততীগুলি—এরূপ দৃশ্য প্রত্যেক পদক্ষেপেই নেত্রপথে পতিত হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঐ সেনাদলকে সেই রজ্জুরচিত জালের ন্যায় বিরাজিত অগণিত লতাকে কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল।

নানাপ্রকার বিরল ও বিচিত্র বৃক্ষলতার বিস্ময়কর বিকাশস্থল বলিয়া বহু উদ্ভিদতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত এই দেশে অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণের জন্য আসিয়া থাকেন। পথে এইরূপ একাধিক পণ্ডিতের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বহু অনুচর ও অশ্বতর না লইয়া এই গহনাবৃত দুর্গম গিরিরাজ্যে অগ্রসর হইবার উপায় নাই বলিয়া এক একজন পণ্ডিতকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। যাঁহারা পণ্ডিত নহেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারেন এই গিরি ও গহনের দেশে নিসর্গের কত দুর্ভেদ্য গভীর রহস্য লুকায়িত রহিয়াছে। সেই রহস্য ভেদ করিবার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে যেরূপ অধ্যবসায় প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি, তাহা আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছে। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক নহেন, শুধু কবি বা ভাবুক, তাঁহাদের নিকটেও কাচিনদের বাসস্থল এই দেশ একান্ত চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই। মিচিনা হইতে আগাইয়া যাইবার সময় আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রকৃতির অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পথের দুই

পাশে দেখিতে দেখিতে মনে হইবে, সুন্দর ছন্দ ও গভীর কবিত্বে পূর্ণ একখানি কমনীয় কাব্য পড়িতে পড়িতে চলিয়াছি। নানা বর্ণরাগে রঞ্জিত আরণ্য পুষ্পপুঞ্জ এবং অপরূপ রূপাস্পদ প্রজাপতিদল স্বভাবের সবুজ পোশাককে শত গুণ অধিক মনোলোভা করিয়া তুলিয়াছে।

পথ কিছুদূর মালি নদীর তীরে তীরে আগাইবার পর ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চে আরোহণ করিয়াছে। আমরা তিয়াংজুপ নামক স্থানে রাত্রিবাসের পর যখন প্রভাতে পুষ্পগন্ধশোভিত শতবিহগকাকলী-মুখরিত পথে পুনরায় যাত্রা করিয়াছিলাম, তখন আমাদের মনে হইয়াছিল সুপ্তি বা সমাধি হইতে সমুত্থিত হইয়া পার্ব্বত্য প্রকৃতি পরম পুরুষের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। প্রজাপতিগুলিকেও পুষ্প বলিয়াই মনে হয়। বিহঙ্গম ও পতঙ্গমদিগের কূজন ও গুঞ্জনকে প্রকৃতিদেবীর কণ্ঠোত্থিত বন্দনা-সঙ্গীত বলিয়া বোধ হয়। পুষ্পপুঞ্জের সুমধুর সুরভি ধূপের কাজ করে। অরুণ-কিরণোজ্জ্বল ধরণীকে তখন বন্দনাগীতি-মন্দ্রিত মহান্ মন্দির বলিয়া মনে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেই প্রভাতের স্মৃতি আমাদের চিত্তপটে চিরদিন অক্ষয় রেখায় আঁকা থাকিবে বলিলে একবিন্দুও অতিরঞ্জন হয় না। প্রকৃতির সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়পরিতর্পণ মূর্ত্তি বাক্যে বর্ণনা সহজ নহে, উহা অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধির উপযোগী।

আমাদের পথটি উত্তরে অগ্রসর হইলেও পার্শ্ববর্ত্তী উপত্যকাটি পূর্ব্বদিকে প্রসারিত রহিয়া অসংখ্য বেগবতী স্রোতস্বতীকে মালিহকার সহিত সম্মিলনে সহায়তা করিতেছে। এই সকল জলধারার দ্বারা মালিহকা পুষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ইহারা ইরাবতীর জন্মের অন্যতম হেতু বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের সবেগে প্রবাহিত শত শত সলিলধারার সম্মেলনই ব্রহ্মের প্রাণস্বরূপ ইরাবতী, সে বিষয়ে লেশমাত্রও সংশয় থাকিতে পারে না। দুইদিকে পাহাড়, মধ্যে উপত্যকা, উপত্যকার বুকে নৃত্য-নিপুণা নটীর ন্যায় স্রোতস্বিনী। স্থানে স্থানে সেতুর সহায়তায় স্রোতস্বিনী পার হইতে হয়। এক এক জায়গায় বেতের সেতু। এই সেতুগুলি পার্ব্বত্য জাতিদের প্রস্তুত। অবশ্য এই সেতু শুধু মানুষের পদব্রজে পার হইবার জন্য। আমরা সাইমনহকা নামক নদীর উপর যে বেত্রে বিরচিত সেতুটি দেখিয়াছিলাম, উহা আমাদের মনে অতীতের লছমনঝোলার স্মৃতি উদ্রিক্ত করিয়াছিল। সেতুটির উপর দিয়া আমরা হাঁটিয়া নদী পার হইয়াছিলাম। সম্মুখে নিবিড় অরণ্যানী ভৈরব গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত হইয়া দণ্ডায়মান, নিম্নে সাইমনহকা শিলাখণ্ডসমূহের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে কল-কল স্বরে, তর তর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে লম্বমান লৌহসেতু দেখা যায়। ইহাদের অধিকাংশই এখন আর ব্যবহৃত হয় না। পথে প্রত্যেক দশ মাইল অন্তর ষ্টেজিং বাংলো রহিয়াছে। এই বাংলোগুলি সাধারণতঃ উচ্চস্থানে রচিত রহিয়াছে। যেন দূর হইতে দেখা যায়। বাংলোর বারান্দায় দাঁড়াইলে পথের পাশে বা পুরোভাগে প্রসারিত পার্ব্বত্য প্রকৃতির কিছুদূর দৃষ্ট হয়। মোটের উপর এই বিশ্রামগৃহগুলির নির্ম্মাণ স্থান নির্ব্বাচনের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কাদরাং ইয়াং নামক স্থানের ষ্টেজিং বাংলোটি আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছিল।

আমরা যখন ঐ বাংলোতে পৌঁছিয়াছিলাম, তখন আমাদের মনে হইয়াছিল, সূর্য্যদেব সম্মুখের কাননকুন্তলা শৈলমালার পশ্চাতে অস্তসাগরে অবতরণ করিতেছেন। পূর্ব্বদিকে কয়েকটি শাখাশূন্য বৃক্ষ সমাধিমগ্ন সন্ন্যাসীর ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল। পার্ব্বত্য জাতিরা বাংলোর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলির জঙ্গল কৃষিকার্য্য করিবার জন্য কাটিয়া ফেলিয়াছিল। এই সকল সম্প্রদায়ের কৃষিকার্য্য করিবার পদ্ধতি আদৌ প্রশংসনীয় নহে। এইরূপ অবাঞ্ছনীয় প্রণালীতে নাগা, কুকী প্রভৃতি আসামের আদিবাসী জাতিকেও চাষ-আবাদ করিতে দেখা যায়। অস্তরবির রক্তরাগরঞ্জিত রশ্মিরেখা বাংলোর পার্শ্বস্থ পরিষ্কৃত স্থানটির বুকে বিচ্ছুরিত হইয়া উহাকে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে। নিম্নে ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকার বুকে একপ্রকার বিষাদভরা

কাচিন সমাধি

গাম্ভীর্য্য পরিব্যাপ্ত বলিয়া মনে হয়। যেন কি নিবিড় রহস্য সেখানে লুকাইয়া আছে। সান্ধ্যসূর্য্যের রশ্মি মারুকাচিনদের বাসস্থল টি্রাহল নামক ত্রিকোণাকৃতি প্রদেশটির উপর পড়িয়া উহাকে মায়াপুরীতে পরিণত করিয়াছে বলিলে ভুল হয় না। বাংলোর বারান্দায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে আমাদের মনে হইয়াছিল—যেন আমরা কোলাহলমুখরিত কর্ম্মজগৎ হইতে দূরে কোন স্বপ্নময় কল্পনার দেশে কোন অপরূপ রহস্যরাজ্যে আসিয়াছি। সভ্যজগতের সহিত যেন আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। পুরোভাগে প্রসারিত তাড়িত তার আমাদিগকে যেন অকস্মাৎ জানাইয়া দিল সভ্যজগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ এখনও শেষ হয় নাই। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ধীর পদক্ষেপে নামিয়া আসিয়া পর্ব্বত, অরণ্য, উপত্যকা সকলকেই নিবিড় তিমির-যবনিকায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল একটা কাঠ-ঠোকরা পার্শ্বস্থ বনানীর বৃক্ষ-কোটর হইতে কাতর কণ্ঠে কাহার কাছে কি যেন কহিতেছিল। অকস্মাৎ বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া পড়ার মত একপ্রকার শব্দ সেই স্তব্ধতাকে গভীরতর করিয়া তুলিল। বাংলোর রক্ষকটির নিকট হইতে যাহা জানিলাম তাহাতে বুঝা গেল, শাখামৃগ বা বানরগণ শাখাসমূহের বক্ষে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিবার ব্যস্ততায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার ভাঙ্গিয়া পড়িবার হেতু হইয়া থাকে।

সেই বাংলোতে রাত্রিযাপনের পর আমরা যখন জাগিয়া উঠিয়া পুনরায়

যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, তখন চতুর্দ্দিকস্থ পার্ব্বত্যপ্রকৃতিকে গভীর কুহেলিকায় আবৃত দেখিয়া নিরস্ত হইলাম। সমুদ্রসলিলে দ্বীপাবলীর মত সেই কুজ্ঝটিকার ভিতর বড় বড় বৃক্ষের ও শৈলসমূহের শীর্ষগুলি দেখা যাইতেছে। একপ্রকার কর্কশ কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাইলাম। বাংলো-রক্ষক বলিল, উহা একজাতীয় বানরের চীৎকার। নানা প্রকার বানর এই অঞ্চলের অরণ্যে অবস্থান করে। কুহেলিকা কিয়ৎ পরিমাণে কাটিয়া গেলে আমরা যাত্রা করিলাম। তখন মাঘমাস। সূর্য্যদেব আকাশের অধিকতর ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গিয়া প্রকৃতির প্রীতিকর মূর্ত্তি পূর্ণরূপে প্রকটিত করিয়া তুলিল। মিয়িৎকিয়িনা হইতে প্রসারিত এই পথের পাশে আমরা যখন ১ শত ১৭ মাইল আসার নিদর্শন দর্শন করিলাম, তখন আমাদের মোটরখানি এই প্রধান পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক একটি শাখাপথে আগাইয়া চলিল। এই পথ ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী সুপ্রাবুম পর্য্যন্ত গিয়াছে। স্থানটিকে সুম্প্রাবুমও বলা হয়। বুম অর্থে পাহাড়—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই স্থানটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। আমরা এই স্থানে একমাস অবস্থান করিয়া পার্শ্বস্থ প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমাদের কতিপয় বন্ধুর আহ্বানে আমরা গিয়াছিলাম। বন্ধুদের অধিকাংশই সার্ভেবিভাগের কর্ম্মচারী। ঐ সময় এই আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে সার্ভে চলিতেছিল। আমাদের দুই একজন বন্ধু মিলিটারী বা সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন। আমরা সুপ্রাবুম হইতে কোর্ট হার্জ্জনামক স্থানে গিয়াছিলাম। ইহাই আমাদের ভ্রমণের সর্ব্বোত্তর সীমা। কয়েক মাইল অন্তর ষ্টেজিং বাংলো থাকার জন্য মিয়িৎকিয়িনা হইতে কোর্ট হার্জ্জ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ আমাদের পক্ষে সেরূপ অসুবিধাজনক হয় নাই। এই প্রদেশে অবস্থানকালে আমরা এই পথে তিনবার যাতায়াত করিয়াছিলাম। মাঘের প্রথমে আসিয়া চৈত্রের শেষে আমরা কাচিনদের দেশ পরিত্যাগ করিয়া সাদিয়া হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম।

সার্ভে বিভাগের বন্ধুদের সহিত ভ্রমণের সময় কতিপয় কাচিন পল্লীতে কাচিন সর্দ্দারদিগের গৃহে আমাদিগকে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছিল। এই নিবিড় বনানীর দেশে প্রায় বারমাসই বর্ষা থাকে বলিয়া আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে—এই সত্য অস্বীকার করা যায় না। বন্ধুবর্গ এবং কাচিন সর্দ্দারগণ আমাদের সুবিধার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই করিয়াছেন। এই সত্যও গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা স্বীকার করিতেছি। আমরা মোটরযোগে এই প্রদেশে পৌঁছিবার পর কাচিন অনুচর ও চৈনিক চালক-চালিত অশ্বতরগণের সহায়তায় কাচিনদের দেশের অভ্যন্তরভাগে ভ্রমণ করিয়াছি। ভ্রমণের সময় মারু ও খাকু উভয় শ্রেণীর কাচিনদের সঙ্গেই মিশিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। মধ্যে নাং, লিসু ও দারু প্রভৃতি পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের নরনারী দেখিবার সুবিধা আমরা পাইয়াছি। স্মিতমুখ দীর্ঘদেহ নাংগণ সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। মস্তকস্থ স্থূল কেশগুচ্ছ ইহাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লিসুরা শিকারী সম্প্রদায়। ইহারা বিষাক্ত তীরের সহায়তায় টাকিন প্রভৃতি বন্য পশু শিকার করে। লিসুদের বিচিত্র পরিচ্ছদ বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

কোন কাচিনপল্লী ষ্টেজিং বাংলো বা বিশ্রামবাসের নিকটে থাকিলে আমরা সন্ধ্যায় বা প্রাতে তথায় গমন করিয়া পল্লীবাসীর আচার-ব্যবহার মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করিতাম। প্রত্যেক পল্লীতে কয়েকটি করিয়া সার্ব্বজনীন গৃহ নির্ম্মিত রহিয়াছে। বহু পরিবার এই সকল গৃহে একত্র অবস্থান করে। একটি মুক্ত প্রশস্ত কক্ষের ভিতর দিয়া এই গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। গৃহের চারিদিকে প্রচুর স্থান আছে। প্রবেশ করিবামাত্র কুকুর, বালকবালিকা, শূকর ও মোরগ এই চারিটি বস্তু দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই চারিটি জিনিষ পাশাপাশি বিরাজিত রহিয়া এক বিচিত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া থাকে বলিলে ভুল হয় না। যেখানে বালকবালিকা খেলা করে, সেখানে দুই একটি কুকুর থাকিবেই। দেখিলে মনে হয়, যেন কুকুরগুলি কোনকালেই কামড়ায় না। এই 'চাও' আখ্যায় অভিহিত সারমেয়গুলি সত্য সত্যই (অন্যান্য শ্রেণীর সারমেয়সন্তের তুলনায়) শান্ত-স্বভাব। কুকুরগুলি দেখিতে সেরূপ সুন্দর না হউক, মন্দ নয়। দুঃখের বিষয় কাচিনরা এই পরম বন্ধুগণকে মারিয়া খাইতে কণামাত্রও কুণ্ঠা বোধ করে না। কুকুর ভক্ষণের প্রথা মারুকাচিনদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত। আমরা তাহাদিগকে এই ঘৃণিত প্রথার বিরুদ্ধে বহু কথাই বার বার বলিয়াছিলাম। সর্দ্দারদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, এই জঘন্য প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য প্রবল প্রযত্ন করিতে। এই প্রথা এখনও আছে কিনা কে জানে।

কাচিন রমণীরা স্বামী ও পুত্রকন্যাদের পরিচ্ছদ আপনারাই বয়ন করে। বাঁশ ও কাঠের তৈয়ারী আদিম চরকা ও তাঁত আজিও চলিতেছে। বয়ন ব্যাপার হস্ত ও পদ উভয় অঙ্গের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। মোটের উপর কাচিন নারীদের বয়ন-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বয়ন সম্পর্কীয় সকল ব্যাপার নারীদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য গৃহকর্ম্মও আছে। সুতরাং কাচিন রমণীর কর্ম্মকুশলতা বা পরিশ্রমপরায়ণতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। জঙ্গল হইতে কাঠ, জলাশয় হইতে জল আনিয়া রন্ধন করা—শিশুকে স্তন্য পান করান প্রভৃতি কার্য্য ইহারা একটির পর একটি এমন ভাবে সাধন করে যে, আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হয়। সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশুটিকে স্তন্য দিয়া কোন জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কন্যার উপর তাহাকে দেখিবার ভার ন্যস্ত করা হয় এবং জননী বয়নে ব্যাপৃত হন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শুধু কাজ আর কাজ। এইরূপ কর্ম্মকঠোর জীবন যাপন করিতে হয় বলিয়া কাচিন কামিনী আপনাদিগকে ভাগ্যহীনা ভাবেন—এইরূপ ধারণা যেন কেহ না করেন। তাঁহাদের হাস্যদীপ্ত মুখ জানাইয়া দেয়—অন্তরে তৃপ্তি বিরাজিত রহিয়াছে। কাচিন কামিনীদের কঠোর কর্ম্মের মধ্যেও হাস্যোজ্জ্বল মুখ স্মরণ করিলে আমাদের মস্তক আজিও শ্রদ্ধায় অবনত হয়।

প্রত্যেক কাচিন পল্লীতে আমরা একটি করিয়া চীনা দোকান দেখিয়াছি। পল্লীবাসীদের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রত্যেক পদার্থই এই দোকানে পাওয়া যায়। শুধু প্রয়োজনীয়ই বা বলি কেন, বালকবালিকার খেলিবার জিনিষ এবং বয়স্কদের সখের বস্তুও এই সকল চৈনিক দোকানে বিক্রয়ার্থ থাকে। বাঁশী, বালকবালিকার ক্রীড়া করিবার হাতঘড়ি, কালি, কাগজ, বাতি, টিনে রক্ষিত মৎস্য, বিস্কুট, লজেঞ্জ প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য, টিনে রক্ষিত ফল, তার, পেরেক, টর্চ্চ, ব্যাটারি, কার্পাসপ্রস্তুত বা রেশমী কাপড়, এমন কি হমবার্গী হ্যাট পর্য্যন্ত এই চীনাম্যান-পরিচালিত পণ্যশালায় পাওয়া যায়। টিনে রক্ষিত মৎস্য, মাংস, ফল—এই সব জিনিষ ইউরোপীয় অফিসার বা ভ্রমণকারীদের জন্য সন্দেহ নাই। ক্বচিৎ কোন পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে ইচ্ছুক সৌখীন কাচিন এই সকল জিনিষ কিনে। এই অঞ্চলের প্রধান ব্যবসায়ী চীনারাই। শুধু এই অঞ্চলই বা বলি কেন, আমরা ব্রহ্মের সর্ব্বত্রই এবং মালয়েও চীনা দোকানদার-দিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতা দেখাইতে দেখিয়াছি। যেমন আমাদের দেশে মাড়োয়ারী, তেমনই ব্রহ্মে ও মালয়ে চীনা দোকানী। বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিবর্ত্তন আনিয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা যে সকল পণ্যের নাম উল্লেখ করিলাম, চীনা ব্যবসায়ী উহাদিগকে অশ্বতরপৃষ্ঠে চাপাইয়া মিয়িৎকিয়িনা হইতে আনিয়াছে।

আমাদের সঙ্গে কয়েকজন কাচিন অনুচর ছিল। ইহাদিগের কার্য্যাবলী দেখিয়াও আমরা কাচিনদের মধ্যে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম। বাঁশের পাত্রে রন্ধন—বাঁশের পাত্রে চায়ের জন্য জল গরম করা প্রভৃতি শুনিলে অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন কিন্তু কাচিনরা নিত্যই বাঁশের তৈজসপত্রে পান-ভোজন সম্পর্কীয় সকল কার্য্য সম্পন্ন করে। বাঁশের চোঙের ভিতর জল ভরিয়া সেই জল ঐ পাত্রেই ফুটাইয়া লওয়া—বিস্ময়কর দৃশ্য বটে। চোঙাটির দুইটি ভাগ থাকে। একটা অংশটি জল

ফুটাইবার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং খাটো অংশটি পানপাত্রের কাজ করে। এই বাঁশের কৌটাটির কোন অংশই আগুনে পুড়িয়া যায় না। অবশ্য এই প্রদেশের বাঁশগুলি খুবই শক্ত এবং অগ্নিতে স্থাপনের প্রণালীটির ভিতরেও কৌশল আছে। আমরা সিকিমের লেপকবাদের মধ্যেও বংশনির্ম্মিত পাত্রে রন্ধনাদি করার প্রথা প্রচলিত দেখিয়াছি। লেপকবাদের ভিতর বাঁশের ব্যাপকতর ব্যবহার আমরা দেখিয়াছি। কাচিনদের জীবনেও বাঁশের স্থান অনেকটা ঐরূপই। ভারতের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তের প্রত্যেক পার্ব্বত্য জাতিদের ভিতরেই আমরা নানা প্রকার কার্য্যে বাঁশ ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি। বাঁশের গৃহে বাস, বাঁশের পাত্রে রন্ধন—বাঁশের শয্যায় শয়ন, বাঁশের তাঁতে বয়ন, বাঁশের বাক্সে সকল বস্ত্র সংরক্ষণ—বাঁশের সাহায্য ব্যতিরেকে কাচিনরা জীবনের পথে এক পাও চলিতে পারে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

[ক্রমশঃ

তোমারই (উপন্যাস)

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

সতী কাঁদল না কিন্তু সুলেখার কথার প্রতিধ্বনি ওর মনকে টুকরো টুকরো করে দিল। বার বার ওর মনের মধ্যে ঘুরতে আরম্ভ করল সুলেখার শেষ কথাটি "আজ আমার বিবাহবার্ষিকী নয়, বিবাহের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী।"

ভাগ্যের এইটাই সব চেয়ে বড় কষাঘাত। এ রকম যে একটা কিছু হবে—সতী জানত' প্রথম দিকেই। প্রথম যেদিন হাঁসপাতাল থেকে ফিরে কথাটা সতী শুনল, সেদিনই ওর মন অশুভ ছায়ায় কাল' হ'য়ে উঠল, ভাল লাগল না সুলেখার জীবন নিয়ে এ অভিনব কৌতুক। আশঙ্কায় আশঙ্কায় ওর মন ধাক্কা খেল। অঘটনের দরজায় দরজায় মনের ভয়ের ভাগটা প্রবল হ'য়ে কেবল গুমরে গুমরে ওকে ভয় দেখাতে লাগল, বলতে থাকল, এ আর না—হয় না, হয় না। সুলেখা ওর সব চাইতে আপন, ওর ব্যথাটাই তাই সব চেয়ে মনে লাগে; নিজের হারিয়ে যাওয়া দিনের সুর ছিল সুলেখার নতুন জীবনের নতুন বীণার তারে তারে। সতী ভেবেছিল সেই ঝঙ্কারের রেশ টেনে নিজের জীবনের ভালো ভবিষ্যতটাকে মেনে নেবে! আজ সেই সুর গেল ছিঁড়ে।

সুলেখা নিশ্চল পাথরের মতন; মাঝে মাঝে নিশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ। সতী মাথার পাশটিতে বসে আছে। ওর ভাবনার সীমা নেই!

নিজের বেদনায় দিদি কেঁদেছিল, কিন্তু তাতে লাভ হয়নি কিছুই, তাই আজকের দিনে সুলেখার এত বড় আঘাতেও ও কাঁদল না। কেঁদে মনকে হাল্‌কা করার মধ্যে ছেলেমানুষী আছে। হাসতে হাসতে তাকে বরণ করার মাঝে আছে জ্বালা। আজ তাই কান্নার চেয়ে বেশী কিছু চাই, বড় কিছু চাই, শক্ত কিছু চাই। নীরবে সহ্য করবার মধ্যে আছে সেই শক্তি।

দিদি আজ তাই কাঁদবে না।

বাইরের পৃথিবী তেমনি নিঝুম, তেমনি স্তব্ধ…সুলেখার এই অভিশাপের মাঝে সতীর জীবনের আর একটি ঋতু পেরিয়ে গেল। বর্ষার বরিষণ শেষ হল।

নিজের ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আর সে কাঁদবে না।

তারপর আরও বছর কেটে গেছে।

সুলেখার প্রথম বিবাহবার্ষিকীর কথাগুলো জীবনের ওপর একটা আলার জাল বিছিয়েছে। সেদিনের রাত্রের নীরবতার প্রতিবিম্ব পড়েছে দিদির জীবনে।

সতীর আজকের জীবনে তাই শীতের ঘন কুয়াসা। বাইরেও কঠিন আবরণ, যা দেখা যায়, ভেদ করা যায় না, ভেতরে ওর অনন্ত শূন্যতা, যা দেখা যায় না, অনুভব করা যায়।

কিন্তু তবু ওর আশা আছে! আজকের জীবনটা ওর সত্যাই বিচিত্র। শোকের আঘাতে শরীর ভেঙেছে, মন শক্তি হারিয়েছে, কিন্তু আশাপথ হারায়নি!' একদিন কিছু ঘটবে, দুঃখের আবরণ হটবে, এই পরিহাসের মধ্যে আছে নতুন আশার আলো—এই রকম তার মনের গোপন কথা।

জীবনটা বার বার শক্ত আঘাত হেনেছে, মন বার বার তাকে মেনে নিয়েছে, আজ সুদীর্ঘ চোদ্দ বছর জীবনের কাছে সতী শত শত আঘাত পেয়েছে, মন তাই ওর রূপ বদলেছে। জীবনটা শক্ত, কঠিন, কিন্তু তাকে সমানে সমানে বরণ করে নেবার শক্তিও বিন্দু বিন্দু করে জমা হয়েছে সতীর মনে। জীবনটাকে ও জীবন দিয়ে চিনেছে, প্রাণ দিয়ে জেনেছে, মন দিয়ে মেনেছে। আজ জীবনটা ওর কাছে ঠিক রহস্য নয়, পরিচিত পরম পুরুষ।

ও জানে, তার কঠিন আভরণের নীচে আছে নরম প্রাণ, তার আঘাতের মধ্যে আছে প্রতিঘাতের শক্তির প্রাচুর্য্য। তার নিস্তব্ধতার মধ্যে আছে সহ্য করার ক্ষমতা।

সতীর দৃষ্টিভঙ্গি তাই নিজের কাছে যেমন সহজ, অন্য সকলের কাছে তেমনি বিচিত্র।

ও হল বাস্তবের আকারে বসুন্ধরার সর্ব্বসহা রূপ।

অচল অটল মহান।

এতদিন ও ছিল সৃষ্টির আগে দেবতার মতন একলা, আজ সুলেখার ভাঙা জীবনে সতী নেমে এল সেতু হ'য়ে। নিয়তির আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে ওদের দু'জনের শুভ দৃষ্টির মাঝখানে ও হল দেবতার শুভদৃষ্টি!

বিকেলটা আজ বিষাদের ম্লান ছায়ায় অন্ধকার। তিনতলার দক্ষিণ চাওয়া ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জ্যোতি লাল আকাশের দিকে তাকিয়ে তাই অনুভব করছে। মনে ওর গভীর বেদনার একটা প্রলেপ, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সমানভাবে কাঁদছে।

রাস্তার লোক চলাচলের একটা গোলমাল আছে, ফিরিওয়ালার চিৎকার আছে, আরও পাঁচ রকম শব্দের প্রতিধ্বনি আছে, সব মিলিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন আর্ত্তনাদ। সবাই মিলে বিদ্রোহ করে আজ জ্যোতির ভরা মনে ছেঁদা করবে। ধরায় আজ কেন এমন বিষাদের ছায়া? জ্যোতি তাই ভাবছে।

তার মা অসুস্থ, অর্দ্ধনিমীলিত চোখ দু'টি অস্পষ্ট কাকে যেন খুঁজছে—যে নেই, কি যেন চাইছে—যা পাচ্ছে না। জ্বর কম, ডাক্তারের দল সবল করবার ওষুধ দিয়েছে, মনটা সেই অনুপাতে দুর্ব্বল।

"তার সুন্দর চেহারা টোল খেয়েছে মর্ম্মন্তুদ কোন বেদনায়। উত্তাপের চাইতে অনুতাপের প্রভাব বেশী, রোগের যন্ত্রণার চাইতে মনের বেদনার আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। মা ত' মা নয়—বেদনার মূর্ত্তিমতী ছায়া।

"জ্যোতি"…অস্পষ্ট ডাক।

জ্যোতির তন্দ্রা টুটে গেল, ছুটে এল' ঘরে। কি মা? বলে বসে পড়ল মাথার ঠিক পাশটিতে। কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, কষ্ট হচ্ছে? উত্তর না দিয়ে মা বললেন, কি ভাবছিলি? বাইরে বুঝি অন্ধকার নামছে, ঘরের বাতি জ্বললো না কেন?

জ্যোতি বল্‌তে পারল না যে মনটা তার ঠিক এই কারণে বেসুরো। বাইরের পৃথিবীর বুকে নেমে আসা ম্লান ছায়া দেখতে দেখতে ঠিক এই কথাই সে ভাবছিল।

জ্বালিয়ে দেবো আলো ?

"না থাক," আপন মনেই মা বলে চলেন, এইটাই ত' হল পুরুষানুক্রমে মেয়েদের কাজ। বাইরের স্তিমিত আলোকে পুরুষ যখন কড়া নাড়ে, মেয়েরা তখন প্রদীপ জেলে শাঁখ বাজিয়ে তাকে ঘরে তুলবে। ঘরের প্রদীপ জ্বালাবে বৌ, বাইরের অন্ধকার সরাবে পুরুষ, এই ভাবে চলবে পৃথিবী, তাছাড়া সবই ব্যতিক্রম। আমিই জ্বালব আলো।

থাক না মা আজ, শরীরটা তোমার ভাল নেই।—জ্যোতি জোর করেই শুইয়ে রাখতে চায় মাকে। সংসারের অকল্যাণ হ'বে বলে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। শক্তি নেই, তবু ভক্তি আছে, ক্ষমতা নেই, তবু দায়িত্বের বোঝা আজও মাথা থেকে নামলো না!

ঘরের আলো জ্বলল' না, দেবতার চরণতলে প্রদীপ জ্বলল'।

ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে কেঁপে ওঠা প্রদীপশিখা মার মনের কোণে কোণে দুঃখের শিখা জ্বালিয়ে তোলে। প্রদীপের স্তিমিত শিখায় আছে অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মিটা ছড়ানো। আলোক নয়, অলকা নারীর সকরুণ দৃষ্টি।

মার মন উতলা। মনের কানায় কানায় পুঞ্জীভূত বেদনার গুরু গম্ভীর নিনাদ। আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে মনের বন্ধ দুয়ার খুলবেই, ভুলবেন না কোন কথা। ভুলবেন কেমন করে? সেই ষোল বছর বয়স থেকে আজও পর্য্যন্ত ছেলের প্রত্যেকটা কথা তার নিজের মনের প্রতিধ্বনি, প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত নিজের হাতে গড়া, তার প্রত্যেক দিনটির ইতিহাস মার নিজের জীবনের ইতিবৃত্ত।

এই ত সেদিনের কথা, পূর্ণিমার পূর্ণ বিকাশ হল রাত্রির শেষ প্রহরে। ভোরের আলো মাথায় কোরে ছেলে এলো ঝুলনে চোড়ে, লীলা কিশোরের চঞ্চল হাসিটী ঠিকের ঠোঁটের কোণে নিয়ে। সেদিন ছিল ঝুলন-তিথি। মেয়ে হলে নাম থাকত' 'রাধী' কি পূর্ণিমা, ছেলে বলে নাম রইল জ্যোতি। সে যে ঘরেরও জ্যোতি, বাইরেরও জ্যোতি।

জ্যোতি আনল' ভাঙনের লীলা-খেলা আর আনল' সংহের সীমা। ও যেন বন্যার প্রবল স্রোতে ভেসে আসা আশীর্ব্বাদী ফুল। তারপরে মার জীবনে কত ঝড় এল', স্রোত বয়ে গেল, কিন্তু জ্যোতির প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের মধ্যে মা সব সয়ে গেলেন।

জ্যোতি বড় হল। প্রথম স্কুলে যাবার দিন কি ঘটা, পাগলীর জটা ছাড়ানোতেও অত গোলমাল নেই। দিনে দিনে জ্যোতি বড় হল, জ্যোতির প্রহর গুণে গুণে মার সময় কাটল। স্কুল থেকে হাই স্কুলে, সেখান থেকে কলেজে, কলেজ থেকে বিয়ে।

বিয়ে...জ্যোতির বিয়ে, ভাবতেও মার হাসি পায়। এইটুকু জ্যোতি তার আবার বিয়ে। এই ভাবনায় যদি পূর্ণচ্ছেদ পড়ত' তাহ'লে সেই পূর্ণচ্ছেদের বেদনার মধ্যে যে তীব্রতা থাকত তাও হয়ত' সহ্য করা সহজ হত।

কে জানত' এই বিয়ের মধ্যেই আছে মার মনের সব চাইতে বড় আঘাত, সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষা।

মা আধোছায়া অন্ধকারে জ্যোতির হাতখানা বুকের ওপর চেপে ধরে, জানলার পানে চেয়ে থাকেন, মনে মনে আঁকতে থাকেন বিয়ের রাত্রের দিনটিকে, নতুন করে·· শুধু সেই দিনটিকে। তারপরের দিনগুলো ভুলে গেলেই ভালো হয়, তাই অকারণে বার বার সব চেয়ে আগে মনে প'ড়ে যায়। সে দিনগুলো সব চেয়ে বেদনাময়, তাই সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে।

[ক্রমশঃ]

বিজ্ঞান-জগৎ

ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

তিন

পরমাণুর ভাঙনের কাহিনী অতি বিচিত্র। প্রধানতঃ এই কাহিনী অবলম্বনেই গত অর্দ্ধশতাব্দীর পদার্থ-বিজ্ঞান অতিক্রত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুতঃ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর এবং বৃহৎ হতে বৃহত্তর এই উভয়ের সাধনাই আধুনিক বিজ্ঞানের সমান লক্ষ্যের বিষয়। এদিকে পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে ভেতরকার খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলির রহস্য উদ্‌ঘাটনে আপ্রাণ চেষ্টা, ওদিকে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদকে ভিত্তি ক'রে দেশ, কাল এবং সমগ্র বিশ্বের স্বরূপ নির্ণয়ে অদম্য আকাঙ্ক্ষা। উভয় প্রচেষ্টাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা শুধু ক্ষুদ্রের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা সম্পর্কেই আভাবদানে অগ্রসর হয়েছি।

পরমাণু ক্ষুদ্র হলেও সসীম পদার্থ; সুতরাং ওর বিভাজ্যতা আমরা অনায়াসেই কল্পনা করতে পারি। আমরা ভাবতে পারি যে, কোন পরমাণুই বস্তুত; নিরেট নয়, পরন্তু এমন সকল সূক্ষ্মতর কণাদ্বারা গঠিত যারা পরমাণুদের মতই স্বতন্ত্র কারবারী, যারা পরস্পরের মধ্যে কিছু না কিছু দূরত্বের ব্যবধান বজায় রেখে স্বাধীনভাবে কিম্বা পরস্পরের আকর্ষণের অধীন হয়ে ঘোরা ফেরা বা ছুটাছুটি করে এবং ফলে হয়ত কেউ কেউ কখনো কখনো পরমাণুর গণ্ডিভেদ ক'রে আপনা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে, যার খবর আমরা এখনো জানতে পারিনি। আবার ঐ সকল খুদে কণার সাজসজ্জা সম্বন্ধেও আমরা নানা গবেষণা করতে পারি। হয়ত পরমাণুর ভেতর ওরা বিচিত্র সাজে সেজে রয়েছে এবং ওদের সংখ্যা ও সাজ পরমাণু ভেদে একটু একটু ক'রে বদলে যাচ্ছে। কিম্বা হয় ত এই ক্রম পরিবর্ত্তন এমনভাবে সংঘটিত হচ্ছে যে, তার ফলে—একটা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পরমাণুর ব্যবধান পেরিয়ে যাবার পর—আবার পুরানো সাজের ঘটাই পুনঃ পুনঃ ফিরে আসছে, এবং ফলে যে সকল নূতন নূতন পরমাণু গড়ে উঠছে, তাদের ধর্ম্ম হুবহু এক না হলেও আগেকার পরমাণুরই অনুরূপ।

এ সকলই আন্দাজ মাত্র। কিন্তু এইরূপ কল্পনাই বিশেষ সমর্থন লাভ করলো ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন রুশদেশীয় বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলিফ্ বিভিন্ন পরমাণুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যাবর্ত্তী নিয়ম (Periodic Law) প্রচার করলেন। কথাটা এই: আমরা বর্ত্তমানে ৯২ রকমের মূল পদার্থের, সুতরাং ৯২ রকমের ৯২টা পরমাণুর খবর জানি। এর মধ্যে সব চেয়ে হাল্কা হলো হাইড্রোজেন পরমাণু এবং সব চেয়ে ভারী ইউরেনিয়ম পরমাণু। এখন এই সকল পদার্থকে, ওদের পরমাণুর গুরুত্ব অনুসারে, পর পর সাজিয়ে লিখলে এবং ১, ২, ৩ প্রভৃতি ক্রমিক সংখ্যাদ্বারা পর পর চিহ্নিত করলে নিম্নোক্ত টেবল্‌টা পাওয়া যায়:

১। হাইড্রোজেন (১)	৫। বোরণ (১১)
২। হিলিয়ম (৪)	৬। কার্ব্বন (১২)
৩। লিথিয়ম (৭)	৭। নাইট্রোজেন (১৪)
৪। বেরিলিয়ম (৯)	৮। অক্সিজেন (১৬)

৯। ফ্লোরিন (১৯)
১০। নিয়ন (২০)
১১। সোডিয়াম (২৩)
১২। ম্যাগনেসিয়াম (২৪)
১৩। এলুমিনিয়াম (২৭)
১৪। সিলিকন্ (২৮)
১৫। ফস্ফরাস্ (৩১)
১৬। গন্ধক (৩২)
১৭। ক্লোরিন (৩৫)
১৮। আর্গন ৪০)
১৯। পোটেসিয়াম (৩৯)
২০। ক্যাল্সিয়াম (৪০)
২১। স্ক্যান্ডিয়াম (৪৫)

এখানে পরমাণুর টেব্লের মাত্র ২১টি মূল পদার্থের নাম দেওয়া হয়েছে। ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যাগুলি এখানে বিশেষ অর্থপূর্ণ। ওদের বলা যায় পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic number). ব্রাকেটের অন্তর্গত ১, ৪, ৭ প্রভৃতি সংখ্যাগুলি বিভিন্ন পরমাণুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (Atomic weight) নির্দ্দেশ কচ্ছে। হাইড্রোজেন-পরমাণুই সবচেয়ে হাল্কা, সুতরাং ওর গুরুত্বকে ১ সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা গিয়েছে। টেব্ল থেকে দেখা যায় যে, হিলিয়ম-পরমাণুর গুরুত্ব, ওর ৪ গুণ, লিথিয়ম-পরমাণুর ৭ গুণ, এইরূপ। প্রত্যেক পরমাণুর গুরুত্বকে আমরা এখানে পূর্ণসংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করেছি, কিন্তু সূক্ষ্ম পরিমাপে ওদের অনেকের বেলাতেই কিছু না কিছু ভগ্নাংশের অস্তিত্ব ধরা পড়ে; তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা ঐ সকল ভগ্নাংশ অনায়াসেই উপেক্ষা করতে পারি।

রাসায়নিক পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, ৩, ১১, ১৯ এই সংখ্যাবিশিষ্ট পদার্থগুলির (অর্থাৎ লিথিয়ম, সোডিয়ম ও পোটেসিয়মের) ধর্ম্মের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে। আবার ৪, ১২, ২০ সংখ্যাবিশিষ্ট পদার্থগুলির (বেরিলিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম ও ক্যালসিয়মের) ধর্ম্মের মধ্যেও সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। ৫, ১৩ ও ২১ নম্বর-সম্বন্ধেও ঐ কথা। মোটের ওপর সাতটা ক'রে পরমাণুর ব্যবধান পেরিয়ে গেলে ফিরে ফিরে প্রায় একই প্রকৃতির ও একই ধর্ম্মবিশিষ্ট পরমাণুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই নিয়মকেই আমরা প্রত্যাবর্ত্তী নিয়ম বলেছি। নিয়মটা অবশ্য আগাগোড়া—টেবলের এ প্রান্ত হ'তে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত সমভাবে প্রযোজ্য নয়, তবু একটা মোটামুটি নিয়ম বটে। সুতরাং ব্যাপারটাকে আকস্মিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। স্পষ্ট বোঝা যায়, এই নিয়ম ইঙ্গিতে এই কথাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, কোন পদার্থের পরমাণুই একেবারে নিরেট নয়, পরন্তু পরমাণুর ভেতর গঠন-বৈচিত্র্য রয়েছে; মনে হয়, যেন পরমাণু মাত্রই একই জাতীয় কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার সমবায়ে গঠিত এবং ঐ সকল কণার সংখ্যা ও বিন্যাস এক এক পরমাণুর পক্ষে এক এক রকমের হলেও, কোন একটা পরমাণু থেকে সাতটা পরমাণুর ব্যবধান পেরিয়ে গেলে আবার আগেকার বিন্যাসেরই পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

এর বহু পূর্ব্বে (১৮১৫ খৃঃ) প্রাউট এই মত প্রচার করেছিলেন যে, সকল পরমাণুরই মূল উপাদান হাইড্রোজেন পরমাণু। এরূপ অনুমানের পক্ষে কারণ ঘটেছিল এই যে, তখনকার দিনে পরমাণুদের ওজন সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে নির্ণীত হ'তে পারেনি, ফলে প্রায় সকল পরমাণুর ওজনই—হাইড্রোজেন-পরমাণুর ওজনের মাপকাঠিতে—এক একটা পূর্ণসংখ্যা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হতো। এর থেকে এরূপ অনুমান করা স্বাভাবিক যে, হাইড্রোজেন-পরমাণুই গোটাকতক ক'রে দল বাঁধবার ফলে অন্যান্য পরমাণুর সৃষ্টি হয়েছে, যথা—১৪টা হাইড্রোজেন পরমাণু জোট পাকিয়ে গড়ে তুলেছে নাইট্রোজেন-পরমাণুকে, ১৬টা গড়েছে অক্সিজেন পরমাণুকে, এইরূপ। পূর্ব্বোক্ত টেবল থেকে এইরূপই প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু সূক্ষ্ম পরিমাপের ফলে যখন বহু পরমাণুর গুরুত্বে ভগ্নাংশের অস্তিত্ব ধরা পড়লো তখন প্রাউটের মত টিক্‌লো না। তবু এই মত থেকে এইরূপ একটা সম্ভাবনা সূচিত হলো যে, যদি একই প্রকারের কতকগুলো কতকগুলো কণা নিয়ে বিভিন্ন পরমাণুর সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, তবে ঐ সকল কণা হাইড্রোজেন-পরমাণু থেকে সূক্ষ্মতর। মোটের ওপর, মেণ্ডেলিফের নিয়মের মত, প্রাউটের মতও পরমাণুর বিজাতীয় এবং ভেতরকার গঠনপ্রণালীতে বৈচিত্র্যের ইঙ্গিত দান ক'রেছিল।

এই ইঙ্গিত আরো স্পষ্টরূপে পাওয়া গেল আলোকরশ্মির বর্ণছত্র এবং বর্ণালীর বৈচিত্র্য থেকে। বর্ণছত্রের বর্ণনা এইরূপ। সূর্য্যের শ্বেতরশ্মি যখন একটা ঝাড়ের কলম বা অন্য কোন ত্রিকোণ কাচ ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসে তখন ওর ভেতর নানারঙের রশ্মি দেখতে পাওয়া যায়। এই রশ্মিগুলিকে সাদা দেয়ালের ওপর ফেললে রামধনুর মত একটা রঙিন চিত্র ফুটে ওঠে, যার রঙগুলি পরস্পরের গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে অবস্থান করে। এই চিত্র-পটকে বলা যায় বর্ণছত্র (Spectrum). এই রঙিন চিত্রের এক প্রান্তে থাকে লাল এবং অপর প্রান্তে থাকে ভায়লেট রঙ্। উভয়ের মধ্যে থাকে হলদে, সবুজ, নীল ক্রমে নানা রঙের সাজের ঘটা। বর্ণছত্রের ব্যাখ্যা দান করেন সর্ব্বপ্রথমে নিউটন। এর মূল কথা এই যে, ঐ রঙিন রশ্মিগুলি সকলেই সূর্য্যের সাদা আলোতে বিদ্যমান ছিল। বস্তুতঃ সাদা আলো একটা মূল রঙ্ নয়—কোন রঙই নয় পরন্তু ঐ সকল লাল, নীল রশ্মিগুলি পরস্পর মিলে মিশে সাদা আলোর সৃষ্টি করেছে। সূর্য্য রশ্মি যখন শূন্যের ভেতর কিম্বা হাওয়ার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয় তখন সকল রঙের সকল রশ্মি একই বেগে (সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে) ছুটতে থাকে। তখন আলোটা থাকে সাদা। কাচের কলমে ঢুক্‌তেই ওদের বেগের মাত্রা প্রত্যেকের পক্ষেই একটু ক'রে আলাদা হয়ে যায়। ফলে রশ্মিগুলি বিভিন্ন দিকে চলতে সুরু করে ও ঝাঁটার শলার মত ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যাপারকে বলা যায় আলোর বিচ্ছুরণ (Dispersion of Light). কলম থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ও আবার ঐ ব্যাপার ঘটে, এইরূপে বর্ণছত্রের উৎপত্তি হয়।

প্রশ্ন হতে পারে, সূর্য্যরশ্মির বদলে যদি চাঁদের আলো, নক্ষত্রবিশেষের আলো অথবা এই পৃথিবীরই বিভিন্ন উজ্জ্বল পদার্থের আলো কাচের কলমের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে সবার বর্ণছত্রেই কি একই রঙের সাজ দেখতে পাওয়া যাবে? এর উত্তর—না। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, বর্ণছত্রের রঙের বৈচিত্র্য নির্ভর করে, যে উজ্জ্বল পদার্থের আলো বিশ্লেষণ করা যায় তার প্রকৃতি বা ধর্ম্মের ওপর। হাইড্রোজেন, হিলিয়ম থেকে আরম্ভ করে' পূর্ব্বোক্ত টেবলের প্রত্যেক মূল পদার্থকে জ্বলন্ত অবস্থায় এনে কাচের কলমের সাহায্যে ওর রশ্মিগুলির বিশ্লেষণ ঘটাতে পারা যায় এবং ফলে যে সকল বর্ণছত্রের উৎপত্তি হয়, দূরবীনের সাহায্যে ওদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করতে পারা যায়। এর জন্য কাচের কলম ও দূরবীনের সমবায়ে যে যন্ত্র নির্ম্মিত হয়, তাকে বলা যায় বর্ণবীক্ষণ-যন্ত্র (Spectroseope). বৈজ্ঞানিকগণ দেখেছেন যে, বিভিন্ন পদার্থের বর্ণছত্রের চেহারা বিভিন্ন প্রকারের। মানুষের আঙুলের ছাপ প্রত্যেকের পক্ষে আলাদা রকমের, তাই ছাপগুলির চেহারা দেখে আমরা মানুষ চিনতে পারি। সেইরূপ বর্ণছত্রের চেহারা দেখে বৈজ্ঞানিকগণ অনায়াসে বলে দিতে পারেন যে, যে উজ্জ্বল পদার্থের রশ্মিগুলি থেকে ঐ বর্ণছত্রের উৎপত্তি তা' মূল পদার্থ না যৌগিক পদার্থ এবং যৌগিক পদার্থ হ'লে কি কি উপাদানে গঠিত। এইরূপে সূর্য্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রের মূল উপাদানগুলি জানতে পারা গেছে এবং দেখা গেছে যে, যে সকল পদার্থ দিয়ে বিভিন্ন নক্ষত্রজগৎ রচিত হয়েছে তা'র অধিকাংশই পৃথিবীতে বিদ্যমান।

জ্বলন্ত গ্যাসের বর্ণছত্রে একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এই যে, ওদের রঙিন রেখাগুলি সৌরবর্ণছত্রের রঙগুলির মত পরস্পরের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে অবস্থান করে না, পরন্তু জানালার গরাদের মত ওদের পরস্পরের মধ্যে অনবিচ্ছিন্ন দূরত্বের ব্যবধান বর্ত্তমান। এজন্য এই সকল বর্ণসমাবেশকে বর্ণছত্র না ব'লে বর্ণালী (Line Spectrum) বলা হয়। সাধারণতঃ

বর্ণালীর ভেতর বহু সংখ্যক উজ্জ্বল রেখা দেখা যায় এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ওদের বিন্যাস যেন খাপছাড়া গোছের। বস্তুতঃ জানালার পর পর শিকগুলির মত এই সকল রেখা সমভাবে বিন্যস্ত নয়, পরন্তু কোন স্থানে অত্যন্ত ঘন সন্নিকট আবার কোন স্থানে অত্যন্ত ফাঁক্ ফাঁক্। অলন্ত সোডিয়ম বাষ্পের বর্ণালীতে শুধু একটিমাত্র (বা পাশাপাশি অবস্থিত) দুইটি মাত্র হলদে রেখা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য গ্যাসের বর্ণালীতে বহু রেখা বিদ্যমান।

এর থেকে বোঝা যায়, এক এক রকমের পরমাণু এক এক শ্রেণীর রশ্মি বিকিরণ করে। বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের কাজ হচ্ছে রশ্মিগুলিকে পরস্পর থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে ওদের বিচ্ছিন্ন রূপ আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র যা'ই করুক রশ্মিগুলির উৎপত্তি স্থল যে পরমাণু এবং পরমাণুর প্রকৃতি ভেদে যে, এক এক শ্রেণীর রশ্মি উৎপন্ন হয় এইটাই হলো বড় কথা। এর সঙ্গে এই ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক পরমাণুরই এক একটা বিশিষ্ট গঠন রয়েছে এবং এই গঠন প্রণালীর ওপরেই নির্গত রশ্মিগুলির বর্ণ বৈচিত্র্য নির্ভর করে। মোটের ওপর, বর্ণ বিশ্লেষণ ব্যাপারও এই মতই সমর্থন করে যে, পরমাণু বিভাজ্য এবং ওর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি নানা সাজে সজ্জিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে নানা কারবারে লিপ্ত হতে পারে। আরো বুঝতে পারা যায় যে, পরমাণুর ভেতরকার সাজসরঞ্জাম এবং অন্যান্য অজানা ব্যাপারগুলির সঙ্গে ওর থেকে নির্গত বর্ণালীর সাজের ঘটার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। সুতরাং জিজ্ঞাস্য হলো এই সকল রেখা-বৈচিত্র্য পর্য্যবেক্ষণ ক'রে প্রত্যেক পরমাণুর ভেতরকার খবর জানতে পারা যায় কি? এই দাঁড়ালো বৈজ্ঞানিকের বিচার বুদ্ধির সামনে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পদার্থের অনুসন্ধানে পথ নির্ণয়োদ্দেশ্যে একটা মস্তবড় প্রশ্ন।

[ক্রমশঃ]

মা (গল্প)

শ্রীছবি দেবী

গেওয়াড়িয়া নিবাসী শ্রমজীবী হারাণের জীবন নিতান্ত দারিদ্র্যে ঢাকা। দুর্ভিক্ষে, ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু এসে ধীরে ধীরে গ্রাস ক'রে নিচ্ছে তার সমস্ত প্রাণ-সত্তাকে!

কাঁথামুড়ি দিয়ে হারাণ কি ক'রে এই অবস্থা হ'তে পরিত্রাণ পাবে ও আহার্য্যের যোগাড় করবে তার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক নানা চিন্তার জাল হঠাৎ মদন সা'র ডাকে ছিন্ন হ'য়ে গেল। বিনয়নম্র বচনে যতই সে তার কাছে কাকুতি মিনতি করুক না কেন, মহাজন মদন সা জানিয়ে গেল, এই মাসেই যেন সে অন্যত্র চেষ্টা করে। পিছন ফিরে হারানের স্ত্রী কিরণ তার রোরুদ্যমান শিশু পুত্রকে তার শুষ্ক স্তন দু'টি মুখে দিয়ে মদন সা'র কথা শুনে যেন শিউরে উঠলো।

দুঃখে যখন মানুষ কূল কিনারা পায় না, চারিদিকের হতাশা মানুষের মধ্যে তখন ক্রোধের সঞ্চার করে, সেই ক্রোধ আবার প্রকাশ পায় নিরীহদের উপর। ক্ষুধার জ্বালায় শিশুটি কেঁদে উঠল, হারাণ তার রোগ-জর্জ্জর মুখ আরও বিকৃত করে ছেলে ও স্ত্রীকে নির্দ্দয়ভাবে গালাগালি করতে লাগলো, যেন তারাই তার এই দুঃখের জন্য একমাত্র দায়ী। এমন সময়, "কৈ গো, কেন লো, আজও তোমাদের মত হ'লো না"—বলতে বলতে পাড়ার ক্ষেমীমাসি এসে উপস্থিত হ'ল।—"আমার তো অমত নাই, ঐ হারাম-জাদীর জেদ; নিজেও মরবে, ছেলেটাকে মারবে," বলে হাঁপাতে লাগল হারাণ।

কিরণ মাতৃহৃদয়ের সমস্তখানি করুণা দিয়ে ছেলেটিকে আরও নিবিড় করে বুকে জড়িয়ে ধরল। ক্ষেমীমাসী পানের রসে মুখটা সরস করে এলো, "ছেলেটাকে কি তুই মেরে ফেলবি? দেখতো, এই ক'দিনেই কেমন রোগা হয়ে গেছে। তারা বড়লোক, তোদের স্বজাতি, নিতে চাচ্ছে, তাদের কাছে ছেলেটা সুখে থাকবে, ওর মঙ্গল কি তুই চাস না?"

কিরণ ছেলের দিকে একবার স্নেহদৃষ্টি বুলিয়ে দিয়ে দেখল, সত্যি ছেলেটা কি রোগা হয়ে গেছে, আজ সমস্ত দিনের মধ্যে ছেলেটাকে একফোটা দুধ সে দিতে পারে নাই। আজ প্রায় বছর পূর্ণ হয়ে গেল, এই অসহায় সন্তানকে এই দুঃখের পৃথিবীতে টেনে এনেছে, কিন্তু কোনদিনই তো তাকে পেট ভরে দুধ দিতে পারে নাই। অসহায় শিশুটী কতরাত্রে ক্ষুধার জ্বালায় চীৎকার করে উঠেছে, কোনবার শুষ্ক মাইটা; কোনবার জল দেওয়া কেন তার মুখে দিয়ে এই নিষ্পাপ ছেলেটার সঙ্গে সে প্রবঞ্চনা করেছে। নিজের এই অসহায় অবস্থার কথা যেন তাকে প্রবলভাবে নাড়া দিল, আপনি হ'তে তার দু'চোখ হতে জল ঝরে পড়ল। গভীর দুঃখে সে মনে মনে জানাল, ঈশ্বর তাকে যদি কৃপা করে ছেলে দিলেনই, তবে তাকে এক বিন্দু আহার্য্য দেবার অবস্থা দিলেন না কেন?

ঔষধ ধরেছে দেখে ক্ষেমীমাসী তার আনন্দ গোপন করে বলল, "বৌ, কাঁদিস্ না, তোর বুকের ব্যথা কি আমি বুঝি না। কিন্তু কি করবি বল্, যে দিনকাল পড়েছে, তা—কি দিয়েই বা ছেলেকে বাঁচাবি, আর কি দিয়েই বা রুগ্ন স্বামীকে দাঁড় করাবি। ঐ হারাণ বাঁচুক, দিন আসুক, আবার তোর কোল জোড়া হয়ে মাণিক আসবে। আচ্ছা! আজ থাক্, এই টাকা দুটো দিয়ে গেলাম, ছেলেটাকে ভাল কোরে খাওয়া, আদর-যত্ন কর, দু'দিন পরেই না হয় ছেলেকে দিয়ে আসবি।"

* * *

আজ ক'দিন হ'ল কিরণ ছেলেটাকে দাসগিন্নির কোলে তুলে দিয়ে শূন্য হৃদয়ে টাকা নিয়ে ফিরে এসেছে। ছেলেটি যেন তার সমস্ত শক্তি হরণ ক'রে নিয়ে গেছে, চলবার শক্তি তার নাই। পাড়ার চরণকে দিয়ে রোগীর পথ্য ও আহার্য্যদ্রব্য কিনে আনিয়েছে। হারাণকে খেতে দিয়েছে, অনশনের তীব্র জ্বালায় নিজে খেতে গিয়েছে, পরক্ষণেই ঘৃণ্য সন্তানবিক্রীর টাকায় আহারের কথা স্মরণে পড়েই আহার্য্য দ্রব্যগুলি যেন বিষাক্ত হয়ে গেছে, দু'চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নেমে এসেছে, খাওয়া তার হয় নি। এমনি করে অভাগিনীর আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল ছেলের চিন্তা। খালি শোনে ছেলের অস্ফুট কাকলি, বাতাস যেন তার কাণে ছেলের কান্না নিয়ে আসে, ঘরে কোন শব্দ হলেই যেন সে তার ছেলের পা ফেলার শব্দ শোনে। রাত্রে সে ছেলের স্বপ্ন দেখে, ঘুমের ঘোরে শূন্য বুকের নিঃস্ব ব্যথায় জেগে কাঁদতে থাকে নিভৃতে ব'সে,—একা...অন্ধকারে।

কতদিন কতবার সে লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়ে কাঙাল নয়নে ছেলেটিকে দেখতে গিয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই সে দাসদাসীদের কাছ হ'তে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে। তারা কি তার মাতৃ-হৃদয়ের খবর রাখে? আজ সে তার রুগ্ন, শক্তিহীন দেহটাকে টেনে নিয়ে কোন মতে সকলের সতর্ক দৃষ্টির আড়ালে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে ছেলের ঘরের জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে—তার খোকা কি সুন্দর হয়েছে, মোটা হয়েছে, নূতন মাকে আদর করে চুমো খাচ্ছে, অস্ফুটভাবে মা, মা করছে। এ দৃশ্য সে যেন সহ্য করতে পারল না, দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে এলো, চারিদিকে অন্ধকার জ'মে উঠলো যেন তারো হ'য়ে। শব্দ শুনে দাসগিন্নি, চাকর-দাসীকে ডেকে বাইরে গিয়ে ভিখারীকে ভিতরে দেখে সকলকে গালাগালি করতে লাগল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কিরণ নিজের ছেলেকে দেখতে এসে সকলের দেওয়া চোর অপবাদ নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার পথ ধরল। তখনো তার শূন্য হৃদয়ের মাতৃস্নেহ ডাক ভেসে উঠছে—"খোকা·· খোকা।"

সাময়িকপ্রসঙ্গ ও আলোচনা

সরকারী কাগজ-নিয়ন্ত্রণ ও বঙ্গশ্রী

বিগত ২২শে জুনের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত সরকারী কাগজ-নিয়ন্ত্রণাদেশে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা লইয়া ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে জাতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয়ের ভিত্তিতে সংরক্ষণের দাবী জানাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন জানানো হইয়াছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণাদেশে ১৯৪৩ সালে যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহার করা হইয়াছে, তদপেক্ষা শতকরা ৭০ ভাগ কম কাগজ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে ; এবং গত ১২ই জুন হইতেই ইহা বলবৎ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মাত্র ত্রিশ ভাগ কাগজ ব্যবহারে দেশের শিক্ষা ও কার্য্যধারা যে স্থাণু হইতে চলিয়াছে, সেই দিকে গোড়াতেই যদি সরকারপক্ষ দৃষ্টি না দেন, তবে এক বিষম বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইবে। বিদ্যালয়সমূহে কাগজাভাবে বহু পূর্ব্ব হইতেই ছাত্রদের লিখিবার কাগজ ও পরীক্ষাসমূহ কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, বর্ত্তমান আদেশে তাহা একরূপ বন্ধ হইতেই বসিয়াছে। সাময়িক পত্রিকাসমূহও আজ সেই বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, যাহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে আমরা নিজেরাও আজ জড়িত।

গত দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা যে আদর্শের পথে চলিয়া আসিতে-ছিলাম, বর্ত্তমান কাগজ-নিয়ন্ত্রণে তাহা ব্যাহত হইতে চলিয়াছে। কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা মানুষের ধনাভাব নিবারণ হইয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধিত হইতে পারে, কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হইতে পারে, এবং কি কি অনুষ্ঠানের অবলম্বনে মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন যাপন করা সম্ভব,—বিগত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বঙ্গশ্রী তাহা জনসমাজের চোখে তুলিয়া ধরিয়াছে। বর্ত্তমানে বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসতার মধ্যে তাহার অপরিহার্য্যতা এমন কি ইউরোপীয় সংস্কৃতিও যথেষ্ট প্রবুদ্ধ শক্তিতে স্বীকার করিয়া লইবে—ইহা আমরা স্বতঃই মনে করি। কিন্তু সাম্প্রতিক সরকারী কাগজ-নিয়ন্ত্রণাদেশ তাহা আজ ব্যাহত করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবন-বেদ প্রচারে বঙ্গশ্রী এতকাল যে আকারে চলিয়াছিল, আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার তাহা বিবেচনা করিয়া বঙ্গশ্রীকে পূর্ব্বায়তন বজায় রাখিতে আদেশ দিয়া সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ করিবেন।

বর্ত্তমান খাদ্যসমস্যা

যুদ্ধের গোড়া হইতেই খাদ্যসমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে। বর্ত্তমানে তাহা আরও কঠিন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বিগত ১৩৫০ সালে বাংলার উপর দিয়া যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ বহিয়া গেল, তাহা আজও চিত্তে ভীতির সঞ্চার করে। পুনরায় কলিকাতা ও বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে মানুষের ভিক্ষাবৃত্তি ও মহামারী প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি বাংলা পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বাংলার পুনর্দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে এক যুক্ত-বিবৃতি দিয়াছেন। তাহা হইতে স্বতঃই জনসাধারণ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে বাংলার লাট বাহাদুর স্যার কেসী এক বেতার-বক্তৃতায় অবশ্য '১৩৫১ সাল দুর্ভিক্ষ হইতে মুক্ত' বলিয়া দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়াছেন, কিন্তু যে পরিমাণে খাদ্যমূল্য পুনরায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ও ভিখারীর আর্ত্তনাদে দেশ ভরিয়া উঠিতেছে—তাহাতে স্বভাবতঃই বাংলায় (আগামী) পুনর্দুর্ভিক্ষ রেখাপাত করে না কি ?

শুধু বাংলা বলিয়াই নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ এই জীবন-মৃত্যু সমস্যায় মানুষ দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পিছনে ভাগ্য-বিধাতার ইঙ্গিত কতটা আছে জানি না, কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তিতে যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইতেছে এই যুদ্ধের বীভৎসতা। পিঠা ভাগের মতো মার্জ্জার ও কপি চূড়ামণির বিরুদ্ধরোষে পৃথিবীর সমস্ত পিঠা বিলুপ্ত হইয়া চলিতেছে, ধুঁকিয়া মরিতেছে গৃহস্থ। যতদিন এই যুদ্ধ রহিয়াছে, যতদিন না এই নারকীয় অগ্নি-শিখা পৃথিবী হইতে একেবারে লুপ্ত হইতেছে, —ততদিন এই খাদ্যসমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান ঘটিতে পারে না। বার বার দুর্ভিক্ষ আসিবে, বার বার লক্ষ লক্ষ লোক মানুষের লাঞ্ছনা কুড়াইয়া অনাহারে বুভুক্ষায় তিলে তিলে কঙ্কালসার হইয়া মরিবে। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে যে মানবীয় প্রীতিজ্ঞান ও সহনশীল আত্মনিষ্ঠা আবশ্যক, তাহা আজ পৃথিবীর মাটি হইতে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। বিনা বিচারে আজ তাই বাংলা মরিতেছে, পৃথিবী এক বন্যার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। ইহার নিষ্পত্তি কে করিবে ? কবে ইহার সমাধান হইয়া বাংলা তথা সমগ্র বিশ্বের জনপ্রাণী আবার সুখের অন্ন ভোগ করিয়া সাবলীল হাস্যে মুখর হইয়া উঠিতে পারিবে ? সে-দিন কি বহু দূরে ?

গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার

বিগত লাহোর অধিবেশনে মুসলীম লীগ কাউন্সিল লীগ-সভাপতি মিঃ জিন্নাকে গান্ধীজীর সহিত আপোষ-আলোচনা চালাইবার জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন। মিঃ জিন্না আশ্বাস দিয়াছেন যে, সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না।

গান্ধীজীর সহিত ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার মিঃ জিন্নার আপোষ-আলোচনা হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু কেহই কিছু একটা সন্তোষজনক মিলন-সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। সম্প্রতি মিঃ রাজাগোপালা-চারীর পাকিস্তান-স্বীকৃতিকে মূল ভিত্তি করিয়া আসন্ন আলোচনার প্রয়াস। কিন্তু যেখানে সমগ্র দেশের প্রযুক্ত মতবাদ অন্ধের মতো পিছনে চাপা পড়িয়া আছে, সেখানে এই বিচ্ছিন্ন কুক্ষিগত 'দফা' সৃষ্টির সত্যই কোনো বৃহত্তর সার্থকতা আছে কিনা, তাহা একমাত্র আগামী ভবিষ্যতের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা গান্ধীজী। হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার তাঁহার এই প্রয়াস স্বাভাবিক। কিন্তু তথাকথিত 'স্বাধীনতা' বলিতে কি বুঝি ? পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন স্বাধীন দেশসমূহ আজ যে ধ্বংসোন্মত্ততার পরিচয়

দিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা-আহার হইতে সমগ্র জনসমাজকে যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ করিয়া রাখিতেছে, ইহাই কি স্বাধীনতাভোগের উৎসারিত রূপ? আশা হয়ত স্তিমিত আলোক-রশ্মির ন্যায় ভবিষ্যতের গর্ভে ভ্রূণের মধ্যে ক্ষীণ প্রাণে নড়িতেছে, কিন্তু ভরসার পথ কণ্টকাকীর্ণ। দুঃখের হুতাশনে প্রাণ বলি হইয়া চলিয়াছে, তৃণের মূল্যে বিক্রীত হইতেছে মানুষের জীবনসত্তা, যুদ্ধজাত রক্তরঞ্জিত ভূমি প্রতি-হিংসার মুখোস আঁটিয়া বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় জিহ্বা লক্ লক্ করিতেছে। ইহাই কি স্বাধীনতা ভোগের আনন্দ? গান্ধীজীর আবদ্ধ স্বাধীনতা অথবা স্বাধীন ভারত কি রূপ পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইবে, তাহা অবশ্য তাঁহারই বিচার্য্য বিষয়, কিন্তু বর্ত্তমান বিশ্বে স্বাধীনতার রূপ যে দিকে চলিয়াছে, তাহা যে অন্ততঃ ভারত চাহে না, ইহা নিশ্চিত।

দ্বিতীয়তঃ, চুক্তি বা 'প্যাক্ট' করিয়া আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কোথাও মিলনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে কিনা তাহাও বিচার্য্য বিষয়। অন্ততঃ কালের গতিপথে তাহার ফলপ্রসূতার সাক্ষ্য ইতিহাস অদ্যাবধি কোথাও দিতে পারিয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। রথের চাকায় ধূলি হইয়া নামমাহাত্ম্যে চিত্তমুখর হইয়া ওঠা সহজ বটে, কিন্তু অঙ্গের বিভূতিকে লাবণ্যবিভায় শাশ্বত করিয়া রাখার নিঃস্বতা পদে পদে। অন্ততঃ পৃথিবীর ঐতিহাসিক পটভূমিতে বার বার ইহারই নিদর্শন দেখিতেছি। আসন্ন চুক্তি-প্রয়াস কি তাহা হইতেও মহত্তর কিছু?

মিঃ জিন্না গান্ধীজীকে জানাইয়াছেন, আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে বোম্বাইয়ে তাঁহার নিজ বাসভবনে গান্ধীজীকে তিনি অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। এই প্রস্তুতির দ্বারপ্রান্তে আমরা উপরোক্ত প্রশ্নটিই মাত্র গান্ধীজী ও মিঃ জিন্নার সকাশে তুলিয়া ধরিতে চাই।

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও শান্তির লক্ষ্য

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া চার বৎসর এগার মাসের যুদ্ধে জার্ম্মানী গোড়ার দিকে যে দানবীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল, সে বিজয়রথচক্র আজ মন্থর হইয়া গিয়াছে বলিলে কম বলা হইবে। সর্ব্বত্রই আজ জার্ম্মানীর অসুবিধা সূচিত হইতেছে। মিত্রপক্ষ ক্রমাগত আজ বিভিন্ন রণ-ক্ষেত্রে তাহার শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিয়া চলিয়াছে। সাম্প্রতিক গত এক মাসের যুদ্ধে দেখা যায়:

ফরাসী রণাঙ্গন

মিত্রপক্ষীয় দ্বিতীয় আর্ম্মি কর্ত্তৃক নর্ম্মাণ্ডি অভিযানের বৃহত্তম পরিকল্পনায় ১৬ই জুলাই তারিখ এস্কোয়ে অধিকৃত হয়। জেনারেল ব্রাডলী ও জেনারেল মণ্টগোমারি এবং কানাডিয়ান টহলদারী সৈন্যবৃন্দের সাঁজোয়া বাহিনী ও সৈন্যসমাবেশ শত্রুসৈন্যকে পর্য্যুদস্ত করে। তৎপর হইতে ক্রমিক পদ্ধতিতে সেণ্ট্ লো, কাঁয়ে, কাঁইসি, কাউটান্স হইতে আরম্ভ করিয়া এভ্রেঞ্জি, এস্কোয়ে ও ভিলার্স বোকেজ পর্য্যন্ত আমেরিকান বাহিনীর অপূর্ব্ব দক্ষতায় মিত্রপক্ষ জয়লাভ করে।

রুশ রণাঙ্গন

অপর দিকে রুশ রণক্ষেত্রে লালফৌজের অক্লান্ত অগ্রগতি জার্ম্মান ঘাঁটিকে সর্ব্বত্র পর্য্যুদস্ত করিয়া চলিয়াছে। বিগত ১৬ই জুলাইয়ের পর হইতে অদ্যাবধি গ্রদ্নো, পস্কভ, লুবলিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ প্রায় খাস জার্ম্মানীর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া লালফৌজ আঘাত হানিয়াছে—যে আঘাত অতি সহজে ফিরাইয়া দিবার মতো শক্তি জার্ম্মানী আজ সত্যই হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ইতালী রণাঙ্গন

যেমনি ইতালী রণক্ষেত্রেও পঞ্চম আর্ম্মির লেগহর্ণ দখল করা হইতে সুরু করিয়া জার্ম্মান সৈন্যের যথেষ্ট বাধাদান সত্ত্বেও আমেরিকান বাহিনীর কারমা, সেরভাবদো, স্যাস্তোনাকো প্রভৃতি অঞ্চল বিজয়ের বার্ত্তাসমূহ চক্রশক্তিকে ক্রমাগত ঘায়েল করিবারই ইঙ্গিত করে। তাহার বিরুদ্ধে উৎসারিত চক্রশক্তির অভিযান সম্প্রতি একরূপ পরিদৃষ্টই হইতেছে না।

ইতিমধ্যে জার্ম্মানীর বহুপ্রচারিত উড়ন্ত বোমার আক্রমণ সমগ্র লণ্ডন-প্রাণভূমিতে যে ভীতির সঞ্চার করে, তাহাও গ্রহীতব্য। এ সম্পর্কে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল সম্প্রতি কমন্স সভায় যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায়—গত জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রায় দুইমাস ধরিয়া জার্ম্মানী বৃটেনের উপর অন্যূন ৫৩৪০ টি উড়ন্ত বোমা নিক্ষেপ করিয়া ৪৭৩৫ জন বৃটেনবাসীকে নিহত, প্রায় ১৪ হাজার লোককে আহত এবং প্রায় ৮ লক্ষ গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে; ফলে প্রায় দশলক্ষ লোক লণ্ডন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিল এই বিরাট ধ্বংস-কার্য্যের প্রত্যুত্তর দিয়াছেন জার্ম্মানীতে কমপক্ষে ৪৮ হাজার টন বোমা নিক্ষেপ করিয়া।

ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে, বিভিন্ন রণাঙ্গন হইতে ক্রমাগত পর্য্যুদস্ততার মধ্যে জার্ম্মাণীর সম্প্রতি প্রধান লক্ষ্য হইতেছে একমাত্র বৃটেনের ক্ষতি সাধন করা। কিন্তু ইতিমধ্যে জার্ম্মানী হইতে যে গৃহযুদ্ধ ও হিটলারের প্রাণনাশ-প্রচেষ্টার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা তাহার সার্থকতা কতদূর অগ্রসর হইবে, সে বিষয় চিন্তা-সাপেক্ষ। জার্ম্মানীর গৃহযুদ্ধের মূলে দেখা যায়, এই দীর্ঘ-কালের যুদ্ধ-মরণমুখীতার মধ্য হইতে সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণ মুক্তপক্ষ-বিহঙ্গমের মতই একটা অনুকূল স্বস্তি চায়। হিটলারের প্রাণনাশ-প্রচেষ্টার মূলে এই স্বস্তিপ্রয়াসই প্রভাবিত কি না, সে সম্বন্ধেও ভাবিবার আছে।

জাপানী যুদ্ধ

এদিকে চীন ও ভারত-ব্রহ্ম যুদ্ধে যথেষ্ট বলপ্রয়োগ সত্ত্বেও গত জুলাই পর্য্যন্ত জাপানকে বহুতর বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, যাহার ফলে দক্ষিণ হুনান, সুমক্রং প্রভৃতি অঞ্চল হইতে তাহাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। ইতিমধ্যে জেনারেল তোজোর পদত্যাগ জাপানী রাষ্ট্রতন্ত্র ও রণনীতিতে এক নূতন আকার ধারণ করাইয়াছে। জার্ম্মানীর মত জাপানেও আজ চারিদিক হইতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জাগিয়া উঠিয়াছে। স্বস্তির প্রত্যাশায় চিত্ত তুলিয়া উঠিয়াছে জনসাধারণের।

বিস্তৃত এই যুদ্ধ-বীভৎসতার মধ্যে শুধু জার্ম্মান ও জাপানী নাগরিকবৃন্দই নয়, সমগ্র পৃথিবীর চিত্তই আজ একটা আশু কল্যা।

ও শান্তির প্রয়াসে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই শান্তি আনিবে কে? জল সেচন করা সম্ভব হইবে কেমন করিয়া এই অগ্নি-প্রবাহে? সম্প্রতি মিঃ চার্চ্চিলের যুদ্ধ-বিবৃতি হইতে দেখা যায়: জার্ম্মানীকে ঘায়েল করিতে পারিলে জাপানকে পরাজিত করা বিন্দু-মাত্রও কষ্ট-সাপেক্ষ নয় এবং ক্রমান্বয়ে যুদ্ধের যথাসম্ভব শীঘ্র অবসানই আশাপ্রদ। এ বিষয়ে মতবৈষম্য না থাকিলেও যুদ্ধের দ্বারা যে যুদ্ধের কখনো শান্তি হওয়া সম্ভব নয়, তাহা সর্ব্বথা অনস্বীকার্য্য। এই যে চতুর্দ্দিকে আজ মূঢ় উন্মত্ততা, বিজাতীয় রোষে জাতি-স্বাতন্ত্র্যের ধ্বংসোন্মুখী উল্লম্ফন, জ্বলন্ত অগ্নিদাহে শ্যামলভূমি শিবা-সঞ্চারিত মহাশ্মশান—ইহা কি শুধু রোষান্বিত আক্রমণের দ্বারাই প্রশমিত হওয়া সম্ভব? আমরা তাহা মনে করি না।

ইতিমধ্যে "যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা"র সতের দফা কোষ্ঠী লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পরিকল্পনা শুধু মাকড়সার মতো জালই প্রসারিত করিতেছে, কার্য্যকারিতা আজও দেখা দেয় নাই। যুদ্ধ প্রশমিত হইলেই যে পৃথিবীতে শান্তির ছায়া নামিবে, তাহা অন্ততঃ ঐতিহাসিক ভিত্তিতে আজ পর্য্যন্ত কোনো দিন দৃষ্ট হয় নাই। ক্ষণকালের বিরতি-প্রশান্তিতে আবার নতুন সাজোয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার সুরু হইয়াছে নতুন আক্রমণ। পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার ইহাই প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। "পরিকল্পনা"কে কেন্দ্র করিয়া নেতৃবৃন্দ এমনও আশ্বাস দিতেছেন যে—এইখানেই চিরকালের মতো যুদ্ধ-নিরসন। কিন্তু তাহার সম্ভাব্যতাও এখনও চিন্তারাজ্যের সুদূরাঞ্চলে নিহিত। যতক্ষণ না মানুষ পরস্পর-সৌহার্দ্যে প্রযুক্ত হইতেছে, একজনকে দিয়া আর একজনকে স্বীকার করিয়া লইতেছে—ততদিন পর্য্যন্ত সত্যকার শান্তির স্বপ্ন দেখা অন্ধতা মাত্র। যুদ্ধের দীর্ঘতা আজ পর্য্যন্ত তো কম দূর প্রলম্বিত হয় নাই, কিন্তু 'পরিকল্পনা'-অনুসৃত সেই শান্তির সূচনা কোথায়? নেতৃবৃন্দ তাহা বলিতে পারেন কি?

সংবাদ

নব-গঠিত জাপ-মন্ত্রিসভা

সম্প্রতি জাপ-প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল তোজো পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রকাশ, উপর্য্যুপরি সামরিক বিপর্য্যয়ে তোজো মন্ত্রিমণ্ডলী অপযশভাজন হইয়া পড়ে এবং জনসাধারণ মন্ত্রিসভার উপর বিশ্বাস হারায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা হইতে ইহার অন্তর্নিহিত সমস্যা উপলব্ধি হয়। ১৯৪২ সালে দক্ষিণ সমুদ্রে দ্রুত জয়লাভের সময় জাপ নৌ-বিভাগ অষ্ট্রেলিয়াকে পাল্টা আক্রমণের ঘাঁটিরূপে ব্যবহারের সুযোগ হইতে মিত্রপক্ষকে বঞ্চিত করার জন্য অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের এক পরিকল্পনা করিয়াছিল; এবং আমেরিকাকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিবার জন্য জাপ নৌ-বিভাগ ঐ সময় আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে বিমান আক্রমণ চালাইবারও এক পরিকল্পনা করে। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী তোজো এই পরিকল্পনায় বাধা দিয়া বলেন: এইরূপ আক্রমণ পরিচালনার মতো জাপানের শক্তি নাই।—গত দুই বৎসরের এই ঘটনা হইতে সুরু করিয়া ১৯৪৩ এর সলোমন দ্বীপাঞ্চলের যুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক জাপানের পরাজয়ের সূচনা পর্য্যন্ত জেনারেল তোজোর দায়িত্ব এবং সমরনীতি সম্পর্কে সৈন্য ও নৌ-বিভাগের মধ্যে ক্রমাগতঃ মতানৈক্য ও বিরোধই তোজোর পদত্যাগ ও নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের কারণ। জাপানী বিশেষজ্ঞ ও জাতীয় সমর পরিষদের আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা গবেষণা ব্যুরোর ডিরেক্টর ওয়াং পেং সেন উপরোক্তরূপ মন্তব্য করেন। বর্ত্তমান নব-গঠিত মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য হইতেছে—পূর্ব্বোক্তরূপ আভ্যন্তরীণ বিরোধ দূর করিয়া এক যুদ্ধ ফ্রণ্ট গঠনের দ্বারা সমর ও শাসনতান্ত্রিক কার্য্য পরিচালনা করা। বর্ত্তমান নব-গঠিত মন্ত্রিসভায় আছেন:

জেনারেল কুনিয়াকি কায়সো (প্রধান মন্ত্রী), এড্‌মিরাল মিৎসুমাসা ইয়োনাই (সহকারী প্রধান মন্ত্রী), মামোরু সিগেমিৎসু (পররাষ্ট্র ও বৃহত্তর পূর্ব্ব এশিয়া সচিব), ফিল্ড্ মার্শাল সুগিয়ামা (সমর সচিব), এড্‌মিরাল মিৎসুমাশা ইয়োনাই (নৌ-সচিব), সিগিও ওদাচি (স্বরাষ্ট্র সচিব), সোতারো ইসিওয়াতা (অর্থ সচিব), হিরোমাসা মাৎসুসাকা (বিচার সচিব), হিসতোদা হিরোস (জন-কল্যাণ সচিব), হারুসিগ্ নিনোমিয়া (শিক্ষা সচিব), জিঞ্জিরো ফুজিওয়ারা (সমরোপকরণ উৎপাদন সচিব), তোসিও সিমাদা (কৃষি ও বাণিজ্য সচিব), ইয়োনেজু মায়েদা (যানবাহন সচিব), চু জি মাচিদা, হিদিও কোদামা ও তাকেতোরা ওগাতা (রাষ্ট্র সচিব)।

তোজো-মন্ত্রিসভার অধিকাংশ মন্ত্রীই বর্ত্তমান মন্ত্রিসভায় বহাল আছেন।

রুশ-পোলিশ সম্পর্ক

সম্প্রতি মস্কো রেডিও কর্ত্তৃক সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, যুদ্ধ বিজয়ের পথে পোলাণ্ডের এলাকায় স্বীয় শাসন প্রবর্ত্তনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের নাই। সোভিয়েট কম্যাণ্ড ও পোলিশ কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকিবে, সে সম্বন্ধে পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির সহিত সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট একটি চুক্তি সাধনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। সাম্প্রতিক যুদ্ধে কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনে এবং পোল্যাণ্ডের মিত্র-জনসাধারণকে জার্ম্মান কবলমুক্ত করার আগ্রহেই লালফৌজ পোল্যাণ্ডের এলাকায় যুদ্ধ চালাইতেছে। আলোচ্য সম্পর্ক বিষয়ে ক্রেমলিনে মার্শাল ষ্ট্যালিনের সম্মুখে পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির সাক্ষরিত চুক্তি-পত্রে যে দশটি ধারার অবতারণা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ধারা হইতেছে—পোল্যাণ্ডের যে সমস্ত স্থান সামরিক তৎপরতার এলাকার অন্তর্ভুক্ত, সেই সমস্ত স্থানে সোভিয়েট প্রধান সেনাপতি সর্ব্বোচ্য ক্ষমতা গ্রহণ করিবেন। পোল্যাণ্ডের জার্ম্মান কবলমুক্ত অঞ্চলে পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটি কর্ত্তৃক পোলিশ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এক পোলিশ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। কোনো অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা শেষ হইলে পর পোলিশ কমিটি তথাকার অসামরিক ব্যাপারের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। পোল্যাণ্ডে সোভিয়েট বাহিনীর লোকগণের বিচারের ক্ষমতা

সোভিয়েট কমাণ্ডের হস্তে থাকিবে ; এবং পোলিশ সশস্ত্র বাহিনীর লোকগণের বিচার পোলিশ সামরিক আইন অনুযায়ী সম্পন্ন হইবে।

চুক্তির উপসংহার এখনো অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

ফিল্ড মার্শাল রোমেল আহত

বিগত ৩০শে জুলাই নর্ম্মাণ্ডিস্থ মার্কিণ প্রথম আর্ম্মির হেড কোয়ার্টার হইতে জানান হইয়াছে যে, মিত্র সেনার হস্তে বন্দী একজন জার্ম্মান ক্যাপ্টেন বলিয়াছেন—নর্ম্মাণ্ডির যুদ্ধে জেনারেল রোমেল আহত হইয়াছেন। যে গাড়ীতে করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লওয়া হইতেছিল, উক্ত গাড়ীখানি পথিমধ্যে উল্টাইয়া যায়, ফলে জেনারেল রোমেলকে প্রায় ছয় ঘণ্টাকাল অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়িয়া থাকিতে হয়। তাঁহার অবস্থা গুরুতর।

পুস্তক ও আলোচনা

উপনিবেশ ঃ শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড্ সন্স, কলিকাতা। দাম ১।০ মাত্র।

উপনিবেশ সেই স্তরের উপন্যাস, যাহাকে বুদ্ধির দ্বারা ধরিতে হয়, হৃদয় দিয়া বুঝিতে হয়, বিজ্ঞানী মন দিয়া খুঁজিতে হয় ইহার সারবস্তু ; সাদা চোখে চিত্ত-বিনোদনের উপাদান খুঁজিতে যাওয়া মূর্খতা। সেই সাহিত্যই সংসাহিত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, যে সাহিত্যে প্রাণবস্তু হইয়া উঠিবে এই মাটির পৃথিবী। 'উপনিবেশ' সেই সাহিত্যে উত্তীর্ণ।—"পৃথিবী বাড়িতেছে। নদীর মোহনার মুখে পলিমাটির স্তর পড়িতেছে, আর ক্রমে ক্রমে সেই স্তরের উপর দিয়া সুন্দরবন প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহাতেই শেষ নয়। প্রয়োজনের ধারালো কুঠার দিয়া লোভী মানুষ বনভূমিকে করিতেছে সমভূমি—অরণ্যকে করিতেছে উপনিবেশ।"

এমনি করিয়াই পৃথিবী বাড়িয়াছে, বাড়িতেছে। কত লোক আসিয়াছে, আসিতেছে, যাইতেছে। জোহান, ডিসুজা, কেরামদ্দি, মণিমোহন, বলরাম, গঞ্জালেস প্রভৃতিও এই ক্রমবর্দ্ধমান পৃথিবীর পথে উপনিবেশ সন্ধানী জনযাত্রী। লেখক তাঁহার স্বভাবসুলভ প্রাঞ্জল ভাষায় ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তিতে গ্রন্থের কাহিনীটিকে এমন প্রাণবস্তু রূপ দিয়াছেন, যাহা বাংলার সংসাহিত্য-গ্রন্থরাজির মধ্যে বিশেষ একটা স্থান পাইবার যথার্থ ই অধিকারী। নারায়ণবাবুর সার্থক সৃষ্টি উপনিবেশ।

শ্রীঅমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

অধিনায়ক ঃ শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটিকা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড্ সন্স, কলিকাতা। দাম—১৲ টাকা মাত্র।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। সাময়িক বিভিন্ন পত্রে ছোট গল্প লিখিয়া ইতিমধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটী তাঁহার নাট্যরচনার প্রথম প্রয়াস। গ্রন্থের নায়ক মানবেন্দ্র জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত। রবীন্দ্র-আদর্শে উদ্বুদ্ধ সে। জীবনের উদ্দেশ্য তাহার পতিতোদ্ধার···দেশের সেবা। কিন্তু পিতা সমরেন্দ্রনারায়ণ রক্ষণশীল অভিজাত সমাজের মানুষ ; আভিজাত্যের সংরক্ষণই তাঁহার ধর্ম্ম। পিতা-পুত্রের মূল দ্বন্দ্ব এইখানেই। এই দ্বন্দ্ব-বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করিয়াই মূল কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।—নাটকীয় বিন্যাস ও ভাষামাধুর্য্যে বইখানি যথার্থ ই সার্থক সৃষ্টি হইয়াছে। নবীন নাট্যকারের পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

বিপ্লব ঃ শ্রীরণজিৎকুমার সেন প্রণীত গল্পগ্রন্থ। ঊষা পাব্লিশিং হাউস, ৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। দাম—১৸০।

বাংলা দেশে আজ সব দিক থেকে যে প্রচণ্ড সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপ্লব আসন্ন হয়েছে, রণজিৎবাবুর গ্রন্থে তার অপূর্ব্ব বাস্তব-চিত্র রূপ পেয়েছে। তাঁর দৃষ্টি বাস্তববাদী, বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ ও নিপুণ—কিন্তু নির্ম্মম ও 'সিনিক' নয়। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে গভীর সহানুভূতির মিলনে গল্পগুলি অভিনব হয়েছে। সাংপ্রতিক যুগের মন্বন্তর-কথাসাহিত্যে তাঁর 'মহামুহূর্ত্ত' গল্পটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প হিসাবে এটি আসন দাবী করতে পারে।

'বিপ্লব' বইটি যাঁরা প'ড়বেন, তাঁরাই দাবী ক'রবেন, রণজিৎ বাবুর লেখনী একান্তভাবে বহুপ্রসবিনী হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

স্যান মিন্ চু-ই ঃ শ্রীলক্ষ্মীকান্ত সেন চৌধুরী কর্ত্তৃক অনূদিত। চাইনিজ্ মিনিষ্ট্রি অফ্ ইন্ফরমেশন, ২৯নং ষ্টীফেন কোর্ট, কলিকাতা।

চীন-বিপ্লবের অন্যতম নেতা ও চীন-সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সান ইয়াট-সেন ১৯২৪ সালে কুয়োমিনটাঙের (চীনের জাতীয় দল) পুনর্গঠনের জন্য উক্ত দলের মূলনীতি ব্যাখ্যা করিয়া ক্যানটনের কোয়াংটুঙ্ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিকরূপে কতকগুলি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাগুলিই স্যান মিন্ চু-ই বা জনসাধারণের তিন নীতি বলিয়া পরিচিত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে বক্তৃতাগুলি চীনের জাতীয় সংগঠনশক্তির মূলে এক অপরিহার্য্য সম্পদ। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বাবু অত্যন্ত সহজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালীর চোখে গ্রন্থখানি তুলিয়া ধরায় তিনি প্রশংসাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। প্রত্যেক জাতীয়তাবাদীর গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

BANGASREE—Bhadra 1351. Each Copy As. -/9/- প্রতি সংখ্যা ।/০ Regd. No. C. 2061.

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং ৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কেমন সুন্দর দেখায়!

ঠিক্ এই কথাই আপনিও বল্‌বেন যখন আমাদের গেঞ্জী ব্যবহার কর্‌বেন।

দেখ্‌তে যেমন সুন্দর, ব্যবহারে তেম্‌নি আরামদায়ক অথচ বেশ টেক্‌সই ও সস্তা। আমাদের তৈরী **"সানসাইন"** ও **"এভারবিউটি"** গেঞ্জী সত্যই অতুলনীয়। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান যুদ্ধের বাজারে আমরা বিশেষ চেষ্টা ক'রেও ক্রেতাগণের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটাতে পাচ্ছি না।

বীণা হোসিয়ারী এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ

৭, শশীভূষণ চাটার্জ্জী লেন, টালা, কলিকাতা।

জাপানী প্রচারক দল বুলি আওড়ায়,—"আমরা ভারতকে মুক্ত করব।" যে-জাতের স্বাধীনতা বল্‌তে নিজেদের দেশে কস্মিনকালেও কিছু নেই তাদের মুখে এ বেশ খাসা প্রতিশ্রুতি! ভারতবর্ষ স্বায়ত্বশাসন চায়। এমন একটা দেশের সহায়তা লাভের প্রয়োজন তার নেই যে-দেশের সামরিক নেতৃবৃন্দ এশিয়ার জাতি সমূহকে মুক্ত না করে বরং পদানত রাখতে চায়।

জয়ের মারফতে .... স্বাধীনতা

A 1019

নারীর
সৌন্দর্য্যকে
ফুটিয়ে তোলে
এম.এল. বসু এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা

আনন্দময়ীর
আগমনে
কেশরঞ্জন তৈল
বাঙ্গলার প্রতি গৃহে—
শান্তি ও আনন্দ
দান করিবে

অলঙ্কারে বৈচিত্র্য
MBS
অলঙ্কার নির্মাণে — ডিজাইনের সৌষ্ঠব, মনোরম কাজ এবং স্বর্ণের বিশুদ্ধতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দোকানে নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ হাল ফ্যাসনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অল্প সময়ে পছন্দ মত জিনিষ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। মফঃস্বলের অর্ডার ভি পি ডাকে পাঠান হয়। পুরাতন স্বর্ণের পরিবর্ত্তে নূতন অলঙ্কার পাওয়া যায়। অন্যের তুলনায় মজুরী সুলভ এবং প্রত্যেকটি অলঙ্কারের জন্য গ্যারান্টি থাকে।

রূপশ্রী!
সুবাসিত
সোহাগ সিন্দুর
নারীর দেহ মন
পবিত্রতর করে!
গুহ এণ্ড ...দাস

NICE BISCUITS
BISCUITS
সন্তোষ ...
৮ সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা

গ্রাম — বণের ধন
ফোন ঃ
ক্যাল ৩৭৩৪

—স্থাপিত—
১৯২৯

আয়করমুক্ত শতকরা ৫৲ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে

শাখা সমূহ —

কলিকাতা		বাঙ্গলা		আসাম	বিহার
মাণিকতলা	ধর্ম্মতলা	মেদিনীপুর	বাঁকুড়া	তেজপুর	পাটনা
শ্যামবাজার	শিয়ালদহ	বালিচক	বিষ্ণুপুর	হবিগঞ্জ	রাঁচী
কলেজ ষ্ট্রীট	বালিগঞ্জ	শালবনী	মির্‌কাদীম		
বড়বাজার	পোস্তা	আলমগঞ্জ	কৃষ্ণনগর		
		গড়বেতা	খুলনা		
		ঘাঁটাল	বাগেরহাট		

সেণ্ট্রাল অফিস শীঘ্রই ৮০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে
স্থানান্তরিত করা হইবে

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন।

জীবন বীমাপত্র

বর্ত্তমান যুদ্ধসঙ্কট ও আর্থিক বিপর্য্যয়ের দিনে ভবিষ্যতের জন্য সাধ্যমত সঞ্চয় করা সকলেরই কর্ত্তব্য। একটী জীবন বীমাপত্র দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক আর তেমনই লাভজনক। 'ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স'কে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দিয়া আপনার ও আপনার পরিবার-বর্গের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন।

মিঃ জে. সি. দাশ, বি-এস্‌সি (ইউ. এস্. এ.), আর. এ., চেয়ারম্যান

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস ঃ ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
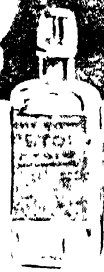
ফ্রাঙ্ক রস্ এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা

ন্যায্য পারিশ্রমিকে

এবং

অল্প সময়ে

সর্ব্বপ্রকার ব্লক

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ

ও

আধুনিক ডিজাইন

রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
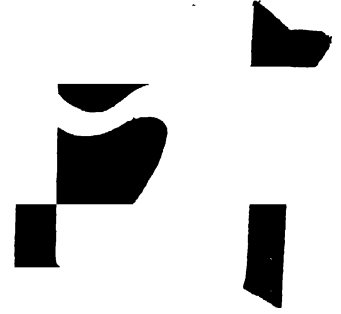
৭।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Telegram :—HOLSFLTI. Estd. 1922.

সত্যিকারের ভাল

চা

পাইতে হইলে

খোঁজ করুন—

বি. কে. সাহা এণ্ড ব্রাদার্স

—লিঃ—

প্রসিদ্ধ চা-বিক্রেতা

মফঃস্বলবাসী পাইকারগণের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস—৫নং পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন্ঃ কলিঃ ২৪৯৩

ব্রাঞ্চ ২নং লাল বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন্ঃ কলিঃ ৪৯১৬

বাংলার গৌরব

বাঙ্গালীর নিজস্ব

আর. বি. রোজ

নস্য

সুমধুর গন্ধ-সৌরভে

গন্ধ নস্য

জগতে অতুলনীয়

মূল্য—ভিঃ পিঃ মাশুলসমেত ২০ তোলা
১ টিন ৩।/০ ; ২ টিন ৬।০ মাত্র।

ক্যালকাটা স্নাফ ম্যানুফ্যাক্ কোং

১৩।৩, বেনেটোলা লেন, কলিকাতা

চা
সকল উৎসবেই প্রয়োজন
নায়েকের চা
গন্ধে অতুলনীয়
স্বাদে অনুপম
বর্ণে অনবদ্য
নায়েক টী মার্ট
২৭, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ম্যানেজিং এজেণ্টস্—
চণ্ডীচরণ নায়েক
প্রসিদ্ধ রং, সিমেণ্ট ও লৌহ-ব্যবসায়ী
১২৪।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লক্ষ্মীর বার্ত্তা চির কল্যাণময়,
দুঃখের আঁধারে আনে আনন্দের জয়।
সঞ্চয়ের অর্ঘ্যভারে অর্চ্চনা তাঁর,
দেশে দেশে শুনি স্তুতি দেবী কমলার।

অর্থগৃধ্নুতা আর অর্থ সঞ্চয় এক বস্তু নয়।
সঞ্চয়ের পথে যাদের প্রশান্ত দৃষ্টি,
লক্ষ্মীর কল্যাণ-আশীষ তাদেরই শিরে।

নগেন্দ্রনাথের—
হিমকল্যাণ
শরৎ আসে তার রূপ সম্ভার নিয়ে, প্রকৃতিদেবী সাজে
এক অপরূপ সাজে, শবং সুষমার এই স্নিগ্ধ আবেষ্টনীর
মাঝে আপনার গৃহকে আনন্দ-মুখর করে তুলুন—
ভেষজ-বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর হিমস্নিগ্ধ
হি ম ক ল্যা ণ।
HIMKALYAN
HAIR OIL
হিমকল্যাণ
HIMKALYAN WORKS
CALCUTTA
হিমকল্যাণ ওয়াকস • কলিকাতা

"আবার তোরা মানুষ হ"
শুভবর্ষ পরে প্রস্তুত

সর্ব্বজনসমাদৃত ও ডাক্তারগণ
কর্ত্তৃক উচ্চপ্রশংসিত।
ORIENT
BHUPATI

অলৌকিক
সুধা
দুর্ব্বলকে বল দেয়
মৃতকে প্রাণ দেয়
মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী হয়
জ্বরে
সূতিকায়
বাতে, দৌর্ব্বল্যে
অব্যর্থ

আমরা নাম মাত্র খরচায়

আপনার পার্শেল ইত্যাদি শিয়ালদহে

এবং

শিয়ালদহ হইতে কলিকাতার যে কোন

স্থানে সর্ব্বদা পৌঁছাইয়া দিয়া থাকি।

দি কমার্শিয়াল ক্যারিয়িং কোং

(বেঙ্গল) লিমিটেড্

দি মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউস্—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

অভিবাদনের এই সুযোগে
চিত্র জগতে নব পর্য্যায় সূচনা করার মত
কখানি ছবির কথা জানিয়ে রাখছি!
আগমন প্রতীক্ষায়
চল চলরে নওজোয়ান
শ্রেষ্ঠাংশে:
অশোককুমার—নাসীম
হুমায়ুন
পারিস্তান
শ্রেষ্ঠাংশে:
অশোককুমার—বীণা—নার্গিস
পাহাড়ী সান্যাল
পর্বত-পে-আপনা ডেরা
শ্রেষ্ঠাংশে:
বনমালা—উল্লাস
কলিয়াঁ
রতন
শ্রেষ্ঠাংশে:
রমলা
কানুন • গীত • জীবন
শ্রেষ্ঠাংশে:
জনপ্রিয় তারকামণ্ডলী
লেডি ডাক্তার
শ্রেষ্ঠাংশে:
মমতাজ শান্তি—উল্লাস
পরিবেশনাঃ—কাপুর চাঁদ লিমিটেড

এই নাটকগুলো শুধু অভিনয়ের জন্য নয়—গল্প-উপন্যাসের মতো পাঠ করার জন্যও রচিত।
—শুধু পাঠের জন্য নয়—অভিনয়ের জন্যেও নাটকগুলোর দিকে দৃষ্টি রাখতে বলি।

শ্রীসরোজ রায়চৌধুরীর — শ্রীপরিমল গোস্বামী রচিত — শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

হালদার সাহেব ২৲ ঘুঘু ২৲ দুষ্মন্তের বিচার ১৷৹ বিশেষ রজনী ২৲

আরও কয়েকখানি উপহারের শ্রেষ্ঠ বই

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত সদ্য প্রকাশিত
বৃহৎ উপন্যাস

স্বর্গাদপি গরীয়সী ৪৲

নীলাঙ্গুরীয় ৩৲ হৈমন্তী ৩৲
চৈতালী ৩৲ বরযাত্রী ২৷৹
বর্ষায় ৩৲

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরীর সদ্য প্রকাশিত

ক্ষুধা ২৷৹ শতাব্দীর অভিশাপ ২৷৹
শৃঙ্খল ২৷৹ মনের গহনে ২৲

শ্রীনবগোপাল দাস, আই-সি-এস্ রচিত

অনবগুণ্ঠিতা ২৷৹
তারা একদিন ভালোবেসেছিল ১৷৹

শ্রীতারাপদ রাহা রচিত

যোগিনীর মাঠ ১৷৹

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

ডঃ সুশীলকুমার দে

অস্তুতনী (কাব্য) ২৲

শ্রীপরিমল গোস্বামীর সদ্য প্রকাশিত

ট্রামের সেই লোকটি (২৫ খানি কার্টুন শোভিত) ২৲
ক্যামেরার ছবি (১৬ খানি আর্ট প্লেটযুক্ত) ৩৲

শ্রীপরিমল গোস্বামী সম্পাদিত যুগের মহাগ্রন্থ

মহামন্বন্তর ৩৲

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা দশ জন কথাশিল্পীর বারোটি অবিস্মরণীয় গল্প। এই বইয়ের খ্যাতি সর্বত্র স্বীকৃত।

ঐতিহাসিক—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন :
মহামন্বন্তর বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্‌।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন :
এই সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে আমি অভিনন্দন জানাই।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ—১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অস্ত্রোপচারের আতঙ্ক!
অনেককেই খুব কাতর করে। ইহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে এক শিশি "কিউরল" কাছে রাখুন। রোগের সূত্রপাত হইতে "কিউরল" ব্যবহার করলে ফোড়া, গলাফোলা প্রভৃতি রোগে আর অস্ত্রোপচার করিবার প্রয়োজন হয় না। জ্বালা-যন্ত্রণা সঙ্গে সঙ্গেই উপশম হয় ও অল্পদিনে রোগ নির্ম্মূল হয়।
"কিউরল"
গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত অশেষ গুণসম্পন্ন ঔষধ—প্রতিষেধক ও পচননিবারক। কাটা, ছেঁড়া, আঘাত লাগা, মচকানো, ব্যথা, ফোড়া, হাজা, আঙ্গুলহাড়া, ফোলা, গলাফোলা (mumps) ও সকল প্রকার বাতে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কাজ করে। ডাক্তারগণ সর্ব্বদাই ইহা ব্যবস্থা করেন।
KUROL
৪নং মহারাজা নন্দকুমার রোড, কলিকাতা

এর চেয়ে আর কি প্রমাণ চাই ?

No G.7347. 29th May 1944.

R·V·BRIGGS & Co. LTD.

ANALYTICAL CONSULTING AND TECHNICAL CHEMISTS

TELEGRAPHIC ADDRESS
ANALYTICAL CALCUTTA
TELEPHONE Nº 2204 CALCUTTA

3 & 4, GARSTIN PLACE
CALCUTTA
POST BOX Nº 279

DIRECTORS.
J.R.H. BARTLETT F.A.C.I., F.C.S., F.R.S.A.
R.V. BRIGGS F.I.C.
E.J. BREULEUX

Certificate of Examination

We hereby certify that a sample of BARLEY, contained in an original 1 lb. tin, SUBMITTED to us on the 27th March 1944 by Messrs THE NEW STANDARD BARLEY MANUFACTURING CO., 105 Cotton Street, Calcutta, has been examined with the following results:-

MICROSCOPIC EXAMINATION:

Origin of Starch		...	...	Barley.

CHEMICAL EXAMINATION:

Water	...	...	...	7.01 %
Fat	...	...	...	1.86 %
Protein	...	...	...	8.42 %
Fibre	...	...	...	0.10 %
Ash	...	...	...	1.32 %
Carbohydrates (Starch etc)		...	...	81.30 %
				100.00
Odour & Taste	...	...		Good and fresh
Acid Value of fat..		...	...	20.1

REMARKS: In our opinion the above described sample of Barley is pure and of good quality.

Director.

INFORMATION ACCOMPANYING SAMPLE:
Label on container:
- SUN -
BARLEY POWDER
* (picture of Sun)
The New Standard Barley Manufacturing Co.
INDIA.

SM:

'সান বার্লি' কেনাই তো ভালো !

হর-গৌরী শিল্পী—শ্রীশিবপদ ভৌমিক

১২শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা]

[আশ্বিন—১৩৫১

বিষয়-সূচী

[পর পৃষ্ঠায়

বিষয়-সূচী—পূর্ব্বানুবৃত্তি

আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও দেশবাসী সর্ব্বসাধারণকে আমাদের শারদীয় প্রীতি-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি।

চিত্র-সূচী

TRIUMPHANT MARCH
দেশের
এই দুর্দ্দিনে
বাংলার জাতীয়
শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে
গড়ে' তুল্‌তে বা বাঁচিয়ে
রাখতে হ'লে চাই সম্মিলিত
হিন্দু-মুসলমানের সমবেত
চেষ্টা, দরদ ও সহানুভূতি।
কমলা
ইঞ্জিনীয়ারিং
সর্ব্বরকমে আপনাদের
সহানুভূতি প্রার্থনা
করে।

FOR A FLAVOUR THRILL!

LORD TEA CO.

H.O. 137, CANNING STREET.

SALE DEPOTS.— 12, CLIVE STREET &
SEALDAH MARKET. (1st. FLOOR)

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যার নাম এবং উহা সমাধানের সঙ্কেতের নাম

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

প্রবন্ধের পরিচয়—

আমাদিগের এই প্রবন্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ একটী প্রবন্ধমালার অংশ মাত্র।

উক্ত প্রবন্ধমালায় নিম্নলিখিতক্রমে পাঁচটী প্রবন্ধ থাকিবে, যথা :

(১) বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্যার নাম এবং উহার সমাধানের সঙ্কেতের নাম

(২) মানুষের পশুত্ব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

(৩) মানুষের পশুত্ব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠনের মূল নীতি-সূত্র (fundamental principles)

(৪) মানুষের পশুত্ব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন সাধন করিবার পরিকল্পনা (plan)

(৫) মনুষ্য-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় উহার সমস্যা-সমাধানের সংগঠন সাধন করিবার পরিকল্পনা।

এই প্রবন্ধমালা ভারতীয় ঋষিগণের লেখাসমূহের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া রচিত হইবে। যাহা ভারতীয় ঋষিগণের লেখার বিরুদ্ধ অথবা যে সমস্ত কথা ভারতীয় ঋষিগণের লেখায় পাওয়া যায় না সেইরূপ একটী কথাও এই প্রবন্ধমালায় স্থান পাইবে না।

প্রবন্ধমালার উদ্দেশ্য—

বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্যার সমাধান করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর সংগঠনের প্রয়োজন হইবে সেই সেই শ্রেণীর সংগঠনের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা মানবসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করা আমাদিগের এই প্রবন্ধমালার উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধমালায় পাঁচটী প্রবন্ধের যে যে নাম লেখা হইয়াছে সেই সেই নাম হইতে আমাদিগের প্রবন্ধমালার উদ্দেশ্য কি কি তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

আমাদিগের এই প্রবন্ধের বক্তব্যের বিষয় প্রধানতঃ আটার শ্রেণীর

১। প্রথম বক্তব্য—

(১) সমস্যা প্রধানতঃ দুইশ্রেণীর ; যথা :—

এক—সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ।

দুই—সমগ্র মানবসমাজব্যাপী দারুণ অভাব।

মানুষের যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষণীয় তাহার কোন শ্রেণীর কোনটি পাওয়া কষ্টসাধ্য অথবা অসাধ্য হইলে মানুষের মনে যে অবস্থার উদ্ভব হয় সেই অবস্থার নাম (মানুষের অভাবের অবস্থা অথবা) মানুষের "অভাব"।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিষয় মূলতঃ সর্ব্বসমেত ছয় শ্রেণীর। এই হিসাবে মানুষের অভাবও মূলতঃ সর্ব্বসমেত ছয় শ্রেণীর হইয়া থাকে।

মানুষের ছয় শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার বিষয়ের নাম—

(১) ধন, (২) স্বাস্থ্য, (৩) সম্মান,
(৪) প্রতিষ্ঠা, (৫) পবিতৃপ্তি, (৬) জ্ঞান (অর্থাৎ বুঝিবার শক্তি)।

মানুষের ছয় শ্রেণীর অভাবের নাম—

(১) ধনাভাব অথবা দারিদ্র্য ;
(২) স্বাস্থ্যাভাব অথবা ব্যাধি ;
(৩) সম্মানাভাব অথবা অসম্মান ;
(৪) প্রতিষ্ঠাভাব অথবা অপ্রতিষ্ঠা ;
(৫) পবিতৃপ্তির অভাব অথবা কু-তৃপ্তি ,
(৬) জ্ঞানাভাব অথবা কুজ্ঞান।

(২) প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়ে অভাব যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৩) আপাতদৃষ্টিতে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা অসংখ্য। আপাতদৃষ্টিতে সমস্যার সংখ্যা অসংখ্য হইলেও বস্তুতঃ পক্ষে সমস্যার সংখ্যা দুই শ্রেণীর। দুই শ্রেণীর সমস্যার সমাধান হইলে প্রত্যেক শ্রেণীর সমস্যার সমাধান হওয়া স্বতঃসিদ্ধ।

২। দ্বিতীয় বক্তব্য—

(১) বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যাবশতঃ বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজ শান্তিপ্রিয় মানুষের পক্ষে বাসের অযোগ্য হইয়াছে।

(২) বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যার সমাধান সাধনে বিলম্ব হইলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে ইহা সর্ব্বতোভাবে বাসের অযোগ্য হইবার আশঙ্কা আছে।

(৩) অনতিবিলম্বে সমস্যার সমাধান হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

৩। তৃতীয় বক্তব্য—

(১) বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যার সমাধান করিতে হইলে মনুষ্যসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধ এবং মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহা করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

(২) বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধ দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা এবং সর্ব্বশ্রেণীর অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সাধন না করিয়া যুগপৎভাবে সাধন করা অপরিহার্য্য-ভাবে প্রয়োজনীয়।

৪। চতুর্থ বক্তব্য—

(১) সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধ এবং সর্ব্বশ্রেণীর অভাব যুগপৎভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে যুগপৎ-ভাবে সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধের ও অভাবের আশঙ্কা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

(২) সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধের ও অভাবের আশঙ্কা যাহাতে যুগপৎভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রকৃত অবসান সাধন করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না এবং হইবে না।

(৩) সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধের ও অভাবের আশঙ্কা যাহাতে যুগপৎভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধন না করিয়া সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অবসান সাধন করা বিপজ্জনক। দূরদর্শী ও দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত কোন মানুষের উহা চেষ্টা করা উচিত নহে।

৫। পঞ্চম বক্তব্য—

(১) সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধের ও অভাবের আশঙ্কা যুগপৎভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিতে হইলে যে সমস্ত কার্য্য-পদ্ধতিতে শত্রুতা ও মিত্রতা, লাভ ও লোকসান, স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য, ব্যাধি ও ব্যাধিহীনতা, সম্মান ও অসম্মান, ধনাভাব ও ধনপ্রাচুর্য্য, প্রতিষ্ঠা ও অপ্রতিষ্ঠা, পরিতৃপ্তি ও অপরিতৃপ্তি, বিচারশীলতা ও বিচারহীনতা যুগপৎভাবে ঘটিতে পারে, সেই সমস্ত কার্য্য-পদ্ধতি বর্জ্জন করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

(২) সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধের ও অভাবের আশঙ্কা যুগপৎভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিতে হইলে যে সমস্ত কার্য্য-পদ্ধতিতে শত্রুতা, লোকসান, অস্বাস্থ্য, ব্যাধি, অসম্মান, ধনাভাব, অপ্রতিষ্ঠা, অপরিতৃপ্তি, ও বিচারহীনতা অসম্ভবযোগ্য হয় এবং যে সমস্ত কার্য্য-পদ্ধতিতে কেবলমাত্র মিত্রতা, লাভ, স্বাস্থ্য, ব্যাধিহীনতা, সম্মান, ধনপ্রাচুর্য্য, প্রতিষ্ঠা, পরিতৃপ্তি এবং বিচারশীলতা অবশ্যম্ভাবী হয় সেই সমস্ত কার্য্য-পদ্ধতির ব্যবস্থা করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

৬। ষষ্ঠ বক্তব্য—

(১) মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধের ও অভাবের আশঙ্কা যাহাতে যুগপৎভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহা করিতে হইলে—

প্রথমতঃ—প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। উহাতে ব্যাধির আরাম হইতেও পারে এবং নাও হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—প্রচলিত ধর্ম্মাচরণ-পদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। উহাতে মানসিক স্বাস্থ্য ও শান্তি বজায় থাকিতেও পারে এবং নাও থাকিতে পারে। উহাতে মানুষের বিচারহীনতা অনিবার্য্য হয়।

তৃতীয়তঃ—প্রচলিত শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কার্য্যপদ্ধতি, বিচার-পদ্ধতি, শাসন-পদ্ধতি, ও সামাজিক ব্যবহার-পদ্ধতি সর্ব্বতো-ভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। উহার প্রত্যেকটিতে মানুষের স্বাস্থ্য ও সম্মান বজায় থাকিতেও পারে এবং নাও থাকিতে পারে। উহাতে শত্রুতা অনিবার্য্য হয়।

চতুর্থতঃ—প্রচলিত কাঁচা-মাল-উৎপাদন-পদ্ধতি বাণিজ্য-পদ্ধতি, শিল্প-পদ্ধতি এবং চাকুরী-পদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। উহার প্রত্যেকটিতে মানুষের ধনাভাব ও প্রতিষ্ঠার অভাব নিবারিত হইতেও পারে এবং নাও হইতে পারে।

পঞ্চমতঃ—প্রচলিত সহর নির্ম্মাণ-পদ্ধতি, সহর আলোকিত করিবার পদ্ধতি, ময়লা পরিষ্কার করিবার পদ্ধতি, তাপ ও শীতলতা নিয়ন্ত্রিত করিবার পদ্ধতি, যাতায়াত সাধন করিবার পদ্ধতি, আমোদ-প্রমোদ-পদ্ধতি এবং খেলা-ধূলা-পদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। উহার প্রত্যেকটিতে মানুষের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি সাধন করা ও বজায় রাখা সম্ভব-যোগ্য হইতেও পারে এবং নাও হইতে পারে।

ষষ্ঠতঃ—প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। উহাতে মানুষের বিচারশীলতা নষ্ট হওয়া এবং বিচার-হীনতার উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

সপ্তমতঃ—বিপক্ষকে বিধ্বস্ত করিয়া শান্তিপ্রার্থী হইতে বাধ্য করিবার এবং পরাজিত পক্ষের সুবিধা ও অসুবিধা সর্ব্বতোভাবে বিচার না করিয়া শান্তি-সর্ত্ত স্থির করিবার পদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। উহাতে মানুষের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

৭। সপ্তম বক্তব্য—

(১) সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধের ও অভাবের আশঙ্কা যাহাতে যুগপৎ-ভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে হইলে যাহাতে মানুষের যুদ্ধপ্রবৃত্তি ও সর্ব্ববিধ অভাব এবং তাহাদের কারণসমূহ যুগপৎভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

(২) যাহাতে যুদ্ধের প্রবৃত্তির ও তাহার কারণসমূহ সর্ব্বতো-ভাবে মনুষ্যসমাজ হইতে দূরীভূত ও নিবারিত হয়, তাহার

ব্যবস্থা সাধিত না হইলে অন্য কোন উপায়ে মনুষ্যসমাজের যুদ্ধের আশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে দূর করা অথবা নিবারণ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও হয় না।

(৩) যাহাতে সর্ব্ববিধ অভাবের ও তাহার কারণসমূহ সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যসমাজ হইতে দূরীভূত ও নিবারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে অন্য কোন উপায়ে মনুষ্য-সমাজের অভাবের আশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে দূর করা অথবা নিবারণ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও হয় না। অভাবের আশঙ্কা দূরীভূত ও নিবারিত না হইলে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও হয় না।

৮। অষ্টম বক্তব্য—

(১) প্রত্যেক শ্রেণীর যুদ্ধ-প্রবৃত্তির যে সমস্ত কারণ অভিব্যক্তি লাভ করে সেই সমস্ত কারণের মূল কারণ—মানুষের দ্বেষ (অর্থাৎ ঘৃণা ও পরশ্রীকাতরতা'র) ও হিংসার (অর্থাৎ পরের অনিষ্ট সাধনে নিঃসঙ্কোচ ও কুণ্ঠাহীন হওয়া'র) প্রবৃত্তি।

(২) প্রত্যেক শ্রেণীর অভাবের যে সমস্ত কারণ অভিব্যক্তি লাভ করে সেই সমস্ত কারণের মূল কারণ—জমি, জল, হাওয়ার এবং মানুষের অবয়বের পূর্ণাবয়ব কার্য্যের (অর্থাৎ অণ্ডাকারের কার্য্যের) ও খণ্ডাবয়ব কার্য্যের (অর্থাৎ সূত্রাকারের কার্য্যের) অসামঞ্জস্যের অবস্থা।

৯। নবম বক্তব্য—

(১) মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধপ্রবৃত্তির কারণসমূহ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে সমর-বলের প্রসারতা সাধন করিয়া মনুষ্য-সমাজের শান্তি স্থাপনের অথবা শান্তি রক্ষার পরিকল্পনা বর্জ্জন করিতে হইবে। সমর-বলের প্রসারতা সাধন করিলে যুদ্ধ-প্রবৃত্তি অথবা যুদ্ধ-প্রবৃত্তির কারণসমূহ কখনও দূরীভূত অথবা নিবারিত হইতে পারে না। পরন্তু, উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(২) মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্ববিধ অভাবের কারণসমূহ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে হইলে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক প্রয়োগসমূহ ও অবাধে খনিজ পদার্থের উত্তোলন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক প্রয়োগসমূহের প্রত্যেকটি এবং অবাধে খনিজ পদার্থের উত্তোলন প্রত্যেক শ্রেণীর অভাবের কারণের বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে।

১০। দশম বক্তব্য -

(১) মানুষের যুদ্ধপ্রবৃত্তির ও সর্ব্ববিধ অভাবের কারণ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার একমাত্র পন্থা—মানুষের সর্ব্ববিধ পশুত্ব (অথবা পশুপ্রবৃত্তি) সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার এবং মনুষ্যত্ব সর্ব্বতোভাবে বিকশিত করিবার ব্যবস্থা যাহাতে যুগপৎভাবে সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

(২) মানুষের প্রবৃত্তি যে শ্রেণীর হইলে মানুষের কার্য্য-প্রবৃত্তি দ্বেষ-পরায়ণ (অর্থাৎ অপরের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ ও পরশ্রীকাতরতা-পরায়ণ) এবং হিংসাপরায়ণ (অর্থাৎ অপরের অনিষ্ট সাধনে কুণ্ঠা ও সঙ্কোচহীন) হইয়া থাকে সেই শ্রেণীর প্রবৃত্তিকে 'মানুষের পশুপ্রবৃত্তি' অথবা পশুত্ব বলা হয়।

পশুত্ববশতঃ মানুষের শত্রু-মিত্রভাবের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং মানুষ বৈরিতা সাধক মিলন ও অমিলনের কার্য্য (অর্থাৎ দলাদলির কার্য্য) করিয়া থাকেন।

(৩) মানুষের প্রবৃত্তি যে শ্রেণীর হইলে মানুষের কার্য্যপ্রবৃত্তি দ্বেষপরায়ণ অথবা হিংসাপরায়ণ হইতে পারে না ও হয় না এবং মানুষের বৈরিতা-সাধক দলাদলির কার্য্য সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়, সেই শ্রেণীর প্রবৃত্তিকে মানুষের 'মনুষ্যত্ব' বলা হয়। মানুষের 'মনুষ্যত্ব' বিকশিত হইলে কাহারও সহিত তাঁহার অমিলনের প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। প্রত্যেকের সহিত তাঁহার মিলনের প্রবৃত্তি বিকশিত হয়।

(৪) মানুষের যুদ্ধপ্রবৃত্তির ও সর্ব্ববিধ অভাবের কারণের আদি কারণ মানুষের 'পশুপ্রবৃত্তি'।

১১। একাদশ বক্তব্য—

(১) মানুষের পশুত্ব ও যুদ্ধপ্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে দূর করা অথবা নিবারণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে—ইহা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের বিশ্বাস। এতাদৃশ বিশ্বাসের কারণ—মনুষ্য-স্বভাব সম্বন্ধে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ও ভ্রমযুক্ততা। বস্তুতঃ পক্ষে উহা অসম্ভবযোগ্য নহে।

(২) প্রথমতঃ, মানুষের ইচ্ছা যাহাতে অতর্কিত না হয়; দ্বিতীয়তঃ, ইচ্ছা পূরণের পদার্থ নির্ব্বাচন যাহাতে অতর্কিত অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচার-প্রসূত না হয় ও ভ্রমহীন বিচারপ্রসূত হয়; তৃতীয়তঃ, ইচ্ছা পূরণের পদার্থ-সমূহের কোনটীর যাহাতে কোনরূপ অভাব না হয় ও প্রাচুর্য্য থাকে; চতুর্থতঃ, ইচ্ছা পূরণের কার্য্য-পদ্ধতি যাহাতে অতর্কিত অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচার-প্রসূত না হয় ও ভ্রমহীন বিচার-প্রসূত হয়—এই চারিশ্রেণীর ব্যবস্থা সাধিত হইলে—মানুষের সর্ব্ববিধ 'পশুত্ব' সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়।

(৩) মানুষের সর্ব্ববিধ 'পশুত্ব' সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিতে হইলে এই ভূমণ্ডলের স্বভাবজাত প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধে ও মনুষ্য-স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানে নির্ভুলতা ও সম্পূর্ণতা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। এই ভূমণ্ডলের স্বভাবজাত কোন পদার্থ সম্বন্ধে অথবা মনুষ্য-স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ অথবা ভ্রমপূর্ণ হইলে মানুষের পশুত্ব দূর করা অথবা নিবারণ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না।

১২। দ্বাদশ বক্তব্য—

(১) এই ভূমণ্ডলের স্বভাবজাত প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধে ও মনুষ্য-স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্ভুলতা ও সম্পূর্ণতা সাধন করা মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে—ইহা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের

বিশ্বাস। এতাদৃশ বিশ্বাসের কারণ, পদার্থ-বিজ্ঞানে নিভুর্লভাবে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর দর্শন ও অধ্যয়ন অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, সেই সেই শ্রেণীর দর্শন ও অধ্যয়ন সম্বন্ধে বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের জ্ঞানের অভাব।

(২) মানুষের 'পশুত্ব' যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে হইলে এই ভূমণ্ডলের স্বভাবজাত প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধে ও মনুষ্য-স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে শ্রেণীর নিভুর্লতা ও সম্পূর্ণতা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেই শ্রেণীর নিভুর্লতা ও সম্পূর্ণতা ভারতীয় ঋষিগণের লেখায় পাওয়া যায়।

(৩) ভারতীয় ঋষিগণের লেখায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে শ্রেণীর সম্পূর্ণতা আছে তাহা বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজ সর্ব্বতোভাবে বিস্মৃত হইয়াছেন। এই বিস্মৃতির কারণ ভারতীয় ঋষিগণের লেখার ভাষা সম্বন্ধে মানুষের বিস্মৃতি।

১৩। ত্রয়োদশ বক্তব্য—

(১) মানুষের সর্ব্ববিধ 'পশুত্ব' সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার এবং 'মনুষ্যত্ব' সর্ব্বতোভাবে বিকশিত করিবার ব্যবস্থা যাহাতে যুগপৎভাবে সাধিত হয় তাহা করিবার একমাত্র পন্থা—সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের 'পশুত্ব' সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে সংগঠন করা।

(২) কোন একটি দেশের অথবা কোন একটি শ্রেণীর মানুষের 'পশুত্ব' সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে, একদিকে সমগ্র মানবসমাজে প্রত্যেক দেশের, অন্যদিকে ঐ দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক মানুষের 'পশুত্ব' সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করা অনিবার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

(৩) মানুষের 'পশুত্ব' সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে অথবা নিবারণ করিতে না পারিলে তাঁহার প্রকৃত 'মনুষ্যত্ব' কখনও বিকশিত হইতে পারে না ও হয় না। মানুষের 'পশুত্ব' যাহাতে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তদুদ্দেশ্যে সংগঠন সাধিত না হইলে কোন মানুষের 'পশুত্ব' দূরীভূত অথবা নিবারিত হওয়া অসম্ভবযোগ্য হয় এবং পশুত্বের বৃদ্ধি অনিবার্য্য হয়।

১৪। চতুর্দ্দশ বক্তব্য—

(১) সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের পশুত্ব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে সংগঠন করা সম্ভবযোগ্য নহে—ইহা বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের মনে হইতে পারে; কিন্তু ঐরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

(২) মানুষের 'পশুত্ব' যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় এবং মনুষ্যত্ব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বিকশিত হয় তাহার সংগঠন মনুষ্যসমাজে এক সময়ে কার্য্যতঃ সাধিত হইয়াছিল এবং ছয় হাজার বৎসর আগে পর্য্যন্ত উহা সমগ্র মানবসমাজে সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান ছিল—ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

(৩) মানুষের 'পশুত্ব' সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হইবার সংগঠন কি পদ্ধতিতে সাধিত হইয়াছিল—তাহা জানিতে পারিলে ঐ সংগঠনের বাস্তব বিদ্যমানতা যে সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস-যোগ্য এবং উহা সাধন করা যে আধুনিক কালেও সম্ভবযোগ্য, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

১৫। পঞ্চদশ বক্তব্য—

(১) মানুষের 'পশুত্ব' দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন সাধন করিতে হইলে, এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক স্বভাবজাত পদার্থ সম্বন্ধে, মনুষ্য-স্বভাব সম্বন্ধে এবং সংগঠন-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

(২) জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরোক্ত সম্পূর্ণতা সাধন করিবার একমাত্র পন্থা—ভারতীয় ঋষিগণের লেখার সাহায্য লওয়া।

(৩) মানুষের 'পশুত্ব' সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হইবার সংগঠন কোন্ শ্রেণীর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলে, মানবসমাজের পক্ষে কি প্রকারে ভারতীয় ঋষিগণের লেখার ভাষা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হওয়া সম্ভবযোগ্য হইয়াছে—তাহা বুঝা সহজসাধ্য হয়।

(৪) ভারতীয় ঋষিগণের লেখার ভাষায় নিভুর্লভাবে প্রবেশের ব্যবস্থা করিতে হইলে, অধুনা ঐ ভাষায় প্রবেশের জন্য যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেই পদ্ধতি যাহাতে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হয় এবং তাঁহাদিগের কোন লেখা যাহাতে কার্য্যকারণের শৃঙ্খলাগত সম্বন্ধহীন অবাস্তব কোন অর্থে গৃহীত হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

১৬। ষোড়শ বক্তব্য—

(১) মানুষের পশুত্ব সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিবার সংগঠন করিতে হইলে, ঐ সংগঠনের ফলে প্রত্যেক মানুষ যাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত পশুত্ব দমন করিবার প্রবৃত্তি, শক্তি ও জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারেন ও করেন এবং কোন মানুষের যাহাতে কোন শ্রেণীর পদার্থের অভাব না হইতে পারে—তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

(২) প্রত্যেক মানুষ যাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত 'পশুত্ব' দমন করিবার প্রবৃত্তি, শক্তি ও জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারেন ও করেন তাহা করিতে হইলে মানুষ যাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত 'পশুত্ব' দমন করিবার প্রবৃত্তি, শক্তি ও জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারেন ও করেন তাহার ব্যবস্থা যেমন করিতে হয় সেইরূপ আবার মানুষ যাহাতে ব্যক্তিগতভাবে 'মনুষ্যত্ব' অর্জ্জন করিবার শক্তি, প্রবৃত্তি ও জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারেন ও করেন তাহার ব্যবস্থা করিবারও প্রয়োজন হয়।

১৭। সপ্তদশ বক্তব্য—

(১) সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত 'পশুত্ব' সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে ও

নিবারণ করিতে পারেন তাহার সংগঠন সাধিত হইলে সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেক মানুষের না হইলেও অধিকাংশ মানুষের পশু-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়।

(২) অধিকাংশ মানুষের পশুপ্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হইলে মনুষ্যসমাজে যুদ্ধ হওয়া অথবা কোন শ্রেণীর অভাব হওয়া অসম্ভব হয়।

(৩) মনুষ্যসমাজে অভাব হওয়া অসম্ভব হইলে মানুষের ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্ববিধ সুখের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হয়।

(৪) মনুষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মানুষের অল্পাধিক অভাব হওয়া অনিবার্য্য—এতাদৃশ যে মতবাদ বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে প্রচলিত আছে, সেই মতবাদ মানুষের স্বভাব ও স্বভাবজাত পদার্থ-সমূহের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং মৃত্যু-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ও ভ্রম-পূর্ণতার পরিচায়ক।

১৮। অষ্টাদশ বক্তব্য—

দার্শনিক ভাষায় বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যার নাম—"মনুষ্যত্বের অভাব" এবং সর্ব্ববিধ সমস্যা সমাধানের সঙ্কেতের নাম "মানুষের পশুত্ব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন"।

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা সমাধানে আমাদিগের প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা অত্যন্ত জটিল। মানবসমাজের গত আড়াই হাজার বৎসরের ইতিহাসে এতাধিক জটিলতার পরিচয় আর কখনও পাওয়া যায় না।

সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী জল, স্থল ও আকাশের এতাদৃশ যুদ্ধের কথা যে ইতিহাসে পাওয়া যায় না তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যে শ্রেণীর অভাব এবং মুদ্রার বিনিময়ে দ্রব্যের যে শ্রেণীর দুষ্প্রাপ্যতা আজকালকার মনুষ্য-সমাজে দেখা দিয়াছে, সেই শ্রেণীর অভাব ও দুষ্প্রাপ্যতার কথা আর কখনও শুনা যায় নাই।

শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় ভূমণ্ডলের প্রায় প্রত্যেক দেশের মানুষের জীবন যেরূপ বিপদসঙ্কুল হইয়াছে সেইরূপ বিপদসঙ্কুল প্রায় প্রত্যেক দেশের মানুষের জীবনে আর কখনও হয় নাই।

– সামরিক বিভাগের যুদ্ধায়োজনবশতঃ কাহার কখন বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া অনিশ্চিত বাসস্থানের তল্লাসে বাহির হইতে হইবে, তাহার যে শ্রেণীর ত্রাস এই যুদ্ধে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, সেই শ্রেণীর ত্রাসের কথা মনুষ্যসমাজে আর কখনও শুনা যায় নাই।

উপরোক্ত অবস্থার বিচার করিলে বর্ত্তমান মানবসমাজের সমস্যা যে অভূতপূর্ব্ব রকমের জটিলতাময়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকে না।

মানবসমাজের বর্ত্তমান সমস্যা যে অভূতপূর্ব্ব রকমের বিপদসঙ্কুল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করা যায় না বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান সাধিত না হইলে এই সমস্যা যে-শ্রেণীর ভীষণতাযুক্ত ও বিপদশঙ্কুল হইবার আশঙ্কা আছে তাহার তুলনায় বর্ত্তমান অবস্থার ভীষণতা ও বিপদসঙ্কুলতা অনেক কম।

অদূর ভবিষ্যতের অবস্থা কতদূর ভীষণ ও বিপদ-সঙ্কুল হইতে পারে তাহার অনুমান করা সহজসাধ্য নহে। উহা অনুমান করিতে হইলে এতাদৃশ ভীষণ যুদ্ধের ও সর্ব্বব্যাপী অভাবের যুগপৎভাবে প্রাদুর্ভাব হওয়া কোন্ কোন্ কারণে ও কি কি প্রকারে সম্ভবযোগ্য হইয়াছে তাহার সন্ধান করিতে হয়।

কোন্ কোন্ কারণে ও কি কি প্রকারে এতাদৃশ সমস্যার উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে এই সমস্যা কতদূর পর্য্যন্ত গড়াইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় এবং তখন এই সমস্যার সমাধান যে কতদূর দুরূহ, তাহাও বুঝা যায়।

মানবসমাজের সমস্যা যতই দুরূহ হউক না কেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধিত হইলে কোন শ্রেণীর সমস্যারই সমাধান করা মানুষের অসাধ্য নহে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা না থাকিলে অনেক শ্রেণীর সমস্যার সমাধানই মানুষের অসাধ্য হয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের ও অভাবের যুগপৎভাবে প্রাদুর্ভাব হওয়া কোন্ কোন্ কারণে ও কি কি প্রকারে সম্ভবযোগ্য হইয়াছে এবং এই সমস্যার সমাধান অদূর ভবিষ্যতে সাধিত না হইলে অদূর ভবিষ্যতে ইহার পরিণাম কি হইতে পারে, এতৎসম্বন্ধীয় কোন কথাই প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা নির্দ্ধারণ করা যায় না।

একে ব্যাধি গুরুতর, তাহার পর আবার চিকিৎসক ও ঔষধ দুষ্প্রাপ্য—এই কারণে বর্ত্তমান সমস্যা চিন্তাশীল মানুষের বিশেষ চিন্তার বিষয়।

প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা মানবসমাজের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে বলিয়া ইহার সমাধানের জন্য আমরা যে সঙ্কেতের কথা বলিতেছি, সেই সঙ্কেত অপরিহার্য্য-ভাবে প্রয়োজনীয়।

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব রকমের মহাযুদ্ধের ও সর্ব্বব্যাপী অভাবের যুগপৎভাবে প্রাদুর্ভাব হওয়া কি প্রকারে সম্ভবযোগ্য হইতে পারিয়াছে তাহার সন্ধান করিতে বসিলে দেখা যায় যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজে স্বাস্থ্যগত অথবা ধনগত অথবা পরিতৃপ্তিগত অথবা সম্মানগত অথবা প্রতিষ্ঠাগত (relating to stability) অথবা জ্ঞানগত কোন শ্রেণীর অভাব যাহাতে কোন

দেশের কোন মানুষের না ঘটিতে পারে এবং প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে ঐ ঐ বিষয়ে সর্ব্বতোভাবের প্রাচুর্য্য উপভোগ করিতে পারেন তাহা করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সংগঠন যখন বিদ্যমান থাকে এবং প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ব্যক্তিগতভাবে যখন নিজ নিজ সর্ব্ববিধ অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টাশীল হন, তখন সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ সংসারে প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষণীয় (অর্থাৎ স্বাস্থ্যগত, ধনগত, পরিতৃপ্তিগত, সম্মানগত, প্রতিষ্ঠাগত এবং জ্ঞানগত) পদার্থের সর্ব্বতোভাবের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান থাকে। তখন শত্রুতামূলক এতাদৃশ যুদ্ধ ত দূরের কথা, সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্য সংখ্যার পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ অমিলনের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে না, পরন্ত সর্ব্বতোভাবের আন্তরিক মিলন পূর্ণভাবে দেদীপ্যমান থাকে।

এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব রকমের মহাযুদ্ধের ও সর্ব্বব্যাপী অভাবের প্রাদুর্ভাব হওয়া কি প্রকারে সম্ভবযোগ্য হইতে পারে তাহার বিচার করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সংসারের সর্ব্বশ্রেণীর অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় এবং যাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য সর্ব্বতোভাবে সুনিশ্চিত হয় তাহার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও ব্যক্তিগত চেষ্টা যতদিন পর্য্যন্ত মানব-সমাজে বিদ্যমান থাকে ততদিন পর্য্যন্ত কোন দেশের কোন সংসারে কোন শ্রেণীর অভাব বিদ্যমান থাকিতে পারে না এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ অমিলনের প্রবৃত্তিও থাকিতে পারে না এবং থাকে না।

সমগ্র মানবসমাজের কোন দেশের কোন সংসারে কোন শ্রেণীর অভাব বিদ্যমান নাই, সমগ্র মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ অমিলনের প্রবৃত্তি নাই, সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সংসারে প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়ে প্রাচুর্য্য আছে, এবং সমগ্র মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রত্যেকের মনে পরস্পরের সঙ্গে আন্তরিক মিলনের প্রযত্ন আছে—এইরূপ অবস্থা যখন মানবসমাজে দেখা দেয়, তখন সমগ্র মানবসমাজ স্বতঃই সর্ব্বতোভাবের সুখ উপভোগ করিতে আরম্ভ করেন এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠনের শাসন-কার্য্যের প্রয়োজন কমিয়া যায়।

যখন সমগ্র মানবসমাজ স্বতঃই সর্ব্বতোভাবের সুখ উপভোগ করিতে থাকেন এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠনের শাসন-কার্য্যের প্রয়োজন কমিয়া যায়, তখন বিশেষভাবে সতর্ক না হইলে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কার্য্য-পরিচালকগণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা-প্রবৃত্তির হ্রাস ও আমোদ-প্রমোদ প্রবৃত্তির আধিক্য উদ্ভূত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কার্য্য-পরিচালকগণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চা-প্রবৃত্তির হ্রাস ও আমোদ-প্রমোদ-প্রবৃত্তির আধিক্যের উদ্ভব হইলে সমগ্র মানবসমাজের মিলিত রাষ্ট্রীয় সংগঠনে শাসন-কার্য্যে শিথিলতার উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

সমগ্র মানব-সমাজের মিলিত রাষ্ট্রীয় সংগঠনের শাসনকার্য্যে শিথিলতার উদ্ভব হইলে সমগ্র মানবসমাজের মিলিত রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বিনাশ হওয়া এবং প্রত্যেক দেশে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে দেশীয় রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। প্রত্যেক দেশে পৃথক্ পৃথক্ রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্ভব হইলে বিভিন্ন দেশের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ-হিংসার উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। বিভিন্ন দেশের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ-হিংসার উদ্ভব হইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিকৃতির উদ্ভব হওয়া এবং প্রত্যেক দেশের মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ-হিংসার উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিকৃতির ও দ্বেষ-হিংসার উদ্ভব হইলে মানুষের জ্ঞানগত ও স্বাস্থ্যগত অভাবের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। জ্ঞানগত ও স্বাস্থ্যগত অভাবের উদ্ভব হইলে পরিতৃপ্তিগত অভাবের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। জ্ঞানগত, স্বাস্থ্যগত ও পরিতৃপ্তিগত অভাবের উদ্ভব হইলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। জ্ঞানগত, স্বাস্থ্যগত ও পরিতৃপ্তিগত অভাবের সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্ব-কলহ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে ধনগত অভাবের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। ধনগত অভাবের উদ্ভব হইলে সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত অভাবের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত অভাবের উদ্ভব হইলে মারামারি প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারির প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে, জ্ঞানগত, স্বাস্থ্যগত, ধনগত, তৃপ্তিগত, সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত অভাবের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়া অনিবার্য্য হয়। জ্ঞানগত, স্বাস্থ্যগত, ধনগত, তৃপ্তিগত, সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত অভাবের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যুদ্ধ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। যুদ্ধ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য হয়। মনুষ্যসমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মনুষ্য-জাতির মধ্যে প্রথম যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন উহা খুব ব্যাপক অথবা তীব্র হয় না। মনুষ্যজাতির মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জ্ঞানগত, স্বাস্থ্যগত, ধনগত, তৃপ্তিগত, সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত অভাবের তীব্রতা ও ব্যাপকতা ক্রমশঃ অধিকতর বৃদ্ধি পায়। সর্ব্বশ্রেণীর অভাবের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা যত বৃদ্ধি পায়, মনুষ্যজাতির যুদ্ধের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা তত বৃদ্ধি পায়।

অভাবসমূহের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়ে সর্ব্বতো-ভাবের দারিদ্র্যের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে, যে জ্ঞান-বিজ্ঞান কখনও মানুষের হিত সাধন করিতে সক্ষম নহে এবং যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আশ্রয় করিলে পদে পদে নানা রকমের বিঘ্ন অনিবার্য্য হয়, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান মনুষ্যসমাজে প্রচলিত হয়। মনুষ্যসমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতাদৃশ অবস্থাকে "জ্ঞানগত দারিদ্র্য" অথবা 'কু-জ্ঞানের অবস্থা' বলা যাইতে পারে।

অভাবসমূহের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন স্বাস্থ্য বিষয়ে মানুষের শরীর পাশবিক বলের ব্যবহারের প্রবৃত্তিযুক্ত, ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব কার্য্য করিবার অক্ষমতাযুক্ত, মন সর্ব্বদা চাঞ্চল্যযুক্ত এবং বুদ্ধি প্রায়শঃ বিচারশক্তিহীনতা অথবা মতবাদ-প্রবণতা অথবা সংস্কার-প্রবণতা অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচার-শীলতাযুক্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থা সত্ত্বেও মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কি অবস্থায় পরিণত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া শরীরের পাশবিক বলের সামর্থ্যের বিদ্যমানতাবশতঃ

নিজেকে স্বাস্থ্যবান্ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞানগত দারিদ্র্যবশতঃ চিকিৎসকগণ পর্য্যন্ত মানুষের স্বাস্থ্যের এতাদৃশ অবস্থাকে তাঁহার সুস্থ অবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পক্ষে মানুষের স্বাস্থ্যের এতাদৃশ অবস্থাকে "স্বাস্থ্যগত দারিদ্র্য" অথবা "ব্যাপ্য-ব্যাধি'র অবস্থা" বলিতে হয়।

অভাবসমূহের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন 'ধন' বিষয়ে, মানুষ 'মুদ্রা'কে ধন বলিতে আরম্ভ করেন এবং মুদ্রার সংখ্যাদ্বারা ধনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। মুদ্রার বিনিময়ে আহারের ও বিহারের অভীষ্ট দ্রব্যসমূহের অনেক দ্রব্য আদৌ অথবা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভবযোগ্য না হইলেও মুদ্রা থাকিলেই মানুষ নিজেকে ধনী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ধনবিষয়ে জ্ঞানগত দরিদ্রতা নিবন্ধন কাঁচামাল-উৎপাদনের যে সমস্ত পদ্ধতি জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির এবং জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার শক্তির ক্ষয়কারী এবং অস্বাস্থ্যকর কাঁচামালের উৎপাদক, সেই সমস্ত পদ্ধতিকে মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন এবং গ্রহণ করিয়া থাকেন। শিল্পকার্য্যের, বাণিজ্যকার্য্যের এবং চাকুরীর যে সমস্ত পদ্ধতিতে ঐ ঐ বিষয়ক শ্রমিকগণের ও অন্যান্য কর্ম্মিগণের ধনাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, তৃপ্তির অভাব, সম্মানাভাব এবং প্রতিষ্ঠার অভাব অনিবার্য্য হইয়া থাকে, সেই সমস্ত পদ্ধতিকে মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করেন এবং ঐ সমস্ত পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পক্ষে মানুষের ধন-বিষয়ক এতাদৃশ অবস্থাকে "ধনগত দারিদ্র্যের" অথবা "মজ্জাগত অসাধুতার" অবস্থা বলিতে হয়।

অভাবসমূহের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন পরিতৃপ্তি, সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা বিষয়েও মানুষের বুদ্ধি বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। যাহা যাহা মানুষের উত্তেজনা সাধন করে তাহাতে যে পরক্ষণেই বিষাদ অনিবার্য্য তাহা বিস্মৃত হইয়া—উত্তেজনার পদার্থকে মানুষ পরিতৃপ্তির পদার্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যাঁহারা কপটতা, মিথ্যাকথা, প্রতারণা ও মানুষের মধ্যে দলাদলি সাধন করিবার শিরোমণি হইয়া দলপতি হইতে পারেন তাঁহারা সমাজের কোন কোন অংশের সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। যাঁহারা বস্তুতঃপক্ষে জনসাধারণের দাসত্ব করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর মত নিজ নিজ দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া নিজদিগকে জনসাধারণের সেবক মনে না করিয়া জনসাধারণের প্রভু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ও জনসাধারণের সন্তুষ্টি অর্জ্জন করিবার পরিবর্ত্তে অসন্তুষ্টির বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকেন—তাঁহারাও নিজদিগকে সম্মানভাজন বলিয়া মনে করেন এবং সমাজের একাংশ তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা জুয়াচুরী, শঠতা, মিথ্যাকথা ব্যবহার করিয়া এবং মানুষের শরীরের, মনের ও বুদ্ধির সর্ব্বনাশকর দ্রব্যসমূহের সর্ব্বনাশকরভাবে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া কতিপয় লক্ষসংখ্যার মুদ্রার্জ্জন করিতে পারেন তাঁহাদিগকেও সমাজের একাংশ সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন। যে সমস্ত আইন ও শৃঙ্খলার ফলে মানুষের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, মিথ্যাব্যবহার, দ্বন্দ্বকলহ প্রভৃতি অনিবার্য্য হইয়া থাকে সেই সমস্ত আইন ও শৃঙ্খলার সেবা করিয়া এবং দ্বেষ-হিংসার বৃদ্ধি সাধন করিয়া যাঁহারা মুদ্রার্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেও সমাজের একাংশ সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা শিক্ষার নামে শিশুগণের ভগবানের দেওয়া বিচারশক্তিকে বিচারহীন মতবাদ মুখস্থ করিবার শক্তিতে ও সংযমশক্তিকে উত্তেজনাশক্তিতে পরিণত করিয়া থাকেন এবং শিশুগণকে মানুষ করিবার পরিবর্ত্তে অমানুষ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকেও সমাজের একাংশ সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা মানুষের চিকিৎসার নামে কার্য্যতঃ মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বিনাশ করিয়া থাকেন এবং এমন কি সময় সময় প্রাণ পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া থাকেন তাঁহারা পর্য্যন্ত সমাজের একাংশের সম্মানভাজন হইয়া থাকেন।

মানুষের ধর্ম্মের নামে যাঁহারা মানুষের বুদ্ধিকে বিচারশক্তিহীন সংস্কারাবিষ্ট করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়সমূহকে অক্ষম করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন, পিতামাতার সেবা ও মানুষের আহারের ও বিহারের পদার্থসম্ভারের অর্জ্জন হইতে বিরত হইয়া অরণ্যবাসী হইতে পরামর্শ দিয়া থাকেন, এবং মানুষ ছোট, বড় ও জাতহীন প্রভৃতি কথা ব্যবহার করিয়া মানুষের মধ্যে দ্বেষ-প্রবৃত্তির বর্দ্ধন করিয়া থাকেন—তাঁহারাও সমাজের একাংশের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া থাকেন।

প্রতিষ্ঠা বিষয়ে—মানুষের বাস আজ একস্থানে, কাল অপর স্থানে; মানুষের জীবিকার্জ্জনের ব্যবসায় আজ একটী, কাল আর একটী; আজ সম্মানিত, কাল অসম্মানের যোগ্য; আজ পরম বন্ধু কাল পরম শত্রু; আজ উল্লেখযোগ্য ধনী, কাল দেউলিয়া ও পথের ভিখারী; আজ স্বাস্থ্যবান, কাল মৃত্যুর কবলে—এইরূপ ভাবের অস্থির অবস্থা চলিতে থাকে অথচ মানুষ এই অবস্থার পরিহাস বুঝিতে পারেন না।

অভাবসমূহের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়ে কোন্ কোন্ শ্রেণীর দারিদ্র্যের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয় তৎসম্বন্ধে যে বিবরণ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, সেই বিবরণের সহিত বর্ত্তমান মানবসমাজের অভাবের অবস্থার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান মানবসমাজে প্রত্যেক শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়ে দারিদ্র্যের* উদ্ভব হইয়াছে।

---

* "অভাব" ও "দারিদ্র্য"—এই দুইটী শব্দ সাধারণতঃ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঐ দুইটী শব্দ সর্ব্বতোভাবে একার্থক নহে।

যাহা যাহা পাওয়া মানুষের অভীষ্ট এবং প্রয়োজনীয় তাহার কোনটী পাওয়া কষ্টকর অথবা অসাধ্য হইলে মানুষের অভাবের উদ্ভব হয়। দারিদ্র্যের উদ্ভব হইলে যাহা যাহা পাওয়া মানুষের প্রয়োজনীয় তাহা মানুষ বুঝিতে অক্ষম হন এবং যাহা যাহা পাইলে মানুষের অপকার হয় তাদৃশ পদার্থসমূহ মানুষ পাইবার জন্য অভিলাষ করিয়া থাকেন। মানুষের দারিদ্র্যের অবস্থায় তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় কি কি তাহা তিনি নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। ঐ কারণে যে সমস্ত পদার্থ মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া

মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়ে উপরোক্ত শ্রেণীর দারিদ্র্যের উদ্ভব হইলে যুগপৎভাবে সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী তীব্র যুদ্ধসমূহ অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

মনুষ্যসমাজের দারিদ্র্য ও ব্যাপক যুদ্ধ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। একটীর উদ্ভব হইলে আর একটীর উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষণীয় পদার্থের প্রাচুর্য্যের অবস্থা এবং মানুষের পরস্পরের অকৃত্রিম মিলন-প্রবৃত্তির অবস্থা হইতে মনুষ্য-সমাজ যে উপরোক্ত পরিবর্ত্তনধারার সর্ব্ব-বিষয়ক দারিদ্র্যের এবং সর্ব্বব্যাপী যুদ্ধ-প্রবৃত্তির অবস্থায় উপনীত হয় সেই পরিবর্ত্তনধারা বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উহা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত এবং কোনক্রমে অস্বীকারের যোগ্য নহে।

প্রাচুর্য্যের ও মিলন-প্রবৃত্তির অবস্থা হইতে যে যে পরিবর্ত্তন-ধারায় মনুষ্য-সমাজ সর্ব্বতোভাবের দারিদ্র্য ও সর্ব্বব্যাপী তীব্র যুদ্ধের অবস্থায় উপনীত হয়, সেই সেই পরিবর্ত্তন-ধারা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্বশ্রেণীর অভাবের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যুদ্ধ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয় এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যুদ্ধের প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য হয়।

বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, নানা রকমের অভাবে জর্জ্জরিত না হইলে, এইরূপ অভাবের মধ্যে অথবা এতাদৃশ অপমানের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার তুলনায় মরিয়া যাওয়া বরং ভাল—এতাদৃশ মনোভাবের উদ্ভব না হইলে, যে কার্য্যে নিজের সন্তানসন্ততির ও আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ, ঘরবাড়ী ও বাসস্থান পর্য্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে পারে সেই কার্য্যে মানুষের মন প্রবৃত্ত হইতে পারে না ও হয় না।

গ্রীক্‌দিগের অভ্যুদয়কাল হইতে গত আড়াই হাজার বৎসরের পৃথিবীর যে ইতিহাস পাওয়া যায় সেই ইতিহাসে যে সমস্ত যুদ্ধের বর্ণনা আছে সেই সমস্ত যুদ্ধের প্রত্যেকটীর কারণ কি কি হইতে পারে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত যুদ্ধের প্রত্যেকটীর মূল কারণ হয় তৃপ্তিগত অভাব নতুবা সম্মানগত অভাব নতুবা প্রতিষ্ঠাগত অভাব নতুবা ধনগত অভাব।

কোন দেশের সমগ্র জাতির কোন না কোন শ্রেণীর অভাবের তীব্রতার উদ্ভব না হইলে—যে কোন শ্রেণীর যুদ্ধ-প্রবৃত্তির অথবা যুদ্ধের উদ্ভব হইতে পারে না ও হয় না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে এবং ঐ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

সর্ব্বশ্রেণীর অভাবের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যুদ্ধ-প্রবৃত্তির ও যুদ্ধের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়, এই কথা হইতে যুদ্ধ-প্রবৃত্তির ও যুদ্ধের উদ্ভব হয় কেন—তাহা বুঝা যায় বটে ; কিন্তু, যুদ্ধ ও অভাব ব্যাপকতা লাভ করে কেন, তাহা বুঝা যায় না। যুদ্ধ ও অভাব ব্যাপকতা লাভ করে কেন—তাহা বুঝিতে হইলে অভাবের উৎপত্তি হয় কেন এবং অভাব হইতে দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয় কি প্রকারে এবং কেন, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়।

অভাবের উৎপত্তি হয় কেন এবং অভাব হইতে দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয় কেন—এই দুইটী বিষয়ের সন্ধান করিতে পারিলে প্রথমতঃ, যুগপৎভাবে সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী যুদ্ধের উদ্ভব ও সমগ্র মানবসমাজব্যাপী অভাবের উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হইয়াছে কি প্রকারে এবং দ্বিতীয়তঃ, অদূর ভবিষ্যতে, বর্ত্তমান মানবসমাজের সমস্যার সমাধান না হইলে, এই মানবসমাজ কোন্ শ্রেণীর বিপদ-সঙ্কুল অবস্থায় উপনীত হইতে পারে—এই দুইটী বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে।

মানুষের অভাবের উৎপত্তি হয় কেন ও কি প্রকারে তাহা না বুঝিতে পারিলে মানুষের দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয় কেন ও কি প্রকারে তাহা বুঝা যায় না। ইহার কারণ—অভাবের তীব্রতার অবস্থা-বিশেষ দারিদ্র্যে পরিণত হয় এবং অভাবের উদ্ভব না হইলে দারিদ্র্যের উদ্ভব হইতে পারে না।

অভাবের উৎপত্তি হয় কেন ও কি প্রকারে তাহা না বুঝিতে পারিলে যেমন মানুষের দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয় কেন ও কি প্রকারে তাহা বুঝা যায় না—সেইরূপ আবার মানুষের সর্ব্বতোভাবের প্রাচুর্য্য সর্ব্বতোভাবে সাধিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে কি প্রকারে তাহা না বুঝিতে পারিলে, মানুষের অভাবের উৎপত্তি হয় কেন ও কি প্রকারে তাহা বুঝা যায় না। উহার কারণ—মানুষের প্রয়োজনীয় ও অভীষ্ট পদার্থসমূহের অভাবের নাম তাঁহার অভাব।

মানুষের সর্ব্বতোভাবের প্রাচুর্য্য সাধিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে কি প্রকারে, তাহার কথা আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

মানুষের সর্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সাধিত হইতে পারে ও হয় তাহা করিতে হইলে মানুষের স্বাস্থ্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বজায় থাকে এবং কোনক্রমে কোনরূপ স্বাস্থ্যগত অভাবের উৎপত্তি যাহাতে না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে সাধন করিতে হয়। মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি যদ্যপি মনুষ্যোচিতভাবে বজায় থাকে তাহা হইলে মানুষ বজায় থাকেন ;* মানুষ বজায় থাকিলে মানুষের সর্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য সাধন করিবার কথা উঠিতে পারে ও উঠিয়া থাকে।

থাকে সেই সমস্ত পদার্থ মানুষ ব্যবহার করিবার অভিলাষ করিয়া থাকেন। যে সমস্ত পদার্থ মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে সেই সমস্ত পদার্থ মানুষ তাঁহার দারিদ্র্যের অবস্থায় ব্যবহার করেন বলিয়া দারিদ্র্যের অবস্থায় মানুষের স্বাস্থ্য অকালে ভগ্ন হয়, অথচ ঐ পদার্থসমূহ যে মানুষের স্বাস্থ্যের অপহারক তাহা মানুষ বুঝিতে পারেন না। দারিদ্র্যের অবস্থায় যে সমস্ত বিপরীত পদার্থ মানুষের অভিলাষের বিষয় হয় সেই সমস্ত বিপরীত পদার্থ পর্য্যন্ত মানুষের পাওয়া কষ্টসাধ্য এবং সময় সময় অসাধ্য হয়।

মানুষের অভাবের অবস্থায় স্বাস্থ্যের অপহারক কোন পদার্থের কথার উদ্ভব হয় না। যাহা যাহা মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তন্মধ্যে যে যে পদার্থ মানুষ পাইবার জন্য অভিলাষ করিয়া থাকেন তাহার কোনটীর অভাবের নাম "মানুষের অভাব"।

*"মানুষ বজায় আছেন"—ইহা মনে করিতে হইলে প্রথমতঃ চাই মানুষের প্রাণবায়ুর প্রবাহ; দ্বিতীয়তঃ, চাই মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির মনুষ্যোচিত অবয়ব ; তৃতীয়তঃ, চাই

মানুষই যদি বজায় না থাকেন, তাহা হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য সাধন করিবার কোন কথা উঠিতে পারে না। উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, মানুষের সর্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য সাধন করিবার প্রথম সোপান—মানুষের স্বাস্থ্যগত প্রাচুর্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হয় এবং কোন শ্রেণীর স্বাস্থ্যগত অভাব যাহাতে কোনক্রমে উদ্ভূত হইতে না পারে ও না হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

মানুষের সর্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য যাহাতে সাধিত হয় তাহা করিবার দ্বিতীয় সোপান—মানুষের ধনগত প্রাচুর্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বজায় থাকে এবং কোন শ্রেণীর ধনগত অভাব যাহাতে কোনক্রমে উদ্ভূত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। মানুষের প্রাণ বজায় রাখিবার জন্য আহার-বিহারাদি যে সমস্ত কার্য্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, সেই সমস্ত কার্য্যের জন্য যে সমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত সামগ্রীকে "ধন" বলা হয়। ধন-গত প্রাচুর্য্য মানুষের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। মানুষের প্রাণ রক্ষিত হইলেই যে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি মনুষ্যোচিতভাবে রক্ষিত হয় তাহা নহে। কিন্তু মানুষের প্রাণ রক্ষিত না হইলে মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির এমন কি অবয়ব পর্য্যন্ত রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য নহে। কাযেই মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির অবয়ব রক্ষা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির অবয়ব রক্ষা করিতে হইলে মানুষের প্রাণ রক্ষা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। মানুষের প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে একদিকে জল বায়ুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং অন্যদিকে যে সমস্ত সামগ্রী মানুষের আহার-বিহারাদির জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, সেই সমস্ত সামগ্রীর প্রাচুর্য্য রক্ষা করা অপরিহার্য্যভাবে আবশ্যকীয়। উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, মানুষের ধনগত প্রাচুর্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বজায় থাকে এবং কোন শ্রেণীর ধনগত অভাব যাহাতে কোনক্রমে উদ্ভূত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা —মানুষের সর্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য যাহাতে সাধিত হয় তাহা করিবার দ্বিতীয় সোপান।

মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির মনুষ্যোচিত কার্য্য-শক্তি, কার্য্য-প্রবৃত্তি ও কার্য্য। ঐ তিনটী যুগপৎ যদ্যপি মনুষ্যোচিত ভাবে বজায় না থাকে তাহা হইলে বাহ্যতঃ মানুষের অবয়ব বিদ্যমান থাকিলেও মানুষ বজায় আছেন ইহা মনে করা চলে না। মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের মনুষ্যোচিত কার্য্য-শক্তি, কার্য্য-প্রবৃত্তি ও কার্য্যের অভাব, মানুষের মনের মনুষ্যোচিত স্থিরতার অভাব, মানুষের বুদ্ধির মনুষ্যোচিত বিচার-শক্তির অভাব এবং এমন কি মানুষের মনুষ্যোচিত শরীরের অভাব সত্ত্বেও কেবলমাত্র অস্বাভাবিক রকমের বক্ষঃস্থল ও বাহু, অথবা অস্বাভাবিক রকমের ভুঁড়ি, অথবা অস্বাভাবিক রকমের শীর্ণতাযুক্ত মানুষের আকৃতি থাকিলেই মানুষ বজায় আছেন—ইহা মনে করা চলে না।

মানুষের সর্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য যাহাতে সাধিত হয় তাহা করিবার তৃতীয় সোপান—মানুষের প্রতিষ্ঠাগত, তৃপ্তিগত এবং সম্মানগত প্রাচুর্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বজায় থাকে এবং প্রতিষ্ঠাগত হউক, তৃপ্তিগত হউক অথবা সম্মানগত হউক, কোন শ্রেণীর অভাব যাহাতে কোনক্রমে উদ্ভূত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। প্রতিষ্ঠাগত প্রাচুর্য্য সাধিত না হইলে তৃপ্তিগত প্রাচুর্য্য সাধিত হইতে পারে না এবং তৃপ্তিগত প্রাচুর্য্য সাধিত না হইলে সম্মানগত প্রাচুর্য্য সাধিত হইতে পারে না।

প্রতিষ্ঠাগত প্রাচুর্য্য বলিতে বুঝায় মানুষের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জীবিকার্জ্জনের বৃত্তি, অবস্থা (ধনগত, কর্ম্মগত ও জ্ঞানগত) এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যের সম্বন্ধ বিষয়ে স্থায়িত্ব। আজ এক রকমের স্বাস্থ্য, কাল আর এক রকমের স্বাস্থ্য; আজ এক স্থানে বাস, কাল আর এক স্থানে বাস; জীবিকার্জ্জনের জন্য আজ এক রকমের বৃত্তি, কাল আর এক রকমের বৃত্তি; আজ ধনী, কাল দরিদ্র, আজ অতিরিক্ত কর্ম্মে ব্যস্ত, কাল বেকার অথবা অলস; আজ বিদ্যাচর্চ্চায় নিরত, কাল বিদ্যাচর্চ্চায় অক্ষমতা—এতাদৃশ অস্থায়ী অবস্থার নাম প্রতিষ্ঠাগত অভাব।

যুগপৎভাবে, শরীরের পুষ্টি, ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও আরাম, মনের স্থিরতা ও শান্তি, বুদ্ধির ধীরতা ও বিচারশক্তি রক্ষিত হইলে মনের যে অবস্থার উদ্ভব হয়, সেই অবস্থার নাম তৃপ্তি। মানুষের যখন জ্ঞানগত দারিদ্র্যের উদ্ভব হয় তখন ঐ চারিটির (অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির) যে কোন একটীর আরাম হইলেই মানুষ তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পক্ষে যুগপৎভাবে চারিটীর আরাম না হইয়া কোন একটীর আরাম হইলে যে অবস্থার উৎপত্তি হয় তাহা তৃপ্তির অবস্থা নহে; উহা "উত্তেজনার অবস্থা"। ঐ-জাতীয় তৃপ্তির সহিত বিষাদ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। যাহা প্রকৃত তৃপ্তি তাহার সঙ্গে বিষাদ থাকিতে পারে না ও থাকে না।

প্রচলিত ভাষায় একজনের সহিত আর একজনের তুলনামূলক উৎকর্ষকে অথবা উচ্চপদকে সম্মান বলা হয়। আমরা যাহাকে সম্মানগত প্রাচুর্য্য অথবা সম্মানগত অভাব বলিয়া থাকি তাহার "সম্মান" প্রচলিত ভাষায় "সম্মানের" সহিত সর্ব্বতোভাবে একার্থক নহে। আমাদের লেখায় সম্মানশব্দে একজন মানুষের অবস্থার সহিত আর এক জন মানুষের অবস্থার কোন তুলনার কথা থাকে না। ইহাতে থাকে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিনের অবস্থার তুলনা। পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের অবস্থার তুলনায় পরবর্ত্তী জীবনের অবস্থা যখন সর্ব্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করে, তখন মানুষ সম্মানের যোগ্য হইয়া থাকেন।

মানুষের প্রতিষ্ঠা-গত, তৃপ্তি-গত এবং সম্মান-গত প্রাচুর্য্য যুগপৎভাবে সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মানুষের ধন-গত প্রাচুর্য্য না থাকিলে যেরূপ তাঁহার পক্ষে প্রাণ রক্ষা করা অথবা তাঁহার শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের এবং বুদ্ধির অবয়ব রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হয় না, সেইরূপ আবার মানুষের প্রতিষ্ঠা-গত, তৃপ্তি-গত ও সম্মান-গত প্রাচুর্য্য না

থাকিলে তাঁহার শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়সমূহের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির কর্ম্ম-ক্ষমতা রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

মানুষের স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে বজায় রাখিতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে যেরূপ তাঁহার প্রাণ রক্ষা করা এবং শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির অবয়ব রক্ষা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আবার ঐ শরীর প্রভৃতির কর্ম্ম-ক্ষমতা রক্ষা করাও অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

কাজেই, মানুষের স্বাস্থ্য-গত প্রাচুর্য্যের জন্যই তাঁহার প্রতিষ্ঠা-গত, তৃপ্তি-গত ও সম্মান-গত প্রাচুর্য্য অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, মানুষের প্রতিষ্ঠা-গত, তৃপ্তি-গত ও সম্মান-গত প্রাচুর্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বজায় থাকে এবং কোন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা-গত, তৃপ্তি-গত ও সম্মান-গত অভাব যাহাতে কোনক্রমে উদ্ভূত না হইতে পাবে তাহার ব্যবস্থা করা মানুষের সর্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য যাহাতে সাধিত হয়, তাহা করিবার তৃতীয় সোপান।

মানুষের সর্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য যাহাতে সাধিত হয়, তাহা করিবার চতুর্থ সোপান—মানুষের জ্ঞান-গত প্রাচুর্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বজায় থাকে এবং কোন শ্রেণীর জ্ঞান-গত অভাব যাহাতে কোনক্রমে উদ্ভূত না হইতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করা। মানুষ তাঁহার মনুষ্যোচিত শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধির বিভিন্ন কার্য্যের দ্বারা তাঁহার মনে যাহা যাহা অর্জ্জন করিয়া থাকেন তাহার প্রত্যেকটীকে এক এক বিষয়ক মানুষের এক একটী জ্ঞান বলা হয়। মনুষ্যোচিত শরীর, অথবা ইন্দ্রিয়সমূহ, অথবা মন, অথবা বুদ্ধি না থাকিলে মানুষের বিভিন্ন কার্য্যের দ্বারা মানুষের মনে যাহা যাহা অর্জ্জিত হয় তাহার কোনটীকে মানুষের "জ্ঞান" বলিয়া অভিহিত করা চলে না। উহার প্রত্যেকটী হয় অজ্ঞান নতুবা কুজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য হইয়া থাকে।

মানুষের স্বাস্থ্যগত, ধনগত, প্রতিষ্ঠাগত, তৃপ্তিগত ও সম্মান-গত প্রাচুর্য্য এবং ঐ ঐ বিষয়ক অভাবের নিবারণ সাধন করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর যে যে বিদ্যা অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই শ্রেণীর সেই সেই বিদ্যা সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জন করিতে পারিলে জ্ঞানগত প্রাচুর্য্য সাধন করা হয়।

জ্ঞান-গত প্রাচুর্য্য সাধিত না হইলে মানুষের স্বাস্থ্য-গত অথবা ধন-গত অথবা প্রতিষ্ঠা-গত অথবা তৃপ্তি-গত অথবা সম্মান-গত প্রাচুর্য্য সাধিত হইতে পারে না।

মানুষের সর্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সাধিত হয় তাহা করিতে হইলে প্রথমতঃ, সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্যগত প্রাচুর্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সাধিত হইতে পারে ও হয় এবং সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্যগত অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হইতে পারে ও হয়; দ্বিতীয়তঃ, সর্ব্ববিধ ধনগত প্রাচুর্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সাধিত হইতে পারে ও হয় এবং সর্ব্ববিধ ধনগত অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হইতে পারে ও হয়; তৃতীয়তঃ, সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠাগত, তৃপ্তিগত ও সম্মানগত প্রাচুর্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সাধিত হইতে পারে ও হয় এবং সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠাগত, তৃপ্তিগত, ও সম্মানগত অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হইতে পারে ও হয়; চতুর্থতঃ, সর্ব্ববিধ জ্ঞানগত প্রাচুর্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সাধিত হইতে পারে ও হয় এবং সর্ব্ববিধ জ্ঞানগত অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হইতে পারে ও হয়—এই চারিটী কার্য্য যুগপৎভাবে সাধন করিবার সংগঠন করা এবং ঐ সংগঠন অনুসারে কার্য্য-পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত চারিটী কার্য্য যাহাতে যুগপৎভাবে সাধন করা স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহার সংগঠন করিতে না পারিলে ও না করিলে এবং ঐ সংগঠন অনুসারে কার্য্য-পরিচালনা করিতে না পারিলে ও না করিলে মানুষের সর্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য সাধন করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও সম্ভবযোগ্য হয় না।

মানুষের অভাবের উদ্ভব হয় কেন তাহা বুঝিতে হইলে ইহা মনে রাখিতে হয় যে, মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য সাধন করিতে হইলে প্রথমতঃ, সর্ব্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সাধিত হয় এবং সর্ব্বশ্রেণীর অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার সংগঠন করা, দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত সংগঠন অনুসারে যাহাতে কার্য্য পরিচালিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত সংগঠনের অথবা সংগঠনানুসারে কোন কার্য্য-পরিচালনার কোনরূপ ত্রুটী হইলে মানুষের অভাবের উৎপত্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে।

মানুষের অভাবের উদ্ভব হয় কেন তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে সংগঠন পরিচালনার কার্য্য কি কি তাহা বিশদভাবে বুঝিবার প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ—সংগঠন-পরিচালনার কোন একটী কার্য্যে ত্রুটী ঘটিলে মানুষের অভাবের উৎপত্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। সংগঠন-পরিচালনার কার্য্য কি কি তাহা আমরা যথাস্থানে বিশদভাবে আলোচনা করিব। এস্থানে উহার বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়।

মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য সর্ব্বতোভাবে সাধন করিতে হইলে উপরোক্ত সংগঠন-পরিচালনায় যে সমস্ত কার্য্য প্রধানভাবে সাধন করিতে হয় আমরা এখানে কেবলমাত্র সেই সমস্ত কার্য্যের আলোচনা করিব। মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য সর্ব্বতোভাবে সাধন করিতে হইলে তাহার সংগঠন পরিচালনা-কার্য্যে কোন্ কোন্ কার্য্য প্রধানভাবে সাধন করিতে হয় তাহা জানা থাকিলে মানুষের অভাবসমূহের ও দারিদ্র্যের উদ্ভব হইবার প্রধান কারণ কি কি তাহা বুঝা যায়। মানুষের অভাবসমূহের ও দারিদ্র্যের উদ্ভব হইবার প্রধান কারণ কি কি তাহা বুঝিতে পারিলে বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্যার (অর্থাৎ সমগ্র ভূ-মণ্ডলব্যাপী যুদ্ধের ও সমগ্র মানব-সমাজব্যাপী দারিদ্র্যের) কারণ কি কি তাহা বুঝা যায়। বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্যার কারণ কি কি তাহা

বুঝিতে পারিলে, অদূর ভবিষ্যতে বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্যার সমাধান না হইলে বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইতে পারে তাহা বুঝা যায়।

মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য সর্ব্বতোভাবে সাধন করিতে হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তদ্বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ে সতর্কতা প্রধানভাবে প্রয়োজনীয় হয়, যথা :

(১) মানুষের স্বাস্থ্যের বিঘ্ন যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(২) জল ও হাওয়ার স্বাস্থ্যকর শক্তির বিঘ্ন যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৩) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিঘ্ন যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা।

আগেই দেখান হইয়াছে যে, মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য সর্ব্বতোভাবে সাধন করিতে হইলে প্রথমতঃ, মানুষের স্বাস্থ্যগত প্রাচুর্য্য এবং দ্বিতীয়তঃ, মানুষের ধনগত প্রাচুর্য্য সাধন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

মানুষের স্বাস্থ্যের এবং জল ও হাওয়ার স্বাস্থ্যকর শক্তির বিঘ্ন যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক না হইলে মানুষের স্বাস্থ্যগত প্রাচুর্য্য কোনক্রমে সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের স্বাস্থ্যগত প্রাচুর্য্য সাধন করিতে হইলে মানুষের স্বাস্থ্যের এবং জল ও হাওয়ার স্বাস্থ্যকর শক্তির বিঘ্নসমূহ যে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

জল ও হাওয়ার স্বাস্থ্যকর শক্তির এবং জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিঘ্নসমূহ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক না হইলে মানুষের ধনগত প্রাচুর্য্য সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। জল ও হাওয়ার যে শক্তি মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া থাকে, উহাদের সেই শক্তি জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তিও রক্ষা করিয়া থাকে। জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি রক্ষিত না হইলে কোন কৃত্রিম উপায়ে স্বাস্থ্যকর কাঁচামালসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষ তাঁহার খাদ্যের জন্য, পানীয়ের জন্য এবং অন্যান্য ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত সামগ্রী ব্যবহার করেন তাহার প্রত্যেকটীর কাঁচামাল জমি হইতে অথবা জমির অস্তিত্ববশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমস্ত শস্য, শাকসব্জী, ফলমূল, পশুর মাংস, ডিম্ব, মৎস্য প্রভৃতি মানুষ খাদ্যরূপে ব্যবহার করেন তাহার প্রত্যেকটী হয় সাক্ষাৎভাবে জমি হইতে নতুবা জমির অস্তিত্ববশতঃ উৎপন্ন হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়। পানীয়ের জন্য যাহা যাহা ব্যবহৃত হয় তাহার প্রত্যেকটী হয় জমিজাত দ্রব্য হইতে নতুবা জমির অস্তিত্ব বশতঃ উৎপন্ন হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়। খনিজপদার্থ, মুক্তা, শঙ্খ, ঝিনুক প্রভৃতিও হয় জমি হইতে নতুবা জমির অস্তিত্ব বশতঃ উৎপন্ন হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়। স্বাস্থ্যকর কাঁচামালসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সহজসাধ্য না হইলে কোনও শ্রেণীর শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। কাঁচামাল ও শিল্পজাতমাল না হইলে কোন বাণিজ্য-কার্য্য করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

কাঁচামাল উৎপাদন-কার্য্য, শিল্পজাত মাল উৎপাদন-কার্য্য এবং বাণিজ্য-কার্য্য সহজসাধ্য না হইলে ধনগত প্রাচুর্য্য সাধন করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। যখন ইহা স্পষ্ট যে, জল-হাওয়ার স্বাস্থ্যকর শক্তি এবং জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি অটুট না থাকিলে স্বাস্থ্যকর কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না, স্বাস্থ্যকর কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য না হইলে স্বাস্থ্যকর শিল্পজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না, কাঁচামাল ও শিল্পজাত মাল না হইলে বাণিজ্য-কার্য্য সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় না এবং কাঁচামাল উৎপাদন-কার্য্য, শিল্প-কার্য্য ও বাণিজ্য-কার্য্য না হইলে ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় না, তখন ইহা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, জল ও হাওয়ার স্বাস্থ্যকর শক্তি এবং জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি অটুট না থাকিলে মানুষের ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও হয় না।

প্রথমতঃ, স্বাস্থ্যগত প্রাচুর্য্য ও ধনগত প্রাচুর্য্য সাধন করা সম্ভবযোগ্য না হইলে মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য সর্ব্বতোভাবে সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় না ; এবং দ্বিতীয়তঃ, মানুষের স্বাস্থ্যের বিঘ্ন, জল ও হাওয়ার স্বাস্থ্যকর শক্তির বিঘ্ন এবং জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিঘ্ন সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত না হইলে মানুষের স্বাস্থ্যগত প্রাচুর্য্য ও ধনগত প্রাচুর্য্য অন্য কোন প্রকারে সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় না—এই দুই কারণে মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য সাধন করিবার প্রধান প্রয়োজনীয় উপরোক্ত তিন শ্রেণীর বিঘ্ন দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কার্য্য ; যথা :

(১) মানুষের স্বাস্থ্যের বিঘ্ন দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কার্য্য ;

(২) হাওয়া ও জলের স্বাস্থ্যকর শক্তির বিঘ্ন দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কার্য্য ;

(৩) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিঘ্ন দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কার্য্য।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর বিঘ্ন দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কার্য্য করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রধান ভাবে সতর্ক হইতে হয়, তদ্বিষয়ে আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

মানুষের স্বাস্থ্যের বিঘ্ন দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কার্য্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রধান ভাবে সতর্ক হইতে হয়—তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মানুষের "স্বাস্থ্য" কাহাকে বলে এবং "মানুষের স্বাস্থ্যের বিঘ্ন" হয় কি হইলে—তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

মানুষের অবয়বের অণ্ডাকারের গমনসমূহের (Elliptical movements-এর) এবং সূত্রাকারের গমনসমূহের (Lireal movements-এর) সমতার অথবা সামঞ্জস্যের নাম মানুষের "স্বাস্থ্য"। মানুষের অবয়বের উপরোক্ত দুই শ্রেণীর গমনের

(movements-এর) অসমতার অথবা অসামঞ্জস্যের নাম "স্বাস্থ্যের বিঘ্ন"।

"মানুষের স্বাস্থ্য" ও "স্বাস্থ্যের বিঘ্ন" কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে "মানুষের অবয়বের গমন," "অণ্ডাকারের গমন,", "সূত্রাকারের গমন," "অণ্ডাকারের গমন ও সূত্রাকারের গমনের সামঞ্জস্য", "অণ্ডাকারের গমন ও সূত্রাকারের গমনের অসামঞ্জস্য" —এই পাঁচটী কথার অর্থের সহিত পরিচিত হইতে হয়।

মানুষের জীবদ্দশায় তাঁহার অবয়বে সর্ব্বদা বিবিধ শ্রেণীর গমন (movements) বিদ্যমান থাকে। মানুষ কোন শারীরিক অথবা মানসিক কার্য্যই করুন, অথবা বিশ্রাম করুন, অথবা শয়ন করুন, অথবা নিদ্রিত হউন, তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার অবয়বস্থ উপরোক্ত বিবিধ শ্রেণীর গমনের কখনও সর্ব্বতোভাবের বিরাম সম্ভবযোগ্য হয় না। প্রাণবায়ুর অবসান হইলে সর্ব্ববিধ গমনের বিরতি হইয়া থাকে।

মানুষের কার্য্যসমূহ প্রধানভাবে দুইশ্রেণীতে বিভক্ত। এক-শ্রেণীর কার্য্য স্বতঃই হইয়া থাকে, আর একশ্রেণীর কার্য্য মানুষ তাঁহার বিবিধ ইচ্ছা পূরণের জন্য করিয়া থাকেন।

মানুষের কার্য্যসমূহ হয় তাঁহার শরীরের দ্বারা নতুবা ইন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা নতুবা মনের দ্বারা নতুবা বুদ্ধির দ্বারা সাধিত হয়।

মানুষের প্রত্যেক কার্য্যবশতঃ তাঁহার অবয়বে প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে।

মানুষের প্রত্যেক কার্য্যবশতঃ তাঁহার অবয়বে যে প্রতিক্রিয়া হয়, সেই প্রতিক্রিয়ার নাম "অবয়বের গমন"।

মানুষের যে সমস্ত কার্য্য শরীরের দ্বারা স্বতঃই সাধিত হয় সেই সমস্ত কার্য্যের প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ শরীরের সর্ব্বাংশে ব্যাপকতা লাভ করে। মানুষ যখন নিদ্রিত হন অথবা শয়ন করেন, তখন সাধারণতঃ তাঁহার অবয়বে শরীরের দ্বারা স্বতঃই কতিপয় কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। মানুষের শয়ন করিবার ও নিদ্রার সময় শরীরের দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য সাধিত হয় সেই সমস্ত কার্য্যের প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ শরীরের সর্ব্বাংশে ব্যাপকতা লাভ করে এবং শরীরের অণ্ডাকারের ন্যায় অণ্ডাকারের হইয়া থাকে।

মানুষের কার্য্যবশতঃ তাঁহার অবয়বে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপী অণ্ডাকারের হইয়া থাকে সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার নাম "অণ্ডাকারের গমন"।

মানুষ তাঁহার ইচ্ছা-পূরণের জন্য যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন সেই সমস্ত কার্য্য—তাঁহার বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হয়। মানুষের ইচ্ছা অতর্কিত অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচারের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইলে মানুষের ইচ্ছা-পূরণের পদার্থ-নির্দ্ধারণ ও ইচ্ছা-পূরণের কার্য্যপদ্ধতি-নির্দ্ধারণ সাধারণতঃ ভ্রমপূর্ণ হইয়া থাকে। মানুষের কার্য্যপদ্ধতি যখন ভ্রমপূর্ণ হয়, তখন মানুষ তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত কার্য্যবশতঃ তাঁহার অবয়বে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া হয়, সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ অবয়বের এক একটী অংশে মাত্র ব্যাপকতা লাভ করে এবং এক একটী ইন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা প্রভৃতির) আকার ধারণ করে।

এক একটী ইন্দ্রিয়ের আকারকে সূত্রাকার বলা হয়।

মানুষের কার্য্যবশতঃ তাঁহার অবয়বে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া খণ্ডাবয়বব্যাপী সূত্রাকারের হইয়া থাকে সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার নাম "সূত্রাকারের গমন"।

মানুষের ইচ্ছা যখন নির্ভুল বিচারের দ্বারা গঠিত হয়, তখন তাঁহার ইচ্ছা-পূরণের পদার্থ এবং ইচ্ছা-পূরণের কার্য্যপদ্ধতিও নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারিত হয়। ইচ্ছা, ইচ্ছা-পূরণের পদার্থ এবং ইচ্ছা-পূরণের কার্য্য-পদ্ধতি কি প্রণালীতে নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাহা যখন মানুষ শিক্ষা করিতে সক্ষম হন, তখন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কার্য্যসমূহের প্রতিক্রিয়া যাহাতে খণ্ডাবয়ব-ব্যাপী ও সূত্রাকারের না হইয়া সর্ব্বাবয়বব্যাপী অণ্ডাকারের হয় তাহা করিতে মানুষ সক্ষম হইয়া থাকেন।

মানুষের অবয়বের সূত্রাকারের প্রত্যেক গমন যখন অণ্ডাকারের গমনে পরিণত হয় এবং অবয়বের মধ্যে যখন কোন সূত্রাকারের গমন বিদ্যমান থাকে না তখন মানুষের অবয়ব যে অবস্থায় উপনীত হয়, মানুষের অবয়বের সেই অবস্থার নাম— "অণ্ডাকারের গমনের ও সূত্রাকারের গমনের সামঞ্জস্য-অবস্থা" অথবা "মানুষের সমতার ও স্বাস্থ্যের অবস্থা"।

মানুষের অবয়বের সূত্রাকারের প্রত্যেক গমন যখন অণ্ডাকারে পরিণত হইতে অক্ষম হয় এবং অবয়বের মধ্যে যখন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অণ্ডাকারের গমন ও সূত্রাকারের গমন বিদ্যমান থাকে তখন মানুষের অবয়ব যে অবস্থায় উপনীত হয়—মানুষের অবয়বের সেই অবস্থার নাম—"অণ্ডাকারের গমনের ও সূত্রাকারের গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থা" অথবা "মানুষের অসমতার ও স্বাস্থ্যের বিঘ্নের অবস্থা"।

মানুষের ইচ্ছা, ইচ্ছাপূরণের পদার্থ ও ইচ্ছাপূরণের কার্য্যপদ্ধতি যাহাতে অতর্কিত অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচারের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে না পারে ও না হয় এবং ভ্রমহীন বিচারের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে ও হয় তাহার ব্যবস্থা থাকিলে মানুষের অবয়বের অণ্ডাকারের গমনের ও সূত্রাকারের গমনের সামঞ্জস্যাবস্থা অথবা মানুষের সমতার ও স্বাস্থ্যের অবস্থা অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে।

মানুষের ইচ্ছা, ইচ্ছাপূরণের পদার্থ ও ইচ্ছাপূরণের কার্য্য-পদ্ধতি অতর্কিত অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচারের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইলে মানুষের অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্যাবস্থা অথবা মানুষের অসমতার ও স্বাস্থ্য-বিঘ্নের অবস্থা অনিবার্য্য হয়।

মানুষের অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থার উৎপত্তি হইলে মানুষের শরীরস্থ রস ও রক্ত তেজের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিত থাকিতে পারে না। মানুষের শরীরস্থ রস ও রক্ত তেজের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিত না থাকিলে মানুষের চাঞ্চল্য, ভ্রম এবং ক্রমশঃ নানা ব্যাধি অনিবার্য্য হয়।

খাদ্য অথবা পানীয় অথবা ব্যবহারের কোন সামগ্রী অথবা জীবিকার্জ্জনের কোন কার্য্য অথবা মানুষের সহিত কোন ব্যবহার অথবা যে স্থানে বাস করা যায় সেই স্থানের জল-হাওয়া উত্তেজক অথবা বিষাদ-আনয়ক হইলে মানুষের অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থা অথবা মানুষের অসমভাব ও স্বাস্থ্য-বিঘ্নের অবস্থা অনিবার্য্য হয়।

মানুষের স্বাস্থ্যের সর্ব্ববিধ বিঘ্ন যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহা করিতে হইলে চারি শ্রেণীর ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

প্রথমতঃ—মানুষের ইচ্ছা, ইচ্ছা-পূরণের কোন পদার্থ, ইচ্ছা-পূরণের কোন কার্য্য-পদ্ধতি যাহাতে অতর্কিত ভাবে অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচারের দ্বারা নির্দ্ধারিত না হইতে পারে ও না হয় এবং যাহাতে ভ্রমহীন বিচারের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় তাহার ব্যবস্থা—

দ্বিতীয়তঃ—মানুষের কোন খাদ্য অথবা পানীয় অথবা ব্যবহারের কোন দ্রব্য অথবা কোন ঔষধ অথবা কোন ব্যবহার যাহাতে উত্তেজনা অথবা বিষাদ-আনয়ক না হইতে পারে ও না হয় তাহার ব্যবস্থা;

তৃতীয়তঃ—মানুষের জীবিকার্জ্জনের কোন কার্য্য অথবা আমোদ-প্রমোদের কোন কার্য্য অথবা খেলাধূলার কোন কার্য্য যাহাতে কোনক্রমে উত্তেজনা অথবা বিষাদ-আনয়ক না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা;

চতুর্থতঃ—মানুষ যে যে স্থানে বাস করেন সেই সেই স্থানের কোন অংশের জল অথবা হাওয়া উত্তেজনা অথবা বিষাদ-আনয়ক যাহাতে না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর ব্যবস্থা সাধিত হইলে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যের যে কোনরূপ বিঘ্ন হইতে পারে না তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

হাওয়া ও জলের স্বাস্থ্যকর শক্তির বিঘ্ন সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কার্য্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্ক হইতে হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে হাওয়া ও জলের স্বাস্থ্যকর শক্তি এবং ঐ শক্তির বিঘ্ন কাহাকে বলে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

মানুষের অবয়বে যেরূপ অণ্ডাকারের গমন ও সূত্রাকারের গমন বিদ্যমান থাকে, হাওয়ার অবয়বে এবং জলের অবয়বেও সেইরূপ অণ্ডাকারের গমন ও সূত্রাকারের গমন বিদ্যমান থাকে।

নীলাকাশের অণ্ডাকারের বিদ্যমানতা বশতঃ হাওয়ার ও জলের অবয়বে অণ্ডাকারের ও সর্ব্বাবয়বিক গমনের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী হয়।

ভূমণ্ডলস্থ উদ্ভিদ্ ও চরজীবগণের বিদ্যমানতা বশতঃ হাওয়ার ও জলের অবয়বে সূত্রাকারের ও অণ্ডাবয়বিক গমনের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী হয়।

মানুষের অবয়বে যেরূপ অণ্ডাকারের গমনের ও সূত্রাকারের গমনের সামঞ্জস্য অবস্থা ও অসামঞ্জস্য অবস্থা বিদ্যমান থাকে, হাওয়ার অবয়বে এবং জলের অবয়বে সেইরূপ অণ্ডাকারের গমনের ও সূত্রাকারের গমনের সামঞ্জস্য অবস্থা ও অসামঞ্জস্য অবস্থা বিদ্যমান থাকে।

হাওয়ার অবয়বের এবং জলের অবয়বের অণ্ডাকারের গমনের ও সূত্রাকারের গমনের সামঞ্জস্য অবস্থা হইতে তাহাদিগের স্ব স্ব স্বাস্থ্যকর শক্তির উৎপত্তি ও অস্তিত্ব ঘটিয়া থাকে।

হাওয়ার অবয়বের এবং জলের অবয়বের অণ্ডাকারের গমনের ও সূত্রাকারের গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থা হইতে তাহাদিগের স্ব স্ব স্বাস্থ্যকর শক্তির বিঘ্নসমূহের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।

মানুষের কার্য্যের দুষ্টতা ছাড়া অন্য কাহারও কোন কার্য্যে হাওয়ার অবয়বের অথবা জলের অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থা কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না।

মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে হাওয়ার এবং জলের অবয়বস্থ তেজ তাহার রসাংশ হইতে পৃথক্ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, মানুষ যদ্যপি সেই সমস্ত কার্য্য করেন তাহা হইলে সেই সমস্ত কার্য্যবশতঃ হাওয়ার এবং জলের অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের "অসামঞ্জস্য অবস্থার" উদ্ভব হইয়া থাকে।

হাওয়ার অথবা জলের অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের "অসামঞ্জস্য অবস্থার" উদ্ভব হইলে উহাদের মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার শক্তি এবং জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি রক্ষার শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঐ অসামঞ্জস্যের অবস্থা বৃদ্ধি পাইলে, হাওয়া এবং জল এই উভয়ই, মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার স্থলে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে এবং জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি রক্ষা করিবার স্থলে উহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করিয়া থাকে।

হাওয়া ও জলের স্বাস্থ্যকর শক্তির বিঘ্ন যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে হাওয়ার এবং জলের অবয়বস্থ কোন অংশের তেজ তাহার রসাংশ হইতে পৃথক্ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কার্য্য মানুষ যাহাতে করিতে না পারেন ও না করেন তাহার ব্যবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

ঐ ব্যবস্থা সাধিত না হইলে হাওয়ার এবং জলের স্বাস্থ্যকর শক্তির বিঘ্ন হওয়া অনিবার্য্য হয়।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিঘ্ন সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কার্য্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্ক হইতে হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে "জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি" এবং "ঐ শক্তির বিঘ্ন" কাহাকে বলে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

মানুষের অবয়বে, হাওয়ার অবয়বে এবং জলের অবয়বে যেরূপ 'অণ্ডাকার গমন' ও 'সূত্রাকার গমন' বিদ্যমান থাকে, জমির অবয়বেও সেইরূপ 'অণ্ডাকার গমন' ও 'সূত্রাকার গমন' বিদ্যমান থাকে।

নীলাকাশে অণ্ডাকারের বিদ্যমানতাবশতঃ জমির অবয়বে অণ্ডাকারের ও সর্ব্বাবয়ব গমনের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী হয়।

ভূমণ্ডলস্থ জল, হাওয়া, উদ্ভিদ্ ও চরজীব এবং জমির অভ্যন্তরস্থ খনিজ পদার্থসমূহের বিদ্যমানতাবশতঃ, জমির অবয়বে সূত্রাকারের ও খণ্ডাবয়ব গমনের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী হয়।

মানুষের হাওয়ার ও জলের অবয়বে যেরূপ অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের 'সামঞ্জস্য অবস্থা' ও 'অসামঞ্জস্য অবস্থা' বিদ্যমান থাকে, জমির অবয়বেও সেইরূপ অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের সামঞ্জস্য অবস্থা ও অসামঞ্জস্য অবস্থা বিদ্যমান থাকে।

জমির অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের সামঞ্জস্য অবস্থা হইতে তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির উৎপত্তি ও অস্তিত্ব ঘটিয়া থাকে।

জমির অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থা হইতে তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিঘ্ন-সমূহের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব ঘটিয়া থাকে।

মানুষের কার্য্যের দুষ্টতা ছাড়া অন্য কাহারও কোন কার্য্যে হাওয়ার অবয়বের অথবা জলের অবয়বের যেরূপ অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থা কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না এবং হয় না—সেইরূপ মানুষের কার্য্যের দুষ্টতা ছাড়া অন্য কাহারও কোন কার্য্যে জমির অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থা কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না ও হয় না।

মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে জমির অবয়বস্থ তেজ তাহার রসাংশ হইতে পৃথক্ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, মানুষ যদ্যপি সেই সমস্ত কার্য্য করেন—তাহা হইলে, সেই সমস্ত কার্য্যবশতঃ জমির অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে।

ভ্রমপূর্ণ পদ্ধতিতে খনিজ পদার্থের উত্তোলন, ভ্রমপূর্ণ পদ্ধতিতে জমির বক্ষে যান-বাহনের প্রচলন, ভ্রমপূর্ণ পদ্ধতিতে জমির বক্ষে কৃষি কার্য্যের প্রবর্ত্তন, ভ্রমপূর্ণ পদ্ধতিতে জমির বক্ষে শিল্পকার্য্যের প্রবর্ত্তন, জমির অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থার কারণ হইয়া থাকে।

জমির অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের "অসামঞ্জস্য অবস্থার" উদ্ভব হইলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিঘ্ন হওয়া অনিবার্য্য হয়।

জমির অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের "অসামঞ্জস্য অবস্থার" বৃদ্ধি হইলে প্রথমতঃ, জমিজাত দ্রব্যসমূহ অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ, জমি হইতে কোন দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা অসম্ভব হয়। তখন মানুষের প্রাণ ধারণ করা পর্য্যন্ত অসম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিঘ্ন যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে জমির অবয়বস্থ কোন অংশের তেজ তাহার রসাংশ হইতে পৃথক্ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে সেই সমস্ত কার্য্য মানুষ যাহাতে করিতে না পারেন ও না করেন তাহার ব্যবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়। ঐ ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিঘ্ন হওয়া অনিবার্য্য হয়।

মানুষের সর্ব্বতোভাবের প্রাচুর্য্য সাধিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে কি প্রকারে—তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত কথা উপরে বলা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, মানুষের সর্ব্বতোভাবের প্রাচুর্য্য যাহাতে সাধিত হয় তাহা করিতে হইলে, ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থা অনিবার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়; যথা :

(১) মানুষের ইচ্ছা, ইচ্ছাপূরণের কোন পদার্থ ও ইচ্ছাপূরণের কোন কার্য্যপদ্ধতি যাহাতে অতর্কিতভাবে অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচারের দ্বারা নির্দ্ধারিত না হইতে পারে ও না হয়, এবং যাহাতে ভ্রমহীন বিচারের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়—তাহার ব্যবস্থা;

(২) মানুষের কোন খাদ্য অথবা পানীয় অথবা ব্যবহারের কোন দ্রব্য অথবা কোন ঔষধ অথবা কোন ব্যবহার যাহাতে উত্তেজনা অথবা বিষাদ-আনয়ক না হইতে পারে—তাহার ব্যবস্থা;

(৩) মানুষের জীবিকার্জ্জনের কোন কার্য্য অথবা আমোদ-প্রমোদের কার্য্য অথবা খেলাধূলার কোন কার্য্য যাহাতে কোনক্রমে উত্তেজনা অথবা বিষাদ-আনয়ক না হইতে পারে—তাহার ব্যবস্থা;

(৪) মানুষ যে যে স্থানে বাস করেন, সেই সেই স্থানের কোন অংশের জল অথবা হাওয়া উত্তেজনা অথবা বিষাদ-আনয়ক যাহাতে না হইতে পারে—তাহার ব্যবস্থা;

(৫) মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে হাওয়ার এবং জলের অবয়বস্থ কোন অংশের তেজ তাহার রসাংশ হইতে পৃথক্ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কার্য্য কোন মানুষ যাহাতে করিতে না পারেন ও না করেন—তাহার ব্যবস্থা;

(৬) মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে জমির অবয়বস্থ কোন অংশের তেজ তাহার রসাংশ হইতে পৃথক্ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কার্য্য মানুষ যাহাতে করিতে না পারেন ও না করেন—তাহার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থা সাধিত হইলেই যে মানুষের সর্ব্বতোভাবের প্রাচুর্য্য সাধিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে—তাহা নহে; মানুষের সর্ব্বতোভাবের প্রাচুর্য্য সাধন করিতে হইলে, ঐ ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থা ছাড়া আরও অনেক শ্রেণীর ব্যবস্থা সাধন করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের সর্ব্বতোভাবের প্রাচুর্য্য সাধন করিতে হইলে ঐ ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থা ছাড়া আরও অনেক শ্রেণীর ব্যবস্থা সাধন করিবার প্রয়োজন হয় বটে; কিন্তু ঐ ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, অন্যান্য কোন শ্রেণীর ব্যবস্থায় মানুষের সর্ব্বতোভাবের প্রাচুর্য্য সাধিত হইতে পারে না।

ঐ ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থার কোন একটী শ্রেণীর ব্যবস্থার অভাব হইলে, যুগপৎভাবে ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থারই অভাব হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়।

সংগঠনের যে সমস্ত দুষ্টতাবশতঃ মানুষের অভাবের উৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত দুষ্টতার মূল কারণ—ঐ ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থার অভাব। এই হিসাবে, ঐ ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থার অভাবকে মানুষের সর্ব্ববিধ অভাবের সংগঠন-গত কারণসমূহের মূল কারণ বলা যাইতে পারে।

মানুষের "অভাবের" কারণ যেরূপ ছয় শ্রেণীর, মানুষের "দারিদ্র্যের" কারণও সেইরূপ ছয় শ্রেণীর। যে সমস্ত সংগঠন-গত কারণে মানুষের অভাবের উৎপত্তি হয়—সেই সমস্ত সংগঠন-গত কারণ যখন অত্যধিকভাবে তীব্র হয়—তখন, মানুষ সর্ব্ববিষয়ে "দরিদ্র" হইয়া থাকেন।

নিম্নলিখিত ছয় শ্রেণীর অবস্থা মানুষের দারিদ্র্যের মূল কারণ :

(১) অতর্কিত ভাবে এবং ভ্রমপূর্ণ বিচারের দ্বারা, মানুষের ইচ্ছা-গঠন করিবার এবং ইচ্ছাপূরণের পদার্থ ও ইচ্ছাপূরণের কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিবার অবস্থা ;

(২) উত্তেজনা ও বিষাদ-আনয়ক খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী ব্যবহার করিবার এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে ব্যবহারে উত্তেজনা ও বিষাদ উদ্ভব করিবার অবস্থা ;

(৩) জীবিকার্জ্জনের, আমোদ-প্রমোদের ও খেলাধূলার কার্য্যে উত্তেজনা ও বিষাদের অবস্থা ;

(৪) মানুষ যে যে স্থানে বাস করেন, সেই সেই স্থানের জল ও হাওয়ার উত্তেজনা ও বিষাদ উদ্ভব করিবার অবস্থা ;

(৫) যে সমস্ত কার্য্যে হাওয়ার এবং জলের অবয়বস্থ প্রত্যেক অংশের তেজ তাহার রসাংশ হইতে পৃথক্ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, মানুষের সেই সমস্ত কার্য্য করিবার অবস্থা ;

(৬) যে সমস্ত কার্য্যে জমির অবয়বস্থ প্রত্যেক অংশের তেজ তাহার রসাংশ হইতে পৃথক্ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, মানুষের সেই সমস্ত কার্য্য করিবার অবস্থা।

অভাবের ও দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয় কেন, তাহা বুঝিতে পারিলে, অভাব হইতে দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয় কি প্রকারে—তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয় কেন, তাহা বুঝিতে পারিলে, মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও মানুষের অভাব অথবা দারিদ্র্য ব্যাপকতা লাভ করে কেন,—তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। যাহা মানুষের দারিদ্র্যের কারণ তাহাই মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের ও মানুষের দারিদ্র্যের ব্যাপকতার কারণ।

যে ছয় শ্রেণীর অবস্থা মানুষের দারিদ্র্যের কারণ—সেই ছয় শ্রেণীর অবস্থা সাক্ষাৎভাবে বর্ত্তমান সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী যুদ্ধ ও সমগ্র মনুষ্য-সমাজব্যাপী অভাব অথবা দারিদ্র্যের কারণ।

যে ছয়শ্রেণীর অবস্থা মানুষের দারিদ্র্যের কারণ, সেই ছয়শ্রেণীর অবস্থা যে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে—তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

যুদ্ধ চলিতে থাকিলে যে ছয়শ্রেণীর অবস্থা মানুষের দারিদ্র্যের কারণ, সেই ছয়শ্রেণীর অবস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রত্যেক যুদ্ধের পরে, মনুষ্যসমাজের অবস্থা প্রত্যেক যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী মনুষ্যসমাজের অবস্থার তুলনায় যে অধিকতর খারাপ হয়, তাহার কারণ—যুদ্ধ চলিতে থাকিলে মনুষ্যসমাজের দারিদ্র্যের কারণ বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের দারিদ্র্য অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করে। প্রত্যেক যুদ্ধের পরে, মনুষ্যসমাজের অবস্থা, ঐ যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী মনুষ্যসমাজের অবস্থার তুলনায় যে অধিকতর খারাপ হয়,—তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। উহা মনুষ্যসমাজে গত আড়াই হাজার বৎসরে যে সমস্ত যুদ্ধ হইয়াছে সেই সমস্ত যুদ্ধের প্রত্যেক যুদ্ধের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

বর্ত্তমান সময়ে যে যুদ্ধ চলিতেছে সেই যুদ্ধবশতঃ মনুষ্যসমাজের দারিদ্র্যের কারণগুলি কিরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রত্যেক দেশের মানুষগুলি কোন্ শ্রেণীর উত্তেজনা ও বিষাদে কোন্ শ্রেণীর আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন, ভূমণ্ডলের প্রত্যেক অংশের জল ও হাওয়া ক্রমেই কিরূপ মানুষের স্বাস্থ্য-নাশ-সাধক হইয়া পড়িতেছে, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি কিরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে—তাহা আমরা সমাজের এক অন্ধকারময় কোণে বসিয়া লক্ষ্য করিতেছি বলিয়াই আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্যার সমাধান না হইলে, মনুষ্য-সমাজ ক্রমে ক্রমে যে বিপদসঙ্কুল দারিদ্র্যের অবস্থায় উপনীত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান দারিদ্র্যের অবস্থা অনেক কম।

মনুষ্য-সমাজের বর্ত্তমান সারথিগণের কর্ণে ও হৃদয়ে উপরোক্ত কথা উপনীত হইবে কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদিগের বিচারানুসারে, যে নিয়মে বিশ্বের এই আকাশ, জল, স্থল এবং চরাচর জীবগণ স্বতঃই উৎপন্ন, বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন, সেই নিয়মানুসারে, মানবসমাজের বর্ত্তমান সারথিগণের কৃত কর্ম্মের হিসাব-নিকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। যে মানুষগুলির সাহায্যে তাঁহাদিগের কৃত কর্ম্মসমূহ চলিতেছে, যে মানুষগুলি তাহাদিগের অনুগত ও শরণাগত—সেই মানুষগুলি কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, সেই মানুষগুলির ভবিষ্যৎ কোন্ দিকে চলিয়াছে, তাহা সর্ব্বব্যাপী ঐ নিয়মের নিয়মানুসারে মানব-সমাজের বর্ত্তমান মহাসারথিগণ বিচার না করিয়া আর বেশী দিন উদাসীন থাকিতে পারিবেন না, ইহা আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

বর্ত্তমান মানব-সমাজের সমস্যার সমাধানে আমাদিগের এই প্রবন্ধ অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, ইহা আমাদিগের অন্যতম সিদ্ধান্ত। আমাদিগের ঐ সিদ্ধান্তের কারণ পাঁচ শ্রেণীর ; যথা :

(১) বর্ত্তমান মানবসমাজের সমস্যা সমাধান করিতে হইলে, মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধপ্রবৃত্তি ও সর্ব্বশ্রেণীর অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তাহা করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়।

(২) মনুষ্যসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধপ্রবৃত্তি ও সর্ব্বশ্রেণীর অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তাহার ব্যবস্থা করিবার পন্থা একাধিক হইতে পারে না এবং একাধিক নহে। ঐ ব্যবস্থার পন্থা কেবলমাত্র একটী।

(৩) মনুষ্যসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধপ্রবৃত্তি ও সর্ব্বশ্রেণীর অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তাহার ব্যবস্থা করিবার পন্থা, বর্ত্তমান তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ-সমূহের জ্ঞানভাণ্ডারে পাওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রয়োগসমূহের ব্যবহারে মানুষের পরস্পরের যুদ্ধ-প্রবৃত্তির ও মানুষের দারিদ্র্যের বৃদ্ধি হওয়া অনিবার্য্য। ঐ সমস্ত প্রয়োগের কোনটীর দ্বারা যুদ্ধপ্রবৃত্তি ও দারিদ্র্য দূর করা অথবা নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য নহে।

(৪) মনুষ্যসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধপ্রবৃত্তি ও সর্ব্বশ্রেণীর অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তাহার ব্যবস্থা করিবার যে একটীমাত্র পন্থা আছে, সেই একটীমাত্র পন্থার সন্ধান পাওয়া যায়—ভারতবর্ষের ঋষিগণের সূত্র, মন্ত্র, কারিকা ও শ্লোকময় লেখায়। ভারতবর্ষের ঋষিগণের লেখা ছাড়া ভারতবর্ষের অথবা ভূমণ্ডলের আর কাহারও কোন লেখায় ঐ পন্থার সন্ধান আদৌ পাওয়া যায় না।

(৫) ঐ পন্থার সন্ধান পাইতে হইলে, ভারতবর্ষের ঋষিগণের লেখা যে পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করিতে হয়, ভারতবর্ষে বসবাস না করিলে, সেই পদ্ধতি শিক্ষা করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না এবং হয় না।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমস্যা সমাধানের কোন যুক্তিপূর্ণ কথা কোন ভারতবাসীর মুখে যদি শুনা যাইত, তাহা হইলে আমাদিগের এই প্রবন্ধের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত হইতে হইত। ভারতবাসিগণ যাঁহাদিগকে মহাত্মা অথবা মহাত্মার অনুচর বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মুখে ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের কোন কোন কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমস্যা সমাধানের কোন কথা শুনা যায় না।

আমাদিগের মনে হয়, সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান না হইলে যে, কোন একজন ভারতবাসীর অথবা কোন এক প্রদেশের ভারতবাসীর সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে—তাহা ভারতবর্ষের ভাবুকগণের অনেকেই এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন। সমগ্র ভারতবাসীর অথবা সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান না হইলে যেরূপ কোন প্রদেশ-গত অথবা ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে—সেইরূপ সমগ্র মানবসমাজের সমস্যার সমাধান না হইলে সমগ্র ভারতবাসীর অথবা সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধান হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে, ইহা আমাদিগের সিদ্ধান্ত। আমাদিগের বিচারানুসারে,উপরোক্ত সত্যটী না বুঝিয়া, সমগ্র মানব-সমাজের সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা না করিয়া, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা আলোচনা করিলে পরোক্ষভাবে মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ-প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং মানুষের পশুত্বের অথবা পশু-প্রবৃত্তির উদ্ভব সাধন করা হয়। যে ভারতবর্ষ একদিন পবিত্র ঋষিগণের পবিত্র চিন্তার উদ্ভব-ক্ষেত্র হইয়াছিল, যে ভারতবর্ষে মানুষের পশুত্ব সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিবার মন্ত্র জাগ্রত হইয়াছিল, যে ভারতবর্ষে ঋষিগণ মানুষের এক-জাতিত্ব ছাড়া দেশগত জাতিত্ববোধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দণ্ডার্হ করিয়াছিলেন, সেই ভারতবর্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলন দেখিলে আমরা প্রাণে নিদারুণ ব্যথা পাই; কিন্তু আমাদের ব্যথায় কেহ কর্ণপাত করেন না, আমাদিগের ব্যথা কাহারও হৃদয় স্পর্শ করে না।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমস্যা-সমাধানের কোন যুক্তিপূর্ণ কথা যাঁহারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা ভারতবর্ষে বসবাস করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কাহারও মুখে শুনা যায় না বলিয়া, আমাদিগের সিদ্ধান্ত—বর্ত্তমান মানব-সমাজের সমস্যার সমধানে আমাদিগের এই প্রবন্ধ অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

আমাদিগের প্রবন্ধমালার এই প্রথম প্রবন্ধের আঠারটী বক্তব্য-বিষয়ের বিবরণ ও যুক্তি ইহার পর প্রকাশিত হইবে। [ক্রমশঃ

"শ্রীদুর্গাপূজা"র প্রয়োজনীয়তা

গত বৎসরের ৺পূজার সংখ্যায় আমাদিগের ঐ প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, এখনও ঐ প্রবন্ধ আমরা সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হই নাই। এই সংখ্যা লইয়া দুই সংখ্যায় উহার পুনরাবৃত্তি স্থগিত রহিয়াছে। ঐ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আমাদের আছে। কতদিনে ঐ ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভবযোগ্য হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার প্রয়োজনীয়তায় আমাদিগের বক্তব্য প্রধান-ভাবে চারি শ্রেণীর, যথা:

(১) পূজা ও দেব-দেবীর পূজা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতার একটী অংশ;

(২) যে সমস্ত কার্য্য বর্ত্তমান মানব-সমাজে "পূজার" নামে প্রচলিত, সেই সমস্ত কার্য্যের প্রত্যেকটী প্রকৃত "পূজা" সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক;

(৩) যাহা যাহা এক্ষণে 'বিজ্ঞান' নামে প্রচলিত, তাহার প্রত্যেকটী প্রকৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক;

(৪) যাহা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান নামের যোগ্য, সেই বিজ্ঞান মানব-সমাজে প্রচলিত থাকিলে কোন মানুষের কোন শ্রেণীর অভাব অথবা দুঃখ থাকিতে পারে না।

যাহা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান নামের যোগ্য, সেই বিজ্ঞান মানব-সমাজে বিদ্যমান থাকিলে প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব ও সর্ব্ববিধ দুঃখ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তাহা ব্যবস্থা করিবার সংগঠনের পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব-যোগ্য হয়।

যাহা বিজ্ঞান নামে বর্ত্তমান মানবসমাজে প্রচলিত, তাহার দ্বারা একটী মানুষেরও সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করা অথবা নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। এই কারণে যাহা বিজ্ঞান নামে বর্ত্তমান মানবসমাজে প্রচলিত, তাহা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান-নামের অযোগ্য।

সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব ও সর্ব্ববিধ দুঃখ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়, তাহা ব্যবস্থা করিবার সংগঠনের পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ করা যে মানুষের সাধ্যায়ত্ত, তাহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সংগঠন কি কি প্রকারে করিতে হয়—তাহা আমরা উক্ত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

পূজা ও দেব-দেবীর পূজার সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতার সম্বন্ধ কি—তাহা আমরা এখনও দেখাই নাই। উহা দেখাইবার ইচ্ছা আমাদিগের আছে।

জা গৃ হি

দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী

রাণীকুমা

হে দেবি—তোমারে অর্চনা করি কত শত উপচারে,
সাজাই মন্ত্র, সাজাই তন্ত্র নানামতে ভাবে ভাবে,—
পূজা-আরতির করি সমারোহ,
বলি-উপায়নে সাধি অবরোহ,
শঙ্খ-ঘণ্টা-ঢক্কা-নিনাদে ভক্তির অভিনয়ে—
মৃন্ময়ী মাতা চিন্ময়ী-রূপে রাজো কি মর্ত্ত্যালয়ে ?

শক্তির আরাধনা ক'রে তবু হয়েছি শক্তিহারা,
বীর্য্যহীনের লাঞ্ছনা শিরে—বাসভূমি হোলো কারা।
পরাধীনতার কশাঘাত সহি'
ক্ষুদ্র পরাণ কোনমতে বহি,
অবমাননার ধূলি গায়ে মাখি' চলেছি ত্রস্ত পথে—
দলিত পিষ্ট মূর্চ্ছিত আহত প্রবলের জয়রথে।

সে যে কোন্ এক বিস্মৃত দিনে জাগিলে জ্যোতির্ম্ময়ী,
মিলিত শক্তি-সাধনে দেবেরে করেছ দৈত্যজয়ী!
অপরূপ রণচণ্ডী মূরতি
ধরিলে গো—তমোরূপিণী নিয়তি,
শত প্রহরণে সিংহবাহনে রাজিলে সংহারিকা,—
দহে অরিকুলে তব ত্রিনেত্রে জ্বলৎবহ্নিশিখা।

মহামানবের অকাল-বোধনে হয়েছ আবির্ভূতা,
আর্ত্তি-হরণে শক্তি-প্রেরণা দিয়েছ শৈলসুতা।
হারায়েছি মোরা সে-নিষ্ঠা-বল,
অবিশ্বাসে যে হৃদয় বিকল,
তোমার বিধান ভুলিয়া, জননী, দর্পের অভিমানে
সাধি ভীরুতার গ্লানি এ-জীবনে মিথ্যার সন্ধানে।

ভেঙেছি আমরা মৈত্রী—তোমার নির্দ্দেশ নাহি মানি,
স্বার্থের হীন সংঘাত জাগে হিংসা-গরল আনি,'
প্রতিশোধ তুমি করো মা শোধন,
শিখাও আবার শক্তি-বোধন,
তোমার রাজ্যে করুণা তোমার জাগুক্ মূরতি ধরি,
ঘুচাও ভ্রান্তি, শান্তির সুধাধারা বর্ষণ করি'।

তব আশ্বাস-বাণী মন্দ্রিত যুগ-যুগান্ত-পারে—
দানব-উৎপীড়নে তুমি, দেবি, রাজিবে যে বারে বারে।
অক্ষম মোরা শক্তি-পূজনে
তাই কি বিমুখ হও আগমনে,
নব চেতনায় জাগাও আবার নিদ্রিত সন্তানে,
মুক্তির ভেরী উঠুক ধ্বনিয়া তব জাগরণ-তানে।

অগ্নিলোচনা জাগো রুদ্রাণী দুর্গা শুভগ আনো',
শত্রু-দহন করো মহামায়া—দাস্ত-শোচনা হানো।

শিব ও অশিব দুই হাতে লয়ি
নৃত্য করো মা কপালিনি অয়ি,
ধরো নৃসিংহ-মূর্ত্তি—নাশিতে পর-লোলুপের দলে,
স্বর্গ-মুক্তি-বরদা ভাঙো মা বন্ধন-শৃঙ্খলে।

ত্রিগুণ-সাম্য-প্রকৃতি সগুণা রাখো এই ধরণীরে,
সচেতন-চিন্ময়রূপে রহো কৃৎস্ন জগৎ ঘিরে।
নির্গুণ চৈতন্ত-সৃজনে
শক্তির লীলা-রূপ-ব্যঞ্জনে
ব্রহ্মবিদুষী বাক্-স্বরূপিণী তুমি মা সরস্বতী।
স্থিতি-কাল-চারী শক্তি-শ্রী লক্ষ্মী বিষ্ণু-সতী।

রুদ্র-বনিতা দুর্গা তুমি গো সংহারে লীলাময়ী,
তুমি মা অনির্ব্বচনীয়া পরব্রহ্ম-মহিষী অয়ি!
কুমারে অজেয় করো বরদানে,
গণদেবে রাখো সিদ্ধি-বিধানে,—
তোমার আরতি—রাষ্ট্র-সমাজ-ভবন-পালন-নীতি,
তব আরাধনা শিখায়, জননি, দিনযাপনের রীতি।

তব মহিমায় কল্যাণী-রূপ উদিত মরমে যবে—
তোমারি অংশ-সম্ভূতা নারী সত্তা চিনিবে তবে।
বিশ্বজননি, তব বৈভবে
স্বরূপ জানিয়া—নব গৌরবে
রমণী যে হবে প্রকৃত জননী আদর্শ গরীয়সী,
বীরপুত্রের লালনে আবার প্রাচী হবে মহীয়সী।

কৌমারী-রূপ-ধারিণী পরমা তুমি গো সুনির্ম্মলা!
তোমার ধারণা-ধ্যানে লভি যেন কন্তা সুমঙ্গলা!
বিলাস-ব্যসন দূর করো মা গো,
প্রাচ্যের মনোমন্দিরে জাগো,
ছিন্ন করো মা মোহ-আবরণ জাগাও অরুণ-জ্যোতিঃ!
দেশ-মাতৃকার ভালো ও মন্দে রাখো মা অমিত মতি।

হে চারু-পূর্ণ-সোম-শিখরিণী—এসো মা ক্ষেমঙ্করি!
তোমার চরণ-মঞ্জীর-তালে উঠুক্ ধরণী ভরি'।
প্রাচী-দিগন্তে জাগুক্ আবার
জীবন-তপন মহামহিমার,
বরাভয়ে তব পাই যেন দেবি, তরুণ প্রবল প্রাণে!
প্রসন্ন-মুখে চাহো অম্বিকা তোমার স্তবন-গানে।

হে মহাশক্তি—রাজো তুমি দেবি—মোদের ভুবন-মাঝে,
যুগ-পুঞ্জিত আঁধার নাশো মা জ্যোতিঃ-সুবিমল সাজে।
তোমার জয়ের মন্ত্রের গুণে
অক্ষয় শর দাও ভরি' তূণে,
যেন অঙ্গদ-মণিকুণ্ডল যতেক ভূষণ খুলি'—
তোমার স্নেহের আদেশ মানিয়া জাগি সুষুপ্তি ভুলি'!

মর্ম্মে মর্ম্মে উঠুক্ বাজিয়া তোমার মাভৈঃ-বাণী,
তব দীক্ষার ভাষণ, হে দেবি, লইব জীবনে জানি'।
ক্লিষ্ট আকাশে আলোকের মালা
বিকশিয়া তোলে জাগরণ-পালা,
এনে দাও যশঃ-বিদ্যা-কীর্ত্তি-শক্তি-অর্থ-আয়ু!
বিষ-জর্জ্জর ভুবনে বহুক্ তব নিঃশ্বাস-বায়ু।

হীন বন্ধন-ভঞ্জন-করা কৃপার প্রসাদী-দানে—
সত্যরূপে মা জাগাও ভারতে জড়ত্ব-অবসানে।
নমি গো হৃদয়-কাম্য-ভরণি,
নমি গো চণ্ডি রিপু-নিসূদনি,
শুভ-দর্শন দিবে, সুধাময়ি, দশভুজা-রূপে কবে!
সিংহবাহিনী জাগ্রতা হও প্রাণের আকুল স্তবে।

দশপ্রহরণধারিণী
শিল্পী শ্রীসুধীর দত্ত (বাম হস্তে অঙ্কিত)

দ্বাদশ বর্ষ } আশ্বিন ঃ শারদীয়া সংখ্যা ঃ ১৩৫১ { ১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

যে অনন্ত কথা তুমি আমার মধ্যে রক্ষা করিয়াছ এবং প্রতিনিয়ত জাগ্রত করিয়া তুলিতেছ, যে ভাষায় সেই অনন্ত কথা আমার ঐ ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের প্রাণে জাগিয়া উঠিতে পারে, সেইরূপ ভাষা আজ আমার প্রাণে জাগ্রত কর মা। আমার মধ্যে যত কিছু দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি এবং রাগ ও দ্বেষের প্রমত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আজ দূরীভূত হউক। তুমি যে আমাদের সর্ব্বসাধারণের মাতা এবং তোমার সৃষ্ট প্রত্যেক মানুষটি যে এক মাতার সন্তান, সেই ভাবে আমি যেন প্রবুদ্ধ হই এবং ঐ ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া যেন আমি রাগ, দ্বেষ, হিংসা, অভিমানের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সকলকেই প্রকৃত ভ্রাতা ও ভগ্নীর মত প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন করিতে পারি।

আমার এই আকাঙ্ক্ষারূপী রাজসিকতার মধ্যে যেন তোমার ঐ সাত্ত্বিকতা অটুটভাবে মিলিত থাকে।

* * * * *

কি করিয়া পরের দুঃখ দূর করা যায়, কোন্ উপায়ে পরের সুখ বাড়ান সম্ভব হয়, তাহা বলিবার জন্য অস্থিরতা দূর করার প্রয়োজন আছে, ইহা যখনই মনে জাগিল, তখনই বুঝিলাম যে, অস্থিরতা দূর করিতে হইলে আমার অস্থিরতা আসে কেন, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

আমার অস্থিরতা আসে কেন তাহা যখন খুঁজিতে আরম্ভ করি, তখন দেখিতে পাই যে, আমি যখন বৃদ্ধ ও মরণের জন্য প্রস্তুত হইতে চাই, তখনই আমার অস্থিরতা সর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায় আর বাকী সব সময়েই অস্থিরতায় আকুল হইয়া পড়ি। বার্দ্ধক্যের জন্য যখন হতাশ্বাস অথবা মরণের ডাক উপস্থিত হয়, তখনও আমার অস্থিরতা পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। এক কথায়, যখন দুর্ব্বুদ্ধি ও দুষ্ট ইচ্ছা আমাকে ডুবাইয়া দেয়, তখনই আমার অস্থিরতা জাগে। যখন আমার প্রাণের মধ্যে বুদ্ধির ও ইচ্ছার উৎস কোথায় তাহার সন্ধান-প্রবৃত্তি জাগে, তখন আর আমার অস্থিরতা থাকে না।

আমি সব সময়েই এইভাবে মজগুল থাকিতে চাই, কিন্তু তাহা পারি না। কেন পারি না—তাহার ভাবনা লইয়া অনেক দিনের অনেক সময় কাটাইয়াছি। পরিশেষে বুঝিয়াছি, বুদ্ধি ও ইচ্ছার উৎস যথাক্রমে শিব ও দুর্গা। শুনিয়াছি, তাঁরা যেমন আমার অবয়বের মধ্যে আছেন, সেইরূপ উন্মুক্ত আকাশের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন।

"দেহস্থাঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
দেহস্থাঃ সর্ব্বতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে॥"

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

পদচিহ্ন-দর্শন

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

ছেলেবেলায় 'আনন্দমঠে' পড়িয়াছিলাম—'১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে পদচিহ্ন গ্রামে একদিন রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল।' মনে হইয়াছিল, বাংলা দেশের কোথাও বুঝি সত্যই পদচিহ্ন নামে একটি গ্রাম আছে। একটু বড় হইলে বুঝিয়াছিলাম, পদচিহ্ন নামটি কাল্পনিক, বাস্তব জগতে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। পরিণত বয়সে বুঝিতে পারিয়াছি—পদচিহ্ন নামটি কাল্পনিক নহে, কিন্তু উহা দর্শন করিতে হইলে চাই সাধকের ধ্যানদৃষ্টি, ঋষি-কবির দিব্যানুভূতি।

যাঁহার অন্তর মথিত করিয়া সেই মর্ম্মভেদী ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়াছিল—'কোথা মা কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি",—শ্রীরাধিকার অন্তহীন বেদনায় যে সাধক কবি আপনার বিপুল ব্যথাকে অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন,—'বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, চাহিব কোন্ দিকে' ?—তাঁহারই ধ্যানদৃষ্টিতে প্রকট হইয়াছিল ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনীবঙ্গ-জননীর দীনা শ্রীহীনা মূর্ত্তি! তিনি দেখিয়াছিলেন, বাংলার মন্দিরে মন্দিরে ভগ্নস্তূপ, শিলাখণ্ডে বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের নিদর্শন আছে, কিন্তু বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত। তাই এই আত্মবিস্মৃত স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট বাঙ্গালী জাতিকে আত্মসম্বুদ্ধ করিতে, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় দীক্ষিত করিতে, তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব মনীষা ও লোকোত্তর প্রতিভাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মূল প্রেরণা ও সাহিত্য-সাধনার মূল উৎস ছিল—এই পদচিহ্ন-দর্শন।

বঙ্কিমের এই পদচিহ্ন-দর্শন শুধু একটি দৃষ্টিভঙ্গি নয়, ইহা দৈব নির্দ্দেশ! আচার্য্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় একদিন গভীর ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন—

'কপিলদেবপ্রিয়া ন্যায়শাস্ত্র-প্রসূতি তন্ত্রশাস্ত্রজননী বঙ্গমাতা আর কতকাল আত্মবিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণরতা থাকিবেন ?'

ইহাই পদচিহ্ন-দর্শনের প্রথম অধ্যায়। এই অধ্যায়ের নাম বিষাদ-যোগ। কবির ভাষায় বলিতে গেলে

'দেবি'—তুমি সাশ্রুনেত্রে, অবনত শিরে,
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী!
ভগ্নস্তূপে শিলাখণ্ডে বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি অতীত কাহিনী।'

(অক্ষয়কুমার বড়াল, 'বঙ্গভূমি')

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও একদিন গভীর বেদনার সহিত বলিয়াছেন—'যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।'

'মা'কে জানিবার, চিনিবার, বুঝিবার জন্য মাতৃভক্ত সন্তানের মূলে আছে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নয়, ধর্ম্মজিজ্ঞাসাও নয়,—মাতৃ-জিজ্ঞাসা, আর এই মাতৃজিজ্ঞাসার মূলে আছে আত্ম-জিজ্ঞাসা। যে মাকে চেনে না, সে নিজেকে চিনিবে কেমন করিয়া ?

সুতরাং এই 'পদচিহ্ন-দর্শন' ও 'বঙ্গদর্শন' একই বস্তু। 'বঙ্গদর্শন' স্থূল চোখে নয়, ত্রিকালদর্শী ঋষির দৃষ্টিতে,—যে দৃষ্টিতে অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত এক সঙ্গে ধরা পড়ে। সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী, অন্ধকার-সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী কালী ও বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী দশভুজার মধ্যে বঙ্গজননীর ত্রিমূর্ত্তি-দর্শন—ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরই দিব্যদর্শন।

এই 'পদচিহ্ন-দর্শনের' প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন—গৌরবময় অতীতের উপর অধিকতর গৌরবময় ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা। সাধনা—ভক্তি অর্থাৎ দেশমাতৃকায় পরমা অনুরক্তি। ফল—সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন।

এই সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে । এইজন্য 'কৃষ্ণ-চরিত্র'কে অনুশীলন বা ধর্ম্মতত্ত্বের 'শারীরক ভাষ্য' বলা হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানা উপন্যাসে শ্রীকৃষ্ণ-কথিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আদর্শ ব্যাখ্যাত। বাংলা দেশের একজন মনীষী* এই গ্রন্থত্রয়কে বলিয়াছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী'। 'ত্রয়ী' নামটির একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। বেদপাঠে অধিকারের মূলে আছে বৈদিকী দীক্ষা। এই ত্রয়ীতে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইলেও সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক তান্ত্রিকী দীক্ষা। এই দীক্ষার ফলে হয় মৃণ্ময়ী বঙ্গজননীর মধ্যে চিন্ময়ী জগজ্জননীর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। যে মন্ত্রের ধ্যানে এই দিব্যানুভূতি লাভ হয়, উহাই স্বয়ংপ্রকাশ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র! মন্ত্রসিদ্ধির মূলে আছে মন্ত্রার্থ-চিন্তন।

তাই বলিতেছিলাম, এই পদচিহ্ন-দর্শনের মূলে আছে দৈবী প্রেরণা। ঐতিহাসিকের গবেষণা, নৈয়ায়িকের সূক্ষ্ম বিচার, বৈজ্ঞানিকের সত্যানুসন্ধিৎসা, পণ্ডিতের বহুশ্রুতত্ব সকলই এখানে ব্যর্থ। আমাদের দেশের ঋষি আত্মদর্শন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'আত্মাকে মেধার দ্বারা লাভ করা যায় না, পাণ্ডিত্যের বা তর্কযুক্তির দ্বারাও লাভ করা যায় না। আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই আত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনিই আত্ম-দর্শনের অধিকারী হন, তাঁহার নিকটেই আত্মা আপনার স্বরূপ প্রকাশিত করেন'। বঙ্কিমচন্দ্রের এই দিব্য দর্শন সম্বন্ধেও আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়—দেশমাতৃকা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই এই পরমা দৃষ্টি লাভ করেন, তাঁহার নিকটই এই সর্ব্বার্থসাধিকা দেবী আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

* পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

দশ

একদিন সকালে ব'সে খবরের কাগজ প'ড়ছে বিকাশ, এখন সে কাগজে খেলার খবর ছাড়া বাজারদরগুলোও পড়ে—কিন্তু তার বেশী নয়, তার সামনে এসে দাঁড়াল সুবোধ।

তাকে চেনা যায় না।

সেই সৌখীন বাবু সুবোধ কি এই? আধময়লা একখানা ধুতি, হাতকাটা একটা জামা, এলোমেলো চুল, না-কামান খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পায় এক জোড়া ধূলিমলিন নাগরা জুতো—একে দেখে কে বলবে যে এক বছর আগে এই ছিল তাদের হষ্টেলের প্রসিদ্ধ বাবু—যার প্রসাধনে রোজ লাগতো এক ঘণ্টা, আর সত্য যার খেদমৎ ক'রতে সারাদিন হন্ত দন্ত হ'য়ে বেড়াত।

বিকাশ উঠে এগিয়ে বললে, "আসুন সুবোধদা! কি ব্যাপার? কবে এলেন রাজসাহী থেকে?"

সুবোধ একটা চেয়ারে ব'সে পকেট থেকে বের ক'রলে দেশলাই এবং বিড়ি!

আরও চমকে উঠলো বিকাশ—সুবোধ খায় বিড়ি! হষ্টেলে থাকতে যখন তার নিজের রোজগার ছিল না এক পয়সা, তখন সে খেতো দামী সিগারেট আর বালাখানার শ্রেষ্ঠ তামাক। এখন সে পুলিসের ডেপুটী-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—সে খায় বিড়ি!

বিড়ি ধরিয়ে সুবোধ বললে, "রাজসাহী থেকে এসেছি অনেক দিন—আমার খবর জান না? কাগজে পড় নি?"

কাগজে আবার বিকাশ কবে কি প'ড়ে থাকে? সে বললে "না ভাই, কি হ'য়েছে?"

"বিশেষ কিছু নয়, চাকরীটা গেছে।"

চমকে উঠলো বিকাশ—এ খবরটায়ও বটে, আর এত বড় একটা নিদারুণ খবর ব'লতে সুবোধের এমন নির্লিপ্ত ভাব দেখে ততোধিক!

সে বললে, "সে কী? কি হ'য়েছিল?"

"বেশী কিছু নয়, হরিপুরের হাট আর শম্ভু সা'র চালের গুদাম লুট হ'য়েছিল, তাতে আমি একটু সাহায্য ক'রেছিলাম। এই সামান্য কাজের জন্য পুলিসের লোকের চাকরী যায় শুনেছ কখনও?" ব'লে সুবোধ হাসলে।

ক্রমে সে সব কথা প্রকাশ ক'রে বললে।

"উত্তর বাঙ্গলার অনেকটা জায়গায় দারুণ বন্যা হ'য়ে লোকের যে দারুণ কষ্ট হ'য়েছে তার কতক খবর কাগজে অবিশ্যি দেখেছ। কিন্তু যা হ'য়েছে তার তুলনায় কাগজের বর্ণনা একেবারে কিছুই নয়। হাজার হাজার লোক রেলের লাইনে, পথে ঘাটে প'ড়ে আছে—বৃদ্ধ, যুবা, নারী, শিশু—তাদের ঘর নেই, বাড়ী নেই, খাবার নেই, পরবার ছেঁড়া নেকড়াও অনেকের একটি বই দুটি নেই। জল নেবে গেছে, যাদের ঘরদোর কিছু আছে, তারা সেই বিধ্বস্ত স্তূপের মধ্যে ফিরে গেছে, যাদের নেই তারা মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আছে।

বন্যার জল নেমে যাবার পর আমার উপর ভার হ'য়েছিল একটা অংশের চুরী-ডাকাতি নিবারণ করবার। চুরী-ডাকাতি হচ্ছিল কিছু, আর হবার সম্ভাবনাও ছিল বিস্তর।

হরিপুর গ্রামটা বন্যায় খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, আর সেখানকার শম্ভু সা'র গোলায় বিস্তর ধান মজুদ ছিল। অগ্নিমূল্যে ধান-চাল বেচে শম্ভু সা' প্রচুর টাকা রোজগার ক'রছিল।

পাশে একটা গাঁয় যেতে হ'য়েছিল আমার। সেখানে দেখলাম কঙ্কালসার বুভুক্ষিত নর-নারী পথের ধারে প'ড়ে যা যেখানে পাচ্ছে পেটে দিয়ে কোনও মতে জ্বালার নিবৃত্তি করেছে। তাদের অবস্থা দেখে আমার কান্না পেলো।

আমি তাদের সব কথা শুনে চটে' মটে' একটা যুবককে বল্লাম, "এত বড় জোয়ান ছোকরা, খেতে না পেয়ে হাঁউ হাঁউ ক'রে কেঁদে মরছ শুধু, কিছু ক'রতে পার না?" কাতরভাবে সে বললে, "কি ক'বব হুজুর?"

"কেন, ধান-চাল কি দেশে নেই? ঐ তো শম্ভু সা'র গোলা বোঝাই—প্রতি হাটে তো দেখি চাল ধরে না।"

"কিন্তু সে ধান কেনবার পয়সা কোথায়? ধারও তো কেউ দেয় না হুজুর।"

"তাই কী? তাই প্যান প্যান ক'রে কাঁদবে শুধু? ক্ষিদেয় পথে প'ড়ে মরবে শুধু—সামনে অত ধান চাল থাকতে। মানুষ ন'স তোরা, শক্তি নেই হাতে? লুটে নিতে পারিস না?"

"লোকগুলো এটাকে পরিহাস মনে ক'রে হাসলে। একজন হেসে বললে, "তা হ'লে আপনিই তো ধ'রে জেলে পাঠাবেন আমাদের।"

"আমি বললাম, "তা পাঠাব। এখনি শুকিয়ে পচে মরবার চেয়ে তা ভাল নয়? জেলে গিয়ে খেতে তো পাবি।"

ব'লে আমি চ'লে গেলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন একজন প্রবীণ ইন্‌স্পেক্টার, আরও সব পুলিসের লোক। ইন্‌স্পেক্টার বাবু বললেন, "এ সব কথা এদের বললেন স্যর, এতে কি অনর্থ হয় দেখুন। এরা dangerous লোক।"

আমি ঘুরে বললাম, "কী হবে? লুট হবে। তাই তো চাই। গোলা বোঝাই ধান নিয়ে মহাজন টাকা গুনবে এই এত বড় দুর্দ্দিনে, আর এরা শুকিয়ে ম'রবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কিছুই হবে না। এ লোকগুলো যদি মানুষ হ'ত তো হ'ত, এরা গরু।"

কয়েকদিনের মধ্যেই দেখলাম, আমার কথায় কাজ হ'য়েছে। পরের হাটে হরিপুরের হাট থেকে লোক এসে আমাকে খবর দিলে—হাটে ধান-চাল লুট হচ্ছে'। আমি খুসী হ'লাম যে মানুষগুলো গরু হ'য়ে যায় নি একেবারে। ছুটে গেলাম হাটে।

ইন্‌স্পেক্টর বাবুর আদেশে তখন কনেষ্টবলেরা লাঠি নিয়ে আক্রমণ ক'রছে। অপর দিকে লোকের হাতেও ক্রমে লাঠি উঁচিয়ে উঠছে দেখা গেল।

আমি গিয়ে লাঠিচাজ্জ বন্ধ ক'রে দিয়ে বললাম, 'মারধোর যদি কেউ করে তবে তাকে গ্রেপ্তার করুন, আর দু'সের চাউলের বেশী যদি কেউ নেয় তাদের ধরুন, বাদবাকী যতদূর পারেন নাম লিখে নিয়ে ছেড়ে দিন।"

ইন্‌স্পেক্টর বাবু বললেন, "আমি তা পারবো না স্যর—আমার duty—"

ইনস্পেক্টর বাবু পোষ্ট আফিসের বারান্দায় বহু কনেষ্টবল ঘেরা হয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলেন—

আমি মুখ খিঁচিয়ে বললাম, ওঃ! ভারী নিমকহালাল ডিউটি-বাজ এসেছেন! ডিউটি ক'রবে তো এখানে ব'সে আছ কেন? নিরপরাধ কনেষ্টবলদের মার খেতে না পাঠিয়ে নিজে যাও ভীড়ের মধ্যে—সাহস থাকে লড়াই করগে। ওই দেখছ এক হাজার লোক? ওরা ক্ষেপে উঠলে পঞ্চাশটা কনষ্টেবল কি করতে পারবে?' আমি সবইনস্পেক্টারকে বললাম, "যাও, আমি যা বললাম কর গে।"

আমার এ কথা দেখতে দেখতে হাটময় রটে' গেল। সব চাল লুট হয়ে গেল, শম্ভু সা'র গোলা শূন্য হ'য়ে গেল।

প্রায় একশো লোক গ্রেপ্তার ক'রে চালান দিলাম আমি। তারা হয় মারপিট করেছে, না হয় চার-পাচ সের চাল নিয়েছে প্রত্যেকে!

বলা বাহুল্য, আমার এ কীর্ত্তি চাপা রইল না। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দু'জনে ছুটে এলেন সেখানে।

আমি তাঁদের বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম যে, আমার সামান্য পুলিস ফোর্স নিয়ে আমি দাঙ্গায় এঁটে উঠতে পারবো না বলেই এরূপ ক'রেছি। এতে ক্ষতি কিছু হয় নি,—একশো লোক গ্রেপ্তার হয়েছে, আর সাতশো লোক প্রত্যেকে দু'সের ক'রে চাল নিয়ে স্বেচ্ছায় ঠিকানা লিখে দিয়ে গেছে। ইচ্ছা করলেই তাদের ধরে আনা যাবে যে কোন দিন!"

ইনস্পেক্টারবাবু আমার উপর রাগে ফুলছিলেন। তিনি আমার সব কীর্ত্তিকাহিনী বেশ ফয়লাও ক'রে প্রকাশ করে দিলেন। আমিই যে উত্তেজনা দিয়ে এই লুটটা করিয়েছি সে কথা তিনি বিস্তর অতিরঞ্জন ক'রে বললেন।

বাঙালী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোরতর অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে বললেন যে, আমার বিরুদ্ধে শুধু ডিপার্টমেণ্টাল নয়, ফৌজদারী প্রসিডিংও হবে।

আমি শান্তভাবে বললাম, "আমি তার জন্য প্রস্তুত।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রক্ত হ'য়ে গেল বিশেষ গরম, সে বললে, "you're a rebel, a Gandhi-ite swine!"

আমার মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেল, আমি বললাম, "shut up you son of a bitch"

"সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তেড়ে এলো"—

সুবোধ হো হো ক'রে হেসে বললে, "ওই আধবুড়ো ভুঁড়িয়ালাটা তেড়ে মারতে এলো কি না সুবোধ চাটুজ্জেকে, স্পর্দ্ধা ভেবে দেখ ভাই!"

"তার ঘুসি ঠেকিয়ে তাকে শক্ত গোটা তিনেক লাগাতেই বাছাধন রক্তাক্ত হ'য়ে লুটিয়ে প'ড়লেন মাটিতে।"

"তারপর কিন্তু ফৌজদারী আর গড়াল না। ডিপার্টমেণ্টাল এনকোয়ারীর ফল যা হবে তা জানি, কাজেই তার আগেই আমি রিজাইন করলাম। কিন্তু তাতে ওরা মানলে না। আমাকে সসপেণ্ড ক'রে এনকোয়ারী চালালে। আমার কাছে চিঠির পর চিঠি আসতে লাগলো, চার্জ্জ দিয়ে, explanation চেয়ে, তাগিদ দিয়ে—আমি সেগুলো সব টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললাম, হাজিরও হ'লাম না। তার পর কর্ত্তারা আমাকে ডিসমিস ক'রে শান্ত হলেন।"

সমস্ত কাহিনী শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়েছিল বিকাশ। তার চোখে সুবোধ হঠাৎ একটা মহীয়ান্ বীরশ্রেষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। সে চক্ষুময় হয়ে চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে। সে বললে অবশেষে, "এখন কি করছেন তা' হ'লে?"

"সেইখানেই কাজ করছি। আমার সেই কীর্ত্তির কয়েকদিন পরই দেখলাম এখান থেকে 'সঙ্কট ত্রাণ' করবার কাজ নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি উৎসাহী যুবক গিয়ে সেখানে নামলেন। তাঁদের দলে ভিড়ে গেলাম। সেই থেকে তাদের সঙ্গে কাজ করছি।"

বিকাশ চোখ দু'টো আরও বড় করে চেয়ে রইল সুবোধের দিকে; একবার শুধু জিজ্ঞেস করলে, "তারপর আপনার স্ত্রীর কি ব্যবস্থা করছেন?"

সুবোধ বললে, "সেটা এখনও ঠিক করিনি। সে এখন দাদার কাছে আছে। এখনকার কাজ তো শেষ হোক, তারপর ভেবে-চিন্তে দেখা যাবে।"

নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইল শুধু বিকাশ।

সুবোধ তারপর বললে, "এখন কাজের কথা বলি, যার জন্য তোমার কাছে এসেছি! আমি এসেছি আমাদের কাজের জন্যে কিছু টাকা তুলতে। হাজার দশেক টাকা আমি নিয়ে যাব এই আমার প্রতিজ্ঞা। তোমার তাতে সাহায্য করতে হবে তিন প্রকারে। চাঁদা দিতে হবে, চাঁদা তুলতে হবে, আর খেলতে হবে।"

বিস্মিত হয়ে বিকাশ বললে, "খেলতে হবে মানে?"

"আমি আই, এফ-এর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে গোটা দুই এক্সিবিসন ম্যাচের বন্দোবস্ত করেছি। তাতে তোমার খেলতে হবে।"

বিকাশ বললে, "বেশ, খেলব, আর একটা চাঁদার বই আমার কাছে রেখে যান, যতদূর পারি টাকা তুলতে চেষ্টা করব।"

হেসে সুবোধ বললে, "আর নিজের চাঁদা?"

বিকাশ শুষ্কমুখে বললে শুধু, "দেব। এক সঙ্গেই সব দেব।"

সুবোধ চলে গেল। অনেকক্ষণ তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল বিকাশ।

একটা কথা তার মাথার ভেতর ঝন্ ঝন্ করে বাজতে লাগল —"সখের দরদী!"

হাঁ, এ কথা বিকাশকে সুবোধের বলবার অধিকার ছিল।

সুবোধের প্রাণে যখন দরদ জেগে উঠল, দরিদ্র বন্যাপীড়িতদের জন্যে, তখন সে তার দরদকে শুধু বাক্যে বা তর্কে পর্য্যবসিত হতে দেয় নি। সে করেছে কাজ। আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছে সে সেই কাজে।

আর বিকাশ!—দশ হাজার টাকা মাত্র চাই আজ, তার জন্যে সুবোধ আজ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। সে দশ হাজার টাকা বিকাশ একাই দিতে পারত! পারেনি। দেবার প্রতিশ্রুতিও দিতে পারেনি। কেন না, ওই দরিদ্র, ক্ষুধিত, গৃহহারাদের জন্য তার সে দরদ নেই। সুবোধ তার স্ত্রীর কথাও ভাবেনি,

তাকেও ভাসিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। বিকাশের স্ত্রী নেই, বাপ, মা বা নিকট আত্মীয় বলতে গেলে কেউ নেই, তবু সে পারে না সুবোধের মত সর্ব্বস্ব বিলিয়ে আর্ত্তের সেবা করতে। কেন না, তার মাসীমা আছেন, তার পরিজন আছেন, তাদের অজস্র বাহুল্য খরচ সে কমাতেও পারে না।

নিজেকে তার একটা কেঁচোর মত মনে হল সুবোধের এই মহীয়ান্ আত্মত্যাগী আদর্শের পাশে। মনটা তার ভারী অবসন্ন হয়ে গেল।

মনে পড়ল তার সেদিনকার প্রতিজ্ঞার কথা। নিজের জন্য সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র রেখে তার যথাসর্ব্বস্ব দরিদ্রের সেবার জন্য বিলিয়ে দেবার যে সঙ্কল্প সে করেছিল, সে শুধু কল্পনাই রয়ে গেল। তারপর অনেক টাকা সে রোজগার করেছে। সবই সে খরচ করেছে, কিন্তু দরিদ্রের সেবায় নয়। সম্পন্নের বিলাস ও খেয়াল মেটাবার জন্যে।

এখনও সে ভেবে দেখলে—পারে না সে সুবোধের মত আত্মত্যাগী হয়ে তার সর্ব্বস্ব দিয়ে দরিদ্রের সেবা করতে। মেসোম'শায়ের স্মৃতি, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর বিষাদভরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখখানি তার পথ আগলে বসে আছে। মাসীমার প্রতি অত্যুগ্র কর্ত্তব্যবোধ তাকে বেঁধে ফেলেছে। তাঁকে সে যে আশ্বাস দিয়ে তার ঘাড়ে নিয়ে এসেছে, সে আশ্বাস, সে প্রতিশ্রুতি সে ভাঙ্গতে পারে না। একি শুধু কর্ত্তব্যবোধ না কাপুরুষতা? এই কি তার কর্ত্তব্য? তার মনে পড়ল হিতোপদেশের কথা

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরোগস্য কিমৌষধৈঃ॥"

কর্ত্তব্য তার কোন্‌খানে? কোন প্রতিশ্রুতি তার বড়, সে কথা নির্ণয় করতে তার কষ্ট হল না। কিন্তু সেই কর্ত্তব্য করবার শক্তি বা সাহস তার নেই।

সুবোধ ঠিক বলেছিল। সে সখের দরদী, সে হাম্বাগ।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে উঠল। আপিসে গিয়ে সে তার কাজ ক'রে গেল অন্যমনস্ক ভাবে। বিকেলের দিকে যতীন বাবু এলেন তার কাছে। অন্য কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে সে যতীনবাবুকে বললে, "দু' হাজার টাকা ধার দিতে পারেন আমাকে?"

যতীনবাবু বললেন, "পারব না কেন? কিন্তু হঠাৎ আজই আপনার টাকার দরকার হল কিসে? কি মতলব করেছেন শুনি? আর যাই করুন, এখন আর ফাটকার বাজারে যাবেন না, অতি লোভে শেষে তাঁতী নষ্ট হবে।"

হেসে বিকাশ বললে, "না, ফাটকা খেলব না। অন্য কাজ আছে।"

যতীন বাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আপিস ফেরবার পথেই সুবোধকে তা পৌঁছে দিয়ে তার মনটা একটু সুস্থির হল।

তারপর সুবোধের হয়ে তিন দিন উপরো উপরি তিনটে ম্যাচ খেলে আর হাজার তিনেক টাকা চাঁদা আদায় করে দিয়ে সে তার অনুতপ্ত চিত্তকে কতকটা সুস্থ করলে।

বিকাশের কাছে টাকাগুলো পেয়ে সুবোধ উল্লসিত হয়ে বললে, "বাঃ grand! বাহাদুর তুমি। তুমি একাই পাঁচ হাজার টাকা দিলে আমায়। এ না হলে দশহাজার টাকা তুলতে আমার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যেত। তুমি wonderful!"

বিকাশ আন্তরিক লজ্জার সহিত বললে, "ও কথা আপনি আমায় বলে লজ্জা দেবেন না সুবোধ দা। এমনিই লজ্জায় মরে যাচ্ছি। এর চেয়ে ঢের বেশী করা আমার উচিত ছিল।"

সুবোধ বললে, "তুমি জান না তুমি কতবড় বাহাদুর। আমি সেটা জানতে পেরেছি সম্প্রতি, অনেক মোটা মোটা পেটওয়ালা পুরাণো বন্ধুদের কাছে ঘোরাফেরা করেছি। তাদের এক একজনের কাছে দু'শো টাকার চেক বের করতে আমার মুখে রক্ত উঠে গেছে! আর তুমি একেবারে দিয়ে দিলে দু' হাজার টাকা। কিই বা রোজগার তোমার।"

সুবোধের প্রশংসা ও সমাদরে তার মনের গ্লানি অনেকটা মিটে গেল। অনেকটা আত্মপ্রসাদও সে লাভ করল। শেষে সুবোধ বললে, "মনে রেখো ভাই। এই টাকা পেয়ে আমি তোমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ—grateful—

হাত জোড় করে বিকাশ বললে, "ও কথা বলে আর আমায় লজ্জা দেবেন না।"

"না না লজ্জা দেবার জন্য ও কথা বলছি না। কৃতজ্ঞতা—gratitude কথাটার definition জান? Gratitude is a lively sense of benefits to come. কাজেই বুঝতে পারছ আমার কৃতজ্ঞতার মানে। ভবিষ্যতের অনেক আশা রাখি, এর পরে যখন দরকার হবে, হাত পাতব তোমারই কাছে।" বলে সে হেসে উঠল।

বিকাশও হেসে বললে, "আমি সেটা আমার অধিকার বলেই দাবী করব।"

এর পর সে যখন বাড়ী ফিরল তখন তার মনটা খুব হাল্কা—উল্লসিত।

পথে চলতে চলতে সে তখন কল্পনা করতে লাগলো অনেক কিছু! আরও কত টাকা সে দেবে সুবোধকে—কত সে চিরদিন ব্যয় করবে দরিদ্রের সেবায়, তার কল্পনায় বিভোর হ'য়ে বিকাশ বাড়ী ফিরলো। [ক্রমশঃ

গান

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

শঙ্খনাদ দ্বারে মুক্তি উচ্চারে,
পূরবে জলে নব ভাতি!
ক্লান্ত পায় প্রাণ, অন্ন দীনে দান,
সত্য, ঈশ্বর পথের সাথী!

মরু-মেরুর পারে সাগরে কান্তারে
জীবন করে জয় মরণে মাতি!
পুরুষ পাশে নারী আসে কলুষহারী
মুক্ত-ধারা যেন গঙ্গা!

সবার জঞ্জালে বহায় কঙ্কালে
জীবনী-শোণিত সুধা-তরঙ্গা!
বিঘ্ন নাহি মানে, শঙ্কা নাহি জানে,
উঠেছে মহাদেশ একটী হ'য়ে জাতি!

ভারতচন্দ্রের কাব্যে রঙ্গরস

শ্রীকালিদাস রায়

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া অঞ্চলের লোকেরা চিরকালই রঙ্গপ্রিয়—বিশেষতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাই ছিল বঙ্গভূমির মধ্যে রঙ্গরসের রঙ্গভূমি। ভাঁড়-বিদূষকের দল সভাটিকে [illegible] করিয়া রাখিত। এই সভার কবি ভারতচন্দ্রও প্রধানতঃ রঙ্গরসের কবি ছিলেন। তাঁহার লেখনীতে করুণ রসের চিত্র তেমন ফুটিত না। তিনি যখনই সুযোগ পাইয়াছেন তখনি একটু রঙ্গলীলা করিয়া লইয়াছেন। অন্নদামঙ্গলে তিনি গোড়া হইতেই শিবকে পাইয়াছেন। শিবের আচরণ লইয়া রঙ্গলীলা দেখানোর পদ্ধতি সাহিত্যে আগে হইতেই প্রচলিত ছিল।

শিব বিবাহ করিতে গিয়াছেন। পরণে বাঘের ছাল সাপ দিয়া বাঁধা। 'কেশব কৌতুকী বড়' কৌতুক দেখিবার জন্য কেশব গরুড়কে ইঙ্গিত করিলেন, অমনি গরুড়ের ভীতিপ্রদর্শনে সাপগুলি শিবদেহ ছাড়িয়া পলাইল। শিবের বাঘছাল খসিয়া পড়িল—শিব হইলেন দিগম্বর! শাশুড়ী মেনকা ও এয়োরা লজ্জায় প্রদীপ নিভাইয়া দিল। 'দেখিয়া সকল লোক মশাল নিবায়।'

কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হইল না—'শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়।' *
নারদ সাহস পাইয়া এখন কৌতুকের মাত্রা বাড়াইবার জন্য কোন্দল বাধাইবার উদ্দেশ্যে নখে নখে ঘষিতে লাগিল। 'এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়।"—কাজেই এ লোভ কি সংবরণ করা যায়? নারদ ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

অনাদি-নিধন শিব শুধু অমর নহেন—তিনি অজরও। কবি রঙ্গরস-সৃষ্টির জন্য তাঁহাকে করিয়াছেন বুড়া।

আমার উমার দন্ত মুকুতা-গঞ্জন,
বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন।
উমার বদনচাঁদে পরকাশে রাকা,
বুড়ার বিকট মুখে দাড়িগোঁপ পাকা।

এ সমস্ত রঙ্গরস জমাইবার তৎকালসুলভ চেষ্টা।

উমাকে পাইয়া শিবের আনন্দের অবধি নাই। শিবের বিবাহের বৌ-ভাত্ত ভাত দিয়া হইবে না—হইবে সিদ্ধি দিয়া। সতী দেহত্যাগ করার পর শিব আর সিদ্ধি খান নাই। তিনি নন্দীকে আদেশ দিলেন—'অন্ন করি সিদ্ধি লহ মণ লক্ষ বারো। ধুতুরার ফল তায় যত দিতে পার।—ভৃঙ্গী মহাকাল ভূত ভৈরবাদি যত। সকলে প্রসাদ পাবে ঘোঁট তারি মত।" বিশ্বকর্মা এই বিবাহে নূতন ঘোটনা-কুঁড়া যৌতুক দিয়াছেন। তাহাতেই সিদ্ধি ঘোঁটা হইল। কিন্তু শেষে মুশকিল হইল—"বস্ত্র বিনা ব্যস্ত হৈলা ছাঁকিয়েন কিসে?" বাঘছালে ত আর ছাঁকা যায় না।

অভাবের সংসারে বাংলা দেশে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন্দল লাগিয়াই আছে। কবি এই লৌকিক ধারা অবলম্বন করিয়া নারদের সাহায্য না লইয়াও হরগৌরীর মধ্যে কোন্দল বাধাইয়া দিয়া করতালি দিয়াছেন। গৌরী বলিতেছেন—

গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি [illegible]।
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি।
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধিলাড়ু।
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ।
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে।

ঘরে অন্ন নাই, গণেশ গজ বদনে চারি হাতে খায়, কার্ত্তিক ছয় মুখে খায়, কেমন করিয়া শিবের মুখে গৌরী অন্ন যোগান। গৌরীর টিটকারিতে শিব রাগ করিয়া বাহির হইলেন। শিবের বাণিজ্য নাই, চাষ নাই, রাজসেবা তিনি জানেন না। তাঁহার সম্বল ভিক্ষা। বৃদ্ধকাল আপনার, নাহি জানি রোজগার, চাষবাস বাণিজ্য-ব্যাপার। সকলে নির্গুণ কয়, ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়, নাম মাত্র রহিয়াছে সার। শিব রাগ করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন। পাগলা ভোলাকে লইয়া পথের রঙ্গচিঙ্গারা রঙ্গ করিতে লাগিল—

কেহ বলে অই এল শিববুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল।
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও।
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই-মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া।
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল-ফল।
কেহ দেয় ভাঙ-পোস্ত আফিঙ্গ গরল।

কিন্তু কেহই এক মুঠা অন্ন দেয় না। কোথা হইতে দিবে? ভবানী শিবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশ্বের সমস্ত অন্ন সংহরণ করিয়াছেন। লক্ষ্মীর ঘরেও অন্ন নাই। শিব তখন বলিলেন—

গুমান হইল গুঁড়া, না মিলিল ক্ষুদ-কুঁড়া
ফিরিনু সকল পাড়াপাড়া,
হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়,
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া।
কত সাপ আছে গায়, হাভাতেরে নাহি খায়,
গলে বিষ সেহ নাহি বধে।
কপালে অনল জ্বলে, দেহ না পোড়ায় বলে,
না জানি মরিব কি ঔষধে।

অন্নপূর্ণার মহিমা কীর্ত্তনের জন্যই শিবের এই বিড়ম্বনার সৃষ্টি করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু—অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে'—এই ব্যাপার লইয়া কবি যথেষ্ট রঙ্গ-রসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

শিবের পালা শেষ করিয়া কবি ব্যাসকে লইয়া পড়িয়াছেন।

---

* বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গলে ব্যাপারটা আরো কুরুচিকর করিয়া লিখিয়াছেন;

হাসি বলে শূলপাণি আইয়ো ভাগিতে আমি জানি
মধ্যে দাঁড়াইব লংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠাম আয়োর উড়িবে প্রাণ
লজ্জা পাইয়া সবে যাবে ঘরে।

ব্যাসের যে রূপবর্ণনার দ্বারা কবি ব্যাসের কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতেই রঙ্গের ইঙ্গিত আছে—

দাঁড়াইলে জটাভার, চরণে লুটায় তাঁর, কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু,
পাকা গোঁপ পাকা দাড়ি, পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি, চলনে
কতেক আঁটুবাঁটু।
কপালে চড়ক ফোঁটা, গলে উপবীত মোটা, বাহুমূলে শঙ্খ-চক্র রেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা, কলিযুগ-বাঘ-থাবা, সারি সারি
হরিনাম লেখা।

ব্যাস বড়ই হরিভক্ত—কাশীতে আসিয়া সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়ান। হরি ছাড়া উপাস্য আর কেহ নাই—ইহাই প্রচার করেন। সেই সঙ্গে শিবের নিন্দা করেন—তাহার ফলে "ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল।" বিষ্ণু আসিয়া বুঝাইয়া গেলেন—"শিব পূজা না করিলে মোর পূজা নয়।" বিষ্ণুর কৃপায় শিব কণ্ঠস্বর ফিরিয়া পাইলেন। এইবার ব্যাস হইলেন—পরম শৈব। আর হরির নামও করেন না। "ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হোক পরিণাম। অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম।" শিব ব্যাসের ভেদজ্ঞানে বিরক্ত হইয়া তাহার অন্ন বন্ধ করিয়া দিলেন। বুড়াকে সকলেই ভিক্ষা দিতে আসে—কিন্তু 'হাত হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায়।' তিন দিন ধরিয়া বুড়া উপবাস করিয়া রহিল। কাশীতে ভিক্ষা না পাইয়া ব্যাস অভিশাপ দিয়া চলিয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা দেখিলেন—ব্যাস অভিশাপ দিয়া চলিয়া যায়—তিনি কাশীতে থাকিতে বুড়া ব্যাস অন্নাভাবে মারা যায়। তখন তিনি মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া গৃহলক্ষ্মীরূপে ব্যাসকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। শিব বৃদ্ধ স্বামিরূপে গৃহে ছিলেন। তাঁহার সহিত ব্যাসের বিতর্ক হইল। তাহার ফলে শিব আত্ম-প্রকাশ করিয়া ব্যাসকে তর্জ্জন করিয়া কাশী হইতে দূর করিয়া দিলেন। ব্যাস শিবের উপরও চটিয়া গেলেন। তিনি হরিহর দুইজনকেই ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার উপাসনার সঙ্কল্প করিলেন এবং নূতন কাশী রচনার জন্য উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু গঙ্গা না হইলে ত' কাশী হয় না। ব্যাস গঙ্গার শরণ লইলেন। গঙ্গা ব্যাসকে ভর্ৎসনা করিয়া শিবনিন্দা করিতে নিষেধ করিল এবং ব্যাসের সঙ্গে যাইতে অসম্মত হইল। ব্যাস তখন গঙ্গাকে গণিকা ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি করিল।

"আমি যারে প্রকাশিনু আমি যারে বাড়াইনু সেহ মোরে
তুচ্ছ করি কহে।
মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গে প্রহার করে এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে।

ব্যাস গঙ্গার কাছে তিরস্কৃত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে স্মরণ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা শিবহীন কাশী গড়িতে চাহিল না। ব্যাস তাহাকে দূর করিয়া দিলেন। তারপর ব্যাস ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—

জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোসাঁই,
তাঁর সঙ্গে তোর বাদ ইথে আমি নাই।

ব্যাস ফাঁফরে পড়িয়া তখন অন্নপূর্ণাকে স্মরণ করিলেন। তিনি অন্নপূর্ণার কৃপার জন্য তপস্যায় বসিলেন। অন্নপূর্ণা পতি পুত্রদের পরিবেষণ করিতেছিলেন, এমন সময় ব্যাসের আহ্বানে তাঁহার ভাবান্তর হইল। একে ব্যাস শিবের সঙ্গে বাদ করিয়া নূতন কাশী রচনা করিতে চায়, তাহাতে অসময়ে আহ্বান। তিনিও ব্যাসের উপর রাগিয়া গেলেন। তারপর তিনি জরতী বেশ ধরিয়া ব্যাসকে ছলনা করিতে চলিলেন।

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী,
ডানি হাতে ভাঙ্গালড়ি বাম কক্ষে ঝুড়ি।
ঝাঁকর মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি,
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি।
ডেঙ্গুর উকুন নিকি করে ইলিবিলি,
কোটি কোটি কাণ কোটারির কিলিবিলি।
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে,
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে।
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজ ভার,
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্ম্মসার।
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল।

বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল—বল দেখি বাছা কোথা মরিলে সদ্যোমুক্তি লাভ করিব?

ব্যাস বলিলেন—"বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ি হেথা বাস কর,
সদ্যোমুক্ত হবি যদি এইখানে মর।"

ঝগড়া করিতেই বুড়ী আসিয়াছিল। সে রাগিয়া বলিল—

তোর মনে আমি বুড়ী এখনি মরিব,
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব।
উদ্বেগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত,
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত।
বায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শন নুড়ি,
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি।
শিরঃ শূলে চক্ষু গেল কুঁজা হৈল কুঁজে,
কতটা বয়স মোর যদি দেখ সুজে!
কান কোটারিতে মোর কান হৈল কালা,
কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা।

এই বলিয়া জরতী ক্রোধভরে চলিয়া যান। ব্যাসদেব ধ্যানে বসিলেন—তাঁহার ধ্যান এখন অন্নদারই ধ্যান। কাজেই জরতীকে আবার ফিরিতে হইল! আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে মরিলে কি হইবে বলিলে? ব্যাস তাঁহার কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন। বধিরতার ভান করিয়া অধীরা হইয়া জরতী চলিয়া গেলেন। কিন্তু ধ্যানের বলে আবার ফিরিতে হইল—এইরূপ বার বার ফিরিয়া জরতী একই কথা জিজ্ঞাসা করেন। ব্যাস কুপিত হইয়া বলিলেন,—"বিরক্ত করিস মাগী কিছু নাহি বোধ, ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কাণের কুহরে। গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে।" এইবার অন্নদার অভীষ্ট পূর্ণ হইল। 'তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈল অন্তর্ধান।'

এই উপাখ্যানটির মূলে গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে সত্য, কিন্তু আগাগোড়া রঙ্গরসের ভঙ্গীতেই ইহা রচিত। কোন তত্ত্বের সন্ধান না করিয়াই রঙ্গ সাহিত্য হিসাবে ইহা উপভোগ্য।

বিদ্যাসুন্দরের বহু স্থলেও কবি রঙ্গরসের অবতারণা করিয়াছেন। সুন্দরকে দেখিয়া পুরনারীরা আত্মহারা। কবি তাহাদের সম্বন্ধে রসিকতা করিয়া বলিয়াছেন—

সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কলসী খসিয়া,
ভারত কহিছে শাড়ী পরলো কসিয়া।

মালিনীর আকৃতি ও চরিত্র বর্ণনায় কবি যথেষ্ট রঙ্গরসের পরিচয় দিয়াছেন। সুন্দর মালিনীর হাবভাব দেখিয়াই তাহার চরিত্র অনুমান করিয়া লইয়াছে। সে তাই ভাবিল—

মাসী বলি সম্বোধন করি আমি আগে,
নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় জাগে।

কবি কড়ির গুণ গাহিয়া বলিয়াছেন—

কড়ি ফটকা চিড়া দই বড় নাই কড়ি বই কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়িলোভে মরে গিয়া কুলবধূ কড়ি পেলে ভুলে।

এই কড়ি রোজগারের জন্য মালিনী কত ছলনাচাতুরীর সৃষ্টি করিতেছে—বিশেষতঃ মালিনীর বেসাতি-ব্যাপারের বর্ণনা বেশ কৌতুকাবহ। এই রঙ্গচিত্রের মধ্য দিয়া হীরার চরিত্রটি চমৎকার ফুটিয়াছে। অন্যভাবে তন্ময় সুন্দরের কাছে হীরার ছলনাময় এ আচরণ কৌতুকের বস্তু।

সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি, রাঙ তামা বারি করি,
হাটে যায় বেসাতির তরে।
চলে দিয়া হাতনাড়া, পাইয়া হীরার সাড়া,
দোকানী দোকান ঢাকে ডরে।

ভাণ্ডাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট বলে শালা আলা টাকা মোর।
যদি দেখে আঁটা আঁটি কান্দিয়া ভেজায় মাটি সাধু হয়ে বেণে হয় চোর।
রাঙ তামা মেকি মেলে রাশিতে মিশায়ে ফেলে বলে বেটা নিলি বদলিয়া
কান্দি কহে কোটালেরে বাণিয়ারে ফেলে ফেরে কড়ি লয় দুহাতে গণিয়া
দর করে এক মূলে জুখে লয় দু'না তুলে ঝগড়ায় ঝড়ের আকার।
পণে বুড়ি নিরূপণ কাহনেতে চারিপণ টাকাটায় সিকার স্বীকার।
এরূপে করিয়া হাট ঘরে গিয়া আর নাট বাঁকা মুখে কথা কয় চোখা
সুন্দর ওজান বোঝা তবু নহে মুখ সোজা যাবত না চোকে লেখা জোখা।
দিয়াছে যে কড়ি তার দ্বিগুণ শুনায় তার সুন্দর রাখিতে নারে হাসি।
ভারত হাসিয়া কয় এই যে উচিত হয় বুনিপোর উপযুক্ত মাসী।

বিদ্যা ও মালিনীর কথোপকথনে ও রঙ্গরসের ছড়াছড়ি। বাহুল্য ভয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল না।

সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শনের মধ্যে কৌতুকের অপপ্রয়োগই আছে। কোটালের নারীবেশ ধারণ এবং চাতুরী করিয়া সুন্দরকে ধরিয়া ফেলার বর্ণনায় কবি যথেষ্ট রসিকতা দেখাইয়াছেন। এখানে রসিকতা বেশ সুরুচিসম্মত হয় নাই। পুরনারীগণের পতিনিন্দা আগাগোড়া কৌতুক রসেরই রচনা। সেকালে হাস্যরস পুষ্টির সব চেয়ে বড় উপাদান ছিল অশ্লীল ইঙ্গিত। ইহাতে তাহার অভাব নাই। দোয়াত কলম সারস্বত সাধনার অঙ্গ। ইহা আমাদের কাছে পবিত্র দ্রব্য। এই দোয়াত কলম লইয়া নোংরা রসিকতা এ যুগের কোন পাঠক সহ্য করিবে কি?

* * * *

মানসিংহ ভবানন্দের অতিথি হইলেন। দারুণ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মানসিংহের সঙ্গের লোকেরা বড় বিপদে পড়িল। কবি ইহাতে রঙ্গরসের অবসর পাইলেন। তিনি তাহাতে আমোদ পাইয়া লিখিলেন—

ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার,
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার।
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার,
তল গেল মাল মাত্তা উরুদু বাজার।
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে,
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হা ভাসে।
কাঁদি কহে ঘেসেড়ানী হায়রে গোসাঁই,
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই।
বৎসর পনেরো ষোল বয়স আমার,
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার।
হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আসিয়া,
অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া।
ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি,
কালোয়াত ভাসিল লাউ বুকে ধরি।

পাতশার সঙ্গে ভবানন্দের তর্কবিতর্ক হিন্দুমুসলমানের আচার আচরণ লইয়া রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। দাস্যবাপুর আক্ষেপও তাহাই। দিল্লীতে ভূতের উপদ্রব ঘটাইয়া কবি কৌতুক অনুভব করিয়াছেন।

ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত,
বিবি লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত।
অরেরে খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত,
ও তোর মাতারি তুই উগারি যে পুত।
কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়,
ফতমা বিবির আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড়।
যুবতী সহেলী বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে,
বেহোঁস হইয়া তারা হাত পা আছাড়ে।

ইত্যাদি বর্ণনার দ্বারা কবি বিবিদের দুর্গতির কথা বলিয়া খুবই আনন্দ পাইয়াছেন। ফারসী শব্দের বহুল প্রয়োগের দ্বারা কবি রস জমাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ভবানন্দ দিল্লী হইতে রাজত্বের ফারমান লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। কাহার ঘরে আগে যাইবেন—তাহা লইয়া দুই রাণী সতীনে কলহ। ইহাতে রঙ্গরস প্রচুর। কবি বলিয়াছেন—

দু' সতিনে কন্দল নইলে রস নহে,
দোষ গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে।

বড় রাণী চন্দ্রমুখী আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে—

তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে,
আটে পাঠে দড় সেই সেই দড় হবে।
দড় বেলা জানিয়াছ কত ঠাট করি,
ধরিতে না হইত প্রভু আনিতেন ধরি।
তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া,
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া।
সুয়া যদি নিম দেয় সেই হয় চিনি,
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি।

*   *   *   *

ভারত চন্দ্রের বেপরোয়া উপমায় হিন্দুর পরম পুণ্যকর্ম্ম যজ্ঞাহুতির যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহার তুলনায় দোয়াত কলমের অদৃষ্ট ভালো।

পুরনারীদের পতিনিন্দায় ভারতচন্দ্র নিজের সহযোগী রাজ-কর্ম্মচারীদের লইয়াই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বোধ হয় এই অংশ বারবার শুনিতেন। দুই-একটি দৃষ্টান্ত তুলিয়া দেখাই—

একজন রামা বলিতেছে—

রাজ সভাসদ্ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে,
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে।
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ,
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উত্থন।
চতুর্ম্মুখ খাইতে বলে শুনে দুখ পায়,
বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের মাথায়।
আর নারী বলে সই এত শুনি ভালো,
ঘড়েল পতির জ্বালে আমি হৈনু কালো।
রাত্রিদিন আটপর ঘড়ি পিটে মরে,
তার ঘড়ি কে বাজায় তল্লাস না করে।
রাতি নাহি পোহাইতে দু ঘড়ি বাজায়,
আপনি না পারে আরো বঁধুকে খেদায়।'

কবি নিজেকেও এই পরিহাস হইতে রেহাই দেন নাই। তিনি যে কামশাস্ত্রবিদ্ কবিটির কথা এখানে বলিয়াছেন—সে কবি তিনি নিজে ছাড়া আর কেহ নয়।

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে,
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে।
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে,
চালে খড় রাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে।
কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার,
কত মতে করে রতি বলিহারি তার।
শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ী না পড়িনু কভু,
কেবল কাব্যের গুণে বিহারেন প্রভু।

সেকালের রঙ্গরসিকতা এইরূপই ছিল। বর্ত্তমান যুগের মার্জ্জিত রুচি প্রবৃত্তির পক্ষে রস উপভোগ করা দূরে থাকুক, এ সমস্ত সহ্য করাই কঠিন। সে যুগের পাঠকদের বিচারে এই সমস্তই প্রথম শ্রেণীর রস-সাহিত্য।

অনিশ্চিত (গল্প)

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

অন্ধকার প্রান্তর মধ্য পথে ট্রেণ ছুটিয়া চলিয়াছে!—শীতের রাত্রি—সমস্ত জানালা বন্ধ, তথাপি একটা জানালা খুলিয়া দিলাম, নিঃসঙ্গতার চেয়ে নৈশ হিম ভাল। মুক্তপথে আলোর রেখা অন্ধকার প্রান্তরে বিদ্যুতের মত দ্রুত গতিতে ছুটিতে লাগিল।

বৃহৎ কামরাটায় দুর্ভাগ্যক্রমে আমি একা, পাশের কামরায় অভিভাবক আছেন।—কিন্তু যত রাত্রি বাড়ে ভয়ও বাড়ে—আগ্রহভরে অপেক্ষায় আছি, যদি কেহ আসে। দূরবর্ত্তী ষ্টেশনের আলো দেখিলে উৎসাহ করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি, লোকজন দেখিলে সাহস হয় কিন্তু কেহ এগাড়ীর দিকে আসে না। যাত্রী-সংখ্যাও বড় কম! বোধ হয় শীতের জন্য।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা, জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম!

কিছুক্ষণ পরে একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল, তখন রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া আছি, সুতরাং জানালা খুলিলাম না—নিষ্ফল প্রতীক্ষায় কোন লাভ? নিশ্চয় আজ রাত্রি সমস্ত ভদ্র মহিলা ধর্ম্মঘট করিয়াছে—কেহই ঘরের বাহির হইবে না।

হঠাৎ সজোরে দুয়ার খুলিয়া গেল, একটি রীতিমত যাত্রীদল, অনেক লোকজন, মালপত্র, গোলমাল, কতক গাড়ীর ভিতরে উঠিল, কতক গেল পাশের কামরায়।

একজনের জন্যে অপেক্ষায় ছিলাম—উঠিলেন পাঁচজন। একটি বধূ, দুইজন প্রবীণা, দুইটী অর্দ্ধ বয়সী ঝি।

মাঝের বেঞ্চিটায় আমি ছিলাম। সম্মুখের বেঞ্চে বধূটি বসিল, পিছনের বেঞ্চে গৃহিণী দুইজন। সঙ্গের দুইটা ভদ্রলোকও গাড়ীতে উঠিয়াছিল—প্রতি বেঞ্চে সযত্নে বিছানা পাতিয়া দিয়াছে,—বাক্স, ডেস্ক, ঝুড়ি চাঙারী—কতক উপরের বাকে এবং কতক বেঞ্চের তলায় রাখিয়া দিল, চারিদিক একবার বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিল, হিসাব মিলাইয়া শেষে কুলী বিদায় করিয়া নিজেরা নামিয়া গেল।

তখন উঠিল আর একজন, হ্যাঁ ভদ্রলোক বটে!—দামী ভদ্রলোক, যেমন বেশভূষা তেমনি চেহারা—সম্ভ্রান্ত ধনী বটে। পিছনের বেঞ্চের পাশে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা, আর কিছু দরকার আছে, তোমাদের?"

পিসীমা উত্তর দিলেন, "না।"

"সরকার দেখে যাবে সব ষ্টেশনে, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও ভোর অবধি; মার কৌটোটা ঠিক আছে তো?"

"আঃ অবু, ঠাণ্ডা লাগাস নি যা।"

ভদ্রলোক আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিল, বৌকে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কিছু?"

অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে প্রায় অস্ফুটস্বরে জবাব হইল, 'না!'

"পানের ডিবেটা দাও না"—

বৌ মাথা হেঁট করিয়া বেঞ্চের তলা হইতে একটি চতুষ্কোণ হ্যাণ্ডেল দেওয়া সবুজে রংয়ের বেতের সাজি টানিয়া বাহির করিল, তার ভেতর হইতে একটা বড় রূপার ডিবা লইয়া হাত বাড়াইল, ভদ্রলোক সেটি লইয়া নামিয়া গেল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল! চুপ করিয়া বসিয়া নবাগত সঙ্গীদিগকে দেখিতেছি।—ইহারা যেন ট্রেণের যাত্রী নয়—এ যেন ঠিক ঘর সংসার। এত জিনিস-পত্র সঙ্গে বহিয়া যাতায়াত করে? লম্বা বেঞ্চিটায় মা পিসীমার দুইটি বিছানা সতরঞ্চির উপরে রেঞ্জি-মাপের পুরু তোষক, ঢেউ বুনানি সাদা চাদর, প্লেন ঝালর দেওয়া ডবল বালিশে সাদা তোয়ালে, সাদা ওয়াড় দেওয়া ছোট পাতলা লেপ। দুইজনের পরণে গরদের ধুতি—ধূসর রংয়ের আলোয়ান! মা আলোয়ানের তলা হইতে একটা বড় চকচকে পিতলের কৌটা পিসীমার হাতে দিলেন! পিসীমা সেটি বালিশের পাশে রাখিয়া

দিলেন, তারপর দু' চারটি মৃদুস্বরে কথা শোনা গেল—শেষে দুইজনে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঝি দুইটি এতক্ষণ ইহাদের কাজে নিযুক্ত ছিল। এবার তাহারা সেই বেঞ্চের সম্মুখে নীচে মেজের উপর নিজেদের বিছানা করিল, তাদেরও সতরঞ্চি তোষক, চাদর বালিশ এবং একখানা বড় লেপ। দু'জনার পরণেই ধোপদস্ত কাপড় সেমিজ মোটাজামা এবং আলোয়ান। সাধারণ ঝিয়েদের মত অকারণ চাঞ্চল্য কিম্বা কৌতূহলপরায়ণা নয়—একটিও বৃথা বাক্য শোনা গেল না এতক্ষণের মধ্যে।

গাড়ীর ভিতর গভীর নিস্তব্ধতা। ফিরিয়া বধূটির দিকে চাহিলাম। স্থিরভাবে বসিয়া সে আলোটার দিকে চাহিয়া আছে, বড় সুন্দর চেহারা। যেমন কান্তি তেমনি লাবণ্যমণ্ডিত মুখ—নামটা মাধুরী কিম্বা লাবণ্যপ্রভা হইবে বোধ হয়। কাণে হীরার ইয়ারিং দুলিতেছে, গলায় দু' তিনটি হার—পাথর বসানো তাবিজ, উপর হাতে মণিবন্ধে সরু সরু চুড়ি এবং জড়োয়া বালা। পাঁচটি পাথর বসানো আংটি উভয় হাতের মধ্যমা অনামিকা এবং কনিষ্ঠায়। জরিপাড় শান্তিপুরী সাড়ী ·· সবুজ ফ্লানেলের হাতকাটা জামা পরা একখানি সিল্কের মত মিহি ঘন লাল রংয়ের সোনালী কল্কা ও পাড় দেওয়া শাল গায়। ধনীগৃহবধূজনোচিত বেশ ভূষার কোন ত্রুটী নাই, কিন্তু মুখখানি বড়ই ম্লান।

শুধু বৌ নহে—দলটির প্রত্যেকের সরকার মশাই পরিচায়ক মালিক হইতে গৃহিণীদ্বয়, দাসীদ্বয় প্রত্যেকের মুখই বিষম বিষণ্ণ। ইহাদের প্রতি কথায় চলা ফেরায় আসন্ন একটা আশঙ্কার ভাব—একটা দারুণ দুর্ভাবনার নিস্তেজ নিরুৎসাহ আবহাওয়া সকলকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে—নিতান্ত না বলিলে নয় এমনি ভাবে দু' একটী কথা বলা।

কিছুক্ষণ পরে ষ্টেশন আসিয়া পড়িল—এখন আর দেখি না কোন ষ্টেশন, নাম কি ষ্টেশনের, কেন না আর আমি অপেক্ষমানা নহি। বউটির সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে নীরব বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আর চেষ্টা করিলাম না। নিশ্চিন্ত মনে শয়নের উদ্যোগ করিলাম—ভাল একখানা বই আনিয়াছি, এবার সেটা পড়িব।

আলোর দিক হইতে বিষাদিত চোখ দুটি ফিরাইয়া সে আমার দিকে চাহিল—জিজ্ঞাসা করিল, "শোবেন আপনি ?"

'হ্যাঁ আর বসে কি হবে—আপনি শোবেন না ?'

'শোব পরে—ঘুম পাচ্ছে না। আপনি ঘুমোবেন, আমি একা জেগে বসে থাকবো ?' বলিয়া একটু হাসিল—যেমন মৃদু মিষ্ট কণ্ঠস্বর—তেমনি সে হাসি।

নিজের বিছানার একাংশে সে বসিয়া আছে তেমনি—বিছানা বরং সকলের চেয়ে ভাল। পুরু তোষক—পুরু নরম পৌষুলী বুনানি দুগ্ধশুভ্র চাদর—কুঞ্চিত ঝালর দেওয়া বালিশের ওয়াড়—ফিকে হলদে তোয়ালে—তোয়ালের ধারে ধারে ঘন সবুজ কাপড়ের মধ্যে গোলাপী ফুল। একটি অত্যন্ত পুরু সবুজ চেককাটা কালো মসৃণ কম্বল বালিশের কাছে ভাঁজ করা—এ হেন বিছানায় ঘুম আসে না চোখে ?

"শোব না ? কি করবো তবে ?"

'কেন ? গল্প করি দু'জনে। আপনার খুব ঘুম পেয়েছে ?'

ঘুম পাইয়াছে সত্য—তার চেয়ে লোভনীয় গল্প করা। বলিলাম—'তা বেশ—আমি রাজী।'

'আপনার নাম কি ভাই ?'

নাম শুনিয়া ভারী খুসী। 'আমার নামে আপনার নামে ভারি মিল—প্রায় একই মানে।'

'কি নাম আপনার ?'

সুনীতি—দু' জনার নামে সু—

'সুনীতি ? আমি ভেবেছিলাম মাধুরী কি লাবণ্য।'

'কেন আপনি অমন ভাবলেন ?'

'আপনাকে দেখে—অমন সুন্দর মুখ।'

'ছাই সুন্দর'—সুনীতির মুখে সেই বিষণ্ণ ছায়াটি দেখা দিল।

'তবু আমার চেয়ে আপনার নাম ভাল।'

'নিজের নাম কারো ভাল লাগে না—পরেরটা খারাপ হলেও মিষ্টি—কেমন না ?' সুনীতি ঈষৎ হাসিল। হাসিলে তার মুখের ম্লানিমাটা সরিয়া যায়।

সে সত্যি—কিন্তু নাম মিলেছে আপনার সঙ্গে,—সত্যিই আপনি সুনীতি।

'আমার চেয়ে আপনার নাম উঁচু ধরণের।'

'আপনার নাম মিষ্টি বেশী।

মাথা নাড়িয়া সুনীতি বলিল—নাঃ কক্খনো না।'

'ফুল কি নিজের গন্ধ বুঝতে পারে ?'

'আপনার কথা বলছেন ?'

'না না আপনার—'

'আমার ?' সুনীতি একটু চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল· 'আপনাকে দেখতে আমার এক বোনের মত।'

'কোথায় বাপের বাড়ী ?'

'ফরিদপুরে বাপের বাড়ী, বড় যেতে পাইনে—বছরে এক আধ বার দেখা সাক্ষাৎ হয়।'

'কষ্ট হয় না আপনার ?

কষ্ট আর কি, অভ্যেস হয়ে যায় না ? তা ছাড়া বাপ মা মেয়েকে শ্বশুর ঘর ছাড়া করতেও চান না। আমি গেলে এদিকে অচল—বোঝেন, তাই তারাও আসেন কখনো কখনো।

'আপনি গেলে এদিকে অচল কেন ?

'শাশুড়ীরা ছাড়তে চান না।'

সে তাঁদের দোষ নয়—আপনার দোষ! আমারি তো মনে হচ্ছে ছাড়বো কি করে আপনাকে, তবু কতক্ষণের দেখাই বা ?

আমার পরিহাসে সুনীতির মুখ ম্লান হইয়া গেল—বলিল, "ভোর হলে কে কোথা চলে যাব—হয়তো কোনদিন দেখাও হবে না।'

'মনে যদি ভালবাসা থাকে—নিশ্চয় দেখা হবে—আমরা দু'জনেই এই বাংলা দেশের। আপনি যাচ্ছেন কোথা ?'

'কলকাতা।'

'এঁরা কে ?

'শাশুড়ী—পিস্ শাশুড়ী।'

তারপরে আমাদের আলাপের ধাপ নানা পথে বহিতে লাগিল, নিজেদের ছেলেবেলার কথা—পিত্রালয়ের কথা—কত ছোট ছোট কাহিনী সে সব কথার আদি অন্ত নাই। এই অল্পক্ষণের মধ্যে দুইজন দুইজনের পরমাত্মীয় হইয়া উঠিয়াছি, কোন শুভ মুহূর্ত্তে এক জনের সঙ্গে দেখা হয়—যাহাকে কিছুই বলিতে বাধে না।

শাশুড়ী একবার মুখ বাহির করিয়া বলিলেন—অ বৌমা, এবারে কিছু খাও—খেয়ে শোও, শরীর তো ভাল নয়—অসুখ করবে।

'করবে না—ঘুম পাচ্ছে না আমার'—

'তবে কিছু খাও—আসবার সময় কিছুই তো মুখে তুললে না—খাবারের ঝুড়িটি'—

'সে আছে এখানে আমার বেঞ্চের তলায়—কিন্তু এত রাত্তিরে আমি কিছু খেতে পারবো না।'

পিস্ শাশুড়ী দুঃখিত ভাবে বলিলেন—'খাবার দিকে কোন দিন বা তোমার মন? ধরে বেঁধে না খাওয়ালে—'

শাশুড়ী ততোধিক দুঃখিত হইয়া বলিলেন—'মনে নেই সুখ—কোন কিছুই ভাল লাগে না'।

তারপর আবার দুইজনে লেপ মুড়ি দিলেন। কিছু বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি—সুখ নেই কেন? যতটা আলাপ পরিচয় হইয়াছে, চারিদিকে তো মহা সুখের লক্ষণ সুনীতির—তবে এ কথার অর্থ কি? এবং ব্যাপারটাই বা কি? এদের গোষ্ঠীশুদ্ধ এক ভাব কেন?

'একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না—ঠিক যেন আপনার নিজের বোন বলছে।'

'কি কথা?'

'কিছু দিই না খেতে আপনাকে? অন্ততঃ একটু মিষ্টিমুখ, অনেক রকম মিষ্টি আছে, কচুরী, ভাল পুরী—আরো কি কি বাড়ীর তৈরী সব—আমি যা যা ভালবাসি, তাই তৈরী করিয়ে এনেছেন—আপনি ভালবাসেন না ও সব?

'বাসি বৈকি—নিশ্চয় বাসি। কিন্তু আমারো সঙ্গে ছিল খাবার, আপনি আসবার একটু আগেই খেয়েছি। কাজেই আমি এখন আর কিছুই পারবো না—তার চেয়ে বরং পান দিন—পান নেই আমার।'

সুনীতি আর একটি নকসাকরা রূপার ডিবে বাহির করিল—ডিবাটির দুই খোলে সাজা পান এবং চূণ সমভাগ করিয়া একটি আমাকে দিল—অপরটি নিজে রাখিল! দুইটি ছোট ছোট কৌটা বাহির করিয়া বলিল—'একটা সুর্ত্তি, একটা জর্দ্দা পশ্চিম থেকে আনানো, কোন্‌টা দেবো? কোন্‌টা ভালবাসেন?'

'একটাও নয়—আমি খাই না ওসব।'

'একটুখানি খেয়ে দেখুন—সরষের মতন একটু, পান মিষ্টি লাগবে—জর্দ্দা থাকগে—সুর্ত্তি দি।'

নাছোড় সুনীতি, আমার পানে সুর্ত্তি দিবেই। কিন্তু কোন ক্ষতি হইল না—ভালই লাগিল সুমিষ্ট সুগন্ধি সুর্ত্তি।

গাড়ী তেমনি ছুটিতেছে—তেমনি আমরা আলাপ করিতেছি, সুনীতি কোন কথা আমার কাছে গোপন করিল না, এমন সরল মধুর স্বভাব দেখি নাই। স্বামীর চিঠি পাইবার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও সে সুযোগ হয় না। সুনীতি তো যায় না কোথাও। স্বামী রাগ করিয়া বলে, তোমার ভারি অদ্ভুত সখ—শেষে একবার মফঃস্বল গিয়া আটদিন রহিল এবং আটদিনে আটখানা চিঠি লিখিয়াছিল।—সত্যি দিদি, শেষে শাশুড়ী একদিন বলিলেন, "হয়েছে কি বৌমা তার? রোজ একটা চিঠি লিখছ কেন? না লোক পাঠিয়ে খবর নোবো? ভাবনা ধরছে বড্ড—"

সুনীতি হাসিতে লাগিল, বলিল, "সে চিঠি কি তেমন হয়? জোর করে লেখা শুধু শুধু—অনেক দূরে গেলে যেমনটি? আপনি যা বলছেন—"

স্বামীর নামটি সে বানান করিয়া বলিয়াছে। স্বামী অবিনাশ মিত্র জমীদার, মায়ের এক সন্তান। প্রকাণ্ড বাড়ীতে সুনীতি একটী মাত্র বৌ—সকলের অত্যন্ত আদরের। কাজ নাই কর্ম্ম নাই সঙ্গী নাই সাথী নাই, কোথাও যাওয়া আসা নাই। প্রাচীন ধরণের সম্ভ্রান্ত ঘর। তবু শাশুড়ীরা নিয়ম করিয়া দিয়াছেন কর্ম্মচারী-দের বাড়ীর মেয়েরা সদাসর্ব্বদা সুনীতির কাছে আসিবে।

এ পর্য্যন্ত সুনীতির কোন সময়ের মধ্যে কোন দুঃখের ছায়াটি ধরা পড়ে নাই। কথায় কথায় আমিও ভুলিয়া গিয়াছি জিজ্ঞাসা করিতে ইহাদের এই দুঃখ-বিষণ্নতার কারণটি কি।

সুনীতি উঠিয়া বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্কের উপরকার একটা বাক্স খুলিয়া ছোট একখানা খাতা ও পেন্সিল বাহির করিল, বাক্স বন্ধ করিয়া বিছানায় বসিয়া বলিল—আপনার ঠিকানাটি লিখে নি, শেষে ভুলে যাব। মাথা কুটে মরলেও আর পাব না—

মাথা কুটতে হবে কেন, বালাই! লিখে নিন না।

আমার ঠিকানা লিখিয়া লইল। বলিলাম, "আপনার ঠিকানা দিন—পৌছে চিঠি লিখবো, কে আগে লেখে দেখবো।"

"না এখন না"—বলিয়া হাসিল, সেই বিষণ্ন হাসি।

ঈষৎ অভিমান করিয়া বলিলাম—ও! আমার চিঠি চান না বুঝি?

"চাই দিদি চাই, চিরকালই চাই"—বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

"তবে আমায় ঠিকানা দেবেন না কেন?"

সুনীতির মুখ গম্ভীর দেখাইতে লাগিল, স্থির চক্ষে আবার আমার দিকে চাহিয়া বলিল—কেন ক'লকাতা যাচ্ছি জানেন?

না, কেন যাচ্ছেন?

ডাক্তার দেখাতে—

কি অসুখ?

সুনীতি একবার শাশুড়ীর দ্বারের দিকে চাহিল, একবার ঊর্দ্ধ নেত্রে আলোটার দিকে চাহিল, সেই দিকে চাহিয়া বলিল—আমার ছেলেপিলে হয় নাই কিছু, প্রায় পঁচিশ বছর বয়েস হলো, তাই ডাক্তার দেখাতে যাওয়া হচ্ছে।

তার জন্য ডাক্তার দেখানো কেন? হয় হবে—না হয় না হবে।

আপনি জানেন না দিদি—একবার থামিয়া একটি মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া সুনীতি বলিল—এঁরা খুব নামী ঘর। বংশে আর কেউ নেই। আমার সন্তান না হলে বংশ থাকবে না, তাই—

কি তাই ?

—যদি ডাক্তার বলে ছেলে পিলে হবে না আমার, তবে—

—তবে কি ?

—আবার বিয়ে করবেন।

—বিয়ে করবেন ?

—হ্যাঁ, উপায় কি ? ছেলে চাই যে, বংশের নাম রাখা হবে না ?

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, এত বড় একটা আঘাত পাইব মনে করি নাই। সুনীতির মুখের দিকে চাহিয়া আঘাতটা শতগুণে যেন বাজিতে লাগিল। ব্যগ্র হইয়া বলিলাম, আপনি বারণ করবেন না ?

বারণ করবো ? কেন ? যে বংশের যে নিয়ম, আমার শ্বাশুড়ীরও সতীন ছিলেন।

শ্বাশুড়ী আপনাকে ভালবাসেন না ?

বাসেন, সবাই বাসে।

তবু বিয়ে দিবেন ওরা ?

ওরা কি করবেন ?

তা বটে। বাঙ্গালী মেয়েদের অদৃষ্ট নানা রকমে ভাগ্যের সহিত বাঁধা। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এতদিনে ওদের এ বুদ্ধি হলো কেন ?"

"এতদিন যাগ-যজ্ঞ-হোম করেছেন—তাবিজ-কবচ যে যা বলেছে কিছু বাদ নেই। বিয়েটা তো সত্যিই কারু ইচ্ছে নয়। এখন সবাই বলছে পঁচিশ বছরের পরে আর ছেলেপিলে হয় না বড়। তাই চলেছেন শেষ চেষ্টা করতে। লোকে বলে ডাক্তারী চিকিৎসা করে অনেকের নাকি অনেক বয়েসে ছেলে হয়েছে।

"আপনার স্বামী বিয়ে করতে পারবেন আপনাকে ফেলে ?"

'ফেলবেন কেন ? যেমন আছি তেমনি তো থাকবো। ছেলের জন্তেই যে বিয়ে—সে না করলে হবে কেন ? মন তো কারুরই ভাল নেই এতে"—

সেই এক কথা, এক সুর। বিবাহ অনিবার্য্য। তাহার প্রতিকূলে অন্যরূপ কেহ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। হিন্দুর বংশরক্ষাকারীর কাছে আবার তুচ্ছ এক মানবীয় সুখ-দুঃখের কথা কি ?

অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম, "যদি ডাক্তার বলে সন্তান হবে—

"একটা সময় ঠিক করে বলবে তো ? সেই সময় অবধি দেখবেন।"

যদি কোন অসুখ-বিসুখ থাকে, যার জন্যে ছেলে হচ্ছে না—

তা হলে চিকিৎসা হবে।

সুনীতিও উহাদের দলে। অনাগত ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে সব বাঁধা-ধরা আছে !

ট্রেন দাঁড়াইল। একটা মাঝারী ষ্টেশন, তত রাত্রেও পান চা সিগারেট খাবার—ডাক-হাঁক তেমনি চলিয়াছে। অবিনাশ মিত্র দেখা দিল এবার—দরজায় দাঁড়াইয়া একবার গাড়ীর মধ্যে দেখিয়া লইল, পরে উঠিয়া সুনীতির কাছে আসিল, বলিল—ঠাণ্ডা লাগাচ্ছ কেন ?

সুনীতি উত্তর দিল—সব জানালা বন্ধ, ঠাণ্ডা কোথায় ?

গাড়ীর ভিতরেই ঠাণ্ডা, দেখি চাবি—সুনীতি আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া দিল। অবিনাশ চাবি লইয়া বাঙ্কের উপরকার একটা ট্রাঙ্ক খুলিয়া একটি খয়েরী রংয়ের ফুলহাতা পশমী জ্যাকেট বাহির করিয়া সুনীতিকে দিয়া বলিল—'পর শীগ্‌গীর—পর —ভারি অসাবধান তুমি, শেষ রাত্রের মাঘের হিম লাগানো ভারি অন্যায়।"

সুনীতি জামাটি পরিল। স্বামী বলিল—বসে আছ কেন ? শোও—ঘুমিয়ে পড়—রাত জেগো না। গাড়ীতে খেয়েছ ত ? খাবার সঙ্গে ছিল না তোমার ? আসবার সময় তোমার খাওয়া হয় নি দেখলাম। এক পেয়ালা চা খাবে ? আনবো ?

'না—না, বার বার এসো না তুমি, ঠাণ্ডা লাগে না ? যাও, শোওগে—'

'যাচ্ছি, তোমার শরীর ভাল নেই—না ? কেমন দেখাচ্ছে যেন—'। 'বেশ ভাল আছি, ঐ ঘণ্টা পড়লো—'

'পরের ষ্টেশনে চা আনিয়ে দেবো—নিয়ো কিন্তু'—

বই পড়িবার ভাণ করিয়া দম্পতির কথাবার্ত্তা শুনিতেছি। কত ভাল বাসিয়াছি সুনীতিকে—সেটা বুঝিলাম—যখন প্রকৃত রহস্য প্রকাশ হইল। অবিনাশ সম্ভ্রান্ত ভদ্র, কিন্তু ব্যাপারটা জানিবার পর হইতে লোকটার উপর দারুণ অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। এত মায়া সুনীতির উপর—তবে কেন আবার বিবাহ করিতে চলিয়াছে ? সুনীতির চেয়ে সন্তানই যদি তোমার বেশী কাম্য—তবে কেন এ বাহ্যিক অভিনয় ? তোমার দরদ সুনীতির মনে ঠাঁই পাইবে কেন ?

যত পাপী—যত অপরাধী হও না কেন—হে আর্য্যকুল তিলকগণ, হে হিন্দু বংশাবতংসবর্গ !—পুত্রমুখ দর্শন মাত্র পাখা মেলিয়া সাঁ করিয়া উড়িয়া সপ্ত স্বর্গে গিয়া পৌঁছিবে। এবং যত পুণ্যবান্ হও—যদি সন্তান লাভ না কর—ঝপাং করিয়া পুন্নাম নরকে পতন। সুতরাং সন্তান যেমন করিয়া হোক—চাই-ই—চাই।

দারুণ বেদনায় মন ভরিয়া গিয়াছে। শুধু দুঃখ নয়—একটা নিষ্ফল ক্রোধ।—নিস্তব্ধ হইয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিলাম। হয়তো সুনীতি কিছু বুঝিল—কিম্বা বুঝিল না। স্বামী নামিয়া গেলে সেও শুইল।—মৃদুস্বরে দুইবার ডাকিল—'দিদিমণি—ও দিদিভাই, ঘুমিয়েছেন ?' কোন উত্তর না পাইয়া চুপ করিল।

ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিয়া দেখি—প্রায় প্রভাত—শিয়ালদহের আর দেরী নাই—দুই দিকের ষ্টেশনগুলিতে আগত শিয়ালদহের সুস্পষ্ট লক্ষণ। সুনীতি বেশ-বাস ঠিক করিয়া বসিয়া জানালাপথে বহির্দৃশ্য দেখিতেছিল। শ্বাশুড়ীরাও উঠিয়া বসিয়াছেন। ঝিয়েরা নিঃশব্দে বিছানা জড়াইতেছে।

আমি উঠিলে সুনীতি একটু হাসিয়া বলিল—'এবার তো নামবো, কখন উঠে বসে আছি, আপনার ঘুম আর ভাঙ্গে না—একবার ভাবলাম ডাকি, সাহস পাইনি—আর একটু আগে উঠ্‌তেন যদি—তবু তো কথা বলতে পারতাম—

শিয়ালদহ, মন্থরগতিভরে ট্রেন থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে

সরকার একদল কুলী লইয়া গাড়ীতে উঠিল। অবিনাশ জানালার ওপাশ হইতে ডাকিল—তোমরা নেমে এসো—

শাশুড়ী বলিলেন—'বৌমা, তুমি আগে নামো—'

সুনীতি আমার হাত ধরিল—দু'টি চক্ষু তার জলে ছল-ছল, আমি বলিলাম—'চিঠি চাই—চিঠি লিখবেন কিন্তু, ভুল হয় না যেন—আমি আশা করে থাকবো—'

'হ্যাঁ দিদি, ঠিকানা নিয়েছি তো। যদি ডাক্তার বলে,—আশা দেয়—তবে আমার ঠিকানা দিয়ে আপনাকে চিঠি দেবো, সব জানাবো। আর যদি—তা না হয়—না হয় যদি,—তা হলে আর চিঠি লিখবো না।'

বলিয়া মুখখানি নীচু করিয়া চক্ষের জল গোপন করিল। পরে মাথার কাপড় ঈষৎ টানিয়া শালখানি গায়ে জড়াইয়া ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিল। অবিনাশ হাত বাড়াইয়া ব্যস্তভাবে স্ত্রীর হাত ধরিল—বলিল—'বড্ড ভিড়—এইদিকে এসো—'

যখন উহারা সকলে নীচে সমবেত হইল—ও গাড়ী হইতেও লোকজন জিনিষপত্র কম নয়—সংখ্যা মিলাইয়া দেখিবার জন্য প্ল্যাটফরমে ক্ষণেক অপেক্ষা করিতে হইল,—ভীড়ও সাংঘাতিক,—সেই সময়ে একবার সকলের দিকে প্রখর দিবালোকে চাহিয়া দেখিলাম। সকলের মুখেই এক আশু আশঙ্কা—একটা অনিশ্চিত উদ্বেগ এবং ঘোর চিন্তা-বিষাদের ছায়া ঘনায়মান। যেন একদল অপরাধী চিরনির্ব্বাসন-যাত্রায় চলিয়াছে।

চলিতে চলিতে সুনীতি একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল—আমাকে দেখিতে পাইল কিনা বুঝিতে পারিলাম না—আমি অনেক পিছনে,—ভিড় একটু কমিলে তবে নামিয়াছি। আজ সকালে প্ল্যাটফরমে সুনীতির দলের মত বিশিষ্ট দল একটিও নামে নাই। ঐ তার শালের কিনারা এক এক বার দেখা যায়।—কিন্তু শেষে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল—আর দেখা গেল না।

ইহার পরে বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে। সুনীতির চিঠি পাই নাই।—কি বলিয়াছে ডাক্তার? অথবা সুনীতি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। কে কোথায় এক রাত্রের দেখা গাড়ীর আলাপ মনে করিয়া রাখে!—ঠিকানা জানি না যে একটা চিঠি দিব। আজও কিন্তু সুনীতিকে ভুলিতে পারি নাই, সেই সুন্দর বিষণ্ণ মুখখানি প্রায়ই মনে পড়ে।

ইউরোপীয় শিল্পে ক্রমোন্নতি

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র, এম-এ

পাশ্চাত্য জগতে গ্রীকরীতির শিল্পচর্চ্চাই পরবর্ত্তী যুগের ইউরোপীয় শিল্পকলার মূল উৎস হিসাবেই রহিয়া গিয়াছে। গ্রীক শিল্প ছিল নগ্নতার পক্ষপাতী—কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রীক শিল্পে স্থূল ভোগবাদের প্রাধান্যই লক্ষিত হয়। দেহজ প্রবৃত্তিগুলির তৃপ্তিসাধনার্থে শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই সেখানে নগ্নমূর্ত্তি রচনা ও নগ্নচিত্র অঙ্কন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচ্য শিল্পের মত কোন উচ্চতর অন্তরঙ্গ ভাবাদর্শের উপর গ্রীক শিল্পকলা প্রতিষ্ঠিত নহে। তাই গ্রীক শিল্পে বহুদিক দিয়াই অন্তরের বৈচিত্র্যকে এবং আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যকে অস্বীকার করা হইয়াছে।

গ্রীক শিল্প এবং তাহার ক্রমোন্নতির গতিরেখাটি একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুসরণ করিলে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, উহার মাঝে ধর্ম্মাদেশে'র অভাববোধ রহিয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু রুচিবোধ যে একেবারেই অশ্লীল ও কুৎসিত, তাহা স্বীকার করা চলে না। ঈশ্বরের একটি অমূল্য দান এই মানবদেহ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়জ কামনা চরিতার্থ করিবার বিষয়বস্তুই নহে, দেহের প্রতিটি অঙ্গে রহিয়া গিয়াছে সত্যসুন্দরের রূপসৃষ্টির উচ্চাঙ্গের সৌন্দর্য্যবোধ ও স্বর্গীয় সুষমা। মধ্যযুগের ইউরোপীয় শিল্পের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, তখনকার শিল্পের পরিচ্ছদ-বাহুল্যের সহিত গ্রীক শিল্পের নগ্ন আদর্শবাদের অসামঞ্জস্যই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধ যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক জীবনে এক আশাতীত পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিয়া গেল, তেমনি কি সাহিত্যে, কি শিল্পে সর্ব্বত্রই একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়া দিল। তখন হইতে শিল্পে আবার স্বল্প পরিচ্ছদের প্রচলন হইল। নগ্নতা তখন অশ্লীলতার ও অসংযমের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইল—আবার পরিচ্ছদবাহুল্যও অসংস্কৃতির পরিচায়ক বলিয়া পরিগণিত হইল।

ম্যাডোনা

গ্রীক শিল্পের নগ্নবাস যে কেবলমাত্র শিল্পকে আশ্রয় করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল তাহাই নহে, তাহা জাতীয় জীবনেও একটি বিশেষ

হোলি ফ্যামিলি (মাইকেল এঞ্জিলো)

ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। আমাদের সামাজিক জীবনের সহিত শিল্পকলার যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না, তাই মধ্যযুগে গ্রীকশিল্পের নগ্নবাদের আদর্শ আর সামাজিক জীবনে পাদ্রীদের অনুশাসন মানুষের দৈনিক জীবনে এক আদর্শ-সংঘাতের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই যুগের শিল্পেও এই সংঘাতের অনুরূপ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এ্যাপোলো, ভেনাস্ প্রভৃতি যে সমস্ত রমণীয় মূর্ত্তিগুলির সন্ধান আমরা রোমক শিল্পে দেখিতে পাই, উহা গ্রীক আদর্শের অনুকরণেই সৃষ্ট হইয়াছিল, মধ্যযুগের পর ইউরোপীয় শিল্পে যে যুগের সূচনা হয়, তাহাকে আমরা রিনেসাঁস যুগ বলিতে পারি। এই যুগে আবার মধ্যযুগের ধর্ম্মভাব একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়া শিল্পে আবার বাস্তব ভোগবাদ প্রবর্ত্তিত হয়। র‍্যাফেল, মাইকেল এ্যাঞ্জিলো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পিগণ এই যুগের। ইহারা আবার শিল্পের বহিরঙ্গ-বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্যপ্রকাশের প্রচেষ্টার দ্বারা ভোগবাদের মূল ধারাটি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তবে র‍্যাফেল-অঙ্কিত চিত্রে যে কেবল মাত্র বাস্তবের প্রতিচ্ছবিই অঙ্কিত হইয়াছে, উহাতে কোন গভীরতর ভাবব্যঞ্জনার প্রকাশ আদৌ পায় নাই, এ কথা বলা চলে না। কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন, র‍্যাফেলের মাতৃমূর্ত্তির চিত্রে শুধু একটি হৃষ্টপুষ্ট রমণীর ক্রোড়ে একটি শিশুকে সংস্থাপিত করা হইয়াছে। এই অভিমত মানিয়া লইলে শিল্পীর প্রতি অযথা অবিচারই করা হইবে। 'ম্যাডোনা' চিত্রখানি একটু অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, চিত্রখানিতে বিশ্বমাতার একটি সুস্নিগ্ধ স্নেহময়ী মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্রোড়লগ্ন সন্তানের চোখে-মুখে শুধু যে শিশুসুলভ লালিত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই নহে, মাতৃহৃদয়ের স্নেহস্নিগ্ধ কোমল অঙ্কে বসিয়া পরম বিশ্বাসে তাহার হৃদয়-মন ভরিয়া উঠিয়াছে—সকল অভাববোধ তাহার দূর হইয়া গিয়াছে। ম্যাডোনা চিত্রের সুসংস্কৃত রুচিসম্মত পরিচ্ছদও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আবার মাইকেল এঞ্জিলো-অঙ্কিত 'পবিত্র পরিবার' চিত্রে আমরা যে কেবল মাত্র বাস্তবেরই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই তাহাই নহে, চিত্রখানি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুষমায় ভরপূর হইয়া উঠিয়াছে। গোয়া-অঙ্কিত 'পবিত্র পরিবারের' চিত্রখানিতে আরও উচ্চাদর্শের ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার পরিচয় আমরা পাই। মাতার যে চিত্র রহিয়াছে তাহা পার্থিবকে অতিক্রম করিয়া অপার্থিবের কল্পনাই বহিয়া আনে—শিশু দু'টিকে যে ভাবে আঁকা হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের দেবশিশু বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়। তাই রিনেসাঁস যুগের শিল্পীরা কেবল মাত্র শিল্প রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উহার ভিতর দিয়া একটি অন্তরঙ্গ গভীর ভাবকে প্রকাশ করিতেও সক্ষম হইয়াছেন। র‍্যাফেলের "যীশুকর্ত্তৃক মহাজনদের বিতাড়ন" চিত্রে আমরা তাঁহার মুখে একটি আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাই। র‍্যাফেল যে কেবল মাত্র গ্রীক আদর্শই যথাযথ অনুকরণ করিয়াছিলেন তাহাই নহে—চিত্রে এমন একটি আন্তরিক অনুভূতির স্পর্শ বুলাইয়াছিলেন, যাহাতে সমস্ত আলেখ্যখানি বর্ণে, ভাবে, রূপে-রসে প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর বরমাল্য তাঁহার কণ্ঠেই অর্পিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তার ধর্ম্মপ্রবণতা স্থান রিনেসাঁস যুগে ছিল না বলিলেই চলে—ভোগবাদ ও প্রকৃতিবাদই তখন প্রবল হইয়া দেখা
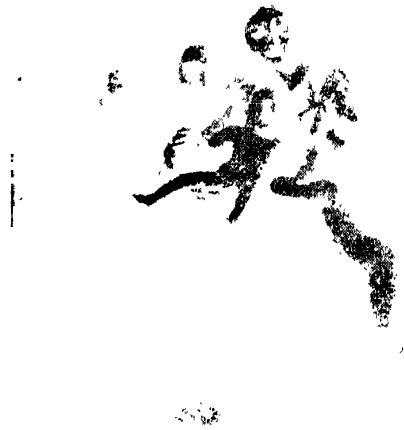
হোলি ফ্যামিলি (গোয়া)

দিয়াছিল। ইহার পর আমরা দেখিতে পাই চিত্রে আলোছায়ার অলঙ্কার প্রচলিত হইতেছে—ব্যঙ্গকৌতুকের চিত্র অঙ্কিত হইতেছে, শিল্পের রসপ্রবাহ ক্রমে সংস্কৃত হইয়া একটু উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর পথে অগ্রসর হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগে জাপানীশিল্পী-অঙ্কিত বহুচিত্র ইউরোপে প্রচলিত হয়। এই সমস্ত চিত্রে কোন বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটি আদৌ অঙ্কিত হয় নাই। কয়েকটা নিপুণ রেখার টানে আর কয়েকটি বিচিত্র বর্ণের সুসঙ্গত পরিবেশে অজানার আভাসই দেওয়া হইয়াছে। এই সময় ইউরোপে একদল 'ছায়াবাদী' শিল্পীসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। ইহাদের মত, যখন আমরা কোন একটা দৃশ্য লক্ষ্য করি তখন তাহা কখনও আংশিক ভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। পর্ব্বত দেখিতে গিয়া টুকরা টুকরা পাথর দেখি না, অরণ্য দেখিতে গিয়া কোন বিশেষ গাছ লক্ষ্য করি না—তখন আমাদের দৃষ্টির সামনে কতকগুলি বিভিন্ন বর্ণস্তরই প্রতিভাত হয়—এই স্তর পর্য্যায় কতকগুলি হাল্কা আর কতকগুলি গাঢবর্ণের সমাবেশ মাত্র। তাই তাঁহারা বলিলেন, এই বর্ণস্তরগুলিকে যথাযথভাবে অঙ্কিত করিতে পারিলেই চিত্র সার্থকতা লাভ করে। শিল্পের রথচক্র অনাদিকাল হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার শেষ নাই, ইহার বিরাম নাই। যেদিন শিল্পের এই নব নব রূপসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, সেইদিনই তাহার মৃত্যু ঘটিবে। আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাইব, শিল্পী কেবলমাত্র ভাববৈচিত্র্য আর অঙ্গসৌষ্ঠব ফুটাইয়াই ক্ষান্ত হইতে চাহিতেছেন না।—শিল্পে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে 'গতিবেগ'। সুতরাং চিত্রশিল্পে আর এক নূতন ধারার উদ্ভব হইয়াছে। ভারতীয় ভাস্কর্য্যেও আমরা ইহার সন্ধান পাইয়া থাকি—মৃগয়া, রণযাত্রা প্রভৃতি যে সমস্ত খোদিত চিত্র বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে দেখিতে পাই, সেখানে আমরা এই গতি-ভঙ্গিমার সুন্দর প্রকাশ দেখিতে পাই।

যীশুখৃষ্ট কর্ত্তৃক মহাজনদের বিতাড়ণ

নারী (অজন্তা)

ইউরোপীয় শিল্পিগণ আবার এই গতিকে প্রকাশ করিবার জন্য এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, অশ্বের দুর্দমনীয় গতিকে প্রকাশ করিতে গিয়া চারিখানির স্থলে কুড়িটি পদ সংযোজনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। নৃত্যের চিত্রে চঞ্চল গতিভঙ্গিমা ও প্রাণ-চঞ্চলতাকে সুপরিস্ফুট করিতে গিয়া এমন আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, যাহাকে রণক্ষেত্র হইতে পৃথক করিয়া দেখাও মুস্কিল। বর্ত্তমানে শিল্পের এতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, তাহার রস উপলব্ধি করা সাধারণের দৃষ্টিতে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানের সাহিত্যে যেমন আর সুস্পষ্টভাবে ভাব-প্রকাশের রীতি নাই, শিল্পেও তাহারই অনুকরণ হইয়াছে। এখনকার কোন চিত্র বা ভাস্কর্য্য ভাল করিয়া অনুসরণ করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম জানিতে হইবে কোন শ্রেণীর শিল্পী কোন ধারার অনুসরণে এবং কি আদর্শের উপর তাঁহার বিষয়বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। আধুনিকতম চিত্রশিল্পে যে একশ্রেণীর অতিবাস্তব ধারার চিত্র অঙ্কিত হইতেছে, তাহা সাধারণের নিকট যেমন উদ্ভট, অসঙ্গত, তেমনি দুরধিগম্য। এই চিত্রগুলিতে কেবলমাত্র মানবচিত্তের উদ্দাম অসংলগ্ন ভাবধারার রূপই ফুটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এশিয়ার শিল্প-কলা লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই মানবের দেহরহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া নগ্নচিত্র অঙ্কিত করিবার

প্রচেষ্টা বড় একটা হয় নাই। জাপানী ও চৈনিকশিল্প যে আদর্শের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতেও কোন মূর্ত্তিকে বসনহীন করিবার প্রয়োজন কোথাও ঘটে নাই।

সামাজিক জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, সেই অতি সাধারণ বিষয়-বস্তুগুলি উচ্চতর আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ শিল্পকলায় কোথাও স্থানলাভ করে নাই। ভারতবর্ষের রূপশিল্পে আমরা স্থানে স্থানে অর্দ্ধনগ্ন নরনারীমূর্ত্তির সন্ধান পাই বটে, তবে শিল্পী সেখানে মাংসল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগবাদকে প্রতিপাদ্য করিয়া কোথাও মূর্ত্তি রচনা করেন নাই। দেশীয় প্রথায় বসনভূষণের ব্যবহারের রীতিটি সেই সময় কেমন ছিল তাহারই আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীগৃহে ও অজন্তার অর্দ্ধনগ্ন নারীমূর্ত্তির যে রূপটি আমরা দেখিতে পাই তাহার পরিচ্ছদ ও পরিধান-ভঙ্গী তখনকার প্রচলিত রীতির পরিচায়ক মাত্র। এই চিত্র ও মূর্ত্তিগুলির মুখে উদ্ভাসিত অন্তরের সুগভীর ভাবব্যঞ্জনা ও স্বর্গীয় সুষমার প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, সৃষ্টির মূলে নগ্নচিত্র আঁকিয়া ভোগস্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিবার কোন প্রচেষ্টা ইহাতে নাই। অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বা নেপালের পুরুষপ্রকৃতির মূর্ত্তিতে আমরা যে নগ্নরূপের সন্ধান পাই উহাতে পুরুষের পৌরুষ ও নারীর মৌনমধুর রূপটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদিকে ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধনার মূলে যেমন ছিল যাহা দৃষ্টিগোচর নহে তাঁহারই আরাধনা, অপরদিকে শিল্পীও এমন কিছুকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল যাহা অরূপ। ভারতের শিল্পে অপ্সরী, নাগনাগিনী, যক্ষিনী, নর্ত্তকী প্রভৃতি মূর্ত্তি ও চিত্রে যে নগ্নতা দেখান হইয়াছে তাহা যেমন পবিত্র, তেমনি সুন্দর। ভারতের যে ইন্দ্রিয়বাদ আমরা দেখিতে পাই তাহা এই স্থূলইন্দ্রিয়জভোগ নহে, তাহা অতীন্দ্রিয়—আমাদের এই চর্ম্মচক্ষু কোনদিনই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে নাই—কারণ মনের মন এবং এই চোখের চোখই এ-দেশে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। তাই ভারতে সুরুচি ও ভাগবতীলীলার আদর্শে যে-অর্দ্ধনগ্ন চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে, সভ্যতার কুঠারাঘাতে তাহা ধূলিসাৎ হইয়া যায় নাই। দেবতার বাসগৃহের অলঙ্কার হইয়াই মন্দিরগাত্রে স্থান পাইয়া আসিতেছে।

বাহির বিশ্ব (গল্প)

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

সনাতন আপন হাবা হয়ে চেয়ে থাকে।

ময়ূরাক্ষীকে দেখে আসছে কবে কোন অজানা দিন থেকে জানে না, ওপারের খয়রাকুড়ীর শালবনের সারি, কাছিমের পিঠের মত ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠে গেছে আকাশের পানে, বিস্তৃত নদীর রূপালী বালিরাশির মাঝে বয়ে চলেছে শীতের কাজলধারা, ময়ূরের চোখের মত নীল। অদূরে দুপুরের কপিশ রৌদ্রতপ্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে নীলাভ পর্ব্বতশ্রেণী, আকাশের মাঝে বাতাসের আনাগোণা।

ছাতিম গাছটার নীচে বসে থাকে সনাতন।

চোখ দুটো দিয়ে খুঁজে চলে কোন হারাণরাজ্যের সীমারেখা।

ভাণ্ডির বনের সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়নি কোথাও। মুখুয্যে পাড়ার সরুপথটার দুদিকে বাংচিত্তির কালো বেড়া, কাকর ভরা সরুপথটার উপর লুটিয়ে পড়ে বাশবনের পাতাগুলো, সেয়াকুল গাছের কোনে বাগানের নীচেটা বোঝাই। রাস্তার বাঁকে দেখা যায় বাঁক-ছিন্ন মলিন তালাই, কালিমাখা হাড়ি বয়ে চলেছে সাওতালের দল।

এই তার জগৎ, এই তার সীমারেখা।

আজ মনে হয় সনাতনের গতজীবনের কথা!

সে অনেক দিনকার কথা নয়—মনে হয় যেন সবে কাল—

মল্লিক পাড়ার নীরব রাস্তাটা বামুনমাসীর বাজখাই গলার শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। ছেলের দল যেদিকে পারল দৌড়। সনাতন হাতের ভাঙ্গাটা ফেলে দিয়েই ছুট!

বামুনমাসী যমের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করে চলেছেন—"অত লোক মরছে, ও আটকুড়োর পুতরা মরে না কেনে? এ-কি কানা হইচ?"

সনাতন আর সকলে তখন অনেক দূরে—পালপাড়ার নদীর ধারে আমবাগানটায়। ছায়াময় আমবাগানে গায়ের কোলাহল পৌছে না, বাঁচবার এ একটা সহজ সরল পন্থা!

. সনাতন সচকিত হয়ে ওঠে—"ওই!"

খিল্ খিল্ করে হাসতে থাকে কুসুম—"হাঁ-তো ভূতলই!"

—"হ্যাঁ পেত্নী!—দেখিস্ যেন আবার বলে দিস্ না মাকে?"

সনাতনের কথায় হাসতে থাকে কুসুম। "বুঝেছি পাঠশাল পালিয়ে—" কথাটা শেষ হয় না কুসুমের। ঘাড় নাড়ে সনাতন!

পাঠশালা ভাল লাগে না। একপাল ছেলে গাদাগাদি করে বসে ক্যাল ব্যাল করে গরমে। চোখের সামনে দিয়ে অমন দুপুর বৈকাল পার হয়ে যায়,...এটা সইতে পারে না সনাতন, রোজই ঘুমন্ত পণ্ডিত ম'শায়ের নাকের উপর দিয়ে বার হয়ে আসে। নির্জ্জন নদীতীরের বাগানটা তাকে ডাক দেয় দু'হাত দিয়ে। থর্ থর্ বিকম্পিত কাশবন মৌন গুঞ্জন তুলে মন তার উতলা করে তোলে।

কুসুমের ডাকে তার চমক ভাঙ্গল—"ওপারের বনে পিয়াল।"

পিয়াল পেকেছে, পত্রহীন গাছের মাথায়—থোকায় থোকায়। চলে দু'জনে, উত্তপ্ত বালিয়াড়ির বুকে পায়ের ছন্দ তুলে চলে তারা দু'জনে—!

তাদের ছোট বাড়ীখানায় আজ যেন সনাতন আগন্তুক।

সারা আকাশ বাতাসে শোনে কার স্তব্ধ মিনতি? বাঁশগাছের কম্পিত শাখাপ্রশাখার মর্ম্মরে প্রস্ফুটিত হয় কার ক্রন্দন ধ্বনি। বাড়ীখানায় সে থাকতে পারে না। কত লোকের ব্যস্ত সমস্ত কণ্ঠস্বর! সনাতনকে উদ্দেশ করে কে যেন কি বলে! সনাতনের হুস নাই।

হীরাকষ রং-এর আকাশে সাদা মেঘের শীর্ণভেলা, শরতের নির্ধূম নীল আকাশ, গড়ের কালো জলে সাপলা-ফুলের অমলিন হাসি। দূরদিগন্তে অলস নয়নে চেয়ে থাকে সনাতন।

মাকে নিয়ে বার হ'ল ওরা, সনাতন চলে পিছু পিছু। তার মুখে আজ কথা নেই, হারিয়েছে সে তার গতিবেগ।

চিতায় তুলে দিল ওরা, সনাতন যেন স্বপ্ন দেখছে। বাগানের প্রান্তে ছাতিম তলায় চিতার লেলিহান শিখায় সনাতনের সংসারের ক্ষীণ বন্ধনসূত্র পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে লালাভ পিঙ্গল শিখাগুলোর দিকে চেয়ে থাকে।

ওপারের বনভূমিতে নেমে এল সন্ধ্যা। অস্পষ্ট অন্ধকারে রাতের বাতাস যেন নদীর চরে কাকে খুঁজে মরে, পায় না ; বুক দীর্ণ করে বার হয় দীর্ঘশ্বাস। চিতার আগুন ম্লান হয়ে আসে।

"চল, ঘরে যাবে না—।"

কার করস্পর্শে সনাতনের চমক ভাঙ্গল। কুসুম!

কথা না বলে ধীরে ধীরে পথ ধরল।

সে রাতে ঘুমুতে পারে না। সারা দেহমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নিস্তব্ধ রাত্রির আকাশে শতেক তারার রোশনী! কম্বলের রোয়াগুলো তিরস্কার করে তাকে। তুই একা!

এ পৃথিবীতে তার কেউ নাই—! আজ সে একা! একা! চঞ্চলভাবে দাওয়ায় পায়চারী করে সনাতন!

—"ঘুমোওনি—?"

কুসুমের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে এসে সনাতনের সামনে বসল। কোন নিশাচর পাখী আর্ত্তক্রন্দন ধ্বনিতে গণনা করে গেল রাতের প্রহর। রাত শেষ হয়ে এল।

কথা কও! কথা কও! নীরব রাত্রির হল নব জাগরণ।

কুসুমদের বাড়ী থেকে বের হয়ে চলে সনাতন লক্ষ্যভ্রষ্টের মত! নিজের জনহীন বাড়ীটায় ঢুকতে সাহস হয় না! মা কোথা গেছে বাইরে হয় তো ও-পাড়ায়। এখুনি এসে পড়বে। কিন্তু আসে না। হয়ত পথ ভুলে গেছে কোন দূরে! ওই লালমাটীর দেশে দুমকা—রাণীপাথর—আরও, আরও অনেক দূরে...ওই নীল ছায়াময় পাহাড়গুলোর ওপারে! দুপুরের রোদে সমাধিস্থ যোগীর মত নিঝুম হয়ে বিশ্রাম করে পাহাড়গুলো! ওর ও-দিকে!

শ্যামরায়ের মন্দির প্রাঙ্গনে জমেছে তীর্থকামীদের জনতা। বিশাল চত্বর নহবৎখানা সব ভরে গেছে, বাইরে এখানে ওখানে লোক আর ধরে না। গোষ্ঠর মেলা এবার নাকি বেশ জমে বসেছে। সনাতনের অবসর নাই। কলসী করে জল তুলছে নদী থেকে—বান্না ঘরে। চাকরি নেহাৎ মন্দ নয়; দিনগুলো চলে যায় কোন রকমে।

শত শত লোকের মাঝে সনাতন অবাক হয়ে গল্প শোনে। এখানটা নাকি ভাল নয়! এর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর ঠাঁই আছে। কত ভাল! কি-পুরী-নাকি! খুব বড় মন্দির, সমুদ্দুর—আকাশের মত ঢেউ!

একজন বাবাজী গল্প করে কলেশ্বরের শিবমন্দির মাঠের। বিশাল উঁচু মন্দির! আর বাগান—ফুলে ফুলে আলো হয়ে রয়েছে! কোন সুদূরের কাহিনী খণ্ডগিরি! দুর্গম পর্ব্বত—ওমনি নীল রঙ···ছায়া মাখান পাহাড়!

কি একটা শহর—সিউড়ী! লাল রাস্তার দুদিকে কেমন সারি সারি পাকা বাড়ী। কত লোকজন! রেলগাড়ী।

কথাগুলো উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনে যায় সনাতন! সে···হ্যাঁ সে যাবেই!

"···এই সোনা, এ্যাই!"

ভাতে জল দিতে হবে বোধ হয়। ব্যাটা ঠাকুরটা চোখ বুজে চীৎকার করছে, চোখ খুলে গুলির নেশা নষ্ট করতে রাজী নয়।

সনাতনকে বাধ্য হয়ে যেতে হয়।

দলে দলে যাত্রীরা আবার মোট ঘাট বেধে রওনা হয়। শীতের দিন মাঠে আধপাকা ধানগাছের মাথায় ধানের মঞ্জরী লুটিয়ে পড়েছে, লাল রাস্তার দুদিকে নিশিন্দের বন! বেগুন গাছগুলো নুইয়ে গেছে ফলের ভারে!

বাবাজী আশ্চর্য্য হয়ে যান বৃন্দাবনের কণ্ঠস্বরে! "যাবি তুই?"

ঘাড় নাড়ে সনাতন! সে চলে যাবে এখান থেকে! এখানে সে আর থাকবে না। কেমন পাহাড় ঘেরা পথটা দিয়ে দূরে—বহু দূরে চলে যাবে সে। পুরীর সমুদ্দুর ধার! খণ্ডগিরি···পাহাড়ে ঘেরে ছোট্ট নদীটার ধারে কেমন ছবির মত সুন্দর জায়গা!

সে যাবে—নিশ্চয়ই যাবে এখান থেকে! সারা দেশে-দেশে।

বাবাজী হাসেন—শান্ত স্নিগ্ধ হাসি। তার পিঠে হাত বুলিয়ে শান্ত করেন।

"এখন না—পরে। কেমন?"

অগত্যা ঘাড় নাড়ে সনাতন! বুড়োর সাদা দাঁড়ি লুটিয়ে পড়েছে বুকের উপর। কাঁধে ডোবাকাটা খেরোটা নিয়ে লাঠি হাতে পথ ধরেন!

তার গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে সনাতন।

পালপাড়ার নীরবতা ভঙ্গ করে একদিন কয়েকটা ঢোল-কাশির সম্মিলিত শব্দ। একটা কোলাহল, বাইরে থেকে কয়েকটা গাড়ীতে করে কয়েকজন লোকজনও এল! সনাতনও গিয়েছিল, যেতে হয়েছিল তাকে। কুসুমের বিয়ে হয়ে গেল! দিব্যি হাসি মুখে সকলকে প্রণাম করে কেমন গাড়ী চড়ে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল আর পাঁচজনের মত! সিউড়ী থেকে রেলে চড়ে না কি যেতে হবে ঐ দিকে। তারা চলে গেল!

ক্লান্ত দ্বিপ্রহর ম্লান হয়ে আসে, সারাটা আকাশ বাতাস যেন কেঁদে চলেছে। হলদে রোদ শয়ন বিছায় নিস্তব্ধ গ্রামের ছায়ায়! মা-হারা গোবৎসের চীৎকার ভেসে আসে কোন সুদূরের বাতাসে! আকাশটা কেমন থমথমে, ওরা চলে গেল এতক্ষণ অনেক দূরে! হিংলে নদী পার হয়ে গেছে।··

সন্ধ্যা হয়ে আসে। সনাতনের কাযে মন বসে না।

কুহেলীমাখা রাতের আধারে ফুটে ওঠে ম্লান তারকার কাঁদন-ভরা চাহনি। পাখীরা শান্ত আকাশ কলরবে ভরিয়ে তুলে চলে গেল ওপারের বনসীমায়। ময়ূরাক্ষীর বালুচরে নামে রাতের অন্ধকার। শাল জঙ্গলটা শাখা-প্রশাখা মেলে জড়িয়ে ধরে ঘন কুয়াসার স্তবক।

বাইরের পথ ডাক দেয় সনাতনকে! ব্যাকুল তার সুর! সামনে আকাশ জোড়া অন্ধকার, পথ সে চেনে না! নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে ওঠে তার অন্তরাত্মা—ওগো মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, আমার চলবার পথে আলো দেখিয়ে দাও!

শালবনে মাতামাতি লেগেছে খ্যাপা বাতাসের, রাতের আঁধারে শাখাশ্রয়ী বিহঙ্গের দল ঝটাপটি করে, কে যেন মুখ থুবড়ে পড়ে শক্ত গ্রানাইট পাথরের বুকে। বার কতক ঝটপট করে শেষ হয়ে যায়। চঞ্চু বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'এক ফোঁটা রক্ত। সব শেষ!

সে আজ অনেক দিনের কথা।

তারপর চলে গেছে কয়েকটা বছর! মুক্তি সে পায়নি, দেয়নি তাকে! মন্দিরের একমাত্র কাজের লোক ছিল সেই। এত কম মাইনেতে সারাদিন প্রাণপাত করে কেউ শ্রম করত না।

রামদাস ঠাকুর তার কথায় প্রতিবাদ করেন, "মন্দিরের শিষ্যরা কেউ ছেড়ে যেতে পারবে না?"

সনাতন বলতে ছাড়ে না—"কিন্তু"।

বাধা দেন রামদাস বাবাজী, "এর কৈফিয়ৎ দের ধর্ম্মের কাছে সনাতন!

মন্দিরের ধর্ম্ম নষ্ট করা মহাপাপ! এরপর আর কথা চলে না, ধীরপদে সনাতন বার হয়ে আসে। দোলমঞ্চের পাশ দিয়ে সারা অন্তর তার হাহাকার করে।

তবে কি যাওয়া হবে না, মুক্তি কি তার মিলবে না ঠাকুর। ·· কোন সাড়া নাই।

তার ছোট্ট আকাশে টিপ পরিয়ে দেয় কোন না-দেখা রাতের ঘুমপাড়ানী মাসী, কার সুরেলা বাঁশীর আলাপনে সে বিছানা ছেড়ে ওঠে পড়ে ধড়ফড় করে বাইরে বার হয়ে আসে!

চাঁদ উঠেছে, ময়ূরাক্ষীর বালুচরে লুটিয়ে পড়ে বিধবার হাসির মত মলিন চাঁদের আলো, তাড়াতাড়ি করে একটা পুটুলি বেঁধে নিয়ে সে বার হয়ে আসে। সে চলে যাবে—তাকে ডাক দিয়েছে আড়াল থেকে হাতছানিতে!

কিন্তু যাওয়া তার হয়নি। কি যেন একটা ক্ষণিকের উন্মাদনা তাকে পেয়ে বসেছিল। আবার সকাল হ'ল। ভাঙ্গির বনের আকাশ বাতাসে বাইরের কার ডাক এ'ল তার কানে।

কিন্তু যাওয়া তার হ'ল না। সে যাবে—যখনই হোক।

* * *

সে আজ অনেক দিনের কথা! কেটে গেল সংখ্যাহীন বছরের আনাগোনা। ময়ূরাক্ষীর ওপারের বনভূমিতে রূপ বদলাল কতবার—ছাতিম গাছের পাতায় এল কত বছরের নিমন্ত্রণ, তার খবর সনাতন রাখেনি।

এদিকটায় নদীর ভাঙ্গন ধরেছে। পালপাড়ার আমবাগান সব কোনদিন ধুয়ে মুছে গেছে। অমন বাগানটা—সেখানে আজ চলে ময়ূরাক্ষীর জলধারা। মন্দিরটা হয়েছে জীর্ণ হতে জীর্ণতর।

লোকের ভক্তি কমেছে বই বাড়েনি।

জীর্ণ শরীরে সনাতনের আর খাটবার সামর্থ্য নাই। বাবাজীও মরে গেছে। এসেছে এক নূতন সেবাইৎ। ছোকরা বয়েস।

সেবাইৎ চটেই আগুন—কখন একটা কালো কুকুর ঢুকেছিল, দেখেনি সে। সেবাইৎ গর্জ্জন করে: "দূর করে দাও বুড়োকে ঐ কুকুরের সঙ্গে! দিনরাত কেবল ঝিমুবে আর ভোগ বসাবে!"

সত্যিই কিছুদিন থেকে সনাতনের কায করবার শক্তি কমে এসেছে। সেবাইৎ কথায় কথায় ঝাল ঝাড়েন, "দূর করে দাও বুড়োকে!" কায করবার চেষ্টা করলে জীর্ণ হাড় ক'খানা মটমট করে, কখন অচল হয়ে যাবে একেবারে। দীর্ঘ আশী বছর ওরা কায করেছে, এবার চায় বিশ্রাম!

নদীতে এসেছে বর্ষার জলধারা। তরতর করে স্থির নিষ্পন্দ গতিতে তাল দিয়ে নাচতে নাচতে ছুটে চলে নীচের দিকে। শিউড়ী নাকি এরই ধারে। আরও কত সহর! কালো হেলেপড়া আকাশের সীমা স্পর্শ করে খয়রাকুড়ীর সজল বনভূমি। বৃষ্টির জল রচনা করে তার চোখে নীলাঞ্জন। মাঝে মাঝে বনভূমি মুখরিত করে ভেসে আসে ময়ূরের ডাক—কেউ···কেউ··।"

নিষ্পন্দ কাশবন কাঁপে বরষার বাতাসে থর থর করে মেঘ-মৃদঙ্গের তালে তালে। বুড়োর চোখে সব কিছু ঘোলাটে হ'য়ে আসে। সে যদি চলে যেত গাড়ীতে করে অনেক—অনেক দূরে পুরীর সমুদ্রের ধারে, খণ্ডগিরির নির্জ্জন পাহাড়ে—!

বুড়োর শিশুমন ব্যর্থ হতাশায় গুমরে ওঠে। রাতের আঁধারে জীর্ণ দেহখানা টেনে নিয়ে চলে মন্দিরের পানে। বৃষ্টির জলে সারা গা মাথা ভিজে একসা হ'য়ে গেছে। বুড়োর খেয়াল নাই। শীতে কাঁপছে!

বাইরে থেকে কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সেবাইতের। "তাকে মন্দিরের সীমানায় দেখলে আমার একদিন কি তারই একদিন। দূর ক'রে দেবে তাকে—"

সনাতন দাঁড়াতে পারে না। কাঁপতে কাঁপতে ব'সে পড়ে সেইখানে। মন্দিরের দরজা বন্ধ। হ্যাঁ তার কোন দরকার নেই এখানে! সে এতদিন পর মুক্ত। অদূরে জীর্ণ বকটায় বসল! আকাশে ঝরছে বর্ষার বারিধারা। ভিজে কম্বলটা জড়িয়ে ব'সে থাকে।

অন্ধকার! সারা পৃথিবীটা পাক খায় তার চোখের সামনে। উদ্ধব দাস,—গোষ্ঠের মেলা, কত লোকজন, পুরীর বিশাল নীলাভ সমুদ্র, আকাশ ছুঁয়ে আসছে ঢেউএর রাশি! সিউড়ী মস্তবড় সহর-বুড়োর দু'চোখ যেন ঠিকরে বা'র হবার উপক্রম। গলার কাছে কি একটা দলা পাকিয়ে আসে! মাথাটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে প্রাণপণে!

চোখের সামনে দুস্তর পারাবার।...রাত হ'য়ে আসে। অনেক রাত। অন্ধকারের শেষ নাই!

—আলো! কোন যাদুমন্ত্রে আবার ফুটে উঠেছে আলোর রেখা, দু'চোখ ঝলসে যায়। কার ডাকে সনাতন ধড়মড় করে উঠে বসে। বাইরের আকাশ আলোয় ভরে গেছে। সেই হারাণ বাবাজী! শুভ্র শ্মশ্রু বয়সের ভারে মাথাটা বুকের উপর নুইয়ে পড়েছে, মুখে তার স্নিগ্ধ মধুর হাসি। —'চল, যাবে না!'

কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না ! সে আজ মুক্ত ! সামনে তাদের পথ উঁচু-নীচু ! নীল পাহাড়গুলোর পাশ দিয়ে চলেছে ! বেউড় বাশবনের নীচে বয়ে চলেছে পাথরের বুকে নাচতে নাচতে স্বচ্ছ জলধারা।

পাহাড়ী ফুলের গন্ধে আকাশ বাতাস ভরপুর। সনাতন এগিয়ে চলেছে ! নীচের দিকে দেখা যায়—পাহাড়ের ফাঁকে বনভূমির অন্তরালে সাদা সাদা বাড়ীর আজব সহর !'

আনন্দে নেচে ওঠে তার প্রাণ—সহর ! ·· সিউড়ি নয় ত ! কেমন পাকা বাড়ীর পাশ ছুঁয়ে রাস্তাগুলো চলেছে···

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সনাতন। কতক্ষণ ছিল জানে না। পিছন ফিরে দেখে—বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নাই ! কোথায় সে চলে গেছে।

পিছু পিছু ছোটে সনাতন ! পাহাড় চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে। বনভূমির মাঝ দিয়ে সে উন্মত্তের মত চলেছে। চলেছে ত চলেছেই।

পাহাড়ের অন্তরালে সূর্য্য কখন ডুবে গিয়েছিল জানে না। প্রাণপণে ছুটে চলেছে সনাতন। চীৎকার করে—'কোথায় ওগো কোথায় তুমি !'

সাড়া মেলে না ! কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তোলে আকাশ বাতাসে।

গভীর বাণী বাতাসে বাতাসে ভেসে ওঠে কার স্তব্ধ ক্রন্দনধ্বনি। চলেছে সনাতন। এ পাশে কারা যেন হাসছে ! হাসছে তাকে দেখেই ! অশরীরী আত্মার দল চোখের সামনে অন্ধকারে ছায়ামূর্ত্তি হয়ে তাকে ভয় দেখায় ! অনুভব করে সর্ব্বাঙ্গে তাদের উষ্ণ নিশ্বাস। রুদ্ধ-কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে ওঠে। সারা বনভূমিতে চলেছে উত্তাল বাতাসের উদ্দাম-নৃত্য।

—'আলো—আলো—'

চারিদিক থেকে ভেসে আসে কাদের অট্টহাসি। নৈশ আকাশ-বাতাসে ওঠে অট্টহাসি—হাঃ হাঃ হাঃ।

কোনদিকে কি হয়ে গেল, জানে না ! পাথরে হোচট খেয়ে ঠিকরে পড়ল পাহাড়ের গা থেকে ! চলেছে নীচের দিকে ! বেউড় বাশের তীক্ষ্ণ কণ্টকে সারা গা রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

রুদ্ধ-কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে ওঠে ! বনভূমির অন্ধকার কে যেন দু'হাতে ছিটিয়ে দেয় সারা আকাশ-বাতাসে।

উন্মত্ত বনানীর বনস্পতিদের মাঝে ওঠে, ভীতির স্পন্দন !! রাতের মায়ায় পৃথিবী আজ ক্ষিপ্ত।

ঝড় চলেছে

আবার সকাল হয়। দিনকারমত ভাণ্ডির বনের ছায়া রেখায়, নদীর বালুচরে কাশবনে দেখা দেয় দিনের সূর্য্যের বন্দনা। আবার পৃথিবীর হয়েছে নব-জাগরণ !

বৃষ্টির জলে সারা গা খানা ধুয়ে মুছে গেছে ! এখন জল জমে রয়েছে ঠাঁই। কাল রাতের বর্ষণ চিহ্ন।

পাড়ার লোক জড় হ'য়ে পড়েছে !·· জীর্ণ রকটার চারি পাশে ভীড় করে ! বৃদ্ধ সনাতনের দেহটা পড়ে রয়েছে জীর্ণ চালাটার নীচে।

সে আর নেই। চলে গেছে বহু দূরে তার মুসাফির আত্মা। আর কোন দিন ফিরে আসবে না ভাণ্ডির বনের সীমারেখায়—ময়ূরাক্ষীর বালুচরে খয়রাকুড়ীর শালবনের সীমানায় !

সে আজ বহু দূরের পথ হারাণ পথিকদের সঙ্গী।

দুটী ঘুঘু

কাদের নওয়াজ

শরতের মিঠি রোদে, দুটী ঘুঘু
উড়ি উড়ি ডাকে,
বুকে বুক্ দেয় কভু, মুখে মুখ
বুলাইতে থাকে।
আগ্ ডালে ব'সে
কভু ডানা ঘষে,
কভু গাব্ গাছে গিয়ে
রবির আলোকে,
গাব্ গুবাগুব্ দোহে
বাজায় পুলকে।
এ দিকেতে কবি,
শরতেরি ছবি—
আঁকি ছন্দে, যতবার
বীণাটী তাহার,
সাধিবারে চায়, তার,
ছিঁড়ে বারে বার।

হেরি দুর্দ্দিন,
ছিন্ন এ বীণ
কবিরে প্রবোধ দিয়ে
দুটী ঘুঘু পাখী,
ঘু-ঘু রবে স্বর ধরি'
গাছে থাকি থাকি।
তাহাদের সনে,
গুঞ্জরণে—
শরতের আবাহনী গাহিল ভ্রমর,
বিস্মিত কবি, শুধু নয়নে বাদর—
ঝরিল, হৃদয় গেল ব্যথায় ভরি
ছিন্ন বীণাটী র'ল ধূলায় পড়ি।

মা নহে—মহাশ্মশান

খান মোহাম্মদ মোছ্লেহউদ্দিন

দুর্দিন বড় আজি
ভারত মায়ের মন্দিরে উঠে বিপদ শঙ্খ বাজি'।
পূজারীর বেশে পূজা-অরি এসে দুয়ারে দিচ্ছে হানা—
রক্ষী তাহার নিদ্রা কাতর জাগেনি উন্মেষণা,
ভারত মায়ের সন্তান মোরা হিন্দু মুসলমান,
একই বুকের স্তন্যে মোদের বাড়িয়াছে দেহ-প্রাণ।
ভাই ভাই আজ রক্ত-পিয়াসী—স্নেহ দয়া মায়াহীন,
একের বুকেতে ছুরি বসাইতে অন্যের কাটে দিন।
আত্মকলহ, ঘৃণা-বিষ-বায়, স্বার্থের সংঘাত,
করেছে ভাগ্য-আকাশে কৃষ্ণ-ঝঞ্ঝার ছায়াপাত।
সবাই চাহিছে নিজেদের দাবী করিতে সম্পূরণ—
নিজের দাবীটি পূরণ করিতে অপরে উৎপীড়ন।
এই নিয়ে হায় হাসি কান্নায় ঘৃণা আর অভিমান,
হয়ত দুদিন পরেই দেখিব মা নহে—মহাশ্মশান।

থিয়োরীর মরীচিকা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

থিয়োরীর যুগ শেষ হয়ে আসছে। The will-to-power is stronger than any theory. শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় এক একজন শক্তিমান মানুষের অঙ্গুলিহেলনে সব কিছু চলছে! পার্টি প্রোগ্রাম সবই গৌণ হ'য়ে পড়েছে। কংগ্রেস মানে গান্ধী, জার্ম্মানী মানে হিটলার, পার্লামেণ্ট মানে চার্চ্চিল, চীন মানে চিয়াংকাইশেক, রাশিয়া মানে ষ্ট্যালিন! একটা কাটা-ছাটা আদর্শের ছাঁচে রূঢ় বাস্তবকে ঢালাই করা সম্ভব নয়। থিয়োরীর কোনো দাম নেই—এমন কথা বলছিনে। বড়ো বড়ো সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে মতবাদের দাম নিশ্চয়ই আছে। গ্রামের লোকেরা মতবাদ বা থিয়োরী নিয়ে শতশত মাথা ঘামায় না। গান্ধীজী ৫।৭।৪২ তারিখের হরিজনে ঠিকই লিখেছিলেন, The people do not weigh the pros and cons of a problem. They follow their heroes. সহরের লোকেরা থিয়োরীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হোলেও বেশী দিনের জন্য নয়। রুসোর Contract Social, মার্ক্সের Communist Manifesto হাজার হাজার মানুষকে মাতিয়েছে! কিন্তু একটা সময় এলো যখন রুসোর Rights of Man-এর থিয়োরী তার আকর্ষণ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো। আজ Contract of Social নিয়ে কত মানুষ মাথা ঘামায়? অথচ রুসোর আদর্শ ফরাসী বিপ্লবের মতো একটা যুগান্তকারী আন্দোলনের স্রষ্টা আর সেই আন্দোলনকে দিগ্বিজয়ী করবার জন্য সহস্র সহস্র ফরাসী নাগরিক অকাতরে জীবন বলি দিয়েছে।

মার্ক্সের উপরে বিশ্বাসও আজ চোখের সামনে ম্লান থেকে ম্লানতর হ'য়ে যাচ্ছে। থার্ড ইনটারন্যাশনালের সমাধি কিসের ইঙ্গিত করছে? মার্ক্সের World Revolution-এর স্বপ্ন আজ পরিণতি লাভ করেছে কোন্‌খানে? Spengler বলছেন: But, as belief in Roussean's Rights of Man lost its force from (say) 1848, so belief in Marx lost its force from the World War...রুসোতে বা মার্ক্সে বিশ্বাসের এই দীনতার পিছনে কোনো আক্রোশ নেই, আছে ক্লান্তি। কোনো থিয়োরীর পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে মানুষ শেষ পর্য্যন্ত হয়রাণ হয়ে যায়। থিয়োরী দিয়ে বাস্তবকে শাসন করবার মূঢ়তা কেবল আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য নয়। প্লেটো নিজের আদর্শ দিয়ে সিরাকিউজ্‌কে (Syracuse) রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন, নগরীর রূপান্তর ঘটেনি, অবনতি ঘটেছিল। থিয়োরী-পাগল জ্যাকবিন্‌রা সাম্যের এবং স্বাধীনতার আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ফরাসী দেশকে উদ্ধার করলো, কিন্তু আর্ম্মির হাতে শেষপর্য্যন্ত চ'লে গেল ফ্রান্সের ভাগ্য।

জনগণের অধিকারকে কাগজে-কলমে স্বীকার করা এবং জাতির সত্যিকারের জীবনে জনগণের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা ঠিক এক কথা নয়—the rights of the people and the influence of the people are two different things. The more nearly universal a franchise is, the less becomes the power of the electorate. ভোটাধিকারকে ব্যাপকতর করা মানে ভোটদাতাদের ক্ষমতাকে ক্রমশঃ হ্রাস ক'রে দেওয়া। রাষ্ট্র খাতায় পত্রে আমাকে যতই অধিকার দিক না, টাকা না থাকলে সে অধিকার অর্থহীন হ'য়ে থাকবে।

রাষ্ট্রক্ষেত্রে শক্তিমান পুরুষেরা টাকার সাহায্যে রেডিয়ো আর সংবাদ-পত্র জনসাধারণের মত গড়বার এই দু'টো যন্ত্রকেই অধিকার করে। একদিকে তারা নিজেদের অনুকূলে জনসাধারণের মতকে গ'ড়ে তোলে—আর একদিকে চাকরী দিয়ে, পিঠ চাপড়িয়ে এবং আরো নানা উপায়ে এমন একদল মানুষ তৈরী ক'রে, যারা হবে নিজেদের ছায়া এবং প্রতিধ্বনি। বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতৃগণের চিত্ত-বিনোদন করে, কেঁদে গায়ের পোষাক ছিঁড়ে ফেলে, ভয় দেখিয়ে উপঢৌকনের সাহায্যে এবং সর্ব্বোপরি টাকার সহায়তা নিয়ে জনসাধারণের চিত্তজয়ের চেষ্টা সিসারোর এবং সিজারের রোমে আমরা দেখতে পাই। সেখানে ভোজ দিয়ে নির্ব্বাচনকারীদের হাত করবার কথা আমরা ইতিহাসে পাঠ করি। ভোট পাওয়ার জন্য সীজারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। অনেক টাকা তাঁর ধার হ'য়ে যায়। গলদেশ (Gaul) জয় কোরে তবে তিনি রক্ষা পান। অনেক টাকা তাঁর হাতে আসে। সিজার যে টাকা জমিয়েছিলেন—সে টাকা আনন্দ পাওয়ার জন্য নয়, মনিব্যাগের সোপান বানিয়ে শক্তির শিখরে উঠবার জন্য। এখানে সিজার আর সিসিল রোডসের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

রোমের ফোরামে (Forum) জনসাধারণকে একত্র জড় করা হোতো। সেই সমবেত জনতাকে লক্ষ্য কোরে বাগ্মীরা নানা অঙ্গভঙ্গী সহকারে বক্তৃতা করতেন। জনতাকে চোখের সামনে দেখা যেতো। শ্রোতৃবর্গের প্রত্যেকের চোখ এবং কান দুয়েরই উপরে গিয়ে পড়তো বাগ্মীর প্রভাব। আধুনিক ইঙ্গ-আমেরিকান রাজনীতিতে জনসাধারণের মনকে ছোঁয়ার প্রধান বাহন হচ্ছে সংবাদ-পত্র। সংবাদ-পত্রকে বাহন ক'রে প্রত্যেকটা মানুষকে রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় ক'রে তুলবার চেষ্টা হচ্ছে বিংশ-শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য। মানুষ এখন মানুষের সঙ্গে কথা বলে না। প্রেস এবং তার সহকর্ম্মী রেডিয়ো মহাদেশের পর মহাদেশকে ক্রমাগত বাণীর পর বাণী শোনাচ্ছে, সমগ্র জাতির জাগ্রত চেতনায়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর একই মন্ত্র পরিবেশন করছে। শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটা মানুষের ব্যক্তিত্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে কিসের যেন ছায়া হ'য়ে যায়।

যুদ্ধে বারুদ যে কাজ করে—প্রেস সেই কাজ করে! কামানের মতো সংবাদপত্রও যুদ্ধ জিতবার একটা প্রধান অস্ত্র। পুস্তিকার পর পুস্তিকা, সংবাদপত্রের পর সংবাদপত্র ক্রমাগত তোমার মনের দরজায় ধাক্কা মারছে—যা সত্য তার বিকৃত রূপকে তোমার সামনে পরিবেষণ করছে, যা মিথ্যা তাকে সত্য বলে তোমার মনের সামনে ধরছে। একই কথা ক্রমাগত পড়তে পড়তে শেষে মন স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে, যে নাটকের অভিনয় হ'য়ে চলেছে—অনাসক্ত সমালোচকের স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখবার শক্তি শেষ পর্য্যন্ত থাকে না। নর্থ ক্লিফের মতো বড় সংবাদপত্রের এক একজন সত্ত্বাধিকারী খবরের কাগজের ছবি, টেলিগ্রাম এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধের চাবুক ব্যবহার ক'রে হাজার

হাজার পাঠক-পাঠিকাকে ক্রীতদাসের মত চালিয়ে নিয়ে যায়। Spengler ঠিকই লিখেছেন; Democracy has by its Newspapers completely expelled the book from the mental life of the people. গণতন্ত্রের কল্যাণে মানুষের এখন মনের জীবন থেকে গ্রন্থ নির্ব্বাসিত হয়েছে। গ্রন্থের স্থান নিয়েছে সংবাদপত্র। সংবাদপত্র পাঠ ক'রে রাতারাতি মানুষ সবজান্তা হ'য়ে যাচ্ছে। আর এই সব সবজান্তা কথায় কথায় অতিমানুষদের মুণ্ডপাত করে! গ্রন্থের জগতে সত্যের নানাদিকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। যেখানে বেছে নেবার, প্রশ্ন করবার অবসর আছে। কিন্তু বই পড়বার লোক এখন অল্পই। অধিকাংশ লোকেরই মনের জীবনের দৌড় খবরের কাগজ পড়া পর্য্যন্ত। সাধারণ লোক নিজের নিজের পছন্দমতো একখানি কাগজ পড়ে। হাজারে হাজারে এই সব কাগজ মুদ্রাযন্ত্রের গর্ভ থেকে মুক্তি পেয়ে হকারের মারফৎ প্রতিদিন সদর দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকছে। উৎসুক পাঠক-পাঠিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভের প্রতিটী লাইন গলাধঃকরণ করে, খবরের কাগজে যা কিছু বেরোয় তারা সর্ব্বান্তঃকরণে তা সত্য ব'লে মেনে নেয়, সম্পাদকের কথাগুলো সকাল থেকে রাত্র পর্য্যন্ত তাদের মগজকে কি এক যাদু-মন্ত্রে আবিষ্ট করে রাখে। সংবাদপত্রে শুধুই কি রাজনৈতিক প্রবন্ধ? সেখানে আরো কতরকমের রোমাঞ্চকর খবর! সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনকাহিনী, খেলার চিত্তাকর্ষক বিবরণ, যুদ্ধবিগ্রহের চমৎকার সাজানো সংবাদ—পড়তে পড়তে মন সবকিছু ভুলে যায়। সংবাদপত্রের তুলনায় গ্রন্থ নীরস। সংবাদপত্র এসে সত্য সত্যই মানুষের গ্রন্থ পড়ার অভ্যাসকে কমিয়ে দিয়েছে।

Spengler বল্ছেন: What is truth? অর্থাৎ সত্য কি? তারপরেই বলছেন: For the multitude, that which it continually reads and hears. অর্থাৎ জনসাধারণ যা সব সময়েই শোনে এবং পড়ে তাই তাদের কাছে সত্য। বর্ত্তমানের চূড়ায় দোদুল্যমান যে সত্য ব্যক্তিগত নয়, সাধারণের তা মুদ্রাযন্ত্রেরই সৃষ্টি! সংবাদপত্র যাকে সত্য বলে চালাতে কৃতসংকল্প, তাই সত্য! What the Press wills is true. ছাপার হরফে যা প্রকাশ পায়, হাজার হাজার লোকের কাছে তা দুই আর দুইয়ে চারের মতোই সত্য। আর ছাপার হরফগুলো তাদেরই আজ্ঞাবহ ভৃত্য, যাদের টাকা আছে। এই শক্তিমান্ লোকগুলিই জনসাধারণের ভাগ্যবিধাতা। জনগণের মনকে এরা যে মূর্ত্তি দিতে চায়, সেই মূর্ত্তি দিচ্ছে ছাপার অক্ষরকে সহায় কোরে। গণতন্ত্রের কণ্ঠে আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-determined) বাণী—সে তো শূন্যগর্ভ একটা কথা মাত্র। আসলে মানুষগুলো হাজার হাজার নর্থক্লিফের মতো এক একটা মানুষের দ্বারা চালিত হয়ে চলেছে আগেকার যুগের ক্রীতদাসের মতো।

খবরের কাগজ যে-হেতু যুদ্ধজয়ের একটী অমোঘ অস্ত্র, সেই হেতু বিপক্ষকে এই অস্ত্রপ্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা রণকৌশলেরই একটী প্রধান অঙ্গ। যবনিকার আড়ালে লোকচক্ষুর অগোচরে শক্তির সঙ্গে শক্তির প্রবল সংঘর্ষ চলেছে প্রেস্‌কে টাকা দিয়ে কে কত কিনতে পারে এই নিয়ে। পাঠক জানতেও পারলো না—তার সংবাদপত্র কখন মালিক পরিবর্ত্তন ক'রে সুর বদলিয়ে ফেলেছে এবং নিজের অজ্ঞাতসারে তারও দৃষ্টিভঙ্গিমার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। স্পেংলার লিখছেন: এখানেও টাকারই জয়জয়কার—টাকা বাধ্য করে স্বাধীন আত্মাগুলিকে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির যন্ত্র হ'তে। No tamer has his animals more under his power, খবরের কাগজে গরম গরম প্রবন্ধ লিখে, মন-গড়া সংবাদ ছাপিয়ে পাঠকদের ক্ষেপিয়ে দেওয়া যায়। এমন ক্ষেপিয়ে দেওয়া যায় যে, তারা দরজা জানালা ভেঙ্গে চারিদিকে একটা হুলুস্থুল বাধিয়ে দেবে। আবার খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগকে একটু টিপে দিয়ে উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করাও কিছু কঠিন কাজ নয়। সংবাদপত্রসেবীরা হচ্ছে—এই বাহিনীর সেনানায়কের দল, পাঠক-পাঠিকারা হচ্ছে সাধারণ সৈনিক। যেমন প্রত্যেক সেনাবাহিনীতে, তেমন এখানেও সৈনিকেরা চোখ বুজে অন্ধের মত উপরকার নির্দ্দেশ অনুসরণ করে;—লড়াই যে লক্ষ্য নিয়ে চলেছে—যুদ্ধের পরিকল্পনা—এ-সমস্ত পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাচ্ছে সৈনিকের অগোচরে। কোন্ উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য পাঠক যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে—তা সে জানে না, তাকে জানবার অবসর দেওয়াও হয় না! A more appalling caricature of freedom of thought cannot be imagined. চিন্তার যে স্বাধীনতা—তার কি সর্ব্বনেশে প্রহসন। এখন টাকাওয়ালা লোকেরা সংবাদপত্রকে বাহন ক'রে তার দ্বারা মানুষকে যে-ভাবে ভাবাতে চায়, তাকে সেই ভাবেই ভাবতে হবে। তবুও সে মনে করে স্বাধীন মন নিয়ে ভাব্‌ছে! আগে মানুষ স্বাধীনভাবে ভাব্‌তে সাহসই করতো না, এখন সাহস করে, কিন্তু পারে না।

প্রেস তার সর্ব্বনেশে নীরবতা দিয়েও সত্যকে হত্যা করতে পারে। গণতন্ত্র কথা বল্‌বার স্বাধীনতা সবাইকে দিয়েছে কিন্তু প্রেস কারো কথা ছাপ্‌বে কি ছাপ্‌বে না—সে প্রেসের মর্জ্জি। প্রেস যে কোন সত্যকে ফাঁসিকাঠে পাঠাতে পারে। তার জন্য দরকার বেশী কিছু নয়, শুধু মৌনাবলম্বন করে থাকা। সত্যকে কাগজে জায়গা না দিলেই হোলো। সংবাদপত্রের পাঠক-পাঠিকারা আসলব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলো না। গ্রন্থের মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তার এবং অনুভূতির প্রকাশ—রেডিয়োর মধ্যে, সংবাদপত্রের মধ্যে একটা নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি। সেই উদ্দেশ্যের মধ্যে কাউকে ধ'রে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না। প্রতিদ্বন্দ্বীরা টাকার সাহায্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে পাঠকপাঠিকাদিগকে বিপক্ষ-দল থেকে ভাঙিয়ে এনে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিমাকে নিজেদের অনুকূলে তৈরী করতে। আগেকার রাজারা অনিচ্ছুক প্রজাদের বাধ্য করতো সৈনিকের কাজ করতে। এখন আর তার দরকার নেই। লোকদের দিয়ে বন্দুক ধরাতে চাও? উপায় খুব সোজা। দেহকে চাবুক মারবার প্রয়োজন কি? তাদের আত্মাকে চাবুক হানো। লেখো গরম গরম প্রবন্ধ, বের করো টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম, ছবির পরে ছবি। দেখবে প্রবন্ধ, টেলিগ্রাম, ছবি অদ্ভুত কাজ করেছে। লোকেরা বন্দুকের জন্য চীৎকার আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, চারিদিকে মার্, মার্ কাট্ কাট্ রব উঠেছে। উত্তেজিত

জনগণ নেতাদের বাধ্য কোরেছে লড়ায়ের আগুনে ঝাঁপ দিতে।

গণতন্ত্র গণতন্ত্র ব'লে এত লাফালাফি করেছি---সর্ব্বসাধারণকে ভোটাধিকার দাও বলে এত কলরব তুলেছি, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বলতে ভাবাবেগে নেচেছি---কিন্তু, হায়রে, কোথায় তার পরিসমাপ্তি! লিঙ্কনের 'Government of the people, for the people, by the people.' মর্ম্মের শৃঙ্খলমুক্ত নব মানবের স্বপ্ন! মিলের 'Liberty' বিশ্বকে গণতন্ত্রের নূতন ছাঁদে যারা রূপান্তরিত ক'র্তে চেয়েছে, তাদের আদর্শকে ধূলিসাৎ কো'রে জীবনের রথ উধাও হ'য়ে ছুটে চলেছে; জনগণ আজ পৃথিবীর কতিপয় শক্তিমান পুরুষের উদ্দেশ্যসিদ্ধির যন্ত্রমাত্রে পর্য্যবসিত? জনসাধারণের চিন্তা, সুতরাং কাজ আজ লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা! ডিক্‌টেটরেরা সেই চিন্তা এবং কর্ম্মকে যেরকম রূপ দিতে চায়, ঠিক সেই রকমের রূপ তাদের নিতেই হবে। জনগণ যাতে মানুষ না হ'য়ে ব্যক্তিবিশেষের ছায়ায় এবং প্রতিধ্বনিতে পর্য্যবসিত হয় তার জন্য, কেবলমাত্র তারই জন্য men are permitted to be readers and voters. রাজদণ্ড এবং রাজমুকুট যেমন শূন্যগর্ভ একটা মহিমায় পর্য্যবসিত হয়েছে—আসলে রাজার হাতে যেমন কোনো ক্ষমতাই নেই, তেমনি সর্ব্বহারাদের অধিকার কথাটাও আজ একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। বিংশ শতাব্দীর পার্লামেণ্টগুলি নাকি জনগণের অধিকারের প্রতীক। কিন্তু আসলে পার্লামেণ্ট হয়েছে একটা চৌকীদার-সমিতি, বড়োলোকদের স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্য চৌকী দেওয়া হচ্ছে পার্লামেণ্টের কাজ—Spengler-এর ভাষায় a solemn and empty pageantry.

ইলেকশনের এই যে ফার্স—এ ফার্স একদা রোমেও অভিনীত হোয়েছে। টাকা যাদের আছে তাদের স্বার্থের জন্য টাকা এই অভিনয়ের আয়োজন করে। ইলেকশনের এই বিরাট প্রহসনগুলোর অভিনয় হচ্ছে কিন্তু জনগণের স্বার্থের দোহাই দিয়ে। সমস্ত খেলাটার পিছনেই পূর্ব্ব পরিকল্পিত একটা কারসাজি রয়েছে। Spengler বলছেন: চরমপন্থী (অর্থাৎ বিত্তহীন) আদর্শবাদী দলগুলো যে অর্থ-শক্তির হাতে শেষপর্য্যন্ত ক্রীড়নক হ'য়ে দাঁড়ায়, টাকাওয়ালাদের টাকার খেলায় দাবার বোড়ে হ'য়ে যায় তার আসল কারণ এখানেই। বড় লোকেরা তাদের শক্র কাগজে কলমে, কিন্তু তাদের আসল আক্রমণ চলে পুরুত পাণ্ডা, দেশাচার, জাতির ঐতিহ্য—এসবের উপরে। Spengler লিখেছেন: Fifty percent of mass-leaders are procurable by money office,...and with them they bring their whole party, অর্থাৎ জনসাধারণের নেতা যারা—তাদের শতকরা পঞ্চাশ জনকে টাকা দিয়ে কেনা যায়, চাকরি দিয়েও কেনা যায়। তারা যখন ভাঙে দলশুদ্ধই ভাঙে।

টাকা বুদ্ধিবৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করে। সর্ব্বসাধারণকে লেখাপড়া শিখিয়ে এবং ভোটদানের সুযোগ দিয়ে ডিমোক্র্যাসি শেষপর্য্যন্ত টাকার ফাঁদে প'ড়ে নিজের গলায় নিজেই ফাঁসি দেয়। জনশিক্ষা এবং ভোটাধিকার মানুষের মনকে মুক্তি না দিয়ে তাকে দুচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলে। Spengler লিখছেন: Through money, democracy becomes its own destroyer, after money has destroyed intellect. টাকা যখন বুদ্ধিকে ডোবালো তখন টাকার হাতে প'ড়ে গণতন্ত্র আপনার গলায় আপনি ছুরি বসালো। মানুষ দেখলো আইডিয়া দিয়ে বাস্তবকে ঠেকানো যায় না। শক্তিকে কেবল শক্তি দিয়েই উন্মূলিত করা যায়, কোনো থিয়োরী দিয়ে নয়। তার মনের মধ্যে জেগে উঠলো একটা ব্যাকুল কান্না, অতীতের যে সকল মহৎ আদর্শ আজও বেঁচে আছে তারই জন্য ব্যাকুল কান্না। টাকা, টাকা, টাকা শুনতে শুনতে মানুষের কান ঝালাপালা হ'য়ে গেছে। মুক্তির আশায় তারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে সত্যের, অহিংসার, শৌর্যের চিরন্তন আদর্শগুলির প্রতি! এরা হয় তো প্রাণকে মুক্তি দিতে পারে। সময় আসন্ন ব'লে মনে হয় যখন কাঞ্চনপূজাকে মানুষ আদর্শ হিসাবে আমল আর দেবেনা, সহুরে মগজের বুদ্ধি ও আধিপত্য যে প্রাণশক্তির অভিব্যক্তিকে চেপে রেখেছে—তার কলধ্বনি আবার বেজে উঠবে মানুষের মনের গভীরে।

মহাকাল

শ্রীশতদল গোস্বামী

মানুষের শব-দেহে স্তূপীকৃত হতেছে পাহাড়:
আকাশে বিমান-সারি দলবদ্ধ উড়ে চলে যায়,
বাতাসে ছড়ায় বিষ, ওঠে তাই তীব্র হাহাকার—
ধ্বংসের সোপানে বসে মহাকাল পাখা ঝট্‌কায়।

কামানের গর্জ্জনে কাঁপে পৃথিবীর কম্পিত প্রহর
ধ্বংসস্তূপে ছাই হ'ল অতীতের কত ইতিহাস,
বীভৎস, কুৎসিত মৃত্যু নৃত্য করে মাথার উপর
মানুষের অন্তিম-শ্বাসে ভারাক্রান্ত হ'তেছে আকাশ।

ধ্বংসের দামামা বাজে আসে ঐ অভিশপ্ত দিন
কবরে ঘুমায় কত সৈনিকের বিকৃত কংকাল,
পাণ্ডুর বিবর্ণ সূর্য্য চিরতরে হ'য়ে যাবে লীন
ধ্বংসের সোপানে বসে হট্টহাসি হাসে মহাকাল।

অশরীরী (গল্প)

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এই ঘরের প্রত্যেকটি দেয়াল—এই বাড়ীর জানলা আর দরজা—এখানকার সমস্ত কিছু মীরাকে যেন তিলে তিলে শেষ করে দেবে; সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ওর চার পাশে কোন অশরীরীর স্পষ্ট ইঙ্গিত মীরা-যেন রোমকূপ দিয়ে অনুভব করে। আজকাল অনেক সময় মনে হয় ও আর বাঁচবে না।

অমলেন্দু মাঝে মাঝে বড় বেশী বিচলিত হয়। লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়—মীরার শরীরে ভাঙন ধরেছে। সারা মুখে নেমে এসেছে উগ্র কাঠিন্য। ওর চেহারার সমস্ত জৌলুষ পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে গেছে,অথচ মীরাকে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় না।

মীরা, কি হয়েছে তোমার? অমলেন্দু সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে।

কই কিছু না তো।

কিন্তু তোমার শরীর—

মীরা হাসে, আঃ রাখ শরীর, তুমি তো কেবলই আমায় শীর্ণ হ'য়ে যেতে দেখছ, অথচ নিজের শরীর কি হয়ে যাচ্ছে সে খবর রাখ? দেখ না আয়নায়—

স্বামীকে এমনি করে এড়িয়ে যেতে মনে মনে মীরার একেবারেই ভাল লাগে না। এক একবার সমস্ত জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে মীরা সামলে রাখে। তার মনের এ দুঃসহ দৈন্য বোধ হয় কোন দিনও সে অমলেন্দুকে জানাতে পারবে না।

শরতের অসহ গভীর রাত্রে মীরার ঘুম ভাঙে। অতি সন্তর্পণে—পাছে আবার অমলেন্দুর ঘুম ভেঙে যায়—মীরা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। বাতাস ভ'রে গেছে রজনীগন্ধার গন্ধে। একটা মিষ্টি আমেজ সব কিছু ভুলিয়ে দেয় যেন। তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মীরার বড় বেশী বাঁচতে ইচ্ছে করে। নিজেকে অনেক বড়ো করে দেখে ও—প্রাণপণে বাড়িয়ে দেয় মনের প্রসার—মন থেকে মুছে ফেলতে চায় সমস্ত ব্যাপারটা! অমলেন্দুর অতীতের ওপর, অমলেন্দু-অতসীর আনন্দ-উচ্ছল দিনগুলির ওপর একটা রূঢ় কৃষ্ণ আবরণ টেনে ফেলে মীরা শান্তির নিশ্বাস ফেলতে চায়।

কিন্তু তার সতর্ক চেষ্টা বহুবার ব্যর্থ হয়েছে। নিজের মনকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আজ ও অবসন্ন। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে ও কতবার বলেছে, হয়তো এ বাড়ীর দোষেই ওর এই জ্বালাময় বিকৃতি। বাড়িটা বদলালে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আজ মীরা স্পষ্ট বুঝেছে, আয়ত্তের বাইরে তার মন।

শরৎ-রাত্রির শান্ত হাওয়ায় বার কয়েক কপালের ওপর এসে পড়ল কয়েকটা এলোমেলো চুল। এতক্ষণ মীরা ভুলেই গিয়েছিল যে, গভীর রাত্রে বারান্দায় ও একা। হয় তো এই বারান্দায় একদিন অতসী আর অমলেন্দু দাঁড়িয়েছিল। ওরা কি খুব গা ঘেঁসে ছিল? অমলেন্দুর হাত স্পর্শ করেছিল কি অতসীর অঙ্গ? কি কথা বলছিল ওরা? হয়-তো অমলেন্দু খুব আস্তে আস্তে বলেছিল, তোমাকে এক মুহূর্ত্তও চোখের আড়াল করতে পারি না—যেমন মীরাকে প্রায়ই বলে। তার উত্তরে কি বলেছিল অতসী? অমলেন্দুর চোখ দু'টো কি আবেশে অপরূপ হয়ে উঠেছিল—প্রেমের কথা বলতে গেলেই যেমন হয়ে ওঠে? মীরার সারা মন জ্বালাময় দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে—ওর চৈতন্যে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরল মীরা। আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ওর ঘাড়ের ওপর পড়ল কার নিঃশ্বাস। চমকে ফিরে দেখে অমলেন্দু দাঁড়িয়ে!

এসেছ? অমলেন্দুকে আঁকড়ে ধরল মীরা।

কখন উঠে এলে তুমি!

এই তো এখুনি।

মীরার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অমলেন্দু বলল, আমায় ডাকলে না কেন?

দেখছিলাম আমার অনুপস্থিতি তুমি বুঝতে পার কি না—বাবা কি ঘুম তোমার! আমি ঘুমিয়ে থাকলেও বুঝতে পারি তুমি পাশে আছ কি নেই—তুমি আমায় একটুও ভালবাস না, না?

পাগলী! অমলেন্দু মীরার মাথাটা বুকে চেপে ধরে।

না—না—না, আর কেউ কোথাও নেই, কেউ কোনদিন ছিলও না, মিথ্যা অমলেন্দুর অতীত, মিথ্যা অতসীর অস্তিত্ব, মীরা মনে মনে বলে উঠল, শুধু সে আর অমলেন্দু। জন্ম-জন্মান্তর তারা দু'জন ঠিক এমনি করেই কাটিয়েছে একসঙ্গে—এমনি করেই কালের স্রোতে ভেসে ভেসে এসেছে তারা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। কেউ কখনও আসেনি তাদের মাঝে—কেউ ভাগ নেয়নি তাদের পাওনা থেকে—ঈশ্বর, এই কথাটা এক মুহূর্ত্তের জন্যে শুধু বিশ্বাস করতে দাও!

চল মীরা শুয়ে পড়ি, রাত অনেক হল।

না না, ওগো আর একটু থাকো, খাটে গেলেই তো ঘুমিয়ে পড়বে, মীরা আরও জোরে আঁকড়ে ধরল অমলেন্দুকে।

না না, মীরা আমার ঘুম পায়নি একটুও, বেশ এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা যাক্।

আচ্ছা, মীরা বিড় বিড় করে বলে উঠল, বিয়ের আগে, মানে অনেক আগে তুমি এই বারান্দায় দাঁড়িয়েছ, না?

হ্যাঁ, কতবার!

আর কে ছিল সঙ্গে? মীরা হঠাৎ বলে বসল।

আবার কে থাকবে? আমি একা, অমলেন্দু হাসল, তখন তো আর তুমি ছিলে না মীরা!

আঃ, মীরা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল।

বেশ, অনেকক্ষণ চুপচাপ।

ওগো!

বল, অমলেন্দু মৃদুস্বরে বলল।

তুমি আমায় কখনও ভুল বুঝবে না? মীরার কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

না গো না।

আমি যদি তোমায় কখনও ভুল বুঝি?

তা হ'লেও না।

তাই যেন হয়, শোন লক্ষ্মীটি, জীবনে যদি কোনদিন আমি তোমায় ভুল বুঝি, তখন তুমিও যেন আমায় ভুল বুঝে দূরে সরিয়ে দিও না, দয়া করে আমার ভুল ভেঙে দিও—বল দেবে?

হ্যাঁ, অমলেন্দু বলে। সে মোটেও আশ্চর্য্য হয় না। এমন পাগলের মত কথা, বিয়ের পর থেকেই মীরা মাঝে মাঝে বলে।

ঠিক বলছ? মীরার চোখ জলে উঠলো উৎসাহে।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

বাঁচলাম—চল এবার শুয়ে পড়ি।

ওরা বিছানায় এল। কিন্তু কিছুতেই মীরার চোখে ঘুম আসতে চায় না। ওর কেবলই ইচ্ছে করছিল অতসীর কথা জানতে। কিন্তু কি ভাবে অবতারণা করা যায়? অমলেন্দু যদি বুঝতে পারে তার দৈন্য, তা হ'লে মীরা মুখ লুকোবে কোথায়?

আচ্ছা দেখ, মীরা অমলেন্দুর আরো কাছে সরে এল, —ওই বারান্দায় অতসী কখনও দাঁড়িয়েছিল?

হ্যাঁ, অনেকবার।

তুমি পাশে ছিলে?

হ্যাঁ।

খুব কাছাকাছি ছিলে বুঝি? তোমার হাত অতসীর কাঁধে ছিল?

অনেক দিনের কথা, ঠিক মনে নেই মীরা, যতটুকু মনে আছে সমস্তই তো তোমায় বলেছি।

একটু দেখ না গো মনে করে? অতসীর সঙ্গে তুমি কোন ঘরে ব'সে বেশী গল্প করতে?

সব ঘরে, আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকতো, সব সময় আসতো কি-না।

রাত্তিরেও আসতো?

হ্যাঁ, তবে থাকতো না বেশীক্ষণ।

ওর বাড়ীর লোকে কিছু বলতো না?

না, কারণ, অমলেন্দু হাসলো, পাত্র হিসেবে আমি তো কিছু খারাপ ছিলাম না, আর আমাদের বিয়ের সমস্তই তো ঠিক ছিল।

তখন যদি তোমার জীবনে আমি আসতাম, আমায় নিষ্ঠুরের মত ফিরিয়ে দিতে তো?

সে কথা আজ কেন মীরা? তোমাকে পেয়ে যে আমার নতুন জন্ম হয়েছে, মনে করো অতসী ছিল আমার গত জন্মের সঙ্গিনী—

কেমন করে ভাববো!

মীরা, অমলেন্দু একটু চমকে ওঠে যেন, তবে কি সঙ্কোচ এসেছে তোমার মনে? সত্যি করে বলো, তুমি কি কিছুতেই ভুলতে পারছো না?

তুমি কি ভাবো আমাকে? মীরা ভয়ানক ক্ষেপে উঠলো অকস্মাৎ, আমি এত নীচ—এত হীন? এতটুকুও প্রসার নেই আমার মনের? আমি তোমাকে সময়ে—অসময়ে নানা প্রশ্ন করি; কারণ, তোমার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের প্রত্যেকটি কথা জানতে চাই—বেশ, আর কিছু কখনও জিজ্ঞাসা করবো না—

রাগ কর কেন মীরা? তোমাকে আঘাত দেবার জন্যে তো আমি কিছু বলিনি। ঠিকই তো, আমার জীবনের সমস্ত কথা তুমি ছাড়া আর কেই বা জানতে চাইবে!

হু হু করে মীরার চোখ ঠেলে জল ঝরে। শরতের তরল অন্ধকারভরা নিভৃত মন্থর রাত বেড়ে চলে। বাতাসে কিসের আমেজ!

অথচ আশ্চর্য্য লাগে মীরার!

আজকের আকাশেও শরতের তেমনি বিপুল সমারোহ—বাতাসের ঢেউএ ঢেউএ নীড় রচনার তেমনি আয়োজন। সেই-সব অনুভূতিশীল দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলি ক্ষণে ক্ষণে মীরার মনে ঝলসায়—যখন তাদের বিয়ে হয়নি। প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে মীরা যেন তার সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ করতে পারতো। তীক্ষ্ণ প্রাণময় অনুভূতি তার সারা অন্তর ছেয়ে ছিল। সেই দিনগুলির কথা বারে বারে স্মরণ করে মীরা, তার মনের রূপ প্রাণপণে পাল্‌টে দিতে চায়।

অমলেন্দুর কণ্ঠস্বর যেন তার কাণে ভাসে, দেখুন, মানুষের তখনি বাঁচতে ইচ্ছে করে, যখন সে আপনার প্রকাশ দেখতে পায় অপরের ভেতর।

মীরা মুচকী হেসে বলতো, আপনার বাঁচতে ইচ্ছে করছে না কি?

হ্যাঁ, অমলেন্দু সটান উত্তর দিত, কারণ নিজের প্রকাশ দেখেছি।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে মীরা ফস্ করে কথা ঘুরিয়ে নিত, কী বিশ্রী গরম পড়েছে আজ ক'দিন থেকে—

কথাটার মোড় ফিরিয়ে দিলেন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

মীরা মাথা নীচু করতো।

মীরা একদা ভেবেছিল, অমলেন্দুকে ফিরিয়ে দেবে। তার কেবলই মনে হ'ত, অমলেন্দু তাকে বড় বেশী বাড়িয়ে দেখেছে এবং একদিন তার সে ভুল খান খান হ'য়ে যাবে। কিন্তু একদিন অর্থাৎ মীরা যেদিন অকস্মাৎ নিজেকে আবিষ্কার করল, সেদিন সে স্পষ্টই বুঝতে পারলো, অমলেন্দুকে ফিরিয়ে দেওয়া সহজ নয়!

নিজেকে যখন আবিষ্কার করা যায়, তখন দেখা যায়—বাইরেও এসেছে পরিবর্ত্তন। পৃথিবীর আলোয়, আকাশে, হাওয়ায় কিসের সূচনা উপলব্ধি করা যায় যেন। সকলকেই সব কিছুকেই ভারী ভালো লাগে। কিন্তু নিজের পরম পরাজয়ের কথা ভেবে মীরার লজ্জার অবধি রইলো না।

তবু অমলেন্দুকে মুক্ত করবার চেষ্টার ত্রুটী সে করে নি। কারণ, নিজের সম্বন্ধে একটা বিশ্রী সংশয় মীরার ছেলেবেলা থেকেই ছিল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কোন পুরুষ কোনদিনও তাকে নিয়ে সুখী হতে পারবে না। নিজেকে একটু অসাধারণ ব'লে মনে হ'ত মীরার। একটা অদ্ভুত অসামঞ্জস্য সব সময় তার মনকে ঘিরে থাকতো। তাই ইতিপূর্ব্বে ভাবপ্রবণতার সাড়া কখনও তার বিশ্লেষণী নীরস মনকে নাড়া দিতে পারে নি। মীরার ভয় ছিল, এই বিশ্লেষণী মন একদিন নিশ্চয়ই অমলেন্দুর কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠবে। শান্তির কথা ভেবে, মঙ্গলের কথা ভেবে মীরার মনে হয়েছিল সরে যাওয়াই সমীচীন।

দেখুন, মীরা বলেছিল, আজ আপনার মনে হচ্ছে আমাকে ।য়ে আপনি সুখী হবেন, কিন্তু একটা কথা আপনার জেনে রাখা প্রয়োজন—

বলুন।

আমার চরিত্রে একটা অদ্ভুত নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা আছে, আমি যখন আপনার খুব কাছে কাছে থাকব, তখন আপনার মুহূর্ত্তগুলি কি অশান্তিময় হ'য়ে উঠবে না?

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে অমলেন্দু উত্তর দিয়েছিল, আমরা কেউ ছেলেমানুষ নই, পরস্পরকে আমরা বুঝেছি সম্পূর্ণ রূপে—আপনাকে জানবার সৌভাগ্য হয়েছে বলেই বুঝেছি, অশান্তি কোনদিনও আমাদের বিচলিত করবে না। আপনার চরিত্রের যে-দিকটার কথা ভেবে আপনি শঙ্কিত হচ্ছেন—আমি যদি বলি আপনার ওইদিকটাই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে —আপনার যা'কিছু সবই মঙ্গলময়, কল্যাণময়—

আজ আপনি একথা বলছেন, কিন্তু—

বললাম তো, যে-বয়সে মানুষ মোহে মেতে ওঠে, আমরা দু'জনেই সে-বয়স পার হয়ে এসেছি, সুতরাং শঙ্কা করবেন না।

তবু, আপনি আর একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখুন!

ভেবে দেখবার আর কিছু নেই।

এমনি করেই ওরা পরস্পরের কাছে এসেছিল! ওরা স্বপ্ন দেখেছিল ব্যাপক গভীর জীবনের। ওরা পণ করেছিল দৈনন্দিন ধরাবাঁধা জীবনে সৃষ্টি করবে নূতনত্ব। মীরা বুঝল, বাধা দিয়ে মহাজীবনের এ মহাসূচনাকে হত্যা করার সাধ্য তার আর নেই।

অকস্মাৎ কিসের সাড়ায় তার সমস্ত ইন্দ্রিয় রিন্ রিন্ করে উঠল। মীরার সমস্ত বিশ্লেষণ, সমস্ত সচেতনতা একে একে গেল মিলিয়ে। অসহ ভাবাবেগে আর দুরন্ত উচ্ছ্বাসে তার মুহূর্ত্তগুলি গান গেয়ে উঠল। আর সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, সে যেন নূতন মানুষ হ'য়ে উঠেছে।

সাধারণত যে বয়সে আসে প্রাণময় উচ্ছ্বলতা—জীবনের কাঠিন্য সচেতনতা নিয়ে আসে না, মীরা সে-বয়স পার হয়ে এসেছে ব্যাপক গাম্ভীর্য্যে। তার বয়সী অন্যান্য মেয়েরা যখন বিনুনি দুলিয়ে খেলে বেড়াত, মীরা তখন চুপ করে ব'সে কি যেন ভাবত। সব সময় সে চাইত প্রচুর নির্জ্জনতা। অনেক সময় তার মনে হ'ত আর সব মেয়েদের মত কেন প্রাণ খুলে ছুটো-ছুটি করে বেড়াতে পারে না সে? তার বয়স বেড়ে উঠল কিন্তু সে স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হল না। মীরার হৃদয়ের কোন বৃত্তি বোধ হয় সুপ্ত ছিল। বয়সের পরিবর্ত্তন তাকে কখনও নাড়া দেয় নি, কোন বসন্ত সাড়া জাগায় নি মনে। সব ক্ষেত্রেই তার নিজেকে মনে হ'ত ব্যতিক্রম। তাই বহুবার তার মনে হয়েছিল সংসারের দীপ সুন্দর ক'রে কখনও সে জ্বালিয়ে তুলতে পারবে না। কিন্তু অমলেন্দু তার সে-ভুল ভেঙে দিল। এইবার মীরার মনে হল অমলেন্দুর সঙ্গে তার আরও অনেক আগে আলাপ হল না কেন! তাহ'লে তার অতীতের অনেক বসন্ত অমন ক'রে বিফলে বয়ে যেত না। অতীতের প্রাণহীন দিনগুলির জন্যে মীরা সর্ব্বপ্রথম দুঃখ করল অমলেন্দুর সঙ্গে আলাপ ঘন হবার পর।

বিয়ের আগে একদিন অমলেন্দু বলেছিল, আপনাকে একটা কথা জানানো আমার একান্ত প্রয়োজন।

বলুন।

একথা আরো আগে আপনাকে বলা উচিত ছিল, বলি নি ইচ্ছে ক'রেই, কারণ তখন আমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ-গতি আজকের মত সঠিক এবং স্থির ছিল না।

বলুন, কি বলবেন, অত ভূমিকা কেন?

না না, আপনার কাছে ভূমিকার কি-ই বা প্রয়োজন, একটু থেমে অমলেন্দু বলেছিল, অতসী ব'লে একটি মেয়েকে প্রথম বয়সে আমি ভালবেসেছিলাম।

কিন্তু সে কথা আমাকে বলা কেন? এ তো স্বাভাবিক আর আমার কাছে আপনিই বড়ো, আপনার অতীত নয়, কাজেই ওকথা আর নয়—

মীরা, সত্যিই তুমি মহৎ—অমলেন্দু ব'লে ফেলেছিল অকস্মাৎ।

* *

তারপর একদিন ওদের বিয়ে হল।

বিয়ের পর মীরা এমন একটা সংসারে প্রবেশ করল, যেখানকার সমস্ত ভার পড়ল তার ওপর। অমলেন্দুর আর কোন আত্মীয় ছিল না। বিয়ের পর নূতন সংসারে প্রবেশ করেই মীরার সর্ব্বপ্রথম মনে হ'ল এখানে ঠিক এমনিভাবে আর একজনের আসবার কথা—সে অতসী! অতসীর সঙ্গে কেন অমলেন্দুর বিয়ে হল না? সে কেমন দেখতে ছিল? অমলেন্দুকে সে কি মীরার চেয়ে বেশী ভালবাসতো? অমলেন্দুর জীবনে মীরা হল না কেন একমাত্র মেয়ে?

মীরার অন্তরের কোন কোণে অতৃপ্তির একটা কাঁটা বিঁধে রইল যেন!

অতসীর সঙ্গে তোমার কেন বিয়ে হল না? মীরা অমলেন্দুকে জিজ্ঞেস করেছিল।

টাইফয়েডে সে মারা যায়।

একটু হেসে মীরা বলেছিল, সে আমার চেয়েও সুন্দরী ছিল, না?

না, না।

তোমাকে সে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসতো?

তোমার চেয়ে বেশী ভাল আর কে আমায় বাসবে!

বিয়ের আগে অতসীকে এতটুকুও স্থান মীরা দেয়নি, কিন্তু বিয়ের পর সে-ই তার কাছে হ'য়ে উঠল সব চেয়ে বড়ো। আর মীরার মনে হল তার পাওনা থেকে অনেক গ্রহণ করেছে অতসী। মীরার জীবনে আস্তে আস্তে কোথা দিয়ে নেমে এল থমথমে অন্ধকার। বিয়ের আগে সে-ব্যাপারটা তার কাছে ছিল অতি তুচ্ছ, বিয়ের পরে তাই হ'য়ে উঠল সর্ব্বপ্রধান।

অমলেন্দুকে সে কেবল প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল—অত্যন্ত

তুচ্ছ সামান্য প্রশ্ন। তবু অতসীর সম্বন্ধে মীরার কৌতূহল দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল। তার মনে হল অমলেন্দুর কাছ থেকে পরিপূর্ণ কিছুই সে পায় নি।

দেখ মীরা, একদিন অমলেন্দু বলল, কেন তুমি আমায় কেবলই প্রশ্ন কর? আজ আমার অতীতের কথা ভেবে কেবলই আমি সঙ্কুচিত হয়ে উঠি তোমার কাছে, ভাবি কেন অতসী এসেছিল আমার জীবনে? অতীতের কয়েকটা জ্বালাময় পাতা নিষ্ঠুরের মতো আমি পুড়িয়ে দিতে চাই—অথচ বারে বারে প্রশ্ন করে কেন আমায় তুমি সে-পীড়াদায়ক স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দাও?

গম্ভীর হ'য়ে মীরা বলেছিল, তোমার অতীতের সমস্ত কথা আমায় বলা উচিত নয় কি? তোমার প্রতিদিনের ইতিহাস আমি জানতে চাই।

নিশ্চয় তোমার জানা উচিত। কিন্তু শুধু অতসীর কথা তুমি কি কিছুতেই ভুলে যেতে পার না মীরা? আজ তোমায় পেয়ে আমি যে নূতন মানুষ হ'য়ে উঠেছি—আমার নূতনত্বকে তুমি পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করো। একদিন তুমিই তো বলেছিলে, আমিই তোমার কাছে বড়ো।—আমার অতীত নয়।

সেকথা মানি, কিন্তু তুমি আমায় ভুল বোঝ কেন? তোমার অতীত আজও আমার কাছে বড়ো নয়—শুধু জানতে চাই তোমার কথা।

আমার কথা জানো, কিন্তু মনে করো অতসী কোনদিনও ছিল না—একমাত্র তুমিই আমাকে নতুন করে গড়েছ—

বেশ, অতসীকে ভুলে যাবো আমি, মীরার চোখের কোনে কি জল চিক্‌চিক্ ক'রে উঠল?

ভুলে যেতে চাইলেই যদি ভুলে যাওয়া যেত তা'হলে বাঁচতে পারত মীরা। অমলেন্দুকে সে কথা দিয়েছিল অতসীকে ভুলে যাবে। আজ মীরার নিজের কাছেই কথাটা শোনায় লঘু পরিহাসের মতো। অথচ কেনই বা পারছে না ভুলতে? মীরা অনেক সময় নিজেকেই প্রশ্ন করে। তারপর অনেক রকম ক'রে নিজেকে বোঝায় ও। অমলেন্দুর সঙ্গে অতসীর যাই থাক না কেন, বিয়ে তো হয় নি। বিয়ের পর মানুষের হয় নতুন জন্ম। এখন আর কেউ কোথাও নেই—শুধু মীরা আর অমলেন্দু। তবু কিছুতেই মন মানতে চায় না মীরার। বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়তে লাগল বেচারী—তার যেন কোন শক্তিই আর নেই—কোন অদৃশ্য শক্তির অসহায় ক্রীড়নক হয়ে উঠল সে যা অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক; মীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেটাকে মনে মনে কিছুতেই গ্রহণ করে নিতে পারল না।

অতসীর সম্বন্ধে মীরার কৌতূহল এখনও মিটল না, বরং বেড়ে উঠতে লাগল দিনে দিনে। অথচ অমলেন্দুকেও প্রশ্ন করবার উপায় নেই, ভয় পাছে ধরা পড়ে যায়। উঃ, মীরা মরে যায় লজ্জায়—যদি তার এ মনোভাব কোন দিন ধরা পড়ে অমলেন্দুর কাছে? আত্মহত্যা করতে হবে তাহলে মীরাকে। অমলেন্দুকে জিজ্ঞেস করতে না পেরে মীরা গুমরে গুমরে জ্বলতে লাগল। এমন করে চেপে রাখলে কিছুতেই সে বাঁচতে পারবে না। তার চেয়ে মীরা ঠিক করল লঘু পরিহাসের ছলে নিবৃত্ত করবে তার কৌতূহল।

কি একটা কারণে সেদিন দুপুরে অমলেন্দু বেরুতে পারে নি। খুসী হল মীরা। দুপুরে অমলেন্দুকে বড়ো একটা কাছে পাওয়া যায়না। আর সে দুপুরটাও ছিল চমৎকার। দেখতে দেখতে শরতের শাদা আকাশে ঘন হয়ে এল কালো মেঘ। এলোমেলো হাওয়ার মাতামাতিতে মধুর হল মধ্যাহ্ন।

চল বেড়িয়ে আসি, অমলেন্দু বলল।

এখুনি বৃষ্টি আসবে যে—

আসুক না, হাত ধরাধরি করে বেড়াবার এই তো সময়।

একটু হেসে খুব হাল্কা সুরে মীরা বলল, অতসীর সঙ্গে বেড়াতে বুঝি?

কতবার! আরও হাল্কা সুরে বলল অমলেন্দু।

হাত ধরে বুঝি?

হ্যাঁগো, অমলেন্দু মীরার আরও কাছে সরে এল।

বাজের মতো বাজল কথাগুলো মীরার কানে। ঠিক সেই সময় বৃষ্টি নামল খুব জোরে। মেঘের গর্জ্জনে আর বিদ্যুতের ঝলকানিতে মেতে উঠল দিগন্ত। কিন্তু গুম হয়ে গেল মীরা। সেই মুহূর্ত্তে পৃথিবীটা ফেটে চৌচির হয়ে গেলেও সামান্যতম স্পন্দনও জাগতো না মীরার বুকে।

সেই রাত্রে যখন অনেকক্ষণ অবধি কিছুতেই মীরার ঘুম এলনা, তখন নিজেকে সম্বোধন করে মীরা মনে মনে বলে উঠল, শোন মীরা, দোষ তোমার, তুমি অমলেন্দুকে ভালবাসতে পারছো না, তাই তোমার কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে অতসী। কে অতসী? কেউ নয়, কিছু নয়। নূতন দৃষ্টি কোন দিয়ে দেখেছ তুমি অমলেন্দুকে, তোমার মতো ভাল বাসতে আর কোন মেয়ে পারে না। ছিঃ মীরা, আজ তোমারই ভালবাসায় ধরেছে ভাঙন, তাই রাত্রিদিন অতসী পীড়া দিচ্ছে তোমায়। ভালবাসো—আরো ভালবাসো, দেখবে তোমার সেই ব্যাপক গভীর ভালবাসার তীব্র তরঙ্গে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যাবে অতসী!

লজ্জায় মীরা মুখ লুকালো অমলেন্দুর বুকে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই উচ্ছল হয়ে উঠল মীরা। ছুটে ছুটে সংসারের কাজ করতে লাগল। আরও অনেক বেশী করে অমলেন্দুর দেখা শোনা করতে লাগল।

আজ তুমি কিছুতেই অফিস যেতে পাবে না, ঠিক বেরুবার সময় মীরা আব্দার ধরে বসলো।

কেন, কি হল তোমার?

আমার ইচ্ছে, আজ এক মিনিটের জন্যেও তোমায় কাছ ছাড়া করবো না।

বেশ, তবে যাবো না অফিস, অমলেন্দু ব'সে পড়ল চেয়ারটায়।

অনেকক্ষণ গল্প ক'রে কাটাল ওরা। আজ যেন ওদের কোন দায় নেই, কাজ নেই। হাসিতে আর সজীব কথায় মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হ'তে লাগল।

চল মীরা ছবি তুলিয়ে আসি, অমলেন্দু প্রস্তাব করলো।

বেশ তো, কতদিন আমরা ছবি তোলাই নি।

মীরা এতক্ষণ নিজেকে মাতিয়ে রেখেছিল নানা কথায়। ছবি তোলার কথায় আবার ওর সমস্ত গোলমাল হ'য়ে গেল। ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো মাথাটা। কিছুতেই মীরা আর নিজেকে সামলাতে পারলো না!

অতসীর সঙ্গে তুমি কখনো ছবি তুলিয়েছিলে?

হ্যাঁ, অমলেন্দু হেসে উঠলো, এক মজা হয় সেবার, ছবি তুলিয়ে ফেরার পথে অতসী বলেছিল, আজ আমাদের সম্বন্ধ একেবারে পাকা হ'য়ে গেল, আমি ছাড়া অন্য কাউকে তুমি আর বিয়ে করতে পারবে না, আমি ম'রে গেলেও না। আমি বললাম, যদি করি? ও বলেছিল, তাহ'লে আমি আসবো তোমার স্ত্রীর পেটে, কুরে কুরে খাবো তাকে—

য়্যাঁ! চীৎকার করে উঠলো মীরা।

তুমি অমন করছ কেন? অমলেন্দু লক্ষ্য করলো মীরার সমস্ত মুখ কাগজের মতো সাদা।

না না কিছু না, মীরা হাসল শুষ্ক প্রাণহীন হাসি।

দিন কয়েক পর সংবাদ পাওয়া গেল মীরা সন্তানবতী।

অমলেন্দুর যত্নের ত্রুটী নেই। একটা অভিজ্ঞ ঝি রেখে দিয়েছে সে। প্রায়ই ডাক্তার আসে। কিন্তু কিছুতেই কিছু খেতে চায় না মীরা।

কেন খাও না মীরা? বড় স্নেহময় কণ্ঠস্বর অমলেন্দুর।

ওগো, আমার একেবারেই ক্ষিধে পায় না, বড়ো ভয় করে, কান্না পায় খালি।

এ সময় অমন হয়, অমলেন্দু যেন কত বোঝে তুমি কিছু ভেবনা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

রাত্রে ভয়ে মীরা চীৎকার করে ওঠে, ওগো অতসী এসেছে, গলা টিপে ধরেছে আমার, উঃ—

মীরা, মীরা—ব্যস্ত হয়ে ওঠে অমলেন্দু। রাত-জাগা পাখী ডাকে। নিভৃত মন্থর মধ্যাহ্নে মীরার গা ছম ছম করে। সব সময় কে যেন পা টিপে টিপে চলে ওর সংগে। মীরা কেবলই একা থাকতে চায় আর কি যেন ভাবে সারাক্ষণ। একটা বিশ্রী অস্বস্তি ওকে পেয়ে বসেছে। সত্যিই কেউ ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে আর ও বহন করে বেড়াচ্ছে তাকে! সেই অদেখা শত্রুকে মীরা অনুভব করে নিজের মধ্যে। ভয়ে ও অজ্ঞানের মতো হয়ে যায়। রাত্রে ও যেন কাকে দেখতে পায়। কোন অশরীরী ওকে নিরন্তর ভয় দেখিয়ে ফেরে। মাঝে মাঝে ভারী কান্নায় ভেঙে পড়ে মীরা।

বিকট হাসির শব্দে অমলেন্দু ছুটে এল মীরার ঘরে। বিমূঢ় বিস্মিত বিচলিত হ'য়ে ও লক্ষ্য করলো, মীরার চুল আলুথালু, দৃষ্টি ঘোলাটে আর ও ছুটে ছুটে কাকে যেন ধরবার চেষ্টা করছে।

অমলেন্দুকে দেখে মীরা বলে উঠলো, অতসী এসেছে আমার পেটে, কুরে কুরে খাচ্ছে আমায়, ওকে ধরবো—আমি ওকে ধরবো, হাঃ হাঃ হাঃ—মীরা আঁকড়ে ধরলো অমলেন্দুকে।

আকাশে মেঘের সমারোহ। শরতের পৃথিবীতে কি বিপুল রহস্য।

আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা

এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেণ্টাব), বার-এ্যট-ল

(ছেষট্টি)

প্রগতিপন্থীদের ভাগ্যে সাধারণতঃ যা ঘটে, আকবরের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আচারপন্থী, লিখিত শাস্ত্র-বাক্যের পূজারী আলেম বা পুরোহিতসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁকে জীবনব্যাপী সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। আমরা বর্ত্তমান সন্দর্ভের গোড়ার দিকে এ বিষয়ের আলোচনা করেছি। আলেমদের ষড়যন্ত্র শেষে যে দেশব্যাপী এক অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল সে কথাও বলেছি। কর্ম্মকুশল আকবর সে বিপ্লবকে সহজেই দমন করে-ছিলেন। আলেমদের বাড়াবাড়ি সাময়িকভাবে সংযত হয়েছিল।

আলেমদের প্রভাব কিন্তু বিলুপ্ত হয়নি। অজ্ঞ জনসাধারণের উপর তাদের প্রভাব এবং আধিপত্য অপ্রতিহতই থেকে যায়। তাঁরা যখন বুঝলেন যে, বাহুবলের সাহায্যে আকবরকে দমন করা অসম্ভব, তখন তাঁর রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে, তাঁর বিভিন্ন প্রগতিমূলক সংস্কারের বিরুদ্ধে, তাঁর ধর্ম্মসংক্রান্ত মতবাদ এবং কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধে তাঁরা উগ্র এবং ধারাবাহিক প্রচার-কার্য্য চালাতে লাগলেন, আর এই অপকর্ম্ম সাধনে, আলোকের শত্রুদের সনাতন অস্ত্র কুৎসা-কীর্ত্তন, মিথ্যাভাষণ এবং অন্যায় অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিতে লাগলেন। আবুল ফজল তাঁদের জঘন্য কর্ম্মপদ্ধতির বিষদ বর্ণনা "আকবর নামায়" দিয়েছেন! বাদশা কোন প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করলেই, তাঁরা তারস্বরে চীৎকার করে উঠতেন, সম্রাট মুসলমানদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেছেন। এইভাবে তাঁরা বাদশাকে জনসাধারণের চক্ষে ধর্ম্মদ্রোহীরূপে চিত্রিত করতে লাগলেন, আর নিজেদের চিত্রিত করতে লাগলেন, ধর্ম্মের নিঃস্বার্থ রক্ষকরূপে। কেবল তাই নয়, তাঁরা ভক্তদের মধ্যে বলে বেড়াতে লাগলেন যে, বাদশা ঈশ্বরত্বের দাবী করেছেন, কমসে কম তিনি নিজেকে একজন পয়গম্বর বলে মনে করেন, দুষ্ট শিয়াদের মতবাদের তিনি সমর্থন করেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আলেমদের অক্লান্ত প্রচারকার্য্যের ফলে অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে আকবরের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষের ভাব তুষের আগুনের মত দেশময় ধূমায়িত হ'তে লাগলো। এই রকম চাপা আগুন অনেক সময় বিষম অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করে থাকে।

আকবর একান্ত সজাগ বুদ্ধি এবং দূরদর্শী বাদশা ছিলেন। তিনি সহজেই বুঝলেন, এক রাজ্যে দুই রাজার হুকুম চলতে পারে না। হয় ধর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব তাকে গ্রহণ করতে হবে, না হয়, ধর্ম্ম-যাজকেরা রাষ্ট্রের আধিপত্য তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নেবেন। বলা বাহুল্য, আকবর প্রথমোক্ত পন্থাই অবলম্বন করলেন। ঐতিহাসিক Lane Poole লিখেছেন: He (Akbar) found that the rigid Muslims of the Court were always casting in his teeth some absolute authority, a book of tradition, a decision of a canonical divine, and like Henry VIII he resolved to cut the

ground from under them ; he would himself be the head of the Church, and there should be no Pope in India but Akbar,"

এখানে অবশ্য একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, Henry VIII অসুবিধাজনক বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যই রোমের পোপকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজে সে ক্ষমতা করায়ত্ত করেছিলেন ; আর আকবর আলেমদের তথাকথিত অধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন রাজ্যে শৃঙ্খলা আনবার জন্যে, অন্তর্বিপ্লবের মূলোৎপাটন করবার জন্যে, আর সাম্রাজ্যকে উচ্চতর, ব্যাপকতর, উদারতর নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে।

১৫৮০ খৃঃ অব্দে জুম্মা প্রার্থনার দিনে মহামহিম ভারতসম্রাট্ ফতেপুর শিকরীর জামে মসজিদের প্রচার-বেদিকায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ভারতের মুসলমান শাসনের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা—কোন সম্রাট কোন দিন প্রচার-বেদিকায় দাঁড়ান নি। রাষ্ট্রের ন্যায় ধর্ম্মের ব্যাপারেও যে তিনি সবার উপরে, এ কথা অতি স্পষ্ট ভাষায় আকবর সকলকে সেদিন জানিয়ে দিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি সেদিন বলেন, "খোদা আমাকে বাদশা বানিয়েছেন, তিনি আমাকে জ্ঞানে বিভূষিত করেছেন, সাহস এবং শক্তি দান করেছেন। আমার অন্তরকে তিনি সত্যের প্রেমে ভরপূর করেছেন।"

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই আকবর তাঁর সমর্থক আলেমদের বিধান-সম্বলিত এক ফরমান জারী করেন। সেই ফরমানে তাঁকে ধর্ম্ম সম্পর্কীয় মতভেদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারীরূপে ঘোষণা করা হয়, আর এই ভাবে ধর্ম্ম সম্পর্কীয় কলহকে রাষ্ট্র থেকে বিদূরিত করা হয়। ফরমানের স্বাক্ষরকারীরা বলেন, ন্যায়নিষ্ঠ নরপতির ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় ক্ষমতা বা অধিকার মোজতাহিদ বা শাস্ত্রবিশারদ মহা-পণ্ডিতদের চেয়ে বেশী। সুতরাং যদি এমন কোন ধর্ম্মসমস্যা উপস্থিত হয় যা নিয়ে মোজতাহিদেরা একমতে পৌছুতে অক্ষম হন, সেরূপ অবস্থায় সম্রাটের সিদ্ধান্তই ভারতীয় মুসলমানদের জন্য চূড়ান্তরূপে গণ্য হবে। যারা সম্রাটের সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে তারা বিচারালয় এবং খোদার কাছে দণ্ডনীয়রূপে গণ্য হবে।" এই বিধানের সাহায্যে আকবর ধর্ম্মের বিধি-নিষেধকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনের তাগিদ মত পরিচালিত করতে থাকেন।

সাতষট্টি

নীহারিকার পরমাণুপুঞ্জ আলোকময় এক নক্ষত্রলোকের সৃষ্টি না করে ছাড়ে না। কালের প্রবাহ দুর্নিবার ভাবে সেই পথেই তাদের পরিচালিত করে। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর উদ্দাম লম্ফঝম্ফ ক্ষুদ্র জলাশয়ে এসে বিশ্রাম নেবার জন্য নয়; দুর্ব্বার গতিতে অসীম সমুদ্রের দিকেই সে চলতে থাকে। কবির প্রাণের ভাবের উৎস কোন অপরূপ ছন্দের কোন মধুর রাগিণীর সৃষ্টি না করে শান্ত হয় না। শেকস্পীয়ারের ভাবের উৎস মিয়ান্দা, জুলিয়েত এবং ডেসডিমনার সৃষ্টি করেছিল; হ্যামলেট, ম্যাকবেথ এবং লিয়ারকে রূপ দান করেছিল। আকবর ছিলেন জীবনের শিল্পী; রাষ্ট্র-শিল্পে তিনি ছিলেন শেকস্পীয়ার। আলোকসামান্য সৃজনী শক্তির দুর্নিবার প্রেরণা তাকে রাষ্ট্র-সৃষ্টির উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে নিয়ে যাচ্ছিল। গোড়ায় অবচেতনার ইঙ্গিতে, পরিণত বয়সে জাগ্রত চেতনার নির্দ্দেশে, ধীরে ধীরে, একান্ত সন্তর্পণে কিন্তু অপ্রতিহত গতিতে, অবিরাম ভাবে তিনি এক আদর্শ ভারতীয় রাষ্ট্র গড়ে যাচ্ছিলেন—যে রাষ্ট্রে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসীক প্রভৃতি সকলেরই স্থান হবে; যে রাষ্ট্রকে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই নিজের রাষ্ট্ররূপে গণ্য করতে পারবে, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগের খবর নেবে; যে রাষ্ট্র প্রত্যেক রাষ্ট্রবাসীর জন্য সেবা এবং সাধনার প্রেরণা যোগাবে; যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে সকলেই একান্ত আপন জন বলে ভাবতে এবং দেখতে পারবে; যে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটী নাগরিক দেশের সকলকে একই খোদার সেবক, একই আদর্শের সাধক, একই পথের পথিকরূপে গণ্য করতে পারবে। এই অপূর্ব্ব স্বপ্নই আকবরের সমস্ত কার্য্যকে, সমস্ত সাধনাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

অন্তরের এই দুনিবার সৃজনী শক্তির তাড়নায় আকবর আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ প্রভৃতি রচনার ব্যাপারে লিখিত শাস্ত্রবাক্য ছেড়ে নূতন জগতে অগ্রসর হয়েছিলেন, টীকাকারদের টিকা-টিপ্পনী ছেড়ে নূতন পথ ধরেছিলেন, ইউরোপের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের ব্যবহারিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে ক্রমবিকাশের উচ্চতম স্তরে, Legislation-এর পর্য্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। বিশ্বের ইতিহাসে তিনিই সর্ব্বপ্রথম রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে আইন-কানুন রচনা করেছিলেন। কোন জাতি বা শ্রেণীকে তার সাধনার মঙ্গলময় প্রবাহ থেকে বঞ্চিত রাখেন নি। তাঁর রাজত্বের বিভিন্ন সংস্কার, বিভিন্ন ব্যবহারিক বিধি-নিষেধ কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য রচিত হয় নি, সর্ব্বজাতির, সর্ব্বসম্প্রদায়ের মঙ্গলের আদর্শই তাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র সাধনার ক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়কর এক বিপ্লবের আমদানী করেছিলেন।

সাধারণ রাজনীতিকদের মধ্যে, আজকালকার গণতান্ত্রিক নেতাদের মধ্যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী কর্ম্ম এবং চিন্তাধারার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই সব লোক কোন বিষয়কে গভীর ভাবে তলিয়ে দেখেন না, সে ভাবে দেখবার ইচ্ছা তাঁরা পোষণ করেন না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিও রাখেন না। তাঁরা পরস্পরবিরোধী কর্ম্মধারা অবলম্বন করে চলেন, পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার অনুসরণ করেন, কেন না সে ভাবে কাজ করলে দশের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করা সহজ হয়, মানুষকে সহজে প্রভাবান্বিত এবং পরিচালিত করা যায়, আকবর সে শ্রেণীর লোক মোটেই ছিলেন না। তিনি যা করতেন খোদার উদ্দেশ্যে করতেন। খোদার নির্দ্দেশ স্পষ্ট করে অন্তরে অনুভব করে তবে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হতেন। আর তাই তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে একটা স্বাভাবিক ঐক্য, তাঁর কর্ম্মধারার মধ্যে একটা প্রবাহ-সম ধারাবাহিকতা দেখতে পাওয়া যায়। অন্তরের নির্দ্দেশে, অন্তরদেবতার আদেশে তিনি যেসব সংস্কার প্রবর্ত্তন করেছিলেন, যেসব বিধি-নিষেধ রচনা করেছিলেন, তাঁর দার্শনিক মন সে-সবের মূল উৎসের সন্ধান না করে থাকতে পারে নি। আর তাঁর দুর্লভ কর্ম্মকুশলতা সেই উৎসকে ভারতের জীবন ক্ষেত্রে সঞ্চারিত না করে স্থির থাকতে পারে নি। [ক্রমশঃ

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী (উপন্যাস)

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

অন্দরের সীমানা ছাড়িয়ে 'বাইরে কয়েক পা আসতে না আসতেই নিজের মধ্যে হারিয়ে গেলেন বিশ্বনাথ। ভুলে গেলেন আজ সারাদিন তাঁর খাওয়া হয়নি, ঘোড়ার পিঠে তীব্র চাবুক বসিয়ে ঘূর্ণির মতো পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। কিসের একটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ যেন অন্য সমস্ত অনুভূতি-গুলোকে তাঁর আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। লালাজীর সেই সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যঙ্গবিদ্ধ হাসি, বিনয়-বিগলিত কথার ভঙ্গিতে উদ্ধত অবজ্ঞা, চারিদিক থেকে ঘনিয়ে আসা সংকটের করাল ছায়ামূর্ত্তি—কোনটাই তাঁকে এত শীর্ণ আর সংকুচিত করে দেয়নি। রূপাপুরের কামারেরা হাতিয়ার ধরেছে—এই সোনাদীঘির মেলায় লালাজীর সঙ্গে সত্যিকারের একটা শক্তিপরীক্ষা হয়ে যাবে। তার জন্যে দেবী-কোট রাজবংশ চিরদিন প্রস্তুত হয়েই আছে। কিন্তু অপর্ণা?

একথা সত্যি, তাঁর বিরুদ্ধে অপর্ণার অভিযোগ অনেক আছে। তাঁর নিজের জীবন এত বহির্মুখী যে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অপর্ণার অভাব কখনো তাঁকে পীড়া দেয় না। ওঁরাও মেয়েদের বলিষ্ঠ গঠিত দেহে যে প্রখর যৌবনের আগুন জ্বলে—সে দীপ্তি অপর্ণার কোথায়? সত্যি কথা, অপর্ণাকে তাঁর মনে থাকে না। কিন্তু তাই বলে কোন্ অধিকারে অপর্ণা তাঁকে ব্যঙ্গ করতে পারে, ব্যঙ্গ করতে পারে তাঁর নিরক্ষরতাকে? আর সত্যিই তো তিনি মূর্খ নন। মোটা মোটা ইংরেজি বই পড়ে অপর্ণা হয়তো বুঝতে পারে, তিনি পারেন না। কিন্তু তাতে কী আসে যায়! তাঁর অমিত পৌরুষ—তাঁর শক্তি—

কিন্তু দাঁড়াও! বিশ্বনাথের মনের মধ্যে কে যেন প্রচণ্ডভাবে একটা ধমক দিয়ে তাঁর চিন্তাকে স্তব্ধ করে দিল। পৌরুষ আর শক্তি। যার জমীদারীর একখানার পর একখানা মহল দেনার দায়ে বিকিয়ে যায়, লাটের খাজানা দেবার জন্য ঘোড়ার সহিস রামসুন্দর লালার বংশধরের কাছে গিয়ে যাকে নতজানু হয়ে দাঁড়াতে হয়, তার শক্তি আর পৌরুষ! তার দাম কী! তার মূল্য কতটুকু!

তা হলে—তা' হলে অপর্ণার এই ব্যঙ্গের পেছনে তার কি কোনো ইঙ্গিত আছে? কোনো কটাক্ষ কি আছে এই দুর্ব্বলতাকে লক্ষ্য করে? অপর্ণা কি সত্যই ভেবেছে, যেদিন সব দিক থেকে মৃত্যু আর পরাজয় নেমে আসবে বিশ্বনাথের জীবনে, সেদিন সে আবার বিজয়িনীর মতো ফিরে যাবে তার মাষ্টারীর জীবনে? এতবড় অপমান সইবার আগে—

বিশ্বনাথ একবার থেমে দাঁড়ালেন।

মতিয়া পেছনে পেছনে ছায়ামূর্ত্তির মতো অনুসরণ করে আসছিল, বিশ্বনাথ তাকে লক্ষ্য করেন নি। তিনি থেমে দাঁড়াতেই সসংকোচে নিবেদন জানাল—হুজুর, রাণীজী বললেন—

রাণীজী! দুই চোখে আগুন বর্ষণ করে বিশ্বনাথ মতিয়ার দিকে তাকালেন। ঝড়ের নিশ্চিত পূর্ব্বাভাস। বিশ্বনাথের পায়ের চটীজোড়ার ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে মতিয়া জানাল—রাণীজী বললেন, চান করে—

—নাঃ, যা তুই সামনে থেকে। হন হন করে এগিয়ে গেলেন বিশ্বনাথ! মতিয়ার ভারী বিস্ময় বোধ হল—হুজুরের আজকে এত সংযম কেন। ওই চোখের দৃষ্টি তো তার চেনা। কারণে অকারণে ওরা যখন ধক ধক করে উঠেছে, তখনই দু'চার ঘা জুতো ধপাধপ তার পিঠে এসে পড়েছে। রাগের ওপরে অনেক জিনিস-পত্র যেমন আছড়ে ভেঙে ফেলে বিশ্বনাথের কোপটাও সেই রকম মতিয়ার পৃষ্ঠের ওপরেই প্রশমিত হয়ে থাকে। আজ যেন তার ব্যতিক্রম ঘটল।

বিশ্বনাথ রংমহলে যাওয়ার জন্যে পা' বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু মনে পড়ে গেল, আর একটা লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এসে বসে আছে। আর একটা লোক! একটা গভীর বিরক্তিতে ভ্রূ দু'টো কুঞ্চিত হয়ে উঠল—একটি মুহূর্ত্ত এরা কি তাঁকে ভাবতে দেবে না, আত্মগোপন করতে দেবে না নিজের নিভৃত অবকাশের মধ্যে? কে এসেছে এবং কেনই বা এসেছে সবই অনুমান করা অসম্ভব তাঁর পক্ষে। যেচে কেউ খাজনা দিতে আসেনি, অপ্রত্যাশিত সুসংবাদও বয়ে আনেনি কেউ। হয়তো ফরিয়াদ, হয়তো হাতে-পায়ে ধরে কোনো একটা কিছু মাপ করিয়ে নিতে চায়—নয় তো কোন দুঃসংবাদ। কোনো মহাজনের তাগিদদার হওয়াও বিচিত্র নয়। একবার মনে হল লোকটাকে পত্রপাঠ বিদায় দেবার কথা। কিন্তু নাঃ—ও পাপ একেবারে মিটিয়ে দেওয়াই ভালো।

যে এসেছিল, কাছারীবাড়ীর দাওয়ার নীচে ছায়ায় বসে একটা তৃষ্ণার্ত্ত কুকুরের মতো সে তখন জিভ বের করে' হাঁপাচ্ছে। অনেকটা পথ তাকে হেঁটে আসতে হয়েছে। তার শরীর দুর্ব্বল—রাত থেকে যে জ্বরটা ধরেছে এখনো ছাড়েনি। অসহ্য রৌদ্রে আর দমকা হাওয়ায় উড়ে আসা রাশি রাশি ধূলোতে—প্রত্যেকটা পদক্ষেপ তার গুণে গুণে আসতে হয়েছে; যতবার কাশি এসেছে, ধূলোর সঙ্গে মিশে মিশে চাপ চাপ রক্ত বেরিয়েছে, মুখ মুছতে গিয়ে ময়লা চাদরের প্রান্তটা তার রক্তে রাঙা আর আঠালো হয়ে গেছে। লোকটা আর কেউ নয়—কালীবিলাস কুণ্ডু।

দাওয়ার নীচে মূর্চ্ছিতের মতো বসে আছে কালীবিলাস। ক্লান্ত নিশ্বাসে বুকটা থর থর করে কাঁপছে, জিভটা আপনা থেকেই বাইরে ঝুলে নেমেছে। দেউড়ির দারোয়ানটা অনেকক্ষণ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে তাকে; কী একটা প্রশ্ন জাগছে তার মনে, কিন্তু কাছে এসে কিছু বলতে পারছে না। চোখ দু'টো যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে কালীবিলাসের, প্রাণপণে মেলে রাখবার চেষ্টা করছে, আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আপনা থেকেই। শুধু একবার স্বপ্নের মতো কাছারীবাড়ি, ফাটলধরা দেউড়ি, দেউড়ির দরজায় পা-ভাঙ্গা একটা সিংহ, অস্পষ্ট আকার নিয়ে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত তন্দ্রা যেন ভিড় করে ভেঙে পড়েছে কালীবিলাসের সর্ব্বাঙ্গে—তাকে তলিয়ে নিতে চায়, তাকে যেন আর জাগাবে না। আচমকা মনে হল, সামনে অনেকগুলো ঝাড়-লণ্ঠন,—অনেক লোকের কোলাহল। যাত্রার আসর বসেছে নাকি! হ্যাঁ, যাত্রাই তো! বিস্মিত কালীবিলাস দেখতে পেল, বহুদিন পরে আবার অধিকারী ম'শাই নেমেছেন গান

গাইতে। পরনে গেরুয়া পোষাক, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি; তাঁর তেজস্বী ভারী মুখখানা ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় জল জল করে জ্বলছে। বেহালার ছড়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বাজছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে বাজছে তাঁর কণ্ঠ:

"দিন এসেছে ডাক এসেছে
আজকে মায়ের শেষ বলি,
কে দিবি আয় মায়ের পায়ে
রক্তজবার অঞ্জলি।"

আশ্চর্য্য! কী অদ্ভুত গলা খেলছে অধিকারী মশাইয়ের। যতদিন কালীবিলাস তাঁর দলে ছিল ততদিন তাঁকে এমন প্রাণ দিয়ে গান গাইতে সে তো শোনে নি। কি আশ্চর্য্য স্বর, কী আশ্চর্য্য গলার কাজ। এমন করে বেহালা বাজাচ্ছে কে? কালীবিলাস লোকটার দিকে তাকালো, তার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু অপূর্ব্ব বেহালা বাজিয়ে চলেছে সে—যেমন গান, তেমনি তার বেহালার ঝংকার।

"কে দিবি আয় মায়ের পায়ে রক্তজবার অঞ্জলি"—কথা আর সুরের অপরূপ সমন্বয় হয়েছে। অধিকারী মশাইয়ের মুখখানা জ্বলছে, একটা আশ্চর্য্য জ্যোতি তাঁর সর্ব্বাঙ্গ থেকে যেন ছড়িয়ে পড়ছে। কালীবিলাসের ভালো লাগতে লাগলো—অদ্ভুতভাবে ভালো লাগতে লাগল। আকস্মিক একটা আনন্দের জোয়ার যেন বুকের ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে। কিন্তু আনন্দ-তরঙ্গের দোলায় বুকের ভেতর এত জ্বালা করে কেন, এমন ভাবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে কেন? অধিকারী ম'শাই কি এবার তাঁর দিকে তাকালেন? গানের সুরটা কী থেমে গেল? বেহালার সুরটাও কি আর শোনা যায় না?

—কে তুমি, কী চাও?

কে জিজ্ঞাসা করছে? অধিকারী ম'শাই কি তাকে চিনতে পারছেন না? পাঁচ বছরেই তিনি কি তাকে ভুলে গেলেন? যাত্রার আসরটা আর দেখা যায় না কেন? মুহূর্ত্তে সব যেন গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। সে কি স্বপ্ন দেখছিল? সে কোথায়? বুকের মধ্যে সেই তীব্র জ্বালাটা বড় বেশি স্পষ্ট, নিঃশ্বাস নিতে বড় বেশি কষ্ট হয়।

—উত্তর দিচ্ছ না কেন? কী হয়েছে?

কী হয়েছে? কী হবে আবার? কালীবিলাসের ঘুম পেয়েছে, বড় বেশি ঘুম পেয়েছে। আর সে চোখ মেলে তাকাতে পারছে না, তাকাতে চায়ও না। এই ঘুমটা তার অত্যন্ত ভালো লাগছে। কে ডাকে··ব্রজহরি? ভূষণ? না:, সে ওদের দলে আর যাবে না! বেজাটা ছোট লোক, অধিকারী ম'শাইকে নিন্দে করে, কু-কথা বলে। তার চাইতে এখানে ঘুমোনোই ভালো—ঘুমটি বেশ জমে এসেছে। আর সে সাড়া দেবে না, চোখ মেলেও তাকাবে না। না—না—না

বিশ্বনাথ শশব্যস্ত হয়ে বললেন, লোকটা কে? অমন করছে কেন?

ব্যোমকেশ কালীবিলাসকে চিনতেন। বললেন, এ তো ব্রজ পালের দলের লোক, কালী বুড়ো। কী বলতে এসেছে কে জানে। এতদূর হেঁটে এসে বোধ হয় মুহ্যমাণ হয়ে পড়েছে—তাই—কিন্তু, একি! মরে গেল নাকি লোকটা?

—মরে গেল!—বিশ্বনাথ বললেন, সে কি কথা! মরে যাবে কেন?

ম'তিয়া ঝুঁকে পড়ে একবারটি পর্য্যবেক্ষণ করলে কালীবিলাসকে। তারপর পেছনে সরে গেল। বললে, হাঁ, হুজুর, একদম মরে গেছে। মুখের ভেতর এক চাপ রক্ত জমে রয়েছে।

বিস্ময়-ব্যাকুল চোখে কালীবিলাসের চিরনিদ্রিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিশ্বনাথ। মরে গেল, এত সহজেই শেষ হয়ে গেল সমস্ত! এই কি মানুষের জীবনের মূল্য!

ব্রজহরির আল্‌কাপের দল ততক্ষণে খেয়া পাড়ি দিয়ে মামুদ-পুরের টাল ছাড়িয়ে বহুদূরে এগিয়ে গেছে।

সাত

কুমার বিশ্বনাথ চলে যাওয়ার পর লালা হরিশরণ এসে বসলেন বাইরের গদীতে। বেলা অনেক হয়েছে, এ সময়টা হরিশরণ ওপরের মহলে গিয়ে বিশ্রাম করেন। কিন্তু আজ আর তিনি ওপরে গেলেন না। রামদেইয়া গড়গড়া সাজিয়ে নিয়ে এল। মোটা গির্দ্দা বালিশটা হেলান দিয়ে নিজের ভেতরেই ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন হরিশরণ।

কাজ—কাজ—কাজ। পনেরো বছর বয়সে তিনি ব্যবসায়ে ঢুকেছিলেন, আজ তাঁর বয়স সাতান্ন। বেয়াল্লিশটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেছে নিজেই টের পাননি তিনি। খ্যাতির দিকে লোভ ছিল না, প্রতিপত্তির দিকে লক্ষ্য ছিল না। টাকা চাই, ব্যবসাকে বড় করা চাই। বিষ্ণুশরণ লালা যা রেখে গিয়েছিলেন, তাতে দিন চলে যেত—হয় তো ভালোই চলে যেত। কিন্তু হরিশরণ বাঙালী জমীদারের ছেলে নন, বাপ-ঠাকুর্দ্দার সম্পত্তিকে দু'হাতে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত নবাবী করবার মনোবৃত্তি তাঁর নয়। তা যদি হত—তা হলে শূন্যদম্ভের বোঝা নিয়ে আজ তাকে কুমার বিশ্বনাথের মতো মহাজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হত ঋণের প্রত্যাশায়।

কুমার বিশ্বনাথ!—লালাজী করুণার হাসি হাসলেন।

কী মূল্য অহমিকার, কতটুকুই বা দাম অর্থহীন আত্মমর্য্যাদার! বিদ্রোহী প্রজার ঘরে আগুন লাগানো? তার বাড়ীর মেয়েদের টেনে এনে কাছারীর পেয়াদার হাতে সমর্পণ করা? কী লাভ হয় তাতে? মামলা হয় মোকদ্দমা হয়, নিজের জেদের খেসারত দিতে হয় অনাবশ্যক অপব্যয় করে। শুধু কী তাই? একজন বিদ্রোহী প্রজাকে সায়েস্তা করতে গিয়ে দশজন বিদ্রোহী হয়; স্ফুলিঙ্গকে ইন্ধন দিয়ে জ্বালিয়ে তোলা হয় সর্ব্বগ্রাসী বিশাল অগ্নি-কুণ্ড, সেই আগুন একদিন এসে নিজেকেই গ্রাস করে বসে। লালা হরিশরন ইতিহাস পড়েননি—কিন্তু লোকচরিত্র তিনি জানেন। ক্ষমতার অন্ধ অহঙ্কারে অস্ত্রাঘাত করতে করতে সেই অস্ত্র একদিন প্রতিহত হয়ে আসে—লাগে নিজের গলাতেই। অত্যাচারের রূপটা স্পষ্ট হয় যত বেশী—বিদ্রোহের রক্তবীজ ততই বেশী পরিমাণে বংশবিস্তার করে। এ কথা আজ কুমার বিশ্বনাথকে দিয়েই তিনি স্পষ্ট করে দেখতে পান। বিশ্বনাথের প্রজারা ঘরবাড়ি

ছেড়ে পালায়, তারা খাজানা দিতে চায় না, তারা কৃষক ইউনিয়ন গড়ে তোলে, মামলা-মোকর্দ্দমা করে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব আজকে যেতে বসেছে। আর তাঁর এলাকাতে যারা কৃষক ইউনিয়নের পাণ্ডা, তাদের খাজানা তিনি মাপ করেছেন—বিনা সেলামীতে জমি বিলি করে দিয়েছেন। গ্রামে টিউব-ওয়েল বসিয়েছেন, স্কুল খুলে দিয়েছেন। ফল কি দাঁড়িয়েছে? হরিশরণ আবার হাসলেন। আজ তিনি একজন আদর্শ জমীদার, গরীবের মা-বাপ তিনি। গরীবেরা তাঁর জমীদারীকে বলে রামরাজ্য।

আর অহমিকা? পাঁচ বছর আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ল। সেটা আজো যেমন উপভোগ্য তেমনি উপাদেয় বোধ হয়।

একটা ইন্‌কাম-ট্যাক্স আফিসার, কত টাকা মাইনে পায় সে? তিন শো, চার শো, পাঁচ শো, ছয় শো? ঠিক জানেন না তিনি। মনে আছে ইন্‌কাম-ট্যাক্সের দরবার করতে তাঁকে নিজেই যেতে হয়েছিল তার কাছে। চলনে বলনে পুরো সাহেবী ধাঁচ লোকটার, চিবিয়ে চিবিয়ে বিলেতী কায়দায় কথা বলে. আর পাইপ খায়। লালাজীকে সামনের চেয়ারে বসতে বলা তো দূরের কথা, চোখের কোণে ভাল করে তাকিয়ে অবধি দেখেনি। তারপর খাতাপত্র নিয়ে তার সে কি গর্জ্জন আর হুঙ্কার! যেন গভর্ণমেণ্টের টাকা আত্মসাৎ করবার জন্যে দুনিয়াশুদ্ধ লোক মুখিয়ে বসে আছে, আর যেমন করে হোক এই সমস্ত দুর্জ্জনদের সায়েস্তা সে করবেই—এই তার ব্রত।

প্রচুর গালাগালি এবং তর্জ্জন হজম করেও লালাজী একটিও কথা বলেন নি, তাঁর মুখের একটি রেখারও স্থানচ্যুতি ঘটেনি। অথচ ইচ্ছে করলে তিনি অনায়াসেই বলতে পারতেন যে, পাঁচশো টাকা মাইনের একটা ইন্‌কামট্যাক্স-আফিসারকে চাকর রেখে তিনি জুতো বুরুশ করাতে পারেন। কিন্তু সেটা তিনি বলেন নি। বরং যুক্তকরে সবিনয়ে নিবেদন করেছেন, মহামহিমান্বিত হুজুর কৃপা না করলে তাঁকে সগোষ্ঠী উপোস করতে হবে, ভাসতে হবে অকূল পাথারে। অতএব—

সময়বিশেষে আরসোলাও পাখী হয়, সুতরাং তিনি যত শান্তি-বারি সেচন করছেন, মহামহিমান্বিত হুজুর দড়ির গিঁঠের মতো ভিজে ভিজে তত বেশী শক্ত আর জটিল হয়ে উঠেছেন। রাশি রাশি অপমান হজম করে কঠিন আর কালো মুখে বেরিয়ে এসেছেন লালাজী। শুধু ইন্‌কামট্যাক্স অফিসের কম্পাউণ্ড পার হওয়ার পরে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে—'লাট বন্ গিয়া শালা শুয়ারকা বাচ্ছা।'

তার দু'বছর পরে ছোটলাট যখন সত্যিই জেলা সফরে আসেন, তখন লাটসাহেবের খানাতে লালাজীরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। মাথায় জরীর পাগড়ি আর দিল্লীর বহুমূল্য আচকান পড়ে যখন লালাজী টি-পার্টির তাঁবুর সামনে নামলেন তাঁর ঝকঝকে বড় ক্রাইস্‌লার থেকে, তখন সর্ব্বপ্রথমেই চোখে পড়েছিল সুট পরে দূরে দাঁড়িয়ে সেই ইন্‌কামট্যাক্স-অফিসার। তার মুখে সে পাইপ নেই, সে সিংহগর্জ্জনও নয়। ম্লান, বিষণ্ণ এবং ভীত তার চোখের দৃষ্টি, সেই সঙ্গে একটা অক্ষম লোলুপতা—বেশ বোঝা যায়, এখানে ঢোকবার যোগ্যতা সে অর্জ্জন করেনি। তাঁবুর সামনে রেশমী পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরে দেখা যাচ্ছে সুসজ্জিত চেয়ার আর টেবিলের সারি, রাশি রাশি ফল, ফুল আর বিলাতী সুখাদ্যের সমারোহ। তীর্থের কাকের মতো দূরে দাঁড়িয়ে সে দিকে ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি ফেলছে—ঘ্রাণেই যতটুকু হয়। তার আশে-পাশে আরো দু'চারজন তার সগোত্রীয় দেখেই সান্ত্বনা।

লালাজী নেমে কার্ড বার করলেন, তকমা আঁটা চাপরাশী সেলাম করে পথ দেখিয়ে দিলে। ভেতরে ঢুকবার আগে লালাজী একবার পেছন ফিরে তাকালেন হুজুরের দিকে। হুজুর তাঁকে চিনেছেন, কোনো সন্দেহ নেই। পলকে তার মুখের চেহারা বদলে গেল, পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালটা মুছল একবার, তারপর বড় বড় পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লালাজী সেদিনের অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

কিন্তু কাজ—কাজ—আর কাজ। কোনো অপমান কোনো দাম্ভিকতা কাজের পথ থেকে তাঁকে ফেরাতে পারেনি। টাকা চাই, যেমন করে হোক বড় হতে হবে। এই বোধটা যদি মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে না থাকত, তা হলে ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসারকে ওভাবে তোসামোদ না করে পাঁচহাজার টাকা বার্ষিক খরচ বাঁচাতে পারতেন না তিনি।

বাইরে বেড়ে চলেছে বেলা। আর অনেকক্ষণ আগেই বিদায় নিয়ে গেছে প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর দল। গড়গড়ার নল থেকে এখন আর ধোঁয়া ওঠে না, অন্যমনস্কভাবে সেটাকে পাশে সরিয়ে রাখলেন লালাজী। সত্যি, অনেক করলেন তিনি জীবনে। আর অনেক না করলেই কি পাওয়া যায় অনেক? সেদিন ইন্‌কামট্যাক্স-অফিসারকে খোসামোদ করতে হয়েছিল বলেই পরে বাংলার গবর্ণর এসে দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন তাঁর প্রাসাদের।

কিন্তু আর নয়—এবার বিশ্রাম করা প্রয়োজন। ঐশ্বর্য্য শুধু তো অর্জ্জনের জন্যেই নয়, তাকে তো ভোগ করতেও হবে। বয়স অবশ্য কিছু বেশি হয়ে গেছে, তা ছাড়া বিশ্বনাথের মতো অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আমদসম্ভোগের স্পৃহাও তাঁর নেই, চরিত্রে নিষ্ঠার মূল্যও তিনি জানেন। কিন্তু তিনি এবারে বিশ্রাম করবেন আর ভোগ করবেন তাঁর যা প্রাপ্য, তাঁর রাজমর্য্যাদা। কুমারদহ ফাঁকির ওপর দিয়ে ব্যবসা চালিয়েছে অনেককাল, গায়ের জোরে আদায় করেছে সেলাম, আদায় করেছে সেলামী। কিন্তু আর সে সুযোগ তাদের দেওয়া চলবে না। সোনাদীঘির মেলা তার প্রথম পর্য্যায় মাত্র। রামসুন্দর লালা যে একদিন কুমারদহের রাজবাড়ীতে ঘোড়ার সহিসের কাজ করতেন, এই সত্যকে মুছে ফেলতে হবে, এই কলঙ্ককে আর সকলের সামনে বুক ফুলিয়ে আত্মপ্রকাশের অধিকার দেওয়া চলবে না।

রামদেইয়া?

জী!

রামদেইয়া সামনে এসে দাঁড়াল। কোমরের ঘুনসী থেকে এক গোছা চাবি বের করে লোহার সিন্দুকটা খুলে ফেললেন লালাজী। তারপর বার করে আনলেন এক তাড়া নোট আর কতকগুলো কাগজ। বললেন, একটু বেরুতে হবে, কুমারদহ যাব।

রামদেইয়া কোনো প্রশ্ন করল না, কৌতূহলও জানাল না। সে এইটুকুই জানে যে, হরিশরণ ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তিনি কিছুমাত্র আলস্য বা আরামের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। শুধু জিজ্ঞাসুভাবে যেন নিজের এ সম্পর্কে কী কর্ত্তব্য সেটা জানবার জন্যেই বললে—জী ?

বড় ঘোড়াটা ঠিক আছে ?

—জী হাঁ।

—কেমন চলবে ? জোর কদম ?—লালাজীর চোখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল : কুমার সাহেবের ঘোড়াটার চাইতে আরো জোরে ছুটতে পারবে তো ?

—কুমার সাহেবের ঘোড়া ? ভ্রূ কুঞ্চন করে চিন্তা করতে লাগল রামদেইয়া। না হুজুর, অত ছুটতে পারবে না। ওটা খেলোয়াড় ঘোড়া, বহুৎ তাকৎ।

—তা হলে কুমার বাহাদুরের এখনো কিছু কিছু আছে যা আমার নেই ! হরিশরণ হঠাৎ সকৌতুকে হেসে উঠলেন, হাঁ হাঁ আছে বই কি ! ওই দারুর বোতল। আমার সাধ্য নেই—ওখানে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি। সাহেব-মেমদের বহুৎ দারু খাইয়েছি কিন্তু মহাবীরজীর দয়ায় ওই হারামী চিজ খাওয়ার ইচ্ছে হয়নি কোনোদিন।

রামদেইয়া এতক্ষণ পরে যেন একটা ভালো কথা বলবার সুযোগ পেল।

—ও বড় শয়তান চিজ হুজুর। মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দেয়।

—হুঁ, সে তো কুমার বাহাদুরকে দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু —কিন্তু লালাজী নিজের মধ্যেই আবার তলিয়ে গেলেন : ঘোড়াটা অত জোরে চলতে পারবে না সত্যিই ?

রামদেইয়া নিরাশভাবে মাথা নাড়ল।

নাঃ। এবার একটা কাম করুন না হুজুর। কলকাতা থেকে বড় একটা ওয়েলার কিনে আনুন, আমি তালিম দিয়ে তাকে ওই ঘোড়ার চাইতে আচ্ছা করে দেব।

—আচ্ছা, সে দেখা যাবে পরে। কিন্তু— কিন্তু লালাজীর চোখ আবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠল : ঠিক হুয়া। তুই হাওয়া গাড়ীটাকেই বার করতে বলে দে।

হাওয়া গাড়ী ? এবারে রামদেইয়াও যেন বিস্মিত হয়ে উঠল : হাওয়া গাড়ী নিয়ে যাবেন কুমারদয় ? রাস্তা যে ভারী খারাপ হুজুর, গাড়ী একদম বরবাদ হয়ে যাবে।

বরবাদ হয়ে গেলে দোসরা গাড়ী কেনা যাবে। তুই গাড়ী বার করতে বল, আমি জামা-কাপড় পরে আসছি। আর আর— লালাজী হঠাৎ হাসলেন : একটা হাতিয়ারও সঙ্গে নেই, কি জানি, রাজারাজড়ার ব্যাপার !

—হাতিয়ার ? পিস্তল ?

—হুঁ।

রামদেইয়ার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল কপালে : হাতিয়ার কি হবে হুজুর ?

কাজে লাগতে পারে হয় তো।

মারামারী ? হাঙ্গামা ? জমি নিয়ে কোনো গোলমাল হয়েছে নাকি ? উত্তেজিত ও সন্ত্রস্ত রামদেইয়া যেন প্রশ্নের পর প্রশ্নবাণ বর্ষণ করতে লাগল : তা হলে হুজুরের যাওয়ার দরকার কি ? বরকন্দাজ যাক, লাঠি যাক থানায়, একটা খবর দেই। আমরা—

হরিশরণ প্রচণ্ড একটা ধমক লাগালেন এইবারে।

না, না, ওসব কিছু করতে হবে না। আমি যা বলি তাই শুনে যা খালি। হাওয়া গাড়ী বার করতে বল। আর আমি একাই যাব, সঙ্গে যেতে হবে না কাউকে।

নোট আর কাগজপত্রগুলো মুঠো করে নিয়ে হরিশরণ অন্দরের দিকে অগ্রসর হলেন।

মোটর লালাজীর আছে বটে, আশে পাশেও চলে, কিন্তু কুমারদহের রাস্তা এত দুর্গম যে সে পথে মোটর চালানো প্রায় অসম্ভব। গোরুর গাড়ির কল্যাণে রাস্তার সর্ব্বাঙ্গে রাশি রাশি গর্ত্ত; প্রতি পদে তার ভেতরে আটকে যেতে পারে মোটরের চাকা। মাঝে মাঝে সে গর্ত্ত এত গভীর যে তাতে বছরের প্রায় ছ'মাস কাদা জমে থাকে। এঁটেল মাটির সে কাদা আঠার মতোই শক্ত—গরুর গাড়ীর চাকা আঁকড়ে ধরে, বলদের পা একবার তাতে পড়লে টেনে তোলা যায় না। তা ছাড়া রাস্তার দু'পাশে নয়ানজুলি, পথ তৈয়ারী করবার সময় লোকাল বোর্ড ওখান থেকে কেটে কেটে মাটি তুলেছিল। খানিকটা ঘোলা আর অপরিচ্ছন্ন জল জমে রয়েছে, নয়ানজুলিতে উঠছে কাদার একটা দুর্গন্ধ। মোটরের চাকা একটুখানি বেশামাল হয়ে গেলে সোজা ডিগবাজী দিয়ে ওই জলের মধ্যেই আশ্রয় নিতে হবে।

অসমতল বন্ধুর পথে ক্রমাগত ঝাঁকুনি খেতে খেতে লালাজীর মোটর এগিয়ে চলল। পাঁচ মাইল পথ যেন পঁচিশ মাইলের চাইতেও দুর্গম হয়ে উঠেছে। মোটরের শব্দে দু'পাশের মাঠের গরুর দল চকিত হয়ে উঠল; কেউ কেউ বা ঊর্দ্ধশ্বাসেই ছুটতে সুরু করে দিলে। বাইরে থেকে রাশি রাশি ধুলো এসে পড়তে লাগল লালাজীর মুখে। তার পর আরো খানিকটা এগিয়ে আম বাগানের মধ্য দিয়ে একটা বাঁক নিয়ে গাড়ি ঢুকল কুমারদয়।

দু'পাশে ভাঙা বাড়ী ঝুঁকে পড়েছে, জংলা আমের বনের মধ্যে মজা দীঘির বুকের ওপর অন্ধকার ছায়া নেমেছে। মোটরের আবির্ভাবে এই দিন দুপুরেই কোথা থেকে দুটো প্যাঁচা উড়ে গেল। কচুরী পানার স্তরের ওপরে বসে যে সাপ দ গোখুর নিজের একরাশ নীল ডিমের পাহারা দিচ্ছল—চট করে জলের তলায় লুকিয়ে গেল সে। চোখে পড়ল রায় বর্ম্মাদের ভাঙা দেউড়ি। রামচন্দ্র রায় বর্ম্মার আমলে যাকে বলত সিংহদ্বার। সিংহদ্বারে পাথরের সিংহ এখনো বীরবিক্রমে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের রঙ মলিন আর বিবর্ণ, একটা দাঁড়িয়ে আছে তিন পায়ে তার লেজটাও খসে পড়েছে ; আর একটার মাথাই নেই, শুধু তার গলায় কোলানো কেশরগুচ্ছের ওপর কোলাহল করছে দু তিনটি চড়াই পাখী। দেউড়ীর সামনে মোটরটা থামতেই চড়াই পাখীরা ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে গেল।

অন্তঃপুরের দোতলাতে জানালার সিক ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন অপর্ণা। তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে প্রসারিত—যেখানে নীলের

বিস্তৃত পটভূমিতে সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, উড়ছে শঙ্খচিল। মনটা মুক্তি চায়, উড়তে চায় ওই শঙ্খচিলের মতো। কিন্তু সে মুক্তি নিতে হলে বিলাতী বইয়ের 'নোরার' মতো বেরিয়ে পড়তে হয়, আইরীণের মতো উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনুপ্রেরণায়। কিন্তু অত সুলভ রোমান্স অপর্ণার নেই। কী চমৎকার কলেজ-জীবন কেটেছে কলকাতায়। শীতের দীর্ঘ নিদ্রার পর থেকে পাহাড়ের গুহা থেকে যেমন করে বেরিয়ে আসে ক্ষুধার্ত্ত আর বিশালকায় অজগর—তেমনি প্রকাণ্ড এক ভুখা মিছিল প্রসারিত হয়ে গেছে হ্যারিসন রোড আর কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় থেকে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত। ইউনিভার্সিটির গেট দিয়ে জয়-ধ্বনি তুলে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা ছাত্রতরঙ্গ। মিশল সেই বিরাট মিছিলের সঙ্গে। সকলের পুরোভাগে রক্ত-পতাকা বয়ে অপর্ণা। একটা লালমুখ সার্জেণ্ট মোটর সাইকেল থেকে নেমে উঠে দাঁড়াল ফুটপাথে—অত্যন্ত সন্দিগ্ধ আর সঙ্কিত চোখে লক্ষ্য করতে লাগল এই বিরাট জনযাত্রাকে। তারপর ওয়েলেসলিতে জনসভা। নতুন মুক্তি নতুন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা দিয়েছে মানবতার উদয় দিগন্তে।

আশ্চর্য্য—সেই অপর্ণা আজ কুমার বিশ্বনাথের স্ত্রী। কুমার বিশ্বনাথ—সামন্ততন্ত্রের আত্মঘাতী ধ্বংসস্তূপ। তার সঙ্গে অপর্ণাকে আজ মানিয়ে নিতে হয়। কিন্তু শুধু মানিয়ে নেওয়ার কাজই অপর্ণার নয়। জয় করতে হবে বিশ্বনাথকে, তাঁকে নামিয়ে আনতে হবে তাঁর ব্রতের মধ্যে। অপর্ণা সেই দিনের প্রতীক্ষায় আছে। সম্রাটের ঔদ্ধত্য রাজশক্তির একটা দৃঢ় কঠোর মর্য্যাদাবোধ বহন করে বিশ্বনাথ তাঁকে এখনো উপেক্ষা করে চলেছেন, অস্বীকার করে চলেছেন। এই পরিবারে অন্তঃপুরিকাদের যে প্রাণহীন বিলাস মূল্য পুরুষানুক্রমিক ধরে নির্দ্ধারিত হয়ে এসেছে, সেই মূল্যই পেয়েছে অপর্ণা। কিন্তু সম্রাটের সাম্রাজ্যে আজ ভাঙন ধরেছে। তাকেও নেমে আসতে হবে, কিন্তু কোথায়? সম্রাট আর সর্ব্বহারার মধ্যে কোনো মাঝামাঝি স্তরভেদ নেই—তার শক্তি দুর্ব্বার আর প্রচণ্ড—শুধু সে শক্তি প্রকাশের প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু সম্রাটের পরিবর্ত্তনও একদিন আসবে—অপর্ণা আছেন তারই প্রতীক্ষাতে।

মোটরের শব্দে অপর্ণার চমক ভাঙল। কে এল? পুলিশের লোক নয় তো? বিশ্বনাথ সম্বন্ধে কিছুই অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত নয়। বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। অপর্ণা ডাকলেন, মতিয়া।

মতিয়া সামনে এসে দাঁড়াল।

মোটরে কে এলো দেখে আয় তো।

মোটর? মতিয়ার মনও শঙ্কিত আর কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। দ্রুতগতিতে নেমে গেল সে।

আর ওদিকে লালাজী দেউড়ি পার হয়ে ঢুকলেন সোজা কাছারী বাড়ির মহলে। কালীবিলাসের মৃতদেহের সামনে বিশ্বনাথ সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হরিশরণ সেখানেই দর্শন দিলেন এসে। চমকে ফিরে তাকালেন বিশ্বনাথ।

রাম রাম।

রাম রাম। বিশ্বনাথ সবিস্ময়ে বললেন, এ কি লালাজী?

হাঁ, হুজুরের টাকাটা দেবার জন্যে—

এই সময়ে, এত কষ্ট করে! কথাটা বলতে গিয়ে সৌজন্যের চাইতে সন্দেহই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল বিশ্বনাথের গলায়। এর পেছনে হরিশরণের কোনো রকম একটা চাল নেই তো? অথবা সোনাদীঘির মেলাটা যত তাড়াতাড়ি বাগিয়ে নেওয়া যায়, সেই আশাতেই?

বিশ্বনাথের দৃষ্টির প্রশ্নটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েই যেন কথা বললেন লালাজী। অত্যন্ত নিরীহ কণ্ঠে বললেন, হাঁ—যখন জরুরি দরকার। আমরা তো গোলাম—মনিবের সুবিধেটা সবসময়েই নজর রাখতে হয়। কিন্তু একি ব্যাপার? এ লোকটা কে পড়ে আছে এখানে?

অসীম বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিশ্বনাথ বললেন, কে জানে, ঠিক বুঝতে পারছি না। কি একটা খবর দিতে এসেছিল আলকাপের দল থেকে—

আলকাপের দল! লালাজীর ভাবান্তর ঘটল। বিচক্ষণ আর তীক্ষ্ণ চোখ গিয়ে পড়ল কালীবিলাসের মৃত্যুপাণ্ডুর আর রক্ত কলঙ্কিত মুখের ওপর। লোকটাকে চিনেছেন তিনি। সমস্ত মনটা চমকে উঠল, মনে হল।

বিশ্বনাথ বললেন, থাক, ওপরে চলুন।

লালাজীর কণ্ঠস্বরে কিছু টের পাওয়া গেল না। তেমনি শান্ত কোমল গলাতেই তিনি বললেন, হ্যাঁ চলুন। [ক্রমশঃ

বিদ্যাপতি

ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের আদিম উৎস। ভগীরথ যেমন মহাদেবের জটাজালবদ্ধ ভাগিরথীকে সাধারণ ব্যবহারের সমতল ভূমিতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন, ইঁহারাও সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সংস্কৃত পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাহিত্যের সুদৃঢ় বেষ্টনী হইতে মুক্তি দিয়া নবজাত প্রাদেশিক ভাষার উচ্ছ্বসিত, কূলপ্লাবী প্রবাহের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন। প্রাকৃত জনসাধারণ ও কাব্যরসিকের মনে প্রেমানুভূতির যে আবেগ যুগ-যুগান্তর হইতে সঞ্চিত হইয়াছে, বিরহ-মিলন, মান-অভিমান, হাসিকান্নার যে নিবিড় আবেশ অপরূপ ইন্দ্রজাল বয়ন করিয়াছে, ইঁহারা সেই সনাতন হৃদয়-লীলার সহিত বৃন্দাবন লীলার সংযোগের পথ প্রদর্শক। 'দেবতারে প্রিয় ও প্রিয়েরে দেবতা' করিয়া ধর্ম্মসাধনার মধ্যে কেমন করিয়া সহজ রসমাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যবোধের স্ফুরণ করিতে হয়, ইঁহাদের কবিতায় তাহা প্রথম পরিস্ফুট। তাই ইঁহারা যে বৈষ্ণব কবিতার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহার আবেদন কেবল একটা বিশেষ ধর্ম্মমতের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, মানবের চিরন্তন হৃদয়বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভক্তি ও বিশ্বাসের উৎস শুকাইয়া গেলেও এই কবিতার কোন ক্ষতি হয় নাই। অন্তরের স্বতঃউৎসারিত অফুরন্ত নির্ঝর এই শুষ্ক খাতে প্রবাহিত হইয়া ইহার শ্যামল সরসতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী যেন স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের হাতে অক্ষয় মিলনের চিহ্নস্বরূপ এক রাগরক্ত রাখীবন্ধন পরাইয়া দিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণের কাহিনী যখন সংস্কৃতের গণ্ডী ছাড়াইয়া প্রাদেশিক ভাষায়

আলোচ্য বিষয় হইল, তখন ইহার একটা গভীর প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অলৌকিকতার পরিমণ্ডলে ভক্তি ও সম্ভ্রমে অবগুণ্ঠিত সংস্কৃত শ্লোকের আবেগহীন শিল্প-সৌন্দর্য্য ও ছন্দোগাম্ভীর্য্যের আচ্ছাদনে সুসংবৃত এই ঐশী প্রেম প্রাচীন মৈথিলী ও বাংলার স্পর্শে যেন নূতন প্রাণ-শক্তিতে চঞ্চল, নূতন আবেগে মর্ম্মস্পর্শী ও নূতন গতিভঙ্গীতে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। নায়ক-নায়িকার রূপ-বর্ণনা ও তাহাদের মনোভাবের স্তর নির্দ্দেশে প্রাচীন আলঙ্কারিক রীতি অনুসৃত হইলেও, বাস্তব প্রতিবেশের সম্পর্কে বাস্তব অনুভূতির স্পর্শে এই প্রেমের মধ্যে বিশুদ্ধ রক্তপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছে ; পুরাতন ভাব নূতন ভাষায় আত্মপ্রকাশের তাগিদে যেন নব উপলব্ধির প্রবল প্রেরণা অনুভব ও অজস্র ও অফুরন্ত ছন্দোবৈচিত্র্যে ইহাকে রূপায়িত করিয়াছে। বিদ্যাপতির কবিতায় এই পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ রূপ প্রথম প্রতিফলিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের মধ্যে কে অগ্রবর্ত্তী তাহা অনিশ্চিত। তবে বিদ্যাপতি যে বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রাচীন ধারার সহিত আরও প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা বলা যাইতে পারে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রথম অংশে পুরাতন কাব্যরীতিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে ইতর কলহ ও পূর্ব্বরাগ বর্জ্জিত লোলুপতার অবস্থিতি প্রতিবেশে স্থানান্তরিত করিয়াছে। শেষের দিকে কবি কৃষ্ণকে উদাসীন্যে অবিচলিত রাখিয়া রাধার প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে বিরহবেদনা ও ব্যাকুল আত্মনিবেদনের দ্বারা মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ করিয়া আবার সনাতন ভাবমাধুর্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বিদ্যাপতির সহিত তুলনায় বড়ু চণ্ডীদাসের প্রথানুগত্য আংশিক ও অসম্পূর্ণ ইহাই অনুমান হয়। বড়ু যেন মহাজন-নির্দ্দিষ্ট মূল স্রোত ছাড়িয়া এক অখ্যাত, আভিজাত্য মর্য্যাদাহীন শাখাপথে তাঁহার কল্পনার তরণীকে বাহিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; শেষ পর্য্যন্ত প্রবাহের অনিবার্য্য আকর্ষণে নৌকার মুখ ফিরাইয়া আবার বৈষ্ণব ভাবধারার সাগরসঙ্গমে অন্যান্য তীর্থ-যাত্রীর সহিত মিলিত হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

বৈষ্ণবকাব্যের এই পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বসূচনা ভাষান্তরের পূর্ব্বেই কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' লক্ষিত হয়। জয়দেব অবশ্য সংস্কৃতে কাব্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু এই কাব্য সম্পূর্ণরূপে গীতি-ধর্ম্মী। সংস্কৃতকাব্যের নিরুচ্ছ্বসিত, স্তরের অনুরূপ সুরগাম্ভীর্য্য জয়দেবের কাব্যে শ্লোকের বন্ধন ও ভাবের সংযম ছিঁড়িয়া বিগলিত হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে নৃত্যছন্দে বহিয়া গিয়াছে। ললিতশব্দ বিন্যাস, ছন্দোমাধুর্য্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সমাবেশে প্রেমের ইন্দ্রজালমণ্ডিত আদর্শ পটভূমিকার রচনা—ইহাই জয়দেবের মৌলিক সৃষ্টি। তাঁহার কাব্যে ভাবগভীরতা অলঙ্কারবাহুল্যের প্রাধান্যের নিকট গৌণ হইয়া পড়িয়াছে ; শব্দঝঙ্কার সময় সময় অর্থসঙ্গতিকেও অতিক্রম করিয়াছে। ইহাতে হৃদয়ের গভীরতা হইতে উৎসারিত আবেগের কোন মর্ম্মস্পর্শী অভিব্যক্তি আমাদের মনকে অভিভূত করে না—সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীততরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আমরা যেন অসহায় ভাবে এক অস্পষ্ট মোহাবেশের নিকট আত্মসমর্পণ করি। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় উক্তি

'স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লব মুদারং'

যেন নিজ অপরূপ সঙ্গীত গুঞ্জনের অন্তরালে পুরাতন আধ্যাত্মিকতা ও নূতন সৌন্দর্য্যপিপাসার মধ্যে এক অমীমাংসিত আদর্শ-সংঘাতকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে।

দুই

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস জয়দেবের এই নূতন প্রকাশভঙ্গী, এই হৃদয়োচ্ছ্বাস গ্রহণ করিয়া তাহাতে ভাবগভীরতার সংযোগ করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থে 'গীতগোবিন্দের' কয়েকটী অংশের চমৎকার ভাবানুবাদ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতিও সাধারণভাবে তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পুরাতন ভাবধারার মধ্যে যতটা গভীর ভাবাবেগ সংক্রামিত করা সম্ভব ইঁহারা তাহা করিয়াছেন। চৈতন্যোত্তর যুগের নিবিড় আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ভাব-তন্ময়তা, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বিশ্লেষণের পূর্ব্বাভাষ ইঁহাদের রচনায় কিছু কিছু পাওয়া যায় ; তবে ইহা প্রতিভার পূর্ব্বসংস্কারের প্রমাণ না পরবর্ত্তীকালের সংযোজনা ইহা মতভেদের বিষয়।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রতীক রূপেই পরবর্ত্তী যুগের নিকট প্রতিভাত হইয়াছেন—তাঁহাদের ব্যক্তিগত পরিচয় এই প্রতিনিধিত্বমূলক মর্য্যাদার অন্তরালে অনেকটা আত্মগোপন করিয়াছে। ইঁহাদের নামের চারিদিকে অনেক মধুর পরিকল্পনা। অনেক কবিত্বমণ্ডিত কিংবদন্তী জড়িত হইয়াছে। মাথুর বিরহের পর রাধাকৃষ্ণের ভাবসম্মিলনের ন্যায় এই দুই ভক্ত কবির গঙ্গাতীরে মিলন ও অশ্রুজলসিক্ত প্রেমালিঙ্গনের কাহিনী কবি-কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। বৈষ্ণবসাহিত্যে ইতিহাস শুধু যাহা ঘটিয়াছে তাহারই অনুবর্ত্তী নহে, আদর্শ সুষমা ও সঙ্গতির নীতি অনুসারে যাহা ঘটা উচিত ছিল তাহারই প্রকটীকরণ। চৈতন্যদেবের চরিত-গ্রন্থসমূহে তথ্যবিবৃতি এই নীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক বিচারক্রমে এই ভক্তজনবাঞ্ছিত ও অন্তরপ্রেরণাপ্রণোদিত মিলনের কোন সমর্থক প্রমাণ নাই। তথাপি এই সমস্ত কল্পনাবিলাস বাদ দিয়াও বিদ্যাপতির বহির্জীবন আমাদের নিকট অনেকাংশে সুপরিচিত। বৈষ্ণব-কাব্যগোষ্ঠীতে তাঁহার জন্য যে আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার একটী অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যটুকুই তাঁহার সম্বন্ধে প্রধান আলোচ্য বিষয়।

বিদ্যাপতির সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে একেবারে অবিমিশ্র বৈষ্ণব প্রতিবেশ হইতে তাঁহার কাব্যপ্রেরণা স্ফুরিত হয় নাই। তাঁহার ধর্ম্মমত যে কি ছিল তাহা লইয়া তর্ক বিতর্কের অবতারণা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে পঞ্চোপাসক ক্রিয়াবান্ মৈথিল ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। খাঁটি বৈষ্ণবের এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে অন্যান্য বৈষ্ণবকবির ন্যায় পূর্ণভাবে রাধাকৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া দাবী করেন। এ প্রশ্নের মীমাংসার যথেষ্ট উপাদান না থাকিলেও, তাঁহার পদাবলীর প্রমাণে বলা যায় যে তাঁহার ভক্তি শিব, দুর্গা, কালী, বিষ্ণু ও রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি সমস্ত দেব-দেবীর উপরই ন্যস্ত হইয়াছে এবং এই সমস্ত কবিতাতে আন্তরিকতার সুরের কোন ইতর-বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবকবিরা যেরূপ আত্মবিস্মৃত, একনিষ্ঠ ভক্তিবিহ্বলতার সহিত রাধাকৃষ্ণের উপাসনায় ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রেমের মাধুর্য্যের অনুধ্যান করিয়াছেন, বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে সেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিষ্ঠার নিদর্শন মিলে না। তাঁহার উদার ধর্ম্মমত ভগবানের সমস্ত রূপের নিকট শ্রদ্ধা ও প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছে—তাহাতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও তীব্রতা উভয়েরই অভাব। তিনি যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন, সেইরূপ মহাদেবের খেয়াল ও পাগলামীতেও স্নিগ্ধ কৌতুক অনুভব করিয়াছেন, আবার রুধিরলিপ্তা, লোলজিহ্বা মহাকালীর মূর্ত্তিরও ভয়াবহ মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক ভাবে বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বে, প্রচণ্ড সর্ব্বগ্রাসী ভক্তিপ্লাবনের বেগ ইহাতে সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বে, ইহা একজন বিদগ্ধ, চতুর, রাজসভার আবেষ্টনে বর্দ্ধিত কবির কল্পনাকে কিরূপে প্রভাবিত করিয়াছিল, চৈতন্যধর্ম্মে দীক্ষিত খাঁটি বৈষ্ণবকবির সহিত তাঁহার রচনার সুরের ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির কি প্রভেদ, বিদ্যাপতির কবিতা (যদি তাঁহার আসল কবিতা পৃথক করা সম্ভব হয়) আমাদের এই কৌতূহল চরিতার্থতার পক্ষে সহায়তা করিতে পারে।

বাংলায় জাতীয়তার ধারা

শ্রীমতী অমিয়া বসু, বি-এ, বি-টি

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর আমাদের দেশে ইংরাজ রাজত্বের সূচনা হয়। দেশকে শাসনাধীন করিতে ইংরাজের আরও অনেক সময় লাগিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ইংরাজ তদানীন্তন দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার "দেওয়ানী" সনন্দ অর্থাৎ রাজস্ব আদায়, দেওয়ানী মোকদ্দমার ব্যবস্থা, শাসন বিভাগ এবং বাংলার নবাবের নিকট হইতে "নিজামত" অর্থাৎ ফৌজদারী বিভাগের যাবতীয় কাজের ভার লাভ করিল। ইংরাজ শাসন উক্ত সনন্দ লাভের পর হইতে আরম্ভ হয়। তারপর বিভিন্ন গভর্ণর জেনারেল বিভিন্ন পন্থা—দমন-নীতি, বশ্যতামূলক সন্ধি প্রভৃতি অনুসরণ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্ব বিস্তার করে। রাজপুত, মারাঠী, শিখ, স্বাধীন নৃপতিগণ কোম্পানীর সঙ্গে কখনও যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, সঙ্কটে পড়িয়া ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করে। ইংরাজ নির্ব্বিবাদে অপ্রতিহতভাবে ভারত শাসন করিতে লাগিল।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার ভারতবাসীদের শিক্ষাদানের জন্য বাৎসরিক কিছু অর্থ ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করে। সরকারের কাজ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। চতুর ইংরাজ কোম্পানীর কাজের সুবিধার জন্য ভারতবাসীদের ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতে লাগিল। এতদনুসারে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে পাশ্চাত্যশিক্ষার ব্যবস্থানুসারে নতুন ধরণের শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। ভারতবাসীদের পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত, এই বিষয়ে বিভিন্নমতাবলম্বী দু'টি পণ্ডিত দলের সৃষ্টি হয় এবং তাঁহাদের বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক সর্ব্বজনবিদিত। এই দুই দল—Anglicists এবং Orientalists বলিয়া পরিচিত। যথাক্রমে প্রথম দলের জয়লাভ হয়। উক্ত দলের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। রাজকার্য্যে, সাহিত্যক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের প্রচলন হইল। পাশ্চাত্য সভ্যতার অবধি প্রসার সহজ হইয়া গেল। ইংরাজ ভারতের কৃষ্টি বিজয় করিল (cultural conquest), ইংরাজের ভারত বিজয় পূর্ণ হইল।

পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও বিজ্ঞান চর্চ্চা ভারতে নবযুগের সৃষ্টি করিল। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচনা পড়িয়া রাজা রামমোহন রায় স্বাধীনতার উপাসক হইলেন। ব্যক্তিগত জাতিগত ও স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য তাঁহার মনে উচ্চাকাঙ্খা জন্মিল। রাজার বহুমুখীন প্রতিভা ছিল। নানা সংস্কার দ্বারা সুষুপ্ত দেশকে আন্দোলিত করিলেন। রাজা রামমোহন ছিলেন নব্য ভারতের প্রবর্ত্তক।

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ক্রমশঃ দেশে বিলাতী ভাবাচ্ছন্ন একদল ইংরাজী নবিশের সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রাজনারায়ণ বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। বসু মহাশয় তাঁহার আত্মজীবনীতে তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙালী সমাজের অকপটে বর্ণনা করিয়াছেন। উত্তরকালে তিনি ইংরাজী সভ্যতার মোহাচ্ছন্ন হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন, এমন কি শেষকালে ইংরাজ বিদ্বেষী হইয়া পড়িলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ। লর্ড ডালহৌসীর শাসন বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। তাঁহার সাম্রাজ্যবাদ, রাজ্যবিস্তারনীতি ও বিবিধ সংস্কার দেশে চাঞ্চল্য উপস্থিত করে। তদুপরি সিপাহীদের মধ্যে "কার্ত্তিজের" (Cartridges) ঘটনা। বিদ্রোহ দমন করিতে ইংরাজ রাজশক্তির অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল, অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইংরাজ জয়লাভ করে। বিদ্রোহান্তে ভারতের শাসননীতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইল। কোম্পানীর শাসন শেষ, ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী হইলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারত শাসন করিবেন, এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী করেন। দেশে মহানন্দ। ভারতেশ্বরীর জয়গানে দেশ মুখরিত। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের অন্তরালে একটি সংশয় উপস্থিত হয়—ইংরাজ রাজশক্তি অজেয় নহে। ইংরাজ-ভীতিও ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে লাগিল। দেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইংরাজ সরকার শাসনকার্য্যে ভারতবাসীদের যৎসামান্য রাষ্ট্রীয় অধিকারও দিতে লাগিল।

কলিকাতাতে জমিদারগণের উদ্যোগে British Indian Association স্থাপিত হয়। অতি সন্তর্পণে এই সমিতি দেশের অভাবের কথা লাট দরবারে উপস্থিত করিত। সংবাদ-পত্রসেবী হরিশ্চন্দ্র মুখার্জ্জী ও কৃষ্ণদাস পাল এই সমিতিতে যুক্ত ছিলেন। অতঃপর সাধারণের জন্য "অমৃত বাজার পত্রিকা"র শিশির কুমার ঘোষ Bengal National League স্থাপন করেন। League বেশী-দিন টিকিল না। পরে বাংলার রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যারিষ্টার আনন্দ মোহন বসু Indian Association প্রতিষ্ঠা করেন। সুরেন্দ্র নাথ এই সমিতির অধিবেশনে ছাত্রদের আহ্বান করিতেন। আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস, ফরাসী বিপ্লব, ইতালীর স্বাধীনতা, আয়র্লণ্ডের সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করিয়া ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিয়াছিলেন, তাঁহার অলৌকিক বাক্‌বিভূতি ছিল। সিভিল সার্ভিস হইতে বিতাড়িত অধ্যাপক সুরেন্দ্র নাথের ছাত্রমহলে তখন একাধিপত্য ছিল। তাঁহার সম্পাদিত "বেঙ্গলী" ও মতিলাল ঘোষের "অমৃত বাজার পত্রিকা" ইংরাজ শাসনের তীব্র সমালোচনা, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের "আনন্দমঠ" ও কবি হেমচন্দ্রের জাতীয় কবিতা বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে জাতীয়তার বীজ অঙ্কুরিত করে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্ম। প্রথম অধিবেশনে বম্বেতে সভাপতি হইলেন ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বহু-বৎসরাবধি কংগ্রেসসেবী ছিলেন। উভয়েই কংগ্রেসের সভানেতৃত্ব করিয়াছেন। জন্ম হইতে ১৯১৯ সন পর্য্যন্ত কংগ্রেস ছিল শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে। কংগ্রেস দেশের যাবতীয় দুঃখ দৈন্য আবেদনপত্রে ভারতসরকারকে জানাইত। কংগ্রেসের তখন ছিল ভিক্ষাবৃত্তি (mendicant policy)।

বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে ঘটনাক্রমে বাংলা দেশে জাতীয়তার আন্দোলন অন্তধারাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ১৯০৫ সনে লর্ড কার্জ্জন বঙ্গবিভাগ করিলেন। সমবেত কণ্ঠে বাঙ্গালী তাহার প্রতিবাদ করিল। বাংলার প্রতি জনপদে প্রতিবাদ সভা হয়। বাঙ্গালীর আবেদন, প্রতিবাদ ইংরাজ সরকার অগ্রাহ্য করে। এই অপমান ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর অসহিষ্ণু হইল। সুরেন্দ্রনাথের ওজস্বিনী বক্তৃতা, বিপিনচন্দ্রের বাগ্মীতা, রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ও মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনের প্রচার, বরিশালের অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মনিষ্ঠা ও অরবিন্দের প্রাণস্পর্শী রচনা বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করে। বাংলার জাতীয় জীবনে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। সেই যুগে বাংলার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় নিখিল ভারতে। বঙ্গভঙ্গ রহিত করাই বাঙ্গালীর সঙ্কল্প হইল। এই সঙ্কল্প হইতেই স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গালী বিলাতী পণ্য 'বয়কট' করিবে এবং স্বদেশী গ্রহণ করিবে। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সূতাকাটা তাঁতের ব্যবস্থা হইল। বাঙ্গালী মাঞ্চেষ্টারের মিহিবস্ত্র ছাড়িয়া স্বদেশী মোটা ধুতী শাড়ী পরিধান করিল। স্বদেশজাত বাণিজ্যের প্রতি বাঙ্গালীর আসক্তি হইল। ইহার ফলে বাঙ্গালীকে স্বদেশী বস্ত্র সরবরাহ করিবার জন্য বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল স্থাপিত হয়। বিলাতী বয়কট আন্দোলন তীব্র বেগে চলিতে লাগিল বিশেষতঃ বরিশালে। অশ্বিনীকুমারের অদম্য উৎসাহে, ব্যক্তিগত প্রভাবে বরিশালে ইংরাজ শাসন অচল হইল। অশ্বিনীকুমারের অনুমতি ভিন্ন স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও এক টুকরা বিলাতী কাপড় বাজারে কিনিতে

পায়েন নাই। কলিকাতাতে রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের একলক্ষ টাকার দানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অরবিন্দ বরোদাকলেজের সহকারী অধ্যক্ষতা ত্যাগ করিয়া বিনাবেতনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করেন। বাঙ্গালীর মাতৃভাষার উৎকর্ষের জন্য কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রনাথের বদান্যতার ফলে কলিকাতাতে বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৬ সালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী আহুত হয়। গভর্ণমেণ্ট অধিবেশনের প্রাক্কালে বাঙ্গালীর জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' বে-আইনী ঘোষণা করেন। কিন্তু সরকারের হুকুম অমান্য করিয়া সহস্রকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি বরিশালের আকাশ বাতাস মুখরিত করে। পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারে স্বেচ্ছাসেবকগণের শোণিতধারা বরিশালের রাস্তা ঘাট রঞ্জিত করে, সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হন। অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালীর প্রাণে আগুণ জ্বলিল।

ডিসেম্বর মাসে কলিকাতাতে দাদাভাই নৌরজীর পৌরহিত্যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রদর্শনীতে বিলাতীপণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়াতে রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে মতদ্বৈধ হয়। বিপিনচন্দ্র, মতিলাল, অশ্বিনীকুমার, ব্রহ্মবান্ধব ও অরবিন্দ উক্ত বিজ্ঞাপনের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পরিশেষে শিল্পপ্রদর্শনী বয়কট করেন। নেতৃবৃন্দ দুই দলে বিভক্ত হইলেন, প্রদর্শনী বয়কটওয়ালারা চরমপন্থী (Extremists) এবং সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নরমপন্থী (Moderates)। ১৯০৭ সনে সুরাটে কংগ্রেস। নরমপন্থীরা রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি প্রস্তাব করেন কিন্তু বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে চরমপন্থীগণ উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি করেন। নরমপন্থীগণ আপত্তি অগ্রাহ্য করাতে সুরাটে যজ্ঞভঙ্গ বা দক্ষযজ্ঞ হয়। কংগ্রেসমণ্ডপে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়া কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল। তদবধি চরমপন্থীগণ কিছুকাল কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই। পুনর্মিলন হয় লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে।

বাংলাতে ইতিমধ্যে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। কলিকতার উপকণ্ঠে মাণিকতলাতে বোমা প্রস্তুত ও গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য অরবিন্দ, তাঁহার অনুজ বারীন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন গ্রেপ্তার হইয়া আলিপুর আদালতে অভিযুক্ত হন। আসামীপক্ষের কৌন্সিলী ছিলেন চিত্তরঞ্জন। বহুদিন মামলার শুনানির পর অরবিন্দ খালাস পাইলেন বটে কিন্তু বারীন্দ্র প্রভৃতির দ্বীপান্তর হয়। কারাকক্ষের অন্তরালে অরবিন্দ সাধনাতে সমাহিত থাকিতেন। মুক্তিলাভের কিছু পর তিনি রাজনীতি বর্জ্জন করিয়া যোগসাধনার জন্য পণ্ডীচারী যাত্রা করেন। অ.দ্যও সেখানে অরবিন্দ ধ্যানস্থ, যোগাবিষ্ট। একদল শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক স্বাধীনতা লাভের জন্য অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। রুশিয়ার নিহিলিষ্টদের মত দেশে গুপ্তসমিতি স্থাপন করে। হিংস্র নীতিতে স্বরাজ লাভ সমিতির উদ্দেশ্য। এই সব বিপ্লবী যুবকদের বোমা, রিভলবারে অনেক স্বদেশী ও বিদেশী রাজকর্ম্মচারী আহত ও নিহত হন। ষড়যন্ত্রকারীগণ অচিরেই অবরুদ্ধ হন এবং কঠোর দণ্ড ভোগ করেন। এই যুবকদলের পালা শেষ হইলে ১৯০৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ১৮১৮ সনের তিন আইনানুসারে হঠাৎ গভর্ণমেণ্ট বাংলার নেতা অশ্বিনীকুমার, কৃষ্ণকুমার প্রভৃতি নয়জনকে বিভিন্নস্থানে নির্ব্বাসিত করে। ১৯১০ সনে ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের আগমনোপলক্ষে নির্ব্বাসিতগণ মুক্তিলাভ করেন, বঙ্গ-বিভাগ রহিত হয়।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের আমলে দেশের শান্তিরক্ষায় Rowlat Act দমননীতি মূলক বিধান প্রবর্ত্তন করাতে সমস্ত ভারতে অসন্তোষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী প্রতিবাদ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। পাঞ্জাবে অবস্থা গুরুতর হইল। সামরিক আইন পাশ ও জালিনওয়ালাবাগের নৃশংস অত্যাচার। Rowlat Act-এর ফলে বাংলার অগণিত যুবক পুনরায় অন্তরীণে আবদ্ধ হয়। ১৯১৯ সনে শাসনপদ্ধতিতে "মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার" প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু ভারতবাসী মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই সংস্কার প্রত্যাখ্যান করে। তারপর মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২১ সনে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়। মহাত্মার নির্দ্দেশমত শত শত বাঙ্গালী নরনারী আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ করে। বাংলার রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তিনি ক্রমে ক্রমে প্রধান "অসহযোগী" হইলেন। অতুল ঐশ্বর্য্য, ভোগবিলাস, আইন ব্যবসা ত্যাগ করিয়া দেশসেবাতে আত্মনিয়োগ করিলেন। চিত্তরঞ্জনের অতুলনীয় ত্যাগে বাঙ্গালীর প্রাণ স্পন্দিত হইল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতে তাঁহার গঠিত স্বরাজ্যদল বারংবার গভর্ণমেণ্টকে পরাজিত করে। অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর সংযম, কৃচ্ছ্রসাধন জীবন সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জনের সহিবে কি? আস্তে আস্তে শরীর ভাঙ্গিতে লাগিল। ১৯২৪ সনে দার্জ্জিলিং-এতে চিত্তরঞ্জন মহাপ্রয়াণ করেন।

চিত্তরঞ্জনের পর মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশমত দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন বাংলার রাষ্ট্রনায়ক হইলেন। তিনিও চিত্তরঞ্জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। আবার বাংলায় নূতন বিভীষিকার সৃষ্টি হইল। অসহযোগ আন্দোলনে অনেক যুবক যুবতী বিশ্বাস হারাইল। গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিল। বিপ্লবীদের গুলিতে অনেক ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর প্রাণ বিনষ্ট হয়। সরকারের কড়া শাসন চলিল। বিপ্লবীগণকে দমন করা হইল। যতীন্দ্রমোহন আইন অমান্য করার অপরাধে বন্দী হন এবং রাঁচীতে অন্তরীণ অবস্থাতেই তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার পর সুভাষচন্দ্র হইলেন বাংলার নায়ক। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শীঘ্রই তাঁহার মতদ্বৈধ হইল। কর্ত্তাদের নীতি তিনি নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করেন নাই, বিবেক বুদ্ধি হইল অন্তরায়। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করেন। বাঙ্গালীর আপনার জন সুভাষচন্দ্র। তাঁহার প্রতি কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আচরণে বাঙ্গালী বিক্ষুব্ধ হইল এবং অনেকটা কংগ্রেস-প্রীতি কমিল। বলিতে কি বাঙ্গালাদেশে অধুনা সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের পর কংগ্রেস হীনপ্রভ হইয়াছে। এদিকে বাংলা হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িক আত্মকলহে ক্ষতবিক্ষত হয়। অনেক বাঙ্গালী কংগ্রেস ছাড়িয়া হিন্দু মহাসভাতে যোগদান করেন। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয় নাই। অনেক কংগ্রেস কর্ম্মী বর্ত্তমানে ভারতরক্ষা আইনে কারারুদ্ধ। সরকারের দমন নীতিতে বাংলার রাজনৈতিক জীবন অচল নিস্পন্দ। কিন্তু বাঙ্গালীর মনে প্রাণে যে দেশাত্মবোধের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহা নির্মূল করা অসাধ্য। বাংলার জীবনধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত। বাঙ্গালী তাঁহার অতীত গৌরব ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা। বাঙ্গালীর আশা, সাধনা পূর্ণ হইবে। বাঙ্গালী আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে।

বন্ধু (গল্প)

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

—"আচ্ছা, রোজ দুপুরে বসন্তদা' এদিক পানে একলাটি কোথায় যায় জানিস?"

—"না, আমিও তাই ভাবি।"

"চল না একদিন পিছু পিছু দেখি কোথায় যায়,—যাবি?"

একমিনিট চুপ ক'রে থেকে মিন্টু সম্মতি দেয়, "যাবো।"

তাই হ'ল একদিন। গ্রামের শেষে ছোট্ট নদী ইচ্ছামতী। ওপার জুড়ে কচি ধানের ক্ষেত। আকাশের সীমাভরা নীল সবুজের রেখা। তারই বিজন কূলে গিয়ে দাঁড়াল বসন্তদা। খালি গা, খালি পা; ধীরে ধীরে নদীর পারে নরম ঘাসের উপর সে বসল। নদীর মাঝখান দিয়ে একটা মোটর লঞ্চ ছুটেছে, তারই ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়ে এপারে। নিস্তব্ধ দুপুর। দূরে কাছে কেউ কোথাও নেই। পাথরের মত নিথর হ'য়ে বসন্তদা বসে আছে। অদূরে ছোট্ট একটু জংলা গাছের ঝোপ। আর তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি কিশোর কদমের চারা, তপ্ত হাওয়ায় দুলছে।

"এ যে শ্মশান?" মিন্টু আঁৎকে উঠল।

অরুণ মিন্টুর বামহাতে চট্ ক'রে ছোট একটুখানি চিমটি কেটে বল্লে, "চুপ"।"

বসন্তদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে ঐ বনগুল্মটার দিকে। সেখান থেকে খানিকটা দূরে ইষ্টিমারের যাত্রীদের ওঠানামার সরু পথ। তারই একপ্রান্তে ষ্টেশন-ঘরের চালার এককোণায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অরুণ আর মিন্টুর গোটা পা বেদনা হ'য়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে অবসন্নভাবে বসন্তদা উঠে দাঁড়াল। কাপড়ের আঁচল থেকে কী যেন সে বের করে ধীরে ধীরে সেই ঝোপের ভিতর দিয়ে সে এগিয়ে চল্ল সেই ছোট কদমগাছটার তলায়। আর তাকে দেখা গেল না। একটু পরেই বাইরে বেরিয়ে এসে আবার পথ ধরল বসন্তদা। সেই জীর্ণ চালা-ঘরটার ভাঙ্গা বেড়ার কোল ঘেঁষেই রাস্তা। একেবারে ঘরের কাছটায় এসে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল বসন্তদা। মিনিটখানিক সেখানে দাঁড়িয়ে আবার সে ফিরে চাইল নদীর পানে।

ঘরের ভিতর মিন্টু নড়তে-চড়তেই খুট করে কী একটু শব্দ হল। অরুণ দুহাতে জোর করে মিন্টুর মুখ চেপে ধরলো। সর্ব্বনাশ! একটিবার বসন্তদা টের পেলে কি আর রক্ষা আছে? তার বুকের ভেতর যেন হাতুড়ীর ঘা পড়তে লাগল। এদিকে সজোরে নাক-মুখ চেপে ধরতেই মিন্টুর এলো একটা প্রবল হাঁচি। সঙ্গে সঙ্গে অরুণের গা দিয়ে দর দর ক'রে ঘাম বেরোতে লাগল ভয়ে।

"কে?"—বাইরে থেকে বসন্তদা হাঁকলো, "কে ঘরের মধ্যে?"

—"আমরাই।"

মুখ কাচুমাচু করতে করতে মিন্টুকে সামনে রেখে সভয়ে অরুণ এসে বসন্তদার সামনে দাঁড়াল। বসন্তদা'র চোখে জল। মনে হয়, অনেকক্ষণ ধরে সে কেঁদেছে। চট্ করে দুহাতে চোখ দুটোকে মুছে ফেলল বসন্তদা। অবসন্ন স্বরে প্রশ্ন করলো, "তোরা! তোরা এখানে কী করছিলি রে?'

কণ্ঠস্বরে অনেকখানি সাহস ফিরে এল অরুণের মনে। বল্লে, "রোজ রোজ আমাদের লুকিয়ে এই দুপুরে তুমি এখানে কেন আস বসন্তদা?"

বসন্তদা এবার কেঁদে ফেলল- শিশু যেমন করে আকুল হয়ে কাঁদে, তেমনি করে। মিন্টু ত অবাক। বসন্তদার চোখে জল!—আশ্চর্য্য।

বসন্তদা আরও সামনে এসে দাঁড়াল। ডান হাতখানি মিন্টুর আর বাম হাতখানি অরুণের কাঁধের উপর এক সঙ্গে রেখে ওদের দুজনকেই একেবারে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বল্লে, "বোস।"

সবাই বসে পড়লো সেই রাস্তার ধারে। ট্যাঁক থেকে বের ক'রে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিলো বসন্তদা। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে তাই টানলো। তারপর ধরা গলায় বল্লো, "তোদের মনে আছে, চক্রোত্তিদের পাঠশালায় পড়ত একটি ছেলে? ছোট্ট ফুটফুটে, মাথাভরা কোঁকড়া কালো চুল? দুষ্টু দুষ্টু চোখ আর মিষ্টি চেহারা?"

—"কোরকের কথা বলছো? বা-রে, মনে নেই? এই ত সেদিন এই জাহাজ-ঘাটায়ই সে এসে নামলো আমাদের সাথে; আমরা ফিরছিলাম মাসীবাড়ী থেকে আর ওরা সব আসছিল কোলকাতা হ'তে বেড়ে। লঞ্চের ভেতর "কুকীজ" কিনে খেলাম আমরা সবাই।"—এক নিঃশ্বাসে মিন্টু বলে ফেলল।

প্রায় সাথে সাথেই অরুণ বল্লে, "আপনাকে সে খুব ভালবাসে, না বসন্তদা?"

সজল চোখে বসন্তদা জিজ্ঞাসা করলো, "সে কোথায় জানিস?"

অরুণ বল্লে. "না তো!"

মিন্টু বল্লে, "তার তো অসুখ।",

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বসন্তদা বল্লে, "হাঁ, কিন্তু অসুখ তার ভাল হয়ে গেছে।"

—"সত্যি?" স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মিন্টু প্রশ্ন করল।

অকপটে বসন্তদা বল্লে, "সত্যি, আর কোনও দিন তার অসুখ করবে না, সে আর বেঁচে নেই।"

ইলেকট্রিক তারের স্পর্শের মত অরুণ আর মিন্টু দুজনেই চমকে উঠল একসঙ্গে। বিবশ হ'য়ে তারা তাকিয়ে রইল বসন্তদা'র পানে।

উদাসদৃষ্টি আকাশের পানে মেলে বসন্তদা আবার বল্লে. "আজ একমাস।"

অবাক হয়ে ওরা বসে রইলো। কোন প্রশ্ন পর্য্যন্ত করতে পারলো না। বসন্তদা আঙুল দিয়ে সেই শীর্ণ কদমগাছটার পাশে দেখালো। বল্ল, "দেখবি?"

কী যে বলবে ওরা কিছুই স্থির করতে পারছিল না। ক্রমশঃ হতে বসন্তদা' উঠে দাঁড়াল। বল্লো, "চল্।"

কাছে গিয়ে সবাই দেখতে পেল নদীতটের এক অংশে একটা অনতি-পুরাতন শ্মশান। দগ্ধগাছের গোটাকয়েক আধপোড়া শাখা, একরাশ কালো অঙ্গার, একটা ভাঙ্গা মাটির কলসীর ছড়ানো টুক্‌রো আর কতকগুলি অর্দ্ধদগ্ধ বাঁশের খণ্ড চারদিকে ছড়ানো। জলের একেবারে কিনারায় একপ্রস্থ ছিন্ন মাদুর আর পরিত্যক্ত বালিশ-বিছানা তখনো রোদে পুড়ে, জলে ভিজে অদ্ভুত হ'য়ে আছে। সেই দগ্ধ অঙ্গাররাশির উপর কে ছড়িয়ে রেখেছে একমুঠো সদ্যফোটা সাদা বেলফুল। হাত তুলে বসন্তদা বল্লে, "দেখেছিস?"

চোখ তুলে চাইল ওরা দুজনেই। কদম গাছটার সামনের অংশের কতকগুলো পাতা পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে অরুণ আর মিন্টু সেই দিকে চেয়ে ছিলো, হঠাৎ হাত ধ'রে টান দিয়ে বসন্তদা বল্লে, "চলে আয়।"

অরুণ আর মিন্টুর মুখে কথা নেই। বিমর্ষ দৃষ্টিতে ওরা দুজনেই বসন্তদার মুখের দিকে চাইল। ধীরে ধীরে একেবারে তার গায়ের কাছটিতে গিয়ে দাঁড়ালো। ম্লান হেসে বসন্তদা বল্লে, "কী?—ভয় করছে?

মিন্টু কোন কথা বল্লে না। অরুণ বললে, "এইখানে এসে একলা একলা নিরালায় বসে কী সুখ তুমি পাও বসন্তদা?"

"সুখ?" বসন্তদা একটু হাসলো। মলিন হাসি। বল্লে, "আমাকে যে আসতেই হয় এখানে।"

"কেন?"—একসঙ্গে দু'জনায়ই প্রশ্ন করে।

"ওর সঙ্গে যে আমি কথা কই এখানে এসে। একদিন আমি কথা না

কইলে ওর চলে না। আজ না এলে কাল অনুযোগ দেয়, কত অভিমান করে, কাঁদে—"

—বলে কি বসন্তদা! "তবে না বললে কোরক বেঁচে নেই।"

"নেই-ই ত।"

—"তবে কেমন করে সে তোমার সঙ্গে কথা কয় বসন্তদা'?"

"যেমন ক'রে তোরা আমার সঙ্গে বলিস।"

"ধেৎ" অরুণ প্রতিবাদ করে। "মরা মানুষ বুঝি কথা কইতে পারে?"

"কথা কি আমরা মুখ দিয়ে কই রে পাগল?" বসন্তদা' জবাব দেয়, "কথা কই আমরা মন দিয়ে, শুনিও মন দিয়ে; মন আছে বলেই না কথা।"

অরুণ বা মিন্টু দুজনার একজনাও বসন্তদা'র কথা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না। কী কথা যে বলে বসন্তদা! সাধে কি আর পাগল বলে সবাই।

"কী কথা ও বলে বসন্তদা?" আবার ওরা প্রশ্ন করে।

"সে অনেক কথা।" বসন্তদা জবাব দেয়। "পাঠশালার কথা, ওর মায়ের কথা, ভাই-বোনদের কথা, আমার কথা, তোদের কথা, সব্বার কথা। আমায় পেলে ভারী খুসী সে। আমি এসে ডাকলেই সে শুনতে পায়। একেবারে আমার কাছখানটিতে এসে গুটিসুটি হ'য়ে বসে।"

মিন্টু বসন্তদা'র অতি কাছে এসে বলে, "আমরা ডাকলে সে শুনতে পাবে বসন্তদা?"

—"নিশ্চয়।"

—"ডাকবো?"

—"ডাকো।"

—কই, শুনতে পেল কই?"

"পেয়েছে, ঐ ত তোদের ডাকে সে সাড়া দিচ্ছে, বলছে, আয় অরুণ, আয় মিন্টু"—

"কই আমরা ত শুনতে পাচ্ছি না"।

"মন দিয়ে না শুনলে কি সেকথা শোনা যায় রে?" উদাস দৃষ্টিতে বসন্তদা জবাব দেয়।

"তুমি যে ফুলগুলি ছড়িয়েছ বসন্তদা, তাদের গন্ধ পাচ্ছে কোরক?"

"নিশ্চয়ই। ওই ত চায় ঐ ফুল। রোজ এই গন্ধ পেতে সে ভালবাসে।"

"তোমার যেমন কথা। মন দিয়ে বুঝি কথা কওয়া যায়, গন্ধ পাওয়া যায়?" অরুণ জিজ্ঞাসু চোখে বলে।

"যায় না?"—বসন্তদা অকস্মাৎ যেন অতি সচকিত হয়ে ওঠে। "নিশ্চয় যায়। শোন্ তবে"—

সেইখানে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে সবাই বসলো। বসন্তদা বলে চললো,—

"আমি তখন ছোট। পাঠশালায় আমার সব চেয়ে আপনার ছিল একটি ছোট ছেলে। যেমন রোগা, তেমনি দুর্ব্বল। সমপাঠীরা প্রায় সবাই তাকে বিদ্রূপ করে বলত 'হ্যাংলা'। পাঠশালার ছেলেরা বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে আসত, ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে তারা খেত। ওর বাপ মা ছিল গরীব, ওর পক্ষে রোজ রোজ খাবার নিয়ে আসা তাই সম্ভব হোত না। উপদ্রবের কঠিন খোঁচায় আহত হ'তে হ'তে সে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরত। আমার ত জানিসই, কিছুই নেই কোন কালে কেবল খিদেটা ছাড়া; ওর মুখের পানে চেয়ে চেয়ে আমি বুঝতে পারতাম ওর খিদে পেয়েছে। পাঠশালা পালিয়ে ওকে নিয়ে এ বাড়ী ও বাড়ী বাগানে বাগানে ফিরতাম। খেজুর রসের হাঁড়ি, কলার কাঁদি, পেয়ারার কাঁড়ি পেড়ে এনে ওকে খাওয়াতাম।

এমনি করেই কিছুদিন কাটলো। এক মিনিট ওকে না দেখে আমি থাকতে পারতাম না, সেও পারত না আমাকে না হলে। রাত নেই, দিন নেই, দুপুর নেই, সন্ধ্যা নেই, আমি আর সে দুজনায় কোথায় না গিয়েছি—কী না করেছি, কত কথাই না বলেছি?"—মস্তবড় একটা লম্বা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বসন্তদা আবার বললো:

"সেদিন শনিবার। পাঠশালায় আসেনি সে। সারা আকাশ মেঘে থমথমে হ'য়ে আছে। ভীষণ হাওয়া বইছে; মনে হচ্ছে এক্ষুণি ভয়ানক ঝড় উঠবে। হন্ত দন্ত হ'য়ে এমনি দুপুরে হঠাৎ বন্ধু এসে হাজির। ব্যাপার কি?—সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে সে বললে, আজ তার জন্মদিন। তার মা কোন মতে যোগাড় করে দুখানি সন্দেশ তাকে খেতে দিয়েছিলো, তারই একখানা সে কলার পাতায় মুড়ে এতদূর ধ'রে এনেছে আমাকে খাওয়াতে। সন্তর্পণে তাই খুলে সে আমার হাতে দিল। আমি যতক্ষণ খেলাম, সে অপলক হাসি-হাসি মুখখানি করে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল। চোখের এমন খুসী আর আমি কখনও দেখি নি।

তারপর গলাগলি দুজনায় বেরিয়ে পড়লাম। হাওয়া তখন দস্তুরমত মেতে উঠেছে। ঝড় এল বলে। তবু তারই মধ্যে সারা দুপুরটা দুজনায় এক সাথে কত জায়গায়ই না ঘুরে বেড়ালাম। সন্ধ্যার একটু আগে এল প্রবল তুফান। বাতাসে আর বৃষ্টিতে সৃষ্টি যেন একাকার হ'য়ে গেল। দৌড়াতে দৌড়াতে বন্ধুকে বল্লাম, "আজ আর এতটা পথ ঠেঙিয়ে বাড়ী যাওয়া তোর হবে না ভাই"—

বন্ধু জবাব দিলো, "নিশ্চয়ই হবে, আজকের দিনে মাকে ছেড়ে আমার থাকতে নেই। যেতেই হবে আমাকে।"

"একটু পরেই ঝড় অনেকটা কমে এল। বন্ধু বিদায় নিল, বলল, "আসি ভাই, কাল আবার আসব।" মনে নিষেধ থাকলেও মুখে তা বলতে পারলাম না। জন্মদিনে ওকে ওর মায়ের বুক থেকে আলাদা করে রাখি কি করে!

এগিয়ে দিয়ে গেলাম চাটুয্যেবাড়ীর শেষ সীমানায় লম্বা শিমুল গাছটার তলা পর্য্যন্ত। সেখানটায় এসে বন্ধু বল্লে—এবার সে একলাই যেতে পারবে। তখন রাত হয়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে; তারই মধ্যে দুই বন্ধু অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দুই বিপরীত পথে অদৃশ্য হ'য়ে গেলাম।

অনেক রাত অবধি ঘুম আসছিল না। বিছানায় শুয়ে চোখ বুঁজে জেগে ছিলাম। ভাবছিলাম বন্ধুর কথা। একলাটি সে বাড়ী পৌঁছাতে পেরেছে তো?

অনেক রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্ন দেখছিলাম ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় আকাশ সাদা হয়ে গেছে। সেই বুড়ো শিমুলতলাটা দিয়ে আমি চলেছি। পেছন থেকে কে এসে আমার হাতখানি চেপে ধরল। ফিরে চেয়ে দেখি, বন্ধু! ব্যাকুল চোখে সে আমায় বলে, "চলে যাচ্ছি কি না, তাই দেখা করতে এলাম।"

"চলে যাচ্ছিস! কোথায়?"

"যেতেই হবে, তাই বিদায় নিতে এসেছি ভাই"—

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাকে। সেই কুঞ্চিত কালো চুল, দুষ্টুমী ভরা হাসি। সস্নেহে তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় যাবি ভাই?"

"অনেক দূর" কৌতুকের হাস্যে সে জবাব দিলো।

"তবু বল্ না শুনি।" কী যেন অনেকখানি সে বললো, ঠিক মনে নেই। শেষে দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে কী তার কান্না! জলভরা দুটি বড় বড় চোখ মেলে সে বললো, "সব রেখে গেলাম এইখানেই, যেখানে যা ছিল, কেবল একটি জিনিষ কোথায় লুকিয়ে রেখে যাব বুঝতে পাচ্ছি না।

"কি জিনিষ ভাই?"

একটু থেমে তেমনি সহজ গলায় বন্ধু বললো, "এই যে এইটুকু!"

কি যেন অতি সন্তর্পণে সে আমার হাতে দিল। তেমনি সযত্নে অভিভূতের মত হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করতে করতে আমি বললাম, "কি দিলি ভাই?"

মধুর হাসিতে মুখখানাকে আলো করে বন্ধু বললে, 'আমার মন। এইটুকুকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে পালাবার আমার উপায় নেই। একলাই আমি যাব।" নিত্যকার মত হাত দুটি বাড়িয়ে আমার গলায় জড়িয়ে সে বললে, "খুব যত্ন করে তোমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিও কিন্তু, একতিলও যেন হারায় না। বল, হারাবে না, ভুলে যাবে না আমাকে?"

মুগ্ধের মত বললাম, "কখনো না—"

"আর যদি না ফিরে আসি কোনদিন, তবুও না!

"না।"

"তোমার স্মৃতির মধ্যে আমাকে বেঁধে রেখে আমি চললাম, মনে রেখো।"

দুচোখ জলে ভ'রে আসে; কাতর গলায় বললাম, "না গেলেই কি নয়?"

"না, এ পাঠশালায় আর আমি পড়ব না! বই খাতা, কালি, কলম সবই ত রইলো, আমি চললাম"—

নিমেষে সে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। শুভ্র চাঁদের উপর একখণ্ড কালো মেঘের ছায়া পড়ল সেই মুহূর্ত্তে। কিছুকালের জন্য সবই অন্ধকার হ'য়ে গেল। চীৎকার ক'রে ডাকলাম, "বন্ধু! বন্ধু!"

ঘুম ভেঙ্গে যেতেই ধড়মড় ক'রে বিছানার উপর উঠে বসলাম। আলোটা জেলে ভাল ক'রে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। বুঝলাম অনেক রাত অবধি জেগে মাথাটা যথেষ্টই গরম হ'য়ে উঠেছে। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ঘুমোতে যাচ্ছি, হঠাৎ দরজায় কে ধাক্কা মারলো। প্রায় ভোর হ'য়ে এসেছে। দোর খুলতেই দেখি বন্ধুর মা আলো হাতে দাঁড়িয়ে। ভয়ে উত্তেজনায় ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে।

"এত রাত্রে হঠাৎ আপনি?" অতি কষ্টে প্রশ্ন করলাম। খপ্ ক'রে সে আমায় ধ'রে ফেললো। বললে, "বাবা, বড় বিপদ্। শীগগির একবার এসো।"

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে তাঁদের বাড়ী গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন সকাল হ'য়ে গেছে। দৌড়ে ঘরে ঢুকেই দেখি, তার অনেকক্ষণ আগেই মৃত্যু এসে বন্ধুকে তার জন্মদিনের শেষ আশীর্ব্বাদ দিয়ে জন্মের মতন ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছে। নিশ্চল পাষাণের মত সেই প্রাণহীন আধবোজা চোখ দুটির পানে নিথর হ'য়ে চেয়ে রইলাম। ওর মা আছাড় খেয়ে পড়ল মাটিতে। সে কান্না শুনতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অভাগিনী মা ভূলুণ্ঠিত হয়ে কাঁদছে আর বলছে, "এই ত একটু আগে তুই ছিলি রে বাবা, এরই মধ্যে কোথায় গেলি রে তুই, আজ যে তোর জন্মদিন—আজকের দিনে যে মার কোল্ ছাড়া হ'তে নেই রে, হ'তে নেই"—

একটা ঢোক গিলে বসন্ত দা টাঁ'ক হাতড়িয়ে আর একটা বিড়ি বের করলো।

"কি হ'য়ে তোমার বন্ধু মরল বসন্ত দা?" অভিভূতের মত প্রশ্ন করলো মিণ্টু আর অরুণ।

"সে কথা আমি কখনো জিজ্ঞাসা করিনি। তবে শুনেছি, রাত ন'টায় তার জ্বর হয়। বারোটায় আগুনের মত দাউ দাউ ক'রে সেই অনির্ব্বাণ জ্বর সমস্ত শরীরে জ্ব'লে ওঠে। রাত তিনটায় মাথায় রক্ত উঠে, সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। এর আগে পর্য্যন্ত ওর মা বিশেষ কিছু বুঝতে পারে নি। সারারাত জেগে মাথায় জলপটি আর হাওয়া দিয়েছে সে। অচৈতন্য হ'লে আমায় খবর দিতে আসে।"

মিণ্টু জিজ্ঞাসা করল, "তারপর?"

"তার কয়েক দিন পর একদিন সন্ধ্যার একটু আগে পুকুরের ঘাটে চুপ করে বসে কত কি ভাবছি। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভিজে লতাপাতার কেমন একটা গন্ধ চারদিকে। বিষণ্ণ মনে বন্ধুর কথাই বারে বারে মনে আসছিলো সেদিন, হঠাৎ মনে হলো কে যেন অতি নিকট হ'তে আমার নাম ধ'রে ডাকলো। চমকে উঠলাম। চারদিকে চেয়ে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। আবার সেই ডাক।

"কে?" প্রশ্ন করলাম।

"আমি, চিনতে পারছো না?"

"কে তুমি?"

"বন্ধু"—

"বন্ধু! কোথায় তুমি?"

"এই ত!"

মনে হল—মনের মধ্যে তার সজীব মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। নির্বিষ্ট হ'য়ে বসতেই সে বললে, "চঞ্চল হ'য়ো না বন্ধু! বসো, শোন! বুকের উপর হাতখানা রাখ ত'! বুঝতে পারছ আমাকে? এই যে আমি এসেছি"—

"কোথায় আছ তুমি?" প্রশ্ন করলাম।

"এই ত তোমার মনে"—

"কি চাও তুমি?"

"কিছু না, তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।"

—"বলো।"

—"কেমন আছ তুমি!"

"ভাল না—"

"বুকের মধ্যে যেন কার অতি করুণ উষ্ণ নিঃশ্বাস ছ্যাঁৎ করে ওঠে।"

"আমার মাকে দেখেছ?"

"রোজই ত দেখতে পাই তাঁকে —"

"খুব কাঁদে আমার জন্য, না?"

স্পষ্ট শুনলাম—বুকচাপা আর্ত্তনাদে আমার বুকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কে কাঁদছে।

—"তুমি কাঁদছ?"

—"হাঁ।"

—"কেন?"

—"যে কারণে তুমি আমার জন্য কাঁদ, আমার মা আমার জন্য চোখের জল ফেলে।"

—"আমাদের ছেড়ে তোমার কষ্ট হয়?"

—"হয় না?"

—"তবে ছাড়লে কেন?"

কোন উত্তর পেলাম না এবার।

—"আসতে ইচ্ছা হয় আমাদের মধ্যে?"

—"হয় না?"

—"তবে এসো না কেন?

এবারও নিরুত্তর। খানিকক্ষণ সমস্তই নীরব। যেন নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত পড়ে না।

—"বলিনি? আমার মনটুকু রেখে গেলাম তোমার মনে। মুখের কথা শেষ হয়ে যাবে জানতাম, তাই মনের মধ্যে সব কথা আজীবন জাগরে রেখে গিয়েছি,—ভাল করি নি?"

—"নিশ্চয়ই, মনের মধ্যে ডাকলেই তোমায় পাব কি বন্ধু?"

—"পাবে। যখনি ডাকবে তক্ষুণি। জানি আমি হারিয়ে যাব, তাইতো মনকে নিয়েই ছিল আমার সব চেয়ে বেশী ভয়, সেটুকু কার কাছে রেখে যাই; তোমার হাতে দিয়ে তবেই না আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছি। ওটুকু তুমি চিরকাল তোমার মধ্যে আগলে রেখো। রাখবে তো?"

—"রাখবো।"

দিনে রাতে এমনি ক'রে রোজ সে আমার মনের মধ্যে আসতো। আমার সাথে কথা কইত! অভিভূতের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আমি তাই শুনতাম। আমার কথা তাকে বলতাম। বেঁচে থাকতে তার যে সঙ্গ আমার সব চেয়ে বেশী ভাল লাগতো, মরার পরও মন দিয়ে সেই হারানো মমতার রস আমি অন্তরের মধ্যে ভোগ করতাম। আমার নাওয়া খাওয়া ছিল না। সময় অসময় ছিল না। সবাই ভাবলো আমাকে ভূতে পেয়েছে। ওঝার দৌরাত্ম্যের ভয়ে দেশছাড়া হ'য়ে অনেকদিন নানা স্থানে ঘুরে বেড়াই। পনেরো বৎসর পরে আবার দেশে ফিরে আসি। কারণ ছিল অবশ্যি ফিরবার"—

"—কী কারণ?" মিণ্টু বিস্ময় পুলকে জিজ্ঞাসা করে।

—"মুঙ্গেরে গঙ্গার তীরে একলা ব'সে আছি একদিন। বেলা প্রায় পড়িয়ে এসেছে। অনেক দূর দিয়ে একখানা পালতোলা নৌকা গঙ্গার উদ্বেল স্রোতে ভেসে চলেছে। পশ্চিমা মাঝিদের কী একটা করুণ গানের সুর উদাস হাওয়ায় ভেসে আসছে। তন্ময় হ'য়ে শুনছি সেই গান;—হঠাৎ দেখতে পেলাম বন্ধুকে। আবার আমার মনের কোণায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোনরূপ ভূমিকা না ক'রেই এবার এসে বল্লে:

"আর কতদিন এখানে থাকবে?"

"জানি না"

"আমি জানি"

"কী জানো?"

"বেশী দিন নয়"

"কিসে বুঝলে?"

"তোমার যে বিয়ে!"

বিয়ে?—আমার বিয়ে? হোঃ হোঃ করে খুব খানিকটা উচ্চহাসি হেসে উঠলাম। আবার সেই দীর্ঘনিঃশ্বাস।

"তোমার আত্মীয়েরা উঠে পড়ে লেগেছেন"

"বেশ ত, তোমার ত আনন্দের কথা,

"কখনো না, আমার হিংসে হয়। তোমার মনে আর কেউ এসে জুড়ে' বসবে, আমি থাকব কোন্‌খানে?

"না, বিয়ে আমি কর্ব্ব না"

"তার চেয়ে আমার মন আমি ফিরিয়ে নিতে চাই বন্ধু।"

—"ফিরিয়ে নেবে?"

—"হাঁ"

—"কেন?"

"তোমার আর তোমার স্বজনদের মধ্যে আমি দাঁড়িয়েছি বিঘ্নর মত। তারা ত আমাকে বুঝতে পারে না। অথচ আমার জন্য এই অশেষ কষ্টের ভাগী হয়েছ তুমি"

—"বেশ ত, হয়েছি বেশ করেছি, তবু তুমি থাকবে।"

"না, তা হয় না বন্ধু! তোমার মায়ের খবর রাখ কি?

—"না।"

—"কতদিন?"

"অনেকদিন"

"তোমার জন্য ভাবনায় তিনি শয্যাশায়ী। কালই তুমি চলে যাবে এখান থেকে। তোমায় না দেখলে তিনি বাঁচবেন না। সত্যি যাবে তুমি, তিন সত্যি রইল, সেই ছোট বেলার তিন সত্যি। এবার আমি চললাম, আর আমায় দেখতে পাবে না।

অকস্মাৎ নিমেষমধ্যে সমস্ত বুকখানা যেন একেবারে খালি হ'য়ে গেল। মুহূর্ত্তে কে যেন সমস্তটুকু হৃদয়কে একটান দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেল। আর্ত্তনাদ ক'রে দুই হাতে বুক চেপে ধরে আমি ডাকলাম, "বন্ধু! বন্ধু!" উত্তর পেলাম না।

পরদিনই বাড়ী ফিরে এলাম। মায়ের অবস্থা দেখে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। আমাকে নিয়ে তিনিও সারারাত কেঁদে কেঁদে কাটালেন। রাজ্যের ঠাকুর দেবতার উদ্দেশ্যে আমার দীর্ঘজীবনের কামনা জানাতে জানাতে বিষম শ্রান্ত হ'য়ে পড়লেন তিনি।

ধীরে ধীরে মা ভাল হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু আমার ভাল চিরজন্মের মত কেড়ে নিয়ে গেল সেই বন্ধু। সেই শূন্য হৃদয় আজও আমার পূর্ণ হল না। তারপর এই অনন্ত শূন্যতার মাঝে হঠাৎ একদিন দেখতে পেলাম তোমাদের সাথী কোরক'কে। ঠিক সেই চোখ, সেই মুখ, সেই দুষ্টুমী মাখানো হাসি; সেই সকৌতুক সপ্রতিভ আনন্দ। এক নিমেষে মন আমার নেচে উঠল। শুনতে পেলাম সে বলছে, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ ত, বুঝি বন্ধু এসেছে।

কোরক'কে দেখতাম চাটুয্যেদের প্রাচীন সেই শিমুল গাছতলাটার উপর কী তার মায়া, সেই বাগানে বাগানে ফুল চুরি করবার কি অফুরন্ত আনন্দ, আমাকে পেয়ে কি তার অপরিসীম সান্ত্বনা! মৃত্যুর সময় এক পলকের জন্যও তার কাছছাড়া হইনি। শেষ মুহূর্ত্তে সে আমার হাত দু'খানি তার বুকের উপর চেপে ধরে বললে, "বসন্ত দা! মরতে আমার একটুও ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছা হয় আরও দুদিন তোমার কাছে থাকি—বেঁচে থাকি আরও কিছুদিন। তা যদি পারতাম! পার বসন্ত দা আমায় বাঁচাতে?" অবিকল সেই হারানো বন্ধুর মত তার আকুলতা। মরণের কোলে বসে জীবনের জন্য সেই অসহায় কান্না!

ডাক্তাররা তখন অক্সিজেন দিচ্ছে। একটু পরেই সব শেষ হয়ে গেল। যাবার পূর্ব্বে সেও তার ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে চাওয়া চোখ দুটির ভেতর দিয়ে তার মনকে চিরদিনের জন্য আমার মর্ম্মের মধ্যে দান ক'রে গেছে। সেই মনের কথাই ত আজ আমি শুনি! বন্ধু আমার কাছে আরও কিছুকাল থাকতে চেয়েছিলো। সে কথা মিথ্যা হয় নি। সে থাকবে চিরকাল আমার কাছে কাছে, আমার অন্তরের মধ্যে।"

বলতে বলতে বসন্তদা'র কণ্ঠ ভারী হয়ে এল। আর কিছুই সে বলতে পারলো না। ছোট্ট শিশুর মত অবোধ কান্নায় তার সমস্ত বুক ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সে বলতে লাগলো, "আর আমি?—আমি কি একটা মানুষ? তাই না পাড়ার লোকে আমায় পাগল বলে। বলে, লক্ষ্মীছাড়া, বখাটে, আর বজ্জাত। আমায় তোরা ভয় করিস, সবাই আমার পাশ কাটিয়ে চলে, কিন্তু বন্ধু আমায় একতিল ঘৃণা করে না। চিরজীবন সে আমায় ভালবাসে, জানিস?"

মিণ্টু এসে বসন্তদা'র চোখ দু'টি নিজের হাতে মুছিয়ে দিলো। বল্ল, "মনের মধ্যেই সে যখন রয়েছে, তখন এত দূরে এসে এই দু'পুরের রোদে এই শ্মশানের মাঝখানে বসে কথা না কইলে কি তোমার চলে না বসন্ত দা?"

ধরা গলায় বসন্ত দা' জবাব দিলো,—'কি জানিস? মনটাকে ত বেঁধে রাখতে পেরেছি তার! পারিনি কেবল দেহটাকে। অথচ ওটার উপরেই ছিল সব চেয়ে বেশী মায়া; সেই মায়ার শেষ চিহ্ন এই মাটিতে পুড়ে' নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তাই ত' এখানকার এই পোড়া মাটী আমায় অমন ক'রে টেনে আনে। যা ধরে রাখতে পারিনি তার মমতা যা ধরে রেখেছি তার চাইতেও যে কত বেশী, তোদের বসন্তদার মত বড় হ'লে তোরাও একদিন তা বুঝতে পারবি।"

বলতে বলতে আবিষ্টের মত বসন্তদা' উঠে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত ওরা দু'টিতে ওর পিছু পিছু চলতে লাগল। একটু পরেই আর বসন্তদা'কে দেখা গেল না।

খেয়ালী লোক, কোনদিকে না কোনদিকে হয়ত নির্ব্বিবাদে স'রে পড়েছে।

কূলে কূলে ঘুরি,
কোথা এ মাধুরী,
কোথা এই শ্যাম-ছায়া !

ফসল বুঝি এলো এবার
বসুন্ধরার বুকে !

রাজপুত্র

বাণীকুমার

[দ্বিতীয় পর্ব্ব]

[রাজপুত্র, পথযাত্রী আর রাখাল ছেলে রাক্ষসপুরীতে চলেছে। এখনো তা'রা এসে পৌঁছুতে পারেনি। কিন্তু মনে আছে তো—রাজপুত্র যখন অন্য রাস্তায় চ'লে গেল—রাজপুত্রের সখা মাধব ভালো খাবার আর আরামে থাক্‌বার লোভে দৈত্যনারীর পিছু পিছু সেখানে এসে উপস্থিত হোলো। ...এখন দৈত্যপুরীতে মাধবের দেখা পাওয়া যাবে। রাক্ষস মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয়টা প্রথমেই ক'রে দেওয়া ভালো। রাক্ষস মহাশয় ভীষণ ক্ষুধার্ত্ত। তাই তার হুঙ্কার সুরু হয়েছে]

[দৈত্যপুরী]

(জলদ-গম্ভীর) বিভীষিকা-ব্যঞ্জক সচকিত সঙ্গীত—

রাক্ষস। আরে-রে-রে-রে-রে রে-রে-রৈ—! আরে-রে-রে-রে-রে ঐ ঐ-ঐ—!— এ কি বিষম কাণ্ড? আঁ্যা-আঁ্যা-আঁ্যা!—রাগের চোটে ব্রহ্মাণ্ড লণ্ডভণ্ড ক'রে দোবো নাকি? এখানে কোনো জনপ্রাণী নেই কেন র‍্যা—আঁ্যাঃ—হঁ্যাঃ! এ বাড়ীতে কি খাওয়া দাওয়ার পাট চুলোর দোরে গ্যাছে—আঁ্যা—? তেত্রিশ কোটি দেবতা শুধু নামে—তা'রা এইটুকু সুবিধে ক'রে দিতে পারে না? হঁ-রে-রে-রে-রে-রে-রে-রে-রে-রে! খাণ্ডারনী আলামুখী রম্ভা রাক্ষুসীটা কি পাহাড়ে চ'ড়ে দোল্ খেতে গেল? —ও-ও-ও-ও-ও-ও-ওঃ-ওঃ-ওঃ!—

রম্ভা। একশো একা'শিটা ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্চো কেন্ গো? এই তো আমি!—

রাক্ষস। বলি কোথা'—আঁ্যা—ওটা আবার কে-রে—রম্ভা? ঐ গেঁটে বেঁটিয়াল্ যেন 'বেগুন গাছে আঁক্সি দিচ্চে গোচের'? —কে—ও—কে—ও কে—ও?

মাধব। আজ্ঞে, একতাল্লার একশো আটবার মহা মহামহাশয়,—আমি আর কেউ নই—শুধু তোমার অধমাধমাধমাধম—

রাক্ষস। বটে—বটে—বটে—বটে—বটে!

মাধব। কি বিকট চেহারা! বাপ্‌রে! গায়ে কি বুনো গন্ধ! বড্ড বিশ্রী লাগচে। অস্বস্তি বোধ হ'চ্চে। খুব খারাপ লক্ষণ! কলজেটা ধড়্‌ফড়্‌ করচে। নি-শ্‌-চ-য়—রাক্ষস!—

রাক্ষস। ওরে রম্ভা—ঐ বেঁটে গাঁট্টুকুল্‌টা কি বিড়্ বিড়্ ক'রে বক্‌চে? কে-ও—কে-ও—কে-ও?

রম্ভা। আঃ! কি-ঈ?—থামো, থামো, থামো! ও একটা ভবঘুরে, তা' ছাড়া আর কি হবে—ঘুটঘুটে বনের সামনে এসে রাস্তা হারিয়ে ফেলেচে। লোকটা বল্‌লে—ক্ষিদেতে নাড়ী কট্‌কট্ করচে, তাই আমাদের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে এলুম।

মাধব। ওরে বাবা! এতো আদর ক'রে ডেকে এনেচে আমাকে —টি ক'রবে ব'লে নাকি!—

রাক্ষস। আবার ও-টা কি বকে? দে-তো—দে-তো রম্ভা—ওর মাথায় একটা মাঝারি সাইজের গাঁট্টা কসিয়ে—দে-দে-দে-দে-দে! হুম! আমি ঐ বেঁটে মনিষ্যিগুলোকে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি না। যারা রাস্তা হারিয়ে মরে তা'রা আবার মানুষ! বেটারা একেবারে রাস্কেল্!

মাধব। কিন্তু আমি ঠিক পুরোদস্তুর রাস্কেল নই—ওর চেয়ে যৎসামান্য উঁচু। আমি—আমি—হঁ্যা—আ-মি—আমাদের রাজপুত্তুরের সহচর—বন্ধু—বন্ধু!

রাক্ষস। হ্যা-হ্যা-হ্যা-ভাঁড় ভাঁড়! হাসির চাটনি! চেহারাতেই মালুম পাওয়া যাচ্চে! নেচে-গেয়ে লোক ঠকিয়ে পয়সা কামানোই কাজ।

মাধব। না-না-না-না-না—ঠিক তা' নয়, তবে সত্যি কথা বল্‌বো? এক কথায় রাজপুত্তুরের মিতে—অর্থাৎ স্যাঙাৎ—

রম্ভা। সেই নাই-আঁকড়ে ছোক্‌রাটা রাজপুত্তুর নাকি, যে জঙ্গলের ভেতর এক দৌড়ে সেঁধিয়ে গেলো?—বেচারা! তা'র কপালে কি আছে... কে জানে?

মাধব। রাজপুত্তুরের কপাল খুব ভালো। এতোক্ষণে বোধ হয় সে কোনো সুন্দর পরীর দেখা পেয়ে গেছে।

রম্ভা। হঁ্যা—যেমন তোমার বুদ্ধি! গলা-কাটাদের সঙ্গে মিতালি হয়েছে, দেখোগে যাও। বেচারা—বেচারা!

রাক্ষস। থাম্, থাম্, থাম্, থাম্, থাম্! কেবল বকর্-বকর্-বক্—খুব হয়েচে। এই রম্ভা—খাবার নিয়ে আয়, ক্ষিদেতে মুণ্ডু ঘুরচে। আর ঐ গিল্‌টি-মুখো বোকারামটাকে আস্তাবলে পাঠিয়ে দে...আমাদের খেয়ে পাতে যদি কিছু চিবোনো হাড় টাড় প'ড়ে থাকে, সেখানে গিয়ে তাই ফেলে দিয়ে আসিস্—খাবে এখন্।

রম্ভা। তোমার বড্ড ছোট নজর। এখানে ব'সে নিজের সুবিধে মত থাক্‌দাক্, তারপরে হাসির কথা ব'লে গান গেয়ে নেচে-কুঁদে আমাদের খোরাক যোগাক্—কি বলো? বলো না গো?

রাক্ষস। যা-যা যা-যা-যাঃ! ও-সব তুচ্ছ ব্যাপারে আমার আমোদ নেই। ওহে বেঁটে মনিষ্যি কি, নামে ডাক্‌লে তোমার ঘুম ভাঙে?

মাধব। তা' ম'শায়ের বাপ-পিতোমো'র আশীর্ব্বাদে আমার উনপঞ্চাশটা নাম আছে—কোন্‌টা তোমার মেজাজ-রোচক হবে তা' তো জানা নেই! কি বলি?

রাক্ষস। থামো, থামো ডেঁপো রাস্কেল! কোন্ নামটা আটপৌরে, সেইটেই বলো।

মাধব। আজ্ঞে ম'শায়—মা-আ-আধব।

রাক্ষস। ঐ মেধো। আচ্ছা, তুমি এখানে থাক্‌তে পারো। আমরা খাই, তুমি দেখো। এই রম্ভা, খাবার আ—ন...যা' বল্‌চি, যা' বল্‌চি, যা, বল্‌চি—যা। ক্ষিদেতে পেট চোঁ-চোঁ করচে। খাবো হাঁউ—হাঁউ! ওঃ-ক্ষিদে-ক্ষিদে-ক্ষিদে—মাথা টন্‌টন্, নাড়ি ঝন্‌ঝন্—পেট কন্‌কন্...

মাধব—ওঃ! কি ভীষণ পাষণ্ড! ওরা গাণ্ডে-পিণ্ডে গিল্‌বে—আমি শুধু তাকিয়ে থাক্‌বো—এক টুক্‌রোও খেতে পাবো না? তা'র চেয়ে রাক্ষসটা আমাকেই আগে জলযোগ ক'রে ওর রাক্ষুসে খাওয়া শুরু করুক্ না কেন! রাক্ষসটার ধারণা বোধ হয় আমি খুব মুখরোচক নই! মানুষ-খোর ও নয় না-কি! দেখি একবার বাজিয়ে!...বলি, মহামহিম ম'শায়গো, ও রাক্ষস ম'শায়, আমাকে একেবারেই তুচ্ছ করচো? আমার মাংস খুব সুস্বাদু। আমার কলজেটা খু-উ-ব নরম, তুলোর মত তুল্‌তুলে, আর হাত দু'টো পায়রার ডানার মত...

রাক্ষস। আমার তা'তে কী হ্যা?—পেল্লাদের বাপ হিরণ্যকশিপুর দোহাই—আমাকে বিরক্ত কোরো না—বল্‌চি!—পাগল না-কি—না—মাতাল?

মাধব। নাঃ! কোনো ফলই হোলো না, রাক্ষসটা আমাকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনে না।—বুঝেছি, শুধু কচি কচি জীব ও পছন্দ করে।—রোজ—এই রকম হাঁউ হাঁউ ক'রে গেলে নাকি!... [খাদ্য এসে পৌঁছুলো]

—ঐ—ঐ—খাবার আসচে—! ওরে বাবা—যা' ভাবচি তা' তো নয়—! ব্যাপারখানা কি! আহা-হা-কী মিষ্টি গন্ধ! ক্ষিদে চন্ চন্ ক'রে বেড়ে মাথায় চ'ড়ে যাচ্চে!—ওঃ—সাম্লানো দায়!—ঐ ঝল্‌সানো হরিণটার মাংস খেতে না পেলে—হয়তো ক্ষিদের চোটে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতেই দম বেরিয়ে যাবে…

রাক্ষস। বেশ গন্ধ—নয়?—আচ্ছা, তোমাকে এক টুকরো হাড় দোবো এখন!—চুসিকাটির মত চুস্‌লেই—স্বাদ পাবে বেজায়!—দে' দে'—রম্ভা—দে'!—ওরে—রম্ভা—খাসা—খাসা—

মাধব। খাসা নয়—খা-সা!

রম্ভা। বেচারা! মুখ থেকে লাল্ ঝরচে!—না—না আমি লুকিয়ে ওকে কিছু চালান্ করি—খেয়ে বাঁচুক্—নইলে লোভে লোভেই মারা পড়্‌বে! [চুপি চুপি সামান্য খাদ্য চালিয়ে দিলে]

মাধব। আঃ—রম্ভারাণী—তুমি যেমনি রূপসী—তেম্‌নি দয়ালু! রাক্ষসী হ'লে কি হয়! হিড়িম্বাসুন্দরী তোমার কেউ হোতো বোধ হয়! তা 'না হ'লে এ-তো! আঃ—তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে! আর কী মিষ্টি! তোমার জয় হোক্—ভালো হোক্—ভালো হোক্! আঃ বাঁচলুম! কি মধুর!

রাক্ষস। কি হে-মেধো! এমন ঝিমিয়ে পড়্‌লে কেন? মাথা নীচু ক'রে ব'সে আছ কেন বলোতো? চুপ্‌টি ক'রে ব'সে শুধু মুখ চোকাতেই জানো! কিছু মজার কথা শোনাও, খাই আর হাসি! (বিকট হাসি)

মাধব। আঃ—!—হাস্‌বো—না—হাসাবো—যাই করি, দম আট্‌কে যাচ্চে—

রাক্ষস। কী হয়েছে?

মাধব। কিছু না—কিছু না—

রাক্ষস। কি গিলে ফেল্‌লে হে? চুরি ক'রে কিছু খাচ্চো বুঝি?

মাধব। অ্যাঁ—না—না—ঐ সুগন্ধ হাওয়া চিবুতে চিবুতে টাক্‌রার তাল পাকিয়ে আট্‌কে গেছে! এক গেলাস জল—জল! দম বন্ধ হ'য়ে আসচে—! জ—ল!

রম্ভা। তুমি এতো কড়া হ'লে কি চলে? বাড়ীতে লোক এসেছে—সে যেই হোক্—একে অন্তত একটু সরবৎ খেতে দাও! তোমার ভাগ মারা যাবে না।

রাক্ষস। আচ্ছা—দাও! (রম্ভা একপাত্র ফলের রস দিলে)

রম্ভা। এই নাও----চোখ কাণ বুজে'—চোঁ চোঁ ক'রে…

মাধব। আঃ…আঃ…! কী উদার মন! আঃ! ফলের রস বুঝি! আঃ—মধু—মধু।

রাক্ষস! হ'বে না? আমার নিজের বাগানে যে সব ফল ফলে… তারই রস।

মাধব। এবারে বুঝেছি…যে খায় সে সুখী! তোমার মত সুখী কেউ নেই!

রাক্ষস। বলো বলো…আমি সুখী-সুখী! খাও দাও…থাকো সুখে… হাসো গাও! হা-হা-হা-হা-হা!

[দৈত্যপুরীর থম্‌থমে ভাব-প্রকাশক সঙ্গীত…হঠাৎ রাক্ষসের আনন্দ-উচ্ছ্বাস]

রাক্ষস। আরে-রে-রে-রে-রে-রে!—হুঁঃ!—ভোজনই হ'চ্চে জীবনের আসল মজা! এই তো দুপুরবেলার ভোজ…আজকে আমার রাতের ভোজের ব্যবস্থাটা বেড়ায় গোছের খুব জম্‌কালো—তেম্‌নি রসালো! (বিকট হাসি)—হা-হা-হা-হা-হাঃ-হা—।

মাধব। অ্যাঁ-অ্যাঁ—যা' ভাবচি তাই না কি? এবার আমার দিকে নজর হয়তো! সান্ধ্যভোজে আমাকেই পেটে পুর্‌বে। মতলব খারাপ!—দেখো রাক্ষসম'শাই, তুমি বুঝি জানো না—এই রাস্তা হেঁ-টে—হেঁ-টে হেঁ-টে আমি একেবারে মরো মরো—গায়ে ধুলো লেগে লেগে লে-গে—আমার মাংস তেঁ-তো হাকুচ্ হ'য়ে গেছে! দেখ্‌চো না--একেবারে মানুষের যোগ্যই আমার চেহারা নয়—

রাক্ষস। কি—একমুখে দু' কথা? মেরে ফেল্‌বো—হাঁ!

রম্ভা। যাক্‌গে যাক্—খাওয়া-দাওয়া করলেই ও ঠিক হ'য়ে যাবে। ভাব্‌ছো কেন?

মাধব। অ্যাঁ—অ্যাঁ!—আমাকে কেটে ঐ রাক্ষসী রম্ভা রাঁধুনী কালিয়া বানাবে নাকি? দেখি--তোমাদের ভোজন তো শেষ হয়েছে—এবার—আমার—

রাক্ষস। তোমার কি হে—বেঁটে মনিষ্যি—অ্যাঁ? ছট্‌ফট্ করো কেন? ক্ষিদে পেয়েছে? এই নাও—এই হাড়টা কড়্‌মড়িয়ে চিবিয়ে খাও—জিবে রস পাবে।

মাধব। ওরে বাবা—বড্ড যে আদর!

রাক্ষস। খাও-দাও, হাসো গাও, আমোদ করো।

(সুরে) যত পারো তত খাও,
হেসে নাও…হেসে নাও,

—গাও না হে—তুমি তো ভাঁড়! (হাই-এর হুমকি) আঃ-আঃ-আঃ-ঘুম পেয়েছ! তুমি গাও, আমি ঘুমোই।

মাধব। অগত্যা! কি করি!

গান

যত পারো ততো খাও,
হেসে নাও, হেসে নাও।
সুখ সুখ শুধু সুখ—
নেই দুখ নেই দুখ—
নেচে কুঁদে মেতে যাও।

(রাক্ষসের হুলো বিড়ালের ঝগড়ার মত নাক ডাকার শব্দ)

…ঘুমিয়েচে নাকি! বিশ্বাস নেই! গেয়ে যাই! আর খাবার ছল ক'রে নাচের ভঙ্গী সাধি!

গান

কাট্‌ম্ কুট্‌ম্—
টুকি-টাকি—কুট্ কুট্।
চাখি-চুখি—চুমচুম্…
যাহা পাই মুখে লুঠ্।
মাংসের চমচম্
পেটে পুরি হরদম্—
লাগ্ ধুম্ লাগ ধুম্—
বুম-বুম-বুম-বুম—
যত চাও—তত পাও।
খুব-খুব-খুব খাও।
ঘুম যাও, ঘুম যাও!

(মুখ বুজে)—(উউউ-হুঁ হুঁ—হুহুহু-হুহুহু)

[মাধব নাচ্‌তে নাচ্‌তে লুকিয়ে দেখতে লাগ্‌লো…কিছুক্ষণ পরে রাজপুত্র একটি ছোট তলোয়ার-হাতে হুঙ্কার ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে সেখানে এসে ছুটে ঢুক্‌লো]

রাজপুত্র। হারে-রে-রে-রে-রে-রে! এইতো দৈত্যপুরী!

মাধব। (ভয় পেয়ে) ওরে বাবারে--গেছিরে- মাগো-বাবাগো—বাবার বাবাগো—বাবার বাবার বাবার বাবাগো—ওগো—রাজপুত্র গো—বড্ড খেয়েছি গো—পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই কি ক'রে! অ্যাঁ! কুমার! রাজপুত্র!

রাজপুত্র। মাধব? তুমি দৈত্যপুরীতে? কে ঘুমোচ্ছে?

মাধব। চুপ চুপ—ঐ তো স্বয়ং রাক্ষস! বেজায় ধার! ওর বউ রম্ভা রাক্ষসী কাছেই আছে। শুনেছি ওর একটা বেঁটে গাঁট্টা অনুচর আছে—নাম একানড়ি—ভয়ঙ্কর পাজি!

রাজপুত্র। ভয় কিসের? এই তলোয়ার দিয়ে রাক্ষসের মাথাটা উড়িয়ে দিচ্চি—এখুনি।

রম্ভা। (দূর থেকে আসতে আসতে) কে-কে-কে-কে কে? কে রাা? বড্ড যে সাহস...আমার স্বামীর গায়ে হাত তোলা? গাঁট্টা কসিয়ে মাথার খুলিটা ছ্যাঁদা ক'রে দোবো—দেখ্‌বি?

রাজপুত্র। জানো আমি রাজপুত্র! রাক্ষস মেরে রাজকন্যাকে উদ্ধার করবো।

রম্ভা। বটে! দাঁড়া তবে! ওরে একানড়ি—গাঁট্টা গাঁট্টা-গাঁট্টা গাঁট্টা—ওরে ভুতুড়ে—

গাঁট্টা। (দূর থেকে নানা রকমের বিকট হাসি ও আওয়াজ...) অ্যাঁ-ও কিঁ-গোঁ—চিঁচাও কিঁনো গোঁ—

রম্ভা। আয়-আয়-আয়-আয়—তিন লাফে ছুটে আয়—একানড়ি একানড়ি—কানে খড়ি সাতটা কড়ি—হাতে নিয়ে সাতটা দড়ি—তালগাছের তোর বাসা থেকে—আয় রে নেমে খোনাভেকে...

গাঁট্টা। হি হি-হি-হি-হি, ঘাড়ে কাঁর চাপবো, কাঁর কাঁন কাটবো, গর্দান মটকাই, কাঁর চোঁক ওঁপড়াই, পাঁই পাঁই পাঁই পাঁই, হেঁচড়াই কাঁমড়াই, খাবড়াই খাই খাই, অ্যাঁওঁ-অ্যাঁওঁ-অ্যাঁওঁ-অ্যাঁওঁ, ম্যাওঁ-ম্যাওঁ-ম্যাওঁ-ম্যাওঁ।

[আবার বিকট হাসি ও কলরব]

রাক্ষস। (হাই তোলা) আঃ-আঃ-আঃ! (সুরে) এই জীবনটা শুধুইরে, সুখ আর কিছু নয়—নয়-নয়-ন-য়!

অ্যাঁ! কিসের গোলমাল? এরা সব কারা...আমার কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে? ওটা কে? মর্কটের মত একটা গুট্‌কে তলোয়ার-হাতে দাঁড়িয়ে—ঘুরঘুরে পোকার মত ঘুরঘুর করচে? যাত্রার সঙ্‌ নাকি? আমার বাড়ীতে এসে ওস্তাদি? দাঁড়া তো?

রম্ভা। মার্-মার্-মার্! আস্পর্দ্ধা ভারী।

রাজপুত্র। আমার অস্ত্রটা ভেঙে গেল যে! এখন্ কি করি?

রম্ভা। মরো! দূর হ' এ পুরী থেকে! আমার স্বামীর গায়ে হাত তোলা? বুকের পাটা দেখো বেঁটে মানুষের?

রাক্ষস। তবে রে, তোদের খুন্ ক'রে জলযোগ করবো—তবে আমার রাগ যাবে! খুন্ করবো—গর্দ্দান্ মুটকে ভেঙে ফেল্‌বো! (তর্জ্জন গর্জ্জন)

পথযাত্রী। থামো থামো—দেখ্‌চো না—রাজপুত্তুর পাগল হয়েছে? ওকে দয়া ক'রে ছেড়ে দাও, ও ছেলেমানুষ, দুর্ব্বল, আর তুমি বলবান্ দৈত্যরাজ! দুর্ব্বলকে মেরে লাভ কি?

রাক্ষস। তা'হ'লে এখুনি আমার পুরী ছেড়ে সব দূর হ'! খুব বরাত, তোরা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পাচ্চিস্। চ'লে যা' চ'লে যা'...যা' যা' যা'—যা'—যা'—

মাধব। হ্যাঁ-হ্যাঁ যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি! চলো রাজপুত্তুর...এমন জায়গায় আর থাকতে আছে!

রাজপুত্র। ওগো পরী—তোমার শক্তি কোথায় গেল?

পথযাত্রী। কথা ছাড়ো, রাজকুমার! এই পুরী থেকে পালিয়ে চলো! একটুও দেরী নয়।

রাজপুত্র। বেশ, আজ যাচ্ছি। দু'দিন পরে লোক-লস্কর মল্ল-পাইক নিয়ে এসে এই রাক্ষসপুরী আক্রমণ করবো।

রাক্ষস। যা' যা' যা' যা' যা' যা' যা' যা' যা' যা' যা' যা' যা'! দোলায় শুয়ে দুধ খা' গে যা'। নইলে ঐ মাথাটা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাবো। তোর মাথার খোকাটে বোকাটে গন্ধ তাই খাচ্ছি নে—নইলে দেখতিস্ কাণ্ডটা! যা' যা' যা' যা' যা' যা' যা' যা'...

মাধবী। ও রাজপুত্তুর, ও ভয়ানক রাক্ষস। ওকে আর চটিয়ে কাজ নেই, চলো! পালিয়ে চলো। ওর ক্ষিদে পেলে হুষ-দীর্ঘ জ্ঞান থাকে না। পালিয়ে চলো!

পথযাত্রী। চলো রাজপুত্তুর—অলকারাজপুরীতে!

রাজপুত্র। রাক্ষস, আজ চল্লুম, কিন্তু কাল—

রাক্ষস। যা' যা' যা' যা' যা' যা' যা' যা' যা' যা'।

*　　　*　　　*

[রাজপুত্র রাক্ষসের কাছে ধমক খেয়ে পথযাত্রীর সঙ্গে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লো। রাজপুত্রকে এবার পথযাত্রী পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌লো অলকারাজ্য। অলকারাজ্যের তিন কন্যা। তিনজনেই পরমাসুন্দরী। এবার অলকায় রাজপুত্রের দেখা মিলবে।]

অলকারাজপুরী মৃদুসঙ্গীত।

তৃতীয়া। আ-আ—ই! রাজপুত্তুর আর আসে না। ঘরের কোণে একলা থাকতে আর ইচ্ছে নেই।

প্রথমা। গান গাও।

দ্বিতীয়া। কাব্য পড়ো।

তৃতীয়া। বোকারা তাই করুক্...একেবারে ছেলেখেলা।

প্রথমা। তা' হ'লে আর—আমরা নাচি আর গাই। গানের চেয়ে সেরা খেলা আর নেই।

সকলে—গান

আ-আ—ই আ—আ—ই!
স্বপ্নে জানাই স্বপ্নে যে পাই!
আনে বাণী মধুরায়
ভেসে যায় ভেসে যায়,
শুনি নাই শুনি নাই।

তৃতীয়া। দূর এ গানের মানে কি? হাওয়ায় আসে হাওয়ায় ভাসে!

দ্বিতীয়া। গানের সুর যদি হাওয়ায় ভেসে চলে তা' হ'লে ঠিক কানে গিয়েই সাড়া তুলবে!

প্রথমা। সুবাতাস কি বইচে? যদি পথ হারিয়ে ফেলে?

তৃতীয়া। তা' হ'লে সুরের ঠিকানা ভুল হ'য়ে যাবে।

দ্বিতীয়া। দেখ্—আমার মনে হ'চ্চে—যেন কোন্ রাজপুত্তুর আস্‌চে কুঁদফুলের মালা হাতে নিয়ে।

তৃতীয়া। ঐ স্বপ্নই দেখ্।

প্রথমা। স্বপ্নও তো সত্যি হয়।

তৃতীয়া। সে সত্যির মুখে ছাই!

দ্বিতীয়া। বলিস্ কি? ভালো ক'রে ডাকতে জানলেই রাজপুত্তুর সাড়া দেয়।

তৃতীয়া। বেশী ডাকলে আবার গলায় ব্যথা হবে। সব ছেলেমানুষী।

প্রথমা। তাই ভালো। আয়—আমরা ছেলেখেলাতেই মন দিই। এতে আনন্দ আছে। মনের কথা মন খুলে বল্‌তে শেখ্।

সকলে—গান

ও-ও-ও-ও ! গিরি-শিখর জল !
কে করেছে পাগল তোরে—
কে করে চঞ্চল !
কল-কল হেসে,
ঝল-মল বেশে,
নীলের কোলে শ্যামল করিস্
অলকা-অঞ্চল ॥
আয় আয় নিয়ে আয় রঙীন্ বাসর-ফুল।
বরণ-মালা গেঁথে দোবো সাজিয়ে দোবো চুল।
রাজার কুমার কই,
পথ চেয়ে যে রই,
আন্ রে ময়ূরপঙ্খী-নায়ে দৈত্যজয়ীর দল ॥

অলকারাজ। এ কি রকম ধারা ? তোরা রাজকন্যা, তোদের কি কোনোকালেই জ্ঞান হবে না ? বিয়ে হবে কেমন ক'রে ? রাজপুত্র যে এসেছে !

প্রথমা। আসে আসুক্—আমার কি !

দ্বিতীয়া। ডাক্‌তে জানলেই আসে !

তৃতীয়া। রাজপুত্তুর এসেচে বাবা ? আমার বিয়ে হবে ? কত ভালো ভালো কাপড় পরবো, কত গয়না—মণি-মুক্তো-সোনা হীরে-সোনার চতুর্দোলায় চ'ড়ে বেড়াবো। পরবো ময়ূরপাখার চূড়ো। কেমন হবে !

প্রথমা। আহা সাধ দেখে ম'রে যাই।

অলকারাজ। চুপ কর্—লোকে বলে, বুড়ো অলকারাজের তিনটে মেয়ে আদুরে গোপালী, যেন তাদের বিবি।

তৃতীয়া। কে বলে এত বড় কথা ? তুমি তাদের মাথা নাওনি কেন ?

দ্বিতীয়া। তা' কেন ? আমার তো শুনতে মজা লাগে।

তৃতীয়া। আমরা তিন বোন্ তো এক রঙের সাজে একই রকম সাজি না।

অলকরাজ। তা সাজিস্ না জানি, পাছে মতের মিল হ'য়ে যায় !

তৃতীয়া। কে আস্‌চে—দেখো দেখো ! কি সুন্দর রাজপুত্তুর !

প্রথমা। দেখে তো চমক লাগে না !

দ্বিতীয়া। আহা—যেন ধ্যানের দেবতা !

অলকরাজ। রাজপুত্র আসছে। তোরা সাবধানে কথা বলিস্। আমি যাই অভ্যর্থনা ক'রে আনি গে।

সঙ্গীত-দোলা

তৃতীয়া। ও কে…হরিণশিকারী নাকি ?

অলকারাজ। চুপ্-চুপ্ ! রাজপুত্র। স্বাগত, স্বাগত- রাজকুমার !

[রাজপুত্রের প্রবেশ]

রাজপুত্র। জয়তু অলকারাজ ! সুন্দরী রাজকন্যাদেরও অভিনন্দন দিচ্ছি।

তৃতীয়া। চোখের সাম্‌নে দেখ্‌লেই সব ধরা পড়ে। রাজপুত্তুরটা পাগ্‌লা ধরণের !

অলকারাজ। চুপ্ কর্ দুষ্টু মেয়ে ! ..রাজকুমার, আমার তিনটি কন্যাই যেন তিনটি লক্ষ্মী প্রতিমা ! রূপে গুণে তিনজনই সমান। এইটি আমার বড়-মেয়ে, লবঙ্গলতা। এইটি মেজো, আলোকবীণা। আর ঐটি ছোট, অনঙ্গমঞ্জরী। কোন্‌টিকে তুমি বরণ করতে চাও ?

রাজপুত্র। সেই তো সমস্যা, অলকারাজ ! তবে আমি পুঁথি প'ড়ে জানি যে, রাজার কন্যাদের মধ্যে ছোট রাজকন্যাই সকলের চেয়ে রূপসী আর ভালো হয়।

প্রথমা। এমন বোকার মত কথা কখনো শুনেছিস্ ?

দ্বিতীয়া। মিথ্যে ধারণা ! সব ভুল ভেঙে যাবে।

অলকারাজ। চুপ্ কর্ বলচি। রাজকুমার, তুমি ঠিক বলেছ ; পুঁথিতে, গল্পে, ঐ কথাই পণ্ডিতরা বলে বটে ! আর আমার এই ছোট মেয়ে…(আস্তে) এই মেয়েটারই বিশ্রী মেজাজ, ঝগড়াটে। এইটের বিয়ে হ'য়ে গেলেই নিশ্চিন্ত…হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাজপুত্র, ঐ কন্যাটি আমার খুব ভালো।

পথধাত্রী। রাজকুমার ! কথা দিয়ো না !…কোন্ মেয়ে তোমার ভালো—তা'র পরীক্ষা দিতে হবে—অলকারাজ !

অলকারাজ। কে ?

রাজপুত্র। পথধাত্রী মায়াবতী পরীমাতা।

পথধাত্রী। শোনো রাজপুত্তুর ! তোমার ভুল হ'চ্চে।

রাজপুত্র। প্রমাণ কি ?

পথধাত্রী। প্রমাণ চাই ? দেখো কি তা' হ'লে ! সৃষ্টি করি মায়া-কানন- দেখ্‌বে চেয়ে নাগ-বাসুকী, আস্‌বে ছুটে ফোঁসফোঁসি…ক্ষীরের বাটি ধরবে মুখে—সে কোন্ রাজকন্যে ?

প্রথমা। না—গো—না মায়াবুড়ি—আমি পারবো না।

দ্বিতীয়া। আমি পারি—রাজপুত্তুর আমাকে যদি বাঁচাতে ছোটে।

তৃতীয়া। বাঁচায় অমনি সকলে ! শেষে নিজে পালিয়ে বাঁচে। আমরা রাজকন্যা—সাপের মুখে ক্ষীর ধরতে তো জন্মাইনি, মায়াবুড়ি ?

পথধাত্রী। রাজপুত্তুর, শুন্‌লে কথা ?

রাজপুত্র। শুনেছি—মায়াবতী, আমার রাজকন্যার সরল বিশ্বাস নেই।

পথধাত্রী। তা' হ'লে আমার হাতেই সব ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। দেখো, রাজকন্যেরা, যখন আমরা এই রাজবাড়ীতে ঢুকচি, শুনতে পেলুম, তোমাদের পোষা তিনটী আদরের জীব-জন্তু তা'দের বদ্ধ খাঁচা থেকে পালিয়েচে।

প্রথমা। আমার রূপসী বাঁদর !

দ্বিতীয়া। আমার শুকপাখী !

তৃতীয়া। আমার খরগোস্ !

পথধাত্রী। অনুচরগুলো ভয়ে কেঁদেই অস্থির, পাছে তা'রা কঠিন শাস্তি পায় !

তৃতীয়া। তাদের মেরে ফেলা উচিত। বাবা উচিত কি-না বলো ?

প্রথমা। তাদের তাড়িয়ে দিলেই হ'বে। এর বেশী কিছু দরকার নেই।

দ্বিতীয়া। আহা—না না। ও-রা গরীব লোক। একটা পশু কি পক্ষীর জন্যে ওদের এতো শাস্তি দেওয়া কি যায় ?

পথধাত্রী। রাজপুত্তুর, এখন তোমার কি মত ?

রাজপুত্র। আমার রাজকন্যার প্রাণে দয়া-মায়া নেই।

পথধাত্রী। থামো। রাজকন্যারা, শোনো। আমরা এখানে যখন আস্‌চি, সেই সময় আমার যা' সম্বল ছিল সেই সমস্ত পয়সা-কড়ি রাজার বাগানে প'ড়ে গেছে। সেগুলো কি ক'রে ফিরে পাবো ?

তৃতীয়া। নিজে তুমি খোঁজো গে যাও।

প্রথমা। আমি বাগানের মালীদের পাঠিয়ে দিচ্ছি…তা'রা খুঁজে আসুক্।

দ্বিতীয়া। কোথায় তুমি ফেলেছ ? আমাকে নিয়ে চলো—আমি তোমার সঙ্গে খুঁজে দেখ্‌বো !

পথধাত্রী। রাজপুত্তুর, কি তোমার মনে হ'চ্চে ?

রাজপুত্র। আমার রাজকন্যার হৃদয় ব'লে কোনো বস্তুই নেই।

পথধাত্রী। আচ্ছা! এখন শোনো! রাজকন্যাদের জন্যে রাজকুমার তিনটি উপহার এনেছে। একটি মানিক, একটি পুঁথি, আর একটি ফুল। কোন রাজকন্যাকে কি উপহার দিলে মনের মত হ'বে রাজপুত্তুর সে ঠিক করতে পারছে না। কন্যারা তোমরা ইচ্ছামত উপহার বেছে নাও।

তৃতীয়া। আমি নোবো এই মানিক।

প্রথমা। আমি নোবো এই পুঁথি।

দ্বিতীয়া। আমি নোবো এই ফুল।

পথধাত্রী। রাজপুত্তুর সব শুনলে সব দেখলে! যে মানিক চাইলে, সে ছোট কন্যা, সে খুঁজছে সাজের বাহার। যে পুঁথি চাইলে—সে বড় রাজকন্যা, সে খুঁজছে কথার ঝুড়ি। যে ফুল চাইলে—সে মেঝো রাজকন্যা, সে সকল সুন্দর দেখতে চায়। সে চায় সুগন্ধ, সে চায় রূপ, সে চায় কোমলতা, চায় মধু। এখন তোমার কী বক্তব্য বলো?

রাজপুত্র। তুমি আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েচো! আমার খুব শিক্ষা হয়েছে, জেনেছি—রূপকথার সঙ্গে জীবনের কোনো মিল নেই। সেই রাজকন্যাই আমার বধূ যাঁ'র নাম আলোকবীণা—ঐ দ্বিতীয়া।

অলকারাজ। ধন্য ধন্য রাজপুত্র! আমার দ্বিতীয়া কন্যাই আমার মুকুটমণি! তুমি যোগ্যার বরণে সুখী হও। বেজে উঠুক্ মঙ্গলশঙ্খ।

[সঙ্গীত…শঙ্খ]

দূত। মহারাজাধিরাজ!

অলকারাজ। সংবাদ!

দূত। বিচিত্ররাজ্যের রাজা আর রাণী আসচেন।

রাজপুত্র। আমার বাবা—আমার মা!

অলকারাজ। কি আনন্দ! মহারাজ মহারাণীকে সমাদরে আহ্বান করবো।

[সঙ্গীত-বিলাস]

*   *

[সকলের কণ্ঠে গানের ঢেউ উঠলো]

(গান)

রাজকুমারের বামে শোভে রাজকন্যা।
বইলো বকুলমালার গন্ধের বন্যা।
সাতভাই চম্পারে আনো মিলন-বাসরে,
পারুল বোনে ডেকে আনোগো আদরে,
সাজাও ফুলের মেলা কুসুমধন্যা॥

অলকারাজ। এসো, এসো বন্ধু, এসো বিচিত্ররাজ! তোমার কুমারকে লাভ ক'রে আমি ধন্য হ'য়েছি।

রাজা। আমারও সৌভাগ্য অলকারাজ! তোমার মধ্যমা কন্যা গুণবতী, রূপবতী। রাণী, তুমি তখন ভয় করেছিলে…আজ দেখচো, তোমার কুমার কঠিন সত্যের পরিচয় পেয়ে মানুষ হ'য়ে উঠেছে।

রাণী। আমার পরম আনন্দ যে শেষরক্ষা হয়েছে। কুমার!

রাজপুত্র। মা! আশীর্ব্বাদ দাও।

রাণী। জীবনে তুমি সুখী হও, বৎস!

রাজপুত্র। মা, তোমরা কেমন ক'রে জানলে, আমি অলকা-রাজ্যে এসেছি?

রাণী। আমরা কি চুপ্ ক'রে বসেছিলুম, বাছা! আমরা তোমাদের পিছে পিছে এসেছি। পথে গুরুহিতৈষীর সঙ্গে দেখা হ'তে জানতে পারি, তুমি রাক্ষসপুরীতে গেছ। তারপরে খোঁজ পাই, তুমি এসেছ এই রাজ্যে।

রাজপুত্র। গুরুহিতৈষী কোথায়?

রাণী। ঐ যে তিনি।

রাজপুত্র। গুরুঠাকুর!

হিতৈষী। তোমার জয়ে আমার গৌরব। আমি জানি, তুমি পথ কেটে বেরিয়ে যাবেই। তাই আমি পরীক্ষা করবার জন্যে, পথের ধারে ব'সে তোমাকে শুধু আশীর্ব্বাদের পর আশীর্ব্বাদ ক'রে গেছি। ফলও পেয়েছ। অমঙ্গল একেবারে তেপান্তরের মাঠ ছাড়িয়ে পালিয়ে গেছে। ঐ যে দুই মহারাজ আসচেন এগিয়ে।

রাণী। মহারাজ শুনুন্। রাজপুত্র এখন অনেক শিখেছে।

রাজা। কুমার, এবার তোমার শিক্ষা পূর্ণ হয়েছে। সত্যকে চিনতে পেরেছ, আমার বিশ্বাস। কত বিঘ্ন কত বাধা পেরিয়ে যেতে পারলে তবে আনন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সে তুমি বুঝতে পেরেছ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। তোমার বধূলাভ আজ সার্থক হোক্। আশীর্ব্বাদ আমার—এই সংসার-সমুদ্রের ঢেউ কাটিয়ে সুখে জীবনপথে চ'লে যাও। স্বর্গ হ'তে নন্দন বনের বাতাস ব'য়ে আসুক্। সুখ দুঃখ যেন তোমাদের প্রভু হ'য়ে না ওঠে, তোমাদের চারি পাশে সুখ দুঃখের হবে নৃত্য কিন্তু তাদের হেলায় পার হ'য়ে যাবে—এ শুধু ভবসাগরে ঢেউখেলা।

হিতৈষী। আজ আনন্দ—আজ আনন্দ—শুধু আনন্দ! আমার শিক্ষায় আজ কি সুফল—দেখেছ কি হে মাধব! দুটো কথা কও!

মাধব। এই আনন্দ মেলায় কথাতো বন্দী! সুখের আর শেষ নেই। ওগো ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট চুলবুলে হাত তুলে তাই তাই দাও তালি—দাও তালি…

(সুরে)

দাও তালি তাই তাই তাই—রে
নাই নাই দুখ নাই নাই—রে
নাচো সবে থেই থেই থেইয়া
হাসি যত যাক্ গান হইয়া
এ মেলায় তোমাদের চাইরে।

…তোমরাই সকলের আশা-ভরসা। রূপকথার মত তোমাদের জীবন সুখের হোক্। তোমরাইত কবির সেরা গৌরব। মন্দের ওপর ভালোর জয় হোক। তোমরা আমাদের রাজপুত্তুর আর রাজকন্যার মত সদাসুখী হও। শুনতে পাচ্চে—কি আনন্দের ঢেউ উঠেছে…রাজপুত্রের অভিনন্দন! আমরাও গাই তোমরাও গাও।

[সমবেত গান]

শ্যামল কানন সাজলো ফুলে
তোমার রাগিণীতে।
বেণু বাজে বেণু বাজে…
তোমার সুন্দর ঐ নাচের ভঙ্গীতে।
দেহো পুলক ভরি'
নাও বিষাদ হরি'
ফোটাও আনন্দ-মঞ্জরী,—
ভালে রূপ-জয়ের তিলক শোভে,—
আলোক-বীণা বাজাও বাজাও প্রাণের সঙ্গীতে॥

[সঙ্গীত-সমারোহ]

*   *

রাজপুত্র যা' শিখেছিল, সমস্তই বই-এর পাতা থেকে, এবার তা'র শিক্ষা হোলো পৃথিবী ঘুরে। জীবনে কি সত্য কি মিথ্যা—চিনতে পারলে।

[সমাপ্ত]

বাসবদত্তার স্বপ্ন

দুই

রুমণ্বানের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ উজ্জয়িনীতে গোপনে দূত পাঠিয়েছিলেন—প্রদ্যোতের বড় ছেলে গোপালককে কৌশাম্বীতে নিয়ে আস্তে। দূত গিয়ে রাজকুমারকে জানালে যে —'আপনার আদরের ছোট বোন আমাদের নতুন রাণীমা—দেবী বাসবদত্তা অনেকদিন বাপের বাড়ীর কোন খবর না পেয়ে বড়ই ভাব্ছেন, আপনি একবার সময় ক'রে যত শীগ্গির পারেন এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি একটু সুস্থির হইতে পারেন'।

গোপালক এই শুনে তখনই বেরিয়ে পড়লেন দূতের সঙ্গে। কৌশাম্বীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পথের মাঝে যৌগন্ধরায়ণ গোপালককে আটকে ফেলে বল্লেন—"কুমার! আমিই দেবী বাসবদত্তার নাম ক'রে কৌশলে আপনাকে এখানে আনিয়েছি—বিশেষ দরকারে। আপনি কিন্তু এজন্যে কিছু মনে করবেন না। কারণ, আমি জান্তুম—এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এত তাড়াতাড়ি আপনাকে এ রাজ্যে আনা সম্ভব হ'ত না"।

গোপালক একটু মৃদু হেসে বল্লেন—"আবার কি ফন্দী আঁট্ছেন মন্ত্রিবর! আপনার পাল্লায় পড়লেই ভয় হয়—কখন কি ভাবে অপ্রস্তুত হ'তে হয়"।

যৌগন্ধরায়ণ—"না না, সে সব ভয় নেই। তবে একাজ আপনার পরামর্শ ও অনুমতি ছাড়া হ'তেই পারে না। তা কুমার! এখন আপনি রাজবাড়ী যান। তবে একটি অনুরোধ—সেখানে কারুর কাছে—আমার এসব কথা জানাবেন না যে আমিই মিথ্যা ছলে দূত পাঠিয়ে আপনাকে আনিয়েছি। আজ রাত্রে আপনার নিমন্ত্রণ রইল আমার কুটীরে। তবে একটু বেশী রাতে—রাজবাড়ীর খাওয়া দাওয়া চুকলে কাউকে না জানিয়ে চুপি-সাড়ে আমার ওখানে গিয়ে পায়ের ধূলো দেবেন। সাবধান! একথা যেন আর কেউ না জান্তে পারে। বিশেষ দরকারী গোপনীয় কথা আছে আপনার সঙ্গে"।

গোপালক মন্ত্রিবরের কথা শুনে প্রথমটা একটু বিস্মিত হ'লেও যৌগন্ধরায়ণের কথায় একবাক্যে রাজি হলেন। কেন না প্রধান মন্ত্রীর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস জন্মেছিল—তাঁর পূর্ব্বের আচরণে। তাঁর অদ্ভুত বুদ্ধি-কৌশল আর অসামান্য প্রভুভক্তি দেখে গোপালক বুঝেছিলেন যৌগন্ধরায়ণ একটা ক্ষণজন্মা লোক—তাঁর দ্বারা তাঁর বোন বা ভগিনীপতির কোন অনিষ্ট কোন দিনই হ'তে পারে না।

দু'জনে সাদর আলিঙ্গন ক'রে তখনকার মত বিদায় নিলেন।

এদিকে গোপালক রাজবাড়ীতে এসে ঢুকতেই উদয়ন তাঁকে দেখে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বাসবদত্তা যতটা অবাক্ তার চেয়েও বেশী আনন্দিত। রাজা-রাণী দু'জনেরই মুখে এক প্রশ্ন—'দাদা, আপনি এমন সময় হঠাৎ কি কারণ? সব ভাল' ত'?

গোপালক হাসি চেপে বল্লেন—'হাঁ, হাঁ, সব ভাল—সব ভাল। হাঁরে দত্তা! তোর বুঝি আর আমাদের জন্যে মন কেমন করে না—এই নতুন সঙ্গীটিকে পেয়ে। তা ব'লে আমরা ত আর তোকে ভুলতে পারি নি। তাই অনেকদিন না দেখায় মন কেমন করছিল। ভাবলুম—যাই, একবার কয়েকদিন কৌশাম্বী বেড়িয়ে আসি। যেমন মনে হওয়া, অমনি চলে এলুম। কি বলিস্! কিছু খারাপ করেছি কি'?

বাসবদত্তা একটু লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন—'সে কি দাদা! এতে আবার বল্বার কি আছে! তা যখন এসেছ—এবার আর শীগ্গির যেতে দিচ্ছি না।'

গোপালক—"তুই ত ব'লে খালাস—'যেতে দেব না;' কিন্তু আমার নতুন জামাইবাবুটি ত তা বলতে পারেন না। তিনি নিশ্চয় মনে করেছেন—'বেশ ছিলুম দু'জনে নিরিবিলি, কোথা থেকে এ শুকনো আপদ্ এসে জুটল? কি বলেন, মহারাজ'!

উদয়ন বিশেষ লজ্জিত হ'য়ে—'আঃ! কি যে বলেন আপনি! নিন এখন রসিকতা রাখুন। বিশ্রাম ক'রে স্নান-আহারের ব্যবস্থা করুন'—এই কথা বলতে বলতে অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন।

দীর্ঘ দিনের পর মহারাজ উদয়নকে রাজসভায় ঢুক্তে দেখে মন্ত্রীরা সব তটস্থ—বিস্ময়ে অবাক্! প্রজারা এভাবে আচম্কা মহারাজের দর্শন পেয়ে আনন্দে জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্ল। কেবল মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ সেনাপতি রুমণ্বান্কে চোখের ইসারায় জানালেন—'কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

দুপুরবেলা স্নান-আহার সেরে ও তারপর একটু ঘুম দিয়ে বিকালে গোপালক বেড়াতে বেরুলেন। বেড়াতে বেরিয়েই তিনি বুঝ্লেন যেন কোন একটা কারণে রাজ্যে কিরকম ছন্ন-ছাড়া ভাব এসেছে। অথচ এর কারণ তিনি বুঝে উঠ্তে পারলেন না। প্রজারা যে রাজার উপর অসন্তুষ্ট তা ঠিক নয়—অথচ সবাই যেন কেমন মন-মরা!

সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে ফিরে তিনি বোনের নিজের হাতে তৈরী নানারকম খাবার খেয়ে খুব তৃপ্ত হ'লেন। তিনি অন্যের মতই পেট ভ'রে সব খেলেন—যৌগন্ধরায়ণের বাড়ী গিয়ে এখনি যে আবার খেতে হবে—এ ভাবটাও যাতে প্রকাশ না হয়—তার জন্যেই তাঁকে এ-কৌশল করতে হ'ল।

খাওয়া-দাওয়ার পর গান-বাজনা-নাচের আসর কিছুক্ষণ চল্ল। তারপর গোপালক জানালেন যে—সেদিন অনেক পথ এসে তিনি বড়ই শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন। তাই তিনি একটু সকাল-সকাল শুয়ে পড়তে চান।

তাঁর কথায় রাজা-রাণী শশব্যস্তে তাঁর শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। গোপালক তাঁর ঘরের সোণার প্রদীপটি নিবিয়ে দিয়ে পালঙ্কে উঠে শুলেন চাদর গায়ে দিয়ে। একটু বাদেই তাঁর নাক ডাকতে সুরু হ'ল। ঘরে যে চাকর ছিল, কুমার ঘুমিয়েছেন বুঝে সে দোরটি আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্রমশঃ রাজা-রাণীও শুতে গেলেন। বাড়ীর অন্যান্য সব লোক ঝি-চাকর সকলে একে একে খাওয়া দাওয়া সেরে যে যার জায়গায় গিয়ে শুল। রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে মাঝ রাতের প্রহর বেজে উঠ্‌ল। রাজবাড়ী তখন নিঃশব্দ।

এদিকে গোপালক একটুও ঘুমোন নি। চারদিকের কোলাহল থেমে যেতেই তিনি আস্তে আস্তে উঠ্‌লেন বিছানা ছেড়ে। গায়ে একটি দুর্ভেদ্য লোহার বর্ম প'রে তার উপর তাঁর পোষাক পরলেন! তাঁর এক হাতে রইল খোলা তরোয়াল আর কাঁকালে রইল একখানা ধারাল ছোরা।

এই ভাবে সাজগোজ ক'রে একখানা কাল রং-এর চাদরে আপাদ-মস্তক ঢেকে তিনি প্রহরীদের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লেন রাজ-প্রাসাদ থেকে। যৌগন্ধরায়ণের বাড়ীর দোরে সঙ্কেতমত টোকা মারতেই মহামন্ত্রী নিজে দোর খুলে দিলেন।

দু'জনে মন্ত্রণাগারে ঢুকে দেখ্‌লেন যে—সেনাপতি রুমণ্বান্ আগেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর কেউ সেখানে নেই।

তিনজনে মুখোমুখী হ'য়ে বস্‌বার পর যৌগন্ধরায়ণ খুব ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে কথা পাড়লেন—'কুমার! আজ আপনার কাছে যে প্রস্তাব করতে চলেছি, তা শুনেই আপনি প্রথমে হয়ত' স্তম্ভিত হ'তে পারেন। এমন কি আমার উপর আপনার বিজাতীয় ক্রোধ ও ঘৃণাও জন্মাতে পারে। কিন্তু আমার অনুরোধ—আপনি আমার সব কথা না শোনা পর্য্যন্ত আমাকে বাধা দেবেন না বা উত্তেজিত হবেন না। তা হ'লে সব কাজ পণ্ড হবে।'

গোপালকও সকালের ব্যাপার থেকেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত হ'য়েছিলেন। এখন ত' তিনি আর ধৈর্য্য ধরতেই পারলেন না—ব'লে উঠ্‌লেন—'দোহাই আপনার মন্ত্রিবর! আর অন্ধকারে রাখ্‌বেন না। মনের কথা খুলে বলুন—ভাবনায় আমার বুক ধড়ফড় করছে'।

তবুও যৌগন্ধরায়ণ ইতস্ততঃ করছেন দেখে তিনি বিশেষ উত্তেজিত হ'য়ে বল্‌লেন—'কি ব্যাপার বলুন ত! আজ কানা-ঘুষোয় যা শুনলুম সারাদিন, তাতে মনে হ'ল রাজার আর প্রজাদের উপর তেমন টান নেই—রাজকার্য্যেও বিশেষ অবহেলা দেখাচ্ছেন বিয়ের পর থেকে। এসব ত ভাল কথা নয়। তা প্রজারা কি তাঁর উপর বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে? কোন রকম বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছেন না কি'?

রুমণ্বান্ আর থাকতে না পেরে সদর্পে ব'লে উঠ্‌লেন—'তা হ'লে ত ভাল ছিল। প্রজাদের বিদ্রোহ বা শত্রুর আক্রমণ হ'লে ত কিছুদিন উত্তেজনার খোরাক মিলত। এ যে ব'সে ব'সে সর্ব্বাঙ্গে বাত ধরবার যোগাড়। তাই ভেবেছি—আমরাই বিদ্রোহ করব'!

ক্ষণিকের মধ্যে গোপালকের মুখের ভাব কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি তাঁর পোষাকের মধ্যে তরোয়ালখানা দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধ'রে বল্‌লেন—'তাই নাকি সেনাপতি! তাই আমাকে ডেকেছেন বুঝি বাইরে থেকে আপনাদের সাহায্য করতে! তা বড় ভুল বুঝেছেন আপনারা'!

এই ব'লে যৌগন্ধরায়ণের মুখের দিকে চাইতেই তিনি বিস্ময়ে কথা হারিয়ে ফেল্‌লেন। মন্ত্রিবর হাসি-হাসি-মুখে তাঁর খোলা বুক সাম্‌নে পেতে দিয়ে বল্‌লেন—'মহারাজ উদয়নের বিরুদ্ধে যৌগন্ধরায়ণ বা রুমণ্বান্ ষড়যন্ত্র করতে পারে—এ সন্দেহ আপনার মনে জাগ্‌বার আগেই আপনার হাতের ঐ তরোয়ালখানা আমূল এই বুকে বসিয়ে দিন বন্ধু! বিনা প্রতিবাদে আমরা বুক পেতে দিচ্ছি'!

স্তম্ভিত গোপালকের অবশ হাত থেকে তরোয়ালখানা ঝন্‌ঝন্ ক'রে মাটিতে খ'সে প'ড়ে গেল—মুখ দিয়ে তাঁর একটিও কথা বেরুল না। তিনি শুধু মন্ত্রী আর সেনাপতির দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইলেন।

তখন যৌগন্ধরায়ণ থেমে থেমে একটু একটু ক'রে তাঁকে তাঁর মনের কথা জানাতে লাগলেন—কি রকম কৌশলে তিনি দেবী বাসবদত্তাকে কিছুদিনের জন্যে মহারাজের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে পদ্মাবতীর সঙ্গে মহারাজের বিয়ে দিতে চান।

গোপালক শুন্‌তে শুন্‌তে মাঝে মাঝে উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌ছিলেন বটে, কিন্তু শেষ অবধি তিনি একটিও কথার প্রতিবাদ না ক'রে সব ধীরভাবে শুনে গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢেকে তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। যখন মুখ থেকে হাত তিনি সরালেন, তখন তাঁর মুখে ম্লান হাসি, কিন্তু চোখে জল। তিনি বল্‌লেন—'মন্ত্রিবর! আমি আপনার কথায় সম্মতি দিলুম'।

হঠাৎ রুমণ্বান্ তাঁর সেই পুরাণো আপত্তি তুললেন—'সবই ত ভাল! কিন্তু দেবীর আগুনে পুড়ে মরার খবর কানে পৌঁছুলে রাজা যে শোকে মারা যাবেন না—তার ঠিক কি'!

যৌগন্ধরায়ণ—'আরে, তোমার মাথায় কি কিছু বুদ্ধি আছে। পত্নী-শোকে কোন বীরপুরুষ কখনও মরে না। বিশেষ আমাদের মহারাজের 'চক্রবর্ত্তি-যোগ' আছে। সেটা ফল্‌বার আগেই তিনি কখনও মরতে পারেন না। তারপর আর এক কথা! তিনি যখন দেখ্‌বেন যে দেবীর বড় দাদা তাঁর আদরের ছোট বোনটির এরকম শোচনীয় অপঘাত মৃত্যুর খবর জেনেও খুব বেশী দুঃখিত হন নি, তখন চালাক তিনি, ঠিক বুঝে নেবেন—ভিতরে কোন একটা রহস্য নিশ্চয়ই আছে! তারপর পদ্মাবতীর সঙ্গে তাঁর একবার মুখোমুখি দেখা করিয়ে দিতে পারলেই বাকী শোকটুকু ভুলতে কতক্ষণ লাগ্‌বে'?

গোপালক—'ঠিকই বলেছেন, মন্ত্রিবর! এখন জান্‌তে পারি কি আপনার কার্য্য-পদ্ধতি কি রকম হবে'?

যৌগন্ধরায়ণ—'শুনুন কুমার! শোন রুমণ্বান্! মগধ-রাজ্যের ও কৌশাম্বী-রাজ্যের ঠিক সীমানার গায়ে কৌশাম্বীর একটা গ্রাম আছে—তার নাম লাবাণক। তার পাশেই মস্ত বড় বন। আমি মহারাজের মনে বিশ্বাস জন্মাব যে ঐ বনে অনেক রকম শিকারের পশু পাওয়া যায়। শুন্‌লেই মহারাজ মৃগয়ায় যেতে প্রস্তুত হবেন। কুমারের উপর ভার রইল—দেবীকে একটু নাচাতে হবে, যাতে তিনি মহারাজের সঙ্গে যেতে চান। তিনি যদি নাছোড়বান্দা হ'ন, মহারাজের এমন সাধ্য হবে না, তাঁকে

এখানে রেখে যান—আর তাঁকে কাছ-ছাড়া করতেও চাইবেন না মহারাজ। তারপর লাবাণকে উপস্থিত হ'য়ে যখন তাঁবু গাড়া হবে, তখন মহারাজ মৃগয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। সেই অবসরে কুমার দেবীকে সব ঘটনা বুঝিয়ে ব'লে তাঁকে কিছুদিন আত্মগোপন করবার পরামর্শ দেবেন। অবশ্য এই কাজে আমিও কুমারকে যতটা পারি সাহায্য করব। দেবী মহারাজের যে রকম হিত-চিন্তা করেন, তাতে এ স্বার্থত্যাগ তিনি নিশ্চয়ই করতে রাজি হবেন—এ ভরসা আমার আছে। তারপর তাঁকে একবার রাজি করাতে পারলেই আমি নিজে তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে ছদ্মবেশে মগধের রাজকুমারী পদ্মাবতীর কাছে রেখে আসব—যাতে তাঁকে কোন দুর্নাম ভবিষ্যতে না স্পর্শ করতে পারে। ইতিমধ্যে সেনাপতি রাণীর তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে রটিয়ে দেবেন—আগুনে দেবী পুড়ে মরেছেন। তারপর যা ঘটবার আপনি ঘটবে'।

গোপালক ও রুমণ্বান্ রাজি হওয়ায় সে রাতের মত মন্ত্রণা-সভা ভঙ্গ হ'ল। [ক্রমশঃ

ললিত-কলা

দশ

১৪। মাল্যগ্রথন-বিকল্প—যশোধর টীকায় বলিয়াছেন—"মাল্য মুণ্ডমালা ইত্যাদি দেবতার পূজার নিমিত্ত নানাবিধ নেপথ্য; তাহাদিগের গ্রথনের বিচিত্র কৌশল।১

'মুণ্ডমালা' বলিলে আজকাল মা কালীর গলায় শোভমান অসুরগণের মুণ্ডে গাঁথা মালাই বুঝায়। কিন্তু টীকাকারের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে মুণ্ডমালা দেবতার পূজার্থ নির্ম্মিত পুষ্পালঙ্কার-বিশেষ—হয় ত প্রতিমার শিরোভূষণ মাল্য বা ঐরূপ কিছু।

ষষ্ঠসংখ্যক কলার অন্তর্ভূত 'কুসুম-বলি-বিকারের' ব্যাখ্যায় টীকাকার বলিয়াছেন—উহা শিবলিঙ্গাদির পূজার্থ নানাবর্ণ কুসুম গ্রহণ-পূর্ব্বক ভাগে ভাগে স্তরে স্তরে নানা আকৃতিতে সাজাইবার কলা-কৌশল। ফুলগুলি স্তরে স্তরে সাজান হইবে—উহাতে সূত্র-সংযোগ থাকিবে না—তবে বিনা সুতায় গাঁথা চলিতে পারে। কারণ সূত্রসংযোগ ঘটিলেই উহা গাঁথা হইল। আর সুতায় গাঁথা ক্রিয়াটি 'মাল্যগ্রথন' নামক আলোচ্য কলাটির অন্তর্গত। সুতায় না গাঁথিয়া বিনা সুতায় গাঁথলে বা স্তরে স্তরে সাজাইলে উহা আলোচ্য কলাটি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত কুসুম-বলি-বিকার কলার মধ্যে পড়িবে।২

পরবর্ত্তী কলা শেখরকাপীড়-যোজনের সহিত ইহার পার্থক্য কোথায়,তাহা টীকাকারের বচন উদ্ধৃত করিয়া পরে সবিস্তারে দেখান হইবে। কেবল এইটুকু এ প্রসঙ্গে সূচিত করা যাইতেছে যে, পরবর্ত্তী কলাটিতে মাত্র দুই শ্রেণীর বিশিষ্ট মাল্যের উল্লেখ আছে। তাহাদিগের গ্রথনের অংশটি এই চতুর্দ্দশ-সংখ্যক কলার অন্তর্গত কেবল যোজনার কৌশলটি পঞ্চদশ-সংখ্যক কলার মধ্যে পড়ে।

১ "মাল্যানাং মুণ্ডমালাদীনাং দেবতা-পূজনার্থং গ্রথনবিকল্পা ইতি"—জয়ম।

৺মহেশপালের সংস্করণের অনুবাদ "মাল্য—মুণ্ডমালাদি, তাহার রচনাবিশেষ। দেবতা-পূজাদির জন্য মাল্যালঙ্কার গ্রথন-বিশেষ। বিনা সূত্রের হার ইত্যাদি"—পৃঃ ৮৯

অনুবাদক—'বিনা সূত্রের হার'—এ অর্থ কোথা হইতে পাইলেন, বুঝা যায় না। বস্তুতঃ, বিনা সূত্রের হার মাল্যগ্রথন নহে—কুসুম-বলি-বিকার মাত্র।

২। বঙ্গশ্রী শ্রাবণ, ১৩৫১, 'ললিত-কলা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৺তর্করত্ন মহাশয় আলোচ্য কলাটির বিশেষ বিবরণ দেন নাই, কেবল বলিয়াছেন—"বিবিধ প্রকার 'মালা গাঁথা' শিল্প" ।৩

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ও প্রায় নীরব—নানাপ্রকার মালা বা হার প্রস্তুতকরণ" ।৪

৺সমাজপতি মহাশয়ও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন—"মালা গাঁথিবার বিচিত্রতা ও কৌশল" ।৫

৺কুমুদচন্দ্রের মতে—"মুণ্ডমালাদি রচনা। দেবতা-পূজার জন্য মাল্যালঙ্কার গ্রথন-বিশেষ। বিনা সূত্রে হার গাঁথা" ।৬

১০। শেখরকাপীড়যোজন—টীকাকার বলিয়াছেন---ইহাও গ্রথনের প্রকারভেদ। তবে যোজনটি কলান্তর। অর্থাৎ এই কলার মধ্যে গাঁথার অংশটি চতুর্দ্দশ-সংখ্যক 'মাল্যগ্রথন-বিকল্প' কলার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নূতনত্ব হইতেছে---গাঁথায় নহে---যোজনে অর্থাৎ বিশিষ্ট আকারে বিরচনে। আর এই যোজন অংশটিই পঞ্চদশ-সংখ্যক কলার মধ্যে পড়ে।

শেখরক—শিখাস্থানে ঝুলাইয়া রাখিবার মত করিয়া পরিধান করা হয়। আপীড়—কাঠি দিয়া মণ্ডলাকারে গ্রথিত—শিরোবেষ্টন-রূপে পরিধান করা হইয়া থাকে। শেখরক ও আপীড় উভয়ই নানা-বর্ণের পুষ্পদ্বারা রচিত হয়। যোজন—বিরচন। অবশ্য পূর্ব্বেই 'মাল্যগ্রথন' বলা হইয়াছে; তদনুসারে শেখরকাপীড় বলিলেই বুঝা যাইত যে--শেখরক ও আপীড় গ্রথন। কিন্তু পুনশ্চ অধিকন্তু যোজন (অর্থাৎ বিরচন) শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে—এ কলাটির প্রতি সমাদর দেখাইবার উদ্দেশ্যে। তৎকালে শেখরক ও আপীড় নাগরক (বাবু) দিগের অত্যন্ত আদরের প্রধান বেশাঙ্গ ছিল।৭

৩ কামসূত্র, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬৪
৪ শিল্প পুষ্পাঞ্জলি, পৃঃ ৬
৫ কল্পিপুরাণ, পৃঃ ২৪
৬ কৌমুদী, পৃঃ ২৮

৭ "গ্রথনবিকল্প এবায়ম্; কিন্তু যোজনং কলান্তরম্। তত্র শেখরকস্য শিখাস্থানেহবলম্বন্যাসেন পরিধাপনাৎ, আপীড়স্য চ মণ্ডলাকারেণ গ্রথিতস্য কাঞ্চিকাযোগেন পরিধাপনাৎ; নানাবর্ণৈঃ-ঐকার পুষ্পৈবিরচনং যোজনম্। পুনর্ব্বিবচনবচনমাদরার্থম্। তদুভয়ং নাগরকস্য প্রধানং নেপথ্যাঙ্গম্"—জয়ম্। কেহ কেহ—'বিরচনং

চতুর্দ্দশ-সংখ্যক কলার সহিত পঞ্চদশ কলার সাম্য—উভয়েরই মধ্যে মালা-গাঁথার কৌশল বর্ত্তমান। আর আগেরটি হইতে পরেরটির ভেদ—আগেরটিতে যে কোন আকারে মালা গাঁথিলেই হইল—পরেরটিতে মালা দুইটিমাত্র বিশিষ্ট আকারে সাজাইয়া গাঁথা প্রয়োজন। ইহারই নাম যোজন অর্থাৎ বিরচন। আরও একটি ভেদ এই যে, মাল্যগ্রথন-কলায় মুখ্যতঃ দেবতা-পূজার্থ মালালঙ্কার বা পুষ্পসজ্জা গাঁথিবার কৌশলে নির্ম্মাণ করিতে হয়; পক্ষান্তরে, শেখরকাপীড়যোজন দেবপূজার অঙ্গভূত নহে—প্রধানতঃ নাগরক (অর্থাৎ বাবুদিগের) বিশিষ্টপ্রকার পুষ্পসজ্জা-বিধান মাত্র। আর ষষ্ঠ-সংখ্যক কলা—কুসুম-বলি-বিকার—সূত্রদ্বারা না গাঁথিয়া কেবল স্তরে স্তরে ভাগে সাজাইয়া অথবা বিনা সূত্রে গাঁথিয়া নানাবর্ণ পুষ্প-দ্বারা দেবপ্রতিমাদির বেশবিধান অথবা দেবমন্দিরাদির শোভা সম্পাদন।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"শিখাস্থানে দোদুল্যমান মাল্য শেখরক, মণ্ডলাকারে শিরোবেষ্টন-মাল্য আপীড়, এই দ্বিবিধ মাল্যদ্বারা নাগরকে সজ্জিত করাই একটা শিল্প।" ৮

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—"শিরোভূষণ অর্থাৎ টুপী পাগ্‌ড়ী ও তাহার অলঙ্কার প্রস্তুতকরণ"। ৯

৺সমাজপতি মহাশয়ের মতে—"শেখর (শিরস্ত্রাণ টুপী) ও তদীয় অলঙ্কার প্রস্তুতের প্রণালী"। ১০

যোজনং', ও 'পুনর্বিরচনবচনম্' ইত্যাদি দেখিয়া অনুমান করেন—টীকাকারের মতে—'শেখরকাপীড়বিরচনযোজনম্' পাঠ। আবার কেহ বা বলেন—না, বিরচন আর যোজন একার্থক—যোজনের ব্যাখ্যা—বিরচন। মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণে অনুবাদ—"এটিও গ্রথন-বিশেষ; কিন্তু যোজনারূপ কলান্তর। শিরোভূষণের ন্যায়,—অর্থাৎ সিঁথি, পানফুল, তারা, প্রজাপতি ইত্যাদির ন্যায়, সমান ভাবে শিখাস্থানে পরিধাপনযোগ্য শেখরক এবং মণ্ডলাকারে কাষ্ঠিকাসাহায্যে (ক্ষুদ্র চাচাড়ী ইত্যাদির সহিত) পরিধানযোগ্য আপীড় নানাবর্ণের পুষ্পদ্বারা বিরচিত করা। এ-দুইটি নাগরের প্রধান নেপথ্যাঙ্গ। টুপী, পাগড়ী ইত্যাদি অলঙ্কারকরণ"।—পৃঃ ৮৯-৯০।

দ্রষ্টব্য :—শেখরক—শিখাস্থানে পরিধানযোগ্য—সিঁথি, প্রজাপতি ইত্যাদি ত' শিখাস্থানে পরিধানের যোগ্য অলঙ্কার নহে—ঐগুলি প্রায় সিঁথির উপর পরা হয়। অতএব, উক্ত অনুবাদ টীকা-সম্মত নহে। শেখরক—ঘাড়ের কাছে (শিখাস্থানে) দোদুল্যমান মালা, ঝুমকো, pendant গোছের। আপীড়—সরু চ্যাচাড়ী দিয়া গোলাকারে গাঁথা মালা, যা মাথার চারধারে পরা যায়, ফুলের টায়রা বা মুকুট, chaplet. কাষ্ঠিকা—বোধ হয় কাষ্ঠিকা, কাঠি, বা চ্যাচাড়ী।

এস্থলে 'যোজন' শব্দটির অর্থ ঝুমকা বা মুকুটের মত দুইটি বিশিষ্ট আকারে বিরচন, ইহাই টীকা-সম্মত অর্থ, শরীরে যোজন নহে, কারণ, উহা ১৬ সংখ্যক নেপথ্যপ্রয়োগ কলার অন্তর্গত।

৮ কাঃ সূঃ বঙ্গবাসী, পৃঃ ৬৪-৬৫

৯ শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, পৃঃ ৬

১০ কল্কিপুরাণ, পৃঃ ২৪

৺কুমুদচন্দ্র সিংহের মতে—"টুপী পাগড়ী ইত্যাদি প্রস্তুত করণ এবং পুষ্পদ্বারা মস্তকভূষণ প্রস্তুতকরণ"। ১১

১৬। নেপথ্যপ্রয়োগ—টীকাকারের অর্থ—"দেশ-কাল-অনুযায়ী শরীর-শোভার্থ বস্ত্র-মাল্য-আভরণ ইত্যাদিদ্বারা শরীর মণ্ডিত করণ"। ১২

'নেপথ্য' শব্দের অর্থ সাজসজ্জা, বেশ-ভূষা, পোষাক ইত্যাদি। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নানাবিধ বেশ, পুষ্পাদির মাল্য ও স্বর্ণ-মণি-মুক্তাদির অলঙ্কার ইত্যাদি পরিধানের কৌশল এই কলাটির অন্তর্গত।

রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ার্থ রঙ্গাবতরণের পূর্ব্বে নট-নটীগণের আহার্য্য-শোভা বিধানের প্রয়োজন হইত। এই আহার্য্যাভিনয়ও নেপথ্য-প্রয়োগ কলার অন্তর্গত। যাহার যেরূপ ভূমিকা, তাহার তদনুরূপ বেশ পরিধানই সঙ্গত! এই বেশ যেস্থানে করা হইত, রঙ্গগৃহের সেই স্থানের নামও 'নেপথ্য'। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় 'নেপথ্য' অর্থে বেশ-ভূষা বড় একটা প্রচলিত নাই। তাহার পরিবর্ত্তে 'সাজঘর' (green room) অর্থই অধিক প্রচলিত।

মতান্তরে, রঙ্গমঞ্চ-নির্ম্মাণও এই কলার অন্তর্ভুক্ত।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"দেশ-কাল ও পাত্র বিবেচনায় উপযুক্ত বেশ-ভূষা ও তাহার সন্নিবেশ"। ১৪

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—"রঙ্গরচনা, অভিনেতাদিগকে সাজান তাহার উপকরণ প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি"। ১৫

৺সমাজপতি মহাশয়ের মতে—"অভিনয়ের উদ্যোগ করণ, অভিনেতৃ-বিভূষণ প্রভৃতি এই শিল্পের অঙ্গ"। ১৬

৺কুমুদচন্দ্র সিংহের মতে—"দেশ-কাল ও পাত্রভেদে বস্ত্রালঙ্কারাদি ধারণ (শরীরের শোভায়)।১৭

১১ কৌমুদী, পৃঃ ২৮-২৯

যাঁহারা টুপী, পাগ্‌ড়ী ইত্যাদি অর্থ করিয়াছেন, তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ও কথাটিতে পুষ্পরচিত শিরোভূষণের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে—অন্য পদার্থ-নির্ম্মিত শিরোভূষণের কথা ইহাতে বলা হয় নাই। পক্ষান্তরে টুপী, পাগড়ী বলিলে পুষ্প-নির্ম্মিত শিরোভূষণ বুঝায় না—একারণে এরূপ অর্থ সঙ্গত মনে হয় না।

১২ দেশকালাপেক্ষয়া বস্ত্রমাল্যাভরণাদিভিঃ শোভার্থং শরীরস্য মণ্ডনাকারা:" (জয়ম্)।

১৩ অভিনয় চতুর্ব্বিধ—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক। এতন্মধ্যে আহার্য্যাভিনয়, নেপথ্যপ্রয়োগের অন্তর্ভূত। কাশী-সংস্করণ, ভরত-নাট্যশাস্ত্রেরও ২ অধ্যায়ে আহার্য্যাভিনয় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১৩ কাঃ সূঃ বঙ্গবাসী, পৃঃ ৩৫।

১৫ শিঃ পুঃ, পৃঃ ৬

১৬ কল্কিপুরাণ, পৃঃ ২৪

১৭ কৌমুদী, পৃঃ ২৯

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও ৺সমাজপতি মহাশয়, নেপথ্য-প্রয়োগ কলাটিকে কেবল রঙ্গ-সম্বন্ধীয় নেপথ্য-বিধানের কৌশলরূপে ব্যাখ্যা

১৭। কর্ণপত্রভঙ্গ—টীকাকার মতে হস্তিদন্ত-শঙ্খাদি-দ্বারা নির্ম্মিত সজ্জার্থ কর্ণাভরণ-বিশেষ।১৮

হস্তিদন্ত ও শঙ্খ নির্ম্মিত শাঁখা, কানের গহনা, আঙটি, সেফ্‌টিপিন ও অন্যান্য নানারূপ খেলার জিনিষ আজকালও খুবই প্রচলিত। প্রাচীনকালেও হস্তিদন্ত ও শঙ্খ-রচিত কানবালা, কানফুল ইত্যাদি কাণের গহনা ব্যবহৃত হইত—এই সকল অলঙ্কার প্রায়ই লতাপত্রাকারে নির্ম্মিত হইত; এই কারণে ইহাদিগের নাম 'কর্ণপত্র'—পত্রাকৃতি কর্ণাভরণ। হস্তিদন্তের মতই দুগ্ধধবল তাল-পত্রাদি-দ্বারাও এইরূপ নানাবিধ অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া পরিধান করিবার প্রথাও এককালে এদেশে খুবই প্রচলিত ছিল। আবার কাহারও কাহারও মতে—চন্দনাদি-দ্বারা আকর্ণ কপালে লতা-পত্রাদি রচনা এই কলার অন্তর্গত।

৺তর্কবত্ন মহাশয়ের মতে—"হস্তিদন্ত ও শঙ্খ প্রভৃতি দ্বারা পত্রাকৃতি কর্ণাভরণ রচনা"।১৯

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয় নূতন রকমের অর্থ করিয়াছেন—"পূর্ব্ব-কালে স্ত্রীলোকেরা মৃগমদ-চন্দনাদির তিলকশ্রেণী ধারণ করিত, তাহাই কর্ণপত্রভঙ্গ নামে ব্যবহৃত হইত। যে নারী এই কার্য্যে কুশলা, সেই নারীই পূর্ব্বে রাজমহিষীগণের নিকট সৈরিন্ধ্রী নামক দাসীপদ প্রাপ্ত হইতেন"।২০

৺সমাজপতি মহাশয় বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুসরণে বলিয়াছেন, "পূর্ব্বকালে কামিনীগণ তিলক রচনা করিতেন। যাহারা তিলক রচনা করিয়া দিত, তাহাদিগকে এই বিদ্যা শিখিতে হইত"।২১

৺বেদান্তবাগীশ ও সমাজপতি মহাশয়দ্বয়ের অর্থ সমর্থনযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, চন্দনাদি-দ্বারা তিলক-রচনা—পঞ্চম-সংখ্যক কলা 'বিশেষকচ্ছেদ্যে'র অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। অতএব, কর্ণপত্রভঙ্গ পৃথক কলা—ইহা শাঁখারী প্রভৃতির জীবিকা।

১৮। গন্ধযুক্তি—টীকাকার ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। এই কলাটির বিস্তৃত বিবরণ গন্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়, আর ইহার প্রয়োজনও সকলের নিকট সুবিদিত।২২

গন্ধ—গন্ধদ্রব্য, চন্দন-অগুরু ইত্যাদি। গন্ধযুক্তি—গন্ধ-যোজনা—নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য-নির্ম্মাণের কৌশল। এসেন্স, গন্ধতৈল, স্নো, ক্রিম, কস্‌মেটিক ইত্যাদি একরূপে বা রূপান্তরে চিরদিনই বর্ত্তমান ছিল, আছে ও থাকিবে।

৺তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, "পাকাচুলের 'কলপ' সুগন্ধ দ্রব্য নির্ম্মাণ ইত্যাদি গন্ধযুক্তির অন্তর্গত। বৃহৎ-সংহিতা ৭৭ অঃ গন্ধযুক্তির অনেক কথা আছে। তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, একলক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাতশত কুড়ি প্রকার গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী এই গন্ধযুক্তির অন্তর্গত। ইহা কল্পনা নহে,—বৃহৎসংহিতা দেখ, কোন গন্ধের কত ভাগ মিলাইয়া এই গন্ধ-সমুদ্রের সৃষ্টি তাহার পরিষ্কার হিসাব পাইবে। এই প্রকাণ্ড বিলাসের ক্ষেত্রে আমাদের পরাধীনতার বীজ নিহিত হয়"।২৩

এস্থলে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চুলে কলপ লাগাইবার কৌশল, বা গন্ধদ্রব্য অঙ্গে অনুলেপনের কৌশল, অষ্টম কলা দশনবসনাঙ্গরাগের মধ্যে পড়িবে। কিন্তু কলপ বা গন্ধদ্রব্য নির্ম্মাণের কৌশল আলোচ্য কলার অন্তর্গত।

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে, "নানাপ্রকার সুগন্ধ প্রস্তুত করণ"।২৪

৺সমাজপতি মহাশয়ের মতে, "গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী"।২৫

৺কুমুদচন্দ্র সিংহের মতে—"যথাশাস্ত্র নানাবিধ গন্ধদ্রব্য করণ"।২৬

১৯। ভূষণযোজন—যশোধর বলিয়াছেন,—"ইহা অলঙ্কার-যোগ। অলঙ্কার-যোগ দ্বিবিধ—(১) সংযোজ্য ও (২) অসংযোজ্য। সংযোজ্য—কণ্ঠিকা, ইন্দ্রচ্ছন্দ ইত্যাদি—যাহা মণি-মুক্তা-প্রবালাদি-যোগে যোজিত হয়। আর অসংযোজ্য—কটক-কুণ্ডলাদির রচনাই যোজন। এই দুই প্রকারে ভূষণ-নির্ম্মাণের কৌশলই নেপথ্য-বিধির অঙ্গ। শরীরে ভূষণ-যোজন এই কলার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। কারণ, 'নেপথ্য-প্রয়োগ' নামক কলাটির দ্বারাই উহার সিদ্ধি হইতে পারিত"।২৭

মুখ্যতঃ অলঙ্কার দুইশ্রেণীর—(১) একপ্রকার যাহা সূত্রে বা তারে গাঁথা যায়, যথা মণি-মুক্তা-প্রবালাদির মালা, কণ্ঠহার (কণ্ঠিকা) বাঁকালের চন্দ্রহার (ইন্দ্রচ্ছন্দ) ইত্যাদি। কিছু কিছু জড়োয়া গহনাও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। আর একপ্রকার, যাহা গাঁথিয়া নির্ম্মাণ করা যায় না, কিন্তু সোনা-রূপা ইত্যাদি ধাতু গালাইয়া নির্ম্মাণ করিতে হয়, যথা—তাগা, বাজু (কটক), কুণ্ডল ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণীর অলঙ্কারের যোজন অর্থ—সূত্রে বা তারে যোগ বা গ্রথন। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর অলঙ্কারের পক্ষে যোজন অর্থ নির্ম্মাণ। মোটের উপর, এস্থলে এই দুই শ্রেণীর অলঙ্কার নির্ম্মাণের সাধারণ নামই 'যোজন'। যোজন অর্থে—শরীরে

করিয়াছেন! কিন্তু 'নেপথ্য' অর্থে কেবল রঙ্গমঞ্চ-সম্বন্ধীয় বেশভূষা নহে। নেপথ্য—বেশ (ভূষা)। উহা অতি ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়। রঙ্গমঞ্চের বেশ-নির্ম্মাণ, নেপথ্য-প্রয়োগের একদেশ, অঙ্গভূত মাত্র।

১৮ "দন্তশঙ্খাদিভিঃ কর্ণপত্রবিশেষা নেপথ্যার্থাঃ"—জয়ম।

১৯ কাঃ সুঃ, বঙ্গবাসী, পৃঃ ৬৫।

২০ শিঃ পুঃ, পৃঃ ৬

২১ কল্কিপুরাণ, পৃঃ ২৪

২২ "স্বশাস্ত্রবিহিতপ্রক্রা প্রতীত-প্রয়োজনা"—জয়ম।

২৩ কাঃ সুঃ, বঙ্গবাসী, পৃঃ ৬৫

২৪ শিঃ পুঃ, পৃঃ ৬

২৫ কল্কিপুরাণ, পৃঃ ২৪

২৬ কৌমুদী, পৃঃ ২৯

২৭ "অলঙ্কারযোগঃ স দ্বিবিধঃ। সংযোজ্যোঽসংযোজ্যশ্চ তত্র সংযোজ্যস্য কণ্ঠিকেন্দ্রচ্ছন্দাদের্মণিমুক্তাপ্রবালাদিভির্যোজনম্। অসংযোজ্যস্য কটককুণ্ডলাদেঃ বিরচনং যোজনম্। তদুভয়ং নেপথ্যাঙ্গম্; নতু শরীরে ভূষণযোজনম্। তস্য নেপথ্যপ্রয়োগা ইত্যনেনৈব সিদ্ধত্বাৎ"—জয়ম।

অলঙ্কারের যোগ নহে---কারণ, তাহা 'নেপথ্য-প্রয়োগ' কলার অন্তর্গত---ইহাই টীকাকারের অভিপ্রায়।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে---"মুক্তাবলী প্রভৃতি বন্ধনযুক্ত অলঙ্কারে মণিযোজনা, বলয়, মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কার নির্ম্মাণ ও তাহার বিন্যাস"।

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে---"অলঙ্কার নির্ম্মাণ ও তাহার গ্রন্থনাদি। নির্ম্মাণকার্য্যটি এক্ষণে স্যাক্‌রার হস্তে এবং গ্রন্থন-কার্য্যটি পাটওয়ারদিগের হস্তে আছে"।

৺সমাজপতি মহাশয়ের মতে—"অলঙ্কার-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি"।

৺কুমুদচন্দ্র সিংহের মতে---"অলঙ্কার প্রস্তুত করণ এবং তাহার প্রয়োগ। যশোধর ইহা দ্বিবিধ বলিয়াছেন, যথা---(১) সংযোজ্য—মণি-মুক্তা প্রভৃতি দ্বারা কণ্ঠহার, চন্দ্রহারাদি প্রস্তুত করা (জড়াও কাজ) এবং (২) অসংযোজ্য—অর্থাৎ কেবলমাত্র স্বর্ণ দ্বারা কটক-বলয়াদি প্রস্তুত করা"।

২০। ঐন্দ্রজাল—টীকাকারের মতে---"ইন্দ্রজালাদিশাস্ত্র-কথিত যোগসমূহ। সৈন্য-দেবালয়াদি-দর্শন-হেতু আপনাকে বিস্মিত বোধ করা"।৩২

'ঐন্দ্রজাল' বলিতে বুঝায় 'ভানুমতীর খেল' বা 'ভোজবাজি'। ইন্দ্রজাল প্রভৃতি তন্ত্রে ইহার বর্ণনা আছে বলিয়াই ইহার নাম ঐন্দ্রজাল। মন্ত্র-তন্ত্রাদির সাহায্যে লোককে বোকা বানাইয়া শূন্যে যুদ্ধাদি নানারূপ অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার দেখানই ইহার কাজ। আজকাল হিপ্নটিজম্, মেস্‌মেরিজম্ ইত্যাদি সম্মোহন বা যাদুবিদ্যার প্রভাবে বহুলোককে একসঙ্গে বশীভূত করিয়া যে সকল যাদু দেখান হয়—সেগুলিকে ইন্দ্রজাল বা ঐন্দ্রজাল বলা যায়। কেহ কেহ বিংশতিপ্রকার মায়া দেখাইবার কথা বলিয়াছেন।

মায়াবি-কর্ত্তৃক মায়া-প্রদর্শন ভারতের একটি অতি পুরাতন ক্রীড়া। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, 'পরমেশ্বর মায়া-দ্বারাবহুরূপতা প্রাপ্ত হন', 'মায়ী এই বিশ্ব ইহা হইতে সৃষ্টি করেন ও অপর তাহাতে মায়া-দ্বারা সন্নিরুদ্ধ' ও 'মায়া—প্রকৃতি, মায়ী—পরমেশ্বর' ইত্যাদি। ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে, স্বপ্ন মায়া-মাত্র। গৌড়পাদ-কারিকায় বলা হইয়াছে, সৃষ্টি স্বপ্ন-মায়া-তুল্য।৩৩

৩২ "ইন্দ্রজালাদিশাস্ত্রপ্রভবা যোগাঃ। সৈন্যদেবালয়াদি-দর্শনাহস্তাববিস্মাপনার্থঃ"—জয়মঃ। "সৈন্য ও দেবালয়াদি দেখাইয়া অহম্মুখ (বোকা) করিয়া ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া দেওয়াই উহার প্রয়োজন"—৺মহেশচন্দ্র পালের অনুবাদ। অহস্তাব বিস্মাপন-অর্থে আহাম্মুখ করা—এ অর্থ কতদূর সঙ্গত তাহা বলা যায় না। আমাদের বোধ হয় টীকাকারের অভিপ্রায়—যাহাতে অহন্তাবের বিলোপ হয় এরূপ বিস্ময়ের উদ্রেক—বিস্ময়ে আমি-জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলা।

৩৩ "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"।

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।" (শ্বেতাশ্বতর ৪।৯)

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" (শ্বেত, ৪।১০)

"মায়ামাত্রন্তু··" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৩)

আচার্য্য শঙ্কর জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে বহুস্থলে মায়া-মায়াবি-দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি মাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখান যায় যে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় রজ্জু-মায়ার (Famous Indian Rope Trick) বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন।

কোন এক মায়াবী আকাশে সূত্র নিক্ষেপ করিয়া তদবলম্বনে আয়ুধ-হস্তে শূন্যে উঠিল ও চক্ষুর অগোচরে গমন করিল। পরে অদৃশ্য থাকিয়া যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল ও অনন্তর পূর্ব্ববৎ অখণ্ড শরীরেই পুনরুত্থিত হইল ইত্যাদি।

পুনশ্চ—যে সূত্র আকাশে নিক্ষিপ্ত হয় ও তাহাতে যে উঠে—এতদুভয়-ব্যতিরিক্ত পরমার্থ-মায়াবী যে সে ভূমিতেই মায়াচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে ইত্যাদি।৩৪

শ্রুতির কথা—ইন্দ্রই মায়াবী; এই ইন্দ্র কে? শ্রুতির উত্তর তিনিই পরমেশ্বর। আর প্রকৃতি তাঁহার মায়া।

'ইন্দ্রজাল শব্দের মুখ্য অর্থ—ইন্দ্রের (অর্থাৎ পরমেশ্বরের) জাল অর্থাৎ—মায়াজাল-সদৃশ)—এই প্রবঞ্চ।৩৫

এ বিশ্ব-প্রপঞ্চ পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত মায়ারূপা প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন—অতএব মায়াময় ইহাই ইন্দ্রজাল-শব্দের মুখ্যার্থ। এই মায়াময় প্রপঞ্চের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যত কিছু ভেল্‌কি বা ভোজবাজি তাহাদিগকেও গৌণভাবে 'ইন্দ্রজাল' আখ্যা দেওয়া অযৌক্তিক হইতে পারে না।

মায়া বা ইন্দ্রজালের অপর নাম শাম্বরী।৩৬ শম্বর নামে অসুর এইরূপ ভোজবাজি বা ভেল্‌কি দেখাইয়া, সুরাসুর-নরের অজেয় হইয়াছিলেন। মায়াবলে তিনি অদৃশ্য থাকিতে পারিতেন। পরিশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী-গর্ভজাত তনয় প্রদ্যুম্নকে শৈশবে মায়াবলম্বনে অপহরণ করিলে উক্ত প্রদ্যুম্নের হস্তেই শম্বরের মৃত্যু হয়। ইহাই পৌরাণিক কথা। এই জাতীয় শাম্বরী মায়াকে দৈত্যমায়া বা আসুরী মায়া (Black Art) বলা হয়।

মহাকবি কালিদাস 'মিথ্যা' অর্থ বুঝাইতে অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে 'মায়া'-পদের প্রয়োগ করিতেছেন।

"স্বপ্নমায়াসরূপেতি সৃষ্টিবরন্যৈর্বিকল্পিতা (গৌড়পাদকারিকা ১।৭) [৩৪ "ন হি মায়াবিনং সূত্রমাকাশে নিঃক্ষিপ্য তেন সায়ুধ-মারুহ্য) চক্ষুর্গোচরতামতীত্য যুদ্ধেন খণ্ডশশ্ছিন্নং পতিতং পুনরুত্থিতঞ্চ তৎকৃত-মায়াদিসতত্ত্বচিন্তায়ামাদরো ভবতি। সূত্র-তদারূঢ়াভ্যামন্যঃ পরমার্থমায়াবী। স এব ভূমিষ্ঠো মায়াচ্ছন্নোঽ-দৃশ্যমান এব স্থিতঃ"।—শাঙ্করভাষ্য গৌড়পাদকারিকা ১।৭।

৩৫ ইদি (পরমৈশ্বর্য্যে) রন্ = ইন্দ্র—পরমেশ্বর। পরমেশ্বর নিজ মায়া বা প্রকৃতি দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অতএব বিশ্বের পারমার্থিক সত্তা নাই উহা মায়িক—ইন্দ্রের জাল (মায়া) মাত্র। এই বিশ্ব যেমন পরমার্থ সৎ নহে, তেমনই ভেল্‌কিতে প্রদর্শিত বস্তু (যথা—সূত্রাবলম্বনে শূন্যে উত্থানাদি) ব্যাবহারিক জগতের বস্তুর মত সৎ নহে—পরন্তু প্রাতিভাসিক। এই কারণে মুখ্য ইন্দ্রজাল-স্বরূপ এই বিশ্বের তুল্য বলিয়া ভেল্‌কিকেও গৌণভাবে ইন্দ্রজাল বলা হইয়া থাকে।

৩৬ "মায়া তু শাম্বরী—অমরকোষ

ইন্দ্রজাল প্রয়োগের সুবিস্তৃত ও বিস্ময়কর বিবরণ দৃষ্ট হয়—শ্রীহর্ষের রত্নাবলী-নাটিকায় চতুর্থাঙ্কে দৃষ্ট হয় যে এক ঐন্দ্রজালিক বৎসরাজ উদয়ন ও তদীয় মহিষী বাসবদত্তা ও সভাসদবর্গের সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ ভ্রামিত করিয়া দেখাইতেছেন—ঐ দেখ পদ্মাসনে ব্রহ্মা, ঐ ইন্দুশেখর শঙ্কর, ঐ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু, ঐ ঐরাবত পৃষ্ঠে দেবরাজ ইত্যাদি। ইহার পরেই রাজান্তঃপুরে যে অগ্নি লাগিল তাহাও ঐ ঐন্দ্রজালিকের ভেল্‌কি—যথার্থ অগ্নি নহে।৩৭

'ঐন্দ্রজাল' শব্দটি 'ইন্দ্রজাল' শব্দ হইতেই নিষ্পন্ন। অর্থ একই।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে "ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাবে বিবিধ প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন"

৺বেদান্তবাগীশ—"ভোজবাজী"।

৺সমাজপতি—৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুগামী।

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ—"ইহা প্রসিদ্ধ (magic)" ৩৮।

২১ কৌচুমার যোগ—যশোধর বলিয়াছেন—"এইগুলি—সুভগঙ্করণাদি কুচুমার-কথিত, উপায়ান্তর-দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় না, তাহার সাধনোপযোগী ব্যাপার" ৩৯।

কুরূপা বা কুৎসিতকে সুরূপা বা সুন্দরী করিয়া দেখান, আবার সুরূপাকে রূপহীনা করিয়া দেওয়া, বার্দ্ধক্য-জরাকে জয় করা, বিরক্তকে অনুরক্ত করা সৌভাগ্য বর্দ্ধন ইত্যাদি যে সকল বিষয় অন্য কোন উপায়ের অসাধ্য—তাহা সাধনের মূল উপায় কুচুমার (বা কুচমার)-নামক কামশাস্ত্রের এক অতি প্রাচীন আচার্য্য-কথিত এই সকল গোপনীয় যোগ।

কুচুমার কামসূত্রের একদেশী আচার্য্য তিনি কেবল ঔপনিষদক অধিকরণের উপদেশ দিয়াছিলেন। ঔপনিষদক অধিকরণে নানা প্রকার ঔষধ করণের উপদেশ আছে।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে "কুচুমার-কথিত সুভগঙ্করণাদি যোগ সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির উপায়-প্রয়োগ"৪০।

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয় ইহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্র-সঙ্গত নহে—"নানাপ্রকার লিপিক্রিয়াকে কৌচুমার যোগ বলে। ইতর ভাষায় যাহাকে জাল বলে, পূর্ব্বে তাহাই কৌচুমার শব্দে অভিহিত হইত। এটি বড় অসাধু জীবিকা। ইহাকে তস্কর-জীবিকা বলিলেও বলা যায়"।৪১

৺সমাজপতি মহাশয় অন্ধভাবে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুসরণ করিয়াছেন—"জাল করিবার উপায় শিক্ষা"।৪২

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয় ৺মহেশচন্দ্র পালের অনুসরণে বলিয়াছেন—কুচমার একজন কামশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত। ইহার উপদেশানুসারে কুরূপাকে সুরূপ করিয়া এবং সুরূপাকে কুরূপ করিয়া দেখান এবং অনুরক্তকে বিরক্ত ও বিরক্তকে অনুরক্ত করা যায়"৪৩।

[ক্রমশঃ

---

৩৭ "স্বপ্নো নু মায়া নু"—শাকু (৬।৯)

"এষ ব্রহ্মা সবোজে" ইত্যাদি রত্নাবলী (৪।১১)

রত্নাবলীর এই চতুর্থ অঙ্কটি ইন্দ্রজালের মহিমায় পরিপূর্ণ! সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যে ইন্দ্রজালের একপ বিস্ময়কর বর্ণনা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

৩৮ কাঃ সূঃ বঙ্গবাসী, পৃঃ ৬৫। শিঃ পৃঃ ৬। কল্কিপুরাণ পৃঃ ২৪ কৌমুদী পৃঃ ২৯

৩৯ "কুচুমারস্তেতে সুভগঙ্করণাদয় উপায়ন্তরাসিদ্ধসাধনার্থাঃ" জয় মং। "কুরূপাকে সুরূপা করিয়া দেখান, সুরূপাকে অরূপা করিয়া দেখান, বিরক্তকে অনুরক্ত করা ইত্যাদি। যাহা অন্য উপায়ের অসাধ্য, তাহার সাধনই ইহার প্রয়োজন। ইহা ঔপনিষদিক প্রকরণে বক্তব্য। (অসাধ্য সাধনার্থ তিলককরণাদি) —৺মহেশচন্দ্র পালের অনুবাদ।

৪০ কাঃ সূঃ বঙ্গবাসী, পৃঃ ৮৫।

৪১ শিঃ পুঃ, পৃঃ ৭। স্পষ্টই বুঝা যায় যে ৺বেদান্তবাগীশ মহাশয় যশোধরের টীকা না দেখিয়া সম্পূর্ণ আন্দাজেই এই বিবরণটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কুচুমারের যথার্থ পরিচয় না জানা থাকায় তিনি এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

৪২ কল্কিপুরাণ, পৃঃ ২৪

৪৩ কৌমুদী, পৃঃ ২৯

দুর্গতি মাঝে এস মা দুর্গে

শ্রীনীলরতন দাশ, বি-এ

প্রলয়ঙ্করী তিমির রাত্রি নেমেছে ধরণী তলে,
বিশ্ব ব্যাপিয়া সৃষ্টিবিনাশী প্রলয়বহ্নি জ্বলে।
এবার সবার মরণোৎসব,
আর্ত্তকণ্ঠে ওঠে কলরব ;
আজি এ-শ্মশানে বোধনের দিনে জাগো মাতা দশভুজা,
শব-সাধনায় তুষিব তোমায় সঁপিয়া ব্যথার পূজা।

হস্তে তোমার বরাভয় ল'য়ে এস মাগো অম্বিকা,
দুর্গত তব ভক্তের ভালে এঁকে দাও জয়টিকা।
মঙ্গলকর-পরশে তোমার
ঘুঁচাও অশিব অশুভ সবার ;—
মহামারী আর অন্নাভাবের অসুরে করিয়া জয়
দুর্গতি মাঝে এস মা দুর্গে নাশিতে দৈন্যভয়।

"টুক্ টুক্ টুক্—টুক্ টুক্ টুক্"

দুয়ারে ভদ্র-দস্তুর মৃদু মৃদু টোকার শব্দ হোল। আহ্নিক শেষ করে নতুন দিদিমা আসনে বসেই লণ্ঠনের আলোয় কি একটা বই পড়ছিলেন। শব্দ শুনে পিছনের দুয়ারের দিকে চেয়ে বললেন, "কে?"

আস্তে আস্তে দুয়ার ফাঁক করে একটি কিশোর মুখ দেখা দিল। চোখ কুঁচ্‌কে সলজ্জ হাস্যে কিশোর বললে, "আসতে পারি?"

বই বন্ধ করে নতুন দিদিমা স্নেহময়-কণ্ঠে সাগ্রহে বললেন, "সন্তু? আরে তুমি? এস এস—"

মস্ত বাড়ী। খুড়ি, জ্যাঠাই, ভাসুর-পো, ভাসুর-ঝি, দেবর-পুত্র, দেবরকন্যা, জায়েদের নাতি নাতিনী, সব নিয়ে নতুন দিদিমার বৃহৎ পরিবার। নিজের পূজাপাঠ, জ্ঞানচর্চ্চা ও রান্না বান্নার সময়টুকু বাদ দিয়ে, বাকী সময়টুকু ঐ ছোটদের সঙ্গে গল্প গুজব, ঝগড়া তর্ক, আড়িভাব নিয়েই তাঁর কাটে। তবু ছোটরা নালিশ করে, তারা নাকি ইচ্ছামত ভাবে নতুন দিদিমার সঙ্গে গল্প-করার সুযোগ পায় না। কাজেই অবকাশ পেলেই নতুন দিদিমা ছোটদের হাতে আত্ম-সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

নাতি সন্তু ঘরে ঢুকল। সলজ্জমুখে অনুযোগের সুরে বললে, "বাব্বাঃ, বিকেল থেকে তিনবার এসে ফিরে গেছি। একবার চোখ বুজে আঙুল গুণছিলেন, আর দু'বার ওঁ ওঁ করছিলেন!"

অর্থাৎ—নাতিপ্রবরের শুভাগমনে স্বাগত সম্ভাষণের বিঘ্ন উৎপাদক সান্ধ্যাহ্নিক! লজ্জিত হয়ে দিদিমা বললেন, "অপরাধ স্বীকার করছি! তিনবার এসেছিলে? কই পায়ের শব্দ তো পাইনি।"

বিজয়ী বীরের মত উৎফুল্ল মুখে নাতি বললে, "হুঁ হুঁ বুঝুন, কেমন নিঃশব্দে আসি যাই! টের পান নি ত?"

যেন টের না পাওয়ায় দিদিমার একটা মস্ত যুদ্ধে হার হয়ে গেছে।

দিদিমা সস্নেহে হেসে বললেন, "অন্যমনস্ক হয়ে থাকলে আমার কান বিশ্বাসঘাতকতা করে ভাই। থাক, এখন খবর কি বল? এগজামিন মাথায় মাথায়, পড়াশুনা বেশ মন দিয়ে করছ ত?"

"নিশ্চয়। আজ সারা দু'পুর পড়েছি। বিকেলে বেড়িয়ে এসে সারা সন্ধ্যা পড়েছি। এবার একটু গল্প করতে এলুম। কি পড়ছেন?"

পাঠ্য পুস্তকে উগ্র উত্তেজনার উপকরণ যথেষ্ট ছিল। সে জন্য আহ্নিক শেষ করে সে আসন ত্যাগ করার তর্ সয়নি, সেখানে বসেই নতুন দিদিমা উগ্র কৌতূহলে বই খুলেছিলেন। নাতির প্রশ্নে উৎসাহের সঙ্গে বললেন—"বিলিতী ভূতের গল্প! উঃ সন্তু, এরা সব কি ভয়ানক জ্যান্তো জ্যান্তো ভূত! আমাদের দিশি লোকেরা মরে আবার জন্মগ্রহণ করবার সুযোগ পায়,—যে তাদের অনিষ্ট করেছে, তারই ছেলে হয়ে জন্মায়, মেয়ে হয়ে জন্মায়। তারপর বাপ-মায়ের শারীরিক, আর্থিক দণ্ড করিয়ে রোগে ভুগে ভুগে অকালে মরে গিয়ে, বাপ-মাকে শোকে ভাসিয়ে প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু বিলিতী প্রেততত্ত্বের আইনে দু'বার জন্মাবার সুযোগ নাই। তাই প্রেতাত্মা হয়ে সাংঘাতিকভাবে অনিষ্টকারীর প্রতিহিংসা সাধন করে। কি নৃশংস সে প্রতিহিংসা! এগজামিন শেষ হলে বইটা পোড়ো।—"

সন্তু বইটা উল্‌টে পাল্‌টে দেখে বললে—"Ghost Stories?" আচ্ছা পড়ব। কিন্তু এদিকের খবর শুনেছেন?"

সব দিকের সব খবর বাহির থেকে সংগ্রহ করে এনে নতুন দিদিমার কাছে রিপোর্ট করায় এবং সেগুলো নিয়ে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতে গবেষণা করায় এদের একটা আরাম আছে। নতুন দিদিমারও অবশ্য দৌর্ব্বল্যের অন্ত নাই, এমন কি বড় জায়েদের কাছে বকুনি খেয়েও তাঁর চৈতন্য হোত না যে—ছোটদের "ছোট" মনে রেখেই চলা উচিত। ছোটদের তিনি অবজ্ঞা করা দূরে থাক, বরঞ্চ সস্নেহে শ্রদ্ধা করতেন। এমন কি তাদের যুক্তি-বিচারসহ কথা শুনলে খুব ভক্তিভরে তাদের শিষ্যত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করতেন।

সুতরাং এদিকের খবরের সংবাদে সসম্ভ্রমে চারদিক নিরীক্ষণ করে বললেন, "কোন্ দিকের?"

ব্যগ্র উত্তেজনায় সন্তু বললে, "কাল রাতে ফের ডাকাতি হয়ে গেছে পাশের বেলগাঁয়ে। বাড়ীর লোকদের তারা মেরে কেটে

জখম করে বহুৎ টাকার গহনা-পত্র লুটে নিয়ে গেছে। এখান থেকে ডাক্তার নিয়ে গেছল।' ডাক্তার এতক্ষণে সেসব সেলাই-ফোঁড়াই করে ফিরে এল। বললে, "দুজন পুরুষ মানুষ আর একজন মেয়ে মানুষের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে গেছে।"

ছাদে কাপড় শুকুতে দেওয়া হয়েছে, তারই আঁচল ওটা। এতেই ভয় পেলে ?

একে সর্ব্বনাশা জার্ম্মান-যুদ্ধ—(জাপান তখনও নীরব) তার উপর সে বৎসর অর্থাৎ ১৩৪৭ সালে এ অঞ্চলে ধান বা অন্য ফসল বৃষ্টির অভাবে ভালরূপ হয় নাই। খাদ্যাভাবে চৈত্র মাস থেকেই চারিদিকে হাহাকার উঠেছে। ক্রমে আশপাশের পল্লী অঞ্চলে প্রথমে চুরী তারপর ঘন ঘন ডাকাতি সুরু হয়েছে। সশস্ত্র ডাকাতদল গভীর রাত্রে হানা দিয়ে গৃহস্থদের ধন-প্রাণ লুণ্ঠন করছে। গ্রামে গ্রামে আতঙ্ক-উদ্বেগে সকলে সশঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

হাটে বাজারে অন্দরে বাহিরে সর্ব্বত্র চলছে চুরি-ডাকাতির সংবাদের আন্দোলন। স্কুলের ছেলেরা হুজুক নিয়ে মাতামাতি করছে সব চেয়ে নির্ভাবনায় এবং সব চেয়ে প্রবল উদ্যমে।

সন্তু স্কুলের ছাত্র, ম্যাট্রিক দিতে প্রস্তুত। বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণে এবং রাস্তায় বেপরোয়া ভাবে সাইকেল চালিয়ে নিরীহ পথিকদের আহত করতে তার সমকক্ষ সুদক্ষ কেউ নাই। কিন্তু চোর ডাকাত এবং ভূতের নামে তার স্নায়ুমণ্ডলী দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। অতএব নিজের অন্তরাগত প্রবল দস্যুভীতি ব্যাধিটা দিদিমায়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে কিঞ্চিৎ স্বস্তি লাভ করার চেষ্টায় বেচারা মহা-উৎসাহে দিদিমায়েদের মহলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব দিদিমাকে শোনানো হয়েছে, এবার নতুন দিদিমার পালা।

ডাকাতির সংবাদের চেয়েও বিলাতী-ভূতের জমকালো কৃতিত্ব-গৌরব তখন নতুন দিদিমার মগজ অধিকার করে রয়েছে। তবু দুঃসংবাদে দুশ্চিন্তা প্রকাশের চেষ্টায় বল্লেন, "এতগুলো চুরি-ডাকাতি নির্ব্বিঘ্নে হোল, পুলিশ কিছুই করতে পারছে না। চৌকিদারগুলোই বা করছে কি ?"

"চৌকিদার ?"—চোখ কুঁচকে বিদ্রূপের হাসি হেসে সন্তু বললে, "চোর ডাকাতরা এসে উৎপাত করলে তাদের দেখা পাওয়া যায় না! চোরেরা চলে গেলে তারা সেজে গুজে লাঠি লণ্ঠন নিয়ে অলস মন্থর গমনে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে কৈফিয়ৎ দেয়—তারা আসবে কি করে? তাদের হাত যোড়া ছিল—তারা 'পগ্‌গ' বাঁধছিল। ভাগ্যে আমাদের গ্রামে ডিফেন্স পার্টি তৈরী হয়েছে, তাই চোর-ডাকাতরা এত চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছে না। শুনেছেন ত? প্রতিরাত্রেই ডিফেন্স পার্টির লোকেরা আদাড়ে পাঁদাড়ে গুপ্তভাবে অনেক রকম লোককে চলা ফেরা করতে দেখেছে। তাড়া পেলেই তারা ছুটে পালায়।"

কথাটা শোনা গেছে বটে। রাত্রে প্রহরা দেবার সময় পুকুরের ওপাড় থেকে, বন-বাদাড়ের নিরাপদ অন্তরাল থেকে, দৈববাণীর মত অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বরে উক্ত রক্ষীদলকে শাসিয়ে বলা হচ্ছে, "দেব একদিন কেটে কুচিয়ে—" ইত্যাদি। তবু রক্ষীদল হটে নি। সমান উৎসাহে প্রহরা কার্য্যে রত আছে।

নতুন দিদিমা রাগ করে বল্লেন, "গভর্ণমেন্টের উচিত চৌকিদার, পুলিশ সবাইকার মাইনে কেটে নিয়ে ডিফেন্স পার্টিকে দেওয়া। ওরা যখন কর্ত্তব্য পালন করতে পারবে না, তখন মাইনে নেবে কোন্ অধিকারে ?"

হঠাৎ গুমট ভেঙ্গে হু হু শব্দে এক ঝলক দম্‌কা বাতাস দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকলো। সন্তু জানালার পাশে খাটে বসেছিল। জানালার দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে বললে, "ওকি? ওকি?"

তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত লণ্ঠনটা নতুন দিদিমা জানালার কাছে তুলে ধরলেন। উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল জানালার ঊর্দ্ধাংশে, ছাদের আলিসা থেকে বিলম্বিত একটা কাপড়ের আঁচল হাওয়ার ধাক্কায় ঝট্‌পট্ করছে। আর কোথাও কিছু নাই।

সন্তু চোখ কপালে তুলে সেই দোদুল্যমান অঞ্চলপ্রান্ত নিরীক্ষণ করছে।

ব্যাপার বুঝতে বাকী রইল না। ভয় জিনিষটাকে প্রশ্রয় দেওয়া কাজের কথা নয়। ভর্ৎসনার সুরে নতুন দিদিমা বললেন, "ছাদে কাপড় শুকুতে দেওয়া হয়েছে, তারই আঁচল ওটা। এতেই ভয় পেলে ?"

লজ্জিত ও বিব্রত হয়ে সন্তু বললে, "তাই ভাল! আমার ভয় হয়েছিল, চোর না ভূত।"

তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য ঢোক গিলে কৌতূহলভরে বললে, "আচ্ছা, বনবাদাড়ের কাছে এঘরে রাত্রে একা থাকতে আপনার ভয় করে না? ধরুন—'সাপোজ' যদি এই দিক দিয়ে ডাকাত এসে আপনার জানালায় উঁকি দেয় ?"

নির্ব্বিকার মুখে গভীর অবজ্ঞাভরে নতুন দিদিমা বললেন,

"তা হলে জান্‌ব সে ডাকাতটি সন্তুবাবু ছাড়া আর কেউ নয়। তুমি ছাড়া আর কে এই অখোদ্বে পথে রসিকতা করতে আসবে ?"

জানালার বাহিরে অন্ধকারের দিকে সন্দিগ্ধ ভীত দৃষ্টিক্ষেপ করে সন্তু বললে, "আমি ? না, না—আমি নয়। কিন্তু সত্যি বলুন তো এ ঘরে একা থাকতে আপনার ভয় করে না, একটুও না ?"

স্মিতহাস্যে নতুন দিদিমা বললেন, "তোমার ভয় দেখাবার মতলব হয়েছে, নয় ? কিন্তু না ভাই ওটা কোর' না। জানো ত আমি ব্লাড প্রেসারের আসামী। দৈবাৎ ইঁদুর ছুটাছুটির শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেলে ধাঁ করে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। তারপর সারা রাত আর কার সাধ্য আমায় ঘুম পাড়ায় ? হার্টের প্যালপিটেসন বেড়ে যায় ! তখন সব ছেড়েছুড়ে নিয়ম পালন, ঔষধ সেবন, চুপচাপ শয়ন ইত্যাদি বহু ছরকট ভোগ করতে হয়।"

তাঁর কথা বলবার সকরুণ ভঙ্গি দেখে সন্তু সকৌতুকে হেসে উঠল। ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে খাবার জন্য ডাক এল। কাজেই গল্প স্থগিত রেখে উঠে যেতে হোল। যাওয়ার সময় নতুন দিদিমা পুনশ্চ বললেন, "ছাখো, পাশের ঘরে এখন মেজ ঠাকুরঝি থাকেন, অতএব আমি কাউকে ডরাই না। ত্যাঁদড়ামি করতে যদি আস, ওঁকে ডেকে জাগিয়ে দেব। জানো ত উনি একাই একশো। দুষ্টুমি কর তো ধরে এমন ঠেঙিয়ে দেবেন যে টের পাবে ?"

"মেজ ঠাকুরঝি" দিদিমাকে সন্তু একটু ভয় করে চলে। কারণ তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে বেশ একটু গায়ের জোর চাই। কিন্তু আসন্ন ম্যাট্রিকের তাড়ায় এবং ম্যালেরিয়ায় ভুগে সন্তু এখন কিঞ্চিৎ কাহিল।

থতমত খেয়ে সন্তু একবার দাঁড়াল, তারপর একটু হেসে চলে গেল।

রাত দশটা।

বাড়ীর সব দুয়ারে খিল বন্ধ হয়েছে। বহু পরিবারের বাড়ী। বাহিরে যাবার দুয়ার উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিমে সবশুদ্ধ সাতটি! পশ্চিমের দুয়ারের পাশেই মেজ ঠাকুরঝির ঘর। পশ্চিমের দুয়ার বন্ধ করে জলযোগ সেরে পাশাপাশি ঘরে নতুন দিদিমা ও তাঁর মেজ ঠাকুরঝি শুয়েছেন।

কিন্তু বিলাতী ভূতের আকর্ষণীশক্তি প্রবল। ব্লাড প্রেসারের আসামীকে তারা রেহাই দেয় না। প্রত্যেক ভূতটি মস্ত বৈজ্ঞানিক, মস্ত দার্শনিক। এই অশরীরী দল ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে এনে দস্তুরমত ডাকটিকিট মেরে পোষ্টাফিস মারফৎ শরীরী মানুষকে চিঠি পাঠায়—"খবরদার, রাত বারটার পর অমুক নির্জ্জন রাস্তায় চলাফেরা করে সেখানকার অদৃশ্য অধিবাসীদের বিরক্ত কোর না।" ইত্যাদি ইত্যাদি অত্যাশ্চার্য্য ব্যাপার! হয় ত সত্য, হয় ত মিথ্যা —তবু বর্ণনার বাহাদুরীর কাছে আত্মঘাতী হতে কৌতূহল জাগে!

বিছানায় শুয়ে গীতা পাঠ করতে করতে নতুন দিদিমার স্কন্ধে পুনরায় বিলাতী ভূতের আবির্ভাব হোল। খুললেন ফের ghost-stories! তারপর তন্ময় হয়ে চলল পঠন!

বাড়ী নিশুতি। হঠাৎ পাশের ঘরে মেজ ঠাকুরঝি হেঁকে উঠলেন, "কে 'নাচের' কপাট খুলছে রে ? কে— ?"

উক্ত 'নাচের কপাট' অর্থাৎ পশ্চিম দ্বার ঠিক মেজ ঠাকুরঝির ঘরের পাশে। সে কপাট খুলে বের হলেই দু'দিকে দু'টো রাস্তা পাওয়া যায়। একটা গেছে সদরের দিকে, একটা খিড়কীর দিকে। খিড়কীর কপাট খুলে বের হলে বন-বাদাড় ; এবং পাঁচ হাতের মধ্যে নতুন দিদিমার সেই পূর্ব্বোক্ত বাতায়ন!

হঠাৎ ঠাকুরঝির হাঁক শুনে নতুন দিদিমার চমক ভাঙল। পড়া বন্ধ করে কান খাড়া করলেন। শুনলেন উঠান থেকে চাপা গলায় অস্পষ্টভাবে কে কি বললে। উত্তরে মেজ ঠাকুরঝি আরো জোরে হেঁকে বললেন, "কে রে, কে ? সাড়া দিস্ না কেন ?"

সন্তুর এক মামা অন্য ঘর থেকে উচ্চকণ্ঠে বললে, "সন্তু এদিক দিয়ে বাইরে যাচ্ছিল। কপাট বন্ধ দেখে ফিরে গেল।"

আকস্মিক তন্দ্রাভঙ্গে বিরক্ত হয়ে মেজ ঠাকুরঝি বললেন, "সন্তু ? তা সাড়া দিলে না কেন ? কে, কে, করছি—তবু সাড়া নাই। এত রাতে এদিক দিয়ে কোথা যাচ্ছিল ?"

মামা জবাব দিলেন, "কি করে জানব ?"

"জিজ্ঞেস কর না—"

বাড়ী নিশুতি। হঠাৎ পাশের ঘরে মেঝ ঠাকুরঝি হেঁকে উঠলেন, "কে 'নাচের' কবাট খুলছে রে ? কে—

"চলে গেছে।"

নতুন দিদিমা দুশ্চিন্তা বোধ করলেন। রাত ন'টার পর জেগে থাকা সঙ্গত নিয়ম নয়। এখন দশটার পর তার এমন

গুপ্তভাবে গতিবিধির অর্থ? এত রাতে সে খিল খুলে কোথা যাচ্ছিল? খিড়কির দিকে? নতুন দিদিমার জানালার উদ্দেশে?

দিন দুপুরে চুপি চুপি পিছন থেকে এসে হঠাৎ কানের কাছে "গাঁক" করে চেঁচিয়ে উঠে নতুন দিদিমাকে চমকে দেওয়া, অন্যমনস্ক হয়ে ঘাটে নামবার সময় পাশের ঝোঁপ থেকে মাছধরা ছিপ বাড়িয়ে নতুন দিদিমার মাথার কাপড়ে বঁড়শি বেঁধা—এবং সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীরভাবে বলে ওঠা—"আমি মাছ ধরতে এসেছি। যে মাছ হবে, সে আমার বঁড়শিতে গেঁথে আপনা আপনি উঠে আসবে, এর জন্যে আমি দায়ী নই—" ইত্যাদি দুষ্ট রসিকতা সন্তুর স্বভাবসিদ্ধ। সে হেন সন্তু সন্ধ্যায় ইঙ্গিত করে এত রাত্রে যখন নিশুতি পুরীর দুয়ারের খিল খুলতে গেছে এবং জবরদস্ত মেজ দিদিমার—অর্থাৎ তার মায়ের পিসিমার সাড়াপেয়ে শশব্যস্তে যখন চম্পট দিয়েছে, তখন তার মতলব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ভয় দেখাবার দুষ্প্রবৃত্তি ওর ঘাড়ে চড়েছে সন্দেহ নাই।

অনুতপ্ত হয়ে নতুন দিদিমা বললেন, 'ভুল করে নিরপরাধকে শাস্তি দিয়েছি···'

এদিকের খিড়কির দুয়ার বন্ধ থাকলেও ওদিকেও আর একটা খিড়কির দুয়ার আছে। হয়ত ওদিক দিয়ে আবার সে আসবে।··· আসুক, একটা পনের বছরের নাতির বাঁদরামিকে বেশী খাতির করা মূর্খতা! জাগরণে ভয়ং নাস্তি—খানিক জেগে থেকে বই পড়া যাক্।

নতুন দিদিমা ফের পড়ায় মন দিলেন। এগারটা—বারোটা—ক্রমে একটা বাজল। দূরে গ্রাম্য চৌকিদার দীর্ঘ বিলম্বিত সুরে হাঁক দিল —"হো—ও—ও—ও হো:!"

না:, আর রাত জাগা ঠিক নয়। সকালে উঠ্‌তে হবে। কিন্তু চমৎকার কৌতূহলোদ্দীপক গল্প! নাম "Footsteps" অর্থাৎ পদধ্বনি। জাহাজের এক নাবিক মরে ভূত হয়ে প্রতিহিংসা সাধনের জন্য উপরওলার পিছু পিছু পদধ্বনি করে ঘুরছে। উপরওলা লোকটি এক সময় ইতর প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য উক্ত নাবিকের কন্যাকে অসৎ পথে নিয়ে গেছলেন। ক্ষোভে ধিক্কারে উন্মত্ত হয়ে নাবিকটা নৃশংশ অত্যাচার করে মেয়েকে হত্যা করে। কিন্তু উপরওলাকে তখন শাস্তি দেবার সুযোগ পায় নি। রুদ্ধ আক্রোশ মনের মধ্যে পুষে রেখে জাহাজ চালাচ্ছিল। হঠাৎ ধনুষ্টঙ্কার হয়ে নেপল্‌সের কোন সুদূর হাসপাতালে মারা গেছে।

কিছুদিন পরে দেশে ফিরে সেই উপরওলা যুবক বিবাহ করতে প্রস্তুত হ'য়েছেন,—এমন সময় পিছনে লেগেছে সেই ভূত! ভাবী বধূর সঙ্গে দেখা করে গভীর রাত্রে যুবক বাড়ী ফিরছেন, এমন সময় নির্জ্জন পথে পিছনে পদধ্বনিত হ'তে লাগল "মুস্—মুস্—মুস্—"

প্লট জমাট হয়ে উঠেছে। এখন পড়া বন্ধ করে নিদ্রার চেষ্টা অনিদ্রার জেদকে উস্কে দেওয়া মাত্র।—তারপর কি ঘটে, সেটা জানা চাই আগে।—

কিন্তু ও কি? জানালার বাইরে নির্জ্জন খিড়কির দিকে ও কিসের শব্দ?

নতুন দিদিমার কান সতর্ক হয়ে উঠ্‌ল। ঐকান্তিক চেষ্টায় শ্রবণেন্দ্রিয়ে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তিনি বাইরের শব্দ অনুভব করবার জন্য মনঃসংযোগ করলেন। হাঁ ঠিক,—ভুল হয় নি। এবড়োখেবড়ো মাটীর উপর দিয়ে, জুতা পায়ে থেমে থেমে,—অতি সন্তর্পণে কেউ জানালার দিকে এগিয়ে আসছে। জুতার স্পষ্ট শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—"মুস্—মুস্—মুস্।"

কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল ছাড়া কেউ সে পথে আসে না। তারা এলেও অত সন্তর্পণে আসবে না, জুতা পায়ে দিয়েও আসবে না। এ তাহলে—

কিন্তু ভূতের পদধ্বনি পড়তে পড়তে মাথা গরম হোল নাকি?

সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে, তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। অনুভব করলেন স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, ধমনীতে রক্তস্রোত দ্রুত বইছে। কান গরম হয়ে উঠেছে। হৃৎপিণ্ড সশব্দে লাফাচ্ছে!

রুদ্ধশ্বাসে কান খাড়া করে শুনলেন—জুতার শব্দ থেমে থেমে অধিকতর নিকটবর্ত্তী হচ্ছে। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে শোনা যাচ্ছে—"মুস্—মুস্—মুস্—"

নিঃসন্দেহে মানুষ! এবং সে ব্যক্তি সন্তু ছাড়া আর কেউ নয়!

সবলে আভ্যন্তরিক চাঞ্চল্য দমন করে,—অকুতোভয়ে দৃঢ় আদেশব্যঞ্জক স্বরে নতুন দিদিমা বললেন, "ছাখো, সাবধান করে দিচ্ছি। ভয়-টয় দেখাবার চেষ্টা কোর না।"

মুহূর্ত্তে জুতার শব্দ স্তব্ধ। দু' মিনিট পরে কে যেন অধিকতর সন্তর্পণে জুতা চেপে ক্ষিপ্র পদে দূরে গেল। তারপর সুস্পষ্ট—দুড়-দুড় শব্দে ছুট!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে দিদিমা লণ্ঠন নিবিয়ে এবার ঘুমাতে বাধ্য হলেন।

পরদিন দুপুরে, ওদিকের মহলের বারেন্দায় সন্তু চেয়ারে বসে, যুদ্ধের খবর নিয়ে প্রবল বিক্রমে তার সেজ মাসিমার সঙ্গে তর্ক করছিল। নতুন দিদিমা বারেন্দায় ঢুকে বিনা বাক্যে কাছে গিয়ে উত্তমরূপে তার কর্ণ মর্দ্দন করে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, "কাল রাত দেড়টার সময় আমাকে ভয় দেখাতে গিয়েছিলে!"

সন্তু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললে, "আমি? আমি তো যাই নি।"

নতুন দিদিমা সন্ধ্যার ব্যাপার ও রাত দশটার ঘটনা-চক্রের যোগাযোগ বিবৃত করে, পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "মেজ ঠাকুরঝির বকুনি খেয়ে তখন দে ছুট! তারপর রাত দেড়টার সময়, জুতো পায়ে সাবধানে, হাঁটি-হাঁটি, পা-পা করে ফের গেছলে ত? আমি টের পেয়ে বললুম—ছ্যাখো সাবধান করে দিচ্ছি!"

ব্যস্ অমি পা চেপে চেপে পিছু হটে গিয়ে, তারপর দুড় দুড় শব্দে ছুট্! এখন ভালমানুষ সেজে আমি তো যাই নি।"

সন্তুর সেজ মাসিমা হতভম্ব হয়ে সমস্ত শুনে সবিস্ময়ে বললে, "সন্তু বিকালে বেড়িয়ে ফেরবার সময় ভুল করে চায়ের দোকানে সাইকেল ফেলে এসেছিল। বাবার বকুনি শুনে জেগে উঠে, রাত দশটায় ঘুম-চোখে সেটা আনতে ছুটেছিল। পশ্চিমের দুয়ার বন্ধ দেখে ফিরে এসে এদিকের দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে যায়। তখুনি সাইকেল এনে ফের শুয়ে ঘুমোয়। আর জাগে নি। তা ছাড়া বাবা বাড়ীতে আছেন, ও কোন সাহসে আপনাকে ভয় দেখাতে যাবে? না কাকিমা, আপনার ভুল হয়েছে। রাত দেড়টার সময় সন্তু মোটে যায় নি।"

সেজ মাসিমার সত্যনিষ্ঠায় তার কাকিমার অর্থাৎ সন্তুর নতুন দিদিমার অগাধ শ্রদ্ধা। বিস্ময়স্তম্ভিত সন্তুর দিকে চেয়ে অধিকতর বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে বললেন, "ও রাত দেড়টায় ওখানে যায় নি? তাহলে কে গেছল রে? আমি যে স্পষ্ট জুতোর শব্দ শুনেছি। হাঁ নিশ্চয় সে মানুষ! সত্যি সন্তু যায় নি? ঠিক ত?"

বিস্তর সম্ভব ও অসম্ভব—সম্ভাবনার তর্কের পর সুনিশ্চিত রূপে প্রমাণ হোল সন্তু রাত দেড়টায় মোটে ওদিকে যায় নি। তার সেজ মাসিমা সে সময় তাকে গাঢ় নিদ্রামগ্ন দেখেছে।

বিপন্ন বিব্রত হয়ে নতুন দিদিমা নিজের ঘরে ফিরলেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, ঘরের পিছনে যে স্থানে জুতার শব্দ শোনা গিয়েছিল, সেই স্থানটা অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

না, ভুল নয়। ভুল নয়। চৈত্রের রৌদ্রদগ্ধ লতা গুল্ম মাড়িয়ে মাড়িয়ে কে বা কারা ঘরের পিছন দিয়ে বহুবার যাতায়াত করেছে বটে! ওই তো তাদের স্পষ্ট পায়ের দাগ! ওই তো দলিত তৃণগুল্মের উপর, এবং ধূলার উপর স্পষ্ট জুতার দাগ!

তবে?—

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, গভীর রাতে পড়াশুনার মাঝে মাঝে হঠাৎ চমক ভেঙে খিড়কির দিকে নানা রকম মৃদু শব্দ তিনি কদিন থেকে শুনেছেন বটে। কুকুর বিড়াল যাতায়াত করছে ভেবে সেগুলা গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু এ পদচিহ্ন ত কুকুর বেড়ালের নয়। তারা তো জুতাও পরে না।

নতুন দিদিমা বিস্ময়ে নির্ব্বাক! চারিদিকে উঠল হৈ চৈ।

খবর পেয়ে ডিফেন্স পার্টির ছেলেরা ছুটে এসে জানালে, কাল রাত দুটার সময় পাহারা দিতে এসে তারা পাশের ঘাটে সিক্ত কাদামাখা জুতার দাগ দেখেছে। দাগগুলো বাইরের রাস্তা থেকে এসে পুকুরের গর্ভ দিয়ে এই দিকে এসেছে এবং ফের ফিরে গেছে। কিছু পরে অন্য পথে পাহারা দিতে গিয়ে তারা এক ব্যক্তিকে জুতা পায়ে দিয়ে দৌড়ে পালাতে দেখেছে। রক্ষীদল তাড়া করায় সে এক পাটি জুতা ফেলে অন্তর্ধ্যান করেছে। জুতাটা বাটার রবার সোলের।

পরীক্ষা করে দেখা গেল এ জুতার দাগও সেই রবার সোলের। মাপও এক!

নতুন দিদিমা নত শিরে নিশ্চুপ!

সন্তু এসে বিজ্ঞভাবে ঘাড় মুখ নেড়ে বললে, "হুঁ হুঁ দেখুন! রোজ চোরেরা সুযোগ খোঁজবার জন্য আনাগোনা করছে,— সাংঘাতিক তালকানা মানুষ আপনি। জেগে থেকে শব্দ পেয়েও লক্ষ্য করেন নি! কাল সন্ধ্যায় গল্প করতে করতে ভাগ্যে ওদিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। তাইতো পদধ্বনিতে মোহিত হলেন। আর দু চার দিন আসতে আসতেই তারা বাড়ীতে ঢুকে পড়ত, সব চুরি করে নিয়ে যেত। আমি করলুম উপকার আর আমাকেই দিলেন চোরের মার!"

অনুতপ্ত হয়ে নতুন দিদিমা বললেন "ভুল করে নিরপরাধকে শাস্তি দিয়েছি, এখন ভুল প্রমাণ হওয়ায় বিবেক আমাকে কি শাস্তি দিচ্ছে বোঝাতে পারব না। সিন্‌সিয়ারলি বলছি সন্তু, আই বেগ ইওর পার্ডন!

বিজয়ী বীরের মত হাস্যোৎফুল্ল মুখে সন্তু বললে, "তাহলে এবার হারলেন ত?"

সনিশ্বাসে নতুন দিদিমা জবাব দিলেন, "মর্ম্মান্তিক ভাবে! সর্ব্বান্তঃকরণে বলছি সন্তু বাবুর জয়! উঃ, পদধ্বনির প্যাঁচে পড়ে এমন বিশ্রী ভুল মানুষে করে!""

'বঙ্গদর্শন' বা বাঙালীর দ্বিতীয় নবজাগরণ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

চৈতন্যযুগে নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া মৃতপ্রায় বাঙালীর একবার যুগান্তের জড়তা হইতে যে চৈতন্যোদয় হইয়াছিল তাহাকে প্রথম জাগরণ ধরিলে বলিতে হইবে 'বঙ্গদর্শনে'র যুগে বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া দ্বিতীয় নবজাগরণ সংঘটিত হইয়াছিল। প্রবল এবং পরিপুষ্ট পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মোহ বঙ্কিমচন্দ্র যে শাণিত অস্ত্রে ছেদন করিয়া ভিত্তিভ্রষ্ট বাঙালীকে আত্মস্থ হইবার শিক্ষা ও সুযোগ দান করিয়াছিলেন তাহার নাম 'বঙ্গদর্শন'। পৃথিবীর অন্যত্র যেমন, তেমন বাংলাদেশেও, এই কাজ এই দ্বিতীয় দফায় সাহিত্যের মারফতেই হইয়াছিল। সে সাহিত্যের মূল স্রষ্টা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁহার আধার ছিল 'বঙ্গদর্শন'— সুতরাং 'বঙ্গদর্শন' শুধু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নয়, বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসেও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বঙ্কিম তথা 'বঙ্গদর্শনে'র কীর্ত্তির যথাযথ পরিমাপ করিতে হইলে সেই সময়কার বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক অবস্থা এবং পরিবেশেরও যথাযথ অনুধাবন করিতে হইবে। সামাজিক ও সাহিত্যিক অবস্থার কথা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন। রাষ্ট্রিক অবস্থাও কম শোচনীয় ছিল না। 'বঙ্গদর্শনে'র "পত্র সূচনা"তে বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়কার শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য বাঙালীদের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :

...ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখকমাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য; নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয় ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় গড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি?...

লেখাপড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্চার, এড্রেস্, প্রোসিডিংস সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয়পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজীতেই হয়, কখনও ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্রলেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয়পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গলায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অচিরে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

...এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণীর এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছু মাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে ...সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায়সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না।

এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার-কল্পে বঙ্কিমচন্দ্র একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলেন। বাংলা সময়িক পত্রের সহিত তাঁহার সংযোগ' দীর্ঘকালের। নিতান্ত কিশোর বয়সে সাহিত্য-গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' তিনি পদ্য-গদ্যের মক্স করিয়াছিলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যখন তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা, একটি কবিতা, উক্ত পত্রিকায় বাহির হয়, তখন তাঁহার বয়স ১৩ বৎসর ৮ মাস। মাত্র দুই তিন বৎসর সাময়িক পত্রে হাত পাকাইয়া ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ললিতা·· মানস'এর মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বঙ্গবীণাপাণির সেবা সাময়িকভাবে স্থগিত হইতে দেখি। পরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত *Indian Field* নামক সাপ্তাহিক পত্রে ইংরেজীভাষায় তাঁহার সাহিত্য-সাধনা পুনরায় আরম্ভ হয়, *Rajmohan's Wife* নামক উপন্যাস সেখানে ধারাবাহিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পর বৎসরই (১৮৬৫) আত্মস্থ বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী', তাহার পর বৎসর (১৮৬৬) 'কপালকুণ্ডলা' এবং তাহারও তিন বৎসর পরে (১৮৬৯) 'মৃণালিনী' প্রকাশ করিয়া বিমাতার সাময়িক পরিচর্য্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকেন।

কিন্তু তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। একটি সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে মাসে মাসে জড়তাগ্রস্ত বাঙালী পাঠকের মনের দ্বারে করাঘাত করিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত করিতে না পারিলে যে উপরে বর্ণিত শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করিলেন। কিন্তু তখন তিনি ডিপুটি-গিরি চাকুরির ধাক্কায় বারুইপুর, আলিপুর আর রাজসাহী ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছেন, শরীরও তাঁহার ভাল যাইতেছিল না, ফিরিয়া ফিরিয়া ছুটি লইতে হইতেছিল। যদিও তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে বহরমপুরে বদলি হইয়াছিলেন কিন্তু সেখানে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার অবকাশ পান নাই; ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন হইতে এই অবকাশ কতকটা মিলিল। আর মিলিল রামদাস সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির মত কৃতবিদ্য লেখক ও মনীষীসম্প্রদায়ের সহযোগিতা। এই সকল সুযোগ ও সুবিধার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসপুত্র 'বঙ্গদর্শন' ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি (১২৭৯, ১লা বৈশাখ) বঙ্গদেশে আত্মপ্রকাশ করিল।

'বঙ্গদর্শনে'র পূর্ব্বে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য মাসিকপত্র হিসাবে কেবলমাত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা, 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভের' নাম করা যাইতে পারে। মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং (কিছুদিনের জন্য) উৎসাহী কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় শেষোক্ত পত্রিকা দুইটি সাময়িক পত্র জগতে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল। প্রাচীন ও সমসাময়িক গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্যবিচার অর্থাৎ যাহাকে সাহিত্য-সমালোচনা বলা হয়, এই দুইটি মাসিক পত্রিকাতেই তাহার সূত্রপাত। নানা সচিত্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও ইহাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যাহা করিলেন তাহা বাংলাদেশে অভূতপূর্ব্ব। তিনি স্বয়ং "পত্রসূচনা"য় প্রতিশ্রুতি দিলেন :

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন

করিব।...এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্ত্তাবহের কতকদূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই। আমরা কৃতবিদ্য-দিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ন পাইব বলিয়া কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা-সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারও উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন সম্পন্ন না করিতাম, তবে এই পত্রপ্রকাশ বৃথাকার্য্য মনে করিতাম।

বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রতিশ্রুতি কি ভাবে পালন করিয়াছিলেন বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কদের বিবিধ উক্তি তাহার সাক্ষ্য হইয়া আছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে লিখিয়াছেন :

১৮৭২ সালে "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের প্রতিভা আর এক আকারে দেখা দিল। প্রতিভা এমনি জিনিস, ইহা যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করে। বঙ্কিমের প্রতিভা সেরূপ ছিল। তিনি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইতে গিয়া এরূপ মাসিক পত্রিকা সৃষ্টি করিলেন, যাহা প্রকাশ মাত্র বাঙালির ঘরে ঘরে স্থান পাইল। তাঁহার সকলি যেন চিত্তাকর্ষক, সকলি যেন মিষ্ট। বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় লোক-চক্ষের সমক্ষে উঠিয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকে 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাবকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে ত তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়দলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশী দুঃসহ হইত।...আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।—জীবনস্মৃতি

শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্ব্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য। যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল, তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগত কেন এমন একটি অপূর্ব্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? য়ুরোপের দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না, এমন কোনো নূতন তত্ত্ব নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজী শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল—বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ-সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন। বিশ পঁচিশ বৎসরকাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার সুদূর সাক্ষাৎলাভ হইত, বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবন-ধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্য্যমুখী কমলমণিরূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালী পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।

বঙ্গদর্শন সেই যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাংলাভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরাজী আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে যে, যদিও আমরা শৈশবাবধি এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্ত্তমান স্থায়ী সাহিত্য যাহা কিছু তাহা বাংলাভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে।—'শিক্ষা'

বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য, নাটক, উপন্যাস, কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

...আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।—"আধুনিক সাহিত্য"

চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিমের একজন স্নেহাস্পদ বন্ধু ছিলেন; পুরাতন-পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র শেষ বৎসরটি একরকম তাঁহারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন :

বঙ্গদর্শন পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, উহা পড়িবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে, বাংলাভাষায় সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে কহিতে পারা যায়; আর বুঝিয়াছিলাম ভাষার বা সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ, মানুষের অভাব। বঙ্গদর্শন বলিয়া গিয়াছিল, বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে—বাংলাসাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।—'প্রদীপ'—১৩০৫

বঙ্গবাসী অফিস হইতে প্রকাশিত (১৩১১ বঙ্গাব্দ) হরি-মোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার "পিতা-পুত্র" নাম দিয়া যে আত্মজীবনী লিখিয়াছেন তাহাতে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সামান্য ইতিহাস আছে। তাঁহার মতে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাভাষায় বিদ্যাসাগরী-রীতি ও আলালী-রীতির সমন্বয়-সাধন করিবার চেষ্টাতেই 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেন। তিনি বলিতেছেন :

মধ্যবর্ত্তিনী ভাষা-প্রচারের সূচনা হইতেই "বঙ্গদর্শন" প্রচারের সূচনা আরম্ভ হইল। কত দিন কত জল্পনা চলিতে লাগিল। শেষে কয়জন

লেখকের নাম দিয়া ভবানীপুরের শ্রীষ্টান ব্রজমাধব বসু প্রকাশকরূপে বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন।

লেখকগণের নাম বাহির হইল—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

লেখকগণ—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র।

" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

" জগদীশনাথ রায়।

" তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

" কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

" রামদাস সেন।

এবং " অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭৯) উপরের প্রচারপত্রে বিজ্ঞাপিত বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' কলিকাতা ভবানীপুরের ১নং পিপুলপটী লেন হইতে "সাপ্তাহিক সংবাদযন্ত্রে ব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক" প্রকাশিত হইল। বহরমপুরে তখন সাহিত্যের আসর সরগরম। ঐতিহাসিক রামদাস সেনের বিরাট লাইব্রেরিটিও বঙ্কিমচন্দ্রের কাজে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত সাহিত্য-দমুদ্ধরেরা তো সেখানে ছিলেনই, রমেশচন্দ্র দত্তও আসিয়া সেখানে জুটিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে ('মানসী' চৈত্র ১৩২১) এখানেই তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় হয় এবং তাঁহারই উৎসাহে রমেশচন্দ্র বঙ্গবীণাপাণির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ভূদেবের উপদেশ, রামদাস সেন প্রভৃতির সহায়তায় 'বঙ্গদর্শন' সুত্রপাতেই যে শক্তি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল, বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব্ব। 'বঙ্গদর্শনে'র লেখকগোষ্ঠী ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল। যে সৌরমণ্ডলী বঙ্কিম-সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘকাল বাংলার সাহিত্যাকাশে প্রদীপ্ত প্রভায় বিরাজ করিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শনে'র সহায়তায় তাঁহারা ধীরে ধীরে ভাস্বর হইয়া উঠিলেন। পরে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র এবং শিষ্যস্থানীয় হরপ্রসাদও (শাস্ত্রী) এই গোষ্ঠীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই একটু স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী, রাশভারি প্রকৃতির লোক ছিলেন, আপন স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য্য লইয়া জনতা হইতে তিনি একটু দূরে থাকিতেন। সাহিত্যিক মজলিশেও আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেন। দাম্ভিক এবং অহঙ্কারী বলিয়া তাঁহার নিন্দা ছিল। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' বঙ্কিমের এই অসামাজিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল। কারণ,তিনি নিজে সব্যসাচীর মত লেখনী প্রয়োগ করিয়াই বঙ্গসাহিত্যের তথা দেশের দুর্দ্দশা ঘুচাইতে চাহেন নাই, গোষ্ঠীপতিরূপে বিভিন্ন লেখকের ক্ষমতানুযায়ী ফরমায়েস ও উপদেশ দিয়া তাঁহাদের সকলের সাহায্যেই জাতির ভাগ্যপরিবর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই সামাজিকতা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আসিয়াছিল বলিয়াই তিনি মাত্র চার বৎসর কালের মধ্যেই (এই চার বৎসরই তিনি সম্পাদক ছিলেন) বাংলা সাহিত্য ও দেশকে একশত বৎসরের গতি ও উন্নতি দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যদি সেদিন সুকৌশলী সেনাপতির মত বঙ্গবাণীর বিচ্ছিন্ন সেবকদের 'বঙ্গদর্শনে'র ব্যূহমধ্যে সংস্থাপিত করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে অত্যল্পকাল মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের এতখানি প্রসার সম্ভব হইত না। তিনি নিজে পুরোভাগে থাকিয়া এক-দিকে প্রাচ্য জড়তা ও অন্যদিকে অস্বাস্থ্যকর মোহজাত পাশ্চাত্যের অনুকরণবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাঙালী জাতি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রচারের বিদায় পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্কিমচন্দ্রের রণোন্মাদের কাল।

আবর্জ্জনা দূর ও আদর্শ-প্রতিষ্ঠার কাজে যিনি আত্মনিয়োগ করিবেন, তাঁহার বহুবিষয়িণী ও নিত্য নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা থাকা প্রয়োজন। বক্তব্য একঘেয়ে হইলে অবজ্ঞাত হইবার আশঙ্কা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রতিভা ছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতেই তিনি ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সঙ্গীত, সাহিত্য-সমালোচনা ও ব্যঙ্গকৌতুক স্বয়ং লিখিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন; মানবীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাতেও তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। স্বীয় স্বভাব-ধর্ম্মে প্রত্যক্ষ পলিটিক্সকে বাদ দিয়া চলিলেও যে তিনি একান্ত ভাবে তাহা বর্জ্জন করিতে পারেন নাই 'সাম্য' প্রভৃতি রচনায় তাহার পরিচয় আছে। 'বঙ্গদর্শনে'র মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্ত্তির চমৎকার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্যে' "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে মিলিবে। আমি এখানে অংশতঃ তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজী পণ্ডিতেরা বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যাইতে পারে, সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিমান [ও] খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে? কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্ব্বে সেই অনাদর মলিন ভাষার মুখে অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমতঃ, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাব প্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভাল লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতি লাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম। সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে-শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না, তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব। বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন, অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে, ইহাই তিনি

প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ খেলেখেলা করিতে আসিত, তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে, দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠন কার্য্যে ও এক হস্ত নিবারণ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন। রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

...মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক পদে আসীন ছিলেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি জানিতেন বর্ত্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এইজন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন। কোনদিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব্ব করিতে হয় নাই। বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, অভাব পূর্ণ করিতেন, তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন। এখন যাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান, তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল। সাহিত্য-মহারথী বঙ্কিম, দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালনা করিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল।

এই সব্যসাচী, দণ্ডবিধাতা, কর্ম্মযোগী, খড়্গধারী, দর্পহারী, মহারথী বীরশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র যেন বঙ্গসাহিত্য-রূপ তরণীর 'বঙ্গদর্শন' রূপ হাল ধরিয়া বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে দুর্য্যোগের বিভীষিকাময় সমুদ্র পার করাইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব একটা সামান্য সাময়িক ঘটনা মাত্র নয়, বাংলা সাহিত্যের পরবর্ত্তী সমস্ত ইতিহাসই এই একটি ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব যেমন বাংলায় নূতন কাব্যধারার প্রবর্ত্তন করিয়া সার্থক হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব যেমন বাংলার কথা-সাহিত্যকে সঞ্জীবিত ও পল্লবিত করিয়া সার্থক হইয়াছিল, 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাবের সার্থকতা তেমনই বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্যের অভিনব বিকাশ ও বিস্তারের মধ্যে। বস্তুত, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' 'সর্ব্বশুভকরী'; 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', 'সোমপ্রকাশ', 'রহস্য-সন্দর্ভ', ও 'অবোধ-বন্ধু' প্রভৃতি পূর্ব্বগামী সাময়িক-পত্রে যে সম্ভাবনার আংশিক আভাস মাত্র পাওয়া গিয়াছিল, 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ণ বিকশিত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রবন্ধ ও সমালোচনা যে কতকগুলি সংবাদ ও তথ্যের সমষ্টি মাত্র নয়, সেগুলিও যে নানা বিচিত্র রস-সংযোগে সাহিত্য পদবাচ্য হইয়া উঠিতে পারে, পাঠকের শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও খোরাক যোগাইতে পারে, 'বঙ্গদর্শনে'ই সেই সত্য সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত হইল।

প্রথম সংখ্যা হইতেই 'বঙ্গদর্শন' আপন প্রতিষ্ঠা সগৌরবে অর্জ্জন করিল। বাংলাদেশের বুভুক্ষু পাঠক সম্প্রদায় অকস্মাৎ চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভূরিভোজনের উপকরণ পাইয়া বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় নতিস্বীকার করিল। বঙ্কিমচন্দ্র পুরা চার বৎসরকাল চাকুরী বজায় রাখিয়াও উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত মাসে মাসে 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিয়া যাইতে লাগিলেন। তবে তাঁহার মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে বরাবর সাময়িক পত্র পরিচালনের একঘেয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে বিরাগ ও বিরক্তি আসিয়া উৎসাহের স্থান অধিকার করিল, তিনি ভরা যৌবনেই বঙ্গদর্শন'কে একরূপ হত্যা করিলেন। তাঁহার উৎসাহের অভাবের জন্য চতুর্থ বৎসরের প্রারম্ভ হইতেই নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতে থাকে; কাঁটালপাড়ায় 'বঙ্গদর্শনে'র নিজের ছাপাখানা হওয়াতেই সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে গোলযোগ ঘটিতে থাকে এবং কোনও রকমে ১২৮২ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়।

এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবসা করিবার জন্য 'বঙ্গ-দর্শন' প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সেরূপ প্রবৃত্তি ও সংস্কারও ছিল না। তিনি আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য এই কঠিন কাজে অগ্রসর হইয়াছিলেন, দিগ্‌ভ্রান্ত বাংলা সাহিত্যে দিগ্‌দর্শনের জন্য 'বঙ্গদর্শনে'র উদ্ভব হইয়াছিল। তাহা যে অনন্তকাল মাসে মাসে নিয়মিত বাহির হইবে না, একথা তিনি নিজেও জানিতেন। তাই প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যায় "পত্র-সূচনা"য় লিখিয়াছিলেন:

আমাদিগের পূর্ব্বগামীরা এক এক বার অকালগর্জ্জন করিয়া, কালে লয়-প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদিগের অদৃষ্টে যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলজ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিণাম ঐ অলজ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কালস্রোতে এ সকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদ স্বরূপ ভাসিল, নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীকার ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে খুব সমৃদ্ধ অবস্থাতেই বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' বিলয়প্রাপ্ত হয়। প্রথমবর্ষের প্রথম সংখ্যা হাজার কপি ছাপা হইয়াছিল! চার মাসের মধ্যেই গ্রাহক সংখ্যা দেড়গুণ এবং পরে দ্বিগুণ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন উহা বন্ধ করিলেন তখন গ্রাহক-সংখ্যা যোলশত। 'বঙ্গদর্শনে'র এই অকাল মৃত্যুতে সমসাময়িক সাহিত্যরসিক সমাজে একপ্রকার হাহাকার উঠিয়াছিল। 'বান্ধব' 'আর্য্যদর্শন' প্রভৃতি সহযোগী মাসিক পত্রিকাগুলি সমস্বরে বঙ্গদর্শনের পুনরাবির্ভাব কামনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং চতুর্থ বর্ষের চৈত্রসংখ্যার শেষে অর্থাৎ তাঁহার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র উপসংহারের পূর্ব্বেই এই সকল মন্তব্যের এইভাবে জবাব দিয়া রাখিয়াছিলেন!—

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িকপত্রের অভাব নাই। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই।...যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সঙ্কল্প করি নাই যে, যতদিন বাঁচিব এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব।...

এই সঙ্গে তিনি পাঠকবর্গকে একটি আশ্বাসও দিয়াছিলেন—

বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জ্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল।

অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করিবার কারণ সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র সেন ('আমার জীবনে') হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ('নারায়ণ' পত্রিকায়) ও শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ('বঙ্কিম-জীবনী'তে) আত্মীয়-বিরোধ, স্বাস্থ্যহানি, ঝঞ্ঝাট প্রভৃতি নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এ সকলের কোনটাই একমাত্র কারণ হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের মত শিল্প-প্রতিভার পক্ষে এই ধরণের নিয়ম মাফিক একঘেয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথও সার্থকভাবে বেশীদিন পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারেন নাই। চতুর্থ বৎসরের পত্রিকা তাঁহার যত্নের অভাবে যখন নিরেস হইল তখনই তিনি মনস্থির করিয়া থাকিবেন। তিনি "বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ" নিবন্ধে লিখিয়াছেন—

এবৎসর বঙ্গদর্শনের প্রতি আমি তাদৃশ যত্ন করি নাই, এবং সন ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুল্য হয় নাই।

সুতরাং "জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল"। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র স্বত্ব সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখাপড়া করিয়া দান করিলেন।

'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় বর্ষ হইতেই কাঁঠালপাড়ায় "বঙ্গদর্শন-যন্ত্র" স্থাপিত হয় ও সেখান হইতেই পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন, চতুর্থ বৎসর হইতে রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ভার গ্রহণ করেন। সঞ্জীবচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইবার কালে বেকার হইয়া পড়েন। ছাপাখানার কাজও প্রায় বন্ধ থাকে। প্রধানত সঞ্জীবচন্দ্রের ও ছাপাখানার বেকারত্ব ঘুচাইবার জন্য পূরা এক বৎসর পরে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পুনরায় 'বঙ্গদর্শন' বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিম সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র গৌরব ইহা লাভ করে না।

পুনঃপ্রকাশিত 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যার গোড়াতেই বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" শীর্ষক নিবন্ধে লিখিয়াছেন :

বঙ্গদর্শনের লোপ জন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচুর্য্যে আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়া ইহা পুনর্জ্জীবিত হইল। যাহা এক-জনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যতদিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য ও জীবনের উপর নির্ভর করিবে ততদিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এই জন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব বিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য সফল হইবার কোনও লক্ষণই গোড়া হইতেই দেখা গেল না। সঞ্জীবচন্দ্র অলস শিথিল প্রকৃতির লোক ছিলেন! কিছুদিন পর তাঁহার নানা শৈথিল্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল, প্রবন্ধ নির্ব্বাচনেও শৈথিল্য দেখা গেল। বঙ্কিমচন্দ্র অনুযোগ করিয়া পত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। কোনও ক্রমে দুই বৎসর (১২৮৪ ও ১২৮৫) 'বঙ্গদর্শন' সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনে বাহির হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র একাদিক্রমে আটচল্লিশ মাস পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন, চল্লিশ মাসেই সঞ্জীবচন্দ্রের দম ফুরাইয়া গেল। এবারে আর কেহ কোন কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত দাখিল করিলেন না। পূরা এক বৎসর বন্ধ থাকিয়া আবার ১২৮৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে 'বঙ্গদর্শন' তৃতীয় দফা বাহির হইতে লাগিল। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন পর্য্যন্ত দেড় বৎসর বা আঠার মাস বাহির হইয়া ইহা আবার বন্ধ হইল। এইকাল পর্য্যন্ত কাঁটালপাড়া "বঙ্গদর্শন-যন্ত্রে"রও অস্তিত্ব ছিল না, ১২৮৮ সালের ছয় মাস ইহা জনসন প্রেসে ছাপা হইতে থাকে। ১২৮৯ সালের বৈশাখ হইতে অর্থাৎ ছয়মাস বাদ দিয়া সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাতেই চতুর্থ দফা 'বঙ্গদর্শন' ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের বাণী প্রেস হইতে শরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন কোনও মাসের কাগজই সময়ে বাহির হয় না, দুই মাস, তিন মাস এমন কি ছয় মাস পরেও তাহা বাহির হইয়াছে। ১২৮৯ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত এই অবস্থা।

ইহার পর বঙ্গদর্শনের ইতিহাস বড় করুণ, বড় শোচনীয়। সঞ্জীবচন্দ্র হাল ছাড়িয়া দিলেন। ১২৯০ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত কোনও পত্রিকা বাহির হইল না। ৯২ নং বউবাজার ষ্ট্রীটের বরাট প্রেসের মালিক অঘোরনাথ বরাট শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশক হইয়া ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে পঞ্চম দফা 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিলেন। কোনও সম্পাদকের নাম রহিল না। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পরিচালক হইলেন এবং চন্দ্রনাথ বসু অন্তরালে থাকিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন ইহার কাহিল অবস্থা। কার্ত্তিক হইতে মাঘ পর্য্যন্ত চারি সংখ্যা এই ভাবে বাহির হইয়া 'বঙ্গদর্শন' প্রথম পর্য্যায় একেবারে বন্ধ হইয়া গেল!

বঙ্গদর্শন মোট ১০৬ সংখ্যা অর্থাৎ ১০৬ মাস বাহির হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় ৪৮, সঞ্জীবের সম্পাদনায় ৫৪ এবং অঘোরনাথ বরাটের হাতে ৪—মোট ১০৬। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে হতাশ হইয়া দেখাশুনা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তিনি যে শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন তাহা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সঞ্জীবচন্দ্রকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্র হইতে জানা যায়, ১২৯০ সালের মাঘ মাসেই পত্রটি লিখিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :

শ্রীচরণেষু,

অঘোর বরাটকে একটু পত্র লিখিবেন. যে মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির করার পক্ষে আপত্তি নাই, ভবিষ্যৎ সংখ্যার প্রতি আপত্তি আছে। অর্থাৎ মাঘসংখ্যা ভিন্ন আর বাহির করিতে দিবেন না। ইহা লিখিবেন।

পত্র পাঠমাত্র ইহা লিখিবেন। চন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিতেছে। কিন্তু এটুকু লইলে বিবাদ সম্পূর্ণ মিটিবে না। ইতি—তাং ২১শে ফেব্রুয়ারী, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখে বঙ্গসাহিত্যের আকাশে যে জ্যোতিষ্কের উদয় হইয়াছিল ১২৯০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ও হাত বদলের (সম্পাদক, মালিক, মুদ্রাকর, প্রকাশক, ছাপাখানা সর্ব্ববিষয়ে) মধ্য দিয়া তাহা অস্তমিত হইল। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' নব পর্য্যায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইতিহাস। পুরাতন পর্য্যায় বঙ্গদর্শনের মোট ১০৬ সংখ্যার লেখক ও প্রবন্ধাদি বিস্তৃত পরিচয়ও স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

রামমোহন ও সংবাদপত্র

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল

আমরা বাঙ্গালীরা অতিমাত্রায় মৃতের উপাসক, এমনিধারার একটা দুর্নাম দেশী এবং বিদেশী উভয় মহলেই প্রচলিত আছে। বাড়াবাড়ি কোন জিনিষেরই ভাল নয়, এ কথাটা অত্যন্ত পুরাণো হলেও সত্য। কাজেই আমরা যদি অতীতকে নিয়ে সত্য সত্যই অত্যধিক মাতামাতি করে থাকি, তাতে লজ্জা পাওয়ার কারণ আছে, বিশেষ করে সে মাতামাতির ফলে যদি বর্ত্তমানের চিন্তা আমাদের মন থেকে বিদায় গ্রহণ করে বা গৌণস্থান লাভ করে। কিন্তু তাই বলে যাঁরা অতীতকে মন থেকে ধুয়ে মুছে শুধু বর্ত্তমানকে নিয়েই মেতে উঠতে চান, তাঁদের সে চেষ্টাকেও আমরা ভাল মনে অভিনন্দন জানাতে পারি না। কারণ একেও আমরা আর এক রকমের একটা বাড়াবাড়ি বলেই মনে করি।

কিন্তু ইদানীং এই শ্রেণীর একটা মনোভাব অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠছে। এই শ্রেণীর যাঁরা পাণ্ডা তাঁরা প্রাক্‌সমর কালটাকে অর্থাৎ গত ইউরোপীয় যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাসকে কথায় ও কাজে একেবারে অস্বীকার করে চল্‌তে চান, যেন এই অস্বীকৃতির দ্বারা তার প্রভাবটাকেও তাঁরা এড়িয়ে চলতে পারবেন। কিন্তু তা যে সম্ভবপর নয়, বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে বর্ত্তমানকে খতিয়ে দেখলেই তা' তাঁদের কাছে ধরা পড়তে বাধ্য!

অতীতকে প্রয়োজন বর্ত্তমানকে বোঝবার জন্যে, অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণ থেকে বর্ত্তমানকে শুধ্‌রে নেওয়ার জন্যে এবং অনেক ক্ষেত্রে কুসংস্কারের তিমিরান্ধতাকে অতীতের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা দূরীভূত করার জন্যেই! বর্ত্তমান অনেক সময় তার অতিসান্নিধ্যের জন্যেই আমাদের নিরপেক্ষ বিচারণার অন্তরায় হয়ে ওঠে। তখন অতীত হয় অপরিহার্য্য বর্ত্তমানকে ব্যাখ্যা করার কাজে। কুসংস্কার নিবারণে অতীতকে কী ভাবে ব্যবহার করা চলে তার একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তই নেওয়া যাক্। মাথার উপরে বেণীকে একটা কায়েমী স্বত্ব দিয়ে চীনারা যে দাসত্বের চিন্তাকেই কায়েম করে রেখেছিল, এ কথাটা তারা ভুলে গিয়েছিল অনেক দিন আগে। ফলে বেণীটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের পক্ষে একটা ধর্ম্ম-প্রতীক। বেণীর বোঝাটা যে আদতে একটা কলঙ্কের বোঝা এ কথা বুঝতে তাদের প্রয়োজন হয়েছিল ইতিহাসবোধের। ইতিহাস না থাকলে ধর্ম্মের এ শেকল-কাটা তাদের পক্ষে সম্ভবপব হত কি না এবং হলেও তার জন্যে কত মণ তেল পোড়াতে হত, সে তর্ক এখন না তোলাই ভাল।

রামমোহন সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসে অতীতের ওকালতি করার কোনই প্রয়োজন হত না, যদি অতীতের প্রতি বর্ত্তমানের খোট্‌টা সদাসর্ব্বদা সঙ্গীন তুলেই না থাকতো। এ উদ্যত সঙ্গীন যে আমাদের সকলেরই মনে অল্প বিস্তর কাজ করেছে, তার প্রমাণ রামমোহনের বেলাতেই মিলে। অতিব্যাপক রাষ্ট্রিক ও সামাজিক দৃষ্টি ও অনন্যসাধারণ মনীষাসম্পন্ন এত বড় একজন শক্তিমান্ পুরুষ সম্বন্ধে আমরা তাঁর দেশবাসীরা এতই কম জানি যে, তা স্বীকার করতেও আমরা কুণ্ঠা বোধ করি নে। আমাদের কাছে রামমোহনের যে পরিচয়, তা প্রধানতঃ সতীদাহনিবারক ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হিসাবে। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, বিচিত্র কর্ম্মধারা আর প্রখর সমুন্নত ব্যক্তিত্বের খোঁজখবর আমাদের মধ্যে খুব বেশী লোকে রাখেন না—এ কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের বিরাগ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকলেও ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে এ কথাও অস্বীকার করা চলবে না যে, রামমোহনের ঐ অপরিচিতির জন্য তাঁরাও খানিকটা দায়ী। মানুষ রামমোহনের বদলে দেবতা রামমোহনের যে বিগ্রহ তাঁরা দেশবাসীর কাঁধে চাপাতে চেয়েছেন তার প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষ রামমোহনও আমাদের মন থেকে মুছে যেতে বসেছিলেন।

ধর্ম্মের সংকীর্ণতা ও অতিশ্রদ্ধার বাড়াবাড়ি থেকে অনেকাংশে মুক্ত আধুনিক মন রামমোহনকে ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে আলোচনায় উদ্যোগী হয়েছে। এর ফলে অচিরেই যে তিনি তাঁর দেশবাসীর অন্তরে তাঁর সত্যকার আসনটিতে প্রতিষ্ঠিত হবেন, এ ভরসা আমাদের আছে।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর রণক্ষেত্রেই প্রকৃতপক্ষে বাংলার ভাগ্য হস্তান্তরিত হয়! রামমোহনের জন্ম হয় ১৭৭২ সালের ২২শে মে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের পনের বৎসর পরে! এই রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তনের ফলে ও দেশীয় সংস্কৃতির ও সভ্যতার সঙ্গে একটা প্রবল বৈদেশিক কৃষ্টির সংঘাতে যে আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়, তারই ফল রামমোহন। তাঁর জীবন ও কর্ম্মকথা আলোচনা করলে এ কথা বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার এক সমন্বয়ী রূপই তাঁর সমগ্র জীবন, তাঁর চিন্তা ও কর্ম্মের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কাজেই রামমোহনকে বুঝতে হলে যেমন তখনকার দেশীয় সমাজ ও সভ্যতাকে বোঝার প্রয়োজন আছে, তদানীন্তন বিলাতী সভ্যতা ও সংস্কৃতির তত্ত্ব সন্ধান করার প্রয়োজনও তার থেকে কম নয়! অধিকন্তু এই উভয় সভ্যতা প্রবল দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে যে কিরূপ একটা সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছিল, তার স্বরূপটা সম্বন্ধেও আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এইদিক দিয়ে রামমোহনকে বিচার না করলে সে বিচার অসম্পূর্ণ হবে বলেই আমরা মনে করি।

কিন্তু রামমোহনের সমগ্র জীবন আমাদের এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। এখানে আমরা তাঁর কর্ম্মজীবনের একটা মাত্র দিক সম্বন্ধে আলোচনা করব। সে দিকটা হচ্ছে তাঁর সংবাদপত্রের পরিচালনার দিক। প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, এতে ব্যবহৃত উপকরণগুলো আমার স্বগবেষণা-লব্ধ নয়। যারা এ সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন, তাঁদের নিকটেই উপকরণগুলোর জন্য আমি ঋণী অন্যান্য নানা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর যে অনন্যসুলভ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে আমরা বিস্মিত হই, সংবাদপত্র-পরিচালনার ব্যাপারেও তাঁর সেই সকল বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ধরা পড়ে।

সংবাদপত্রের পূর্ব্বকথা

কোন দেশেই সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়, ভারতবর্ষেও নয়! ভারতবর্ষে সংবাদপত্রপ্রকাশের প্রথম গৌরব ইংরেজদের প্রাপ্য। ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারী মিঃ হিকি (Mr. Hickey) 'বেঙ্গল গেজেট' নাম দিয়ে একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'বেঙ্গল গেজেট'ই ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রিত ইংরেজী সংবাদপত্র। কিন্তু তদানীন্তন সরকারের

বিরূপতা এই পত্রিকাখানার দীর্ঘজীবনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের পত্নী ও অন্য কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশ করার অভিযোগে দু'বছরের মধ্যেই পত্রিকাখানার প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন আইন ছিল না সত্য, কিন্তু হাতে ক্ষমতা থাকলে তার প্রয়োগের বাধা কোন দিনই হয় না। একটা উদাহরণ দিলেই বোধ হয় কথাটা স্পষ্ট হবে। বেঙ্গল গেজেট প্রকাশের কিছুদিন পরে 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' (বেঙ্গল জার্ণাল) নামে একখানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাখানার সম্পাদক ছিলেন মিঃ উইলিয়ম ডুয়েন (Mr. William Duance)। মিঃ ডুয়েন ছিলেন আইরিশ-আমেরিকান। তাঁর কাগজে তিনি কিছু আপত্তিকর লেখা প্রকাশ করেন বলে তাঁকে ১৭৯৪ (১৭৯১ ?) সালে গ্রেপ্তার করা হয়। আপাততঃ এর মধ্যে এমন কিছু অভিনবত্ব নাই, যাতে এ ব্যাপারটা বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু একে স্মরণীয় করে রেখেছে মিঃ ডুয়েনের গ্রেপ্তারের নাটকীয়ত্বে। তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল স্যার জন শোরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ডুয়েনকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে নিমন্ত্রণ করেন। মিঃ ডুয়েন উৎফুল্ল মনে যখন গবর্ণমেণ্ট হাউসে ঢুকলেন, তখন কয়েকজন সৈন্য এসে তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং জোর করেই তাঁকে কেল্লায় ধরে নিয়ে যায়। তারপর একেবারে সশরীরে ইংলণ্ডে পৌঁছে তবে তাঁর বন্ধনমুক্তি।

যা' হক সংবাদপত্রের পায়ে শেকল পরাতেও খুব বেশী দেরী হয় নাই। ১৭৯৮ সালে লর্ড ওয়েলেস্‌লি (Richard Colley Wellesley, Earl of Mornington) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন এবং এক বৎসর যেতে না যেতেই ১৭৯৯ সালের ১৩ই মে তারিখে তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচ করার জন্য বিধান প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁর বিধান অনুসারে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিতব্য সমস্ত বিষয় প্রকাশের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর নিকট দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়। এ বিধান ভঙ্গের সাজা ছিল ইউরোপ নির্ব্বাসন। তখনকার দিনে সমস্ত সংবাদপত্রই ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত হত বলেই বোধ হয় এই রকমের বিধান করা হয়েছিল। এই সময়টা ইংরেজদের অত্যন্ত দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের ধাক্কা সামলাতে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, প্রাচ্য ভূখণ্ডে তার অধিকারগুলি নেপোলিয়নের কবলিত হওয়ার আশঙ্কায় সে সন্ত্রস্ত। এরূপ অবস্থায় সম্পাদকদের ইচ্ছামত মত প্রকাশের অধিকার থাকাটাকে বোধ হয় তিনি নিরাপদ মনে করেন নাই! তখনকার সম্পাদকেরা ভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু বেপরোয়া ছিলেন—এও নাকি তাঁর ঐরকম আইন প্রবর্ত্তনের একটা কারণ। যা'হক লর্ড ওয়েলেস্‌লির বিহিত সংবাদপত্রের এই বন্ধন তাঁর পরিবর্ত্তীদের আমলেও কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই, বরং লর্ড মিণ্টোর (১৮০৭-১৩) আমলে তা দৃঢ়তরই হয়েছিল। পুরা ১৯ বৎসর পর ১৮১৮ সালের ১৯শে আগষ্ট, লর্ড হেষ্টিংস (Earl of Moira ১৮১৩-২৩) সংবাদ, প্রবন্ধ বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রকাশের পূর্ব্বে পরীক্ষার জন্য দাখিলের দায় থেকে সম্পাদকদের অব্যাহতি দেন। কিন্তু তিনি নির্দ্দেশ দেন যে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের নিন্দা এবং দেশবাসীদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনরূপ আতঙ্কের সৃষ্টি কিংবা অন্য কোনরূপ বিরোধের সৃষ্টি হতে পারে—এরূপ কোন লেখা বা সংবাদ যাহাতে প্রকাশিত না হয় সে সম্বন্ধে সম্পাদকেরা যেন হুঁসিয়ার থাকেন।

লর্ড হেষ্টিংস সংবাদ-পত্রের বন্ধন শিথিল করে খুব প্রশংসার্হ কাজ করেছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর আমলেই যখন আবার সেই বাঁধনকে শক্ত করে আঁটার প্রচেষ্টা দেখি, তখন তাঁর সদিচ্ছা সম্বন্ধে মুখর হয়ে উঠ্‌তে স্বভাবতঃই সঙ্কোচ আসে। অনুরূপ সন্দেহও যে মনে না জাগে তা নয়। লর্ড ওয়েলেস্‌লির প্রবর্ত্তিত বিধান ভঙ্গ করলে, তার জন্যে শুধু ইউরোপীয়ানদেরই সাজা দেওয়া চলতো, ফিরিঙ্গি বা দেশী সম্পাদকের সাজার কোন ব্যবস্থা ঐ বিধানে ছিল না। কাজেই তাঁদেরও বিধানের প্যাঁচে আটকাবার অভিসন্ধি থেকেই সামান্য কিছু দিনের জন্য বাঁধনটাকে তিনি আলগা করে দিয়েছিলেন। পরে দেশী ও বিদেশী সব সম্পাদকই যাতে আটকে পড়েন, সেইরূপ আইন প্রবর্ত্তিত করেন। এর পর সংবাদ-পত্রের জন্য যে এই নব বন্ধনের সৃষ্টি হলো, তার স্বরূপ সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

বাংলা সংবাদ-পত্র

১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে, শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সাহেবরা শ্রীরামপুর থেকে 'দিগদর্শন' (The Digdarsan or Magazine for Indian Youths) বা দিগ দর্শন (অর্থাৎ যুব-লোকেরকারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ) নামে একখানা বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। এইখানাই প্রথম প্রকাশিত বাংলা সাময়িক পত্র। মিশনের প্রস্তাব অনুসারে এই পত্রিকাতে রাজনীতি সম্বন্ধে কোন আলোচনা থাকত না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হ'ত। প্রত্যেক প্রবন্ধ ইংরেজী ও বাংলা এই দুই ভাষাতেই লিখিত হ'ত এবং সামনা-সামনি পৃষ্ঠায় ছাপা হ'ত। ইংরেজী প্রবন্ধ থাক্‌তো বাঁ দিকের পৃষ্ঠায়, আর বাংলা প্রবন্ধ ছাপা হতো ডানদিগের পৃষ্ঠাতে। প্রথম সংখ্যাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি ছিল—আমেরিকার দর্শন বিষয়ে (of the Discovery of America), হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ (of the Limits of Hindoosthan), হিন্দুস্থানের বাণিজ্য (of the Trade of Hindoosthan), বেলুনদ্বারা সাদলার সাহেবের আকাশ গমন (Mr. Sadler's Journey in a Balloon from Dublin to Holy head), বিসুবিয়স পর্ব্বত বিষয়ে (of mount Vesuvious)। এর ভাষার সামান্য একটু নমুনা নীচে দিলাম :—

"এইরূপ দুর্ভিক্ষ বঙ্গভূমিতে ও হিন্দুস্থানের অন্য অন্য ভাগে কখন কখন হইয়াছিল। সন ১৭৭০ সালে বাঙ্গালা দেশে এইরূপ অতি ঘোর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তৎকালে নবাব ও অন্যান্য ভাগ্যবান্ লোকেরা দরিদ্র লোকেদের মধ্যে অনেক তণ্ডুল দান করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহাদের ভাণ্ডার শূন্য হওয়াতে দান নিবৃত্ত হইল।

ইহাতে অনেক দুঃখিলোক জীবনোপায়-প্রত্যাশাতে তৎকালীন ইংলণ্ডীয়দের প্রধান বসতিস্থান কলিকাতায় আইল।" ইত্যাদি।

এই কাগজখানা তিন বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। তারপর এর প্রকাশ বন্ধ হ'য়ে যায়!

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদ-পত্র কি, তা নিয়ে পণ্ডিতদের বাগ্‌বিতণ্ডার পরিসমাপ্তি আজও হয় নাই। কাজেই আমাদের মত অধ্যবসায়ীর সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সঙ্গত তো নয়ই, নিরাপদও নয়। পণ্ডিতদের এই বিতণ্ডা চলেছে দুই-খানা সংবাদ-পত্রকে কেন্দ্র করে। একখানা 'বাঙ্গাল গেজেটি' আর দ্বিতীয় হচ্ছে 'সমাচার-দর্পণ'। এই দুইখানা সাপ্তাহিক পত্রই অতি সামান্য কয়দিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়, কিন্তু কার আবির্ভাব আগে তার মীমাংসা আজও হয় নাই। তার একটা কারণ হয়তো 'বাঙ্গাল গেজেটি'র কুলজীর অভাব। এ পর্য্যন্ত অধ্যবসায়ীদের সযত্ন পরিশ্রমে তার একখানা সংখ্যারও সন্ধান মিলে নাই! তা' ছাড়া সমসাময়িক লেখা থেকে তার সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতেও অসঙ্গতি থাকার জন্য কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি, কে যে কাগজখানা প্রকাশ করেছিলেন—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য না হরকুমার রায় সে সম্বন্ধেও জোর করে বলার মত প্রমাণ পণ্ডিত ব্যক্তিদের হাতে খুব বেশী কিছু নাই। কিন্তু 'সমাচার-দর্পণ' সম্বন্ধে তথ্যের এরূপ অপ্রতুলতা নাই। কাজেই তার প্রকাশ-কাল প্রভৃতি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা স্থির সিদ্ধান্তে এসে গেছেন। তা থেকে জানা যায়, 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ সালের ২৩শে মে, ১২২৫ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীরামপুর থেকে। কাগজ-খানা বেরিয়েছিল শ্রীরামপুরের পাদরী জে, সি, মার্শম্যানের সম্পাদনায়। অনেকেই মনে করেন যে, 'সমাচার-দর্পণ'ই বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদ-পত্র। 'বাঙ্গাল গেজেটি' যদি এর পরে প্রকাশিত হয়ে থাকে, তবে তার প্রকাশ যে 'সমাচার-দর্পণ' প্রকাশের একপক্ষ কালের মধ্যেই হয়েছিল—তা বিশ্বাস করবার মত কারণ আছে। আর 'সমাচার দর্পণের পূর্ব্বে এ প্রকাশিত হয়ে থাকলেও, তার প্রকাশকাল সম্ভবতঃ একপক্ষকালের পূর্ব্ববর্ত্তী নয়! যা হ'ক বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদ-পত্র হিসাবে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র দলটী যদি নাও টিকে, তবুও বাঙ্গালী পরিচালিত বাংলা সংবাদ-পত্রের আদি পুরুষ হিসাবে তার গৌরব ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। প্রসঙ্গতঃ এ কথাটাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতার যে ছাপাখানায় 'বাঙ্গাল গেজেটি' মুদ্রিত হ'ত, রামমোহন রায় তার অন্যতম মালিক ছিলেন। এই সময় সংবাদ-পত্রের প্রতি গবর্ণমেন্টের মনোভাব যে কিরূপ ছিল তার একটা আভাস পাওয়া যাবে জে, সি, মার্শম্যানের একখানা পত্র থেকে। এই পত্রখানা ডক্টর জর্জ্জ স্মিথ নামক এক ব্যক্তিকে লেখা। এই পত্রে তিনি লিখেছিলেন :—

The English journals in Calcutta were under the strictest surveillance and many a column appeared resplendent with the stars which were substituted at the last moment for the editorial remarks and through which the censor had drawn his fatal pen. কলকাতার ইংরেজী কাগজ-গুলির ওপর খুব কড়া নজর রাখা হতো। সংবাদ-পত্রগুলির অনেক স্তম্ভই তারকা-চিহ্নিত হয়ে বের হ'ত। যে সব সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যে সেন্সর শেষ মুহূর্ত্তে তাঁর নির্ম্মম কলম চালাতেন, তারকা চিহ্নগুলি তাদের পরিবর্ত্তস্বরূপ দেওয়া হ'ত।

রামমোহন ও সংবাদ-পত্র

রামমোহন রংপুরের সরকারী চাকরী থেকে অবসর নিয়ে ১৮১৪ সালে (মতান্তরে ১৮১৫) কল্‌কাতায় আসেন এবং এইখানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এই সময় থেকেই তাঁর সত্যিকার কর্ম্ম-জীবনের সূত্রপাত হয়।

১৮২১ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে "সমাচার-দর্পণ" পত্রিকায় একজন পাদ্রী একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে তিনি প্রশ্নচ্ছলে হিন্দুদের বেদান্তাদি-দর্শন শাস্ত্রের অযৌক্তিকতা প্রমাণিত করার প্রয়াস পান এবং তাঁর পত্রের উত্তর আহ্বান করেন। রামমোহন রায় 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা'—এই ছদ্মনামে ঐ পত্রের জবাব 'সমাচার-দর্পণের' সম্পাদকের নিকট পাঠান। কিন্তু সম্পাদক তাঁর পত্রখানা প্রকাশ করেন না। কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি ১লা সেপ্টেম্বরের 'সমাচার-দর্পণে' লেখেন—

"শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্ম্মা প্রেরিত পত্র এখানে পহুঁছিয়াছে। তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে, সে পত্রে পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে! কিন্তু অজিজ্ঞা-সিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব্বসমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।"

'সমাচার-দর্পণে' উত্তর ছাপা না হওয়াতে রামমোহন ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, "The Brahmunical Magazine. The Missionary and the Brahmun. ব্রাহ্মণ সেবধি। "ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্বাদ" নাম দিয়ে একখানা কাগজ প্রকাশ করেন। এই কাগজে তিনি মিশনারিদের মত খণ্ডন করতে আরম্ভ করেন। এই কাগজের সম্পাদক হন "শিবপ্রসাদ শর্ম্মা" ছদ্মনামে রামমোহন নিজেই। এই কাগজ প্রকাশের কারণ সম্বন্ধে রামমোহন The Brahmunical Magazine-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় নিজে যা লিখেছেন, নিম্নে তা উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল :—

The Brahmunical Magazine was commenced for the purpose of answering the objections against the Hindu Religion contained in a Bengalee Weekly Newspaper, entitled "Samachar Darpan", conducted by some of the most eminent Christian Missionaries, and published at Shreerampore. In that paper of the 14th July 1821, a letter was inserted containing certain doubts regarding the Sastras, to which the writer invited any one to favour him with an

answer, through the same channel. I accordingly sent a reply in the Bengalee Language, to which however, the conductors of the work calling for it refused insertion; and I therefore formed the resolution of publishing the whole controversy with an English translation in a work of my own "The Brahmunical Magazine......"

"কয়েকজন বিশিষ্ট খৃষ্টান মিশনারী দ্বারা পরিচালিত ও শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত একখানা বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল। তার উত্তর দেওয়ার জন্য "দি ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন" আরম্ভ করা হয়। সমাচার-দর্পণের ১৮২১ সালের ১৪ই জুলাইয়ের সংখ্যায় প্রকাশিত একখানা চিঠিতে শাস্ত্র সম্বন্ধে কতকগুলি সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। ঐ সংবাদপত্রের মারফতই তার জবাব দেওয়ার জন্য পত্রলেখক আমন্ত্রণ করেন। আমি তদনুসারে বাংলাভাষায় একটা উত্তর লিখে পাঠাই। কিন্তু যে কাগজের পরিচালকেরা উত্তর চেয়েছিলেন, তাঁরাই ঐ জবাব ছাপতে অসম্মত হন। কাজেই আমি সমস্ত বাদানুবাদ ইংরেজী অনুবাদসুদ্ধ আমার নিজের কাগজ "দি ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন" প্রকাশ কবার সংকল্প করি।"

এই কাগজখানার এক পৃষ্ঠায় বাংলা এবং অন্য পৃষ্ঠায় তার ইংরেজী অনুবাদ থাকত। ৺নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রামমোহন চরিত গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই কাগজ খানার মোট ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ৪টি সংখ্যার ইংরাজী অংশ এবং তিনটি সংখ্যার বাংলা অংশ ছাড়া এ পর্য্যন্ত তার আর কোন সংখ্যা পাওয়া যায় নাই। তা ছাড়া এই কাগজ ধারাবাহিকরূপেও প্রকাশিত হয় নাই। এর প্রথম সংখ্যায় খৃষ্টান পাদরীর পত্র ও তার ইংরেজী অনুবাদ এবং ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় তার জবাব প্রকাশিত হয়। এর পর ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কাগজের ৩৮শ সংখ্যায় মিশনারীরা এর এক প্রত্যুত্তর প্রকাশ করেন। রামমোহন তাঁর কাগজের তৃতীয় সংখ্যায় ওর জবাব দেন। তারপর প্রায় দু'বৎসর চুপচাপ। সহসা আবার বেদ ও বেদপন্থীদের প্রতি নানা অভিযোগ করে' মিশনারী প্রেস থেকে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এবং খৃষ্টান পাদরীরা ঐ পুস্তিকাখানা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। রামমোহন এর জবাব দেওয়ার জন্য দু'বৎসর পরে 'দি ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিনে'র ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশ করেন। এই সংখ্যার ভূমিকায় তিনি বলেছেন:—"Notwithstanding my humble suggestions in the third number of this magazine, against the use of offensive expressions in religious controversy, I find, to my great surprise and concern, in a small tract lately issued from one of the missionary presses and distributed by missionary gentlemen, direct charges of atheism made against the doctrinse of the Vedas, and undeserved reflections on us as their followers. This has induced me to publish, after an interval of two years, a fourth number of the Brahmunical Magazine.

"এই কাগজের তৃতীয় সংখ্যায় আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে, ধর্ম্ম সম্পর্কিত বিতর্কে যেন গ্লানিকর উক্তি প্রয়োগ করা না হয়। কিন্তু আমি দেখছি যে, সম্প্রতি কোন মিশনারী প্রেস থেকে প্রকাশিত ও মিশনারীদের দ্বারা বিতরিত একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বৈদিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে নাস্তিকতার অভিযোগ করা হয়েছে এবং বেদের অনুগামী আমাদের সম্বন্ধে অবাঞ্ছিত মন্তব্য করা হয়েছে। এতে আমি বিস্মিত ও শঙ্কিত হয়েছি। এর ফলে আমাকে দু'বৎসর পরে ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিনের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশ করতে হচ্ছে।"

ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিনের অন্যান্য সংখ্যাগুলি প্রকাশের কি উপলক্ষ্য ছিল এবং কতদিন পরে পরেই বা সেগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্তও সঠিক কিছুই জানা যায় নাই।

ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিনের প্রথম তিন সংখ্যার ইংরেজী অংশ পুনর্মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় রামমোহন লিখেছিলেন,...... ......

the 3rd No. of my Magazine has remained unanswered for nearly two years. During that long period the Hindoo community (to whom the work was particularly addressed and, therefore, printed both in Bengalee & English) have made up their mind that the arguments of the Brahmanical magazine are un-answerable; and I now republish therefore, only the English translation, that the learned among Christians in Europe as well as in Asia, may form their opinion on the Subject.

"আমার কাগজের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের পর দু'বৎসর হতে চলেছে, কিন্তু এখনও কেউ ওর কোন জবাব দেয় নাই। এই দীর্ঘকালের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের (তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রধানতঃ ও কাগজ প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই জন্যেই ইংরেজী ও বাংলা এই দুই ভাষাতে তা মুদ্রিত হয়) মনে এই প্রত্যয় দৃঢ় হয়েছে যে, ব্রাহ্মণসেবধির যুক্তি অখণ্ডনীয়। এখন আমি কেবল ওর ইংরেজী অনুবাদ পুনরায় প্রকাশ করছি।- ইউরোপ ও এশিয়ার শিক্ষিত খ্রীষ্টানগণ ঐ বিষয় সম্বন্ধে যাতে তাদের মত স্থির করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এর পুনঃ প্রকাশ।"

প্রবন্ধের অতিবিস্তৃতির ভয়ে এখানেই দাঁড়ি টানতে হলো।

'ব্রাহ্মণসেবধি' পরিচালনায় রামমোহন যে শাস্ত্রজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, স্পষ্টবাদিতা, সুরুচি ও মর্য্যাদাবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন, এর পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। তার পরবর্ত্তী দুটী প্রবন্ধে রামমোহনের বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সম্বাদকৌমুদী' এবং ফার্সী সাপ্তাহিক পত্র 'মীরাৎ উলআখবার' সম্বাদ আলোচিত হবে। রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য কিরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে লড়েছিলেন, সর্ব্বশেষ প্রবন্ধে তার একটা বিবরণ দেওয়ার প্রয়াস পাব।

নানা ভঙ্গীর দৃষ্টি আছে,—দৃষ্টিভঙ্গী জিনিসটা কিন্তু তাদের থেকে আলাদা। কালিদাসের কালের কটাক্ষ এখনো দেখা যেতে পারে, কিন্তু সেকালের দৃষ্টিভঙ্গী আর নেই। দৃষ্টিভঙ্গী বদ্‌লায়, বদলাতে বাধ্য।

আবার দৃষ্টিভঙ্গীরও তারতম্য আছে। আপনার এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। আপনি যাকে গোরু দেখছেন, আমি তাকে গুরুবৎ দেখতে পারি। আপনার চোখে যে শস্য ছাড়া কিছু না, আমি তাকে শিষ্যস্থানীয় দেখি—আপনি যাকে গোলালু দেখছেন, আমার কাছে তা শাঁকালু। বস্তুতঃ জিনিসটা হয়তো একরূপই থাকে, কিন্তু দেখবার দোষে (কিম্বা গুণে) বিভিন্নরূপে দেখা দেয়। দৃষ্টিভঙ্গীর মজাই এই!

প্রেমে পড়াটাও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। তা ছাড়া কি? এক দৃষ্টিতে যেটা প্রেম, অন্য দৃষ্টিতে (এবং অন্যের দৃষ্টিতে) সেইটাই শয়তানি। আবার বই, কাপড়, প্রেম, খানা-ডোবা এ-সবই পড়বার জিনিস বটে, কিন্তু এদের প্রত্যেকের পাঠ আলাদা। কিন্তু পাঠে আলাদা বলে' ভ্রম হলেও আসলে আলাদা নয়, এইখানেই দৃষ্টিভঙ্গীর মারপ্যাঁচ।

কটাক্ষ কালো চোখে এবং কটা চোখে সমান মারাত্মক হতে পারে—সব সময়েই মারাত্মক হতে পারে—কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর রঙ্‌ ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে—তা কি পূর্ব্বরাগে, কি অনুরাগে আর কি অস্তরাগে, আর কিবা ঘোরতর রাগে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই ছলনায় একটু আগে যা প্রেমে পড়া বলে বোধ হয়েছিল, একটু পরেই তাকে প্যাঁচে পড়া বলে জ্ঞান হয়। তার প্ররোচনায় মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের 'লায়ন্‌' পরমুহূর্ত্তে পলায়নে পরিত্রাণ পেতে চায়। পুরুষসিংহ লক্ষ্মীলাভ করেও পরিত্যাগ করতে পারলে বাঁচে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিহাস এই গল্পের নায়ক লোকনাথের অদৃষ্টে ঘটতে দেখা গেছল।

লোকনাথ, জয়কেষ্ট আর বনমালী—তিন বন্ধুতে বসে জুতো পালিশ করছিল—তাদের সান্ধ্যভ্রমণের পূর্ব্বাভাস।

হঠাৎ লোকনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে' উঠল, "নাঃ, জীবনটা দেখচি বৃথাই গেল। কিচ্ছু হোলো না!"

প্রায় একমাস ধরে' প্রত্যহ সন্ধ্যার ঠিক বেরুবার মুখেই এই মন্তব্য ওর মুখে শোনা গেছে। ওর বন্ধুরা শুনেছে, কোনো প্রশ্ন তোলেনি। কিন্তু আজ জয়কেষ্টর অসহ্য বোধ হোলো। সে বলে' উঠল, "কেন এই বুটপালিশটা কি এতই খারাপ?"

জুতোর পালিশটা সে-ই কিনে এনেছিল।

"জুতোর পালিশ নয় মূর্খ, বুকের মালিশ। প্রেমের কথা হচ্ছে। প্রেমে না পড়তে পারলে জীবন ব্যর্থ! বেঁচে লাভ?" জবাব দিয়েছে লোকনাথ।

"প্রেমে পড়াকে আমি অধঃপতন মনে করি।" এই বলে' জয়কেষ্ট নিজের জুতোয় ফের মনোযোগ দিয়েছে।

"রোজ তিন জনে মিলে বেড়াতে বেরিয়ে যে কী হয়? কেন, একসঙ্গে না বেরুলে কি চলে না?" বনমালী কিন্তু অন্য কথা এনে ফেলেচে, "কেন, আলাদা আলাদা বেরুলে হয় কী? তা হলে আমরা নিজের নিজের ভাগ্য পরখ করে' দেখতে পারি।

·তিনবন্ধুতে বসে জুতা পালিশ করছে·

একসঙ্গে ত্র্যহস্পর্শ ঘটিয়ে কারো ভাগ্যেই কোনো ফল হয় না যখন দেখা যাচ্ছে।"

মেয়েটি চম্‌কে……কেন ?

বনমালীর কথাটা লোকনাথের থেকে অন্য শোনালেও এবং একটু বন্য শোনালেও, আসলে দুটো কথাই এক কথা। দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক্‌—কিন্তু দ্রষ্টব্য এক।

জয়কেষ্টর নজর কিন্তু জুতোর দিকেই বেশি। তবু সে আবার ঘাড় তুলল। তুলে বলল, "তার মানে ?"

"তার মানে আমি বলছি, আজ আর আমি তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি না। আজ আমি একলা একলা বেড়াব। এবং আজ থেকে প্রত্যহ। এমন কি, যদি দরকার হয় আমি অন্য মেসে সীট নিতেও প্রস্তুত আছি।" এই কথা বলেছে বনমালী। "তোমাদের সঙ্গসুখে আমি মারা গেলাম।"

"শুনছ ? শুনছ ওর কথা ?" জুতো ছেড়ে দিয়ে জয়কেষ্ট লোকনাথের মুখের দিকে তাকালো। "ও আমাদের জয়েণ্ট ফেমিলি ছেড়ে দিয়ে পৃথক্‌ হয়ে যেতে চায়। শুনছ তো! তুমি তো একটু আগে প্রেমের কথা বলছিলে। ওর কথায় নিশ্চয়ই তোমার প্রেমে আঘাত লেগেছে। প্রাণে খুব ব্যথা পেয়েছ আশা করি।"

"আমাদের অভাবে বোধ হচ্ছে ও পীড়িত হবে না—ভাব করবার মত কিছু যেন পেয়েছে মনে হচ্ছে।" লোকনাথের সন্দেহ হয়।

"পেয়েছিই তো" জয়কেষ্ট জোর গলায় জাহির করে। "সেই জন্যই তো তোমাদের ল্যাজে বেঁধে নিয়ে ঘুরতে রাজি নই। তোমরাও আমাকে তোমাদের ল্যাজের বন্ধন থেকে মুক্তি দাও। একমাস হোলো আমরা কলকাতায় এসেছি। দেশের এক কলেজ থেকে একসঙ্গে পাস করে' বেরিয়েছি। এখানে এসে একবাসায় উঠেছি, এক পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছি—একসঙ্গে মিলে কলকাতার এক একটা রাস্তা পঞ্চাশবার করে' চষেছি। একত্র সিনেমাতেও গেছি। কিন্তু খুব হয়েছে, আর না! এবার আমি মুক্তি চাই।...আমার মনের মত চমৎকার একটি মেয়ে আমি খুঁজে বার করব; এমন একটি মেয়ে—সে যেমন স্মার্ট তেম্‌নি আপ্‌টুডেট। তোমাদের আড়াআড়ির থেকে, তোমাদের বিষ-দৃষ্টির আড়ালে একলা আমি তার সঙ্গে আলাপ জমাব। ঘুরব, বেড়াব, এমন কি একসঙ্গে সিনেমাতেও যেতে পারি।"

"চাল মারা হচ্ছে ? তাই না ?" জয়কেষ্ট তথাপি একটু আশার দোলায় দোলে। বনমালী সত্যিই তাদের সঙ্গ ছাড়বে—সে যেন ভাবতে পারে না। "মেয়ে অতো সস্তা নয়।" সে বলে। হয়তো বা বনমালীকে নিরস্ত করতে চায়।

"চাল কি ডাল্‌ এখনই দেখতে পাবে।" এই বলে জুতা পায়ে দিয়ে বনমালী বেরিয়ে চলে গেল তৎক্ষণাৎ। ফিরেও তাকালো না।

জুতো পালিশ মুলতুবি রেখে জয়কেষ্ট চুপ করে' রইলো। অনেকক্ষণ পরে সে মুখ খুলল তারপর:

"আচ্ছা, কী হয় মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে' বলো তো ? আমি তো কোনো লাভ দেখি না। সবাই মেয়ে মেয়ে করে' হন্দ হচ্ছে—একটা মেয়ে পেলে যেন হাতে স্বর্গ পায়! আমি তো ভাই এর কিছু বুঝি না। সত্যি বলতে, ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সেদিন একটা মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে গেছলাম—এমন কিছু না, তবে সে যা এক কাণ্ড হোলো—"

"আমি জানি!" বলল লোকনাথ, "আমি তো কাছেই ছিলাম। মেয়েটা বল্‌ল, আপনি কিরকম ভদ্রলোক মশাই ? চেনা নেই, শোনা নেই—গায়ে পড়ে কথা কইতে এসেছেন! এমন বেয়াদপি করলে আমি এক্ষুণি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।"

"ওরে বাবা! এখনো আমার বুক কাঁপছে।" জয়কেষ্ট শিউরে উঠ্‌ল। "জুতো পায়ে খট্‌খটিয়ে চলা কল্‌কাতার এ-সব মেয়েরা কী রে!"

"বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়।" লোকনাথ বলে। বলে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে: "তবু ওদের পায়ের তলায় পড়ে থাকাও ভালো। নইলে বুকের ফুটপাথ তো ফাঁকা!"

"বুঝেছি! তোমাকেও ব্যারামে ধরেছে।...তুমিও আমাদের ছেড়ে যাবে। তুমিও দাগা দিয়ে যাবে আমাদের প্রাণে। তবে কেন আর অনর্থক তোমার বিরহযন্ত্রণা সহ্য করার জন্য পড়ে থাকা। আমিই বরং আগে বিদায় হই।"

এই বলে' পালিশের কাজ আর না বাড়িয়ে জুতো পায়ে জয়কেষ্টও বিদায় নিয়ে গেল।

"তুমি! তুমিও গেলে! তুমিও গেলে অবশেষে!" তিরোহিত ছায়ার দিকে তাকিয়ে লোকনাথ বলে উঠল: "যাও। আমি একাই থাকব! আমার জীবন তো ব্যর্থই গেছে! আমি আর কোথায় যাব?"

লোকশূন্য ঘরে লোকনাথ একাই পড়ে থাকল! একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। একলা একলা বেড়াতে কি ভালো লাগে? কী হবে বেড়িয়ে? কোথায়ই বা বেড়াবে! বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলে সে পড়ে রইল।

আধঘণ্টা ঐ ভাবে পড়ে থাকার পর হঠাৎ তার মনে হোলো কড়িকাঠের চেয়ে অধিকতর রমণীয় কলকাতায় কি কিছু নেই? পথে-ঘাটে ইতস্ততঃ সর্ব্বত্রই যাদের ছড়ানো দেখা যায়—তাদের তুলনায় কড়িকাঠ কোন্ হিসেবে অধিকতর দর্শনীয়? এবং বাঞ্ছনীয়? হতে পারে তারা গায়ে পড়তে গররাজি। কিন্তু চোখে পড়তে তো তাদের আপত্তি নেই। চোখে দেখাটাই কি কম হোলো? পাবার সাধ না করে, কেবল চোখে চোখে, স্বাদ পাবার বাধা কি?

ইত্যাকারে আত্মজিজ্ঞাসার আপন মনে সদুত্তর লাভ করে' সেও বেরিয়ে পড়ল। যদিও তার একটা জুতো তখনো অপালিশ থেকে গেছল, তবুও সে দ্বিধা করল না। এক পাটি জুতোর চাকচিক্যই পদমর্য্যাদার পক্ষে যথেষ্ট বলে' তার মনে হোলো। তা ছাড়া চেহারাটা তার একটু ঝক্‌ঝকে ছিল—দুটো পাটিই মুখের মতন নাই বা হোলো—ক্ষতি কি?

সন্ধ্যে হয় হয়, লোকনাথ বেরিয়েছে। সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন, চারিধারের এত লোকের মধ্যে অনাথ বালকের মত চলেছে লোকনাথ। রাস্তাগুলোও হেঁটে হেঁটে ওর মুখস্থ হয়ে যাওয়া—তাদেরও কোনো পদস্থতা ছিল না। কোনো কোণেই কোনো বিস্ময়ের অপেক্ষা বা রহস্যের হাতছানি নেই তার পথে।

অভ্যেস হয়ে যাওয়া একটা চায়ের দোকানে সান্ধ্য চা পান সেরে—ত্রিসন্ধ্যার নিত্যকর্ম্ম সেরে নিয়ে—ফের সে পা বাড়িয়েছে—নিরুদ্দেশের পথে না হলেও নিরুদ্দেশ্যের পথে। কিন্তু এবার সে যেন উৎসাহজনক কিছু দেখল। একটি তরুণী চলেছিল তার আগে আগে। সুবেশিনী।

পা চালিয়ে লোকনাথ তার পাশাপাশি পৌছল। পৌছে দেখল তার দৃষ্টিভঙ্গী নেহাৎ ভুল বাৎলায় নি। এক একটি মেয়ে আছে, যে-কোনো কোণ থেকে, এমন কি পেছন থেকেও, যাদের একটুখানি কেবল কাণের পশ্চাদ্‌ভাগে দেখলেই মনে হয় যে, মেয়েটি সুন্দর—তারপর সামনে এসে দেখে সে ধারণা বদ্‌লাবার কোনো কারণ দেখা যায় না, এ মেয়েটি সেই বিরলগোত্রীয়াদের অন্যতমা।

কিন্তু কি করে' কথা পাড়া যায়? মস্ত বড় সমস্যা। একটু-খানি ইতস্ততঃ করে লোকনাথ বলে' উঠ্‌লো আপনা থেকেই—"কোথাও যাচ্ছেন বুঝি?"

মেয়েটি চম্‌কে গিয়ে ফিরে তাকালো—"হ্যাঁ—কেন?"

"ভাবছিলুম যে আপনি বোধ হয় আমার পথেই চলেছেন—তাই—তাই জিজ্ঞেস করলুম।" লোকনাথ জড়িয়ে জড়িয়ে বলল: "তাই ভাবছিলুম যে একটুখানি হয়ত আমরা একসঙ্গেই যেতে পারি, অবশ্যি—যদি আপনি কিছু না মনে করেন।"

"তা, চলুন না, আপত্তি কি!" মেয়েটি বলল: "আপনি কোন্‌দিকে যাবেন?"

"আমার—আমার কোনো গন্তব্য স্থান নেই। এম্‌নি বেরিয়েছি।" লোকনাথ জানাল।

"তা, বেশ তো।" মেয়েটি হাসল।

মেয়েটির কোনো দ্বিধা দেখা গেল না। লোকনাথের একটু কেমন কেমন ঠেকলেও সে তেমন আশ্চর্য্য হোলো না। তার সঙ্গ তার বন্ধুদের কাছে অসুখ বলে' মনে হলেও মেয়েদের কাছে অসহ্য নাও হতে পারে। তা ছাড়া, প্রথম দর্শনেই যে সব দুর্ঘটনা ঘটে বলে' শোনা যায়, তার সবই তো একেবারে মিথ্যে নয়—তার সবটাই যে মিলিটারী লরীর মুখোমুখি ঘটে, তা নাও তো হ'তে পারে। মেয়ে এবং মিলিটারী লরীতে অপমৃত্যু এবং প্রেমে কিছু কিছু মিল থাকলেও—অন্যথাও কি তেমনি নেই? আর, সবে তো এখন দর্শনের প্রথম অধ্যায়!

আলাপের প্রথম ফাঁড়াটা কাটিয়ে, এবং জয়কেষ্ট সুলভ কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে লোকনাথ এবার আরো একটু সাহসী হোলো। বলল: "চলুন্ না, কফি হাউসে যাওয়া যাক্! আপনার আপত্তি আছে?"

"না, ধন্যবাদ। কফি আমি খাই না।"
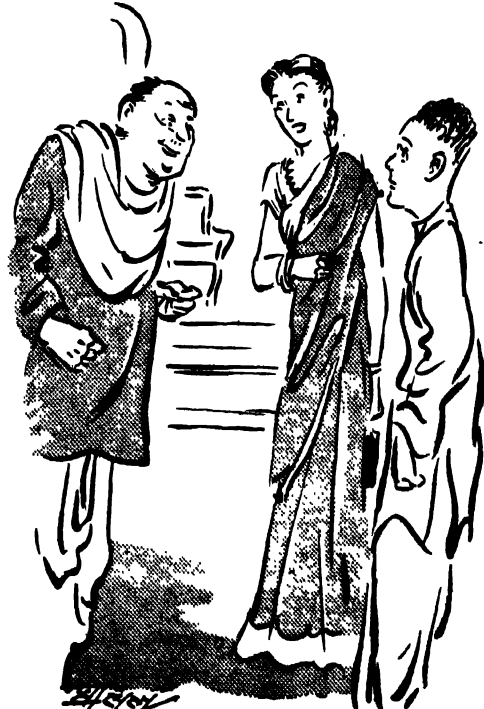
"বাবা, আমি আরেকজন ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছি।"

"আপনার হাতে যদি তেমন কোনো কাজ না থাকে—ঘণ্টা দুয়েকের অবসর থাকে যদি—তাহ'লে একটা সিনেমায় টিনেমায় গেলে কেমন হয়?" লোকনাথ আরো একটু এগুলো।

"অনর্থক কেন পয়সা নষ্ট করবেন?" বলল মেয়েটি।

এই প্রশ্নের কী উত্তর দেবে লোকনাথ ভেবে পেল না। প্রেমে পয়সা খরচ আছেই—সূত্রপাতেও আছে, সূচীপত্রেও আছে—সূচিকাভরণে তো রয়েছেই—এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে না। কথাটা বাহুল্যমাত্র। তার উত্তর দেওয়া বাহুল্য বিবেচনা করে' লোকনাথ নিরুত্তর হয়ে রইলো।

"তার চেয়ে আমি আপনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি যেখানে এক পয়সা খরচ নেই। মেয়েরা আছে, গান আছে,—সময়টা আপনার বেশ আনন্দে কাট্‌বে।··· যাবেন?' মেয়েটি একটু থাম্‌ল: "অবশ্যি ঘণ্টাখানেক নষ্ট করবার মতো সময় যদি আপনার থাকে।"

"আপনার সঙ্গে যাওয়াটা কি সময় নষ্ট করা?" লোকনাথ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে: "কী যে আপনি বলেন?"

লোকনাথ মেয়েটির সাথে সাথে চলে। ভাবতে ভাবতে চলে। কবি যে বলে গেছেন, প্রেমের ফাঁদ ভুবনে পাতা—কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে-না। ফাঁদ তো পাতাই রয়েছে, সাহস করে পা দিতে পারলেই হয়—পদস্খলনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো হবে। প্রেম সব সময়েই নিপাতেন সিদ্ধ! কখনো ছেলের দিক থেকে, কখনো বা মেয়ের দিক থেকে। কিন্তু সর্ব্বদা যারা উঠে পড়ার তালে থাকে সেই সতর্করা কখনো প্রেমে পড়তে পারে না। যতই ভাবে ততই লোকনাথের রোমাঞ্চ হয়। অভাবিত ভাবে এবং কত সহজে সে প্রেমের পথে পা বাড়িয়েছে।

আরো একটু চলবার পর তারা একটা থাম্‌ওলা বাড়ীর সামনে এল। মেয়েটি তাকে নিয়ে ঢুকল ভেতরে।

প্রকাণ্ড হল্‌ ঘরের মত। বিস্তর বেঞ্চি পাতা। কিন্তু তার বেশির ভাগই ফাঁকা পড়ে আছে। সামনে একটুখানি থিয়েটারের ষ্টেজের মতো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে একটিমাত্র অভিনেতা—যদি তিনি অভিনেতাই হন্‌। নাটকটা যে কী, লোকনাথ আন্দাজ পেল না। তবে অভিনেতার দাড়ি আছে, বেশ পালিশ করা দাড়ি, এটা তার নজরে পড়ল।

দর্শক সংখ্যা মুষ্টিমেয়। জন কুড়ি লোক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে বসে'। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বল্‌ছিলেন—

"আজকালকার ছেলেদের ধর্ম্মে রুচি নেই—সিনেমায় রুচি। আগে আমাদের সমাজের প্রত্যেক অধিবেশনে লোক ধরত না—এখন তাদের ধরে ধরে আনতে হয়···"

এমন সময়ে মেয়েটি গিয়ে সেই বক্তৃতা দাতাকে সম্বোধন করল,—"বাবা, আমি আরেকজন ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছি।"

"বেশ করেছ মা। ওঁকে সাম্‌নে নিয়ে এসে বসাও—ওই ধারটায়—যেখানে আরো দু'জন ভদ্রলোক বসে' আছেন।" তিনি প্রসন্ন হাস্যে বল্লেন।

সম্মুখীন হয়ে সেইখানে বস্‌তে গিয়ে লোকনাথ হাঁ হ'য়ে গেল। যে লোক দু'জন ফাঁক হয়ে মাঝখানে তার জায়গা করে' দিল, তারা আর কেউ না—বনমালী আর জয়কেষ্ট।

লোভীর অভিযোগ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

লোভে পাপ—সত্য কথা, যদি পাপ হয় সমাজদ্রোহিতায় এবং বিধি-নিয়মের স্বেচ্ছাকৃত ব্যত্যয়ে। তেমন পাপে কিন্তু মৃত্যু হয় না। আদালতে মিথ্যা মামলায় অর্থ সঞ্চয় করলে দেহের পুষ্টি হয়। আইনের কবলে না পড়লে, অন্যায়ে অর্থ সংগ্রহ, অনেক মানুষকে জীবনের শেষের দিকে গণ্যমান্য করে। এমন বহু লোক সকল সমাজে বিদ্যমান। অনেক ধন-ভাণ্ডারের বুনিয়াদ পরীক্ষা করলে, তার সম্ভ্রান্ততা ঈর্ষার কারণ হ'তে পারে না।

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম।
কুতস্তদ্‌ ধনলুব্ধানাং ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাম॥

শিক্ষালয়ের নীতি-হিসাবে শুদ্ধ। কিন্তু সংসারে যশ, মান, রচন এবং অর্থের পশ্চাদ্ধাবন না করলে, ঐ তিনটি পদার্থ মিলে না। জোগাড়ের জয়।

আমি অন্যত্র বলেছি মিথ্যা অভিযোগী, সত্য ঘটনার কাঠামোয় মিথ্যার রূপ দেয়। আমি এ শ্রেণীর কতক প্রকার নালিসের বিবরণ দেব।

যে অর্থ দেওয়ানী কোর্টে আদায় হ'তে পারে, সে অর্থ ফৌজদারী মামলার চাপে উসুল করবার জন্য অনেকে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মোকদ্দমা রুজু করে। যদি সে নালিসের বিবরণের মধ্যে মিথ্যা আরোপ না থাকে, এমন অভিযোগকে মিথ্যা বলা যায় না। মক্কেলের নষ্ট দ্রব্য উদ্ধারের বাসনা, উকীলের ভ্রম, এবং একটু ফাটকাবাজীর ফলে এমন নালিস কাছারীতে আসে। দেওয়ানী মামলা করতে গেলে যত টাকার দাবী, সেই অনুপাতে কোর্ট ফি দিতে হয়। যার টাকা উদ্ধার হচ্ছে না, তার পক্ষে আবার ঘরের অর্থ সরকারকে দিয়ে নষ্ট অর্থ উদ্ধারে দ্বিধা স্বাভাবিক। তারপর দেওয়ানী মামলায় অসাধু দেনাদার বিচলিত হয় না। ডিক্রী হ'লেও কিস্তিবন্দী চলে। ডিক্রীজারী হাঙ্গামা এবং ঝঞ্ঝাট। কিন্তু ফৌজদারী মামলা ভীতিপ্রদ। উত্তমর্ণ একবার চেষ্টা করে জেলের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে। একজন ধনী ফৌজদারী উকীল সম্বন্ধে কু-লোকে বলত যে, তিনি ফৌজদারী কাছারীতে বসে, দেওয়ানী মামলা বুঝেই অধিক অর্থ উপার্জ্জন ক'রেছিলেন।

কিন্তু ঠিক যথাযথ বিবরণে প্রথম দিনেই হাকিম এ রকম নালিসের দরখাস্ত ডিস্‌মিস্‌ করেন। তার সংবাদ বিবাদীর কাছে পৌঁছায় না, সুতরাং তার প্রাণে প্রত্যাশিত আশঙ্কা জন্মাতে

পারে না। তাই অভিযোগে বাদী একটু রসান দেয়। অনেক কথা বলে না কিম্বা দু' একটা নূতন অসত্য কথা বলে।

ধরুন কলিকাতায় কাপড়ের পাইকারী বাজারে, নগদ বিক্রী মানে কোন ক্ষেত্রে পনরো দিনের ডিউ। অর্থাৎ ক্রেতা যদি পনেরো দিনের মধ্যে প্রাপ্যগণ্ডা চুকিয়ে দেয়, সে কিছু ব্যাজ বা কমিশন পায়। পনেরো দিনের দিন দাম দিলে নির্দ্দিষ্ট দাম দিতে হয়। তার পরে দিলে সুদ দিতে হয়। একে ব্যবসা জগৎ নগদ বিক্রী বললেও, আইন তা' বলে না। ক্রেতার উপর দাবী রাখবার জন্য পূর্ব্বে পাইকারী তৌসওয়ালাদের মুচ্ছুদ্দী ক্রেতার কাছে এক পত্র লিখিয়ে নিত। তার মর্ম্ম এই যে দাম চুকিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত মালের স্বত্বস্বামিত্ব বিক্রেতারই অক্ষুন্ন থাকবে। বলা বাহুল্য এ সর্ত্ত নিরর্থক। কারণ ডিউতে মাল বেচার মানে, ব্যবসায়ী মাল বেচে বিক্রেতার দাম চুকিয়ে দেবে।

এই সর্ত্ত নিয়ে পুলিস কোর্টে বহু মামলা হয়েছে। ভয়ে সাধু ব্যবসায়ী দেনা মিটিয়েছে। কিন্তু যে অসাধু বা যার দেনা দেবার সঙ্গতি নাই, সে শেষ অবধি লড়াই ক'রে অব্যাহতি লাভ করেছে। তার পরেই ইন্‌সলভেন্সী কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারলে তার সকল দিক মুক্ত। এক্ষেত্রে অভিযোক্তা মিথ্যুক বা অসাধু নয়।

এইরকম ঘটনার চরম দৃষ্টান্ত পূজার বাজারের জুয়াচুরি। এক অসাধু ব্যবসায়ী একটি গণেশের মূর্ত্তি এবং সিঁদুর লাগানো ঘট-স্থাপন ক'রে খানকতক খেড়ুয়া-মোড়া খাতা কিনে দোকান খুলে বসতো। ডিউতে মাল কিনে তাড়াতাড়ি লোকসানে কম দামে কাপড় বেচে বিক্রেতা ব্যবসায়ীর দেনা মেটাতো। তারপর আবও মাল নিত। এই রকমে খুব চালাও কারবার ক'রে বাজারের অনেক মাল ধারে কিনে পূজার পরই গণেশ উল্টে দোকান বন্ধ করত। এক মাসের মধ্যে এই রকমে হাজার কতক টাকা উপার্জ্জন করা সম্ভব হত।

এমন লোক চলতিভাষায় জুয়াচোর। আইনের খুব সূক্ষ্ম বিচারে সে জুয়াচোর প্রতিপন্ন হতে পারে। কিন্তু যার গেছে তার পক্ষে কাজ ক্ষতি ক'রে, উকীলের ফি দিয়ে, সেই সূক্ষ্ম বিচার যে সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করবে, সে মালমসলা সংগ্রহ করা কঠিন। এসব জুয়াচোরদের শাস্তি দেবার কত চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আইনের মোচকোফেরে তারা অনেকেই অব্যাহতি লাভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে বহুদিন চেষ্টা ক'রে অর্থব্যয় ক'রে ফরিয়াদী অসাধু ব্যবসায়ীকে টাকায় চার আনা ছ'আনা দিয়ে মেটাতে বাধ্য করেছে।

এক শ্রেণীর অপরাধ আছে যার উৎপত্তি ঋণদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের লোভে। মোটামুটি যাদের কাপ্তেনী কারবার বলা হয় এ অপরাধ তাকে মৌজদারীর রূপ দেয়। বহু পূর্ব্বে কলিকাতায় বিদেশী জাহাজের কাপ্তেন, মালিক, নাবিক প্রভৃতি চীনাবাজার, চাঁদনী ও মার্কেটে বাজার করতে যেত। তাদের কাছে ভাঙ্গা ইংরাজি ব'লে এক শ্রেণীর দোকানদার যথা ইচ্ছা অসম্ভব দরে সাধারণ দেশী জিনিস বিক্রয় করতো। একটা বানর ছানার কুড়ি টাকা সাধারণ দর ছিল। তিন টাকায় কাকের বাচ্ছা, দু'টাকায় মাটির আহ্লাদী পুতুল ইত্যাদির কারবারকে বলা হ'ত কাপ্তেনী কারবার। শীতকালে তখন প্রায়ই যুদ্ধের জাহাজ বা ম্যান-অফ্-ওয়ার আসতো। সেই মানোয়ারী গোরারা সবাই কাপ্তেন নামে অভিহিত হ'ত। দোকানদার তাদের ডাকতো—কাপ্তেন সাব, টেক্ টেক্ টেক্ নোটেক্, নোটেক্, একবার তো সী। অর্থাৎ নাও না নাও একবার তো দেখো। রাধাবাজারের মোড়ে এক মদের দোকানে মদ খেয়ে তারা লালবাজারে হুল্লোড় করত। একটা হুঁকাকে গদার মত ঘুরিয়ে একবার এক কুলির মাথায় মেরে অনুতপ্ত হয়ে মানোয়ারী গোরা তার মুখচুম্বন ক'রে তাকে পাঁচ টাকা বখসিস দিয়েছিল। এ সব কাপ্তেনী কারবার বেশী ঘটতো শীতকালে বড়দিনের ছুটিতে।

বলছিলাম কাপ্তেনী কারবারের কথা। ইংরাজী প্রবচন সর্ব্বনাশের তিনটি কারণ নির্দেশ করে—মদ, মদন ও দ্যুতক্রীড়া। এক একটি ধনী লোকের ছেলে যৌবনেই প্রথম ছুটির করলে পড়ে। স্নেহময়ী মা বা পিসীমার কাছে যে অর্থ পায়, বিলাসিতার অমিতব্যয়িতার পক্ষে তাহা যথেষ্ট হয় না! তখন তাকে যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থ সংগ্রহ করতে হয়।

কলিকাতার কুস্থানে এক শ্রেণীর কুকর্ম্মী থাকে। তারা হ্যাণ্ডনোটের দালাল। অকস্মাৎ কুকাজে অর্থের অনটন পড়লে তারা ভীষণ সুদে টাকা ধার ক'রে দেয়। যত টাকা ধার হয় তার অধিক টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতে হয়। এই টাকা—ধারের লোভের উপর কর্জ্জ দিয়ে, অর্থ উপার্জ্জনে লোভীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত।

সাধারণ ভাবে এমন ধার দিয়ে অর্থ উদ্ধার করতে সময়ে সময়ে কষ্ট পেতে হয়। তাই কারবারের মধ্যে অপরাধের উপকরণ সন্নিবিষ্ট হলে আদায়ের পথ সুগম হয়। নাবালকের হ্যাণ্ডনোট তমসুক, মর্টগেজ প্রভৃতি কোনো দলিল দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য নয়। কিন্তু মিথ্যা প্রলোভনে অর্থ সংগ্রহ ফৌজদারী অপরাধ। তাই একশো টাকার হ্যাণ্ডনোটে ধনীর নাবালক তরুণকে চল্লিশ টাকা দেবার সময়, মহাজন (!) তার কাছ থেকে একটা মিথ্যা স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেয়—যাতে ঋণ-দাতা বলে যে তার বয়স উনিশ বছর ছমাস অতএব সে সাবালক। সময় থাকলে, অধিক টাকার কারবারে কাপ্তেন তরুণ পুলিশ কোর্টে এফিডেভিট করে। এরও প্রকার-ভেদ আছে। সম্পত্তির মালিক সাবালক হলে, তাকে দিয়ে এক সম্পত্তি দুবার বন্ধক দেওয়ানো হয়। দ্বিতীয় বন্ধকী পত্রের সম্পাদনের সময় সে একটা এফিডেভিট দেয় যে তার সম্পত্তি দায়হীন, অর্থাৎ পূর্ব্বে বন্ধক দেওয়া হয় নি। এই স্বীকারোক্তি কাল হয়। তার ফলে যে ধার নেয় সে ফৌজদারী মামলায় পড়ে।

বলা বাহুল্য, এক শ্রেণীর জুয়াচোর আছে, যারা ঋণ-দাতাকে এই রকম স্বীকারোক্তিতে প্রবঞ্চনা ক'রে অর্থ সংগ্রহ করে। একজন এই প্রকারে একটা সম্পত্তি আঠারো বার দায়হীন ব'লে বন্ধক দিয়েছিল। এটর্ণী এবং উকীলরা এই সব বন্ধকী দলিল লেখে। তাদের মধ্যে অনেকে প্রবঞ্চিত হয়। আমার সম-ব্যবসায়ীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে—ব্যবহারবুদ্ধি লোবল।

কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলতে হয় যে সকল এটর্ণী ও উকীল সাধু প্রকৃতি নয়।

এই বাস্তবিক জুয়াচুরির উপর মামলার রূপ দিয়ে, কাপ্তেনী কারবারের দেনদার ও পাওনাদার উভয়ে কাপ্তেনী চিটিংবাজী করে। লোভী উভয় পক্ষ। পাওনাদার ফৌজদারী কোর্টে অভিযোগ করে যে নাবালক স্বচ্ছকুমার আপনাকে সাবালক ব'লে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে মবলগ্ তিনশ টাকা হ্যাণ্ডলোটে ধার করেছে। সত্য কথা জানলে বাদী টাকা ধার দিত না। এ অর্থ আদালতের সাহায্যে উদ্ধার হয় না। অতএব হুজুর প্রতিবাদীকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া আইনের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে আজ্ঞা হয় ইত্যাদি।

যুবকের বিধবা মা, স্নেহময়ী পিতৃস্বসা, বিরক্ত খুড়িমা সবাই এক জোটে বাছাকে কারাগার হ'তে বাঁচাবার জন্য, গহনা পত্র বিক্রয় করে দেনা চোকায়। অনুতপ্ত স্বচ্ছকুমার সাতদিন ঘাপটি মেরে ঘরে থাকে। তারপর বন্ধু ঝণ্টু এসে আবার তাকে ফুসলে বিরহিণী শ্রীমতী চলচ্চিত্রের শাস্তিকুঞ্জে নিয়ে যায়।

মিথ্যা চেকে টাকা ধার করা জুয়াচুরি। অনেক সময় লোকের হঠাৎ টাকার দরকার হ'লে সে বন্ধু বান্ধবের কাছে গিয়ে বলে— ছুটা বেজে গেছে, ব্যাঙ্ক বন্ধ। আমার এই একশো টাকার চেক রেখে একশ নগদ টাকা দাও। কাল সকালে ব্যাঙ্কে পাঠালে চেক ক্যাশ হবে।

জগতে এমন ঘটনা প্রায় ঘটে। বহু লোক ঘরে সামান্য মাত্র অর্থ রাখে। সব টাকা থাকে ব্যাঙ্কে। সুতরাং হঠাৎ রোগে শোকে মানুষকে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

এই রকম ঘটনা'কে আদর্শ ক'রে অনেক জুয়াচোর পরিচিতকে প্রবঞ্চিত করে। যার ব্যাঙ্কে মাত্র ষাট টাকা আছে, সে বন্ধুকে বলে, আমার পরিবার পীড়িত। ব্যাঙ্ক বন্ধ। সেখানে আমার যথেষ্ট অর্থ আছে। আপাততঃ একশো দশ টাকা দাও। এই চেকখানা কাল দশটার সময় ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিও, তোমার টাকা পা'বে। অবশ্য পরদিন ব্যাঙ্ক চেক ফেরৎ দেয়, টাকা নেই দেবে কোথা থেকে। এ প্রতারণা আইনের চক্ষে—চিটিঙ্।

যেখানে লোভী দুজনেই পাপী, সে ক্ষেত্রে এই চিটিঙের আইনের কাঠামোয়, কাপ্তেনী লেন্ দেন হয়। ধনীর ছেলে ঐ রকম বাজে একশো টাকার চেক দিয়ে ঋণ-দাতার কাছে ৮০ টাকা নেয়। চেকের তারিখ সাতদিন পিছিয়ে দেয়। সাত দিনের দিন টাকা দিতে না পারলে, উত্তমর্ণ চেক ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে, ডিজনার করিয়ে নেয়। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের কাছে চিঠি নেয় যে চেকদাতার টাকা নাই, তার কাছে চাওগে—রেফার টু ড্রয়ার। তারপর সে পুলিশ কোর্টে কেশ ক'রে। তখন মুগ্ধ আত্মীয় ঋণের পাই পয়সা মায় সুদ ও খরচ চুকিয়ে দেয়।

এ সব ক্ষেত্রে মিথ্যা অভিযোগের উপকরণ বাদীর হাতে জুগিয়ে দেয় বিবাদী। উভয়েই ন্যায় ও ধর্ম্মের চোখে পাপী। কিন্তু কাছারীর পক্ষে এ জুয়াচুরির মূলে পৌছান অনেক সময় কঠিন কাজ।

এতাবৎ আমি অর্থলোভের কথা বলেছি এবার অতীতের একটি মামলার কথা বলব। মন্তব্য অনাবশ্যক।

আমি তখন তরুণ। কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ বংশের একটি যুবক আমার চব্বিশ পরগণার এক মহকুমার নালিশ রুজু করবার জন্য নিযুক্ত করতে চান। আমি যে ফী চাইলাম দিতে চাহিল। মোকদ্দমা কি?

সে তার এক সহিসকে দেখিয়ে বললে, বেচারা সেই ছোট সহরে বিবাহ করেছে। তার শ্বশুর পক্ষের লোক স্ত্রীকে আটকে রাখছে, স্বামীগৃহে আসতে দিতে চায় না। স্ত্রী যোড়শী!

আমি বললাম, এ সব ক্ষেত্রে স্ত্রীর সম্পত্তি না থাকলে হাকিম মা-বাপের হেপাজত হতে মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠাতে চান না! অবশ্য যদি মূলে কোনো অবৈধ ব্যাপার থাকে, তা হ'লে স্বতন্ত্র কথা।

ভদ্রলোক বললে—স্ত্রী আসতে সম্মত। কারণ সে স্বামী চায়। তার মা তাকে অন্যের সঙ্গে নিকা দিতে চায়। মেয়েটি পালিয়ে আসতে পারেনা অথচ স্বামীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত।

কথাবার্ত্তা যখন চলছিল, পত্নী-প্রাণ সহিস হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার কৌতূহল হ'ল। সামান্য অর্থে স্থানীয় উকীল পাওয়া যায়! আমাকে অত টাকা দেবার কারণ কি? বিশেষ সে-যুগের সহিসের বেতন ছিল মাসে সাত টাকা।

ভদ্রলোক বললে—আপনার বাপ-মার আশীর্ব্বাদে কিছু পয়সা আমি খরচ করতে পারি। বলুন তো কেশববাবু এটা ধর্ম্মের কাজ কি না? হানিফরা দু'পুরুষ আমাদের চাকুরী করে। তার স্ত্রীর অন্যের সঙ্গে নিকা হবে? কি কেলেঙ্কারী।

আমি বললাম—বালাই ষাট। সীতা সাবিত্রীর দেশে এমন এমন দুর্ঘটনা ঘটতে দেওয়া উচিত না। তবে বলে রাখি মামলা একদিনে শেষ হবে না!

—কুছ পরোয়া নাই। টাকা সঙ্গে যাবে না।

অবশ্য এই রকম শুবুদ্ধি সর্ব্বজনীন হ'লে উকীল মোক্তার সমৃদ্ধ হয়। ভদ্রলোকের প্রশংসায় প্রাণ গলে গেল! তবু কিন্তু ফৌজদারী উকীলের মন এক একবার আমার কি, আমার কি, বল্লে একটা কুৎসিত সন্দেহকে চাপা দেবার জন্য।

মহকুমার হাকিম ছিলেন শিক্ষিত ইংরাজ। ইনি পরে লাট সাহেব হয়েছিলেন। দরখাস্ত পেয়ে তিনি বললেন—কাল আপনি এগারোটার ট্রেণে আসবেন। আমি থানার বড় দারোগাকে দিয়ে কাল মেয়েটিকে হাজির করাব।

আমি এ-সব ক্ষেত্রে যা হয় তা বললাম। তার মা-বাপ শিখিয়ে দেবে মিথ্যা বলতে। কারণ হুজুরের নিজের দেশের প্রবচন—রক্ত জলের চেয়ে গাঢ়।

সাহেব বললেন সে ভয় নাই। আমি তাকে আমার খাস কামরায় রেখে দেব। তার দৃষ্টির মাঝে থাকবেন আপনি আর আমি।

হাকিমকে ধন্যবাদ দিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম।

আমার বিজয়-হাসি প্রতিফলিত হ'ল বড় লোকের ছেলের মুখে। সহিসের সেই এক ভাব—যুক্তপাণি, নীরব।

পরদিন নালিশের দরখাস্ত শোনা শেষ ক'রে, হাকিম খাস-কামরায় গেলেন। তখন চাপরাসী আমায় বললে—সাহেব সেলাম দিয়া।

ঘরের এক কোণে একটা রঙীন কাপড়ের পুঁটুলি। তার উপর-প্রান্ত হতে দুটা চঞ্চল মকরী আঁখি এবং বাঁশীর মত নাকের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

সাহেব হেসে বললেন—এই বাণ্ডিল হালিমা বিবি। আমি তার মুখে তার গল্প শুনেছি। আপনি শুনুন।

সাহেবের করুণ আহ্বানে যুবতী উঠে দাঁড়ালো, টেবিলের নিকট এলো। এক কথায় হালিমা সুন্দরী।

হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন—হানিফ টোমারা খসম।

হালিমা মৃদুস্বরে বললে—নেহি হুজুর।

তার পিতা নিকটের গ্রামের পাটের কলে কাজ কর্ত্ত। হানিফ তার মাকে ফুসলে পয়সা দিয়ে ভালো কাপড় দিয়ে মেয়েটিকে কদিন বাবুর বাগানে নিয়ে গিয়েছিল।

—টোমারা এ রেশমী কাপড়া কোন্ ডিয়া!

সলজ্জ হালিমা কথার উত্তর দিল না। সাহেব তাকে নির্ভয় হতে বল্লেন। উকীল বাবুর কাছে লজ্জা নাই।

হালিমা চকিতনেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে মাটির দিকে চাইল। তার পর তার চক্ষু ভরে জল এল।

অনেক সান্ত্বনার পর সে বাকী গল্পটুকু বললে। বাবু তার সঙ্গে হানিফের নামে মাত্র বিবাহ দিয়ে, নিজের উপপত্নী হিসাবে রাখতে চেয়েছিল। তাকে কিছু গহনা দিয়েছিল। তার মার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিল—হালিমার নামে কলিকাতায় বাড়ী কিনে দিবে ইত্যাদি ইত্যাদি সেই পুরাতন কাহিনী। একদিন তার পিতা সন্দেহ ক'রে হানিফকে নিজের বাড়ীতে ধরেছিল। সে প্রাণভয়ে পালিয়েছিল! তারপর এই মিথ্যা মামলা।

সাহেব বললেন—আমার বিশ্বাস বাবুর ধারণা মেয়েটি আমার কাছে বলবে—হানিফ তার স্বামী, সে তার কাছে যাবে। কিন্তু আমি তাকে জেরা করে অভয়দান করে সত্য ঘটনা জেনেছি।

আমি আর কি বলব? এর একমাত্র বিচার ফল—দরখাস্ত নাকোচ। আমার ভয় হচ্ছিল হানিফ এবং বাবু মিথ্যা অভিযোগের দায়ে অভিযুক্ত হবে।

সাহেব বললে—এখনও শেষ হয়নি। হালিমার জননীর ডাক পড়লো। সাহেব তাকে বললেন—তুমি হাজতে যাবে। টুমি মেয়েকে খারাপ করছ।

অবশ্য মাতা পুত্রীর যৌথ ক্রন্দনে সে অব্যাহতি লাভ করলে। তার পর পিতার পালা। হানিফ এবং বাবুর উপর মামলা করলে তাকে সমাজচ্যুত হতে হবে। সে মেয়েকে যত্নে রাখবে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দেবে।

তাদের প্রত্যেককে ধমক দিয়ে সাহেব স্ব স্ব স্থানে ফেরত পাঠালেন। হানিফকে শালা বদমাস বলতে হাকিমের শঙ্কা হ'ল না। তারপর আমার পালা।

লজ্জায় আমার কণ্ঠরোধ হচ্ছিল। বুক পকেটের নোটের তাড়া বৃশ্চিক হয়ে বক্ষে হুল ফোটাচ্ছিল।

আমি কোনো প্রকারে মৃদুস্বরে বললাম—আমি দুঃখিত।

সাহেব বললেন—আপনি কেমন ক'রে জানবেন? কিন্তু আপনি শিক্ষিত যুবক, আমার সমবয়স্ক। আপনার সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য আছে।

—অবশ্য।

আপনাকে কে নিযুক্ত করেছে?—বাবু?

আমি বললাম—দয়া করে জিজ্ঞাসা করবেন না। আমাদের বৃত্তির নিয়ম—

—আচ্ছা! আমি আপনাকে বিব্রত করতে চাই না। কিন্তু যদি—বাবুর সাক্ষাতের সুযোগ পান, তাকে বলবেন, যতদিন আমি এ জেলায় থাকব, সে যেন এদিকে না আসে।

আমার সাহস হল না, এ কথার প্রতিবাদ করবার। আধ্যাত্মিক দীনতার অনুভূতি আমাকে লজ্জা দিচ্ছিল। দুর্ব্বল করছিল কি জানি হাকিমের কি মনে হল। তিনি হেসে বললেন—আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না।

আমি মাত্র 'থ্যাঙ্ক ইউ' উচ্চারণ করতে পেরেছিলাম।

তারপর সেই হাকিমের কাছে আমি একটা বড় মামলা জিতেছিলাম।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার এক বাগান-পার্টিতে সেই সাহেবকে দেখেছিলাম। সেই সপ্তাহের শেষে তিনি অন্য এক প্রদেশে লাটসাহেবী করতে যাবেন। একজন বড় সাহেবকে ধোরে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলাম। দু'চার কথার পর এই মামলার কথা বললাম। সাহেব কপালে তর্জ্জনী ঠুকে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ রকম একটা মামলার কথা মনে পড়ছে। কিন্তু আপনাকে কিছুতেই স্মরণ করতে পারছি না। তারপর সাহেব হেসে বললেন—আমি কত বোকা।

আমি বললাম—গবর্ণরগিরি যদি তার ফল হয় তো চালাক হবার আবশ্যক কি?

আমি অদ্যাপি সে বাবুটিকে আর দেখিনি—অন্ততঃ চিনতে পারি নি। কে জানে আজ তার চরিত্র কি? সুন্দরীর লোভ এমন মিথ্যা অভিযোগের কারণ হয়। তার বহু দৃষ্টান্ত আমি জানি।
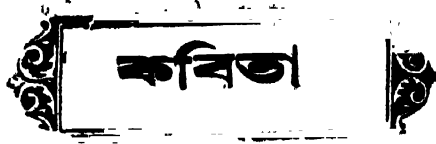
উদ্ধবের প্রতি গোপীগণ

মথুরার মণি শ্যামলের দীনা গোপীদের কথা মনে কি পড়ে—
যারা ছিল তারা চরণ-নলিনা, ভুলিত ভুবন বাঁশীর স্বরে!
প্রিয় পরিজন সুখ সাধ যারা আসিত ছাড়িয়া তাহারি তরে,
গৃহ থেকে যারা ছিল গৃহহারা তাদের ভুলেও মনে কি পড়ে?
বলো ওগো সখা বলো তারি কথা, আমাদের কথা বোলো না তারে
কী হবে বলিয়া? ফুল ঝরা ব্যথা ফুলফোটা করে বুঝিতে পারে?
অবলার বলো কী আছে দিবার? রূপ তো শিশির বালুকাচরে:
নয়ন-নদীর ঢেউগুলো তার চরণ-সিন্ধু খুঁজিয়া মরে।
বৃন্দাবনের আছে হায় শুধু যমুনা সে-ও তো ব্যথায় কালো,
ব্রজের বাসর রাস রস মধু রচিত তাহারি মায়াবী আলো।
সে রঙিন মায়া মথুরায় শুনি নব নব প্রেমে নিতি নিঝরে
পেয়ে নব-উছলা সুরধনী সুরহারাদের মনে কি পড়ে?
যার আছে ধন ধনী নাম তারি শকতি যাহার সেই তো বলী।
আমাদের শুধু আছে আঁখিবারি নাহি তো আমরা কথা কুশলী।
নাই কিছু তবু যারা দিতে চায় অকারণে মন কেমন করে
হেন গোপীদের আজ মথুরায় বারেকো তাহার মনে কি পড়ে?
প্রাণ চায় দিতে কূলেরে বিদায় কেন চায় বলো কেন কি জানে?
যে-নিঠুর চিরতরে ছেড়ে যায় তারি পানে ধাই কিসের টানে?
পলকে যে ভোলে কেন তারে কভু পারি না ভুলিতে পলক তরে?
সে চির উদাসী জানি, বলো তবু গোপীদের তার মনে কি পড়ে? *

(*শ্রীমদ্ভাগবত—দশমস্কন্দ—৪৭ অধ্যায়)

গোপীদের প্রতি উদ্ধব

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(কীর্ত্তন)

শ্যামলের প্রেমে যাহারা বিভোর ভুলি' সুখ সাধ প্রিয় স্বজনে
তাহারেই শুধু জানে চিতচোর ধন্য তাহারা তিন ভুবনে।
আশার চমকে যে আলোক জ্বলে সে-দীপনে পথ যায় না দেখা:
যে-প্রদীপ জ্বলে নিরাশা অতলে সে দেখায় তার চরণ রেখা।
দান করি' তারে কে পেয়েছে কবে যোগেযাগে ধরা দেয় না বঁধু:
মিলে কি তাহারে শুধু নাম জপে না ঝরিলে সেথা হৃদয়-মধু?
কে বলে তোমরা দীনা ভিখারিণী গরবিনী যারা লভিয়া তারে?
দেববল্লভে নিল যারা কিনি' দেবদুর্লভ দুরভিসারে?
ছাড়ি' কূল বরি' অকূল তারণ জীবনে মরণ বাসিলেভালো
তারে বিনা গণি' আঁধার ভুবন নাই পেলে তার আলোর আলো
কে বলে কলংকিনী তোমাদের প্রণয় যাদের প্রেমল বাঁধা?
তারি সহচরী হয়ে সহজের সখীসুর হ'ল যাদের সাধা!
তারে জানে যারা সুখের কারণ সাবধানে চায় শরণাগতি
নহে তারা তার আপন তেমন যেমন তোমরা লো চিরসতী!
পূজারী সে জানে মন্ত্র প্রণতি প্রার্থী সে জানে কৃতজ্ঞতা,
জ্ঞানী জানে তার জ্যোতি নিরবধি প্রেমিকা তাহার প্রাণের কথা।
সে কথা তাহারে বলি' হরি তারি প্রেমে ফিরে পায় আপন সুধা,
অভিসারিকার তরে অভিসারী নহিলে যে তার মিটেনা ক্ষুধা!
হেন শ্যামলের যারা বরণীয়া নমি আমি তাদের চরণে—
তনু মন যারা তারে নিবেদিয়া ফুল হয়ে ফোটে কাঁটার বনে।*

(*শ্রীমদ্ভাগবত—দশমস্কন্দ—৪৭ অধ্যায়)

কে বলে রে মায়ার খেলা

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

কে বলেরে মায়ার খেলা ছায়ার আলোড়ন,
সে জানে কি মায়ের বুকে কিসের আলাপন?
পিতৃস্নেহের গভীরতা,
কোন অসীমের দেয় বারতা,
ধন্য ধরা লভি' এদের চরণ পরশন।

নয়ত' মায়া মরীচিকা মৃগ-তৃষায় ভরা,
ছল্ চাতুরী প্রবঞ্চনা এই নিয়ে এই ধরা।
অন্তরে তার ফল্গুধারা,
কোন্ অমৃতের দেয় ইসারা,
পাষাণ বুকে ঝর্ণাধারা মানে না বন্ধন।

স্বর্গে যদি সুধা থাকে সে সুধা মোর মায়ের বুকে,
হেথা হাসি কান্না দোলায় ষড় ঋতু দোলায় সুখে
চাহি' প্রিয়ার মুখের পানে
সন্ধ্যাতারা মধুর গানে
এই ধরণীর 'পরে করে অমৃত সিঞ্চন।

বর্ষা-সন্ধ্যা

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

কালো মেঘখানা জল দিয়ে দিয়ে বেড়েছে সরে,
কিছুটা ফাঁকা।
সে ফাঁকার পাশে এধারে ওধারে কতনা মেঘ—
আকাশ ঢাকা।
কালো মেঘ-তলে লম্বা ফাঁকায় ঝিক্‌মিক্ করে
শাদা ও সোনা।
যেন কালো শাড়ী, তাহাতে উজল রঙ্গিন হলুদ
পাড়টি বোনা।
সূর্য্য কোথায় ডুবে ডুবে যায় মেঘের আড়ে,
যায় না জানা।
মেঘ-অরি-দলে করিতে ভস্ম নয়নে তাহার
আগুন হানা।
দক্ষিণে হেরি সাদাটে ধোঁয়াটে থাকে থাকে ফোলো
মেঘের দল।
মাথার উপর ছেঁড়া মেঘগুলা বড়ই কাতর
রিক্ত-জল।

মেঘ সরে যায়, পিছে হেসে উঠে দশমী তিথির
আধেক চাঁদ
আকাশ ছাঁকিয়া তুলেছে মাণিক জালসম ওই
মেঘের ফাঁদ।
তপনের সোনা ম'রে ম'রে যায়, মেঘ স'রে স'রে
তাহারে ঢাকে।
মেঘের চলন, আলোর মরণ চাঁদের কিরণ
ঘটিতে থাকে।
চেয়ে চেয়ে দেখি অবাক্ হইয়া জীবনের গতি
আকাশ জুড়ে।
নারিকেল পাতা মেঘ-লোকে দোলে, কচুপাতা নড়ে
নিকটে দূরে!
আমার জীবন এ বুকে দুলিছে পাতার সঙ্গে
মেঘের সাথে।
বিশ্বলীলার সাথে সাথে প্রাণ তাল দিয়ে দিয়ে
হর্ষে মাতে॥

পিতৃযজ্ঞ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বংশের আদি মাতা পিতাগণে
প্রণতি জানাই পায়।
গঙ্গাসাগরে করি তর্পণ
গোমুখী ভেদি তা যায়।
পুণ্যপুঞ্জ—হে স্বর্গবাসী—
ভক্তি ও পূজা করি, ভালবাসি,
তোমাদের দীন সন্তান করি
বন্দনা কবিতায়।
তোমাদের স্নেহ শুভ আকাঙ্ক্ষা
বংশ লতিকা ধরে'
সুরভির মত নামিয়া এসেছে
রেখেছে এ বুক ভরি।
এ তৃণ ফুলের পারিজাত সনে—
আছে সংযোগ জানি আমি মনে।
তোমাদিগে আমি পরশ করিতে
হরিরে পরশ করি।
সৃষ্টির সেই আদি হতে এই
সুদূর বর্ত্তমান।
এলো তোমাদের অমৃতের ধারা
পাই তার সন্ধান।
সয়েছ এমনি সুখ দুখ ব্যথা,
এই প্রতীক্ষা এই ব্যাকুলতা,
করেছ ধরার এই মধুবিষ
আমাদের মত পান।

হর-পার্ব্বতী সম পবিত্র
ছিলে এসে ধরাগায়,
নব নব আভিজাত্য দিয়েছ
বংশ মর্য্যাদায়।
ধর্ম্মনিষ্ঠ উন্নত শুচি,
জ্ঞানী, তেজস্বী, বিশুদ্ধ রুচি,
পেলে আনন্দ শিবের সেবায়
জীবের শুশ্রূষায়!
তোমাদের কাছে এক হয়ে গেছে
নর আর নারায়ণ,
স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সেথা
হয়েছে সম্মিলন।
পিতৃলোকের অমৃতের হ্রদে
গঙ্গা মিশিল আসি' হরিপদে,
আমি নর বটি—জেনেছি আমার
দেবতারা পর ন'ন।
কত সভ্যতা ভাঙিল গড়িল
যুগ ও যুগান্তর!
হেরেছ তোমরা সহ্য করেছ
কত মন্বন্তর।
যায় নি শুকায়ে তোমাদের ধারা,
বিপর্য্যয়েতে হয় নাই হারা,
হলে বিস্তৃত শাখা প্রশাখায়
বৃহৎ বৃহত্তর।

শুধু তুমি—শুধু আমি দুইজন

বন্দে আলী মিয়া

মোর কামনার রূপ ধরে তুমি
দেখা দিলে প্রিয়তম,
রাতের স্বপন ফুল হয়ে আজ
ফোটে অন্তরে মম,
দখিণ বাতাসে রাঙা পথ-ধূলি
সহসা যেন রে উঠেছে আকুলি,
নয়ন সলিল আজিকে আমার
হলো মধু মনোরম।

মনের ময়ূর পাখনা মেলিয়া
উড়ে যায় নীল নভে,
ক্ষণ বসন্তে জাগিল জীবন
গুঞ্জন-কলরবে।
শুধু তুমি-শুধু আমি দুইজন
চোখে চোখে চেয়ে থাকা অনুখন,
অনুরাগে রাঙা মোদের ভুবন
সুন্দর অনুপম॥

দর্পচূর্ণ

শ্রীআশুতোষ সাণ্ডাল, এম্-এ

তোমারে ছাড়িয়া যবে উঠিবারে চাই,
বারবার আছাড়িয়া শুধু প'ড়ে যাই
অসহায় বলহীন শিশুর মতন
ভূমিতলে! হে ঈশ্বর, মোর আস্ফালন,
শূন্যগর্ভ অহমিকা—অভ্রভেদী আশা,
স্পর্দ্ধাশীল—অবহিত মোর সর্ব্বনাশা
এ আত্মপ্রত্যয় আর ক্ষীণ বাহু-বল
অবিশ্রান্ত করি' চূর্ণ দেখাও কেবল
এ-দাস তোমার অণু হ'তে অনীয়ান্
বিশ্বসৃষ্টিমাঝে! প্রভু সর্ব্বশক্তিমান,
আরো দাও দেখাইয়া ক্ষুদ্রতা আমার,
ব্যর্থতার সুরে ভরি' দাও বীণা-তার
হৃদয়ের! ধীরে ধীরে দৃপ্ত মোর শির
তব পদ-প্রান্তে প'ড়ে হোক্ চিরস্থির!

প্রভুর করুণা কতখানি পেলে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তপে জপে আর ধ্যান ধারণায় যাপিয়া হাজার দিন
মাঠে মন্দিরে প্রতিমা সাজায়ে বাজায়ে ভাবের বীণ,
বারোমাস ধরি' তেরো পার্ব্বণে উৎসব করি' তুমি
প্রভুর করুণা কতখানি পেলে আমার জন্মভূমি।
ভক্তভাবুক বারে বারে এসে শুনালো তোমাবে গান,
কত অবতার বক্ষে ধরেছ তীর্থে করিয়া স্নান!
উপনিষদের জননী এবং গীতার ধাত্রী তুমি,
প্রভুর করুণা কতখানি পেলে আমার জন্মভূমি!
জড়বাদ আর মায়াবাদ হ'তে মুক্ত হবার তরে
এত যে দারুণ সাধনা করেছ লক্ষ বছর ধরে,
কি ফল লভিলে কহিতে পারো কি? এই দুর্দ্দিনে তুমি
প্রভুর করুণা কতখানি পেলে আমার জন্মভূমি!
মহিমা তোমার চির সমাহিত বিদেশীর অভিযানে
গরিমা তোমার ডুবেছে সাগরে লাঞ্ছনা অপমানে।
তব জীবনের আগ্নেয়গিরি—পড়েছে তুষারে ঘুমি,
প্রভুর করুণা কতখানি পেলে আমার জন্মভূমি!

ঘরের বাঁধন ভাঙ্‌লি মিছে

আপনারে তুই আপ্‌নি ভুলে খুঁজিস্ ভোলানাথে,
সেই ভোলা যে তোর মাঝে ভাই দুল্‌ছে ভবেরসাথে।
ঘরের বাঁধন ভাঙ্‌লি মিছে,
শ্মশান সাধন করিস কি যে!
কুহেলিকার মন্ত্র পিছে
ভুলের কুসুম গাঁথে।

তোর ঘরে সে অরূপ হয়ে রূপের রসে রয়,
মায়ার খেলায় খেল্‌ছে সে জন, মায়ার বাঁধন নয়।
অগমলীলা চল্‌ছে প্রাণে,
যেজন প্রেমী সেইতো জানে
বেভুল হয়ে বাহির পানে
ছুটিস্ দিবস রাতে।

রূপান্তর (গল্প)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীপতির সংসার ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে দু'জনের মতভেদটাই প্রথম বছর কয়েক শাশুড়ী বউয়ের ঝগড়ার প্রধান স্থান দখল ক'রেছিল। অন্য কোন তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে কথান্তর আরম্ভ হলেও কলহটা তুমুল হয়ে উঠত সেই পুরাতন এবং অপরিবর্তনীয় মতানৈক্যে।

হেমাঙ্গিনী বলতেন, 'তোর জন্যই তো এমন হোল, দিনরাত কেবল খাই খাই, 'দাও দাও' করেই তো বাছাকে তুই ভিটেছাড়া করলি, না হ'লে এমন ভরা সংসার এমন কচি কচি ছেলে মেয়ে ফেলে কেউ বিবাগী হয়ে পথে বেরোয়? এই কি তার বিবাগী হওয়ার বয়স?'

পুত্রবধূ সরমা জবাব দিত, "ঘর যে সে কার জন্য ছেড়েছে সে কথা দেশশুদ্ধ লোক জানে, রাতদিন তো কেবল এই মন্ত্র দিয়েছ বউয়ের এটা ভালো না ওটা খারাপ, খাওয়ার জিনিস দেখলে জিভ দিয়ে জল পড়ে, পর-পুরুষ দেখলে চোখের পলক পড়ে না। সতীন হয়েও যা মানুষে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারে না, শাশুড়ী হয়ে তুমি তাই করেছ। ঘেন্নায় মরে যাই। এখন মন্ত্র জপ না ক'রে, মনের সাধে ঘর কর না ছেলে নিয়ে? আমিই যদি তাকে ঘরছাড়া ক'রে থাকি, বেশ করেছি উচিত করেছি।

হেমাঙ্গিনী প্রতিবাদ করে বলতেন, "এসব কথা আমি বলেছি? তোর নিজের মনে আছে পাপ, আর বদনাম দিচ্ছিস আমার নামে, হে ভগবান, হে আকাশের চন্দ্র সূর্য্য তোমরাই সাক্ষী।'

সরমা এর পর হঠাৎ একটু হাসত, 'থাক, থাক, তাদের চেয়েও বড় সাক্ষী আছে আমার দু'ট কান, তবু যদি নিজের কানে না শুনতাম।'

হেমাঙ্গিনী এক মুহূর্ত অবাক হয়ে পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ঝগড়ার মাঝখানে কণ্ঠকে নীচু পর্দ্দায় নামিয়ে এমন মধুর করে একটু হাসবার অপূর্ব্ব কৌশল শুধু যে তিনিই জানেন না তাই নয়, সরমা ছাড়া আর কাউকে এমন কৌশল অবলম্বন করতে তিনি দেখেনও নি। কিন্তু না দেখলে হবে কি, এটুকু তাঁর বুঝতে বাকি থাকত না যে এই একফোটা হাসির কাছে তাঁর সমস্ত ঝাঁঝালো কটুবাক্যই নিতান্ত জোলো এবং হাস্যকর হয়ে গেছে।

কিন্তু দু'একটি বছর ঘুরে আসতে না আসতেই ঝগড়ার বিষয়টা বদলাতে সুরু করল। শ্রীপতির কথা প্রায় ওঠেই না। সরমা আজকাল বলে, "লজ্জা করা উচিত। আমার বাবা হাত তুলে দু'মুঠো দেয় তবে এক সন্ধ্যা জোটে। এর পরও জোট বেঁধে ঝগড়া করতে আসতে আমি তো পারতুম না। একবার ভেবে দেখতুম এতখানি গলার জোর কার ভাতের জোরে।'

কথাগুলি হেমাঙ্গীর বুকে গিয়ে বাজে। একমুহূর্ত্ত তিনি যেন কথা খুঁজে পান না। তারপর আবার সুরু করেন, 'থাক বড়লোক বাবার বড়াই আর করিসনে, মাস অন্তে পাঠায় তো দশটি টাকা, তাতে তোর আর তোর ছেলে মেয়েরই কুলোয় না, তা আবার অন্যে খাবে। কত বড় অন্তর কত বড় বিবেচনা তোর বাপের। ও গল্প পাড়ায় গিয়ে করিস, আমার কাছে করতে আসিস নী। আমি আমার স্বামী-শ্বশুরের ভিটায় থাকি। তাঁরা যা রেখে গেছেন তাতেই আমার চলে। তোর বাপের খরচে তুই-ই খাস আর কেউ তা বাঁ পায়েও ছোঁয় না।'

স্বামী-শ্বশুরের সম্পত্তি হিসাবে বিঘা তিন চারেক ধানী জমি, বাড়ীর লাগা একটা বাঁশঝাড় এদের আছে। ধান যা পাওয়া যায় তাতে মাত্র বছরের মাস দুই আড়াই যায়, আর বাঁশ ঝাড়ের বাঁশ বিক্রি করেও সামান্য কিছু হয়। না হ'লে কেবল সরমার বাবা হীরালাল ঘোসের প্রেরিত দশটি টাকায় চারিটি ছেলেমেয়ে এবং দুটি স্ত্রীলোকের চলবার কথা নয়। সরমাও তা বোঝে। সত্যি বলতে কি বৃদ্ধ পিতা তার সম্বন্ধে যে এমন অবিবেচক এবং কৃপণ হবেন তা সে ধারণায় আনতে পারে নি। পাছে সে আরও টাকা দাবী করে, কিংবা ছেলে-মেয়ে নিয়ে দু'চার মাস বাপের বাড়িতে আসবার ইচ্ছা জানায় সেই ভয়েই যে তার বাবা এই বছর কয়েকের মধ্যে একবার এসে খোঁজটি পর্য্যন্ত করেন নি তা সে জানে। এর জন্যে বাপকেও সে ক্ষমা করে না। বাপের বাড়ীর সম্পর্কে অন্য যে দু'একজন আত্মীয়-স্বজন আছে তাদের সঙ্গে কদাচিৎ দেখা সাক্ষাৎ কি চিঠিপত্রের বিনিময় হলে বাপের হৃদয়হীনতা সে নির্ম্মমভাবেই সকলের কাছে প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু হেমাঙ্গিনীকে খোঁচা দেওয়ার সময় এই দশ টাকাই হাজার টাকার কাজে আসে। আর এই সব কথা প্রায়ই তোলে খাওয়ার সময় সংসারের সমস্ত কাজকর্ম সেরে, সরমা ছেলে মেয়েদের নাইয়ে খাইয়ে দিয়ে বেলা দুটো আড়াইটের হেমাঙ্গিনী যখন হবিষ্য করতে বসবেন; সরমা, যেন সেই সময়টার দিকে তাক করে থাকে। এমন দিন খুব কমই যায় যেদিন ভাতের থালায় হেমাঙ্গিনীর চোখের জল পড়ে না।

সরমা নির্ব্বিকারভাবে নিজের এই নির্ম্মমতা উপভোগ করে। তার কথার ঝাঁঝে হেমাঙ্গিনীর মত মানুষেরও যে চোখ দিয়ে জল বেরোয়, এ যেন সরমার এক পরম কৃতিত্ব। যে ক্রূর ভাগ্য তার সঙ্গে নিষ্ঠুর খেলা খেলেছে তার প্রতিনিধি যেন সমস্ত একমাত্র হেমাঙ্গিনী। সমস্ত অন্যায় সমস্ত অবিচারের প্রতিশোধ হেমাঙ্গিনীকে নির্য্যাতনের দ্বারাই যেন নিবৃত্ত হবে। আর যদি কোন দোষ তাঁর না-ও থাকে, এই তো যথেষ্ট যে শ্রীপতিরই মা হেমাঙ্গিনী, যে শ্রীপতি চারটি শিশুসন্তান আর নিঃসহায় যুবতী স্ত্রীকে এমন ক'রে ফেলে রেখে বেরিয়ে যেতে পারে!

কী এমন পাপ করেছে সরমা যে তার জীবন এমন ক'রে ব্যর্থ হয়ে গেল? এ প্রশ্নের জবাব যে-ভাবেই হোক শ্রীপতির মা হেমাঙ্গিনীর কাছ থেকেই সরমা আদায় করে ছাড়বে। কেন না শ্রীপতিকে জিজ্ঞেস ক'রে এর কোন উত্তর মেলে নি। সম্পর্কিত এক দেবরকে সঙ্গে ক'রে শ্রীপতির আশ্রম পর্য্যন্ত সরমা ধাওয়া ক'রেছিল। স্বামীর সহস্র বাধা সত্বেও তাঁর পায়ের উপর মুখ রেখে সরমা জিজ্ঞেস ক'রেছিল, "সত্যি ক'রে আমার গা ছুঁয়ে বল, কি দোষে তুমি ঘর ছাড়লে? কী দোষ দেখলে তুমি আমার?"

মাথামুড়ে, কষায় বস্ত্র প'রে শ্রীপতি তার কিছুদিন আগে সন্ন্যাস নিয়েছে। সন্ন্যাসীজনোচিত শান্ত কণ্ঠে এবং স্মিতহাস্যে সে জবাব দিয়েছিল, "তোমার তো কোন দোষ নেই সরমা?"

"তবে মা যে বলেন আমার স্বভাবচরিত্রে তোমার সন্দেহ এসেছিল। বল, তোমাকে ছাড়া এমন কোন পুরুষের সঙ্গে—"

শ্রীপতি জবাব দিয়েছিল, "ছিঃ, মার ধারণা অত্যন্ত ভুল।"

সরমা কিছুটা আশান্বিতা হয়ে বলেছিল, 'তবে? টাকা-পয়সা জিনিস-পত্রের জন্য তোমাকে মাঝে মাঝে বিরক্ত করেছি বলেই কি—কিন্তু সে তো তোমার ছেলে-মেয়েদের জন্য, তোমার সংসারের জন্য। আচ্ছা, তুমি ফিরে চল। আমি আর কোন কিছু যদি তোমার কাছে চাই। তুমি শুধু ফিরে চল।"

শ্রীপতি তেমনি স্মিতহাস্যে বলেছিল, "এ তোমার অত্যন্ত ছেলেমানুষের মত কথা হোল সরমা। সংসারী মানুষ তো ওসব চাইবেই। তুমি নিশ্চিন্ত থেক, আমি যে সংসার ত্যাগ করেছি সে তোমার কোন দোষে নয়। কোন সাংসারিক কারণেও নয়।"

"তবে কেন তুমি এমন ক'রে চলে এলে?"

"সে কথা বুঝবার সময় তোমার এখনো আসেনি সরমা।"

দুঃসহ ক্রোধে সরমার সমস্ত গা জ্বলে গেছে, "বেশ তো, আমার সেই বুঝতে পারার সময় পর্য্যন্তই না হয় তুমি অপেক্ষা ক'রতে।"

"তুমি ধৈর্য্য হারাচ্ছ সরমা, ফিরে যাও। সংসারে কার জন্য কে অপেক্ষা করতে পারে?"

কিন্তু কারো না কারো জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া সমাজ আর ধর্ম্ম কি শিখিয়েছে সরমাকে? ফিরে এসে সরমা শাশুড়ীর সঙ্গে আর এক চোট

ঝগড়া করেছিল। তার আর কোন অস্ত্র নেই, শুধু জিহ্বা, আর কোন শত্রু নেই, শুধু হেমাঙ্গিনী।

কিন্তু মনে হাজার রাগ থাকলেও চব্বিশ ঘণ্টা আর মানুষ ঝগড়া করে কাটাতে পারে না। বরং পরম শত্রু নিয়েও মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একত্র বসবাস ক'রতে হ'লে জীবনযাত্রার প্রয়োজনে তার সঙ্গেও শত্রুতা ছাড়া আর এক ধরণের সম্পর্ক গড়ে ওঠে; হেমাঙ্গিনী আর সরমার মধ্যেও তেমন একটা সম্পর্কের সূচনা দেখা যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে দেশে খাদ্যাভাব ঘটল। অভাব যত বাড়তে লাগল, দুজনার মধ্যে ঝগড়াও তত প্রচণ্ড হয়ে উঠল। ঝাঁড়ের বাঁশ এবং ভিটা-বাটার গাছপালা বিক্রির টাকার সঙ্গে বাপের দেওয়া দশটাকা ভাতা যোগ ক'রেও যখন ছেলেমেয়েগুলির সামনে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল, তখন সরমার দৃষ্টি গেল হেমাঙ্গিনীর ওপর, কী প্রয়োজন আছে এই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির বেঁচে থাকবার? সরমার ছেলেমেয়েদের মুখের গ্রাসে ভাগ বসানো ছাড়া সংসারে বেঁচে থেকে সে আর কোন কাজটা করছে? আর যদি বাঁচবার এত সাধই থাকে, অন্য কোথাও গিয়ে বাঁচুক না? হেমাঙ্গিনীর ভগ্নীপতি আছে, বোনপো আছে, সেখানে গিয়ে কাটিয়ে আসুক না দু'মাস?

সরমা একথা পরামর্শচ্ছলে হেমাঙ্গিনীকে দিন দুয়েক বলেওছে। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর কোন পা বাড়াবার লক্ষণ দেখা যায়নি। আরও একদিন প্রস্তাবটা তুলতেই হেমাঙ্গিনী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "আমি যে তোর দু'চক্ষের কাঁটা তাতো অনেক দিন থেকেই জানি। একবেলা যে একমুঠো হবিষ্যি করি তাও তোর প্রাণে সয় না! কেন যাব অন্য কোথাও? আমি কি তোর খাই না পরি?"

সরমা কিছু বলবার আগে জবাব দিয়েছে কণা, সরমার বছর দশেকের মেয়ে, "শোন মা, ঠাকুরমার কথা শোন, বলে একমুঠো হবিষ্যি করি। রোজ চুরি মেপে মেপে তুমি যে আধসের ক'রে চাল নাও, তা যেন আমরা আর দেখি না?"

সরমা মুখ টিপে হেসেছে, "তুই চুপ কর কণি।"

"হ্যাঁ মা, সত্যি। আমি রোজ দেখি।"

হেমাঙ্গিনী কিছুক্ষণ বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে রয়েছেন, তারপর জবাব দিয়েছেন, "তা তো দেখবিই। সাপের পেটে সাপ ছাড়া আর কি হবে? কথাটা মেয়েকে শিখিয়ে না দিয়ে নিজে বললেই হ'ত।" কণার কথায় সরমা মনে মনে যে একটু লজ্জিত না হয়েছিল তা নয়, কিন্তু হেমাঙ্গিনীর মিথ্যা অপবাদে সেই লজ্জা ক্রোধে রূপান্তরিত হ'তে সময় লাগেনি, "শিখিয়ে দিয়েছি? বেশ! হাজারবার শিখাব। তোমার সহ্য হয় থাকো, না হয় চলে যাও। ছেলেমেয়েদের কিছু শেখাতে হয় না। ওরা যা দেখে তাই বলে।"

সে-দিনই রাত্রে আবার এই খাওয়া নিয়েই ঝগড়া বাঁধল। শোয়ার আগে হাঁড়ি কুঁড়ি ঝেড়ে কোত্থেকে একমুঠ খই সংগ্রহ ক'রে নিয়ে তাই দিয়ে জল খেতে বসেছেন হেমাঙ্গিনী। সরমা দেখে বলল, "তবে যে বিকালে বললেন, খই ফুরিয়ে গেছে। খাব খাব বলে ছেলেটা অত কাঁদল, একটা কিছু তার হাতে দিতে পারলাম না। দিলেই হোত একমুঠ খই তাকে।"

হেমাঙ্গিনী খই শুদ্ধ বাটিটা ঘরের একধার থেকে আর একধারে ছুড়ে ফেলে দিলেন, "খা, খা, প্রাণের সাধ মিটিয়ে খা।"

ক্ষোভে দুঃখে হেমাঙ্গিনীর ঘুম এলো না। কেবলি মনে হ'তে লাগল—আর কেন। কিসের মায়ায় তিনি এখানে প'ড়ে আছেন? তাঁর ছেলে সংসার ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও তো সমস্ত বন্ধন খসে প'ড়েছে। তিনি না বুঝে এই সব শত্রুপক্ষীয়দের আপন মনে ক'রে মিথ্যা মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছেন। আসলে কেউ এরা তাঁর নয়? এই মুহূর্তে সংসারে কারো জন্যই বিন্দুমাত্র আকর্ষণ হেমাঙ্গিনী অনুভব করলেন না। বরং তাঁর আশঙ্কা হ'তে লাগল এখানে নিজের বাড়ীতেই তাঁকে উপোস ক'রে মরতে হবে।

যেমন সরমা তেমনি তার ছেলেমেয়ের দল! সাপের পেটে আর কতকগুলি সাপ এসে জন্মেছে।

ভোরে উঠে তিনি পাড়ায় বেরুলেন। সরকারদের বড় গিন্নী তাঁরই সমবয়সী। একই বছরে বউ হ'য়ে এই গ্রামে তাঁরা ঢুকেছিলেন। এ পাড়ায় তাঁকেই হেমাঙ্গিনী একমাত্র ব্যথার ব্যথী মনে করেন। আর সবাইকেই তিনি চিনেন। সাক্ষাতে বন্ধনা, অসাক্ষাতে নিন্দা ক'রতে জুড়ি নেই।

হেমাঙ্গিনী কেঁদে বললেন, "আজ দু'দিন ধ'রে আমার মুখে উপবাস যাচ্ছে বিশুর মা! শত্রুরা আমাকে না খাইয়ে খাইয়েই মারবে।"

কলকাতা থেকে বিশু দিন কয়েক আগে ছুটি নিয়ে এসেছিল বাড়ীতে। সমস্ত শুনে সে বলল, "আমার কথা শুনবেন খুড়ি মা? তাহ'লে হয় তো একটা ব্যবস্থা হ'তেও পারে।"

হেমাঙ্গিনী বললেন, "শুনব বাবা শুনব! তুই যা আমাকে করতে বলিস তাই করব।"

বিশু একটু ভেবে বলল, "তাহ'লে আর দেরি নয়। চলুন আপনি আমার সঙ্গে কলকাতায়। সেখানে খিদিরপুর অঞ্চলে আমি যাঁদের কাজ করি তাঁরা এক অনাথ-আশ্রম খুলেছেন। মা-বাপ হারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সেখানে খেতে পরতে দেওয়া হয়। তাদের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন খুব ভদ্রঘরের বয়স্কা স্ত্রীলোক ওঁরা খুঁজছিলেন। আপনাকে সেখানে আমি ঠিক ক'রে দেব। খোরাক পোষাক বাদে মাইনেও পাবেন পনের বিশ টাকা। আপনার কোন ইতস্ততঃ করবার কিছু নেই, বেশ সম্মানের কাজ, তাছাড়া আমিই তো আছি।"

হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ বললেন, "তাই নিয়ে চল্ বাবা, এই শত্রুপুরীতে আর নয়।"

তবু যাওয়ার সময় চোখ দিয়ে জল বেরুল হেমাঙ্গিনীর। স্বামী-শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে এই যে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তাকে বেরুতে হোল, এর মধ্যে পরাজয়ের অবমাননার কথা তিনি ভুলতে পারলেন না। পুত্রবধূর সঙ্গে তিনি পেরে উঠলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁকেও সে বাড়ির বের ক'রে ছাড়ল। যাওয়ার সময় তিনি সরমাকে বলে গেলেন, "এবার মিটেছে তো মনের সাধ? আমার ছেলেকে ভিটা ছাড়া ক'রেছিস্, আজ আমাকেও করলি। এবার মনের সুখে থাক্ একেশ্বর হয়ে। যা খুশী তাই করতে পারবি, কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু আকাশে এখনো চন্দ্র সূর্য্য ওঠে, তারাই সাক্ষী থাকবে। যে আশায় আমাকে তাড়ালি সে আশায় যেন ছাই পড়ে, ছাই পড়ে, ছাই পড়ে।"

আজই গাড়ী ধরবার জন্য নৌকায় করে যেতে যেতে হেমাঙ্গিনীর মনে হ'তে লাগল সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্য হ'য়ে গেছে। কোন আনন্দ নেই, স্বাদ নেই জীবনে।"

মাসখানেকের মধ্যে দুর্ভিক্ষ চরম রূপ গ্রহণ করল। চালের মণ ষাট টাকা সত্তর টাকা; তাও সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। ঘরে সোনা রূপা সামান্য যা অবশিষ্ট ছিল তা বিক্রী ক'রে কাল পর্য্যন্ত চলেছে। থালা ঘটি বাটি কিছু বলতে আর নেই ঘরে। তবু সরমা কাল উঠে সারা হাঁড়ি কুঁড়িগুলি ঝেড়ে ঝেড়ে দেখছে, মনের ভুলে কোথাও যদি কিছু রেখে থাকে।

এই সময় পোষ্ট অফিসের পিওন এসে হাঁকল মনিঅর্ডার। অর্ডার আছে। ছেলেমেয়েগুলি কলরবে চীৎকার উঠল, "মা, মা, এসো শিগগির, টাকা এসেছে। পড়ি কি মরি ক'রে মই বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এল সরমা। "বাবা টাকা পাঠিয়েছে বুঝি?"

না, সরমার বাবা নয়, টাকা পাঠিয়েছেন হেমাঙ্গিনী। কুড়ি টাকা মণি

অর্জ্জন ক'রেছেন। টাকাটা সই ক'রে রেখে তাড়াতাড়ি কুপনখানা নিয়ে পড়তে বসল সরমা।

দেশের অবস্থার কথা সব হেমাঙ্গিনী শুনেছেন। অনাথ আশ্রমের একটি ছেলে রোজ তাঁকে খবরের কাগজ প'ড়ে শোনায়। তার মুখ ঠিক সরমার বড় ছেলে খোকনের মত। সরমা আর তার ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে চোখে ঘুম হয় না হেমাঙ্গিনীর। মাইনে পেলেই সমস্ত টাকাটা তাদের জন্ত তিনি পাঠিয়ে দিতেন। হেমাঙ্গিনীর জন্ত ভাবনা নেই। তাঁর ওখানে কোন খরচই লাগে না। তিনি দিদুকে ব'লে কয়েক দিনের মধ্যেই আরও কিছু টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। সরমা যেন ছেলেপুলে নিয়ে সাবধানে থাকে। কোন চিন্তা ভাবনা যেন না করে সরমা। হেমাঙ্গিনী বেঁচে থাকতে সরমার ভয় কিসের?

হেমাঙ্গিনীর এমন স্নেহ আর সহৃদয়তা সরমার কাছে অপ্রত্যাশিত। এই টাকা কয়টি না পেলে ছেলেপুলে নিয়ে উপোস করা ছাড়া আজ আর সরমার সত্যিই গতি ছিল না। সমস্ত রাত আর সকাল কুড়াবার ছুটাছুটির পর এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করল সরমা। কিন্তু এখন নিরুদ্বেগ স্বস্তির মধ্যে হঠাৎ কুপনের একটা লাইন তার কানের ভিতর বেজে উঠল এবং তার আওয়াজ সম্পূর্ণ মধুর ঠেকল না। হেমাঙ্গিনী বেঁচে থাকতে সরমার ভয় কিসের? এ যেন হেমাঙ্গিনী নয়, সরমার স্বামী আগেকার সেই শ্রীপতির গলা। এই বুড়ো বয়সে অনাথ আশ্রমে কুড়ি টাকা মাইনের চাকুরী নিয়ে কী এমন পেয়েছেন হেমাঙ্গিনী, যাতে তিনি রাতারাতি শ্রীপতি হ'য়ে উঠতে পেয়েছেন?

তোমারই (উপন্যাস)

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

দুর্ব্বল মন সবল চিত্র আঁকে, গরীবের সংসার, অর্থের অভাব, অনর্থের প্রাচুর্য্য। আজ চাল নেই, কাল স্কুলের মাইনের টাকা নেই, পরশু বাজারের পয়সা নেই—এমনি হাজার রকম অভাব, হাজার রকম অনটন, কিন্তু তার মধ্যে পরিপূর্ণতা আছে ঐ ছেলে জ্যোতি। ওকে কেন্দ্র করেই সংসারটা ঘোরে, কাজেই ওকে নিয়েই সকলের ভাবনা। একদিন ও বড় হবে, দশজনের একজন হবে—এমনি ছিল আশা। দারিদ্র্যের প্লাবনে ভেঙে যাওয়া ওদের সংসারের সুখের উজান বইবে এই আশাটিকে সহজ প্রাণশক্তি দিয়ে ঘিরে; জ্যোতি বড় হয়ে উঠল, শুধু বয়সে নয়, বাইরের পৃথিবী, বন্ধু মহল, অধ্যাপকদের মনে এবং গোলামীর কাঠগড়ায়।

দেখতে দেখতে আয়ের টাকাও ওর ঘরে এল থলে ভোরে। সকাল বিকাল সকলের মনে চমক লাগিয়ে ও গোলামী করতে গেল সাহেব বাড়ীতে। কোন এক বড় সাহেবী ব্যবসাদারের দোকানে ওর মেধা এবং ওর কর্ম্মশক্তির উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল ইউরোপীয় অ্যাসিষ্টাণ্ট গ্রেড পদোন্নতি হবার সঙ্গে সঙ্গে। জ্যোতি দাসত্বের শৃঙ্খলটা পরল ভালো করেই, লোকে বাহবা দিল, বললে বাঙালীর ছেলে সাহেবী গ্রেডে চাকরী! মেয়ের বাবা, মামা, কাকারা নিলেমের ডাক ছাড়লেন, দাম উঠল হাজার পঁচিশ। সাহেবী দোকানের চারশো টাকা পাত্রীমহলে যাট গুণ হয়ে উঠল, সঙ্গে গাড়ী এবং চারতলা বাড়ী। সব এড়িয়েই অনিতা এল, টাকার রথে নয়, যৌবনের রঙ মাখানো সৌন্দর্য্যের চকমকি আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও যাকে পাওয়া গেল না, বিনা পণেই তার ভবিষ্যৎ গেল বিকিয়ে।

অনিতাকে প্রথম দেখার দিন থেকেই মার মনে একটা গোপন আশা বাঁধল বাসা। অনিতা কল্যাণীরূপে এসে সংসারের লক্ষ্মীর আসন কায়েম করবে, মনে মনে এই আশাটা জ্বলে উঠে অন্ত সব কথাকে ঝলসে দিল।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এল এগিয়ে। সানাই বাজল, বাড়ীতে বাড়ীতে গেল চিঠি, মেয়েদের মনে লাগল নানান গল্পের নেশা, মুখে মুখে নানান রূপ নিয়ে নানান কথা ছড়িয়ে পড়ল। কেউ বললে—অনিতা জিতল, কেউ বললে জ্যোতি। বন্ধু মহলে চাঞ্চল্য সব তাতেই বেশী প্রবল হল, অমন সুন্দরী স্ত্রী কারো হয় নি। কিন্তু মজা এই যাকে ঘিরে এত চাঞ্চল্য সেই জ্যোতিই রইল নির্ব্বাক। মুখে মুখে ওদের বরাতের হিসাব হল বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের হিসেবটা রইল বাকী! সব মিলিয়ে জ্যোতি অবলম্বন করলে ষ্ট্রিক্ট নিউট্রালিটি, ফলে সমস্ত ব্যাপারটা হয়ে রইল মিষ্টিরিয়াস।

সানাই বাজল, নানান রকম লোকের ভিড়ে বাড়ীটা একটি রাতের জন্যে সগর্ব্বে উঠল হেসে! বাইশ বছরের ছেলে একটি দিনের জন্যে পর হয়ে গেল জামাই সেজে। আলোয় কমলে ফোটা মুখের ওপর বড় বড় সাদা চন্দনের ফোঁটা গেল মিলিয়ে, লাল ফোঁটা পেল লজ্জা। মাসী মামীর দল থেকে কে যেন ঐ ব্যাপার দেখে বললে, "দয়াময়ীর ফোঁটা গেল যে হারিয়ে, লাল চন্দনের ফোঁটাই না হয় দাও আরও দু' একটা বেশ ভাল করে, নইলে এত চন্দন, এত আয়োজন, কিছুই বোঝা যাবে না।

দয়াময়ী সগর্ব্বে বললেন, সত্যি। ওর মামাতবোন বললে, বোল না অমন করে, অমন কথায় মাথাটা ওর যাবে গুলিয়ে।

জ্যোতি কিন্তু মাসীর কথাই মনে মনে ভাবছে। সত্যিই ত', এত আয়োজন, এত চন্দন, কিন্তু বোঝা ত গেল না।" বোঝা যাবে কি করে, বোঝা যে ওর মনের পরদার পরদায় সোনালী দাগ কেটেছে! ওর বোঝা যে ওর ভালবাসার বোঝা, পাঁচটি বছর যাকে প্রত্যেকটি দিনে ভালবাসার নতুন দানে ষোড়শপচারে পূজা করেছে সেই পূর্ণিমাকে ও ভুলবে কেমন করে।

জ্যোতি আজকের দিনের অপরিসীম আয়োজনের মধ্যে আর পাঁচজনের অপর্য্যাপ্ত আনন্দের মধ্যে দেখতে পেল পূর্ণ জ্যোৎস্নার নিষ্কম্প কল্লোল! আশ্চর্য্য মেয়ে পূর্ণিমা, পাঁচ বছরেও যেমন

তাকে বোঝা গেল না, আজকের নতুন জীবনের প্রারম্ভেও তার বোঝা মন থেকে নামিল না! ওর মনে একটা ভয় আজ আবার নতুন করে নিজেকে প্রসারিত করলে। সত্যই কি পূর্ণিমা ওর মনে ওর জীবনে বোঝা হয়েই রইলো?'

শাঁখের শব্দটা ওর কানের কাছেই বেজে উঠল। মামাত বোন ভয়ানক দুষ্টু, বললে, মহাশয় কি শ্রীমতির পণ করেছেন? সবে ত কলির সন্ধ্যে, কলিটি যখন ফুল হয়ে ফুটবে, রজনী—গন্ধা হয়ে তখন ত তাহলে আর মহাশয়কে পাওয়াই যাবে না! জ্যোতি ম্লান দৃষ্টিতে একবার খালি চাইল, কোন কথা বললে না। বলতে পারত, "মায়া মনটা মরিচীকার পেছনেই শুধু ছুটেছে, ক্লান্ত হয়ে পড়বে যখন, তখন কি হবে উপায় তাই ভাবছি!" এ কথা বলে ও মায়ার আনন্দের অবগুণ্ঠনখানাকে লুণ্ঠন করতে পারলে না।

শাঁখ বাজল, মেয়েরা দিল উলু, মাকে প্রণাম করে জ্যোতি উঠে দাঁড়াল, বললে, 'যাই মা বৌ আনতে?'

দয়াময়ী কোন কথা বললেন না, স্থির দৃষ্টিতে চাইলেন ছেলের দিকে।

ভাবছেন কি? কি হল? কেমন হল। ঠিক না ভুল! সুখী হবে ত?

যাত্রা শুধু জীবনের নয়, দুঃখেরও।

তার পরের দিনগুলো বাদ দেওয়াই ভাল। দুর্ব্বল মন যার, কি করে তবু ভোলা যায় যা তোলা আছে মরমের মজ্জায় মজ্জায় …ঘরখানা ধ্যানে বসেছে। দয়াময়ী আর জ্যোতি দু'জনে দুদিক দিয়ে মনের ভাজ তুলছে, একজন অতীতের দিনগুলো উলটে পালটে, আর একজন বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতের হিসেব নিয়ে!

বাইরে আলোর দীপ্তি গেছে কমে, শীতের কৃপণ রাত্রি নামছে ধীরে ধীরে।

কি ভাবছ মা? জ্যোতি বললে, রোগা শরীর নিয়ে অত ভাবলে শরীরটা যে ঘা খাবে।

দয়াময়ী হাসলেন, বললেন, "ঘা খাবার জায়গা কৈ জ্যোতি? যা পাবার তাত অনেক আগেই পেয়েছি।"

থামান যাবে না মাকে, মনকে নাড়া দিয়েছে আজ চার বছরের প্রত্যেকটি দিনের কথা—প্রহরে প্রহরে রূপ বদলে যে সব কথা নতুন আঘাত হেনেছে। যারা আঘাত দেয় তারা ভুলে যায় কিন্তু যারা পায় তারা ভোলে না, এমন বিচিত্রই আঘাতের দেওয়া নেওয়ার ধারা।

দয়াময়ী বলতে আরম্ভ করেন, জ্যোতি, কতরাত কতদিন ভেবেছি, অনিতাকে নিয়ে মন আমার কত নতুন খেলাই খেলেছে কিন্তু নতুন পথ কৈ? তোর জীবনের রথ অচল হয়ে আছে এ কি আমি জানি না।

কি যে বাজে বকছ মা, জ্যোতি অন্যমনস্ক হয়ে হতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, কি যে তুমি বল আমি কিছু বুঝেই উঠতে পারি না।

'বুঝবে কি করে' দয়াময়ী বলেন, 'তোর মনের যে বোঝা তার আদ্দেক ও আমার বোঝার ভুলের দোষ! অনিতাকে ভুল বুঝে ছিলাম, ওর আসল পরিচয়টাকে নিজের মনের কল্পনায় ঢেকে ফেলেছিলাম। ও যা তা ত' আমি দেখিনি, আমি যা চেয়েছিলাম, বার বার সেই রূপেই ওকে মনে এঁকেছিলাম, ওকে মনে মনে গড়েছিলাম ঠিক তেমনি ভাবে যেমন ভাবে ওকে ঠিক মানায়। কল্পনার আলোয় ওকে উজ্জ্বল ক'রে সঙ্গোপনে ওর আসনে ওকে বসিয়েছিলাম, কিন্তু ওর তা সইল' না।

দয়াময়ী বলে চলেন, আমার কল্পনাকে আমার আশা আকাঙ্খাকে ও চূর্ণ করে দিলে নিজের পূর্ণতার অহঙ্কারে। ঘর ভাঙল, সংসার ভাঙল, ভাঙল জীবনের রথ, থামল' গতি, হারাল' পথ, সব বিপথে গিয়ে হল বিকল। তাই ত' ভাবছি জ্যোতি, দয়াময়ী কিছুক্ষণ পরে আবার বলতে আরম্ভ করেন, জীবনের কবেকার ছোট্ট একটা ভুলের বোঝা আজ যে এমন ভাবে অসহ্য হয়ে উঠবে তা ত' পারি না ভাবতে! কি ভুলই করেছিলাম তোর জীবনের পূর্ণিমাতে কল্পনার অন্ধকার দিয়ে আড়াল ক'রে? তার জন্যে ভগবানও বুঝি ক্ষমা করলেন না, অনুতাপে আমার জীবন গেল, তা যাক, কিন্তু আমার শেষের সঙ্গেই যে তোর জীবনের আরম্ভ তা ভুলি কেমন করে! সুরুতেই আমার ভুলের বোঝা, পথ চলার কেমন ক'রে? তাই বলছি জ্যোতি, তুই আবার নতুন করে চন্দন পর, নতুন সুরে সানাই বাজুক, নতুন সুরে জীবনটা পূর্ণ হ'ক, নতুন মানুষের চরণস্পর্শে সংসারটা নতুন করে বাঁচুক—পূর্ণ হ'ক, আমার ভুলের বোঝা চূর্ণ হ'ক। পাঁচজনের নিন্দেতে কটু কথায় হ'ক আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

দয়াময়ী চুপ করলেন। সমস্ত আকাশ বাতাস তখন করছে দয়াময়ীর কথার প্রতিধ্বনি, জ্যোতির মনে কে যেন বলে চলে, "আমার কল্পনায় যে ছিদ্র ছিল, তোর মধ্যে তা থাকবে না, নতুন সুরে বাঁধ বীণা, দুঃখের বাঁধ ভেঙে আসুক তোর জীবনের কল্যাণী, বইয়ে দিক প্লাবন, ঘুচিয়ে দিক যত গ্লানি, আমার ঠাকুর ঘরের প্রদীপ শিখা নতুন প্রাণে দিক পূর্ণ করে! আহ্বান করুক সে সন্ধ্যার আশীর্ব্বাদ, বিশ্বের পথিক পুরুষকে দিক সংসারের স্নিগ্ধ ছায়া, সভক্তিতে তোকে দিক প্রণাম, নিক দেবতার আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে কাজে কর্ম্মে।…

তোর মনের মতন কল্যাণীকে নিয়ে আয়, তোর ভালবাসার স্রোতে সে আসুক হেসে, আমি মরবার আগে তাকে বরণ করে নি, বুঝিয়ে দি সংসারের বোঝা, হাতে তুলে দি তোদের জীবনের সোনার চাবি!

দয়াময়ী আবার বলতে আরম্ভ করেন—ক্লান্ত দেহ, পরিশ্রান্ত আমার মন, সামনে দেখতে পাচ্ছি তারায় তারায় আমার যাবার আহ্বান, ডাক আসছে বার বার, বার বার আমার ঠাকুর ডাকে

দিচ্ছেন ফিরিয়ে। আমার মনের বোঝা হাল্‌কা না হ'লে আমার ওপরের পথে পড়বে কাঁটা, তোর জীবনের পরক্ষ অশান্তির ওপর পা ফেলে আমি চলব কেমন করে! এ পারের পথ যেমন তোর আমার, তোর মুখ চেয়ে সহজ হল, ওপারের পথ তেমনি তোর শান্তির ছায়ায় স্নিগ্ধ হ'ক!··আমার সংসারের ঠাকুর বড় অভিমানী, কল্যাণীর পূজো না পেলে তার মান ভাঙ্গে না। সে যে আমার পাগল ঠাকুর, নিজেকে দিয়ে যে পূজো, সে পূজো না পেলে তার মন ওঠে না। স্বভাব তার মন্দ, কঠিন তার অভিমান, গলবস্ত্র না হ'লে তার মান ভাঙ্গে না, সন্ধ্যার শ্লোক না পড়লে তার ঘুম আসে না! এমনই দুষ্টু সে, আদর করে মিষ্টি, কথা না বললে সে খায় না, আজ ভাবচি তাই, তোর জীবনে নতুন করে কল্যাণীর ছায়া না পড়লে আমার সেই পাগল ঠাকুরকে দিয়ে যাব কার হাতে!

আবহাওয়া হাল্‌কা করবার জন্যেই জ্যোতি বলে, আমার সঙ্গে ত তার বেজায় মিল, তোমার দুষ্টু ঠাকুরটি ত' তা' হ'লে ঠিক আমারই মতন! তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো বাপু, তোমার ছোঁয়া না পড়লে আমার দিনের কাজে ফাঁক থেকে যায়। যেন দোল পূর্ণিমাতে তিথিমতে রঙের বারণ!

দয়াময়ী তারই রেশ টেনে বলেন, ঠিক তাই, আমার ঠাকুর তোর রূপের আড়ালে বন্দী, স্বভাবটা ঠিক তোরই অনুকরণে, তাই ত' পারিনি তোর মনটাকে জানতে। মনে তাই ত' আমার ভাবনা, তোদের দু'জনের সেবায় ফাঁক থাকতে দিলে মন মানবে কেন? এমন লোক চাই যে জানবে খালি তোদের দু'জনকে। তোদের দু'জনকে নিয়ে হবে তার প্রহরে প্রহরে লুকোচুরী খেলা। তোর সেবার মাঝে তাঁর পূজো, তোর রূপের আড়ালে তার দৃষ্টি। এমন কাউকে চাই—যে বলতে পারবে, 'যাও দুষ্টু, অভিমান বুঝি তোমার ওপর করতে পারি না?' কোথায় আছে আমার সেই মেয়ে, যে স্বামীর কপালে দেখবে ঠাকুরের দীপ্তি, যে স্বামীর হাসিতে দেখবে আমার মদনগোপালের মনচোরা রূপ! তাকে না পেলে আমার ত চলবে না—আমার যাবার বেলায় সব ঠাকুরকে একলা ফেলে যাব' কেমন করে? আমি যে দেখতে পাচ্ছি তাদের আঁধার করা অভিমানী ছবি! সৃষ্টি তাদের অন্ধকার, প্রদীপ জ্বালাবে কে?··

জ্যোতি স্তব্ধ। তন্দ্রহারা রাতের তারার মতন শুধু শুনছে। মার চোখের তলায় জমে ওঠা বড় বড় ফোঁটা অন্ধকারে দেখা যেত না, যদি না সামনে জ্বল-জ্বলে তারার প্রতিবিম্ব আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত'!

অনিতাকে ঘিরে, এই যে অনুতাপে জীবনের অনুপরমাণু পুড়ে ঝলসে যাচ্ছে, এটা কার দোষ, কার ভাগ্যের লীলা খেলা? মা যা চেয়েছিলেন ও নিজেও ত চেয়েছিল তাই! তবে দু'জনকার চাওয়া কেন ব্যর্থ হ'ল একজনকার স্বার্থের অন্ধকারে? এ কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত?

আজ তাকে কেন্দ্র করে এই যে অনিশ্চয়তা ঘুরছে বিভীষিকাময় রূপ নিয়ে এ কার পাপে? আজ জ্যোতিরও চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে হ'ল, "হতভাগী এমনি ক'রে নিজেকে নিঃস্ব ক'রে হারালি?"···

বাইরের রাত্রি শীতে আলোড়িত, সেও নিজেকে হারিয়েছে নিস্তব্ধতার মধ্যে! খুঁজে মরছে কাকে, চাইছে যেন কিন্তু চারিদিকে তার ঐ একই সুর, নেই, নেই, নেই···

জ্যোতির মন তখন ছুটে চলেছে, মার কথাগুলো ঠেকছে পায় পায়···নিস্তব্ধ ঘরখানায় ক্যর কথার প্রতিধ্বনি···নতুন সুরে বীণা, নতুন সুরে সানাই, নতুন মানুষের চরণধ্বনি, ঠাকুরের মান ভাঙাবার জন্যে সন্ধ্যার শ্লোক·· প্রদীপ···নতুন জীবন···মানবী···

কোথায় পাবে তাকে?

আজকালকার নকল যুগের মানুষ—শুধু মনের বাইরে নয়, ঠাকুরকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে ঘরের বাইরে। প্রদীপ অবহেলায় ঠাকুরের চরণ ছেড়ে উঠে গেছে টেবিলের ওপর, সন্ধ্যা ঘরের অন্ধকারে পা টিপে টিপে না এসে, চায়ের আসরে আসে রঙে রঙে নেশা ধরিয়ে! এমন দিনে কোথায় সেই কল্যাণীর ছায়া, কোথায় তার আভাষ?···

কোথায় সেই নববধূ? কোথায় সেই মানবী? যার সর্বস্ব লুকিয়ে আছে দেবতার ছন্দে ছন্দে, যার শ্রী ঘুমিয়ে আছে সর্বস্বর প্রাণে, যার প্রদীপ ঘুমিয়ে আছে নিজের মনের গহন কোণে? যার হাতের ছোঁয়ায় আছে পৃথিবীর সব অশান্তির শেষ, যার মুখের কথায় আছে মধ্যম মীড়ের মূর্চ্ছনা, যার দৃষ্টিতে আছে ভালবাসা, আছে সন্ধ্যার বিশ্বজোড়া বৈশিষ্ট্য! যার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আছে নব প্রভাতের প্রথম কথাটি,—যার নামে আছে প্রথম রেখার কোমল দোলা, যার অভিমানে আছে অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মির গোপন কথাটি! কোথায় আছে সেই মানবী?

জ্যোতির ভাবনা থমকে দাঁড়াল'। আশ্চর্য্য, সুলেখা ওর মনটিকে এমন করে রাঙিয়ে দেবে? মার মনের কথা ও মনে মনে মিলিয়ে নিল' সুলেখার মাধুর্য্যের সঙ্গে। সুলেখাকে কল্পনা করে যে ভাষা ছুটে চলে, তারই প্রতিধ্বনি ওর মার কথায়।

পাশের ঘরের প্রদীপটা নতুন আলোকে নতুন জ্যোতিতে জ্বলে উঠল···

সুলেখা কি নতুন ক'রে তাকে জ্বালিয়ে দিল?

(ক্রমশঃ)

নবীন ঘোষাল (গল্প)

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

নবীন ঘোষাল লোকটা একটু অদ্ভূত প্রকৃতির। সে যে কাজ উচিত মনে করিবে, তাহাতে সে মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিবে; কিন্তু যে কাজ সে উচিৎ মনে করিবে না, তাহাতে মারামারি কাটাকাটি করিয়াও কেহ তাহার নিকট হইতে একটি পাই পয়সাও বাহির করিতে পারিবে না।

নবীনের পৈতৃক বাড়ীখানা একান্তই শ্রীহীন ও ভাঙ্গাচোরা ছিল বটে কিন্তু নগদ টাকার সে না কি কুমীর ছিল। সংসারে কেহই তাহার ছিল না। প্রায় ৪০ বৎসর বয়স হইলেও এ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই। কেহ বিবাহের কথা বলিলে বলিত—"বিবাহের কোন প্রয়োজন নাই। বিবাহ না করিয়াও যখন চল্লিশ বৎসর কাটিয়াছে, তখন বাকী জীবনও কাটিয়া যাইবে।" ভগ্নজীর্ণ বাড়ীখানার মেরামতের কথা কেহ তাহাকে বলিলে নবীন বুদ্ধিমানের মত মাথা নাড়িয়া উত্তর করিত—"প্রয়োজন নাই; এই বাড়ীতেই থাকার ত কোন ব্যাঘাত হইতেছে না।" কিন্তু নবীনের নাকের উপর একবার ছোট একটা ব্রণ হইয়াছিল; হয় ত তাহাতে একটু চুণ লাগাইয়া রাখিলেই সারিয়া যাইত; কিন্তু নবীন ব্যস্ত হইয়া কর্ণেল নলীক্যাক্ নামে এক সাহেব ডাক্তারকে 'কল্' দিয়া সর্ব্বরকমে ২৩৭।/১৫ ব্যয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু পাড়ার যুবকের দল কিছুদিন আগে একটা লাইব্রেরী করিবার জন্য তাহার কাছে কিছু চাঁদার জন্য আসিলে নবীন কহিয়াছিল—"লাইব্রেরীর কোন প্রয়োজন নাই।"—সুতরাং চারিগণ্ডা পয়সাও তাহারা তাহার নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে পারে নাই। এই প্রকারেই নবীন ঘোষাল তাহার দিন কাটাইয়া আসিতেছিল এবং ভবিষ্যত হয় ত এইভাবেই কাটাইয়া যাইত, কিন্তু তাহার স্থির সংসার-সাগরে তরঙ্গ তুলিল—তাহার ভাগিনা আসিয়া। ভাগিনার নাম—হরিশ। হরিশ তাহার অপেক্ষা আট-দশ বৎসরের ছোট।

হরিশ চতুর লোক; আসিয়া কহিল—"সংসারে একলা থাকাটা ভাল নয়, আপদ আছে, বিপদ আছে, কিছু ত বলা যায় না। তাই ভাবলুম, আমারও ত কোন কাজকর্ম্ম নেই, মামার কাছেই গিয়ে থাকি।"

নবীন বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া কহিল—"ঠিক কথাই বলেছ, আপদ আছে, বিপদ আছে। তা, তুমি এসে ভালই করেছ হরিশ।"

সুতরাং হরিশ মামার কাছে দিব্যি থাকিয়া গেল এবং দুই চারিদিনের মধ্যেই দিব্যি পাড়ার লোকের সঙ্গে ভাব-সাব করিয়া ফেলিল।

একদিন কালীচরণ নামে হরিশের এক বন্ধু হরিশকে কহিল—"মামাটিত টাকার কুমীর, বাড়ী-খানার ত ভাঙ্গা-চোরা অবস্থা। বোলে-বুঝিয়ে একটু মেরামত্-টেরামত্ কোরে ফেল না; ওর অবর্ত্তমানে সবইত তোমার।" হরিশ কহিল—"মাথা-পাগলা গোছের লোক জানত! মতলব খাটিয়ে সবই করাতে হবে, তবে—ধীরে ধীরে, অর্থাৎ ক্রমশঃ।"

ইহার কয়দিন পরেই হরিশ তাহার এখানকার নূতন বন্ধুদের লইয়া কি-একটা পরামর্শ করিল। এবং তাহার পরই মামার কাছে আসিয়া কহিল—"একটা ভয়ানক সু-খবর শুনে এলুম, মামা।"

নবীন জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের সুখবর?"

প্রফুল্ল বদনে হরিশ জানাইল—"সরকার থেকে তোমায় নাকি এবার 'রায় বাহাদুর' টাইটেল্ দেবে?"

প্রথমটায় আশ্চর্য্য, তারপর একটু আশায় এবং আনন্দে নবীন কহিল—"কোথা থেকে শুনলি?"

"শুনলুম, খুব ভাল লোকের মুখ থেকে। রমেনের ভগ্নীপতি হরিদাস বাবু, তাঁর এক মাসতুতো ভাই লাট-দপ্তরে খুব উঁচু পোষ্টে কাজ করেন, তাঁর কাছ থেকেই খবরটা পাওয়া গেছে। তা ছাড়া, কালীবাবুও বলছিলো, সে-ও নাকি কোত্থেকে খবরটা পেয়েছে।"

নবীনের প্রফুল্ল মুখখানা নীরব রহিলেও, সংবাদটায় তাহার অন্তর-মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। কিন্তু খবরটা সত্য না মিথ্যা? কথাটাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে তাহার ভরসা হইতেছে না। তবে একথাটাও তাহার মনে হইতেছিল যে, এ সব সংবাদ প্রায় মিথ্যা হয় না। তবুও এই সুখবরের ঘোল আনা আনন্দটুকু যেন নবীন ইচ্ছাসত্বেও লইতে পারিতেছিল না।

হরিশ মাতুলের 'হার্ট'এ ইনজেকসন্ দিয়া চলিয়া গেল, এবং ইহার ফলাফলের জন্য নবীনের প্রতি লক্ষ্য রাখিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে দোতালায় জীর্ণ বারান্দায় একখানি অতি পুরাতন আরাম কেদারায় বসিয়া নবীন ভাবিতেছিল—"অসম্ভব কিছু না; হ'তে পারে; বরঞ্চ হওয়াটাই স্বাভাবিক। রতনেই রতন চেনে। সরকারের কাছে কি কারো গুণ চাপা থাকে! আমি না হয় আজকালকার ইংরেজী লেখাপড়াটাই শিখিনি, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি আমার যা আছে, তেমন আর ক'টা লোকের ভেতর দেখতে পাওয়া যায়! রায় বাহাদুর—রায় বাহাদুর টাইটেলটা আমার মত গুণী লোকেরই পাওয়া উচিৎ। খবরটা সত্যি বলেই ত মনে হচ্চে। কালীচরণও তা' হ'লে কথাটা শুনেচে। কালীচরণ খবরটা কোথা থেকে শুনলে? নিশ্চয়ই ভাল জায়গা থেকে শুনেচে। কালীচরণটাকে বরাবরই আমি ঘৃণা করি; কিন্তু লোকটা আসলে ভাল। হ্যাঁ, ভাল বই কি, খুবই ভাল; নিশ্চয়ই ভাল; আমিই হয়ত ওকে ঠিক বুঝতে পারিনি।"

নবীন ধীরে ধীরে উঠিল; পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়াইয়া এক-পা এক-পা করিয়া নীচে নামিয়া আসিল; তারপর মন্থর গতিতে কালীচরণের বাটীর দিকে যাত্রা করিল।

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উৎরাইয়া গিয়াছিল। কিছু আগে নবীন ঘোষাল কালীচরণের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ-আলোচনা করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে কালীর বন্ধুরা আসিয়া তাহার বৈঠকখানায় জমায়েৎ হইয়াছে এবং হাসি-তামাসার মধ্য দিয়া নবীন ঘোষালের সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা হইতেছে।

নীলরতন হরিশের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—"তা হোলে তোমার ওষুধে দেখছি ফল ধরেচে!"

হরিশ কহিল—"সেরা ওষুধ লাগিয়েছি, ফল ফলাতেই হবে।"

রমেশ কহিল—"কি রকম অদ্ভুত স্বভাব বাবা! একটা সামান্য ব্রণের জন্যে তিন চারশো টাকা ব্যয় কোরে ফেললে, কিন্তু লাইব্রেরীর চাঁদার জন্য তিনটে পয়সাও আদায় করতে পারা গেল না।"

বিপিন কহিল—"এদিকে সেই আদ্যিকালের অ-ভব্য বাড়ী-খানা ভেঙ্গে পড়েচে, তা কিছুতেই মেরামত করবে না; বলবে প্রয়োজন নেই'। "কোনটা যে ওর 'প্রয়োজন'—আর কোনটা 'অপ্রয়োজন'—তা বোঝা শক্ত।"

কালীচরণ কহিল—"মাথা খারাপ আর কি! এ একরকমের পাগল!"

রাত দশটা পর্য্যন্ত এইরূপ বৈঠক চলিল; তারপর যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেল। হরিশ বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, মাতুল গুণ-গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু অন্যদিন এ সময়ে নবীন প্রায় আহারাদি সারিয়া শুইয়া পড়ে।

পরদিন মামা-ভাগিনাতে কথা হইতেছিল।

নবীন কহিল—"টাইটেলের সনদখানা যেদিন পাওয়া যাবে, সেদিন তোমার হাতে শ' আড়াই টাকা দোবো, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের ভাল করে খাওয়াবার ব্যবস্থা করবে; কি বল?"

হরিশ কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, নবীন পুনরায় কহিল—"আচ্ছা, রায়বাহাদুর কথাটা, নামের গোড়ায় ব্যবহার করলে ভাল শোনাবে, না—শেষে?

"কতক গোড়ায়, কতক শেষে, যেমন সকলে করে থাকেন; যেমন—রায় নবীন চন্দ্র ঘোষাল বাহাদুর।"

"না—না, সকলে যা করে, তা করা হবে না; আমি একটু নতুন রকম করব।"

তা হোলে কি আপনি নামের মাঝখানে বসাতে চান—অর্থাৎ শ্রীনবীন চন্দ্র রায় বাহাদুর ঘোষাল?"

নবীন একটু মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিল—"ওটা শুনতে ভাল হবে না,—না? যাক্—এ বিষয়ে একটু ভাল কোরে ভাবতে হবে।"

"আপনাকে কিন্তু ভাল একটা দরবার-সুট তৈরী করাতেই হবে, মামা, কারণ ··"

"কারণটা আর আমায় বলতে হবে না। দরবারী পোষাক একটা নিশ্চয় প্রয়োজন; সুতরাং ও একটা করাতেই হবে। যেটা প্রয়োজন, সেটা করতেই হবে।···হ্যাঁ, ভাল কথা; ওদের লাইব্রেরীর জন্য যে চাঁদা নিতে এসেছিল আমার কাছে, তখন দিই নি; দেখচি—ওটার প্রয়োজন আছে বটে। কাল পঁচিশটা টাকা ওদের দিয়ে এস।"

হরিশ না হইয়া আর কেহ হইলে, হাসি চাপিয়া থাকা তাহার পক্ষে দুরূহ হইত।

* ⁃ * *

ডিসেম্বর মাস। এবার প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে; সকলেই এবার শীতে কাতর, কিন্তু নবীনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। নবীন কাতর বটে, বরঞ্চ খুবই কাতর, কিন্তু সে কাতরতা শীতের জন্য নহে; তাহা রায়-বাহাদুরী পাইবার কাতরতা। দিনরাত সে অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করিতেছে, কখন তাহার শুভসংবাদ সরকারী ভাবে তাহার কাছে আসে। কিন্তু দিনের পর দিন যাইতেছে, কোন সংবাদই আসিতেছে না। নবীনের আহারে স্পৃহা নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই,—চব্বিশঘণ্টা তাহার মন 'রায় বাহাদুর' খেতাবের জন্য অস্থির হইয়া আছে।

এমন সময় হরিশ একদিন সংবাদ লইয়া আসিল, কহিল—"যুদ্ধ বেঁধেছে বলে এবার বছরের গোড়ায় খেতাব দেওয়া বন্ধ থাক্‌লো, ছ'মাস পরে খেতাবের লিষ্ট বার করা হবে।"

খুব মন-মরা হইয়া নবীন জিজ্ঞাসা করিল—"তাই না কি?"

"হ্যাঁ। তবে, তোমার নাম উঠেছে, সে খবরটাও পাকাপাকি পাওয়া গেল।"

খুব উৎসুক-আনন্দে নবীন কহিল—"পাওয়া গেল? কোত্থেকে পেলি?

অতঃপর কার কাছে থেকে পাওয়া গেল, কি সূত্রে পাওয়া গেল—প্রভৃতি শুনিয়া নবীন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। হরিশ কহিল—'কিন্তু সকলে যে রকম বলচে, তাতে তোমার একটা কাজ করা বিশেষ দরকার; এবং সেটা এই ছ'মাসের ভেতরেই করে ফেলতে হবে। নতুবা······"

"কি বল ত?"

"এই পুরাণো ধ্যাড়-ধেড়ে বাড়ীটাকে একটু মানুষের মত কোরে ফেলতে হবে। একজন রায় বাহাদুর যে বাড়ীতে থাকবেন, সে বাড়ী···· বুঝছ না?"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নবীন কহিল—"যে বাড়ীতে একজন রায় বাহাদুর থাকবে, সে-বাড়ী······ঠিক ঠিক—সে বাড়ী একটু দেখতে শুনতে ভাল হওয়ারই প্রয়োজন বটে; খুবই প্রয়োজন। বাড়ীটা একেবারেই ভেঙ্গে-চুরে গিয়েছে!"

হরিশের ইনজেক্‌সনের ফল এইবার ফলিতে সুরু করিল। তিন মাসের মধ্যে এবং তিন-তিরিক্কে নয় হাজার টাকা ব্যয়ে নবীন ঘোষালের সাত-পুরুষের জরা-জীর্ণ বাড়ীখানা নবীন রূপ পাইয়া রাস্তা আলো করিয়া দাঁড়াইল। ভাঙিয়া-পড়া সেই বাড়ী যে এইরূপ হইবে, ইহা পূর্ব্বে কেহ আশা করিতে পারে নাই। সকলেই মনে-মনে ইঞ্জিনীয়ারের কৃতিত্বের কথা বলাবলি করিতে লাগিল। খড়-খড়ি, সার্সি, ঝিল্‌-মিলি, নূতন ফ্যাসানের বারান্দা, ফটক, পোর্টিকো, বাথরুম, সুচিত্রিত দেওয়াল-গাত্র প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া সারা বাড়ী যেন হাসিতে লাগিল। ফটকের গায়—বাড়ীর নামের ট্যাবলেট বসিল। ইলেক্‌ট্রিক, রেডিও, টেলিফোন প্রভৃতির ব্যবস্থায়ও কোন ত্রুটী রহিল না; একে একে সকলই হইল। ভাল ভাল সবরকম ফার্ণিচারে নূতন বাড়ীর সবদিক ভরিয়া উঠিল। নীচের তলার হলঘরের দুই পাশে দুইখানা সুসজ্জিত বৈঠকখানা ঘর; এ পাশের খানা নবীনের নিজের, ও-পাশেরখানা হরিশের। হরিশের বৈঠকখানা সকাল-সন্ধ্যা তাহার বন্ধুবর্গদ্বারা মুখরিত থাকে। এই সকল দেখিয়া নবীন মনে মনে কহে—'একজন রায়বাহাদুরের পক্ষে এ সবেরই প্রয়োজন আছে

বটে !' হরিশ মনে মনে ভাবে—'এতদিনে ইনজেক্‌সনের পূর্ণ ফল পাওয়া গেল।'

এ দিকে ছয়মাস কাটিতে আর বিলম্ব নাই। অধীর আশা-উৎকণ্ঠায় নবীনের দিন কাটিতে লাগিল। এইবার কবে হয় ত একদিন তাহার নামে সরকারী বিধি আসে! হয় ত এই সপ্তাহের মধ্যেই আসিয়া পড়িবে। আজ আসিল না, হয় ত কাল আসিবে। নবীনের আর দিন কাটে না। আজ বুধবার; আজ হয় ত ঠিকই আসিবে ··ঠিকই কিন্তু—

কিন্তু—কিন্তু—কিছুই আসিল না। যথাসময়ে গেজেটে খেতাবের লিষ্ট বাহির হইল; নবীনের নাম তাহার মধ্যে নাই। বহুবার দেখা হইল—নাই—নাই; কোথাও নবীনের নাম নাই। নবীন এ ধাক্কা আর সামলাইতে পারিল না; শয্যা গ্রহণ করিল।

তিনমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। নবীনের অবস্থা শোচনীয়! তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই; কখন যে কোথায় থাকে তাহারও কোন ঠিক নাই। হয় ত' তিনদিন ধরিয়া ঘরের মধ্যেই থাকে, একদণ্ডের জন্ম বাহির হয় না; আবার হয় ত' তিন দিন ধরিয়া পথে-পথেই ঘুরিয়া বেড়ায়। পথের যাহার সহিতই দেখা হয়, তাহাকেই আকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে—"কোন খবর এল আমার?"

হরিশ মামার জন্ম প্রথমটায় ডাক্তারী চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়াতে এক্ষণে কবিরাজী চিকিৎসা করা হইতেছে। কবিরাজ নানাপ্রকার ঔষধের সহিত মধ্যম-নারায়ণ' তৈল প্রভৃতি ব্যবহার করাইতেছে; কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইতেছে না।

সেদিন সারাদিনের পর অপরাহ্ণে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নবীন ব্যস্ত হইয়া হরিশকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোন খবর আসে নি?"

হরিশ তাহার হাত ধরিয়া কহিল—"খবর আসবে; অত ব্যস্ত হতে আছে কি? চলুন, স্নান করে খাওয়া দাওয়া করবেন, চলুন।" নবীন সজোরে তাহার হাত ছাড়াইয়া আবার বাহির হইয়া গেল এবং পোষ্টাফিসে গিয়া পোষ্টমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার সরকারী চিঠি এসেচে কি?" দিনে বিশবার করিয়া নবীন এইরূপ পোষ্টাফিসে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে। পোষ্টাফিসের পিয়ন হইতে ডাকবাবু পর্য্যন্ত সকলের কাছেই নবীন ঘোষাল সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই সকলে বলাবলি করে—"ওই রে রায়বাহাদুর আসচে।"

নবীন ঘোষালের এই দুর্দ্দশা চক্ষে দেখা যায় না; দেখা উচিতও নয়। সুতরাং এইখানেই এ-কাহিনীর শেষ করা ভাল।

পুস্তক ও আলোচনা

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য : এস্, ওয়াজেদ আলী, বি-এ (কেন্টাব) বার-এ্যাট-ল। দি বুক হাউস, ১৫, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—১।০ মাত্র।

ওয়াজেদ আলী সাহেবের নতুন করিয়া পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সাহিত্য বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি শুধু রূপকারই নন, পণ্ডিতও বটে। সেই পাণ্ডিত্যের রসসৃষ্টি 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য'। বিভিন্ন কালের সমন্বয়তায় রূপায়িত ইহার প্রাণবস্তু। গ্রন্থের 'সাকী ও কবি', 'পটভূমিকা', 'মুক্ত মানব', 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য', 'পাহাড় ও প্রান্তর', 'বাংলার প্রকৃতি' প্রভৃতি চিত্রপটগুলি শুধু ভাবে ও ভাষায়ই অনবদ্য হয় নাই, ললিত প্রাণঃ-শীলতায়ও অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়াছে। ওয়াজেদ আলী সাহেবের কবিধর্ম্মী সুন্দর মনের পরিচয় তাঁহার 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।'

শ্রীঅমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়

গল্পের মজলিশ : ৸০
বাদশাহী গল্প : ৸০ } শিশু-গল্পিকা

এস্, ওয়াজেদ আলী, বি-এ (কেন্টাব), বার-এ্যাট-ল। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা।

ওয়াজেদ আলী সাহেব শুধু গল্পলেখক নহেন, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক এবং দার্শনিকও। বুদ্ধিজীবী মন লইয়া একদিকে তিনি যেমন শিক্ষিত সর্ব্বসাধারণের জন্ম তথ্যপূর্ণ রচনা সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্যদিকে দরদী শিল্পকুশলতায় তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন শিশুদের গল্প-সাহিত্য। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার 'প্রাণদার শেষ বীর' বাংলার শিশুজীবনে যে উদ্দাম প্রবাহ আনিয়াছিল, আলোচ্য গ্রন্থ দুইটিতেও সে প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, সত্যিই যেন বাদশাহী যুগে বসিয়া বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছি। ভাষায়, চরিত্র-সৃষ্টিতে ও আবহ প্রকাশভঙ্গিমায় গ্রন্থ দুইখানি সুন্দরতম হইয়াছে। শিশুদের মন স্বভাবতই আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে কাহিনীগুলির পরিচয়ে।

[illegible]াচায

Racial History of India—শ্রীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক বিজয়কৃষ্ণ ব্রাদার্স, ৮১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। মূল্য ৫৲ টাকা। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী একজন প্রতিভাবান লেখক। অনুরূপ বিষয়-বস্তু লইয়া তিনি আরও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকে তিনি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য হইতে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে হিন্দুজাতির উৎপত্তি ও গঠন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এক কথায় পুস্তকখানাকে প্রাচীন ভারতের মূল্যবান তথ্যাদির আধার বলা যাইতে পারে।

শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

মাটির পৃথিবী : উপন্যাস৭ শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য। গ্রন্থ কুটীর, কলিকাতা।

প্রক্ষিপ্ত জীবনধারায় আমাদের বর্ত্তমান সমাজ দাঁড়াইয়া আছে। শোভনশীলতা আর অর্থনৈতিক বিক্ষুব্ধতার পাশাপাশি বিরুদ্ধবাদী দ্বন্দ্বে জীবন হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে মানস-পৃথিবী। সেই জীবনের স্পষ্ট প্রতীক দেখিতে পাই আলোচ্য গ্রন্থের সুশান্ত সেনকে। স্বল্প বেতনের কেরাণী; সাংসারিক পরিবেশ আরও ক্ষুদ্র। ইহারই মধ্যে মানুষ হইয়া বাঁচিবার দুর্নিবার প্রচেষ্টা সুশান্তের। সূক্ষ্ম মনে আসে তার বিচার, আসে স্বপ্ন; স্থূল মনে আসিয়া আঘাত করে প্রেম, জাগিয়া ওঠে আদর্শের ক্ষুধা। ইহারই মধ্যে পাশাপাশি যোগ তাহার মিনতি আর সুপ্রীতির সাথে, হারানো দিনের সুবোধদা আর তাঁর আশ্রমের সাথে। ঘাত-প্রতিঘাতমূলক বিচিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়া কাহিনী সুন্দরতম রূপ পাইয়াছে। তবু, এ কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা যে, লেখকের কাহিনী ও রচনার আবহ গতিকে মাঝে মাঝে আসিয়া ব্যাহত করিয়া দাঁড়াইয়াছে ভাষার অদৃঢ়তা।

অনিলবাবু উপন্যাস লিখিতে জানেন, 'মাটির পৃথিবী' তাহারই সাক্ষি দেয়।

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

ডারউইন : শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এস্-সি। প্রকাশক : পূর্ব্বাশা, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ, কলিকাতা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী চার্লস ডারউইন। আধুনিক যুগের চিন্তাধারায় যাঁরা বিপ্লব ঘটিয়েছেন, ডারউইন সেই ক্রান্তিকারী পুরুষদের অগ্রণী। বিশেষ সৃষ্টিবাদ (Theory of special creation)-কে অস্বীকার করে তাঁর বিবর্ত্তন-নীতি প্রাণী ও প্রাণবিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছে। প্রচলিত ধর্ম্মসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহী, নির্ভীক ও দুঃসাহসী বিজ্ঞানী।

বিস্তৃত গবেষণা ও আলোচনার ফলে ডারউইনিজম যথেষ্ট পরিত্যক্ত এবং সংশোধিত হলেও তাঁর ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক বিবর্ত্তনবাদ পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছে। এই বিরাট পুরুষের চিন্তা ও গবেষণার সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর পরিচয় এই ছোট বইখানির মধ্যে পাওয়া যায়। অনিলবাবু জীব-বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ছাত্র, বাংলা সাময়িক পত্রে তাঁর বহু সুলিখিত মূল্যবান্ প্রবন্ধ পড়ে আনন্দ পেয়েছি। এই বইখানিও তাঁর সাহিত্যিকধর্ম্মী রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে—সামান্য টেক্‌নিক্যালিটিজ সত্ত্বেও কোথাও দুর্ব্বোধ নয়—সরস ও হৃদয়গ্রাহী। Popular science-এর এইজাতীয় বই বাংলায় বিরল বলেই অনিলবাবুর গ্রন্থখানির মূল্য আরো বেশি এবং এই সাধুপ্রচেষ্টার জন্যে প্রকাশককেও ধন্যবাদ জানাই।

ছাপা ও বানান ভুলগুলি সম্পর্কে আরো একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ছিল।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পয়লা এপ্রিল : কানাই বসু প্রণীত গল্পসমষ্টি। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড্ সন্স কলিকাতা। দাম—দুই টাকা মাত্র।

১৩৪৮ হইতে '৫০ সাল পর্য্যন্ত যে-সমস্ত গল্প বঙ্গশ্রী ও ভারতবর্ষ মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি লইয়া আলোচ্য গ্রন্থখানি সঙ্কলিত। কানাই বাবুর ভাষা সাধারণ পথ দিয়া চলাফেরা করিলেও গল্পের অবতারণায় পাঠককে খুসী করে। 'সর্ট ষ্টোরি' বা ছোট গল্প বলিতে যাহা বুঝায়, পয়লা এপ্রিলে তাহার সৌকুমার্য্য রক্ষা পাইয়াছে বলা চলে। তবে 'বড়বাবু'শীর্ষক গল্পটি ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যেও বৃহত্ত্বের স্পর্শলাভে 'সর্ট ষ্টোরি'-ধর্ম্মের খানিকটা আইন ভঙ্গ করিয়া কিছু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কানাই বাবু গল্প বলিতে জানেন, যে গল্পে হাসি, অশ্রু ও সমস্যার একত্র সংমিশ্রণে আমাদের পারিপার্শ্বিক সমাজচিত্রই বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এতৎসত্ত্বেও আমাদের অনুযোগ আছে। গ্রন্থখানি মাঝে মাঝে অহেতুক মুদ্রাপ্রমাদে হোঁচট খাইয়াছে; এবং দ্বিতীয়তঃ দেড়শো পৃষ্ঠার পয়লা এপ্রিলের পূর্ব্বাহ্ণে অন্ততঃ একটা একত্রিশে মার্চ্চের সংযোগ থাকা শোভন ছিল, যাহাকে সাধারণ পাঠকের পক্ষে 'সূচীপত্র' নামে অভিহিত করা যায়। ভবিষ্যতে আরও সুচিন্তিত গল্প দাবী করি কানাই বাবুর কাছে। শ্রীরণজিৎকুমার সেন

গান

শ্রীআভা দেবী

ডাক দিয়েছে এই সকালে প্রভাত হাওয়া
ফিরে গেছে তারা সবাই আমার শুধু
হয়নি যাওয়া।
অনেক দিনের তারা সাথী,
ছিল প্রাণের মাতামাতি,
কাজের ভুলে তাদের পানে হয়নি চাওয়া।

ঐ যে তারা গগন কোণে:
ভীড় করে আজ আমার মনে—
সুর রয়েছে তবুও গান হয়নি গাওয়া;
ভুলেছিলেম তাদের কথা,
ছিল না তায় কোন বাধা,
সুরু হোল আবার আমার তরী বাওয়া।

সাময়িকপ্রসঙ্গ ও আলোচনা

আবাহন

মায়ের আবির্ভাবের দিন আজ সমাগত। ঘরে ঘরে স্তুতি-মুখর আজ বাংলার সন্তানেরা। দুর্গতিনাশিনীর কল্যাণস্পর্শে পুঞ্জিভূত এই দুঃখ যাতনার অবসান হউক। বড় দুর্দ্দিন, বড় দুঃসময়ের দুঃসহ তাপ। মা ভিন্ন কে নিবারিবে এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রনা, কে দিবে এই মৃত্যু-আহবে জীবন-সঞ্জীবনী? একদিকে, বোধনের শঙ্খনাদে বিঘোষিত আজ মায়ের আহ্বান, অন্যদিকে জৈবতাড়নার উদ্ধত অস্ত্র; ভ্রাতৃকলহ আর হানাহানি, অস্ত্রে অস্ত্রে শক্তি পরীক্ষার বিজয় অভিযান; দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর হাহাকার। মা ভিন্ন কে শুনাইবে আজ আশার বাণী, কে বহাইবে জীবনে আনন্দের রসধারা?···মিথ্যা আড়ম্বরের মোহে মাকে ডাকিবার আজ দিন নয়; মনের পশুত্বকে আজ বলি দিতে হইবে, সমগ্র মনুষ্য সমাজের সম্প্রদায়গত প্রভেদের অত্যাচার দূর করিতে হইবে, অখণ্ড মানব-সমাজের পরস্পরের মধ্যে মানবতাজাত প্রাকৃতিক সম্বন্ধ জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে, মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার প্রয়াসী হইয়া মহাশক্তির পায়ে আত্মাকে নিবেদন করিতে হইবে, তবেই হইবে প্রকৃত মাতৃপূজা, মাতৃবন্দনা। কোথায় সেই ভক্তির উৎস, কোথায় সেই চিত্ত-নিবেদনের অজস্রতা? দেশ ও জাতির অপাপবিদ্ধ শুদ্ধ চিত্তের দ্বার হইতে আজ এই মন্ত্রই বিঘোষিত হউক:

এস মা, নবরাগরঙ্গিণী শান্তিবিধায়িণী, দশভুজে দশপ্রহরণ-ধারিণী, শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে, ধাত্রী-ধরিত্রী ধনধান্যদায়িকে, অসুর-মর্দ্দিনী, চারুচন্দ্রভালিকে, এস মা, দূর কর শিবাভীতি, লোকভীতি; দূর কর' জরা ব্যাধি আর পশুত্বের ছায়া। বল দাও, বীর্য্য দাও, শক্তি দাও,—দাও ভক্তি আর মুক্তির আনন্দ; তোমার কোটি কোটি সন্তানের কণ্ঠে সার্থক কর' মা তোমার অমৃত বন্দনা। গ্রহণ কর' অন্তরের ভক্তি প্রণতি।

মহাযুদ্ধের গতিপথে

সোভিয়েট-রুমানিয়ান যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি

সম্প্রতি রুমানিয় মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে বলিয়া বুখারেষ্ট বেতারে রাজকীয় ঘোষণায় বিবৃত হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া ও রুমানিয়ার মধ্যে যুদ্ধের অবসান হইয়া গেল। যুদ্ধবিরতির সর্ত্তাবলী এইরূপ:

(ক) রুমানিয়া স্বীয় স্বাধীনতা ও স্বাধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য মিত্রপক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জার্ম্মানী ও হাঙ্গারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, এবং এজন্য অন্ততঃ সৈন্যদল নিয়োগ করিবে। রুমানিয়ান স্থলবাহিনী, নৌ ও বিমান বাহিনীর যুদ্ধ সোভিয়েট হাই-কম্যাণ্ডের পরিচালনাধীন থাকিবে।

(খ) রুমানিয়ান এলাকায় জার্ম্মানী ও হাঙ্গারীর সকল সশস্ত্র সৈন্যকে অন্তরীণ করা হইবে বলিয়া রুমানিয়া প্রতিশ্রুতি দিতেছে। পূর্ব্বোক্ত দুইটি দেশের নাগরিকবৃন্দকেও অন্তরীণ করিতে হইবে।

(গ) সামরিক প্রয়োজনে রুমানিয়ার মধ্য দিয়া সোভিয়েট ও অন্যান্য মিত্রপক্ষীয় সৈন্যরা অবাধ চলাফেরা করিতে পারিবে। জল, স্থল, বিমান পথে মিত্রপক্ষীয় সোভিয়েট সৈন্যদের চলাফেরার জন্য রুমানিয়াকে নিজ ব্যয়ে সর্ব্বপ্রকার যানবাহন ছাড়িয়া দিতে হইবে।

(ঘ) ১৯৪০ সালের জুন মাসে রুশ-রুমানিয়ান চুক্তি দ্বারা রুমানিয়া ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যে সীমানা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, উহা পুনরায় বলবৎ হইবে।

(ঙ) সোভিয়েট ও অন্যান্য মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধবন্দী, অন্তরীণ নাগরীক ও অন্যান্য যে সকলকে জোর করিয়া রুমানিয়ায় লইয়া আসা হইয়াছে, রুমানিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ দিবে এবং তাহাদিগকে মিত্রপক্ষীয় (সোভিয়েট) হাইকম্যাণ্ডের হাতে অর্পণ করিবে। এই চুক্তি স্বাক্ষরের মুহূর্ত্ত হইতে তাহাদিগকে স্বদেশে প্রেরণ না করা পর্য্যন্ত রুমানিয়া নিজ ব্যয়ে পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধবন্দী, অন্তরীণ ও সকল অপহৃত ব্যক্তিগণের যত্নাদি করিবে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে খাদ্য যতটা প্রয়োজন, পোষাক ও ঔষধপত্রাদি সরবরাহ করিবে। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য রুমানিয়াকে নিজ ব্যয়ে যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

রুশ-ফিন সন্ধি

ষ্টকহলম হইতে ২রা সেপ্টেম্বরের এক সংবাদে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ফিনিশ মন্ত্রিসভা ও পার্লামেণ্ট জার্ম্মানীর সহিত কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং জার্ম্মানদিগকে অবিলম্বে ফিনল্যাণ্ড ত্যাগ করিবার জন্য ফিনিশ গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ থাকিতে পারে, ১৯৪১ সালে জার্ম্মানীর সহিত ফিনিশের চুক্তি হইয়াছিল সামরিক ভিত্তিতে, রাজনীতি-মূলক নয়। জার্ম্মানীর উদ্দেশ্য ছিল রুশিয়ার সঙ্গে ফিনল্যাণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবে। কিন্তু ফিনকে যথেষ্টরূপে সাহায্য করা জার্ম্মানীর সম্ভব ছিল না। সম্প্রতি যুদ্ধের পরিবর্ত্তিত গতি দেখিয়া ফিনিশ প্রধান মন্ত্রী মঃ হাক্জেলন ফিনিশ জাতির উদ্দেশে এক বেতার বক্তৃতায় বলেন: জার্ম্মানীর পক্ষে পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ জার্ম্মান সৈন্যই এখন আর বিশ্বাস করে না যে, তাহাদের জয় হইবে। অতএব জার্ম্মান-ফিনিশ সম্পর্কে এক নতুন অধ্যায় সুরু হইয়াছে।—সামরিক পরিস্থিতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এবং শান্তির জন্য জনসাধারণ আগ্রহান্বিত হওয়ায় ফিনিশ গভর্ণমেণ্ট পুনরায় গত ২৫শে আগষ্ট ষ্টকহলম হইতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সোভিয়েট উহার উত্তরে

দাবী করে যে, ফিনিশ গভর্ণমেণ্টকে সরকারীভাবে ঘোষণা করিতে হইবে যে, তাঁহারা জার্ম্মানীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন এবং জার্ম্মানীর নিকট দাবী করিতে হইবে যে, দুই সপ্তাহের মধ্যে ফিনিশ রাজ্য হইতে জার্ম্মানসৈন্য তাহাকে সরাইয়া লইতে হইবে। ফিনিশ গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মানদিগকে তাহাদের সৈন্য সরাইয়া লইতে বলিয়াছেন ; জার্ম্মানী উহাতে রাজী হইয়াছে।

সম্প্রতি ফিনল্যাণ্ড হইতে দ্রুতগতিতে জার্ম্মান অপসারণ চলিতেছে।

পোলিশ সমস্যা

সম্প্রতি সোভিয়েট-পোলিশ সম্পর্ক লইয়া লণ্ডনের রাজনৈতিক মহল অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন। 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রিকার মতে ঐ সম্পর্ক 'ওয়ারশতে যুদ্ধমান পোলিশ সৈন্যগণকে সাহায্যদানের সমস্যার সহিত শোচনীয়ভাবে জড়াইয়া পড়িতেছে।' এই সমস্যা সম্পর্কে পোলিশ-প্রধানমন্ত্রী মিঃ ইডেনের সহিত আলোচনা করেন। সমস্যার সংক্ষিপ্তসার এইরূপ : ওয়ারশ'র যোদ্ধাগণকে যে সকল বৃটিশ ও মার্কিণ বিমান, অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহ দিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই সকল বিমানের জন্য রাশিয়ায় ঘাঁটি দিতে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ অস্বীকার করিয়াছেন। ওয়ারশ'তে পোলিশ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল বরের প্রস্তাবানুসারে জার্ম্মান অবস্থানের বিরুদ্ধে ভারী বোমারু যাহাতে ব্যবহার করা যায়, এবং সেই সঙ্গে সরবরাহ দেওয়া যায়, তজ্জন্য আমেরিকানরা সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিমান নামাইয়া তৈল লইবার সুবিধা দিবার অনুরোধ জানাইয়াছিল। 'ডেলি টেলিগ্রাফ' প্রভৃতি পত্রিকা বলিতেছে, সোভিয়েট এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করে। সোভিয়েট এইরূপ যুক্তি দেখায় যে, প্রথমতঃ, ওয়ারশ'তে অভ্যুত্থান যথাকালে করা হয় নাই, তাহার ফলে লালফৌজের সাহায্যদানের ষ্ট্র্যাটিজি ব্যাহত হইয়াছে ; এবং দ্বিতীয়তঃ, এই অসময়ের অভ্যুত্থানের জন্য সোভিয়েট দায়ী নয়। সোভিয়েট মনে করে যে, ওয়ারশ'র যোদ্ধারা লণ্ডনস্থ পোলিশ গভর্ণমেণ্টের আদেশ পালন করে, কিন্তু ঐ পোলিশ গভর্ণমেণ্টকে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন না।

ডেলি হেরাল্ডের মতে—ঘাঁটি দিতে সোভিয়েট অস্বীকার করায় বিমান তৎপরতার ঝুঁকি অনেক বাড়িয়াছে, এবং লোক হতাহতের সংখ্যাও ইতিমধ্যে বেশী হইয়াছে।

লণ্ডনস্থ পোলিশ গভর্ণমেণ্ট লুবলিনস্থিত পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির সহিত সহযোগিতা সম্বন্ধে মার্শাল ষ্ট্যালিনের নিকট এক স্মারকলিপি পাঠাইতেছেন ; তাহার চূড়ান্ত খসড়া শেষ হইয়াছে। এই কারণে বর্ত্তমান মতান্তরে রাজনৈতিক মহল দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। পোলিশ মুক্তি কমিটির পররাষ্ট্র বিভাগের পরিচালক মঃ মোরাভস্কি বলেন যে, ঐক্য স্থাপনের জন্য কমিটি লণ্ডনস্থ প্রধান মন্ত্রী মঃ মিকোলাইজিককে পোল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী করিতে চাহিয়াছেন। মঃ মোরাভস্কি এই বলিয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন যে, পূর্ব্ব প্রুশিয়ার ভার পোলেরা গ্রহণ করার পর জার্ম্মানগণকে সেখানে থাকিতে দেওয়া হইবে না।

বুলগেরিয়ার অবস্থা

রয়টারের বিগত ২৪শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ—বুলগেরিয়ান আর্ম্মি স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পথে যাত্রা করিয়াছে। ম্যাসিডোনিয়া এবং থ্রেস-এ গত তিন বৎসর কাল যাবৎ যে নৃশংস অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল, তাহার অবসান আসন্ন হইয়াছে, এবং বুলগেরিয়া কম্যাণ্ড ঐ সব এলাকা হইতে অন্যূন ১১ ডিভিসন সৈন্য অপসারণের এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই সব সৈন্য বল্কানস্থিত জার্ম্মান সৈন্যদিগকে সাহায্য করিতেছিল। সম্প্রতি বুলগেরিয়ার সহিত কি সর্ত্তে সন্ধি হইতে পারে, মিত্রপক্ষ সে বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। বুলগেরিয়া বর্ত্তমানে নিরপেক্ষ থাকিতে প্রয়াসী। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। ১লা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ : বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ বাগ্রিয়াখোভ পদত্যাগ করিয়াছেন। নূতন প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি এক বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, বুলগেরিয়া কঠোর নিরপেক্ষতানীতি অবলম্বন করিবে। জার্ম্মানী যদি কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে, তবে জার্ম্মানীর সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হইবে। যুদ্ধ হইতে বুলগেরিয়ার সরিয়া দাঁড়াইবার নীতি গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিয়াছেন। এদিকে মস্কো বেতারে প্রচার করা হইয়াছে যে, রুশ সরকার বুলগেরিয়ার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন এবং রুশিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান—মস্কোর বুলগেরিয়ান দূতের হাতে রুশ সরকারের এই মর্ম্মের এক বিজ্ঞপ্তি প্রদত্ত হইয়াছে।

এমতাবস্থায় বুলগেরিয়ার নিরপেক্ষতানীতি যে কতদূর কার্য্যকরী হইবে, সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল মহল সর্ব্বদাই সন্দিহান।

যুদ্ধের গতিপথে জার্ম্মানীর সামনে আজ এক বিষম পরিস্থিতি উপস্থিত হইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধে জার্ম্মানীর যে ভুল হইয়াছিল, রণনীতিগত সেই ভুলের যাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, বর্ত্তমান যুদ্ধের গোড়া হইতেই হের হিটলার সে বিষয় সতর্ক হইয়া জার্ম্মানবাহিনীকে একাধিক রণক্ষেত্রে নিয়োজিত না রাখিয়া বৃহত্তর শক্তিতে ক্রমাগত অগ্রগতির পথে চলিয়াছিলেন। কিন্তু আফ্রিকায় নাৎসীবাহিনীর বিপর্য্যয়ের পর দক্ষিণ ইতালীতে মিত্রবাহিনীর অবতরণ হইতেই তাঁহার সেই রণপরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে বসিল। পূবের বাতাস এখানে আসিয়াই যেন একটা আকস্মিক ঘূর্ণিবাত্যায় পাক খাইয়া গেল। ১৯৪০ সালের জুন হইতে ফ্রান্সে জার্ম্মানীর যে দৌত্য চলিয়াছিল, জেনারেল আইসেনহাওয়ারের তত্ত্বাবধানে সম্প্রতিক মিত্রবাহিনীর ক্রমঅভিযানের ফলে আজ তাহা পর্য্যুদস্ত হইতে চলিয়াছে। ফ্রান্সের পূর্ণাধিকারের দিন আজ আর দূরে নয়। ইহা ছাড়া সমগ্র ইউরোপ ও বল্কানে সম্প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন রণাঙ্গনে মাথা তুলিতে যাইয়া কোনো বিশেষ নিরাপদ ব্যূহে প্রত্যাবর্ত্তনের পথই খুঁজিতে হইতেছে জার্ম্মানীকে। এদিকে ইতালী রণক্ষেত্রে আজ আর তাহার বিন্দুমাত্রও স্থিতি

নাই। মুসোলিনীর পতন এবং জার্মানীতে পলায়নই তাহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ বলা যায়।

ইতালীর পর রুমানিয়াকে নিয়া অনেকখানি ভরসা ছিল হিটলারের। রুমানিয়ার খনিজসম্পদে সমরায়োজন পরিপুষ্ট ছিল জার্মানীর। কিন্তু ভাগ্যস্রোত এমনই প্রবাহিত যে, সেই রুমানিয়া আজ শুধু হাতছাড়াই হয় নাই, সোভিয়েটের সাথে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তিতে আজ সে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছে। এদিকে বুলগেরিয়া নিরপেক্ষতামূলক যুদ্ধবিরতির জন্য উদ্যোগী। গ্রীক-দেশপ্রেমিকও ইত্যবসরে সুযোগ বুঝিয়া নাৎসীকবল-মুক্ত হইবার আয়োজন করিয়াছে। তুরস্কের সংলগ্ন সমগ্র গ্রীকসীমান্তে তথাকার দেশপ্রেমিকদলের এক বিরাট কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়া একটি বিশ্বস্ত সংবাদও ইহারই মধ্যে আমরা পাইয়াছি।

এদিকে রাশিয়ার লালফৌজের কাছে আজ বিপর্য্যয়ের অন্ত নাই জার্মানীর। ফিনল্যাণ্ড ছিল তার অন্যতম অবলম্বন। জার্মানীর উদ্দেশ্য ছিল—রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রমাগতঃ যুদ্ধ-বিরতাবস্থার মধ্য দিয়া জার্মানী রাশিয়ায় এক কায়েমীশক্তি লইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। কিন্তু দেখা গেল—সামরিক তথা ভৌগোলিক অবস্থায় ফিনিশকে যথেষ্টরূপে সাহায্য করা জার্মানীর সম্ভব নয়। সম্প্রতি রাশিয়ার সাথে ফিনিশের নবতম সামরিক চুক্তিতে ফিনল্যাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিতে বাধ্য হইয়াছে। ফিনিশ প্রধান মন্ত্রী মঃ হাক্জেলনের এক বেতার বক্তৃতায় স্পষ্ট বোঝা যায়—জার্মানীর পক্ষে পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ জার্মাণসৈন্যই এখন আর বিশ্বাস করে না যে, তাহারা বিজয়লাভ করিবে। অন্যদিকে মিত্রবাহিনী আজ একরকম জার্মানীর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বেলজিয়াম, লাক্সেমবুর্গ, নরওয়ে ও হল্যাণ্ডও সম্প্রতি ভিতরে ভিতরে বন্ধন-মুক্তির প্রত্যাশায় নড়িয়া উঠিয়াছে। জেনারেল আইসেন-হাওয়ার এক বাণী প্রসঙ্গে তাহাদের অধিবাসীদের আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, তাহাদের মুক্তির দিন আসন্ন। বর্ত্তমান আবহাওয়ার দিক হইতে কথাটা যে অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ, তাহাতে ভুল নাই। হিটলারের কণ্ঠ আজ একরকম নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বরের এক সংবাদে দেখা যায়—মিত্রবাহিনী খাস্ জার্মানীতে রোয়েংজেন গ্রাম দখল করিয়াছে। তা ছাড়াও আকেনের দক্ষিণপূর্ব্বে ও সিগফ্রীড্ লাইনের পশ্চিমে কয়েকটি জার্মাণসহর ইতিমধ্যে অধিকৃত হইয়াছে।

এদিকে আসামব্রহ্ম রণাঙ্গন সম্পর্কে দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের ইস্তাহারে প্রকাশিত যে সমস্ত ঘটনাবলী আমরা পাইতেছি, তাহাতে জাপানের বিপুল শক্তি যে ক্রমশঃ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়।

স্মরণে থাকিতে পারে যে, ১৯৪২ সালে মিত্রপক্ষ বর্ম্মা ত্যাগ করেন। "আমরা আবার ব্রহ্মে ফিরিয়া যাইব" বলিয়া জেনারেল ষ্টীলওয়েল তখন যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহা একরকম বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। উত্তর ব্রহ্মে দশ সহস্রাধিক বর্গ মাইল ব্যাপী স্থান পুনরায় অধিকৃত হইয়াছে—যাহার ফলে প্রায় কুড়ি হাজার জাপানীর প্রাণনাশ ঘটে। লুপ্ত সমরসজ্জার সহ মিত্রসৈন্য সম্প্রতি আবার ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইতেছে।

এই দুর্দ্ধর্ষ দেশ দুইটির আকস্মিক এই দুঃস্থতার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—বিক্ষুব্ধ দেশগুলির উপর দমননীতি চালাইয়া কখনও কোনো শক্তি একচ্ছত্র হইয়া দীর্ঘ দিনের স্থিতি লইয়া দাঁড়াইতে পারে না। সুযোগ আসিলেই বিজিত দেশ আবার বিজয়দর্পে মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। এম্নি করিয়াই আজ যে ক্রমাগত পাল্টা আক্রমণ সুরু হইয়াছে, তাহার কাছে জাপান কিম্বা জার্মানীর সিংহ-বিক্রম আজ আর দুঃসাহসীর জয়যাত্রায় ভীমনৃত্য তুলিবার মতো সঙ্গতি-সার্থক নয়।—সর্ব্বত্রই আজ মিত্রপক্ষের আশু জয়ের সূচনা দেখা যাইতেছে।

গান্ধী-জিন্না আলোচনা

বিগত আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে বোম্বাইয়ে মিঃ জিন্নার সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাত ও হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী সম্পর্কে আলোচনা হইবার কথা ছিল। কিন্তু মিঃ জিন্নার আকস্মিক অসুস্থতার জন্য উক্ত সময় সাক্ষাৎ-আলোচনা বন্ধ থাকে। সম্প্রতি মিঃ জিন্নার পুনর্নির্দ্দেশ অনুযায়ী গত ৯ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে গান্ধীজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে ক্রমাগতঃ কয়েকদিন ধরিয়া তাঁহাদের আলোচনা চলিতেছে। আলোচ্য বিষয় সাংবাদিক মহলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

বোম্বাই বিস্ফোরণের তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট

গত ১৪ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাই ডকে যে বিস্ফোরণ হইয়া গিয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লিওনার্ড ষ্টোন, পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মিঃ এস, বি, ধারেল এবং রিয়ার এডমিরাল সি, এস, হল্যাণ্ডকে লইয়া একটি কমিশন ২রা মে তারিখে নিযুক্ত করা হয়। কমিশন ১৩৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং বহু নথিপত্র পরীক্ষা করিয়া সম্প্রতি কেবলমাত্র বিস্ফোরণের কারণ সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়াছেন। আমরা রিপোর্টের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, ...কর্ত্তব্যের গাফিলতি এবং বিচ্যুতি উভয় প্রকার ভ্রম প্রমাদের জন্য বোম্বাইতে চরম দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে ·· অগ্নির বিপদ সঙ্কেত ধ্বনি যখন আলেকজেন্ড্রিয়া ডকে জ্ঞাপন করা হয় তখন বেলা ২—১৬ মিঃ! অতঃপর কণ্ট্রোল রুমে যখন সংবাদ পাঠান হয় তখন অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে ··· যে সংবাদ পাঠান হয় তাহাতে অতি সাধারণ ধরণের অগ্নিকাণ্ড বলিয়া মনে হয় · প্রথমে কেহই অবস্থা গুরুতর বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। ·· · বেলা ২-২৫ মিঃ সময় ইণ্ডিয়ান আর্ম্মি অর্ডনান্স কোরের ক্যাপ্টেন ওবার্ষ্ট জাহাজের উপর যান। তিনি জাহাজের সেকেণ্ড অফিসারের সহিত দেখা করেন এবং গুরুতর অবস্থার কথা জানান এবং জাহাজখানাকে ডুবাইয়া দেওয়ার জন্য বলেন। তিনি নাকি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, জাহাজে যে পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ আছে তাহা বিস্ফোরিত হইলে সমস্ত ডক পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে। ··

নৃত্যকুশলা ছায়া-চিত্রশিল্পী শ্রীমতী সাধনা বসুর অনিন্দ্য-সুন্দর অভিনয় ও নৃত্য পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাঁহার অঙ্গের নিখুঁৎ ত্বক্ ও উজ্জ্বল বর্ণ-সমন্বয়ে ; এবং আমাদের গর্ব্ব এই যে, প্রতি রাত্রে নিয়মিত ওটীন ক্রীম ব্যবহারের ফলেই তাঁহার নিখুঁৎ ত্বক্ ও উজ্জ্বল বর্ণ এখনও অম্লান আছে।

OATINE CREAM is indispensable for my toilet. I have been using it for a long time, and find it delightful, and extremely necessary to preserve a perfect skin.

Sadhona Bose

Oatine CREAM *for nightly massage*

SNOW *for daily protection*

কে. ভি. আপ্পারাও কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ—৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
সম্পাদক—শ্রী[illegible]েন্দ্র নাথ বিশ্বাস

বঙ্গশ্রী
মাতৃদুগ্ধের
অনুরূপ
শিশুদের পক্ষে মাতৃদুগ্ধ অমৃতের ন্যায় অনুপম। কিন্তু বিশুদ্ধতায় এবং পুষ্টি-কারিতায় 'ভিটামিল্ক' মাতৃদুগ্ধেরই অনুরূপ। ইহা খাঁটি গো-দুগ্ধ হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত এবং ইহাতে প্রচুর ভিটামিন বিদ্যমান। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্য, শক্তি এবং লাবণ্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য তাহাকে নিয়মিত 'ভিটামিল্ক' খাইতে দিন।
Vitamilk
ভিটা-মিল্ক
বিশুদ্ধ·পুষ্টিকর·সুস্বাদু
ন্যাশনাল নিউট্রিমেন্টস্ লিঃ · কলিকাতা
দ্বাদশ বর্ষ—কার্ত্তিক, ১৩৫১]
[১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা

কেমন সুন্দর
দেখায়!
সানসাইন
এভারবিউটি

যুদ্ধকালে পীড়িত ও আহতদের সেবা করা ব্যতীত উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কি থাকিতে পারে? পীড়িত ও আহত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণরূপে এই কোমল ও পটু হস্তের সেবার উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষিত নার্সের সাহায্য ব্যতীত ডাক্তারগণ এবং তাঁহাদের বিজ্ঞান উভয়ই রুগীদের ন্যায় অসহায় হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমানে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের জন্য বহু সংখ্যক মহিলার প্রয়োজন।

যাহাদের জন্য যুদ্ধজয় সুনিশ্চিত, তাহাদিগকে সেবা করার জন্য দ্বিধা এবং সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হউন।

পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই; কারণ, কার্য্যে নিয়োগ করার পূর্ব্বে কিছুদিন শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহাদের পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা আছে, তাহারা সরাসরি ভাবে কার্য্যে গৃহীত হইতে পারেন।

পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা থাকিলে অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হয়।

সন্তোষজনক কার্য্য-সমাপ্তির পর এককালীন কিছু টাকা দেওয়া হয়।

সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত যে সমস্ত নার্স আই. এম্. এন. এস্.-এর দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম, তাহারা বিশেষ সর্ত্তে এ. এন্. এস্.-এ যোগদান করিতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন:

লেডী সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, সেণ্ট জন্ এম্বুলেন্স ব্রিগেড।
৫নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস, কলিকাতা।

আপনি যদি এই ঠিকানা অনুসন্ধান করিতে অক্ষম হন্, তাহা হইলে এই ঠিকানায় লিখুন:
ডাইরেক্টর জেনারেল,
ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস্, নিউ দিল্লী।

ভারত সেবা করিতে

এ. এন. এস.-এ

যোগদান করুন।

অক্জিলারী নার্সিং সার্ভিস

Two points are
VITAL
SAFE
PROFITABLE
Bank with
SREE BANK LTD
3-1, BANKSHALL STREET, CALCUTTA

আমরা নামমাত্র খরচায়

আপনার পার্শেল ইত্যাদি

শিয়ালদহে এবং শিয়ালদহ হইতে

কলিকাতার যে কোন স্থানে

সর্ব্বদা পৌঁছাইয়া দিয়া থাকি।

কোং (বেঙ্গল) লিমিটেড্

দি মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউস্

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

মিঃ বি. সেন, এটর্নি-এাট্-ল মহোদয়ের

সহযোগিতায় শীঘ্রই খোলা হইবে।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লি

হেড অফিস:

১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

পোষ্ট বক্স—২৪০৬ টেলিগ্রাম "লেনদেন" কলি:

মদনানন্দ ট্যাবলেট

আয়ুর্ব্বেদোক্ত "মদনানন্দ মোদক" সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ও পৌরুষহীনতায় বহুশতাব্দী-প্রচলিত শ্রেষ্ঠ রসায়ন। তাহাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে Vitamin ও Calcium সহযোগে নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় Tablet আকারে প্রস্তুত করা হইয়াছে। "মদনানন্দ ট্যাবলেট" স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও শুক্রহীনতায় অব্যর্থ মহৌষধ। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী ও Dyspepsia দূর করিয়া ক্ষুধা ও হজমশক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহার ন্যায় ঔষধ আর নাই। নূতন রক্ত ও বীর্য্য সৃষ্টি করিয়া ও সুনিদ্রা আনয়ন করিয়া ইহা মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন সঞ্চার করে। যাঁহারা কাঁচা "মদনানন্দ" সেবনে উপকার পান নাই, তাঁহারা একবার আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে প্রস্তুত "মদনানন্দ ট্যাবলেট"-এর নমুনা ব্যবহার করিয়া দেখুন—নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন।

ছোট শিশি (৩২ ট্যাবলেট) ১৲—ডাকব্যয় ॥০। বড় শিশি (৮০ ট্যাবলেট) ২৲—ডাকব্যয় ॥০।

ভাস্কর লবণ ট্যাবলেট

আয়ুর্ব্বেদোক্ত "ভাস্কর লবণ"-এর নাম এবং গুণের সহিত সকলেই পরিচিত আছেন। "ভাস্কর লবণ"-এর সহিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কয়েকটি অগ্নিশক্তিবর্দ্ধক এবং পাচক ঔষধির সংমিশ্রণে, নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় ট্যাবলেট-আকারে "ভাস্কর লবণ ট্যাবলেট" সর্ব্ববিধ অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, Dyspepsia, বুক-জ্বালা করা, চোঁয়া ঢেকুর উঠা, পেটে বায়ু হওয়া ও বদহজম-জনিত কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি রোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ। ট্যাবলেট-আকারে প্রস্তুত বলিয়া ব্যবহারেও অত্যন্ত সুবিধাজনক। খাইতে সুস্বাদু হওয়ায় শিশুরাও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবে। ইহার নিয়মিত ব্যবহারে সকলেই নব-জীবন লাভ করিবেন। "ভাস্কর লবণ ট্যাবলেট" বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Digestive Tonic.

ছোট শিশি (৩২ ট্যাবলেট) ৸০—ডাকব্যয় ॥০। বড় শিশি (৮০ ট্যাবলেট) ১।০—ডাকব্যয় ॥০।

দিল্লী অফিসে পোষ্টেজ ও প্যাকিং-এর জন্য ৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে বিনামূল্যে উভয় প্রকার ট্যাবলেটের নমুনা পাঠান হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন। সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক।

এজেণ্ট—

দিল্লী আয়ুর্ব্বেদ ফার্ম্মেসী

৮০, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও ২৯, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা।

কল্যাণী ষ্টোর্স—গোধোলিয়া, বেনারস।

BHARAT AYURVED LABORATORY P. B. 158 DELHI

পরিবেশনাঃ—কাপুরচাঁদ লিমিটেড

বঙ্গশ্রীর নিবেদন ও নিয়মাবলী

"বঙ্গশ্রী"র বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।০ টাকা। ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥/০ আনা। মূল্যাদি—কর্ম্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী, C/o মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আষাঢ় হইতে "বঙ্গশ্রী"র বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া চলে।

প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। ফেরতের জন্য ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হয়। যে-মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তদন্তের ফল আমাদিগকে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য থাকিব না।

বিজ্ঞাপনের হার পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

বাংলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ না আসিলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার।

১২শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা] [কার্ত্তিক—১৩৫১

বিষয়-সূচী

[পর পৃষ্ঠায়

বিষয়-সূচী — পূর্ব্বানুবৃত্তি

আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও দেশবাসী সর্ব্বসাধারণকে আমাদের বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি।

চিত্র-সূচী

বিস্তৃত ও সরল
টিপ্পনী
বঙ্গীয় সংস্করণ
রামায়ণ

লক্ষ্মীর বার্ত্তা চির কল্যাণময়,
দুঃখের আঁধারে আনে আনন্দের জয়।
সঞ্চয়ের অর্ঘ্যভারে অর্চ্চনা তাঁর,
দেশে দেশে শুনি স্তুতি দেবী কমলার।

অর্থগৃধ্নুতা আর অর্থ সঞ্চয় এক বস্তু নয়॥
সঞ্চয়ের পথে যাদের প্রশান্ত দৃষ্টি,
লক্ষ্মীর কল্যাণ-আশীষ তাদেরই শিরে।

কলিকাতা।

"মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে—"

[ফটো— শ্রীগৌরচরণ বসু

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যার নাম এবং উহা সমাধানের সঙ্কেতের নাম

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

"বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যার নাম এবং উহা সমাধানের সঙ্কেতের নাম"-শীর্ষক প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় আঠার শ্রেণীর। যে আঠার শ্রেণীর কথা এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়, সেই আঠার শ্রেণীর কথা আমরা গত সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি।

আমাদিগের ঐ আঠার শ্রেণীর কথা প্রধানতঃ পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত, যথা :

(১) বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যাসমূহের মূল সমস্যা-নির্দ্ধারণ-সংক্রান্ত কথা ;

(২) সমস্যা-সমাধানের গুরুত্ব ও দুরূহত্ব-সংক্রান্ত কথা ;

(৩) সমস্যা-সমাধানের সঙ্কেত-নির্দ্ধারণ-সংক্রান্ত কথা ;

(৪) সমস্যা-সমাধানের সঙ্কেত কার্য্যে পরিণত করিবার সংগঠন ও পরিকল্পনা-নির্দ্ধারণের দুরূহত্ব-সংক্রান্ত কথা ;

(৫) সমস্যা-সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় বর্জ্জন-সংক্রান্ত কথা।

আমাদিগের আঠার শ্রেণীর বক্তব্য বিষয়ের পাঁচটী বিভাগের এক একটী বিভাগের বক্তব্যের বিবরণ ও যুক্তি আমরা অতঃপর ক্রমে বিবৃত করিব।

(১)

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যাসমূহের মূল সমস্যা-নির্দ্ধারণ-সংক্রান্ত কথার বিবরণ ও যুক্তি

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যাসমূহের মূল সমস্যা-নির্দ্ধারণ-সংক্রান্ত কথার বিবরণ ও যুক্তি প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর আলোচনায় বিভক্ত করা হইবে, যথা :

(১) মানবসমাজের সমস্যাসমূহের মূল সমস্যার নাম ;

(২) অভাব-সমস্যা ও বর্ত্তমান যুদ্ধনিবৃত্তি-সমস্যার প্রাধান্যের যুক্তি ;

(৩) মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন অবস্থার শ্রেণীবিভাগ ;

(৪) বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের দারিদ্র্যাবস্থা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধতার যুক্তি ;

(৫) মনুষ্যসমাজের অভাব-সমস্যার ও বর্ত্তমান যুদ্ধনিবৃত্তির সমস্যার সর্ব্বতোভাবে সমাধানের সম্ভবযোগ্যতা সম্বন্ধে যুক্তি।

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা অসংখ্য। ঐ অসংখ্য সমস্যাসমূহের মূল কারণ "অভাব-সমস্যা"। অভাব-সমস্যার সমাধান হইলে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের অন্যান্য প্রত্যেক সমস্যার সমাধান স্বতঃসিদ্ধ হয়। উহা হয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের নিবৃত্তি না হইলে অভাব-সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে এবং অভাব-সমস্যার সমাধান না হইলে বর্ত্তমান যুদ্ধের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। এই কারণে অভাব-সমস্যা যেরূপ বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যাসমূহের একটী মূল সমস্যা, সেইরূপ বর্ত্তমান যুদ্ধনিবৃত্তির সমস্যাও বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্যাসমূহের একটী মূল সমস্যা।

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন সমস্যাসমূহের মধ্যে অভাব-সমস্যা ও বর্ত্তমান যুদ্ধনিবৃত্তির সমস্যাকে মূল সমস্যা বলিয়া ধরিতে হয় কেন তাহার যুক্তি দেখান "অভাব-সমস্যা ও বর্ত্তমান যুদ্ধনিবৃত্তি-সমস্যার প্রাধান্যের যুক্তি"-শীর্ষক আলোচনার অভিপ্রায়।

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজ তাহার অভাবের অবস্থার শেষ সীমানায় উপনীত হইয়াছে। মনুষ্য-সমাজের অভাবের অবস্থার শেষ সীমানার নাম মনুষ্যসমাজের দারিদ্র্যাবস্থা। মনুষ্যসমাজ তাহার অভাবের অবস্থার শেষ সীমানায় উপনীত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের বিচারানুসারে সর্ব্বাগ্রে অভাব-সমস্যার সমাধান হওয়া অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের কর্ণধার যে শাসক-সম্প্রদায়, তাঁহারা মনুষ্যসমাজে যে উল্লেখযোগ্যভাবে অভাব-সমস্যা বিদ্যমান আছে—তাহাই স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন না। প্রত্যেক দেশে প্রতিবৎসর যে যে বাৎসরিক শাসন-বিবরণী প্রকাশিত হয়, ঐ সমস্ত শাসন-বিবরণী পাঠ করিলে প্রত্যেক দেশের শাসকসম্প্রদায়ের মতবাদানু-সারে প্রত্যেক দেশেই ঐশ্বর্য্য অগ্রগতি লাভ করিতেছে—ইহা মনে করিতে হয়। এই কারণে মনুষ্যসমাজের কোথাও যে কোনরূপ ঐশ্বর্য্য প্রগতিলাভ করিতেছে না—পরন্তু মনুষ্যসমাজের সর্ব্বত্রই যে দারিদ্র্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয়।

"মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন অবস্থার শ্রেণীবিভাগ" বিষয়ে এবং "বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের দারিদ্র্যাবস্থা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধতার যুক্তি" বিষয়ে আলোচনা করিবার অভিপ্রায়—বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে যে দারিদ্র্যাবস্থা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং কোন শ্রেণীর ঐশ্বর্য্য প্রকৃতভাবে অগ্রগতি লাভ করিতেছে না—তাহা দেখান।

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা-সমূহের সমাধান করিতে হইলে মানুষের অভাব-সমস্যার ও যুদ্ধ-সমস্যার সমাধান করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের নীতিবিদ্‌গণের মতবাদানুসারে মানুষের অভাব-সমস্যার ও যুদ্ধ-সমস্যার সর্ব্বতোভাবে সমাধান করা কখনও সম্ভব-যোগ্য হয় না। এই কারণে—মানুষের অভাব-সমস্যা ও যুদ্ধ-সমস্যার সর্ব্বতোভাবে সমাধান করা যে মানুষের সাধ্যান্তর্গত ও সম্ভবযোগ্য, তাহা দেখাইবার প্রয়োজন হয়।

"মনুষ্যসমাজের অভাব-সমস্যা ও যুদ্ধসমস্যার সর্ব্বতোভাবে সমাধানের সম্ভবযোগ্যতা সম্বন্ধে যুক্তি" বিষয়ে আলোচনার অভিপ্রায়—মানুষের অভাব-সমস্যা ও যুদ্ধ-সমস্যা সর্ব্বতোভাবে

সমাধান করা যে মানুষের সাধ্যান্তর্গত ও সম্ভবযোগ্য—তাহা দেখান।

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যাসমূহের মূল সমস্যার নাম

আমাদিগের মতে সমগ্র মানবসমাজের বর্ত্তমান সমস্যাসমূহের মূল সমস্যা দুই শ্রেণীর, যথা :

(১) সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী বর্ত্তমান যুদ্ধনিবৃত্তির সমস্যা এবং

(২) সমগ্র মানবসমাজব্যাপী দারুণ অভাব-সমস্যা।

আপাতদৃষ্টিতে সমগ্র মানবসমাজের বর্ত্তমান সমস্যা অসংখ্য। যদিও আপাতদৃষ্টিতে সমগ্র মানবসমাজের বর্ত্তমান সমস্যা অসংখ্য, তথাপি আমাদিগের বিচারানুসারে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে অন্যান্য সমস্যার প্রত্যেকটীর সমাধান স্বতঃই অবশ্যম্ভাবী হয়। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে অন্যান্য সমস্যার প্রত্যেকটীর সমাধান স্বতঃই অবশ্যম্ভাবী হয় বলিয়া আমরা উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সমস্যাকে বর্ত্তমান মানবসমাজের একমাত্র সমস্যা বলিয়া মনে করি।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে যে অন্যান্য প্রত্যেক শ্রেণীর সমস্যার সমাধান হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয় তাহা দেখাইতে হইলে "বর্ত্তমান যুদ্ধনিবৃত্তি-সমস্যা" ও "অভাব-সমস্যা"—এই দুইটী কথায় আমরা কি কি বুঝি তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধ নিবৃত্তি-সমস্যা

সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী বর্ত্তমান যুদ্ধের শান্তি স্থাপন করিবার কার্য্যে যে সমস্ত শক্ত প্রশ্ন আছে সেই সমস্ত শক্ত প্রশ্নকে আমরা যুদ্ধ-সমস্যা বলিয়া অভিহিত করি।

অভাব-সমস্যা কথাটীর অর্থ

সমগ্র মানবসমাজব্যাপী বর্ত্তমান অভাবসমূহ দূর করিবার কার্য্যে যে সমস্ত শক্ত প্রশ্ন আছে সেই সমস্ত শক্ত প্রশ্নকে আমরা অভাব-সমস্যা বলিয়া অভিহিত করি।

বর্ত্তমান মানবসমাজের সমস্যাসমূহের মধ্যে বর্ত্তমান যুদ্ধ নিবৃত্তি-সমস্যা ও অভাব-সমস্যার প্রাধান্যের যুক্তি

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে যত শ্রেণীর সমস্যা আছে সেই সমস্ত সমস্যার মধ্যে, আমাদিগের বিচারানুসারে, প্রধান সমস্যা—"বর্ত্তমান যুদ্ধ-নিবৃত্তি-সমস্যা" ও "অভাব-সমস্যা"।

আমাদিগের বিচারানুসারে মানুষের অভীষ্ট পদার্থসমূহের কোনটীর অভাবের উদ্ভব হইলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে দ্বন্দ্ব-কলহের কার্য্য চলিতে আরম্ভ করে। মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের কার্য্য চলিতে থাকিলে মানুষের অভাব ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি লাভ করে। মানুষের অভাবসমূহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়; মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারির ও যুদ্ধের কার্য্য চলিতে আরম্ভ করে।

মানুষের অভাবসমূহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি যত অধিক হয় মানুষের পরস্পরের মধ্যের মারামারির ও যুদ্ধের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি তত অধিক হয়।

মানুষের অভাবসমূহের উদ্ভব না হইলে মানুষের পরস্পরের মধ্যের দ্বন্দ্ব ও কলহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি ঘটিতে পারে না। মানুষের পরস্পরের মধ্যের দ্বন্দ্ব ও কলহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি না ঘটিলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইতে পারে না; মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব না হইলে মনুষ্যসমাজে মারামারির ও যুদ্ধের সূচনা পর্য্যন্ত হইতে পারে না। মনুষ্যসমাজে মারামারির ও যুদ্ধের সূচনা না হইলে যুদ্ধের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি হওয়া কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

উপরোক্ত যুক্তিবাদ যে সর্ব্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ঐ যুক্তিবাদ কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না।

উপরোক্ত যুক্তিবাদানুসারে মনুষ্যসমাজের যুদ্ধের ব্যাপকতার ও বৃদ্ধির প্রধান কারণ মনুষ্যসমাজের মারামারির ও যুদ্ধের সূচনা; মনুষ্যসমাজের মারামারির ও যুদ্ধের সূচনার প্রধান কারণ—মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি; মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির প্রধান কারণ—মানুষের পরস্পরের মধ্যের দ্বন্দ্ব ও কলহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি; মানুষের পরস্পরের মধ্যের দ্বন্দ্ব ও কলহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধির প্রধান কারণ—মানুষের বিবিধ শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের অভাব।

উপরোক্ত যুক্তিবাদ অনুসরণ করিলে আমাদিগের বিচারানুসারে তিন শ্রেণীর সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হয়, যথা :

(১) মানুষের বিবিধ শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের অভাব মনুষ্য-সমাজে মারামারি হওয়ার ও যুদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ;

(২) মারামারির ও যুদ্ধের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি যখন মনুষ্য-সমাজে অত্যন্ত অধিক হয় তখন মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের সর্ব্বপ্রকার অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার পন্থা স্থির করিতে না পারিলে এবং ঐ পন্থানুসারে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে—অন্য কোন উপায়ে মনুষ্যসমাজের মারামারি ও যুদ্ধ দূর করা অথবা নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও হয় না।

(৩) মারামারির ও যুদ্ধের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি যখন মনুষ্যসমাজে অত্যন্ত অধিক হয় তখন উহা দূর করিবার ও নিবারণ করিবার প্রধান পন্থা—মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের সর্ব্বশ্রেণীর অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করা।

মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের সর্ব্বশ্রেণীর অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা-সাধন করিতে পারিলে একদিকে যেরূপ মনুষ্যসমাজের মারামারি ও যুদ্ধ করা নিবারণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয় সেইরূপ আবার মানুষের ও মনুষ্যসমাজের অন্যান্য সর্ব্বশ্রেণীর সমস্যা দূর করা এবং নিবারণ করাও স্বতঃসিদ্ধ হয়। ইহার কারণ মানুষের কোন শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের কোনরূপ অভাবের উদ্ভব হইলে, ঐ অভাব দূর করিবার কার্য্যে যে সমস্ত শক্ত প্রশ্নের উদ্ভব হয় সেই সমস্ত প্রশ্নকে মানুষের ও মনুষ্যসমাজের "সমস্যা" বলা হয়। মানুষের ও মনুষ্য-সমাজের "সমস্যা" কাহাকে বলে—তাহা বুঝিতে পারিলে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের সর্ব্বশ্রেণীর অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সাধন করিতে পারিলে মানুষের অথবা মনুষ্যসমাজের কোন শ্রেণীর সমস্যার উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও সম্ভবযোগ্য হয় না।

মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের সর্ব্বশ্রেণীর অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা-সাধন করিতে পারিলে মানুষের ও মনুষ্যসমাজের মারামারি, যুদ্ধ ও সর্ব্ববিধ সমস্যা দূর করা ও নিবারণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের সর্ব্বশ্রেণীর অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা-সাধন করা সহজ-সাধ্য নহে। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না পারিলে উহার পরিকল্পনা অথবা সংগঠন নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। উহার পরিকল্পনা ও সংগঠন নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে নানা রকমের শক্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। এই হিসাবে উপরোক্ত পরিকল্পনা ও সংগঠন নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্যকে একশ্রেণীর "সমস্যা" বলিতে হয়। মানুষের সর্ব্বশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের সর্ব্বশ্রেণীর অভাব সর্ব্বতো-ভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থাকে "অভাব-সমস্যার-সমাধান" করিবার কার্য্য বলিতে হয়।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে মানুষের ও মনুষ্যসমাজের অভাব-সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে মানুষের ও মনুষ্যসমাজের মারামারি, যুদ্ধ ও সর্ব্ববিধ সমস্যা দূর করা ও নিবারণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয়। উহা স্বতঃসিদ্ধ হয় বলিয়া যখনই মানুষের অথবা মনুষ্যসমাজের কোন শ্রেণীর সমস্যার উদ্ভব হয় তখন ঐ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে অভাব-সমস্যার সমাধান করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই কারণে অভাব-সমস্যাকে মানুষের ও মনুষ্যসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর অবস্থার সর্ব্বশ্রেণীর সমস্যার প্রধান সমস্যা বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়।

অভাব-সমস্যা মানুষের ও মনুষ্যসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর অবস্থার সর্ব্বশ্রেণীর সমস্যার প্রধান সমস্যা বটে, এবং অভাব-সমস্যার সমাধান না হইলে মানুষের কোন শ্রেণীর সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মারামারি ও যুদ্ধের ব্যাপকতা যখন সমগ্র ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জল ও স্থলময় হয় তখন এ যুদ্ধ-নিবৃত্তি-সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে অন্য কোন ক্রমে অভাব-সমস্যার সমাধান করা সম্ভবযোগ্য হয় না। একদিকে অভাব-সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে যুদ্ধনিবৃত্তি-সমস্যার সমাধান করা সম্ভবযোগ্য হয় না এবং অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, যুদ্ধ-নিবৃত্তির-সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে অভাব-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব-যোগ্য হয় না।

উপরোক্ত কারণে, মারামারির ও যুদ্ধের ব্যাপকতা যখন সমগ্র ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জল ও স্থলময় হয়, তখন মানুষের অথবা মনুষ্য-সমাজের সমস্যার সমাধান করিতে হইলে যুগপৎভাবে যুদ্ধ-নিবৃত্তি সমস্যার এবং অভাব-সমস্যার সমাধান করা অপরিহার্য্য-ভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ সমগ্র ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জল ও স্থলময় ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে বলিয়া আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের প্রধান সমস্যা—"বর্ত্তমান যুদ্ধ-নিবৃত্তি-সমস্যা" ও "অভাব-সমস্যা"। যুগপৎভাবে ঐ দুইটী সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের অন্যান্য প্রত্যেক সমস্যার সমাধান হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে ও হইবে।

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে অভাবের বিদ্যমানতা বিষয়ে মতবাদ

বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের অবস্থা সর্ব্বতোভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যদিও বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে যুদ্ধ-সমস্যার ও অভাব-সমস্যার যুগপৎ সমাধান করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়, তথাপি ঐ উভয়বিধ সমস্যাকে বর্ত্তমান সমস্যাসমূহের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া ধরা চলে না। বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যাসমূহের একমাত্র সাক্ষাৎ কারণ—মানুষের ও মনুষ্যসমাজের অভাবগ্রস্ততা। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, মানুষের বিবিধ শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের অভাব না থাকিলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি হইতে পারে না; মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি না ঘটিলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইতে পারে না; মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব না হইলে মনুষ্যসমাজে মারামারির ও যুদ্ধের সূচনা হইতে পারে না। ঐ হিসাবে মনুষ্যসমাজে মারামারির ও যুদ্ধের সূচনা দেখিলেই ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে মানুষের বিবিধশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের অভাবের উদ্ভব হইয়াছে।

মনুষ্যসমাজে মারামারি ও যুদ্ধ বিদ্যমান থাকিলে মানুষের বিবিধশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের অভাব বিদ্যমান আছে ইহা বিচারা-নুসারে বুঝিতে হয় বটে এবং ঐ হিসাবে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে যে বিবিধশ্রেণীর অভাব বিদ্যমান আছে তাহা কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না বটে কিন্তু বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশেই এমন একদল মানুষ আছেন যাঁহারা মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের অভাবের বিদ্যমানতা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে চাহেন না। ইহাদের অনেকেই প্রত্যেক দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক দেশের বাৎসরিক শাসন বিবরণে ইহারা মানুষের ঐশ্বর্য্যের উন্নতির কথা শাসিতগণকে শুনাইয়া থাকেন।

ঐ সমস্ত বাৎসরিক শাসন-বিবরণ লক্ষ্য করিলে ইহা মনে করিতে হয় যে কোন দেশেই মানুষের অভীষ্ট পদার্থের অভাব উল্লেখযোগ্য ভাবে বিদ্যমান নাই; পরন্তু প্রত্যেক দেশেই ঐশ্বর্য্য উল্লেখযোগ্য ভাবে বিদ্যমান আছে।

আমাদিগের বিচারানুসারে শাসকবর্গের উপরোক্ত বাৎসরিক শাসন-বিবরণ তাঁহাদিগের জ্ঞান-গত দারিদ্র্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমাদিগের মতবাদানুসারে মনুষ্যসমাজে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ঐ তিন শ্রেণীর অবস্থার নাম—(১) মানুষের প্রাচুর্য্যাবস্থা, (২) মানুষের অভাবের অবস্থা এবং (৩) মানুষের দারিদ্র্যের অবস্থা। আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজ মানুষের চরম দারিদ্র্যের অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যেক শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে চরম দারিদ্র্যে উপনীত হইয়াছেন।

আমাদিগের উপরোক্ত বিচার যে যুক্তি-যুক্ত তাহা দেখাইতে হইলে প্রথমতঃ মানুষের অভাবের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে, দ্বিতীয়তঃ, মানুষের স্বাস্থ্যের ও স্বাস্থ্যাভাবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে; তৃতীয়তঃ, মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্যের ও শারীরিক স্বাস্থ্যাভাবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে; চতুর্থতঃ, মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্যের ও ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্যাভাবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে; পঞ্চমতঃ, মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ও মানসিক স্বাস্থ্যাভাবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে; ষষ্ঠতঃ, মানুষের বুদ্ধির স্বাস্থ্যের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যাভাবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে, সপ্তমতঃ, মানুষের স্বাস্থ্যের ও স্বাস্থ্যাভাবের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে; অষ্টমতঃ, মানুষের ধনের ও ধনাভাবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে; নবমতঃ, মানুষের প্রতিষ্ঠার ও প্রতিষ্ঠার অভাবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে; দশমতঃ, মানুষের তৃপ্তির ও তৃপ্তির অভাবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে; একাদশতঃ, মানুষের সম্মানের ও সম্মানাভাবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে; দ্বাদশতঃ, মানুষের জ্ঞানের ও জ্ঞানাভাবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে; ত্রয়োদশতঃ মানুষের অভাব যে ছয় শ্রেণীর অতিরিক্ত হইতে পারে না তাহার যুক্তি সম্বন্ধে, চতুর্দ্দশতঃ, মানুষের অভাবাবস্থা ও দারিদ্র্যাবস্থার পার্থক্য সম্বন্ধে; পঞ্চদশতঃ, মনুষ্যসমাজের ও মানুষের প্রাচুর্য্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে; এবং ষোড়শতঃ, মনুষ্যসমাজের ও মানুষের দারিদ্র্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে—আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়।

মনুষ্যসমাজের ও মানুষের দারিদ্র্যাবস্থার বৈশিষ্ট কি কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজ এবং প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ যে দারিদ্র্যের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

আমরা অতঃপর ক্রমে ক্রমে উপরোক্ত ষোলটী বিষয়ের আলোচনা করিব।

মানুষের অভাবের শ্রেণী-বিভাগ

আপাতদৃষ্টিতে মানুষের অভাব অসংখ্য শ্রেণীর, কিন্তু ঐ অসংখ্য শ্রেণীর অভাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে মানুষের অভাব অসংখ্য শ্রেণীর বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহা অসংখ্য শ্রেণীর নহে। মানুষের অভাব কত শ্রেণীর হইতে পারে ও হইয়া থাকে তাহা বিচার করিতে বসিলে দেখা যায় যে, মানুষ যাহা যাহা পাইবার অভিলাষ করেন তাহার কোনটী না পাইলে মানুষ অভাব অনুভব করেন এবং সেই হিসাবে মানুষের অভাব সর্ব্বসমেত ছয় শ্রেণীর হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কোনও মানুষের অভাব ছয় শ্রেণীর অধিক হইতে পারে না। মানুষের ছয় শ্রেণীর অভাবের নাম—

(১) স্বাস্থ্যাভাব;
(২) ধনাভাব;
(৩) প্রতিষ্ঠাভাব;
(৪) তৃপ্তির অভাব;
(৫) সম্মানাভাব;
(৬) জ্ঞানাভাব।

কোনও মানুষের অভাব যে ছয় শ্রেণীর অধিক হইতে পারে না তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে হইলে মানুষের স্বাস্থ্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, তৃপ্তি, সম্মান এবং জ্ঞান এই ছয়টী কথার কোন্‌টীতে কি বুঝায় তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়

মানুষের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যাভাবের সংজ্ঞা

মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির মনুষ্যোচিত অবস্থার নাম মানুষের "স্বাস্থ্য।"

মানুষের শরীরের মনুষ্যোচিত অবস্থার অথবা ইন্দ্রিয়ের মনুষ্যোচিত অবস্থার অথবা মনের মনুষ্যোচিত অবস্থায় অথবা বুদ্ধির মনুষ্যোচিত অবস্থার অভাব হইলে মানুষের স্বাস্থ্যের অভাব হয়। শরীরেরই হউক, অথবা ইন্দ্রিয়েরই হউক, অথবা মনেরই হউক, অথবা বুদ্ধিরই হউক—এই চারি শ্রেণীর যে কোন একটি শ্রেণীর মনুষ্যোচিত অবস্থার অভাবের নাম মানুষের "স্বাস্থ্যাভাব"।

মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের ও বুদ্ধির মনুষ্যোচিত অবস্থা এবং মনুষ্যোচিত অবস্থার অভাব কাহাকে বলে তাহা আমরা ইহার পরে বিবৃত করিব।

মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক স্বাস্থ্যাভাবের সংজ্ঞা

মানুষের মস্তিষ্ক, মুখ, স্কন্ধ, কণ্ঠ, হস্ত, বুক, পেট, পদ প্রভৃতি শরীরের অঙ্গসমূহ যখন সুব্যবস্থিতভাবে (well proportionate) বিদ্যমান থাকে তখন মানুষের শরীরের মনুষ্যোচিত অবস্থা (অর্থাৎ মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য) বজায় আছে ইহা বুঝিতে হয়। যখন মানুষের মুখ, তাহার মস্তিষ্ক অথবা স্কন্ধ অথবা কণ্ঠ অথবা হস্ত অথবা বুক অথবা পেট প্রভৃতির তুলনায় বেমানান হয় তখন মানুষের শরীরের মনুষ্যোচিত অবস্থা বজায় নাই—ইহা বুঝিতে হয়। মানুষের শরীরের কোন একটি অথবা একাধিক অঙ্গ অন্য কোন একটী অথবা একাধিক অঙ্গের তুলনায় বেমানান হইলে মানুষের শরীরের "স্বাস্থ্যাভাব" ঘটিয়াছে—ইহা বুঝিতে হয়।

মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যাভাবের সংজ্ঞা

মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হস্ত, পদ ও লিঙ্গ প্রভৃতি

ইন্দ্রিয় যখন সমান ভাবে কার্য্যক্ষম থাকে এবং যখন একটী অথবা একাধিক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যক্ষমতা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্যক্ষমতার তুলনায় অসমান হয় না তখন মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের মনুষ্যোচিত অবস্থা (অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য) বজায় আছে ইহা বুঝিতে হয়। মানুষের সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যক্ষমতা সমান না হইলে কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যব্যস্ততা বেশী হওয়া এবং কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যব্যস্ততা অল্প হওয়া অনিবার্য্য হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য্যব্যস্ততার রকম বিভিন্ন হওয়া অনিবার্য্য বটে কিন্তু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য্যব্যস্ততার পরিমাণ বিভিন্ন হওয়া অনিবার্য্য নহে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য্যব্যস্ততার পরিমাণ বিভিন্ন হইলে মানুষের মনুষ্য-স্বভাববিরুদ্ধ ও পশুস্বভাব-সম্মত উচ্ছৃঙ্খলতা অনিবার্য্য হয়। মানুষের মনুষ্যস্বভাববিরুদ্ধ ও পশুস্বভাবসম্মত উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্ভব হইলে তাঁহার ইন্দ্রিয়-সমূহের মনুষ্যোচিত অবস্থা (অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্য) বজায় নাই ইহা বুঝিতে হয়।

মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যাভাবের সংজ্ঞা

মনের স্থিরতা থাকিলে উহার মনুষ্যোচিত অবস্থা (অর্থাৎ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য) বজায় আছে—ইহা বুঝিতে হয়। মনে অস্থিরতা থাকিলে উহার মনুষ্যোচিত অবস্থা বজায় নাই ইহা বুঝিতে হয়।

মানুষের বুদ্ধির স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যাভাবের সংজ্ঞা

বুদ্ধির বিচারশক্তি থাকিলে উহার মনুষ্যোচিত অবস্থা (অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধির স্বাস্থ্য) বজায় আছে—ইহা বুঝিতে হয়। বিচার-শক্তির স্থলে মতবাদপ্রবণতা অথবা সংস্কারপ্রবণতা বিদ্যমান থাকিলে বুদ্ধির মনুষ্যোচিত অবস্থা বজায় নাই—ইহা বুঝিতে হয়।

মানুষের স্বাস্থ্যের ও স্বাস্থ্যাভাবের শ্রেণীবিভাগ

"শরীরের স্বাস্থ্য", "ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য", "মনের স্বাস্থ্য" এবং "বুদ্ধির স্বাস্থ্য" এই চারিটী কথার কোনটীতে কি বুঝায় তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিলে দেখা যায় যে, মানুষের স্বাস্থ্য চারিশ্রেণীর, যথা :

(১) শরীর-গত স্বাস্থ্য ;
(২) ইন্দ্রিয়-গত স্বাস্থ্য ,
(৩) মন-গত স্বাস্থ্য , এবং
(৪) বুদ্ধি-গত স্বাস্থ্য।

মানুষের স্বাস্থ্য যেরূপ চারিশ্রেণীর সেইরূপ মানুষের স্বাস্থ্যা-ভাবও চারিশ্রেণীর, যথা :

(১) শরীর-গত স্বাস্থ্যাভাব ,
(২) ইন্দ্রিয়-গত স্বাস্থ্যাভাব ,
(৩) মন-গত স্বাস্থ্যাভাব ; এবং
(৪) বুদ্ধি-গত স্বাস্থ্যাভাব।

মানুষের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যাভাব সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিবার প্রয়োজন, তাহা জানিতে পারিলে দেখা যায় যে, মানুষের চারিশ্রেণীর স্বাস্থ্যের প্রত্যেক শ্রেণীর স্বাস্থ্য মনুষ্যোচিত অবস্থায় বজায় থাকিলে মানুষের স্বাস্থ্য বজায় থাকে। কোনও একশ্রেণীর স্বাস্থ্যের মনুষ্যোচিত অবস্থার অভাব হইলে মানুষের চারিশ্রেণীর স্বাস্থ্যের অভাব হয়।

মানুষের ধন ও ধনাভাবের সংজ্ঞা

মানুষের প্রাণ বজায় রাখিবার জন্য আহার বিহারাদির যে সমস্ত কার্য্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, সেই সমস্ত কার্য্যের জন্য যেসমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, সেই-সমস্ত সামগ্রীকে "ধন" বলা হয়। ঐ সমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন অনুরূপ প্রাচুর্য্যের নাম "ধন-প্রাচুর্য্য"। ঐ সমস্ত সামগ্রীর কোনও একটীর অভাব হইলে মানুষের ধনাভাব হইয়া থাকে।

মানুষের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাভাবের সংজ্ঞা

মানুষের প্রতিষ্ঠা বলিতে বুঝায়—মানুষের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জীবিকার্জ্জনের বৃত্তি, ধনগত অবস্থা, মানুষের কর্ম্মগত অবস্থা, মানুষের জ্ঞানগত অবস্থা এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যের সম্বন্ধ বিষয়ে স্থায়িত্ব। আজ এক রকমের স্বাস্থ্য, কাল আর একরকমের স্বাস্থ্য ; আজ একস্থানে বাস, কাল আর একস্থানে বাস ; জীবিকা-র্জ্জনের জন্য আজ একরকমের বৃত্তি, কাল আর একরকমের বৃত্তি ; আজ ধনী, কাল দরিদ্র , আজ অতিরিক্ত কর্ম্মে ব্যস্ত, কাল বেকার অথবা অলস . আজ বিদ্যাচর্চ্চায় নিরত, কাল বিদ্যাচর্চ্চায় অক্ষমতা ; আজ বন্ধু, কাল শত্রু ; এতাদৃশ অস্থায়ী অবস্থার নাম "প্রতিষ্ঠাগত অভাব"।

মানুষের তৃপ্তি ও তৃপ্তির অভাবের সংজ্ঞা

যুগপৎভাবে শরীরের পুষ্টি, ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও আরাম, মনের স্থিরতা ও শান্তি, বুদ্ধির ধীরতা ও বিচারশক্তি রক্ষিত হইলে মনের যে অবস্থার উদ্ভব হয়—সেই অবস্থার নাম "তৃপ্তি"। মানুষের যখন জ্ঞানাভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন মানুষের জ্ঞানগত দারিদ্র্যের উদ্ভব হয় মানুষের জ্ঞানগত দারিদ্র্যের উদ্ভব হইলে মানুষ তাঁহার শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির যে কোন একটীর আরাম হইলে তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকেন। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই চারিটী অংশের যুগপৎ-ভাবে আরাম না হইয়া কোন একটী অংশের আরাম হইলে যে অবস্থার উৎপত্তি হয়, সেই অবস্থা তৃপ্তির অবস্থা নহে ; উহা "উত্তে-জনার অবস্থা"। ঐজাতীয় তৃপ্তির সহিত বিষাদ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। যাহা প্রকৃত তৃপ্তি তাহার সঙ্গে বিষাদ থাকিতে পারে না ও থাকে না। মানুষের উত্তেজনার অবস্থা তাহার তৃপ্তির অভাবের অবস্থা।

মানুষের সম্মান ও সম্মানাভাবের সংজ্ঞা

মানুষের ছয় শ্রেণীর অভাবের স্থলে ছয় শ্রেণীর প্রাচুর্য্য লাভ করা এবং নিয়মিত ভাবে ঐ ছয় শ্রেণীর প্রাচুর্য্যের বৃদ্ধি করা সম্ভব হইলে মানুষ যে অবস্থায় উপনীত হন, সেই অবস্থার নাম "মানুষের সম্মানের অবস্থা"। মানুষের ছয় শ্রেণীর অভাব দূর করা সম্ভব হইলে ক্রমে ক্রমে তাহার ছয় শ্রেণীর প্রাচুর্য্য লাভ করা সম্ভব হয়। প্রচলিত ভাষায় এক জনের সহিত আর একজনের তুলনা-মূলক উৎকর্ষকে অথবা উচ্চপদকে সম্মান বলা হয়। আমরা

যাহাকে "সম্মান" বলিয়া থাকি, সেই "সম্মান" প্রচলিত ভাষার 'সম্মানের' সহিত সর্ব্বতোভাবে একার্থক নহে। আমাদের লেখায় 'সম্মান' শব্দে একজন মানুষের অবস্থার সহিত আর একজন মানুষের অবস্থার কোন তুলনার কথা থাকে না। ইহাতে থাকে মানুষের স্ব স্ব জীবনের বিভিন্ন দিনের অবস্থার তুলনা। মানুষ যখন স্ব স্ব জীবনে ক্রমিক উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের অবস্থার তুলনায় পরবর্ত্তী জীবনের অবস্থা যখন সর্ব্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করে, তখন মানুষ সম্মানের অবস্থায় উপনীত হয়। কোন মানুষ যখন স্বীয় জীবনে ছয় শ্রেণীর প্রাচুর্য্য বিষয়ে ক্রমিক উন্নতি লাভ করিতে অক্ষম হন, তখন তাঁহার সম্মানাভাব হইয়া থাকে।

মানুষের জ্ঞান ও জ্ঞানাভাবের সংজ্ঞা

মানুষ তাঁহার মনুষ্যোচিত শরীর, মনুষ্যোচিত ইন্দ্রিয় মনুষ্যোচিত মন ও মনুষ্যোচিত বুদ্ধির বিভিন্ন কার্য্যের দ্বারা তাঁহার মনে যাহা যাহা অর্জ্জন করিয়া থাকেন তাহার প্রত্যেকটীকে এক এক বিষয়ক এক একটী 'জ্ঞান' বলা হয়। মানুষের স্বাস্থ্য-গত, ধন-গত, প্রতিষ্ঠা-গত, তৃপ্তি-গত ও সম্মান-গত প্রাচুর্য্য সাধন করিতে হইলে এবং ঐ ঐ বিষয়ক অভাবের নিবারণ সাধন করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর যে যে বিদ্যা অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই শ্রেণীর সেই সেই বিদ্যা সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জন করিতে পারিলে জ্ঞানগত প্রাচুর্য্য সাধন করা হয়। উপরোক্ত কোন শ্রেণীর বিদ্যার কোনরূপ অভাব হইলে মানুষের জ্ঞানাভাব আছে, ইহা বুঝিতে হয়। কোন মানুষের মনুষ্যোচিত শরীরের অথবা মনুষ্যোচিত ইন্দ্রিয়ের অথবা মনুষ্যোচিত মনের অথবা মনুষ্যোচিত বুদ্ধির অভাব হইলে তাহার জ্ঞানাভাব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

মানুষের অভাব যে ছয় শ্রেণীর অতিরিক্ত হইতে পারে না—তাহার যুক্তি

মানুষের স্বাস্থ্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, সম্মান, তৃপ্তি এবং জ্ঞান এই ছয়টী কথার কোন্‌টীতে কি বুঝায় তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব ব্যক্তিগত জীবনে যাহা যাহা পাইবার অভিলাষ করেন—তাহার প্রত্যেকটা উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের কোন না কোন এক শ্রেণীর পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের কোন অভিলাষ উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর পদার্থের বহির্ভূত হইতে পারে না। কোন মানুষের কোন অভিলাষ উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর পদার্থের বহির্ভূত হইতে পারে না বলিয়া কোন মানুষের অভাব উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর বহির্ভূত হইতে পারে না ও হয় না। আপাত দৃষ্টিতে মানুষের অভাবের সংখ্যা যতই হউক না কেন, কোন মানুষের অভাব উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর বহির্ভূত হইতে পারে না বলিয়া মানুষের অভাব ছয় শ্রেণীর ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

অভাবাবস্থা ও দারিদ্র্যাবস্থার পার্থক্য

মানুষের অভীষ্ট পদার্থের শ্রেণীবিভাগানুসারে মানুষের অভাব যেরূপ ছয় শ্রেণীর হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার অভাবের মাত্রার (অর্থাৎ তীব্রতার) শ্রেণীবিভাগানুসারে মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর অভাব প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা: (১) অভাব ও (২) দারিদ্র্য। মানুষের যেরূপ স্বাস্থ্যাভাব ঘটিতে পারে সেইরূপ আবার স্বাস্থ্যগত দারিদ্র্য ঘটিতে পারে। ধনাভাব যেরূপ ঘটিতে পারে সেইরূপ আবার ধন-গত দারিদ্র্যও ঘটিতে পারে। প্রতিষ্ঠাভাব যেরূপ ঘটিতে পারে সেইরূপ আবার প্রতিষ্ঠাগত দারিদ্র্যও ঘটিতে পারে। সম্মানাভাব যেরূপ ঘটিতে পারে, সেইরূপ আবার সম্মান-গত দারিদ্র্যও ঘটিতে পারে। তৃপ্তির অভাব যেরূপ ঘটিতে পারে সেইরূপ আবার তৃপ্তিগত দারিদ্র্যও ঘটিতে পারে। জ্ঞানাভাব যেরূপ ঘটিতে পারে সেইরূপ আবার জ্ঞানগত দারিদ্র্যও ঘটিতে পারে।

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা কি কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে যেরূপ "অভাবসমস্যা" কাহাকে বলে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিবার প্রয়োজন হয়, এবং অভাবসমস্যা কাহাকে বলে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে যেরূপ মানুষের অভাব কয়শ্রেণীর হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার মানুষের অভাবের অবস্থা ও দারিদ্র্যের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কি কি তাহাও স্পষ্টভাবে ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়।

মানবসমাজের আধুনিক প্রত্যেক প্রচলিত ভাষায় "অভাব" ও "দারিদ্র্য" এই দুইটী শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানুষের ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান জানিতে পারিলে দেখা যায় যে, ঐ দুইটী শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না, এবং একই অর্থে ব্যবহৃত হওয়া কোনক্রমে সঙ্গত নহে।

মানুষের ভাষাসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান জানিতে হইলে প্রথমতঃ, মানুষের শব্দশক্তি, দ্বিতীয়তঃ, মানুষের শব্দপ্রবৃত্তি, তৃতীয়তঃ, মানুষের শব্দমিশ্রণশক্তি ও প্রবৃত্তি, চতুর্থতঃ, মানুষের কথার পদগঠনশক্তি ও প্রবৃত্তি, পঞ্চমতঃ, মানুষের বাক্যগঠনশক্তি ও প্রবৃত্তি স্বতঃই কোন্ কোন্ নিয়মে এবং কোন্ কোন্ কার্য্যধারায় উদ্ভূত হইতে পারে ও হইয়া থাকে তাহা নির্দ্ধারণ করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। আধুনিক মানবসমাজে যাহা ভাষা-বিজ্ঞান বলিয়া প্রচলিত আছে, সেই তথাকথিত ভাষা-বিজ্ঞানে উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর প্রয়োজনীয় কথার কোন শ্রেণীর কথা পাওয়া যায় না। মানুষ তাঁহার বাক্যে যে সমস্ত কথা ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত কথার প্রত্যেকটি মূলতঃ মানুষের স্বাভাবিক শক্তি বশতঃ স্বতঃই প্রকাশিত হয় এবং সেই সমস্ত কথার প্রত্যেকটীর এক একটী স্বাভাবিক অর্থ মৌলিকভাবে বিদ্যমান থাকে। ভাষা-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধিত না হইলে মৌলিকভাবে মানুষের কথাসমূহের কোন্‌টীর কি স্বাভাবিক (inherent) অর্থ তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। আধুনিক মানবসমাজে উপরোক্ত শ্রেণীর ভাষা-বিজ্ঞানের অভাববশতঃ মানুষের কথার অর্থনির্দ্ধারণে যথেচ্ছাচার করা হয় এবং ঐ কারণ বশতঃ "অভাব" ও "দারিদ্র্য" এই দুইটী শব্দের অর্থের পার্থক্য যে কি কি তাহা আধুনিক মানবসমাজের পক্ষে সঠিকভাবে স্থির করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

ভাষাবিজ্ঞানানুসারে মানুষের অভাবের অবস্থা বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে যাহা যাহা পাওয়া মানুষের অভীষ্ট ও প্রয়োজনীয় তাহার কোনটী পাওয়া কষ্টকর অথবা অসাধ্য হইলে মানুষের

অভাবের উদ্ভব হয়। ভাষাবিজ্ঞানানুসারে মানুষের দারিদ্র্যাবস্থা বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে মানুষের দারিদ্র্যাবস্থার উদ্ভব হইলে কোন্ কোন্ পদার্থ মানুষের মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় তাহা মানুষ নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম হন। যে সমস্ত পদার্থ ব্যবহার করিলে মানুষের মনুষ্যোচিত অবস্থা নষ্ট হইয়া যায় এবং পাশবিক অবস্থার উদ্ভব হয়, সেই সমস্ত পদার্থ মানুষ তাঁহার দারিদ্র্যের অবস্থায় স্বাস্থ্যজনক বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেসমস্ত পদার্থ মানুষের মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে সেই সমস্ত পদার্থ মানুষ তাঁহার দারিদ্র্যের অবস্থায় ব্যবহার করেন বলিয়া মানুষের দারিদ্র্যাবস্থায় তাঁহার বুদ্ধি বিপরীত হয়, মন অস্থির হয়, ইন্দ্রিয়সমূহ অক্ষম হয় এবং শরীর অকালে জরাগ্রস্ত হয়। মানুষ তাঁহার দারিদ্র্যাবস্থায় অনিষ্টজনক পদার্থসমূহ ব্যবহার করেন বলিয়া তাঁহার বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং শরীর অকালে নষ্ট হইয়া যায় বটে কিন্তু তথাপি যে-সমস্ত পদার্থ মানুষ ব্যবহার করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থ যে মানুষের অনিষ্টজনক তাহা মানুষ বুঝিতে পারেন না। মানুষের দারিদ্র্যের অবস্থায় যে সমস্ত বিপরীত পদার্থ তাঁহার অভিলাষের বিষয় হয় সেই সমস্ত বিপরীত পদার্থ পর্য্যন্ত পাওয়া কষ্টসাধ্য এবং সময় সময় অসাধ্য হয়।

মানুষের অভাবের অবস্থায় স্বাস্থ্যের অপহারক কোন পদার্থ মানুষের অভিলাষের বিষয় হয় না।

যাহা যাহা মানুষের মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তাহার কোনটীর অভাবের নাম—"মানুষের অভাবের অবস্থা"।

যে সমস্ত পদার্থ মানুষের মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সেই সমস্ত পদার্থের নির্দ্ধারণে অক্ষমতাবশতঃ যাহা যাহা মানুষের মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে সেই সমস্ত পদার্থকে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার পদার্থ বলিয়া স্থির করার এবং সেই সমস্ত পদার্থের কোনটীর অভাব হওয়ার নাম মানুষের "দারিদ্র্যাবস্থা"।

মানুষের অভাবের অবস্থা অথবা দারিদ্র্যের অবস্থা যখন না থাকে তখন তাঁহার প্রাচুর্য্যের অবস্থা বিদ্যমান থাকে।

মানুষের প্রাচুর্য্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য

যাহা যাহা মানুষের মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তাহার প্রত্যেকটী প্রচুর পরিমাণে ও অনায়াসে পাওয়া সম্ভবযোগ্য হইলে মানুষের প্রাচুর্য্যের অবস্থার উদ্ভব হয়।

মনুষ্যসমাজে প্রাচুর্য্যাবস্থার উদ্ভব হইলে অধিকাংশ মানুষের ব্যাধি অথবা অকাল বার্দ্ধক্য ঘটিতে পারে না; পরন্তু অধিকাংশ মানুষ সর্ব্বতোভাবের স্বাস্থ্য, দীর্ঘযৌবন ও দীর্ঘজীবন উপভোগ করিয়া থাকেন। অধিকাংশ মানুষেরই বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত হওয়া অথবা অহঙ্কারী হওয়া অথবা সংস্কারপ্রবণ হওয়া অথবা মতবাদ-প্রবণ হওয়া অথবা বিচারবিশ্লেষণহীন হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি ও প্রবৃত্তিযুক্ত হইয়া থাকেন। তখন অধিকাংশ মানুষেরই ইন্দ্রিয়সমূহ উত্তেজনা-প্রবণ অথবা সমতার অভাবযুক্ত হইতে পারে না; পরন্তু অধিকাংশ মানুষেরই ইন্দ্রিয়সমূহ ক্লান্তিহীন সমানভাবের কার্য্যক্ষমতাযুক্ত হইয়া থাকে। তখন অধিকাংশ মানুষেরই মন অস্থিরতাযুক্ত অথবা স্থিরতার অভাবযুক্ত হইতে পারে না; পরন্তু অধিকাংশ মানুষেরই মন স্থিরতাযুক্ত এবং সর্ব্ববিধ বিষয়ের দায়িত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত ও একনিষ্ঠ হইয়া থাকে। তখন অধিকাংশ মানুষেরই আকৃতি কোন রূপে বিরক্তিকর হওয়া অথবা ঔজ্জ্বল্যের অভাবযুক্ত হওয়া অথবা বিশৃঙ্খল অঙ্গসমাবেশযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়, পরন্তু অধিকাংশ মানুষেরই আকৃতি প্রীতিকর, ঔজ্জ্বল্যযুক্ত, এবং সুব্যবস্থিত অঙ্গ-সমাবেশযুক্ত হইয়া থাকে। তখন অধিকাংশ মানুষেরই নির্ধন হওয়া অথবা ধনাভাবযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই ধন-প্রাচুর্য্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া থাকেন। তখন, অধিকাংশ মানুষেরই কোন বিষয়ে অপ্রতিষ্ঠিত হওয়া অথবা প্রতিষ্ঠার অভাবযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। তখন, অধিকাংশ মানুষেরই কোন বিষয়ে অসন্তুষ্টিযুক্ত হওয়া অথবা সন্তুষ্টির অভাবযুক্ত হওয়া অথবা অতৃপ্তিযুক্ত হওয়া অথবা তৃপ্তির অভাবযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্বতোভাবের তৃপ্তিযুক্ত হইয়া থাকেন। তখন, অধিকাংশ মানুষেরই কোন বিষয়ে নিজেকে অসম্মানযুক্ত অথবা সম্মানের অভাবযুক্ত মনে করা অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই নিজেকে প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্বতোভাবের সম্মানযুক্ত মনে করিয়া থাকেন। তখন, অধিকাংশ মানুষেরই প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে কু-বিদ্যাযুক্ত হওয়া অথবা বিদ্যার কোনরূপ অভাবযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে বিদ্বান্ হইয়া থাকেন।

মানুষের দারিদ্র্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য

মনুষ্যসমাজে দারিদ্র্যাবস্থার উদ্ভব হইলে অধিকাংশ মানুষেরই সর্ব্বতোভাবের স্বাস্থ্য অথবা দীর্ঘ-যৌবন অথবা দীর্ঘজীবন উপভোগ করা অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই নানারূপ ব্যাধির যন্ত্রণায়, অকালবার্দ্ধক্যের অক্ষমতায় এবং অকালমৃত্যুর শোকে জর্জ্জরিত হইয়া থাকেন। তখন অধিকাংশ মানুষেরই বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি ও প্রবৃত্তিযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু, অধিকাংশ মানুষই বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত, অহঙ্কারী, সংস্কার-প্রবণ, মতবাদ-প্রবণ, এবং বিচার-বিশ্লেষণহীন হইয়া থাকেন। তখন অধিকাংশ মানুষেরই ইন্দ্রিয়সমূহের ক্লান্তিহীন সমানভাবের কার্য্য-ক্ষমতাযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই উত্তেজনা-প্রবণ ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া থাকেন। তখন অধিকাংশ মানুষেরই মনের স্থিরতাযুক্ত হওয়া অথবা একনিষ্ঠতাযুক্ত হওয়া অথবা দায়িত্ব সম্বন্ধে জাগ্রতাযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়, পরন্তু অধিকাংশ মানুষেরই মন অস্থিরতাযুক্ত ও স্থিরতার অভাবযুক্ত হইয়া থাকে। তখন অধিকাংশ মানুষেরই আকৃতির প্রীতিকরতা, ঔজ্জ্বল্যযুক্ততা এবং সুব্যবস্থ অঙ্গসমাবেশযুক্ততা অসম্ভব হইয়া থাকে; পরন্তু অধিকাংশ মানুষেরই আকৃতি হয় ভীতিকর নতুবা বিরক্তিকর নতুবা ঔজ্জ্বল্যের অভাবযুক্ত নতুবা বিশৃঙ্খল অঙ্গসমাবেশযুক্ত হইয়া থাকে। তখন অধিকাংশ মানুষেরই ধনপ্রাচুর্য্যযুক্ত হওয়া অথবা ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই যে সমস্ত সামগ্রী

মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে সেই সমস্ত সামগ্রীকে মানুষের শরীর প্রভৃতির স্বাস্থ্যকর বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং নির্ধন অথবা ধনাভাবযুক্ত হইয়া থাকেন। তখন, অধিকাংশ মানুষেরই কোন বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব হয়, পরন্তু অধিকাংশ মানুষই প্রত্যেক বিষয়ে অপ্রতিষ্ঠ অথবা প্রতিষ্ঠার অভাবযুক্ত হইয়া থাকেন। তখন অধিকাংশ মানুষেরই কোন বিষয়ে সর্ব্বতোভাবের তৃপ্তিযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়, পরন্তু অধিকাংশ মানুষই প্রত্যেক বিষয়ে অসন্তুষ্টিযুক্ত অথবা সন্তুষ্টির অভাবযুক্ত অথবা অতৃপ্তিযুক্ত অথবা তৃপ্তির অভাবযুক্ত হইয়া থাকেন। তখন অধিকাংশ মানুষেরই কোন বিষয়ে নিজেকে সম্মানযুক্ত মনে করা অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই প্রত্যেক বিষয়ে নিজেকে অসম্মানযুক্ত অথবা সম্মানের অভাবযুক্ত মনে করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। তখন অধিকাংশ মানুষেরই প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের সর্ব্বতোভাবের বিদ্যা অর্জ্জন করা অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই যে যে কার্য্যপন্থা অবলম্বন করিলে মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যাভাবযুক্ত হওয়া অথবা অস্বাস্থ্যযুক্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয় সেই সেই কার্য্য-পন্থার বিদ্যাকে প্রকৃত বিদ্যা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং সেই সেই কার্য্যপন্থার বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া থাকেন।

মনুষ্যসমাজে যখন সর্ব্বতোভাবের দারিদ্র্যাবস্থার উদ্ভব হয় তখন মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের ও বুদ্ধির যে যে অবস্থা প্রকৃত বিচারানুসারে উহাদের প্রত্যেকটীর অস্বাস্থ্যের অথবা স্বাস্থ্যাভাবের অবস্থা, সেই সেই অবস্থাকে অধিকাংশ মানুষ উহাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ধন বিষয়ে যে যে অবস্থা প্রকৃত বিচারানুসারে মানুষের নির্ধনের অথবা ধনাভাবের অবস্থা, সেই সেই অবস্থাকে অধিকাংশ মানুষ ঐশ্বর্য্যের অথবা ধন-প্রাচুর্য্যের অবস্থা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। মানুষের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যে যে অবস্থা প্রকৃত বিচারানুসারে মানুষের অপ্রতিষ্ঠার অথবা প্রতিষ্ঠার অভাবের অবস্থা, সেই সেই অবস্থাকে অধিকাংশ মানুষ বিচিত্রতাময় ও গৌরবের অবস্থা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। মানুষের তৃপ্তি বিষয়ে, যে যে সামগ্রী ও আচরণ প্রকৃতপক্ষে মানুষের অতৃপ্তির অথবা তৃপ্তির অভাবের উদ্ভব করিয়া থাকে, সেই সেই সামগ্রী ও আচরণকে অধিকাংশ মানুষ তৃপ্তির সামগ্রী ও আচরণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। মানুষের সম্মান বিষয়ে, যে যে অবস্থা বা ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে মানুষের অসম্মানের অথবা সম্মানাভাবের অবস্থা, সেই সেই অবস্থা ও ব্যবস্থাকে অধিকাংশ মানুষ সম্মানের অবস্থা ও ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। মানুষের বিদ্যা বিষয়ে, যে যে বিদ্যা মানুষের কুবিদ্যা ও বিদ্যাভাবের পরিচায়ক সেই সেই বিদ্যাকে অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত বিদ্যা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মনুষ্যসমাজে যখন সর্ব্বতোভাবের দারিদ্র্যাবস্থার উদ্ভব হয়—তখন অধিকাংশ মানুষের মনুষ্যোচিতভাবের জীবন বজায় থাকা অসম্ভব হয়।

মানুষের বুদ্ধি যদ্যপি বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি ও প্রবৃত্তিযুক্ত না হইয়া অবিচারিতভাবে সংস্কার ও মতবাদসমূহকে শিরোধার্য্য করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তিযুক্ত হয়, মানুষের মন যদ্যপি একনিষ্ঠ ও ধীরতাযুক্ত না হইয়া সর্ব্বদা দোদুল্যমান ও চঞ্চল হয়, মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহ যদ্যপি কার্য্যকারণের শৃঙ্খলানুসারে মানুষের অভাব-নিবারক কার্য্য করিবার অথবা পদার্থসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতাযুক্ত না হইয়া অক্ষমতা অথবা ক্ষমতার অভাবযুক্ত হয়, এবং মানুষের শরীর যদ্যপি মনের তৃপ্তির উৎপাদক না হইয়া ভীতি-সঞ্চারক হয়—তাহা হইলে মানুষের অবয়বে প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলেও যে মানুষের মনুষ্যোচিতভাবের জীবন বিদ্যমান থাকে না তাহা সাধারণ বিচারবুদ্ধির দ্বারা বুঝা যায়। যেসমস্ত কারণে মানুষকে পশু মনে না করিয়া মানুষ বলিয়া অভিহিত করা হয় সেই সমস্ত কারণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা:

(১) মনুষ্যোচিত বুদ্ধি;
(২) মনুষ্যোচিত মন;
(৩) মনুষ্যোচিত ইন্দ্রিয় এবং
(৪) মনুষ্যোচিত চেহারা।

মানুষের অবয়বে যে যে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও চেহারা বিদ্যমান থাকে তাহার কোনটি যদ্যপি কোন মানুষের কোনও কারণে মনুষ্যোচিত মনে করিতে ইতস্ততঃ করিতে হয় এবং পশুর বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের সহিত একভাবের বলিয়া স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে—ঐ মানুষকে যে মনুষ্যাবয়বযুক্ত পশু বলিতে হয় তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

মনুষ্যসমাজে যখন সর্ব্বতোভাবের দারিদ্র্যাবস্থার উদ্ভব হয়, তখন স্ব স্ব স্বাস্থ্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, তৃপ্তি, সম্মান ও বিদ্যা বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত হইয়া থাকেন বটে কিন্তু উঁহারা যে ঐ ঐ বিষয়ে বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত হইয়াছেন তাহা অধিকাংশ মানুষ বুঝিতে অক্ষম হইয়া থাকেন।

তখন, স্বাস্থ্য বিষয়ে, মানুষের শরীর পাশবিক বলের ব্যবহারের শক্তি ও প্রবৃত্তিযুক্ত হয়; ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব কার্য্য করিতে ক্লান্তিযুক্ত ও অক্ষমতাযুক্ত হয়, মন সর্ব্বদা প্রত্যেক বিষয়ে দোদুল্য-মানতা ও চাঞ্চল্যযুক্ত হয়; বুদ্ধি সর্ব্বদা প্রত্যেক বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি ও প্রবৃত্তিহীন হইয়া কখনও বা অবিচারিত সংস্কারের বশীভূত হয়, আবার কখনও বা অবিচারিত মতবাদের বশীভূত হইয়া ভ্রমপূর্ণ বিচারশীলতাযুক্ত হইয়া থাকে। এতাদৃশ ভাবে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির মনুষ্যোচিত অবস্থার বিরুদ্ধতা ও অভাব সত্ত্বেও মানুষ তাঁহার শরীরের পাশবিক বলের বিদ্যমানতা বশতঃ নিজেকে স্বাস্থ্যবান বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞানগত দারিদ্র্যবশতঃ চিকিৎসকগণ পর্য্যন্ত মানুষের স্বাস্থ্যের এতাদৃশ অবস্থাকে তাঁহার সুস্থ অবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

তখন ধনবিষয়ে মানুষ "মুদ্রাকে" ধন বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন এবং মুদ্রার সংখ্যাদ্বারা ধনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। মুদ্রার বিনিময়ে আহারের ও বিহারের অভীষ্ট দ্রব্য-সমূহের অনেক দ্রব্য আদৌ অথবা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব-যোগ্য না হইলেও মুদ্রা থাকিলেই মানুষ নিজেকে ধনী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ধনবিষয়ে জ্ঞানগত দরিদ্রতা নিবন্ধন কাঁচামাল

উৎপাদনের যে-সমস্ত পদ্ধতি জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির এবং জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার শক্তির ক্ষয়কারী এবং অস্বাস্থ্যকর কাঁচামালের উৎপাদক, সেই সমস্ত পদ্ধতিকে মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন এবং গ্রহণ করিয়া থাকেন। শিল্পকার্য্যের, বাণিজ্যকার্য্যের এবং চাকুরীর যে-সমস্ত পদ্ধতিতে ঐ ঐ বিষয়ক শ্রমিকগণের ও অন্যান্য কর্ম্মিগণের ধনাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, তৃপ্তির অভাব, সম্মানাভাব এবং প্রতিষ্ঠার অভাব অনিবার্য্য হইয়া থাকে, সেই সমস্ত পদ্ধতিকে মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করেন এবং ঐ সমস্ত পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তখন পরিতৃপ্তি, সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা বিষয়েও মানুষের বুদ্ধি বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। যাহা যাহা মানুষের উত্তেজনা সাধন করে তাহাতে যে পরক্ষণেই বিষাদ অনিবার্য্য তাহা বিস্মৃত হইয়া উত্তেজনার পদার্থকে মানুষ পরিতৃপ্তির পদার্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যাঁহারা কপটতা, মিথ্যাকথা, প্রতারণা ও মানুষের মধ্যে দলাদলি সাধন করিবার শিরোমণি হইয়া দলপতি হইতে পারেন তাঁহারা সমাজের কোন কোন অংশের সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। যাঁহারা বস্তুতঃপক্ষে জনসাধারণের দাসত্ব করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর মত নিজ নিজ দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া নিজদিগকে জনসাধারণের সেবক মনে না করিয়া জনসাধারণের প্রভু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ও জনসাধারণের সন্তুষ্টি অর্জ্জন করিবার পরিবর্ত্তে অসন্তুষ্টির বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকেন—তাঁহারাও নিজদিগকে সম্মানভাজন বলিয়া মনে করেন এবং সমাজের একাংশ তাহাদিগকে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা জুয়াচুরী, শঠতা, মিথ্যাকথা ব্যবহার করিয়া এবং মানুষের শরীরের, মনের ও বুদ্ধির সর্ব্বনাশকর দ্রব্যসমূহের সর্ব্বনাশকর ভাবে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া কতিপয় লক্ষ সংখ্যার মুদ্রার্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেও সমাজের একাংশ সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন। যে সমস্ত আইন ও শৃঙ্খলার ফলে মানুষের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, মিথ্যা ব্যবহার, দ্বন্দ্ব-কলহ প্রভৃতি অনিবার্য্য হইয়া থাকে সেই সমস্ত আইন ও শৃঙ্খলার সেবা করিয়া এবং দ্বেষহিংসার বৃদ্ধিসাধন করিয়া যাঁহারা মুদ্রার্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেও সমাজের একাংশ সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা শিক্ষার নামে শিশুগণের ভগবানের দেওয়া বিচার-শক্তিকে বিচারহীন মতবাদ মুখস্থ করিবার শক্তিকে ও সংযম-শক্তিকে উত্তেজনা-শক্তিতে পরিণত করিয়া থাকেন এবং শিশুগণকে মানুষ করিবার পরিবর্ত্তে অমানুষ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও সমাজের একাংশ সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা মানুষের চিকিৎসার নামে কার্য্যতঃ মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বিনাশ করিয়া থাকেন এবং এমন কি সময় সময় প্রাণ পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া থাকেন তাঁহারা পর্য্যন্ত সমাজের একাংশের সম্মানভাজন হইয়া থাকেন।

মানুষের ধর্ম্মের নামে যাঁহারা মানুষের বুদ্ধিকে বিচারশক্তিহীন সংস্কারাবিষ্ট করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়সমূহকে অক্ষম করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন, পিতা-মাতার সেবা ও মানুষের আহারের ও বিহারের পদার্থসম্ভারের অর্জ্জন হইতে বিরত হইয়া অরণ্যবাসী হইতে পরামর্শ দিয়া থাকেন, এবং মানুষ ছোট, বড় ও জাতহীন প্রভৃতি কথা ব্যবহার করিয়া মানুষের মধ্যে দ্বেষপ্রবৃত্তির বর্দ্ধন করিয়া থাকেন—তাঁহারাও সমাজের একাংশের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া থাকেন। প্রতিষ্ঠা বিষয়ে—মানুষের বাস আজ একস্থানে, কাল অপরস্থানে; মানুষের জীবিকার্জ্জনের ব্যবসায় আজ একটী, কাল আর একটী; আজ সম্মানিত, কাল অসম্মানের যোগ্য; আজ পরম বন্ধু, কাল পরম শত্রু; আজ উল্লেখযোগ্য ধনী, কাল দেউলিয়া ও পথের ভিখারী; আজ স্বাস্থ্যবান্, কাল মৃত্যুর কবলে—এইরূপ ভাবের অস্থির অবস্থা চলিতে থাকে, অথচ মানুষ এই অবস্থার পরিহাস বুঝিতে পারে না।

মানুষের দারিদ্র্যাবস্থায় জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্য যে-সমস্ত বিদ্যা প্রচলিত থাকে তাহার কোনটী মানুষের শরীরের স্বাস্থ্যাভাব, অথবা ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যাভাব, অথবা মনের স্বাস্থ্যাভাব, অথবা বুদ্ধির স্বাস্থ্যাভাব, অথবা ধনাভাব, অথবা প্রতিষ্ঠাভাব, অথবা তৃপ্তির অভাব, অথবা সম্মানাভাব দূর করিতে অথবা নিবারণ করিতে সক্ষম হয় না। কোন শ্রেণীর অভাব দূর করা ও নিবারণ করা ত' দূরের কথা, মানুষের দারিদ্র্যাবস্থার যে-সমস্ত বিদ্যা প্রচলিত থাকে সেই সমস্ত বিদ্যার প্রত্যেকটীতে মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর দারিদ্র্যের উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। এই সমস্ত বিদ্যার প্রত্যেকটীতে মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর দারিদ্র্যের উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয় বটে কিন্তু মানুষ ঐ সমস্ত বিদ্যার কুফল ধারণা করিতে অক্ষম হন এবং সম্ভ্রমের সহিত ঐ সমস্ত বিদ্যাকে এক একটি "বিজ্ঞান" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের দরিদ্রতা দূর সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধতার যুক্তি

"বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের অভাবের বিদ্যমানতা বিষয়ে মতবাদ" শীর্ষক আলোচনায় আমরা যাহা যাহা উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদিগের মতবাদানুসারে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজ মানুষের চরম দারিদ্র্যাবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যেক শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে চরম দারিদ্র্যে উপনীত হইয়াছেন।

"মানুষের প্রাচুর্য্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক আলোচনায় মানুষের প্রাচুর্য্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে-সমস্ত কথা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত কথার প্রত্যেকটী বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত কথার কোনটী অস্বীকার করা যায় না। মানুষের অবস্থার যে যে বৈশিষ্ট্য থাকিলে মানুষ প্রাচুর্য্যের অবস্থায় আছেন বলিয়া মনে করা যায় সেই-সেই বৈশিষ্ট্যের কোনটী যে বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের কোন মানুষের অবস্থায় দেখা যায় না, তাহা কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না।

শরীরের অঙ্গসমূহের যে শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্য, সুব্যবস্থিত সমাবেশ ও প্রীতিকরতা থাকিলে এবং যে শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্যের অভাব, সমাবেশের অভাব ও প্রীতিকরতার অভাবশূন্য হইলে মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য আছে বলিয়া মনে করা যায়—অঙ্গসমূহের

সেই শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্য, সুব্যবস্থিত সমাবেশ ও প্রীতিকরতা অথবা সেই শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্যাভাবশূন্যতা, সুব্যবস্থিত সমাবেশাভাবশূন্যতা ও প্রীতিকরতার অভাবশূন্যতা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশের কোন মানুষের শরীরে দেখা সম্ভবযোগ্য নহে ও দেখা যায় না।

মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের যে শ্রেণীর সমানভাবের অক্লান্তিকর কার্য্যক্ষমতা থাকিলে এবং অক্ষমতার অভাব হইলে মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য আছে বলিয়া মনে করা যায় ইন্দ্রিয়সমূহের সেই শ্রেণীর কার্য্যক্ষমতা ও অক্ষমতার অভাব বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশের কোন মানুষের থাকা সম্ভবযোগ্য নহে ও নাই।

মানুষের মনের যে শ্রেণীর স্থিরতা ও একনিষ্ঠতা থাকিলে এবং যে শ্রেণীর অস্থিরতার ও দোদুল্যমানতার অভাব হইলে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য আছে বলিয়া মনে করা যায়, মনের সেই শ্রেণীর স্থিরতা ও একনিষ্ঠতা এবং অস্থিরতার ও দোদুল্যমানতার অভাব বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশের কোন মানুষের থাকা সম্ভবযোগ্য নহে ও নাই।

মানুষের বুদ্ধির যে শ্রেণীর বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি ও প্রবৃত্তি থাকিলে এবং যে শ্রেণীর সংস্কারপ্রবণতার ও মতবাদপ্রবণতার অভাব হইলে মানুষের বুদ্ধির স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য আছে বলিয়া মনে করা যায় বুদ্ধির সেই শ্রেণীর বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি ও প্রবৃত্তি এবং সেই শ্রেণীর সংস্কারপ্রবণতার ও মতবাদপ্রবণতার অভাব বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশের কোন মানুষের থাকা সম্ভবযোগ্য নহে এবং নাই।

শরীরের ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির যে শ্রেণীর মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্য বজায় থাকিলে এবং যে শ্রেণীর পশুজনোচিত স্বাস্থ্যের অভাব হইলে মানুষের মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্য বজায় আছে বলিয়া মনে করা যায় স্বাস্থ্যের সেই শ্রেণীর মনুষ্যোচিত অবস্থা এবং পশুজনোচিত অবস্থার অভাব বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশের কোন মানুষের থাকা সম্ভবযোগ্য নহে এবং নাই।

আহার ও বিহারের সামগ্রীসমূহের যে শ্রেণীর প্রাচুর্য্য, স্বাস্থ্যজনকতা ও তৃপ্তিজনকতা থাকিলে এবং যে শ্রেণীর প্রাচুর্য্যের অভাব, স্বাস্থ্যজনকতার অভাব ও তৃপ্তিজনকতার অভাব না থাকিলে মানুষের ধনপ্রাচুর্য্য আছে বলিয়া মনে করা যায় আহার ও বিহারের সামগ্রীসমূহের সেই শ্রেণীর প্রাচুর্য্য, স্বাস্থ্যজনকতা ও তৃপ্তিজনকতা অথবা সেই শ্রেণীর প্রাচুর্য্যের অভাবশূন্যতা, স্বাস্থ্যজনকতার অভাবশূন্যতা ও তৃপ্তিজনকতার অভাবশূন্যতা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশের কোন সংসারে থাকা সম্ভবযোগ্য নহে ও নাই।

ধনতৃষ্ণা সম্বন্ধে যে শ্রেণীর সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টির অভাব থাকিলে, মানুষের ধনপ্রাচুর্য্য আছে বলিয়া মনে করা যায়—ধনতৃষ্ণার সেই শ্রেণীর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির অভাব বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশের কোন মানুষের থাকা সম্ভবযোগ্য নহে ও নাই।

প্রতিষ্ঠা, অপ্রতিষ্ঠার অভাব; তৃপ্তি, অতৃপ্তির অভাব, সম্মান, অসম্মানের অভাব, জ্ঞান এবং অজ্ঞানের অভাব যে শ্রেণীর হইলে, মানুষের প্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য্য, তৃপ্তির প্রাচুর্য্য, সম্মানের প্রাচুর্য্য ও জ্ঞানের প্রাচুর্য্য আছে বলিয়া মনে করা যায়—সেই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ও অপ্রতিষ্ঠার অভাব, তৃপ্তি ও অতৃপ্তির অভাব, সম্মান ও অসম্মানের অভাব, জ্ঞান ও অজ্ঞানের অভাব—বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশের কোন মানুষের থাকা সম্ভবযোগ্য নহে ও নাই।

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের এবং মানুষের উপরোক্ত অবস্থা বিচার করিলে মনুষ্যসমাজের এবং মানুষের বর্ত্তমান অবস্থাকে যে প্রাচুর্য্যের অবস্থা বলা চলে না—তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়।

শরীরের যে শ্রেণীর স্বাস্থ্যাভাব থাকিলে মানুষকে শারীরিক স্বাস্থ্যাভাবযুক্ত বলিতে হয়; ইন্দ্রিয়সমূহের যে-শ্রেণীর স্বাস্থ্যাভাব থাকিলে মানুষকে ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্যাভাবযুক্ত বলিতে হয়; মনের যে-শ্রেণীর স্বাস্থ্যাভাব থাকিলে মানুষকে মানসিক স্বাস্থ্যাভাবযুক্ত বলিতে হয়; বুদ্ধির যে শ্রেণীর স্বাস্থ্যাভাব থাকিলে মানুষকে বুদ্ধির স্বাস্থ্যাভাবযুক্ত বলিতে হয়; শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের ও বুদ্ধির সেই শ্রেণীর স্বাস্থ্যাভাব নাই এমন একটি মানুষ বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশে পাওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না এবং পাওয়া যায় না।

ধনের, প্রতিষ্ঠার, পরিতৃপ্তির, সম্মানের এবং জ্ঞানের যে শ্রেণীর অভাব থাকিলে মানুষকে ধনাভাব-যুক্ত, প্রতিষ্ঠার অভাব-যুক্ত, পরিতৃপ্তির অভাব-যুক্ত, সম্মানের অভাব-যুক্ত এবং জ্ঞানের অভাবযুক্ত বলিয়া মনে হয়—ধনের, প্রতিষ্ঠার, পরিতৃপ্তির, সম্মানের এবং জ্ঞানের সেই শ্রেণীর অভাব নাই—এমন একটি মানুষ বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশে পাওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না এবং পাওয়া যায় না।

স্বাস্থ্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, পরিতৃপ্তি, সম্মান এবং জ্ঞানবিষয়ে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের এবং মানুষের উপরোক্ত অভাবের অবস্থা বিচার করিলে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের এবং মানুষের বর্ত্তমান অবস্থাকে যে অভাবের অবস্থা বলা অনিবার্য্য হয়—তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

উপরোক্তভাবে বিচার করিলে, বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষ যে সর্ব্বশ্রেণীর অভাবের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের—প্রত্যেক মানুষ যে কেবলমাত্র সর্ব্বশ্রেণীর 'অভাবের' চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাহা নহে। প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষই 'দারিদ্র্যের' চরম অবস্থায়ও উপনীত হইয়াছেন। ইহার কারণ তিন শ্রেণীর:—

প্রথমতঃ, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষ যদিও অভাবের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তথাপি অধিকাংশ মানুষ নিজ নিজ অবস্থা যে কোথায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে অক্ষম হইয়াছেন;

দ্বিতীয়তঃ, স্বাস্থ্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, পরিতৃপ্তি, সম্মান এবং জ্ঞান বিষয়ে প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ যে যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন সেই সেই আদর্শ বস্তুতঃ পক্ষে স্বাস্থ্যাভাব, ধনাভাব,

প্রতিষ্ঠাভাব, পরিতৃপ্তির অভাব, সম্মানাভাব এবং জ্ঞানাভাবের আদর্শ ;

তৃতীয়তঃ, স্বাস্থ্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, পরিতৃপ্তি, সম্মান এবং জ্ঞান-বিষয়ক প্রচলিত আদর্শে উপনীত হইবার জন্য প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ যে যে কার্য্য-পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই সেই কার্য্য-পন্থায় কু-স্বাস্থ্য, কু-ধন, কু-প্রতিষ্ঠা, কু-তৃপ্তি, কু-সম্মান এবং কু-জ্ঞান হওয়া অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

"অভাবাবস্থা ও দারিদ্র্যাবস্থার পার্থক্য"-শীর্ষক আলোচনায় এবং "মানুষের দারিদ্র্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য"-শীর্ষক আলোচনায় মানুষের দারিদ্র্য সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত কথা বিচার করিয়া দেখিলে উহাদের কোনটী স্বীকার না করিয়া পারা যায় না ; এবং তখন বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ যে দারিদ্র্যের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন,— তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়।

মানুষের অভাবসমস্যার সমাধানের সম্ভবযোগ্যতা

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যার নাম সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত কথা হইতে তিনটি কথা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়, যথা :

(১) বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজ দারিদ্র্যের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ;

(২) বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের দারিদ্র্যের সাক্ষাৎ কারণ মানুষের ছয় শ্রেণীর অভাব ;

(৩) বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যার সমাধান করিতে হইলে যুগপৎভাবে যুদ্ধ-সমস্যার ও অভাব-সমস্যার সমাধান করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

যুদ্ধ-সমস্যার ও অভাব-সমস্যার সর্ব্বতোভাবে যুগপৎ সমাধান সম্ভবযোগ্য হইলে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান স্বতঃসিদ্ধ হয় বটে ; কিন্তু যুদ্ধ-সমস্যার অথবা অভাব-সমস্যার সর্ব্বতোভাবে সমাধান করা কার্য্যতঃ সম্ভবযোগ্য কি না তদ্বিষয়ে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সন্দেহ আছে। যদি ঐ দুই শ্রেণীর সমস্যার সমাধান কার্য্যতঃ সম্ভবযোগ্য না হয়, তাহা হইলে ঐ দুই শ্রেণীর সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান হইতে পারে—তাহা বলিয়া কোন ফলোদয় হইতে পারে না। এই কারণে মনুষ্যসমাজের যুদ্ধসমস্যার এবং অভাবসমস্যার সর্ব্বতোভাবে সমাধান করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত কি না—তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন হয়।

ঐ দুই শ্রেণীর সমস্যার কোন শ্রেণীর সমস্যারই সর্ব্বতোভাবে সমাধান করা সম্ভবযোগ্য নহে—ইহা প্রচলিত মতবাদ। প্রচলিত মতবাদানুসারে "মানুষ থাকিলেই মানুষের পরস্পর যুদ্ধ এবং মানুষের অভাব বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য্য হয়"।

ভারতীয় ঋষিগণ মানুষের পরস্পরের মধ্যের যুদ্ধ ও অভাব সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন সেই সমস্ত কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, মনুষ্যসমাজের যুদ্ধ ও অভাব অনিবার্য্য নহে। যে যে নিয়মে এই ভূমণ্ডলের আকাশ, বাতাস, জল, স্থল, উদ্ভিদ্‌শ্রেণী ও চরজীবশ্রেণী স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হইয়া থাকে—সেই সেই নিয়মে মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি এবং অভাবের আশঙ্কা স্বতঃই উৎপন্ন হয়। সেই সেই নিয়মে মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি এবং অভাবের আশঙ্কা যেমন স্বতঃই উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধশক্তি ও যুদ্ধপ্রবৃত্তি এবং অভাবাশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিবার শক্তিও স্বতঃই উৎপন্ন হয়। মানুষ যদ্যপি ব্যক্তিগত শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা এবং সঙ্ঘগত সংগঠনের দ্বারা মানুষের পরস্পরের মধ্যের যুদ্ধশক্তি ও যুদ্ধপ্রবৃত্তি এবং অভাবাশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিবার স্বাভাবিক শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য প্রযত্নশীল হন, তাহা হইলে মানুষের স্বাভাবিক যুদ্ধশক্তি ও যুদ্ধপ্রবৃত্তি এবং অভাবাশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। ভারতীয় ঋষিগণের কথানুসারে এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল যে যে নিয়মে স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়, সেই সেই নিয়মানুসারে মানুষের জন্য দুই পন্থা স্বতঃই উন্মুক্ত থাকে। বিচার করিয়া কার্য্য করিলে মানুষ যেমন তাঁহার সর্ব্ববিধ সমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিয়া সর্ব্বতোভাবের সুখ-শান্তি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, সেইরূপ আবার বিচার করিয়া কার্য্য না করিলে মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখের ও অশান্তির পন্থা স্বতঃই উন্মুক্ত হইয়া থাকে। ভারতীয় ঋষিগণের কথা আদাম এবং ইভের সুশোভিত ফলফুলভরা নন্দনকাননের কথার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। মানুষের পক্ষে এই ভূমণ্ডল যেরূপ নন্দন কানন সদৃশ হইতে পারে, সেইরূপ আবার অবিচারিত সৌন্দর্য্যের মোহে লালসাপ্রণোদিত হইয়া নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিলে কণ্টকাকীর্ণ নরকসদৃশও হইতে পারে।

অভাব-সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে যে মনুষ্যসমাজের যুদ্ধ-সমস্যার সমাধান স্বতঃই হইতে পারে ও হইয়া থাকে তাহা আমরা "বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যাসমূহের মধ্যে যুদ্ধসমস্যার ও অভাবসমস্যার প্রাধান্যের যুক্তি"-শীর্ষক আলোচনায় দেখাইয়াছি। "মানুষের অভাবসমূহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি না হইলে মনুষ্যসমাজে যুদ্ধ হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে এবং মানুষের অভাবসমূহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি ঘটিলে মনুষ্যসমাজে যুদ্ধের আশঙ্কা অনিবার্য্য হয়"—এই দুইটি সত্য বুঝিতে পারিলে অভাব-সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে মনুষ্যসমাজের যুদ্ধসমস্যার সমাধান যে স্বতঃই অবশ্যম্ভাবী হয় তাহা বুঝিতে পারা যায়।

অভাবসমস্যার সমাধান করিতে পারিলে যখন মনুষ্যসমাজের যুদ্ধসমস্যার সমাধান স্বতঃসিদ্ধ হয়, তখন বুঝিতে হয় যে, অভাব-সমস্যার সমাধান মানুষের সাধ্যান্তর্গত হইলে দুই শ্রেণীর সমস্যার সমাধানই মানুষের সাধ্যান্তর্গত।

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতীয় ঋষিগণের মত-বাদানুসারে "মানুষ" যদ্যপি ব্যক্তিগত শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা এবং সঙ্ঘগত সংগঠন দ্বারা মানুষের অভাবাশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত

ও নিবারিত করিবার স্বাভাবিক শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য প্রযত্নশীল হয় তাহা হইলে মানুষের অভাবাশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়।"

যে-শ্রেণীর ব্যক্তিগত শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা এবং সঙ্ঘগত সংগঠন দ্বারা মানুষের অভাবাশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয় সেই শ্রেণীর ব্যক্তিগত শিক্ষা ও সাধনা এবং সঙ্ঘগত সংগঠন যে-শ্রেণীর পরিকল্পনায় স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে ও হয়—সেই শ্রেণীর পরিকল্পনার কথা আমরা "মানুষের পশুত্ব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠনের মূল নীতিসূত্র"-শীর্ষক এবং "মানুষের পশুত্ব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন সাধন করিবার পরিকল্পনা"-শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধে আলোচনা করিব। মানুষের অভাব-সমস্যার সমাধান করা যে মানুষের সাধ্যান্তর্গত তাহা ঐ দুটী প্রবন্ধ হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে।

মানুষের ইচ্ছা কয় শ্রেণীর হইতে পারে ও হয় এবং মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা পূরণ করিতে হইলে কোন্ কোন্ শ্রেণীর পদার্থের প্রয়োজন হইতে পারে ও হয় তাহার বিচার করিলেও মানুষের অভাব-সমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করা যে মানুষের সাধ্যান্তর্গত তাহা বুঝা যায়। মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত হইলে যে মানুষের অভাবসমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত হয় তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহার কারণ—মানুষের ইচ্ছাপূরণের অসাধ্যতা ও দুঃসাধ্যতা হইতে অভাবের উৎপত্তি হয় এবং সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হইলে অভাব-সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে না।

মানুষের অভাব যেরূপ মূলতঃ ছয় শ্রেণীর, মানুষের ইচ্ছাও সেইরূপ মূলতঃ ছয় শ্রেণীর, যথা :

(১) স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা,
(২) ধনগত ইচ্ছা,
(৩) প্রতিষ্ঠাগত ইচ্ছা,
(৪) তৃপ্তিগত ইচ্ছা,
(৫) সম্মানগত ইচ্ছা, এবং
(৬) জ্ঞানগত ইচ্ছা।

এই ছয় শ্রেণীর ইচ্ছার প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত।

এই ছয় শ্রেণীর ইচ্ছার প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত বটে কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবের চেষ্টায় কোন মানুষের পক্ষে সর্ব্বশ্রেণীর ইচ্ছা ত দূরের কথা—নিজের কোন একটী শ্রেণীর ইচ্ছাও সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। কোন একটী মানুষের কোন একটী শ্রেণীর ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের ছয় শ্রেণীর ইচ্ছা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

ঐ ছয় শ্রেণীর ইচ্ছার প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছা পূরণ করিতে হইলে যে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় সেই সেই ব্যবস্থার সহিত পরিচিত হইতে পারিলে, কোন একটী মানুষের কোন একটী শ্রেণীর ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য করিতে হইলে কেন যে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের ছয় শ্রেণীর ইচ্ছা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা বুঝা যায়।

ছয় শ্রেণীর ইচ্ছা যাহাতে যুগপৎভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় তাহা করিতে না পারিলে অথবা না করিলে যে কোন এক শ্রেণীর ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না—ইহা সাধারণ বিচারবুদ্ধি অনুসারেও অস্বীকার করা যায় না। ধনগত অথবা প্রতিষ্ঠাগত অথবা তৃপ্তিগত অথবা সম্মানগত অথবা জ্ঞানগত কোন একটী ইচ্ছার পূরণ না হইলে যে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আবার মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা পূরণ করিতে হইলে শরীরের, ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যগত ইচ্ছার এবং অন্যান্য পাঁচ শ্রেণীর ইচ্ছার পূরণ করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

ছয় শ্রেণীর ইচ্ছা যুগপৎভাবে যাহাতে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা করিতে না পারিলে কোন এক শ্রেণীর ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না বটে কিন্তু মানুষের স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা করিতে পারিলে ছয় শ্রেণীর ইচ্ছাই যুগপৎভাবে এবং সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়। স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে যাহাতে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে মানুষের অন্য কোন শ্রেণীর ইচ্ছাই সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা কোন ক্রমে সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও সম্ভবযোগ্য হয় না।

মানুষের স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা যাহাতে সম্ভবযোগ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসে, জলে ও স্থলে, মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যাভাব পূরণ করিবার এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, সেই স্বাভাবিক শক্তি যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বজায় থাকে এবং কোনক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, তাহা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

যে যে নিয়মে এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়, সেই সেই নিয়মের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায়, এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর কার্য্য আছে।

ঐ দুই শ্রেণীর কার্য্যের এক শ্রেণীর কার্য্যের নাম সর্ব্বাবয়বিক কার্য্য আর অপর শ্রেণীর কার্য্যের নাম খণ্ডাবয়বিক কার্য্য। সর্ব্বাবয়বিক কার্য্য সর্ব্বদাই অণ্ডাকারের অথবা অখণ্ডমণ্ডলাকারের (Elliptical) হইয়া থাকে। সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের একমাত্র কারণ ভূমণ্ডলের উপরিভাগে নীলাকাশের বিদ্যমানতা। ভূমণ্ডলের উপরিভাগে নীলাকাশ অণ্ডাকারে অথবা অখণ্ডমণ্ডলাকারে বিদ্যমান আছে বলিয়া এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের, স্থলের,

উদ্ভিদ্‌শ্রেণীর এবং চরজীবশ্রেণীর অবয়বের প্রত্যেক অংশে ও প্রত্যেক পূর্ণাংশে অণ্ডাকারের অথবা অখণ্ডমণ্ডলাকারের সর্ব্বাবয়বিক কর্ম্ম সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। অণ্ডাকারের অথবা অখণ্ডমণ্ডলাকারের সর্ব্বাবয়বিক কর্ম্ম সর্ব্বদা ঊর্দ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া অধোদিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে।

খণ্ডাবয়বিক কার্য্য প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর আকারের হয়। খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের এক শ্রেণীর আকারের নাম ছত্রাকার—(lineal or umbrella-like), আর অপর শ্রেণীর আকারের নাম সূত্রাকার (linear)। খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের প্রধান কারণ দুই শ্রেণীর, যথা :—

(১) জলের, স্থলের, উদ্ভিদ্‌শ্রেণীর ও চরজীবশ্রেণীর অবয়বের গুরুত্ব (weight) এবং

(২) চরজীবশ্রেণীর খণ্ডাবয়বসমূহের (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হস্ত, পদ, লিঙ্গ, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মসমূহের) রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্য্য। ছত্রাকারের ও সূত্রাকারের খণ্ডাবয়বিক কার্য্যসমূহ সর্ব্বদা অধঃ হইতে উৎপন্ন হইয়া ঊর্দ্ধদিকে প্রধাবিত হয়।

এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে যে প্রধানতঃ উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কার্য্য বিদ্যমান আছে, তাহা আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের বিভিন্ন অবস্থার সহিত পরিচিত হইতে পারিলে কোন ক্রমে অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কার্য্য বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ দুই শ্রেণীর কার্য্যের উপরোক্ত তিন শ্রেণীর আকার (অর্থাৎ অণ্ডাকার, ছত্রাকার ও সূত্রাকার) কুত্রাপি বিদ্যমান থাকে না। স্বভাবতঃ এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কার্য্য বিদ্যমান থাকিলেও কেবলমাত্র অণ্ডাকার অথবা অখণ্ডমণ্ডলাকার বিদ্যমান থাকে। ইহার কারণ স্বভাবতঃ খণ্ডাবয়বিক কার্য্যসমূহ সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ জলে, স্থলে, উদ্ভিদ্‌শ্রেণীর অবয়বে, এবং চরজীবশ্রেণীর অবয়বে যে সমস্ত খণ্ডাবয়বিক কার্য্য হইতে পারে ও হইয়া থাকে সেই সমস্ত খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের বেগ অথবা পরিমাণ কখনও সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের বেগ অথবা পরিমাণের তুলনায় অধিক হইতে পারে না। স্বভাবতঃ যে সমস্ত খণ্ডাবয়বিক কার্য্য হইতে পারে ও হইয়া থাকে সেই সমস্ত খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের বেগ অথবা পরিমাণ কখনও সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের বেগ অথবা পরিমাণের তুলনায় অধিক হইতে পারে না ও অধিক হয় না বলিয়া স্বভাবতঃ খণ্ডাবয়বিক কার্য্যসমূহ সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে এবং এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কার্য্য বিদ্যমান থাকিলেও কেবলমাত্র অণ্ডাকার অথবা অখণ্ডমণ্ডলাকার বিদ্যমান থাকে। উদ্ভিদ্‌শ্রেণীর ও চরজীবশ্রেণীর প্রত্যেকটীর আকৃতিতে যে অণ্ডাকার বিদ্যমান থাকে তাহার প্রধান কারণও উপরোক্ত সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের এবং খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতা।

এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশের সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতা স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে বটে কিন্তু মনুষ্যশ্রেণীর ভ্রমে খণ্ডাবয়বিক কার্য্যসমূহের বেগ ও পরিমাণ সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যসমূহের বেগ ও পরিমাণের তুলনায় অধিক হইতে পারে। খণ্ডাবয়বিক কার্য্যসমূহের বেগ ও পরিমাণ সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যসমূহের বেগ ও পরিমাণের তুলনায় অধিক হইলে উহাদের সমতার অভাব হয় এবং তখন এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে দুই শ্রেণীর কার্য্য ও তিন শ্রেণীর আকার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিদ্যমান থাকে।

এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতা বিদ্যমান থাকিলে ঐ আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশ মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়-সমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যাভাব পূরণ করিবার ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার শক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতা বিদ্যমান থাকিলে জল ও ভূমি স্বতঃই সর্ব্বাধিক পরিমাণের (of maximum intensity) উৎপাদিকশক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের জলের ও স্থলের কোন অংশে সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতার অভাব হইলে আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশ মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যাভাব পূরণ করিবার ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার শক্তি-বিহীন হইয়া থাকে এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার শক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের কোন অংশে সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতার অভাব হইলে, জল ও ভূমি স্বতঃই ক্ষীণ উৎপাদিকাশক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। জল ও ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি ক্ষীণ হইলে ঐ জল ও ভূমি কোন পদার্থ মানুষের প্রয়োজননির্ব্বাহের উপযুক্ত প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে অক্ষম হয় এবং যে সমস্ত পদার্থ যে যে পরিমাণে উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত পদার্থের কোনটী মানুষের শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়সমূহের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার শক্তিযুক্ত হয় না। জল ও ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ক্ষীণতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে জল ও ভূমি হইতে যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন সেই সমস্ত পদার্থ মানুষের সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্যের ক্ষয়-কারক হইতে পারে ও হইয়া থাকে।

এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশের সর্ব্বাবয়বিক কার্য্য, খণ্ডাবয়বিক কার্য্য, দ্বিবিধ কার্য্যের সমতা, এবং দ্বিবিধ কার্য্যের সমতার অভাববিষয়ক উপরোক্ত কথাগুলি বর্ত্তমান মানবসমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্থান পায় নাই। উপরোক্ত কথাগুলি বর্ত্তমান মানবসমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্থান

পায় নাই বলিয়া ঐ কথাগুলি যে ভ্রমযুক্ত অথবা নিষ্প্রয়োজনীয়, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সাধারণ বিচারবিশ্লেষণের বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলেও ঐ কথাগুলির সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। আমাদিগের বিচারানুসারে ঐ কথাগুলি এত প্রয়োজনীয় যে, বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের দারিদ্র্যাবস্থার প্রধান কারণ ঐ কথাগুলির বিস্মৃতি।

এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে স্বতঃই সর্ব্বাবয়বিক কার্য্য, খণ্ডাবয়বিক কার্য্য এবং ঐ দ্বিবিধ কার্য্যের সমতা বিদ্যমান থাকে বলিয়া আকাশ-বাতাসে, জলে ও স্থলে মানুষের শরীরের ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যাভাব পূরণ করিবার ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার শক্তি স্বতঃই বিদ্যমান থাকে। আকাশ-বাতাসে, জলে ও স্থলে মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যাভাব পূরণ করিবার ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার শক্তি স্বতঃই বিদ্যমান থাকে বলিয়া স্বাস্থ্যগত সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত—ইহা সিদ্ধান্ত করা যায়। স্বাস্থ্যগত সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত—ইহা স্বীকার করিলে মানুষের ছয় শ্রেণীর ইচ্ছাই সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত—ইহাও স্বীকার করিতে হয়। ইহার কারণ, মানুষের স্বাস্থ্য-গত সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধন করিতে পারিলে স্বতঃই মানুষের ছয় শ্রেণীর ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত হয়।

মানুষের ছয় শ্রেণীর ইচ্ছার প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত বলিয়া আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে মানুষের অভাব-সমস্যার সর্ব্বতোভাবে সমাধান করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত এবং সম্পূর্ণ সম্ভবযোগ্য।

এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের কোন অংশে যদ্যপি সর্ব্বাবয়বিক কার্য্য অথবা খণ্ডাবয়বিক কার্য্য অথবা সর্ব্বাবয়বিক ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতা স্বতঃই বিদ্যমান না থাকিত এবং ঐ দ্বিবিধ কার্য্যের কোনটির অভাব হওয়া অথবা ঐ দ্বিবিধ কার্য্যের সমতার অভাব হওয়া যদি স্বভাবের নিয়ম হইত তাহা হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিতে হইত; পরন্তু, মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সর্ব্বাবস্থায় সম্ভব-যোগ্য নহে—ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হইত।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত বটে, কিন্তু মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছার সর্ব্বতোভাবের পূরণ হওয়া স্বতঃই কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছার সর্ব্বতোভাবের পূরণের জন্য মানুষের ব্যক্তিগত শিক্ষা ও সাধনা এবং সঙ্ঘগত সংগঠন অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছার সর্ব্বতোভাবের পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিবার বিরুদ্ধে স্বভাবজাত কোন বিঘ্ন থাকিতে পারে না ও থাকে না বটে; কিন্তু মানুষ যদ্যপি ঐ উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত শিক্ষা ও সাধনা অর্জ্জন না করেন এবং সঙ্ঘগত সংগঠন না করেন তাহা হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছার সর্ব্বতোভাবের পূরণ হওয়া কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতো-ভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে কোন মানুষের কোন কার্য্যবশতঃ যাহাতে এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের কোন অংশে স্বভাবজাত সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতার কোনরূপ অভাব না ঘটিতে পারে তদ্বিষয়ে প্রধান ভাবে ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার কারণ—এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের কোন অংশে স্বভাবজাত সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতার কোনরূপ অভাব ঘটিলে কোন শ্রেণীর ব্যক্তিগত শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা অথবা সঙ্ঘগত সংগঠনের দ্বারা কোন দেশের কোন মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জল-ভাগের ও স্থলভাগের অখণ্ডতা নিবন্ধন উহাদের কোনটীর কোন অংশে স্বভাবজাত সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতার কোনরূপ অভাব ঘটিলে, সমতার ঐ অভাব সমগ্র ভূ-মণ্ডল-ময় ব্যাপ্তিলাভ করিয়া থাকে; ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের স্বভাব-জাত সর্ব্বাবয়বিক ও খণ্ডা-বয়বিক কার্য্যের সমতার কোনরূপ অভাব ঘটিলে আকাশ-বাতাস, জলভাগ ও স্থলভাগ মানুষের স্বাস্থ্যাভাব পূরণ করিবার ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার স্বাভাবিক শক্তিহীন হয় এবং মানুষের স্বাস্থ্যক্ষয় করিবার শক্তিযুক্ত হয় এবং ভূ-মণ্ডলের, জলের ও স্থলের স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি ক্ষীণ হইয়া থাকে; ভূ-মণ্ডলের আকাশ বাতাস, জলভাগ ও স্থলভাগ মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষয়সাধন করিবার শক্তিযুক্ত হইলে অথবা ভূ-মণ্ডলের, জলের ও স্থলের স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক দেশের মানুষের স্বাস্থ্যাভাব ও ধনাভাব অনিবার্য্য হয়।

ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থল-ভাগের কোনও এক অংশে উহাদের স্বভাবজাত সর্ব্বাবয়বিক ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতার অভাব হইলে, সমতার ঐ অভাবের ব্যাপ্তি সমগ্র ভূ-মণ্ডলময় হওয়া এবং প্রত্যেক দেশের মানুষের স্বাস্থ্যাভাব ও ধনাভাব হওয়া অনিবার্য্য হয় বলিয়া মানুষের কোন একশ্রেণীর ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে যেরূপ ছয় শ্রেণীর ইচ্ছা যাহাতে যুগপৎভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়—সেইরূপ আবার, কোন একটী দেশের কোন একটী মানুষের কোন একটী ইচ্ছা সর্ব্বতো-ভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে—সমগ্র ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা যাহাতে যুগপৎ ভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়—তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

আধুনিক মানবসমাজের এক শ্রেণীর মতবাদানুসারে মানুষ অসংখ্য শ্রেণীর সামগ্রী উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, এবং মানুষের উপভোগ-ইচ্ছাসমূহের পূরণ করিতে হইলে অসংখ্য শ্রেণীর সামগ্রীর প্রয়োজন হয় বলিয়া মানুষের ধনগত ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। আমাদের মতবাদ উহার বিরোধী।

আমাদিগের বিচারানুসারে যে-সমস্ত সামগ্রীর কাঁচামাল এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জলভাগ ও স্থলভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে এবং যে-সমস্ত সামগ্রী শিল্পকার্য্যের সহায়তায় মানুষ তাঁহার শরীর অথবা ইন্দ্রিয়সমূহ অথবা মন অথবা বুদ্ধিদ্বারা ব্যবহার-যোগ্য করিতে সক্ষম নহেন সেই সমস্ত সামগ্রীর কোনটী মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইতে পারে না ও হয় না। ইহার কারণ—প্রত্যেক মানুষের স্ব স্ব ইচ্ছার গণ্ডী অনুসারে অভীষ্ট সামগ্রীসমূহের গণ্ডী সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে; কামের গণ্ডী অনুসারে ইচ্ছার গণ্ডী সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে; প্রবৃত্তির গণ্ডী অনুসারে কামের গণ্ডী সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে; শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির শক্তি অনুসারে প্রবৃত্তির গণ্ডী সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। আকাশ-বাতাস, জল ও স্থলের সহিত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংস্রব হইতে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে-সমস্ত সামগ্রীর কাঁচামাল এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জলভাগ ও স্থলভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে এবং যে-সমস্ত সামগ্রী শিল্পকার্য্যের সহায়তায় মানুষ তাঁহার শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি দ্বারা ব্যবহারযোগ্য করিতে সক্ষম নহেন, সেই সমস্ত সামগ্রীর কোনটী যে মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইতে পারে না ও হয় না, তাহা সাধারণ বিশ্লেষণ-বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলেও অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক মনুষ্যসমাজে অভাবসমস্যার সর্ব্বতোভাবের সমাধানের সম্ভবযোগ্যতার বিরুদ্ধে আর এক শ্রেণীর মতবাদ প্রচলিত আছে। ঐ শ্রেণীর মতবাদানুসারে মনুষ্যসমাজের লোকসংখ্যা যখন অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তখন মানুষের আহার-বিহারের সামগ্রীসমূহ যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয়, সেই সেই পরিমাণের অল্পাধিক অভাব হওয়া অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

আমাদিগের বিচারানুসারে উপরোক্ত মতবাদও সমর্থনযোগ্য নহে। আকাশ-বাতাসের অথবা জলের অথবা স্থলের কোন অংশের সর্ব্বাবয়বিক ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতার অভাব না ঘটিলে আকাশ-বাতাসের অথবা জলের অথবা স্থলের স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তির ক্ষীণতা ঘটিতে পারে না. আকাশ-বাতাসের অথবা জলের অথবা স্থলের স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তির ক্ষীণতা না ঘটিলে এই ভূমণ্ডলের মনুষ্যসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পায় না কেন, মানুষের আহার-বিহারের জন্য যখন যে যে সামগ্রী যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হইতে পারে ও প্রয়োজন হয় সেই সেই সামগ্রীর সেই সেই পরিমাণের কখনও কোনরূপ অভাব হইতে পারে না।

যে যে কারণে এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল উদ্ভিদ্‌শ্রেণী ও মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণী, এবং মনুষ্যশ্রেণী ও মনুষ্যশ্রেণীর আহার-বিহারাদির ইচ্ছা স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়, সেই সেই কারণের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল উৎপন্ন না হইলে উদ্ভিদ্‌শ্রেণীর ও মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণী উৎপন্ন হইতে পারে না; উদ্ভিদ্‌শ্রেণী ও মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণী উৎপন্ন না হইলে, মনুষ্যশ্রেণী উৎপন্ন হইতে পারে না; মনুষ্যশ্রেণী উৎপন্ন না হইলে মনুষ্যশ্রেণীর আহার-বিহারাদির ইচ্ছা উৎপন্ন হইতে পারে না। আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল উৎপন্ন হইবার পর উদ্ভিদ্‌শ্রেণী ও মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণী উৎপন্ন হয় বলিয়া আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল যত অধিক আয়তনে (area) উৎপন্ন হইতে পারে ও হয়, উদ্ভিদ্‌শ্রেণী ও মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণী তত অধিক আয়তনে * (area) উৎপন্ন হইতে পারে না ও হয় না। উদ্ভিদ্‌শ্রেণী ও মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণী উৎপন্ন হইবার পর মনুষ্যশ্রেণী ও তাহার আহার-বিহারাদির ইচ্ছা উৎপন্ন হয় বলিয়া উদ্ভিদ্‌শ্রেণী ও মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণী যত অধিক আয়তনে উৎপন্ন হইতে পারে ও হয় মনুষ্যশ্রেণীর আহার-বিহারাদি ইচ্ছার সামগ্রীর আয়তন তত অধিক হইতে পারে না ও হয় না।

যে যে কারণে এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল, উদ্ভিদ্‌শ্রেণী ও মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণী, এবং মনুষ্যশ্রেণী ও মনুষ্যশ্রেণীর আহার-বিহারাদির ইচ্ছা স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হইয়া থাকে—সেই সেই কারণের কার্য্য উপরোক্ত নিয়মে সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকে বলিয়া আমাদিগের বিচারানুসারে সর্ব্বাবয়বিক ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতার কোনরূপ অভাব মনুষ্যের দ্বারা সাধিত না হইলে মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, মনুষ্যজাতির আহার-বিহারের প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর কাঁচামাল যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হইতে পারে ও হয়, সেই সেই শ্রেণীর কাঁচামালের কোনটীর অথবা কোন শ্রেণীর কাঁচামালের কোন প্রয়োজনীয় পরিমাণের কখনও কোনরূপ অভাব হইতে পারে না।

মনুষ্যজাতির আহার-বিহারাদির ইচ্ছাসমূহ পূরণ করিবার জন্য যে সমস্ত কাচামাল যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেই সেই কাচামালের সেই সেই পরিমাণের অভাব যে, আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের সর্ব্বাবয়বিক ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতার কোনরূপ অভাব না হইলে ঘটিতে পারে না তদ্বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইবার আর একটী পদ্ধতি আছে। ঐ পদ্ধতি অনুসারে তিন শ্রেণীর বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়, যথা:

(১) প্রত্যেক মানুষের আহার-বিহারাদির ইচ্ছাপূরণের জন্য যে যে সামগ্রী যে যে পরিমাণে প্রতি বৎসরে প্রয়োজন হইতে পারে সেই সেই সামগ্রী সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে কত আয়তনে জমি, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি ক্ষীণ না হইলে, প্রয়োজন হইতে পারে—সেই আয়তনের পরিমাণ;

* "উদ্ভিদ্‌শ্রেণীর আয়তন"—এই ভূ-মণ্ডলে সর্ব্ববিধ উদ্ভিদ্‌শ্রেণীর প্রত্যেকটীর যে যে আয়তন থাকে, সেই সেই আয়তনের সমষ্টিকে উদ্ভিদ্‌শ্রেণীর আয়তন বলা হয়।

"মানুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণীর আয়তন"—এই ভূ-মণ্ডলে যত শ্রেণীর মনুষ্যেতর-চর-জীব আছে তাহার প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকটির যে আয়তন থাকে সেই আয়তনের সমষ্টিকে মনুষ্যেতর-চর-জীব শ্রেণীর আয়তন বলা হয়।

"মনুষ্যজাতির আয়তন"— এই ভূ-মণ্ডলে যতসংখ্যক মানুষ থাকেন, সেই সমগ্র সংখ্যার প্রত্যেক মানুষের যে আয়তন থাকে, সেই আয়তনের সমষ্টিকে মনুষ্যজাতির আয়তন বলা হয়।

(২) মানুষের আহার-বিহারাদির ইচ্ছাপূরণের যে যে সামগ্রী প্রতিবৎসর প্রয়োজন হয় সমগ্র ভূ-মণ্ডলে সেই সেই সামগ্রীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার যোগ্য জমির আয়তনের পরিমাণ ;

(৩) সমগ্র মনুষ্যসমাজের লোকসংখ্যার পরিমাণ।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর বিষয় লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের মনুষ্যসংখ্যার পরিমাণ যাহাই হউক না কেন সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার আহার-বিহারাদির ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য সর্ব্বসমেত যখন যে আয়তনের জমির প্রয়োজন হইতে পারে ন্যূনপক্ষে তাহার নয়গুণ আয়তনের জমি সর্ব্বদাই এই ভূ-মণ্ডলে বিদ্যমান থাকে।

এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জল, ভূমি, উদ্ভিদ্‌শ্রেণী, মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণী এবং মনুষ্যশ্রেণী যে যে কারণবশতঃ স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হয় সেই সেই কারণের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, ঐ কারণসমূহের শৃঙ্খলাবদ্ধ চলৎ-শীলতার বিদ্যমানতা বশতঃ মনুষ্যশ্রেণীর উৎপত্তির সংখ্যা কখনও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, আবার কখনও ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মনুষ্য-শ্রেণীর উৎপত্তির সংখ্যার বৃদ্ধি ও হ্রাস এই দুইই সীমাবদ্ধ।

উপরোক্ত কারণের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে আরও দেখা যায় যে, মনুষ্য শ্রেণীর উৎপত্তির সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত আকাশ-বাতাসের, জলের, স্থলের, উদ্ভিদ্‌শ্রেণীর এবং মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণীর উৎপত্তির আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হওয়া অনিবার্য্য হয়। মনুষ্যশ্রেণীর উৎপত্তির সংখ্যা স্বতঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণীর, উদ্ভিদ্‌শ্রেণীর, জমির, জলভাগের এবং আকাশ-বাতাসের উৎপত্তির আয়তন স্বতঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মনুষ্যশ্রেণীর উৎপত্তির সংখ্যা স্বতঃই হ্রাস পাইতে থাকিলে মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণীর, উদ্ভিদ্‌শ্রেণীর, জমির, জল-ভাগের এবং আকাশ-বাতাসের উৎপত্তির আয়তন স্বতঃই হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এক শ্রেণীর পদার্থের স্বাভাবিক উৎপত্তির বৃদ্ধি আর অন্য এক শ্রেণীর পদার্থের স্বাভাবিক উৎপত্তির হ্রাস—ইহা কখনও হইতে পারে না ও হয় না।

যে যে কারণ বশতঃ এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জলভাগ, স্থলভাগ, উদ্ভিদ্‌শ্রেণী, মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণী এবং মনুষ্যশ্রেণী স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হইয়া থাকে, সেই সেই কারণের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যজাতি যখন যে আয়তনে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, মনুষ্যেতর চর-জীবশ্রেণী তখনই সেই আয়তনের তিন গুণ আয়তনে, উদ্ভিদ্‌শ্রেণী মনুষ্যজাতির আয়তনের সাতাইশ গুণ আয়তনে, ভূমি মনুষ্যজাতির আয়তনের দুইশত তেতাল্লিশ গুণ আয়তনে, জল মনুষ্যজাতির আয়তনের সাতশত উনত্রিশ গুণ আয়তনে এবং এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাস মনুষ্যজাতির আয়তনের ছয় হাজার পাঁচশত একষট্টি গুণ আয়তনে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মানুষের অভাব-সমস্যার সর্ব্বতোভাবের সমাধানের সম্ভব-যোগ্যতা বিষয়ে যে যে কথা উপরে বলা হইয়াছে, সেই সেই কথা হইতে পাঁচ শ্রেণীর কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, যথা :

(১) মানুষের ছয় শ্রেণীর ইচ্ছা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে মানুষের কোন শ্রেণীর অভাব-সমস্যার কথা উঠিতে পারে না ; ঐ ব্যবস্থা সাধিত হইলে স্বতঃই মানুষের অভাব-সমস্যার সর্ব্বতোভাবের সমাধান করা হয়।

(২) মানুষের ছয় শ্রেণীর ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রথম ও প্রধান সোপান মানুষের স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা। মানুষের স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় ; মানুষের স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য না হইলে মানুষের কোন শ্রেণীর ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

(৩) এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের কোনও অংশের সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতার অভাব না হইলে মানুষের স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় ; এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের কোন একটী অংশের সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের সমতার অভাব হইলে মানুষের স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা ত' দূরের কথা স্বাস্থ্যগত প্রয়োজন পর্য্যন্ত আদৌ পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

(৪) এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলভাগের ও স্থল-ভাগের প্রত্যেক অংশের সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতা বিদ্যমান থাকা—যে যে নিয়মে এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জলভাগ ও স্থলভাগ স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়, সেই সেই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) যে যে নিয়মে এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জলভাগ ও স্থলভাগ স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়, সেই সেই নিয়মের কোনরূপ ব্যভিচার যদি কোন মানুষ না করেন তাহা হইলে অন্য কোন কারণে এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা স্থলভাগের কোন অংশের সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতার কোনরূপ অভাব হইতে পারে না ও হয় না।

প্রথমতঃ, মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য ছাড়া এই

ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের কোন অংশের সর্ব্বাবয়বিক কার্য্যের সমতার কোনরূপ অভাব হইতে পারে না এবং কোন মানুষ যদ্যপি প্রকৃতিবিরুদ্ধ কোন কার্য্য না করেন তাহা হইলে এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের কোন অংশের সর্ব্বাবয়বিক ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতার কোনরূপ অভাব হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলভাগের ও স্থলভাগের প্রত্যেক অংশের সর্ব্বাবয়বিক ও খণ্ডাবয়বিক কার্য্যের সমতার অভাব না হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হয়;

তৃতীয়তঃ, মানুষের সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়।

চতুর্থতঃ, মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত হইলে স্বতঃই মানুষের অভাব-সমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করা হয়।

উপরোক্ত এই চারিশ্রেণীর যুক্তিবলে আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের অভাব-সমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত ও সম্ভবযোগ্য।

বিধ্বস্ত বিমান

দ্বাদশ বর্ষ কার্ত্তিক, ১৩৫১ ১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

মাতৃপূজার লগ্ন হয়েছে শেষ,—
পূজাপ্রাঙ্গণ মৌন নীরব, বন্দনা নিঃশেষ ;
বেদ-চণ্ডীর মন্ত্র-গীতালি বাতাসে হয়েছে হারা,
পঞ্চপ্রদীপে ঘৃতালোকছটা আঁধারে ডুবিয়া সারা।
জনসমারোহ কল কলরব নীরব হয়েছে আজি
বাজে না শঙ্খ, শুভ মঙ্গল বাদ্য ওঠে না বাজি'—

সবার অশ্রুজলে
মাটির প্রতিমা বিদায় নিয়াছে নিশীথে নদীর তলে,
মৃত্তিকা যাহা ধুয়ে গেছে তাহা, বর্ণ গিয়েছে গলি'
মাটির যেটুকু, মাটি হয়ে গেছে—সোণা যাহা আছে লি'।

জননী নহে ত মৃন্ময়,
এই স্বদেশেরই মাটির মাঝারে মা'টি মোর অক্ষয়,
সন্তানে তাই মৃত্তিকা ছানি' মাকে দিতে চায় রূপ
মাটির দেউল যত্নে-বেড়িয়া জ্বালে সে গন্ধধূপ
জন্মের মাটি, মরণের মাটি, সারাজীবনের মাটি
এ মাটিরই মহাপ্রসাদের কণা সকলে নিয়েছে বাটি';
সবার মাঝারে সকলেরে ল'য়ে জননী লভেছে রূপ
ধূলায় ধূসর মরু-সংসারে বিচিত্র অপরূপ।

অসুরদলনী বেশে
তাই দশহরা দুর্গতিহরা দুর্গা দাঁড়ালো এসে।
আজিকে চিনেছি ঠিক
এ মনোহরণী রুদ্রার লাগি' আমি যে পৌত্তলিক !
কোটি রূপ আর লক্ষ আকারে বিশ্বে বিকাশ যার
নব নব রূপা মায়াবী বহু কি সত্যই নিরাকার ?
যেটুকু পেয়েছি, যাহা ফুটিয়াছে সপ্ত ভুবন ভরি'
আকাশে, চন্দ্রে, সাগরে গিরিতে দিবা আর বিভাবরী,
কূলে ও অকূলে, অনলে অনিলে, ব্যোমে আর চরাচরে
সব ঠাঁই ভরি' রূপের মুকুল ফুটে আছে থরে থরে।
মাটি আছে তাই আকাশ সাগর দুলিতেছে তারে ঘিরে
অরূপ আসিয়া রূপে হ'ল হারা, রূপ জাগে স্মৃতি তীরে।
আলো-আঁধারের জানা-অজানায় খুঁজে নাহি যারে পাই,
আকারে বিকশি সে রূপের শশী একবার ছুঁয়ে যাই।

যাহার যেভাবে রুচি
রূপাতীত রূপ আঁকিয়া ফিরি গো,—রং দেই আর মুছি।

যে মায়ার পট মাটি ছিল কাল, দশমী লগনে গলি'
বিসর্জ্জনের প্রান্তে আজি তা আলোকে উঠেছে জ্বলি'
যে মলিন কালো ধূলার আড়াল কালোবধি ছিল বাঁচি ;
সে কুহেলীজাল ছিন্ন আজিকে, সত্যকে জানিয়াছি।

অশ্রুমোচন ভুলি'
মানুষের মাঝে যে দেবতা আছে তারে লই বুকে তুলি'।
প্রতি মানবেরে প্রণতি জানাই, প্রতি ঠাঁই রাখি নতি
আজি শুভদিনে সকল সৃষ্টি লভুক পরমা গতি।

বৈরিতা নাই কারো সাথে আজ বিরোধ কাহারো সনে
বিশ্ব মানব-মনের পরিধি ছুঁয়ে যাই মনে মনে ;
নিখিলের মাঝে যে আছে যেথায় কারো সাথে দ্বেষ নাই
মিলিত মানবে পংক্তি-মানব নিঃশেষ করে যাই
নবীন আলোকে নূতন উষায় চাহি সব মুখে মুখে
জনে জনে আজ করি কোলাকুলি, ভালোবাসি বুকে বুকে।

একের লাগিয়া অপরের স্নেহ-অশ্রু-সলিলে ভিজে'
নবীন সাম্য জন্ম লভুক নব মমতার বীজে।

তারই জয়গান আজি বিজয়ার উৎসবক্ষণে গাই,
আত্মীয় সাথে আত্মা মিলায়ে বিশ্বে মিলিব ভাই।

—মানুষ আজিকে মিলন লভুক—শক্তি, আয়ুধ, বল,
নব জ্ঞানালোকে ফুটুক তাহার সাধনার শতদল ;
সাহিত্যে আর শিল্পে লাগুক নবীন আলোর ছোঁয়া
তার সংসার-তপোবন হোক শান্তি-সলিলে ধোয়া ;
যজ্ঞ-বিনাসী তাড়কা নিধনে জাগুক শক্তিধর
রক্ষ-বিনাশী রাম লক্ষ্মণে ভরে যাক তার ঘর।

অনাথেরা আজি আশ্রয় পাক, অশুচিরা হোক শুচি
নিঃস্ব আজিকে জানুক তাহারে বিশ্ব নিয়াছে খুঁজি,
অত্যাচারের হোক অবসান উৎপীড়নের জয়—
করিব শপথ, আজি হ'তে যেন পৃথিবীতে নাহি হয়।
কামনা জিনিয়া নিষ্কাম হোক সত্যের পরিচয়
নরজগতের নিষ্ঠুর রণে মানুষের হোক জয়।
আজিকে যাহারা আমাদের মাঝে আছে, আর যারা নাই
সবারই আত্মা হউক তৃপ্ত আর কিছু নাহি চাই।

বিজয়ার প্রলাপ

শ্রীহরিপদ দত্ত

আজ বিজয়া দশমী। তিন দিনের অহোরাত্রব্যাপী আনন্দোৎসবের পর আজ অন্তরের কিয়দংশ শূন্য মনে হচ্ছে—মনটা যেন "ফক্ ফক্" করছে। কিন্তু এখনও আনন্দের সম্পূর্ণ অভাব অনুভূত হয় না। সে-আনন্দের জের আবার সন্ধ্যা থেকে উথলে উঠবে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনে আনন্দাশ্রুই বিগলিত হ'বে। এই ভাব আমাদের চিরাভ্যস্ত, আমাদের মজ্জাগত। মায়ের আগমনের মাসাধিক পূর্ব্ব থেকেই আমরা তাঁর প্রতিমাদর্শনের প্রতীক্ষায় আনন্দ অনুভব করি। বালক-বালিকাগণ প্রথমতঃ নূতন বস্ত্র ও নূতন পাদুকা পা'বার আশায় উৎসাহিত হয় এবং প্রাপ্তিমাত্র আনন্দে উৎফুল্ল হয়। এ-আনন্দ নিরঞ্জন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। যাঁরা আত্মীয়স্বজনবিরহিত হ'য়ে চাকরী উপলক্ষে বিদেশে থাকেন, তাঁরা স্ব স্ব ভবনে আস্‌বার আশায় ও মিলনপ্রতীক্ষায় আনন্দিত হ'ন এবং আনন্দ উপভোগ করেন। কেউ কেউ দীর্ঘ অবকাশলাভে আনন্দিত হ'ন এবং কেউ কেউ স্থান-পরিবর্ত্তনের (change) আনন্দ লাভ করেন। পূজাবকাশের পূর্ব্বে কেউ কোথাও বাইরে যা'বেন কি না—যা কোন্ স্থানে যা'বেন—বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে এই প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ হয়। ভিক্ষা যাদের জীবিকা অথবা বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে যারা বাধ্য হ'য়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে, তারাও অধিক পরিমাণে ভিক্ষালাভের আশায় আনন্দিত হয়। যেদিক দিয়েই হ'ক, মায়ের আগমন উপলক্ষে একটা টানা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয় এবং ক্রমশঃ শীর্ণতা প্রাপ্ত হ'লেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্য্যন্ত সে স্রোত বইতে থাকে।

মা! শরতে তোমার দশভুজা মূর্ত্তির আবির্ভাবে আপামর সাধারণ বাঙ্গালীর প্রাণে পরম আনন্দের উচ্ছ্বাস আসে। যাঁরা বাঙ্গালার বাইরে থাকেন তাঁরাও সমবেতভাবে বিদেশে পূজার আয়োজন করেন এবং উৎসবের ও পূজার আনন্দে মগ্ন হ'য়ে যান। এ-পূজার আনন্দ বিশ্বব্যাপী বা ভারতব্যাপী না হ'লেও বঙ্গব্যাপী, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মা, এ-বৎসরের আনন্দ দুঃখমিশ্রিত। যা'রা অনশনে বা অর্দ্ধাশনে বৎসরের অধিকাংশ দিন যাপন করে, যারা পুত্রকন্যাগণকে পেট ভ'রে আহার দিতে অসমর্থ, লজ্জানিবারণের জন্য সামান্য আচ্ছাদন সংগ্রহ করবার ক্ষমতা যাদের নাই, তা'রা পূজার সময়ে নূতন বস্ত্র কোথা থেকে সংগ্রহ করবে, বিশেষতঃ, যখন বস্ত্রের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণেরও অধিক? কেবল বস্ত্রের মূল্য নয়, এমন কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য নাই—যার দাম চতুর্গুণের অধিক বেড়ে উঠে নি। যারা ক্ষুধার আহার জুটাতে পারে না, রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে অক্ষম, যা'দের অভুক্ত, শীর্ণকায়, ব্যাধিজর্জ্জরিত সন্তানগণ হয় ক্ষুধার তাড়নায়, নতুবা ব্যাধিজনিত করুণ ক্রন্দনে জনকজননীর হৃদয়ে নিরন্তর কঠিন শেলাঘাত করছে, তা'রা নূতন বস্ত্র সংগ্রহ করবে কিরূপে? তা'দের প্রাণে আনন্দ আস্‌বে কেমন ক'রে মা?

আমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদর্শী শাসনকর্ত্তারা অনেক জিনিসের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ক'রে Standard price বেঁধে দিয়েছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে-জিনিষের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তা'ই বাজার থেকে উবে যাচ্ছে; ৪।৫ গুণ অধিক দাম দিতে না পারলে তা' বাজারে পাওয়া যায় না। আপাত-দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, মূল্যনিয়ন্ত্রণের ফলে দ্রব্যবিশেষের "Black Market" সৃষ্ট হচ্ছে। দৃষ্টির হয়ত, ভুল আছে এবং দুর্ভাগ্যও আমাদের, কিন্তু, কারও বুদ্ধির বা কর্ম্মকৌশলের দোষ আছে কি না সে-বিচার আমাদের সাধ্যাতীত হ'লেও, দোষ বা ত্রুটী তোমার অবিদিত নয়। সময়ে তুমি অবশ্য এর বিচার করবে।

গত বৎসর বাঙ্‌লায় লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে কালকবলিত হ'য়েছে, ত্রিনয়নি, এ-কথা ত তোমার বিদিত—তোমার দৃষ্টির অন্তরালে ত সংসারে কোন ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় না। যে-দেশের উৎপন্ন শস্যজাত সমগ্র পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা-সমাধানে সক্ষম, সে-দেশে দুর্ভিক্ষ! সে-দেশের লোক অনাহারে মরে! এদিকে শুনি, কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও বঙ্গের কোন কোন স্থানে রক্ষিত রাশি রাশি খাদ্যদ্রব্য পচিয়া পূতিগন্ধময় ও বিষবৎ আহারের অনুপযোগী হওয়াতে প্রকৃত আবর্জ্জনার মত আবর্জ্জনা-স্তূপে নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে। আরও শুনি যে, যথাকালে এই পূর্ব্ব-সঞ্চিত খাদ্যগুলির সদ্ব্যবহারে লোকক্ষয় অনেক পরিমাণে নিবারিত হ'ত। এ-বিষয়েও যদি কারও বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির দোষ বা অদূর-দর্শিতা অথবা নির্দ্দয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, তার বিচার তুমিই করবে মা—এ-বিচার আমাদের অধিকার বহির্ভূত।

এ-দুর্দ্দিন কেবল বঙ্গের নয়, কেবল ভারতের নয়; সমগ্র পৃথিবীতে একটানা নির্ঝরিণীর মত এই দুর্দ্দিনের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, যদিও নিয়ন্ত্রণবিধির তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে এর উৎকটতার তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। কারণের অনুসন্ধান করতে গেলে সকলের কাছে একই উত্তর পাওয়া যায়—বর্ত্তমান বিশ্ব-ব্যাপী সংগ্রাম। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে যে সমরানল প্রজ্জলিত হ'য়েছিল, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বাহ্যতঃ নির্ব্বাপিত হ'লেও তার স্ফুলিঙ্গা-বশেষ জার্ম্মাণীর অন্তরে বর্ত্তমান ছিল এবং সে-সমর-প্রসূত কু-ফলের তিক্ত আস্বাদ রসনা থেকে নিরাকৃত না হ'তে না হ'তে প্রধূমিত হ'য়ে বর্ত্তমান বিরাট আকার ধারণ করেছে এবং তার লেলিহান জিহ্বা সমস্ত জগতে প্রসারিত হয়েছে। পূর্ব্বযুদ্ধের ফল ভারতবর্ষ কিয়ৎ পরিমাণে ভোগ করলেও সে-যুদ্ধ তার দ্বারদেশে উপস্থিত হয়নি, কিন্তু বর্ত্তমান সমরে তার বক্ষের কিয়দংশ আক্রান্ত হ'য়েছিল এবং বিপক্ষবাহিনী অদ্যাপি তার দ্বারের অনতিদূরে অবস্থান করছে। লক্ষ লক্ষ বৈদেশিক সৈন্য ভারতরক্ষার্থে তার অঙ্কে উপনীত হ'য়েছে। তাদের ও স্থানীয় সৈন্যগণের অশন-বসনাদির সরবরাহকল্পে কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত, এমন কি দিশাহারা হ'য়ে পড়্‌লেন যে, বেচারা দেশবাসগণের পানে ভাল ক'রে তাকাবারও অবকাশ পেলেন না। আইন-কানুনের শৃঙ্খলে তা'রা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, না খেয়ে মরলেও তাদের মুখ ফুটে কথা বল্‌বারও উপায় নাই। তা' যদি থাক্‌ত, দেশে প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত থাক্‌তেও তারা না খেয়ে মর্‌ত না এবং সঞ্চিত খাদ্য পর্য্যুষিত হ'য়ে আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হ'ত না। অতিথি-

সংকার ভারতবাসীর ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট ; যে বিদেশীয় সৈন্য-বাহিনী ভারতরক্ষার জন্য উপস্থাপিত, তাদের আমন্ত্রণ ও উপস্থিতি অথবা সমর-প্রচেষ্টা ইচ্ছানুরূপ হ'ক না হ'ক, তাদের যথোচিত সংকারের জন্য ভারতবাসী স্বার্থত্যাগে পরাঙ্মুখ হ'ত না, কিন্তু, হাত তুলে কিছু দেবার অধিকার বা সামর্থ্য কি তার আছে? অবশ্য কর্ম্মকর্ত্তাদের বুদ্ধি-বা প্রবৃত্তির দোষে যদি কোন কার্য্য-বিশৃঙ্খলা ঘটে তার জন্য দায়ী যিনিই হ'ন, ফলভোগ করে সেই বেচারাগণ।

এইরূপ যুদ্ধের সূত্রপাত হয় কিসে? রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ যে এর উদ্দেশ্য নয়, সে-কথা বলাই বাহুল্য, কারণ যে-দেশে এ-যুদ্ধের সূত্রপাত সেই জার্ম্মাণী স্বাধীন দেশ। কেউ কেউ বল্‌তে পারেন যে, পররাষ্ট্রবাসী স্বজাতির কল্যাণ বা উদ্ধারের নিমিত্ত এই যুদ্ধের আয়োজন, কিন্তু এরূপ উদ্দেশ্যের ভিত্তি স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি ও প্রেম। যার হৃদয়ে এই ভিত্তি স্থাপিত, সে কি লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যেতে এবং লক্ষ লক্ষ নারীকে পতিপুত্রহীনা বা পিতৃভ্রাতৃবিহীনা করতে প্রয়াসী বা অভিলাষী হ'তে পারে? কোটী কোটী নরনারীর দ্বারা একটি সমগ্র জাতি গ্রথিত হয়। যে জাতির মঙ্গল কামনা করে, জাতি-ভুক্ত প্রত্যেক মানুষের কল্যাণ তার কাম্য এবং প্রত্যেকের অর্থ বিষয়ে, বাসস্থান বিষয়ে ও খাদ্য বিষয়ে স্বাধীনতা ও সন্তোষ লাভ তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এতদ্বিষয়ে যখন স্বদেশজাত দ্রব্য দ্বারা সকলের সর্ববিধ অভাবের পূরণ অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন বিষয়গুলি জটিল সমস্যায় পরিণত হয়। সুতরাং বল্‌তে হয় যে, খাদ্যসমস্যা এই যুদ্ধের মূলীভূত, অন্ততঃ, অন্যতম তথা প্রধানতম কারণ। কিন্তু, কয়জন এ-বিষয়ের অনুধাবন করেন? কয়জন এই সমস্যা-সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায়-নির্দ্ধারণ-বিষয়ে চিন্তা করেন? যাঁরা এই যুদ্ধের প্ররোচক বা নিয়ন্তা, এ-চিন্তা কি তাঁদের মস্তিষ্কের প্রবেশদ্বারে আঘাত করেছে? এই উপায় নির্দ্ধারণের উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা তাঁদের আছে কি না, এরূপ প্রশ্নের উত্থাপন প্রথমতঃ আমাদের অধিকার বহির্ভূত, দ্বিতীয়তঃ অশোভন। অধিকন্তু, তাঁরা এমন আত্মাভিমানী যে, কোন বিষয়ে অপরের সাহায্য বা উপদেশ গ্রহণ করতে গেলে তাঁদের আত্ম-মর্য্যাদায় আঘাত লাগে। শুনা যায় যে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ব্রহ্মদেশ রক্ষা বিষয়ে চীনের সাহায্যপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ফলে ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশের হস্তচ্যুত হ'ল, আর এখন "ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরবার" ব্যবস্থা হ'য়েছে। এরূপ ব্যবস্থা যে বহু ক্লেশসাধ্য এবং বহু ব্যয়সাপেক্ষ তা' বলা নিষ্প্রয়োজন। এই সম্পর্কে আর একটি প্রশ্নের স্বতঃই উদয় হয়: যখন জাপান, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি "গালে চড় মেরে কেড়ে নিলে", তখন কি, মা, তোমার বাহনের জ্ঞাতি "নাকে সর্ষের তেল দিয়ে" নিভৃত গহ্বরে নিদ্রিত ছিল? চারিদিক থেকে রক্ত শোষণ ক'রে যে রক্ষিগণের ও রক্ষণ-কার্য্যের বিধাতৃবর্গের পেট ভরানো হয়, তাঁদের কর্ম্মদক্ষতা কি ভস্মে পর্য্যবসিত হ'য়েছিল। কর্ত্তারা হয়ত উত্তর করবেন যে, জাপান বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে রক্ষার্থে নিয়োজিত নৌবহর ধ্বংস করায় সিঙ্গাপুর প্রভৃতির রক্ষা অসম্ভব হ'য়েছিল। জাপানের যুদ্ধ-পরিকল্পনা ত অবিদিত ছিল না, তবে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রস্তুত হওনি কেন?

যুদ্ধ-সমাধানের জন্য এখন বোধ হয়, সকলেই উদ্‌গ্রীব, কিন্তু ভেঙ্গে পড়বার সম্ভাবনা থাক্‌লেও কেউ সহজে মচকাতে চায় না। অধিকন্তু, কর্ত্তাদের অবস্থা 'সাপের ছুঁচো গেলা'র মত হ'য়েছে, কারণ, খাদ্যসমস্যার সমাধান না হ'লে যুদ্ধসমাধানে স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হ'বে না—এটুকু তাঁরা বুঝ্‌তে পেরেছেন।

এই মহাসমরের জন্য দায়ী কে? সকলেই একবাক্যে বলবেন,—হিট্‌লার। জাপানকে স্বীয় মতাবলম্বী ক'রে প্রাচ্যেও তিনি যুদ্ধ বিস্তারিত করেছেন। স্বদেশের খাদ্যসমস্যা-সমাধানের উদ্দেশ্যে যদি তিনি এরূপ উৎকট পন্থা অবলম্বন ক'রে থাকেন, যদিও সে-উদ্দেশ্যকে মন্দ বলা যায় না, তথাপি বল্‌তে হ'বে যে, প্রথমতঃ, তিনি অনুদার, স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণদৃষ্টি; সমস্ত জগতের খাদ্যসমস্যার সমাধানকে দৃষ্টিপথে রাখা উচিত ছিল; দ্বিতীয়তঃ, সে-সমাধানকল্পে তিনি যে-উপায় অবলম্বন করেছেন তা' নৃশংস এবং সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়—দানবের উপযুক্ত। এই বিরাট যুদ্ধের জন্য যে-পরিমাণে ধনক্ষয় ও লোকক্ষয় হ'য়ে আসছে, যথাযথ-রূপে নিয়োজিত হ'লে তা'দের সহায়তায় প্রচুর খাদ্যের উৎপাদন এবং খাদ্যসমস্যার সমাধান সম্ভব হ'ত। হিট্‌লারসূচিত মহা-সমর কেবল স্বদেশের খাদ্যসমস্যা-সমাধানমূলক নয়, পরন্তু, ঈর্ষ্যা-মূলক, দূরাকাঙ্ক্ষামূলক।

দানবদলনি! কয়েক বৎসর বিজয়ার দিনে তোমার চরণে কাতর প্রার্থনা করছি যে, এই দানবকে শাসন কর, কিন্তু তুমি কর্ণপাত করছ না কেন মা? জানি, ইচ্ছাময়ি, তোমার ইচ্ছা না হ'লে, সময় উপযুক্ত বিবেচিত না হ'লে তুমি কোন কার্য্য কর না, কিন্তু, মা, অনাহারে মৃত্যুমুখী মানুষের আর্ত্ত, ক্ষীণ প্রার্থনা, পতিহারা, সন্তানহারা নারীর করুণ রোদন, অসহায় রোগীর কাতর অনুযোগ যে আমাদের সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করেছে। আমাদের শক্তির, আমাদের বৃত্তির, আমাদের অনুভূতির সীমা আছে যে মা! পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করতে ভিক্ষুকের লজ্জা হয় না। মায়ের কাছে সন্তান, প্রয়োজন হ'লে, পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা ক'রে থাকে। তাই, যখন সমগ্র পৃথিবী এই দানবের নৃশংস কর্ম্মনীতির ফলে ত্রস্ত ও প্রপীড়িত, তখন আবার প্রার্থনা করি—

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বম্
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।

তুমি যে নিখিল বিশ্বের জননী। তোমা ভিন্ন কে বিশ্ব রক্ষা করবে, কে বিশ্বের দুঃখ মোচন করবে? নির্য্যাতিত সন্তান যে, মা বলেই কাঁদে। বৎসরান্তে যখন তোমার পুনরাগমন হবে, তখন যেন এ-সকল করুণ দৃশ্য আর দেখ্‌তে না হয় মা।

তোমার পাগল ছেলে "ধান ভানতে শিবের গীত" অনেক গেয়ে গেল মা! কিন্তু, পাঠক-পাঠিকাগণ ক্ষমা করুন আর নাই করুন, তুমি তা'কে ক্ষমা করবে নিশ্চয়। পায়ে রাখ মা! আনন্দময়ি, বিশ্বের আনন্দবিধান কর মা!

ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের লুব্ধ আশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশকে ইঙ্গ-মার্কিণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি পরিকল্পিত ও পরিচালিত আন্তর্জাতিক শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্পর্কীয় চুক্তি করার ও স্বীকৃতি-সম্মতির সন্ধি-বন্ধনীর বজ্রবন্ধনে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিবার বিপুল আয়োজন চলিতেছে। ভারতসম্রাটের প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল সাহেব ভারতকে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে "পূর্ণ পরিতোষের" (Full satisfaction within the Empire) প্রলোভন দেখাইয়াছেন। সম্প্রতি ভারতসচিব আমেরী সাহেব বিলাতে রপ্তানী-আলোচনা সভার (Institute of Export) এক অধিবেশনে ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির ধারার ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই অধিবেশনে কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত সংবাদপত্র 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্যার এলফ্রেড্‌ ওয়াটসন্‌ সাহেব "যুদ্ধান্তে ভারতের সহিত বাণিজ্য" শীর্ষক একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। দূরদর্শী প্রত্যক্ষ দৃষ্টি দ্বারা স্যার এলফ্রেড্‌ ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষে ও চীনে বিপুল পরিমাণে বিক্রয়-ক্ষেত্র হইবে,—যদি উভয় দেশের জীবনযাত্রার ধারাকে উন্নত করা যায়। এই 'যদি' অবশ্য একটি বিষম 'যদি'।

স্যার এলফ্রেড্‌ উদার হৃদয়ে উপদেশ দিয়াছেন যে, ভারতে প্রবাসী বৃটনকে ভারতবাসীকে তাহার সমকক্ষ (equal) এবং নিজেকে অভ্যাগত (guest) মনে করিতে হইবে। তিনি তারস্বরে বলিয়াছেন যে, তাঁহার স্বজাতীয়েরা যুদ্ধোত্তর ভারতে এমন কোন বিশেষ অধিকার আকাঙ্ক্ষা করিবেন না,—যাহা অন্যে উপভোগ করে না। সুসমাচার সন্দেহ নাই। ভারতের কর্ণধার ঝুনা সাম্রাজ্যবাদী আমেরী সাহেবও বক্ষ বিস্তৃত করিয়া উদাত্ত-স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার দেশবাসীকে এখন হইতেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে যে, যুদ্ধ-পূর্ব্বে বৃটেনের বহির্বাণিজ্য, যে সকল প্রধান প্রধান পণ্যের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল, যুদ্ধান্তে প্রায় সমস্ত জাতিই সেই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবে; সুতরাং তাঁহাদিগকে নূতন নূতন ধরণের দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে এবং উৎপাদন-কুশলতায় তাঁহারা যে বৈশিষ্ট্য ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তৎপ্রতি অধিকতর মনঃসংযোগ করিতে হইবে; ব্যয়সাধ্য মুখ্য কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত (Installation of capital plant) করিতে হইবে; এবং অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বিক্রয়-কৌশল (salesmanship), বিশ্বাসযোগ্য সততা (Reliability) এবং মাল প্রদানের ক্ষিপ্রকারিতার (promptness of delivery) উপর নির্ভর করিতে হইবে। বস্তুতঃ, পরস্পর সাহায্যকারী পরিচর্য্যা (Co-operative service) দ্বারা প্রত্যেক দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যোগাইতে হইবে।

আমেরী সাহেবের মতে ভারতের সম্পর্কে এই নীতি বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, একটি বিশাল শিল্পাত্মক দেশে রূপান্তরিত হইবার উপযোগী কাঁচামাল, তড়িৎশক্তি এবং শ্রমকুশলতা প্রচুর পরিমাণে ভারতে প্রসুপ্ত (Latant) রহিয়াছে। আর্থিক উন্নতির দ্বারা জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারণ প্রত্যেক দেশভক্ত ভারতবাসীর একান্ত কাম্য। ইহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের ফলে ভারতের আমদানী বাণিজ্যে প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিবে। বৃটিশ বহির্বাণিজ্যের পক্ষে এই পরিবর্ত্তন প্রতিকূল হইলেও, পরিতাপের বিষয় নহে। পরন্তু, অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অগ্রেই এই পরিবর্ত্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, সুযোগ-সুবিধার সম্যক্‌ সদ্ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে।

যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সহৃদয় সহযোগিতা করিবার প্রথম ও প্রধান সূত্র হইবে ভারতের শিল্প-সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টাসম্ভূত মূল ও স্থূল কলকারখানার যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ। তৎপরে, ভারতের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, বিবিধ বিশিষ্ট ভোগ্য ও ভোজ্যদ্রব্যের (Consumers' goods) সরবরাহ। এই কারবারে, ভারতকে বৃটেন যে পরিমাণ সহৃদয়তার সহিত শিল্পোন্নয়নের সাহায্য করিবে, ভারতের সহিত বাণিজ্যেও তাহার তদনুরূপ সাফল্যলাভ ঘটিবে! যেরূপেই হউক, ভারত যে বৃটেনের মূলধন ও পণ্যের সুরক্ষিত বিক্রয়-ক্ষেত্র, এ-ধারণা সমূলে বর্জ্জন করিতে হইবে। এবিষয়ে বৃটিশ প্রভুত্বের নিদর্শন মাত্র থাকিবে না,—না প্রচ্ছন্ন, না প্রকাশ্য। এ যেন ভূতের মুখে রামনাম! এ দরদের এ-সহৃদয় সহযোগিতার আশ্বাসবাণীর নিগূঢ় কারণ কি?—উদ্দেশ্যই বা কি?—তাহাই আমাদিগকে অনুধাবন করিতে হইবে।

আমেরিকার সহিত ইংল্যাণ্ডের এখন অত্যন্ত সম্প্রীতি। এই প্রণয় জ্ঞাতিত্ব অপেক্ষা যুদ্ধের প্রয়োজন এখন অত্যধিক। মার্কিণের ইজারা-ঋণ সাহায্য ব্যতীত বৃটেনের যুদ্ধোদ্যম বর্ত্তমানের পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারিত না। এই সূত্রে যুদ্ধোত্তর ব্যবসা-বাণিজ্যের পরস্পর-সাপেক্ষ পরিচালনা হেতু, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি সম্মতি-পত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই উভয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ভারত ইজারা-ঋণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতবাসীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মার্কিণের সহিত ভারতের একটি সরাসরি চুক্তি অপরিহার্য্য হইয়াছে। মার্কিণ ভারতে কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে, ইজারা-ঋণ-আফিস খুলিয়া বসিয়াছেন। ভারতের সহিত ভারতের কল্যাণার্থ নিস্বার্থভাবে শিল্প-বাণিজ্যে সহযোগিতা করাই মার্কিণের এখন প্রকাশ্য নীতি। আটলাণ্টিক সনন্দের সহিত ইহার কোন মুখ্য অথবা গৌণ সংযোগ আছে কি না, তাহা এখন প্রচ্ছন্ন। স্বার্থ-সংশ্রবে হউক, অথবা নিস্বার্থ পরহিতৈষণা হেতু হউক, আজ যেখানে যুক্তরাজ্যের একাধিপত্য, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব-বিস্তারের ফলে, অন্ততঃ আংশিক ভাবেও যে বৃটেনের, আধিপত্য না হউক, প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব্ব হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাস্তি।

যুদ্ধোত্তর শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার-প্রতিপত্তি নির্ভর করিতেছে, যুদ্ধ-পরিস্থিতি, যুদ্ধের কিরূপ অবসান ঘটিবে তাহার এবং যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য প্রভৃতি শক্তিশালী দেশসমূহের আর্থিক, অর্থ-নৈতিক

এবং শুল্কসংক্রান্ত নিয়ম-নীতির উপর। এই নিমিত্ত এখন হইতেই, প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে, কয়েকটি আন্তর্জ্জাতিক সমবায় সংগঠনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই সম্পর্কে, সর্ব্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাপ্রকরণের সমন্বয় প্রচেষ্টা। সম্প্রতি বিলাতে প্রখ্যাতনামা অর্থ-নীতিবিদ্ লর্ড কীনেস্ যুক্তরাজ্যের তরফ হইতে একটি আন্তর্জ্জাতিক নিকাশ-নিষ্পত্তি-সম্মিলন (International Clearing Union) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান কার্য্য করিবে একটি আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাপ্রকরণের শীর্ষ একক "ব্যাঙ্কর" (Bancor) দ্বারা। বৃটিশ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তার এবং তৎসাহায্যে সহযোগী দেশসমূহে জনসাধারণের জীবনযাত্রার ধারার সমুন্নতি সাধন। মার্কিণেও ইহার অনুরূপ পরিকল্পনা পরিপুষ্ট করিয়াছেন,—রাষ্ট্র কোষাগারের কর্ম্মসচিব মিঃ মর্গেনথো। এই পরিকল্পনায় আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাপ্রকরণের শীর্ষ একক "ইউনিটাস্" এবং কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠানের নাম, আন্তর্জ্জাতিক স্থৈর্য্যসম্পাদক ভাণ্ডার (International Stabilisation Fund) ; ইহার উদ্দেশ্য, ভাণ্ডারের সভ্যশ্রেণীভুক্ত দেশসমূহের মুদ্রাপ্রকরণের স্থৈর্য্য-সম্পাদন এবং ইহা সাধিত হইবে ভাণ্ডার কর্ত্তৃক একটি নির্দ্ধারিত হারে সভ্য-তালিকাভুক্ত দেশসমূহের মুদ্রাপ্রকরণের ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা। ভাণ্ডারের সম্মতি ব্যতীত কোন মুদ্রাপ্রকরণের হারের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারিবে না। কদাচিৎ কোন চরম পরিস্থিতি হেতু প্রচলিত বিনিময়-শাসনের (Existing exchange control) পরিহার ঘটিতে পারিবে কিন্তু ভাণ্ডারের সম্মতি ব্যতীত নূতন শাসনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। উভয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য একই,—অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাপ্রকরণের সমন্বয় সাধনপূর্ব্বক বিনিময়-হারের স্থৈর্য্য সম্পাদন। আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাপ্রকরণের বিনিময়-হার স্থিতিশীল হইলে, ব্যবসা-বাণিজ্য দৃঢ় হয়। কিন্তু প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের সংযোগে দুর্ব্বলেরই হানি ঘটে, সুতরাং এই সমন্বয় সম্পাদিত হইলে, পরাধীন ভারতের যে বিশেষ সুবিধা হইবে না, তাহা নিশ্চিত। কেন, তাহা বলিতেছি।

এই সমন্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে লর্ড কীনেস্ একটি আন্তর্জ্জাতিক পণ্য-ভাণ্ডার (International Commodity Pool) প্রতিষ্ঠার কল্পনা পরিপুষ্ট করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, আন্তর্জ্জাতিক কর্তৃত্বাধীনে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী এবং কাঁচামালের একটি সমষ্টিগত মজুত সংস্থান প্রথা (A system of reserve Pools) প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন মার্কিনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ হারবার্ট ফিস্। এই আন্তর্জ্জাতিক প্রভুত্বের (International Authority)অধিকার হইবে উদ্বৃত্ত-বণ্টন, অবশ্য প্রয়োজনানুযায়ী; প্রতিপক্ষের মূল্য প্রদানের সামর্থ্যানুযায়ী নহে। প্রধানতঃ কাঁচামাল সরবরাহকারী ভারতের পক্ষে এই প্রস্তাব সঙ্কট-সঙ্কুল। মার্কিণের জাতীয়-সম্পদ্-পরিকল্পনামণ্ডলী (National Resources Planning Board) এবং অর্থনৈতিককুশল সম্পাদকমণ্ডলী (Board of Economic Welfare) কিছুদিন হইতে একটি আন্তর্জ্জাতিক উন্নতিবিধায়িনী সমিতি (International Development Corporation) এবং আরও কয়েকটি আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নতিবিধায়িনী পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার প্রচেষ্টায় নিমগ্ন আছেন। এই সকল পরিকল্পনার বিচার-বিবেচনার নিমিত্ত অচিরে ওয়াশিংটন নগরে একটি আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক বসিবে। সম্প্রতি মার্কিণের ভার্জ্জিনিয়া নামক স্থানে জগতের খাদ্য সঙ্গতি (Food Supplies) সম্পর্কে একটি বৈঠক বসিয়াছিল। যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধাবসানের প্রথম বৎসরে বয়নশিল্পোৎপন্ন দ্রব্যাদির (Textile Supplies) বণ্টন সম্পর্কে আর একটি আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকও অনতিবিলম্বে ওয়াশিংটন নগরে মিলিত হইবে।

ভারতীয় বণিকসম্প্রদায়কে এই সকল আন্তর্জ্জাতিক প্রচেষ্টার গূঢ় উদ্দেশ্য, বিশেষ যত্নপূর্ব্বক, অনুধাবন করিতে হইবে। কোন আন্তর্জ্জাতিক কল্পনা কিংবা বন্দোবস্তে ভারতবাসীর বিরাগ নাই, যদি উহা তাহার অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। ভারতের অবস্থা ও ব্যবস্থা, শিল্পে-সমুন্নত পাশ্চাত্য দেশসমূহের অবস্থা ও ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতের জনসাধারণ দারিদ্র্যে ও অজ্ঞতায় সমাচ্ছন্ন। ভারতের শিল্প-প্রচেষ্টা এখনও শৈশব অতিক্রম করে নাই। অর্থনৈতিক আন্তর্জ্জাতীয়তা, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় শিল্পে-সমুন্নত দেশের পক্ষে হিতকর ; এবং ইহা এরূপ স্বার্থ-সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল, যাহা ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশের পক্ষে আদৌ উপযোগী নহে। ভারতে এখনও আমলাতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী প্রবল। "ভারতীয় প্রতিনিধি" নামে যে সকল মহোদয় এই সকল আন্তর্জ্জাতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, তাঁহারা ভারতের জাতীয় প্রতিনিধি নহেন ; সুতরাং স্বাধীনভাবে ভারতের স্বার্থের অনুকূল মতামত প্রকাশ করিতে অসমর্থ। সরকারের নিকট হইতে তাঁহারা যেরূপ উপদেশ লাভ করেন, তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র করেন। তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়। ভারতের জনমত এবং বিশেষতঃ বণিক্ সম্প্রদায়ের মতামত গ্রহণ না করিয়া, এই সকল আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ সমীচীন হইবে না। আমলাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ভারতীয় স্বাধীন জনমতের অপেক্ষা রাখেন না। সুতরাং ভারতবাসীকে এই সকল আন্তর্জ্জাতিক সলাপরামর্শ সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। আমাদের জাতীয় অর্থ ও স্বার্থের প্রতি এই সকল আন্তর্জ্জাতিক বিধি-নিষেধের প্রবর্ত্তকদের দৃষ্টি "ধাত্রীমাতা" পূতনার দৃষ্টির ন্যায়! নামে আন্তর্জ্জাতিক হইলেও, কার্য্যতঃ এই সকল বৈঠক ইঙ্গ-মার্কিণ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইবে।

যুদ্ধের তাগিদে ইঙ্গ-মার্কিণ স্বার্থ এখন বহুলাংশে সমভাবাপন্ন বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু, এই উভয় স্বার্থ সমধর্ম্মী নহে। বাণিজ্যক্ষেত্রে, বিশেষতঃ প্রাচ্যের বিক্রয়ক্ষেত্রে, উভয় স্বার্থই সমভাবে স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে উদগ্রীব। অন্যান্য সাপেক্ষ (Reciprocal) বাণিজ্য-অঙ্গীকার-নীতি যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক মূলমন্ত্র। গত এপ্রিল মাসে রাষ্ট্র-সচিব কর্ডেলহাল্ আমেরিকান কংগ্রেসকে জানাইয়াছিলেন যে, এইরূপ ত্রিশটি চুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং আরও তিনটি দেশের সহিত ঐ

সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে। অন্যান্য সাপেক্ষ বাণিজ্য-চুক্তি আইনের (Reciprocal Trade Act) প্রসার সংকল্পে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধোত্তর জগদ্ব্যাপী-অর্থনৈতিক-পুনর্গঠনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার নিমিত্ত, যুক্তরাষ্ট্রকে এখন হইতেই জমি প্রস্তুত করিতে হইবে। গত মে মাসে, তিনি বলিয়াছিলেন যে, সম্মিলিত জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ব্যতীত যুদ্ধে বিরতি স্থায়ী শান্তিতে পর্য্যবসিত হইবে না। তাঁহার সহকারী মিঃ সাম্নার ওয়েলেস্ও অর্থনৈতিক আক্রমণের (Economic Aggression) নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, "আমাদের দেশ ও কংগ্রেসের সম্মুখে প্রশ্ন এই যে, আমরা কোন্ নীতি অবলম্বন করিব? ১৯২২ এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের অর্থনৈতিক আক্রমণ-নীতি, অথবা ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের অর্থনৈতিক সহযোগ (Corporation) নীতি?" তিনি বলিয়াছিলেন "আমরা, বৃটেন এবং প্রায় অন্যান্য প্রত্যেকটি দেশ অকুণ্ঠিত স্বার্থপরতা-কলুষিত অর্থনৈতিক আক্রমণ-দোষে দুষ্ট হইয়াছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রশ্রয়মূলক শুল্ক-প্রশমন-(Preferences) ইতিহাস, অর্থনৈতিক আক্রমণের ইতিহাস।"

মার্কিণের এই বদান্যতার উদ্দেশ্য কি? আত্মস্বার্থ-সংরক্ষণ, অথবা নিছক পরার্থ-পরতা? সম্প্রতি মার্কিণ-পরিচালিত বিশিষ্ট পত্রিকা "ফার ইষ্টার্ণ সার্ভে" একটি প্রবন্ধে ভারতের সহিত মার্কিণের যুদ্ধোত্তর বাণিজ্যসম্ভাবনার আলোচনা করিয়াছেন। এই পত্রিকা বলিতেছেন, "যুদ্ধের পূর্ব্বে মার্কিণ রপ্তানী ব্যবসায়ীরা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ বৃটিশ-প্রতিষ্ঠান-পরিবেষ্টিত ভারতীয় ব্যবসা কেন্দ্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, এবং ভারতীয় বিক্রয়-ক্ষেত্রে স্বল্পমাত্র কারবারে তুষ্ট ছিল। এখন অবশ্য যুদ্ধকালীন চুক্তিগুলি যুদ্ধের পরেও সংরক্ষিত ও বিস্তৃত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। ইতিমধ্যে উভয় দেশের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কারবারীরা ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্যসম্পর্কের সুযোগ-সুবিধার আলোচনা করিতেছেন। বর্ত্তমানের পরিণত যুদ্ধোপকরণ-কারবার হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইবে না। ভবিষ্যৎ সুযোগ-সুবিধার উদ্ভব হইবে, ভারতে বিলম্বিত শিল্প-সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টার অনুকূল কলকারখানায় ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি ও শিল্পসংক্রান্ত কাঁচামালের প্রবর্ত্তন হইতে। ভারতে মার্কিণ মালের যুদ্ধকালীন আমদানী বিশেষতঃ মূল ও স্থূল দ্রব্যসামগ্রীর (Capital goods) প্রচলন, শান্তিকালে মার্কিণ ব্যবসায়ের প্রধান প্রবর্ত্তনের কার্য্য করিবে। কলকারখানার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির অভাব-পূরণ ও বিস্তারসাধন হেতু, মার্কিণ সাজসরঞ্জামের জোগানও ঐ কার্য্যে প্রচুর সাহায্য করিবে। "মার্কিণ যন্ত্রপাতি" এখন ভারতের প্রধান অবলম্বন। ইতিমধ্যে মার্কিণের সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রেরিত মার্কিণের রপ্তানী পণ্যের একুন মূল্য হইয়াছিল—৩৭৮ মিলিয়ন (নিযুত) ডলার; অর্থাৎ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায় নয়গুণ অধিক! এই পণ্যের অধিকাংশই অবশ্য ইজারা-ঋণের অন্তর্ভুক্ত; তথাপি, বাণিজ্য-পণ্যের পরিমাণ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায় দ্বিগুণ হইয়াছিল। বৃটিশ ব্যবসায়ীদের ইহা অবিদিত নহে যে, যুদ্ধান্তে ব্যবসায়ের বিপুল বিস্তার সাধন ব্যতীত বৃটেনের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের উন্নতধারা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না; এবং বৃটেনের ন্যায় মার্কিণও যুদ্ধান্তে তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যকে যথাসাধ্য বিস্তৃত করিতে কৃতসঙ্কল্প। বৃটেনের প্রশ্রয়মূলক শুল্ক-প্রশমন-নীতির প্রতি মার্কিণের সহকারী রাষ্ট্রসচিবের তীব্র কটাক্ষ হইতে ইহা অনুমান করা কঠিন নহে যে, যুদ্ধান্তে মার্কিণ অটোয়া নীতির পরিবর্জ্জন কামনা করিবে। ইহা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, যুদ্ধান্তে ভারতের বিক্রয়-ক্ষেত্র লইয়া বৃটেন ও মার্কিণের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটিবে। চল্লিশকোটি অধিবাসী সমন্বিত বিশাল ভারতের বিক্রয়-ক্ষেত্র প্রথমে বৃটিশ, পরে বৃটিশ ও জার্ম্মানী এবং গত যুদ্ধের সূচনা হইতে বৃটিশ ও জার্ম্মানী-ব্যবসায়ীগণের মধ্যে আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে—ইজারা-ঋণ বিধানের প্রভাবে, ভারতের বিক্রয়-ক্ষেত্রে মার্কিণের প্রসার-প্রতিপত্তি সম্প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান। এই বৃদ্ধির পরিণতি একাধিপত্যে পর্য্যবসিত না হয়, তৎপ্রতি বৃটেনের শ্যেন দৃষ্টি স্বাভাবিক। জুলুম-জবরদস্তি দ্বারা বাণিজ্য পরিচালন এখন অসম্ভব; সুতরাং মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ভারতের ক্রয়শক্তিকে আয়ত্ত করা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। বৃটেন ও মার্কিণ উভয়েই এখন সেই সুনীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বৃটেনের প্রতি ভারতের অনুরাগে যে ভাটা পড়িয়াছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। মার্কিণ ইহার গূঢ় কারণ অনুধাবন করিয়াছেন; এবং সেই জন্যই "ফার ইষ্টার্ণ-সার্ভে" কাগজ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের শেষে টিপ্পনী করিয়াছেন,—"ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্প-সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টার গতি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরিসরের উপর নির্ভরশীল।" একটি বৃটিশ সংবাদপত্র ইহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, "সম্পর্কের শেষ নহে, সংশোধনই ইহার যথার্থ প্রতিকার।"

মার্কিণের ইজারা-ঋণ-অধ্যক্ষ মিঃ এড্ওয়ার্ড ষ্টেটিনাস্ সেদিন ঘোষণা করিয়াছেন যে, এসিয়ার রণক্ষেত্রে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের অস্ত্রাগার ও উপকরণ-ভাণ্ডার। এই নিমিত্ত মার্কিণ এখন ভারতে প্রচুর পরিমাণে রাস্তা নির্ম্মাণের সাজ-সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, কলকারখানায় ব্যবহারোপযোগী ক্ষুদ্র-বৃহৎ যন্ত্রপাতি, ইস্পাৎ এবং অন্যান্য বহুবিধ কাঁচামাল সরবরাহ করিতেছেন। যদিও রণপরিচালন-নীতি অনুযায়ী ভারতের অবস্থিতি এবং তাহার বিপুল উপকরণ-সম্ভার ভারতকে প্রাচ্য রণাঙ্গনের অস্ত্রাগারে ও উপকরণ-ভাণ্ডারের উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তথাপি প্রাচ্য গুচ্ছবৈঠক (Eastern Group Conference) এবং মার্কিণের বিশেষজ্ঞ দূতমণ্ডলীর (American Technical Mission) ভারতপরিভ্রমণের ফলে, ভারতকে আত্মপ্রাচুর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত কোন ব্যাপক অথবা বিস্তৃত নিয়ম-পরিকল্পনা অবলম্বিত হয় নাই। যুদ্ধের অতি-সংশয়াকুল অবস্থায় শেষোক্ত দূতমণ্ডলী ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন; এবং সেই জন্য ভারতবাসীর মনে দৃঢ় আশা জন্মিয়াছিল যে, ভারতের শিল্পসমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্য্য দ্রুতগতি লাভ করিবে। কিন্তু দূতগণ ভারতের যুদ্ধসংক্রান্ত উৎপাদন সম্পর্কে একটি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেন এবং বিমান ও জাহাজ

প্রস্তুতির পরিবর্ত্তে যেরূপমত কার্য্যের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য প্রদান করেন। এই দূতমণ্ডলী কি সুপারিশ করিয়াছেন এবং সরকার তাহার কতটুকু গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতবাসী তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত। পরন্তু, সম্প্রতি আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যুক্তরাষ্ট্র গ্রেডী মিশনের (Grady Mission) প্রস্তাবগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে বিমুখ হইয়াছেন, কারণ ঐ সকল প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, যে-সকল উপায় ও উপাদান অবলম্বন করিতে হয়, অর্থই আশু তাহার বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং গ্রেডী মিশনের অনুমোদনানুযায়ী কলকব্জা, যন্ত্রপাতি এবং সুযোগ-সুবিধা এখন আমরা পাইতে পারিব না। একটি অত্যন্ত আশাপ্রদ বিশেষজ্ঞকৃত অনুসন্ধানের ইহা একটি অত্যন্ত নৈরাশ্যপ্রদ পরিণাম! এই বিফলতা হইতে আমরা এই শিক্ষালাভ করি যে, কোন বহিঃশক্তির প্রতি নির্ভরতা নিরর্থক। স্বাবলম্বন ও আত্ম-নির্ভরশীলতা ব্যতীত আমাদের উন্নতির দ্বিতীয় উপায় নাই।

ইজারা ঋণ সম্পর্কে মার্কিণের সহিত আমাদের একটি স্বতন্ত্র চুক্তি সংগঠনের প্রস্তাব চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে ষ্টার্লিং-সংস্থিতির ন্যায় আমাদের একটি ডলার-সংস্থিতির প্রয়োজন। আমাদের বর্ত্তমান প্রভূত ষ্টার্লিং-সংস্থিতির কিয়দংশ ডলার-সংস্থিতিতে পরিণত করিবার প্রস্তাব আমরা বহুবার কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিয়াছি, কিন্তু এটা ভুলিবার নয়। পক্ষান্তরে বিনিময়-শাসন এবং ভারতে স্বর্ণের আমদানী প্রতিরোধের ফলে, বৃটেন কিংবা মার্কিণের সহিত বাণিজ্য জমাখরচের আমাদের প্রাপ্য উদ্বৃত্ত জমার (Favourable trade balances) ওয়াশীল আমরা পাইতেছি মাত্র ষ্টার্লিং-এ। অধিকন্তু, ভারতের জাতীয় অধিবাসী কর্ত্তৃক অর্জ্জিত ডলার (Dollar credits) বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক তাহার নিজের ব্যবহার ও উপকারের নিমিত্ত অধিকৃত হইয়াছে; এবং বাণিজ্য জমাখরচের প্রাপ্য উদ্বৃত্ত জমা ভারতে ডলারে প্রাপ্তব্য নহে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে যখন এই ডলার তলপ হুকুম (Dollar Requisition order) ভারতসংরক্ষণ বিধি-নিষেধ (Defence of India Rules) অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত হয়, তখন যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আদান-প্রদান রোকশোধ নীতি (Cash and carry) অনুযায়ী চলিতেছিল এবং যুক্তরাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্রীত দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য স্বর্ণ অথবা ডলারে মূল্য দিতে হইত। তৎপরে ইজারা-ঋণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, এবং তাহার ফলে, মার্কিণ হইতে ক্রীত দ্রব্যাদির নিমিত্ত ডলার সংস্থানের প্রয়োজন ছিল না এবং এখনও নাই। সুতরাং ভারতবাসীকে তাহার অর্জ্জিত প্রাপ্য ডলারের অধিকার হইতে বিচ্যুত করার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু এখন বিদ্যমান নাই। ডলার প্রাপ্যের অধিকারী ভারতবাসীকে এখন নির্ব্বিঘ্নে তাহার প্রাপ্যের অধিকার ও সদ্ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ভারতবাসী এই ডলারের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কলকব্জা যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে সমুৎসুক।

এই নিষেধাত্মক বিধানের ফলে, ভারতবাসী স্বর্ণ কিংবা ডলার বিনিময়ে (Gold or Dollar Exchange) সঞ্চয় করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এ-বিষয়ে ভারতের স্বাধীনতা থাকিলে, ভারত তাহার শিল্পবাণিজ্য-সমুন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অনুকূল ব্যবস্থা করিতে পারিত। অন্যান্য দেশ, এমন কি বৃটিশ ডমিনিয়নগুলিও এ-বিষয়ে ভাগ্যবান, কারণ তাহারা যুক্তরাজ্যে প্রেরিত দ্রব্যাদির নিমিত্ত তাহাদের প্রাপ্য তাহাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল উপায়ে ওয়াশীল লইয়াছে। ১৯৩৬ হইতে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারত ৩৮৩ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণসম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে; সুতরাং এখন তাহাকে তাহার প্রাপ্য আদায় করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। বৃটিশ ডমিনিয়নগুলির ন্যায় ভারত তাহার কলকারখানার নিমিত্ত কল-কব্জার যন্ত্রপাতি ও সমস্ত সরঞ্জাম ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়াছে। বাধা-বিঘ্নের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সে সুযোগ লাভ করিলে ভারতবর্ষও ডমিনিয়নগুলির ন্যায় তাহার গুরুত্ব সংরক্ষণ-শিল্পের প্রচুর উন্নতি সাধন করিতে পারিত। এই উদ্দেশ্যে আমাদের ষ্টার্লিংসংস্থিতির যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে আশু দৃঢ়নিশ্চয়তা প্রয়োজন। ভারতের আর্থিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ-কল্পে নিযুক্ত না হইয়া যদি এই প্রচুর সম্পদ্ বিলাতী চাকুরিয়াদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি ও ভাতা প্রভৃতির নিমিত্ত নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ভারতের পরিতাপের সীমা থাকিবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কানাডার ন্যায় ডমিনিয়নগুলি—যাহাদের ইংলণ্ডের সহিত জাতীয় সংশ্রব আছে, তাহারাও তাহাদের অনুরূপ সংস্থিতিকে যুদ্ধান্ত পর্য্যন্ত অব্যবহৃত রাখে নাই। পরন্তু, উপস্থিত প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহারে লাগাইতেছে এবং তাহাও সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্বার্থানুযায়ী। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথমতঃ তদ্দেশস্থ বৃটিশ ধনসম্পদ্ (Investments) আয়ত্ত করে। এই ধনসম্পদ্ স্বর্ণখনি-সংশ্লিষ্ট। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের নিকট বিক্রীত স্বর্ণও তাহারা পুনরায় ক্রয় করিয়া লয় এবং তাহার পরে তাহারা ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধে প্রবৃত্ত হয়। ক্যানাডাও বৃটিশ সরকারের সহিত এইরূপ আর্থিক বন্দোবস্ত করিয়াছে যে, ক্যানাডা হইতে ক্রীত দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যের শতকরা চল্লিশ অংশ স্বর্ণে দিতে হইবে এবং আর চল্লিশ অংশ ক্যানাডায় অর্জ্জিত বৃটিশ সম্পদ-সম্পত্তির হস্তান্তরণ দ্বারা। পক্ষান্তরে, আর্জ্জেণ্টাইনাকে একটি স্বর্ণনিশ্চয়াত্মিকা ধারায় (Gold guarantee clause) মারফতে ষ্টার্লিংএর ঘাটতি-পড়তার দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার এরূপ কোন দায়িত্ব স্বীকার করেন নাই। তাহার ষ্টার্লিং-সংস্থিতির মূল্য সম্পর্কে ভারত এখনও বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে কোন বিনিশ্চয়তা (Guarantee or Assurance) প্রাপ্ত হয় নাই, কিংবা স্বর্ণ অথবা ডলার বিনিময়, অথবা ভারতে অর্জ্জিত বৃটিশ বিনিয়োজিত অর্থ-সম্পদের সত্বাধিকার লাভ করিতে পারে নাই।

ভারতের অধিবাসিবৃন্দ বহুদিন হইতে তারস্বরে বলিতেছে যে, ভারতের অর্জ্জিত ষ্টার্লিং-সংস্থিতি এরূপ ভাবে বিনাসর্ত্তে আটক রাখিবার একমাত্র অছিলা এই যে, যুদ্ধান্তে বহুবিধ ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির প্রসারণার্থ ভারতের যে বহু কল-কব্জা ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হইবে, সে সমুদয় এই অর্থে ক্রয় করিবার সুবিধা হইবে। এই হিতৈষণার অর্থ এই যে, যুদ্ধান্তে ভারতকে বৃটেন হইতে এই সকল অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি উচ্চমূল্যে কিনিতে হইবে।

সুতরাং এই আটক ভারতের প্রতি মমত্বপ্রযুক্ত নহে, বৃটেনের যুদ্ধোত্তর বাণিজ্যের স্বার্থ সংরক্ষণার্থ। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন-ভাণ্ডার (Postwar Reconstruction Fund) প্রতিষ্ঠার মূলে এই গূঢ় অভিসন্ধি নিহিত।

ভারতের অর্থসচিব বাজেট-বিতর্ককালে বলিয়াছিলেন যে, ষ্টার্লিং অঞ্চল ও ডলার অঞ্চল, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ক্ষেত্র; এবং ইহাদের পরস্পরের সম্পর্ক যুদ্ধশেষে বিবেচ্য সমস্যা। অর্থাৎ ভারতবর্ষের যুদ্ধোত্তর ক্রয়কে যুক্তরাজ্যের পরিধির মধ্যে নিবদ্ধ রাখাই পুনর্গঠন ভাণ্ডারে মুখ্য উদ্দেশ্য। সুবিধাজনক হইলে যুক্তরাজ্যে এবং প্রয়োজন হইলে যুক্তরাজ্যের বহির্ভাগে, ভারতের যুদ্ধোত্তর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার অক্ষুণ্ণ-ক্ষমতা ভারতের অবশ্য প্রাপ্য। কেবলমাত্র ক্ষমতা নহে, প্রয়োজনীয় অর্থও ভারতবাসীর আয়ত্তে থাকা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। টাকা যাহার ন্যায্য প্রাপ্য, খরচের অধিকার তাহারই।

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত-সরকার চারিটি পুনর্গঠন সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এতাবৎকাল তাহারা যে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিয়াছে, আমরা তাহার কোন নিদর্শন পাই নাই। তাহাদের বিবেচনার্থ কোন সুসম্পূর্ণ পুনর্গঠন-পরিকল্পনার বার্ত্তাও আমরা পাই নাই। আমাদের বিশ্বাস, ভারতের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা গতবৎসর বৃটেন ও মার্কিণে যাইয়া যুদ্ধোত্তর সংগঠন ও পুনর্গঠন সম্পর্কে কি আলাপ-আলোচনা ও অভিজ্ঞতার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সমিতিগুলি এখনও গাঢ় তিমিরে। ইতিমধ্যে গত এপ্রিল মাসের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের অধিবেশনে সরকারী নায়ক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে শতাবধি পরিকল্পনাকারী গুচ্ছ (Planning Groups) যুদ্ধোত্তর ভারতের আর্থিক, অর্থনৈতিক ও শুল্কসংক্রান্ত সমস্যার স্বাধীনভাবে অনুশীলন ও আলোচনা করিতেছেন। সরকার তাহাদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেছেন। ইত্যবসরে ভারতের বাণিজ্যে মার্কিণ তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে, অদূর ভবিষ্যতে বৃটেনকে অতিক্রম করিতে পারে। বৃটেনের সমস্যা এইখানে। ভারতের ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগও এই প্রতিযোগিতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন।

মর্ম্ম ও কর্ম্ম (উপন্যাস

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

এগার

পরের দিন সকালবেলায় উঠে বিকাশ মাসিমার কাছে গিয়ে মাথা চুলকে বললে, "মাসিমা, ব'লছিলাম কি?"—কিন্তু বলা আর হ'ল না, সে শুধু মাথা চুলকাতেই লাগলো।

মাসিমা একটু হেসে ব'ললেন, "কী ব'লছিলি বল না—চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

আরও খানিকক্ষণ মাথা চুলকে দু'টো ঢোঁক গিলে সে বললে, "ব'লছিলাম কী—এই—মানে বিয়েটা যখন ক'রতেই হবে, তখন দেরী ক'রে আর কি হবে? পরশু দিন তো একটা লগ্ন আছে, সেই দিনেই"—

"তবে রে গোলামের পো, কাল রাত্তিরে হ'ল বিয়েটা অসম্ভব, আর এখন তর সইছে না! 'ক'রতেই হবে'—বেটা যেন ওষুধ গিলছেন! থাক না ওষুধ—নাই খেলি! আর কিছুদিন ভেবেই দেখ না।" মাসিমা একগাল হেসে বললেন।

হেসেই বিকাশ বললে, "তা নয় মাসিমা, ভাবছিলাম কি? বিয়ের ক'নের সঙ্গে এমনি এক সঙ্গে থাকবে'—নিন্দে হ'তে পারে, তাই গোলটা চুকিয়ে ফেলে—"

"থাম, থাম, আর নেকামী ক'রতে হবে না। বিয়ে অমনি পাকা ফলটি কি না? পাড়া যখন হ'য়ে গেছে গালে পুরলেই হ'ল। দু'দিনে বিয়ের জোগাড় হয় কখন? ওসব হবে না। তুই পারা এখন—টাকার জোগাড় করগে, আমি আর সব করবো।"

বিকাশ বললে, "টাকাটা আর বেশী কী লাগবে। একজন পুরুত ডেকে—"

"পাগলা ছেলে! বিয়ের বাড়ি—সে কি অমনি হয়? আত্মীয়-কুটুম্বদের আনতে হবে, তাদের ব্যবহার দিতে হবে, নেমন্তন্ন করতে হবে, কেউ যেন বাদ না পড়ে, খাওয়া দাওয়ার উজ্জুগ"—

বিকাশ আবার মাথা চুলকোতে লাগলো, এবার অন্যভাবে। মাসিমার কথার বহর দেখে সে আন্দাজ করলে যে, তিনি খরচের আঁচ করছেন, তাঁর মেয়ের বিয়ের আদর্শে। ছ'কা বারো হাজার খরচ করেছিলেন মেসোম'শায় সে বিয়েতে! অনেক ছাটকাট দিয়েও মাসিমার মনের মত উৎসব ক'রতে কমসে-কম সাত হাজার টাকা না হ'য়ে যায় না।

কোথায় পাবে সে সাত হাজার টাকা? এ যে বেয়াড়া আবদার মাসিমার! রাগই হল তার। কিন্তু সে মুখ ফুটে মাসিমাকে ব'লবে যে—সে হবে না, এত বড় বুকের পাটা তার নেই।

উভয় সঙ্কট!—কিন্তু উপায় নেই। তার সাহসের অভাবটাকে সে ঢাকলে একটা কর্ত্তব্যের ওজুহাত দিয়ে। দুঃখিনী মাসিমাকে মেসোম'শায়ের মৃত্যুর পরই—এই মনোভঙ্গের আঘাত দেওয়া তার অকর্ত্তব্য হবে। সে নীরবে সরে গেল।

সামনে পড়ল সীতা। সে বোধ হয় আড়ি পেতে কথা শুনছিল, কিন্তু এমন ভাবে পিছন ফিরে চললে সে, যেন ভিজে বেড়ালটি, কিছু জানে না।

তার নিটোল গোল নরম হাতখানা এমন লোভনীয় ভাবে পাশে দুলছিল যে, বিকাশ কিছুতেই আপনাকে সামলাতে পারলে না। সে পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে মারলে একটা চিমটি।

"উঃ! মেরে ফেললে গো!" ব'লে সেখানে হাত বুলোতে বুলোতে সীতা ফিরে দাঁড়াল। সহাস্য গর্জ্জন ক'রে সে চোখ পাকিয়ে বললে, "বুড়ো ধিঙ্গী হ'লে, এখনও শয়তানী গেল না।

ছিঃ! লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছ। এখন—এখন কি আর অমনি করতে আছে? লোকে বলবে কি?"

হেসে বিকাশ বললে, "কী আর ব'লবে? বলবে এরা তুটো বয়ে গেছে। তাতে ব'য়ে গেল আমাদের। 'তুম্ হম্ তো মজা লিয়া'!"

"তবে রে। মজাটা দেখাচ্ছি!" বলে হঠাৎ গীতা বিকাশকে একটা কীল মারলে। বিকাশ ফস করে ঘুরে পেশী ফুলিয়ে এমন ক'রে দাঁড়াল যে কীলটা প'ড়লো গিয়ে তার বাহুমূলের কঠিন পেশীপিণ্ডে।

বজ্রের মত কঠিন পেশীতে আঘাত ক'রে তার হাতে হাত বুলোতে বুলোতে গীতাই বলে উঠল, "উঃ, হাতটা গেল আমার! দেহ তো নয় যেন পাথর। গুণ্ডা একটা!"

বিকাশ ব'ল্লে, "যাক শোধবোধ। এখন কথার জবাব দে আমার"—

জিভ কেটে গীতা ব'ল্লে, "ও কি? ছিঃ! বউয়ের সঙ্গে বুঝি ভদ্রলোকে তুই-তোকারী করে!"

কপট অনুতাপের স্বরে বিকাশ ব'ল্লে, "ক্ষমা কর দেবি, ভুল হ'য়ে গেছে। এখন, হে দেবি, আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কৃতার্থ ক'রবে কি?"

গর্বিতভঙ্গীতে গ্রীবা বাঁকিয়ে চোখ টেনে গীতা ব'ল্লে, "কি প্রশ্ন প্রভু!"

"ও ঠিক হ'ল না। প্রভুটা modern নয়। ব'লতে হবে, প্রিয়তম—"

"যাও, কি যে বল?" বলে লজ্জায় লাল হ'য়ে গীতা তার পিঠে একটা চড় লাগালে।

"যাক, এখন প্রশ্নটা হ'চ্ছে এই। এখন আমার হবু বউটিকে তোর পছন্দ হ'য়েছে কি?"

গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে গীতা ব'ল্লে, "মোটেই না।"

কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বিকাশ ব'ল্লে, "তবেই তো মুস্কিল, তোর পছন্দ না হ'লে আমি বিয়ে করি কি ক'রে? তবে এ বিয়েটা ভেঙ্গেই দি—কি বলিস্?"

গীতা খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে ব'ল্লে, "আমার সন্দেহ হয় তা পারবে না—কমলি নেই ছোড়েগা।"

"না ছাড়াই সম্ভব, কেন না তা' হ'লে, হয় গয়নাগুলো বেহাত হ'য়ে যাবে, না হয় কথার খেলাপ হবে। —তবে কী আর করা যাবে, ক'রবোই বিয়ে।" ব'লে একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফে'ললে বিকাশ।

গীতাও সমান ওজনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'ল্লে, "আমারও সেই কথা। উপায় নেই, ক'রতেই হবে বিয়ে।" ফস্ ক'রে গীতার হাত ধ'রে বিকাশ তখন ব'ল্লে, "তবে এসো প্রিয়তমে, আমরা তু'জনে হাতে হাত ধ'রে এই বিবাহ-অনলে আত্মবিসর্জ্জন করি।" বলেই সট ক'রে সে গীতাকে একেবারে বুকের ভিতর সাপটে ধ'রলে।

"ছিঃ! কি যে কর? ছিঃ! ছেড়ে দাও, কে দেখে ফেলবে।" ব'লে আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে বললে, "একেবারে নির্লজ্জ বেহায়া—আর একটা দানব! হাত তো নয় যেন লোহার বেড়ী। আমার হাড়গোড় সব গুড়ো হয়ে গেছে।" ব'লে সে এমন একটা পুলকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে বিকাশের দিকে চাইলে যে বিকাশের মনে হ'ল যে এই দানবীয় অত্যাচারটার পুনরাবৃত্তিটা একেবারেই অপ্রীতিকর হবে না।

কিন্তু ঝি তখন ঝাঁটা হাতে এসে প'ড়েছে।

গীতা অত্যন্ত শান্ত সম্ভ্রান্তভাবে ব'ললে, "কিন্তু শোন বিকাশদা, জেঠাইমার কথায় ভুলে তুমি একগঙ্গা টাকা খরচ ক'রো না। কি দরকার মিছে কতকগুলো টাকা ঢেলে? বিশেষ যেখানে টাকা নেই তোমার। জোগাতে হবে হয় ধার ক'রে না হয় চুরী ক'রে।"

"কিন্তু মনের মতন খরচ ক'রে একটা যজ্ঞি ক'রতে না পারলে যে উনি বড় কষ্ট পাবেন গীতা! ওঁর খুব বেশী করেই মনে হবে যে মেসোমশায় নেই, এখন আমার কাছে হাত পাততে হ'চ্ছে তাঁর, তাই হ'ল না।"

"কিন্তু তাই ব'লে কি তুমি ডুববে নাকি? ওঁর খরচের খেয়াল মেটাতে মেসোমশায়ই ডুবতে ব'সেছিলেন। তিনি তো তবু সে সব ক'রেছেন তাঁর শেষ বয়সে যখন রোজগার তাঁর শেষ সীমায় পৌঁছেছে। তুমি সবে রোজগার আরম্ভ ক'রেছ—এমনি যদি সেই খরচের ভার নির্বিবাদে গলায় বেঁধে নাও তবে নির্ঘাত ডুবতে হবে তোমার সপরিবারে। একেই তো একটা রাবনের সংসার তোমার ঘাড়ে প'ড়েছে।"

বিকাশের মনে হ'ল এসব ছাঁকা সত্যি কথা, কিন্তু শুনে তার বুক কেঁপে উঠলো। সে বললে, "চুপ, গীতা চুপ, ও কথাও নয়! আমি কী গীতা? মেসোমশায় মাসিমা আমাকে গড়ে পিটে মানুষ ক'রেছেন তাই না আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার কি তোমার মনে বা মুখে যদি একবারও একথা আসে যে মাসিমার সংসার আমাদের একটা বোঝা, তবে আমাদের পাপের যে শেষ থাকবে না গীতা!"

বক্তৃতা ক'রে তার মনে হ'ল বেশ বলা হ'য়েছে। বেশ গর্ব্ব হ'ল তার। সে মনকে চটপট ভোগা দিলে যে এইটাই তার মনের আসল কথা! সে ত্যাগী সেবক। অপ্রস্তুত হয়ে গীতা চুপ ক'রে গেল। তার ছায়াচ্ছন্ন মুখ দেখে বিকাশের মনে হ'ল যে এই সাদা কথাটা গীতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়াটাও একটু তিরস্কারের মতই হ'য়েছে। তখন সে তাকে আদর ক'রে বললে, "তুমি রাগ ক'রো না লক্ষ্মীটি। কিন্তু ভয় নেই তোমার। সাধ্যের অতীত খরচ আমি ক'রবো না। মাসিমাকে ব'লে ক'য়ে খরচ আমি যথাসাধ্য কমাবো। কেমন? খুসী হ'লে তো?"

সংক্ষেপে গীতা বললে, "আচ্ছা।" কিন্তু তার ভ্রূ কুঞ্চিত হ'য়েই রইলো!

তখন বিকাশ বললে, "অমন ক'রে মুখভার ক'রে থেকো না লক্ষ্মী!—হাস তুমি, নইলে বড় তুঃখ পাব আমি।"

নিরুপায় হ'য়ে হাসতে হ'ল গীতার। কিন্তু একটু পরেই সে বললে, "একটা কাজ ক'রলে হয় না?"

"কি ?"

"জ্যোঠাইমার যজ্ঞি হ'তে তো সেই একমাস বাদে হবে। এর ভেতর চল না চুপি চুপি আমরা রেজেষ্ট্রী আফিসে গিয়ে—"

হেসে বিকাশ ব'ললে, "তাই বল, ভয়টা খরচার নয়—দেরী হবে তাই—কি জানি, যদি ফস্কে যায়! কেমন? সে কথা আমিও ভেবেছি। কিন্তু, তাতেও অমনি চট ক'রে হবে না। নোটিশ দিতে হবে, তাতেও দেরী হবে।"

"তবে আর কি করা যাবে?"

"দেখি, যাই টাকার চেষ্টায়।"

বিকাশ চলে গেল।

বার

মাসিমা সেইদিনই অনন্তকে আসতে টেলিগ্রাম ক'রে দিলেন। শুনে বিকাশ মাথায় হাত দিলে। মাসিমার খরচ তবু সামলান যাবে কিন্তু অনন্তর খরচ যে মহাসমুদ্র! একা রামে রক্ষা নেই—ইত্যাদি—

বিকাশ খুব সাহস ক'রে একবার শুধু বললে, "বড়দাকে আনবার মানে এমন কি দরকার? তা' ছাড়া তিনি যা কাণ্ড ক'রেছেন বাড়ীটা নিয়ে—"

মাসিমা বললেন, "ছোট লোক সে তাই ছোটলোকী করেছে। তার সে কাজের জবাবদিহি ক'রবে সে তার ধর্ম্মের কাছে। সেই কথা মনে ক'রে আজ যদি তার বোনের বিয়েতে আমি তাকে না ডাকি তবে সে যে আমার অধর্ম্ম হবে! তা ছাড়া তার বোনের বিয়ে—সে নইলে সম্প্রদান ক'রবে কে? আর, এত বড় একটা যজ্ঞি সে কি তুই সামলাতে পারবি? সে জানে শোনে, পাঁচটা ক'রেছে, সে না হ'লে চ'লবে না।

নিরুপায় হ'য়ে বিকাশ হাত পা ছেড়ে দিলে।

এলো অনন্ত!

অবিলম্বে সে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব বেশ সহজভাবে দখল ক'রে নিলে।

প্রথমেই সে বললে, "তা' হ'লে আমার তো একটা আলাদা বাড়ী নিতে হয়। বিয়ের আগে বর ক'নে এক বাড়ীতে থাকা তো ভাল দেখায় না।"

কথাটা শুনে বিকাশের হাড় জ্বলে গেল। উনি বাড়ী নেবেন! টাকাটা গুণবে তো সেই বিকাশ! অথচ এত বড় মান তাঁর যে তাঁর বোন বিয়ের আগে বরের বাড়ী থাকলে তাঁর মানের হানি হবে।

মাসিমা কিন্তু ঘাড় নেড়ে বললেন, "তা' তো নেবেই। দেখ একখানা বাড়ী। বেশ বড় সড় দেখেই নিও বাড়ী—বিয়ে তো সেখানেই দিতে হবে।"

বিকাশ তাড়াতাড়ি বললে, "আমি বাড়ী ঠিক ক'রে দেবো'খন।"

অনন্ত বললে, "না হে ভায়া না। নিজের বিয়ের কাজ নিজে ক'রবে কি? তোমার কোনও চিন্তা নেই, আমি সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি।"

বাড়ী নেওয়া হ'ল একখানা—পাঁচশো টাকা ভাড়ায়। বিরাট প্রাসাদ!

বিকাশের টাকা, দরাজ হাতে খরচ ক'রতে অনন্তের কোনও সঙ্কোচ নেই। কেন থাকবে? অনন্ত চিরদিনই পোদ্দারী ক'রে এসেছে—আর চিরদিনই পরের ধনে। বিশ্বাত্মতার অর্দ্ধেকটা তার বেশ আয়ত্ত করা আছে। পরের ধনে আপনার ধনে তার ভেদজ্ঞান নেই, সবার ধনই সে আপনার ব'লে মনে করে এবং সুযোগ পেলেই আপনার ব'লে ব্যবহার করে।

সেইদিনই গীতা ও বসন্তকে নিয়ে, অনন্ত সপরিবারে সেই প্রাসাদে গিয়ে আড্ডা নিলে আর এমন ষ্টাইলে বাস ক'রতে লাগলো যাতে সে প্রাসাদের কোনও অমর্য্যাদা না হয়।

বিয়ে হ'তে একমাস দেরী। তার আগে গোটা আষ্টেক তারিখ ছিল, অনন্ত সব নাকচ ক'রে দিলে, বললে এক মাসের আগে জোগাড় হ'য়ে উঠবে না।

বিকাশ গীতা দুজনেরই মুখ অন্ধকার হ'য়ে উঠলো।

নিমন্ত্রণ হ'ল—নারদের নিমন্ত্রণ!

সুধু তাই নয়—লোক পাঠিয়ে খরচা ক'রে দূর দূরান্তর থেকে নানাবিধ উচ্চ ভাইলিউশনের মাসি, পিশি, দিদিমা, ঠাকুরমা, ভাই, বোন, খুড়ো, জেঠা, মেসো, পিশে প্রভৃতি আমদানী ক'রে দুই বাড়ী ভরে ফেলা হ'ল।

বিকাশের চক্ষু ক্রমশঃই ঊর্দ্ধগামী হ'য়ে উঠলো—আকাশ স্পর্শ ক'রবে ব'লে আশঙ্কা হ'তে লাগলো।

এক একটা আয়োজন দেখে আর তার বুক কেঁপে ওঠে। কোথায় পাবে সে এত টাকা?

ফাটকার বাজারে একবার সে ঢোকা দিয়ে এসেছে। বাজার একেবারে ঠাণ্ডা—উঠতি পড়তি নেই একেবারে, হবেও না শীগ্‌গির। কাজেই সেখানে হঠাৎ কোনও টাকা করবার সম্ভাবনা নেই।

তবে উপায়?

মাসিমার কাছে সে আর ঘেঁষতে পায় না। তাঁর ব্যয় বিভাগের মহামন্ত্রী অনন্ত আসবার পর তিনি খরচ পত্র সম্বন্ধে কোনও আলোচনাই করেন না বিকাশের সঙ্গে—মাঝে মাঝে কেবল বলেন—টাকার জোগাড় কর।

মরিয়া হ'য়ে বিকাশ স্থির ক'রল, ব'লবেই সে মাসিমাকে যে টাকা সে দিতে পারবে না এত। বুক ফুলিয়ে সদর্পে সে এগিয়ে গেল। কিন্তু মাসিমার সামনে এসে সে সুধু দাঁড়িয়েই রইল; কথা ফুটলো না তার।

মাসিমা মহা আনন্দে ছুটোছুটী ক'রে বেড়াচ্ছেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাপারের আয়োজনে তার মুখখানি খুসী ক'রে ব'সে আছেন। কোন প্রাণে বিকাশ তাঁকে ব'লবে এ সব কিছু হ'তে পারবে না, টাকা নেই তার।

নীরবে সে ফিরে গেল।

একদিন অনন্ত তাকে বললে, "এইবারে মোটা মোটা খরচ আসছে, পাঁচ হাজার টাকা হাতে কর।"

বিকাশ বললে, "কোথায় পাব টাকা বড়দা? কোথাও টাকা পাচ্ছিনে—এসব খরচ"—

তার কথা সম্পূর্ণ করবার অবসর দিলে না অনন্ত। সে জনৃ

ক'রে ব'লে বসলো, "আচ্ছা, কোনও চিন্তা নেই, আমি টাকার জোগাড় করছি। বেচেই দি'গে রাঁচীর বাড়ীখানা।

বিকাশ একেবারে বিমূঢ় হ'য়ে গেল। সে যখন রাঁচীর বাড়ী বেচবার কি ভাড়া দেবার প্রস্তাব ক'রেছিল তখন অনন্ত কী প্রাণপণে বাধা দিয়েছিল। আর আজ সে এক কথায় বাড়ীটা বিক্রী ক'রতে চায় বিকাশের ও গীতার বিয়ের জন্য! গীতা অবশ্য তার বোন, কিন্তু গীতার ষোল বছরের জীবনে কোনও দিন তার সম্বন্ধে অনন্তের এতখানি দুর্ব্বলতার নিঃশ্বাস মাত্রও বিকাশ কোনও দিন দেখে নি—দেখেছে নির্দ্দয় তিরস্কার ও প্রহারের প্রাচুর্য্য!

বিস্ময়ের অবধি রইলো না তার।

সে বললে, "রাঁচীর বাড়ী বেচবেন?"

অনন্ত বললে, "আর উপায় কি?—তা ছাড়া একটা সুবিধাও হ'য়েছে বড্ড। জান তো ও বাড়ীর টাইটল নিয়ে যা গোলমাল, কেউ নিতেই চায় না। এক বেটা জমীদার ভারী ঝুলোঝুলি ক'রছে তাও। বলে জ্যাঠাইমার কাছে কবালা পেলেই সে নেবে—আর আমাকে বাড়ীর একটা অংশ ছেড়ে দেবে, আমার একটা নাদাবী লিখে দিতে হবে। পাঁচ হাজার টাকা সে দেবে। এমন সুযোগটা ছাড়া উচিত হবে না।—যাক গে, তাই করবো—টাকার জন্যে তুমি ভেবো না।

অনন্ত উঠতেই বিকাশ বাধা দিলে।

গোড়া থেকেই কথাটা তার অদ্ভুত ঠেকছিল। এখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে এটা কেবল অনন্তের নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির একটা চাল। মাসিমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বিদেয় ক'রে সে নিজস্ব ক'রে নেবে বাড়ীর খানিকটা, আর, কোন না আর হাজার দুই চার টাকা মারবে।

সে ব'ল্লে, "না, বড়দা', থাক, ও বাড়ী যেয়ে কাজ নেই। আমি যেমন ক'রে পারি টাকার জোগাড় ক'রবো।"

কথাটা হ'চ্ছিল বিয়ের বাড়ী, অর্থাৎ অনন্তের বাড়ীতে। এখানে বিকাশ বড় একটা আসে না, আজ এসেছে অনন্তের নিমন্ত্রণে—টাকার জন্য।

তার কথা শুনে অনন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠে গেল! তখন গীতা এদিক ওদিক চেয়ে বিকাশের কাছে এসে ব'ল্লে, "বলি কি সব কাণ্ড হ'চ্ছে বিকাশ দা, খবর রাখ?"

বিকাশ শুষ্ক মুখে ব'ল্লে; "খবর রাখবার দরকার করে না, অনুভবেই বুঝতে পারছি—হ'চ্ছে রাজসূয় যজ্ঞ। এবং তার বলি তুমি। কিন্তু শুধু তাই নয়। খরচ যা হ'চ্ছে—তার চেয়ে বেশী গিয়ে উঠছে দাদার সিন্দুকে"—

নিভৃতেও এ কথা গীতার মুখে শুনে তার বুক কেঁপে উঠলো। অনন্ত শুনলে নাকি? সে ব'ল্লে, "থাক গীতা, এ কথা নিয়ে আলোচনা ক'রে কাজ নেই।" "না থাকলো আমার কাজ, কিন্তু তোমার চেহারাখানা যে এই ক'দিনে আমনি হ'য়ে গেছে"—

একটু হেসে বিকাশ ব'ল্লে, "বিরহে এমনি হয়, কবিরা বলেন।"

"তামাসা রাখ। তুমি টাকার জন্যে ভেবে ভেবে শুকিয়ে ম'রছো, সে কথা আর কেউ না বোঝে, আমি বুঝি। আমি তোমাকে এমনি ক'রে বধ হ'তে দেবো না। অমন ভালো মানুষটি হ'লে চ'লবে না। সাহস ক'রে ব'লতে হবে তোমায়, আমি দিতে পারবো না। এত ভয় কিসের তোমার?"

সাহসের অভাব তা'র? গীতার মুখে এই সম্পূর্ণ সত্য অভিযোগেও সে কেঁপে উঠলো। "দাদা কি বলছিলেন জান?—রাঁচির বাড়ী বেচবেন, তা হ'লে!"

"সে তিনি বেচবেনই। সে সব যুক্তি আমি জানি—বউদিকে দাদা ব'লছিলেন, আড়াল থেকে শুনেছি সব। কথাটা বিয়ের কথার আগেই ঠিক হ'য়ে গেছে।"

একটা বোকা জমিদারকে বাগিয়ে উনি দশ হাজার টাকায় আর্দ্ধেকটা বাড়ী তার ঘাড়ে গছাবার ব্যবস্থা ক'রেছেন, এই ফাঁকে তপ্ত তপ্ত কাজটা সেরে ফেলে জ্যাঠাইমাকে দেখাবেন পাঁচ হাজার টাকা, তারপর বিয়েতে হাজারদুই টাকা খরচ ক'রে বাকী টাকা নিয়ে লটকাবেন।"

"কিন্তু আমি তা' বারণ ক'রেছি"—

"ব'য়ে গেছে। তুমি মানা ক'রবে তাই জ্যাঠাইমাকে দিয়ে বাড়ী বেচাতে পারবেন না দাদা! তুমি ভেবেছ কি?"

"আমি যেমন ক'রেই হোক টাকাটা তুলে দেবো!"

"তাতে লাভ হবে এই যে আর পাঁচ হাজার টাকা বেশী খরচ দেখাতে হবে। মোটের উপর এই লাভের কাজটা দাদা ছাড়বেন না কিছুতেই।"

"বটে, আচ্ছা দেখি উপায় হয় কি না।"

"আমি বলি, কোনও চেষ্টা ক'রো না। ধনঞ্জয় হয় বর্ব্বরেরই হোক—তুমি সে বর্ব্বর নাই হ'লে! উপায়ের চেষ্টায় বিকাশ সটান গেল উকীলের বাড়ী। সেখান থেকে পরামর্শ সেরে সে গেল আফিসে। কাজে তার মন বসলো না, টাকার চিন্তায়।

ভাবলে সে, এ কী নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে সে আপনাকে? গীতার কথা যে ঠিক তা' সে জানে। সে দুঃখ পাচ্ছে কেবল জোর ক'রে না বলবার তার সাহস নেই ব'লে। কিন্তু কি ক'রবে সে?

তবু এ আর চলবে না। বার বার এই শেষ বার। বিয়েটা চুকে গেলে আর সে ভাল মানুষটা থাকবে না, নাগপাশ থেকে মুক্তি নেবে সে।

কিন্তু এখন উপায়? কোনও উপায়ই সে খুঁজে পেলে না। ধার ক'রতে পারে সে, জমীটা বাঁধা দিয়ে—কিন্তু বিয়ের জন্য ধার ক'রে ডুববে? সে যে আশা ক'রে আছে ঐ জমী বাঁধা রেখে আস্তে আস্তে ওর উপর বাড়ী করবে একখানা।

যতীনবাবু এসে ব'ললে, "বিকাশবাবু, জমীটা বেচবেন আপনি?"

বিকাশ চমকে উঠলো, এ লোকটা কি শয়তান? তার মনের দ্বন্দ্বটা টের পেলো কেমন ক'রে? আমতা আমতা ক'রে সে বললে, "না—কেন বলুন তো?"

"ভারী একটা ভাল অফার আছে। ছাঁকা বিশ হাজার টাকা cash down। আমি বলি, বেচে ফেলুন। আর ঐ টাকা দিয়ে ৯ নং কীমের একটা গোটা বাড়ী কিনে ফেলুন। সে চমৎকার

জায়গা হবে, আর সেখানকার কতগুলি ভাল বাড়ী না ভেঙেই বিক্রী ক'রছে। তাই করুন।"

নেচে উঠলো বিকাশের প্রাণ। এতদিন ভাগ্যদেবীর যে অপর্য্যাপ্ত প্রসাদ সে পেয়ে এসেছে তার ধারা আজও অব্যাহত আছে, আর আজ তার প্রয়োজনের দিনে সে প্রসাদ উথলে পড়েছে দেখে সে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো।

যতীনবাবুর সাহায্যে সেই দিনের ভিতর বাড়ী বিক্রী হ'য়ে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের একখানা মাঝারী গোছ বাড়ী কেনবার ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। সব দিয়ে থুয়ে সে ছয় হাজার টাকার নোট পকেটে পুরে সে হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরলো।

সবচেয়ে এই কথায় সে আরাম শেষ করলে যে, তার কোনও সাহসের কাজ করতে হ'ল না আপনা আপনি সব বিপদ কেটে গেল। একটু বুকে জোরও হ'ল—ভাবলে মাসিমাকে এবার দুটো কথা ব'লবে।

মাসিমাকে সে বললে, টাকার জোগাড় করেছি মাসিমা, কিন্তু তার তিনটে সর্ত্ত আছে।"

টাকা হ'য়েছে শুনে খুসী হয়েও মাসিমা এই সর্ত্তের কথায় বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হ'লেন। মেসোমশায়ের কাছে তার কোনওদিন কোনও সর্ত্তের কথা শোনা অভ্যাস হয় নি। একটু ভার মুখে সে বললে, "কি সর্ত্ত?"

"প্রথম সর্ত্ত এই যে পাঁচ হাজার টাকার ভিতর সব খরচ সারতে হবে। কেন না, আর টাকা পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় সর্ত্ত এই যে রাঁচীর বাড়ী বিক্রী বা তার সম্বন্ধে কোনও বন্দোবস্ত আপনি ক'রতে পারবেন না। তৃতীয় সর্ত্ত এই যে আর একহাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনবেন, আর এর পর যখন যা পাবো তার যা বাঁচে সব দিয়ে আপনার নামে কোম্পানীর কাগজ কিনবেন।"

মাসিমা একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, "এমন কড়া শাসন তো তোর মেসো কোনওদিন করেন নি।"

"তিনি করতে পারেন নি কেন না তিনিই আপনাকে বেশী ভালবাসতেন। কিন্তু আমি যে আপনার ছেলে, আমার বেলায় যে ভালবাসাটা আপনার বেশী, তাই আমার এ আবদার আপনার না রেখে উপায় নেই।"

ব'লে বিকাশ ছ' হাজার টাকার নোট মাসিমার পায়ের কাছে রেখে দিলে।

প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো তাঁর মুখ। টাকাগুলো হাতে ক'রে নিয়ে বললে, এখন এগুলো রাখি কোথায়! গীতাটা না থেকে বড় মুস্কিল হয়েছে। অনন্ত—"

"আমি রেখে দেবো মাসিমা? আমার কাছে থাক, যখন যা' দরকার হবে আমিই দেবো।"

"আচ্ছা তাই রাখ্, দেখিস্ হারিয়ে বা খরচ ক'রে ফেলিসনে যেন। যে মনভোলা তুই!" ব'লে টাকাগুলো বিকাশের হাতে দিয়ে ব'ললেন, "কোথ্ থেকে জোগাড় করলি টাকা?

"টাকা কি আর আমি জোগাড় ক'রেছি মাসিমা? অন্নপূর্ণা মার টাকার দরকার হ'য়েছে কুবের পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর ভাঁড়ার থেকে।"

হেসে মাসিমা ব'ললেন, "ভারী জ্যাঠা হ'য়েছিস। বল্ না কোথায় পেলি?"

সব কথা খুলে ব'লে বিকাশ ব'ললে, "আপনি চেয়েছিলেন খুব জাঁক করে আমার বিয়ে দিয়ে আমার ঘর গোছাতে, দালালের মারফত কুবের পাঠিয়ে দিলেন টাকা, তাতে বাড়ীকে বাড়ী রইলো, বিয়ের খরচও জুটে গেল।—মাসিমা, সে বাড়ী দেখলে খুসী হ'য়ে যাবেন। একমাসের মধ্যেই বাড়ী মেরামত হ'য়ে যাবে তারপর ভাড়াটে ঘর ছেড়ে আপনাকে নিজের ঘরে নিয়ে যাবো।"

"কিন্তু একটা কথা বাবা, রাঁচীর বাড়ীর কথা—"

"কেন কি ক'রেছেন আপনি? বেচা হ'য়ে গেছে?" চমকে উঠে ব'ললে বিকাশ।

"অনন্ত একখানা চিঠি আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে যে আমি ঐ বাড়ী বেচতে সম্মত আছি।"

বিকাশ লাফিয়ে উঠে ব'ললে, "সে চিঠি কোথায়?"

"ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছে—"

বিদ্যুদ্বেগে বিকাশ ছুটে বেড়িয়ে গেল উকীলের কাছে। তার পরামর্শ নিয়ে সে তৎক্ষণাৎ রাঁচিতে চারখানা আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম ক'রলে, মাসিমার নামে আর তার ভাগ্নে অমলের পক্ষে কমলার নামে। টেলিগ্রাম দুটো গেল যে বাড়ী কিনতে চেয়েছিল তার নামে, আর দুখানা গেল রাঁচীর একজন বড় উকীলের নামে।

অনন্ত চিঠি ডাকে পাঠায়নি, নিজেই সে চিঠি নিয়ে রাঁচী গিয়েছিল, চটপট কার্য্য শেষ ক'রে আসবার জন্য। সেখানে গিয়ে সে দেখতে পেলে বিকাশের পাঠানো টেলিগ্রাম পেয়ে খরিদ্দার পেছু পা'। আর যে উকীলকে টেলিগ্রাম করা হ'য়েছিল, তিনি তাকে ডেকে শাসিয়ে দিলেন যে বাড়ী বেচবার কোন চেষ্টা করলে অনন্তকে আদালতে লাঞ্ছনা পেতে হবে।

রাগে ফোঁস ফোঁস ক'রতে ক'রতে অনন্ত ফিরে এলো ক'লকাতায়। মাসিমার কাছে এসে লম্ফ-ঝম্ফ ক'রে তাঁকে গালাগালি ক'রতে লাগলো—ব'ললে, "আমি এবিয়ের সাতেও নেই পাঁচেও নেই। আমি চল্লাম, কেমন ক'রে বিবাহ হয় দেখি।"

রাঁচীর বাড়ী বিক্রি বন্ধ হ'য়ে গেছে, সেখানকার উকীলের চিঠিতে এই খবর পেয়ে মহা উল্লাসে বিকাশ আসছিল মাসিমার কাছে। তাঁর সামনে অনন্তকে দেখে তার বুক কেঁপে উঠলো।

উকীলের পরামর্শ—শুধু পরামর্শ নয়, তাঁর তীব্র উত্তেজনার ফলে বিকাশ টেলিগ্রামগু'লা পাঠিয়েছিল। তার পর থেকেই তার বুক কাঁপছিল অনন্তের সঙ্গে এই অবশ্যম্ভাবী সাক্ষাতের কল্পনায়। সে ভাবলে যে অনন্ত তাকে গাল দিয়ে ভূত ঝেড়ে দেবে। কী যে সব কাণ্ড ক'রবে তা' কল্পনাই করতে পারছিল না, শুধু ভয় করছিল। ছেলে বেলায় কারণে অকারণে অনন্তর কাছে কাণমলা ও চড় চাপড় খেয়ে তার অবচেতনায় অনন্তের সম্বন্ধে যে একটা অহেতুক ভীতি ছিল তাতে তাকে এই সাক্ষাতের সম্ভাবনা কল্পনায় ভারী সঙ্কুচিত ক'রে দিয়েছিল।

হঠাৎ ঘরে ঢুকে প'ড়েই সে দেখতে পেলো অনন্ত ভীষণ ক্রুদ্ধ; গর্জ্জনশীল অনন্ত। দেখে তার পেটের পীলে চমকে গেল।

কিন্তু ফিরবার পথ নেই, কাজেই সে যেন কিছুই জানে না এই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো অনন্তের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ও তিরস্কার শোনবার সশঙ্ক প্রতীক্ষায়।

কিন্তু না হ'ল গর্জ্জন না হ'ল তিরস্কার!

ফলে দেখা গেল যে অনন্তের সামনা সামনি দাঁড়াতে বিকাশের যে সঙ্কোচ, অনন্তের ভয় বা সঙ্কোচ তার চেয়ে ঢের বেশী। বিকাশের কাছে তার সব ফন্দী ফাঁক হ'য়ে গেছে জেনেই অনন্ত কাবু হ'য়ে প'ড়েছিল। তারপর রাঁচীতে একবার বিকাশের মুখ ভেঙে দেবার একটা সামান্য প্রস্তাব করায় অনন্ত যে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছিল তাতে বিকাশের সামনে ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করা সম্বন্ধে তার একটা বেশ সুস্থ অরুচি জন্মেছিল।

তাই বিকাশকে দেখেই তার লম্ফ ঝম্ফ হঠাৎ চুপসে গেল এবং তার মানসিক লাঙ্গুল নিঃশেষে গুটিয়ে নিয়ে সে নিঃশব্দে সটকান দিলে।

বিকাশের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

সে মাসিমাকে তার সংবাদটা জানালে।

মাসিমা বললেন, "সে শুনেছি অনন্তের কাছে। তাতে ভারী রাগ হ'য়েছে বাবুর!" ব'লে তিনি হাসলেন। তারপর বললেন, "যাক বাবা একথা নিয়েও যদি আর কিছু বলে তাতে কিছু বলিস নে তুই। ও কথা আর ঘাঁট-ঘাঁটি ক'রে কাজ নেই। এখন বিয়েটা নির্ব্বিঘ্নে—।"

অনন্ত যদিও বললে যে, সে এ বিয়ের সাতেও নেই পাঁচেও নেই, তবু, এখনও যখন বিয়ের পাঁচ হাজার টাকা খরচ হ'তে বাকী আছে তখন সেগুলো খরচ না ক'রে অমনি হাত পা ধুয়ে ব'সে থাকবার মতলব তার সত্যি সত্যি ছিল না।

টাকাটা বিকাশের হাতে পড়েছে—সেটা আদায় করবার চেষ্টায় দু'দিন পর সে বিকাশকে বললে, "টাকাগুলো চাই যে এখন।"

টাকা দিতে সে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, কিন্তু 'না' বলাও বিকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। মুখের উপর কাউকেই সে 'না' ব'লতে পারে না কোনও দিন।

বিস্তর সাহস সংগ্রহ ক'রে বিকাশ বললে, "আজ কত দরকার?"

অনন্ত দেখলে—হিসেব চায়। আর সব টাকা চাইতে সাহস হ'ল না। ব'লতে গেলে আজ কিছুই ছিল না। তবু অনন্ত বিস্তর চেষ্টা ক'রে মাথার আনাচে কানাচে খুঁজে দশ বারোটা দফা উদ্ভাবন ক'রে ফেললে, তার সব যোগ ক'রে খুব টেনেও চারশো টাকার বেশী হ'ল না।

সে টাকাটা ফেললে বিকাশ।

এর পর অনন্ত হতাশ ও নিরুৎসাহ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিলে, তারপর খরচ খুব বাহুল্যের সঙ্গে হ'লেও একটু শৃঙ্খলার সঙ্গে হ'ল। [ক্রমশঃ

ললিত-কলা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

এগার

১২। হস্তলাঘব—টীকাকার বলিয়াছেন—ইহার অর্থ—'সকল কর্ম্মে লঘুহস্ততা। কালাতিপাত দূর করিবার নিমিত্ত ইহার উপযোগিতা। দ্রব্যহানিতে লঘুতা—ক্রীড়ার্থ ও বিস্ময় জন্মাইবার নিমিত্ত।'১

টীকাকারের প্রথম অর্থটি পরিষ্কার। যে-কার্য্য করিতে সাধারণতঃ বহু সময় লাগে, অল্প সময়ের মধ্যে তাহার অনুষ্ঠান—হস্তলাঘবের বিষয়। সময় বাঁচানই ইহার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অর্থটি একটু অস্পষ্ট। মনে হয়—ইহাতে হাত সাফাই-এর ইঙ্গিত আছে। খেলা (অর্থাৎ ম্যাজিক) দেখাইয়া লোকের মনে চমক লাগাইবার উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য উড়াইয়া দেওয়া—ঘুঁটিবাজি।

৺মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণে টীকানুবাদে বলা হইয়াছে—"অনেক সময় লইয়া নিষ্পাদ্য কর্ম্মের অল্প সময়ে শিক্ষা করা। দ্রব্যের হানিতে, ক্রীড়ার্থ বা বিস্ময় জন্মাইবার জন্য লঘুহস্ততা দ্বারা তাহার রক্ষাকরণ। (অলক্ষ্যে অতিশীঘ্র হস্ত-সঞ্চালন দ্বারা বস্তুর পরিবর্ত্তন করা। বাজী-বিশেষ"।)২

৺তর্করত্ন মহাশয়ের অর্থ—"(হাতসাফাই) তাহার ফলে—ঘুঁটিবাজি তাস উড়ান প্রভৃতি হইয়া থাকে"।

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—"অলক্ষ্যে অতিশীঘ্র হস্ত-সঞ্চালন দ্বারা বস্তুর পরিবর্ত্তন করা! ইহা এক চমৎকার বাজী। এখনও অনেক হস্তলাঘবপটু বাজীকর আছে"।

৺সমাজপতি মহাশয়ের অর্থ—"হাতের লঘুতায় কোন কাজ-কর্ম্ম দেখাইয়া উপার্জ্জনের পথ। বোধ হয় ইহাও একরূপ ভোজবাজী"।

"কোন কাজকর্ম্ম"—এই অংশটুকু স্পষ্ট নহে। বোধ হয়, টীকাকারের প্রথম অর্থটি প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে—কিন্তু পরিস্ফুট হয় নাই।

---

১ "সর্ব্বকর্ম্মসু লঘুহস্ততা। কালাতিপাতনিরাসার্থম্। দ্রব্যহানিষু বা লাঘবং ক্রীড়ার্থং বিস্মাপনার্থঞ্চ"—জয়মঙ্গলা।

২ পৃঃ ৯১। এ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে—টীকা হইতে—"দ্রব্যের হানিতে…লঘুহস্ততা দ্বারা তাহার রক্ষা করণ"—এরূপ অর্থ আসে কোথা হইতে? বরং দ্রব্যের হানিতে হস্তের লঘুতা—খেলা দেখাইতে বা বিস্ময় জন্মাইতে (অর্থাৎ দ্রব্য উড়াইয়া দেওয়া)—এরূপ অর্থই সঙ্গত মনে হয়।

৮ কুমুদচন্দ্র সিংহের মতে—"সর্ব্বকার্য্যে হস্তের লঘুতা এবং বাজি দেখাবার সময় হাতের সাফাই" ৩

২৩। বিচিত্র-শাক-যূষ-ভক্ষ্য-বিকার-ক্রিয়া

ও

২৪। পানকরস-রাগাসব-যোজন—যশোধরেন্দ্রপাদের মতে এই দুইটি ভিন্ন কলা নহে—একই কলার দুইটি বিভাগ মাত্র।৪

টীকার অনুবাদ প্রথমে দেওয়া যাইতেছে—"আহার চতুর্বিধ—ভক্ষ্য-ভোজ্য-লেহ্য পেয়। তন্মধ্যে ভোজ্য বলিতে বুঝায়—অন্ন (ভাত) ও ব্যঞ্জন। ভাত ও ব্যঞ্জনের মধ্যে আবার ব্যঞ্জন-রন্ধন প্রায় অধিক লোকেরই ভাল জানা নাই। তাই ব্যঞ্জনের শ্রেষ্ঠ যে শাক তাহাকে লইয়াই ব্যঞ্জন-রন্ধন-প্রক্রিয়া দেখান হইতেছে। শাক দশবিধ বলা হইয়াছে—মূল, পত্র, করীর, অগ্র, ফল, কাণ্ড, প্রকাণ্ড, ত্বক্, পুষ্প ও কণ্টক—এই দশপ্রকার শাক।

পেয় দ্বিবিধ—অগ্নি দ্বারা নিষ্পাদ্য ও তদ্ভিন্ন। উহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত-প্রকার পেয় 'যূষ'-নামে প্রচলিত। উহা আবার দ্বিবিধ—মুগাদির নির্যূহকৃত ও ক্কাথরস।

ভক্ষ্য—খণ্ডখাদ্যাদি। নানাজাতীয় এই সকলের (শাক-যূষ-ভক্ষ্য-দ্রব্যের) ক্রিয়া অর্থে পাকবিধি দ্বারা নিষ্পাদন।

আর যে পেয় অগ্নি-দ্বারা নিষ্পাদিত হয় না, তাহা দ্বিবিধ—সন্ধানকৃত (অর্থাৎ মিশ্র) ও তদ্ভিন্ন (অসন্ধানকৃত)। উহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত-প্রকার আবার দ্বিবিধ—দ্রাবিত ও অদ্রাবিত। উহাদের মধ্যে যাহা গুড়-তিন্তিড়ী (মিশান) জলের সহিত সংযোগ করিয়া নির্ম্মিত হয়, তাহা 'দ্রাবিত'। তাহারই নামান্তর 'পানক'। আর যাহা অদ্রাবক ঔষধের সহিত তাল-মোচাফল (কদলী) ইত্যাদির সংযোগ করিয়া নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা 'অদ্রাবিত'—উহারই নামান্তর 'রস'।

'আসব'-শব্দটির প্রয়োগ-দ্বারা অসন্ধান-কৃত পেয়ের সূচনা করা হইয়াছে। উহা মৃদু-মধ্য-তীক্ষ্ণ সন্ধান-যোজনা-দ্বারা তথাবিধরূপে নিষ্পাদিত হইয়া থাকে।৫

'রাগ'-শব্দের প্রয়োগ-দ্বারা 'লেহ্য' সূচিত হইয়াছে। যেহেতু উহা (রাগ) ত্রিবিধ। উক্ত হইয়াছে—রাগবিধানজ্ঞগণ বলিয়াছেন রাগ (ত্রিবিধ)—লেহ্য, চূর্ণ ও দ্রব। উহা ঈষৎ মধুরাস্বাদ-সংযুক্ত লবণাম্ল-কটু-স্বাদ।

আস্বাদ্য-কলার এই চতুর্ব্বিধ বিস্তার শরীরস্থিতির অনুকূল। যোগ-বিভাগ ৬ অগ্নিজাত ও অনগ্নিজাত ক্রিয়াপ্রদর্শনার্থ তন্মধ্যে পাক-দ্বারা শাকাদি-ক্রিয়া ও বিনা পাকে পানকাদিযোজন। অন্যথা 'আস্বাদ্যবিধি'—এইরূপ নাম উক্ত হইতে পারিত। অতএব, (ইহা বুঝা যায় যে) কর্ম্মভেদ-বশতঃ আস্বাদ্যবিধানও দ্বিবিধ। তদ্বশতঃ একটিই কলা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া কথিত হইয়াছে।৭

যশোধরের বক্তব্য একটু পরিষ্কারভাবে বুঝান প্রয়োজন। তাঁহার মতে—খাদ্য-দ্রব্য মোট চারি শ্রেণীর—১ ভোজ্য, ২ ভক্ষ্য, ৩ পেয় ও ৪ লেহ্য। ভোজ্য ও চূষ্য (চোষ্য) একই। আবার ভক্ষ্য ও চর্ব্ব্য—একই। ভোজ্য বলিতে বুঝায় ভাত ও তরকারী (ব্যঞ্জন)। ভাত-রাঁধা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস-সাধ্য। কিন্তু ভালরূপে রন্ধন রাঁধিতে প্রায়ই লোক জানে না। রন্ধনের মধ্যে

---

৩ কাঃ সূঃ বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬৫। শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, পৃঃ ৭। কল্কিপুরাণ, পৃঃ ২৩। কৌমুদী, পৃঃ ২৯।

৪ ললিতকলা (চার) বঙ্গশ্রী, চৈত্র ১৩৫০, দ্রষ্টব্য।

৫ টীকার এই অংশে সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদ আছে। সন্ধানকৃত (মিশ্রিত) পেয়—দ্রাবিত বা পানক ও অদ্রাবিত বা রস। অসন্ধানকৃত (অমিশ্র) পেয়—আসব। ইহা যদি হয় তাহা হইলে আবার উহাতে মৃদু-মধ্য-তীক্ষ্ণ সন্ধান-যোজন কিরূপে সম্ভব? একারণে মনে হয় শুদ্ধ পাঠ—"মৃদু-মধ্য-তীক্ষ্ণাসন্ধান-যোজনাৎ"।

৬ যোগ-বিভাগ—যোগ-সূত্র। প্রত্যেকটি কলার নাম সূত্রাকারে সংগৃহীত হওয়ায় প্রত্যেক নামটিই এক একটি যোগ। আস্বাদ্য-কলা মূলতঃ একটি যোগ। তবে উহাকে দ্বিধা বিভক্ত করা হইয়াছে—অগ্নিজাত ও অনগ্নিজাত এই দুই শ্রেণীর খাদ্য পৃথক্ করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে।

৭ চতুর্ব্বিধ আহারঃ, ভক্ষ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয়মিতি। তত্র ভোজ্যম্—ভক্তব্যঞ্জনয়োর্ব্যঞ্জনারাধনং প্রায়শো ন সুজ্ঞানমিতি ব্যঞ্জনাগ্র্যং শাকস্যোপাদানেন দর্শয়তি। তত্র শাকং দশবিধম্। যথোক্তম্—"মূলপত্রকরীরাগ্রফলকাণ্ডপ্রকাণ্ডকম্। ত্বক্ পুষ্পং কণ্টকং চেতি শাকং দশবিধং স্মৃতম্॥" পেয়ং দ্বিবিধম্, অগ্নিনিষ্পাদ্য-মিতরচ্চ। তত্র পূর্ব্বং যূষাখ্যম্। তচ্চ দ্বিবিধম্—মুদ্গাদিনির্যূহ-কৃতম্, ক্বাথরসঞ্চ। ভক্ষ্যং খণ্ডখাদ্যাদি (খণ্ডকাদ্যাদি)। এষাং নানাপ্রকারাণাং ক্রিয়া পাকবিধানেন নিষ্পাদনম্। যদনগ্নি-নিষ্পাদনং পেয়ং তদ্ দ্বিবিধম্—সন্ধানকৃতম্ ইতরচ্চ। তত্রাদ্যং দ্রাবিতম্ অদ্রাবিতঞ্চ। তত্র যদ্ গুড়তিন্তিড়িকাদিজলেন সংযোজ্য ক্রিয়তে, তদ্ দ্রাবিতং পানকাখ্যম্। যদদ্রাবকৌষধেন তালমোচা-ফলানি সংযোজ্য নিষ্পাদ্যতে, তদদ্রাবিতং রসাখ্যম্। আসব-গ্রহণেনাসন্ধানমুপলক্ষয়তি। তন্মৃদুমধ্যতীক্ষ্ণসন্ধানযোজনাত্তথা-বিধমেব নিষ্পাদ্যতে। রাগগ্রহণং লেহ্যং সূচয়তি, তস্য ত্রৈবিধ্যাৎ। তথা চোক্তম্—"রাগো রাগবিধানজ্ঞৈর্লেহ্যশ্চূর্ণো দ্রবঃ স্মৃতঃ। লবণাম্লকটুস্বাদ ঈষন্মধুরসংযুতঃ"॥ ইতি। এতচ্চতুর্ব্বিধমাস্বাদ্য-কলায়াঃ প্রপঞ্চিতং শরীরস্থিত্যর্থম্। যোগবিভাগোঽগ্নিজানগ্নি-জকর্ম্মদর্শনার্থঃ। তত্র পাকেন শাকাদিক্রিয়া। বিনা পাকেন পানকাদিযোজনম্। অন্যথা আস্বাদ্যবিধিরিত্যুক্তং স্যাৎ। তস্মাৎ কর্ম্মভেদাদাস্বাদ্যবিধানজ্ঞোঽপি (?) দ্বিবিধঃ। তদ্বশাদেকাপি কলা দ্বিধাকৃত্যোক্তা"—জয়ম।

দ্রষ্টব্যঃ—"আস্বাদ্যবিধানজ্ঞোঽপি"—পাঠটি সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদ-দুষ্ট। অথবা উহার এরূপ অর্থও করা চলে—কর্ম্মভেদে (অর্থাৎ উপজীবিকার ভেদানুসারে) আস্বাদ্যকলাবিৎ দুই শ্রেণীর (এক শ্রেণীর রন্ধনকারী, হালুইকর ইত্যাদি; ও দ্বিতীয় শ্রেণীর—সরবৎ ইত্যাদি প্রস্তুতকারক)। এতদনুসারে একই কলাকে দুই ভাগ করিয়া বলা হইয়াছে।

শাকই প্রধান। শাক—নিরামিষ, ব্যঞ্জন। উহা দশ প্রকার যথা :—মূল (মূলা, আলু, কচু, ওল ইত্যাদি), পত্র বা পাতা (ন'টে, পুঁই প্রভৃতি শাকের পাতা), করীর বা কোঁড় (কচি বাঁশের কোঁড়), অগ্র বা আগা (বেতের আগা, নারিকেল ও খেজুরের আগা—যাহাকে চলিত ভাষায় 'মাথি' বলা যায়), ফল (বেগুন, পটল, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, কাঁচা পেঁপে ইত্যাদি), কাণ্ড বা গুঁড়ি (অর্থাৎ ডাঁটা—ডেঙ্গো ডাঁটা, ন'টের ডাঁটা ইত্যাদি), প্ররূঢ় বা অঙ্কুর (ছোট ছোট শাকের চারা, বাঁশের কোঁক ইত্যাদি), ত্বক্ বা ছাল (অর্থাৎ খোসা—সজ্‌নের ছাল, আলু, পটল, কুমড়ার খোসা ইত্যাদি), পুষ্প বা ফুল (মোচা, সজ্‌নে, কুমড়ার ইত্যাদির ফুল) ও কণ্টক বা কাঁটা (কাঁটা-ন'টে ইত্যাদি)। এই হইল দশবিধ শাক। ইহাই ব্যঞ্জনের প্রধান উপাদান। ব্যঞ্জন আবার ভোজ্যের প্রধান অংশ। 'ভোজ্য'—সাধারণতঃ চুষিয়া খাওয়া হয়—এ-কারণে ইহাকে 'চুষ্য' (বা চোষ্য) নামও দওয়া হইয়া থাকে।

ইহার পর 'ভক্ষ্য'। ভক্ষ্য সাধারণতঃ চিবাইয়া খাওয়া হয়—এ-হেতু ইহার নামান্তর 'চর্ব্ব্য'। দৃষ্টান্ত—মোদক, পিষ্টক (অপূপ), লড্ডুক, খণ্ড (খাঁড়), সিতা (মিছরি) ইত্যাদি। চিড়া, মুড়ি, খই, কটি, লুচি ইত্যাদি কঠিন খাদ্যমাত্রই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

পেয়—তরল খাদ্য—পানের যোগ্য। পেয় সাধারণতঃ দুই প্রকার—অগ্নি জ্বালিয়া যাহা রন্ধন করা হয়, আর যাহা রন্ধন করা হয় না। রন্ধন করা পেয়ের নাম যূষ। যূষ আবার দুই প্রকার—ঝোল বা নিষ্কাষিত সারাংশ (যথা—মুগের ডালের যূষ৮, মাংসের মাছের যূষ ইত্যাদি), ও ক্বাথরস (যথা—কবিরাজি পাচন, অরিষ্ট ইত্যাদি)।

শাক, ভক্ষ্য ও অগ্নি-নিষ্পাদ্য পেয়—ইহাদের বিভিন্ন প্রকার অগ্নিতে পাক-দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই সকল খাদ্য রন্ধনের কৌশল বিচিত্র-শাক যূষ-ভক্ষ্য-বিকার ক্রিয়া কলাটির অন্তর্গত। এক কথায় এই কলাটিকে 'রন্ধন-কলা' বলা চলে, কারণ রন্ধন-করা যত কিছু খাদ্য সে-সকলই ইহার মধ্যে পড়ে।

আর যে পেয় রন্ধন করা হয় না—কাঁচাই যাহা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে—অগ্নির সহিত যাহার সংস্পর্শ-মাত্রও নাই—সেইরূপ পেয়ও দুই শ্রেণীর। নানাবিধ উপাদান একত্র মিশ্রিত করিয়া যাহা তৈয়ারী করা যায়, তাহা প্রথম শ্রেণীর পানীয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে—যাহা নানা দ্রব্যের মিশ্রণে নিষ্পাদিত হয় না।

নানা দ্রব্যের একত্র সংমিশ্রণে যে পানীয়ের সৃষ্টি, তাহাও আবার দুই প্রকার—দ্রাবিত (অর্থাৎ যাহা জলে গুলিয়া তৈয়ারী করা যায়) ও অদ্রাবিত (যাহা জলে গুলিতে হয় না)।

গুড়, তেঁতুল ইত্যাদি দ্রব্য জলে গুলিয়া তাহার সহিত দধি ও অন্যান্য উপাদান একত্র মিশাইয়া যে পেয় উৎপন্ন হয় তাহা দ্রাবিত পানীয়—উহারই নামান্তর—পানক (অর্থাৎ সরবত)।

৮ মূলে আছে 'মুদ্গাদিনির্য্যূহকৃতং'; নির্য্যূহ অর্থে সার, essence, যথা—মুগের বা মসুরির যূষ।

আর যে পানীয় জলে গুলিয়া তৈয়ারী হয় না, পক্ষান্তরে—যাহা অদ্রাবক ঔষধের সহিত তাল, কলা, লেবু ইত্যাদির সংযোগ করিয়া তৈয়ারী হয়, তাহা অদ্রাবিত পেয় বা 'রস'। এমন ঔষধ আছে, যাহার সহিত তাল, কলা,৯ ইক্ষু লেবু (জম্বীর) ইত্যাদি ফল মিশাইয়া রাখিয়া দিলে ঐ সকল ফলের রস আরকের আকারে নির্গত হইয়া থাকে। ঐ আরকই 'রস'-শব্দ-বাচ্য। উহা বর্ত্তমানে 'সিরকা' (বা 'ভিনিগার') নামেই প্রচলিত। উহার কিছু মাদকতা-শক্তি ও জীর্ণ করিবার শক্তি আছে।

পানক (সরবত) ও রস (ভিনিগার—সিরকা) মিশ্র পানীয়ের অন্তর্ভুক্ত। অমিশ্রিত পানীয়ের দৃষ্টান্ত—'আসব'। আসবের মাদকতা-শক্তি রসের অপেক্ষা অধিক। বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়গুলির বিজ্ঞাপনের বাহুল্যে আয়ুর্ব্বেদোক্ত দুইটি বিভিন্ন জাতীয় পানীয় ঔষধের নাম আমাদের বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে—আসব ও অরিষ্ট। কোন পদার্থ জলে ভিজাইয়া বকযন্ত্রাদির সাহায্যে চুয়াইয়া লইলে 'অরিষ্ট' প্রস্তুত হয়। উহাতেও মাদকতা-শক্তির অস্তিত্ব বর্ত্তমান। উহাতে অগ্নি-সম্পর্ক ঘটে—এ কারণে উহাকে ক্বাথ রসের অন্তর্গত বলা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত—আসব। উহাতে অগ্নি সম্পর্কের প্রয়োজন হয় না বা বকযন্ত্রাদি দ্বারা উহা চুয়াইয়া লইতেও হয় না। যে কোন একটি দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সহিত না মিশাইয়া জলে ভিজাইয়া কিছুদিন পচাইতে হয়। দীর্ঘদিন পচিলে উহার মধ্যে সুরাসার (alcohol) আপনি জন্মিয়া থাকে। তখন উহা ছাঁকিয়া লইলে যে ঈষৎ মাদকতা শক্তি-বিশিষ্ট অথচ পুষ্টিকর তরল অমিশ্র অনগ্নি-নিষ্পাদ্য পানীয় পাওয়া যায়, উহাই 'আসব'। দ্রব্য-বিশেষ অনুসারে, অথবা পচাইবার কালভেদ অনুযায়ী আসবের মাদকতা-শক্তিও তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে—মৃদু, মধ্য ও তীক্ষ্ণ। মৃদুর মাদকতা-শক্তি ও ঝাঁঝ কম, মধ্যের মাঝারি, ও তীক্ষ্ণের অত্যধিক।

'রাগ'-শব্দটির ব্যবহার-দ্বারা লেহ্য-পদার্থের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। লেহ্য রাগেরই একটি প্রকার ভেদ মাত্র। 'রাগ' বলিতে তিন প্রকার খাদ্য বুঝায়—(১) লেহ্য বা অবলেহ—যাহা চাটিয়া খাওয়া যায়—চাটনী, আচার, কাসুন্দী, মোরব্বা, জ্যাম্, জেলি ইত্যাদি জাতীয় পদার্থ; এ শ্রেণীর খাদ্য খুব কঠিনও নয়, খুব তরলও নয়—মাঝামাঝি নরম—অনেকটা কাদা-কাদা ভাব; (২) চূর্ণ—খুব কঠিন দ্রব্য হইলে উহাকে গুঁড়াইয়া চূর্ণ করিতে হয়; ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত 'গোটা'; (৩) দ্রব—লেহ্য যদি অতিরিক্ত তরল হয়, তবে তাহার নাম 'দ্রব' (পাতলা)। কচি আমের কাঁচা ঝোল, নানারূপ পাতলা অম্বল ইত্যাদি দ্রব শ্রেণীর অন্তর্গত১০।

৯ মূলে আছে—'মোচাফল'। 'মোচা বলিলে বুঝিতে হইবে কলা গাছ। মোচাফল = কলা। বাঙ্গালা ভাষায় অবশ্য মোচা = কলার ফুল মাত্র—পুরাপুরি কলাগাছটিকে বাঙ্গালায় 'মোচা' বলে না। সংস্কৃতে কলাগাছের নামও 'মোচা'।

১০ অবশ্য—ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে—এই সকল ঝোল বা অম্বল রাঁধা নহে—কাঁচা। রাঁধা হইলে সেগুলি পড়িবে যূষ

অবশ্য পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি হইতে একথা মনে করা অন্যায় হইবে যে, তিন শ্রেণীর রাগ-দ্রব্য কেবল অম্লাস্বাদ বা অম্লমধুর হইয়া থাকে। যশোধর বলিয়াছেন—রাগ-দ্রব্যের আস্বাদ অতি বিচিত্র। লবণাস্বাদ, অম্লাস্বাদ ও কটু আস্বাদ—এই তিন প্রকার আস্বাদই রাগদ্রব্যে প্রধানতঃ পাওয়া যায়। তবে রাগদ্রব্যে কষায়াস্বাদের যে একেবারেই অভাব—এমন কথাও বলা চলে না। কেবল তিক্তাস্বাদেরই ইহাতে অভাব। আর লবণ-অম্ল-কটু-কষায় যাহাই আস্বাদ হউক না কেন, ঈষৎ মধুরাস্বাদ প্রত্যেক রাগদ্রব্যেই জড়িত থাকে—ইহাই যশোধরের অভিমত।

'রাগ'-শব্দটির অর্থ—অনুরাগ, প্রীতি, রুচি, ভালবাসা, টান। খাদ্য-দ্রব্যে রুচি ফিরাইয়া আনে বলিয়াই এ জাতীয় খাদ্যের নাম 'রাগ-দ্রব্য'।

টীকাকার পরিশেষে বলিয়াছেন—মোটের উপর ২৩ ও ২৪ সংখ্যক কলা দুইটি একই মূল 'আস্বাদ্য-কলা'র অন্তর্ভুক্ত। আস্বাদ্য-কলার চতুর্ব্বিধ ভেদ—ভোজ্য, ভক্ষ্য, পেয় ও লেহ্য (রাগ)। শরীর যাহাতে সুস্থ থাকে ও পুষ্টিলাভ করে, তাহার নিমিত্ত আস্বাদ্য-কলার জ্ঞান ও প্রয়োগের একান্ত প্রয়োজন। আস্বাদ্য-কলাটিকে কর্ম্মভেদ (অর্থাৎ প্রক্রিয়াভেদ) অনুযায়ী দ্বিধা বিভক্ত করা চলে—(১) অগ্নিজ (অর্থাৎ পাকক্রিয়া-সাপেক্ষ আস্বাদ্য-বিধান) ও (২) অনগ্নিজ (অর্থাৎ পাকক্রিয়া ব্যতীত আস্বাদ্য-বিধান)। শাকাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, যূষ-শ্রেণীর পেয় ও মোদকাদি ভক্ষ্য প্রস্তুত করা পাক-ক্রিয়া-সাপেক্ষ। আর পানক-রস-আসব-শ্রেণীর পেয় ও রাগ (লেহ্য) প্রস্তুতকরণ পাকক্রিয়া-নিরপেক্ষ। প্রথম শ্রেণীর নাম দেওয়া চলে—'রন্ধন-কলা'। ভাত, তরকারি, ঝোল, পাচন, পিঠে ইত্যাদি। রাঁধিবার কৌশল রন্ধন-কলার অন্তর্ভুক্ত। ইহারই কামসূত্রোক্ত নাম বিচিত্র-শাক-যূষ-ভক্ষ্য-বিকার-ক্রিয়া'। আর দ্বিতীয়টি 'অরন্ধন-কলা।' না রাঁধিয়া সরবত, সিরকা, চাট্‌নী, আচার, গোটা, ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার কৌশল এই অরন্ধন-কলার অন্তর্গত। কামসূত্রে ইহার নাম—'পানক-রস-রাগাসব-যোজন'।

মোটের উপর এক কথায় এই দ্বিধা বিভক্ত আস্বাদ্য-কলাই গার্হস্থ্য-কলা-সমূহের শীর্ষস্থানীয়।

৺মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণে বলা হইয়াছে—"সুতরাং কর্ম্ম-ভেদে আস্বাদ্যবিধানজ্ঞও (?) দ্বিবিধ। তদনুসারে একই কলা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ভক্ষ্য ও ভোজ্য প্রথমভাগে এবং লেহ্য-পেয় দ্বিতীয় ভাগে কথিত হইয়াছে। অন্যথা পরস্পর মিলিত হইয়া একটা গণ্ডগোল হইবার সম্ভাবনা ছিল" (পৃঃ ৯২)।

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে প্রথমভাগে কেবল ভক্ষ্য ও ভোজ্যের কথা বলা হয় নাই পাকনিষ্পন্ন পেয়ের কথাও বলা হইয়াছে। কথাও বলা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় ভাগে কেবল অপক্ক পেয়-সমূহ ও লেহ্যাদি ত্রিবিধ রাগ-দ্রব্যের বিবরণ আছে। দ্বিতীয়তঃ, এই দুইটি কলা 'পরস্পর লিখিত হইয়া একটা গণ্ডগোল হইবার সম্ভাবনা' কোথায়? গণ্ডগোল কিছুই হইত না—তবে সে অবস্থায় দুইটি পৃথক্ পৃথক্ কলার নাম না দিয়া একটি মাত্র নাম দিতে হইত—'আস্বাদ্য-কলা' বা 'আস্বাদ্য-বিধান'। বস্তুতঃ, কলা একটিই আস্বাদ্যবিধি। কর্ম্মভেদে ঐ একটিই কলার দ্বিধা বিভাগ করিয়া দুইটি নামে পৃথক্ পৃথক্ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—ইহাই টীকাকারের আশয়।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"টীকাকার বলেন, ইহা নামতঃ ভিন্ন হইলেও একই কলা; সর্ব্ববিধ পানাহার প্রস্তুতের উপদেশ এই কলাতে আছে। কিন্তু একই কলা দুইভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগ—ব্যঞ্জন (শাক), ঝোল (যূষ), মিষ্টান্ন, অন্ন, পিষ্টকাদি (ভক্ষ্য-বিকার) প্রস্তুত বিষয়ে এবং দ্বিতীয় ভাগ, সরবৎ (পানক), সির্কা (রস), চাট্‌নি (রাগ) এবং বিবিধ সুস্বাদু আসব প্রভৃতি প্রস্তুত বিষয়ের উপদেশে পূর্ণ। এক প্রকার পানাহার পাক-সাপেক্ষ, অন্যপ্রকার পাক-নিরপেক্ষ, এই কারণে পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ হইয়াছে"।

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয় নাম দিয়াছেন—"চিত্রভক্ষ্যক্রিয়া আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করণ"। কিন্তু কি জাতীয় খাদ্য তাহা স্পষ্টভাবে বলেন নাই। দ্বিতীয় কলাটিরও নাম তাঁহার মতে—"পানকরসযোগ—মদ্য, নানাপ্রকার সরবৎ ও আচার মোরব্বা প্রভৃতি প্রস্তুত করণ"।

৺সমাজপতি মহাশয় নামকরণ ও ব্যাখ্যায় ৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুগামী—"চিত্রভক্ষ্য-ক্রিয়া;—চমৎকার ও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী, ময়রার কাজ। পানকরস-যোগ; আম্র প্রভৃতি ফলের আচার ও সুরা প্রভৃতি পানীয় রসের প্রস্তুত প্রণালী"।

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—প্রথমটি "নানাপ্রকার শাকব্যঞ্জন প্রস্তুত ক্রিয়া (সুপশাস্ত্র)"। আর দ্বিতীয়টি—"সরবৎ, পেয় প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য্য। জয়মঙ্গলা-টীকায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে"।[১১]

[ক্রমশঃ

শ্রেণীর মধ্যে। আবার কাঁচার মধ্যেও এই 'দ্রব' দ্রব্য অন্য দ্রব্যান্তরের মিশ্রণে প্রস্তুত হইবে না। কারণ, নানাদ্রব্য একত্র মিশাইয়া জলে গুলিয়া যাহা প্রস্তুত হয়, তাহা পানক-শ্রেণীর পেয়ের অন্তর্গত। কাঁচা আম ইত্যাদি থেঁতো করিয়া উহার কাঁচা রস বাহির করিয়া তাহাই পাত্‌লা চাট্‌নীর মত ব্যবহৃত হইলে উহাকে, দ্রব রাগ-দ্রব্যের দৃষ্টান্ত বলা চলে। এই শ্রেণীর যে পাত্‌লা অম্বল ইত্যাদি, তাহাও রাঁধা নহে, কাঁচা—ইহাই বুঝিতে হইবে।

১১ কাঃ সূঃ, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬৫; শিঃ পুঃ, পৃঃ ৭; কল্কিপুরাণ, পৃঃ ২৪; কৌমুদী, পৃঃ ২৯—৩০।

সৃষ্টিরহস্য (একাঙ্ক নাটিকা)

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ দাস, এম-এ, বি-এল,
পি এইচ-ডি

পাত্রপাত্রীগণ—কবি, কবি-পত্নী ও চারজন ভূত।
দৃশ্য—কবির লিখিবার ঘর। সময়—রাত্রি।

বর্ষাকাল। নদীর বেঁকের মুখে বাড়ী। চারিদিকে জল। জায়গায় জায়গায় জল ভেদ করিয়া মাটী দেখা যাইতেছে। কবির ঘরখানি নানারূপ আসবাবে পূর্ণ। একই ঘরের মধ্যে সুন্দর ও কুৎসিতের এরূপ মিলন সচরাচর দেখা যায় না। ঘরের এক কোণে একটা কর্ণারপিসের (corner piece) উপর Epstien-র Madouna and Child-র অনুকরণে নির্ম্মিত সিমেণ্ট জমান একটী ছোট মূর্ত্তি। এ পর্য্যন্ত যত মাতৃমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বোধ হয় এই মাতৃমূর্ত্তিটীই সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত। আর এককোণে কড়িকাঠের কাছে একটী মাকড়সা জাল বুনিতেছে। ঘরটী আগাগোড়া সুন্দর কার্পেটে মোড়া; এক পাশে খানকয়েক চেয়ার, কিন্তু কোনটীই পূর্ণাঙ্গ নহে। দেওয়ালে সুন্দর একটী ঘড়ী বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। খোলা জানলার সামনে একটী টেবিল। টেবিলের উপর একটী টেবিল-ল্যাম্প জ্বলিতেছে। কবি টেবিলের নিকট চেয়ারে বসিয়া তাহার মহাকাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড লিখিতে ব্যস্ত। কবির চেহারাটা এমন, যে, ঠিক বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু দেখিলে খানিকটা উপলব্ধি হয়।

(কবিপত্নীর প্রবেশ)

কবি-পত্নী। অনেক রাত হোয়েছে—শোবে চল।

কবি। (প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে) রাত, রাত হোয়েছে! কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি কবি, আমি স্রষ্টা, আমি সত্যদ্রষ্টা, আমার কাছে রাতদিন সবাই সমান, কালের গতি এখানে প্রতিহত।

কবি-পত্নী। আচ্ছা, রাত হোয়েছে, আর বোলব না রাত হোয়েছে, কিন্তু সেই কখন থেকে বোসে বোসে কি লিখছ, এখন একটু বিশ্রাম করবে চলো।

কবি। আমার আবার বিশ্রাম। সৃষ্টিকার্য্য এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বন্ধ থাকতে পারে না। আমার কলম যখন বন্ধ থাকে তখনও সৃষ্টিকার্য্য চলে কিন্তু তখন সেটা হয় মনে। সৃষ্টির প্রধান কাজই ত মন।

কবি-পত্নী। হেঁয়ালি রাখ, দেখ যতক্ষণ না তুমি শুতে যাবে ততক্ষণ আমি এখান থেকে নড়ছি না, এই আমি বসলুম।

(চেয়ারে বসিতে উদ্যত)

কবি। না, না, তা হোতেই পারে না। যখন আমি কবি, আমি স্রষ্টা, তখন আমি একা, নিঃসঙ্গ, একম্ এব অদ্বিতীয়ম্। লক্ষ্মীটী তুমি যাও, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

কবি-পত্নী। আচ্ছা, দেখ বেশী দেরী কোর না।

(কবি-পত্নীর প্রস্থান)

কবি। (স্বগত) কিন্তু এ কি সৃষ্টিকার্য্য ছেড়েও ত যেতে পারছি না, নিজের সৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি না কি? না না, তা হোতেই পারে না; সৃষ্টি আমারই, সৃষ্টির মধ্যে আমি আছি আবার সৃষ্টির অতীতও আমি। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলি যদি সত্য সত্যই তাদের বক্তব্য এসে বলতে পারত—তাহলে, (হঠাৎ আলো নিবিয়া গেল, চারিদিক অন্ধকার, একজন শীর্ণকায় মলিন ও ছিন্ন বেশ পরিহিত ভূতের প্রবেশ।)

কবি। আলো fuse হয়ে গেল বোধ হয়—

(আলো জ্বলিয়া উঠিল)

(ভূতের দিকে চাহিয়া) কে? কে তুমি?

প্রথম ভূত। কেন চিনতে পারছেন না, আপনিই ত আমায় সৃষ্টি করেছেন, এই মাত্র যে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন, আমার বক্তব্য শুনতে চাইছিলেন।

কবি। ও তুমি, তোমার এরকম অবস্থা হয়েছে।

প্রথম ভূত। সে ত আপনিই করেছেন, আপনি আমায় উচ্চাশা দিয়াছেন কিন্তু তা পূরণ করবার উপায় দেন নাই, দারিদ্র্য দিয়াছেন কিন্তু দারিদ্র্য দূর করতে হোলে যে রকম মনোবৃত্তি নিয়ে অসঙ্কোচে অন্যায় করতে হয়, সে রকম মনোবৃত্তি আমায় দেন নাই। অধিকন্তু যৌবনেই আমার স্বাস্থ্য কেড়ে নিয়েছেন—কেন আপনি আমায় এরকম করে কষ্ট দিচ্ছেন?

কবি। আমি কষ্ট দিচ্ছি? না, না, তোমার কাজের জন্য তুমিই কষ্ট পাচ্ছ।

প্রথম ভূত। আমার কাজ, আমি কি অন্যায় করেছি বলুন। আমার এ অবস্থার উপরও অপরকে ঠকিয়ে পয়সা করতে আমার বাধে! অপরের কষ্টে এখনও আমি কষ্ট অনুভব করি। তবুও আপনি বলবেন, আমি আমার কর্ম্মফল ভোগ করছি।

কবি। তুমি ভুলে যাচ্ছ, যে, এটা আমার কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড। এর আগেকার খণ্ডে তুমি কি রকম জীবন যাপন করেছ তা তুমি ভুলে যেও না—তারই ফল এখন তোমায় ভোগ করতে হচ্ছে।

প্রথম ভূত। আমি করেছি, না, আপনি আমায় করিয়েছেন। প্রথম খণ্ডে আপনি আমায় উচ্ছৃঙ্খল বদমাইসভাবে কল্পনা করলেন আর এখন বলছেন আমি আমার কর্ম্মফল ভোগ করছি। কেন আপনি আমায় এ রকম করে সৃষ্টি করলেন?

কবি। না কোরে উপায় ছিল না, তোমায় না করলে আর একজনকে ঠিক এই রকম কোরে সৃষ্টি করতে হোত।

প্রথম ভূত। কেনই বা তা কোরতে হোত। এ-রকমভাবে দুঃখ না দিয়ে কি আপনি সৃষ্টি করতে পারেন না?

কবি। কাব্যের বৈচিত্র্য রক্ষা করবার জন্য সুখ দুঃখ দু'য়েরই প্রয়োজন। এই জন্য আমার সৃষ্টির মধ্যে, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, সুন্দর ও কুৎসিত এমন পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। দুঃখকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি করলে সৃষ্টি হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে, বিস্বাদ।

প্রথম ভূত। (মিনতির সুরে) দোহাই আপনার, আমি আপনার পায়ে পড়ি, দুঃখ দিতে হয় আর কারুকে দিন, আমায় একটু সুখ একটু শান্তি দিন। আমি আর পারছি না।

কবি। সবাই ঐ কথাই বলে, তাদের দুঃখ আমায় জানায়,

সুখ ও শান্তি চায়, কিন্তু আমার এই কাব্য থেকে ত' দুঃখকে, অশান্তিকে বাদ দেওয়া যায় না, তাই তাদের প্রার্থনা নিষ্ফল হয়।

প্রথম ভূত। আমি তাদের কথা, সবাইয়ের কথা বলছি না, আমি আমার কথাই বলছি, আমাকে বাঁচান, আমায় একটু সুখ, একটু শান্তি দিন। আপনি ইচ্ছা করলে কি না হোতে পারে, আপনার ইচ্ছায় অসম্ভব সম্ভব হোতে পারে, আবার সম্ভবও অসম্ভব হোতে পারে।

কবি। হোতে পারে কিন্তু হয় না। যদি মাঝে মাঝে অসম্ভব সম্ভব হোতে থাকে ও সম্ভব অসম্ভব হোতে থাকে তা'হলে সৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট হোয়ে যায়। সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করবার জন্য আমি কতকগুলি নিয়ম বা বিধান মেনে চলি, সে-বিধানগুলি যথাযথ, তাহা এলোমেলো নয় ও তাহা শাশ্বত কালের। যথাতথ্যতো'র্থান ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

প্রথম ভূত। তা'হলে আপনিও আপনার নিয়মের মধ্যে, বিধানের মধ্যে বদ্ধ।

কবি। বদ্ধ নই কিন্তু স্বেচ্ছায় মেনে চলি, যেমন তোমার দুটো হাত আছে, খাবার সময় যে কোন হাতটা তুমি ব্যবহার করতে পার, কিন্তু তা কি তুমি কর ?

প্রথম ভূত। বুঝলাম, কিন্তু এ-রকম সৃষ্টি করে আপনার লাভ কি ?

কবি। আনন্দ, আনন্দ ভিন্ন সৃষ্টি হয় না। এক আমি বহুরূপে নিজেকে ভোগ করতে চাই, তাই আমি নিজেকে রাজা, উজীর, ধনী, নির্ধন, সুখী, দুঃখী, পাপী, পুণ্যবান এইরূপ নানা ভাবে কল্পনা করেছি ও তাদের সবাইকে আমার কাব্যে স্থান দিয়েছি।

প্রথম ভূত। আপনাকে আনন্দ দেবার জন্য আমি কেন কষ্টভোগ করব—না, না, আমি কখনই কষ্টভোগ করব না, আমি বিদ্রোহ করব।

কবি। বিদ্রোহ করবে, তোমার সে শক্তি কোথায় ? ভুলে যেও না আমার শক্তিতেই তোমার শক্তি, আমার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা।

প্রথম ভূত। (কবির কথা কাণে না তুলিয়া উত্তেজিতভাবে) আপনার এ সৃষ্টি আমরা ধ্বংস করব, আমরা বিদ্রোহ করব।

কবি। আমরা কারা ?

প্রথম ভূত। আপনি যাদের সৃষ্টি করেছেন।

কবি। তারাও কি তোমার সঙ্গে বিদ্রোহ করবে না কি ? না, না, তা কখনই হোতে পারে না। আচ্ছা ডাক তাদের।

(প্রথম ভূতের প্রস্থান ও আর তিনজন ভূতকে সঙ্গে করিয়া প্রবেশ—একজন গৈরিক বসন পরিহিত, একজনের গলায় কণ্ঠী ও হাতে খঞ্জরী ও আর একজনের পোষাক সাধারণ কৃষকের ন্যায়)

গৈরিক বসন পরিহিত ভূত কবিকে দেখিয়া—শঙ্কাহরণ শঙ্কর—

খঞ্জরী হাতে ভূত কবিকে দেখিয়া—এ যে আমার বনমালী।

কবি। আমাকে অনেকে অনেক নামে ডাকে কিন্তু আমার আসল পরিচয়, আমি কবি, আমি স্রষ্টা, আমি সত্যদ্রষ্টা।

প্রথম ভূত। আপনার সৃষ্টি আমরা ধ্বংস করব। কেন আপনার সৃষ্টির খাতিরে আমরা দুঃখভোগ করব ! তোমরা কি বল ?

গৈরিক বসন পরিহিত ভূত—তোমার দুঃখ তোমারই কর্ম্মফল, তোমাকেই তা দূর করতে হবে। আমরা কি করব ?

খঞ্জনীহাতে ভূত। দুঃখ কি অমনি দূর হবে, ডাক, নাম কর, তবে তো দুঃখ দূর হবে।

কৃষকবেশী ভূত। আরে ক্ষেপে গেছ নাকি, সৃষ্টি ধ্বংস করব এও কি একটা কাজের কথা, সংসারে এসেছিস দুঃখ ভোগ করবি নি, সহ্য কর, নিজের ভাগ্যকে মেনে নে।

কবি। (প্রথম ভূতের প্রতি) দেখছো, এরা কেউ তোমার সঙ্গে বিদ্রোহ করবে না।

প্রথম ভূত। তাইতো দেখছি, কিন্তু কেন যে ওরা আপনার এই সৃষ্টিকে বজায় রাখতে চায়, একে এত ভালবাসে, তা আমি বুঝতে পারি নি।

কবি। সেও আমার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছাতেই ওরা এই সৃষ্টিকে বজায় রাখতে চায়, আর তুমি এই সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে চাও।

প্রথম ভূত। (নিরাশভাবে) বুঝলাম আপনার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হবে না। কিন্তু কখন আপনি আপনার এই সৃষ্টি ইচ্ছা করে শেষ করবেন তা জানতে পারি কি ?

কবি। সৃষ্টির ত শেষ নেই, আরম্ভও নেই, আদিও নেই অন্তও নেই।

প্রথম ভূত। তা হলে আপনার এ কাব্যের শেষ নেই ?

কবি। কাব্যের শেষ আছে কিন্তু সৃষ্টির শেষ নেই। এই কাব্য শেষ হয়ে গেলে, অন্য কাব্য লেখা আরম্ভ হবে। যেমন এর আগে অতিকায় জীবদের কাব্য শেষ হয়ে গেছে তবু আমার কলম বন্ধ হয়নি। (পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া) অনেক রাত হয়ে গেল, তাছাড়া এ সব নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই ; এখন তোমরা তা হলে এস।

কৃষকবেশী ভূত। মাথা ঘামিয়ে লাভ ত নেই, উল্টে লোকসান, মাথা গুলিয়ে যায়।

প্রথম ভূত। আপনি যখন আমাদের যেতে বলছেন তখন যেতেই হবে, তবে আমাকে একটু দয়া করবেন ; (অন্য ভূতদের প্রতি) চল, ভাই।

অন্যান্য ভূতেরা। (যাইতে যাইতে) আমাদেরও একটু দয়া করবেন। (সকল ভূতের প্রস্থান)

যবনিকা পতন

কাচিনদের দেশ*

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

কাচিনদের দেশে পরিভ্রমণের সময় নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। এই সময় নানা জাতীয় বানরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সকল বানরের ভিতর 'কৃষ্ণকায় হুলক' শ্রেণীর বানরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। সকালে ও সন্ধ্যায় হুলক বানরদের বিচিত্র চীৎকারে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠে। একটি বা দুইটি নয়, একসঙ্গে একটি দল উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে। ইহাদের চীৎকার কতকটা কুকুরের বাচ্চাদের কণ্ঠনাদের অনুরূপ। একশত সারমেয়-শাবক একত্র শব্দ করিলে যেরূপ আওয়াজ জন্মিবে হুলক জাতীয় শাখামৃগ-গণের এক একটি দলের কণ্ঠ হইতে অনেকটা সেইরূপ শব্দ নির্গত হয়। আশঙ্কার কারণ থাকিলে সঙ্গিগণকে বা স্বজাতি-বর্গকে সাবধান করিবার জন্য ইহারা আর এক প্রকার শব্দ করে। এই শব্দ কতকটা মানুষের কাসির শব্দের মত। অধি-কাংশ ক্ষেত্রেই হুলক বানরদের চীৎকারই শুনা যায়, উহাদিগকে দেখা যায় না। অরণ্যগুলি এরূপ নিবিড়, বৃক্ষশ্রেণী এরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট, বৃক্ষবর্গের সহিত ব্রততীরা এরূপ গাঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ এবং প্রকাণ্ডকায় পাদপদল এরূপ প্রচুর পত্রপুষ্পে পরিপূর্ণ যে শাখাস্থ বানরগণ প্রায়ই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। পশুপক্ষীর কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণের জন্য এইরূপ সুগভীর অরণ্যানীর অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিবার সাহসও সকলের হয় না। উদ্ভিদরহস্য ও প্রাণিতত্ত্ব জানিবার প্রবল কৌতূহল আমাদিগকে সময়ে সময়ে বিপদকে উপেক্ষা করিয়া এই সকল শ্বাপদসঙ্কুল পথহারা অরণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। অবশ্য সেই সাহসের জন্য আমাদিগকে কোন দিন অনুতপ্ত হইতে হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা চৈত্রমাস পর্য্যন্ত এই প্রদেশে ছিলাম। ফাল্গুন ও চৈত্রমাস হইতে এই দেশে প্রায় প্রবল ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি দুর্য্যোগ দেখা যায়। এই গভীর গহনাবৃত গিরিশ্রেণীর দেশে বজ্র-গর্জ্জনের সঙ্গে ঝঞ্ঝার তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে দেখিতে আমাদের মনে বিচিত্র ভাবধারা সঞ্চারিত হইয়াছিল। চারিদিকে সবুজ শোভায় সমৃদ্ধ নিবিড় অরণ্য এবং ধূম্রধূসর শৈলমালা, বারবার গুরুগম্ভীর বজ্রনাদের সহিত মেঘ-মেদুর আকাশ হইতে অবিশ্রান্ত ধারাপাত অন্তর-তন্ত্রীতে একপ্রকার ভাষাতীত ভাবের ঝঙ্কার জাগাইয়া তুলা স্বাভাবিক। পাহাড়ের উপর অবস্থিত স্টেজিং বাংলোর বারান্দায় বসিয়া পুরোভাগে প্রসারিত পার্ব্বত্য প্রকৃতির ধারাসিক্ত উদাস মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আমাদের কল্পনাপ্রবণ মন উধাও হইত সেই অপরূপ রূপকথার দেশে, যেখানে কঠোর কর্ম্মের কোন স্থান নাই, আছে শুধু গল্প আর গান। এই জঙ্গলের দেশে জল অর্থাৎ বৃষ্টি হইলে জোঁকের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। জুতা ও মোজায় পদদ্বয় আচ্ছাদিত থাকিলে জোঁকের দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা কম বটে; কিন্তু কোথাও বসিলে বস্ত্রের ভিতর এই রক্তশোষক জীবটি প্রবেশ করা আদৌ অসম্ভব নয়। আমাদের কাচিন অনুচরদিগকে জোঁকের জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইত। ইহারা শরীরের সংলগ্ন হইয়া মানুষের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে এরূপ ভাবে শোণিত শোষণ করিয়া লয় যে, ইহাদের জন্য সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকা খুবই স্বাভাবিক। যথাপরিমাণ শোণিত শোষণের পর যখন ইহাদের শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় আসে, তখনই ইহাদের বিদ্যমানতার কথা মানুষ জানিতে পারে।

সেদিনের কথা বেশ মনে আছে। ফুঙ্গিন হকা নামক নদীর উপত্যকার উপর দিয়া আমরা অশ্বতর-পৃষ্ঠে চলিয়াছি। বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পথ অতিশয় পিচ্ছিল; গিরিশ্রেণীর তুঙ্গ অঙ্গে যাহারা অনায়াসে আরোহণ করিতে পারে সেই অশ্বতরগণের পক্ষে স্খলিতপদ হইয়া পতিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক না হইলেও পথের অত্যন্ত পিচ্ছিলতা তাহাদের পক্ষেও পদে পদে অসুবিধার কারণ হইতেছে। ঠিক যেন সাবান গুলিয়া পথের উপর ঢালিয়া দিয়াছে। অশ্ব ও গর্দ্দভের সম্মেলনে সম্ভূত অশ্বতর নামক এই ভারবাহী প্রাণীগুলির বহন ও সহন শক্তি সত্য সত্যই বিস্ময়কর। পার্ব্বত্য পথ-পরিভ্রমণে ইহারা অপরিহার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিমাদ্রির দুর্গমতম অংশেও ইহারাই ভ্রমণকারীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার জন্য পার্ব্বত্য প্রবাহিনীগুলি পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। জলের তলদেশে অসংখ্য শিলাখণ্ড বিরাজিত বলিয়া অশ্বতরদিগের পক্ষে পদক্ষেপ অত্যন্ত অসুবিধাজনক; কিন্তু এমনই সহিষ্ণু ও সতর্ক এই প্রাণী যে কখনও স্খলিতপদ হইয়া ইহারা পড়িয়া যায় না।

নদীতীরে কাচিন পল্লী। নদী হইতে পিচ্ছিল পথে পল্লীতে উঠিতে এইরূপ প্রাণীর পক্ষেও একান্ত কষ্ট হইতে লাগিল। আবার প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল। আবার বজ্র গর্জ্জিতে লাগিল, ঝঞ্ঝা তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল। বার বার ব্যর্থকাম হইয়াও

তিনজন মারু-কাচিন মোট পিঠে লইয়া পথে চলিয়াছে; পশ্চাতে বেণুনির্ম্মিত কুটীর

* ভাদ্র সংখ্যার পর।

অশ্বতরগণ অধ্যবসায় ত্যাগ করিল না, তাহারা অবশেষে নদীর উচ্চ তটদেশে উঠিতে সমর্থ হইল। সেই সুযোগের ভিতর আমরা কাচিনপল্লীর প্রধান ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সলিলসিক্ত বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের পর কাচিন সর্দ্দারের দরবারে আমাদের অভ্যর্থনা আরম্ভ হইল। এই সর্দ্দারটি কিঞ্চিৎ শিক্ষিত ব্যক্তি। বর্ম্মীজ ভাষা ব্যতিরেকে যৎকিঞ্চিৎ ইংরেজীও তাঁহার জানা ছিল। তিনি মিয়িৎকিয়িনার স্কুলে পড়িয়াছিলেন। বয়স বেশী নয়। চায়ের সকল রকম সৌখীন সরঞ্জাম তাঁহার ছিল। জলে ভিজিবার পর গরম চা আমাদের পক্ষে দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় হইল বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। এই কাচিন-সর্দ্দারটির ধারণা দক্ষিণ চীন কাচিন জাতির প্রাচীন বাসস্থল। ইঁহার মতে চৈনিক সংস্কৃতি হইতে কাচিন সংস্কৃতির জন্ম। তিনি আমাদিগকে সগর্ব্বে জানাইয়াছিলেন—নাং লিস্থ ও লাকদের মত আমরা সভ্যতা লোকশূন্য সম্প্রদায় নই, কাচিনরা অতি প্রাচীন জাতি, উৎকৃষ্ট না হউক কাচিনকৃষ্টি উপেক্ষণীয় নয়। প্রবল বর্ষার জন্য সর্দ্দার

নৃত্যরত কাচিন তরুণদল

আমাদিগকে দুইদিন তাঁহার গৃহ হইতে যাইতে দিলেন না। এই তরুণ কাচিন সর্দ্দারের ভদ্রতা আমরা কখনও ভুলিব না। এই দেশের কোনও দলপতির নিকট আমরা এরূপ উদার ভদ্র ব্যবহার পাই নাই।

দুইদিন পরে আমরা যখন যাত্রা করিলাম, তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার, কিন্তু বিকালের দিকে আবার বারিপাত আরম্ভ হইল। এবার আমরা বস্ত্রাবাস বিস্তৃত করিয়া তথায় রাত্রিযাপন করিলাম। আমরা যাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম, সেই সুহৃদগণ সার্ভে বিভাগের কর্ম্মচারী—তাহা বলা হইয়াছে। সার্ভে বিভাগের অফিসারদিগকে সর্ব্বদা সদলে ভ্রমণ করিতে হয় বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ক্যাম্প বা বস্ত্রাবাস প্রস্তুত করিবার সকল প্রকার সরঞ্জাম থাকে। এই সকল তাঁবু উৎকৃষ্ট ওয়াটারপ্রুফ বস্ত্রে প্রস্তুত। এই অঞ্চলটা কেবল জঙ্গল বলিয়া কাহারও গৃহে আতিথ্য স্বীকার ও আশ্রয়-লাভের সম্ভাবনা ছিল না। সঙ্গতিশালী সর্দ্দার ভিন্ন সাধারণ কোন লোকের পক্ষে আমাদিগকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়। ইহার কারণ, আমাদের দলটি বিশেষ বৃহৎ না হউক, বহু ব্যক্তির দ্বারা গঠিত এবং অশ্বতরসমূহের সংখ্যাও স্বল্প নহে। গৃহ বিশেষ বৃহৎ না হইলে আমাদের সকলকে স্থান দেওয়া কোন কাচিন গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমাদের শিবির হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে এক চীনার দোকান ছিল। সেই দোকান হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি কিনিয়া আনা হইল। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন চীনা অশ্বতর-চালক ছিল। চালকের কাজ চীনারাই করে। আমাদের বাহন ও ভারবাহী উভয় প্রকার অশ্বতরই চীনের য়ুনান প্রদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে আনীত। চালকরাও য়ুনানী বা দক্ষিণ চীনের লোক। প্রবল বর্ষাবাদলের জন্য আমরা তিনদিন তাঁবুতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। চীনা দোকানীটির দ্বারা একদিন আমাদের চৈনিক অনুচরবর্গ ও অশ্বতর-চালকগণ আমন্ত্রিত হইল। শুনিলাম, ভোজ্য পদার্থসমূহের ভিতর সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল চীনাদের পরমপ্রিয় শূকরমাংস। কাচিনরাও প্রায় সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর মাংসই খাইয়া থাকে। কুক্কুরমাংস ভক্ষণে যাহাদের কণা মাত্র কুণ্ঠা নাই, তাহাদের নিকট কোন মাংস ন্যক্কারজনক অনুভূত হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা পূর্ব্বে যে তরুণ কাচিন সর্দ্দারের কথা বলিয়াছি, তিনি তাঁহার রাজ্য বা জমিদারীর ভিতর কুক্কুরমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ব্যাপার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। নিজেও মাছ, মুরগী ও ছাগ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর মাংস খাইতেন না।

এই স্থান হইতে আমাদের একটি দল কার্য্যানুরোধে মিয়িৎ-কিয়িনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল, আমরা কয়েকজন খাস কাচিনদের দেশ দর্শনের জন্য আরও উত্তরে অগ্রসর হইলাম। প্রবলতর বর্ষা আমাদের বিশেষ অসুবিধা ঘটাইলেও নানাপ্রকার অজানা ব্যাপার জানিবার প্রবল কৌতূহল আমাদিগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিল। আমরা পূর্ব্বে তিন শ্রেণীর কাচিনের নাম উল্লেখ করিয়াছি—কাথা কাচিন, মারু কাচিন ও খাকু কাচিন। ইহাদের মধ্যে কাথা বা দক্ষিণী কাচিনরা সভ্যজগতের সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক সম্পর্কের জন্য কিঞ্চিৎ সভ্যতালোক প্রাপ্ত বলা চলে। মারুরাও নিতান্ত অসভ্য নয়। এক প্রকার সংস্কৃতি তাহাদেরও রহিয়াছে। সর্ব্বোত্তর প্রদেশের অধিবাসী খাকু কাচিনদের ভিতর আমরা সভ্যতার বিশেষ কোন নিদর্শন দেখিতে পাই নাই। তবে তাহারাও ক্রমশঃ সভ্যজগতের সহিত পরিচিত হইতে প্রয়াস করিতেছে, এই সত্য সংশয়াতীত। খাকু কাচিনদের দেশ দুর্গমতম প্রদেশে অবস্থিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিঞ্চিৎ দূরেই চীনের সীমান্ত। এই অঞ্চল স্বল্পদিন হইল বৃটিশ শাসনাধীন হইয়াছে। সীমারেখা লইয়া চৈনিক সরকারের সহিত বৃটিশ সরকারের বাগ্‌বিতণ্ডা বহুদিন চলিয়াছে। অবশেষে সামরিক ও সার্ভে বিভাগের সাহায্যে স্থায়ী সীমা নির্দ্ধারণ সম্পাদিত হওয়ায় সেই বিতণ্ডার অবসান ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে সুযোগ পাইলেই চীনা সরকার এই দুর্গম ও অজ্ঞাত সীমান্ত-প্রদেশের অংশ-বিশেষ য়ুনানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে বিলম্ব করেন নাই। পুনঃ পুনঃ এইরূপ হওয়ার পর জরিপ বিভাগের কর্ম্মচারীরা সহস্র অসুবিধা সহিয়া ও কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বৃটিশ অধিকারভুক্ত কাচিনদের দেশের সীমারেখা স্থায়ী ভাবে স্থির করিয়াছেন। আমাদের বন্ধু সার্ভেবিভাগের অফিসারদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলেন, যাঁহারা সীমা নির্দ্ধারণে সরকারকে সে

সময় সহায়তা করিয়াছিলেন। কাচিনদের দেশ, বিশেষতঃ খাকু কাচিনদের দেশ জরিপ করিয়া যাঁহারা বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইউ পে নামক বর্ম্মীজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার একটি অতি প্রশংসনীয় কীর্ত্তি খাকু কাচিনদের মধ্যে প্রচলিত দাস ক্রয় বিক্রয় প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য প্রাণপণ প্রযত্ন করা। যেমন লোকে গরু, ছাগল বিক্রয় করে এবং বিক্রীত পশুর উপর ক্রেতার সর্ব্বপ্রকার অধিকার স্থায়ীভাবে জন্মিয়া যায়, তেমনই ক্রীতদাসের উপরেও ক্রেতা কাচিনের সর্ব্বস্বত্ব জন্মিত। প্রধানতঃ 'ইউ পে'র চেষ্টায় এই অতি ঘৃণ্য প্রথা উঠিয়া যায় বলিলে অন্যায় হয় না। ইউ পে সরকারের নিকট হইতে কে, সি, এম, উপাধি লাভ করেন। ইহাই বর্ম্মার সর্ব্বোচ্চ সম্মানজনক উপাধি। উপাধিটির সংক্ষিপ্তসার কে, সি, এম। 'কিয়েং-আয়ে ক্ষায়ু-শয়ে-শালেয়ে-ইয়া-মিন' ইহাই উহার পূর্ণরূপ।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যখন এই শাসন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন খাকু কাচিনরা জালের সাহায্যে মাছ ধরিতে জানিত না। এখন তাহারা এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই প্রদেশের নদ-নদীতে প্রচুর মাছ আছে। আমাদের সঙ্গিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নিকট মৎস্য ধরিবার নানাপ্রকার সরঞ্জাম ছিল। ইঁহারা সুযোগ পাইবামাত্র মাছ ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িতেন। সঙ্গিগণের মধ্যে সুদক্ষ শিকারীও ছিলেন। ইঁহারা বন্দুকের সাহায্যে আরণ্য পশুপক্ষী শিকার করিয়া আনিয়া আমাদের আহার্য্যের ভিতর যে রুচিকর বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেন, নিরামিষাশী আমি সেই বৈচিত্র্য হইতে বঞ্চিত ছিলাম।

আমাদের ৪৬ দলটি মিসিংকিয়ানা হইয়া মালিহক চলিয়া যাওয়ার পর আমরা পর্ব্বতবন্ধুর খাকু কাচিনদের দেশের অভ্যন্তর ভাগে অগ্রসর হইলাম। চারিদিকে শুধু চড়াই ও উৎরাই। এই চড়াই পথে আরোহণ করা অশ্বতরদিগের পক্ষেও কষ্টকর হইল; বিশেষতঃ যাহারা গুরুভার বহন করিয়া আরোহণ করিতেছে। কয়েকবার ব্যর্থকাম হইবার পর প্রত্যেক অশ্বতরই আরোহণে সমর্থ হইল। কয়েকদিন ভ্রমণের পর আমরা অবশেষে সেই সঙ্কীর্ণ শৈলসানুতে পৌঁছিলাম, মালিহকা চঞ্চলা বালিকার ন্যায় (জন্মলাভের কিয়ৎকাল পরেই) যথায় নাচিতে নাচিতে নীচে নামিয়া আসিতেছে। দুইদিকে অম্বরচুম্বী গুরুগম্ভীর গিরিশ্রেণী প্রকাণ্ড প্রাকারের ন্যায় দাঁড়াইয়া, মধ্যে মালিহকা যেন কৌতুকচ্ছলে করতালি দিয়া শিলা হইতে শিলান্তরে লাফাইয়া পড়িতে পড়িতে সবেগে ছুটিতেছে। ইরাবতীকে পূর্ণ পরিণতযৌবনা গাম্ভীর্য্যভরা লাবণ্যবতী যুবতী এবং মালিহকাকে ক্রীড়া-কৌতুকপ্রিয়া চিরচঞ্চলা বালিকার সহিত তুলনা করিলে ঠিকই হয়। দেখিলে কল্পনা করা কঠিন হয় যে, এই বালিকা মালিহকাই যুবতী ইরাবতীতে পরিণতি পাইয়াছে। খাকু কাচিনদের বাসস্থল উচ্চ উপত্যকার সকল জল মালিহকাই ব্রহ্মের বুকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। যেমন উচ্চাঙ্গের সাধক নির্জ্জন গুহায় সাধনায় মগ্ন রহিয়া জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করে, তেমনই এই দুর্গম ও অজ্ঞাত উপত্যকা বহু দূরে রহিয়াও অপূর্ব্ব অবদানে ব্রহ্মবাসীর অশেষ উপকার সম্পাদন করিতেছে।

আমরা আরও অগ্রসর হইয়া দুর্গমতর প্রদেশে বিরাজিত শিগাম গা নামক গ্রামে উপনীত হইলাম। এই স্থানটির উচ্চতা আড়াই হাজার ফিট। তখন ফাল্গুন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই সময় মধ্যাহ্নেও ঐ স্থানের উত্তাপ ৫০ ডিগ্রির অধিক নয়। আমরা ঐ গ্রামের নিকটে শিবির স্থাপন করিলাম। বর্ষা ছিল না বটে কিন্তু নিশির শিশির এরূপ প্রচুর পরিমাণে পড়িত যে, তাঁবুর উপরে ওয়াটারপ্রুফ না বিছাইলে চলিত না। আমরা যে উচ্চ স্থানে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলাম, তথা হইতে চারিদিকের দৃশ্য শুধু সুন্দর নয়, বিস্ময়কর ও বর্ণনাতীত। যে গহ্বরবৎ গভীর উপত্যকার ভিতর দিয়া মালিহকা আঁকিয়া বাঁকিয়া যাইতেছে, উহার পশ্চাতে খাকু কাচিনদের দেশের নিবিড় বনানী অভিনয়-মঞ্চের পটভূমিকার মত দেখা যাইতেছে। অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিলে কিছু দূরে যে তুষারশুভ্রশীর্ষ তুঙ্গশৃঙ্গ শ্রেণী দেখা যায়, উহারা ইরাবতী ও সালুইন উভয় নদীর জন্মস্থানকে বিভক্ত

বয়ন ব্যাপৃতা কাচিন-কামিনী

করিতেছে। আরও দূরে চীনের সীমান্তে দণ্ডায়মান তুষারাবৃত-তনু সমুন্নত শৈলমালা চিরবিনিদ্র প্রহরীর মত বিরাজিত। এই গ্রাম হইতে তিব্বতের সীমান্তও বেশী দূর নহে। সূর্য্য অস্তসাগরে ডুবিবার পরে, কিয়ৎকাল পুরোভাগে প্রসারিত শৈলশীর্ষসমূহের সহিত সংলগ্ন তুষাররাশি অস্তরবির রমণীয় রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে সেই রক্তরাগে রঞ্জিত রমণীয় রবিরশ্মি-রেখা শূন্যে মিলাইয়া গেল, তন্দ্রালস অন্ধকারের ইন্দ্রজাল প্রকৃতির বুকে বিছাইয়া রহস্যময়ী রাত্রি মৃদুমন্দ পদে বসুন্ধরার বুকে নামিয়া আসিল। লক্ষ লক্ষ খদ্যোত বৃক্ষলতার বক্ষে বিচরণ করিয়া অরণ্যানীকে অগণিত মণি-খণ্ডে মণ্ডিত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতে লাগিল। নীল নভোমণ্ডলে অসংখ্য নক্ষত্র একে একে ফুটিয়া উঠিয়া, আমাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যেন কোন শাশ্বত রহস্যের বিস্ময়জনক বার্ত্তা আমাদিগকে নিঃশব্দ সঙ্গীতের সাহায্যে জানাইতে লাগিল। নিসর্গের এইরূপ অপরূপ নিরুপম রূপ দেখিবার জন্য মানুষ দুঃসহ অসুবিধা সহ্য করিলেও তাহা সার্থক বলিয়া আমাদের মনে হয়।

আমরা চৈত্রমাস পর্য্যন্ত এই দেশে ছিলাম। ফাল্গুন শেষ

হইবার পর যেমন গরমের লেশ বা রেশ দেখা গেল, অমনই কাচিনদের দেশ নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গতে পূর্ণ হইয়া পড়িল। নানা রকম মাছি ও মশা নানা রঙ ও আকারের গুবরে পোকা, হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ দেখা দিল। বর্ণ বৈচিত্র্যে চিত্তাকর্ষক প্রজাপতিপালের সংখ্যাও বাড়িয়া উঠিল। লেপচাদের দেশ সিকিম ছাড়া এত সংখ্যক এবং এত প্রকার প্রজাপতি অন্য কোন প্রদেশে পরিদৃষ্ট হয় না। পার্ব্বত্য প্রবাহিনীগুলির পার্শ্বেই প্রজাপতিপালের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সময়ে সময়ে প্রাণিতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতরা সিকিমের ন্যায় এই প্রদেশেও প্রজাপতি সংগ্রহের জন্য আসিয়া থাকেন। একজাতীয় জালের সাহায্যে প্রজাপতি ধরা হয়। এই প্রদেশের পাদপদলের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ও প্রাচুর্য্য দর্শকের চিত্ত ও চক্ষু দুইই সহজেই পরিতর্পিত করিয়া তুলে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র পাদপলতার ভিতর চিরনিহিত প্রাণপ্রবাহের বার্ত্তা আমাদের নিকট বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। এই দেশে আসিলে মহীরুহসমূহের দেহে প্রবাহিত সেই প্রাণধারার কি অপূর্ব্ব পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই। অরণ্যগুলি এত নিবিড় যে প্রবেশ করা কঠিন। পুনঃ পুনঃ কুঠারের সাহায্য না লইলে প্রবেশ করা অসম্ভব। শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত এক একটি মহান মহীরুহ যেন এক একটি দ্বিতল গৃহ। শাখায় শাখায় শ্যামসুন্দর শৈবাল দেখিলে মনে হয়, কোন বর্ণশিল্পী তাহাদিগকে সবুজ রঙে রঞ্জিত করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বৃক্ষের বক্ষে বিচিত্রাকার অর্কিড ও ফার্ণ জন্মিয়া উহাকে শুধু বিশালতর নয়, বিস্ময়কর করিয়া তুলিয়াছে। এক একটী গাছ যেন এক একটী জগৎ। উহা কতপ্রকার প্রাণীর আশ্রয়স্থল তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? শাখায় শাখায় বানর, পাতায় পাতায় নানাজাতীয় প্রজাপতি ও অন্যান্য পতঙ্গম, ফাটলে ফাটলে কমনীয় বা কদর্য্যাকার এবং কিম্ভূতকিমাকার কত প্রকার কীট, কোটরে কোটরে কতরকম পাখী। এই সকল অরণ্যানী অসংখ্য প্রাণীর কণ্ঠস্বরে মুখরিত কিন্তু তবুও কি নিবিড় নিস্তব্ধতা ইহাদের বক্ষে অবিরাম বিরাজিত। বনানীর এই ধ্যানমৌনী মন্দির সম্মুখে দাঁড়াইলে মুখসর্ব্বস্ব মূর্খ মানুষের সকল মুখরতা যেন মূক হইয়া পড়ে।

২

এই নিবিড় ও নিস্তব্ধ অরণ্যানীর, উহার পার্শ্বে অবস্থানকারী কাচিনদের মনের উপর একপ্রকার অদ্ভুত প্রভাব প্রসারিত করা স্বাভাবিক। তবে দুঃখের বিষয়, ঐশ্বরিক শক্তি সম্বন্ধে ভক্তি ও প্রীতির পরিবর্ত্তে একপ্রকার ভীতিভাব ইহাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়। ভীতিই ইহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাসের একমাত্র ভিত্তি। ইহারা পর্ব্বতপুঞ্জ ও বনানীসমূহকে লাট নামক একপ্রকার উপদেবতায় পূর্ণ বলিয়া মনে করে। আমরা ছোটনাগপুর প্রভৃতি পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রদেশের অধিবাসী আর্য্যেতর জাতিদিগকে যেমন ভূত প্রেতের পূজা করিতে দেখি—তেমনই ব্রহ্মের উত্তর-সীমান্তের এই পার্ব্বত্য ও আরণ্য সম্প্রদায় লাটদিগের উপাসনা করিয়া থাকে। আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সভ্যতার পথে অনগ্রসর বনবাসী সম্প্রদায়গণকে যেমন জীববলির দ্বারা উপদেবতা বা অপদেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে দেখি, ইহারাও লাটের নিকটে মোরগ, শূকর প্রভৃতি পশু বলি দিয়া থাকে! কাচিনরা কুক্কুর ভক্ষণ করে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সুতরাং লাটের উদ্দেশ্যে বলিরূপে ইহারা কুক্কুরও হত্যা করে। মোটের উপর কাচিনরা ধর্ম্ম সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তরে অবস্থান করিতেছে সে বিষয়ে সংশয় নাই। বর্ম্মীজদিগের ন্যায় বৌদ্ধ হইলে এ বিষয়ে ইহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইত সন্দেহ নাই। কদাচিৎ কোন কাচিন লাটবাদের প্রভাব অতিক্রম করিয়া বৌদ্ধ বা খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে! আমাদের সুহৃদ এক সন্ন্যাসী কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া এই দুর্গম দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে ব্যাপৃত করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। হিমাদ্রির পাদদেশে প্রসারিত প্রদেশসমূহের অধিবাসী পাহাড়িয়া-সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সত্যধর্ম্ম প্রচারকেই ইনি জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, ইহা জানিতাম। আমরা এই সন্ন্যাসী সুহৃদের সহিত সাক্ষাতের জন্য একপ প্রদেশের ভিতর দিয়া আগাইয়া চলিলাম, যাহা অপেক্ষাকৃত অধিক দুর্গম এবং লাটবাদ যেখানে শঙ্কারজনক আকারে প্রচলিত রহিয়াছে বলা চলে।

বুম অর্থে পাহাড় তাহা বলিয়াছি। এই পাহাড়পূর্ণ অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রামকেও বুম্ বলা হয়। বুম কাটাউয়ং প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বের ন্যায় সাধারণতঃ দলপতিদিগের গৃহেই অবস্থান করিতাম। প্রত্যেক পল্লীতে কয়েকটি করিয়া সার্ব্বজনীন গৃহ রহিয়াছে। কোন কোন গ্রামে বিদেশীয় পথিককে শস্যাগারের একটি অংশে থাকিতে দেওয়া হয়। এই শস্যাগার এক জনের সম্পত্তি নহে, সকলের। রুশীয়রা আজ ধনসাম্যবাদ বা কমিউনিজম্ প্রচার করিতেছে কিন্তু একপ্রকার সাম্যবাদ এই সকল পার্ব্বত্যসম্প্রদায়সমূহের ভিতর প্রাচীনকাল হইতে প্রচারিত রহিয়াছে। নাগা, কুকী প্রভৃতি আসাম-সীমান্তের আরণ্যজাতিদের মধ্যেও এই ধরণের সার্ব্বজনীনতা আমরা দেখিয়াছি। দলবদ্ধ হইয়া সকল কাজ করা ইহাদের অভ্যাস। সন্ধ্যার সময় সার্ব্বজনীন শস্যাগারে সকলে সম্মিলিত হইয়া নানাপ্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে চাউল হইতে প্রস্তুত একপ্রকার মদ্যপানও চলে। পানপাত্র বাঁশের চোঙা। কদলীপত্রে মদ্যপানের প্রথাও এই দেশে প্রচলিত। পত্র-পাত্রে মদ্যপানের প্রথা ছোটনাগপুরের সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়দের ভিতরও দেখিয়াছি। পান খাওয়ার প্রথাও কাচিনদের মধ্যে প্রচলিত। বেনু নির্ম্মিত পাত্রেই পান সুপারী প্রভৃতি রক্ষিত থাকে। বর্ম্মা ও মালয়ের সর্ব্বত্র এবং মালয়দ্বীপপুঞ্জেও আমরা পান খাওয়ার প্রথা প্রচলিত দেখিয়াছি।

বুম কাটাউয়ং গ্রামটি পাহাড়ের পার্শ্বে অবস্থিত। আরও উপরে নিবিড় বনানীতে আচ্ছন্ন গৃহশ্রেণী। এই সকল শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া দেখিলে চীনের য়ুনান প্রদেশের গিরিমালা দেখা যায়। একদিকে কাচিনদের দেশ, অন্যদিকে শাননামক সম্প্রদায়ের বাসস্থলী উপত্যকাবলী বা প্রান্তর। বুম কাটাউয়ং-এর নিম্নে প্রসারিত নামখাস নামক প্রান্তরটিতে শানরা বাস করে! শানপল্লীর ভিতর কাচিনও থাকে। আমরা কয়েকটি গ্রাম অতিক্রম করিবার পর সন্ন্যাসীর আশ্রমে আসিলাম। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

প্রচারকার্য্য কিরূপ চলিতেছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা বলিলেন তাহাতে আমরা বুঝিতে পারিলাম "লাটবাদী কাচিন জনসাধারণ তাঁহার বিরোধিতা কোনদিন করেন নাই, তাঁহার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছে পুরোহিতশ্রেণীর কাচিনরা, পল্লীর লাটপূজা সম্পাদন যাহাদের কাজ। কাহারও ঘাড়ে ভূত চাপিলে বা কেহ কোন ডাইনীর প্রভাবে পড়িলে পুরোহিতই মন্ত্রতন্ত্রাদির দ্বারা ভূত ছাড়াইতে বা ডাইনীর কুপ্রভাব হইতে মুক্ত করিতে প্রযত্ন করে। সন্ন্যাসীর মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে ইহাও বুঝা গেল—এমন কোন কুকর্ম্ম বা কদর্য্য কাজ নাই যাহা লাটের পূজারীরা করিতে না পারে। এই পূজারীরা ডুমজা আখ্যায় অভিহিত হয়। ডাইনের প্রভাব হইতে কোন ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে যে অনুষ্ঠান আবশ্যক—উহা কাচিনভাষায় কুমলাও আখ্যায় অভিহিত। ডুমজারা ভবিষ্যদ্বাণীও বলে। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে লাটকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মোরগাদি প্রদান প্রয়োজন। লাটের পুরোহিতদের প্রবল চেষ্টা জনসাধারণকে চিরকাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাখার দিকে। সুতরাং সন্ন্যাসীর ধর্ম্মপ্রচারের প্রচেষ্টা তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ করা স্বাভাবিক। যে স্বল্পসংখ্যক কাচিন সন্ন্যাসীর প্রচারের ফলে লাটবাদ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু হইয়াছে, পূজকরা তাহাদিগের উপরেও নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে বলিয়া জানা গেল। খৃষ্টীয় মিশনারীদের চেষ্টাও পুরোহিতদিগের দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে। নচেৎ নূতন মতবাদ গ্রহণ করিতে কাচিনদের আন্তরিক আগ্রহই দেখা যায়। ডুমজাদের দুরভিসন্ধিই তাহাদিগকে উন্নতির পথে আগাইতে দিতেছে না। মিৎকিনা ও ভামোর নিকটবর্ত্তী কাচনপল্লীতে ডুমজাদের প্রভাব ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে কিন্তু অভ্যন্তরভাগে ইহাদের কুপ্রভাব এখনও অব্যাহত রহিয়াছে।

আমাদের সহচরদিগের একজন কাচিনভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ইনি বর্ম্মীজ এবং চীনাভাষাও জানিতেন। সন্ন্যাসী সান্ধ্যসম্মিলনের সময় কাচিনদিগকে লাটবাদের অপকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। বহুভাষাবিদ্ বন্ধুটি প্রবন্ধলেখককে বলিলেন—তুমি বাংলায় বল, আমি কাচিনভাষায় উহা অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিব। লাটবাদের ভিত্তিতে রহিয়াছে ভীতি, অথচ ভক্তি ও প্রীতিই প্রত্যেক প্রকৃত ধর্ম্মের মূলে বিদ্যমান। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে ভগবান্ রহিয়াছেন, সেই ভগবানের উপাসনাই আমাদিগকে করিতে হইবে। ভগবান্ যে সকল জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পালন করিতেছেন, তাহাদিগকে ভালবাসাই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার প্রধান উপায়। এই ভালবাসাই উপাসনা! জীবহত্যারূপ জঘন্য পাপের দ্বারা প্রেতকে প্রীত করিবার জন্য প্রযত্নকে যদি ধর্ম্ম বলা হয় তাহা হইলে অধর্ম্ম কাহাকে বলিব? প্রবন্ধলেখক এই সম্বন্ধে বাঙ্গালায় যাহা বলেন, কাচিন ভাষায় নিপুণ সহচরটী তাহাই সমবেত কাচিনদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। এক বৃদ্ধ কাচিন মাথা নাড়িয়া জানাইতেছিল, কথাগুলি খুবই ঠিক এবং তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল। পরে জানিলাম, সে পার্শ্ববর্ত্তী এক পল্লীর দলপতি। সন্ন্যাসী বৃদ্ধকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনি সহায় না হইলে আমার পক্ষে এই স্থানে এক মাস থাকাও সম্ভব হইত না। বৃদ্ধ শুধু নিজে নয়, পুত্র-পরিবারকেও লাটপূজা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে।

আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিবার তিন বৎসর পরে সন্ন্যাসী-সুহৃদের পরপার-প্রয়াণের সংবাদ শুনিতে পাই। তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে দুই প্রকার জনশ্রুতি আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। ঐ জনশ্রুতির অন্যতম, লাটের পুরোহিতদের অত্যাচার তাঁহার মৃত্যুর কারণ। তিনি দুই মাসকাল জ্বররোগে শয্যাগত ছিলেন, কেহ কেহ ইহা কহিয়া থাকেন। সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া লোক-লোচনের অগোচরে অতি দুর্গম প্রদেশে অবস্থানপূর্ব্বক সত্যপ্রচারকে যিনি জীবনের একমাত্র ব্রতে পরিণত করিয়াছিলেন এবং সেই ব্রত পালন করিতে করিতে একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে কখন ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছিলেন, সেই সত্যধর্ম্মপ্রচারক নিষ্কাম-কর্ম্মযোগীর উদ্দেশে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

মালিহকার উচ্চ-কলগীতি-মুখরিত পথহারা কান্তারে পূর্ণ এই দুর্গম দেশের নাম হুকামতী। শীতের সময়ে এই দেশ তুষারে রজত-শুভ্র এবং বর্ষার কুহেলিকায় ধূম্র-ধূসর হইয়া পড়ে। যেমন বাঙ্গালার পক্ষে সিকিম, তেমনই ব্রহ্মের পক্ষে হুকামতী। মালিহকার গুঞ্জনগীতি-মুখরিত হুকামতীর স্মৃতি আমাদের অন্তরপটে চিরদিন অঙ্কিত রহিবে। [সমাপ্ত]

শরতের রাণী

শ্রীনীলরতন দাশ, বি-এ

আলো ঝলমল পূত নির্ম্মল
রামধনু রাঙা পথে
শরতের রাণী এলোরে ধরায়
চড়িয়া মেঘের রথে।

ঝরা-শেফালিকা মালতী চাঁপায়
বনবীথিতলে আসন বিছায়,
কাশবন তা'রে প্রণতি জানায়
দূর কান্তার হতে।

বুলবুলি শ্যামা বনে বনে গায়
তা'রি আগমনী গান,
সুনীল গগন অরুণ আলোর
অঞ্জলি করে দান।

ফুলে ফুলময় কুঞ্জকানন,
গন্ধমদির দখিনা পবন,—
পুলকে মগ্ন নিখিল ভুবন
পেয়ে তা'রি সন্ধান।

কুমার গুপ্ত

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত বংশীয় শ্রেষ্ঠ নৃপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ভারতে যে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, তদ্দর্শনে তৎকালীন রাজত্বকালকে "স্বর্ণযুগ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই স্বর্ণ যুগের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার গুপ্ত।

খৃষ্টীয় ৪১৫ অব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিত্যক্ত উজ্জয়িনীর সিংহাসনে তৎপুত্র কুমার গুপ্ত আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই কুমারগুপ্ত সর্ব্বপ্রথমে "ছত্রধর ও মঙ্গলঘটহস্তা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি" যুক্ত এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। এই প্রকার মুদ্রার একদিকে হস্তী পৃষ্ঠে রাজা এবং তাঁহার পশ্চাতে একজন ছত্রধর উপবিষ্ট আছে এবং দিকে পদ্মের উপরে দণ্ডায়মান সনালোৎপল ও মঙ্গলঘট হস্তা লক্ষ্মী দেবীর মূর্ত্তি আছে (১)। এই জাতীয় স্বর্ণমুদ্রা প্রাচীন বঙ্গের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ জনপদ মহানাদে আবিষ্কৃত হইয়াছে।(২)

সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল পরেই পুষ্যামিত্রীয় ও হূন জাতীর সহিত কুমার গুপ্তকে বিশেষভাবে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। তিনি প্রবল পরাক্রম সহকারে তাহাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজয়-গৌরব প্রকাশার্থে কয়েক প্রকার স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে এক প্রকার মুদ্রার প্রথম দিকে রাজ মূর্ত্তির চারি পার্শ্বে উপগীতিচ্ছন্দে—

"ক্ষিতিপতি রজিতো বিজয়ী
কুমার গুপ্তো দিবং জয়তী"

লিখিত আছে। অপরদিকে লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণ হস্তে পাশ ও বাম হস্তে সনালোৎপল আছে (৩)।

স্বর্ণমুদ্রা ব্যতীত সৌরাষ্ট্র, মালব এবং মধ্য প্রদেশে কতিপয় জাতীয় রজত মুদ্রার প্রচলন ছিল। এক জাতীয় রজত মুদ্রার একদিকে রাজার মস্তক এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে তারিখ লিখিত আছে। অপর দিকে একটি ময়ূর ও একটি পদ্ম আছে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে উপগীতিচ্ছন্দে—

"বিজিতো বনির বনিপতি
কুমার গুপ্তো দিবং জয়তি"

লিখিত আছে।(৪)

যুদ্ধবিগ্রহের পর কুমার গুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দুই প্রকার স্বর্ণমুদ্রায় ইহার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম প্রকার মুদ্রার একদিকে যজ্ঞযূপে সুসজ্জিত অশ্বমেধের অশ্ব এবং অপর দিকে চামর হস্তে প্রধানা মহীষীর মূর্ত্তি (৫)। দ্বিতীয় প্রকার মুদ্রায় একদিকে অশ্বের নিম্নে "অশ্বমেধ" এবং অপর দিকে "শ্রী অশ্বমেধ মহেন্দ্র" লিখিত আছে (৬)।

যজ্ঞসমাপনান্তে তিনি "পরম রাজাধিরাজ" উপাধিতে বিভূষিত হন। তৎকালীন প্রচলিত এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রার একদিকে "পরম রাজাধিরাজ কুমার গুপ্ত" এবং অপরদিকে দেবীর হস্তে পাশ ও পদ্ম আছে (৭)।

অতঃপর তিনি "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। তৎকালীন প্রচলিত একজাতীয় স্বর্ণমুদ্রার একদিকে "মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্তঃ" এবং অপরদিকে ভামণ্ডল সমন্বিতা পদ্মাসনা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে (৮)। এতদ্ভিন্ন তৎকালে তিনি তাম্র মুদ্রাও প্রচলন করিয়াছিলেন। এই প্রকার তাম্রমুদ্রায় "শ্রী মহারাজ শ্রীকুমার গুপ্তস্য" লিখিত আছে (৯)।

মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে অযোধ্যা, মথুরা, কনৌজ, অহিচ্ছত্র, কৌশাম্বী, কাশী, সারনাথ, গয়া, পাটলীপুত্র, বৈশালী, চম্পা, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম, মহানাদ ও পাহাড়পুর প্রসিদ্ধ নগর এবং তন্মধ্যে কৌশাম্বী, অযোধ্যা, তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। সপ্তগ্রাম ও তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে বহুবিধ পণ্যদ্রব্য সমুদ্র যবদ্বীপ, বালি প্রভৃতি সুদূর দেশে বাণিজ্যব্যপদেশে রপ্তানি হইত। তৎকালে ভারতীয় বণিকগণ বালি ও যবদ্বীপে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং স্থাপত্য-শিল্পে ঐ সকল অঞ্চলকে সুসমৃদ্ধ করিয়া তুলেন। সংক্ষেপে বলিতে হইলে তাঁহার সময়ে ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, জ্যোতির গণিতশাস্ত্র, শিল্প, স্থাপত্য, চিত্র ও ভাস্কর্য্যে ভারত এবং তথা বৃহত্তর ভারতের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

এইরূপে মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্ত ৪৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরাক্রম ও সুখ্যাতির সহিত রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপরে তাঁহার পরিত্যক্ত সিংহাসনে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র স্কন্দ গুপ্ত আরোহণ করেন।

(১) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882 pp. 91, 104.

(২) Ibid. p. 88

(৩) Ibid, 70-71. Nos. 205-209.

(৪) Allan, B.M.C., pp. 107 108, Nos. 385 390.

(৫) Ibid, p. 68.

(৬) Ibid, p. 69.

(৭) Ibid, No. 191 I. M. C. Vol. I. P. III, Nos 2—4.

(৮) Ibid P. 66. Nos. 198 200

(৯) Ibid. No. 55

পিতৃ-পরিচয় (গল্প)

শ্রীজনরঞ্জন রায়

ছেলের পিতৃপরিচয় তার মা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। তবে মা'র কাছ থেকে তাহা জানিবার দুর্ভাগ্য আমার মতন কোনো সন্তানের যেন না হয়।

যেখানে তাহা জানিবার কৌতূহল আছে, সেখানেই আছে অপমানের বিষ। এই বিষের জ্বালাই আমার ডাক্তারী জীবনের সব বাধা ঠেলিয়া নিয়া চলিয়াছে...আর আমাকে মানুষ করিবার জন্য মায়ের এই যে কৃচ্ছ্র সাধন ও দেহপাত তাহাও এই বিষজ্বালার ফল।

এই প্রসিদ্ধ স্যানিটেরিয়মে আমি এসিষ্টেন্ট সার্জ্জন। পার্ব্বত্য উপত্যকার পাশে আমার কোয়ার্টার। প্রাতে চা খাইতে বসিয়াছি। পেয়ালা ঠাণ্ডা হইয়া গেল...তবু ভাবিতেছি। ভাবিতেছি সেই বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের কথা... তাঁর ইনফিরিয়রিটি-কমপ্লেক্সের কী দুর্জ্জয় অভিমান! ডাকিলাম—মা ?... একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

অনেকদিন পরে দীর্ঘশ্বাস পড়িল। দীর্ঘশ্বাস ফেলি না, দৃঢ়তা নষ্ট হয়, বল কমিয়া যায়। আমার মনের বল রাখিতে হইবে। মনকে চোখ রাঙাইয়া বলি—ঠিক থাকো! আমার জন্ম আমার আয়ত্তের বাহিরে ছিল, তাই বলিয়া আমার মন আমার আয়ত্তের বাহিরে যাইতে পারিবে না।

ইহার ফলে আমার মধ্যে দারুণ একটা কমপ্লেক্স আসিয়াছে—আত্মপ্রত্যয়ের কমপ্লেক্স! আমার মতকে আমি 'এসার্ট' করিতে ভয় পাইতাম না। শুধু নীতির দিক দিয়াই নয়, পড়ার দিক দিয়াও আমি খাঁটি—এই অভিমান আমায় পাইয়া বসিয়াছিল। ইহার জন্য আমি পরিমিত ব্যায়াম করি, পরিমিত আহার অভ্যাস করিয়াছি। কিন্তু ছাত্রজীবনে কিছুটা অপরিমিত পড়িয়াছি। ডাক্তারী কলেজের শেষ পরীক্ষার কথা মনে পড়িতেছে। হার্টের বিষয় আমার বিশেষ পাঠ্য ছিল। তিনজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মৌখিক পরীক্ষা লইতেছিলেন। আমাকে একটা ধাঁধাঁর প্রশ্ন করিলেন। একটু ভাবিয়াই উত্তর দিলাম। তাঁহারা বলিলেন—আরও ভাবিয়া উত্তর দাও, দুই মিনিট সময় দিলাম। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছিলাম—আমার ঐ একটাই উত্তর। একজন বলিলেন, তোমার ভুল উত্তর! আমি দুই হাত মুঠো করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়াছিলাম—আমি 'এসার্ট' করিতেছি আমার ঠিক উত্তর। সেদিন প্রধান পরীক্ষক আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন—সত্যই তোমার ঠিক উত্তর, আর তোমার আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তার জন্য এবার তুমিই স্বর্ণ পদকটা পাইবে।

আবার ডাকিলাম—মা ?...সকাল থেকে ভারি অন্যমনস্ক। মা'র সুখ দুঃখ তো আমারই জন্য, আমি ভাল আছি, তবে? কৈশোরেই তিনি বিধবা হন, অসভ্য আত্মীয়গণের নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারেন না, লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাইয়াই অল্প দিনে নিজের যোগ্যতা দেখান। তারপর তিনি হন শিক্ষয়িত্রী, ইহার মধ্যেই আমি আসিয়াছি। আমার জ্ঞান হইলে দেখিলাম শুদ্ধ আত্মীয়গণ মা'কে 'এক ঘরে' করিয়া রাখিয়াছে। প্রায় স্কুল হইতে পাশ করিয়া আমি কলিকাতায় আসিলাম। মা'র আয়ে আমার পড়ার খরচ চালানো কষ্টকর হইল। তিনি নার্স হইয়া কলিকাতার একটি হাঁসপাতালে ঢুকিলেন। আপনি না খাইয়া আমায় খাওয়াইয়া পাশ করাইলেন। সেই থেকে মা আমার সঙ্গে সঙ্গে। ইদানীং ধর্ম্ম-কর্ম্মের দিকে খুব ঝোঁক হইয়াছে। কিন্তু কয়দিন হইতে এ কী দেখিতেছি? মা তাঁর নার্সের পোষাক পরিয়া এখানকার এই হাঁসপাতালে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেছেন! একটি বৃদ্ধ রোগী সেখানে আসিয়াছেন, রোগটা যে বুকের ক্যানসার তাহাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। ভর্ত্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন আমাদের মহকুমা হাকিম দয়াল চক্রবর্ত্তী। কলিকাতাতেই তাঁর সঙ্গে আলাপ। তাঁর স্ত্রীর অসুখের জন্য আমাদের কলেজের হাঁসপাতালে ঘর নিয়া থাকেন, আমি তখন পাশ করিয়া হাউস-সার্জ্জেন হইয়াছি। তারপর অনেকবার তাঁদের বাড়ীতে গিয়াছি। কলেজের পাশে শাঁখারিডাঙায় তাঁদের বাড়ী ছিল—এখন যে জায়গাটা ভাঙিয়া বড় এভেনিউ রাস্তা হইয়াছে। তাঁর স্ত্রী নিজের হাতে আমায় কতদিন খাওয়াইয়াছেন। তিনি আমায় ভাই বলিয়া ডাকিতেন, আমি তাঁকে দিদি বলিতাম। সেই সুবাদে দয়াল বাবু আমার রোগীটির কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে মা'র কি যোগাযোগ থাকিতে পারে বুঝিতে পারিতেছিলাম না!

নার্স ভিন্ন রোগীর কাছে কোনো আত্মীয় স্বজনও বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না। মা তাই তিন চারবার করিয়া নার্সের বেশে এই রোগীটিকে দেখিতে যাইতেছেন। বুঝিতেছি কাল সমস্ত রাত সেখানেই আছেন। আজ এখনও ফেরেন নাই!

নীচে মোটারের শব্দ শুনিয়া নামিয়া আসিলাম। দেখিলাম দয়াল বাবু ও তাঁর স্ত্রী আমায় হাঁসপাতালে নিয়া যাইতে আসিয়াছেন। দয়াল বাবুর স্ত্রী আমার দিদি, কাঁদিয়া বলিলেন, ভাই এখুনি চলুন, বাবা আর বাঁচেন না। নিমেষের মধ্যে ধড়াচূড়া পরিয়া তাঁদের সঙ্গে বাহির হইলাম। গিয়া দেখি বৃদ্ধের শেষ অবস্থা, পাশে দাঁড়াইয়া আমার মা, পাথরের মতন নিশ্চল, চোখ দুইটা লাল।

আমি আসিতেই মা'র মুখ যেন প্রফুল্ল হইল, সচল হইয়া উঠিলেন তিনি। তারপর দ্বিধাহীন স্পষ্ট কণ্ঠে আমায় বলিলেন, কতদিন তুমি পিতৃ-পরিচয় চেয়েছ বিশু, দিতে পারি নি! তোমার ভাগ্য ভাল, এখনো ওঁর জ্ঞান আছে। পায়ের ধুলো নাও, আশীর্ব্বাদ চেয়ে নাও।

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর পায়ের ধূলা নিলাম। মনে হইল আশীর্ব্বাদ করিতে তাঁর ডান হাতখানি একটু উঠিল, তাঁর মুখ দিয়া যেন অস্পষ্ট বাহির হইল—'বি, উ'। কিন্তু তখনি সব শেষ।

লিপি (গল্প)

শ্রীরমেন মৈত্র

*বরষার মেঘমেদুর এক সকাল। ভোর হইতে আকাশটা মুখখানা কেমন ম্লান করিয়া আছে। ঠাণ্ডা বাতাস থাকিয়া থাকিয়া ঘরের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। আমি চেয়ারে বসিয়া বাতাসের শৈত্য অনুভব করিতেছি এবং বাহিরের প্রকৃতির এই মত্ত লীলা ও ঝুপ, ঝাপ, বারিপাত দেখিতে দেখিতে কাগজ ও কলম সহযোগে এক নাতিদীর্ঘ প্রণয়লিপি লিখিতেছি।

সত্যই পত্র লিখিতেছি। প্রবাস-বাসের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা এবং নিঃসঙ্গ জীবনের বিরহে বেদনা মিশাইয়া, ভাবা-চাতুর্য্যে অপূর্ব্ব করিয়া পত্র লিখিতেছিলাম শিবানীকে। যাঁহারা আমাকে চেনেন ও জানেন তাঁহারা ভাবিবেন—শিবানী আবার কে? তাঁহারা ভাবুন, তবু লিখিব, এখন তাঁহাদের কথা ভাবিবার সময় নাই। বিরহের পত্র লিখিবার এমন চমৎকার পরিবেশ আবার হয়ত নাও আসিতে পারে।

বাহিরের বরষা দেখিয়া মনে কেমন এক অদ্ভুত বৈক্লব্য ও ঔদাসীন্য জাগিয়া উঠিতেছে। জানালা দিয়া যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল দেখি দু'একটা শাল গাছ, লাল কাঁকর বিছানো পার্ব্বত্য পথ, আর তারই পাশে উন্মুক্ত প্রান্তর শ্যামল বারিস্নানে স্নিগ্ধ। বাতাসের দোলায় শাল গাছের শাখা পল্লব দুলিতেছে। সুন্দর নিস্তব্ধতায় বসিয়া আমি চিঠি লিখিতেছি শিবানীকে—!

"ওগো মিতা মোর অনেক দূরের মিতা,
কতদিন হয়ে গেল তোমাকে দেখি নি, কবে দেখবো তাও জানি না।

জীবনের কর্ম্ম কি আমাদের দু'জনের সাক্ষাতের মধ্যে এমনি করেই ব্যবধান সৃষ্টি করে চলবে চিরদিন! কই তুমিও তো আমাকে আর লেখো না,- নাও না আমার খবর। আমাকে একবারও বুঝি মনে পড়ে না তোমার? একটিবারও না? কিন্তু জানো কি, কেমন করে কাটে আমার নিঃসঙ্গ জীবন এই সুদূর প্রবাসে।—

আমার কি বেদনা সেকি জানো তুমি জানো
ওগো মিতা মোর অনেকদূরের মিতা,
আজি মোর তিমির নিবিড় যামিনী বিদ্যুৎ সচকিতা।
বাদল বাতাস ব্যেপে'
আমার হৃদয় উঠিছে কেঁপে,
ওগো সেকি তুমি জানো,
উৎসুক এই দুঃখ জাগরণ সেকি হবে হায় বৃথা।

বন্ধু আমার—

যদি জানতে দয়িতবিরহের বেদনা কি দুঃসহ। কর্ম্মবহুল দিনের শত ব্যস্ততার মধ্যেও মনে পড়ে তোমার মুখ। প্রথম ক'দিনের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্যের কাহিনী মনে পড়ে। পুরানো দিনের স্মৃতি কেবল দুঃখই আনে বন্ধু। আর আজ? আজ, বাইরের প্রকৃতির মত অশান্ত হয়ে উঠেছে আমার মন, চোখে নেমেছে অশ্রুধারা। মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে পরিচয় না হওয়াই বুঝি ভাল ছিলো।

আমার ভবন দ্বারে
রোপণ করিলে যারে
সজল হাওয়ার করুণ পরশে
সে মালতী বিকশিতা,
মিতা মোর অনেকদূরের মিতা।

ঠিক করে বলতে পাচ্ছিনা কবে যাবো তোমার কাছে। তবে হঠাৎ কোন সময় যাবো নিশ্চয়ই। এবার যদি যাই, আসবার সময় মনে করে তোমায় নিয়ে আসবো। এখানে বসে বসে আমরা দেখবো পাহাড়ের গায়ে সন্ধ্যা নামছে, আকাশে জেগে উঠছে তারার দল, শালবনের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জোনাকীর স্তিমিত আলো। আর মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে পথিকের অশান্ত সুর। শুনবে তো? বাঁশী শুনতে তুমি যে ভালবাসো। তুমি না থাকলে আমাকে দেখবে কে? চিঠি পেয়েই জানিও তোমার জন্যে কি নিয়ে যাবো। জানো তো পার্ব্বত্য দেশে কিছুই মেলে না। বন্ধু -

তুমি যার সুর দিয়েছিলে বাঁধি
মোর কোলে আজ উঠিছে সে কাঁদি,
সেই সে তোমার বীণা সেকি বিস্মৃতা,
মিতা মোর অনেক দূরের মিতা।

লেখা চিঠিখানা পড়িতেছিলাম। টের পাই নাই ইতিমধ্যে কখন ভৃত্য বাজারের ঝুড়ি লইয়া আমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে পয়সা লইবার জন্য। সহসা সে কাসিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম ভৃত্য গজেন্দ্র। কহিলাম—"শিবানীকে আনবো বলে চিঠি লিখে দিলাম।" ভৃত্য পুলকিত হইয়া কহিল—"তাই নাকি"। "হ্যাঁ রে।"

"কই কি লিখলেন দেখি।"

"তুই দেখে বুঝতে পারবি না, বরং আমি পড়ছি শোন্।"

"পড়ুন"। বলিয়া গজেন্দ্র ঝুড়িটা মেঝেতে নামাইয়া হাসিমুখে বসিল। আমি পড়িয়া চলিলাম।

পড়া শেষ হইল। ভৃত্যের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। কহিলাম—"এই লিখে দিয়েছি, কেমন হয়েছে?" ভৃত্য যেন অনেকটা অপ্রসন্ন মুখে কহিল—"তা মন্দ হয়নি। তবে আরও গোটা কতক কথা লিখে দিলে হোত। আর শেষের দিকে নামটা উঠিয়ে দিয়ে লিখে দিন—'ইতি তোমার তালতলার বেহারী'।"

"বেহারী কেন রে? আর তালতলাই বা কেন?'

"বেহারী আমার ডাক নাম। আর 'তালতলার বেহারী' বলেই সকলে ডাকে আমাকে। তালতলায় বাড়ী কিনা। শিবানী ও নাম ছাড়া আমার ভাল নাম জানে না।" "বলিস কি, তোর বউ, অথচ সে তোর—"

ভৃত্য হাসিয়া কহিল—"আর ওর মধ্যে লিখে দিন একটু যে আসছে মাসে টাকা পাঠাতে পারবো না।"

সামান্য কয়টা কথা তখনি চিঠির মধ্যে একজায়গায় লিখিয়া দিলাম। গজেন্দ্র চিঠি লইয়া চলিয়া গেল। পরে শুনিয়াছিলাম, আমার লেখা চিঠি তাহার মনঃপুত হয় নাই বলিয়া ডাকঘরে গিয়া অন্য কাহার কাছ হইতে সে নূতন করিয়া চিঠি লিখাইয়া স্ত্রীকে পাঠাইয়াছে।

ত্রাণ-সমিতির একটী নারী (গল্প)

শ্রীসতীকুমার নাগ

... ঘষে মেজে পুরাণো বাড়ীটার সংস্কার হ'লো। টেবিল চেয়ার সব এসে জড়ো হ'লো। এ-পথে যাদের দেখিনি, তারাও এলো। দিনের আলোকে যেন চমক লাগে চোখে। দেয়ালের গায়ে একদিন একটা টিনের কালো সাইনবোর্ডে শাদা অক্ষরে 'ত্রাণ-সমিতি' ঝুলতে দেখা গেলো। আর আটা দিয়ে বেশ সতর্কে আটকানো আছে একটি তিনরঙা ছবি, মানুষের মূর্ত্তি আর লালকালীতে সাবধান-বাণী—'এদের মারতে হবে'।

এরা কারা? মন দিয়ে অনেকক্ষণ দেখলাম। হাতে সঙীন্ উঁচিয়ে আছে, নাকবোঁচা, মুখ থ্যাবড়া, রং চটা! আর এদেরই বিপরীত দিকে আছে প্রতিদ্বন্দী দল, যাদের মধ্যে নারীর হাতে বঁটি, নরের হাতে শাবল, ছেলের হাতে লাঠি।

এতক্ষণে আঁচ হ'ল সাবাস...আমার দেশের নরনারী...জাপানকে এভাবে রুখতে হ'বে। ভীরু মনে সাহস হ'লো। ছোট বুকের ছাতি ফুলে উঠল, কালো মুখে গর্ব্বের হাসি দেখা দিল।

ভিতরের কার্য্যকলাপ দেখবার সাধ হলো। উঁকি ঝুঁকি মারলাম। বক্তৃতা চল্‌ছে। 'সভ্য ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ' লটকানো কাগজের বোর্ড। পিছু পা হলাম, সহজেই বুঝলাম —আমাদের হিতৈষী। অর্থাৎ বিপদেই এরা বন্ধু।

নিরাপদ এলাকায় ফিরে আসতেই সৌমিত্রী এসে সংবাদ দিল, "ওগো, একটা সুখবর আছে—"

কি?

আমি কাল থেকে 'ত্রাণ সমিতি'তে যাচ্ছি।

বিশ্বাস হ'ল না। বললাম: কিসের ত্রাণ আবার?

ও-জানো না বুঝি, এই দেখ— কতকগুলো কাগজ দিল হাতে। সমিতির নিয়মকানুন। সৌমিত্রীই বলল,: যাক্, এবার ভাবনা দূর হ'ল তো?

নিঃশ্বাস ফেললাম মুখ ফিরে।

যাক্, তোমাকে এবার আর চাল-ডালের ভাবনা ভাবতে হবে না। এই দেখ।

সৌমিত্রী চতুরা—সন্দেহ নেই। সে জানে এ যুদ্ধের বাজারে পয়সা হলেও 'চিজ' পাওয়া যায় না।

রেশন পাওয়া যাবে· আশ্বাস দিলে সৌমিত্রী।

বললাম, কাজটা ভাল হ'ল না...'

কেন? তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

ঘর ছেড়ে বাইরে যাবে ...সমিতি রক্ষা করতে?

সমিতি রক্ষা করতে নয়, বাংলাকে রক্ষা করতে। জানো এদের কি কাজ? খৈ ফোটার মত বলে চলল সৌমিত্রী। তার মর্ম্মার্থ এই যে, জনসাধারণকে জাপানী বোমা থেকে রক্ষা করা, তাদের হিত কথা শুনানো, আহতদের সেবা করা, আরো অনেক কিছু বল্লে...সে গুলো মনে নেই।

আপন মনেই কথাগুলো উচ্চারিত হলো: হায় সৌমিত্রী, তোমাকে নিয়ে আমার নীড় বাঁধা, আজ নীড় ছেড়ে তুমি যাবে রণচণ্ডীর বেশে – দুর্ব্বলতাকে গোপন করেই বললাম: ওসব নোংরা কাজে গিয়ে লাভ নেই।

প্রসাধনরতা সৌমিত্রী আয়না থেকে মুখ বেঁকিয়ে নিয়ে জবাব দিল: কি বল্লে, নোংরা কাজ? দেখ··এসব কথা আর কখনো বোলো না.... সরকার জানলে তোমাকে পঞ্চমবাহিনী বলে ধরে নিয়ে যাবে।

একথা শুনে আমার বাক্‌ রোধ হ'ল।

কাঁধের'পর দিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে কোমরের দু'পাশে শক্ত করে বাঁধলে কাপড়, আরেকবার মাথার চুলগুলো দু'হাত দিয়ে চেপে তুলে ঠিক করে নিলে।

কাছে এসে বললে, তুমি ত জানো সংসারে কি অনাসৃষ্টি চলছে, চাল নেই, কয়লা নেই, যা দেখছো কনট্রোল দোকানের দশা · তবু যদ রেশন পাই—তা দিব্যি চলে যাবে...

আমতা আমতা করে, বলি: কিন্তু তুমি—

হাঁ, আমার জন্য ভাবছ? আমি ত কচিখুকীটী নই, যে, পথে বেরুলেই পথ হারিয়ে ফেলবো, আর ঘরের কথা ভুলে যাবো। এই ঘর ত তোমাকে আমাকে নিয়েই, লক্ষ্মীটী...

ছোট অবুজ ছেলেকে যেমনি করে বুঝায় তেমনি করে সৌমিত্রী আমাকে অনেকখন বুঝালে। মনে মনে বল্লাম, আজ থেকে সৌমিত্রী তুমি আমার হাতছাড়া।

বল্লাম, তবুও —

দুঃখে তুমি ছোট ছেলের মতো সহজেই ভেঙ্গে পড়ো।

পৌরুষে ঘা দিলে সৌমিত্রী। শ্লেষ কেটেই বল্লাম, মৈত্রী, ঐ কনট্রোলের দোকানই ভাল, পয়সা না থাকে আমি আনবো, দোহাই মৈত্রী, তুমি নিজেকে সংযত করো, কনট্রোল করো—তোমার অসংযমকে।

যে কথাটী ছিল সৌমিত্রীর মনে মনে, সে কথাটা নির্ম্মমভাবেই আজ আমাকে বলল, ভাগ্যিস, পাশকরা মেয়ে বিয়ে করেছিলে তাই রক্ষে, "

জবাব দেবার কিছু নেই এতে, উচিৎ বক্তা উচিত কথাই বলেছে বিপদের মাঝখানে অনেক সময় সৌমিত্রীই রক্ষা করেছে তার পাশকরা বিদ্যা বুদ্ধি খরচ করে! এ-ই ত সে বছর আমার অসুখ হ'লো টাইফয়েড ...সৌমিত্রীকে দেখেছি ঘরে বাইরে আনাগোনা করেছে, পয়সা উপার্জ্জন করেছে·· ধন্যি সৌমিত্রী, তুমি আমার ঘরের গেহিনি নও, বাইরেরও মিতা।

আমাকে নীরব দেখে সৌমিত্রী বুঝলে তার শ্রীমুখের বাণী আমাকে আহত করেছে।

একটু আদর করেই বললে: ক'টা দিন বৈ ত নয়, তোমার চাকরী হ'লেই এ সব ছেড়ে দেবো...।

নীচে পায়ের শব্দ শোনা গেল। পা উঁচু করে উঁকি মেরে দেখলে, 'ত্রাণ সমিতিরই' গাড়ী।

সৌমিত্রী পা বাড়াবার পথে ছোট্ট আলমারিটা খুলে আমাকে দেখিয়ে বললে: এ প্যাকেটে তুলো, এ শিশিতে গ্লিসরিন, এ লেবেল আঁটা শিশিতে টিংচার আওডিন...উপরে কখনো থেকো না, 'সাইরেন' বাজলে সেণ্টার রুমে যেও···লক্ষ্মীটী · বলে দ্রুত ভঙ্গিমায় 'ত্রাণ সমিতি'র বীরাঙ্গনা সৌমিত্রী দেবী ভ্যানিটী ব্যাগ বাঁ হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভাবলাম, আমার প্রতি সৌমিত্রীর অনুরাগ একটুও শিথিল হয় নি! আমি কি করে বাঁচবো, ভাল খাবো—তা নিয়ে ওর চিত্তে ভাবনার বিরাম নাই। কেন জানি মন হঠাৎ ডুকরে উঠল। আমি একেবারে নিভে গেলাম। উঠে দাঁড়াবার আর ইচ্ছে হল না। মিঃ সেনের ওখানে যাবার কথা ছিল, একটা কাজের কথা ছিল · যাক গে · কার জন্য এসব করবো · সৌমিত্রী?...সে তো তার পাথেয় নিজেই খুজে নিতে পারে ··আর আমার...?

অপ্রসন্ন মনে আঁকলাম সৌমিত্রী আর আমার ভবিষ্যত ছবি...। কাগজগুলো খুলে দেখলাম...এ-আর-পি-র সতর্কবাণী ··। 'সাইরেন' বাজলে শ্লিট ট্রেঞ্চএ আশ্রয় নিন বা কোন নিরাপদ এলাকায় থাকুন। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াবেন না... ··।' সতর্কবাণী...সহসা সতর্ক করে দিল সত্যি সত্যি সাইরেণ বাজল।

'এ-আর-পি'র বাণী ভুলবার নয়...বিপদে ধৈর্য্য হারাবেন না···।

ঘরে আমি, সৌমিত্রী বাইরে...ধৈর্য্য কোথায় রাখি বলুন তো? 'এণ্টি-এয়ারক্রেফটে'র শব্দ শোনা গেল · তড়বড় করে নীচে নেমে এলাম। এক ঝাঁক এরোপ্লেন, মধুগুঞ্জন ধ্বনি...জাপানী...সন্দেহ নেই ··এতোকাল রাত্রিতে এসেছে ওরা চুপি চুপি·· এবার দিনের বেলাই হানা দিলে··উঃ দস্যি মায়ের ডানপিটে ছেলে ওরা...এরা নেহাৎ ডাকু·· মানুষের·· যাঃ ঐ তো রীতিমত বোমার শব্দ.. তুলো·· গ্লিসারিণ...তাইত···ওগুলো যে, আল-মারীতেই আছে...এ-আর-পি-র কাগজখানি হাতেই আছে। এরি মধ্যে কে জানি সংবাদ দিল, জাপানী 'প্যারাসুট' দিয়ে নেমেছে...রক্ষা নাই...।

মাথার কলকব্জাগুলো ঢিলে হয়ে গেল · কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সৌমিত্রী কি বেঁচে নেই হবে · মনে মনে বললাম...হে জাপানী, আজকের মত দয়া করো, ভাল ছেলের মত ঘরে ফিরে যাও···।

আবার কে একজন 'রয়টার' বললে: খিদিরপুর ডকে বোমা ফেলেছে, লোকও মরেছে।

দরজা একটু ফাঁক করে গলা বের করে দেখতে যাই···এমনি সময় পিছন থেকে কোঁচা ধরে টান মেরে বলে, মশাই দোর বন্ধ করুন। জবাব দেই মশাই · আমার হয়ে মানে ওয়াইফ—বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বলে উঠেন যাবেন কোথায় পুরন্দরবাবু। মাথা খারাপ হয়েছে না কি?

একঘণ্টা পর 'অল ক্লিয়ার' ধ্বনি হলো। পথে বেরিয়ে পড়লাম সৌমিত্রীর সন্ধানে। হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে চলি। ঐ ত 'ত্রাণ সমিতি', দরজা ধাক্কা মারতেই খুলে গেল...কই কাউকে ত দেখতে পাচ্ছি নে। তবে... আমার মৈত্রী...কোথায় গেল ··

সহসা নজরে পড়ল বাঁ কোণে টেবলের নীচে শাড়ীর...সৌমিত্রী হামাগুড়ি দিয়ে...যাক্‌ যে অবস্থায় 'ত্রাণ সমিতি'র সদস্যা সৌমিত্রীকে দেখতে পেলাম তা বর্ণনা করতে আমার হাসি ও লজ্জা পায়।

হামাগুড়ি দিয়ে সৌমিত্রী বেরিয়ে এলো টেবিলের নীচ থেকে। বাড়ী ফেরবার পথে সৌমিত্রী আমার সাথে একটীও কথা বলে নি।

বীরেন দা'

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এস্-সি,

কু-লোকে অনেক কথাই বলে, কিন্তু সে-সব ধর্ত্তব্য নহে। হয়ত বা ঈর্ষ্যাবশে রটাইয়া বেড়ায়,— মাথায় একটু ছিট আছে, বদমেজাজী! আমরা কিন্তু বলি, বেশ্ লোক বীরেন দা'! মজার মানুষ!

ঈর্ষ্যা না-হইবেই বা কেন? বয়স প্রায় দু'কুড়ি হইতে চলিল তথাপি সংসার-ধর্ম্ম করেন নাই; তাই সংসারের দায়িত্বও স্কন্ধে আসিয়া পড়ে নাই। মার্চ্চেন্ট আপিসে আশি টাকা বেতন সম্বল করিয়া বেশ তোফা আরামে নিশ্চিন্তে নাকে সরিষার তৈল দিয়া কাটাইয়া দিতেছেন। কয়লার দোকানে বা রেশন শপে লাইন ধরিয়া দাঁড়াইবার বালাই নাই, গয়লার হিসাব রাখিবার প্রয়োজন নাই, কাচ্চা-বাচ্চার অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের বিল চুকাইবার ভাবনা নাই, গহনার অভাবে গৃহিণীর ঝঙ্কার শুনিবার দায়ও নাই! তবে আর পরের চোখ না টাটাইয়া যায় কি?

না হয় একটু চট্ করিয়া চটিয়া উঠেন, কিন্তু তাই বলিয়া বদমেজাজী বলিতে হইবে? আমাদের সহিত তো কেমন হাসিয়া হাসিয়া কথা বলেন। এক হাতে কখনো তালি বাজিতে পারে না—বিনা ঘর্ষণে দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে না। অথচ মজা এই, যাহারা তাঁহাকে রাগায় লোকে তাহাদের কোন দোষ দেখিতে পায় না—তাহাদের তরফে কোন দোষ নাই, যত অন্যায় শুধু বীরেনদারই—যদি তিনি উত্যক্ত হইয়া দ্বিতীয় রিপুটিকে আপনার আয়ত্তাধীনে রাখিতে না পারেন। এরকম একচোখেমি ও পক্ষপাতিত্ব নির্ব্বিবাদে প্রতিদিন বরদাস্ত করিতে আমাদের বিবেকে বাধে। তাই আজ দাদার হইয়া একটু ওকালতি করিতেছি— অবশ্য একেবারে নিছক সত্য কথাই বলিতেছি। দাদাকে যদি আপনাদের প্রকৃত ভাল লাগে তবে তাঁহার শুভানুধ্যায়ীদের নিকট হইতে অদূর ভবিষ্যতে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

এই সেদিন অতুলের সঙ্গে যে কেলেঙ্কারীটা হইয়া গেল তাহাতে দাদার হাত কতটুকু? তিনি তো নিমিত্তমাত্র! অথচ সেকথা বুঝিবার মত মস্তিষ্কের স্বাভাবিক উর্ব্বরতা কয়জনের আছে? বড়বাবুও সেদিন খামখা অনেক কথা শুনাইয়া দিলেন। ইহাকে বরাত ছাড়া আর কী বলা চলে? আমরা কিন্তু বাপু হক্ কথা বলিব—দাদার স্বপক্ষে।

আচ্ছা, চুকলি না কাটিলে কি চলিত না? গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে আপিসে বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসিয়া কাজ করিতে করিতে অমন একটু আধটু তন্দ্রা কার না আসে, বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি! তাই বলিয়া ত্রু… সাহেব মরিসনের গোচরে তাহা আনিতে হইবে? বীরেনদার বিশ্বাস অতুলই তাঁহার নামে চুকলি কাটিয়াছে। ছোঁড়াটা এই সেদিনমাত্র আপিসে ঢুকিয়া ইতিমধ্যেই সাহেবের নজরে পড়িয়া গিয়াছে, এবং এর-ওর নামে যা তা বলিয়া সাহেবের মন ভাঙাইয়া দিয়া নিজে আরো প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টায় আছে। দাদা সিনিয়র লোক, তবু অতুলের ইনক্রিমেন্ট তাঁর চেয়ে বেশী হয় কেমন করিয়া! দাদা কি ঘাস-বিচালি ভক্ষণ করিয়া থাকেন যে ইহার অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হইবে? হায় আপিস! মনুষ্যত্বকে তুমি কতখানি নিম্নে টানিয়া আন! বীরেনদা এক একসময়ে ভাবেন, হয়ত বা পায়রার ন্যায় অতুলেরও প্রাণ যাও আছে; নচেৎ যখন তখন সে এরূপ অফুরন্ত তৈল সংগ্রহ করে কোথা হইতে?

এহেন অতুলকে দাদা এক টিপিক্যাল দুর্জ্জন বলিয়া মনে করেন এবং চাণক্য-নীতি অনুযায়ী তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন। অথচ নবাগত অতুল ছোকরা এমন পাজি যে শত নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার পিছনে আঠার ন্যায় লাগিয়া থাকিবে। আমরা কতদিন শুনিয়াছি আপিসে আসিয়া দাদা তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, সে যেন তাঁহাকে না ঘাঁটায়। কিন্তু তাঁহার নিতান্ত গুরুগম্ভীর ওয়ার্ণিংকে অতুল পরিহাসে তরল করিয়া একেবারে বাষ্পীভূত করিয়া দেয়। এরূপক্ষেত্রে দাদা যদি চটিয়া উঠিয়া অতুলের ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষকে তাহার কুকর্ম্মে সাক্ষ্য দিবার জন্য গলাবাজি করিয়া অদৃশ্যলোক হইতে টানিয়া আনেন তবে তাঁহার একার উপর দোষারোপ করা চলে কি?

মেল ডে। সকাল সকাল আমরা আপিসে হাজির হইয়াছি। কাজের তাড়ায় প্রায় নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ নাই। অথচ আজই দাদা আধ ঘণ্টা লেট করিয়া আপিসে আসিলেন। লেটের কারণ আর কিছু নয়— হঠাৎ সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া আবিষ্কার করিলেন, মাথার আধ-ইঞ্চি পরিমিত চুল প্রায় পৌনে এক ইঞ্চিতে উপনীত হইয়াছে এবং এজন্য মস্তক ভারাক্রান্ত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং নাপিত ডাকিয়া কদম-ছাঁট দিতে একটু বেলা হইয়া যাইবে বৈকি।

পালোয়ানী ঢঙে চুল ছাঁটিয়া মালকোঁচা আঁটিয়া নীল সার্টের আস্তিন গুটাইয়া আধ ঘণ্টা লেটে দাদা আপনার সীটে আসিয়া বসিলেন। মুখে মৃদুমন্দ হাসি, হাতে কালিদাসের মেঘদূত। সদ্যবিবাহিত ভাই-পোর উপহার সামগ্রী হইতে এখানা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। কাব্য-চর্চ্চা করিতে কখনো তাঁহাকে দেখি নাই, তাই এক অজানা আশঙ্কায় আপনার অজ্ঞাতেই বোধ হয় একটু শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম।

অতুলটা ফস করিয়া প্রথমেই তাঁহার চুল ছাঁটা লইয়া একটুখানি টিপ্পনী কাটিল, বলিল, কোথাকার সেলুন দাদা? পাছে কথায় কথায় কথা বাড়িয়া যায় এই ভয়ে আমিই তাড়াতাড়ি সে-কথার উত্তর দিলাম। বললাম, অমন সুন্দর পালোয়ানী ছাঁট দেওয়া নাপিত ছাড়া কি তোমার ঐ সেলুনের কাজ? কী যে বুদ্ধি! দাদা খুশি হইয়া গেলেন। আমার পানে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাইলেন। আমি ধন্য হইয়া গেলাম। যাক্, এখুনি একটা রাম-রাবণের পর্ব্বাভিনয় হইত— ঠিকটা একেবারে রগ ঘেঁষিয়া গিয়াছে— বড় ভালে সামলাইয়া লইয়াছি।

আফিসে কাজের অন্ত নাই। এদিকে কর্ম্মযোগী দাদার আজ কাজে মন নাই। সামনে একাউন্ট খুলিয়া রাখিয়া আপন মনে মেঘদূত পড়িয়া চলিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে কেমন যেন উদাস হইয়া যাইতেছেন। দাদার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আমরা ভক্তের দল বিস্মিত হইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছি।

দাদা তন্ময় হইয়া পড়িতেছিলেন। সহসা আবেগ রোধ করা বোধ হয় অসম্ভব হইয়া পড়ায় উচ্ছসিত কণ্ঠে পড়িয়া গেলেন—

…তোমায় দেখে ঘোমটা খুলে
সরিয়ে মাথার ঝাপ্টা চুলে
চাইবে হেসে মুখটি তুলে
বিরহিণীর দল…

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা অনিল, বলতে পারো, এই "ঝাপ্টা চুল" মানে কী? কী রকম ধরণের চুল?

তাঁহার এই আকস্মিক উচ্ছাসে ও অতর্কিত প্রশ্নে আমি প্রথমে হতবাক্ হইয়া গেলাম। পরে একটু হাসিয়া বলিলাম, যে লোক কখনো রসগোল্লা খায়নি, তাকে তার স্বাদ বোঝাব কেমন করে? এসব বোঝানো কি আর উপমায় চলে? বিরহী যক্ষের মর্ম্মবেদনা যদি আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, তা' হ'লে ঝাপ্টা চুলই বলুন আর এলো চুলই বলুন কোনো কিছুই আপনার অন্তর্দৃষ্টিকে প্রতিহত করতে পারবে না— সব অর্থ সহজ হ'য়ে যাবে। দাদাকে এভাবে ঘুরাইয়া বলিলাম, কারণ আমি নিজেও ঝাপ্টা চুলের অর্থ জানি না—অথচ দাদার কাছে এখুনি সেকথা স্বীকার করিতে আমার অভিমানে বাধে।

এমন সময় অতুল পাকামি করিয়া ভারী গলায় বলিয়া উঠিল— ব্যাচিলর মানুষের বিশেষ ক'রে যে লোক কোনোদিন কোনো মেয়ের রেশমের মত চুলকে স্পর্শ করবার বা তার আঘ্রাণ নেবার আশা বা আকাঙ্ক্ষা করতে

পারে না, তার মেঘদূত পড়ার অর্থ কী বলতে পারো? আমি তো স্রেফ্ একটি মাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি।

বলিলাম, কী?

—আর কী! চরিত্তিরটি একেবারে...

অতুলের কথা শেষ হইল না। তাহাকে মুখ খুলিতে দেখিয়া দাদা নিজে মুখ বন্ধ করিয়া প্রথম হইতেই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলেন। এখন ভীম হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, শাট্-আপ্!

স্পষ্টই বুঝিলাম, দাদার কাছ হইতে সেদিন আর কোন কাজ পাইবার আশা নাই—দম দেওয়া কলের গাড়ীর মত অবিরাম কথার গোলাগুলি বর্ষিত হইতে থাকিবে। অথচ মেল ক্লোজ করা চাই। তাই তাড়াতাড়ি মৌনী হইয়া যোগে বসিয়া গেলাম। যোগ দিতে দিতেই বোধ হয় প্রাণ বিয়োগ হইয়া যাইবে! যাক্, দাদা এখন শান্ত হইলেই সুস্থির হইয়া কাজ করিতে পাই। নচেৎ তিনি যেভাবে মুখ ছুটাইতে ছুটাইতে ইঞ্জিনের পিষ্টনের ন্যায় হাত নাড়িতেছেন তাহাতে আমার কাঁচের গ্লাসটির প্রতি মুহূর্ত্তেই অপমৃত্যু ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, দাদা, ও অর্ব্বাচীনটাকে এবারের মত মাফ করুন—আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাচ্ছি।

বীরেনদা আমাকে বড়ো ভালবাসেন। তাই প্রথমে ডিকাইং এ্যাটিচ্যুড দেখাইয়াও পরিশেষে ঘণ্টাখানেক পরে একবার পাড়া ঘুরিয়া আসিয়া ক্রমশঃ শ্রান্ত ও শান্ত হইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য তিনি গেলে অন্ততঃ এক ঘণ্টার মধ্যে আর কাহারও সেখানে প্রবেশ করিবার জো থাকে না। সুতরাং রাগ পড়িয়া আসিবার পক্ষে দু' ঘণ্টা সময় একেবারে নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর বলা যায় না।

...দু'দিন পরে শনিবারে দাদা যখন খোশ মেজাজে ছিলেন তখন ট্রামে আসিতে আসিতে আমাকে তাঁহার মেঘদূত পড়ার ইতিহাস বলিয়াছিলেন।

বছর পনেরো আগে একটি পরিবার দাদার পাশের বাড়ীটায় ভাড়া থাকিত। সেই পরিবারের বি-এ পরীক্ষার্থিনী একটি মেয়ে কালিদাসের অরিজিন্যাল মেঘদূত ভারী সুন্দর সুর করিয়া পড়িত। দাদা সম্ভবতঃ মনে মনে সেই পাঠ-নিরতা মেয়েটিকে লইয়া একটু লোকসানে পড়িয়াছিলেন! তাই সে যখন অনতিপরে বিবাহ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল তখন দাদা তাঁহার জীবন-নাট্য হইতে বিবাহের অঙ্কটি বাদ দিতে মনস্থ করিলেন।

সেদিন ভাই-পোর প্রীতিভোজনোৎসবে তাহার কুটুম্ববাড়ী হইতে যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের সহিত দাদার সেই পূর্ব্বদৃষ্ট মেয়েটিও ছিল। সে-ই নববধূকে মেঘদূতখানি উপহার দিয়া গিয়াছে।

...দাদার উপর আমার মমতা আরো বাড়িয়া গেল।

অনাগত

শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

অনাগত দিনের একটা শীতের আবছা সন্ধ্যা!...

কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঘরের মধ্যে সুর করিয়া স্কুলের পড়া মুখস্থ করিতেছিল। অদূরে সামনের দালানে বৃদ্ধ ঠাকুর্দ্দা আনমনাভাবে বসিয়া কী ভাবিতেছিলেন।...হয়ত অতীত দিনের স্বপ্ন...হয়ত পরকালের চিন্তা! কিম্বা—

হঠাৎ যেন ঠাকুরর্দ্দা সজাগ হইয়া ওঠেন। পাঠরত একটা ছেলের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করেন—কী পড়ছিস্ রে নন্তু? ইতিহাসের পড়া বুঝি? ১৯৩৮ সালের যুদ্ধ?"

নন্তু নামক ছেলেটা, পড়া বন্ধ করিয়া জবাব দেয়—"হুঁ দাদু!"

ঠাকুরর্দ্দার গলার স্বর বদলাইয়া যায়! বয়সোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলেন—"ও আর বই পড়ে তোরা কতটুকু জানতে পারবি বল্? দেখিস্নি তো তোরা সে সব! আর দেখবিই বা কী করে বল? তোর বাবাই বা তখন কতটুকু? সে একদিন গেছে রে!"...

ছেলেমেয়েগুলি ঠাকুর্দ্দার কথায় গল্পের গন্ধ পায়! পড়া বন্ধ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা ঠাকুরর্দ্দাকে ঘিরিয়া বসিয়া পড়ে। আব্দার করিতে থাকে..."বল না দাদু তখনকার গল্প! দরকার কী বই পড়ে? তোমার কাছে শুনলেও তো পড়া হবে? ও দাদু, ব'ল না—"

ঠাকুর্দ্দা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—পিছনে ফেলিয়া আসা রঙীন দিনগুলির... কত স্মৃতি...কত আলো...কত আনন্দ সেখানে জমা হইয়া রহিয়াছে!... ওঃ! কতদিন হইয়া গেল! এই ছেলেমেয়েগুলি তখন কোথায়ই বা ছিল? অথচ মনে হয় এই তো সেদিনের কথা! কত কাছে...যেন হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করা যায়।...

ছেলেদের আব্দারের সুরে স্বপ্ন টুটিয়া যায়। হয়ত একটা অজ্ঞাত দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলিয়া পথ করিয়া লয়।

আত্মসম্বরণ করিয়া ঠাকুর্দ্দা বলেন—"বলছি রে, বল্‌ছি। কিন্তু, তোদের পড়া হবে না? এখুনি মাষ্টার আস্‌বে, না, না, আর একদিন বলব। এখন পড়্‌গে যা।

ছেলেমেয়েগুলি হাসিয়া ওঠে। মিনু বলে, 'ঠাকুর্দ্দা যেন কী। কিছু যদি মনে থাক্‌বে? কাল রোববার না? কাল আবার পড়া কিসের?" সত্যই। কী যে হইয়াছে ঠাকুর্দ্দার? একান্ত জানা কথাগুলিও যে আজকাল কিছুতেই আর মনে থাকিতে চায় না. কেন যে এমন হয়? জোর করিয়া হাসিয়া ঠাকুর্দ্দা বলেন, মনে থাক্‌বে কী রে? বয়েস তো বড় কম হোল না? কিন্তু মিনুদি—আগে এক পেয়ালা চা খাওয়াতে হবে যে ভাই। তা' না হ'লে গল্প তো জম্‌বে না। আর শীতটাও যা' পড়েছে আজ।

মিনুর চেষ্টা ও সুপারিশে চা আসিয়া পড়ে! তোয়াজ করিয়া চা পান করিতে করিতে ঠাকুর্দ্দা বার বার তাঁহার কোটরগত পীতাভ চক্ষুর ক্ষীণ দৃষ্টি সস্নেহে বুলাইয়া লইতে থাকেন একান্ত উৎসুকচিত্ত শিশুদলটার উপর! বড় ভালবাসেন ঠাকুর্দ্দা এগুলিকে! ইহারাই তো তাঁহার অন্তদিনের সঙ্গীসাথী! ইহারা কী তাঁহার পর? লোকে অবশ্য কত কীই বলে? কিন্তু তাহারা কী একবারও ভাবিয়া দেখে ইহারা বৃদ্ধের কত আপনার?...ইহারা যে এই বৃদ্ধেরই ক্ষুদ্রতম রূপান্তর!...নন্তু মিনুর মধ্যেই যে লুকাইয়া আছে এই লোলচর্ম্ম ঠাকুর্দ্দার নবশৈশব!...

ছেলেরা আবার আব্দার আরম্ভ করে! গল্প আরম্ভ করিতেই হয়! ঠাকুর্দ্দা বলিয়া চলেন,—জার্ম্মানীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা...পোলাণ্ড-ডান্‌কার্কের পতন...রাশিয়ার সন্ধিবৈষম্য...জাপানের বর্ব্বরতার কাহিনী!...

কাহিনীতে হয়ত অনেক ত্রুটি থাকিয়া যায়!...ঘটনার পারম্পর্য্য হয়ত সঠিক রক্ষিত হয় না।...অনেক কথা হয়ত বাদ পড়িয়া যায়...কত নূতন কথা হয়ত মিশিয়া যায়! তবু গল্প জমিয়া ওঠে! একটা অশীতিপর বৃদ্ধ ইতিহাসের গল্প বলার ছলে আত্মবিভোর চিত্তে বলিয়া যান আপনার জীবন মধ্যাহ্নের হারাইয়া যাওয়া রৌদ্রমধুর দিনগুলির কথা, আর সুমুখে বসিয়া একদল কচিশিশু তাহাই শুনিতে থাকে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ তন্ময়তায়!...

ইতিহাস নিছক গল্পে রূপান্তরিত হইয়া যায়! কাহিনী প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইতে দেরী হয় না!...ঠাকুর্দ্দা বলিয়া চলেন—"প্রথম যেদিন

কোল্‌কেতায় বোমা পড়ল,—ওঃ! সেদিনও এম্‌নি শীতকাল! তবে, রাত আরও একটু বেশী হবে! বারোটা তো বটেই,···একটা দু'টোও হতে পারে,—ঠিক মনে নেই! খাটের ওপর লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছি আমি, নিচে মেঝেতে শুয়ে আছে তোদের ঠান্‌দি! তার বুকের একপাশে ঘুমোচ্ছে নন্তুর জেঠামণি, আর বুকের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে নন্তুর বাবা! এই—ঠিক এতটুকুন্‌ তখন! আর তোদের কাকু তখনও জন্মায়ইনি!...

ছোট শিশুর দলটী হাসিয়া ওঠে! যেন কতবড় একটা অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনিতেছে! বাবা এতটুকু...কাকু জন্মায়নি!...তাহাদের ঐ অত-বড় বাবা আর কাকু কিনা...! কিন্তু শুনিতে বেশ লাগে! সাতভাই চাঁপার গল্পের চাইতে একটুও খারাপ নয়!...

ঠাকুর্দ্দা তৎক্ষণে আবার আরম্ভ করেন—"হঠাৎ বুম্‌ বুম্‌ আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল! কী হোল? ব্যাপার কী?··· আর কী! বোম্‌ পড়ছে। ভারী সখ হোল দেখ্‌বার...বাইরে চলে এলাম! ওঃ! সে, কী আলো রে ভাই! একটা ক'রে বোম্‌ ফাটে আর আলোর বন্যে ব'য়ে যায়! ঘর দোর সব থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপ্‌তে আরম্ভ করে! মনে হয়, এই বুঝি গেল পড়ে! আর, সে কী আওয়াজ!

শিশুগুলি হাঁ করিয়া যেন গিলিতে থাকে প্রত্যেক কথাটী! ঠাকুর্দ্দার গল্পের ভিতর দিয়া তাহারা যেন নিজেরাও প্রত্যক্ষ করিতে থাকে অন্ধকালো আকাশপথে বোম্‌ ফাটার তীব্র আলো, শুনিতে থাকে তাহার গুরুগম্ভীর ধ্বনি. মাটীটা কাঁপিতেছে বলিয়াই তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস!

ভয়ে ভয়ে মিনু জিজ্ঞাসা করে,—তোমার ভয় কর্‌ছিল না দাদু?" অল্প একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া ঠাকুর্দ্দা বলেন,—"ভয় কিসের? তখনও কী আর আমি এম্‌নি বুড়ো ছিলাম রে? তখন আমার ই-য়া বুকের ছাতি. এক হাতের কব্জি আর এক হাতে ধরা যায় না! হাঁ, ভয় পেয়েছিল বটে তোদের ঠান্‌দি'—"

ঠাকুর্দ্দা হাসিতে থাকেন। যেন কতবড় একটা মজার কথা হইয়াছে। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে কখন যে তিনি সত্য সত্যই নিজের বর্ত্তমানকে অজ্ঞাতে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারেন নাই। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিতে থাকেন, 'জান্‌লি ভাই! সে এক মজা! যত কাঁদে ছেলেদুটো, তত কাঁদে তাদের মা! আমাকে বলে—ভেতরে এসো বল্‌ছি! নইলে আমি গিয়ে বোমার তলায় মাথা পেতে দেব!—শোন কথা! বোমা যেন সত্যিই আমার ছাদে পড়্‌ছে, যে-"

এক ঝলক্‌ ঠাণ্ডা উত্তরের হাওয়া হু-হু করিয়া বহিয়া যায়! শিশুগুলি পরস্পর আরও ঘন হইয়া বসে, দেহসান্নিধ্যের উত্তাপ ভাগ করিয়া লইতে চায়! বৃদ্ধ ঠাকুর্দ্দার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনী ধরিয়া যায়! মোটা র‍্যাপারটায় বেশ করিয়া সমস্ত দেহ জড়াইয়া লইয়াও যেন শীত কমিতে চায় না। কাঁপিতে কাঁপিতে বৃদ্ধ বলেন—"আর একটু চা খাওয়াতে পারিস্‌ মিনুদি? ইঃ! ঠাণ্ডাটা আজ বেশ চেপেই পড়্‌ল রে! রাতে বোধ হয় আরও বাড়বে! দিবি নাকি ভাই?" অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিনু উঠিয়া দাঁড়ায়! মা জেঠিমা হয়ত বকাবকি করিবেন! তবু মিনু বৃদ্ধের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারে না, তাহার শিশুমনের কোথায় যেন বাধে! আহা! শীত করে তো!

মিনু চলিয়া যায়!

বাকীগুলি তাহাদের দাদুর মতই নীরবে মিনুর প্রত্যাগমনের আশায় বসিয়া থাকে। ঢং,···ঢং···ঢং···।

দেওয়ালে টাঙ্গানো বড় ঘড়িটায় দশটা বাজিয়া যায়!

রাত হইয়াছে বৈকি!

হঠাৎ ভিতর মহল হইতে জোরালো মেয়েলী গলার আওয়াজ শোনা যায়, "যা, যা, বাপু! বিরক্ত করিস্‌ নে মিনু! হাঁ, কারও তো আর কোন কাজ নেই। দিবারাত্তির শুধু এক বুড়োর জন্যে চা-ই বরুক্‌! হবে না বলছি, না? বলে দিগে যা"

শিশুগুলি চমকিয়া ওঠে! নন্তু বলে, "এই রে! জেঠীমা—"

মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখা যায়, তাহারা যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া গিয়া কোন না কোন একটী বই খুলিয়া আবার সুর করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে! জেঠীমাকে ইহারা বেশী ভয় করে।

বৃদ্ধ শুনিতে পান, মিনু যেন তাহার জেঠীমাকে মিনতিভরা নিম্নকণ্ঠে কী বলিতে চাহিতেছে। কিন্তু জেঠীমার উচ্চ কণ্ঠে তাহা চাপা পড়িয়া যায়—'জ্বালাসনে মিনু? যা' বল্‌ছি- পড়গে যা! ভারী দরদ হয়েছে দেখি যে। পড়াশুনো ছেড়ে ··আর এই বা কেমন? বুড়োমানুষ—চুপচাপ অক্ষয় বটের মত ব'সে থাকলেই হয়। তা' না, ছেলেমেয়েগুলোর পড়াশুনো চুলোয় দিয়ে খালি ফরমাস খাটানো হচ্ছে। বলতে বাধেও না? খালি চা আর চা। যেন কোন্‌ দুশো দশটা ঝি-চাকর বাহাল করা আছে—তদ্বির করবে। যা' যা', এখন আর হবে না ওসব। আমার নাম ক'রে ব'লে দিগে যা'—"

বলিয়া কাহাকেও দিতে হয় না। বৃদ্ধ নিজেই সব শুনিতে পান।...

একটা আর্ত্ত দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বুকের মধ্যে গুমরিয়া ফিরিতে থাকে।··· হায় রে। এখানে আজ সে আবর্জ্জনা·· স্থান নাই। অথচ, তাহার নিজেরই সংসার। একদিন এই অবাঞ্ছিত বৃদ্ধ হইতেই তো ইহার আরম্ভ... ইহারই প্রত্যেক অণুতম পরমাণু দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রত্যেক শাখা। সেই সাথে ছিল কত আশা···কত কল্পনা · কত ছবি। তাহারই সন্তান তাহারই পুত্রবধূ, তাহারই পৌত্রপৌত্রীগুলি। ইহাদের প্রত্যেকের মাঝেই তো সে নিজে মিশিয়া রহিয়াছে। তবু আজ সে এখানে কেহ নয়। কেন এমন হয়? কেন? কেন?

বৃদ্ধ আর ভাবিতে পারেন না। অক্ষিকোটর ছাপাইয়া অভিমানাহত শিশুর মত জল জমিতে থাকে। ওঃ।

পাশে নতমুখী মিনুও কাঁদিতেছে। ছোট্ট হইলেও বৃদ্ধের ব্যথা সে হয়ত বুঝিতে পারে। তাই বোধ হয়, নিজের অক্ষমতা আর জেঠীমার অপরাধ--- এই দু'য়ের বোঝাই নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়া সে যেন কাঁদিয়া মার্জ্জনা পাইতে চায়।

নিঃশব্দে হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধ তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লন। স্নেহের পরশে মিনু যেন তাহার দাদুর কোলের মধ্যে গলিয়া পড়িতে চায় অবরুদ্ধ আবেগে ছোট্ট দেহটী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে থাকে!

বৃদ্ধও বোধ হয় আর নিজেকে সামলাইতে পারেন না। উপরে আকাশের পানে চোখ তুলিয়া নিঃশব্দে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ফেলিতে থাকেন। যেন কোন্‌ অদৃশ্যের কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে সুবিচার প্রার্থনা করিতে চান! কিম্বা হয়ত কোন অজ্ঞ মানবআত্মার ভুলের জন্য জ্ঞানবৃদ্ধ নিজেই কাঁদিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে চান কোন্‌ অদৃশ্য ক্ষমাসুন্দরের কাছে!

মিনুর বাবা আসিয়া বলেন, "এসব কী হচ্ছে, বাবা? তোমার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান কী কোনদিন হবে না! ঠাণ্ডা লাগিয়ে মেয়েটাকে কী মেরে ফেল্‌তে চাও? এই মিনু—উঠে আয়! আয় বল্‌ছি—

কথা শেষে তিনি নিজেই মিনুকে উঠাইয়া লইয়া যান।

বৃদ্ধের কান্না থামিয়া যায়। নির্ব্বাক বিস্ময়ে তিনি উপযুক্ত পুত্রের আচরণ লক্ষ্য করেন। মিনুকে মারিয়া ফেলিতে চায় তাহার ঠাকুর্দ্দা? যে ঠাকুর্দ্দা···ওরে হতভাগা। এই কোলে...ঠিক এমনি শীতের রাত্রে···এমনি ভাবে তুইও কী সহস্র দিন আসিস নাই? সে কী তোকে মারিয়া ফেলিবার জন্যই? সেই প্রথম বোমা পড়ার রাত্রেও যে শেষ পর্য্যন্ত মায়ের কোল ছাড়িয়া এই কোলে আসিয়াই তবে শান্ত হইয়াছিলি। সেই তুই···কত আদরের খোকা...আজ কি না—ওঃ। ভগবান! আরো কতদিন—

কতদিন এমনিভাবে বাঁচাইয়া রাখিতে চাও? কেন? কোন দরকারে?

গৃহিণী চীৎকার করিয়া ওঠেন—"থাম', থাম বলছি—"

বাধা পাইয়া গল্পপাঠ থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন লাগছে? ভাল হয় নি গল্পটা? না হয় বলো, পাল্টে লিখি।"

উত্তর নাই।

দেখি, গৃহিণী কাঁদিতেছেন। গল্পপাঠ বন্ধ করিতে হইল।

—"কী হোল কী?" মুখে জিজ্ঞাসা করিলেও ভিতরে ঘামিয়া উঠিতেছিলাম। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন—হয়ত অজ্ঞাতে কোন মারাত্মক দোষত্রুটি, কিম্বা এত কষ্ট করিয়া লেখা গল্পটা কী—

বহু সাধ্যসাধনায় কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া গৃহিণী মুখ খুলিলেন। বলিলেন, "মুখে আগুন অমন ছেলেপুলের। আঁটকুঁড়ো আছি আমরা বেশ আছি। দরকার নেই আমার অমন গুণধরে। শেষে কী বুড়ো বাপকে অমন করে—আর করুছেই বা কে? হোল কী ছাই এতদিনে একটা কাণা-খোঁড়াও, না হবার কোন আশাই আছে?"

কথা শেষে দ্রুতপদে গৃহিণী কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

স্পষ্ট দেখিলাম, তাঁহার দুই চক্ষে আবার বর্ষা নামিয়াছে।

অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে। বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছি—গৃহিণী কাঁদিলেন কেন?

কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না।

ভাল কথা। আজ পর্য্যন্ত আমার গৃহিণীর কোল আলো করিতে কোন কাণা-খোঁড়া সন্তানও আসে নাই। হয়ত আর আসিবেও না।

তবু দেখি, গৃহিণী অঙ্গের স্বর্ণাভরণগুলিকে নিয়তই এক এক করিয়া স্থানচ্যুত করিয়া সেখানে যত্নে স্থানদান করিতেছেন নানা আকৃতির অজস্র মানবীয় ও দৈব মাদুলী ও তাবিজের।

বায়ু-পরিবর্ত্তন (নক্সা)

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়, এম-এ

ভাঙ্গা স্বাস্থ্য জোড়া লাগে কিন্তু ভাঙ্গা মন জোড়া লাগে না। ডাক্তার সে কথা বোঝে না। সে বারংবার জিদ্ করিয়া বলিল—আপনাকে বায়ু পরিবর্ত্তনে যেতে হবে।

দীর্ঘকালের একটানা দাসত্বের খাঁচা হইতে বাহিরে আসিয়া নিতান্ত পোষমানা পাখীর মত আমার সামনের দিকে পা বাড়ানর উৎসাহ রহিল না। চিরন্তন জড়ত্বের বাঁধন হইতে মুক্তি পাইয়া রাত্রিশেষে সদ্য-জাগা হরিণের মত কোথায় লাফাইয়া পাড়া মাতাইব—তার জায়গায় কিনা অন্ধকার-বাসী পেচকের মত আমার নির্জ্জন গুহাভবনে বসিয়া চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলাম। বায়ু-পরিবর্ত্তন শব্দের প্রকৃত অর্থ স্থান-পরিবর্ত্তন। তার জন্য অন্য কিছু না হউক, রৌপ্যনন্দিনীর করুণার দরকার!

লক্ষ্মী, সরস্বতী, দৈব, পুরুষকার—সকলে একসঙ্গে ঘোঁট্ করিয়া এ অধমকে দূর হইতে পরিহার করিয়াছেন। কৃপা করিয়াছেন কৃপাময় যম—পুরাণে যাঁকে বলে ধর্ম্মরাজ। দু'টো একটা গাছ লইয়া বোধ হয় বাগান হয় না—নচেৎ কবির কথায় বলিতাম—ঐ ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্যই বোধ হয়—আমার সাজানো বাগান এক নিঃশ্বাসে শুকাইয়া দিয়াছেন। একটি ছোট মেয়ে—মাকে ছাড়িয়া থাকিবে কেমন করিয়া?—ধর্ম্মরাজকে দয়াময় বলিতেই হইবে।

পশ্চিম মুলুকে একটা পাহাড়িয়া জায়গায় আমার ভগ্নীপতি থাকেন। অনেকদিন হইতেই আমার দেহ ও মনের উপর দিয়া কয়েকটা দমকা ঝড় বহিয়া যাওয়ায় ভগ্নী ও ভগ্নীপতি উভয়েই আমাকে সেখানে যাইবার জন্য অতিরিক্ত জিদ্ সহকারে চিঠি লিখিতেছিল। ভগ্নীপতি একটি ছোট রেল ষ্টেশনের মালিক। বায়ু-পরিবর্ত্তন যখন করিতেই হইবে—তখন আর কাল-বিলম্ব না করিয়া বাংলার ক্ষীণ হাওয়া পরিত্যাগ করিয়া বিহারের বিপুলকায় বায়ুর আশায় যাত্রা করিলাম।

ষ্টেশনটি ছোট। লোকজনের ভীড় কম। ফাঁকা মাঠের মাঝে করগেট টিনে ছাওয়া ছোট বাড়ী। যখন দূর থেকে ইঞ্জিনগুলো হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বিশ্রাম নিত—তখন সমস্ত ষ্টেশনের মাটি হইতে ছাদ পর্য্যন্ত কাঁপিত। মহান অতিথিকে অভ্যর্থনা করার তাহার কোন সম্বল নাই—এই আশঙ্কায় যেন এই দরিদ্র কুটীর সহসা চঞ্চল হইয়া পড়িত। ষ্টেশনের উপর দিয়া আড়াআড়িভাবে উত্তর-দক্ষিণে একটি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। উত্তরদিকের গ্রামটি কিছু বড়-সেখানে ছোট একটি বাজার আছে; রবিবারে বুধবারে হাট বসে। ঐ দুই দিন ষ্টেশনের উপর দিয়া বহু লোক চলাচল করে। বাজারের পাশে একটা ছোট নদী—তার কোলেই শ্মশান। সামনে একটা পাহাড়ের সারি চলিয়া গিয়াছে। তাকে দেখিয়া মনে হয়—সে যেন পৃথিবীর পূব-পশ্চিম-ব্যাপী একটা অবিচ্ছিন্ন প্রাচীর—তারও পাশে আছে নতুন জগৎ—কল্পনার ইন্দ্রপুরী। প্ল্যাটফরমের একেবারে পশ্চিমদিকে একটা ছোট শিশুগাছের নীচে একটা আধভাঙ্গা বেঞ্চিতে সকাল-সাঁঝে বসিয়া এলো-মেলো চিন্তার জাল নিতে আমার খুব ভাল লাগিত।

একদিন বিকালে সূর্য্যাস্তের অল্প আগে আমার পাশ দিয়া কাঁচা-পাকা চুল ও ছোট করিয়া ছাঁটা চাপ দাড়ীতে বেশ শোভমান গৌরবর্ণ গম্ভীর প্রশান্তমূর্ত্তি এক বৃদ্ধ ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে কয়েকজন চাকর-বাকরও ছিল।

তখনই ট্রেন আসিল। ষ্টেশনে যাত্রীর ওঠানামা খুব কম। সেদিন অপেক্ষাকৃত ভীড় ছিল। পিছনের কামরা হইতে এক সুসজ্জিত সৌখীন ভদ্রলোক এক যুবতীর সহিত নামিয়া আসিয়া বৃদ্ধকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। অনুমান হইল ইহারা বৃদ্ধের মেয়ে-জামাই। বৃদ্ধ তাহাদের সঙ্গে লইয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে দক্ষিণের গ্রামের দিকে চলিয়া গেলেন।

সেইদিন হইতে প্রায় প্রত্যহ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধকে দাসদাসী লইয়া মহা-সমারোহে লাইন পার হইয়া উত্তরদিকের গ্রাম হইতে তরিতরকারী, মিষ্টান্ন, জিনিষপত্র, কাপড়চোপড় আনিতে দেখিতাম। মনে হইত বৃদ্ধের পূর্ব্বের প্রশান্তি, গাম্ভীর্য্য অনেকটা তরল হইয়া গিয়াছে।

প্রায় মাসখানেক পরে একদিন দেখিলাম বৃদ্ধ উত্তরদিকের গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন—সঙ্গে ছাই রংয়ের গলাবন্ধ কোট-পরা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ীযুক্ত গলায় ষ্টেথিস্কোপ পরা এক ভদ্রলোক আসিতেছেন। বুঝিলাম বাড়ীতে অসুখ। খানিক পরে ডাক্তার ফিরিয়া আসিলেন—বৃদ্ধ কতকগুলি খালি শিশি লইয়া তাঁহার সহিত আসিলেন। দেখিলাম—তাঁর সেই সাময়িক তরলতার মুখোস্টা আবার খসিয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন বৃদ্ধকে আর পূর্ব্বের মত হাটবাজার করিতে দেখিলাম না—কিন্তু তাঁহার ওষুধ বওয়ার বিরাম ছিল না।

একদিন সকালে শববহনকারীদের হরি-স্মরণে চকিত হইয়া পিছনে ফিরিয়া দেখি—কতকগুলি লোক একটি শব লইয়া আসিতেছে—পিছনে আসছেন সেই বৃদ্ধ গায়ে একটা সাদা চাদর জড়াইয়া কুশ কলসী, কাপড় হাতে লইয়া।

আকাশটা মেঘে রোদে আধময়লা। পাশে একটা লাল গাই-যেন চণ্ডিক দেশের ফেরত—চড়চড় করিয়া প্লাটফরমের কোলের দুর্ব্বাঘাসগুলি খাইতেছিল। কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড কালো গরু ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে শিং দিয়া আঘাত করিল। আমার পায়ের কাছে একটা হাড়-জিরজিরে রোগা কুকুর শুইয়া শুইয়া ধুঁকিতেছিল—একটা ভিখারী বালক তাহার মাথায় সজোরে একটা বাড়ী মারিতেই সে আর্ত্তনাদ করিয়া সরিয়া গেল। কি জানি কেন—হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম—এমন সময় আর একবার হরিধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম—তাহারা উত্তরদিকে শ্মশানের রাস্তা ধরিয়াছে।

বৃদ্ধকে আজ যেন পরম প্রশান্ত দেখিলাম। দুঃখ যেন সিদ্ধ পুরুষ গুরুজীর মত তাঁহার সমস্ত তরলতা, চপলতা চঞ্চলতাকে মুছিয়া দিয়া আজ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বৈরাগ্যের পবিত্র চন্দন লেপিয়া দিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল সুখের লঘুতা বিক্ষিপ্ততার চেয়ে দুঃখের শান্ত সমাধি স্নিগ্ধ সৌম্য জ্যোতিতে ভাস্বর।

ক্ষণেকের জন্য বোধ হয়—তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম—বাঁশির শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখি—গাড়ী আসিতেছে। ষ্টেশনে অল্পক্ষণ থামিয়া গাড়ী পুনরায় চলিতে সুরু করিল। যে ভদ্রলোককে সেদিন বৃদ্ধকে প্রণাম করিতে দেখিয়াছিলাম—সে ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীতে চড়িল। আত্মীয়ের কাছে শুনিলাম—বৃদ্ধের কন্যা অন্তঃসত্ত্বা ছিল বলিয়া প্রসবের সময় মায়ের কাছে আসিয়াছিল—আর জামাইও বায়ু-পরিবর্ত্তনের মতলবে দু' মাসের ছুটি লইয়া আসিয়াছিল। মেয়ে যখন পৃথিবীর ধুলো-মাখা ঝড়-খাওয়া হাওয়া একেবারে পরিহার করিল—তখন জামাই আর এ দূষিত বায়ুতে বায়ু-পরিবর্ত্তন করে কেমন করিয়া!

মন আর রাশ মানিল না। পরদিন তল্পীতল্পা বাঁধিয়া আবার রেলের যাত্রী হইলাম। দেহের পরিবর্ত্তন কিছু হইল কিনা জানি না—মনটা আগের চেয়ে আরও ভারী হইয়া গেল!

অন্নদামঙ্গলে মানসিংহ-ভবানন্দ-কৃষ্ণচন্দ্র-প্রসঙ্গ

শ্রীকালিদাস রায়

মানসিংহ-ভবানন্দ-প্রসঙ্গ অন্নদামঙ্গলের একটি প্রধান অঙ্গ। ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর কৃষ্ণচন্দ্র কবির প্রতিপালক। তাঁহারই গুণগান অন্নদার গুণগানের পরই তাঁহার ছিল কবিকৃত্য। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য বঙ্গদেশে আসিলেন—"দেখা হেতু দ্রুত হয়ে নানা দ্রব্য ডালি লয়ে বর্দ্ধমানে গেল মজুমদার।" বর্দ্ধমানে মজুমদারের মুখে মানসিংহ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী শুনিলেন। বিদ্যাসুন্দর পৃথক কাব্য নয়, অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত গর্ভকাব্য। মজুমদারের মুখে ইহা মানসিংহের পরিতোষণের জন্য বিবৃত।

ভারতচন্দ্র যে-ভাবে 'ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ' বলিয়া প্রতাপাদিত্যের বিক্রমগাথার সূত্রপাত করিয়াছিলেন—তাহাতে মনে হইবে, কবি বুঝি প্রতাপাদিত্যের বীরাবদানের কাহিনীই এইবার বলিবেন। কিন্তু রাজভক্ত কবি এক কথাতেই প্রতাপাদিত্যকে হারাইয়া দিয়াছেন। যুদ্ধ একটা হইল বটে, কিন্তু 'বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া প্রতাপাদিত্য তারে।' তারপর মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পিঞ্জরে ভরিয়া দিল্লী লইয়া গেল।

> প্রতাপ-আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।
> ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে॥
> কতদিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত।
> সাক্ষাৎ করিল পাতসাহের সহিত॥
> ঘৃতে ভাজা প্রতাপ-আদিত্য ভেট দিলা।
> ক'ব কত কতমত প্রতিষ্ঠা পাইলা॥

বাঙ্গলার যে দেশভক্ত বীর মানসিংহ-প্রেরিত বেড়ী ও তলবারের মধ্যে তলবার তুলিয়া লইয়া বলিয়াছিল—

> কহ গিয়া ওরে চর মানসিংহ রায়ে।
> বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
> লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
> যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥

সেই প্রতাপাদিত্যের এই শোচনীয় পরিণামের কথা বেশ প্রফুল্ল চিত্তে বিবৃত করিতে গিয়া কবির একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়িল না। একটি বেদনার কথাও কবির মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল না। কবির উদ্দেশ্য প্রতিপালকের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দের গুণগান। ভবানন্দ প্রতাপাদিত্যের শত্রু। মানসিংহকে ভবানন্দ বাংলায় নানা-ভাবে সাহায্য করিয়া ছিলেন বলিয়াই মানসিংহ বিজয়ী হইতে পারিয়াছিলেন। মানসিংহের বিজয়ই ভবানন্দের বিজয়। তবে যে প্রতাপাদিত্যের বিক্রমের অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়া কবি প্রসঙ্গের সূত্রপাত করিয়াছিলেন—তাহার কারণ—বিজয়ীর বিক্রম ও কৃতিত্বকে বড় করিয়া দেখাইতে হইলে বিজিতের বিক্রম ও বীরত্বকেও বড় করিয়া দেখাইতে হয় বলিয়া। ইহা ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতচন্দ্র দেশদ্রোহী ভবানন্দের গুণগান করিয়া ভাটের নিম্নাসনে নামিয়া আসিয়াছেন।

কবি ভবানন্দকে রণবীররূপে দেখাইতে পারেন নাই—কিন্তু তাঁহার বীরত্ব অন্যভাবে দেখাইয়াছেন—তাঁহাকে বাক্যবীর করিয়া তুলিয়াছেন। জাহাঙ্গীর পাতসাহ যখন হিন্দুধর্ম্মের অজস্র নিন্দা করিলেন—তখন ভবানন্দ সহিয়া থাকিলেন না। তিনি মুখের উপর বলিয়া দিলেন—

> দেবদেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়।
> স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায়।
> উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের।
> হায় হায় যবনের কি হবে আখের॥

তাহার ফলে ভবানন্দের কারাবাস। এখন কবির অন্নদার মহিম-কীর্ত্তনের প্রয়োজন। ভক্তের বন্ধনে অন্নদা রাগিয়া গেলেন।

জাহাঙ্গীর বলিয়াছিলেন—হিন্দুর দেবতা ভূত। তাই ভূতনাথ-জায়া অন্নদা ভূতলোকের সমস্ত ভূতকে ডাকিলেন। দিল্লীতে ভূতের উৎপাতে যে কাণ্ড হইল, তৈমুর নাদিরও সে কাণ্ড করিতে পারেন নাই।

জাহাঙ্গীর বিপন্ন হইয়া দেবীর শরণাপন্ন হইলেন এবং মানসিংহের উপদেশে মজুমদারকে মুক্তি দিয়া নিজে বিপদ্ হইতে মুক্ত হইলেন। অন্নদা তখন দয়া করিয়া জাহাঙ্গীরকে দেখা দিলেন। জাহাঙ্গীর তখন মজুমদারকে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন—

দেবীপুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া।
তোমার প্রসাদে আমি দেখিনু অভয়া॥
অধম যবন জাতি তপস্যা কি জানি।
অধর্ম্মেরে ধর্ম্ম বলি ধর্ম্ম নাহি মানি॥
তবে যে আমারে দেখা দিলা মহামায়া।
তার মূল কেবল তোমার পদছায়া॥
অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্পসঙ্গে কীট যেন উঠে সুরমাথে॥ ইত্যাদি।

তারপর যাহা যাহা আছে—তাহাতে কবির কাপুরুষতার চরম প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালা দেশ হইতে বাঙ্গালীর মহাবীরকে মানসিংহ ঘৃতে ভাজিয়া দিল্লীতে লইয়া গেল। আর মজুমদার তাহার বিনিময়েও ভূত দেখাইয়া জমিদারী ফরমান লইয়া আসিল। তাহাও সহ্য হয়। কিন্তু কবির যত আক্রোশ ছিল মুসলমান জাতির উপর, অভয়ার ও তাঁহার সঙ্গী ভূতগুলির মারফতে তাহা ঝাড়িলেন—ইহা বড়ই কাপুরুষতা। ইহাই কি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মুর্শিদাবাদে 'বৈকুণ্ঠবাসের' প্রতিশোধ? অন্নদার ভবিষ্যদ্বাণী স্মর্ত্তব্য—

আলিবর্দ্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে।
নজরাণা বলি বারো লক্ষ টাকা চাবে।
বন্ধ করি রাখিবেক মুর্শিদাবাদে।
মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে।

জাহাঙ্গীরের দিল্লী যে কি ছিল আর জাহাঙ্গীর যে কত বড় প্রতাপশালী সম্রাট্ ছিলেন, ভারতচন্দ্র তাহা জানিতেনও না। ভারতচন্দ্রের কবিকীর্ত্তি দিল্লীতে পৌঁছিবারও সম্ভাবনা ছিল না—এমন কি মুর্শিদাবাদের নবাব কিংবা কোন প্রতাপান্বিত মুসলমানের গোচরে যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই কবি নিশ্চিন্ত হইয়া বাদশাহকে লইয়া নাস্তানাবুদ করিয়াছেন। দিল্লীর সম্রাটের কাল্পনিক বিড়ম্বনায় কৃষ্ণচন্দ্রও প্রাণ ভরিয়া আমোদ উপভোগ করিয়াছেন এবং নিজের পূর্ব্বপুরুষের ভৌতিক কীর্ত্তিতে খুবই গদগদ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, মুসলমান-ভয়ভীত—মুর্শিদকুলিখাঁ ও সরফরাজ খাঁর দ্বারা নিগৃহীত হিন্দু পারিষদগণও খুবই আনন্দ পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, যখন তাঁহারা ভারতচন্দ্রকে আবৃত্তি করিতে শুনিতেন—

বিবিরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল।
পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়ি দিল॥
চিতপাত হ'য়ে বিবি হাত-পা আছাড়ে,
কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে।
কিংবা—বাদশা কহেন বাবা কি কৈল গোসাঁই।
সাত রোজ মোর ঘরে খানাপিনা নাই।
মামুর হইল মোর বাবরুচি খানা।
ঘরে হৈতে নিকলিতে না পারে জানানা॥

এই অংশের কথাবস্তু অতি সামান্য। কবি কথাবস্তুর সৌষ্ঠব বা গৌরবের জন্য আদৌ ব্যস্ত ছিলেন না। ভবানন্দ মানসিংহকে প্রতাপ-দমনে সহায়তা করিয়া দিল্লী যাত্রা করেন, 'রাজাই' পাইবার জন্য। তাহার পর মানসিংহের সুপারিশে, অন্নদার কৃপায় ও ভূতের সাহায্যে ফরমান পাইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর তিনি ঘটা করিয়া অন্নপূর্ণার পূজা করিলেন। অন্নপূর্ণার পূজা-প্রচার হইলে তাঁহার শাপ-মুক্তি হইল। পূজাপ্রচারের জন্য অন্নদার রাজশক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি তাই ভবানন্দকে এই রাজশক্তি প্রাপ্তির সহায়তা করিলেন। তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইল,—ভবানন্দের কথাও ফুরাইল।

এই সংক্ষিপ্ত কথাবস্তুর মধ্যে ভারতচন্দ্র কবিত্বপ্রকাশের অবসর পান নাই। যে সব ঘটনা লইয়া বিস্তৃত বিবৃতির প্রত্যাশা করা যায়—সে সব ঘটনার কথা কবি সংক্ষেপেই সারিয়া লইয়াছেন। যুদ্ধের বর্ণনা কয়েকটি মামুলী ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বারাই নিষ্পন্ন অর্থাৎ সশব্দ পদধ্বনির দ্বারা কবি রণতাণ্ডব প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধ বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যুদ্ধটা মানুষে মানুষে হইতেছে না—হইতেছে শব্দে শব্দে। রণকোলাহলটা শব্দের কেবল ধ্বনির দ্বারাই প্রকাশ করা হইয়াছে। সকল মঙ্গল কাব্যেই তাই। কেবল ঘনরামের যুদ্ধবর্ণনায় একটু বৈচিত্র্য আছে। ভারতচন্দ্রের যুদ্ধ-বর্ণনা অনেকটা মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর যুদ্ধবর্ণনার সঙ্গে মিলে।

মানসিংহ বাংলা হইতে সোজা পথে দিল্লী যান নাই—গিয়াছেন ভারতবর্ষ বেষ্টন করিয়া—তবু এ দীর্ঘ পথের কোন বর্ণনা নাই। দিল্লীর ঐশ্বর্য্য বা জাহাঙ্গীরের রাজসভার সমারোহের কোন বর্ণনা নাই। জাহাঙ্গীর যেন একজন জমিদার মাত্র, আর দিল্লী যেন আর একটা কৃষ্ণনগর মাত্র।

কবি তাই বহু অবান্তর কথা দিয়া কবিত্ব-পুষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। এই কবিত্বও রসিকতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। মানসিংহের সৈন্যসামন্ত বাংলায় বড়বৃষ্টিতে কিরূপ নাজেহাল হইয়াছিল—তাহার বর্ণনা দিয়া কবি রসিকতা করিয়াছেন। দিল্লীর দরবারে হিন্দুমুসলমান ধর্ম্ম লইয়া তর্ক-দ্বন্দ্বেও কিছু রসিকতা আছে। দাসু-বাসুর খেদ রসিকতার একটি দৃষ্টান্ত। দিল্লীতে ভূতের উৎপাতের বর্ণনা করিয়া কবি সেকালের লোকদেয় খুব হাসাইয়াছিলেন। তারপর কবির চূড়ান্ত রসিকতা (সেকালের পাঠকদের বিচারে) প্রকাশিত হইয়াছে—ভবানন্দ রাজ্যে ফিরিয়া গেলে দুই সতীনের কোন্দলে। 'রসিকের স্থানে হয় রসের বিচার।'

দু' সতীনে কন্দল নহিলে রস নহে,
দোষ গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে।

রাণীদের সঙ্গে রাজার মিলন বর্ণনায় ভারতচন্দ্র অবশ্য যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যার বাসরের উল্লেখমাত্র করিয়া ভবানন্দের প্রসঙ্গে বিহার-বর্ণনার আর পুনরাবৃত্তি করেন নাই।

কথার না সহে ভর তুহে কামে জর জর কামক্রীড়া করিল বিস্তর।
ভারত কহিছে সার বিস্তর কি কব আর বর্ণিয়াছি বিদ্যার বাসর।

কবিত্বের পরাকাষ্ঠা ত তাহাতেই দেখানো হইয়াছে—এখানে আবার তাহার পুনর্বর্ণনা কেন ?

কাব্যের অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে তবে কিসে ? অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে কতকগুলি মামুলি কথায়। সে সব কথা পূর্ব্ববর্ত্তী মঙ্গলকাব্যেও নিকৃষ্ট উপাদান হিসাবে পূর্ব্বেই অঙ্গীভূত হইয়াছে।

জগন্নাথ পুরীর বর্ণনা, ডাকিনী যোগিনীর উপদ্রব, গঙ্গাবতরণের পৌরাণিক কথা, সংক্ষেপে রামায়ণ কাহিনী, এয়োদের নামের তালিকা, বাঙ্গালীর ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা* ও রন্ধন-গৃহের উপাদান উপকরণের বিশেষতঃ বিবিধ চাউলের ফিরিস্তি, অষ্টমঙ্গলার কথা সংক্ষেপ—এইগুলি দিয়া এই কাব্যাংশের অঙ্গপুষ্টি করা হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে কবিত্বের কোন বালাই নাই।

এই অংশে ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আছে। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বেও কোন কোন কবি বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু আরবি পারশি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা এক হিসাবে অকারণে। কারণ, তাঁহারা মুসলমান-রাজদরবারের কথা কোথাও বলেন নাই—মুসলমানী পরিবেষ্টনী ও (Environment and atmosphere) সৃষ্টির প্রয়োজন তাঁহাদের ছিল না। যে সব পারশী কথা সেকালে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাঁহারা সেগুলিকে কাব্যরচনায় বর্জ্জন করেন নাই। ভারতচন্দ্র এই অংশে বাঙ্গালায় মোগল অভিযান ও মোগল দরবারের কথা বলিয়াছেন। যথাযথ আবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে এবং রস জমাইতে তাঁহাকে প্রভূত পরিমাণে মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন—এসকল কথা আরবি পারশী ও হিন্দুস্থানীতে বলিলেই উচিত হইত। আমি আরবী পারশী হিন্দুস্থানী বই পড়িয়া শিখিয়াছি—

পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবার পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।

---

* অন্যান্য তালিকার তুলনায় রন্ধনগৃহে প্রস্তুত-করা খাদ্য দ্রব্যের বিশেষতঃ বিবিধপ্রকার অন্নের তালিকায় এই কাব্যে সার্থকতা আছে। কারণ, অন্নপূর্ণার পরিবেষণের জন্য অন্নব্যঞ্জনের ঐশ্বর্য্য অবশ্যই চাই। অন্নপূর্ণার কাছে অন্নভিক্ষার্থী সন্তানের আবেদনটি কবিত্বময় হইয়াছে—

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধ বাড় গিয়া।
পরম আনন্দ দেহ পরমান্ন দিয়া।
তোমার অন্নের বলে অদ্যাবধি আছে গলে
কালরূপী কালকূট অমৃত হইয়া।
এক হাতে অন্নপাত্র আর হাতে হাতা মাত্র
দিতে পার চতুর্ব্বর্গ ঈষৎ হাসিয়া।
তুমি অন্ন দেহ যারে অমৃত কিমিবা তারে ?
সুধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া ?
পরশিয়া অন্ন সুধা ভারতের হর ক্ষুধা
মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া।

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।"

প্রভূত পরিমাণে মুসলমানী শব্দের সমাবেশে ভারতচন্দ্র মানসিংহ-জাহাঙ্গীর-ভবানন্দের কাহিনীটিকে অভিনব একটা ভাষারূপ দিয়াছেন।

ভাষার ভঙ্গী ও পদবিন্যাস যে বিষয়ের অনুগামী হওয়া উচিত এবং ভাষাই যে বিষয়বস্তুর পরিবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে পারে, ভারতচন্দ্র তাহা বুঝিতেন। ভাষাশৈলীর দিক হইতে ভারতচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে একজন গুরু ও রীতিপ্রবর্ত্তক এবং বর্ত্তমান 'যাবনীমিশাল' বাংলা ভাষার সূত্রপাত ভারতচন্দ্র হইতেই হইয়াছে একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। এই ভাষাই যে তাঁহার বর্ণিত আখ্যানবস্তুর সম্পূর্ণ উপযোগী তাহা সেকালের পাঠক ধরিতে না-ও পারে। সেই জন্য তিনি একটু কৈফিয়ৎ দিয়া বলিয়াছেন—

প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন ক'য়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥

কেবল অন্নদামঙ্গলের শেষ পরিচ্ছেদে নয় বিদ্যাসুন্দরে ও অন্নদামঙ্গলের অন্যান্য লৌকিক অংশেও কবি মুসলমানী কথার প্রচুর প্রয়োগ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র পল্লীর কবি নহেন—তিনি নগরের কবি,—নবাবের আশ্রিত রাজার আশ্রিত কবি, ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরের কবি। সেকালের সভ্যতা-শিক্ষা, নাগরিক জীবন, রাজ রাজড়ার দরবার এবং ঐশ্বর্য্যপ্রতাপ—সমস্তের মালিক মুসলমান। কাজেই মুসলমানী ভাষা তখন নাগরিক সভ্যতারই ভাষা। এই ভাষাকে এড়ানো লোচনদাস নরহরির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, তাঁহার পক্ষে সম্ভবও ছিল না—স্বাভাবিকও ছিল না। মুসলমানের সৌভাগ্যের যুগেই এই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্র এই ভাষার সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন।

এই যুগের—"ভাষাই বঙ্গদেশে হিন্দুর দুর্ভাগ্য ও মুসলমানের সৌভাগ্যের প্রমাণ দিতেছে। হিন্দুর গাঁ, মুসলমানের শহর, হিন্দুর কুঁড়ে ঘর, মুসলমানের দালান ইমারত। শস্য কর্ত্তিত হইয়া যখন মুসলমানের সেবায় লাগে তখন তাহা ফসল। ক্ষুদ্র মেটে প্রদীপটি মাত্র হিন্দুর। ঝাড়, ফানুস, দেওয়ালগিরি ও শামাদান—সমস্ত বিলাসের আলোই মুসলমানের। হিন্দু অপরাধ করিলে কাজী মেয়াদ দেয়। বাদশাহ, ওমরাহ, উজীর, নাজির, পেয়াদা, বরকন্দাজ, নফর সব মুসলমানী শব্দ—জমি জোত তালুক মুলুকও তাই।—কিন্তু স্বভাবের চন্দ্র সূর্য্য তরু ফুল পল্লবে হিন্দুর অধিকার যোচে নাই। পল্লীবাসী হিন্দু নিজের অন্তঃপুরে, ধর্ম্মটিতে ও প্রকৃতির মূর্ত্তিতে মুসলমানের ছায়া স্পর্শ করিতে দেন নাই"।

তাই অন্নদামঙ্গলের পৌরাণিক অংশ, বীরসিংহের অন্তঃপুর ও গাঙ্গিনী তীরের নাবিকটির কথায় মুসলমানী শব্দের ছোঁয়াচ বা আঁচ লাগে নাই।

অন্নদামঙ্গলে সেকালের ইতিহাস সামান্য কিছু পাওয়া যায়। এই ইতিহাসটুকু কেবলমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তি ও অন্নদার মহিমা-প্রচারের জন্যই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সুজাখাঁর পুত্র সরফরাজখাঁ ছিলেন বাংলার নবাব। আলিবর্দ্দি ছিলেন পাটনার শাসনকর্ত্তা। আলিবর্দ্দি সরফরাজকে গিরিয়ার

যুদ্ধে বধ করিয়া বাংলার মসনদ অধিকার করিলেন। দিল্লীর বাদশা তাঁহাকে মহাবৎজঙ্গ উপাধি দিলেন। কটকে কুলি খাঁ ছিলেন নবাব। তাহাকে দূর করিয়া আলিবর্দ্দি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সৌলদজঙ্গকে (সৈয়দ আহ্‌মদ?) উড়িষ্যার মসনদে বসাইলেন। মুরাদ বাখর সৌলদকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করিল। আলিবর্দ্দি এ সংবাদ শুনিয়া সসৈন্যে উড়িষ্যায় গিয়া মুরাদকে যুদ্ধে হারাইয়া ও তাড়াইয়া সৌলদকে খালাস করিলেন। কটক হইতে যুদ্ধ জয় করিয়া আলিবর্দ্দি ভুবনেশ্বরে আসিয়া খুবই দৌরাত্ম্য করিলেন। কবি বলিয়াছেন—নবাব এই দৌরাত্ম্যের দণ্ড লাভ করিলেন বর্গীদের হাতে! ভুবনেশ্বরের সেবক নন্দী ত রাগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি দিতে চাহিয়াছিল।

শিব বলিলেন—"না না, এখানে রক্তারক্তি করে কাজ নেই—আমার ভক্ত বর্গীরাজকে স্বপ্ন দাও—সেই ব্যবস্থা করবে।" ইহারই ফলে বর্গীর উপদ্রব। বর্গীর উপদ্রবে আলিবর্দ্দি বিব্রত হইলেন বটে, কিন্তু হিন্দু প্রজাদেরই ত সর্ব্বনাশ হইল। কবি কৈফিয়ৎ দিয়া বলিলেন—নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়? এ কৈফিয়ৎ একেবারেই জোরালো নয়। কারণ,—'বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়।' এমন কি ধার্ম্মিকের চূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্র রায়েরই মহাবিপদ ঘটিল। 'মহাবৎজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়। নজরাণা ব'লে বারো লক্ষ টাকা চায়।' এদিকে বর্গীরা দেশ লুটিয়া লইল—কৃষ্ণচন্দ্র কোথা হইতে টাকা দিবেন? তাঁহাকে আলিবর্দ্দি মুর্শিদাবাদে বন্দী করিয়া রাখিলেন। তিনি দেবীপুত্র, তিনি চৌত্রিশ অক্ষরে দেবীর স্তব করিলেন। বলা বাহুল্য, চৌত্রিশ অক্ষরের স্তব শুনিলে দেবী আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। তিনি অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া বলিলেন—"যাও বৎস, তুমি কবি ভারতচন্দ্রকে আদেশ কর গিয়া আমার মঙ্গল গান গাইবার জন্য আর চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে আমার পূজা কর। তোমার আর ভয় নাই।" গ্রন্থের সূচনা ইহাতেই হইল। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র কি করিয়া উদ্ধার পাইলেন, সে কথা কবি বলিলেন না। যাহাই হউক, বর্গীরা বঙ্গদেশকে বার বার লুণ্ঠন করিয়া নিরন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। সেই নিরন্ন দেশে যদি কোন দেবীর পূজা করিতে হয়, তবে যে অন্নপূর্ণারই পূজা করিতে হইবে এবং যদি কোন দেবীর মঙ্গলগান গাইতে হয় তবে যে অন্নদারই মঙ্গল-গান গাহিতে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কবি তাই গোড়াতেই নিরন্ন দেশের একমাত্র উপাস্যা অন্নপূর্ণার স্তব করিয়া বলিয়াছেন—

কৃপাবলোকন কর ভক্তের দুরিত হর দারিদ্র্য দুর্গতি কর চূর্ণ।
তুমি দেবী পরাৎপরা সুখদাত্রী দুঃখহরা অন্নপূর্ণা অন্নে কর পূর্ণ।

ইহা অন্নের কাঙাল, নিঃসম্বল, হৃতসর্ব্বস্ব হতভাগ্য সমগ্র দেশের পক্ষ হইতেই কবির কাতর প্রার্থনা।

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী (উপন্যাস)

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আট

পর পর বেরোল তিনখানা গাড়ী। একখানা রামনাথের, একখানা বৈজুর, আর একখানা সুরযের। গাড়ীতে যাবে জিনিস-পত্র, লোহা-লক্কর, যন্ত্রপাতি আর মেয়েরা। কৃপাপুরের কামারেরা যখন দল বেঁধে কোথাও বেরিয়ে পড়ে, তখন সহধর্ম্মিণী মেয়েরাও চলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। অনেকটা প্রাচীন কালের বণ-যাত্রার মতো। দাঙ্গা হাঙ্গামার দরকার হলে ওদের মেয়েরাও সঙ্গে হাতিয়ার ধরে। তা ছাড়া শত্রুর অভাব নেই। দু' একজন অথর্ব্ব বুড়ো অথবা বুড়ি ছাড়া যুবতী মেয়েদের অনেকটা অরক্ষিত ভাবে গ্রামে ফেলে যাওয়া ওরা নিরাপদ মনে করে না।

গাড়ী সাজানো সুরু হল। হাতুড়ি, হাপর, ছেনী, লোহার টুকিটাকি। বড় বড় পাকা বাঁশের লাঠিগুলো মরদদের হাতে, ওরা পেছনে পেছনে হেঁটে যাবে। মেয়েরা আজকের দিনে বিশেষ ভাবে প্রসাধন করেছে, রঙীন শাড়ী পরেছে, গায়ে রূপোর গয়না। কটাক্ষগুলি চঞ্চল আর উৎসুক হয়ে উঠেছে। নানা গোলমালে গত দু' বছর ওরা মেলায় যায়নি, তাই এবারে উৎসাহ আর উদ্যমটা কিছু বেশী।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বেঁকে বসল রামনাথ।

—না রে, তোরা যা চলে। আমার শরীরটা ভালো নেই, আমি আর যেতে পারব না।

সমস্ত কামারপাড়া বিস্ময়ে হতবাক।

—সে কি কথা তাউই!

—না, আমি যাব না।

সুরয হো হো করে হেসে উঠল।—ভয় করছে? মেলায় তোমার নতুন বউ হারিয়ে যাবে নাকি?

কিন্তু এ কথাতেও রামনাথ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল না, দপ দপ করে ওর চোখে জ্বলে উঠলনা সেই স্বভাবসিদ্ধ প্রখর দৃষ্টি। ম্লান আর বিমর্ষ মুখে রামনাথ শূন্য দিগন্তের দিকে নিরুত্তরে তাকিয়ে রইল। কর্দ্দমাক্ত বিলের জলে তাল গাছের ছায়া কাঁপছে। শংখচিল উদগ্রীব হয়ে বসে আছে সেই তাল গাছের ওপর—তার সমস্ত ধ্যান জ্ঞান তপস্যা ওই বিলের দিকে নিবদ্ধ। কখন একটা দুর্ভাগা গজাল মাছ নিঃশ্বাস নেবার জন্যে চকিত মুহূর্ত্তে জলের ওপর ভেসে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা ছোঁ দিয়ে—

সুরয বললে, ভয় নেই, আমরা পাহারা দেব বউকে।

অন্য সময় হলে রামনাথ বলত, হুঁ, পাহারা দেওয়া যাবে, নিজেরা ভালো করে গ্রাস করবার মতলব!—আর সঙ্গে সঙ্গে এক হাত পরিমাণে একটা জিভ কাটত সুরয। নীচু হয়ে রামনাথের পায়ের ধুলো নিয়ে বলত: ছি ছি তাউই, আমাদের কি নরকের ভয় নেই!

কিন্তু আজ সব কিছুই অস্বাভাবিক আর স্বতন্ত্র। রামনাথের মনের সুর কেটে গেছে। কোথা থেকে দেখা দিয়েছে সংশয়

দোলা লেগেছে নিজের যা কিছু বিশ্বাসের ভিত্তিতে। ঘর—ঘর—ঘর। ঘরের এত মায়া এ কথা কি রামনাথ আগে জানত কোনোদিন? সবুজ ফসলে সোণালি সম্ভাবনা আজ ওর চোখে মুখে স্বপ্নের মায়া পরশ বুলিয়ে দিয়েছে। এখন বিলের জলে চাঁদ নিজেকে হারিয়ে ফেলে, এখন মহুয়া বন থেকে পাপিয়ার ডাক শোনা যায়। রক্তের জোর মরে গেছে, তাই কামনা নিয়েছে প্রেমের রূপ। একদিনের সেই ধূ—ধূ করা পথ, আশ্রয়হীন শূন্য দিগন্ত—সে সব এখন গত-জীবনের দুঃখের স্মৃতি। সোনাদীঘির মেলাকে আশ্রয় করে আবার সেই অনিশ্চয়তা আর সংঘাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া—না, রামনাথকে দিয়ে তা আর হবার নয়।

বৈজু কামার সামনে এসে দাঁড়াল। রূপাপুরের কামারই বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য জাতের লোক। ক্ষীণজীবী মানুষ, পেশীতে জোর নেই, সুরয বা দূরবিস্মৃত কেশোলালের মতো উগ্র বন্যতায় তার চোখ দপ দপ করে ওঠেনা। কিন্তু তবু বৈজুকে মান্য করে সকলে, ভয়ও করে অনেকে। লোকটা কুটিল আর কূটবুদ্ধি। জীবনের একটা দীর্ঘ সময় সে কাটিয়েছে সহরে, কাটিয়েছে কলকাতাতে। গাঁজা, চণ্ডু, চরস, মদ, ভাং কিংবা কোকেন—সমস্ত নেশায় সে বিশারদ। সারা গায়ে এক সময় বিষাক্ত ক্ষত চিহ্ন ফুটে উঠেছিল—এখন তাদের শুকনো কালো কালো দাগগুলো ইন্দ্রের সহস্র-লোচনের মতো তাকিয়ে আছে। তারপর থেকেই সহর ছেড়েছে বৈজু—সহরে শুধু অমৃতের পাত্রই যে পরিপূর্ণ নয়, সেখানে বিষও আছে—এই সত্যটা ভালো করে অনুভব করেছে সে। গ্রামে ফিরে মন দিয়েছে বিষয়-কর্ম্মে। বৈজুর হাত পরিষ্কার, এমন চমৎকার কাজ রূপাপুরে কেউ করতে পারেনা। শুধু তাই নয়। লোকে বলে সিসা আর রাঙের কাজেও তার জুড়ি নেই। নবাবপুরের কোন্ মহাজনের সঙ্গে তার বন্দোবস্ত আছে কে জানে, ওর তৈরী টাকা, সিকি, আধুলি নাকি সরকারী জিনিষের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলতে পারে। পুলিশ দু'একবার ও সব জিনিষের সন্ধানে এ তল্লাটে হানা দিয়েছে, বৈজুকে ডেকেও নিয়ে গেছে থানায়, কিন্তু কিছু বার করতে পারেনি!

বৈজু বললে, তুমি যাবেনা মানে? কুমার বাহাদুরকে জবান দিয়েছি আমরা।

রামনাথ তবু নিরুত্তর হয়ে রইল।

—রূপাপুরের কামারেরা জবান ভাঙেনা কোনোদিন। তুমি না গেলে রহমগঞ্জের সেখদের সঙ্গে লাঠি ধরবে কে? এরা তো একটা চোট খেলে চিৎ হয়ে পড়বে।

—কেন, সুরয!

বৈজু হাসল।—হাঁক-ডাক করলেই মরদ হয় না, মুরোদ চাই।

সুরযের হাতের গুলি শক্ত হয়ে উঠল মুহূর্ত্তের মধ্যে।

—মুরোদটা একবার পরখ করব নাকি তোর সঙ্গে?

বৈজু একবিন্দু বিচলিত হ'ল না। সাপের মতো কুটিল আর অত শীতল চোখ পলকের জন্যে পড়ল সুরযের মুখে।

—তা ক্ষতি নেই।

অত্যন্ত সুস্পষ্ট সংকেত। রূপাপুরের কামারদের বেশি আয়োজন দরকার হয় না। শক্তির অভাব যেখানে, গলার জোড়-জোড়টা সেখানেই বেশি। দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়াল। কিন্তু সংশয়টা দেখা দিল সুরযের মুখেই। বৈজুর গায়ে ওর মতো শক্তি নেই এ-কথা সত্যি, কিন্তু কাপড়ের ভেতর থেকে একখানা ছোরা বের করতে তার সময় লাগে না। দু'জনের মাঝখানে রামনাথ এসে দাঁড়াল।

—নিজেরাই মারামারি করে মরবি নাকি এখন! গায়ের জোর কার কত সে পরখ পরে হবে। কিন্তু আমি যাব না। কুমার বাহাদুরের কাজ নিয়েছিস, তোরাই করবি।

সুরয বাঘের মতো ফুলছিল। বৈজুর ওপর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেল্‌ল সে। আচ্ছা দেখা যাবে। অপমান সহ্য করবার পাত্র সে না। বৈজু কিন্তু হাসল। সাপের মতো তীক্ষ্ণ আর শীতল দৃষ্টি।

সুরয রুদ্ধশ্বাসে বল্‌লে, আর ভাগের বেলায়!

এবার রামনাথও হাসল। বল্‌লে, সে ভাবনা ভাবতে হবে না। তার সবই তোদের।

কথা চলছিল রামনাথের দাওয়ায় বসে। ঠিক এই সময় ঘরের ভেতর থেকে ঠনঠন করে শিকল নড়ে উঠল। সমস্ত আবহাওয়াটা যেন বদলে গেল মুহূর্ত্তের মধ্যে—যেন একটা গুমোট অতৃপ্তির ভেতরে খানিকটা মুক্তির ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল।

বৈজু বল্‌লে, যাও তাউই, তোমার ডাক পড়েছে। শুধু আমাদের না বললেই তো হবে না—নতুন বউয়ের মত নিয়ে এসো আগে।

রামনাথ বললে—থাম হতভাগা।

ঘরের ভেতরে শিকলটা নড়তে লাগল অধৈর্য্যভাবে। জরুরি তাগিদ। রামনাথ উঠে পড়ল। তারপর বেরিয়ে এল একটু পরেই।

—আচ্ছা যাব, তোদের সঙ্গেই যাব। যা থাকে কপালে।

তিরিশটা করাতের মতো প্রখর শব্দ করে তিরিশজন কামার একসঙ্গে অট্টহাসি করে উঠল। সে হাসির শব্দে বিলের জলে লাগল চমক, তালগাছের মাথার ওপর থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে মৎস্যলোভী শংখচিলটা উড়ে চলে গেল রৌদ্র-ঝকিত নীল-দিগন্তে।

পর পর বেরোল তিনখানা গাড়ী। বৈজুর গাড়ীতে উঠেছে ভানী, কামারপাড়ার আরো তিন চারটি মেয়ে। অপাঙ্গকুটিল কটাক্ষে ভানীর দিকে একবার তাকালো বৈজু, তারপর মহিষ দুটোর লেজে শক্ত করে মোচড় লাগালো। লোহা-বাঁধানো ভারী চাকায় বিদীর্ণ পথটাকে আরো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে গাড়ীটা ছুটে চলল ঘড় ঘড় করে—পেছনে লাঠি হাতে যে-সব পুরুষেরা আসছিল, ধূলোর কুয়াশায় মুহূর্ত্তে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল তারা।

*   *   *

কুমার বিশ্বনাথের বৈঠকখানায় বেশীক্ষণ বসলেন না হরিশরণ। তিনি কাজের লোক, বিশ্বনাথ কাগজপত্র সই করে দিতে অবহেলা-ভরে ভাঁজ করে তিনি সেখানাকে পকেটে পূরলেন, একবার পড়েও দেখলেন না পর্য্যন্ত। এ-সব সামান্য ব্যাপারে খুব বেশি পরিমাণে মনোযোগ দেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আর ক'টাই বা

টাকা। বড় জোর পাঁচ হাজার। একটা টী-পার্টিতেই পাঁচ হাজার টাকা বেরিয়ে যায় লালা হরিশরণের। ইচ্ছা করলে—

কিন্তু হরিশরণের উদ্দেশ্য পাঁচ হাজার টাকা নয়। এই কুমারদহকে ধ্বংস করতে হবে---দেবীকোট রাজবংশকে লুটিয়ে দিতে হ'বে ধূলোর নীচে। ইতিহাসের পাতা থেকে, জনশ্রুতি থেকে, কুমারদহের আকারহীন, অর্থহীন শূন্য দম্ভ থেকে এই কথাটাকেই নিঃশেষ করে মুছে দিতে হবে যে রাঘবেন্দ্র রায় বর্ম্মার ঘোড়ার সহিস ছিল রামসুন্দর লালা।

আর কুমারদহ! কী আছে কুমারদহের? বহুদিন পরে আজ চোখ মেলে লালাজী কুমারদহের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন। ভাঙা বাড়ী, মজা দীঘি, অপব্যয়, ব্যভিচার আর জীর্ণতার প্রেতমূর্ত্তি। একে শেষ করে দিতে হবে। কুমারদহের তলা দিয়েই বয়ে গেছে নীলস্রোতা কাঞ্চন---আর ঠিক দশ মাইল দূরে রেলের ইষ্টিশন। রাঘবেন্দ্র রায় বর্ম্মার সাতমহলা বাড়ী যেখানে অজগর-জঙ্গলে দুর্গম হয়ে আছে, ওখানে বসতে পারে মস্ত বড় গঞ্জ---নবীপুরের মতো সমৃদ্ধ বিরাট বন্দর। তা ছাড়া কিছুদিন থেকে আরো নানা রকমের প্ল্যান ঘুরছে লালাজীর মাথায়। কয়েকটা চাউলের কল এখানে বসালে কেমন হয়? খুব মন্দ হবে না বোধ হয়! আর পাঁচ সাত বছরের মধ্যে একটা মোটর চলবার মতো পাকা রাস্তা ষ্টেশন পর্য্যন্ত টেনে নেওয়াও খুব শক্ত হবে না। এই মৃত, বিষাক্ত কুমারদহ নতুন ক'রে গড়ে উঠবে প্রাণের ঐশ্বর্য্য নিয়ে, যান্ত্রিকতার নতুন স্বাস্থ্যে। তখন এর নাম কি হবে? নাম হবে হরিশরণপুর।

বিশ্বনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঠিক এই জিনিসগুলোই লালাজীর মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আর একটা চিন্তাও তারি সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্নমুখ ঝাঁটার মতো খচ খচ করে বিঁধছিল। কালীবিলাস কুণ্ডুর মৃত্যুটা অত্যন্ত সন্দেহজনক। কী কথা বলতে এসেছিল, কুমার বিশ্বনাথের সঙ্গে কী কী দরকার ছিল তার। আলকাপ দলের ব্যাপার কী? আজ তো তাদের নবীপুরে পৌছবার কথা ছিল—কিন্তু। নাঃ, যাওয়ার পথে শোভাগঞ্জের হাট ঘুরে ব্রজহরি পালের খবরটা একবার নিয়ে যেতেই হবে।

বিশ্বনাথ বললেন, "তা হলে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।"

লালাজী হাত জোড় করলেন।

—মাপ করবেন, অসময়ে চা আমার চলে না। আচ্ছা আমি তা হলে আসি—রাম রাম।

লালাজী বের হ'য়ে গেলেন। বেরোবার পথে দরজার গায়ে কী একটা খটাস ক'রে আটকে গেল এক মুহূর্ত্তের জন্যে—লালাজীর পকেটের সেই পিস্তলটা। থমকে থেমে দাঁড়ালেন তিনি, পকেটে হাত পুরে অস্ত্রটাকে টিপে ধরলেন, তারপর দ্রুত গতিতে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। এটা কি কোনো কিছুর একটা আসন্ন সঙ্কেত! অস্ত্রটা কি সুনিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিল—শুধু পকেটের মধ্যে নিশ্চিত হ'য়ে বিশ্রাম করাই তার কাজ নয়, একটা রক্তাক্ত কর্ত্তব্যের প্রেরণাতে সে উন্মুখ হ'য়ে আছে?

আর এদিকে জলন্ত চোখে টেবিলের ওপরে রাখা নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন বিশ্বনাথ। ওগুলো যেন নোট নয়—এক-রাশ তীক্ষ্নধার অস্ত্রের মতো তাঁর হাতের সামনে ছড়িয়ে র'য়েছে। কেন কে জানে, নোটগুলো স্পর্শ করতে বিশ্বনাথের কেমন একটা ভয় আর সংশয় বোধ হ'তে লাগল। মনে হ'ল: ওদের প্রত্যেকটি যেন ছুরির ফলার মতো বিদ্ধ হ'য়ে তাঁর বুককে বিক্ষত আর রক্তাক্ত ক'রে দেবে।

শিউরে নোটগুলোর ওপর থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। ওগুলো ব্যোমকেশের হাতে তুলে দিতে হবে—টাকার জন্যে ব্যোমকেশ হন্যে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কালই সদরে খাজনা পাঠাতে হবে, নইলে সব মহলগুলো একসঙ্গে লাটে চড়ে যাবে। আর নীলামে কিনে নেবার জন্যে লালা হরিশরণই এগিয়ে আসবেন সর্ব্বাগ্রে। সদর! একবার সদরের ওই কাগজ-পত্রের স্তূপে যদি আগুন ধরিয়ে দেওয়া যেত—উড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ ক'রে দেওয়া যেত সমস্ত! কী দিন গেছে রাঘবেন্দ্র রায় বর্ম্মার আমলে। দেবীকোট রাজবংশ—রাজা তারা। ইজারাদার দেবী সিংহ দু'হাতে বাংলা দেশকে লুটে নিয়েছে বটে, কিন্তু সেদিনের জমিদারের ক্ষমতাও ছিল তেমনি সীমানাহীন, তেমনি অব্যাহত। হাসমারীর খাড়িতে হাঁটু কাদার তলায় সন্ধান করলে বহু বিদ্রোহী প্রজার শ্যাওলা-পড়া কঙ্কাল আজও তুলে আনা যায়।

বেলা তিনটার কাছাকাছি। অস্নাত, অভুক্ত বিশ্বনাথ, অস্বাভাবিক উত্তেজনায় শিরাগুলির মধ্যে প্রখর বিদ্যুতের দীপ্তি বয়ে যাচ্ছে। একটু স্নান করে বিশ্রাম নিতে পারলে শরীরের আগুনটা বোধ হয় অনেকখানি জুড়িয়ে যেত। কিন্তু বিশ্রাম! বিশ্রামের কথা ভাবতেই মনে পড়ল অন্তঃপুরের কথা—মনে পড়ল অপর্ণাকে। আশ্চর্য, অপর্ণার অবজ্ঞাটা অনুভব করেই কি বিশ্বনাথ আজ তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠলেন!

টেবিলের ওপর রাখা নোটগুলো তখনো আগুনের হলকার মতো জ্বলছে। আর একবার সেদিকে তাকিয়ে বিশ্বনাথ এক কোণের কাচের আলমারী খুললেন। মদের বোতল, গ্লাস, কর্ক, স্ক্রু।

এমন সময় আবার মতিয়ার আবির্ভাব।

—হুজুর?

আরক্ত প্রচণ্ড দৃষ্টিতে বিশ্বনাথ যেন মতিয়াকে দগ্ধ করবার উপক্রম করলেন।—কী চাই?

বিশ্বনাথের চটির ঘা খেয়ে পিঠ শক্ত হ'য়ে গেছে মতিয়ার। সে ভয় পেল না! একবার দ্বিধা ক'রে বললে, রাণীজী ডাকছেন।

সম্পূর্ণ অনিশ্চিতভাবে বিশ্বনাথ কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির হ'য়ে রইলেন। পায়ের চটিটাই খুলবেন, না—শিসের ভারী কাগজ-চাপাটা ছুঁড়ে মারবেন মতিয়ার মাথায়? কিন্তু বিশ্বনাথ কিছুই করলেন না। কী ভাবলেন কে জানে, তারপর ওই অভিশপ্ত নোটগুলোকেই মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধ'রে বললেন, চল্ হারাম-জাদা, কোন জাহান্নামে যেতে হবে।

মতিয়া একগাল হাসল।

—আজ্ঞে না, জাহান্নামে নয়, রাণীজী ডেকে পাঠিয়েছেন।

চলতে চলতে বিশ্বনাথ থেমে দাঁড়ালেন। পেছন ফিরে বললেন, বেশী ইয়ার্কী দিবি তো একদম খুন ক'রে ফেলব রাস্কেল কোথাকার।

—ক্রমশঃ

আকবরের রাষ্ট্রসাধনা

এস, ওয়াজেদ আলি, বি,এ (কেন্টাব), বার-এট-ল

আটষট্টি

মুসলমানেরা প্রথমতঃ ভারতবর্ষে বিজেতা হিসাবেই এসেছিলেন। ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ক'রে, মুসলমানদের নিয়ে ভারতে হিন্দুদের শাসন করা, এই ছিল প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের আদর্শ এবং লক্ষ্য, কিন্তু সে আদর্শ বেশী দিন টিকতে পারল না, সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বেশী দিন তাঁরা চলতে পারলেন না। ভারতবর্ষের হিন্দুরাও ছিলেন এক সুসভ্য জাতি। তাঁদের নিজেদের উচ্চাঙ্গের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি সবই ছিল। যুদ্ধের ব্যাপারেও তাঁরা অক্ষম ছিলেন না। ব্যবসায়, বাণিজ্যে, হিসাবপত্রের ব্যাপারে তাঁরা বিজেতা মুসলমানদের চেয়ে বেশী দক্ষ ছিলেন। সুতরাং মুসলমানেরা তাঁদের দ্বারা অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রভাবান্বিত না হয়ে থাকতে পারলেন না।

সে যুগের ইরাণী-মুসলিম সভ্যতা, যে সভ্যতা মুসলমানেরা ভারতে আমদানী করেছিলেন, উৎকর্ষের চরমশিখরে পৌঁছেছিল। যে সভ্যতা আলবেরুণীর মত দার্শনিকের সৃষ্টি করেছিল, ফেরদৌসীর মত মহাকবির জন্ম দিয়েছিল, জালালুদ্দীন রুমীর মত ভাবুক যে সভ্যতার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন, সাদী, খৈয়াম, হাফেজ প্রভৃতি অমর কবির যে সভ্যতার সৃষ্টি করেছিলেন, সে সভ্যতা যে তখন জীবনের উচ্ছল আনন্দে ভরপুর ছিল, সহজেই তা বুঝা যায়। এই সভ্যতার জীবন্ত প্রবাহ ভারতের হিন্দুদের যথেষ্টভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। ফলে বিজেতা এবং বিজিত উভয় জাতিই পরস্পরের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। মুসলমান সভ্যতার উদার সুফিমতবাদ ভারতের হিন্দুর মনেও ভাবের জোয়ার এনেছিল। ফলে মধ্যযুগে বহু ভক্তিমূলক ধর্ম্মাদর্শ এবং সাধন-তন্ত্র ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছিল এবং তাদের দ্বারা ভারতীয় জীবন যথেষ্টভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেল।

প্রয়োজনের তাগিদে মুসলমান বিজেতারা হিন্দু-কর্ম্মচারীদের সাহায্য ক্রমেই বেশী করে নিতে লাগলেন। সাম্রাজ্যের উচ্চতম পদ হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত হতে লাগলো। প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতির পদেও হিন্দুরা অধিষ্ঠিত হতে লাগলেন। পাঠান-যুগের ইতিহাসে বহু খ্যাতনামা হিন্দু রাজপুরুষদের নাম আমরা দেখতে পাই।

ধীরে ধীরে হিন্দুরা ফার্সিভাষার দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলেন এবং সে ভাষার শিক্ষায় এবং ব্যবহারে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে লাগলেন। মুসলমানদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা প্রভৃতি হিন্দুরা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করতে লাগলেন। পক্ষান্তরে মুসলমানেরাও হিন্দুদের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি বহুল পরিমাণে গ্রহণ করতে লাগলেন। সভ্যতার আদান প্রদান জোরের সঙ্গেই চলতে লাগলো। ফলে ভারতবর্ষে এক সামবায়িক সভ্যতার বীজ অঙ্কুরিত হতে লাগলো। সুলতান সেকেন্দার লোদীর সময় মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বার হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত হল। হিন্দু শিক্ষার্থীরা দলে দলে মুসলিম বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে আরবী-ফার্সির সঙ্গে এবং মুসলিম কৃষ্টির সঙ্গে গভীর পরিচয় লাভ করতে লাগলেন। কৃষ্টির বৈষম্য ক্রমেই দূরীভূত হতে লাগলো। ঐতিহাসিক Blockman-এর ভাষায়: "The Hindoos from the sixteenth century took so zealously to Persian education that before another century had elapsed they had fully come up to the Muhammadens in point of literary acquirements."

(উনসত্তর)

হিন্দু-মুসলমানের সভ্যতার এই আদান-প্রদানের যুগে দেখা দিলেন মহামানব কবীর। পাঠান আমলের শেষ যুগে বেনারসের এক দরিদ্র জোলা-পরিবারে কবীর জন্মগ্রহণ করেন। অমানুষিক প্রতিভা এবং অলৌকিক চরিত্রবলে নিরক্ষর এই জোলা-সন্তান মধ্যযুগের ভারতীয় জীবনকে যে ভাবে প্রভাবান্বিত ক'রেছিলেন তা সত্যই বিস্ময়কর। কবীরের প্রভাব সুদূর পাঞ্জাব থেকে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অনুভূত হ'য়েছিল। শিখ ধর্ম্মগুরু নানক কবীরকে নিজের গুরু বলে স্বীকার ক'রেছেন। কবীরের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি হিন্দু এবং মুসলমানদের ধর্ম্মের মূলগত ঐক্যের বাণী প্রচার ক'রেছিলেন এবং উভয় জাতির আচার, ধর্ম্মের সংকীর্ণতা এবং অসারতাকে লোকচক্ষে জাজ্বল্যমান ক'রে তুলেছিলেন। আকবরের উদার ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্রনীতির জন্য প্রকৃত-পক্ষে কবীরই ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রেছিলেন।

Mr. Tara Chand লিখেছেন: Kabir's was the first attempt to reconcile Hinduism and Islam: the teachers of the South had absorbed Muslim elements, but Kabir was the first to come forward boldly to proclaim a religion of the centre a middle path, and his cry was taken up all over India and was reechoed from a hundred places. He had numerous disciples and today his sect numbers a million.

But it is not the numbers of his following that is important, it is his influence which extends to the Panjab, Gujrat and Bengal and which continued to spread under Mughal rule till a wise sovereign correctly estimating its value attempted to make it a religion approved by the state

Akbar's Din-i-Illahi was not an isolated freak of an autocrat who had more hours than he knew how to employ, but an inevitable result of the forces which were deeply surging in India's breast and finding expression in the teachings of men like Kabir. Circumstances thwarted that attempt, but destiny still points towards the same goal.

সত্তর)

রাষ্ট্রশাসনের দিক থেকে পাঠান যুগের বাদশা'রা হিন্দু প্রজাদের **"জিম্মি"** অর্থাৎ আশ্রিত বিধর্ম্মী হিসাবে দেখতেন। তাদের উপর অন্যায় বা অত্যাচার করা তাঁদের আদর্শ ছিল না, তবে তাদের এবং মুসলমান বিজেতাদের মিলিয়ে বৃহত্তর এক জাতি সৃষ্টি করবার কথা তখনও তাঁরা ভাবতে পারেন নি। প্রকৃত পক্ষে, কোন দেশের লোকই সে আদর্শের কথা তখন ভাবতে পারে নি। এসব ছিল তখনকার যুগের মানুষের কল্পনার অতীত। মুসলমানেরা তবু ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের অস্তিত্ব সহ্য করতেন, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের যথোচিত ব্যবস্থা করতেন। সে যুগের খৃষ্টানেরা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের অস্তিত্ব মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। খৃষ্টানদের রাজ্যে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের ভাগ্যে ছিল কেবল নিগ্রহ আর উৎপীড়ন, এবং তাদের ধর্ম্মাচরণের পথে সহস্র রকমের বাধা-বিপত্তি।

আকবরের পিতামহ, স্বনামধন্য সুলতান বাবরই সর্ব্বপ্রথম ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের সংস্কারের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্যশাসন করার চেষ্টা করেন এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের সাহায্যে বৃহত্তর এক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন দেখেন। পুত্র হুমায়ুনের জন্য তিনি যে উপদেশ-লিপিকা বা "ওসিয়েতনামা" ছেড়ে যান, তাতে আমরা আকবরের রাষ্ট্রনীতির অঙ্কুর বা পূর্ব্বাভাষ দেখতে পাই। বাবর তাঁর "ওসিয়েতনামায়" লিখেছেন :

সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য এই "ওসিয়েত" লিখিত হল। হে আমার পুত্র, ভারত সাম্রাজ্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের দ্বারা অধ্যুষিত। খোদাকে ধন্যবাদ (তিনি বিচারক, মহান্ এবং সর্ব্বোচ্চ) যে তিনি এই ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনভার তোমার হস্তে অর্পণ করেছেন। তোমার কর্ত্তব্য হচ্ছে, সর্ব্বপ্রকার গোঁড়ামি থেকে নিজের অন্তরকে মুক্ত করে, প্রত্যেক জাতির প্রতি সুবিচার করা—তাঁদের ধর্ম্মের নির্দ্দেশ অনুযায়ী। আর তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি গরু কোরবানী (গোহত্যা) বর্জ্জন করবে; কেন না, ভারতবাসীদের অন্তর জয় করবার এই হচ্ছে সহজ পন্থা। আর তোমার এই উদারতার পরিচয় পেলে দেশের প্রজাপুঞ্জ তোমার একান্ত ভক্ত এবং অনুরক্ত হ'য়ে পড়বে। তুমি কোন জাতির বা ধর্ম্মের মন্দির এবং ধর্ম্মালয়ের কখনও কোন ক্ষতি করো না। ন্যায়-বিচার করবে, কেন না তা'হলে প্রজাদের নিয়ে তুমি সুখে থাকবে, আর প্রজারাও তোমার শাসনে সুখে থাকবে। ইসলামের সম্প্রসারণের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে দয়ার তরবারি, অত্যাচারের তরবারি নয়।

শিয়া এবং সুন্নিদের তর্কাতর্কি এবং কলহ-কোন্দলের মধ্যে থাকবে না। এই বিসম্বাদই হচ্ছে ইসলামের দুর্ব্বলতা। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদের সেইভাবে মিলিত এবং সংমিশ্রিত করবে, যেভাবে বিশ্বের চারিটী উপকরণ (জল, বায়ু, অগ্নি এবং মৃত্তিকা) সংমিশ্রিত হয়ে থাকে; অর্থাৎ রাষ্ট্রদেহে যাতে কোন ব্যাধি দেখা না দেয়, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করবে। আর প্রপিতামহ তাইমুরের কীর্ত্তি-কলাপের কথা মনে রাখবে, কেন না, তা হলে তুমি রাজ্যশাসনের ব্যাপারে দক্ষতা লাভ করবে। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে উপদেশ দেওয়া। ১লা জামাদি উল-আউয়াল ৯৩৫ হিজরী (১১ই জানুয়ারী; ১৫২৯ খৃঃ অব্দ)।

(একাত্তর)

প্রত্যেক মহাপুরুষই যুগের প্রয়োজনের তাগিদে, যুগের প্রয়োজন পূরণ করতে, যুগের কামনাকে রূপ দিতে এবং সার্থক করতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। হজরত মোহাম্মদ, গৌতম বুদ্ধ, জিসাস্ খৃষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষেরা, তথা জর্জ্জ ওয়াশিংটন, মোস্তফা কামাল প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতারা এই ভাবেই এসেছিলেন। আকবরও এসেছিলেন যুগের বাণী নিয়ে, যুগের কামনার মূর্ত্ত প্রতীকরূপে। কোন আকস্মিক উল্কার মত তিনি আসেননি। তিনি ছিলেন প্রকৃত একজন যুগ-মানব। সে যুগের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ কামনা, শ্রেষ্ঠ সাধনা তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এক মোহনীয় জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করেছিল।

প্রকৃত মহাপুরুষের মত আকবর বাল্যকাল থেকেই জীবনকে একটা এক সাধনক্ষেত্র বলে মনে করতেন, আর একাগ্র মনে চেষ্টা করতেন সে জীবনকে সার্থক করবার জন্যে। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, ধর্ম্মভাব এবং খোদা-ভক্তি আকবরের জীবনে চিরকালই প্রবল ছিল। প্রাথমিক জীবনে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের সাহায্যেই সেই ভাবকে তিনি রূপায়িত করবার চেষ্টাই করতেন। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিতভাবে তিনি নামাজ পড়তেন। অকৃত্রিম ভক্তির আবেগে, সম্মার্জ্জনী হস্তে স্বয়ং তিনি মসজীদে গিয়ে ঝাড় দিতেন। আজান (নামাজের আহ্বান) তিনি নিজেই দিতেন। ধর্ম্মযাজকদের তিনি একান্ত ভক্তির চক্ষে দেখতেন। এই তো গেল প্রাথমিক জীবনের কথা। তারপর কি করে ধীরে ধীরে আকবর আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম থেকে এবং সে ধর্ম্মের পাণ্ডাদের প্রভাব থেকে দূরে গিয়ে পড়লেন, তার আলোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বেই করেছি। শাস্ত্রীয় ব্যাপারের মীমাংসার ভার আকবর শেষে নিজ হস্তেই গ্রহণ করলেন।

উদার সার্ব্বজনীন মনোভাব ছিল আকবরের মজ্জাগত। ফার্সি সুফি সাহিত্য সে ভাবকে বিশেষভাবে পুষ্ট করেছিল। কবীর-প্রমুখ ভারতীয় সাধকদের ভাবধারাও যে তাঁর মনকে প্রভাবান্বিত করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। দরবারের আলেম এবং পণ্ডিতের কলহ-কোন্দল, তর্কাতর্কি এবং একদেশদর্শিতা যে সেভাবকে দৃঢ়তর করেছিল, সহজেই তা অনুমান করা যায়। দীর্ঘকালের চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং আলোচনার ফলে আকবর যে মতবাদে পৌঁছেছিলেন, কবি Tennyson অতি সুন্দর ভাষায় তার ব্যঞ্জনা করেছেন :

> If I can but lift the torch,
> Of reason in the dusky cave of life,
> And gaze on this miracle, the world,
> Adoring That Who made, and makes, and is,
> And is not, what I gaze on—all else Form,
> Ritual, varying with the tribes of men.

এদিকে রাজনৈতিক প্রয়োজন, অন্তরের নির্দ্দেশ, সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত মঙ্গলের চিন্তা, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের দার্শনিক ভিত্তির প্রয়োজন, অনিবার্য্যভাবে ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন সত্যের দিকে, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের দিকে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল। [ক্রমশঃ

উদয়ন-কথা

প্রিয়দর্শী

চার

বাসবদত্তার স্বপ্ন

যে রাত্রে তিন বন্ধুতে মন্ত্রণা করলেন, তার পর দিন সকালে সেনাপতি রুমণ্বান্ রাজপ্রাসাদে গিয়ে মহারাজের কাছে প্রতিহারীকে পাঠালেন—'শীগ্‌গির মহারাজকে খবর দাও, বল—সেনাপতি দোরে দাঁড়িয়ে—জরুরী খবর।'

উদয়ন তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। প্রতিহারীর মুখে খবর শুনেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন ব্যস্তসমস্ত ভাবে। রুমণ্বান্‌কে আলিঙ্গন ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার? সব ভাল ত? এত সকালে যে হঠাৎ'!

রুমণ্বান্ মহারাজকে নমস্কার ক'রে বললেন—"মহারাজ! আমার একজন বিশ্বস্ত চর এইমাত্র ফিরে এসে জানালে যে—আমাদের রাজ্যের শেষ সীমায় 'লাবাণক' ব'লে যে গ্রামখানি আছে, তার পাশে যে গভীর বন, তার মধ্যে একপাল কৃষ্ণসার মৃগের সন্ধান পেয়েছে। তাই মহারাজকে জানাতে এলুম—যদি অনুমতি করেন, তা হ'লে সসৈন্যে আজই মৃগয়ায় যাবার ব্যবস্থা করি'।

উদয়ন হেসে ব'লে উঠলেন—'আজই! এত তাড়া কেন, সেনাপতি'?

রুমণ্বান্—'জানেন ত মহারাজ! কৃষ্ণসারের দল তিন-চার দিনের বেশী এক জায়গায় থাকে না। তাই ভাবছি—আজই যদি রওনা হওয়া যায়, কালই মৃগয়ায় বেরুনো যাবে। নয় ত একবার ঘন বনের মধ্যে ঢুকে গেলে আর হরিণগুলোর সন্ধান সহজে মিলবে না"।

উদয়ন—'তা বেশ! আজই খাওয়া-দাওয়ার পর রওনা হওয়া যাবে। তবে একটা কথা! নীল হাতীর মত ব্যাপার কিছু তলে তলে নেই ত'!

রুমণ্বান্ একটু সলজ্জ হাসি হেসে মাথা নীচু ক'রে আস্তে বললেন—"না মহারাজ! আর এবার আমি সসৈন্যে আগে আগে যাব—আর পিছনে সৈন্য নিয়ে থাকবেন—মহারাণীর দাদা—তিনিও মৃগয়ায় যেতে রাজী আছেন'।

উদয়ন—'তা হ'লে মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণের উপর নগর রক্ষার ভার থাকুক। আর বয়স্য বসন্তকও মৃগয়া বড় ভালবাসেন না। তিনি মন্ত্রিবরের সঙ্গে নগরে থেকেই দিব্য রাজভোগ খেতে থাকুন। আমরাই শুধু যাই বনে আধপোড়া মৃগমাংস খেতে। আচ্ছা, রুমণ্বান্! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। রাণী ত ধ'রে বসেছেন—তিনি একবার মৃগয়ায় যাবেন। তা এবার তাঁকে কি সঙ্গে নেবার সুবিধা হবে'?

রুমণ্বান্ ত' এই সুযোগই খুঁজছিলেন। তিনি মহারাজের মুখের কথা লুফে নিয়ে ব'লে উঠলেন—'খুব হবে, মহারাজ! খুব হবে। আমি এখনই শিবিরের ব্যবস্থা করছি'!

দেবী বাসবদত্তা ঘরের ভিতর থেকে রাজা ও সেনাপতির কথা শুনছিলেন। মৃগয়ায় যেতে তাঁর মনে খুবই ইচ্ছা জেগেছিল। নিয়তিকে কে খণ্ডন করে। তাই সেনাপতির সম্মতি জেনে তিনি আর মনের আনন্দ চেপে রাখতে পারলেন না—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন—"নমস্কার সেনাপতি ম'শায়। আপনার সম্মতির জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি'।

রুমণ্বান্ হাসিমুখে প্রতিনমস্কার ক'রে বললেন—'দেবি! আপনার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে—এ ইচ্ছা আমাদের হ'তে পারে না। আমি শিবিরের ব্যবস্থা করছি। তবে কাল পৌঁছেই হয় ত' আপনার পক্ষে বনে ঢোকা সম্ভব হবে না। আপনি দু'এক দিন লাবাণকের শিবিরে বিশ্রাম করবেন। ইতিমধ্যে আমরা বন-জঙ্গল একটু পরিষ্কার ক'রে একদিন আপনাকে মৃগয়ায় নিয়ে যাব'।

বাসবদত্তার মুখে হাসি আর ধরে না। হাসিমুখে উত্তর দিলেন,—'মৃগয়ায় আপনার ব্যবস্থাই পালন করা থাকে—এতে আর বাধা কি থাকতে পারে'।

রুমণ্বান্—'মহারাজ! দেবি! আপনারা তা'হলে প্রস্তুত হ'তে থাকুন। আমার ব্যবস্থা শেষ হ'লেই শিঙার আওয়াজ শুনতে পাবেন। অমনি ঘোড়ায় চেপে দু'জনে বেড়িয়ে পড়বেন। জিনিষপত্র সব হাতীর পিঠে আমি চালান দোব। এই ব্যবস্থা পাকা রইল আমি আসি এখন'।

এই ব'লে সেনাপতি বেরিয়ে এলেন। সদর দরজায় যৌগন্ধরায়ণ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি হ'ল সেনাপতি! সব ঠিক ত! বেফাঁস হয়নি কিছু?'

'না মন্ত্রিবর'! হেসে উত্তর দিলেন সেনাপতি, 'আপনার মন্ত্রণা বেফাঁস করে কার সাধ্য'!

যৌগন্ধরায়ণ—'রাণী যেতে রাজী ত?'

রুমণ্বান্—'আমাকে কথা পাড়তে অবধি হয় নি। মহারাজ নিজেই কথা পাড়লেন। আমি ত ভাবছিলুম কি করে গুছিয়ে কথাটা পাড়ি? তা আমার আর কিছুই করতে হ'ল না। খালি মহারাজ একবার জিজ্ঞাসা করলেন—'নীল হাতীর মত ব্যাপার কিছু তলে তলে নেই ত?'

যৌগন্ধরায়ণ—'তুমি কি উত্তর দিলে'?

সেনাপতি—'আমি উত্তর দোব কি—হাসিতে আমার পেট ফাটবার যোগাড়। অনেক কষ্টে হাসি চেপে বললুম—'না মহারাজ! এবার কি আর আপনাকে একলা ছেড়ে দোব। এবার সামনে আমি—পিছনে মহারাজকুমার গোপালক সসৈন্যে থাকবেন'।

যৌগন্ধরায়ণ (একটু হেসে)—হায়! মহারাজ ত জানেন না—এবার ব্যাপার আরও গুরুতর! সেবার প্রদ্যোতের চক্রান্ত—যৌগন্ধরায়ণ তা ব্যর্থ করেছিল। এবার যৌগন্ধরায়ণ নিজেই চক্রান্তকারী—বাঁচাবে কে?

রুমণ্বান্—'মন্ত্রিবর! মহারাজ আপনাকে স্মরণ করছেন। আর বসন্তক কোথায়?

যৌগন্ধরায়ণ—'ঐ যে ওপাশে দাঁড়িয়ে। আচ্ছা, আমরা

দু'জনে এক সঙ্গেই ভিতরে যাই। তুমি যাত্রার ব্যবস্থার কোন ত্রুটি কোরো না'।

উভয় বন্ধুতে একবার স্নেহালিঙ্গন ক'রে পরস্পর বিদায় নিলেন। তারপর বসন্তকের সঙ্গে রাজপ্রাসাদে মন্ত্রিবর প্রবেশ করলেন। রুমন্বান্ চললেন—সেনা সাজাতে।

মহামন্ত্রী ও বিদূষক রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে মহারাজ উদয়নের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ঠিক করলেন যে যতদিন মহারাজ মৃগয়া থেকে না ফিরে আসেন, ততদিন মন্ত্রিবর নিজে প্রত্যেকটি রাজকার্য্য দেখবেন। বিদূষক সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে থাকবেন। কথাবার্ত্তা শেষ হবার পর মন্ত্রী ও বিদূষক প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন ব'লে আসন ছেড়ে উঠেছেন—এমন সময় প্রাসাদের চত্বর এক দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বিস্ময়ে বিহ্বল রাজা, রাণী, মন্ত্রী, বিদূষক, প্রতিহারী সেদিকে তাকাতেই দৃষ্টিতে পড়ল, দেবর্ষি নারদ তাঁর বীণাটি হাতে নিয়ে হাস্য মুখে আকাশ থেকে রাজ-প্রাসাদের উঠানে নেমে আস্‌ছেন। সসম্ভ্রমে সকলে আসন ছেড়ে উঠে প্রণাম করতেই দেবর্ষি তাঁর দন্তরুচিকৌমুদী বিকীরণ ক'রে সকলকে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে রাজার দেওয়া সোনার সিংহাসনে বসলেন।

মহারাজ ও মহাদেবী পুনরায় নত হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে তিনি নিজের বীণা থেকে পারিজাত মালা দু'গাছি খুলে নিয়ে দু'জনের মাথায় পরিয়ে দিলেন। তখন মহারাজ করজোড়ে দাঁড়িয়ে অতি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—"হে প্রভু! আজ আমার বংশ পবিত্র, আমার গৃহ পূত, আমি ও দেবী ধন্য! বলুন, দেবর্ষি! আমি আপনার কোন্ সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারি'?

যৌগন্ধরায়ণের অন্তরে এতক্ষণ ভয়ানক ঝড় চলছিল। কারণ তিনি জানতেন যে, দেবর্ষি অন্তর্যামী—আর বড়ই কলহপ্রিয়। যৌগন্ধরায়ণের মনের ফন্দী জেনে তিনি যদি তা মহারাজের কাছে ফাঁস ক'রে দেন, তা হ'লে সর্ব্বনাশ! তাঁর আর কারুর কাছে মুখ দেখাবার পথ থাকবে না।

যৌগন্ধরায়ণের অন্তরের কাতরতা দেবর্ষির কাছে অজানা ছিল না। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে মন্ত্রিবরের মন্ত্রণা ব্যর্থ করে দিতে আসেন নি। বরং কয়েকদিন বাদে দেবী বাসবদত্তার বিরহে মহারাজ পাছে আত্মহত্যা করে ফেলেন—এই আশঙ্কায় তিনি আগে হইতে একটি আশ্বাসজনক বর দিতে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। তাই মৃদুহেসে ও কটাক্ষে যৌগন্ধরায়ণকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বললেন—'শোনো মহারাজ! শোনো মহাদেবি! শোনো মন্ত্রিবর! আর তোমরা সবাই শোন।—শুনে আনন্দ কর। জেনো আমার কথা কখনও মিথ্যা হবে না। স্বয়ং কামদেব মহারাজের পুত্র হ'য়ে দেবী বাসবদত্তার গর্ভে এসে জন্মাবেন। আর জন্মের পর তিনি সমগ্র বিদ্যাধর সমাজের একচ্ছত্র সম্রাট্ হবেন। মহারাজ! তোমার পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চপাণ্ডব আমায় বড় ভক্তি করতেন। তাঁদের সাহচর্য্যে আমি বহুবার শ্রীকৃষ্ণের সেবার অবসর পেয়েছি। তাদের সঙ্গে আমার বড় প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। তাঁরা কোন দিন আমার কথা এতটুকুও অমান্য করেন নি। সেই সম্পর্কের জোরে আমি তোমাকে এই সংবাদটি দিতে এলুম। জেনো আমার কথা কখনও মিথ্যা হয় না। তবে, একটা কথা! মাঝে হয় ত' তোমাকে ও দেবীকে কিছুদিন খুবই কষ্ট পেতে হবে। সে সময় মহারাজ! ও মহাদেবী! তোমরা দু'জনেই মহামন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কথামত কাজ করবে—কদাচ তাঁর কথার অন্যথা করবে না। এ হ'লে ভবিষ্যৎ খুব সুখের হবে। আর বিদ্যাধর সম্রাট্‌কে পুত্ররূপে পাবে'!

'দেবর্ষির যেমন আদেশ'—এই ব'লে রাজা রাণী মন্ত্রী বিদূষক ইত্যাদি সকলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করতেই দেবর্ষি আবার একবার যৌগন্ধরায়ণের দিকে ভ্রূভঙ্গী ক'রে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

যৌগন্ধরায়ণ বুঝলেন যে, তাঁর মনোরথ সিদ্ধ হ'তে কোন বাধা ঘটবে না।

এমন সময় রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে শিঙা বেজে উঠল তিন বার।

মহারাজ ও মহাদেবী সুসজ্জিতই ছিলেন। প্রাঙ্গণে বেরিয়ে এলেন। একজোড়া রাজ-অশ্ব সাজান ছিল। দু'জনে সেই দুই ঘোড়ায় চেপে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আগে সেনাপতি রুমণ্বান্, তারপরে সেনাদল, তারপর শিকারীর দল, তারপর মহারাজ নিজে, তার পাশে মহারাণী, তারপরে রসদ ও মালপত্র নিয়ে হাতীর দল, তার পিছনে কুমার গোপালক সব শেষে আর একদল সেনা।

শিঙা বাজাতে বাজাতে সেনাপতি অগ্রসর হলেন। ধীরে ধীরে শিকারের দল-বল রাজধানী হ'তে বেড়িয়ে গেল!

[ক্রমশঃ

স্বৃষ্টি বুঝি হয় অবসান-

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

মৃত্যুর বিভীষিকা ছাড়ে উর্দ্ধ ডাক্
অশান্ত ক্রন্দনে। সৃষ্টি হতবাক্।
প্রলয়ের তাণ্ডবলীলা ওই ধীরে ধীরে
গ্রাসিতেছে পুণ্য ভূমি শ্যাম ধরণীরে
তিলে তিলে। দুর্নীতি আর ধাপ্পাবাজি
মায়ায় ভরা ধর্ম্মকথায় মহাভণ্ড সাজি'

পণ্যশালায় ফিরছে পাপ মুখোসপরা
পৃথ্বীতল ঘিরলো আজি দুঃখ জরা।
অত্যাচারীর অট্টহাসি হাসছে ওই
নবযুগের ভাগ্যেতে আর সাম্য কই?
ব্রহ্মা তোমার সৃষ্টি ছিল মূল্যবান
সর্ব্বনাশের ধাক্কাতে আজ একশ'খান

সুপ্তি ভেঙে ওঠ আজি বজ্র হানো শিরে
কলুষ করেছে যারা পুণ্য ধরিত্রীরে।

তোমারই (উপন্যাস

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

সতীর বাড়ীতে আজ জ্যোতি যাবে। ঠিক নেমন্তন্ন নয়, তবে ঐ ধরণেরই একটা কিছু হবে। উপলক্ষ্য দিদির সঙ্গে আলাপ করা। সুলেখার মুখে দু'জনের কথা দু'জনার কাছে! দিদির সঙ্গে যখন গল্প করে তখন জ্যোতির কথা ছাড়া অন্য কথা অল্পই হয়, আবার জ্যোতির কাছে অতিমাত্রায় দিদির কথা। দিদির কথা যখন বলে, তখন তলে তলে থাকে মেয়েদের প্রশংসা, তাদের মনের যে দিকটা ভালবাসার প্রবল উত্তাপে উত্তপ্ত, তার কথা। নিজেকে প্রকাশ করবার প্রভূত চেষ্টা দিদির প্রচুর ভালবাসার প্রত্যেকটি কথা বলে। 'মানে,' ও বলে, 'দিদির প্রাণে যে অফুরন্ত ভালবাসা আছে তা বহুমুখী নয়, একটি মাত্র মানুষকে উপলক্ষ ক'রে ছুটে চলে, অথচ এমনই আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, সে মানুষটি কিছুই জানে না।' পরোক্ষে নিজের মনটাকেই ও জ্যোতির কাছে প্রকাশ করে। আর দিদির কাছে যখন ও গল্প ফাঁদে, তখন চাঁদের সঙ্গে তুলনা করতে থাকে জ্যোতির রূপের, তাঁর স্নিগ্ধ আলোকের সঙ্গে ওর স্বভাবের। বলে অভাব কিছুরই নেই, ওর মধ্যে ওর সবটাই সুন্দর। ও ঠিক যেন প্রাঞ্জল ভাষায় ঝরঝরে ছন্দে আশার কবিতা।

সতী ওর কথা শুনে বলেছিল, 'আনিস্ না তোর মানুষটিকে একদিন, জানিস ত আমার রূপের নেশা, হয়ত পছন্দই ক'রে নেব'! 'ভয় পাই'—সুলেখা উত্তরে বলেছিল। 'তাই ত' আনি না, জানি না হয়ত হাতছাড়াই হ'য়ে যাবে, যতই ওর বড়াই করি ততই বুঝি ওকে ছোঁয়া আমার কাছে রঙিন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আজ তাই আলাপের আয়োজন।

সত্য কথা বলতে, সতী আর জ্যোতি ওদের দুজনকার জীবনের একটা ওজন করা পরিমাণ একই ধাতুর তৈরী। সুলেখাও প্রায় কাছাকাছি। সতীর ভয়ানক ইচ্ছে সুলেখার নতুন মানুষটিকে দেখে, সুলেখাই কৌতূহলটাকে জাগিয়ে দিয়েছে কথার আলপনায়। সুলেখা নিজেও তাই চায়, কারণ ওর জীবনে দিদি মস্তবড় একটা স্বর্ণ পরিচ্ছেদ, আর কারো কাছে না হ'ক অন্ততঃ তার কাছে জ্যোতিকে পাশে নিয়ে দাঁড়ায়, যেমন ভাবে মনে মনে ও দাঁড়াতে চায়। জ্যোতি নিজেও দিদিকে জানবার জন্যে উৎসুক, ও জানে, দিদিই হ'ল ভায়া মিডিয়াম্। কিন্তু ওদের দু'জনের জানা-শোনায় সবচেয়ে বড় হাত ছিল নিয়তির—তার ছিল আশীর্ব্বাদ!

শীত পেরিয়ে গেছে, সন্ধ্যার ঠাণ্ডা আমেজ নেই। দিনের শেষ আলোর বেশ আছে। বেলাটা তবু যাই যাই করেও যাচ্ছে না, বিদায়ের খেলা খেলছে প্রকৃতির সঙ্গে। দিদির বাড়ীর গেট্ পেরোতেই সুলেখার দেখা পাওয়া গেল। বারান্দা থেকে নেবে সুলেখা দাঁড়িয়েছিল হাস্নাহানার ঝাড়টির ঠিক পাশে ফিকে লাল রঙের সাড়ীটা পরে। বাড়ীটার বিরাটত্বের সঙ্গে মিশে আছে একটা বনেদি গাম্ভীর্য্য। আসবার কথা যেদিন সুলেখা জ্যোতিকে বলেছিল, সেদিন নিজের কল্পনায় জ্যোতিকে সৃষ্টি করে বলেছিল, 'বিলেতী পোষাকে জমিদারী মানায় না, সাজতে হবে সম্পূর্ণ বাঙালী। সাদা পাঞ্জাবীর সঙ্গে থাকবে সাদা ধুতি, গলায় থাকবে সাদা চাদর, বুঝলে? জ্যোতি হাসতে হাসতে ব'লেছিল, 'জামাই সাজতে হবে, আদরটা মিলবে ত?' 'দিদি জানে,' লেখা বললে, "প্রাণে যদি তার তেমন রং ঢালতে পারো, তা হ'লে মিলবে, উপরিও কিছু আশা করা যায়!'

উপরি কেমন?

জানো না?

না!

দুর্ভাগ্য তুমি, সুন্দর শালী বুঝি কখনও এক ফালিও আলো দেয় নি! আমাদের বাড়ীতে শালীস্বভাবই শালীনতায় ভরা, অত্যন্ত সুনিয়মে বাঁধা।

আজ সুলেখা জ্যোতিকে নিজের মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিল'। ঠিক যেমনটি ও কল্পনা ক'রেছিল, ঠিক যে রূপে ও মনের মধ্যে আছে, ঠিক তেমনি, কোথাও খুঁত নেই, অমিল নেই।

নিজেকে কোন রকমে প্রকাশ করবে না, এই ছিল সুলেখার মনের গোপন প্রতিজ্ঞা। হয়ত' প্রতিজ্ঞা না করে যদি মনটাকে ঠিক করত' তা' হ'লে ঠিক সময়টিতে মনটা এমন বেঠিক হ'ত না। দুষ্টু ছেলে দুষ্টুমি করতে করতে আপনিই ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু ঘুম পাড়াতে গেলে ঘুমোবার সময়টিতেই তার দুষ্টুমি ঝড়ের দাপটেই ছুটে আসে। সুলেখারও ঠিক তাই হ'ল।

বললে, জামাই সাজলে দেখি, মানিয়েছে সুন্দর, ভারী ভালো দেখায় তোমায় সাদা কাপড়ে।

জ্যোতি ছেলেটা ভয়ানক দুষ্টু, ঠাট্টার ছলে ও কথা বলে, নিজের মনের কথাটা অন্যের মনের সঙ্গে মিশিয়ে। ওর কথা বলার মধ্যে আছে অন্যের গোপন কথাটি ছুঁয়ে যাবার ভঙ্গি, বললে—

'মনে হচ্ছে না স্বর্গ থেকে ঠাকুর নেবে এল' মন ভোলাতে··· দোলা লাগল বুঝি মনে...দেখ' শেষে ভোলা যাবে ত' আজকের দিনটিকে, না মনটাকে খুলেই দিয়ে যেতে হবে!'

সুলেখা বললে, 'বড় কথার উত্তর দিতে গেলে ভাবতে হয়, একসঙ্গে দেবার সামর্থ্য নেই, হারিয়ে ফেলব যদি চেষ্টা করি!'

সময় দিলে না জ্যোতি, বললে, 'ভাবনা কি, বড় কথার উত্তর না হয় ছোট্ট একটা কথাতেই দাও, উত্তর দেওয়াও হবে অথচ নিজেকে বাঁচানও হবে! বাঁচানোতে আমার সাধ নেই, মনের বাধাও আছে, কিন্তু বাইরের কথা ভাবতেই যত ভয়। তা'ছাড়া নিয়তিটা বড্ড ছেলেমানুষী রঙে রাঙানো। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, ঠিক তার কিছুই নেই, সবই বেঠিক।' 'তাই ত আমার ভয়, সুলেখা হাসতে হাসতেই বলে, 'চোখ দুটোতে কিন্তু ওর শঙ্কার সঙ্কেত।'

জ্যোতি কি উত্তর দেবে ভাবছিল, দিদি এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন, বললেন, 'তোমরা দু'জন কি ঐ বাইরে দাঁড়িয়েই বিকেলটা কাটাবে?' 'তাহ'লে' সুলেখা হাসতে হাসতে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ করে বললে, 'তুমি যে আমার মাথা ফাটাবে দিদি! মন আর মাথা দুটো এক সঙ্গে হারাতে রাজি নই।'

বলতে বলতে ওরা দু'জনে ঘরের ভেতর উঠে এল'। প্রকাণ্ড ঘরখানা জমিদারীর সঙ্গে ঠিকমত উমেদারী করছে। চারিদিকে মেহেগনির ফার্নিচার, ঝকঝকে তকতকে, ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড ঝাড় লণ্ঠন। পুরাতনের পাশে নূতনের স্থান হয়েছে। ঘরের কোণে কোণে প্রকাণ্ড করণার ল্যাম্প, বড় বড় রং ম্যাচ্ করা সোফা, কৌচ সেণ্টার টেবিল। দেওয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড অয়েল পেণ্টিং, বংশ-পরম্পরায় সাজানো। তাদের প্রত্যেকটিতে বংশ-মর্য্যাদার ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে ছবিগুলির অস্পষ্টতার মধ্যে। তারা উজ্জ্বল অতীতের গরীয়ান দিনের সাক্ষ্য, আজকের দিনের অযত্নের উপলক্ষ্য। বাজের আঘাতে মরে যাওয়া গাছ, আজও পড়ে যায়নি। ঝড়ের দাপট সহ্য ক'রে, বৃষ্টির প্রলেপ মাথায় নিয়ে, রৌদ্রে পুড়ে ছাই হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐশ্বর্য্যময় অতীতের সাক্ষ্য দিতে। সমস্ত ঘরখানায় অতীতের ঐশ্বর্য্যের ওপরে ভবিষ্যতের দুর্ভাগ্যের ছাপ পড়েছে—বাগানবাড়ীর শান বাধানো পুকুরে যেমন যত্নের অভাবে শ্যাওলার প্রাচুর্য্য।

জ্যোতি নিজের মনকে সহজ করবে, ওর মধ্যে দুর্লভ যা কিছু সব আজ সুলভ করবে, সুলেখার অলক্ষ্য স্পর্শ ওর মনের মধ্যে মিশে আছে।

সতী ওর দিকে চেয়ে ছিল, ও বসতে বসতে বললে, 'দিদি আপনার কাছে আমার পরিচয় দেবার মতন আজ ঠিক কিছু নেই, দিতে গেলে দিক হারাবো।'

সতী হাসতে হাসতে বললে, 'তুমি দিক হারাবে না, তোমার ঠিক ঠিক হিসেব নিতে গেলে আমি হারাবো। তা'ছাড়া,' দিদি বলে চলে, 'পুরাতনকে ভুলে গিয়েই নতুনকে আবাহন জানানো সমীচীন, পোড় খাওয়া পুরোণো আনকরা নতুনকে হয়ত ঠকাতেও পারে! দরকার কি ওসব ঘরে নিয়ে, আমার কাছে তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয় সুলেখার ভাগ্য!'

দরকার আছে বৈ কি দিদি, যাচাই করে না নিলে যদি ভুল হয়?

ভুলের কথা ভুলো না ভাই; চুলচেরা বিচার করবার জন্যে চাকরির সিলেকসন বোর্ড আছে, সংসারে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়।

ঠাট্টা সুলেখার ঠোঁটের আগায়, দিদির জন্যে তার বিশেষ সান দেওয়া কথা, বললে, '...দেখ দিদি, প্রহর গেল না, এরই মধ্যে সংসারে মানিয়ে নিচ্ছ ওকে, ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না।'

'দোষ কি ভাই,' দিদি অল্প ইঙ্গিত করলেন, 'বোনটা ত' আমি তোরই, তোর জ্বালা প্রদীপে নিজের ঘরখানায় আলো জ্বালাবো বই ত' নয়, কিন্তু তা বলে প্রদীপ ত' আর আমার হ'ল না!'

'বারে!' জ্যোতি বললে, 'প্রদীপটা হ'ল একজনের, আলো পেল' অন্যে।'

'ভয় পেও না ভাই,' দিদি বললে। 'দু'চারটে 'তোমার' দিয়ে তবে 'তোমাদের' আর সেই 'তোমাদের' নিয়ে হবে 'আমার'। আমার বাগানে হাস্নুহেনার গন্ধ, ঘরে বসে তাই পাই, তা'বলে কি ফুল নেই বাইরে, না তা ভালো লাগে না!' 'তা তো ঠিকই,' জ্যোতি বললে, 'নাতবৌ' বুড়ো দাদাম'শাইর ঘর আলো করে, তা'বলে কি নাতি ঘরের অন্ধকার!'

সুলেখা অবাক হয়ে জ্যোতির কথা শুনছিল। কথায় ওর রঙিন পরশ, জীবনের উষ্ণতা, প্রাণের মৃদু স্পন্দন। বললে, 'কে পারবে কথায় তোমার সঙ্গে; কথার তুমি বড় পাল-তোলা জাহাজ!'

দিদিই জবাব দিলে, 'নিজের জালে যে নিজে ধরা পড়লি, লেখায় বা পালে বাতাস না লাগলে কি জাহাজ গতি পায়? পালে বাতাস লাগলে তবে গতি!'

তার পরের কাহিনীটা আমি বলি,' 'বললে জ্যোতি 'পালে বাতাস লাগল, বাড়ল গতি, উঠল প্রকাণ্ড ঢেউ, সেই ঢেউ আছড়ে পড়ল তীরের পায়, পড়েই গেল মিলিয়ে, নিজেকে বিলিয়ে দিয়েও সে কিছু করতে পারল' না, তীরের শব্দ যা উঠল' সেটা শূন্য হাহাকার!'

'ওরে বোকা ছেলে' সতী বলে, 'হালকা কথার ঢেউ বড় নষ্টামি করে, ভাঙন ধরায় না, চুপি চুপি ভাঙে। ওপর থেকে পার যেমন পূর্ণ, ভেতর থেকে তীর তেমনি শূন্য!' দিদির কথায় আদরের স্নিগ্ধতা।

সুলেখা বললে, 'দিদি, তোমার মনটা কি সেই পূর্ণ পার না শূন্য তীর?'

জ্যোতি হাসতে হাসতে বললে, 'বরাতটাই আমার খারাপ দিদি, বলি এক কথা, বোঝায় অন্য, গড়তে যাই শিব, হয় বাঁদর, ভাঙতে গেলাম এ-পার, ভাঙল' ও-পার।'

ভাঙতেই কি তোমাদের আনন্দ—তাই কি তোমরা আছ?

'গড়তে যে তোমরা'—উত্তর দিলে জ্যোতি!

'তোমরা বড় কৃতঘ্ন'। লেখা বললে, 'যারা গড়ে তাদেরই আবার তোমরা ভাঙো।' 'পুরুষ জাতটা ওরকম বেরসিক'—জ্যোতি বললে, 'রাগ কি আমার কম নিজের ওপর, কিন্তু যতবারই দোষী বলে নিজেকে ধরতে যাই, ততবারই মনটা ফাঁকি দিয়ে শূন্য কারণ দেয়, মনটা ভোলাবার জন্যে। সত্যি কথা কি জানো? আমরা যখন ভাঙি তখন নিজের মনের মতন করে গড়বার জন্যে ভাঙি, কিন্তু তোমরা যখন গড়ো তখন নিজের মনের মতন করে, নিজের জন্যে গড়ো না, মনকে ভোলাবার জন্যে গড়ো।'

সতী উঠে যেতে যেতে বললে, 'তোমাদের ভাঙা-গড়ার পালা শেষ হলে তবে আমাকে ডাক দিও, দোহাই বাপু মারামারি কোর' না, মনের সঙ্গে মনটা মিশিয়ে শেষ পর্য্যন্ত সৃষ্টি কিছু কোর', শূন্য চেয়ো না। আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।'

সতী চলে গেল, সমস্ত ঘরখানার মধ্যে ওর সৌরভ ছড়ানো, নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েও রেখে গেল স্নেহের উত্তাপ, আর ওদের মনের পর্দায় এঁকে গেল শ্রদ্ধার অঞ্জলী।

[ক্রমশঃ

কাব্যকথা ও কালিদাস

এই প্রগতিশীল বহু বিচিত্র বাণীমুখর বঙ্গভূমিরই এক অজ্ঞাত কোনে বসিয়া সেকালের অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব্ব-যুগের কোনও এক কবি এক বৃহৎ ভাবকল্পনার প্রেরণায় ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছিলেন :—

"অসীমের দেশ হ'তে আজি অভ্যাগত
জ্যোতিঃর ঈঙ্গিত নব দুয়ারে আমার—
আহ্বান করিতে তারে হয়েছি বিব্রত—
নাহি জানি সে দেশের ভাষা ব্যবহার ;
চির-জন্ম-সংবৰ্দ্ধিতা ভারতী আমার
সুমনাঃ বরণ লয়ে ভেটিতে তাহারে
ফিরেছে মলিন মুখে অহংকার তার
বিগলিত হয়ে গেছে নয়ন আসারে।

তাহার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছিলেন এই বলিয়া—

সে কভু দিল না ধরা বাণীর মুঠায়
চকিতে প্রমেয় শুধু হৃদয়-গুহায়,
শরতের ক্ষেত্রশীর্ষে শ্যামলী সীমায়
শিশু বায়ু লীলা-রেখা যথা রাখি যায়।

পরে আপনার কাব্য-প্রচেষ্টার দুঃসাহসে এই কথা বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন :—

চিরদিন করে নর তবু পৃথিবীতে
তৃষ্ণাতুর-দৃষ্ট মাঝে অদৃষ্ট চিন্তন ;
ভাগ্যবানে পায় শুধু সুপ্রতীক চিতে
সত্য-সমুদ্রের ঘন উচ্ছ্বাস গহন।
লক্ষ কোটী বর্ষ ধরি সুধা-সাগরের
তীরে বসি মরিতেছে এ বিশ্ব সংসার—
চাহেনা জানিতে নর, তারি আশে পাশে
প্রতিবস্তু খুলিয়াছে আলোকের দ্বার।

কিন্তু সে আর এক যুগের কথা—তখনও এদেশে বাস্তববাদ ভাল করিয়া প্রবেশ লাভ করে নাই এবং কবিগণেরও দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আলাদা। তাই রবীন্দ্রনাথের মুখে তখনও পর্য্যন্ত আমরা শুনিতে পাই—"আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়-পদ্মদলে।" পরে অবশ্য তিনি তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা যাক। আজ আমরা বাংলাদেশে কবিতাকে বুঝি অন্তভাবে। অবশ্য সেরূপ ভাবে বুঝিবার পিছনে কোনও দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সমর্থন আছে কি না আমরা এখানে তাহার আলোচনা করিব না—অথবা সেরূপ দেখা ঠিক বা বেঠিক এখানে সে তর্কও তুলিব না। আমাদের বক্তব্য এই যে, সে পথে কালিদাস-শ্রেণীর মহাকবিগণের বিচার করা চলে না—তাঁহাদিগকে বুঝিবার পথ আলাদা—যেহেতু তাঁহাদের কাব্যসৃষ্টি অন্য জাতীয়। ভারতীয় মহাকবি যদি সত্যসত্যই মহাকবি হন—তবে শুধু ভারতীয় রূপদর্শনের মানদণ্ডে তাঁহার বিচার না করিয়া অন্য দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের দ্বারা নির্দ্দেশিত রূপদর্শনের পথেও বিচার করিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করিতে পারা উচিত। অবশ্য রূপদর্শনের পথ বলিতে আমরা হালফ্যাসানের সাহিত্যাভিমানী অর্থনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক পথের কথা বলিতেছি না—পরন্তু যে সমস্ত মনীষী কোনও কিছু প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক প্রয়োজন নিরপেক্ষ হইয়া বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য বিচারের পথে চিন্তা করিয়াই এ যুগে বরেণ্য হইয়াছেন, যেমন ক্রোচে, বোমগার্টেন, শোপেনহায়ার, শেলি ইত্যাদি, আমরা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথের কথাই বলিতেছি। আমরা আমাদের এই প্রবন্ধে সেই পথে চলিয়াই অর্থাৎ আধুনিকের দৃষ্টিতে দেখিয়াই মহাকবি কালিদাসের সৃষ্টি-গৌরবের একটু পরিচয় লইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি যদি শাশ্বত অর্থাৎ সর্ব্বকালীন হয়, তবে সে ত আর দেখাইবার অপেক্ষা রাখে না—নিজের সৃষ্টিধর্ম্মে আপামর সর্ব্বসাধারণের চক্ষুকেই সে মুগ্ধ করে, নয়ন পাইলেই সেখানে সে অমৃত ঢালিয়া দেয় ; গোলমাল বাধে শুধু আমাদের চশমা-পরা চোখ লইয়া, যেখানে স্বভাব অপেক্ষা বিকৃতিই প্রকৃতি হইয়া দাঁড়ায়—সুতরাং আমরা আমাদের প্রবন্ধে কালিদাস অপেক্ষা এই চশমা অর্থাৎ দৃষ্টির স্বরূপ লইয়াই একটু ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা করিয়াছি এই বিশ্বাসে, দৃষ্টির বাধা যদি একটুও অপসৃত হয় অর্থাৎ সুস্থ ও সোজা চোখেই যদি দেখিতে পাই—তাহা হইলে তাহার পরের যাহা তাহাকে আর আলোকপাত করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হইবে না, কারণ তাহা স্বপ্রকাশ। আশা করি আমাদের এই আলোচনা ধান ভানিতে শিবের গীত অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইবে না, কারণ কাব্যালোচনাই আমাদের মুখ্য লক্ষ্য, কালিদাস গৌণ।

আধুনিক যুগেরই কোনও একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলিয়াছেন, "কাব্য বিশ্বসৃষ্টির রসানুবাদ।" কথা কয়টী সামান্য হইলেও ইহাদের মধ্যে সাধারণ ভাবে কাব্য সাহিত্যের একটা সংজ্ঞা স্বল্প পরিসরের মধ্যে বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে কাব্য একটা রসের খেলা—ইহার সৃষ্টিতেও রস, উপভোগেও রস। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে কাব্যের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া যখন দেখা গেল ইহার জাতি নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার—ইহার কোথায় যে আদি কোথায় অন্ত, বলা কঠিন—তখন আলঙ্কারিক শেষ পর্য্যন্ত বলিয়া বসিলেন—"কাব্য রসাত্মক বাক্য"। প্রথমটা শুনিতে কথাটা যেন নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলিয়া মনে হয়, এটা কি রকম হইল ? ওদের দেশে কাব্য লইয়া কত দার্শনিক গবেষণা, কত বিচার বিশ্লেষণ, কত চুল-চেরা তর্ক, কত প্লেটো, প্লটিনাস্, বোমগার্টেন, ফিসার, ফেক্‌নার, আর আমাদের দেশে শুধু এইটুকু, শুধু বাক্য আর তাহার একটু রস। বাক্য বলে ত সবাই—আর রসও তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে কদাচিৎ কখনও, তবে তাহারা সকলেই কবি এবং তাহাদের রসযুক্ত বাক্য মাত্রেই কাব্যসৃষ্টি! কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে কথা কয়টীকে আর তত আজগুবি বলিয়া মনে হয়না। প্রথমতঃ মানুষ মাত্রেই কবি ত বটেই, সব সময়ে না হউক ক্ষণ বিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে প্রত্যেকেই কবি। দ্বিতীয়তঃ রস বা অনুভূতি (ইংরাজী মতে intuition—ক্রোচের intuition না হউক অন্ততঃ বার্গসঁর intuition, ভারতীয় মনীষিগণের মতে রস, আনন্দ বা intuitive ecstasy) যখন জীবনের লক্ষণ এবং কাব্যের প্রেরণাও যখন রস বা অনুভূতি, তখন প্রত্যেক জীবিত মানুষের মধ্যে কাব্য সৃষ্টির মূল প্রেরণাটী ত থাকাই উচিত।

মনীষী ক্রোচে বলেন কাব্যের ভিত্তি হইতেছে—"the first ingenuous theoretic form of the Absolute which is the lyric or the music of spirit and in which there is nothing philosophically contradictory because the philosophic problem has not yet emerged. It is the region of intuition, of language in its essential character as painting, music or song in a word it is the region of art. (Croce, What is living and what is dead in the philosophy of Hegel) এখন এই firs ingenuous theoretic form of the absolute-টি কি? ইহাই কি জীবনেরও গোড়ার কথা নহে? সুতরাং ক্রোচের মতেও জীবন-ধারা ও কাব্য ধারার মূল উৎস একই। তবে মানুষ মাত্রেই সম্ভাবনায় (potentially) কবি, একথা ভাবা আর এমন অযৌক্তিক কিসের? কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার ব্যতিক্রম ঘটে কেন? তাহার কারণ কাব্য সৃষ্টির মূল কারণটা প্রত্যেক মানুষের মগ্ন-চৈতন্যে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও প্রকাশের ক্ষেত্রে ইহা প্রধানতঃ উদ্দীপনাসাপেক্ষ। যেহেতু ইহার সহজ উদ্দীপন-শীলতা সকল চিত্ত-ধর্ম্মে নাই, প্রকৃতি-ধর্ম্মে মনের গঠনবৈশিষ্ট্যে কতকগুলি বিশেষ মানুষের মধ্যেই আছে সেই জন্য তাঁহারা কবি, আমরা কবি নই। তাঁহাদের জাগ্রত রসানুভূতির সৃষ্টিগুলি শিল্প-ধর্ম্মের প্রভাবে এবং অখণ্ডতার ফলে কাব্য, আমাদের অজাগ্রত চিত্তের মৌহূর্ত্তিক রস প্রকাশগুলি কাব্যের উপাদান হইলেও এই দুইটী কারণের অভাবে কাব্য নামের অযোগ্য; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কাব্যের মূল লক্ষণের অভাব তাহাদিগের মধ্যে নাই। সুতরাং কাব্য রসাত্মক বাক্য—এইরূপ নির্ণয়ের মধ্যে ত্রুটি কিছু নাই, বরং উহাই উহার সর্ব্বাপেক্ষা উদার এবং সর্ব্বত্র প্রযুজ্য সাধারণ সংজ্ঞা। মনীষী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কাব্যধর্ম্ম আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার Lyrical Ballads-এর ভূমিকায় যেখানে প্রেম-প্রীতি, দুঃখ-শোক, ভয়-বিস্ময় ইত্যাদি মানব-মনের মৌলিক আবেগগুলিকে কিম্বা অন্য কথায় শৃঙ্গার, করুণ, অদ্ভুত, শান্ত ইত্যাদি রস প্রবৃত্তিগুলিকে উহার মূলকথা বলিয়াছেন সেখানেও তিনি কাব্যের রসাত্মকতাই স্বীকার করিয়াছেন। তা ছাড়া আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে কি দেখিতে পাই? লোকে প্রেমে পড়িলে কবি হয়, শোকের উচ্ছ্বাস কবিতায় প্রকাশ করে, বিবাহের আনন্দোল্লাসের পরিচয় দিতে সহজেই কবিতার কথা মনে করে—ছড়া বাঁধিয়া বিদ্রূপ করে—এই সকল তথ্যও কি উল্লিখিত মন্তব্য সমর্থন করেনা? নিছক গদ্যাত্মক বাক্যও, রস বা আবেগের সংস্পর্শে, পদ্য হইয়া গড়িয়া উঠে, তাহাতে ছন্দ আসে, যতি আসে, ঝঙ্কার আসে, কবিতার প্রয়োজন সব কিছুই আসে। মহর্ষি বাল্মিকীর সাদামাটা ভৎর্সনা "ওরে নিষাদ, মুগ্ধ-ক্রৌঞ্চ-দম্পতীর একটীকে অকারণে বধ করায় তুই জীবনে কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না" শোকের আবেগে "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ অগমঃ শাশ্বতী সমাঃ" ইত্যাদি রূপ শ্লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পল্লী সমাজের রমার "তুই ভারী দুষ্টু ছেলে" এই তুচ্ছ কথা কয়টী ভয়ব্যাকুলতার আবেগে "ওরে কি দুষ্টু ছেলেরে তুই" ইত্যাদি হইয়া ছন্দে গড়িয়া উঠিয়াছিল। রস বা রসাবেগই কবিতার প্রাণ, তাহা প্রকাশের মুখে আপনার ভাষা আপনি খুঁজিয়া লয়। মধুসূদনের কাব্য-জীবনের প্রথমাংশে যখন বাংলা মিত্রাক্ষর ছন্দ কেন—বাংলা ভাষাই তাঁহার ভাব-প্রকাশের প্রধান অন্তরায় ছিল, তখন তাঁহার নিরুদ্ধ কাব্য বেদনা ছন্দের বেড়ি ভাঙ্গিয়া অমিত্রাক্ষরের ভিতর দিয়া আপনার পথ করিয়া লইয়াছিল—সেখানে আবেগের ঝঙ্কারই মিলের ঝঙ্কারের অভাব পূর্ণ করিয়াছিল। এই আবেগের বা প্রাণের ঝঙ্কার—ক্রোচের ভাষায় music of the spirit—না থাকিলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের গদ্য মূর্ত্তি কত খানি বাহির হইয়া পড়ে তাহা তাঁহার লেখা যে কোনও বড় কবির লেখার সহিত মিলাইয়া পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। রুদ্রপীড়ের মৃত্যুর পর বহ্ণীক আসিয়া শোকবার্ত্তা বৃত্রের কাছে নিবেদন করিতেছে, আর বীরবাহুর মৃত্যুর পর ভগ্নদূত আসিয়া শোক-বার্ত্তা রাবণের কাছে নিবেদন করিতেছে; হেমচন্দ্র লিখিলেন, "শোকাকুল বহ্ণীক তখন 'খেদ স্বরে আরম্ভিলা'।", মধুসূদন লিখিলেন, "প্রণমি রাজেন্দ্রপদে করযুগ জুড়ি আরম্ভিল ভগ্নদূত।" একজনের পংক্তি প্রাণের সঙ্গীতের অভাবে পদ্যের ভাষায় গদ্য, আর একজনের রচনা উহার সদ্ভাবে গদ্যের রীতির মধ্যেও ভাষার ঝঙ্কারে মুখরিত পরিপূর্ণ সঙ্গীত। এই ঝঙ্কারের উদাহরণ তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যের যেখানে সেখানে অজস্র পরিমাণে পাওয়া যায়, যথা:

> নিশার-স্বপন সম তোর এ বারতা
> রে দূত, অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
> কাতর বধিলা সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব
> ভিখারী?"
> "খনির তিমির গর্ভে, "হায়রে যেমতি
> না পারে পশিতে সৌরকররাশি
> সূর্য্যকান্ত মণি, কিম্বা বিম্বা-ধরা রমা
> তলে'।"
> "দ্বিরদরদ বিনির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
> বাহিরলা বিধুমুখা।" ইত্যাদি, ইত্যাদি,

বেশ বুঝা যায় সমস্ত কাব্যখানি ধ্বনি দিয়াই তৈয়ারী, অর্থাৎ মধুসূদনের ধ্বানমুখ্য কাব্য-প্রেরণা (music of the spirit) প্রকাশের তাগিদে সমস্ত বাঙ্গলা ভাষাটাকেই কবিতায় পরিণত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। রস বা আবেগই যে কাব্যের মূলকথা—মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরই তাহার জলন্ত উদাহরণ।

তবেই দেখা গেল রসাত্মক বাক্য বলিয়া কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করিলে সেখানে ভুল করা হয় না। কারণ উহার মধ্যে কাব্যের ধ্বনি, অর্থ, ব্যঞ্জনা, রীতি ইত্যাদি বহিরঙ্গের সব প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি ত নির্দ্দেশিত হইয়াছেই, তা ছাড়া অন্তরঙ্গের পরিচয়ও খুব সুগভীর ভাবেই আছে। এক এই বাক্যটা ধরিয়া আলোচনা করিলেই "কাব্যের যথার্থ স্বরূপ কি" এক দিক দিয়া বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আমরা উপরে কাব্যের বাহ্যরূপের অর্থাৎ ধ্বন্যাত্মক দিকটার সম্বন্ধেই দু'এক কথা বলিলাম, এইরূপ অন্য অন্য দিকের সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা যায় কিন্তু তাহার স্থানাভাব। এখন বিশেষের কথা ছাড়িয়া দিয়া একটু নির্বিশেষ বা সমগ্র প্রকৃতির কথা

আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। প্রথমতঃ কাব্য রসাত্মক বাক্য বলিলে বক্তার মধ্যে একটা তৎকালীন রসানুভূতির বিধেয় স্বভাবতঃই উপন্যস্ত করিতে হয়। রসের অনুভূতি হইলে তবে ত রসসৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে একটা রসধর্ম্মী চিত্তের কথাও মনে আসে—চিত্ত রসধর্ম্মী না হইলে রসের অনুভূতি কি করিয়া সম্ভবপর হয়? আবার চিত্ত রসধর্ম্মী বলিলে, রস কি, তাহার ধর্ম্ম কি, তাহার প্রেরণা কিসে হয়, এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রসের নিত্য উৎসব, অখণ্ড রূপ, প্রবাহ ধর্ম্ম ইত্যাদির কথাও চিন্তা করিতে হয়। ফলে টানে টানে এমন এক জায়গায় গিয়া পৌঁছিতে হয়—যেখানে সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব রসতত্ত্ব এক হইয়া যায়। আবার বাক্য ধরিয়া অগ্রসর হইলেও সে অভিযান বড় কম অনন্তাভিসারী হয় না—সেখানেও পথের রেখা অসীমে হারাইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ভারতীয় দর্শনের প্রসিদ্ধ স্ফোটতত্ত্বের খবর রাখেন তাঁহাদের কাছে ইহার পরিচয় দেওয়াই বাহুল্য। এই বাক্যকে বাক্য না বলিয়া বাণী বলিলেই ভাল হয়। আমরা এই বাণীর সম্বন্ধে আর সবিশেষ কিছু না বলিয়া, একবার এক কবির সম্বন্ধে অন্যত্র যাহা বলা হইয়াছিল—এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়া আমাদের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। যথা:

"ভাবের এত অসামান্য উদারতা" আদর্শের এতবড় গৌরব—বঙ্গসাহিত্য কেন, অন্যান্য কোনও সাহিত্যেও খুব কম দেখা যায়। কবি একেবারে ভাবের যেখানে শেষ সেইখানে তাঁহার বীণার স্বর বাঁধিয়াছিলেন—তাঁহার উপজীব্যের শিল্পমূর্ত্তি ছিল বাণী, আমাদের দৈনন্দিন ভাববাণিজ্যের বাহন ভাষা নহে—ইহা সেই আদি বাণী, যাহা অখণ্ড অদ্বয় নির্ব্বিশেষের প্রথম বিশেষণ (the first ingenuous theoretic form of the Absolute) এবং যাহা আমাদিগের ভারতীয় ঋষিগণের চিত্তে আনন্দে ও সৌন্দর্য্যে ধরা পড়িয়া আরণ্যকের সহস্র উল্লসিত গাথায় ফাটিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার কাব্যের প্রেরণা কোথায়—শব্দ-অর্থ-ছন্দ বলিতে তিনি কি বুঝিতেন—তাহা কবির নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটা হইতেই জানিতে পারা যায়।

"'তোমার অনন্তমুখী আদি রস-খেলা,
ভুবন-কবিতা ছন্দে করি অবহেলা,
বাহিরের ধ্বনিবঙ্গ বিলাসে বিহ্বল,
শব্দের অন্ধবনে ঘুরেছি কেবল।
সকল শব্দের অর্থ, পরমার্থ-ভূমা,
সে অন্ধ ঘূর্ণির মাঝে তুমি ছিলে—তুমি।
অতর্কিতে, অযাচিতে লভিনু তোমায়,
ছন্দের অন্দরপুরে অন্তর গুহায়।
সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির মহামহিম-সৌরভে,
ভরে গেল শূণ্য প্রাণ ভূমার গৌরবে।
সেই তুমি উপস্থিত আজি সর্ব্বমতে,
সকল ছন্দেরে মিলে একই ছন্দ পথে।
বিশ্বের সকল ছন্দে সাগর সঙ্গীত,
নিখিল শব্দ অর্থে এক অর্থরীত—
গন্ধ-স্পর্শ-রূপ-রস সঙ্গীত আকারে,
পশিছে উদাত্ত ছন্দে একের পাথারে।'"

আশা করি ইহার পরে "কাব্যের বাক্য" অর্থ ছন্দ বলিতে এদেশীয়েরা কি বুঝিতেন তাহার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন হইবে না। এখন অন্যদিক দেখা যাক।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ইউরোপের সর্ব্বজনবরেণ্য রূপ-দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত কতকটা ইহারই অনুরূপ। অবশ্য সেখানে বিভেদবাদী যে নাই তাহা নহে—কিন্তু বিভেদ যাঁহারা করেন তাঁহারা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক নহেন। তাঁহারা সৌন্দর্য্যকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করিয়া যাহা দেখেন বা দেখান—তাহা সুন্দরের অস্থি, মাংসের টুকরা বা অন্য বিচ্ছিন্ন দেহাংশ হইতে পারে, কিন্তু উহা তাহার যথার্থ স্বরূপ নহে। সুন্দর এ সকলকে জড়াইয়া এবং ইহাদের অতীত, অন্য এক লোকোত্তর বস্তু, উহার খানিকটা বাস্তব খানিকটা ভাব। তাহার স্বরূপ তাহার অবয়বের টুকরায় পাওয়া যায় না, এমন কি অনেক সময়ে সমগ্রেও ধরা পড়ে না, কারণ সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব অতর্কিত, আশ্চর্য্য ও অলোক-সামান্য—তাহার কোথায় যে প্রকাশ হইবে এবং কখন হইবে বলা কঠিন; তাহা ঠিক আমাদের বুদ্ধির মাপকাটীতে কিম্বা যন্ত্রাগারের পরীক্ষায় ধরা পড়িবার বস্তু নহে, সুতরাং এই সকল বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক শব-ব্যবচ্ছেদের দ্বারা সুন্দরের পরিচয় পাইবার যে প্রয়াস তাহা ওদেশেই হাস্যকর বলিয়া বিবেচিত হয়, আমরা আর তাহার কথা কি বলিব? কিন্তু যাহারা সত্যই দার্শনিক, অখিল রসসুন্দরকে ভাবের পথে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মূল সিদ্ধান্তে এবং এদেশীয় মনীষিগণের মূল সিদ্ধান্তে প্রভেদ বিশেষ কিছু নাই। প্রভেদ শুধু পরিস্থিতিস্থানের ও দৃষ্টিভঙ্গীর। একদল তাকান উপর হইতে নীচের দিকে—আর একদল তাকান নীচ হইতে উপরের দিকে; একদল দেখেন সমগ্র হইতে বিশেষকে, তাঁহারা সমস্ত বিশেষকে সমগ্রেরই খণ্ড প্রকাশ বলিয়া মনে করেন—আর একদল চলেন বিশেষ হইতে সমগ্রের পথে—তাঁহারা মনে করেন বিশেষের ভিতর দিয়া সমগ্রকে জানাই ঠিক জানা। প্রভেদ শুধু এইমাত্র—সুতরাং দু' দলের সিদ্ধান্তে মিল থাকিবে বিচিত্র কি? আমরা ইউরোপীয় দর্শনের মোটামুটী মর্ম্ম কথা, বিশেষ কোনও খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়া, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত এখানে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিলাম। বলা বাহুল্য, বিবৃতির ভাষা ও পদ্ধতি আমাদের নিজেদের, কিন্তু ইহার মূল তথ্যগুলি প্রধানতঃ আধুনিক সৌন্দর্য্য-দার্শনিকদের (যেমন ক্রোচে পেটার ইত্যাদির) কাছ হইতে লওয়া।

আমরা গোড়াতেই একজন আধুনিক সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করিয়া এই প্রবন্ধের মুখবন্ধ করিয়াছি। সেখানে আমরা বলিয়াছি—কথা কয়টি কাব্য সম্বন্ধে আধুনিক দর্শনের চূড়ান্ত কথা। "কাব্যসৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টির রসানুবাদ।" অর্থাৎ কাব্যসৃষ্টি করিতে গেলে প্রথমে আপনার হৃদয় দিয়া সমস্ত বিশ্বের রসপ্রকৃতিকে অনুভব করিতে হয়, তবেই সেই অনুভূতি-লব্ধপথে কাব্যের উদ্বোধন সম্ভবপর হয়। এই রসানুবাদ কোনও রকম বাদের

প্রভাবে পড়িয়া অথবা নিজের মনোগত কোনও আদর্শের সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা নহে। কারণ এরূপ আদর্শ জ্ঞান মানুষের চরিত্রে আগন্তুক—ইহা তাহার শিক্ষা দীক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর করে; কিন্তু কবির রস-সংবেদন তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা-নিরপেক্ষ সহজ অনুভূতি কোনওরূপ কৃত্রিম সংস্কারের দ্বারা তাহা বাধিত নহে। বিশ্বের সহিত প্রাণের যোগের মধ্যেই তাহার প্রতিষ্ঠা। কবি যখন মানুষ, তখন বুদ্ধির দ্বারাও তিনি জগৎকে দেখেন। কিন্তু এই বুদ্ধি দ্বারা লব্ধ জগৎ তাঁহার ভাব চিন্তার জগৎ, আর প্রাণের যোগে, রসের সাহায্যে যাহা পাওয়া, তাহা তাঁহার কাব্য জগৎ। এই চিন্তা-জগৎ আর কাব্য-জগৎ পরস্পর-বিরোধী—একে অপরকে খণ্ডিত করে। বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া করিলে তাহা আর কাব্য হয় না—আবার কাব্যের চোখে দেখিয়া বিচার করিলে চিন্তার rationality থাকে না। সেই জন্য যাঁহারা বাস্তববাদের দোহাই দিয়া কাব্যের সাহায্যে সামাজিক, নৈতিক, অর্থ-নৈতিক বা ঐরকম কোনও কিছু সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন—তাঁহাদের সে কাব্য কাব্য নহে। বিশ্বের সহিত আত্মার যোগে যে রসের জগৎ, সেখানকার অনুভূতি অখণ্ড—ভাবচিন্তার জগৎ কবির সসীম মনের সৃষ্টি, তাহা অন্য মনের অন্য ভাব-চিন্তা দ্বারা, অথবা নিজেরই কালান্তর বা অবস্থান্তরের ভাবচিন্তা দ্বারা নানারকমে বাধিত। সেখানে বুদ্ধির দ্বারা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া যাহা দেখা হয়, তাহাতে আলোর সঙ্গে ছায়া থাকে—রসের সাহায্যে আত্মযোগে পাওয়া জগতে অনাবিল আলোকেরই প্রবাহ। বিশ্ব এখানে রসে গাঁথিয়া অখণ্ড হইয়াই কবির মনে ধরা দেয়। এইরূপে জীবন মরণাতীত সত্যের উপলব্ধি—তাহা বুদ্ধি প্রণোদিত, কোন সমস্যার সমাধান নহে। যদি সমস্যার মতন কোন কিছু থাকে, সেখানে তাহার আত্যন্তিক নিরাকরণ। এই রসের পথে চলিয়াই বুদ্ধ জগতে অমৃতের বাণী বহিয়া আনিয়াছিলেন—চৈতন্য বিশ্বহৃদয়ের তরল রস প্রবাহে অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি দেখিয়া প্রেমে বিগলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সকলও বৃহত্তর ক্ষেত্রের বৃহত্তর কথা। আমরা আমাদের এই সামান্য ঘর-সংসারের মধ্যেও কবিদের ভিতর দিয়াই এইরূপ সংশয়ের নিরাকরণ দেখিতে পাই। উদাহরণের সাহায্যে আমাদের বক্তব্য একটু পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। সুন্দরের পথের পথিক শান্ত শিব অদ্বৈতের পূজারী কোনও একজন কবি—জগতের মধ্যে পুণ্যের সহিত পাপের, মঙ্গলের সহিত অমঙ্গলের সমাবেশ দেখিয়া এবং কোন যুক্তির দ্বারাই তাহার মীমাংসা করিতে না পারিয়া পরে যখন দেখিলেন দুইয়েরই লক্ষ্য বৃহত্তর সার্থকতা—কেবল একজন ধীর—সে সকল বাধা স্বীকার করিয়া লইয়া শান্তচিত্তে ক্রমে ক্রমে আপনার গন্তব্যে পৌঁছিতে চায়—আর একজন দুর্ব্বার, সে ন্যায় অন্যায় কোন কিছু না মানিয়া অসহিষ্ণু আগ্রহে সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারেই আপনার কাম্য বস্তুকে পাইতে চায়—প্রভেদ শুধু এইখানে, তা না হইলে দুয়ের প্রেরণাই সেই বাঞ্ছিত শ্রেয়ের অভাব-বোধে ;—তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন :—

"এ বিরোধ, এ মীমাংসা অশান্তি সমর
এই ভ্রান্তি, আত্মহত্যা, হিংসা, অনাচার
তোমার বিরহ বিষে উন্মাদ প্রখর
নহে কিগো হে দেবতা নৈবেদ্য তোমার ?
তব তৃষ্ণা বিশ্বলোক করে না ঘূর্ণিত।
ভবঃ মরীচিকা ক্ষিপ্ত, হে জীবনস্বামী ?
সকল পাপের বাঞ্ছা, পুণ্যের লক্ষিত
সুগুপ্ত সে অজ্ঞাতেরে খুঁজিতেছি আমি।"

তাহার পর দৃষ্টি যখন আরও খুলিয়া গেল, তখন বলিলেন :—

"খুঁজিছে খুঁজিছে নব অনন্ত জীবন,
জ্বলিছে তৃষ্ণায় যার কিম্বা বেদনায় ;.
জীবনের অন্য নাম যারি অন্বেষণ ;
বংশীমুগ্ধ মর্ম্মে বিদ্ধ হরিণের প্রায়।"

এখন এরূপ নির্দ্ধারণের মধ্যে সত্য যদি কিছু থাকে তবে তাহা হৃদয়ের মধ্যে পাওয়া—ব্যাকুল হইয়া বৃহত্তর জীবনকে আত্ম-জীবনের মধ্যে অনুভব করিবার চেষ্টায়—তাহা না হইলে ইহা যদি কেবল বুদ্ধির নির্দ্ধারণ হইত, তাহা হইলে এতবড় একটা দুঃসাহসিক প্রশ্নের এরূপ সহজ মীমাংসা উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে কবিকে নিশ্চয়ই একাধিক বার থামিতে হইত। আত্মযোগলব্ধ সত্যের ইহাকে একটা সহজ উদাহরণ বলা চলে।

এই আত্মযোগের শক্তি কবির দৈবলব্ধ শক্তি—মানুষ-মাত্রের ইচ্ছাই ইহার স্রষ্টা নহে এবং ইহা সকলের ভাগ্যেই ঘটে না। সকল কবির মধ্যে এই যোগজ অনুভূতি আবার সমান সুস্পষ্টও নহে। যাহার মধ্যে ইহা যত সুস্পষ্ট তিনি তত বড় কবি—তিনি ব্রহ্মের রস-রূপের তত বড় দ্রষ্টা। বলা বাহুল্য এই রস নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের রস নহে, পরন্তু ব্রহ্ম যেখানে সৃষ্টিরূপ ধারণ করিয়াছেন, ইহা তাহারই রস—সেই জন্যই এদেশে ইহার আস্বাদকে ব্রহ্মাস্বাদ না বলিয়া ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর বলা হইয়াছে। অন্য কথায় ইহা ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রের রস ; ঐক্য যেখানে নিছক নির্ব্বিশেষ অবিচিত্র ঐক্য, ইহা তাহার রস নহে।

কিন্তু সকল কবির মধ্যে এই যোগজ অনুভূতি সমান সুস্পষ্ট হয় না কেন ? এবং এই যোগজ অনুভূতি যখন কোনও কবির একচেটিয়া সম্পত্তি নহে এবং মানব-সাধারণেরও যখন ইহাতে অধিকার আছে, তখন অনেক মানুষের মধ্যে ইহার আত্যন্তিক অভাব দেখা যায় কেন ? কথাটা একটু বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। আমরা পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে, কবি-মানসে ও মানব-মানসে জাতীয়তার তফাৎ কখনও হইতে পারে না, কারণ কবির মন মানুষেরই মন—এবং সেখানে যদি কিছু বিশিষ্ট অনুভূতির সৃষ্টি হয় তবে তাহা মানুষের মনোধর্ম্মের কাছ হইতেই পাওয়া। তবে সাধারণ মানব মানসের সহিত উহার পার্থক্য হইতেছে এই যে সাধারণ মানব-মানস অস্বচ্ছ, কবি-মানস স্বচ্ছ। মানব-মানস একটানা প্রবাহে বহিয়া যায় না এবং তাহার ভিতরকার ঐক্যটী বহির্জগতের বহু বিরোধী সংস্কাররাশির তলায় চাপা পড়িয়া যায়—সেই জন্য তাহাকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ফলে তাহার ভিতরের বেগও সুস্পষ্ট হয় না। কবি-মানসের ঐক্য অনেকখানি সুস্পষ্ট, তাহাতেও ব্যক্তাব্যক্ত জাগ্রত-অজাগ্রতের লীলা আছে বটে, তবে তাহা অনেকখানিই ব্যক্ত ও জাগ্রত—অনেকখানিই অখণ্ডিত। এবং এই অনেকখানি অখণ্ডিত ও

অব্যাহত বলিয়াই তাঁহার মনের প্রবাহধর্ম্ম বেশ সুস্পষ্ট, কারণ, মনের ধর্ম্মই চলমানতা। সাধারণ মানুষের মনেরও এই প্রবাহ-ধর্ম্মতা আছে, কেবল বাহিরের আবর্জ্জনা-সঞ্চয়ে ব্যাহত হইয়া তাহা গতিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং অসংস্কৃত বস্তু ও ঘটনা-রাশির সংযোগে তাহার স্বাভাবিক স্বচ্ছতা মলিন হইয়া দাঁড়ায়, মনোধর্ম্মতার গুণেও বটে, ভাবপরম্পরায় গতায়াতের জন্যও বটে। কবিহৃদয়ে মানবসাধারণ ছেঁড়া-খোড়া খণ্ডতাগুলি জোড়া লাগিয়া অনেকখানি এক হইয়া যায়। এখানে মনোধর্ম্ম ও ভাবপ্রবাহ পরস্পরের সহায়ক হয়—মনের স্বাভাবিক বেগ হইতে ভাব-পরম্পরা জাগ্রত হয়—এবং আবার ভাবানুধ্যানের ফলে চিত্তবৃত্তির খণ্ড খণ্ড অংশগুলি জোড়া লাগিয়া তাহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহার বেগ আরও বর্দ্ধিত হয়। ফলে, কবির চিত্ত আমাদের চিত্ত অপেক্ষা অনেক বেশী সক্রিয়, সচেতন ও স্বচ্ছ। এই স্বচ্ছ চিত্তে বিশ্বের রসরূপের প্রতিফলন যে অতি সহজেই হইবে এবং প্রবাহ-ধর্ম্মের ফলে এই অনুভূতিগুলি যে কাব্য হইয়া গড়িয়া উঠিবে তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও এই চিত্ত-স্রোত সকলের মধ্যে ও সকলক্ষেত্রে সমান সক্রিয় ও স্বচ্ছ নহে। দেশ-কাল-পাত্র বৈচিত্র্যে—ঘটনা সংস্থানের ভিন্নতায়, লব্ধসংস্কারের তীব্রতা ও মৃদুতা ভেদে এই মনোধারার কাহারও মধ্যে অধিক স্বচ্ছ, কাহারও মধ্যে অল্প স্বচ্ছ হওয়া যেমন স্বাভাবিক, তেমনই রচনার মধ্যে কোথাও সবল, কোথাও দুর্ব্বল, কোথাও সুস্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও অতিরঞ্জিত হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এইখানেই কবিতে কবিতে এবং কবির পূর্ব্বাপর রচনার মধ্যে পার্থক্য। কিন্তু তাহা হইলেও রচনা যদি জাগ্রত চিত্তের রচনা হয় এবং নিছক রচনা-বিলাসের ফল না হয়—তবে এই সকল ত্রুটিতে কবির সৃষ্টির অঙ্গহানি হয় না এবং পাঠকের রসানুভূতিতেও বাধেনা। যেখানে অসামঞ্জস্য, তাহার তলায় ডুবিয়া ঐক্য-সূত্রটী বাহির করিয়া লইতেও বিলম্ব হয় না—কারণ জাগ্রত রসা-নুভূতির সৃষ্টির ঐক্যের উপরই প্রতিষ্ঠা।

এ পর্য্যন্ত আমরা যাহা দেখিলাম তাহা হইতে বুঝা গেল কবি হইতে গেলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন রসের উদ্বোধনের। নকলনবিশী করিয়া কবি হওয়া যায় না কারণ সে চিত্ত জাগ্রতও নহে, সক্রিয়ও নহে। চলমান বিশ্বের নব নব রসলীলা তাহাতে ধরা পড়ে না। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত প্রাণের সম্বন্ধে রসের যে বিচিত্র অনুভূতি কবির কাছে হয়, তাহাই যখন তাঁহার প্রাণের ছাপটী লইয়া আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই হয় তাঁহার কাব্য। আর এই নিজের প্রাণের ছাপটী হয় তাহার শিল্প—এইরূপ কাব্যই সাহিত্যের জগতে কবির নূতন অবদান। এদেশে ও বিদেশে যে সকল বড় বড় কবির কথা আমরা শুনিতে পাই তাঁহারা এই হিসাবেই বড় কবি। ডাল-ভাতের সমস্যা, চাহিদা ও জোগানির প্রশ্ন, অর্থনৈতিক বা রাজ-নৈতিক প্রতিবন্ধক, ইত্যাদি বিষয়গুলি আমাদের কাছে যত কঠিন ও মর্ম্মান্তিক হউক না কেন; শুধু সেই সকলেরই জল্পনা কখনও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হইতে পারে না—যদি তাহাদের পিছনকার দৃষ্টি কেবল আমাদের বস্তুজগতেই নিবদ্ধ থাকে। তাহাদের প্রয়োজন আমাদের জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে কাব্যের প্রয়োজন অপেক্ষা অনেকগুণে বেশী হইতে পারে, কিন্তু কাব্যের ক্ষুধা সম্পূর্ণ অন্য জাতীয় ক্ষুধা এবং তাহার পরিতৃপ্তি কেবল এই সকলের বস্তু-তান্ত্রিক বিবৃতির মধ্যে নাই। কবি যদি পাঠকের চিত্তকে জগতের মোহপঙ্কিল আবিলতা, অজস্র প্রাণঘাতী বাদবিসম্বাদ হইতে সরাইয়া লইয়া উন্মুক্ততর দৃষ্টির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিতে না পারিলেন, তবে তাঁহার কাব্য-সৃষ্টির মূল্য কি? ছোট করিয়াই হউক বা বড় করিয়াই হউক দেখে ত সকলেই এবং প্রকৃতি-ধর্ম্মে রসও অল্পবিস্তর অনুভব করে, যদি তাহাদের কথা—না হয় একটু ফেনাইয়া ফাঁপাইয়াই পুনরাবৃত্তি করা হইল, তবে কবি বা ভাবুকের ঋষি-দৃষ্টি বৃহত্তর অনুভূতির কাছ হইতে আমরা নূতন কি পাইলাম? এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গিয়াছেন—"জগৎজুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে।" তাহা হয়ত বাজে, কিন্তু আমরা বধির—আমাদের প্রাণের কর্ণে তাহা পৌছায় না। কে তাহার শ্রুতি আমাদের কাছে পৌছাইয়া দিবে, কবি ব্যতীত? কবির চিত্তও যদি আমাদের মত আবদ্ধচিত্ত হয়, আমাদের মতই যদি বাস্তবের প্রয়োজন লইয়া তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন, তবে তাঁহার কাছ হইতে আমাদের প্রত্যাশা কি? বৃহত্তর দৃষ্টি, বৃহত্তর হৃদয়, বৃহত্তর স্বার্থ যে আমাদের জাগতিক অস্তিত্বের পক্ষে কত প্রয়োজন, তাহা আজিকার এই ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া দানবীয় তাণ্ডব লীলার মধ্যে অপেক্ষা মানুষ আর বেশী কখনও অনুভব করে নাই। কিন্তু হায়, সে কবি কোথায়, যিনি তাঁহার প্রাণের আলোকে দেখাইয়া দিবেন, যে বিশ্ব-মানবীয় মিলন ও হৃদয়ের আদান-প্রদানের মধ্যেই আমাদের চরম ও পরম কল্যাণ লুকান আছে,—ব্যক্তিগতই হউক আর জাতিগতই হউক, সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-প্রণোদিত হানা-হানির মধ্যে নহে। কিন্তু সে কথা যাক্।

কালিদাস ইত্যাদি মহাকবিগণের উক্তরূপ অন্তর্গভীর বিশ্বোদার ঋষি-দৃষ্টি-স্বচ্ছ সাবলীল প্রবাহ-ধর্ম্মী হৃদয় ছিল, তাই তাঁহাদের কাব্যকথা, আমাদের মত সংশয়ে ছিন্ন, সংসারের ধূলায় অন্ধ, ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কথা নহে, তাহা সীমায় পরিচ্ছিন্ন মানুষের অসীমের জন্য শাশ্বত আকুতির কাহিনী। অন্তহীন শূণ্যতার বুকে মূলহীন ফুলের মত এই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে একটা বিরহ ব্যথা নিরন্তর জাগিয়া আছে, আমাদের পরিপূর্ণ সুখের মধ্যে তাহারই রেশ হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া আমাদের সমস্ত ভোগসুখ, সমস্ত আনন্দ উৎসব এমন কি আমাদের অস্তিত্বটাকে পর্য্যন্ত ব্যথাসকরুণ করিয়া তুলে। মনে হয়, "কি যেন রয়ে গেল, কোথা কি রয়ে গেল, পড়িয়া এল বেলা, হল না পাওয়া"; কালিদাস ইহারই উল্লেখ করিয়া তাঁহার "অভিজ্ঞান শকুন্তলে" লিখিয়াছেন, "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্", ইত্যাদি। কবি ইহারই দূর শ্রুত সঙ্গীতের মত রেশ আপনার প্রাণের কর্ণে শুনিয়া অজানা বিষাদে ব্যাকুল হইয়া উঠেন, আপনার চিত্তকে সুদূরে প্রসারিত করিয়া অভিসারে প্রেরণ করেন, কখনও সেই অপাওয়া স্বপ্নের নিজের মনগড়া একটা রূপ কল্পনা করিয়া মর্ত্ত্যেই অমর্ত্ত্য লোকের ছবি আঁকেন। কালিদাসের কাব্য আলোচনা করিতে বসিলে তাঁহার এই বিশিষ্টতাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তাঁহার মেঘদূতে কবি-চিত্তের এই শাশ্বত বিরহ-ব্যাকুলতাই যক্ষের বকলমে ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্য

দেশেও এই জাতীয় অনুপ্রেরণার আদর্শ পাওয়া যায়। হোমারের ওডেসী, দান্তের ডিভাইন কমেডি, শেলির অ্যালাষ্টর, টেনিসনের সার গ্যালাহাড কর্ত্তৃক হোলি গ্রেলের অন্বেষণ এই জাতীয় কবিতার অন্যতর উৎকৃষ্ট নমুনা। কবি-চিত্তের এই রহস্যময় বিরহব্যাকুলতা কাব্যের প্রথম কথা, তাঁহাদের সমস্ত কাব্যসৃষ্টিই এই অনির্দ্দিষ্ট উদ্বেগ, এই কি-জানি-কি অভাবের দ্বারা প্রবোধিত। কিন্তু ইহা শুধু কবি-চিত্তের ব্যাকুলতা বলিলে বোধ হয় অন্যায় বলা হইবে, ইহা মানবমনেরই সাধারণ ধর্ম্ম। ইহারই উল্লেখ করিয়া সঞ্জীব চন্দ্র এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "চারিটা বাজিলেই আমি অস্থির হইয়া উঠিতাম, কেন তাহা কখনও ভাবিতাম না, পাহাড়ের কিছুই নূতন নাই, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না—তথাপি কেন আমার যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি, এ বেগ আমার একার নহে, যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময়ে কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে—জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে। জলে যে যাইতে পারিল না সে অভাগিনী" ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ও ইহার অনুরূপ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় যথা,—

আর নাইরে বেলা নামলো ছায়া ধরণীতে
চলবে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে।
জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যা গগন আকুল করে,
ডাকে আমায় পথের পরে সেই ধ্বনিতে।

জানিনা আর ফিরবো কিনা, কা'র সাথে আজ হবে চিনা!
(ঘাটে) কোন্ অজানা বাজায় বীণা তরণীতে।"

সঞ্জীব চন্দ্র, রবীন্দ্র নাথ, উক্ত কুলবধূ, আপনি, আমি, আর পাঁচজনে সকলেই কোনও না কোনও সময়ে এই ব্যাকুলতা অল্পবিস্তর অনুভব করি। কিন্তু কবির হৃদয় স্বচ্ছ, তিনি ইহা আরও সুস্পষ্ট রূপে অনুভব করেন এবং ইহার ইঙ্গিতে আরও অধিক ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ইংরাজীতে ইহার নাম "call of the infinite" বৈষ্ণবের ভাষায় ইহাই কৃষ্ণ-ব্যাকুলতা। তাঁহাদের মতে বিশ্ব-বৃন্দাবনের নিয়মে, আমরা সকলেই, জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, অল্পবিস্তর কৃষ্ণ-ব্যাকুল, অল্পবিস্তর ব্রজগোপী। এই প্রেরণাতেই আমাদের কর্ম্মচক্র চলিতেছে। বিশ্বভুবন প্লাবিত করিয়া বাঁশীর সুরে নিয়ত বাজিতেছে "আয় রাধা আয়" আমাদের কেহ তাহা নিয়া ধন জন পার্থিব ভোগসুখের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি, চিত্তের ধাঁকায় মনে করিতেছি "বাঁশী বুঝি এইখান হইতেই বাজিতেছে।" আবার কেহ বা অধিক ভাগ্যবান্, ইহার ইঙ্গিত অনেকটা ঠিকভাবে হৃদয়ে অনুভব করিয়া কুঞ্জের পথেই ছুটিয়া চলিয়াছেন, যেখানে হৃদয়রাজ বাঁশীর সুরে নিখিলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া নিখিল রসামৃতমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন। কবিগণ এই ভাগ্যবান্ দিকুলের অন্যতম, তাঁহাদের কাব্যসৃষ্টি এই বাঁশরীর অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত। কালিদাসের মেঘদূত এই চিরন্তন বাঁশরীর অভিসারেরই কাহিনী, সেইজন্য ইহা আমাদের কাছে আজ পর্য্যন্ত এত মধুর হইয়া আছে।

এতদূর পর্য্যন্ত যাহা দেখা গেল, তাহাতে আমরা এই বুঝিলাম, বিশ্বের সহিত প্রাণের সংযোগে লব্ধ অখণ্ড রস অনুভূতি, স্বচ্ছ প্রবহমান্ চিত্ত, আবদ্ধচিত্তের বৃহত্তর মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা, এই সমস্ত আলোকপন্থী কবিগণের কাব্যসৃষ্টির অপরিহার্য্য গোড়াকার কথা। তাঁহাদের কবিকৃত্য, ক্ষুদ্রপ্রাণ কবিগণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, সূক্ত্যুক্তিবহুল, রীতি মাত্রে পর্য্যবসিত, ছন্দ ও বাক্যের স্বল্পপ্রাণ শিঞ্জিনীতে শেষ, সাহিত্যিক চটুলবৃত্তি নহে। তাহা অমৃতের ক্ষুধা; এই ক্ষুধার তাড়নায় তাঁহারা শতকদর্য্যতাকলুষিত, ধূলি মলিন, মর্ত্ত্যের মৃত্তিকার উপর ভাব-রসের আনন্দলোক সৃষ্টি করেন। ব্যবহারতঃ পৃথিবীর জীব হইলেও, তাঁহাদের চিত্তের জ্যোৎস্না অনন্তের সেই মিলন-বাসরে, যেখানে জড়ে জীবে, বিশ্বে বিশ্বেশ্বরে অফুরন্ত প্রেমের লীলা চলিতেছে। সেই রস-লোকে দাঁড়াইয়া এবং অখণ্ড-রসসুন্দরকে সম্মুখে লইয়া যে সুরে তাঁহারা তান ধরেন মর্ত্ত্যের ভাষায় প্রকাশ বলিয়া মাটির ছাপ হয়তঃ তাহাতে একটু আধটু থাকে, কিন্তু তাহা স্বরূপতঃ স্বর্গেরই সঙ্গীত। মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলাও এইরূপ একটী মর্ত্ত্যের ভাষায় গঠিত স্বর্গের সঙ্গীত। সেখানে তপোবনের যে গাথা ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এক সুরে বাঁধা। তাঁহার অতুলনীয় শকুন্তলা তপোবনেরই শান্ত স্নিগ্ধ কোমল মাধুর্য্যভরা হৃদয়ের এক অপূর্ব্ব বহিঃপ্রকাশ। বসন্তের অতর্কিত আবির্ভাবে সেখানকার সংযত অনাড়ম্বর তপঃক্লিষ্ট জীবনে যে মাধবী মাদকতা উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল, কবি যেন তাহাকেই রেখার সীমায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেইজন্য লালসা, কৃত্রিমতা, ভোগবিলাসের প্রতিরূপ, মর্ত্ত্যের অতিবাস্তব রাজসভার কলুষিত বায়ুস্পর্শে সেই স্বর্গের সুষমা এক মুহূর্ত্তেই ম্লান হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছিল। আবার যখন আমরা তাহার পুনর্দর্শন পাই, তাহা আর মর্ত্ত্যের মাটিতে নয়, পরন্তু স্বর্গের পথে—অনেক অনুতাপের অশ্রুজল ঢালিয়া চিত্তশুদ্ধির পরে—তাহাও আর সে তপোবনের কাব্যাত্মা, তপোবন পরিপ্রেক্ষার কোমল সৌন্দর্য্যের মূর্ত্ত প্রকাশ, অমানুষী-সম্ভবা শকুন্তলার নহে কারণ তাহা চিরদিনের জন্য সৌন্দর্য্যের অখণ্ড আধারে বুদ্বুদের মত লয় হইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়াছিলেন যিনি তিনি দুষ্যন্তের ভাবী রাজমহিষী ও তাঁহার পুত্রের জননী, মানবী শকুন্তলা। ইহার পর যাহার কথা, তাহা বাস্তব জগতের—বাস্তব ঘরকন্নার কথা, সৌন্দর্য্যের স্বপ্নের সহিত তাহা খাপ খায় না, সেইজন্য কবি অতি নিপুণ হস্তে তাহার উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। কবি এই-রূপ অপার্থিব দিব্য সঙ্গীতে তাঁহার অমর গ্রন্থকে গাঁথিয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়াই জার্ম্মানীর অন্যতম মহাকবি শিলার বলিয়াছিলেন "It is too delicate for the stage." কবে কালিদাস শকুন্তলা রচনা করিয়াছেন, তাহার পর জগতের উপর দিয়া কত কদর্য্য বাস্তবতা, কত জিঘাংসু ঘাত-প্রতিঘাতের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সৃষ্ট এই অপার্থিব সৌন্দর্য্য লোকের ছবি নরসংসারের বাহিরে আমাদিগের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া থাকিয়া চিরদিন আমাদিগকে আনন্দলোকের পথ দেখাইয়া দিতেছে। এইরূপ সৃষ্টিতেই মহাকবির মহাকবিত্ব। কালিদাসের মধ্যে এই সৃষ্টিশক্তি অসাধারণ পরিমাণে বিদ্যমান্ ছিল বলিয়াই তিনি জগতের সর্ব্বকালের মহাকবিদের অন্যতম।

গান

রচনা ঃ বাণীকুমার
সুর ঃ পঙ্কজকুমার মল্লিক

স্বরলিপি ঃ অনিল দাস ও
বিমলভূষণ

প্রভু, নিতি-নব প্রেমের করুণা
বিপুল সৃজন-মাঝে হে।
জাগে তব গীতি নিখিল-ভুবনে
জীবনে-মরণে কাজে হে ॥
সুমধুর রসে অমৃত ধারায়
গ্রহ-তারা-রবি তব গান গায়,

কি মহোৎসব-সঙ্গীত ভবে
সুরে-তালে-তানে বাজে হে
মানব তোমায় চিন্তা করিয়া
লহে যে চরম-মুক্তি বরিয়া,
হে জ্যোতির্ম্ময়, কল্যাণতম—
তব রূপ চোখে রাজে হে ॥

-ত্রিতাল-

সা সা || { ধা সা রা রা | রা রা মজ্ঞা -মা | মা মপা মা পা | ‌া -া -া -া
প্র ভু || { নি তি ন ব | প্রে মে র॰ ॰ | ক রু॰ ণা ॰ | ॰ ॰ ॰ ॰

মা মপা পা পা | পা পা মপধা মপা | মজ্ঞা -া া -া | রজ্ঞা মজ্ঞা (রজ্ঞা সা)} -া -া
বি পু॰ ল সৃ | জ ন মা॰॰ ঝে॰ | হে ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ ॰ ("প্র॰ ভু")} ॰ ॰

মা মা রা রা | সজ্ঞা জ্ঞরা রসা -া | ণ্‌া ণ্‌া ণ্‌া ণ্‌ধা | পধ্‌া -া পা -া
জা গে ত ব | গী॰ ॰॰ তি ॰ | নি খি ল ভু॰ | ব॰ ॰ নে ॰

প্‌া সা সা সা | সরা রসা রপা মপা | মজ্ঞা -া -া -া | রজ্ঞা মজ্ঞা রজ্ঞা সা
জী ব নে ম | র॰ ণে কা॰ জে॰ | হে॰ ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ ॰ "প্র॰ ভু"

০ ১ + ৩
|| ণা ধা ণা ধা | ণা ধা না -া | না র্সা রা র্সনা | র্সা -া -া -া
|| সু ম ধু র | র ॰ সে ॰ | অ মৃ ত ধা॰ | রা ॰ ॰ য়

ণা ধা ণা ধা | ণা ধণা পা -া | মা পা পধা মপা | মজ্ঞা -া -া -া
গ্র হ তা রা | র ॰॰ বি ॰ | ত ব গা॰ ন॰ | গা॰ ॰ ॰ য়

র্রা -া া া | র্রা -া র্রা সর্রা | র্রর্মা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্মা | র্রা র্রা র্সা -া
কি ॰ ॰ ম | হো ৎ স ব | স॰ ঙ্‌ গী ত | ॰ ভ বে ॰

সা́ সা́ -া ণা　ণসা́ ণা ণধা পা　মা রা রমা পধা　মজ্ঞা -া -া -া
সু রে ॰ তা॰　লে॰ ॰ তা॰ নে　না ॰ জে॰ ॰॰　হে॰ ॰ ॰ ॰

ইহার পরে "জাগে তব গীতি".

০　　১
[ধা সা́ সা́ ণা　পধা ধণা মা -া]
ণা ণা ণা ধণা | ধপা -া -া রা　রা মা মা পা　ণ ধণা পা -া
মা ন ব তো॰ | মা॰ ॰ ॰ য়　চি ন্ তা ক　রি ॰॰ য়া ॰

ণা ধা ণা া　ণা ধণধা মা পা　না -া না না　না নর্সা সা́ (র্া) }
ল হে যে ॰　চ র॰॰ ম ॰　মু ক্ তি ব　রি ॰॰ য়া (॰) }

সা́ সর্া র্া র্া.　র্া -া র্া র্া　র্মা́ জ্ঞা́ জ্ঞা́ মা́ | -া র্মা́ র্সা́ -া
হে　জ্যো　তি র্ ম য়　ক॰ ॰ ল্যা ণ ॰ ত॰ ম॰ ॰

সা́ সা́ -া ণা　ণসা́ ণা ধণা পা　মা রা রমা পধা　মজ্ঞা -া -া -া
ত ব ॰ ক্র　প॰ ॰ চো॰ কে　রা ॰ জে॰ ॰॰　হে॰ ॰ ॰ ॰

ইহার পরে "জাগে তব গীতি·· কাজে হে"······ ॥ ॥

'কল্কি'

বীণা সেন, এম-এ

উন্নত শিরে শ্বেত উষ্ণীষ পিঙ্গল বর্ণধারী,
পিঙ্গ নয়নে চাহিয়া ঊর্দ্ধে আসে ঐ ভয়হারী।
বিশ্বের মনীষা

তাঁর আগমন ব্যক্ত করিতে খুঁজে মরে শুধু ভাষা
কল্পলোকের বিলাস লইয়া নবীন যুগের কল্পনা
যুগসন্ধির বাস্তবতায় স্বপ্নেরি জাল বোনা।
মানুষের কোটী জন্মের পাপ দুঃসহ হ'য়ে উঠে,
বিধির ক্ষমার প্রলেপে সে পাপ তিলেকে নাহিক টুটে

মানবের বিধাতা,
ধারণ করে নৃসিংহ মূরতি বিভীষণ অপরূপতা।
অশ্বক্ষুরের ধূলিরেণুতে দিঙ্ মণ্ডল ঘিরি'
দিবসরজনী চ'লে আসে ঐ দীপ্ত কৃপাণধারী।

নরের কল্পনায়
যে শ্যামসুন্দর অঙ্কিত ছিল শুভ্র আল্‌পনায়,
সভয়ে চমকি' তাহারা দেখিছে ঈশান মেঘের কালো,
বাঁশীর বদলে বিষাণ বাজিছে তৃতীয় নেত্রে আলো।

নহে শ্যামসুন্দর,
রুদ্রের বেশে আসিছে দেবতা ভেদি' গিরি কন্দর।
পথে পথে তাই অপেক্ষিছে মরণ-মহোৎসব,
মৃত্যুর স্তূপে অর্ঘ্য রচনা, ক্ষুধিতের জয়রব।
ঝঞ্ঝার বেশে আসছে দেবতা বিশ্ব রণাঙ্গনে,
পুঞ্জিত পাপ ধ্বংস করিতে মৃত্যুর গরজনে।

এসেছে অমৃতক্ষণা,
প্রভঞ্জনের প্রতি পদপাতে চলিতেছে মার্জ্জনা।
বিষাক্ত ধরা নিঃশেষিছে রুদ্রের নিঃশ্বাসে,
নব ধরণীর স্বপ্ন জাগিছে যুগের সন্ধ্যাকাশে।

মহাযজ্ঞের শেষে,
সুধাসিঞ্চিত পূত ধরণীতে দেবতা উঠিবে হেসে।'
যুগসন্ধির দুয়ারে দাঁড়া'য়ে আন্ত বিশ্বজন
বৃথা আশা ল'য়ে দেখিছে কেবল রক্ত সম্মার্জ্জন।

প্রলয় পরমক্ষণে
হায়, দেবতা শুধুই ঊর্দ্ধ নয়নে দৃষ্টিশায়ক হানে।

অনধিকারী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমার চোখে যা লাগে না কো ভাল
দেখেই বলো না—ছাই,
হয় ত তাহার মহিমা বুঝিতে
অধিকারী হওয়া চাই।
চেনে যারা জানে তাহারই ত দাম,
শিলা হয়ে পড়ে রহে শালগ্রাম,
বোঝে দুর্লভ মণি-রত্নের
মূল্য যে গুণীরাই।

রুক্ষ প্রাচীন তুলটের পুঁথি
হয় ত অসুন্দর।
কতই অমৃত ধরিয়া রেখেছে
কালো আঁখরের গড়।
কতই শান্তি, কত আনন্দ,
ভাবের ভুবন রয়েছে বন্ধ,
তুলনায় যার নেহাৎ ক্ষুদ্র
মোদের পৃথিবীটাই।

জটাজুটধারী শুষ্ক শীর্ণ
বসে আছে সন্ন্যাসী,
বক্ষে নিবিড় মিলনোৎসব,
ঘন আনন্দ রাশি।
সেথা শ্রীহরির কত রাস দোল,
কত ঝুলনের মধু হিল্লোল
সুধা সাগরের কল কল্লোল—
কিছু কি আমরা পাই?

মন্দির গায়ে অশ্লীল ছবি
দেখিলেই হয় ঘৃণা,
আছে ভক্ত ও শিল্পীর কাছে
মূল্য তাহার কি না?
তন্ময়-মন জানে না বিকার—
প্রবেশে তাহারি শুধু অধিকার,
পিপাসু চকোর সুধা চায় শুধু,
আন সুধা তার নাই।

লৌহ মনকে চুম্বক পাবে
করিতে আকর্ষণ,
সোনা যে হয়েছে, নির্ভিক আর
নির্মল তার মন।
ছাগলে কি ভয় কল্পতরুর,
ফাঁদে পড়ে ঘুঘু, পড়ে না গরুড়,
কালো ও নিকষে খাঁটি স্বর্ণের
প্রথমে হয় যাচাই।

মন্দির পথে বিপণি পাতায়ে
বিলাসিনীগণ রয়,
মুক্তা-তোলার ডুবারীরে কি সে
ভুলাবে সফরীচয়?
যাহারা ভক্ত, যারা উপাসক,
তারা দেবশিশু—কঠোর সাধক,
সঙ্গে তাদের অমৃত বাক্য
সমান সকল ঠাঁই।

বাহির দেখিয়া আমরাই ভুলি
অনধিকারীর দল,
বুঝিতে পারিনে তবু করি মিছে
তর্ক ও কোলাহল।
চিনিতে হরির চরণ দাগ গো,
চাই প্রেম চাই ভকতি ভাগ্য,
যন্ত্রেতে যাহা যায় নাকো ধরা
মন্ত্রেতে তাহা পাই।

গান

—আব্বাসউদ্দিন আহমদ

সবি মুছে যায়, মোছে নাকো শুধু স্মৃতি,
সুর রহে জেগে' যদি থেমে যায় গীতি॥
জড়ানো যেমন বীণা আর বেণু,
মাধুরীর সাথে যেন ফুল-রেণু,
মোর কণ্ঠের কলকাকলিতে জাগে সেদিনের প্রীতি।
স্মৃতির দেউলে ম-‐উপচার নিয়া
হারানো দিনের অর্ঘ্য সাজাই প্রিয়া,

কত বসন্ত বাদলের রাতে
যে গান গেয়েছো তুমি মোর সাথে,
সে সুর-লহরী মূরতি ধরিয়া
জাগে অন্তরে নিতি।
মোছে নাকো কভু স্মৃতি॥

মরণ-বাসর

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি-এল,

নিভে আসে আলো ধরণীর বুকে যাবার বেলা,
কি খেলা খেলিবে আজি প্রিয় মোর, মরণ খেলা?
হৃদয় কাঁপিছে থর থর থর্ ;
উঠে চারিদিকে প্রলয়ের ঝড় ;
সাগরের বুকে উঠে তরঙ্গ দিতেছে দোল্
গগণে পবনে বাজিছে বিষাণ, অট্ট রোল।

যাবার বেলায় ওই বাজে বুঝি মরণ শাঁখ,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেণিল কণায় দিতেছে ডাক?
আরো কাছে এস—এস প্রিয় মোর,
শুনিতেছ নাকি ওগো চিত চোর—
কালের বক্ষে মৃত্যু জয়ের বাজিছে বাঁশী?
প্রলয় নাচনে ধরা টলমল—অট্টহাসি।

রচিয়াছি আজ বাসর-শয়ন যাবার রাতে ;
দীপ নিভে আসে—শুষ্ক কুসুম শূন্য হাতে।
ঘুমে আসে ঢুলে অলস নয়ন,
লও বুকে মোরে হৃদয় হরণ ;
কণ্ঠে দুলিছে কণ্টকসম প্রণয়-ডোর ;
আজি দু'নয়নে মিলন-অশ্রু ঝরে অঝোর।
পাষাণ কারার বন্ধ নাশিয়া ভাঙ্গি' আগল ;
মুক্তি-আলোয় হাসে দশদিক ধরা পাগল।
সাগরের বুকে মত্ত তুফান,
আকাশে বাতাসে মিলনের গান ;
উল্লাসে আজি চিত্ত দোদুল—হৃদয় নাচে
প্রিয়রে পেয়েছি মরণ-বাসরে বুকের কাছে।

'অনন্ত যাত্রা'

শ্রীবিমল রায়

তরীখানি চলে মোর, ভাঙ্গা হাল তার—
এ আঁধার পারাবারে। স্তব্ধ চারিধার!
ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ বৈতরণী। একেলা পথিক—
বাহিয়া চলেছি তরী অনন্তেরি পানে।

দিগন্ত নিঃসাড় স্তব্ধ, রাকে আবছায়া!
অজানা বাঁশীর সুরে ছেড়েছি এ ঘর,—
চলেছি অনন্ত পথে একান্ত একেলা!
কেহই নাহিক মোর, বিরহী বিজন!

ওপারের কালো মায়া কাজল পাতায়—
দিয়ে মোরে হাতছানি ভেঙ্গে দিছে ঘর'
এক বিন্দু নয়নাশ্রু ঝরেছিল হায়।
চলেছি বাহিয়া তবু ক্ষুদ্র তরীখানি।

নাই নাই এ যাত্রার শেষ নাহি আর,
অসীমের যাত্রা পথে একেলা পথিক।

"যাযাবর মন ভোলে পথচলা"

শ্রীআশা সান্যাল, বি-এ

অনেক ভাবিয়া তোমারে ত' আমি বলেছি অনেকবার
আমার জীবনে তুমি ধূমকেতু, অভিশাপ আঁধিয়ার।
বরিষামুখর সজল প্রভাতে অকারণে বলে মন
তুমি ছাড়া মোর ব্যর্থ সকলি' প্রাণহারা প্রতিক্ষণ।

কাছে এলে যারে পারি না বাঁধিতে দুরু দুরু কাঁপে বুক,
দূরে গেলে যারে হৃদয়ে বাঁধিতে জেগে থাকি উৎসুক ;
কেন আমি দেখি তব আঁখি 'পরে মোর ম্লান মুখছায়া।
তোমার তৃষ্ণা-মরুতে যে আমি ঘন নীল মেঘমায়া।

শিরায় শিরায় জাগে শিহরণ মাতাল শোণিত নাচে,
যাযাবর মন ভোলে পথচলা—আপনি বাঁধন যাচে,
প্রেতের মতন মোহছায়া কার তন্দ্রার মতো ঢাকে,
অনাগতকাল নিয়তির মতো অবিরত মোরে ডাকে।

সুদূর আকাশে তারায় তারায় তারি যেন হাতছানি,
শ্যামল-তৃণের মুছে যাওয়া পথে তারি রেখে-যাওয়া বাণী ;
পথিক বাউল পথচারী অলি গাহে যেন তারি গাথা,
স্মৃতি-সমাধির সে তীর্থ দ্বারে নীরবে জানাই ব্যথা।

মাভৈঃ মাভৈঃ

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল

মাভৈঃ মাভৈঃ
গগণে তপন জাগে ঐ!
অমৃতের পুত্র মোরা
তুচ্ছ মৃত্যু-ভীত নই।
আমরা আনিব জয়,
আমরা জানি না ভয়,

রুধিব অত্যাচার শত অন্যায়,
শিব তাণ্ডবে চিত্তে ডমরু বাজায়
তাথৈ তাথৈ।
কে দেবে মায়ের তরে আত্মাহুতি
সমরে ডাকিছে তারে মরণ দূত—

আমরা আনিব জয়,
আমরা জানি না ভয়,
পীত শত্রু নাশি' শান্তি আনিব নিশ্চয়।
আমরা মায়ের ছেলে,
শিরে তাঁর পদধূলি লই।

মায়ামৃগ

বাণীকুমার

[নাট্যরসিকা]

প্রথম

দৃশ্যরূপ : [নেটিভ্ ষ্টেট্—ভেলপুরা। এই ষ্টেটের সর্ব্বময় কর্ত্তা দেওয়ানের গৃহ-কক্ষ।···কক্ষটিকে ইঙ্গ-ধরণে সাজানোর একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।···

গৃহাভ্যন্তর হইতে আসিবার একটি দ্বার—দক্ষিণ দিকে, বাম-পার্শ্বে বাহিরে যাইবার দ্বার। সাম্নের দিকে দক্ষিণ ঘেঁসিয়া একটি খোলা জানালা।···

কক্ষের মধ্যভাগে একটি বড় গোল টেবিল—সেই টেবিলের সাম্নে একটি ভালো চেয়ার—দেওয়ান সেই আসনে বসিয়া থাকেন। টেবিলের এক এক ধারে চারটি করিয়া সমবেখায় দুই ধারে আটটি চেয়ার সাজানো।···পিছনদিকে এক কোণে একটি বুক্-কেস্—সেই বুককেসের শীর্ষে একটি ঘড়ি, তারপরেই কয়েকখানি মোটা মোটা দপ্তর রহিয়াছে।—পটোত্তোলনের সঙ্গে দেখা গেল—দেওয়ান সত্যস্বরূপ সর্ব্বাধিকারী সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বতীর্থের কাছে হাত গণাইতেছে—টেবিলের উপরে আধ্খোলা অবস্থায় একটি গোটানো কোষ্ঠি পড়িয়া আছে—একটি শ্লেট্ তদুপরি একটি পেন্সিল খড়ি—গোটাকয়েক পুরাতন ও একটি নূতন পাঁজি।···শ্লেটে একটি 'ছক্' কাটা রহিয়াছে। অতি মনযোগের সঙ্গে সর্ব্বতীর্থ সত্যস্বরূপের হস্তরেখা বিচার করিতেছে—দৃষ্ট হইল।]

সত্যস্বরূপ। কি রকম দেখ্চেন বলুন তো—সর্ব্বতীর্থ ম'শায়? আমি তো মহাভাবনায় প'ড়ে গেছি।

সর্ব্বতীর্থ। ভাবনার খুব বিশেষ কিছু নেই··আবার কিঞ্চিৎ তা'র যোগাযোগও দেখ্তে পাচ্চি—হ্যাঁ, তাইতো বটে—(হস্ত-বিচারে মন দিল)

সত্য। দেখুন না চেষ্টা ক'রে—ঐ যোগটাকে কোনো রকমে যদি বিয়োগ ক'রে দেওয়া যায়।

সর্ব্ব। হুঁ··'পঞ্চমে মঙ্গল যার বন্ধ গত শনি—
কে দিল অনলে হাত কে ধরিল ফণী।'··

এই হোলো জ্যোতিষ-বচন···আপনারও দেখ্চি অনেকটা এই অবস্থা—অতএব গ্রহ-শান্তি করা আশু প্রয়োজন।

সত্য। যে দুর্গ্রহ এখন প্রত্যক্ষ মার্গে উদয়ের পথে—তাঁর অস্তের ব্যবস্থা আগে না ক'রে, আপনার শূন্যমার্গে ঘুরে-বেড়ানো গ্রহের শান্তি কর্বার সময় কোথায়? মনে রাখবেন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা··সহজে যে-টা হয়—গণনা ক'রে তাই করুন না কেন।

সর্ব্ব। দেখি চেষ্টা ক'রে··তবে গ্রহ যদি হয় বক্র—তা'র চক্রফল সাম্লানো একটু শক্ত—

সত্য। আপাততঃ দিন কয়েকের জন্যে বাঁকাকে একটু সোজা রাখা যায় না—যৎকিঞ্চিৎ নৈবেদ্য-টৈবেদ্য দেখিয়ে? এখন কিছু মানসিক ক'রে রাখা যাক্—তারপরে না হয় মূল্য ধ'রে দেওয়া যাবে।

সর্ব্ব। দেখুন সর্ব্বাধিকারী ম'শায়—যে যোগাযোগ বিষম গ্রহের দ্বারা সম্ভাবিত—সে-স্থলে মানুষের হস্তক্ষেপ করা ভয়ঙ্কর কঠিন ব্যাপার। কারণ, জ্যোতিষ-বচনেই আছে—

সাত শূন্য বহুতর পাপ
এহার এড়ান্ নাহিরে বাপ।···

সত্য। বচন্-টচন রেখে দিয়ে এখন কাজের কাজটা দেখুন। আপনার গণনাটা একটু নুইয়ে-বেঁকিয়ে আমার সুবিধেটা যাতে হয়, তাই কর্তে হবে।

সর্ব্ব। ভাগ্য কি কারো মন রেখে চলে—ম'শায়! শাস্ত্রই বল্চেন—'সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ'··বুঝ্লেন কথাটা। তাই আমার উদ্দেশ্য, শাস্ত্রমতেই আপনার ভাগ্য-গণনা কর্বো, তা' ভালোই হোক্ আর মন্দই হোক্—উপলব্ধি কর্চেন কথাটা? জ্যোতিষে ফাঁকি-জুকি নেই—

সত্য। আঃ কি যে বকেন আপনি? অতো বোঝ্বার অবসর আমার নেই, আমার শিরে সংক্রান্তি। আরে ম'শায়—আইনে ফাঁকি রয়েচে, আর জ্যোতিষে ফাঁকি নেই? এ বল্লেই আমি শুনবো। একটা গ্রহের যদি কুদৃষ্টি থাকে—অন্য গ্রহের সুদৃষ্টি থাক্তেও তো পারে...তখন কাটান হ'য়ে গেল—। দেখুন দেখুন, কাটান-মন্তর ছাড়ুন··আপনার বৃত্তি বাড়িয়ে দোবো। কিন্তু আমি চাই এমন্ ফল—

সর্ব্ব। ফল তো নানাপ্রকারের··কোনটা বুঝ্বো—সুফল না কুফল বা পুণ্যফল না কর্ম্মফল, মহাফল না প্রতিফল, কুষ্টিফল না দৃষ্টিফল, কোনটার আশা রাখেন?

সত্য। সমস্ত পণ্ডিতই কি কড়ে গণ্ডমূর্খ? ম'শায়, একশো-বার বল্চি, আমার সুফল গণে' বা'র করুন—

সর্ব্ব। তবে ত্রিপাপ-চক্রফলের বচনটা শুনে নিন··

'রবি বৎসর শূন্য ফল—
শিরঃশূল গায়ে জ্বর।
··
শনির বৎসর শূন্যভোগ—
বন্ধু-বিচ্ছেদ করায় রোগ।
শিলার স্তম্ভ খ'সে পড়ে—
যত অর্জ্জে সব হরে'··

সত্য। আপনার মাথা আর মুণ্ডু। আপনি সোজা রাস্তায় আস্বেন কি-না—জানতে চাই নইলে আপনার বৃত্তি একেবারে বন্ধ ক'রে দোবো।

সর্ব্ব। আজ্ঞে—হঠাৎ ব্যস্ত হবেন না· দেখতে দিন ধীরে-সুস্থে—গণনার ভুল মারাত্মক। আচ্ছা—আমি কেবল গণনা কর্চি।··

"সাত পাঁচ তিন কুশল বাত।
নয়ে একে হাতে হাত।
কি করে ছটে চটে।
কার্য্যনাশ দুয়ে আটে।"

সত্য। কার্য্যনাশ—কার্য্যনাশ! কার্য্যনাশ যা'তে না হয়—সেইটেই গ্রহ-বিচার ক'রে আপনাকে স্থির করতেই হবে···নইলে আপনার অবস্থা যা' হবে—বুঝতেই পাচ্ছেন!

সর্ব্ব। এই দেখুন—গ্রহই আপনাকে অযথা কুপিত ক'রে তুলচেন···একটু ধৈর্য্য ধরুন, এবার সমস্ত ঠিক ক'রে দিচ্চি। উত্তম—একটা প্রাতঃকালীন ফুলের নাম বলুন তো—

সত্য। মুচুকুন্দ—

সর্ব্ব। এবার একটা মধ্যাহ্ন-কালীন ফলের নাম—

সত্য। ফল্‌সা—

সর্ব্ব। তারপর, সায়ংকালীন একটি নদীর নাম—

সত্য। এর মানে কি ?

সর্ব্ব। আহা, জীবন-সন্ধ্যায় কোন্ নদী মানুষ পার হয়—

সত্য। বৈতরণী—

সর্ব্ব। এরপর, রাত্রিকালের কোনো দেবতার নাম উচ্চারণ করুন।

সত্য। রাত্রিকালের দেবতা !—আচ্ছা, পঞ্চানন্দ—

সর্ব্ব। এখন ফলাফল বিচার কর্‌চি, দেখে নিন্—ফুল, ফল, নদী আর দেবতার বর্গ, বর্ণ, স্বর গুণ ক'রে যে পিণ্ড হবে—

সত্য। আপনার শ্রাদ্ধে তাই দেওয়া হবে। সোজা কথায় বলুন, কোন গ্রহ এখন প্রবল—

সর্ব্ব। দাড়ান তবে—অঙ্ক কসি, খড়ি পাতি—(রেখা প্রভৃতি অঙ্কন ও গণনার অভিনয়)

··ধরা পড়েছে—হুঁ-হুঁ—লুকিয়ে ব'সেছিল, আপনার কর্কটে মর্কট, অর্থাৎ কিনা—আপনার ভাগ্য-স্থানে বর্ত্তমানে দশম গ্রহ—

সত্য। দশম গ্রহ আবার কি ?

সর্ব্ব। ঐ তো, তবে আর অন্তর্দৃষ্টি কা'কে বলে—দশম-গ্রহের বৃত্তান্ত কল্কাপুরাণে ধনখণ্ডে লেখা আছে :—

সদা বক্রঃ সদা ক্রূরঃ সর্ব্বদা ধনহারকঃ।
কন্যারাশিং সদা ভুংক্তে জামাতা দশমগ্রহঃ॥

জামাতালাভের যে বিশেষ যোগাযোগ দেখ্‌চি ! তবে ধনক্ষয়ের যোগ রয়েচে।

সত্য। তা'তে আমি ডরাই না··ক্ষয় যা' হবে—তা'র চতুর্গুণ আয় কর্‌তেও আমার বেশী সময় লাগ্‌বে না। কিন্তু জামাতা-লাভ ! এ-ক্ষেত্রে সে কেমন ক'রে সম্ভব ?

সর্ব্ব। আজ্ঞে, তা' বল্‌তে পারি না, তবে গণনায় এই ফলই পাচ্চি—একেবারে নির্ভুল।

সত্য। কিন্তু কাল শেষ রাত্রিতে একটা কালো ধেড়ে ইঁদুর স্বপ্ন দেখেছি—তা'র কি ফল, বলুন দেখি ?

সর্ব্ব। আজ্ঞে—ইঁদুর সিদ্ধিদাতা গণেশের বাহন, ও খারাপ কিছু নয়, তবে দশম গ্রহের দৃষ্টি প'ড়ে কালো হ'য়ে গেছে। আচ্ছা—ইঁদুরটা কি ধরা পড়লো—না পালালো ?

সত্য। পালালো—

সর্ব্ব। তবেই তো খারাপ···হুঁ—একটা গণেশ-বাহন কবচ ক'রে দিচ্চি—হাতে প'রে ফেলুন···মন্ত্রপূত ক'রে দিচ্চি—সব খণ্ডন হ'য়ে যাবে...

[একটি বড় মাদুলি বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ ভূর্জ্জপত্র পুরিয়া মুখ আঁটিয়া সত্যস্বরূপের হাতে পরাইয়া দিল]

—ব্যস্—আর ভয় নেই। তা' হ'লে—আমার দক্ষিণাটা ?

সত্য। কত ? আচ্ছা যাক্—এই নিন্ স'পাঁচ আনা—

সর্ব্ব। আনা কেন, ওটা সিকেয় পুরিয়ে দিন্ না···সুফল তো আমলকীর মতো মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেলেন···

সত্য। আচ্ছা—এই নিন্ পুরোপুরি ষোল আনা।

সর্ব্ব। (ট্যাঁকে গুঁজিয়া) শুভমস্তু—শুভমস্তু—চিন্তা নেই !

সত্য। তা' হ'লে আসুন···এখন আমাদের একটা মিটিং বস্‌বে।

সর্ব্ব। ভালো কথা—নিশ্চিন্ত মনে মিটিং করুন···তবে দেখুন—সর্ব্বাধিকারী ম'শায়, ফলপ্রাপ্তির পরে কিন্তু আমার বৃত্তি সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

সত্য। সে হবে এখন—হবে এখন্।

[এক রকম তাহাকে তাড়া দিয়াই পথ দেখাইয়া দিয়া—দক্ষিণ দিকের দ্বার দিয়া প্রস্থান করিল।—

ক্ষণপরে স্থানীয় আদালতের বিচারক স্বামীশরণ সিদ্ধান্ত, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও জন-স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক গজানন জয়তিলক চোরারিয়া, শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক রাখালরাজ চট্টরাজ, স্থানীয় ডাক্তার জুড়নজীবন জানা প্রভৃতি ব্যক্তিগণের একে একে প্রবেশ। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্যস্তভাবে সত্যস্বরূপ পুনঃ প্রবেশ করিল।]

সত্যস্বরূপ। সকলেই এসেছেন ?—হ্যাঁ—ভদ্রমহোদয়গণ, আজকে আপনাদের সকলকে ডেকেছি—তা'র বিশেষ কারণ আছে···জটিল সমস্যা !

স্বামীশরণ। সমস্যা ?

সত্য। হাঁ—সেই কথা আপনাদের জানানোই আমার উদ্দেশ্য··অত্যন্ত অপ্রিয় খবর : সরকার পক্ষ থেকে এক পদস্থ কর্ম্মচারী আমাদের এখানে আসছেন—এই ষ্টেট্ পরিদর্শন কর্‌তে !

স্বামী। পদস্থ কর্ম্মচারী ?

গজানন। সোর্‌কারী—আঁ ?

গণকলা, বর্ব্বরকলা ও নব্যকলা

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ইতিহাসে কলাকুহেলিও আভিজাত্যের কিরীট ধারণ করে যুগে যুগে সকলের মনোহরণের চেষ্টা করেছে। নাগরিক সভ্যতা সব সময় জটিল আলঙ্কারিক শ্রীকে বহন ক'রে অগ্রসর হয়েছে। উপাখ্যানে যেমন রাজা-রাণীর প্রসঙ্গ হয়েছে সব চেয়ে চমকপ্রদ, তেমনি চিত্রাখ্যানেও আলঙ্কারিকদের জটিল রীতিনীতির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সৌন্দর্য্যস্বপ্ন। এর ভিতর সরলতা, সামান্যতা বা সহজ কারুতা খুব কমই প্রশ্রয় পেয়েছে।

অথচ জগতের ইতিহাসে এসব সহজ কারুতার প্রভাব নিঃশব্দে নিজের রাজপথ কেটে কোটী কোটী হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন ক'রেছে। ইদানীং জগতের সৌন্দর্য্যগত বিচার এসব রচনার দিকে চোখ ফিরিয়েছে। শুধু গ্রাম্য কলা মাত্র নয়, বর্ব্বরকলাও সকলের মনঃপূত হয়েছে এবং এদের নিয়ে রূপকলার মূল তত্ত্ব বিশ্লেষণে আধুনিক যুগকে মসগুল ক'রেছে।

বিখ্যাত আলোচক Roger Try মহাশয় Bushmen-দের রচনাকে 'Surprising' বলেছেন। তিনি প্রাচীন আমেরিকার Maya ও পেরুর কলাসঞ্চয়কে বন্দনা করেছেন এবং নিগ্রো কলার অশিক্ষিত পটুত্বকে উচ্চ-স্থান দিয়েছেন। ইউরোপ এক সময় কলাকে একটা অনুকরণের চাতুরী মনে করতো—ইদানীং ইউরোপে সে নীতি বর্জ্জিত হয়েছে। গ্রীক ভাস্কর্য্যের আপাত মধুর লালিত্য ইদানীং মোটেই চিত্তাকর্ষণ করে না। Barlach-এর রচনা বা Epstein-এর অদ্ভুত রসের কণ্ঠে জয়মাল্য দিতে ইউরোপ কুণ্ঠিত নয়।

এ হ'ল একটা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। এদেশে অজন্তা বা বাঘগুহার রচনাই একমাত্র সৃষ্টি নয়। ভারতের সর্ব্বত্র পটের ও পটুয়ার আদর এখনও জাগ্রত। পুরী, কালীঘাট, গয়া, কাশী প্রভৃতি সর্ব্বত্র মূর্ত্তি তৈরী হচ্ছে ও চিত্র রচিত হচ্ছে পটের ভঙ্গীতে। এ সমস্তের সহজ ভঙ্গী বিস্ময়কর। এ-সব শিল্পীর রেখাঙ্কন অতি অপূর্ব্ব। কালীঘাটের পটে একটি রেখার অভ্রান্ত ও অস্খলিত হিল্লোলের দ্বারা সহসা দেব-দানব, মনুষ, পশু রচিত হ'য়ে যায়। রেখার উপর এরূপ অধিকার খুব কম দেশের শিল্পীরাই দাবী করতে পারে। এসব শিল্পী যাহা বিনা আয়েসে ক'রেছে, অন্যত্র তা' বহু সাধনায় হ'তে পারে নি।

উড়িষ্যার চিত্রকলা

পটশিল্পের ধারা বহু প্রাচীন—এ ধারার উদ্দেশ্য সমগ্র জাতির সহজ হৃদয়বৃত্তিকে সরল মানবিকতার ভিতর দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা। গ্রাম্য জীবনের সহজ প্রেরণা শ্যামল বনানী, মুক্ত প্রান্তর ও প্রবহমান তটিনীর মুগ্ধ রেখা-জালেই আবদ্ধ হয়—ঐ সবের ভিতরকার জটিল রেখাজাল, বিচিত্র বর্ণের গমক বা গভীরতার সীমাহীন স্তর যাচাই করতে কেউ উৎসুক হয় না। মার চোখে যেমন বিকলাঙ্গ ছেলেও সুন্দর, তেমনি গ্রাম্য জীবনের চোখে অসংলগ্ন মাটির পুতুল, সোলার তৈরী পাখী, চিনির খেলনা, প্রভৃতির যে সৌন্দর্য্য পুলক আছে তা অতিসভ্য সৃষ্টির জমকাল আসবাবে পাওয়া যাবে না। বস্তুতঃ যে শিল্প যতই তরল আলঙ্কারিক পারিপাট্যে ভূষিত হয়—তা ততই দুর্ব্বল ও অপ্রখর হয়ে পড়ে। এজন্য কঠিন রাগরাগিনীতে আবদ্ধ নাগরিকার নৃত্য-বিলাস অপেক্ষা পল্লীর সাঁওতাল নৃত্যের উদ্দাম প্রখরতা বেশী। তাতে সভ্যতার গলিত তিক্ততা, অবসন্ন ক্লান্তি এবং সান্ধ্য রক্তহীনতা নেই। এজন্য ইদানীং ইউরোপ নিগ্রো সঙ্গীত হ'তে নূতন সুর গ্রহণ করছে, বর্ব্বর নৃত্য হ'তে সুগন্ধ উপকরণ সংগ্রহ করছে এবং এমন সব রচনায় মেতে গেছে যাকে ইতর লোক একান্ত ছেলেমানুষি মনে করতে পারে।

বস্তুতঃ জীবনের অফুরন্ত উদ্দামতা

এবং উল্লোলশ্রী আহরণ করতে হ'লে এই আরণ্যক কলার স্মরণাপন্ন হ'তে হবে। এজন্যই বর্ত্তমান সভ্যতা হয়ে পড়েছে, "anti-intellectual"; বুদ্ধিবাদকে অর্জ্জন করে রক্তজ সংস্কারকে আজ আহ্বান করা হচ্ছে জগতের চিত্তবিনোদনে। এই সংস্কারের দান এখনও শেষ হয় নি। ইউরোপের আধুনিক অবস্তুতন্ত্র কলা এখনও বহিরঙ্গ compositionকে বড় ব্যাপার মনে করে না। সব কিছুই ভিতর থেকে দেখতে—অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে জগত ব্যাকুল। এজন্য ইউরোপের expressionist কলা সব রূপের বহিরঙ্গ দিক ভেঙ্গেচুরে এক নুতন ছিন্নমস্তা কলা রচনা করেছে। মাতিসে (Matisse) যা যা সুরু হয়েছিল—ডালি (Dali) Mare, Barlach ও Kleeতে পর্য্যবসিত হ'য়েছে। জড় বস্তুর বন্ধন ভেদ করে, তাকে সতীদেহের মত টুক্‌রো টুক্‌রো ভিতরকার সত্য খুঁজতে ইউরোপ উৎসাহিত—তাই ন্যাকেল ও কনেষ্ট্‌বল গেছে জঙ্গালের বাক্সে। মাটি খুঁড়ে রত্নের সন্ধান হচ্ছে। এজন্য কোন শিল্পী বলেন: "We are breaking up the chaste ever deceptive phenomena of nature...We look through the matter and we shall be able to cleave asunder her oscillating mass as if it were air."

এই ভিতরকার সত্য গ্রামজীবন বহুকাল পূর্ব্বে দেখেছে, এজন্য Folk art হয়েছে চিরন্তন, তা আর out of date হয়না—চিরকালই চিত্তরঞ্জন করে এসেছে। এসব আর্টের বৈজ্ঞানিক পরিমাপ করতে যাওয়া বৃথা। মাতৃত্বের কল্পনায় শুধু এই ভাবটিই ফুটিয়ে তুলতে হবে, আর সব কিছু হবে তুচ্ছ; এর ভিতর হুবহু অনুরাচণের কিছু নেই। ইউরোপ নিগ্রো আর্টের plasticity দেখে মুগ্ধ হয়েছে, গ্রাক আর্টে তা পাওয়া যাবেনা। অতি

কালীঘাটের পট

সংক্ষেপে মুখ্য বস্তু বা রস উদ্‌ঘাটন করা অনেক সময় বিরূপ রূপ উদ্‌ঘাটনের দ্বারাই সম্ভব হয়। আসল কথা হচ্ছে—শিল্পকলা প্রস্ফুট করবার ব্যাপার

নেপালের গ্রাম্যকলা

হচ্ছে ভাব বা "idea", কোন বস্তু নয়। কাজেই উড়িষ্যার অর্দ্ধস্ফুট চিত্রে বা পটের অশিক্ষিত রেখাজালে বেগবান হৃদয়ের উদ্বেলিত রসপ্রসঙ্গ সহজেই প্রকট হয়—তার উপর আর কোন আবরণ থাকেনা। শিশুর অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্যনিচয়ের মাধুর্য্য যেমন অতুলনীয় তেমন রসসমাবেশের এই অভিনব অসংলগ্নতা ভাবকে আরও ঘনীভূত করে, কারণ তা'তে পাণ্ডিত্যের কোন আবর্জ্জনাই থাকে না। ধ্রুপদের গিট্‌কিরি টান ওস্তাদদের মুগ্ধ করে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রাম্য ঢাক-ঢোলের তূর্য্যনাদ তার চেয়েও সময় বিশেষে উপাদেয় হয়। পারস্য গালিচায় বা কাশ্মিরী শালে আমরা অভিভূত হই—কিন্তু দেশী কাঁথা-শিল্পের কারুতার ভিতর পাখী, জন্তু, প্রভৃতির নক্‌সা অনেক সময় অধিক ক্লান্ত মনে হয়। বিষ্ণুপুর-মন্দিরে খোদিত relief এর গ্রাম্য শ্রী এমনি অপূর্ব্ব যে তার কাছে বরভূধরের অতিরিক্ত কারোয়াতী হার মানে। মোট কথা বহিরঙ্গ দিক হতে অগ্রসর হয়ে যে শিল্পসূচনা হয়—তা ঠিক বিপরীত পথে—অন্তরঙ্গ দিক হতে যা হবে তার পরিমাপ উল্টো হ'তে বাধ্য। তখন বৈষ্ণব কবির ভাষায় এক দণ্ডও 'লাখ লাখ যুগের'' মহিমায় অভিষিক্ত হয়।

উড়িষ্যার পটে আমরা যে ধারা দেখতে পাই, তা' চলে এসেছে বহু শতাব্দী। তাতে রেখাজালের সৌকুমার্য্য অসামান্য—কিন্তু শিল্পী বহিরঙ্গ বৈজ্ঞানিক পরিমাপকে ইচ্ছা করেই যেন ব্যঙ্গ করেছে। অথচ যথার্থ সৌন্দর্য্যস্রষ্টার সমগ্র নৈপুণ্য এসব শিল্পীর আছে। এর ভিতরকার schematised ঘোড়া ও সিংহ রূপরসে ভরপুর। যেন এক অলৌকিক সৃষ্টি-প্রেরণার দক্ষিণ পবনে একটা রূপারণ্য মুখর হয়েছে।

নেপালের একটি পটে নারীগরুড়ের উপর শ্রীকৃষ্ণকে আরোহণ করে উড়ে যেতে দেখা যায়। এরূপ একটি জটিল, কঠিন ও গভীর সৃষ্টিপ্রসঙ্গ হঠাৎ যেন অতি সরল, মধুর ও জীবন্ত হয়েছে শিল্পীর মায়া-তুলিকা স্পর্শে। এতে অজন্তার কঠিন রেখাবর্ত্ত নেই, বর্ণের হিল্লোলিত গমক নেই—অথচ যা আছে তা অপূর্ব্ব ও অভাবনীয়। শিল্পী একমুহূর্ত্তে সমগ্র চিত্রপটকে জীবন-রসে আপ্লুত করে জয়মুকুট শীর্ষে পরেছে।

এযুগে শুধু পটশিল্প বা বর্ব্বরশিল্প মাত্র নয়, সভ্যতানন্দিত শিল্প এজন্য ইচ্ছা করেই অদ্ভুত ও অপ্রাকৃত হ'তে অগ্রসর হয়েছে। এদের কোথাও বা sur-real বা অতিপ্রাকৃত বলা হচ্ছে। যা কিছু অসম্ভব, অসংলগ্ন ও অপ্রত্যাশিত তার ভিতরেই শিল্পের স্বর্ণসূত্র চালিয়ে মণিহারে পরিণত করার

চেষ্টা চল্‌ছে। এপথে নব্য শিল্পী কতটা অগ্রসর হ'তে পারে তা' ভাববার বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু ভেবে চিন্তে কৌশল করে' যে রম্যকলা রচিত হবে তা'তে গ্রাম্যকলার ঐশ্বর্য্য ও অফুরন্ত রসকদম্ব থাকা সম্ভব নয়। এজন্য আজ পটশিল্পের প্রশস্তির ভিতর জীবনের যে উপাদান লক্ষ্য করা যায়, আধুনিক চিত্রকলার উদ্দাম বিপ্লবে সব সময় তা পাওয়া দুষ্কর হয়।

ইউরোপীয় শিল্পে রুশিয়ার গণকলাকে এজন্যই এক কঠিন সমস্যায় পড়তে হয়েছে। একদিকে গ্রাম্যকলার অফুরন্ত ও সনাতন আহ্বান যেমন রুশীয় চিত্তকে স্থূলসৌন্দর্য্যের দিকে আহ্বান করেছে অন্যদিকে রুশিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত ও নন্দিত যান্ত্রিক সভ্যতাও তাকে নিয়ে গেছে কুটিল রস-মরীচিকার পিচ্ছিল প্রান্তরে। কল্পনের লোভে এমনি করে Slav-চিত্ত দুস্তর পঙ্কে পড়েছে। অথচ জগতের বিস্তীর্ণ কলাবাসরে গণশিল্পের কাকলি ও কৌতুক অফুরন্ত কলহাস্যের ভিতর যুগে যুগে নন্দিত হচ্ছে। কাজেই এ-যুগের শিল্পবিত্তকে আসতে হয়েছে নূতন সাধনার পথে। কিন্তু অহরহ এই শিল্পাদর্শ-পরিবর্ত্তন যে ইউরোপের প্রিয়—তা কি কখনও মরুশিল্প, পেরুভীয় শিল্প বা নিগ্রো শিল্প প্রশস্তিতে চরম শান্তি পাবে! এ-দেশের রসতাত্ত্বিকদের ভিতর নারায়ণই বলেছেন যে অদ্ভুত রসই একমাত্র রস। যা কিছু নূতন, অপ্রত্যাশিত ও strange, তাকে নিয়ে ইউরোপ হয়ে যায় আত্মহারা। ইদানীং বিরূপ রূপচর্চ্চা প্রসঙ্গে ইউরোপ নিজের গ্রীক্-রোমক heritage পর্য্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। তাতে করে অন্ততঃ গ্রাম্যকলা ও গণকলা ক্ষণকালের জন্য সমগ্র বিশ্বে বন্দিত হচ্ছে।

বাবলাকের এঞ্জেল (নিগ্রোকলার অনুসরণ)

কিন্তু গ্রাম্যজীবন যা চেয়েছে তা' বাহুল্যের বহুমুখী বিলাসিতা নয়। সামান্য পরিসরে অসামান্য আনন্দের যে উপকরণ সামান্য খেল্‌না, ঝুমঝুমি, কাঠের আসবাব, বেতের তৈরী পাখার রচনা অর্পণ করেছে তার ভিতরকার ছন্দ-সুষমা বাহিরের কোন করতালির উপর কখনও নির্ভর করে নি। কাঁধে লাঙ্গল ফেলে গান গেয়ে কৃষক চলে, মেঠো রাস্তায় বঙ্কিম ছায়াপথে যুগযুগান্তের বাস্তবতা যে স্বপ্নাবেশ রচনা করে, বটগাছের ছায়া, দীঘির স্নিগ্ধতা রিক্ত জীবনের শূন্যতার উপর যে যবনিকা ফেলে—তাদের আহ্বান সভ্যতার সুতীক্ষ্ণ আয়োজনে উপভোগ্য নয়। নাগরিক সভ্যতা কখনও আত্মদান করে অজ্ঞ জীবনযাত্রাকে বরণ করবে না—কাজেই আজ যা অভিনন্দন গ্রাম্য কলার জুটছে, কাল তা' অস্তমিত হবে। কিন্তু তবুও মনে রাখতে হবে কোটি কোটি মানব জলে স্থলে যে সৌন্দর্য্যশ্রীকে বরণ করে' জীবনের অফুরন্ত রসপিপাসা মেটাচ্ছে—তা সামান্য নয়। তা'তে ভূমার সম্পর্ক আছে—তা মানবিকতার উকস্পর্শে উজ্জ্বল ও মহান্। নিগ্রো আর্টের করতালির সহিত এই বিরাটত্বের জয়কারকে এক পাংক্তেয় করলে সুশোভন হবে না।

মহানাদের প্রতি

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্

মহাশঙ্খের নিনাদ শুনি, দেবতা
আসিলেন স্বর্গ হ'তে,
বশিষ্ঠ হেথায় গঙ্গা আনিলেন
দ্বাদশ যজ্ঞের কুণ্ড কেটে।
রাজরাজেশ্বর আসিয়া হেথায়
স্থাপিলেন তাঁদের রাজধানী,
কত বীর যোদ্ধা চলে যেত
বীর গর্জ্জনে মেদিনী।
চন্দ্রকেতু করিলেন দান
মণিমুক্তা বিত্ত যত,
পাণ্ডুরাজ ত্যাজিলেন প্রাণ
যবন কর্তৃক হ'য়ে পরাভূত।
আজিও বিদ্যমান মঠমন্দির
যোগীর জীবন্ত সমাধি,
গুপ্তরাজের ভগ্ন প্রাসাদ
অতীতের বহি স্বপ্ন স্মৃতি।
পাল রাজত্বের মূর্ত্তিগুলি
প্রকাশিছে শিল্পকলা,
ঐতিহাসিকরূপে আসিলাম হেথা,
স্থাপন করিতে প্রত্নশালা।

ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

চার

এর জন্য প্রথমেই আলোর স্বরূপ সম্বন্ধে দু'টা প্রশ্নের উত্তর দানের প্রয়োজন :—(১) উজ্জ্বল পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরে কী সকল ব্যাপার ঘটছে যার ফলে পদার্থটা রশ্মি বিকিরণ করে? (২) কি প্রণালীতে ঐ সকল ব্যাপার আলোক-রশ্মিরূপে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে? প্রথম প্রশ্নটা হলো আলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে, এবং দ্বিতীয়টা ওর বিস্তারলাভের প্রণালী সম্বন্ধে। এই দুই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আলো সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সেই কথাই প্রথমে আমরা বলবো।

আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য প্রথম মতবাদ প্রচার করেন নিউটন। একে বলা যায় আলোর কণাবাদ (Corpuscular Theory of Light) এই মতবাদের মূল বক্তব্য এই যে, আলো একপ্রকার কণাজাতীয় পদার্থ। কণাগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ভারহীন। এক এক রঙের আলোর পক্ষে এক এক রকমের কণা। অসংখ্য রঙের আলো, সুতরাং আলো-কণাগুলির রকম-ভেদও অসংখ্য। প্রত্যেক উজ্জ্বল পদার্থ থেকে এই খুদে কণাগুলি ছিটে গুলীর মত, কিন্তু ওদের তুলনায় বহুগুণ বেগে চতুর্দ্দিকে ছুটে বেরিয়ে আসছে এবং আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ে আঘাত ক'রে ঐ পদার্থটা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিজ্ঞান জন্মাচ্ছে। আলো-কণাগুলি ভারহীন, সুতরাং ওদের বর্ষণে উজ্জ্বল পদার্থটার ওজনের হ্রাস হয় না। শূন্যের ভিতর সকল রঙের সকল আলো-কণাই ছোটে সোজা পথে ও একই বেগে, তাই আলোক-রশ্মির পথ সরল। আলো-কণাগুলি যখন দর্পণের ওপর আঘাত করে তখন স্থিতিস্থাপক গোলকের মত ওরা দর্পণের পিঠে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। এই ব্যাপারকে বলা যায় আলোর প্রতিফলন (Reflection)। জল, কাঁচ বা অপর কোন স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর আলোক-রশ্মি ঢুকলে এই কণাগুলির বেগ বদলে যায়, ফলে ওদের গতির দিক্ ঘুরে গিয়ে আলোক-রশ্মিটা নূতন পথে চলতে থাকে। এই ব্যাপারকে বলে আলোকের প্রতিসরণ (Refraction); রশ্মিগুলি যদি নানা রঙের (বা নানাজাতীয়) কণার মিশ্র আলো হয়, তবে জলে বা কাচে ঢুকতে গিয়ে ওদের বেগ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বদলে যায়, সুতরাং ওদের প্রতিসরণও ঘটে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে। ফলে বিভিন্ন রঙের রশ্মিগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারকেই আমরা পূর্ব্বে বলেছি আলোর বিচ্ছুরণ। এইরূপে কণাবাদের সাহায্যে আলোর সরল পথে গমন, প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বিচ্ছুরণ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি সহজ ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হলো।

কিন্তু আলোর চালচলন সম্পর্কে আরো কতকগুলি ব্যাপার ক্রমে নজরে পড়তে লাগলো যার ব্যাখ্যাদান কণাবাদের সাহায্যে সম্ভব বা সহজ হলো না। জলের পিঠে বা অপর কোন স্বচ্ছ পদার্থের ওপর আলো পড়লে খানিকটা আলো ওর পিঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং খানিকটা ওর ভেতরে ঢুকে যায়। এই প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ব্যাপার একসঙ্গেই ঘটে। এ হয় কি করে? একটা আলোকণা হয় পিঠ থেকে ফিরে আসবে নয় ভেতরে ঢুকে যাবে। দু'পথে পা দেয় কি করে? কণাবাদ থেকে এর সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অন্যপক্ষে আলোর রশ্মিকে কণার সমষ্টি মনে না ক'রে তরঙ্গজাতীয় পদার্থরূপে কল্পনা করলে এরূপ বিভ্রাটে পড়তে হয় না। দ্বিতীয় আপত্তি উপস্থিত হলো আলোর নিবর্ত্তন (Interference) ব্যাপার নিয়ে। দেখা যায়, দু'দিক থেকে আলো আসতে থাকলে আলোতে আলোতে মিলে স্থানবিশেষে বেশ জোরালো আলো এবং স্থানবিশেষে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়; কণাবাদ মেনে নিলে এর ব্যাখ্যা দিতে হয় এই বলে যে, আলো-কণায় আলো-কণায় মিলে কণাহীন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এরূপ কল্পনা অত্যন্ত কষ্টকল্পনা। অন্যপক্ষে, আলোর তরঙ্গ-প্রকৃতি স্বীকার করলে এই ব্যাপারের একটা সমীচীন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আমরা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকি যে, জলে কলসী দোলাতে থাকলে যে সকল তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তার হতে প্রতিফলিত হয়ে যে সকল তরঙ্গ ফিরে আসে, এই উভয় দলের মিলনের ফলে স্থানবিশেষে প্রবল তরঙ্গের এবং কোন কোন স্থলে নিস্তরঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি হয়। খুব উঁচু ঢেউ দেখা যায়, যেখানে উভয় শ্রেণীর তরঙ্গের মাথায় মাথায় মিলন ঘটে। আর যেখানে পেটে মাথায় মিলন ঘটে সেখানে জলের পিঠটা থাকে সমতল—তরঙ্গের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। সুতরাং উক্ত নিবর্ত্তন ব্যাপার থেকে এইরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক যে, আলোক-রশ্মিগুলি কণা ধর্ম্মী নয়, তরঙ্গধর্ম্মী।

আর একটা ব্যাপার আলোর তরঙ্গ প্রকৃতিকে আরো বিশেষভাবে সমর্থন করলো। একে বলা যায় আলোর ব্যাবর্ত্তন (Diffraction of Light). সহজ দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই, আলো সোজা পথে চলে এবং এর প্রমাণ স্বরূপ এই নিত্য-প্রত্যক্ষ ব্যাপারের উল্লেখ করি যে, আলোর রশ্মি পথে যদি একটা অস্বচ্ছ পদার্থ রাখা যায়, তবে তার পেছনে একটা স্পষ্ট ছায়া পড়ে। কণাবাদে ছায়ার ব্যাখ্যা দান অতি সহজ। আলো-কণাগুলি চলে সোজা পথে। ফলে যে কণাগুলি অস্বচ্ছ পদার্থটার ঠিক সামনা-সামনি এসে পড়ে, তা'রা বাধা পেয়ে ওপারে পৌঁছবার সুযোগ পায় না। সুতরাং এ বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, অস্বচ্ছ পদার্থের পেছনটায় অন্ধকার থাকবে এবং ওর একটা স্পষ্ট ছায়া পড়বে। কিন্তু আলোক-রশ্মি যদি তরঙ্গ-ধর্ম্মী হয়, তবে ঠিক পেছনটায় ছায়া নাও পড়তে পারে। কারণ তরঙ্গগুলি অস্বচ্ছ পদার্থটার চারপাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে ওর পেছনে মিলিত হতে পারে—যেমন তরঙ্গসঙ্কুল নদীর মধ্যে কেউ দাঁড়ালে ঢেউগুলি তার পাশ কাটিয়ে পেছনে গিয়ে মিলিত হয়। এরূপ ঘটে যদি—যেমন এক্ষেত্রে—ঢেউগুলির দৈর্ঘ্যের তুলনায় অস্বচ্ছ পদার্থটার প্রসার খুব বড় না হয়। অন্যপক্ষে উক্ত মনুষ্য-দেহ যদি পাহাড় পর্ব্বতের মত প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে, তবে তার ঠিক পেছনে ঢেউগুলি মিলিত হবার সুযোগ পাবেনা। নদীর ভিতর পাহাড় থাকলে দেখা যায় যে, পাহাড়ের পেছনে জলতরঙ্গগুলির একটা ছায়া পড়ে। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, আলো যদি তরঙ্গধর্ম্মী হয় এবং আলোক-রশ্মির পথে যদি কোন সূক্ষ্ম পদার্থ অবস্থান করে, তবে ওর ঠিক পেছনে স্পষ্ট ছায়া পড়বেনা। ছায়া পড়বে যদি অস্বচ্ছ পদার্থটা আলোর ঢেউগুলির তুলনায় প্রকাণ্ড হয়। এখন আলো সম্বন্ধে পরীক্ষার ফল এই যে, আলোক-রশ্মির পথে যদি ফুটবলের মত একটা বড় গোলাকার পদার্থ রাখা যায়, তবেই পেছনের দেয়ালে একটা স্পষ্ট গোলাকার ছায়া পাওয়া যায়, কিন্তু যদি বালুকণার মত কোন সূক্ষ্ম পদার্থ রাখা যায় তবে দেয়ালের ওপর একটা গোল ছায়ার বদলে মণ্ডলাকারে সজ্জিত আলো ও ছায়ার পরপর সজ্জা দেখতে পাওয়া যায়, যা' কতকটা বিড়ালের চক্ষুর মত। এই ব্যাপারকে বলা যায় আলোর ব্যাবর্ত্তন (Diffraction) এবং আলো ছায়ার এইরূপ সাজের ঘটাকে বলা যায় ব্যাবর্ত্তন প্যাটার্ণ (Diffraction Pattern). আবার আলোক-রশ্মি যদি খুব সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে, তা' হলেও ঠিক অনুরূপ প্যাটার্ণেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আলোককে তরঙ্গ-ধর্ম্মী ব'লে স্বীকার করলে এবং তরঙ্গগুলিকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিরূপে কল্পনা করলে এই সকল ব্যাপার অনায়াসেই বুঝতে পারা যায়; কারণ ব্যাবর্ত্তন-প্যাটার্ণের উজ্জ্বল মণ্ডলগুলি দেখিয়ে দিয়ে তখন আমরা বলতে পারি যে, এই সকল স্থলে, বিভিন্ন পথের ঢেউগুলির মাথায় মাথায় মিলন ঘটেছে, এবং অন্ধকার মণ্ডলগুলির ভেতর ওরা মিলেছে মাথায়

ও পেটে। অন্যপক্ষে কণাবাদ থেকে এর কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সুতরাং ব্যবর্ত্তন-প্যাটার্ণ হলো তরঙ্গ-বাদের একটা বড় রকমের সমর্থক।

এই সকল ব্যাপার থেকে বৈজ্ঞানিকগণ আলোককে তরঙ্গ-ধর্ম্মী পদার্থ রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। আরো বাধ্য হলেন এই দেখে যে, প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি, যা'রা কণাবাদের সাহায্যে সহজে ব্যাখ্যাত হয়ে আসছিল তাদেরও তরঙ্গবাদের সাহায্যে, অত সহজে না হোক, সঙ্গত ব্যাখ্যা-দান সম্ভব। ফলে হাইগেন্ প্রবর্ত্তিত আলোর তরঙ্গবাদ বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। সঙ্গে সঙ্গে 'ইথর' নামক এক ক্রমভঙ্গহীন বিশ্বব্যাপী পদার্থের অস্তিত্বের কল্পনা বৈজ্ঞানিকগণের মনোরাজ্য অধিকার করে বসলো। কারণ, আমাদের কল্পনা করতে হবে, প্রত্যেক উজ্জ্বল পদার্থ হতে, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, নীহারিকা হতে আলোর ঢেউগুলি ছুটে এসে আমাদের চোখে আঘাত কচ্ছে বলেই আমরা ঐ সকল পদার্থ দেখতে পাই, এবং আলো যখন ঢেউ তুলেই আসছে, তখন তরঙ্গায়িত হতে পারে এইরূপ একটা পদার্থও অবশ্যই রয়েছে এবং তা' অন্ততঃ নক্ষত্র জগৎ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। এই পদার্থ নিশ্চয়ই জল নয়, বায়ু নয় কিম্বা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি এরূপ কোন কিছুই নয়; তবু তা' অস্তি। এইরূপে সমগ্র জগৎ জুড়ে অদৃশ্য মূর্ত্তিতে দেখা দিল অদ্বিতীয় এক ইথর, যার সম্বন্ধে জনসাধারণের মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজনই কোনদিন অনুভূত হয়নি, কিন্তু যা' তখনকার বৈজ্ঞানিকগণের বিচারবুদ্ধির কাছে উপস্থিত হলো এবং চেয়ার টেবিলের মতঃ বাস্তব সত্তার দাবি নিয়ে।

ইথর এলো, তরঙ্গবাদ প্রতিষ্ঠিত হলো, কিন্তু তা'র ফলে আলোর প্রকৃতির সবটা পরিচয় পাওয়া গেলনা। তরঙ্গবাদ এই কথাই শুধু জানাতে পারলো যে, ইথরের ভিতর ঢেউ তুলে আলোক-রশ্মিগুলি ভীমবেগে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এর থেকে আলোর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতে পারা গেল না। তবু এইটুকু বোঝা গেল যে, ইথরসাগরে অবস্থিত হয়ে প্রত্যেক উজ্জ্বল পদার্থের অণু-পরমাণুগুলি অথবা ওদের ভিতরকার আরো সূক্ষ্মতর কণাগুলি, জলের ভিতর কলসীর দোলার মত এমন সকল আন্দোলন-গতি—কম্পন বা ঘূর্ণন-গতি—সম্পন্ন করছে যা'র ফলে ইথর-সমুদ্রে আলোর ঢেউ উঠতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন হলো, সূর্য্যের পরমাণু যে সকল আলোক-তরঙ্গ বিকিরণ করে, তা' তার কোন্ কোন্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নর্ত্তনের ফল? গোটা সূর্য্যদেহ যে কলসীর দোলার মত দুলছে না, তা প্রত্যক্ষের বিষয়; আবার গোটা পরমাণুর দোলন কল্পনা করলেও বর্ণালীর বর্ণবৈচিত্র্যের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। অনুমান করতে হয় পরমাণুর ভেতরকার কণাগুলিরই কোন না কোন ধরণের নর্ত্তনের ফলে ইথরসাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলোর ঢেউ উঠে থাকে।

যেই দুলুক, তার দোলন-সংখ্যার সঙ্গে তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের একটা সহজ সম্বন্ধ অনায়াসেই আমরা কল্পনা করতে পারি। জলের ভিতর কলসীর দোলাই ধরা যাক্। কলসীর প্রতি দোলনে জলের ভিতর একটা ক'রে ঢেউ ওঠে। তার অর্দ্ধেকটা মাথা, অর্দ্ধেকটা পেট। এইরূপ পেট-মাথা-ওয়ালা প্রত্যেক তরঙ্গের এ-প্রান্ত হ'তে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত যে দূরত্ব, তাকে বলা হয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য (Wave-length); কলসী প্রতি সেকেণ্ডে যতবার ক'রে দোলে তাকে বলা যায় ওর স্পন্দনসংখ্যা (Frequency), ধরা যাক্ কলসী সেকেণ্ডে ৪ বার ক'রে দুলছে। ফলে, জলের ভেতর প্রতি সেকেণ্ডে ৪টা ক'রে ঢেউ উঠছে এবং পর পর সারি দিয়ে সবাই সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এক সেকেণ্ড পরে জলের ওপর কোন্ দিকে তাকালে কি দেখা যাবে? দেখা যাবে, পেট ও মাথাওয়ালা ৪টা ঢেউ পর পর সেজে রয়েছে! এই ঢেউ চারটার উভয় প্রান্তের মধ্যে যে দূরত্ব, প্রথম ঢেউটা ঐ সেকেণ্ডকাল মধ্যে ঠিক ততটাই ছুটে গিয়েছে এবং প্রত্যেক ঢেউই প্রতি সেকেণ্ডে ঠিক অতটা দূরেই ছুটতে পারে। সুতরাং এই দূরত্বের ব্যবধানটা ঢেউগুলির বেগের পরিমাণ নির্দ্দেশ করে; অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে তরঙ্গের বেগটা হচ্ছে তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের ৪ গুণ। সাধারণভাবে বলতে পারা যায়—তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও স্পন্দন-সংখ্যার পূরণ ফলটা সকল ক্ষেত্রেই তরঙ্গগুলির বেগের সমান হয়ে থাকে। তরঙ্গের বেগটা বস্তুতঃ নির্ভর করে, যে পদার্থের ভেতর তরঙ্গ ওঠে তার ধর্ম্মের ওপর, অর্থাৎ জল-তরঙ্গের বেলায় জলের এবং আলোক-তরঙ্গের বেলায় ইথরের ধর্ম্মের ওপর। জল বা ইথরের মত তরঙ্গ-বহন-ক্ষম পদার্থকে বলা যায় মাধ্যম (Medium); একই মাধ্যমের পক্ষে তরঙ্গের বেগ একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রার হবে, সুতরাং এরূপ স্থলে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ভর করবে শুধু স্পন্দন-সংখ্যার ওপর। স্পন্দন-সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও সেই অনুপাতে কমতে থাকবে। জলের ভিতর কলসী দোলানোর পরীক্ষা থেকেই দেখতে পাওয়া যায় যে, মৃদু আন্দোলনে বড় বড় এবং দ্রুত আন্দোলনে ছোট ছোট ঢেউ উঠে থাকে।

সুতরাং তরঙ্গবাদ আমাদের এই কথাটাই বিশেষ করে জানিয়ে দেয় যে, উজ্জ্বল পদার্থ যে জিনিষটা বিকিরণ করে, তা' আদৌ জড়পদার্থ বা কণাজাতীয় পদার্থ নয়—তা' হচ্ছে একটা ওঠা-নামার ভাব বা স্পন্দন এবং তা নির্দ্দেশ করে জড়শক্তিরই মূর্ত্তিবিশেষ। সূর্য্যের পরমাণুগুলির স্পন্দনশক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে চতুষ্পার্শস্থ ইথরের রাজ্যে তরঙ্গরূপী স্পন্দনের আকারে। সূর্য্যরশ্মিতে অসংখ্য রঙের আলো এবং প্রত্যেক রঙের পক্ষে আলাদা আলাদা স্পন্দন-সংখ্যা; সুতরাং ওদের তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও ভিন্ন ভিন্ন। নীল-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যা লাল-তরঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ, সুতরাং লাল-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নীল-তরঙ্গের প্রায় আধা-আধি। বস্তুতঃ বিভিন্ন আলোক-রশ্মির পরিচয় দানের জন্য বৈজ্ঞানিক ওদের রঙের উল্লেখের কিছুমাত্র প্রয়োজন বোধ করেন না। আলোর স্পন্দন-সংখ্যা বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উল্লেখ ক'রেই তাঁদের সব কাজ চালিয়ে নেন। জলে বা কাচে ঢুকতেই তরঙ্গগুলির বেগ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, তাই আলোর প্রতিসরণ এবং বিচ্ছুরণ ঘটে।

এই হলো আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে তরঙ্গবাদের স্থূল কথা। এখন আমাদের কল্পনা করতে হবে, বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রযোগে পদার্থবিশেষের বর্ণালীতে আমরা যে সকল উজ্জ্বল রেখা দেখতে পাই, তার প্রত্যেকটার সঙ্গে এক একটা বিশিষ্ট স্পন্দন-সংখ্যা ও বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ গ্রথিত রয়েছে। বর্ণালীর পর পর রেখাগুলিকে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে এবং প্রত্যেক ক্রমিক নম্বরের সঙ্গে একটা স্পন্দন-সংখ্যা (বা একটা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য) জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, রেখা বিশেষের ক্রমিক নম্বর দ্বারাই ওর জন্মদাতা আলোক-রশ্মির স্পন্দন-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হতে পারবে। কিন্তু বামার দেখতে পেলেন যে, ঐ স্পন্দন-সংখ্যা নির্ভর করে কেবল একটি মাত্র ক্রমিক নম্বরের ওপর নয়, পরন্তু একজোড়া নম্বরের ওপর; অথবা আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে—দু'টো বিশিষ্ট নম্বরের বর্গকে উল্টে নিলে যা' হয়, তার বিয়োগ ফলের ওপর। ফলে একটা অপ্রত্যাশিত নিয়ম মানতে হলো এবং আমাদের গোড়ার প্রশ্নটা এখন বিশিষ্ট আকার ধারণ করলো—এই নিয়ম থেকে, পরমাণুর ভিতর যাদের এবং যে ধরণের স্পন্দন হচ্ছে তার কোন খবর পাওয়া যায় কি? রাসায়ণিক বিশ্লেষণের নিয়ম (সরলানুপাতের ও গুণানুপাতের নিয়ম) থেকে আমরা পরমাণুর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। বর্ণবীক্ষণিক বিশ্লেষণের নিয়ম থেকে পরমাণুর ভেতরকার খুদে কণাগুলির খুঁটিনাটি ব্যাপারসমূহও জানতে পারা যাবে, বিচিত্র কি? আমরা দেখবো বস্তুতঃ এই পথ অবলম্বনেই ঐ সকল খবর সংগ্রহ সম্ভবপর হয়েছে। [ক্রমশঃ

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

ইউরোপীয় যুদ্ধের গতি

মিত্রপক্ষ খাস জার্ম্মাণীর দুয়ারে আঘাত হানিয়া ইতিমধ্যেই কয়েকটি গ্রাম ও নগর অধিকার করিয়া লইয়াছেন—এ সংবাদ আমরা গত মাসেই পাইয়াছি। সকলেই বিষয়টার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ভাবিয়াছিল যে, বিপর্য্যস্ত জার্ম্মাণীর পরাজিত হইবার আর বিলম্ব নাই। এবং জার্ম্মাণীর পরাজয়ের অর্থ যে আশু যুদ্ধাবসান—এ সম্বন্ধে শুধু মিঃ চার্চ্চিল নহেন, সুদূর প্রাচ্য-জন-নায়কবৃন্দও একমত ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় যুদ্ধ ও আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে জার্ম্মাণীর ভাগ্যসূর্য্য যে অচিরেই অস্ত যাইবে, এমন মনে হয় না। তিনি বলিয়াছেন: জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলিতেছে, উহা শেষ করিবার শেষ তারিখ আমরা ঘোষণা করিতে পারিতেছি না। সুতরাং তাঁহার মতে ১৯৪৫ সালেরও অনেক সময় যে যুদ্ধে ব্যয়িত হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। কারণ জার্ম্মাণীর শক্তি এখনও খুব কম নয়। মিত্রবাহিনী যতই জার্ম্মাণীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই জার্ম্মাণীর বাধাদানের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। সাম্প্রতিক গত এক মাসের যুদ্ধ-ইতিহাস হইতে দেখা যায়: সিগ্‌ফ্রিড্ লাইন যাহাতে মিত্রবাহিনী ভাঙিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে জার্ম্মাণ হাইকমাণ্ড্ প্রবল বাধাদানের ব্যবস্থা করিতেছেন। হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া জার্ম্মাণীতে প্রবেশের পথ সহজলভ্য বলিয়া মিত্রবাহিনী এপথের সাহায্য লইতে যায়, কিন্তু জার্ম্মাণ প্রতিরোধ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। আর্ণহেম হইতেও জার্ম্মাণ প্রতি-আক্রমণের ফলে মিত্রপক্ষীয় বিমানবাহী সৈন্যদলকে পশ্চাদপসরণ করিতে হয়। অবশ্য আর্ণহেমে আংশিক এই পরাজয় ঘটিলেও জেনারেল ডেম্‌সির সৈন্যবাহিনী ওয়াল ও নিজ্‌মেজেনে সেতুমুখ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। জেনারেল আইসেনহাওয়ারের হেড্‌কোয়ার্টার হইতে বিগত ১লা অক্টোবরের বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়—মিত্রবাহিনী ক্যালে অধিকার করিয়াছে। ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত্রে ক্যালেস্থিত জার্ম্মাণ কম্যাণ্ডার বন্দী হন, এবং পরদিবস ভোরে ওখানকার জার্ম্মাণ সৈন্যদল আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী দেখা যায়—ক্যালে অধিকারে আসায় ডোভার সম্প্রতি নিরাপদ হইল। ইহার ফলে দূর-পাল্লার কামান হইতে ইংলণ্ডের উপর গোলা বর্ষণ করিতে জার্ম্মাণীর পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না। এদিকে দেখা যায়—ফরাসী উপকূলের একমাত্র ডানকার্ক্‌ই এখনও জার্ম্মাণীর হাতে আছে; তাহারও আজ প্রায় যায়-যায় অবস্থা। অধিকৃত অঞ্চলসমূহ হস্তচ্যুত হইবার ফলে অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মাণীকে যে কাঁচামাল ও খাদ্য-শস্যের জন্য বেগ পাইতে হইবে, জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ গোলযোগ হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। রুমানিয়ার তৈলসম্পদ্ হইতেও আজ সে বিচ্যুত। কিন্তু এতদ্‌সত্বেও আজ জার্ম্মাণীর আত্মরক্ষামূলক রণক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হওয়ার ফলে তাহার বাধাদানের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির সুবিধা হইয়াছে। মিঃ চার্চ্চিলের আশু যুদ্ধাবসান সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তাই অমূলক নহে।

এদিকে চেকোশ্লোভাক সীমান্তে লালফৌজের অভিযান প্রচণ্ডভাবে সুরু হইয়াছে। ওয়ারশ'র পথে পথে জীবনমরণ সংগ্রাম চলিতেছে জার্ম্মাণ ও রুশবাহিনীর মধ্যে। ইতিমধ্যে যুগোশ্লাভিয়ার কয়েকটি স্থান রুশের অধিকারে আসিয়াছে। পূর্ব্ব প্রুশিয়ার প্রবেশ-দ্বারও আজ রুশবাহিনীর ক্রমাগত আঘাতে ভগ্নপ্রায়।

গুরুত্বপূর্ণ সহর বোলনার পথে পঞ্চম আর্ম্মি ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ব্রেনার গিরিবর্ত্মের ও জার্ম্মাণী প্রবেশের পথ এই বোলনায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। জার্ম্মাণ-আক্রমণের মুখে মিত্রবাহিনীর অগ্রগতি উপর্য্যুপরি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে বোলনার মুখে।

দেখা যাইতেছে, জার্ম্মাণী আজ বহু বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইলেও তাহাকে পর্য্যুদস্ত করা মিত্রবাহিনীর পক্ষে আশু সম্ভব নয়। একদিকে যেমন খাস জার্ম্মাণীতে মার্কিণবাহিনীর ক্রম-অগ্রগতির চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি জার্ম্মাণ পাল্টা আক্রমণের মুখে মিত্রবাহিনীকে বিপর্য্যস্ত হইতে হইতেছে। এই জন্যই ইয়োরোপে যুদ্ধের শেষ হইবার যে আশু সম্ভাবনা নাই, কমন্স সভায় মিঃ চার্চ্চিলের কণ্ঠে তাহারই আভাষ স্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

আসাম-ব্রহ্ম রণাঙ্গন

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের এক ইস্তাহার হইতে জানা যায়—কক্স্‌বাজার হইতে চল্লিশ মাইল পূর্ব্বে এবং প্যালেটোয়ার পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত প্রাক্ষু উপত্যকার মৌড়ক এলাকায় ভারত-সীমান্তের অভ্যন্তরে সম্প্রতি জাপানীরা তৎপর হইয়া উঠিয়াছে! প্রায় চারিশত জাপসৈন্য (তাউং বাজারের উত্তরে) ভারত ও আরাকান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ১৪শ আর্ম্মির ঘাঁটিগুলির উপর হানা দেয়। কাণ্ডির সমরদপ্তর হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জাপানী আত্মপ্রকাশের তিন দিনের মধ্যেই তাহারা আরাকান প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। ইম্ফল এবং উত্তর ব্রহ্মের সুদূর-বিস্তৃত অঞ্চল হইতে জাপানীরা আবার বিতাড়িত হইয়াছে। জেনারেল ষ্টিলওয়েলের চীনা ও মার্কিণ-বাহিনীর সাফল্যে এক দশমাংশ ভূখণ্ড ব্যতীত বাকী সবটাই পুনরাধিকৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় চতুর্দ্দশ আর্ম্মি আরাকানের দিকে নতুন করিয়া আক্রমণ চালাইবার জন্য কিছুদিন হইতে ব্যাপকভাবে তোড়জোড় সুরু করিয়াছেন।

কিছুকাল হইতে যুদ্ধের ধারা কিছুটা মন্থরগতিতে চলিয়াছে। সমগ্র ভারত-ব্রহ্মের উপর পুনর্বার জাপানের প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা যদিও ইতিমধ্যেই মিঃ চার্চ্চিলের সাম্প্রতিক যুদ্ধালোচনায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি এ কথা বলা অশোভন হইবে না যে, মিত্রশক্তি তাহাকে বড় সহজে আর মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে দিবে না।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে মহাচীন

বিগত ১০ই অক্টোবর চীনের স্বাধীনতা-দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আজ হইতে ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১১ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে, 'উচাং' সৈন্যদলে বিক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ায় যে

বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল, তাহা হইতেই বর্তমান চীন গণতন্ত্রের জন্ম।

মাঞ্চু রাজবংশের কু-শাসন হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য চীনের আপ্রাণ চেষ্টা ক্রমান্বয়ে ফলপ্রসূ হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সমস্যায় সে প্রতিনিয়ত বৈদেশিক স্বার্থ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। ইহারই মধ্যে তাহার আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথে প্রবল অন্তরায় হইয়াছে পর-পর দুইটি

চিয়াং কাইসেক

মহাযুদ্ধ। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে চীনকে অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে তেমন বিব্রত হইতে হয় নাই; কিন্তু জাপানের আক্রমণে বর্তমান মহাযুদ্ধে চীনকে ক্রমাগত ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইতেছে। তথাপি মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় চীনবাসীর অদম্য উৎসাহ বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই। বৃহত্তর মিত্র রাষ্ট্রসমূহের নিকট সাহায্য চাহিয়া যথাকালে উপযুক্ত সাহায্য সে পায় নাই। সম্প্রতি নানকিং হইতে গণতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টের রাজধানী চুংকিং-এ স্থানান্তরিত হইয়াছে। জাপানীরা নানকিং-এ একটি তাঁবেদার গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

সম্প্রতি চীনে মিত্রপক্ষের সাহায্যের পরিমাণ লইয়া যে বিতর্ক উঠিয়াছে, তাহা মিঃ চার্চ্চিল কুইবেক সম্মেলন হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া পার্লামেণ্টে যে বক্তৃতা করেন, তাহা হইতেই উদ্ভূত হয়। মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন: এত সাহায্য পাইয়াও চীন তাহার সামরিক বিপর্য্যয় ঠেকাইতে পারিল না, ইহা "বিরক্তিকর ও নৈরাশ্যজনক।" ইহাতে চীনের উপর যে কটাক্ষ করা হইয়াছে চুংকিং-এর সরকারী মহল তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নীরব থাকা শ্রেয় মনে করেন নাই। তাঁহারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, জলপথ ও স্থলপথ অবরুদ্ধ হওয়ায় একমাত্র বিমান পথে চীন যে সাহায্য পাইয়াছে, তাহা নগণ্যমাত্র। এ বিতর্ক সহসা মিটিবার নয়, কারণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও মিঃ চার্চ্চিলের কথারই একরূপ পুনরাবৃত্তি করিয়া সাহায্য দানের বহু নিদর্শন দেখাইয়াছেন, যাহা চীনের মতে অমূলক।

এতদসত্ত্বেও দেশের স্বাধীনতা কোনো ক্রমেই ফ্যাসিষ্ট শক্তির পদতলে পিষ্ট হইতে দিব না—ইহাই আজ সমগ্র চীনবাসীর একমাত্র পণ। চুংকিং গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কম্যুনিষ্ট দলের সহিত বোঝাপড়ার একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। চীনের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার দিক হইতেই প্রধানতঃ এই মীমাংসার প্রস্তাব রচিত ও উত্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া চীনের সমর শক্তিকে অধিকতর সংহত ও শক্তিশালী করিবার অভিপ্রায় ইহার মূলে রহিয়াছে। গণ-পরিষদে মার্শাল চিয়াং কাইসেক এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ লইয়া সমরশক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনটি উপায়ের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন:

(১) একটি সম্মিলিত কম্যাণ্ড গঠন করিতে হইবে। ইহার পর সৈন্যবাহিনীকে চীন গভর্ণমেণ্ট ও জাতীয় সমর পরিষদের সমস্ত আদেশ মানিয়া চলিতে হইবে।

(২) সৈন্য ও অফিসারগণের বর্তমান জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রচুর অর্থ চাই। গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, নিকৃষ্ট সৈন্যদল ভাঙিয়া দিয়া ব্যয়সঙ্কোচ করিবেন এবং তাহাতে যে অর্থ বাঁচিবে, তাহা উৎকৃষ্ট সৈন্যদলের জন্য ব্যয় করিবেন। এতদ্ব্যতীত চীনের ধনী ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণকে গভর্ণমেণ্ট এই অনুরোধ করিবেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের উদ্বৃত্ত ধন ও অন্যান্য খাদ্যশস্য সৈন্যদের জন্য দান করেন।

(৩) সৈন্যবাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য চীনের শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে "সৈন্যদলে যোগ দাও" আন্দোলন জোর দিয়া চালান হইবে।

ইহা কার্য্যকরী হইলেও জাপানের ন্যায় শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার পক্ষে আজ একক চীনের আপ্রাণ চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। ইহার সহিত নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী বিশ্বের সর্ব্ববিধ সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। চীনের সাফল্যের অর্থ গণতন্ত্রেরই বিজয় বুঝিতে হইবে। অদ্যকার চীন-জাপান যুদ্ধের অষ্টমবর্ষে চীনের পক্ষে সেই সাহায্য আসুক, ইহাই আজ সাম্যবাদী জাতিসমূহের একান্ত কাম্য।

তপশীল-হিন্দু সম্মেলনে ডাঃ আম্বেদকর

সম্প্রতি এলোরে তপশীলভুক্ত হিন্দুদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে হিংসা ও আক্রোশই দেখা যায় এই সম্মেলনের একমাত্র মূলধন ও অস্ত্র। ভারত সরকারের শ্রমসচিব ডাঃ বি, আর, আম্বেদকর সম্মেলনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন: জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য যদি ইংরাজদের এক শত কারণ থাকে, তাহা হইলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যদের যুদ্ধ করিবার সহস্রাধিক কারণ আছে। তপশীলীদের এই কথা জোর গলায় বলিতে হইবে এবং যদি যুক্তিতর্ক নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে তপশীলীদের অধিকার লাভের জন্য বলপ্রয়োগ

করিতে হইবে। মিত্রপক্ষ এবং জার্ম্মাণদের মধ্যে যে বিরোধের কারণ আছে, হিন্দু এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে বিরোধের কারণ তদপেক্ষা অধিকতর মৌলিক এবং পবিত্র। নিজেদের অধিকার অর্জ্জনের জন্য অস্পৃশ্যদের রক্তপাত করিয়াও সংগ্রাম করিতে হইবে।

বিস্ববিয়াসের আকস্মিক অগ্ন্যুদগারের মতই ডাঃ আম্বেদকর ভাবাবেগে কথার বেগ ছাড়িয়া দিয়াছেন। চিন্তা করিয়া দেখিলে মূল বিষয় হয়ত অত্যন্ত নগণ্য হইয়াই দেখা দিবে, কিন্তু তাহা লইয়া উল্লম্ফনের চূড়ান্ত হইয়া গেল। অধিকারের উপযুক্ততা এবং উন্নত মনের সহজতা-ধর্ম্ম দ্বারাই জীবন ও অবস্থাকে উন্নত করা সম্ভব। বর্ণ-হিন্দুদের বিরুদ্ধে তপশীলী-হিন্দুকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিবার মূলে ডাঃ আম্বেদকর কি একবারও সে কথা তলাইয়া দেখিয়াছেন?

গান্ধী-জিন্না আলোচনার ব্যর্থতা

বিগত ৯ই আগষ্ট হইতে বোম্বাইয়ে গান্ধীজি ও মিঃ জিন্নার মধ্যে যে আপোষ-আলোচনা চলিতেছিল, তাহা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। রাজাজীর প্রস্তাব লইয়া মিঃ জিন্নাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন গান্ধীজি। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে হিন্দুদের অধিকার জলাঞ্জলি দিয়াও যে ঐক্যের অখণ্ডতা রক্ষা করা চলে না, মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনার প্রাক্কালে এই কথাটা

গান্ধীজি

মিঃ জিন্না

সম্ভবতঃ গান্ধীজি ভাবিয়া দেখেন নাই। অবশ্য জিন্নার সম্পূর্ণ সর্ত্ত গান্ধীজি মানিয়া ল'ন নাই, তথাপি গান্ধীজি যে ভারত-বিভাগের নীতি মানিয়া লইয়াছেন, তাহাতে মিঃ জিন্না অবশ্যই খুসী হইয়াছেন। এতদসত্ত্বেও আলোচনা ব্যর্থ হইল। না হইলেও অবশ্য সন্দেহের অনবকাশ কিছু থাকিত না! কারণ 'প্যাক্ট'জাত স্বাধীনতা প্রণয়নের পিছনে স্থিতিহীনতার ঐতিহাসিক পটভূমি আমরা আগাগোড়া সর্ব্বত্র লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি।...মিঃ জিন্না অবশ্যই অসহযোগ করিয়া আরামে আছেন, কিন্তু গান্ধীজি?

পরলোকে খ্যাতনামা মার্কিণ রাজনৈতিক ওয়েণ্ডেল উইল্কি

গত ৭ই অক্টোবর রাত্রে খ্যাতনামা মার্কিণ রাজনৈতিক ওয়েণ্ডেল উইল্কি পরলোক গমন করেন। মিঃ উইল্কি ১৮৯২

ওয়েণ্ডেল উইল্কি

সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইণ্ডিয়ানার অন্তর্গত এলউডে জন্ম গ্রহণ করেন। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বিগত মহাযুদ্ধে তিনি মার্কিণ গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেনরূপে ফ্রান্সে যুদ্ধ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কমন-ওয়েল্‌থ্ করপোরেশন পাবলিক ইউটিলিটি কোম্পানীর কর্ত্তা হন। ১৯৪০ সালে মার্কিণ নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতার সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টপদে নির্ব্বাচনের জন্য রিপাব্লিক্যান দলের প্রার্থিরূপে তাঁহাকে মনোনীত করা হয়। ঐ সময়েই তিনি আকস্মিকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মিঃ উইল্কি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধিরূপে সম্মিলিত বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করেন। এই সময় এবং পরবর্ত্তীকালে তিনি ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য পরাধীন দেশের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়া এবং চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য

দানের প্রস্তাব করিয়া বিভিন্ন বিবৃতি দেন। যুদ্ধকালে তাঁহার এই বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি "ওয়ান ওয়ার্ল্ড" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পরলোকে সত্যেন্দ্রমোহন

সত্যেন্দ্রমোহন রায়

রংপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনাধিপতি স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র ও বারেন্দ্র কায়স্থ কুলতিলক প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় রমণী মোহন রায় মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মোহন রায় মহাশয় গত ১৫ই ভাদ্র ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে রাজ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হইলেও সত্যেন্দ্রমোহন ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও সাধুসঙ্গ লাভের জন্য সর্ব্বদা উৎসুক থাকিতেন। ভাগ্যক্রমে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য শ্রীশ্রীভূপতিনাথ মহারাজের চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। গুরুর কৃপায় সাধক এবং ভক্ত-মণ্ডলীর নিকট তিনি 'সাধু রায়' মহাশয় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত সত্যেন্দ্রমোহনের কৃপায় কাকিনার এবং স্থানান্তরের বহুলোক এবং বহু ছাত্র নানাপ্রকারের সাহায্য লাভ করিয়া উপকৃত হইতেন। সত্যেন্দ্রমোহন দুই পুত্র, দুই কন্যা এবং চারি ভ্রাতা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবেন্দ্রমোহন রায়, ই, আই, রেলের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এক ভ্রাতা ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রমোহন রায়, অপর ভ্রাতাগণের মধ্যে রবি রায় ও ভূমেন রায় মঞ্চ ও পর্দ্দার সুবিখ্যাত অভিনেতা। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করিতেছি এবং শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

"যদি ভগবানের ভগবত্তার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বদা মনে করিতে হইবে যে, তাঁহার রাজ্য এবং সৃষ্টি শৃঙ্খলাময়; বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা কোথাও নাই! যেখানে আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা, সেই খানেই আমাদের জ্ঞানের অভাব বুঝিতে হইবে। মানুষের কার্য্যের বিষয় এবং রকম অনুসারে নূতন বিষয়ের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ পরিবর্দ্ধিত শক্তিসম্পন্ন হয়। যেখানে মানুষের শক্তির অভাব সেইখানেই বুঝিতে হইবে, মানুষের কার্য্যের বিষয়ে এবং রকমে মানুষ কোন না কোন ভুল করিয়াছে। মানুষকে সর্ব্বদা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, সে তাহার কার্য্যের বিষয় ও রকম বাছিয়া লইতে শিখিলে নিজেকে অসীম শক্তিসম্পন্ন করিতে পারে। কোথায় তাহার শক্তির অভাব, তাহার কার্য্যের পরিণতি দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। চেষ্টা করিলে নিজের শক্তি বাড়াইতে পারা যায়, এই হিসাবে আত্মবিশ্বাসী হইতে হইবে, কিন্তু কখনও যেন কোথায় শক্তির অভাব তদ্বিষয়ে মানুষ অন্ধ না হইয়া পড়ে।"

বঙ্গশ্রী—১৩৪১, মাঘ।

শেষ ঘনিয়ে এল

নামগুলি মনে আছে ?… কিছুদিন আগেও নামগুলি খবরের শিরোনামা ছিল। ডিমাপুরের কাছে রেলপথে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। কোহিমার ভা[illegible]হিনী সংখ্যায় অনেক বেশি শত্রুসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। জাপানী সৈন্যেরা ইম্ফলের সমভূমিতে প্রবেশ করেছিল এবং বিষেণপুরের উত্তর ও দক্ষিণে পৌঁছেছিল। উখরুল নিরাপদ ছিল না …

এ সব আজ পুরোনো কথা। জাপানীরা পরাস্ত হয়েছে এবং পিছু হঠছে। আজ ডিমাপুরে ১৫০ মাইলের মধ্যে কোথাও তাদের অস্তিত্ব নেই। নাগারা কোহিমায় ফিরে এসেছে। গুলি, গোলা ও বোমায় পর্যুদস্ত এই পার্বত্য সহরটির পুনর্গঠনের পরিকল্পনা এগিয়ে চলছে। জাপানীরা নিজেরাই যাকে বলেছিল,—"অপরাজেয় বাহিনী" …আজ সেই সব জাপসৈন্যের অস্থি বিষেণপুর পাহাড়গুলিতে ছড়িয়ে আছে। এইভাবে তাদের শেষ ঘনিয়ে আসছে। আপনি যখন এটা পড়বেন…তখন যে সব সাহসী বীরপুরুষ এই জয়লাভ সম্ভব করেছে তাদের কথা স্মরণ করবেন

আমাদের সৈন্যেরা প্রমাণ করেছে —
জাপানীরা উপদেবতাও নয়, অপরাজেয় মহাপুরুষও নয়।

ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট কর্তৃক প্রচারিত

AAA 1306

টেলি—"ব্যাঙ্ক", কলিকাতা | ফোন্—ক্যাল্ ২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

স্থাপিত—১৯২৬

২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

অধিকৃত	২৫,০০,০০০৲ লক্ষ টাকা
বিলিকৃত	১২,৫০,০০০৲ লক্ষ টাকা
	১২,৫০,০০০৲ লক্ষ টাকা
আদায়ীকৃত ...	৮,২৫,০০০৲ লক্ষ টাকা
কার্য করা তহবিল	৯০,০০,০০০৲ লক্ষ টাকার অধিক

১৯৪৩ সালে বার্ষিক শতকরা
টাকা হারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করা

এ পর্য্যন্ত অংশীদারগণের অর্থের শতকরা এক শত টাকা
হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—এস্, এম্, মুখার্জ্জী, এম-এস-সি (ক্যাল),
এ-সি-আই-এস্ (লণ্ডন), চার্টার্ড সেক্রেটারী।

MBS

রঙ্কো সুরভিত ক্যাস্টর অয়েল
ফ্রাঙ্ক রস এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা

বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্

হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

কাপড়-কাঁচা, গায়ে-মাখা—দু'রকমের সাবানের জন্যই

"বঙ্গলক্ষ্মী" প্রশস্ত।

গ্রাম—বথের ধন
ফোন:
ক্যাল ৩৭৩৪

২ জরাদা ব্যাঙ্ক

লিঃ

স্ট্রীট কলিকাতা

—স্থাপিত—
১৯২৯

আয়করমুক্ত শতকরা ৫৲ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে

— শাখা সমুহ —

কলিকাতা		বাঙ্গলা		আসাম	বিহার
মাণিকতলা	ধর্ম্মতলা	মেদিনীপুর	বাঁকুড়া	তেজপুর	পাটনা
শ্যামবাজার	শিয়ালদহ	বালিচক	বিষ্ণুপুর	হবিগঞ্জ	রাঁচী
কলেজ ষ্ট্রীট	বালিগঞ্জ	শালবণী	মির্জাপুর	—	—
বড়বাজার	পোস্তা	আলমগড়া	কৃষ্ণনগর	—	—
—	—	গড়বেতা	খুলনা	—	—
—	—	ঘাঁটাল	বাগেরহাট	—	—

সেণ্ট্রাল অফিস শীঘ্রই ৮০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে
স্থানান্তরিত করা হইবে

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন।

বঙ্গশ্রীর নিবেদন ও নিয়মাবলী

"বঙ্গশ্রী"র বার্ষিক মূল্য সডাক ৬॥• টাকা। ষাণ্মাসিক ৩॥• টাকা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥৵• আনা। মূল্যাদি—কর্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী, C/o মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আষাঢ় হইতে "বঙ্গশ্রী"র বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া চলে।

প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। ফেরতের জন্য ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হয়। যে-মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তদন্তের ফল আমাদিগকে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য থাকিব না।

বিজ্ঞাপনের হার পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

বাংলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ না আসিলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার।

লক্ষ্মীর বার্ত্তা চির কল্যাণময়,
দুঃখের আঁধারে আনে আনন্দের জয়।
সঞ্চয়ের অর্ঘ্যভারে অর্চ্চনা তাঁর,
দেশে দেশে শুনি স্তুতি দেবী কমলার।

অর্থগৃধ্নুতা আর অর্থ সঞ্চয় এক বস্তু নয়।
সঞ্চয়ের পথে যাদের প্রশান্ত দৃষ্টি,
লক্ষ্মার কল্যাণ-আশীষ তাদেরই শিরে।

১২শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ—১৩৫১

বিষয়-সূচী

[পর পৃষ্ঠায়

বিষয়-সূচী—পূর্ব্বানুবৃত্তি

চিত্র-সূচী

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যাসমূহের সমাধান করিবার পরিকল্পনা ও কার্য্যসঙ্কেত

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

আমাদিগের এই প্রবন্ধের বক্তব্য-বিষয় প্রধানতঃ আট শ্রেণীর, যথা :

(১) বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের তিন শ্রেণীর সমস্যার নাম ;

(২) তিন শ্রেণীর সমস্যা-সমাধানের দুই শ্রেণীর পরিকল্পনার নাম ;

(৩) দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সঙ্কেতের নাম ;

(৪) তিন শ্রেণীর সমস্যার সমস্যাত্ব সম্বন্ধে যুক্তিবাদ ;

(৫) বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপণ করিবার ব্যবস্থাকে সমস্যা মনে করিবার যুক্তিবাদ ;

(৬) বর্ত্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবার ব্যবস্থাকে সমস্যা মনে করিবার যুক্তিবাদ ;

(৭) মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থাকে সমস্যা মনে করিবার যুক্তিবাদ ;

(৮) দুই শ্রেণীর পরিকল্পনার এবং এক শ্রেণীর কার্য্যসঙ্কেতের প্রয়োজনীয়তার যুক্তিবাদ।

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের তিন শ্রেণীর সমস্যার নাম

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর এবং ঐ তিন শ্রেণীর সমস্যার সমাধান করিতে হইলে দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা আমাদিগের বিচারানুসারে, যে তিন শ্রেণীর, সেই তিন শ্রেণীর সমস্যার নাম—

(১) বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নিরাপদভাবে নির্ব্বাপণ করিবার ব্যবস্থা-বিষয়ক সমস্যা ;

(২) বর্ত্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবার ব্যবস্থা-বিষয়ক সমস্যা ;

(৩) মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা-বিষয়ক সমস্যা।

মানুষের "দারিদ্র্য" ও "অভাব" আমরা কাহাকে বলি তাহার ব্যাখ্যা না করিলে আমাদিগের বিবেচনায়, উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সমস্যার তৃতীয় সমস্যাটীর যে কি অর্থ তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে মানুষের পরিণত জীবনের অবস্থাসমূহের শ্রেণী-বিভাগ ও মানুষের বিভিন্ন অবস্থার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব তাহার পরিণত জীবনের দুইটী অবস্থা। আমাদিগের বিচারানুসারে প্রত্যেক মানুষের পরিণত জীবনে তিনটী অবস্থা বিদ্যমান থাকে, যথা :

(১) দারিদ্র্যের অবস্থা ;

(২) অভাবের অবস্থা ;

(৩) প্রাচুর্য্যের অবস্থা। "প্রাচুর্য্যের অবস্থা"র অপর নাম "ঐশ্বর্য্যের অবস্থা"।

আমাদিগের মতবাদানুসারে মানুষের ইচ্ছাপূরণের সক্ষমতার ও অক্ষমতার ভেদানুসারে তাঁহার পরিণত জীবনের অবস্থাসমূহের শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে।

মানুষের জীবনের কার্য্যসমূহের ভেদানুসারে তাঁহার ইচ্ছা-পূরণের সক্ষমতার ও অক্ষমতার ভেদ হইয়া থাকে।

মাতৃগর্ভে জন্ম হওয়া অবধি মরণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মানুষের জীবনে যে সমস্ত কার্য্য সাধিত হয় সেই সমস্ত কার্য্য আমাদিগের মতবাদানুসারে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর, যথা :

(১) সর্ব্বব্যাপী মনুষ্য-স্বভাবের কার্য্য ;

(২) ব্যক্তিগত মনুষ্য-স্বভাবের কার্য্য ;

(৩) মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের কার্য্য।

যে শ্রেণীর কার্য্য-বশতঃ প্রত্যেক মানুষের জন্ম স্বতঃই মাতৃগর্ভে সাধিত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়, সেই শ্রেণীর কার্য্যকে আমরা "সর্ব্বব্যাপী মনুষ্য-স্বভাবের কার্য্য" বলিয়া থাকি। সর্ব্ব-ব্যাপী মনুষ্য-স্বভাবের কার্য্য যে কেবলমাত্র মানুষের মাতৃগর্ভেই বিদ্যমান থাকে তাহা নহে। আমাদিগের মতবাদানুসারে উহা মানুষের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

যে শ্রেণীর কার্য্য মানুষের ইচ্ছাসমূহের বিকাশ হইবার আগে প্রত্যেক মানুষ তাহার শৈশবে অতর্কিতভাবে করিয়া থাবেন সেই সমস্ত কার্য্যকে আমরা "ব্যক্তিগত মনুষ্য-স্বভাবের কার্য্য" বলিয়া থাকি। আমাদিগের মতবাদানুসারে মানুষের ব্যক্তিগত স্বভাবের কার্য্যসমূহ তাহার মাতৃগর্ভে বিদ্যমান থাকে না। উহা মাতৃগর্ভ ছাড়া ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি আজীবন বিদ্যমান থাকে।

যে শ্রেণীর কার্য্য—মানুষের ইচ্ছাসমূহের বিকাশ হইবার পর প্রত্যেক মানুষ তাঁহার সারাজীবনে কখনও অতর্কিতভাবে, কখনও ভ্রম-পূর্ণ বিচারের দ্বারা, কখনও ভ্রমহীন বিচারের দ্বারা সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত কার্য্যকে আমরা "মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের কার্য্য" বলিয়া থাকি। মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের কোন কার্য্য তাঁহার মাতৃগর্ভে অথবা শৈশবে ইচ্ছা-সমূহের বিকাশ হইবার আগে বিদ্যমান থাকে না। ইচ্ছাসমূহের বিকাশ হইবার পর উহা আজীবন বিদ্যমান থাকে।

আমাদিগের মতবাদানুসারে মানুষের ইচ্ছাসমূহের বিকাশ হইবার পর তাঁহার ব্যক্তিগত অবস্থার উৎপত্তি হয়। মানুষের ইচ্ছাসমূহের বিকাশের আগে তাঁহার কোন ব্যক্তিগত অবস্থা বিদ্যমান থাকে না। তখন যে অবস্থা থাকে, সেই অবস্থা মানুষের শৈশবাবস্থা। উহা সর্ব্বতোভাবে মানুষের নিজ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের বহির্ভূত।

মানুষের ইচ্ছা পূরণ করিতে হইলে যে যে সামগ্রী অথবা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তাহা যখন মানুষ নির্ভুল ও নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম হন এবং যে সমস্ত সামগ্রী ও ব্যবস্থায় মানুষের তৃপ্তির ও স্বাস্থ্যের অভাব উদ্ভূত হওয়া অনিবার্য্য হয়, সেই সমস্ত সামগ্রী ও ব্যবস্থা যখন মানুষ তৃপ্তির ও স্বাস্থ্যের সামগ্রী ও ব্যবস্থা বলিয়া গ্রহণ করেন, তখন মানুষের যে অবস্থার উৎপত্তি হয়, সেই অবস্থার নাম মানুষের "দারিদ্র্যের অবস্থা।"

মানুষের ইচ্ছা পূরণ করিতে হইলে কি কি সামগ্রী অথবা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তাহা যখন মানুষ নির্ভুল ও নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হন, কিন্তু যে সমস্ত সামগ্রী অথবা ব্যবস্থা মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, সেই সমস্ত সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করিতে এবং ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে সম্পাদন করিতে সক্ষম হন, তখন মানুষের যে অবস্থার উৎপত্তি হয়, সেই অবস্থার নাম মানুষের "অভাবের অবস্থা"।

মানুষের দারিদ্র্যের এবং অভাবের অবস্থা দূরীভূত হইলে "প্রাচুর্য্যের অবস্থা"র উৎপত্তি হয়। প্রাচুর্য্যের অবস্থার অপর নাম "ঐশ্বর্য্যের অবস্থা"।

প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যে সমস্ত ইচ্ছার উৎপত্তি হয় সেই সমস্ত ইচ্ছা প্রধানতঃ ছয় শ্রেণীর। এই হিসাবে প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর অবস্থাও ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ইচ্ছাসমূহ যে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত, সেই ছয় শ্রেণীর নাম:

(১) স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা;
(২) ধনগত ইচ্ছা;
(৩) প্রতিষ্ঠাগত ইচ্ছা;
(৪) সম্মানগত ইচ্ছা;
(৫) তৃপ্তিগত ইচ্ছা;
(৬) বিদ্যাগত ইচ্ছা;

স্বাস্থ্যগত ইচ্ছাসমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা:

(১) শারীরিক আকৃতির স্বাস্থ্যের (অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের) ইচ্ছা;
(২) ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্যের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের বল ও কার্য্য-নৈপুণ্যের) ইচ্ছা;
(৩) মনের স্বাস্থ্যের (অর্থাৎ স্থিরতার ও একনিষ্ঠার) ইচ্ছা,
(৪) বুদ্ধির স্বাস্থ্যের (অর্থাৎ ভ্রমহীন বিচারশীলতার) ইচ্ছা।

আহার-বিহারের সামগ্রী সম্বন্ধীয় যে সমস্ত ইচ্ছা মানুষের হইয়া থাকে সেই সমস্ত ইচ্ছার নাম মানুষের "ধনগত ইচ্ছা"।

যাহা যাহা পাইলে মানুষের ইচ্ছার পূরণ হয়, তাহার প্রত্যেকটার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে মানুষের যে শ্রেণীর ইচ্ছা হয়, সেই শ্রেণীর ইচ্ছার নাম "প্রতিষ্ঠাগত ইচ্ছা" (Desires for stability)। যখন কোন পরিবর্ত্তন-বিরুদ্ধতা মানুষের ইচ্ছার বিষয় হয়, তখন মানুষের "প্রতিষ্ঠাগত ইচ্ছা"র উদ্ভব হয়।

অসম্মান যাহাতে না হয়, তজ্জন্য মানুষের যে শ্রেণীর ইচ্ছার উদ্ভব হয় সেই শ্রেণীর ইচ্ছার নাম মানুষের "সম্মানগত ইচ্ছা"। আমাদিগের মতবাদানুসারে মানুষের দুঃখহীন জীবন যাপন করিতে হইলে মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি ও নিষেধ পালন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। ঐ সমস্ত "বিধিমূলক" কার্য্য না করিলে এবং "নিষেধমূলক" কার্য্য করিলে মানুষের অসম্মানের যোগ্য হইতে হয়। মানুষ যাহাতে অসম্মানের যোগ্য না হয় তজ্জন্য মানুষের স্ব স্ব কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববিষয়ক বিধিমূলক কার্য্যসমূহ করিবার ও নিষেধমূলক কার্য্যসমূহ না করিবার ইচ্ছার নাম মানুষের "সম্মানগত ইচ্ছা"।

মানুষের ইচ্ছাসমূহ যেরূপ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত, মানুষের দারিদ্র্যাবস্থা, মানুষের অভাবের অবস্থা এবং মানুষের প্রাচুর্য্যের অথবা ঐশ্বর্য্যের অবস্থাও সেইরূপ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা:

(১) স্বাস্থ্যগত দারিদ্র্য, অভাব ও ঐশ্বর্য্য,
(২) ধনগত দারিদ্র্য, অভাব ও ঐশ্বর্য্য,
(৩) প্রতিষ্ঠাগত দারিদ্র্য, অভাব ও ঐশ্বর্য্য;
(৪) সম্মানগত দারিদ্র্য, অভাব ও ঐশ্বর্য্য,
(৫) তৃপ্তিগত দারিদ্র্য, অভাব ও ঐশ্বর্য্য,
(৬) বিদ্যাগত দারিদ্র্য, অভাব ও ঐশ্বর্য্য।

প্রত্যেক মানুষেরই ইচ্ছার বিষয় হয় উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাচুর্য্য অথবা ঐশ্বর্য্য লাভ করা এবং ঐ ছয় শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর দারিদ্র্য ও অভাব নিবারণ করা ও দূর করা।

উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাচুর্য্য অথবা ঐশ্বর্য্য লাভ করা প্রত্যেক মানুষেরই ইচ্ছার বিষয় বটে কিন্তু আমা

দিগের মতবাদানুসারে "ব্যক্তিগত মনুষ্য-স্বভাবের কার্য্যসমূহের" নিয়মানুসারে প্রত্যেক মানুষই উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর দারিদ্র্য লইয়া ব্যক্তিগত জীবন আরম্ভ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। ঐ সমস্ত ব্যক্তিগত দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য সঙ্ঘগত সংগঠনের ও ব্যক্তিগত কার্য্যের প্রয়োজন হয়। সঙ্ঘগত সংগঠন না থাকিলে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কার্য্যের দ্বারা কোন ক্রমে ঐ সমস্ত ব্যক্তিগত দারিদ্র্য সর্ব্বতোভাবে দূর করা অথবা নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। ঐ সমস্ত ব্যক্তিগত দারিদ্র্য সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইলে উহার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘগত সংগঠন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। ইহার কারণ মানুষের ব্যক্তিগত প্রত্যেক ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে যে বিদ্যার ও ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় সেই সেই বিদ্যার ও ব্যবস্থার অভাব হইলে অথবা যে যে বিদ্যায় ও ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত প্রত্যেক ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা অসম্ভব হয় সেই সেই বিদ্যার ও ব্যবস্থার প্রচলন হইলে মানুষের দারিদ্র্যের উদ্ভব হয়। সঙ্ঘগত সংগঠন সাধন করিতে না পারিলে যে যে বিদ্যার ও ব্যবস্থার অভাবে অথবা প্রচলনে দারিদ্র্য অনিবার্য্য হয়, সেই সেই বিদ্যার ও ব্যবস্থার অভাব অথবা প্রচলন দূর করা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত চেষ্টায় সম্ভবযোগ্য হয় না।

ব্যক্তিগত দারিদ্র্যের প্রধান কারণ দুই শ্রেণীর, যথা :

(১) বিদ্যাগত এবং

(২) ব্যবস্থাগত।

সঙ্ঘগত সংগঠন সাধিত হইলে ব্যক্তিগত দারিদ্র্যের ব্যবস্থাগত কারণসমূহ সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় এবং বিদ্যাগত কারণসমূহও আংশিকভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়। ব্যক্তিগত দারিদ্র্য সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইলে উহার জন্য যেরূপ সঙ্ঘগত সংগঠনের প্রয়োজন হয় সেইরূপ আবার ব্যক্তিগত চেষ্টারও প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিগত দারিদ্র্য সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইলে উহার জন্য যে সমস্ত ব্যক্তিগত চেষ্টার প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত ব্যক্তিগত চেষ্টা দুই শ্রেণীর, যথা :

(১) বিদ্যাগত চেষ্টা ও

(২) কার্য্যগত চেষ্টা।

ব্যক্তিগত দারিদ্র্য সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইলে যে শ্রেণীর সঙ্ঘগত সংগঠনের প্রয়োজন সেই শ্রেণীর সঙ্ঘগত সংগঠনের অভাব না হইলে ও উপরোক্ত দুই শ্রেণীর ব্যক্তিগত চেষ্টার অভাব হইলে "ব্যক্তিগত মনুষ্যস্বভাবের কার্য্যসমূহের" নিয়মানুসারে প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত দারিদ্র্য লইয়া ব্যক্তিগত জীবন আরম্ভ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, সেই সমস্ত দারিদ্র্য উপরোক্ত স্বভাবের কার্য্যসমূহের নিয়মে স্বতঃই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং আজীবন বিদ্যমান থাকে।

মানুষের স্ব স্ব বিদ্যাগত চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলে ব্যক্তিগত দারিদ্র্য দূর হয়। উহা দূর হয় বটে, কিন্তু কার্য্যগত চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত না হইলে কোন শ্রেণীর প্রকৃত প্রাচুর্য্য অথবা ঐশ্বর্য্য লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। কার্য্যগত চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত না হইলে বিদ্যাগত চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলেও মানুষের কোন না কোন শ্রেণীর কোন না কোন মাত্রার "অভাব" থাকা অনিবার্য্য হয়।

যে ছয় শ্রেণীর প্রাচুর্য্য অথবা ঐশ্বর্য্য লাভ করা প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছার বিষয়, সেই ছয় শ্রেণীর প্রাচুর্য্য অথবা ঐশ্বর্য্য সর্ব্বতোভাবে লাভ করিতে হইলে আমাদিগের মতবাদানুসারে—

প্রথমতঃ, মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কোনও বিদ্যার ও ব্যবহারের কাহারও অভাব না হয়, তাহার সঙ্ঘগত সংগঠন অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক মানুষ যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার জন্য স্ব স্ব বিদ্যাগত ও কার্য্যগত চেষ্টাসমূহ সম্পাদন করেন, তাহার জন্য সঙ্ঘগত সংগঠন অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

আমাদিগের মতবাদানুসারে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সঙ্ঘগত সংগঠন সাধিত না হইলে কোন মানুষের এমন কি ব্যক্তিগতভাবে ছয় শ্রেণীর কোন শ্রেণীর প্রকৃত ঐশ্বর্য্য লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সঙ্ঘগত সংগঠন সাধন করিবার সমস্যাকে আমরা "মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা-বিষয়ক সমস্যা" বলিয়া অভিহিত করি।

তিন শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের দুই শ্রেণীর পরিকল্পনার নাম

ঐ তিন শ্রেণীর সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, আমাদিগের বিচারানুসারে, যে দুই শ্রেণীর পরিকল্পনার প্রয়োজন, সেই দুই শ্রেণীর পরিকল্পনার নাম—

(১) সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নিরাপদভাবে নির্ব্বাপণ করিবার এবং এতাদৃশ যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবার পরিকল্পনা,

(২) মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার পরিকল্পনা।

আমাদিগের বিচারানুসারে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা যে কেবলমাত্র মানবসমাজের তিন শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা, তাহা নহে। যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করিতে হইলেও ঐ দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। আমাদিগের মতবাদানুসারে ঐ দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা স্থির করিতে না পারিলে অন্য কোন উপায়ে বর্ত্তমান যুদ্ধে কোন পক্ষের সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করা সম্ভবযোগ্য নহে। এই হিসাবে উপরোক্ত দুইটী পরিকল্পনাকে "বর্ত্তমান যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করিবার পরিকল্পনা" বলা যাইতে পারে।

দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সঙ্কেতের নাম

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সমস্যা সমাধান করিতে হইলে যেমন উপরোক্ত দুই

শ্রেণীর পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ ঐ দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা যাহাতে অনায়াসসাধ্য হয় তাহার কার্য্য-সঙ্কেতেরও প্রয়োজন হয়।

আমাদিগের বিচারানুসারে যে কার্য্যসঙ্কেত দ্বারা উপরোক্ত দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা অনায়াসসাধ্য হইতে পারে, সেই কার্য্যসঙ্কেতের নাম—

"যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়ী হইবার কার্য্যসঙ্কেত"—

তিন শ্রেণীর সমস্যার সমস্যার্ত্ব সম্বন্ধে যুক্তিবাদ

যে তিন শ্রেণীর সমস্যাকে আমরা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা বলিয়া মনে করি, সেই তিন শ্রেণীর সমস্যাই যে প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা, তাহা প্রমাণিত করিতে হইলে উহাদিগকে সমস্যা মনে করিবার আমাদিগের যে সমস্ত যুক্তি আছে, সেই সমস্ত যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে হয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নির্ব্বাপণকে অথবা বর্ত্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করাকে অথবা মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে নিবারণ ও দূর করাকে আমরা কেন যে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের তিনটী প্রধান সমস্যা বলিয়া মনে করি, তাহার কারণ দুই শ্রেণীর, যথা:

(১) আমাদিগের বিচারানুসারে ঐ তিনটী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষই বর্ত্তমান সময়ে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং উহা সাধন করিবার ইচ্ছাও অনেকেরই জাগ্রত হইয়াছে, অথচ ঐ তিনটী কার্য্য যে কি করিয়া সাধন করা অনায়াসসাধ্য হইতে পারে, তাহার কোন পন্থা কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না।

(২) ঐ তিনটী কার্য্য সাধন করিতে পারিলে আমাদিগের মতবাদানুসারে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত প্রত্যেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভবযোগ্য হয় এবং প্রত্যেক মানুষের পক্ষে নিজ নিজ সর্ব্ববিধ অভাব ও সর্ব্ববিধ দুঃখের হাত হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য উপভোগ করা সাধ্যায়ত্ত হয়।

আমাদিগের মতবাদানুসারে যে সমস্ত কার্য্য মানুষের ইচ্ছার বিষয় এবং প্রয়োজনীয়, তাহার কোনটী সাধন করা মানুষের কষ্টসাধ্য অথবা অসাধ্য হইলে মানুষের সমস্যার উদ্ভব হয়। মানুষের কাম্য অথবা প্রয়োজনীয় কার্য্যের প্রত্যেকটী যখন মানুষ অনায়াসে সাধন করিতে সক্ষম হন, তখন তাঁহার কোন সমস্যা থাকিতে পারে না ও থাকে না।

বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নির্ব্বাপণ, যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ এবং মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করা যদ্যপি মনুষ্য-সমাজের অধিকাংশ মানুষের কাম্য অথবা প্রয়োজনীয় না হইত অথবা ঐ তিনটী কার্য্য সাধন করা যদ্যপি মানুষের কষ্টসাধ্য না হইত তাহা হইলে ঐ তিনটী কার্য্যের কোনটীকে মানুষের কোন সমস্যার বিষয় বলিয়া মনে করা যাইত না।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, আমাদিগের বিচারানুসারে ঐ তিনটি কার্য্যের প্রত্যেকটি বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের অত্যধিক কাম্য ও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, অথচ কেহই উহা সাধন করিবার পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইতেছেন না বলিয়া আমরা ঐ তিনটী কার্য্যকে সমস্যার তিনটী সমস্যা বলিয়া মনে করি।

ঐ তিনটী কার্য্যের প্রত্যেকটী সাধন করা যে মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের অত্যধিক কাম্য ও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে অথচ কেহই কোনটী সাধন করিবার সঠিক পন্থা যে নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের যাহা যাহা বলিবার আছে তাহা অতঃপর আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপণ করিবার ব্যবস্থাকে সমস্যা মনে করিবার যুক্তিবাদ

বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপণকে আমরা যে সমস্যা বলিয়া মনে করি তাহার কারণ—ঐ অগ্নিবর্ষণের নির্ব্বাপণ, আমাদিগের বিচারানুসারে প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের এক্ষণে ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে; উহা মানুষের মনুষ্যোচিত জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অথচ ঐ অগ্নিবর্ষণের নির্ব্বাপণ মানব-সমাজের বর্ত্তমান কর্ণধারগণের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নির্ব্বাপণ যাহাতে অনতিবিলম্বে সাধিত হয়, তাহা যে মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের কাম্য তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আমাদিগের মতবাদানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুই পক্ষের যুদ্ধ-সারথিগণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নির্ব্বাপণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। তাঁহারা যে অগ্নিবর্ষণের নির্ব্বাপণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন তাহা তাঁহাদিগের কাহারও কোন কথা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। উঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রত্যেক কথা হইতে বরং বিপরীত ভাব প্রতীয়মান হয়। উঁহাদিগের কথায় আপাতদৃষ্টিতে যতই বিপরীত ভাবের পরিচয় পাওয়া যাক্ না কেন, উঁহারা যদ্যপি সত্যসত্যই যুদ্ধ চালাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইতেন তাহা হইলে মানুষের মনস্তত্ত্বের নিয়মানুসারে উঁহাদিগের মুখে শান্তিস্থাপনের পরিকল্পনার কথা অথবা যুদ্ধের পরবর্ত্তী সংগঠন-সমূহের কথা শুনা যাইত না। শান্তিস্থাপনের পরিকল্পনার কথা এবং যুদ্ধের পরবর্ত্তী সংগঠনসমূহের কথা যুদ্ধসারথিগণের মুখে প্রকাশ্যভাবে আজকাল যেরূপ শুনা যাইতেছে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে কখনও সেইরূপভাবে শুনা যায় নাই। পাছে সৈনিকগণের যুদ্ধোৎসাহ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় সেই আশঙ্কায় আধুনিক যুদ্ধনিয়মানুসারে কোন পক্ষের যুদ্ধ-সারথিগণের পক্ষে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধবিরতির কোন কথা বলা চলে না, ইহা আমাদিগের অভিমত। ঐ কারণে তাঁহারা স্পষ্টভাবে যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নির্ব্বাপণের জন্য কোন উদ্‌গ্রীবতা দেখাইতে পারেন না। তথাপি তাঁহাদিগের মুখে যখন শান্তিস্থাপনের পরিকল্পনার কথা এবং যুদ্ধের পরবর্ত্তী সংগঠনের কথা নির্গত হইতেছে, তখন বুঝিতে হয় যে যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নির্ব্বাপণ তাঁহাদিগের কাম্য হইয়াছে। যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপণ করা যখন প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়, তখন উহা

ভাষায় লিখিত সেই ভাষা এক্ষণে মনুষ্যসমাজের প্রায় সকলেরই সম্পূর্ণভাবে অবোধ্য।

যে যে স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের অবয়বের, শক্তির ও প্রবৃত্তিসমূহের উৎপত্তি, অস্তিত্বরক্ষা ও বৃদ্ধিসমূহ স্বতঃই হইয়া থাকে, সেই সেই স্বাভাবিক নিয়মের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক বয়সের প্রত্যেক মানুষের অবয়বের মধ্যে স্বতঃই তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেক মানুষ যে তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হাত, পা ও লিঙ্গের দ্বারা কার্য্য করিতে স্বতঃই সক্ষম হইয়া থাকেন তাহার কারণ অবয়বমধ্যস্থিত ঐ তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা। অবয়বমধ্যস্থিত ঐ তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা শৃঙ্খলাযুক্ত হইলে মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হাত, পা এবং লিঙ্গের কার্য্যসমূহও স্বতঃই শৃঙ্খলাযুক্ত হয়। মানুষের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির কার্য্যসমূহ শৃঙ্খলাযুক্ত হইলে তাঁহার মনুষ্যোচিত জীবন যাপন করা সম্ভবযোগ্য হয়। অবয়বমধ্যস্থিত তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা যত অধিক শৃঙ্খলাযুক্ত হয় মানুষের মনুষ্যত্বও তত বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমে ক্রমে মানুষের পক্ষে মহামানুষ হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়।

অবয়বমধ্যস্থিত ঐ তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা শৃঙ্খলাহীন অথবা বিশৃঙ্খল হইলে মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হাত, পা এবং লিঙ্গের কার্য্যসমূহও স্বতঃই শৃঙ্খলাহীন অথবা বিশৃঙ্খল হইয়া থাকে। মানুষের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির কার্য্যসমূহ শৃঙ্খলাবিহীন অথবা বিশৃঙ্খল হইলে তাহার মনুষ্যোচিত জীবন যাপন করা অসম্ভব হয় এবং মানুষের পশুত্বের উৎপত্তি হয়। অবয়বমধ্যস্থ তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা যত অধিক শৃঙ্খলাহীনতা অথবা বিশৃঙ্খলযুক্ত হয়, মানুষের পশুত্ব এবং শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যাভাব অথবা ব্যাধি তত অধিক বৃদ্ধি পায়। মানুষের শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়সমূহের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির স্বাস্থ্যাভাব অথবা ব্যাধি এবং পশুত্বের বৃদ্ধি পাইলে মানুষের জীবন দুঃখভাবাক্রান্ত হয় এবং ক্রমশঃ মানুষ মনুষ্যাকারে পশু হইয়া থাকেন।

যে যে স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের অবয়বমধ্যস্থিত তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা শৃঙ্খলাযুক্ত হইতে পারে ও হইয়া থাকে, সেই সেই স্বাভাবিক নিয়মের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের অবয়বের মধ্যে যেরূপ তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা স্বতঃই বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের প্রত্যেক অংশে, জলভাগের প্রত্যেক অংশে এবং স্থলভাগের প্রত্যেক অংশেও তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা স্বতঃই সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে।

উপরোক্ত স্বাভাবিক নিয়মসমূহের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে ইহা ছাড়া আরও তিন শ্রেণীর ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :

(১) মানুষের অবয়বমধ্যস্থ তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা নিকটবর্ত্তী আকাশ-বাতাসের চলৎশীলতার সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত এবং নিকটবর্ত্তী আকাশ-বাতাসের চলৎশীলতা জলভাগের ও স্থলভাগের চলৎশীলতার সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

(২) আকাশ-বাতাসের চলৎশীলতায় অথবা জলভাগের চলৎশীলতায় অথবা স্থলভাগের চলৎশীলতায় কোন শ্রেণীর শৃঙ্খলাহীনতার উদ্ভব হইলে মানুষের অবয়বের অভ্যন্তরস্থ তিন শ্রেণীর চলৎশীলতার শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হয় এবং মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হাত, পা ও লিঙ্গের কার্য্যসমূহের শৃঙ্খলাহীন হওয়া অনিবার্য্য হয়।

(৩) আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের চলৎশীলতায় কোন শ্রেণীর শৃঙ্খলাহীনতার উদ্ভব না হইলেও মানুষের অবয়বের অভ্যন্তরস্থ তিন শ্রেণীর চলৎশীলতার শৃঙ্খলা নষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু উহার পুনরুদ্ধার করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। প্রত্যেক শ্রেণীর যুদ্ধবশতঃ যে মানব-সমাজের দীর্ঘস্থায়ী কুফল হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহার কারণ প্রত্যেক শ্রেণীর যুদ্ধে ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলভাগের এবং স্থলভাগের প্রত্যেক অংশের যুগপৎভাবে চলৎশীলতার অল্পবিস্তর শৃঙ্খলাহীনতার উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

আকাশ-বাতাসের, জলভাগের এবং স্থলভাগের প্রত্যেক অংশের স্বাভাবিক চলৎশীলতায় শৃঙ্খলা-হীনতার উদ্ভব হইলে দুই শ্রেণীর কু-ফলোদয় হওয়া অনিবার্য্য হয়। একদিকে মানব-সমাজের প্রত্যেক মানুষের অবয়বস্থ স্বাভাবিক চলৎশীলতার অল্লাধিক শৃঙ্খলা-হীনতার উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। অন্যদিকে স্থলভাগের ভূমিজাত কাঁচামালসমূহ উৎপাদন করিবার ও জলভাগের জলজাত কাঁচামালসমূহ উৎপাদন করিবার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হওয়া এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অত্যধিক উষ্ণতা, অত্যধিক শীতলতা, স্বাভাবিক জলাশয়সমূহের শুষ্কতা, অত্যধিক জল-প্লাবন, ভূমিকম্প, অত্যধিক বজ্রপাত ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়।

মানুষের অবয়বস্থ চলৎশীলতার শৃঙ্খলাহীনতা হইলে মানুষের শরীরের স্বাস্থ্যাভাব, ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য, মনের স্থিরতার অভাব ও বুদ্ধির অভাব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

স্থলভাগের ভূমিজাত কাঁচামালসমূহ উৎপাদন করিবার ও জলভাগের জলজাত কাঁচামালসমূহ উৎপাদন করিবার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইলে মানুষের আহার-বিহারের সামগ্রীর প্রাচুর্য্য কমিয়া যাওয়া এবং ক্রমশঃ অভাব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অত্যধিক উষ্ণতা, অত্যধিক শীতলতা, নদী প্রভৃতি স্বাভাবিক জলাশয়সমূহের শুষ্কতা, অত্যধিক জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, অত্যধিক বজ্রপাত এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম হইতে আরম্ভ করিলে অধিকাংশ মানুষের জীবন আকস্মিক দুর্ঘটনাময় ও সর্ব্বদা বহুবিধ ভয়ের আশঙ্কাময় হওয়া অনিবার্য্য হয়।

উপরোক্তভাবে যে কোন শ্রেণীর যুদ্ধের ফলে মানবসমাজের অধিকাংশ মানুষের স্থায়ী ভাবে স্বাস্থ্যাভাব হওয়া, ধনাভাব হওয়া এবং জীবন আকস্মিক দুর্ঘটনাময় ও সর্ব্বদা বহুবিধ ভয়ের আশঙ্কাময় হওয়া অনিবার্য্য হয়।

যুদ্ধ যখন আকাশে, জলে ও স্থলে ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করে তখন মানুষের স্বাস্থ্যাভাব, ধনাভাব এবং জীবনের আশঙ্কা-ময়তা অধিকতর ব্যাপক ও তীব্র হওয়া উপরোক্ত কারণে অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল-পরিব্যাপ্ত যুদ্ধের ফলে যে উপরোক্ত স্থায়ী ভাবের কুফল সমূহ অনিবার্য্য হয় তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মানব-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা।

বর্ত্তমান যুদ্ধের আরম্ভ হওয়া অবধি আমাদিগের মতবাদানুসারে সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক দেশে অধিকাংশ পরিবারে ব্যাধি ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রত্যেক দেশেই অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, নদীসমূহের শুষ্কতার আধিক্য, জলপ্লাবনের আধিক্য, বজ্রপাতের আধিক্য, কখনও উষ্ণতার আধিক্য, আবার কখনও শীতলতার আধিক্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন কোন স্থানে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারও দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের আরম্ভ হওয়া অবধি যে উপরোক্ত পরিবর্ত্তনসমূহ সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক দেশে দেখা দিয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আমাদিগের বিচারানুসারে আকাশভাগ, জলভাগ এবং স্থলভাগ-পরিব্যাপ্ত বর্ত্তমান যুদ্ধ ঐ সমস্ত পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। আকাশ, জল ও স্থল-পরিব্যাপ্ত যুদ্ধ তীব্রতার সহিত চলিতে থাকিলে আকাশ, জল ও স্থলের অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক চলৎশীলতার শৃঙ্খলা কতদূর পর্য্যন্ত নষ্ট হওয়া এবং ঐ শৃঙ্খলা নষ্ট হইলে মানবসমাজের অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্যাভাব, ধনাভাব ও বিপদা-কুলতা কতদূর পর্য্যন্ত স্থায়ী ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের জানা নাই বলিয়া আমাদিগের বিচারানুসারে এতাদৃশ যুদ্ধ আর চলিতে থাকিলে মানুষের অবস্থা যে কোথায় উপনীত হইতে পারে, তাহা আজকালকার অনেকেই সম্পূর্ণভাবে অনুমান করিতে পারেন না।

বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নির্ব্বাপণ নিরাপদভাবে সাধন করা বর্ত্তমান মানবসমাজের সারথিগণের পক্ষে দুঃসাধ্য—ইহা আমরা মনে করি কেন, আমরা অতঃপর তাহার ব্যাখ্যা করিব।

বর্ত্তমান মানবসমাজের সারথিগণ বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ আদৌ নির্ব্বাপণ করিতে পারেন না—ইহা আমরা মনে করি না। দুই পক্ষের কোন পক্ষই উহা নিরাপদভাবে নির্ব্বাপণ করিতে পারেন না, ইহা আমরা মনে করি।

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নিরাপদ ভাবে নির্ব্বাপণ করিতে হইলে বর্ত্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ যাহাতে আর না হয় এবং প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হয়—এই দুইটী ব্যবস্থা যুগপৎভাবে সাধন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

আমাদিগের বিচারানুসারে এই দুইটী ব্যবস্থা যুগপৎভাবে সাধিত না হইলে অন্য কোন উপায়ে বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নিরাপদ ভাবে নির্ব্বাপণ করা সম্ভবযোগ্য নহে।

আমাদিগের মতবাদানুসারে এই দুইটী ব্যবস্থার একটী ব্যবস্থাও সাধন করা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সাধ্যান্তর্গত নহে এবং সেই হিসাবে উহাদের কোনটীই দুই পক্ষের কোন পক্ষের যুদ্ধ-সারথিগণের দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে।

তাহা ছাড়া দুই পক্ষ যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপণ করিবার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন সেই পন্থায়, আমাদিগের বিচারানুসারে, বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপিত হওয়া সম্ভব-যোগ্য নহে। প্রত্যেক পক্ষই বিপক্ষকে বলপূর্ব্বক সন্ধিপ্রার্থী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

মানবসমাজে ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত যুদ্ধ হইয়াছে, সেই সমস্ত যুদ্ধে এক পক্ষকে বলপূর্ব্বক সন্ধিপ্রার্থী করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু এক্ষণে মানবসমাজ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান যুদ্ধে, আমাদিগের বিচারানুসারে, উহা সম্ভবযোগ্য হইবে না।

আমাদিগের বিচারানুসারে যুগপৎভাবে উপরোক্ত যে দুইটী ব্যবস্থা সাধন করিলে যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইতে পারে, সেই দুইটী ব্যবস্থা সাধন করিবার উদ্যোগ না করিয়া যে পদ্ধতিতে ঐ অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপিত করা সম্ভবযোগ্য নহে, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধ আরও দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, দুই পক্ষের কোন পক্ষই বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নিরাপদভাবে নির্ব্বাপণ করিতে সক্ষম নহেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপণ করিতে হইলে প্রথমতঃ, বর্ত্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ যাহাতে আর না হয় এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হয়—এই দুইটী ব্যবস্থা যুগপৎভাবে সাধন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়, তাহার কারণ দুই শ্রেণীর।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হয় তাহার ব্যবস্থা না করিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপণ করিলেই যুদ্ধের দলভগ্ন সৈনিকগণের দারিদ্র্য ও অভাব অবশ্যম্ভাবী হইবে এবং উহাদিগের দারিদ্র্য ও অভাব অবশ্যম্ভাবী হইলে প্রত্যেক দেশে ব্যাপকভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হওয়া এবং শাসক-সম্প্রদায়ের জীবন বিপন্ন হওয়া, আমাদিগের বিচারানুসারে, অনিবার্য্য হইবে।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে, বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপণের পর দলভগ্ন সৈনিকগণের কোন উপদ্রব যাহাতে না হইতে পারে তাহা করিবার জন্য অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপণ করিবার আগে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হইতে পারে তাহার সংগঠন করা অপরিহার্য্য-ভাবে প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়তঃ, মানবসমাজ এক্ষণে যে শ্রেণীর দারিদ্র্য ও অভাবের অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে তাহাতে আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ যাহাতে আর না হয় তাহার ব্যবস্থা নির্ভরযোগ্যভাবে সাধিত না হইলে দুই পক্ষের কোন পক্ষই স্বেচ্ছায় বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপণ করিতে স্বীকার করিতে পারেন না। এবং দুই পক্ষ স্বেচ্ছায় অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপিত করিতে স্বীকৃত না হইলে এতাদৃশ যুদ্ধের

অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। এই যুদ্ধ দুই পক্ষই স্ব স্ব অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া চালাইতেছেন। এই যুদ্ধে দুই পক্ষের যে-পক্ষ পরাজিত হইবেন সেই পক্ষেরই অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। এই শ্রেণীর আর কোন যুদ্ধের পরিচয় মানবসমাজের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই কারণে আমরা মনে করি যে, দুই পক্ষ স্বেচ্ছায় অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপিত করিতে স্বীকৃত না হইলে, একপক্ষের পরাজয় দ্বারা এই যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। এবং মানবসমাজে যুদ্ধ যাহাতে আর না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা নির্ভরযোগ্যভাবে সাধিত না হইলে দুই পক্ষের কোন পক্ষই স্বেচ্ছায় অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপণ করিতে পারেন না। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর যুক্তি বশতঃ আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নিরাপদভাবে নির্ব্বাপণ করিবার একমাত্র পথ উপরোক্ত অভাব ও যুদ্ধ নিবারণ করিবার দুইটী ব্যবস্থা যুগপৎভাবে সাধন করা।

বর্ত্তমান যুদ্ধে দুইপক্ষের কোন পক্ষই যে অপর পক্ষকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপণ করিতে ও শান্তি-প্রার্থী হইতে বাধ্য করিতে পারেন না, তাহার প্রধান কারণ, আমাদিগের মতবাদানুসারে, মানবসমাজের বর্ত্তমান ধনগত দারিদ্র্য ও অভাবের অবস্থা। আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান মানব-সমাজ ধনগত দারিদ্র্য ও অভাবের চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। বর্ত্তমান মানবসমাজ যে ধনগত দারিদ্র্য ও অভাবের চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহা কোনদেশের শাসনসম্প্রদায় স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন না। তাঁহারা স্পষ্টভাবে উহা স্বীকার না করিলেও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি প্রকারান্তরে উহা স্বীকার না করিতেন তাহা হইলে প্রত্যেক দেশের শাসকসম্প্রদায়ের [illegible] দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার সংকল্পের কথা শুনা যাইত। [illegible] কোন দেশের শাসকসম্প্রদায় যে উহা [illegible] ভাবে স্বীকার করেন না তাহার প্রমাণ প্রত্যেক দেশের শাসন-বিবরণীর মন্তব্যসমূহ। যে কোন দেশের যে কোন বৎসরের শাসন-বিবরণী পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ঐ বিবরণী অনুসারে ঐ বৎসরে ঐ দেশে জনসাধারণের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ যে এক্ষণে দারিদ্র্যের ও অভাবের তীব্রাবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাহা শাসকসম্প্রদায় স্পষ্টভাবে স্বীকার করুন আর নাই করুন, উহা জনসাধারণ অস্বীকার করিতে পারেন না। আমাদিগের মতবাদানুসারে বর্ত্তমান যুদ্ধে দুই পক্ষেরই যে অভূত-পূর্ব্ব সংখ্যায় সৈনিক সংগ্রহ করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছে তাহা মানবসমাজের চূড়ান্ত দারিদ্র্য ও অভাবের অবস্থার নিদর্শন। বর্ত্তমান যুদ্ধে দুই পক্ষেরই সৈনিক সংগ্রহ যে অভূতপূর্ব্ব সংখ্যায় সাধিত হইয়াছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। "অনাহারে বাঁচিয়া থাকা আর মরিয়া যাওয়া এই দুই-ই সমান" এতাদৃশ মনোভাব ধনগত অভাবের ও দারিদ্র্যের তাড়নায় এত মানুষের মনে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে বলিয়া দুই পক্ষের এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব সংখ্যায় সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছে। সমাজমধ্যে দারিদ্র্যের, অভা-বের ও অনাহারের তীব্রতা না থাকিলে বলপূর্ব্বক মানুষকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার কার্য্যে যোগদান করান সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না। মানুষের অভাব ও দারিদ্র্য না থাকিলে তাহাদিগকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার কার্য্যে যোগদান করিতে প্রলুব্ধ করা যায় না। বলপূর্ব্বক অথবা ভীতি প্রদর্শন করাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার কোন কার্য্যে যোগদান করাইতে না পারিলে বিদ্রোহের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। মানবসমাজে এতাদৃশ দারিদ্র্য ও অভাবের উদ্ভব হওয়ায় দুই পক্ষেরই অভূতপূর্ব্ব সংখ্যায় সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছে এবং দুই পক্ষই অতর্কিতভাবে টলটলায়মান স্ব-স্ব অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া আসুরিক বলের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন।

উপরোক্ত কারণে কোন পক্ষকে বলপূর্ব্বক সন্ধি প্রার্থী করান অথবা অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপণ করিতে বাধ্য করান সম্ভবযোগ্য নহে—ইহা আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

মানবসমাজের ইতিহাসে এই যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী যে সমস্ত যুদ্ধের ইতিহাস পাওয়া যায় সেই সমস্ত যুদ্ধের অধিকাংশেরই মূলে আমাদিগের বিচারানুসারে, হয় ধর্ম্মান্ধতা, নতুবা কামান্ধতা, নতুবা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, নতুবা ঐশ্বর্য্যের ও আধিপত্যের প্রসার সাধন। এই যুদ্ধের পশ্চাতে মানুষের যে শ্রেণীর ধনগত দারিদ্র্য ও অভাব বিদ্যমান আছে সেই শ্রেণীর ধনগত দারিদ্র্য ও অভাব ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন যুদ্ধের পশ্চাতে বিদ্যমান ছিল না। বিচার করিয়া দেখিলে আমাদিগের এই কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব রকমের ধনগত দারিদ্র্য ও অভাব বশতঃ এ বর্ত্তমান যুদ্ধ অভূতপূর্ব্ব রকমের ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করিয়াছে।

"বর্ত্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ যাহাতে আর না হয় তাহার ব্যবস্থা নির্ভরযোগ্যভাবে সাধিত না হইলে অন্য কোন উপায়ে এই যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নির্ব্বাপিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে"—ইহা যে আমরা মনে করি তাহারও কারণ মানবসমাজের বর্ত্তমান দারিদ্র্য ও অভাবের অবস্থা।

আমাদিগের মতবাদানুসারে মানবসমাজে মানুষের এই যুদ্ধের প্রবৃত্তি ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ না করিলে মানুষের দারিদ্র্যের ও অভাবের ব্যাপকতা ও তীব্রতা হওয়া কখনও সম্ভব-যোগ্য হয় না। মানব-সমাজে প্রথমে সামাজিক সংগঠনের দোষ বশতঃ তৃপ্তিগত, সম্মানগত এবং প্রতিষ্ঠাগত দারিদ্র্যের ও অভাব উদ্ভব হয় এবং তাহার পরে ক্রমে ক্রমে সামাজিক সংগঠনের দুষ্টতাবশতঃ ঐ তৃপ্তিগত, সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত দারিদ্র্য অভাব কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত স্বতঃই ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করে। তৃপ্তিগত, সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত দারিদ্র্য ও অভাব কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করিলে মানুষের দলগত প্রবৃত্তিও তীব্রভাবে জাগ্রত হয় এবং মানুষ স্থানগত সঙ্ঘ গঠন করিতে আরম্ভ করেন। এই স্থানগত সঙ্ঘসমূহের নাম হয় এক একটী দেশের এক একটী জাতি। মানুষের স্থানগত সঙ্ঘস্থাপন কার্য্য অগ্রসর লাভ করিলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহের

প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবৃত্তি তীব্রতা লাভ করে এবং তখন ক্রমে ক্রমে সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং একটীর পর একটা করিয়া যুদ্ধ হইতে থাকে। মানব-সমাজে যুদ্ধের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, মানুষের সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত দারিদ্র্য ও অভাব তত ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করিতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে মানুষের বুদ্ধির, মনের, ইন্দ্রিয়ের ও শরীরের স্বাস্থ্যগত দারিদ্র্য ও অভাব এবং অবশেষে ধনগত দারিদ্র্য ও অভাব আসিয়া দেখা দেয়।

উপরোক্তভাবে প্রতিনিয়ত যুদ্ধের ফলে যখন পণ্যের (অর্থাৎ আহার-বিহারের সামগ্রীর) অভাব ও দারিদ্র্য মনুষ্যসমাজে তীব্রতা ও ব্যাপকতা লাভ করে, তখন স্বভাবের নিয়মে মানুষ স্বতঃই অতর্কিতভাবে যুদ্ধ যাহাতে আর না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন।

আমাদিগের বিচারানুসারে মানবসমাজ বর্ত্তমানে উপরোক্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন এবং যুদ্ধজাত ধনগত দারিদ্র্য ও অভাববশতঃ অতর্কিতভাবে বর্ত্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ যাহাতে আর না হয় তাহার ব্যবস্থার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন।

মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাবসমূহ এবং মনুষ্যসমাজের যুদ্ধসমূহ দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন করিতে হইলে যে সমস্ত বিজ্ঞান অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় সেই সমস্ত বিজ্ঞান যে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে পাওয়া যায় না তাহা আমরা [illegible] বিষয়ক আলোচনায় দেখাইব।

প্রথমতঃ, বর্ত্তমান যুদ্ধে কোন পক্ষকে বলপূর্ব্বক সম্যক্ ভাবে পরাজিত করা অথবা সন্ধিপ্রার্থী হইতে বাধ্য করা সম্ভবযোগ্য নহে কেন এবং দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমান যুদ্ধের অনিবার্য্য [illegible] করিতে হইলে মানুষের ব্যক্তিগত [illegible] ও [illegible] সমাজের যুদ্ধ দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় কেন—এই দুইটী বিষয়ে আমরা যে সমস্ত কথা বলিয়াছি সেই সমস্ত কথা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান [illegible] যে বর্ত্তমান যুদ্ধমান [illegible] করিয়াছেন সেই পন্থায় উহার আমূল [illegible] নির্ব্বাপণ হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে।

ইহারই জন্য, যদিও বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নির [illegible] নির্ব্বাপণ করা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের বাঞ্ছা ও প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি ইহা [illegible] মানুষের পক্ষে অনায়াসসাধ্য নহে, পরন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ-[illegible] অসাধ্য—ইহা আমরা মনে করি। বর্ত্তমান যুদ্ধের [illegible] নিরাপদভাবে নির্ব্বাপণ করিবার ব্যবস্থা করা যে বর্ত্তমান [illegible] সমাজের একটী প্রধান সমস্যা তাহাও উপরোক্ত কারণে স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

বর্ত্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবার ব্যবস্থাকে সমস্যা মনে করিবার যুক্তিবাদ

আমাদিগের মতবাদানুসারে মানবসমাজে যুদ্ধ যাহাতে আর না হয় তাহার ব্যবস্থার কথা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে এবং ঐ ব্যবস্থা মানুষের মনুষ্যোচিত অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া শান্তিতে জীবন যাপন করিতে হইলে অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। মানবসমাজে যুদ্ধ যাহাতে আর না হয় তাহার ব্যবস্থা আমাদিগের মতবাদানুসারে মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে এবং উহা মানুষের প্রয়োজনীয়ও বটে কিন্তু ঐ ব্যবস্থা সাধন করা বর্ত্তমান মানবসমাজের পক্ষে অনায়াসসাধ্য নহে। উহা মানুষের কাম্য এবং প্রয়োজনীয় অথচ অনায়াসসাধ্য নহে—এই কারণে আমরা ঐ ব্যবস্থাকে একটী সমস্যার বিষয় বলিয়া মনে করি।

বর্ত্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ যাহাতে মানব-সমাজে আর না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা যে বর্ত্তমান মানব-সমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছে, তাহা এই যুদ্ধ-প্রবৃত্ত দুই পক্ষের সারথিগণের মুখ হইতে আজকাল এই সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা নির্গত হইতেছে সেই সমস্ত কথা লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ যাহাতে মানব-সমাজে আর না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা আমাদিগের মতবাদানুসারে বর্ত্তমান মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের কেবলমাত্র যে সাধারণভাবে একটী ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে তাহা নহে। উহা তাঁহাদিগের তীব্র ইচ্ছার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের তীব্র ইচ্ছার বিষয় না হইলে মনুষ্য-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধ যাহাতে মানবসমাজে আর না হয় তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে উঠিতে পারিত না। বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের অধিকাংশ পরিগৃহীত মতবাদানুসারে মানুষের সমাজ থাকিলেই মানুষের পরস্পরের মধ্যে [illegible] অনিবার্য্য হইয়া থাকে। এই মতবাদানুসারে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে যুদ্ধবিজ্ঞানের বিকাশ (development) সাধন করিয়াছেন। এতাদৃশ মতবাদ ও যুদ্ধবিজ্ঞানের বিকাশের প্রবৃত্তি সত্ত্বেও যে, যুদ্ধ যাহাতে মানবসমাজে আর না হয় তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যখন কথা উঠিতে পারিয়াছে, তখন আমাদিগের বিচারানুসারে ঐ কথার উত্থাপন হইতে ইহা বুঝিতে হয় যে, যুদ্ধ নিবারণ করিবার ইচ্ছা [illegible] প্রয়োজনীয়তাবোধ বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজে তীব্রাকার ধারণ করিয়াছে।

আমাদিগের মতবাদানুসারে যাঁহারা মনে করেন যে, মনুষ্য-সমাজ থাকিলেই মানুষের পরস্পরের মধ্যে [illegible] অনিবার্য্য হয় এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য নহে তাঁহাদিগের মতবাদ সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত নহে। মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির মধ্যে যুদ্ধের প্রবৃত্তি স্বভাবের নিয়মে স্বতঃই অজ্ঞাতসারে জাগ্রত থাকে বটে, কিন্তু যেমন যুদ্ধের প্রবৃত্তি স্বভাবের নিয়মে স্বতঃই অজ্ঞাতসারে জাগ্রত থাকে, সেইরূপ যুদ্ধ নিবৃত্ত করিবার প্রবৃত্তিও স্বভাবের নিয়মে স্বতঃই অজ্ঞাতসারে জাগ্রত থাকে।

মানুষের যুদ্ধ নিবৃত্তি করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জাগ্রত করিতে হইলে উহার জন্য সামাজিক সংগঠন করিবার প্রয়োজন হয়। ঐ

সামাজিক সংগঠন সাধিত না হইলে মানুষের স্বাভাবিক যুদ্ধ-প্রবৃত্তি দূর করা অথবা নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না এবং যুদ্ধ-প্রবৃত্তির জাগরণ অবশ্যম্ভাবী হয়। অন্যদিকে উপরোক্ত সামাজিক সংগঠন সাধিত হইলে মানুষের স্বাভাবিক যুদ্ধ-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হওয়া ও নিবারিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়।

যুদ্ধ নিবারণ করিবার ইচ্ছার পরিচয় যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন যুদ্ধ নিবারণ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথাও যে অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান মানবসমাজ বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা স্থির করিতে হয়।

যুদ্ধ নিবারণ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা কিছু না কিছু বর্ত্তমান মানবসমাজ যে বুঝিতে পারিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বটে কিন্তু আমাদিগের বিচারানুসারে যুদ্ধ মানুষের মনুষ্যোচিত অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া সুখে জীবন যাপন করিতে হইলে সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিবার সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি, তাহা আধুনিক মনুষ্যসমাজ এখনও বুঝিতে সক্ষম হন নাই।

আমাদিগের মতবাদানুসারে মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া ও দূর করিয়া মনুষ্যত্ব জাগ্রত করিতে হইলে এবং প্রকৃত মনুষ্যোচিত সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করিতে হইলে মনুষ্য-সমাজে যাহাতে যুদ্ধ না হইতে পারে তাহার সংগঠন করা অপরি-অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়। মনুষ্যসমাজে যাহাতে যুদ্ধ না হইতে পারে তাহার সংগঠন বিদ্যমান থাকিলে কোন দেশের কোন মানুষের আকৃতি ভীতিপ্রদ অথবা কুৎসিত, কাহারও কোন ইন্দ্রিয়, কোন অঙ্গ দুর্ব্বল, কাহারও মন কোনরূপ অস্থিরতা এবং কাহারও বুদ্ধি দুষ্টতাযুক্ত হইতে পারে না। কোন দেশের কোন মানুষের ধনাভাব অথবা প্রতিষ্ঠার অভাব অথবা সম্মানের অভাব অথবা জ্ঞানতৃষ্ণা-পূরণের ব্যবস্থার অভাব হইতে পারে না।

অন্যদিকে ঐ সংগঠন বিদ্যমান না থাকিলে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের আকৃতি অল্পাধিক কুৎসিত অথবা ভীতি-প্রদ হওয়া, ইন্দ্রিয়সমূহের অল্পাধিক দৌর্ব্বল্য হওয়া, মনের অল্পাধিক অস্থিরতা হওয়া, বুদ্ধির অল্পাধিক দুষ্টতা হওয়া, ধনের অল্পাধিক অভাব হওয়া, জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহে অস্থায়িত্বের, অসম্মানের ও অসন্তুষ্টির অল্পাধিক আশঙ্কা থাকা, এবং জ্ঞানের বিকৃতি ঘটা অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

আমাদিগের মতবাদানুসারে মনুষ্যসমাজে যুদ্ধ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার সংগঠন বিদ্যমান থাকিলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে পশুত্বের লেশহীন মানুষ হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়। আর ঐ সংগঠন না থাকিলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে পশুত্বযুক্ত মানুষ হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়।

উপরোক্ত হিসাবে মনুষ্যসমাজের যুদ্ধ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার সংগঠন যতখানি প্রয়োজনীয় তাহা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজ বিদিত নহেন—ইহা আমরা মনে করি। ঐ কারণে আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, মনুষ্যসমাজের যুদ্ধ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার সংগঠনের যাহা মূল প্রয়োজন, তাহা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজ অনুমান করিতে পারেন না।

মানবসমাজে যুদ্ধ যাহাতে আর না হইতে পারে তাহার সংগঠন করা, আমাদিগের মতবাদানুসারে যে বর্ত্তমান মানবসমাজের অনায়াসসাধ্য নহে, তাহার প্রধান কারণ ঐ সংগঠন সাধন করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর জ্ঞানের প্রয়োজন, বর্ত্তমান মানবসমাজে বিজ্ঞানের অপূর্ণতার জন্য সেই সেই শ্রেণীর জ্ঞানের প্রত্যেকটির অভাব বিদ্যমান আছে। মানবসমাজে যুদ্ধ যাহাতে আর না হইতে পারে তাহার সংগঠন করিতে হইলে কোন মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে কোন শ্রেণীর মারামারির অথবা যুদ্ধের প্রবৃত্তি যাহাতে উদ্ভূত অথবা অবাধে বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে—তাহার সংগঠন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। কোন মানুষের ব্যক্তিগতভাবে মারামারির অথবা যুদ্ধের প্রবৃত্তি যাহাতে উদ্ভূত হইতে অথবা অবাধে বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে—তাহার সংগঠন করিতে হইলে কোন মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে যাহাতে দ্বেষ, হিংসা এবং দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি উদ্ভূত হইতে অথবা অবাধে বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে তাহার সংগঠন করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হয়। কোন মানুষের ব্যক্তিগতভাবে দ্বেষ, হিংসা এবং দ্বন্দ্বকলহের প্রবৃত্তি যাহাতে উদ্ভূত—ও অবাধে বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে তাহার সংগঠন করিতে হইলে কোন মানুষের ব্যক্তিগতভাবে শরীরের, স্বাস্থ্যের অথবা কোন ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যের অথবা মনের স্বাস্থ্যের অথবা বুদ্ধির স্বাস্থ্যের অথবা প্রয়োজনীয় ধনের (অর্থাৎ আহার-বিহারের সামগ্রীর) অথবা প্রতিষ্ঠার অথবা যোগ্য সম্মানের অথবা তৃপ্তির অথবা প্রয়োজনীয় বিদ্যার যাহাতে কোনরূপ অভাব না হইতে পারে তাহার সংগঠন করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়। কোন মানুষের ব্যক্তিগতভাবে উপরোক্ত অভাব-সমূহের কোনটী যাহাতে উদ্ভূত না হইতে পারে তাহা করিতে হইলে মানুষের ব্যক্তিগত অবয়বের, আকাশ-বাতাসের, ভূমণ্ডলের জলভাগের এবং স্থলভাগের কোন অংশে যাহাতে সেই অংশের স্বভাবজাত চলৎশীলতাসমূহের কোনরূপ শৃঙ্খলাহীনতার উদ্ভব হইতে না পারে তাহার সংগঠন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। মানুষের ব্যক্তিগত অবয়বের, আকাশ-বাতাসের, ভূমণ্ডলের জলভাগের এবং ভূমণ্ডলের স্থলভাগের কোন অংশে সেই অংশের স্বভাবজাত চলৎশীলতাসমূহের কোনরূপ শৃঙ্খলাহীনতার উদ্ভব যাহাতে না হইতে পারে তাহার সংগঠন করিতে হইলে স্বভাবজাত পদার্থসমূহের অবয়বে স্বতঃই চলৎশীলতাসমূহের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন হয় স্বভাবের যে যে নিয়মে সেই সেই নিয়মের সহিত পরিচিত হওয়া অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

উপরোক্ত হিসাবে মানবসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিবারিত ও দূরীভূত করিতে হইলে চারিশ্রেণীর বিদ্যা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হয়, যথা:

(১) মানুষের মারামারির ও যুদ্ধের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে নিবারিত করিবার ও দূরীভূত করিবার সংগঠনের বিদ্যা।

(২) মানুষের দ্বেষ-হিংসার ও দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে নিবারিত করিবার ও দূরীভূত করিবার সংগঠনের বিদ্যা ;

(৩) মানুষের শরীরের স্বাস্থ্যের, ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্যের, মনের স্বাস্থ্যের, বুদ্ধির স্বাস্থ্যের, প্রয়োজনীয় ধনের, যোগ্যতানুযায়ী সম্মানের, প্রতিষ্ঠার, তৃপ্তির এবং প্রয়োজনীয় বিদ্যার অভাব সর্ব্বতোভাবে নিবারিত করিবার ও দূরীভূত করিবার সংগঠনের বিদ্যা ;

(৪) মানুষের অবয়বের, আকাশ-বাতাসের, জলভাগের এবং স্থলভাগের অভ্যন্তরস্থিত স্বাভাবিক চলৎশীলতাসমূহের শৃঙ্খলাহীন হওয়ার আশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে নিবারিত করিবার ও দূরীভূত করিবার সংগঠনের বিদ্যা।

মানবসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধ* যাহাতে সর্ব্বতোভাবে নিবারিত ও দূরীভূত হইতে পারে তাহার সংগঠন সাধিত না হইলে কোন শ্রেণীর যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিবারিত ও দূরীভূত হইতে পারে না। সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিবারিত ও দূরীভূত করিবার সংগঠন একাধিক শ্রেণীর হইতে পারে না। মারামারির ও যুদ্ধের প্রবৃত্তি যাহাতে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হইতে পারে ও হয় তাহা করিতে না পারিলে অন্য কোন পন্থায় মানবসমাজের যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিবারিত ও দূরীভূত করা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের ব্যক্তিগত ভাবের মারামারির ও যুদ্ধের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে নিবারিত করিবার ও দূর করিবার পন্থা একটীর বেশী দুইটী হইতে পারে না ও হয় না।

মানুষের ব্যক্তিগত ভাবের দ্বেষ-হিংসার ও দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি যাহাতে নিবারিত ও দূরীভূত হইতে পারে তাহার সংগঠন সাধিত না হইলে অন্য কোন উপায়ে মানুষের ব্যক্তিগত ভাবের মারামারির ও যুদ্ধের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে নিবারিত করা ও দূরীভূত করা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের ব্যক্তিগত ভাবের দ্বেষ-হিংসার ও দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে নিবারিত করিবার ও দূর করিবার পন্থা একটীর বেশী দুইটী হইতে পারে না ও হয় না।

মানুষের ব্যক্তিগত সর্ব্ববিধ অভাব ও সর্ব্ববিধ অভাবের আশঙ্কা যাহাতে নিবারিত ও দূরীভূত হইতে পারে তাহার সংগঠন সাধিত না হইলে অন্য কোন উপায়ে মানুষের ব্যক্তিগত ভাবের দ্বেষ-হিংসার ও দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে নিবারিত করা ও দূরীভূত করা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের ব্যক্তিগত সর্ব্ববিধ অভাব ও সর্ব্ববিধ অভাবের আশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পন্থা একটীর বেশী দুইটী হইতে পারে না ও হয় না।

মানুষের ব্যক্তিগত অবয়বের, আকাশ-বাতাসের, জলভাগের ও স্থলভাগের অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক চলৎশীলতাসমূহের কোনরূপ শৃঙ্খলাহীনতা যাহাতে ঘটিতে না পারে তাহার সংগঠন সাধন করিতে না পারিলে অন্য কোন উপায়ে মানুষের ব্যক্তিগত সর্ব্ব শ্রেণীর অভাব ও তাহার আশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করা ও দূর করা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের ব্যক্তিগত অবয়বের, আকাশ-বাতাসের, জলভাগের ও স্থলভাগের অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক চলৎশীলতাসমূহের কোনরূপ শৃঙ্খলাহীনতা যাহাতে ঘটিতে না পারে—তাহার সংগঠন এক শ্রেণীর বেশী দুই শ্রেণীর হইতে পারে না ও হয় না।

মানবসমাজে যুদ্ধ যাহাতে আর না হইতে পারে, তাহার সংগঠন করিবার পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় চারিশ্রেণীর বিদ্যা সম্বন্ধে আমরা উপরে যে সমস্ত কথা বলিলাম, সেই সমস্ত কথার কোনটী কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না।

যে চারিশ্রেণীর বিদ্যা মানবসমাজে যুদ্ধ যাহাতে আর না হইতে পারে তাহার সংগঠন করিবার জন্য অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, সেই চারি শ্রেণীর বিদ্যার কোন শ্রেণীর বিদ্যাই আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান মানবসমাজে বিদ্যমান নাই। ঐ চারি শ্রেণীর বিদ্যার কোন শ্রেণীর বিদ্যাই যে বর্ত্তমান মানবসমাজে পাওয়া যায় না, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

প্রথমতঃ, ঐ চারি শ্রেণীর বিদ্যার কোন শ্রেণীর বিদ্যার সহিত বর্ত্তমান মানব-সমাজ পরিচিত নহেন; দ্বিতীয়তঃ, মানবসমাজের যুদ্ধ নিবারণ করিবার পন্থা একাধিক হইতে পারে না; এবং তৃতীয়তঃ, মানব-সমাজের যুদ্ধ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ-সারথিগণের মুখে যে সমস্ত কথা শুনা যাইতেছে, সেই সমস্ত কথা আমাদিগের মতবাদানুসারে যুক্তিবিহীন—এই তিন কারণে আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ত্তমান মানবসমাজের সারথিগণের দ্বারা মানব-সমাজে যুদ্ধ যাহাতে আর না হইতে পারে, তাহার পন্থা নির্দ্ধারিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে।

মানব-সমাজে যুদ্ধ যাহাতে আর না হইতে পারে, তাহার যে সমস্ত পরিকল্পনা যুদ্ধ-সারথিগণের মুখে শুনা যাইতেছে, সেই সমস্ত পরিকল্পনার প্রত্যেকটীর মধ্যে সমগ্র মানব-সমাজের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের কথা এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সামরিক বল বৃদ্ধি করিবার কথা আছে। মানবসমাজে যাহাতে যুদ্ধ আর না হইতে পারে, তাহা করিতে হইলে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা যে অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদিগের মতবাদানুসারে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সামরিক বল বৃদ্ধি করিবার আয়োজন থাকিলে, মানবসমাজের যুদ্ধ নিবারিত হওয়া ত' দূরের কথা, যুদ্ধ আরও বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী হইবে।

আমাদিগের মতবাদানুসারে যুদ্ধ যাহাতে আর না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে মানুষের মনস্তত্ত্বের নিয়মানুসারে ব্যক্তিগতভাবে কোন মানুষের যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তি যাহাতে না থাকে এবং পুনরায় না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্যভাবে

*যুদ্ধ প্রধানতঃ ছয়শ্রেণীর, যথা :—
(১) ধর্ম্মান্ধতা বশতঃ ধর্ম্মপ্রাধান্য স্থাপিত করিবার যুদ্ধ;
(২) কামান্ধতা বশতঃ কাম চরিতার্থ করিবার যুদ্ধ;
(৩) ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে কুজ্ঞান বশতঃ উপনিবেশ স্থাপনের—রাজ্যবিস্তারের ও বাজার বিস্তারের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার যুদ্ধ;
(৪) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে কুজ্ঞান বশতঃ প্রভুত্ব ও খ্যাতি লাভ করিবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার যুদ্ধ;
(৫) দারিদ্র্য ও অভাব বশতঃ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার যুদ্ধ;
(৬) অন্যায় দূর করিয়া ন্যায় প্রতিষ্ঠা করিবার যুদ্ধ।

প্রয়োজনীয়। যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তি যাহাতে না থাকে ও পুনরায় না হয়, তাহার ব্যবস্থা না থাকিলে, উপরোক্ত মনস্তত্ত্বের [illegible] যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয় এবং যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া সম্ভব হইলে যুদ্ধ ও মারামারি হওয়া সম্ভব হয় এবং অবস্থাবিশেষে অনিবার্য্য হয়। যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তি যাহাতে না থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া যদ্যপি যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তি যাহাতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে আমাদিগের বিচারানুসারে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া থাকে এবং ঐ ব্যবস্থায় যুদ্ধ নিবারিত করা কোনক্রমেই সম্ভবযোগ্য হয় না। আমাদিগের উপরোক্ত মতবাদানুসারে আমরা মনে করি যে, প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সামরিক বল বৃদ্ধি করিবার আয়োজন থাকিলে মনুষ্য-সমাজে যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তি যাহাতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে এবং তাহাতে পুনরায় যুদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য হইবে।

যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তি যাহাতে না থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা না করিয়া যদ্যপি যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তি যাহাতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে যে মানবসমাজের যুদ্ধ নিবারণ করা যায় না পরন্তু যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়—তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মানবসমাজের গত আড়াই হাজার বৎসরের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

মানবসমাজের গত আড়াই হাজার বৎসরের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে খৃষ্ট জন্মিবার সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে। খৃষ্ট জন্মিবার সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকগণের অভ্যুদয়কাল বিদ্যমান ছিল। গ্রীকগণের অভ্যুদয়কাল হইতে মানবসমাজের আড়াই হাজার বৎসরের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, সেই ইতিহাস আমাদিগের বিচারানুসারে একটী সুদীর্ঘ যুদ্ধের ইতিহাস। এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি জাতির উত্থান হইয়াছে এবং যখনই যে-জাতির উত্থান হইয়াছে তখনই সেই জাতির বিরুদ্ধে কতিপয় প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিরও উদ্ভব হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত উত্থানশীল জাতির পতন না ঘটিয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ উত্থানশীল জাতি এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ চলিয়াছে। সময় সময় ক্লান্তির জন্য এক পক্ষ আর এক পক্ষের নিকট সন্ধিপ্রার্থী হইয়াছেন এবং কিছুদিনের জন্য যুদ্ধের বিরতি ঘটিয়াছে কিন্তু আবার দুই পক্ষের যুদ্ধ চলিয়াছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত উত্থানশীল জাতির সর্ব্বতোভাবে পতন না ঘটিয়াছে ততদিন পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে স্থগিত হয় নাই। এইরূপভাবে একটী উত্থানশীল জাতির পতনের পর আর একটী জাতির উত্থান ঘটিয়াছে এবং আবার তাঁহার পতন ঘটিয়াছে। প্রত্যেক পরবর্ত্তী উত্থানশীল জাতি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী উত্থানশীল জাতির তুলনায় সমরবলের প্রসার সাধন করিয়া আসিতেছেন এবং প্রত্যেক পরবর্ত্তী যুদ্ধও পূর্ব্ববর্ত্তী যুদ্ধের তুলনায় অধিকতর বিস্তৃতি ও তীব্রতা লাভ করিয়া আসিতেছে। কোন জাতি কখনও মানুষের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি দূরীভূত ও নিবারিত করিবার জন্য কোনরূপ সংগঠন করেন নাই।

সমর-বলের প্রসার সাধন করিলে যদ্যপি মানবসমাজের যুদ্ধের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হইত তাহা হইলে আমাদিগের বিচারানুসারে মানবসমাজের বিভিন্ন জাতির পরস্পরের যুদ্ধের নিবৃত্তি অনেক দিন আগেই দেখা যাইত এবং উপরোক্তভাবে একটির পর একটি করিয়া এতাধিক সংখ্যক উত্থানশীল জাতির পতন ঘটিত না।

সমরবলের প্রসারসাধন করিলে যে মানবসমাজের যুদ্ধের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না পরন্তু যুদ্ধের বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা মানবসমাজের আড়াই হাজার বৎসরের উপরোক্ত ইতিহাস হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যুদ্ধের নিবৃত্তি সাধন করিতে হইলে যে যুদ্ধের প্রবৃত্তি নিবারণ করা প্রয়োজনীয়, তাহাও ঐ ইতিহাস হইতে বুঝা যায়।

মানবসমাজের যুদ্ধ নিবারণ করিবার পন্থা যদ্যপি একাধিক হওয়া সম্ভবযোগ্য হইত তাহা হইলে আমরা যে পন্থাটীকে মানবসমাজের যুদ্ধ নিবারণ করিবার পন্থা বলিয়া মনে করি, সেই পন্থা যুদ্ধ-সারথিগণের দ্বারা অবলম্বিত না হইলেও তাঁহাদিগের পরিকল্পনায় যুদ্ধের নিবৃত্তি হইলেও হইতে পারে ইহা মনে করা যাইত। কিন্তু একে মারামারি ও যুদ্ধের প্রবৃত্তির সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন সাধিত না হইলে অন্য কোন উপায়ে মানবসমাজের যুদ্ধনিবৃত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে এবং তাহার পর আবার যুদ্ধ-সারথিগণের পরিকল্পনায় যে পন্থার আভাস পাওয়া যায় সেই পন্থায় মারামারির ও যুদ্ধের প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হওয়া অনিবার্য্য।

তাহার পর আবার মারামারির ও যুদ্ধের প্রবৃত্তি নিবারণ করিবার ও দূর করিবার সংগঠন করিতে হইলে যে চারি শ্রেণীর বিদ্যা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়—সেই চারি শ্রেণীর বিদ্যার কোন শ্রেণীর বিদ্যাই বর্ত্তমান মানবসমাজে বিদ্যমান নাই। কাজেই মানবসমাজে যুদ্ধ যাহাতে আর না হয় তাহার ব্যবস্থা সাধন করা বর্ত্তমান মানবসমাজের পক্ষে অনায়াসসাধ্য নহে—ইহা মনে করা অপরিহার্য্য হইয়া থাকে।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, মানবসমাজে যুদ্ধ আর যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা সাধন করা মানুষের কাম্য এবং প্রয়োজনীয়, অথচ বর্ত্তমান মানবসমাজের পক্ষে উহা অনায়াসসাধ্য নহে—এই কারণে ঐ ব্যবস্থাকে আমরা বর্ত্তমান মানবসমাজের অন্যতম সমস্যা বলিয়া মনে করি।

মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থাকে সমস্যা মনে করিবার যুক্তিবাদ

মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থাকে আমরা যে বর্ত্তমান মানবসমাজের একটী সমস্যা বলিয়া মনে করি, তাহার কারণও তিন শ্রেণীর; যথা:

(১) মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে;

(২) ঐ ব্যবস্থা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাহাও অনেকে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ;

(৩) অথচ ঐ ব্যবস্থা করা যে কিরূপে সম্ভবযোগ্য তাহা কেহই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর কারণের বিদ্যমানতা বশতঃ মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ব্যবস্থাকে আমরা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের একটী সমস্যা বলিয়া মনে করি।

অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ইচ্ছা মানুষের অস্তিত্বের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। ব্যক্তিগত অভাব দূর করিবার ব্যবস্থা প্রত্যেক মানুষের চিরদিনই ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে। এই দিক দিয়া দেখিলে,—"মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে" এই কথাটী অর্থহীন হয়।

আমাদিগের বিচারানুসারে, যদিও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ইচ্ছা মানুষের অস্তিত্বের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, তথাপি মানুষের কোনরূপ অভাব না থাকিলে মানুষের মুখে অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কোন কথা উত্থিত হয় না। আমাদিগের মতবাদানুসারে সমগ্র মানবসমাজে একদিন এমন একটী অবস্থা বিদ্যমান ছিল যে, কোন দেশে কোন শ্রেণীর অভাবের কথা কাহারও মুখে শুনা যাইত না। মানবসমাজে যে-দিন এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল সেই দিনের কোন ইতিহাস—মানবসমাজে এক্ষণে যে ইতিহাস প্রচলিত আছে সেই ইতিহাসে স্থান পায় নাই।

মানবসমাজে যেদিন উপরোক্ত অভাবহীন অবস্থা বিদ্যমান ছিল, সেইদিন আধুনিক কালের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক কালের অবস্থা দেখিলে সমগ্র মানবসমাজে যে একদিন উপরোক্ত ভাবের অভাবহীন অবস্থা বিদ্যমান থাকা সম্ভবযোগ্য হইতে পারিয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। আজকালকার অনেকে হয়ত আমাদিগের এই কথাটীকে আমাদিগের কল্পনার নিদর্শন বলিয়া মনে করিবেন। যিনি যাহাই মনে করুন, আমাদিগের মতবাদানুসারে ছয় হাজার বৎসর আগে সমগ্র মানবসমাজ সর্ব্বশ্রেণীর অভাবের হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্তাবস্থায় বিদ্যমান ছিল। আমাদিগের এই মতবাদ এখনও অকাটাভাবে প্রমাণিত হইতে পারে।

মানুষের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের অভাব, প্রতিষ্ঠার অভাব, সম্মানের অভাব, তৃপ্তির অভাব ও জ্ঞানের অভাব আরম্ভ হইয়াছে গত ছয় হাজার বৎসর হইতে। যদিও ব্যক্তিগত উপরোক্ত স্বাস্থ্য প্রভৃতির অভাব গত ছয় হাজার বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি ধনের অভাব এই ভূমণ্ডলের কুত্রাপি এক হাজার বৎসর আগেও দেখা দেয় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত ধনের অভাব দেখা দেয় নাই ততদিন পর্য্যন্ত অভাবের জন্য কোন অভিযোগ মানবসমাজের কুত্রাপি উত্থিত হয় নাই। যত দিন পর্য্যন্ত ধনের অভাব দেখা দেয় নাই ততদিন পর্য্যন্ত কেবলমাত্র ধর্ম্মবিকৃতির অভিযোগ এবং ধর্ম্মসংস্কারের কথা মানবসমাজে উত্থিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট ও নবী মহম্মদ মানবসমাজের ধননীতির কোন সংস্কার সম্বন্ধে কোন কথা কহেন নাই ; ঐ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোন কথা কহিবার প্রয়োজন হয় নাই ; তাঁহাদিগের অভ্যুদয়কালে মানবসমাজের কুত্রাপি কোন শ্রেণীর ধনাভাবের অভিযোগ উত্থিত হয় নাই। ধনাভাবের অভিযোগ যে চিরদিন মানবসমাজে বিদ্যমান ছিল না তাহা বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট এবং নবী মহম্মদের সমসাময়িক মানবসমাজের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ধনাভাবের অভিযোগ মানবসমাজে গত এক হাজার বৎসর হইতে উত্থিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনও ঐ অভিযোগ কেবলমাত্র ইউরোপ ছাড়া ভূমণ্ডলের অন্যত্র স্থান পায় নাই। ঐ অভিযোগের বিস্তৃতি ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে নববিজ্ঞানের বাষ্প-শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহারের কাল হইতে অর্থাৎ গত সোয়াশত বৎসর হইতে। ঐ অভিযোগের তীব্রতা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে নববিজ্ঞানের বৈদ্যুতিক-শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহারের কাল হইতে অর্থাৎ গত ষাট বৎসর হইতে। মনুষ্যের ঐশ্বর্য্য বিধান করিবার এবং ঐ ঐশ্বর্য্যের সামঞ্জস্য বিধানের চিন্তা মনুষ্যসমাজে অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু মনুষ্যের অভাব দূর করিবার কোন উল্লেখযোগ্য চিন্তা, উল্লেখযোগ্য ভাবে আধুনিক মানবসমাজের কুত্রাপি বর্ত্তমান যুদ্ধের আগে স্থান পায় নাই। ঐ চিন্তার নিদর্শন বর্ত্তমান যুদ্ধের সারথিগণের মুখে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার এক বৎসরেরও অধিককাল পরে উল্লেখযোগ্যভাবে পাওয়া যাইতেছে। এই কারণে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এতদিন পরে যখন সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মনুষ্য দারিদ্র্য ও অভাবে জর্জ্জরিতপ্রায় হইয়াছেন তখন মহামান্য সারথিগণের মুখে উহা দূর করিবার জন্য কয়েকটা আধ-অস্পষ্ট কথা শুনা যাইতেছে। ঐ অস্পষ্ট কথা কয়েকটি শুনা যাইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি যে, মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে।

মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা যে প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে তাহা দেখিলে উহার প্রয়োজনীয়তাও যে অনেকেই অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা মনে করিতে হয়।

মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার জন্য কোন না কোন ব্যবস্থার যে প্রয়োজন আছে তাহা প্রত্যেক দেশের অনেক মানুষই অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু ঐ ব্যবস্থার প্রয়োজন যে কতখানি তাহা আমাদিগের মতবাদানুসারে এখনও মনুষ্যসমাজের কোন দেশের সারথিবৃন্দ যথাযোগ্য ভাবে অনুভব করিতে আরম্ভ করেন নাই। উহা যদি মনুষ্যসমাজের কোন দেশের সারথিবৃন্দ যথাযোগ্য ভাবে অনুভব করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের বিচারানুসারে মানবসমাজের কুত্রাপি কোন শ্রেণীর যুদ্ধ চলিতে পারে না।

আজকালকার প্রত্যেক দেশের বিজ্ঞান-বিশারদগণ, রাষ্ট্রনীতি বিশারদগণ এবং অর্থনীতি-বিশারদগণ প্রায়শঃ স্ব স্ব দেশের মানুষের ঐশ্বর্য্য এবং সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য নানাশ্রেণীর

পরিকল্পনার আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহই এমন কি স্ব স্ব দেশের মানুষের পর্য্যন্ত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার জন্য কোন পরিকল্পনার অথবা কোন সংগঠনের আলোচনা করেন না। ইঁহাদিগের কথা শুনিলে মনে হয় যে, ইঁহাদিগের মতবাদানুসারে, মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে কোন সংগঠন না করিলেও কেবলমাত্র মানুষের ঐশ্বর্য্য, সুখ ও শান্তি বিধান করিবার সংগঠন করিলেই মানুষের দারিদ্র্য ও দুঃখ স্বতঃই দূরীভূত ও নিবারিত হইতে পারে। মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশের সারথিবৃন্দের যে স্পষ্টভাবের সম্পূর্ণ ধারণা নাই, তাহার অন্যতম সাক্ষ্য—মানুষের ঐশ্বর্য্য ও সুখশান্তি সাধনের জন্য ঐ বিশারদগণের উপরোক্ত কার্য্য-প্রচেষ্টা।

আমাদিগের বিচারানুসারে মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যমূলক উল্লেখযোগ্যভাবের সংগঠন সাধিত না হইলে মানুষের ইচ্ছাসমূহের অথবা প্রয়োজনসমূহের পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না এবং ইচ্ছাসমূহের ও প্রয়োজনসমূহের সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য না হইলে মানুষের কোন শ্রেণীর প্রকৃত ঐশ্বর্য্য লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। প্রকৃত ঐশ্বর্য্য লাভ করা সম্ভবযোগ্য না হইলে প্রকৃত সুখ অথবা শান্তি লাভ করাও সম্ভবযোগ্য হয় না।

দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যমূলক সংগঠন সাধন না করিয়া ঐশ্বর্য্য ও সুখশান্তি সাধন করিবার সংগঠন সাধন করিবার চেষ্টা ভিত্তিহীন সৌধ নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টার অনুরূপ। আমাদিগের বিচারানুসারে মানুষের ঐশ্বর্য্য ও সুখশান্তি সাধন করিবার সংগঠন সাধন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্যভাবে মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন সাধন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। কোনরূপ সাধনা অথবা কার্য্য না করিয়া মানুষের পক্ষে স্ব স্ব প্রয়োজনের প্রাচুর্য্য স্বতঃই লাভ করা যদ্যপি স্বভাবের নিয়ম হইত তাহা হইলে আমাদিগের উপরোক্ত কথা যুক্তিবিরুদ্ধ হইত। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে কোনরূপ সাধনা অথবা কার্য্য না করিলে স্ব স্ব প্রয়োজনের প্রাচুর্য্য স্বতঃই সর্ব্বতোভাবে লাভ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না। স্ব স্ব প্রয়োজনের প্রাচুর্য্য স্বতঃই সর্ব্বতোভাবে লাভ করা ত' দূরের কথা, প্রত্যেক মানুষ স্বভাবের নিয়মে স্বতঃই লাভ করিয়া থাকেন—প্রত্যেক প্রয়োজনের বিষয়ে দারিদ্র্য ও অভাব। শিক্ষা ও সাধনা ছাড়া কোন বিষয়ক প্রাচুর্য্য স্বতঃই লাভ করা স্বভাবের নিয়মানুসারে কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না। সুচিন্তিত ও সুবিচারিত শিক্ষা ও সাধনার আশ্রয় লইতে পারিলে স্বভাবের নিয়মে প্রত্যেক প্রয়োজনের প্রাচুর্য্য মানুষের পক্ষে লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয়। শিক্ষা ও সাধনা ছাড়া কোন বিষয়ক প্রাচুর্য্য স্বতঃই লাভ করা স্বভাবের নিয়মানুসারে কোন মানুষের পক্ষে যে সম্ভবযোগ্য হয় না তাহার নিদর্শন বালকের অবস্থা। দরিদ্রের সন্তানই হউক আর ধনীর সন্তানই হউক, প্রত্যেক বালক পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য ও অভাবযুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন। সুচিন্তিত সুবিচারিত শিক্ষার ও সাধনার আশ্রয় না পাইলে প্রত্যেক বালক পূর্ণবয়স্ক হইয়া শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যের অভাবযুক্ত হইতে পারেন। প্রত্যেক বালকেরই প্রতিষ্ঠা, সম্মান, তৃপ্তি-শক্তি ও বিদ্যার অভাব থাকে।

সুচিন্তিত ও সুবিচারিত শিক্ষার ও সাধনার ব্যবস্থা না থাকিলে পূর্ণবয়স্ক হইলেও বালকগণের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির প্রাচুর্য্য লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষ যাহা যাহা আহার-বিহারের সামগ্রী বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহার কোনটী স্বতঃই ব্যবহারযোগ্যভাবে উৎপন্ন হয় না এবং শিক্ষা ও সাধনা ছাড়া কোনটী ব্যবহারযোগ্যভাবে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। যে-সমস্ত সামগ্রী স্বতঃই বন-জঙ্গলে উৎপন্ন হয় তাহার প্রত্যেকটীকে মানুষের ব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবার প্রয়োজন হয়, নতুবা প্রত্যেকটী স্বতঃই যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থা মানুষের ব্যবহারের অযোগ্যাবস্থা।

প্রত্যেক মানুষ স্বভাবের নিয়মে স্বতঃই যে প্রত্যেক বিষয়ে দারিদ্র্য ও অভাবযুক্ত হইয়া থাকেন এবং মানুষের ঐশ্বর্য্য, সুখ ও শান্তির বিধান করিতে হইলে যে উল্লেখযোগ্যভাবে মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার সংগঠন অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয় তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে মানুষের ঐশ্বর্য্য ও সুখ-শান্তি সাধন করিবার সংগঠন বিদ্যমান থাকিলেও মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার কোন উল্লেখযোগ্য সংগঠন যে কোন দেশে নাই তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

কাজেই ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা—যদিও প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তথাপি কোন দেশের সারথিগণ ঐ প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ ভাবে অনুভব করিতে পারিতেছেন না।

মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা যখন সারথিগণ সম্যক্‌ভাবে অনুভব করিতে আরম্ভ করিবেন, তখন আমাদিগের বিচারানুসারে মানবসমাজের কুত্রাপি কোনরূপ যুদ্ধ থাকিতে পারিবে না। পরন্তু সর্ব্বত্র সমস্ত জাতির পরস্পরের মধ্যে মিলনের প্রবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী হইবে। ইহার কারণ কোন মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে ও নিবারণ করিতে হইলে আমাদিগের মতবাদানুসারে সমগ্র মনুষ্যসমাজের মিলিত কার্য্য অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয় এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের মিলিত কার্য্য ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কোন মানুষের এমন কি ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করা অথবা নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্যক্‌ভাবে যদিও এখন পর্য্যন্ত মানবসমাজের সারথিগণের বুঝা সম্ভবযোগ্য হয় নাই, তথাপি ঐ

প্রয়োজনীয়তার কথা যে প্রত্যেক দেশের মানুষ অল্প সঠিকভাবে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ঐ প্রয়োজনীয়তার কথা প্রত্যেক দেশের মানুষ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত অভাব ও দারিদ্র্য সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার যে একটী-মাত্র পন্থা বিদ্যমান আছে, সেই একটীমাত্র পন্থা কেহই সঠিকভাবে এখনও নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। এই হিসাবে, মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পরিকল্পনা স্থির করা আমাদিগের মতবাদানুসারে মনুষ্য-সমাজের বর্ত্তমান সারথিগণের সাধ্যাতিরিক্ত।

মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পরিকল্পনা স্থির করা মনুষ্য-সমাজের বর্ত্তমান সারথিগণের সাধ্যাতিরিক্ত বলিয়া আমরা যে মনে করি তাহার প্রধান কারণ—ঐ সম্বন্ধে কোন কথা বর্ত্তমান বিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে মানুষের ধননীতি বিষয়ে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ও চাকুরী সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা পাওয়া যায়, সেই সমস্ত কথার প্রধানতঃ উদ্দেশ্য মানুষের ঐশ্বর্য্য সাধন করা। আমাদিগের বিচারানুসারে ঐ সমস্ত কথার মধ্যে মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার কোন কথা পাওয়া যায় না এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ধননীতি অনুসারে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত কার্য্য করা হয়, সেই সমস্ত কার্য্যে মানুষের ঐশ্বর্য্যের যেমন বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ দারিদ্র্য, অভাবেরও বৃদ্ধি হয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ধননীতি অনুসারে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত কার্য্য করা হয়, সেই সমস্ত কার্য্যে যে মানুষের দারিদ্র্য এবং অভাবের বৃদ্ধি হয়, তাহা জার্ম্মানগণের অবস্থা দেখিলে কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ধননীতি অনুসারে কৃষি শিল্প ও ব্যণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে জার্ম্মান জাতি যে উন্নতির উচ্চ-শিখরে উঠিয়াছেন, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, অথচ প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া ঐ সমস্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন করিবার পর, জার্ম্মান জাতি জার্ম্মানী হইতে তাঁহার অধিবাসিবৃন্দের অন্নসংস্থান করিতে অক্ষম হইয়াছেন এবং তাঁহার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে উপনিবেশের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা জার্ম্মান কর্তৃপক্ষকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইতেছে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, একশত বৎসর আগে জার্ম্মান জাতির যে শ্রেণীর দারিদ্র্য ও অভাব ছিল না, এক্ষণে সেই শ্রেণীর দারিদ্র্য ও অভাব দেখা দিয়াছে। শুধু জার্ম্মান জাতির কেন, আমাদিগের বিচারানুসারে প্রত্যেক জাতিরই অভাব ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পরিকল্পনা স্থির করা যে মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান সারথিগণের সাধ্যান্তর্গত নহে, তাহা ঐ সম্বন্ধে তাঁহারা যে সমস্ত কথা বলিতেছেন সে সমস্ত কথা লক্ষ্য করিলেই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। বর্ত্তমান সারথিগণের অনেকেই যুদ্ধের পর মানুষের অভাব দূর করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে নিজ নিজ সঙ্কল্পের পরিচয় দিতেছেন; কিন্তু কেহই উহার কোন পরিকল্পনার কোন কথা স্পষ্টভাবে বলিতেছেন না। আমাদিগের মতবাদানুসারে মনুষের যখন কোন কার্য্যের পরিকল্পনা জানা থাকে তখন ঐ কার্য্য সম্বন্ধে কোন কথা বাহির হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে উহার পরিকল্পনার কথা বাহির হওয়া মানুষের স্বভাব। আমাদিগের বিশ্বাস, মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পরিকল্পনা যদ্যপি মনুষ্যসমাজের সারথিগণের জানা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা এতদিনে উহা মানবসমাজের সম্মুখে প্রকাশ করিতেন।

মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা অধিকাংশ মানুষের কাম্য ও প্রয়োজনীয়, অথচ ঐ ব্যবস্থার পন্থা কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া ঐ ব্যবস্থাকে আমরা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের একটি সমস্যা বলিয়া মনে করি।

দুই শ্রেণীর পরিকল্পনার এবং এক শ্রেণীর কার্য্য-সঙ্কেতের প্রয়োজনীয়তার যুক্তিবাদ

বর্ত্তমান মানবসমাজের তিনটী সমস্যা সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিবার একমাত্র পন্থা আমাদিগের বিবেচনানুসারে নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণীর কার্য্য সাধন করা, যথা:

প্রথমতঃ, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পরিকল্পনা স্থির করিবার কার্য্য;

দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর পরিকল্পনানুসারে ভারত-বর্ষের সংগঠন সাধন করিবার এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের আহার-বিহারের সামগ্রীর অভাব পূরণ করিবার পরিকল্পনা স্থির করিবার কার্য্য;

তৃতীয়তঃ, নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীর কার্য্য যুগপৎভাবে সাধন করিবার কার্য্য, যথা:

(১) উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা সমগ্র মানব-সমাজের জনসাধারণের এবং বিশেষতঃ বিপক্ষের জন-সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার কার্য্য;

(২) সমগ্র মানবসমাজের—বিশেষতঃ বিপক্ষের জনসাধারণ যদ্যপি প্রথম পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য করিতে স্বীকৃত হ'ন তাহা হইলে তাঁহাদিগের সর্ব্ববিধ আহার-বিহারের সামগ্রীর অভাব পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিবার কার্য্য;

(৩) ভারতবর্ষের সংগঠনের উপরোক্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনা—কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এবং ভারতবর্ষের শাসন-কার্য্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক দেশের—বিশেষতঃ বিপক্ষীয় দেশসমূহের প্রতিনিধি আহ্বান করিবার কার্য্য।

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কার্য্যের নাম—"মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার পরিকল্পনা;"

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্যের নাম—

"যুগপৎভাবে বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নিরাপদ ভাবে নির্ব্বাপণ করিবার এবং এতাদৃশ যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবার পরিকল্পনা";

যে তিন শ্রেণীর কার্য্যের যুগপৎ সাধন করা উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত, সেই তিন শ্রেণীর কার্য্যের যুগপৎ সাধন করিবার নাম—

"যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়ী হইবার কার্য্যসঙ্কেত"—

আমাদিগের মতবাদানুসারে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ঐশ্বর্য্য সর্ব্বতোভাবে লাভ করা যাহাতে সম্ভবযোগ্য হয় তাহা করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সঙ্ঘগত সংগঠন অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হয়। সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ঐশ্বর্য্য সর্ব্বতোভাবে লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইলে কোন মানুষের যুদ্ধের ত' দূরের কথা, মারামারির অথবা দ্বন্দ্ব-কলহের অথবা দ্বেষ-হিংসার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত জাগ্রত হইতে পারে না।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের কোন দেশের কোন মানুষের দ্বেষ-হিংসার অথবা দ্বন্দ্ব-কলহের অথবা মারামারির অথবা যুদ্ধের প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত যাহাতে জাগ্রত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে বিভিন্ন দেশের মানুষের পরস্পরের মধ্যে কোন শ্রেণীর যুদ্ধ হওয়া যে অসম্ভব হয় তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে আমরা মনে করি যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সঙ্ঘগত সংগঠন করিতে পারিলে মনুষ্যসমাজে যাহাতে ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ না হয় এবং প্রত্যেক মানুষ যাহাতে যুদ্ধের প্রবৃত্তি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পরিত্যাগ করেন তাহা করা অবশ্যম্ভাবী হয়।

এই হিসাবে, বর্ত্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার জন্য সঙ্ঘগত সংগঠনের সাধন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। ঐ সংগঠন সাধন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে উহার পরিকল্পনা স্থির করিতে হয়।

প্রথমতঃ, বর্ত্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবার ব্যবস্থা-বিষয়ক সমস্যা এবং দ্বিতীয়তঃ, মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা-বিষয়ক সমস্যা—এই দুই শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের জন্য, আমাদিগের বিচারানুসারে, মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার জন্য সঙ্ঘগত সংগঠন সাধন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় এবং ঐ সঙ্ঘগত সংগঠন সাধন করিবার জন্য উহার পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়।

সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির মানুষের সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হইতে পারে তাহার সঙ্ঘগত সংগঠন সাধন করিতে হইলে, আমাদিগের বিচারানুসারে, সর্ব্বাগ্রে উহার পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু একমাত্র ঐ পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেই যে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিবার সঙ্ঘগত সংগঠন সাধিত হইতে পারে তাহা আমরা মনে করি না। সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে যাহাতে দূরীভূত ও নিবারিত হইতে পারে ও হয় তাহার সঙ্ঘগত সংগঠন সাধন করিতে হইলে একদিকে যেরূপ উহার পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার ঐ পরিকল্পনা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবারও আবশ্যক হয়।

ঐ পরিকল্পনা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে আমাদিগের বিচারানুসারে ঐ উদ্দেশ্যে সমগ্র মানবসমাজের সমস্ত দেশের সমস্ত জাতির আন্তরিকভাবে মিলিত কার্য্য অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। উহা প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু আমাদিগের বিচারানুসারে, দুই পক্ষের যুদ্ধপ্রবৃত্তি যেরূপ তীব্রভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাতে ঐ দুই পক্ষের আন্তরিকভাবে মিলন ত' দূরের কথা, কোন শ্রেণীর মিলন হওয়া সহজসাধ্য নহে।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুই পক্ষের আন্তরিকভাবের মিলন যাহাতে সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা করিতে হইলে, আমাদিগের বিচারানুসারে, একপক্ষ যাহাতে আন্তরিকভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়া যুদ্ধ-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

একপক্ষ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়া যুদ্ধ-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহা করিতে হইলে, আমাদিগের বিচারানুসারে অপর পক্ষ যাহাতে যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করিতে পারেন তাহা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

আমাদিগের বিবেচনায় একপক্ষ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন, তাহা করিতে পারিলে, অপর পক্ষ আন্তরিকভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়া যুদ্ধ-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন এবং তখন সমগ্র ভূমণ্ডলের সমস্ত দেশের আন্তরিক মিলিতভাবে কার্য্য করা সম্ভব হইবে। সমগ্র ভূমণ্ডলের সমস্ত দেশের আন্তরিক মিলিতভাবে কার্য্য করা সম্ভব হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য ও দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে এবং প্রত্যেক দেশে উহার সংগঠন করা অনায়াসসাধ্য হইবে। প্রত্যেক দেশে ঐ সংগঠন সাধিত হইলে বর্ত্তমান মানব-সমাজের তিন শ্রেণীর সমস্যার সমাধান যুগপৎভাবে হওয়া অনিবার্য্য হইবে।

উপরোক্ত। ইহা বুঝিতে হয় যে, বর্ত্তমান মানব-সমাজের তিনটী সমস্তার সমাধান সর্ব্বতোভাবে করিতে হইলে একপক্ষ যাহাতে এই যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করেন, তাহা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। এই কারণে আমরা "যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়ী হইবার কার্য্যসঙ্কেতকে" মানব-সমাজের তিন শ্রেণীর সমস্তা সমাধানের কার্য্যসঙ্কেত বলিয়া মনে করি।

অতঃপর আমরা এই যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করিবার কার্য্যসঙ্কেত কি হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিব। এই যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করিবার কার্য্যসঙ্কেত কি হইতে পারে তাহা স্থির করিতে পারিলে আমাদিগের প্রস্তাবিত দুই শ্রেণীর পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা যে কি তাহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে।

আমাদিগের বিচারানুসারে গত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া মানবসমাজে যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য যুদ্ধ করিবার যে পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে সেই পদ্ধতিতে কোন যুদ্ধে কোন পক্ষের সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। আমাদিগের মতবাদানুসারে যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করিতে হইলে বিপক্ষ যাহাতে আবার যুদ্ধের জন্য প্রবৃত্তিশীল হইতে না পারেন এবং আবার ঐ বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে না হয় তাদৃশভাবে যুদ্ধ-জয় করিতে হয়। যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করিতে হইলে বিপক্ষ যাহাতে আন্তরিকভাবে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন, তাহা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য গ্রীকগণের অভ্যুদয়কাল হইতে গত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া মানবসমাজে যুদ্ধ করিবার যে পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে সেই পদ্ধতি অনুসারে বিপক্ষকে বলপূর্ব্বক হউক অথবা ছলপূর্ব্বক হউক অথবা কৌশলপূর্ব্বক হউক বিধ্বস্ত করিয়া শান্তিপ্রার্থী করিতে হয়। উপরোক্তভাবে বলপূর্ব্বক অথবা ছলপূর্ব্বক অথবা কৌশল-পূর্ব্বক বিপক্ষকে বিধ্বস্ত করিয়া শান্তিপ্রার্থী করিতে পারিলে, আমাদিগের মতবাদানুসারে, বিপক্ষকে আন্তরিক ভাবে পরাজয় স্বীকার করান যায় না। উহাতে বিপক্ষের যুদ্ধপ্রবৃত্তি দূরীভূত হয় না, বরং প্রতিহিংসা লইবার জন্য বিপক্ষের যুদ্ধপ্রবৃত্তি অধিকতর তীব্রতার সহিত জাগ্রত হয় এবং সুবিধা পাইলেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

গত আড়াই হাজার বৎসর কালে মানবসমাজে যে সমস্ত যুদ্ধ হইয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটী আমাদিগের উপরোক্ত মতবাদের সমর্থক।

আমাদিগের মতবাদানুসারে যে কোন যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়-লাভ করিতে হইলে বিপক্ষ কেন অতগুলি মনুষ্য-জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করিতে হয় এবং যে সমস্ত অভিযোগবশতঃ বিপক্ষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সেই সমস্ত অভিযোগ দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সাধন করিবার প্রতিশ্রুতি বিপক্ষের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে বিপক্ষকে প্রদান করিতে হয় এবং ঐ সমস্ত অভিযোগ দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সাধন করিতে হয়।

উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করিলে যে বিপক্ষ আন্তরিক ভাবে পরাজয় স্বীকার করিতে এবং যুদ্ধের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুভাব বিসর্জ্জিত করিতে ও মিত্রভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হন তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এই পন্থায় যে, যে-কোন যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে জয় করা সুনিশ্চিত হয় তাহাও প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন বলিয়া আমরা মনে করি।

আমাদিগের মতবাদানুসারে যে দুই পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন সেই দুই পক্ষের যে কোন পক্ষ অপর পক্ষের অভি-যোগ দূর করিতে সক্ষম হন না। এই কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুই পক্ষের যে কোন পক্ষ সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারেন না ও সক্ষম হন না।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রধান কারণ সমগ্র মানবসমাজব্যাপী ধন-গত দারিদ্র্য ও অভাব। আমাদিগের মতবাদানুসারে মুদ্রার অভাব আজকাল অধিকাংশ মানুষেরই নাই কিন্তু প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ আহার-বিহারের একান্ত প্রয়োজনীয় বিবিধ সামগ্রীর অভাবে জর্জ্জরিত হইতেছেন। আহার-বিহারের সামগ্রীর অভাবকে আমরা ধনাভাব বলিয়া অভিহিত করি। এই কারণে আমাদিগের বিচারানুসারে বর্ত্তমান এ যুদ্ধের প্রধান কারণ ধন-গত দারিদ্র্য ও অভাব।

ধন-গত দারিদ্র্য ও অভাব বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রধান কারণ বটে, কিন্তু আমাদিগের বিচারানুসারে অন্য পাঁচশ্রেণীর অভাবও এই যুদ্ধের পশ্চাতে বিদ্যমান আছে।

আমাদিগের মতবাদানুসারে অ্যাক্সিস্ পক্ষ প্রধানতঃ তাঁহার অধিবাসিবৃন্দের ধন-গত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রসার সাধন করিবার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আর মিত্রপক্ষ তাঁহার অধিবাসিবৃন্দের ধন-গত দারিদ্র্য ও অভাব যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে না পারে তাহার উদ্দেশ্যে তাঁহার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি যাহাতে খর্ব্ব না হয় তাহা করিবার জন্য অ্যাক্সিস্-পক্ষের হাত হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

দুই পক্ষের উপরোক্ত যে দুই শ্রেণীর মনোভাব এই যুদ্ধের পশ্চাতে বিদ্যমান আছে বলিয়া আমরা মনে করি, সেই দুই শ্রেণীর মনোভাব যে দুই পক্ষ স্পষ্টভাবে স্বীকার করিবেন অথবা বিদিত আছেন—তাহা আমরা মনে করি না। আধুনিক মানবসমাজের মানুষ অনেক সময়ে অনেক কার্য্যে কোন উদ্দেশ্য অথবা কারণ নির্দ্ধারণ না করিয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা এই সমস্ত কার্য্য করেন তাঁহারা কার্য্যের উদ্দেশ্য অথবা কারণ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বিদিত না হইলেও বাহির হইতে কার্য্যের ধারা দেখিয়া উহা স্পষ্ট-ভাবে বুঝিতে পারা যায়।

আমাদিগের বিচারানুসারে এই যুদ্ধে যে পক্ষ সমগ্র মানব-সমাজের জনসাধারণকে, বিশেষতঃ বিপক্ষের জনসাধারণকে, তাঁহাদিগের আহার-বিহারের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি ঐ জনসাধারণের বিশ্বাস-যোগ্যভাবে প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন, সেই পক্ষ সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

পেটের দায়ে মানুষ যদ্যপি যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে আমাদিগের উপরোক্ত কথা অসার বলিয়া বাতিল করা যাইত। বর্ত্তমান যুদ্ধের পশ্চাতে যে মানুষের পেটের দায় দারুণভাবে বিদ্যমান আছে, তাহা কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না। মানুষের পেটের দায় উপস্থিত না হইলে জীবননাশের আশঙ্কা সত্ত্বেও এত অগণিত সংখ্যায় যুদ্ধে যোগদান করা সম্ভবযোগ্য হয় না। জার্ম্মানগণের পেটের দায় না থাকিলে হিটলারের কিম্বা তাঁহার অনুচরবর্গের পক্ষে তাঁহাদিগকে আধ-পেটা খাওয়াইয়া এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধে অটল রাখা সম্ভবযোগ্য হইত না। জাপান, রুশিয়া, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের পক্ষেও ঐ একই কথা খাটিতে পারে।

"যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে দেশের লোকের কোনরূপ অভাব-অসুবিধা থাকিবে না এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে প্রত্যেকের অভাব অসুবিধা অনিবার্য্য"—এতাদৃশ কথা প্রকারান্তরে জনসাধারণকে বুঝাইয়া প্রত্যেক দেশের যুদ্ধ-সারথিগণ স্ব স্ব দেশের জনসাধারণকে যুদ্ধে নানারূপ ক্লেশ থাকা সত্ত্বেও এত দীর্ঘকাল অটল রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন—ইহা আমরা মনে করি।

প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে নানারকমের ক্লেশ ও অসুবিধা আছে বলিয়াই উহা সম্ভবযোগ্য হইতেছে। উপরোক্ত ক্লেশ ও অসুবিধা না থাকিলে জনসাধারণকে ঐরূপ ভাবে এত দীর্ঘকাল যুদ্ধে অটল রাখা সম্ভবযোগ্য হইত না। "যুদ্ধে জয়লাভ হইলে জনসাধারণের সর্ব্ববিধ অভাব ও অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা করিবেন"—এতাদৃশ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া প্রত্যেক দেশের যুদ্ধ-সারথিগণ নিজ নিজ দেশের জনসাধারণকে যুদ্ধে অটল রাখিতে সক্ষম হইতেছেন বটে, কিন্তু কোন দেশের জনসাধারণকে নিজ নিজ দেশের যুদ্ধ-সারথিগণের দেওয়া অভাব-অসুবিধা দূর করিবার প্রতিশ্রুতির প্রতি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসযুক্ত তাহা আমরা মনে করি না।

প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ প্রায়শঃ নিজ নিজ নেতৃবর্গের সদিচ্ছায় প্রতি বিশ্বাসশীল এবং তদনুসারে নেতৃবর্গ যে জনসাধারণের মঙ্গলার্থ কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা বিশ্বাস করেন এবং তদনুসারে নেতৃবর্গের আদেশ পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ স্ব স্ব কিসমতের দোহাই দিয়া নৈরাশ্য ও হতাশাপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া থাকেন। জনসাধারণের উপরোক্ত ভাব লক্ষ্য করিলে আমাদিগের বিচারে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ অতর্কিত ভাবে স্ব স্ব নেতৃবর্গের দেওয়া অভাব-অসুবিধা দূর করিবার সামর্থ্যের প্রতি সন্দেহযুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে কোন দেশের নেতৃবর্গই স্ব স্ব দেশের মানুষের কোন শ্রেণীর অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে অথবা নিবারণ করিতে সক্ষম নহেন। ঐ সক্ষমতা যে কেন ঐ নেতৃবর্গের থাকিতে পারে না—তাহা আমরা আগেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। আমাদিগের বিচারানুসারে কোন দেশের নেতৃবর্গ এতদবস্থায় "ব্যক্তিগত মনুষ্য-স্বভাবের" নিয়মানুসারে জনসাধারণের সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারেন না।

প্রত্যেক দেশের উপরোক্ত অবস্থায় যদি কোন পক্ষ সমগ্র মানবসমাজের জনসাধারণকে, বিশেষতঃ বিপক্ষের জনসাধারণকে তাঁহাদিগের আহার-বিহারের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি ঐ জনসাধারণের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রদান করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে আমাদিগের বিচারানুসারে সেই পক্ষের প্রত্যেক দেশের বিশেষতঃ বিপক্ষীয় দেশের জনসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধাভাজন হওয়া অনিবার্য্য হইবে। প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের ঐ পক্ষের আদেশ ও পরামর্শ যত আন্তরিকতার সহিত পালন করিতে উদ্যত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইবে, স্ব স্ব দেশের নেতৃবর্গ যদ্যপি ঐ পক্ষের বিরোধী হন তাহা হইলে ঐ নেতৃবর্গের আদেশ ও পরামর্শ তত আন্তরিকতার সহিত পালন করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইবে না। ইহার ফলে প্রত্যেক দেশের নেতৃবর্গকে হয় উপরোক্ত পক্ষের আদেশ ও পরামর্শানুসারে চলিতে বাধ্য হইতে হইবে, নতুবা তাহাদিগের নেতৃত্বের পদ-গৌরব হইতে ইস্তফা দিতে হইবে।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, এই যুদ্ধে যে পক্ষ সমগ্র মানবসমাজের জনসাধারণকে, বিশেষতঃ বিপক্ষের জনসাধারণকে তাহাদিগের আহার-বিহারের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি ঐ জনসাধারণের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন, সেই পক্ষের সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করা অবশ্যম্ভাবী হইবে।

সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের আহার-বিহারের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি যে পক্ষ জনসাধারণের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তাহাদিগকে প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন, সেই পক্ষের এই যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করা অবশ্যম্ভাবী হইবে বটে, কিন্তু কোন পক্ষের ঐ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সক্ষমতা লাভ করা সহজসাধ্য নহে।

ঐ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সক্ষমতা লাভ করা যে সহজসাধ্য নহে তাহার কারণ—ঐ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সক্ষমতা লাভ করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পরিকল্পনা স্থির করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হয়। ঐ পরিকল্পনা স্থির করা আমাদিগের মতবাদানুসারে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত। উহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত বলিয়া মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ইহার কারণ—বর্ত্তমান মানবসমাজ বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে অধিক শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকে।

ঐ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সক্ষমতা লাভ করা কোন পক্ষের সহজসাধ্য নহে বটে, কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সক্ষমতা লাভ করিতে না পারিলে মানবসমাজের কোন সমস্যা সমাধান করা অন্য কোন উপায়ে আদৌ সম্ভবযোগ্য হইবে না। যতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুই পক্ষের এক পক্ষ মানব-সমাজের জনসাধারণকে

ঐ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সক্ষমতা অর্জ্জন করিতে না পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত মানব-সমাজ হইতে যুদ্ধ দূর করাও কোনক্রমেই সম্ভবযোগ্য হইবে না এবং এমন কি বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নিরাপদ ভাবে নির্ব্বাপণ করা সম্ভবযোগ্য হইবে না—ইহা আমাদিগের অভিমত। আমাদিগের এই অভিমত বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা যে বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই বিচার বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানুষের বুঝা সহজসাধ্য নহে। আমাদিগের উপরোক্ত অভিমত যে সন্দেহের অযোগ্য, তাহা যুদ্ধের অবস্থা বিচক্ষণতার সহিত বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

ঐ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সক্ষমতা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

প্রথমে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পরিকল্পনা ; তাহার পর, উপরোক্ত প্রথম পরিকল্পনানুসারে ভারতবর্ষের সংগঠন সাধন করিবার এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের আহার-বিহারের প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব পূরণ করিবার পরিকল্পনা।

আমাদিগের বিচারানুসারে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর ও নিবারণ করিবার পরিকল্পনানুসারে ভারতবর্ষের সংগঠন সাধন করিতে না পারিলে শুধু ঐ পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ করিলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের সর্ব্ববিধ আহার-বিহারের সামগ্রীর অভাব পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। ঐ পরিকল্পনানুসারে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশের সংগঠন সাধন করিলে ভূমণ্ডলের বর্ত্তমান অবস্থায় সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের সর্ব্ববিধ আহার-বিহারের সামগ্রীর অভাব পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। ঐ পরিকল্পনানুসারে ভারতবর্ষের সংগঠন সাধন করিলে উপরোক্ত অভাব পূরণ করিবার সক্ষমতা অর্জ্জন করা অবশ্যম্ভাবী হয়।

ঐ পরিকল্পনানুসারে অন্য কোন দেশের সংগঠন সাধন করিলে যে উপরোক্ত অভাব পূরণ করিবার সক্ষমতা অর্জ্জন করা সম্ভবযোগ্য হয় না, অথচ ভারতবর্ষের সংগঠন সাধন করিলে যে উহা অর্জ্জন করা আমাদিগের মতবাদানুসারে অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহার কারণ দুইশ্রেণীর ; যথা :—

(১) ভারতবর্ষের স্বাভাবিক স্থানগত বৈশিষ্ট্য ; এবং

(২) ভারতবর্ষের জমির অন্যান্য দেশের জমির তুলনায় স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বৈশিষ্ট্য ও আধিক্য।

ভারতবর্ষের যে স্বাভাবিক স্থানগত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বিদ্যমান আছে তাহা ভূমণ্ডলের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশিখর গৌরীশঙ্করের অবস্থান দেখিলে অনুমান করা যায়। গৌরীশঙ্করের মত উচ্চ পর্ব্বতশিখর ভূমণ্ডলের অপর কোন দেশে পাওয়া যায় না।

অন্যান্য দেশের জমির তুলনায় ভারতবর্ষের জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা তিন শ্রেণীর ব্যাপার হইতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

(১) মানুষের তৃপ্তিকর ও স্বাস্থ্যকর বহু আহার-বিহারের সামগ্রী একমাত্র ভারতবর্ষে ছাড়া অন্য কোন দেশে অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় না ;

(২) মানুষের বুদ্ধির ও মনের স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে বজায় রাখিতে হইলে যে-যে সামগ্রী অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, তাহার কোনটী ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় না অথচ অন্য কোন দেশে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইতে পারে এইরূপ হয় না ;

(৩) ভারতবর্ষের জমি হইতে যে পরিমাণের ফসল প্রতি বৎসর কোনরূপ কৃত্রিম সার ব্যবহার না করিয়া স্বভাবতঃ উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য, অন্য কোন দেশের জমি হইতে সেই পরিমাণের ফসল প্রতি বৎসর কোনরূপ কৃত্রিম সার ব্যবহার না করিয়া স্বভাবতঃ উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য নহে।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার পরিকল্পনানুসারে ভারতবর্ষের সংগঠন সাধন করিতে পারিলে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের আহার-বিহারের প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সক্ষমতা অর্জ্জন করা কেন অবশ্যম্ভাবী হয়, আর অন্য কোন দেশের সংগঠন সাধন করিলে উহা কেন সম্ভবযোগ্য হয় না—তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে স্বভাবের কোন্ কোন্ নিয়মে, ভূমির ও ভূমির উৎপাদিকাশক্তির এবং তাহাদিগের বৈশিষ্ট্যসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় তাহার বর্ণনা করিতে হয়। ঐ সমস্ত কথা খুব বিস্তৃত এবং সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে বুঝা দুরূহ। ঐ সমস্ত কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গশ্রীতে ব্যাখ্যা করিয়াছি।

অন্য কোন দেশের সংগঠন সাধন করিলে ঐ দেশের পক্ষে সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের আহার বিহারের প্রত্যেক সামগ্রীর বর্ত্তমান অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করা বর্ত্তমান সময়ে সম্ভবযোগ্য নহে বটে, কিন্তু আমাদিগের মতবাদানুসারে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার পরিকল্পনানুসারে যে কোন দেশের সংগঠন করা যাক না কেন ঐ সমস্ত দেশ নিজ নিজ অধিবাসিগণের আহার-বিহারের প্রত্যেক সামগ্রীর এবং এমন কি কাঁচামালের পর্য্যন্ত অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে ও নিবারণ করিতে সক্ষম হইবেন।

ভারতবর্ষের উপরোক্ত সংগঠন সাধন করিতে পারিলে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের আহার-বিহারের প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের উপরোক্ত সংগঠন সাধন করা বর্ত্তমান যুদ্ধের নিবৃত্তি না হইলে সম্ভবযোগ্য নহে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের নিবৃত্তি না হইলে ভারতবর্ষের সংগঠন করা এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের আহার-বিহারের প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য নহে বলিয়া আমাদিগের মতবাদানুসারে বর্ত্তমান যুদ্ধের

নিবৃত্তি হইবার আগে সমগ্র মানবসমাজের জনসাধারণের সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ঐ অভাব পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

আমাদিগের বিচারানুসারে প্রথমতঃ, সমগ্র মানবসমাজের অভাব ও দারিদ্র্য সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার পরিকল্পনা; দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের সংগঠন সাধন করিবার পরিকল্পনা; তৃতীয়তঃ, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের আহার-বিহারের প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব পূরণ করিবার পরিকল্পনা, সমগ্র মানব-সমাজের বিশেষতঃ বিপক্ষের জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিলে এবং ভারতবর্ষের সংগঠনকার্য্য সাধন করিবার জন্ত ও সংগঠনকার্য্য পরিচালনার জন্ত প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি আহ্বান করিলে মানবসমাজের কেহই তাহাদিগের অভাব পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতির সত্যতা সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত ভাবে কোনরূপ অবিশ্বাস করিতে পারেন না।

সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের আহার-বিহারের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি যে-পক্ষ জনসাধারণের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন, সেই পক্ষের এই যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করা যে অবশ্যম্ভাবী—তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করিতে হইলে যাহা যাহা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় তাহা লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করিতে হইলে আমাদিগের প্রস্তাবিত দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা ও কার্য্যসঙ্কেত অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

আমাদিগের প্রস্তাবিত দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকারান্তরে বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করিয়াছি।

আমাদিগের মতবাদানুসারে ভারতবর্ষের শাসনভার যে-পক্ষের করায়ত্ত, কেবলমাত্র সেই পক্ষেরই এই যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করা অনায়াসসাধ্য। অন্ত পক্ষের এই যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করা কোনক্রমে সম্ভবযোগ্য নহে। ঐ হিসাবে বর্ত্তমান অবস্থায় মিত্রপক্ষের সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করা সুনিশ্চিত হওয়া উচিত।

ধর্ম্ম ও ধর্ম

বর্ণের অর্থানুসারে "ধর্ম্ম বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য (দ্রব্য অথবা গুণ নহে), অথবা সেই চালচলন, যে কার্য্যে অথবা চালচলনে জীবের উপস্থ, বহ্নি এবং স্পর্শশক্তি অটুট থাকে। অথবা যাহা মানুষের করা উচিত, তাহার নাম ধর্ম্ম, ইহা বলা যাইতে পারে। আর "ধর্ম" বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য (দ্রব্য অথবা গুণ নহে), অথবা সেই চালচলন, যাহা জীব তাহার উপস্থ ও তেজ বশতঃ অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, জীব যাহা সাধারণতঃ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার ধর্ম, যথা—চোরের ধর্ম, সাধুর ধর্ম, পশুর ধর্ম ইত্যাদি।......

বঙ্গশ্রী—১৩৪৩, বৈশাখ, পৃঃ ৪১৩

ব্রাহ্মণ

একদিন বহু ভারতবাসী যে "ব্রহ্ম"কে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন, তাহা "ব্রাহ্মণ" শব্দটির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ না করিতে পারিলে মানুষ ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারিত না। ঋক্ বেদের অভ্যাসসমূহে অভ্যস্ত হইয়া বেদান্ত-দর্শনের বক্তব্য পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে এখনও ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়।... ... ...

বঙ্গশ্রী—১৩৪৩, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৬৭৫

দ্বাদশ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ | ১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর

শ্রীকালিদাস রায়

ভারতচন্দ্র রঙ্গরস ও রতিরসের কবি। সে জন্য তাঁহার নিজস্ব কবিত্ব-প্রতিভা যেমন বিদ্যাসুন্দরে পরিস্ফুট, অন্নদামঙ্গলের অন্যত্র তেমনটি হয় নাই। অন্নদামঙ্গলের বাকী অংশ রসালফলের আচ্ছাদনীর মত। ইহার রসালো অংশ এই বিদ্যাসুন্দর। এই গর্ভকাব্যের রুচি বর্ত্তমান যুগের রসাদর্শের অনুগত নয়। তবু ইহার কবিত্ব অস্বীকার করা যায় না। নায়ক-নায়িকার 'সুন্দর ও বিদ্যা' নামকরণ বেশ ব্যঞ্জনাময়। সৌন্দর্য্যবোধের সহিত বিদ্যাবত্তার মিলন বড়ই দুর্লভ ও দুরূহ—কচিৎ কখনও ঘটে। যেখানে ঘটে, সেখানেই প্রকৃত কবিত্বের জন্ম হয়। এই মিলনের দূতীই প্রকৃতি—এই কাব্যে সেই পুষ্পকুঞ্জবাসিনী মালিনী। অন্তরের গভীর স্তরে এই মিলন—মনের সুড়ঙ্গ-পথে। এই মিলনের আনন্দ কবিচিত্ত গোপনেই উপভোগ করেন—চরম দৈহিক আনন্দের Symbol-এর দ্বারাই বিদ্যাসুন্দরে সেই আনন্দের আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছে। কবিচিত্তের গোপন স্তরেই এই আনন্দলীলা পর্য্যবসান লাভ করে না। তাহা রসসৃষ্টির মধ্য দিয়া বহির্জগতে প্রকাশ লাভ করে।

এখন এই কাব্যখানিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক—ইহাতে কতটা রস সৃষ্টি হইয়াছে।

তুলিকার কয়েকটি আঁচড়ে কবি বর্দ্ধমান শহরের ঐশ্বর্য্যের আভাস দিয়াছেন।

> চৌদিকে শহর মাঝে মহল রাজার।
> আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার॥
> থামে বাঁধা মত্ত হাতী হলকে হলকে।
> শুঁড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে॥
> ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী।
> হাজার হাজার দেখে থামে বান্ধা বাজী॥
> উট গাধা খচর গণিতে কেবা পারে।
> পালিয়াছে পশু-পক্ষী যে আছে সংসারে॥

সুন্দরকে দেখিয়া বর্দ্ধমানের কুলবধূগণের জল আনিতে আসিয়া কি দশা হইল—তাহার রুচি যেমনই হউক, তাহার বর্ণনা বড়ই সরস—

> দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর স্মরে জরজর যত রমণী।
> কবরী ভূষণ কাঁচলী কষণ কটির বসন খসে অমনি॥
> চলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে এ বলে উহারে দেখ লো সই।
> মদনজ্বালায় মরম গলায় বকুলতলায় বসিয়া অই॥
> আহা মরে যাই লইয়া বালাই কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।
> যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া যাই পলাইয়া সাগরপারে॥
> কহে একজন লয় মোর মন এ নব রতন ভুবন মাঝে।
> বিরহে জ্বালিয়া সোহাগে গালিয়া হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে॥
> আর জন কয় এই মহাশয় চাঁপা ফুলময় খোঁপায় রাখি।
> হলদী জিনিয়া তনু চিকনিয়া স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে রাখি॥
> ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার মিছার সংসার ভাতার জ্বরা।
> সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিণী ননদী নাগিনী বিষের ভরা॥

ইত্যাদি শেষ পর্য্যন্ত রুচি শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছে। যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করিয়া কবি ঘন ঘন মিল দিয়া মালিনীর আবির্ভাবের আগেই ললিত পদের এই মালিকাটি গাঁথিয়াছেন।[১]

ভারতচন্দ্রের হীরা একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বাস্তবনিষ্ঠ হীরা-চরিত্রটি কবি বাস্তব জীবন হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। মনে হয়—ইহার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের যেন পরিচয় ছিল এবং কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীর কাছেই ইহার মালঞ্চ-ঘেরা বাড়ীটিও ছিল। হীরার পরিচয়—

> কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
> দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
> গালভরা গুয়া-পান পাকি মালা গলে।
> কাণে কড়ি ক'ড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে॥
> চূড়া বাঁধা চুল পরিধানে সাদা শাড়ী।
> ফুলের চুপড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
> আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
> এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
> ছিটা ফোঁটা মন্ত্র তন্ত্র জানে কতগুলি।
> চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥
> বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
> পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥

রামপ্রসাদের মত মালিনীর বেসাতিতে কবি বঙ্কের একটা জমকালো তালিকা দিয়াছেন, সেটা বড় কথা নয়। ইহাতে

---

১ রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে ঠিক এই ছন্দে এইরূপ ভাষায় পুরনারীদের আক্ষেপের বর্ণনা আছে। ভারতচন্দ্র রঙের উপর রসান দিয়াছেন মাত্র।

> "হৃদয়-মাঝারে রাখিয়া ইহারে নয়ন-দুয়ারে কুলুপ দিয়া।
> রূপ নহে কালো নিরখিতে ভালো দেখ সখি আলো আঁখি মুদিয়া॥
> কহে রামা আর গলে পরি হার এ হার কি ছার ফেলিগো টেনে।
> সাধ পূরে তবে হেন দিন হবে কোন জন কবে ঘটাবে এনে॥
> বলে কোন আই আমি যদি পাই পলাইয়া যাই এদেশ থেকে।
> নীবী-কলা ফাঁদে বাঁধি নানা ছাঁদে প্রাণ বড় কাঁদে
> দে না লো ডেকে॥"

মালিনীর যে চরিত্রটি ফুটিয়াছে তাহা কথা-সাহিত্যেরই উপযোগী। যে যুগে কথা-সাহিত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, কাব্যের মধ্যে যাহা অনুস্যূত থাকিত, সে যুগে এই চরিত্রটি কাব্যের রসপুষ্টিরই সহায়তা করিয়াছে।

বিদ্যার রূপ-বর্ণনা ঠিক কবিত্বের না হউক—রচনা-চাতুর্য্যের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত—আলঙ্কারিকতার কসরৎ। বলা বাহুল্য, ইহাতে 'বিদ্যা'র রূপ কিছুই ফুটে নাই। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাবত্তা'র রূপই ফুটিয়াছে। ইহাতে একটি বাঙ্ময়ী অপ্সরীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবন নাই।

সুন্দরের রূপ অবশ্য ইতিমধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে,—কোন বর্ণনার দ্বারা নয়—বর্দ্ধমানের কুলবধূদের রূপমুগ্ধতার মধ্য দিয়া।

বিদ্যার রূপবর্ণনাচ্ছলে কবি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যতিরেক অলঙ্কারে শব্দ বাক্‌চাতুর্য্যের পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন—

বিনানিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা।
কি ছার মিছার কামধনু রাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে।
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে।
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইল লুকাইয়া।
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল।
কুচ হইতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।
নাভিকূপে যেতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলি ছলে।
মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।
করিকর রামরম্ভা দেখি তার উরু।
সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু।
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ।
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোণার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তারে দরশন।

এই যে বাক্‌চাতুর্য্য—ইহাতেও ভারতচন্দ্র মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন না।২ চিরপ্রচলিত রূপবর্ণনার ভাবাই ইহা। তবু ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব আছে। উপমান-উপমেয়গুলিকে কবি অভিনব ঢঙে সাজাইয়াছেন। এই আলঙ্কারিক কলাচাতুর্য্যকে সে-কালের কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করা হইত। সে-যুগে সকল আর্টই ছিল decorative, কবিত্বের আর্টও সে-যুগে এইরূপ decorative না হইবে কেন?

কবি বিদ্যা-সুন্দরের বিহার অসঙ্কোচে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সাহিত্যের বিচারে ইহা রুচি বিগর্হিত। বাক্-প্রিয় রচনার দিক্ হইতে ইহাকে সরসই বলিতে হয়। কবি আলঙ্কারিকতার প্রাচুর্য্য ও পদবিন্যাসের চাতুর্য্যের দ্বারা অশ্লীলতাকে কতকটা নিগূহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, বিহার-বর্ণনায় কবি সাধারণ ভাষা ত্যাগ করিয়া ব্রজবুলি ও বৈষ্ণব কবিদের ছন্দ আশ্রয় করিয়াছেন। এই ভাষায় এই ছন্দে রাধা-শ্যামের বিহার বর্ণনার প্রথা পূর্ব্ব হইতেই দেশে প্রচলিত ছিল। অন্নদার পূজার জন্য অবচিত পুষ্প বসুন্ধর কামার্ত্তা পত্নীর রতি-সজ্জায় নিয়োজিত করিয়া যে অপরাধ করিয়াছিল—রাধা-শ্যামের লীলা-বর্ণনার ভাষা ও ছন্দকে বিদ্যাসুন্দরের বিহারবর্ণনায় বিনিয়োগ করিয়া অনেকের মতে ভারতচন্দ্র সেই অপরাধ করিয়াছেন। বসুন্ধরের মত ভারতচন্দ্রও বঙ্গ-সাহিত্যে শাপগ্রস্ত (রাহুগ্রস্ত?) হইয়া আছেন।

বিদ্যাসুন্দরের মূল আখ্যান-বস্তুর সহিত কামকেলি-বর্ণনার অপরিহার্য্য সম্বন্ধ নয়। কামকেলির বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য—বিদ্যা ও সুন্দরকে অবলম্বন করিয়া রসাইয়া রসাইয়া সেই কেলির বর্ণনা করিয়া নিজেও আনন্দ পাইয়াছেন—রাজকৃষ্ণেরও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। রাজসভার শ্রোতারাও ইহাতে নিশ্চয়ই প্রচুর রস পাইয়াছেন। এই অকারণ কেলিবর্ণনার জন্য বিদ্যাসুন্দর ব্রাহ্ম-যুগের সভ্যসমাজে অপাংক্তেয় হইয়াই ছিল। এক শ্রেণীর শ্রোতা ব্রাহ্মযুগেও গোপাল উড়ের মারফতে ইহার রস কতকটা উপভোগ করিত। বর্ত্তমান যুগের পাঠকদের রুচি ইহাকে সহ্য করিলেও সৎ-সাহিত্য বলিয়া বরণ করিতে প্রস্তুত নয়

শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্যে খণ্ডিতার বর্ণনা একটা কবি-পদ্ধতি। বিদ্যা রহস্য করিবার জন্য সুন্দরের মুখে সিন্দূর-কাজল লাগাইয়া অন্যাসম্ভোগ চিহ্নিত করিয়া আসিয়া ঈর্ষ্যাকষায়িতা খণ্ডিতার রূপ ধরিল। ইহা গতানুগতিক কাব্য-পদ্ধতির অনুবৃত্তি মাত্র। ইহাতে কবির কোন মৌলিকতা নাই।

ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে বিদ্যার মান ও মানভঙ্গের চিত্রও অঙ্কন করিয়াছেন। মান-ভঙ্গের কিয়দংশ গীতগোবিন্দের অনুবাদ বলিলেই হয়। তবু ইহাতেও কিছু মৌলিকতা আছে, রূপের পূজারী রমণী-রসজ্ঞ কবি সুন্দরকে বিদ্যার পায়ে ধরাইয়া বলিয়াছেন—

হৃদে ধরে রাঙাপদ হৃদে যেন কোকনদ নূপুর ভ্রমর ধ্বনি করে।"
ভারত কহিছে সার বলিহারি যাই তার হেন পদ মাথায় যে ধরে।

২ রামপ্রসাদও বিদ্যাসুন্দরে এইরূপ কষ্টকল্পিত আলঙ্কারিকতার সাহায্যে বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দু-সুধায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়।
নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধুপান।
ক্রমে ক্রমে বাড়িল বায়ণকুম্ভস্থান।
কিবা সোমরাজি ছলে বিধি বিচক্ষণ।
যৌবন-কৈশোর-দ্বন্দ্ব করিল ভঞ্জন।
কোন বা বড়াই কাম পঞ্চশর তূণে।
কতকোটি খরশর সে নয়নকোণে।

আর একখানি সমসাময়িক কাব্য নিধিরাম আচার্য্যের কালিকা-মঙ্গল। ইহাতেও এই ধরণের রূপবর্ণনা আছে।

মাধার মারফতে যে-সব কথা বলা হইত—বিদ্যার মারফতে সে-সব কথা বলিয়া ভারতচন্দ্র অল্প সাহসের পরিচয় দেন নাই।

চোরবেশে ধৃত সুন্দরকে দেখিয়া রাণীর মাতৃ-বাৎসল্যের উদয় ও খেদ বেশ সরস করিয়া বর্ণিত। সুন্দরকে দেখিয়া পুরনারীদের পতিনিন্দা—আর একটি সরস রচনা। পুরনারীদের পতিনিন্দা একটি চিরপ্রচলিত প্রথা, ইহাতে ভারতচন্দ্রের মৌলিকতা নাই। কিন্তু রচনা-চাতুর্য্যে কবি এ শ্রেণীর পূর্ব্ববর্ত্তী সকল রচনাকেই পরাজিত করিয়াছেন। এই রচনার রুচিও জঘন্য। ইহাতে রঙ্গ-রসের চাতুর্য্য আছে। অধিকাংশ স্থল তুলিয়া দেখাইবার উপায় নাই। অপেক্ষাকৃত শিষ্ট অংশ উৎকলন করিয়া দেখাই—

রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই তারে।
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ,
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উদ্বন।
চতুর্ম্মুখ খাইতে বলে শুনে দুঃখ পায়,
বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের মাথায়।
আর রামা বলে সই কিছু ভাল বটে,
নাড়ী ধরিবার বেলা হাতে ধরা ঘটে।
রাজ-সভাসদ পতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত,
না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত। ইত্যাদি

কবি পুরনারীদের মধ্যে দপ্তরী, ঘড়েলের বধূদেরও বাদ দেন নাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ীতে যে সকল লোক চাকুরী করিত, ভারতচন্দ্র এই প্রসঙ্গে যেন তাহাদের সকলেরই পরিচয় দিয়াছেন।৩ সমসাময়িক সুপরিচিত লোকদের লইয়া রঙ্গরস করাও কবির উদ্দেশ্য ছিল। সমস্তের মধ্য দিয়া সুন্দরের মদনমোহন রূপেরই মহিমা

সুন্দরীর মুখখানি দেখি যুবরাজ।
কলঙ্ক শরীর চাঁদে পাইলেক লাজ।
কষ্টতপ করে চাঁদে পাই অপমান।
মাসে মাসে মরে গিয়ে না হয় সমান।
তিলফুল জিনি চারু নাসিকার ঠাম।
রূপে গুণে খগপক্ষী চঞ্চুর সমান।
লজ্জায় আকুল হৈয়া পক্ষী খগেশ্বর।
বিষ্ণুসেবা করে পক্ষী হৈতে সমসর।
তথাপি না পারিল নাসা সমান হৈতে।
লজ্জা পাইয়া তদবধি না আসে ভারতে।
খঞ্জন চকোর আর কুমুদ কুরঙ্গ।
নয়নে দেখিয়া তারা অপমানে ভঙ্গ।
খঞ্জন উড়িয়া গেল মৃগ বনমাঝে।
চকোর চান্দের আগে রহিলেক লাজে।

৩ ভারতচন্দ্রের জন্ম পল্লীতে হইলেও তিনি নাগরিক জীবনই যাপন করিতেন। তাঁহার কাব্যে বাংলার পল্লীজীবনের পরিচয় নাই। বাংলার নাগরিক জীবনই সর্ব্বত্র ফুটিয়াছে। এই যে নগর—তাহা কৃষ্ণনগর ছাড়া আর কিছু নয়। বর্দ্ধমান—এমন কি দিল্লীও কৃষ্ণনগরেরই পুনরাবৃত্তি।

কীর্ত্তিত হইয়াছে। কবি এই প্রসঙ্গে সে-কালের কুলীন-রমণীর করুণ-কাহিনীর আভাস দিয়াছেন—

দু' চারি বৎসরে যদি আসে একবার,
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার।
সূতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়,
তবে মিষ্ট মুখ, নহে রুষ্ট হ'য়ে যায়।

কুলীন-কন্যা চরকায় সূতা কাটিয়া, সেই সূতা হাটে বিক্রয় করিয়া কিছু সঞ্চয় করিত—তাহাই দক্ষিণা দিয়া কুলীন পতির একদিনের দুর্লভ দাক্ষিণ্যটুকু লাভ করিত—এ কাহিনী বড়ই করুণ।

এক কথাতেই সমাজের একটি অঙ্গ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—"শাশুড়ী বাঘিনী ননদ নাগিনী"—তখন ঘরে—ঘরে। কিন্তু প্রত্যেক কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে "সতিনী বাঘিনী।"

সারীকে ভর্ৎসনাচ্ছলে শুকের মুখে সুন্দরের পরিচয় কবির রচনাচাতুর্য্যের একটি নিদর্শন। কবিকঙ্কণের সুশীলার বারমাস্যার মত বিদ্যার একটি বারমাস্যার বর্ণনা আছে। ইহার রচনা গতানুগতিক। ভারতচন্দ্র ইহাতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর সুশীলার বারমাস্যায় ঢের বেশি প্রেমাকুলতা ও নবপরিণীতাসুলভ আগ্রহ অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সুন্দরকে ভারতচন্দ্র বিদ্যা ও সৌন্দর্য্য দিয়া গড়িয়াছেন—রক্তমাংসের দেহ সে পায় নাই। কাজেই তাহার বাঙ্ময় দেহে কবি প্রাণসঞ্চারের চেষ্টাও করেন নাই। কেবল কামসঞ্চারই ত প্রাণসঞ্চার নয়। যাহার দেহে ভৌতিক প্রাণই নাই—সে ঘাতকের কৃপাণের তলে প্রাণের জন্য আকুল হইবে কেন? সে রাজার সঙ্গে রসিকতা করিতেছে—আপনার পরিচয় না দিয়া রাজাকে হতবুদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে, চৌরপঞ্চাশিকার শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছে—শেষে মশানে গিয়া শব্দচাতুর্য্যের দ্বারা পঞ্চাশ অক্ষরে গ্রথিত স্তব পাঠ করিতেছে—কিন্তু নিজের আসন্ন মৃত্যুর জন্য বিন্দুমাত্র ব্যাকুল হইতেছে না। অক্ষর গণনার দ্বারা নিষ্পন্ন স্তব পঞ্চাশ অক্ষরে না হইলেও চৌত্রিশ অক্ষরে শ্রীমন্তও করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শ্রীমন্ত ছিল জীবন্ত—তাই সে প্রাণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল—সে অতি করুণ ভাষায় দাসী দুর্ব্বলার উদ্দেশেও তর্পণের জল নিবেদন করিয়াছিল। আসন্ন-মৃত্যুর ছায়ায় অঙ্কিত শ্রীমন্তের চিত্রের কাছে সুন্দরের চিত্র একটা ছায়ামাত্র।

একজন ছদ্মবেশী রাজপুত্র ও একটি রাজকন্যার গুপ্তপ্রণয়-কাহিনী লইয়া রচিত গল্প এদেশে বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল। 'চৌরিপীরিতি'র মাধুর্য্য যে অপারসীম তাহা বহুকাল হইতে কবিরা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন—সে পীরিতি 'রেবারোধসি বেতসী-তরুমূলেই' হউক আর 'যমুনারোধসি' তমালতরুমূলেই হউক। 'যমুনারোধসি' যে 'চৌরিপীরিতি' তাহা ধর্ম্মভাবের সহিত বিজড়িত। ধর্ম্মভাববর্জ্জিত চৌরিপীরিতির কাহিনী লইয়াও এদেশে বাংলার কাব্য রচিত হইত। যেমন, কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর। মঙ্গলকাব্যের যুগে এই কাহিনী আবার দেবীর মহিমা প্রচারের

সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া বিদ্যাসুন্দরের প্রচলিত কাহিনীর সৃষ্টি করিল। এই দেবী চণ্ডী নহেন—চণ্ডীরই রুদ্রাণীরূপ—কালী। ফলে বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনী কালিকামঙ্গল কাব্যের রূপ ধারণ করিল। এই কালিকামঙ্গলের প্রধান কবি গোবিন্দদাস, (চট্টগ্রামের) কাশীনাথ, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ইত্যাদি। এই কাহিনীর সহিত কাশ্মীরের কবি বিল্হনের চৌর-পঞ্চাশিকার কাহিনী সংযুক্ত হইল। কবি বিল্হন কোন রাজকন্যার সহিত গুপ্তপ্রণয় করিয়া ধরা পড়েন। তাহার ফলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। কবি পঞ্চাশটি স্বরচিত আদি-রসাত্মক শ্লোক শুনাইয়া রাজাকে মুগ্ধ করেন। তাহার ফলে তিনি প্রাণ ও প্রাণাধিকা দুইই ফিরিয়া পান, কোন দেবদেবীর অনুগ্রহে নয়। এই কাহিনী-বাংলার বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সহিত যুক্ত হওয়ায় প্রণয়ী রাজপুত্র একাধারে কালীর ব্রতদাস, অনুগৃহীত ভক্ত এবং কবিরূপে অঙ্কিত হইলেন এবং পঞ্চাশটি আদিরসাত্মক শ্লোকের দ্বারা কবিনায়ক রাজাকে মুগ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু নিস্তার পাইলেন—কালিকার অনুগ্রহে। তাহা ছাড়া, কালিকার কৃপাতেই সুন্দর সিঁদকাটির সাহায্যে সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া রাজকন্যার গৃহে প্রবেশ লাভ করিলেন।

বাংলার মঙ্গলকাব্যের ধারা ও পদ্ধতি অনুসারে বিদ্যা ও সুন্দর শাপভ্রষ্ট দেবদেবী, কালিকার পূজাপ্রচারের জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ। ভারতচন্দ্র গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন—কালী মূর্ত্তিমতী হইয়া সুন্দরকে বলিতেছেন—

তোমা মোর দাসদাসী শাপেতে ভূতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা।
ব্যক্ত হইল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
নানামতে আমারে তুষিলা।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ও চৌরপঞ্চাশিকা কালিকামঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত হইল। এই শ্রেণীর কালিকামঙ্গল কাব্য যতগুলি রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গলই প্রাঞ্জলতায় ও কবিত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার অল্পদিন পূর্ব্বে রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। রামপ্রসাদও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগৃহীত কবি ছিলেন। রামপ্রসাদও সম্ভবতঃ রাজার আদেশেই এই কাব্য রচনা করেন। রাজা এই কাব্য পড়িয়া সম্যক্ তৃপ্তিলাভ না করিয়া ভারতচন্দ্রকে বিদ্যাসুন্দর রচনার আদেশ দেন বলিয়াই অনুমিত হয়। ভারত-চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর প্রকাশিত হওয়ার ফলে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের দশা হইল সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রের মত। রামপ্রসাদের গীতির ঐশ্বর্য্য ছিল—দেশের লোকও তাঁহার পদাবলীর ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া তাঁহার বিদ্যাসুন্দরকে ভুলিয়া গেল। রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক সম্বল ছিল, সে সম্বলের বলে রামপ্রসাদ চিরদিনই এদেশে ধর্ম্মগুরুরূপে পূজ্য। ভারতচন্দ্রের সে সৌভাগ্য হয় নাই।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সহিত বর্দ্ধমান রাজপরিবারের কোন সম্পর্ক নাই। চট্টগ্রামের কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন বিদ্যার পিতার রাজধানী রত্নপুর, কবি কৃষ্ণরাম বলিয়াছেন—বীরসিংহপুর। ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপরিচিত স্থানেরই নাম দিয়াছেন-অর্থাৎ এমন একটা নগরের নাম দিয়াছেন যাহার বর্ণনায় কৃষ্ণনগরে বর্ণনা করিলেই চলিবে। কেহ কেহ মনে করেন—বর্দ্ধমান রাজপরিবারের উপর তাঁহার পারিবারিক আক্রোশ ছিল। বর্দ্ধমানরাজের অত্যাচারে তাঁহাকে বিষয়সম্পত্তি হারাইয়া দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরও বর্দ্ধমানরাজের প্রতি একটা ঈর্ষ্যা থাকিতে পারে। যাহাই হউক—ভারতচন্দ্র তাঁহার বিদ্যাসুন্দরকে এমনভাবে অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন—যাহাতে বর্দ্ধমান রাজ-পরিবারের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না।৪

বিদ্যাসুন্দরের সহিত মঙ্গল-কাব্যগুলির অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, অনেক বিষয়ে বৈষম্যও আছে। বিদ্যাসুন্দরে দেবতার মহিমা প্রচার মুখ্য নয়—গৌণ; আদিরসাত্মক কবিত্ব-সৃষ্টিই মুখ্য। সুন্দর কালীপূজা প্রচারের জন্য শাপভ্রষ্ট—কবি গ্রন্থশেষে এ কথায় উল্লেখমাত্র করিয়াছেন। কোন্ স্বর্গবাসী যে শাপভ্রষ্ট হইলেন এবং কি অপরাধের জন্য বা দেবতার কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি শাপগ্রস্ত হইলেন—এ সকল কথা ইহাতে নাই। হরিহোড় বা ভবানন্দের অভিশাপ সম্বন্ধে যেরূপ একটা কাহিনী আছে, সুন্দর সম্বন্ধে সেরূপ কাহিনী নাই। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবতা আপন পূজা-প্রচারের জন্য যে ব্যাকুলতা দেখাইয়াছেন, যে সৎ ও অসৎ উপায়-কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন এবং যেভাবে বিদ্রোহীর দণ্ডবিধান করিয়াছেন, বিদ্যাসুন্দরে সেসকল কথা একে-বারেই নাই। তাহা ছাড়া, বিদ্যাসুন্দরে ভিন্ন ভিন্ন ভক্তদের মারফতে দেবতায় দেবতায় দ্বন্দ্বের কথা একেবারে নাই। দেবদ্রোহী চরিত্রের সমাবেশ একেবারে নাই। তবে দেবী আপনার ভক্তকে অসাধ্য

৪ মানসিংহ প্রতাপাদিত্য-দমনের জন্য বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছিলে ভবানন্দ তাঁহাকে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বিবৃত করিতে-ছেন—মানসিংহ গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সুরঙ্গ দেখিয়া আসিলেন। ভবানন্দ বলিতে চাহিয়াছেন—বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়-ব্যাপার এই বর্দ্ধ-মানে বহু পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। মানসিংহের বঙ্গাভিযানের পরে বর্দ্ধমান রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠা। অতএব ইহা বর্দ্ধমানের কোন কাল্পনিক রাজার অন্তঃপুরের কাহিনী। মোগলযুগে বর্দ্ধমান একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল। জাহাঙ্গীরের যৌবনকালে এখানে শের আফগান শাসনকর্ত্তা ছিল। সে কথা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। এই বর্দ্ধমানকেই কবি ঘটনাস্থল কল্পনা করিয়াছেন—কাব্যের আবেষ্টনী-সৃষ্টির সুবিধার জন্য। বিল্হনের চৌর-পঞ্চাশিকার রাজাটির নাম বীরসিংহ। ভারতচন্দ্র সেই নামই গ্রহণ করিয়া-ছেন। সুকবি সুপণ্ডিত সুন্দরের উপযুক্ত প্রণয়িনী পরিকল্পনার জন্য রাজকুমারীকে বিদুষী কল্পনা করিয়া তাঁহার নামও দিয়াছেন বিদ্যা। বর্দ্ধমান নগরের সহিতও ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই। এরূপ ঘটনা যদি কোথাও ঘটিয়া থাকে তবে কাশ্মীরে কিংবা অন্য কোন স্থলে। ইতিহাসোক্ত ভবানন্দ-মানসিংহের সহিত সূত্র বন্ধনের জন্যই কবি বাংলা দেশের একটি সুপরিচিত স্থানের নাম গ্রহণ করিয়া-ছেন মাত্র। নায়ককে কোন দূরবর্ত্তী দেশ হইতে সমাগত কল্পনা করার মধ্যে একটা Romance আছে— সেই Romance সৃষ্টির জন্য সুন্দরকে বহুদূরবর্ত্তী কাঞ্চীদেশের রাজকুমার বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

সাধনে সহায়তা করিতেছেন এবং ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য মশানে অবতীর্ণ হইতেছেন। ইহা মঙ্গলকাব্যের ধারারই অনুসরণ।

গুপ্ত প্রণয়ের কথা অথবা প্রণয়ি-প্রণয়িনীর উচ্চশ্রেণীর বৈদগ্ধ্যের কথা অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে নাই। কুটনী-চরিত্র কোন কোন মঙ্গলকাব্যে ও গীতিসাহিত্যে পূর্ব্ব হইতেই ছিল। মীনচেতনে ছিল যোগিনী, ধর্ম্মমঙ্গলে ছিল নয়ানী। মৈমনসিংহ গীতিকাব্যেও এইরূপ চরিত্রের সহায়তা লওয়া হইয়াছে। গোবিন্দ দাসের কালিকামঙ্গলে রম্ভা, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে বিন্দুবামনী, কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলে বিমলা, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে সে-ই হীরা। দীনেশবাবুর মতে এই কুটনী-চরিত্র মুসলমান সাহিত্য হইতে আমদানী করা।৫ ইহা সঙ্গত মনে হয় না। দূতীরূপে এ চরিত্রটি চিরকালই সাহিত্যে বর্ত্তমান আছে। ভারতচন্দ্র এই চরিত্র-রচনায় অনেকটা মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। হীরার বেসাতি কবিকঙ্কণের দুর্ব্বলার বেসাতিরই অনুসৃষ্টি। সুপুরুষ দর্শনে পুরনারীদের মোহমুগ্ধতার বর্ণনা সংস্কৃত কাব্য হইতেই চলিয়া আসিতেছে—বাংলা কাব্যের ইহা একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। গৌর-গীতিকায় নদীয়া-নাগরীদের রূপমুগ্ধতার কথা নরহরি, লোচন দাস ইত্যাদি কবিরা খুব রসাইয়া রসাইয়া বলিয়াছেন। এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের চৌর-গীতিকায় মৌলিকতা নাই। পুরনারীদের পতি-নিন্দার পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যের চিরপ্রচলিত প্রথা। তবে ভারত-চন্দ্র ইহা লইয়া প্রচুর রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিহারের কথা কোন কোন মঙ্গলকাব্যে অল্পবিস্তর আছে বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত কেহ এমন নির্লজ্জভাবে বর্ণনা করিতে সাহসী হ'ন নাই। কবি এই সাহস পাইয়াছেন—বৈষ্ণব পদাবলী হইতে। কবি এই বিষয়ে বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাসকেও পরাজিত করিয়াছেন।

চৌত্রিশ অক্ষরে দেবীস্তবের (চৌতিশা) কথা প্রচলিত ছিল, ভারতচন্দ্র পঞ্চাশ অক্ষরের স্তব রচনা করিয়াছেন। বারমাস্যা বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। সুশীলার বারমাস্যার অনুসরণে ভারতচন্দ্র বিদ্যার একটি বারমাস্যা রচনা করিয়াছেন। শুক-শারীর মুখে কথা বসানো পূর্ব্বপ্রচলিত পদ্ধতি। বিদ্যাসুন্দরে সেই প্রথারই অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সহিত বিদ্যাসুন্দরের প্রধান প্রভেদ, বিদ্যাসুন্দরের রচনাভঙ্গীতে। বিদ্যাসুন্দর আখ্যান-মূলক খণ্ডকাব্য হইলেও ইহা প্রধানতঃ কতকগুলি গীতি-কবিতার সমষ্টি। অনেক প্রসঙ্গের গীতি-কবিতা হিসাবে স্বতন্ত্র মূল্য আছে। অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যে গল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষার অজুহাতে অনেক অনাবশ্যক নীরস কথার সমাবেশ আছে, এ কাব্যে তাহা নাই। কবি যতটুকু সরস করিয়া বলিতে পারিয়াছেন—ততটুকুই বলিয়া গল্পের ধারা-বাহিকতা রক্ষা করিয়াছেন। অন্যান্য কাব্যে নীতি-প্রচারের জন্য,

৫ দীনেশ-বাবু বিদ্যাসুন্দরের রুচিবিকার মুসলমানী প্রভাবের ফল বলিয়াছেন। কাব্যের আবহাওয়া মুসলমানী হওয়ারই কথা —নবাবী আমলে রাজা-জমিদাররা মুসলমানী কেতাই অনুসরণ করিত। তাই বলিয়া মুসলমান-সাহিত্যের প্রভাব পড়িয়াছে মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বিদ্যার রূপ-বর্ণনার মত আলঙ্কারিক কসরৎ পার্শী সাহিত্যেও থাকিতে পারে, কিন্তু এইরূপ আমাদের দেশের সাহিত্যেও ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। ভারতচন্দ্রের রচনায় সংস্কৃত কবিদের প্রভাব যদি কিছু স্পষ্টভাবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তবে এই আলঙ্কারিকতায়। কুটনীর চরিত্রই বা মুসলমান সাহিত্য হইতে আসিয়াছে এ কথা মনে করিবার কি কারণ আছে? সংস্কৃত সাহিত্যের দূতীই ত বাংলা সাহিত্যের কুটনী। প্রেমের ব্যাপারে দূতী একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বড়াই-ই ত বাংলা সাহিত্যের আদি কুটনী। বৈষ্ণব সাহিত্যে বৃন্দা, ললিতা, বিশাখার কাজই অপকৃষ্টতা লাভ করিয়া মালিনীর কাজে দাঁড়াইয়াছে। গোপনে গর্ভসঞ্চারের জন্য মায়ের তিরস্কার একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এ জন্য অন্য দেশের সাহিত্যের দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন কেন হইবে? বরং রামপ্রসাদের বিদ্যা-সুন্দরে মা ও মেয়ের কথা-কাটাকাটির মধ্যে যে ইতর শ্রেণীর রসিকতা ফুটিয়াছে—তাহাকে বিজাতীয় মনে করিবার কারণ আছে।

দীনেশবাবু বিদ্যাসুন্দরে কয়েকটি অসঙ্গতির কথাও বলিয়াছেন। সুন্দর সন্ন্যাসী বেশে রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় যে রঙ্গরসিকতা করিয়াছে, তাহা শ্বশুরের প্রতি জামাতার অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক আচরণ। জল্লাদের খড়্গ যখন সুন্দরের মাথার উপর—তখন সুন্দর নিশ্চিন্ত মনে গণিয়া গণিয়া পঞ্চাশ অক্ষরের আনুপ্রাসিক স্তব করিতেছে, ইহাও বড়ই অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। অর্থাৎ দীনেশ বাবু বিদ্যাসুন্দরে Realism বা বাস্তবনিষ্ঠতা প্রত্যাশা করিয়াছেন। আমি বিদ্যাসুন্দরকে অন্নদামঙ্গলের গর্ভকাব্য বলিয়াছি। বিদ্যার গর্ভসঞ্চার ছাড়া এই কাব্যে বাস্তবনিষ্ঠ কোন কথা নাই। যে কাব্যে ছয় মাসের পথ ছয় দিনে আসা যায় এবং দেবীর ও সিঁদ কাঠি দিয়া মালিনীর বাড়ী হইতে রাজ-অন্তঃপুরের (কোন্ তালায়? একতালা নিশ্চয়ই নয়) বিদ্যার কক্ষ পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ খনন করা যায়—সে কাব্যে সঙ্গতি-অসঙ্গতি স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতার প্রশ্ন তোলাই বিড়ম্বনা। দীনেশবাবু স্বাভাবি-কতার অভাবের জন্য দোষ দিয়াছেন, সুকুমার বাবু উল্টা কথা বলিয়াছেন। সুকুমারবাবুর উক্তিও সঙ্গত নয়। "রামপ্রসাদের কাব্যে সকল চরিত্রগুলিই স্বাভাবিক হইয়াছে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে চরিত্রগুলি Typical প্রায় যেন Satirical এই জন্য ভারতচন্দ্রের কাব্যের কাছে রামপ্রসাদের কাব্য অনেকটা নিষ্প্রভ।" স্বাভাবিকতা দোষ নয়, গুণই। এ জন্য নয়, অন্যান্য কারণে রামপ্রসাদের কাব্য নিষ্প্রভ।

মোটের উপর ভারতচন্দ্রের কাব্যে মুসলমানী সাহিত্যের প্রভাব স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। আলঙ্কারিকতার ভঙ্গী ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও বিশেষ কিছু নাই—প্রাচীনতর বাংলা সাহিত্যের প্রভাবই সমধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। বাংলা সাহিত্যের চিরপ্রচলিত প্রথাপদ্ধতিগুলিই অন্নদামঙ্গলে অনুসৃত হইয়াছে। আর বিদ্যাসুন্দরও পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দরগুলির পরিমার্জ্জিত সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতচন্দ্রের কৃতিত্বের অনেক অংশই পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের প্রাপ্য।

লোকশিক্ষার জন্ত এবং বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য-প্রকাশের জন্ত যে অনেক অবান্তর কথার সমাবেশ হইয়াছে—অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান আসিয়া পড়িয়াছে—এই কাব্যে তাহা নাই। ব্যক্তি, বস্তু, স্থান ইত্যাদির নীরস তালিকাও ইহাতে স্থান পায় নাই। কবি যেন কতকগুলি গীতি-কবিতাকে একত্র গ্রথিত করিয়া কাব্যখানিকে রূপ দান করিয়াছেন। মাঝে মাঝে অনেক গান এবং স্তবও সংযোজিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে আমরা যাহাকে গীতি-কবিতা বলি—বলা বাহুল্য, বিদ্যাসুন্দরের গীতি-কবিতা সেই শ্রেণীর নয়। এইগুলিতে মনের আবেগের উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি নাই। বেদনার কথা যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করা হইয়াছে। যেখানে বেদনার কথা আছে, সেখানে কবি যে সংযম দেখাইয়াছেন, তাহা ইচ্ছাকৃত সংযম নয়। রঙ্গ-রসের কবি ভারতচন্দ্রের লেখনীতে বেদনার চিত্র স্বভাবতই ফুটিত না। অনেক স্থলে বেদনাকে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। রঙ্গরসের আতিশয্যে ছোটখাট সুখ-দুঃখ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। দাম্পত্য জীবনের গভীর বেদনাও তাঁহার পরিহাসের বস্তু ছিল। একমাত্র রতিরসের আবেশটাই কবির রচনায় আবেগে পরিণত হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের গীতি-কবিতা বাক্-চাতুর্য্য ও মণ্ডনকলার সু-পরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। রসের আবেদনটা হৃদয়-বৃত্তিকে আশ্রয় করে নাই—পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া সার্থকতা লাভ করিতে চাহিয়াছে।

পারসীক চিত্রশিল্পের ঐতিহাসিক পটভূমি

শ্রীগুরুদাস সরকার

প্রাচীন সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে কোন দেশের চারু-শিল্প কি করিয়া গড়িয়া উঠিল তাহা ভালরূপ উপলব্ধি করা যায় না। অতীতের ইতিহাস একবারে বাদ দিলে বর্ত্তমান নিতান্ত খাপছাড়া হইয়া পড়ে, তাই সন-তারিখের ও প্রয়োজন রহিয়াছে। পারস্যের ইতিহাসের প্রধান কয়টি যুগের উল্লেখ করিয়া মোটামুটি রকমের একটা কালসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একিমিনীয় যুগ	...	৫৫০—৩৩০ খৃঃ পূঃ অব্দ
গ্রীকাধিকার কাল	.	৩৩৪—১২৯ খৃঃ পূঃ অব্দ
পারদ (পার্থীয়) যুগ	...	২৪৮—২২৬ খৃঃ পূঃ অব্দ
সাসানীয় যুগ	.	২২৬—৬৫২ খৃঃ অব্দ
হিজরা (পয়গম্বর মহম্মদের মদিনাগমন)	...	৩২২ খৃঃ অব্দ
আরবগণ কর্ত্তৃক পারস্তজয়	...	৬৩৫—৬৫২ খৃঃ অব্দ
দামাস্কসে ওমাইয়া বংশীয় খলিফাগণের রাজত্ব	...	৬৬১—৭৫০ খৃঃ অব্দ
বোগ্দাদে আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের রাজত্ব	...	৭৫০—১২৫৮ খৃঃ অব্দ
সেলজুক তাতার বংশীয়দিগের রাজত্ব	...	১০৩৭—১১৯৭ খৃঃ অব্দ
চেঙ্গিজখাঁর সমরাভিযান ও রাজত্বকাল	...	১২০৬—১২২৭ খৃঃ অব্দ
মোঙ্গলদিগের হস্তে বোগ্দাদ নগরীর পতন	...	১২৫৮ খৃঃ অব্দ
তৈমুরের বিজয়াভিযান ও রাজত্বকাল	..	১৩৬৯—১৪০৫ খৃঃ অব্দ
তৈমুর বংশের রাজত্বকাল	...	১৩৬৯—১৪৯৪ খৃঃ অব্দ
সাফাবীয় বংশের রাজত্বকাল	...	১৫০২—১৭৩৬ খৃঃ অব্দ
জান্দবংশীয় নৃপতিগণ	...	১৭৫০—১৭৯৪ খৃঃ অব্দ
কাজর রাজবংশ	..	১৭৯৮—১৯২৫ খৃঃ অব্দ
রিজা সাহ পহ্লভী	.	১৯২৫—১৯৪১ খৃঃ অব্দ

পারস্যের নিজস্ব সভ্যতার ঐতিহাসিক পত্তন হয় ৫৫৮ খৃঃপূঃ অব্দে, মহানুভব সাইরাস্ কর্ত্তৃক একিমিনীয় বংশের প্রতিষ্ঠা হইতে। মধ্যযুগের পারসীকগণ একিমিনীয় সম্রাটদিগের কথা একবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাই প্রাচীন ক্ষোদিত লিপিতে যথেষ্ট উল্লেখ থাকিলেও তাঁহাদের গৌরব-গাথার কোন সংবাদই সাহনামায় পাওয়া যায় না। এ ত্রুটি সংশোধন করিয়াছেন জাতীয়তা-প্রবুদ্ধ আধুনিক মুসলমান পারসীক কবিগণ। কবি আমিরী তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতে মহানুভব সাইরাসকে চিরজীবী কল্পনা করিয়া প্রভাত-পবনকে দূতপদে বরণ করিয়াছেন এবং সম্রাট সকাশে সহানুভূতিশূন্যতার জন্ত অনুযোগ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন যে, এ দুর্দ্দশার দিনে তিনি স্বদেশের প্রতি এত বিমুখ কেন'? ফারুখী নামক অপর একজন কবি নিজ মাতৃভূমি প্রতীচ্যের দুইটি শক্তিশালী জাতির দ্বারা পদদলিত হইতেছে দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"এই" কি সেই ইরাণ—যাহা কাই-কাউস ও দারিয়ুসের বিশ্রাম স্থান, যেখানে সাইরাস্ তাঁহার শান্তিময় আবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাহা জাল, রুস্তম প্রভৃতি বীরগণের স্বদেশ বলিয়া পরিচিত!" পুর-ই-দাভুদ দেশাত্মবোধ উদ্রিক্ত করিয়া তাঁহার "ইরাণবাসী! ইরাণবাসী!" নামক বিখ্যাত কবিতায় প্রাচীন যুগের জয়দৃপ্ত সেনাবাহিনীর ও সুবিখ্যাত নৃপতিগণের কথা স্মরণ করিয়া শুধু যে সাইরাস্, ক্যামবাইসিস্ প্রভৃতিরই উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নহে, পৌরাণিক পিশ্দাদীয় বংশেরও গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। শুধু ইঁহারাই নহে, আরিফ, বাইজাই, হুসাম্জাদ্, রাইজান্ সুরতগর্ ও মসৃকর-প্রমুখ কবিগণ তাঁহাদের কবিতায় প্রাচীন ইরাণের অতীত গৌরব ও সে যুগের অজেয় বীরবৃন্দ ও অপূর্ব্ব বৈভবশালী নৃপতিগণের কথা উল্লেখ করিয়া ঐতিহ্যের

ধারা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন (১)। আধুনিক ইরাণ, শিল্প ও সংস্কৃতির দিক দিয়া আপনাকে একিমিনীয় সভ্যতার নিকট ঋণী বোধ না করিলে, এরূপ যশঃকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইত না।

একিমিনীয় যুগের শিল্পোৎকর্ষের কথা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে (২)। পাথরে ক্ষোদাই করা, রত্নাদির উপর উৎকীর্ণ, মিনা করা ইষ্টক দিয়া গড়া—তখনকার কালের যে সকল চিত্র কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া আধুনিক যুগে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহার কোনটিতে পরাজিত জাতির প্রতিনিধিদিগের ক্ষমা-প্রার্থনায়, কোথাও বা বিজয়োৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রায়, আবার কোথাও বা মৃগয়ার ও বন্দ্বযুদ্ধের আলেখ্য অঙ্কিত। (৩) কোথাও নৃপতি ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত রহিয়াছেন, কোথাও বা তিনি নিজহস্তে হিংস্র শ্বাপদ নিহত করিতেছেন। শীলমোহর ও মূল্যবান্ প্রস্তরাদির উপর দেব আহুরমজ্দার চিত্রও স্থান পাইয়াছে। একসময় যোন-রোমক (গ্রীক-রোমক) প্রভাব পারস্যশিল্পে শক্তিমান্ হইলেও একিমিনীয় ও মেসোপটেমীয় (বর্ত্তমান ইরাক) বাঁধা ছাঁচগুলি শিল্পিগণ একবারে ভুলিয়া যান নাই। পারস্যের শিল্পিসঙ্ঘ সেগুলিকে নিজ রক্ষণশীলতাগুণে সঞ্জীবিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে শক প্রভাব আসিয়া জান্তব মূর্ত্তিসমূহের পরিকল্পনা বিষয়ে পূর্ণতা প্রদান করে এবং নূতন জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়। মহাবীর সেকেন্দরের (Alexander the Great-এর) বিজয়াভিযান একিমিনীয় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটাইলেও পারস্য শিল্পের কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। পারস্য শিল্পের জীবনস্রোতঃ সাময়িকভাবে স্তব্ধ হইলেও যে মূলতঃ অব্যাহত ছিল, তাহা অস্কার রাফায়েল চিত্রশালার খৃঃ পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর আইবেক্স মূর্ত্তিত্রয়ের সহিত কাইজার ফ্রেডেরিক যাদুঘরে রক্ষিত খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর, স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত উল্লম্ফনে উন্মুখ একটি পক্ষযুক্ত আইবেক্সের পরিকল্পনা ও সম্পাদনের দিক দিয়া তুলনা করিলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। শেষোক্ত মূর্ত্তিটি যে অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠ, তাহা যে কোনও রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি তুলনামূলক বিচারে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন; আর ইহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে যে, একিমিনীয় যুগের শিল্প-পদ্ধতির দ্বারা পুষ্ট না হইলে সাসানীয় যুগের প্রথমাংশের এই শিল্প-নিদর্শনটি কোন ক্রমেই শিল্পীর হস্তে মূর্ত্ত হইতে পারিত না। সাসানীয় যুগের ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত জন্তুমূর্ত্তিগুলি এখনও পারসীক শিল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলিয়া পরিগণিত। কালবশে শিল্পের যে কেবল অধোগতিই হইবে, একথা সকলক্ষেত্রে বলা চলে না। মধ্যবর্ত্তী পারদ (Parthian) যুগের ইরাণীয় শিল্পধারা অনুধাবন করিলেও দেখা যাইবে যে, তাহাতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব প্রকট বটে কিন্তু ভাব-ভঙ্গীতে ও বেশভূষায়, দেশীয় ছাপ মুছিয়া যায় নাই। বের্লিনের কায়জার ফ্রেডেরিক্ মিউজিয়মে রক্ষিত পারদ যুগের একটি পোড়ামাটির ফলকের (plaque এর) উপর যে অশ্বারোহী ধানুকীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহারই উল্লেখ করা যাইতে পারে। খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতে ৮০০ অব্দের মধ্যে প্রস্তরপটে উৎকীর্ণ একটি মৃগয়ারত অশ্বারূঢ় ধনুর্ধারী মূর্ত্তির (১) সহিত ইহার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

ভারতের সহিত ইরাণের প্রথম প্রামাণিক সংস্পর্শের পরিচয় পাওয়া যায় খৃঃ পূঃ ৫১৯ হইতে ৫১১ অব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ বেহিস্তুন লিপি হইতে। সে সময় গান্ধারের অধিবাসিগণ সম্রাট দেরিয়ুসের (দরায়ুসের) প্রকৃতিপুঞ্জের অন্তর্গত ছিল। একিমিনীয় রাজ্যের অংশহিসাবে গান্ধার বোধ হয় এই সময়েই ইরাণীয় প্রভাবের সংস্পর্শে আসিয়া থাকিবে। একিমিনীয় যুগের অবসান হইতে সাসানীয় যুগ পর্য্যন্ত পারসীক কৃষ্টির ইতিহাস অনেকাংশে অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইরাণ হইতে পরাক্রান্ত পারদজাতি ভারত আক্রমণ করে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে। পারদদিগেরই আর্সিকীয় রাজবংশ (Arsekidae) পারস্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে খৃঃ পূঃ ২৪৮ হইতে ২২৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। এই বংশেরই প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি প্রথম মিথ্রিডেটিস্ (Mithridates) নিজরাজ্য পঞ্জাবের ঝিলাম নদীর উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। ভারতের সহিত ইরাণের ইহাই বোধ হয় অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সংস্পর্শ।

কেহ কেহ গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্যে গ্রীক (যোনক)-ও ইরাণীয় (পারসীক) প্রভাব লক্ষ্য করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই মতবাদের মূলভিত্তি কতটুকু তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। গান্ধার শিল্পে ইরাণীয় প্রভাব সাসানীয় যুগে (খৃঃ অঃ ২২৬-৬৪২) অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল—পণ্ডিতগণ এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মৌর্য্যযুগের সেই স্তম্ভশীর্ষে পার্সিপোলিসের স্থাপত্যপদ্ধতির অনুকৃতি (Parsepolitan Capital), খৃঃ চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম শতাব্দীর পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত গুপ্ত ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। ভারতীয় বর্দ্ধকী পূর্ব্ব হইতেই কাটিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে জানিত। হারাপ্পায় প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের খণ্ডিত প্রস্তরমূর্ত্তি এই সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিতেছে। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালেই (খৃঃ পূঃ ৩০০—২৩২) পারসীক প্রভাব ভারতীয় ভাস্কর্য্যে প্রথম দেখা দেয়। লুভর্ মিউজিয়মে যে একটি একিমিনীয় স্তম্ভশীর্ষ রক্ষিত আছে, তাহা আর্টাজেরিক্সিস নেমনের (Artaxerecxes Mnemonএর) রাজত্বকালের (খৃঃ পূঃ ৪০৪-৩৫৮)। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, খৃঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে ইরাণীয় প্রভাব ভারতে প্রথম প্রবেশ লাভ করে। কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় স্থাপত্যে এ পদ্ধতির স্তম্ভশীর্ষের প্রবর্ত্তন হওয়া হয়তো আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কিন্তু যেখানে ছয় শত

১ M. Ishaque, Modern Persian Poetry, pp. 150, 151, 152.

২ "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের "একিমিনীয় যুগে পারসীক শিল্প ও সংস্কৃতি" নামক নিবন্ধ।

৩ শুসা (Susa) নগরীর ধ্বংসাবশেষমধ্যে প্রাপ্ত, মিনা করা ইষ্টক সাহায্যে রচিত সিংহশ্রেণী ও ধানুকীগণের ভিত্তিচিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১ K. Mishkin Collection, ইহা খৃঃ ১৯৩১ সালের পারসীক শিল্পপ্রদর্শনীতে বার্লিংটন মিউজিয়মে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ক স্মারক (Souvenir) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শতাব্দীর ব্যবধান, সেখানে অনুকরণের কথা সহজে উঠিতে পারে কি করিয়া ? পারস্যে, পর্ব্বতগাত্রে, যে সকল উৎকীর্ণ চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহার যেগুলি বেশ উঁচু করিয়া কোদাই করা, সেগুলি যে ভারতীয় শিল্পীর হাতের কাজ, এ কথাও শুনিতে পাওয়া যায় (১)। অশোকের রাজত্বকালের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বেকার মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে (২)। প্রাক্-মৌর্য্য যুগের এ মূর্ত্তি কয়টিতে যে পারস্য প্রভাব বর্ত্তিয়াছে এ কথা কাহাকেও বলিতে শুনি নাই, আবার পারসীক রাজশক্তিকর্ত্তৃক ভারতীয় ভাস্কর নিয়োগও একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। শিল্পিকুলের যাতায়াত ছিল বলিয়াই এক দেশের বিশিষ্ট পদ্ধতি বা শিল্পধারা আর একদেশে সংক্রামিত হইতে পারিত। শিল্পের দিক দিয়া প্রত্যেক সভ্যতাই একটা নূতন বিশিষ্ট ভঙ্গীর, একটা নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন ঘটায়। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। পরিসর অথবা বিস্তৃতি এবং কালপারম্পর্য্য, এই দুইয়ের কোন দিক হইতে আমরা যদি কোনও সভ্যতার সীমানা পরিমাপের চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, কেবল সৌন্দর্য্যবিবেক ও রসগ্রাহিতার সাহায্যেই ইহার যথার্থ মীমাংসা সম্ভব। এরূপ সূক্ষ্ম বিচার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোন মাপকাঠির সাহায্যে করা যাইতে পারে না (৩)।

প্রাচীন ভারতের দেশজ শিল্পের পর্য্যালোচনার ফলে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বিদেশীয় প্রভাব ইহার ক্রমবিকাশে যে সহায়তা করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কারণে উহা শুধু নকল-নবীশ পর্য্যায়ে অবনমিত হয় নাই। এ কথার যাথার্থ্য সাক্ষী ভাস্কর্য্য হইতেই প্রতীত হইবে। ঢঙ (motif) বা ভাবধারার কতকাংশ পারস্য হইতে গৃহীত হইলেও ইহাতে প্রাচীন ইরাণীয় শিল্পের তুষারবৎ উদাসীন স্থৈর্য্য, অবিভিন্ন পুনরাবৃত্তি কিংবা উহার মহিম বিপুলতা (massiveness) কুত্রাপি অনুকৃত হয় নাই।

লোকপরম্পরায় প্রাপ্ত শিল্পের ইঙ্গিত বা উপাদান সকল জাতিরই সাধারণ উপজীব্য রূপে গণ্য হইতে পারে। আসিরীয়ার সুপ্রাচীন সভ্যতার নিকট আংশিক ভাবে ঋণী হইলেও আসিরীয় কল্পনার জাঁকাল আড়ম্বরের সমুচ্চ গৌরবে ভারতের শিল্প কদাপি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই এবং ভিনদেশীয় প্রতিভার নিকট বাহুল্য বরণ করিয়া লয় নাই। প্রাচীন ভারতের শিল্প ছিল প্রকৃতই জাতীয় শিল্প আর তাহার ভিত্তি ছিল ভারতবাসীর হৃদয়নিহিত ধর্ম্মবিশ্বাসে এবং বহিঃপ্রকৃতির সহিত গভীর ও আন্তরিক সহানুভবিতায়। সরল স্বতঃলব্ধ পরমার্থিকতাই ছিল ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই মৌর্য্য পালিশে (Mauryan polish এ)ও স্তম্ভাদির ঘন্টাকৃতি অগ্রভাগ অথবা জান্তব প্রকৃতিসম্বলিত স্তম্ভশীর্ষে পারস্যের প্রভাব সূচিত হইলেও আমরা বহুমুখী প্রতিভানিঃসৃত এই অকপট অভিব্যক্তি ভারতীয় ব্যতীত আর কিছুই বলিব না (১)। খুঁজিলে পুষ্পাদির নক্সায় কোথায় হয় তো আসিরীয় প্রভাব এবং পক্ষসমন্বিত জন্তসমূহের নক্সায় কোনও কোনও স্থলে বা পশ্চিম এসিয়ার প্রভাব লক্ষিত হয় বটে কিন্তু ইহাতে ভারতীয় শৈলীর মৌলিকতা কোথাও বিকৃত হয় নাই। শিল্পজগতে পারস্যের নিকট ভারত যে ঋণী, তাহা স্বীকার করিতে অগ্রণী হইলেও আমরা যেন বৈদেশিক পক্ষপাত হেতু ভারতের প্রতি অবিচার করিতে প্রবৃত্ত না হই।

পারস্যের প্রকৃত জাতীয় শিল্পের অভ্যুদয় হয় সাসানীয় যুগ হইতে। বিস্মৃতপ্রায় একিমিনীয় যুগ সম্বন্ধে অলীক বা অর্দ্ধভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিলেও পরবর্ত্তী যুগের শিল্পসাধক পারসীকেরা সাসানীয় যুগ হইতেই শক্তি ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। সাসানীয় রাজগণ রেশম-শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা ও উৎসাহদাতা ছিলেন। বয়ন-শিল্পের উন্নতির সহিত রেশম-বস্ত্রে নানারূপ শোভন অলঙ্কার ও চিত্রাদি স্থান পাইতে থাকে। ইরাণে আলঙ্কারিক চিত্র যে তখন হইতেই আদরণীয় হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়—খৃঃ ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দীর ভামাস্ক নামধেয় বিচিত্র কৌষের বস্ত্রের অদ্যাবধি বিদ্যমান নমুনাগুলি হইতে। এরূপ একটি নমুনায় অর্দ্ধপার্দ্দল অর্দ্ধপক্ষী একপ্রকার কাল্পনিক জন্তু পরস্পর-সংলগ্ন মণ্ডলের (medallion-এর) ভিতর প্রধান অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বুটি দিয়া ঘেরা বৃত্তগুলি কাপড়ের জমিতে এরূপ কৌশলে সুবিন্যস্ত যে, পাশাপাশি যে কোনও দুইটি বৃত্তে এই অর্দ্ধবিহঙ্গম শ্বাপদের মুখ যথাক্রমে দক্ষিণ ও বামদিকে ফিরান, যেন সেগুলি পরস্পর মুখামুখি করিয়া রহিয়াছে। এই সামঞ্জস্যসূচক অলঙ্কারবিন্যাস-পদ্ধতি পারসীক চিত্রশিল্পেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বস্ত্রশিল্পের এই সকল নক্সা পারসীক ললিত কলার চর্চ্চায় যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। শিল্প-কলার ধারাবাহিক বিবরণে কেবল পুঁথিতে আঁকা ক্ষুদ্রক চিত্রগুলি প্রশংসা লাভের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ধাতব মূর্ত্তি ও পাথরে খোদাই চিত্র ব্যতীত পোড়ামাটির পীঠিকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিনিচয় (terra-cotta plaques and figurines), চীনামাটির পাত্রসমূহে অঙ্কিত ও চিত্রিত টালিগুলি এ পর্য্যায়ে আসিয়া পড়ে। রেশম-বস্ত্র, মখমল ও কার্পেটের নক্সা চিত্রসমূহেও যুগপারম্পর্য্য বিবেচনা

১ Roger Fry, Introduction to the illustrated of the Burlington House Exhibition of Art, London, 1931.

তাক্-ই-বোস্তানে, সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর (খৃঃ অঃ ৫৯০-৬৪২) শিকার চিত্রে যে ভারতীয় প্রভাব প্রকটিত রহিয়াছে, সুধী অর্নেষ্ট ডিয়েৎস্ (E. Dietz) তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, Eastern Art, Philadelphia (U. S. A.) October, 1928.

২ দৃষ্টান্ত স্বরূপ পার্কহামে প্রাপ্ত, পূর্ব্বে যাহা অজাতশত্রুর বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই মূর্ত্তিটির এবং কলিকাতা যাদুঘরের, মূর্ত্তি বলিয়া বিতণ্ডার বিষয়ীভূত অপর দুইটি মূর্ত্তির কথা করা যাইতে পারে।

৩ Toynbee, Study of History, Vol. III, p. 378, ৪১ ফাল্গুন সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৮৬।

১ Cambridge History of India, Vol. I. pp. 632, 644.

করিয়া, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে ক্রমবিভাগ করা প্রয়োজন। মখমল ও কার্পেটের উৎকৃষ্ট নমুনাগুলি খৃঃ পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর, এবং বিচিত্র রেশম-বস্ত্রের বিবিধ নমুনাগুলি একাদশ হইতে ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী। সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে পারস্য শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি রচিত হইয়া লোকলোচনের গোচরে আইসে। এ যুগে ভাস্কর্য্য-প্রতিভা অবলুপ্ত হইলেও মৃৎশিল্পে (চীনামাটির তৈজসে ও পোড়ামাটির জীবজন্তুর মূর্ত্তিতে) নির্ম্মাতৃগণের অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। রঙ-বেরঙের চিত্রে ও নক্সায় সজ্জিত রাভি (Ravy), ঢাজেস্ (Rhages) ও সুলতানাবাদ প্রভৃতি আড্ডার চীনামাটির সুরম্য স্থালী (plates), কটোরা ও ভৃঙ্গার প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ নমুনাগুলি নবম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত।

পারস্যের আর একটি কারুশিল্প নিজ মনোহারিত্বগুণে শিল্প-জগতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। পারস্যের পুরাতন কচি-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি এখনও সমঝদারদিগের নিকট যথেষ্ট আদর লাভ করিয়া থাকে। এ শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি যে বহুমূল্য সামগ্রীর মধ্যে গণ্য হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেও চীনাবাজারের নাখোদা সওদাগরদিগের গুদামে পারস্যের ক্রিষ্টাল কাঁচের সুন্দর সুন্দর পুরাতন জিনিস, সাদা ক্রিষ্টেলের উপর গোলাপী ক্রিষ্টেলের ফুলের নক্সাযুক্ত বাটি, 'সবুজ দূর্ব্বার মত রঙের' উপর 'সোনালি কাজ করা' হুঁকা, গোলাপপাশ প্রভৃতি যে পাওয়া যাইত, তাহা আচার্য্য অবনীন্দ্র নাথের বর্ণনা হইতে জানা যায়।১

সাসানীয় যুগের শিল্পে (খৃঃ অঃ ২২৮-৬৫২), প্রাচীন ও নবীন, দেশীয় ও বিদেশীয়, বিভিন্ন শিল্পধারা সম্মিলিত হইলেও আসলে উহা দেশীয় শিল্পেরই বৈশিষ্ট্যগুণে অলঙ্কৃত। তৎকালীন শিল্পে যে আশ্চর্য্য শক্তি, সংযম ও গাম্ভীর্য্য গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা সাঙ্কর্য্যের (hybridityর) মালিন্য ও দুর্ব্বলতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কবিসুলভ ভাবাতিশয্য ও উচ্ছল কল্পনার সূক্ষ্ম খেয়ালিপণা এ যুগের শিল্পশৈলীতে স্থান পায় নাই, যদিও পরবর্ত্তীকালের সৃজন-শীল পারসীক শিল্পী যে ভাগাবেগ গীতি কবিতার সম্পদ বলিয়া বিবেচিত, তাহাই নিজস্ব বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। শক সংস্পর্শের ফলে নবশক্তিতে সঞ্জীবিত সাসানীয় শিল্প বাস্তব মূর্ত্তি রচনায় এক প্রকার যুগান্তর ঘটাইতেই সমর্থ হইয়াছিল। ইহার উদাহরণ শুধু ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিতে নহে চূণ-বালি দিয়া গড়া সমতল পীঠিকার উপর অনুচ্চভাবে পরিকল্পিত (basso relievo) পশু পক্ষী প্রভৃতির মূর্ত্তি হইতেও যথেষ্ট উপলব্ধি হয়। এই প্রকারে গঠিত একটি তিত্তির পক্ষীর প্রতিকৃতি এমনই সুন্দর যে, তাহার প্রত্যেক রেখায় প্রাণ-শক্তির চাঞ্চল্য যেন স্বতঃই স্ফুরিত হইয়াছে। —পাখী পা তুলিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহার চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধ-বিস্ফারিত, যেন এখনই ডাকিয়া উঠিবে। ইহার তুলনায় সাসানীয় কারুশিল্পের একটি প্রসিদ্ধ নমুনা কোনও সিংহাসনের অর্দ্ধ-গ্রিফিনাকৃতি১ ব্রোঞ্জ-বিনির্ম্মিত পায়া, সুগঠিত ও সুকল্পিত হইলেও সেরূপ সূক্ষ্ম অনুভূতিপুষ্ট ও ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ নহে। মৃৎফলকে যে জীবন্তভাব বিকশিত হইয়াছে, সিংহাসনের আওতায় কারুশিল্পী তাহা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই—হয় তো বা প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। যে কৌশলে শিল্পী পশু বা পক্ষীর জীবন্ত ভাবটি টানিয়া লইয়া সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে রূপদ (plastic) শক্তির অদ্ভুত বিকাশ ঘটাইয়াছেন পাশ্চাত্য কলা-বিদেরাও তাহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। সাসানীয় যুগে পূর্ব্বাগত শিল্পধারার সহিত শুধু শকশৈলী নহে ভারতের বৌদ্ধ শৈলীও সম্মিলিত হইয়াছিল। এই ত্রিধারায় যুক্তবেণী, বাইজান্টাইনভিত্তিমূলক আব্বাসীয় শিল্পের এবং বিশেষ করিয়া প্রবল চৈনিক প্রভাবযুক্ত মোঙ্গল শিল্পের রুচির সঙ্গমে যে নবীন বল সঞ্চয় করে—তাহাই ক্রমে উপচিত হইয়া বায়জাদ ও তাহার অনুবর্ত্তিগণের শিল্পচর্চ্চার কেন্দ্রসমূহে পরম্পরিণতি লাভ করিয়াছে।

পারস্যের ললিত-কলা ও কারুশিল্প সাসানীয় যুগ হইতেই বর্ণযোজনায় সমৃদ্ধ। কার্পেটে, মিনা করা রঙ্গিন টালিতে, মসজিদ ও মাদ্রাসার প্রাচীর গাত্রে চূণবালির (stucco) মণ্ডলে ও দেওয়াল চিত্র অথবা ভিত্তিচিত্রে বর্ণিকাভঙ্গের অপূর্ব্ব নৈপুণ্য দেদীপ্যমান। উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সুপ্রাচীন ধারা মুসলমান বিজয়ের পরও ইরাণের শিল্পরাজ্য হইতে বিসর্জ্জিত হয় নাই।

১ ঘরোয়া, পৃঃ ৩৬-৩৭।

১ পূর্ব্বোক্ত Souvenir গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। গ্রিফিন একপ্রকার কাল্পনিক জন্তু, সিংহ ও ঈগল পক্ষীর সমবায়ে গঠিত।

অর্ব্বাচীন

শ্রীসুনীল ঘোষ

ওরা কি মানুষ সব? জীবনের এত বড় ফাঁকি
বুঝেও বুঝেনা ওরা—অপমান সহে প্রতিপল;
দহ্যমান জীবনের নির্ব্বাপিত ছাইটুকু বাকি;
পৃথিবীর দেনা যত শোধ কর ব্যর্থ আঁখিজল।

একদা ওরাও ছিল এ-বিশ্বের সহজ পূজারী;
স্বপনের মোহজালে সুপ্ত ছিল এদেরও কামনা;
তাহাদের পদভারে রাজপথ হয়েছিল ভারি;
অপাংক্তেয় জীবনের দুর্ব্বিসহ ছিল না যাতনা।

তারপর এল নেমে ঝটিকার ঘন আঁধিয়ার;
বুভুক্ষার মহামারি ছেয়ে এল ওদের আকাশ—
মৃত্যুর করাল দূত—হাতে তার তীক্ষ্ণ হাতিয়ার;
দিশেহারা হ'ল ওরা—অবিচারে রুদ্ধ হ'ল শ্বাস।

আজ আর কিছু নাই; ব্যর্থ ওরা জগতের মাঝে;
বাঁচিবার অধিকার ভীরুতায় পড়ে গেছে ঢাকা;
অভিযোগ নাহি তাই অভিশপ্ত মরণের কাছে;
ওদের তো আশা নাই—কোন মতে শুধু বেঁচে থাকা।

মর্ম্ম ও কর্ম্ম

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

পনের

বিয়ে হ'য়ে গেল।

যে বিরাট যজ্ঞি মাসিমা চেয়েছিলেন তার চেয়ে এক চুলও কম হ'ল না। মাসিমা আনন্দে ভাসতে লাগলেন।

বিয়ের আগেই বিকাশের নতুন বাড়ীর কাজ শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে বাড়ীতে বিকাশ উঠলো বিয়ে ক'রে ক'নের বাড়ী থেকে যাত্রা ক'রে এসে।

গীতা কখনও এ বাড়ী দেখে নি। মেরামতের সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীতে অনেক কিছু নতুন হ'য়েছে—তাতে বাড়ীখানা তক্ তক্ ক'রছে—নতুন বিজলীর আলোয় ঝকমক ক'রছে যেন ইন্দ্রপুরী! আনন্দে নাচতে লাগলো গীতার প্রাণ।

বাড়ীর ইট কাঠ পাথর সব যেন পরম আত্মীয়তার সঙ্গে গীতাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন ক'রে নিলে। গীতা দেয়াল স্পর্শ ক'রে থাকে—তাতে বুকের ভিতর ব'য়ে যায় আনন্দের স্পন্দন। চক্‌চকে মেঝের উপর লুটিয়ে প'ড়ে তার নিবিড় স্পর্শ নেয়, থামগুলোকে দেয় তার আলিঙ্গন। সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সে অনুভব ক'রতে চায় 'এ আমার বাড়ী—আমার স্বামীর'।

বিকাশ ছট্‌ফট্ ক'রছিল যতক্ষণ আত্মীয়স্বজনের অনাবশ্যক ভীড় তাকে আর গীতাকে ঘিরে অযথা তার হাত-পা আড়ষ্ট ক'রে রাখছিল।—অবশেষে—দীর্ঘ-সুদীর্ঘকাল পরে তারা দয়া ক'রে তাদের দু'জনকে একলা রেখে সরে' গেল।

অমনি বিকাশ তড়াক ক'রে উঠে গীতাকে ঘিরে নাচতে লাগলো।

নাচটা বিকাশের স্বভাব। ফুটবল খেলবার সময় সবাই তাকে বলতো নাচওয়ালা—কেন না, সে প্রায়ই নেচে উঠতো। গোলে যখন বল আসছে, সে তখন উবু হ'য়ে দুই হাঁটুর উপর দুই হাত দিয়ে নেচে নেচে গোলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে বেড়াত। আর বল এলে যখন সে তাকে ধ'রে মেরে দিত অনেক দূরে, তখন গোল-পোষ্টের নীচে ফিরবার আগে চক্রাকারে ঘুরে এক চোট নেচে নিতো। আর যখন তাদের পক্ষ গোল দিত, তখন বিকাশ ধেই ধেই ক'রে নাচতো।

বিয়ের সময় থেকে বিকাশের তাই নাচ পাচ্ছিল, কিন্তু এই শত্রুগোষ্ঠী—এরা একদণ্ড তাকে সময় দিলে না নাচবার।

এখন সময় পেয়ে সে মনের সুখে এক চোট নেচে নিলে।

গীতারও প্রায় নাচতে ইচ্ছা ক'রছিল, কিন্তু সে ব'সে রইলো। বিকাশের নাচ দেখে সে বল্‌লে, "ও কী রঙ্গ?"

বিকাশ বল্‌লে, "ঠিক ধ'রেছ—এ রঙ্গ—আনন্দ-তরঙ্গ!" ব'লেই গীতাকে দুই হাত দিয়ে সবলে বেষ্টন করে ধ'রে বললে, "ওঃ! গীতা—গীতা তুমি কী?"

গীতা হেসে বললে, "আপাততঃ দেখতে পাচ্ছি একটা পাগলের হাতে বন্দিনী।"

ছেড়ে দিয়ে বিকাশ আর এক পাক নেচে এসে ব'সে বললে, "তুমি নিশ্চয় মনে ভাবছ তুমি গীতা—শুধু গীতা! কেমন?"

"তা নয় তো কী?" হেসে বললে গীতা।

"তা নয়, তা নয়! ছিলে তুমি শুধু একটা বাজে গীতা এখন তুমি—প্রিয়া! অনাদি অনন্ত প্রিয়া—

> আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মথিত সাগরে
> ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে,
> তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
> প'ড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণালক্ষ শত
> করি অবনত।

ঠিক এমনি।"

ব'লে বিকাশ গীতার আলতাপরা পা দু'খানির কাছে মাথা নুইয়ে নিয়ে দু'হাতে পা চেপে ধ'রে ক'রলে চুম্বন।

"ও কি? ছি!" বলে গীতা পা দু'টো ছাড়িয়ে নিয়ে বিকাশকে ক'রলে প্রণাম।

তাকে তুলে নিয়ে তফাতে ধ'রে বিকাশ সুধু চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ। গীতাও বিকাশের মুখের দিকে বিপুল আনন্দে শুধু চেয়ে রইলো।

গীতা বল্‌লে এবার, "ভয়ানক আশ্চর্য্য, না?"

"কি আশ্চর্য্য?"

"যোলটি বছর ধ'রে আমরা পরস্পরের মুখ দেখে আসছি, কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জান? যেন এ মুখ দেখি নি কোনও দিন।"

"ঠিক! আমারও তাই মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে যে, তোমার মুখখানি যেন ঠিক এই মুহূর্ত্তে বিশ্বকর্ম্মার কামারশালা থেকে সদ্য ঢালাই হ'য়ে এলো।—কাল কি তোমার এ মুখ ছিল?—পরশু ছিল? ছ' মাস আগে ছিল? তবে কেন আমি দেখতে পাই নি এ মুখে এত রূপ, দেখি নি ওই চোখের ঐ অপূর্ব্ব লাবণ্য, পাতলা মেঘঢাকা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত ঐ অপরূপ মিষ্টি রঙটি তোমার!"

গীতা হেসে বল্‌লে, "বল্‌বো কেন?"

"বল।"

"তখনও তুমি সুস্থ ছিলে, তাই—পাগল হও নি, তাই।" ব'লে হেসে বিকাশের কোলের উপর গড়িয়ে পড়লো।

বিকাশ গীতার মাথা কোলে ক'রে ব'সে তাকে দীর্ঘ চুম্বন দিলে। তারপর তার হাত ধ'রে গয়নাগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

হঠাৎ বিকাশ বল্‌লে, "গীতা, এ কী অন্যায়? এ গয়নাগুলো তোমার আমার স্ত্রীকে দেবার কথা ছিল!"

হেসে গীতা বল্‌লে, "দিয়েছি তো সব!"

"কি আশ্চর্য্য—বল, সব দিয়েছ অথচ সব র'য়ে গেছে তোমার। এই কথা ভেবেই বোধ হয় ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা ব'লে গেছেন, 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'।"

গীতা বল্‌লে, "ওটা কি? গাল দিলে না কি আমায়? দিয়ে থাক তো বুঝিয়ে বল। জান তো সংস্কৃত পড়ি নি কোনও দিন।"

"ওর মানে হচ্ছে এই যে, পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই অবশিষ্ট রইলো।—আচ্ছা গীতা, তোমার সঙ্গে যদি আমার বিয়ে না হ'ত

আর ঐ গয়না যদি তোমার সত্যি সত্যি দিতে হ'ত আমার স্ত্রীকে, তা' হ'লে তোমার হার্ট ফেল হ'ত নিশ্চয়।"

গীতা বললে, "যেটা একেবারেই অসম্ভব, তা' কল্পনা ক'রে কি লাভ?"

"কেন, আর কারো সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তে পারতো না? আমি বিয়ের বাজারে এমনি অচল জিনিষ ছিলাম না কি?"

"একেবারে অচল হ'লে চললে কি ক'রে এখানে? কিন্তু তবু অসম্ভব। এ গয়না আমি প'রেছিলাম, তাই কাণ টানলে যেমন মাথা আসে তেমনি গয়নাটায় টান পড়তেই আমার আসতেই যে হবে।"

একটা ছোট মেয়ে—বিঘ্ন যেন মূর্ত্তিমতী—এসে বললে, "আপনার এক বন্ধু এসেছেন, কাকাবাবু।"

মুখ খিঁচিয়ে বিকাশ বললে, "আ মরি বন্ধু রে আমার। এমনি সময় মরতে এসেছেন! বন্ধু! জন্মজন্মান্তরের শত্রু আমার।"

ব'লে সে বাইরে যেতে যেতে ব'লে গেল, "পালিও না কিন্তু, আমি এলাম ব'লে ফিরে।"

গীতা কিন্তু উঠে পড়লো। বললে, "ফিরে এলে খুঁজে নিতে পারবে, এ বাড়ী তোমার গোলোক-ধাঁধা নয়।"

ব'সে থাকতে তার মন চাইছিল না। তার ইচ্ছা করছিল আনন্দে ছুটে বেড়াতে। সব ঘরে গিয়ে সবগুলিকে তার আলিঙ্গনে বেষ্টন করতে—তার নুতন সৌভাগ্যের কথা সবাইকে কাণে ধ'রে শোনাতে।

বের হ'তেই তার সামনে পড়লো বসন্ত। সে অমনি ফস্ ক'রে তার কাণ ধ'রে টেনে বললে, "এ বাড়ীর শালাবাবু, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

বসন্ত ফস্ ক'রে ঘুরে গীতাকে এক প্রবল চিমটি কেটে দিলে দৌড়।

"দস্যি ছেলেটা", ব'লে সে তাকে তাড়া করতে গেল, কিন্তু বিয়ের জবড়জঙ্গ কাপড়-চোপড় গয়না-পত্তর নিয়ে ছোটাটা সুবিধে হবে না ব'লে ছেড়ে দিলে।

সে সবার সঙ্গে হাসি-মস্করা ক'রে বেড়াতে লাগলো। কমলাকেও ছাড়লো না।

কমলা মাসিমার বিধবা মেয়ে, ভারী ঠাণ্ডা সুস্থির চুপ চাপ মেয়েটি। সে নিঃশব্দে বোনের ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে, আপনার ঘরে ব'সে পড়ে বা সেলাই করে, আর মায়ের ফরমায়েস মত এটা ওটা কাজ করে। বিধবা সে, কিন্তু বাপ-মা তাকে থান প'রতে দেন না, চওড়া কস্তা পেড়ে শাড়ী ও হাতভরা চুড়ী প'রে থাকে সে। এ বেশ সে পরে দায়ে প'ড়ে, মা বাপের মুখ চেয়ে। বেশভূষা বা সংসারের আর কিছুতেই তার আসক্তি নেই।

এ হেন বৈরাগিণীকেও গীতা স্বস্তি দেয় না। সে তার কাছে গিয়ে বলে "হাঁ দিদি, কি কাণ্ডটা হ'ল বল দেখি—একটা দারুণ সীমানার মামলা চারদিকে। জ্যাঠাইমা—তিনি আমার জ্যাঠাইমা, না মাসী?—তুমি আমার দিদি, না ঠাকুরঝি?—অমল আমার বোনঝি, না ভাগনে?—এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। আচ্ছা, তুমি বল তুমি কার দিদি?"

কমলা হেসে ব'ল্লে, "যে বেশী পাগল, তার।"

"বুঝেছি, তবে তুমি ঠাকুরঝি।"

"পোড়ারমুখী, বিকাশ পাগল হ'ল কিসে?"

"বদ্ধ পাগল, দিদি, বদ্ধ পাগল! একেবারে কাঁকের গারদের পাগলা। বিয়ের আগে এত কি জানি? এখন দেখছি একেবারে unmanagable.'

[ক্রমশঃ

আগামী স্বপ্ন

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

ঐ শুনিরে জগৎজুড়ে ধ্বংস-বিষাণ বাজে,
দগ্ধ হয়ে এই ধরণী নতুন বেশে সাজে।
মহাকালের ডঙ্কা বাজে,—শঙ্কা জাগে ভয়ে,
ঝঞ্ঝা আসে উড়িয়ে কেতন অসীম দিগ্বিজয়ে!

আগুন দেখে ভয় কিরে আজ? গর্জ্জনে কি ডর?
প্রলয়, সে-তো খেলার সাথী—মৃত্যু নহে পর।
জীবনটারে উজাড় ক'রে সুখ আছে ভাই ঢেলে,
দুর্নিবার এই দৈত্যরথের চাকার তলায় ফেলে

আগ্নেয়গিরি কেঁপে ওঠে বুঝি!—অগ্নিগর্ভজ্বালা,
নিশার আকাশে ফোটে ফুলঝুরি,—বিস্ফোরণের মালা,
ঝলকি উঠিছে বিদ্যুৎশিখা কর্কশ চীৎকারে
জীবনের ক্ষীণ দীপ নিভে যায় মুহূর্ত্ত ফুৎকারে!

শ্মশান-পেচক ডাকিছে কোথায় জনহীন প্রান্তরে,—
আগুনে বোমার ফসল বুনিছে মানুষ মাটির 'পরে!
দাউ দাউ জ্বলে রক্তিম শিখা,—কঠিন যন্ত্ররথে
মৃত্যু-দেবতা অক্ষয় হ'য়ে আজিকে নেমেছে পথে!

কাঁপে মৃত্তিকা, আকাশে তারকা, সপ্ত সাগরে জল,
দুলিছে ভুবন, বিশ্বনিখিল শঙ্কাভরে টলমল,
জীবন মৃত্যু আজ একঠাঁই—আদি ও অন্ত আসি'
নতশিরে তাই দুইজনে ভাই দাঁড়ায়েছে পাশাপাশি।

বায়ুলোক হ'তে গর্জ্জন ক'রে বাতাসেরে জর্জ্জর'
মৃত্যুশকুন পাখা মেলিয়াছে—ধ্বংস পড়িছে ঝরে';
সব সন্দেহ ভঞ্জন করি' বন্ধু এসেছে ঘরে—
কামানগোলকে মৃত্যু ঝলকে, জীবনের ফুল ঝরে।

তারই মাঝে আসে নতুন ফসলে সৃজনের নবদান,
গত জীবনের শ্মশান ভস্মে নব জীবনের গান।

[illegible]

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্

প্রাচীনকালে গুপ্ত-পল্লী বঙ্গের অন্যতম সংস্কৃতচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। পণ্ডিতসমাজ অহোরাত্র সারস্বত পূজায় ব্যাপৃত থাকিতেন। নিদান-টীকাকার বিজয় রক্ষিত এবং অমর-কোষাভিধানের টীকাকার ভরত মল্লিক এই গুপ্ত-পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন 'শ্রীশ্যামাকল্পলতিকা'র কবি মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ব্রজদেব তর্কবাগীশ, রামগোপাল তর্কবাগীশ, রাধামোহন তর্কভূষণ, নৈয়ায়িক গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন, স্মার্ত্ত রামধন বিদ্যালঙ্কার, ক্ষুদিরাম ন্যায়ভূষণ, নীলকমল বিদ্যাসাগর, রামধন ন্যায়রত্ন, রামপ্রসাদ চূড়ামণি, রামকিশোর তর্কপঞ্চানন, কালীকিশোর বিদ্যাবাচস্পতি, রঘুনাথ সিদ্ধান্ত, রামলোচন ন্যায়ালঙ্কার, রামজয় তর্কভূষণ, রামজীবন বিদ্যাভূষণ, শ্যামসুন্দর তর্কালঙ্কার প্রভৃতি স্বনামধন্য পণ্ডিতগণ সনাতন বিদ্যাচর্চ্চা অক্ষুন্ন রাখিয়া গুপ্ত-পল্লীর যশোরশ্মি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১৮৪৬ অব্দ পর্য্যন্ত গুপ্ত-পল্লীর সংস্কৃতচর্চ্চা অব্যবহিত ছিল।

সংস্কৃতচর্চ্চা ব্যতীত স্থাপত্য-শিল্পে গুপ্ত-পল্লী বিশেষরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে গুপ্ত-পল্লী-নিবাসী বৈদ্যবংশীয় বিশ্বেশ্বর রায় নামক জনৈক ধনী ব্যক্তি তাঁহার গুরু সত্যদেব সরস্বতীকে স্বীয় বিপুল সম্পত্তি প্রদান করেন (১)। সত্যদেব এই সম্পত্ত পাইয়াই গুপ্ত-পল্লীতে একটি মঠ স্থাপন এবং আরাধ্য দেবতা বৃন্দাবনচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত বৈদ্যগ্রন্থকার ভরত মল্লিক ১৫৯৭ শকে (১৬৭৫ খৃষ্টাব্দ) "চন্দ্রপ্রভা" নামক কুলগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার উক্তি অনুসারে বিশ্বেশ্বর রায়ের সাতটি কন্যা বিশিষ্ট কুলীন বৈদ্যে অর্পিত হইয়াছিল (২)। ইহাতে বেশ অনুমিত হয়, বিশ্বেশ্বর রায়ের পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি তাঁহার বিপুল সম্পত্তি গুরুদেবকে দান করিতে পারিয়াছিলেন।

সত্যদেব সরস্বতী কয়েক বৎসর যাবৎ বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করিবার পর দেহত্যাগ করেন। তৎপরে তাঁহার প্রিয়শিষ্য গোমুখানন্দ সরস্বতী সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

গুপ্ত-পল্লীনিবাসী চন্দ্রচূড় ব্রহ্মচারী নামক জনৈক পণ্ডিত গোমুখানন্দের শিষ্য ছিলেন। চন্দ্রচূড় ত্রিপুরার রাজবংশীয় চম্পক নরপতির নির্দ্দেশমত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কালীপক্ষীয় এক টীকা ১৬২৭ শকে রচনা করেন। এই টীকার শেষাংশে গ্রন্থকার ও তাঁহার গুরু গোমুখানন্দের পরিচয় পাওয়া যায়—

"আস্তে শ্রীগুপ্ত-পল্লী সুরবরসরিতস্তীরদেশে সুধন্যা
তত্র শ্রীগোমুখাখ্যো নিবসতি সততং দণ্ডিনামগ্রগণ্যঃ।
তচ্ছাত্রশ্চন্দ্রচূড়স্ত্রিপুরনরপতিং শ্রীযুতং চম্পকাখ্যং
দৈবাৎ তক্তেত্য টীকাস্তদনুমতিবশাৎ ব্যারচদ্ ব্রহ্মচারী।"

কিছুদিন পরে গোমুখানন্দ দেহত্যাগ করিলে ধ্রুবানন্দ কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম 'দণ্ডী' নামে অভিহিত হন। তৎপরে পীতাম্বর নন্দ, সুমুখানন্দ ও রামানন্দ যথাক্রমে দণ্ডী হইয়াছিলেন। রামানন্দ একজন সাধক ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনচন্দ্রের বামপার্শ্বে শ্রীরাধার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ 'দেশ-কালিকা' তাঁহারই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত।

এইরূপে তৎকালে গুপ্ত-পল্লীর মঠে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব সমভাবে বিদ্যমান ছিল।

রামানন্দের পর পূর্ণবোধান[illegible] ও তৎপরে মধুসূদানন্দ দণ্ডী হইলেন। মধুসূদানন্দ রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, গৌর, নিতাই প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পুরীর ন্যায় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা প্রচলিত হইয়াছিল। তৎকালীন রথখানি ১৩ চূড়াবিশিষ্ট ছিল। কোন এক দুর্ঘটনার ফলে ইহা ৯ চূড়াবিশিষ্ট করিয়া সংস্কার করা হয়। বর্ত্তমানে ইহা উচ্চতায় ৫১ ফুট, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২৮॥০ ফুট, ৩৬ চক্রবিশিষ্ট, প্রত্যেক চক্রের ব্যাস ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং অশ্বযুগলের প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্যে ১৩॥০ ফুট। অদ্যাপিও ভারতের রথসমূহের মধ্যে ইহা বৃহত্তম বলিয়া বিদিত।

এতদ্ভিন্ন মধুসূদানন্দের সময়কালীন আরও একটি ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবনচন্দ্রের সম্পত্তির কর বাকী থাকায় বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মধুসূদানন্দকে মূর্ত্তিটিকে দরবারে আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। মধুসূদানন্দ মহাসমস্যায় পড়িলেন। তিনি বৃন্দাবনচন্দ্রের অনুরূপ একটি নূতন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা রাজদরবারে লইয়া গেলেন। অতঃপর শ্রীযুত রামচন্দ্র সেন ও শ্রীযুত ব্রজনাথ মুন্সীর চেষ্টায় মঠের বাকী কর মিটাইবার ব্যবস্থা হইলে নবাব বৃন্দাবনচন্দ্রের মূর্ত্তি লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন। তখন মধুসূদানন্দ বৃন্দাবনচন্দ্রের এই নকল মূর্ত্তিটিকে সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি রাম-সীতার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের রচিত 'চিত্রচম্পূ' কাব্যের ২৭৮ম শ্লোকে বর্ণিত আছে—

"সর্গ্রগ্রাম-সমীপ-ধাম পরমং শ্রীগুপ্তপল্লীতি যৎ
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রনন্দিতমপি শ্রীরামচন্দ্রোজ্জ্বলম্।"

রামসীতা মন্দিরের কারুকার্য্য অতীব মনোরম। শেওড়াফুলীর বিখ্যাত জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায় মন্দিরটির নির্ম্মাণকার্য্যের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। তাহার পর মধুসূদানন্দ রামসীতা মন্দিরের সম্মুখভাগে একটি সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেই নকল বৃন্দাবন চন্দ্রের মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইবার এই মূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের মূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত হইল।

খৃষ্টীয় ১৭৯৪ অব্দে মধুসূদানন্দ দেহত্যাগ করিলে রাজা রামচন্দ্র সেনের পুত্র শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ সেন 'সরবরাহকার" রূপে ৯৫ বৎসরের জন্য মঠের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবন চন্দ্রের জন্য এক নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটির শিল্পচাতুর্য্য ও বর্ণের সৌন্দর্য্য যথার্থই প্রশংসনীয়। তাঁহার সময় হইতে গৌরনিতাইয়ের মূর্ত্তি বৃন্দাবনচন্দ্রের পুরাতন মন্দিরে সংরক্ষিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৮২৭ অব্দে দণ্ডী কেশবানন্দ মঠটি উদ্ধারকল্পে এক

(১) Hoogly District Gazetteers. vol. XXIX, P269

(২) "চন্দ্রপ্রভা"—পৃঃ ১৮০, ১৮৭, ২১২ ৭৬, ২৯৯ ইত্যাদি।

অভিযোগ আনয়ন করেন এবং অত্যধিক চেষ্টার ফলে কৃতকার্য্য হন। ইহার পর কিছুকাল যাবৎ দণ্ডিগণের দ্বারা মঠটি সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। পরিশেষে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই অর্থাভাব হইতে থাকে। খৃষ্টীয় ১৯৩০ অব্দে ৯ই এপ্রিল হইতে শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র মজুমদার উক্ত মঠের 'রিসিভার' নিযুক্ত হইলেন; তিনি মঠের কার্য্যপরিচালনার জন্য বহু টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ইহার ফলে মঠের সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় হইবার উপক্রম হইল। খৃষ্টীয় ১৯৩৩ অব্দে এই ব্যাপারে এক মামলা হয়। তৎকালীন হুগলী জেলা-কোর্টের বিচারপতি Mr. Jemison. I.C.S. মহোদয় মঠটিকে একটি সর্ব্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং মঠের কার্য্যাদি পরিচালনার্থে নয় জন সভ্য লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠন করেন। শ্রীযুত জ্ঞানকুমার সেন ম্যানেজার এবং খগেন্দ্রানন্দ দণ্ডী নিযুক্ত হইলেন।

পূর্ব্বাপেক্ষা মঠটির অবস্থা শোচনীয়। মঠের উন্নতিকল্পে জেলার মনীষিবৃন্দের চেষ্টা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ললিত-কলা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

বান

২৫। সূচীবান-কর্ম্ম—যশোধরের মতে সূচী দ্বারা যে সন্ধান-করণ (অর্থাৎ সেলাই করিয়া জোড়া দেওয়া) তাহাই 'সূচীবান'। উহা ত্রিবিধ—১ সীবন, ২ উতন ও ৩ বিরচন। প্রথম প্রকার (অর্থাৎ সীবন)—কঞ্চুকাদির পক্ষে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় প্রকার (অর্থাৎ উতন)—ত্রুটিত বস্ত্রাদির ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য। আর তৃতীয় (অর্থাৎ বিরচন)—কুথ আস্তরণ ইত্যাদি নির্ম্মাণে প্রযুক্ত হয়।১

"বান' শব্দটির অর্থ বয়ন বা সেলাই। সূচী ও সূত্রের সাহায্যে যে বাঁধন বা সেলাই দেওয়া যায়, তাহাই এ কলাটির আলোচ্য। এ কলাটি দরজীরই আয়ত্ত, কারণ, কেবল বয়ন-কর্ম্ম হইলে উহা তন্তুবায়ের কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারিত; কিন্তু উহা সূচী-দ্বারা বয়ন, অতএব তাঁতি অপেক্ষা দরজীরই ইহাতে অধিকার অধিক।

সূচীবান তিন প্রকার—(১) সীবন বা কাটাকাপড়ের কাজ—কাপড় ইচ্ছামত আকারানুযায়ী কাটিয়া নূতন সেলাই করিয়া জামা (কঞ্চুক) ইত্যাদি নানারূপ পোষাক তৈয়ারী ইহার মধ্যে পড়ে।

(২) উতন—ছেঁড়া কাপড় সেলাই বা রিপু করা।

(৩) বিরচন—কাঁথা ২, লেপ, তোষক, বিছানার চাদর ইত্যাদি তৈয়ার করা—ইহার মধ্যে পড়ে। তাহা ছাড়া কাপড়ের জমিতে নানা রঙ্-বেরঙের ফুল তোলা, শালের উপর নানা রকম সূচের কাজ, উল বোনা, কার্পেট বোনা, আসন বোনা—ইত্যাদি সকল রকম সৌখীন বোনার কারু-কার্য্য ইহারই অন্তর্গত।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"বান-বন্ধন, সূচী ও সূত্রের বন্ধন দ্বারা যে কর্ম্ম হয়, (১) সীবন, (২) 'রিপু' করা সংস্কৃত নাম উতন এবং (৩) বিরচন,—জামা ইত্যাদি প্রস্তুত সীবন-সাধ্য,—এই জন্য (১) সীবন শব্দের অর্থ—কাপড় কাটিয়া নূতন সেলাই। (২) ছিন্ন বস্ত্রের ছিন্নাংশ যোজন, উতন, 'রিপু' করা, (৩) শাল প্রভৃতির সূচীকর্ম্ম, তাহার নাম বিরচন" ।৩

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—"সূচীকর্ম্ম ও বস্ত্র বয়ন কার্য্য" ।৪

৺সমাজপতি মহাশয় বলেন—"দরজী ও তাঁতির ব্যবসায়" ।৫

৺কুমুদচন্দ্রের মতে—'সূচী (ছুঁচ) দ্বারা বস্ত্র সন্ধান করা (যোড়া লাগান); ইহা তিন প্রকার—

(১) সীবন (২) উম্ব ও (৩) বিরচন। সীবন (কঞ্চুকাদি, জামা প্রভৃতি সেলাই করা; উম্ব বোধ হয় ত্রুটিত বস্ত্রের সংস্কার, রিফু কর্ম্ম প্রভৃতি; বিচরন অর্থাৎ কাঁথা লেপ প্রভৃতিতে সেলাই করিয়া ফুল কাটা প্রভৃতি" ।৬

২৬। সূত্রক্রীড়া—টীকাকার মতে—'নালিকা-সঞ্চার-দ্বারা নালাদ সূত্রের অন্যথা অন্যথা প্রদর্শন। (সূত্র) ছিন্ন ও দগ্ধ করিয়া পুনশ্চ অচ্ছিন্ন ও অদগ্ধ ভাবে (উহার) পুনঃ প্রদর্শন। উহা অঙ্গুলিন্যাস-দ্বারা (সম্ভব) হইয়া থাকে। দেবকুলাদি প্রদর্শন—এইরূপ অন্যান্য ব্যাপার ক্রীড়ার্থ (প্রদর্শন)" ।৭

১। 'সূচ্যা যৎ সন্ধানকরণং তৎ সূচীবানং ত্রিবিধং—সীবনম্ উতনং, বিরচনঞ্চ। তত্রাদ্যং কঞ্চুকাদীনাম্। দ্বিতীয়ং ত্রুটিতবস্ত্রাণাম্। তৃতীয়ং কুথাস্তরণাদীনাম্।"—জয়ম

সন্ধান-করণ—যোজনাকরা, জোড়া দেওয়া, বাঁধন দেওয়া, সেই, রিপু ইত্যাদি করা।

•২। মূলে আছে—'কুথ'=(১) কুশ, (২) গজের পৃষ্ঠের আস্তরণ বিচিত্রবর্ণ কম্বল। উহা হইতে 'কুথ' অর্থে 'কাঁথা'—এরূপ অর্থও করা হয়।

৩। কাঃ সূঃ, পৃঃ ৬৬, বঃ সং।

৪। শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, পৃঃ ৭

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয় 'সূচী' ও 'বান' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, টীকাকারের ন্যায় 'সূচীদ্বারা 'বান' এরূপ অর্থ করেন নাই।

৫। ৺সমাজপতি মহাশয় ৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের উক্তির সরলার্থ করিয়াছেন। কল্কিপুরাণ, পৃঃ ২৪

৬। কৌমুদী, পৃঃ ৩০। ইহাতে যে 'উম্ব' শব্দটি পাওয়া যায়, উহা সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদবশতঃ হইয়াছে—'উতন' হওয়াই উচিত। 'উম্ব বোধ হয় ত্রুটিত বস্ত্রের সংস্কার' এ বাক্যে আর 'বোধ হয়' প্রয়োগ কেন—নিশ্চয়ই ঐ অর্থ।

৭ "নালিকাসঞ্চারনালাদিসূত্রাণামন্যথান্যথা দর্শনম্। ছিন্ন

টীকাকারের উক্তির একটু পরিষ্করণ আবশ্যক। সূত্রক্রীড়া এক রকমের ভেল্‌কি বা বাজী সূতার সাহায্যে বাজী দেখান—ইহার বিষয়। নলের এক মুখ দিয়া নীল, লাল ইত্যাদি কোন এক রঙের ও কার্পাস-পদ্মনালাদি কোন এক জাতীয় সূতা প্রবেশ করাইয়া নলের অপর মুখ হইতে অন্য রঙের বা অন্য জাতীয় সূতা বাহির করার কৌশল। যেমন ধরুন এক মুখ দিয়া নীলরঙের সূতা প্রবেশ করাইবার অপর মুখ হইতে লাল রঙের সূতা বাহির করণ। অথবা, পদ্মনালের সূক্ষ্ম সূত্র নলের একমুখে ঢুকাইয়া অপর মুখ দিয়া কার্পাসের মোটা সূতা বাহির করার কৌশল। মুখ হইতে নানা বর্ণের সূতা বাহির করা; এক খণ্ড সূতা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া পুনরায় উহা জোড়া লাগান; সূতা পুড়াইয়া ফেলিয়া পুনশ্চ উহাকে পোড়ান হয় নাই—এই ভাবে দেখান—এই সকল কৌশল এই কলাটির বিষয়। বলা বাহুল্য যে, এ সকলই হাতের ও আঙ্গুলের কায়দায় সম্ভব হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত সূতার সাহায্যে শূন্যে দেবমন্দির, দেবমূর্ত্তি, হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি জীবগণের মূর্ত্তি এরূপভাবে দেখান যাইতে পারে যে, মনে হইবে যেন শূন্যেই ঐ সকলের আবির্ভাব হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে—সূতার সাহায্যে পুতুল নাচ, সূতা বা দড়ির উপর চলাফেরা করা ও নাচ, হাতে ও পায়ে সূতার বাঁধন কৌশলে নিমেষের মধ্যে খুলিয়া ফেলা—ইত্যাদি সূত্রক্রীড়ার অন্তর্গত।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"সূত্র সম্পর্কে বাজি, মুখ দিয়া বিবিধ সূত্র বাহির করা—সূত্র দগ্ধ করিয়া অদগ্ধ সূত্র প্রদর্শন ইত্যাদি"।৮

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—"সূত্র-সংযোগে পুত্তলিকা পরিচালন (পুতুলের নাচ)।

৺সমাজপতি মহাশয়ের মতে—"সূতা দিয়া কৌশলপূর্ব্বক পুত্তলিকা নাচাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের পথ"।

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয় টীকাকারের অনুসরণে বলিয়াছেন—"ইহা একপ্রকার বাজি বা খেলা মাত্র। নলিকামধ্যে সূত্র-সঞ্চার ও তাহা অন্যভাবে প্রদর্শন, ছেদন ও দহন প্রভৃতি করিয়া সূত্রকে পুনর্ব্বার আচ্ছন্ন অদগ্ধ ভাবে দেখান। সূত্র-সাহায্যে শূন্যমার্গে দেবতা প্রদর্শন প্রভৃতি কার্য্য"।৯

দগ্ধা চ পুনরচ্ছিন্নাঽদগ্ধা চ দর্শনম্। তচ্চাঙ্গুলিন্যাসাৎ। দেবকুলাদিদর্শনম্—ইত্যেবম্প্রকারা ক্রীড়ার্থৈব"—জয়ম।

"নালাদিসূত্রাণাম্"—অর্থ অস্পষ্ট। নাল অর্থে পদ্মনাল হইতে পারে। পদ্মনালাদির সূত্র নালিকার (নলের) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ক্রীড়া—এ অর্থ হয়। অথবা—'নাল' মুদ্রাকর-প্রমাদ—'নীল' এরূপ পাঠও আছে। নীলবর্ণ-সূত্র নলমধ্যে প্রবেশ করাইয়া ক্রীড়া। অঙ্গুলিন্যাস—আঙ্গুলের কৌশল। দেবকুল—দেউল, মন্দির।

৮কাঃ সূঃ, বঃ সং, পৃঃ ৬৬।

৯বেদান্তবাগীশ ও সমাজপতি মহাশয়দ্বয়—এই কলাটিকে পুতুলনাচের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন—টীকাকার-সম্মত 'সূতার

২৭। বীণাডমরুকবাদ্য—যশোধরের মতে—'বাদিত্রের অন্তর্গত হইলেও সকলপ্রকার বাদ্যের মধ্যে তন্ত্রীবাদ্যই প্রধান। তন্ত্রীগত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আবার বীণাবাদ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ডমরুক-বাদ্য-শিক্ষাতেও বিশেষ কৌশল প্রয়োজন। কারণ, উহা বাল্যকাল হইতে শিখিতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য ও উহার (বাদন-কৌশল) অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়। (উহার বাদন-কৌশল) সম্যগ্‌রূপে আয়ত্ত হইলে উহা হইতে স্পষ্টভাবে অক্ষরসমূহ উচ্চারিত হইতেছে—ইহা শুনিতে পাওয়া যায়'।১০

কামসূত্রকারের মতে—দ্বিতীয় কলাটিই বাদ্য-কলা। বাদ্যের চতুর্ব্বিধ বিভাগ—(ক) নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে—তত-অবনদ্ধ-ঘন-সুষির; (খ) যশোধর মতে—তত-বিতত-ঘন-সুষির।১১

টীকাকারের মতে—এই চতুর্ব্বিধ বাদ্যের মধ্যে তন্ত্রী-বাদ্য বা তত প্রধান। তন্ত্রী বাদ্য হইতেছে তারের বা তাঁতের বাজ্‌না। ইহার দৃষ্টান্ত—বর্ত্তমানের বীণা, স্বরদ, সেতার, এস্‌রাজ, সুরবাহার, বেহালা, ব্যাঞ্জো ইত্যাদি। প্রাচীনকালে কি কি তন্ত্রীবাদ্য ছিল, তাহার সুবিস্তৃত বিবরণ বর্ত্তমানে পাওয়া না যাইলেও—ইহা সুনিশ্চিত যে বীণা অতি প্রাচীন বাদ্য—উপনিষদে ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে।

যশোধর বলিতেছেন—সকলপ্রকার তন্ত্রীবাদ্যের মধ্যে বীণাই শ্রেষ্ঠ। মহাকবি মাঘ 'শিশুপাল-বধ' কাব্যে (১।১০) দেবর্ষি নারদের বীণা 'মহতী'র উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ শ্লোকটীর টীকায় মল্লিনাথের মন্তব্য—বিশ্বাবসু-নামক গন্ধর্ব্বরাজের বীণার নাম 'বৃহতী', তুম্বুরু-নামক সুপ্রসিদ্ধ গন্ধর্ব্বের বীণার নাম 'কলাবতী' দেবর্ষি নারদের বীণার নাম 'মহতী' ও বাগ্‌দেবী সরস্বতীর বীণার নাম 'কচ্ছপী'। ঐ শ্লোকটির উপর বল্লভদেব তাঁহার 'সন্দেহবিষৌষধি' টীকায় বলিয়াছেন—রুদ্রের বীণার নাম 'নালম্বী', নারদের বীণার নাম 'মহতী', সরস্বতীর বীণার নাম 'কচ্ছপী' ও গণদিগের বীণার নাম 'প্রভাবতী'।

তন্ত্রী-বাদ্যের মধ্যে যেমন বীণা প্রধান, অবনদ্ধ (বা বিতত বাদ্যের মধ্যে তেমনই ডমরু প্রধান। কারণ, ডমরু বাজান বড়ই কঠিন ব্যাপার। আবাল্য অভ্যাস না করিলে ডমরু-বাদ্য আয়ত্ত করা যায় না। আর যদি ডমরু-বাদ্য একবার আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে স্পষ্ট স্পষ্ট বোল বাহির করা যায়। এই কারণে, পূর্ব্বে একবার সাধারণভাবে বাদ্য-কলার উল্লেখ করা হইলেও এ স্থলে পৃথগ্‌ভাবে দুইটি বিশিষ্ট বাদ্য—বীণা ও ডমরুর উল্লেখ করা হইয়াছে—ইহাই যশোধরের অভিপ্রায়।

এতদ্ব্যতীত আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বীণা বাগ্‌দেবী সরস্বতীর ও ডমরু দেবাধিদেব মহাদেবের প্রিয়

ম্যাজিক'—এ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। শিঃ পুঃ, পৃঃ ৭, কঃ পুঃ, পৃঃ ২৪; কৌমুদী পৃঃ ৩০।

১০"বাদিত্রান্তর্গতত্বেঽপি তন্ত্রীবাদ্যং প্রধানম্। তত্রাপি বীণাবাদ্যং ডমরুকবাদ্যমাবশ্যকার্থম্, বাল্যোপক্রমহেতুত্বাদ্ দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাচ্চ। ততো হ্যক্ষরাণি স্পষ্টান্যুচ্চার্য্যমাণানি শ্রূয়ন্তে"—জয়ম।

১১—এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বঙ্গশ্রী বৈশাখ ১৩৫১ দ্রষ্টব্য

বাদ্য। এ-কারণেও এই দুইটি বাদ্যের পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু তথাপি এ-প্রকার ব্যাখ্যা আমাদিগের মনোমত নহে; এ-সম্বন্ধে স্বর্গত তর্করত্ন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা অল্প নহে—

"বীণা ও ডমরুর ন্যায় বাদ্যধ্বনি—কণ্ঠ ও মুখের সাহায্যে করিবার কৌশল। এখানে 'ডমরুক' এই যে ক-প্রত্যয়, ইহাই কৃত্রিমতার দ্যোতক। টীকাকার বলেন,—প্রকৃত বীণাবাদ্য ও ডমরু-বাদ্য;—ইহা বাদ্যনামক দ্বিতীয় কলার অন্তর্গত হইলেও প্রাধান্যহেতু পুনরুক্ত হয়। এ-অর্থ আমার ভাল লাগে নাই।১২

মুখে বাঁশী বাজান বা মুখ হইতে তব্‌লা ও ঢোলকের বোল বাহির করিতে আমি স্বয়ং বহুবার শুনিয়াছি। ব্যাপকভাবে উহা 'ভেন্ট্রিলোকুইজম্' কলার অন্তর্গত। উক্ত অর্থ যে এ-ক্ষেত্রে অসঙ্গত—তাহা মনে হয় না।

বেদান্তবাগীশ ও ৺সমাজপতি মহাশয়দ্বয় এই কলাটির উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই—ইহা লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়—"ইহা স্পষ্ট" বলিয়া এক কথায় শেষ করিয়াছেন।

২৮। প্রহেলিকা—টীকাকার বলিয়াছেন—'ইহা লোক-প্রতীত'—ক্রীড়ার্থ অথবা বাদকরণার্থ ইহার উপযোগ।১৩

'প্রহেলিকা' পদটির অর্থ ৺মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণে কথিত হইয়াছে—"কবিতায় গোপনীয় অর্থের পরিজ্ঞান"।১৪ এরূপ অর্থ প্রহেলিকা বস্তুটির স্বরূপ বুঝাইতে পারে না।

৺তর্করত্ন মহাশয় এক কথায় সমাপ্তি করিয়াছেন—"হেঁয়ালি রচনা ও পুরাতন হেঁয়ালির অভ্যাস"।১৫ অবশ্য দৃষ্টান্ত তিনি দেন নাই।

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—"কবিতায় গোপনীয় অর্থের পরিজ্ঞান"।১৬ এ-সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

৺সমাজপতি মহাশয়ের মতে—ইহা "হেঁয়ালি"।১৭

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—"কবিতায় গুপ্ত অর্থের জ্ঞান (হেঁয়ালি)"।১৮

প্রহেলিকা বলিলে বুঝায় হেঁয়ালি। হেঁয়ালি বলিলেই যে কবিতায় রচিত হেঁয়ালি বুঝাইবে—এরূপ কোন নিয়ম নাই। তবে সাধারণতঃ সংস্কৃতে উহা কবিতায় ও বাঙ্গালায় ছড়ায় রচিত হইয়া থাকে—কিন্তু গদ্যে হইলেও কোন অসঙ্গতি থাকিতে পারে না।

হেঁয়ালি দুই প্রকার—স্বরচিত ও পররচিত (প্রাচীন)

হেঁয়ালির উদ্দেশ্যও দুই প্রকার—(১) ক্রীড়াচ্ছলে আনন্দ উপভোগ (২) পরস্পরের সহিত বাদ-করণ। কিছুকাল পূর্ব্বেও বিবাহের সভায় বর ও বরযাত্রীদিগকে কন্যাপক্ষগণ হেঁয়ালি-প্রয়োগে উত্যক্ত করিতে ছাড়িতেন না।

মহাকবি দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে বলিয়াছেন—ক্রীড়া-গোষ্ঠী-বিনোদের নিমিত্ত, জনাকীর্ণ দেশে গুপ্ত ভাষণার্থ, ও পরব্যা-মোহনার্থ প্রহেলিকার উপভোগ হইয়া থাকে।

ক্রীড়া—বন্ধুগণের মধ্যে পরস্পর বাক্‌চাতুরী কৌতুক (অর্থাৎ কথা-কাটাকাটি)।

গোষ্ঠী—বিদগ্ধগণের একত্র আসনবন্ধ বা মিলন (assembly club)—চলিত ভাষায় 'আড্ডা'।

বিনোদ—কাব্যালাপে কালহরণ।

এই সকল স্থলে প্রহেলিকা চলিয়া থাকে।

আর যথায় বহু লোক উপস্থিত, তথায়ও প্রহেলিকাভিজ্ঞ ব্যক্তি-গণ অপরের সমক্ষেই গুপ্ত বিষয়ে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ্যে পরস্পর আলাপ করিতে পারেন, অথচ সাধারণ জনগণ সেই আলাপের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারে না।

আর পরের বুদ্ধি বিকল করিয়া অন্যের নিকট পরকে বোকা বানাইবার নিমিত্তও প্রহেলিকার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

দণ্ডীর মতে প্রহেলিকার ষোড়শ ভেদ—১ সমাগতা, ২ বঞ্চিতা, ৩ ব্যুৎক্রান্তা, ৪ প্রমুষিতা, ৫ সমানরূপা, ৬ পরুষা, ৭ সঙ্খ্যাতা, ৮ প্রকল্পিতা, ৯ নামান্তরিতা, ১০ নিভৃতা, ১১ সমানশব্দা, ১২ সম্মূঢ়া, ১৩ পরিহারিকা, ১৪ একচ্ছন্না, ১৫ উভয়চ্ছন্না ও ১৬ সঙ্কীর্ণা চ।

দণ্ডীর মতে এই ষোড়শ প্রকার অদুষ্টা প্রহেলিকা। ইহাদিগের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কাব্যাদর্শে দ্রষ্টব্য।১৯

এতদ্ব্যতীত তিনি পূর্ব্বাচার্য্যগণ-কথিত চতুর্দ্দশবিধ দুষ্টা প্রহেলিকারও উল্লেখ করিয়াছেন। টীকাকার ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের মতে চ্যুতাক্ষরা দত্তাক্ষরা, চ্যুতদত্তাক্ষরা, বিন্দুমতী ইত্যাদি কোন কোন মতে দুষ্টা প্রহেলিকার অন্তর্গত; মতান্তরে, গুপ্তা ইত্যাদি দুষ্টা প্রহেলিকার অন্তর্গত।২০

কাদম্বরীতেও এইরূপ নানাজাতীয় প্রহেলিকার উল্লেখ পাওয়া যায়—"কদাচিৎ অক্ষরচ্যুতক, মাত্রাচ্যুতক, বিন্দুমতী, গূঢ়-চতুর্থপাদ, প্রহেলিকা ইত্যাদির আলোচনা-দ্বারা…

ধর্ম্মদাস-রচিত বিদগ্ধ-মুখমণ্ডনের চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রহেলিকার লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে—যে কোন একটি অর্থের প্রকাশন-পূর্ব্বক, স্বরূপার্থের গোপন করিবা যথায় বাহ্য ও আভ্যন্তর এই দ্বিবিধ অর্থ কথিত হয়, তাহার নাম প্রহেলিকা।

প্রহেলিকা দ্বিবিধা—আর্থী ও শাব্দী। দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

'তরুণী-দ্বারা কণ্ঠদেশে আলিঙ্গিত ও (তরুণীর) নিতম্বস্থলে আশ্রিত হইয়া গুরুজনের সন্নিধানেও কে মুহুর্মুহুঃ কূজন করিয়া থাকে'?

---

১২ কাঃ সূঃ, বঃ সং, পৃঃ ৬৬,

১৩ "লোকপ্রতীতা ক্রীড়ার্থা বাদার্থা চ"—জয়ম। লোকপ্রতীত—সকল লোকেরই জানা।

১৪ পৃঃ ৯৩

১৫ কাঃ সূঃ, বং সং; পৃঃ ৬৬

১৬ শিঃ পুঃ, পৃঃ ৭

১৭ কল্কিপুরাণ, পৃঃ ২৪

১৮ কৌমুদী, পৃঃ ৩০

১৯ কাব্যাদর্শ ৩।৯৬-১২৪।

২০ কাব্যাদর্শ ৩।১০৬।

উত্তর—সজল পানীয়-কুম্ভ। কূজন করে—ভু কু ভু কু (বা ছল্ ছল্ দুলাং) শব্দ করে। অবশিষ্ট অংশের অর্থ সুস্পষ্ট। ইহা আর্থী প্রহেলিকার দৃষ্টান্ত।২১

সদা অরিমধ্যা হইয়াও বৈরিযুক্তা নহে, নিতান্ত রক্তা হইয়াও নিত্য সিতা,—যথোক্তবাদিনী হইয়াও দূতী নহে, এরূপ প্রীতিকরী কে?—শীঘ্র বল।

উত্তর—সারিকা। ইহা শাব্দী প্রহেলিকার দৃষ্টান্ত। সদা অরিমধ্যা—'অরি'-শব্দটি সর্ব্বদা যাহার মধ্যে বর্ত্তমান। সারিকা পদটির মধ্যে 'অরি' শব্দটি আছে। অথচ, বৈরভাব সারিকার নাই।

রক্তা—রক্তবর্ণা, অথচ অনুরক্তা। সিতা—শ্বেতবর্ণা। রক্তা হইয়াও সিতা—আপাত-বিরোধ। উহার সমাধান—অনুরক্তা ও শ্বেতবর্ণা (সারিকা—'সার' শব্দের অর্থ—কৃষ্ণ-শ্বেত-মিশ্র বিচিত্র বর্ণ)।

দূতীকে যেমন যেমন বাক্য বলিয়া দেওয়া হয়, নায়কের কাছে যাইয়া সে ঠিক তেমন তেমন বলে। আর কান্তের সমীপে যায় বলিয়া দূতীও সারিকা। আবার দেখুন—সারিকাকে যে যে কথা পড়ান যায়, সে সেই সেই কথা যথাযথভাবে উচ্চারণ করে, অথচ তাহাকে দূতী বলা চলে না।২২

এস্থলে শব্দগত হেঁয়ালি।

২৯। প্রতিমালা—টীকাকারের মতে—ইহার নামান্তর—'অন্ত্যাক্ষরিকা'। উহারও প্রয়োগ—ক্রীড়ার্থ বা বাদার্থ হইয়া থাকে। প্রতিশ্লোকে যথাক্রমে অন্তিম অক্ষরের সন্ধান-পূর্ব্বক যখন দুইজন পরস্পর শ্লোক পাঠ করে তখন তাহাকে প্রতিমালা বলা হয়।

প্রতিমালা—ছড়া-কাটাকাটি। অনেকটা তরজার মত। তবে এর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ধরুন,—প্রথমে কোন এক ব্যক্তি একটি শ্লোক বলিলেন। তাঁহার শ্লোকের যেটি অন্তিম অক্ষর, সেইটিকে প্রথম-অক্ষর-রূপে গ্রহণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে একটি শ্লোক রচনা করিতে হইবে। আবার তাঁহার শ্লোকের অন্ত্য অক্ষরকে প্রথম অক্ষর ধরিয়া প্রথম বাদী আর একটি শ্লোক করিবেন। এইরূপে বাদ-প্রতিবাদ চলিতে থাকিবে, যতক্ষণ না কোন একজন নিরুত্তর হন। যিনি প্রথম নিরুত্তর হইবেন, বুঝিতে হইবে তাঁহার হার হইল। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বরচিত শ্লোকের সমাদরই অধিক। কদাচিৎ কেহ কেহ প্রাচীন কবি-রচিত শ্লোকেরও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আবার মতান্তরে—ইহার অর্থ—ভাস্কর্য্যশিল্প।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"দুইজনে ছড়া-কাটাকাটি। এক ব্যক্তির ছড়ার শেষ অক্ষর অন্য ব্যক্তির ছড়ার প্রথম অক্ষর হইবে—এইরূপ যোজনা আবশ্যক"।২৩

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয় ইহার এক অভিনব অর্থ করিয়াছেন—"বস্তুর প্রতিরূপ প্রস্তুতকরণ। উনবিংশ শতাব্দীতে এ বিদ্যার একটি শাখা বাহির হইয়াছে, তাহার নাম ফটোগ্রাফী"।২৪ বেদান্তবাগীশ মহাশয় এ অর্থ কিরূপে পাইলেন, তাহার কোন যুক্তি বা প্রমাণ দেন নাই।

৺সমাজপতি মহাশয় ও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন—"বস্তুর প্রতিরূপ রচনার কৌশল"।২৫

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয় টীকাকারের অনুগামী—"অন্ত্যাক্ষরিকা নামে প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক শ্লোকের অন্ত্যাক্ষর সন্ধান করতঃ পরস্পর শ্লোক পাঠের সঙ্কেত"।২৬ (ক্রমশঃ)

---

২১ "ব্যক্তীকৃত্য কমপ্যর্থং স্বরূপার্থস্য গোপনাৎ। যত্র বাহ্যান্তরাবর্থৌ কথ্যেতে সা প্রহেলিকা ॥১॥

সা দ্বিধার্থী চ শাব্দী চ···তরুণ্যানিন্দিতঃ কণ্ঠে নিতম্বস্থল-মাশ্রিতঃ। গুরূণাং সন্নিধানেঽপি কঃ কূজতি মুহুর্মুহুঃ" ॥৩॥

২২। সদারিমধ্যাপি ন বৈরিযুক্তা নিতান্তরক্তাপি সিতৈব নিত্যম্। (প্যসিতৈব নিত্যম্—পাঠান্তর)।
যথোক্তবাদিন্যপি নৈব দূতী কা নাম কান্তেতি নিবেদয়াশু ॥৭॥
বিদগ্ধমুখমণ্ডন, ৪র্থ পরিঃ

২৩। কাঃ সূঃ, বং সং, পৃঃ ৬৬
২৪। শিঃ পুঃ, পৃঃ ৭
২৫। কঃ পুঃ, পৃঃ ২৪
২৬। কৌমুদী, পৃঃ ৩০

কথার মর্য্যাদা

ভোগ ও লোভ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কথার অর্থগৌরব আর মর্য্যাদা যদি চাও,
স্বল্পাক্ষর সার্থক কথা কম ক'রে বোলো তবে;
সূর্য্যকান্ত মণির ভিতরে রবির কিরণ দাও,
সূচের মতন তীক্ষ্ণ দহন অগ্নিরে পরাভবে।

ভোগে লোভ বাড়ে লোভে কদাচার,
প্রমাণ স্বয়ং সূর্য্য নিজে;
মীন হ'তে মেষ—মেষ হ'তে বৃষ
রাশি ভোগ করি রসনা ভিজে!

গান জুড়েছে ভানী, কামিনী, কামারপাড়ার আরো তিন চারটি যুবতী আর প্রৌঢ়া। তাড়ির পাত্র চুমুকে চুমুকে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, গানের মধ্যে আসছে মত্ততার আমেজ। দর্শকেরা কখনো কখনো এক একটা অশ্লীল উক্তি করছে, কখনো বা বলে উঠছে, বাঃ—বাঃ—বাহবা!

তারই মধ্যে সবটার সুর কেটে দিয়ে একবার চকিত কলরব জেগে উঠল।

—জমিদার, জমিদার!

রসভঙ্গে বিরক্ত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে জনতা উঠে দাঁড়াল। গান বন্ধ করে মেয়েরা জড়োসড়ো হয়ে সরে বসল একপাশে। ঢোল, করতাল, বাঁশি আর ঘুঙুরের বাজনা মুহূর্ত্তে থেমে গেল।

বিশ্বনাথ ডাকলেন, ওস্তাদ!

সামনে এসে আভূমি অভিবাদন জানাল রামনাথ। পেছনে পেছনে এল সুরেন, এল বৈজু।

—সব ঠিক আছে?

রামনাথ মাথা নীচু করে রইল। সুরেনের পেশীতে লাগল হিংস্রতার মত্ত আন্দোলন। বৈজুর চোখ দু'টো সাপের মতো কুটিল আর বিষাক্ত হয়ে উঠল—মশালের রাঙা আগুন প্রতিফলিত হতে লাগল সেই চোখে।

জবাব দিলে বৈজু। শান্ত গলায় বললে, হাঁ হুজুর, সব ঠিক আছে। আপনার চাকর আমরা।

—বেশ, মনে থাকে যেন।—ঠোঁটের ওপর বিশ্বনাথের দাঁত চেপে পড়ল: কোনো ভাবনা নেই তোদের।

শেষ পর্য্যন্ত যা হবে, তার দায় আমার।

রামনাথের মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের ছায়া। কিন্তু সুরেনের সমস্ত চেতনায় রূপাপুরের বিদ্রোহী পূর্ব্বপুরুষেরা সাড়া দিয়ে উঠেছে। অতীতের সম্রাট্ আর অতীতের সৈনিক।

বিশ্বনাথ বললেন, থামলে কেন, গান চলুক তোমাদের।

একজন কোথা থেকে এর মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার যোগাড় করে এনেছে। বিশ্বনাথ চেয়ারে ভালো করে চেপে বসলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখ পড়ে গেল ভানীর ওপর—এমন সুগঠিত, এমন পূর্ণায়ত! রাঘবেন্দ্র রায় বর্ম্মার লালসা আর লোভ উত্তর পুরুষের সমস্ত শিরা-স্নায়ুগুলোকে মাতাল করে দিলে। কোথায় রইল অপর্ণা, কোথায় রইল আসন্ন সন্ধ্যার সেই আবিষ্ট আচ্ছন্নতা। কী হবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে—কী হবে লাল্লা হরিশরণের কথা ভেবে। আপাততঃ এই মুহূর্ত্তটাই সত্য, তার চেয়ে অনেক বেশি সত্য ভানীর এই উচ্ছলিত যৌবনশ্রী। বিশ্বনাথ ব্যোমকেশকে ইঙ্গিত করলেন দু বোতল মদ জোগাড় করে আনবার জন্যে—আর দু চোখের তীব্র নির্লজ্জ দৃষ্টি দিয়ে যেন গিলতে লাগলেন ভানীকে। ওপাশ থেকে বৈজুর সাপের মতো তীক্ষ্ণ চোখ বার বার এসে বিশ্বনাথের মুখের ওপর এসে পড়তে লাগল—আর কেউ না হোক, সে বিশ্বনাথকে বুঝতে পেরেছে।

বৈজু মৃদু হাসল। ভানী একদিন ঘটির ঘায়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। সে কথা বৈজু ভোলে নি—প্রতীক্ষা করে আছে। আজ তার প্রতিশোধের দিন ফিরে এসেছে হয়তো।

রাত বাড়তে লাগল। এল মদের পাত্র, শূন্য হয়ে চলল তাড়ির ভাঁড়। ওদিকে নিজের ঘরে বসে কী একখানা বই পড়তে পড়তে বার বার উৎকর্ণ হয়ে উঠতে লাগলেন অপর্ণা। জানলার ফাঁকে বাইরে শুধু কালো অন্ধকার—আকাশে জলন্ত সপ্তর্ষি। রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সোনাদীঘির দিক থেকে ঢোলের শব্দ আরো উত্তাল আর উন্মত্ত হয়ে উঠছে।

—ক্রমশঃ

বিজ্ঞান-জগৎ

ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পাঁচ

কিন্তু তার আগে তড়িৎ পদার্থের প্রকৃতি সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। কাচের নল রেশমের রুমালের সঙ্গে ঘষলে উভয়েই তাড়িতযুক্ত হয়। এ কথা বলা হয় এই জন্য যে, ঘষবার পর দেখা যায়, প্রত্যেকেই ওরা কাগজের টুকরা এবং অন্যান্য হাল্কা পদার্থকে অনায়াসে আকর্ষণ ক'রে থাকে। অনুমান করতে হয়, ঘর্ষণের ফলে ঐ নলটা এবং রুমালখানা এমন কোন পদার্থের মালিক হয় যার ফলে ওদের ঐরূপ আকর্ষণ-ক্ষমতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই অজানা পদার্থের নাম তড়িৎ বা বিদ্যুৎ। আরো দেখা যায় যে, যদি দু'টা কাচের নলকে দু'খানা রেশমের রুমালে ঘষা যায় তবে কাচের নল দু'টা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং রেশমের রুমাল দু'খানাও পরস্পরকে বিকর্ষণ করে; কিন্তু প্রত্যেকটা কাচের নলই প্রত্যেকটা রুমালকে আকর্ষণ করে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, ঘর্ষণের ফলে কাচে ও রেশমে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয় তারা ভিন্ন প্রকৃতির। মোটের ওপর দু'প্রকার তড়িতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় এবং বলতে হয়, দু'টা সমজাতীয় তড়িৎবিশিষ্ট পদার্থ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিষম জাতীয় তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

উক্তপ্রকারের ঘর্ষিত কাচের তড়িৎকে বলা যায় ধন-তড়িৎ এবং রেশমের তড়িৎকে বলা যায় ঋণ-তড়িৎ। সুতরাং সংক্ষেপে বলতে পারা যায়—ধনে-ঋণে আকর্ষণ এবং ধনে-ধনে বা ঋণে-ঋণে বিকর্ষণ ঘটে। আরো দেখা যায় যে, ঘর্ষণের পর যদি কাচের নল ও রেশমের রুমালকে একত্র করা যায় তবে সংযুক্ত অবস্থায় ওরা বাইরের কোন পদার্থকে আকর্ষণ করে না, অর্থাৎ উভয় তড়িৎ

মিলে মিশে একটা তড়িৎবিহীন অবস্থা জ্ঞাপন করে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ঘর্ষণের ফলে যে ধন ও ঋণ তড়িতের আবির্ভাব হয় তারা পরিমাণে সমান এবং যদি সমপরিমাণে উভয় তড়িতের মিলন ঘটে তবে ওরা পরস্পরে কাটাকাটি ক'রে তড়িৎ-হীন অবস্থার সৃষ্টি করে। আরো দেখা গেছে যে, কেবল কাচের নল ও রেশমের রুমালই নয়, বিভিন্ন প্রকৃতির যে কোন পদার্থদ্বয়ের পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলেই একটায় ধন ও অপরটায় ঋণ তড়িতের উৎপত্তি হয় এবং পরিমাণেও ওরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের সমান। এর থেকে এবং অন্যান্য পরীক্ষা থেকেও সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জড়দ্রব্য মাত্রই উভয় জাতীয় তড়িতের আধার। যতক্ষণ ওর উভয় তড়িতের মাত্রা সমান থাকে ততক্ষণ ঐ জড় পদার্থে—উভয় তড়িতের কাটাকাটির ফলে—তড়িদ্ধর্মের বিকাশ হয় না। দু'টা বিভিন্ন পদার্থের ঘর্ষণের ফলে এই সমতা নষ্ট হয়—একটার ধন-তড়িৎ বেড়ে যায় এবং অপরটার সম পরিমাণে কমে যায়। যেটার বাড়ে সেটা ধন-তড়িতের এবং যেটার কমে সেটা সম পরিমাণে ঋণ-তড়িতের আধার হয়। সুতরাং পদার্থ বিশেষকে তড়িদ্যুক্ত করার অর্থ দাঁড়ালো, ওর অন্তর্গত ধন ও ঋণ তড়িতের সমতা নষ্ট ক'রে ওদের মধ্যে কারুকে খানিকটা প্রাধান্য প্রদান।

কিন্তু তড়িৎ মূলতঃ কি পদার্থ তা' এই ধরনের সাধারণ পরীক্ষা থেকে জানতে পারা যায়না। তড়িতের গঠন কিরূপ? তড়িৎ কণাময় না কল্পিত ইথরের মত ক্রমভঙ্গহীন পদার্থ? তখনকার বৈজ্ঞানিকগণ ধ'রে নিয়েছিলেন যে, তড়িৎ এক প্রকার সরিল পদার্থ (Fluid) এই পদার্থ ক্রমভঙ্গহীন ও ভারহীন এবং এর অংশসমূহ পরস্পরকে বিকর্ষণ ক'রে থাকে। ভারহীন অনুমান করা হয়েছিল এই জন্য যে, তড়িৎবিশিষ্ট হওয়ায় ফলে পদার্থের ওজনে তাঁরা কোন তারতম্য দেখতে পান নি। ঘর্ষণের ফলে এইরূপে যে তড়িতের আবিষ্কার হলো তাকে বলা হয় ঘর্ষণজ তড়িৎ বা স্থির-তড়িৎ। স্থির-তড়িৎ বলা হয় এই জন্য যে, এইরূপ তড়িৎ বিশিষ্ট কোন পদার্থকে কোন তড়িৎ-অপরিচালক (Non-conductor) আধারের ভেতর রেখে দিলে ওর তড়িতের মাত্রা ঠিকই থেকে যায় এবং ঐ নির্দিষ্ট মাত্রা নিয়ে নানা পরীক্ষা করা চলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্যাল্‌বানি প্রবহমান তড়িতের অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন। এর কিছুদিন পরে ভল্‌টা দেখালেন যে, একটা কাচের পাত্রে সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে তার ভেতর একটা তামার চাকৃতি ও একটা দস্তার চাকৃতি দাঁড় করিয়ে রাখলে তাম্রখণ্ডটা ধন-তড়িৎ এবং দস্তা-খণ্ড ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এইরূপ তড়িতাধারকে বলা যায় তড়িৎ-কোষ। আরো দেখা গেল যে, ঐ চাকৃতি দু'টাকে যদি একটা তামার তার (বা অন্য কোন তড়িৎ-পরিচালক পদার্থ) দ্বারা বাইরের দিক দিয়ে সংযুক্ত ক'রে দেওয়া যায় তবে এই চক্রের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হ'তে থাকে। প্রবল তড়িৎ-স্রোত পেতে হ'লে একটা তড়িৎকোষের বদলে পর পর সংযুক্ত বহু কোষ ব্যবহার করতে হয়। এইরূপ কোষের সমষ্টিকে বলা যায় বৈদ্যুৎ-ব্যাটারী।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে উরষ্টেড্‌ তড়িৎ-প্রবাহ সম্বন্ধে একটা বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর পরীক্ষা থেকে দেখা গেল যে তড়িৎ-প্রবাহ সমন্বিত একটা তামার তার চুম্বকের ওপর বিশিষ্ট ধরণের প্রভাব বিস্তার করে। একটা চুম্বক শলাকায় সুতা বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে স্বভাবতঃই শলাটা উত্তর-দক্ষিণ দিক্‌-বরাবর অবস্থান করে। উরষ্টেড্‌ দেখালেন যে, তড়িৎ-প্রবাহবিশিষ্ট একটা তারকে যদি চুম্বক-শলাকাটার সমান্তরাল ভাবে, এবং ওর ঠিক ওপরে বা নীচে ধ'রে রাখা যায়, তবে চুম্বকটা ঘুরে গিয়ে পূব-পশ্চিম দিক্‌-বরাবর অবস্থান করতে চায়। এর থেকে এইটা প্রতিপন্ন হলো যে, তড়িৎ-প্রবাহ চুম্বক-ধ্রুবের ওপর বলপ্রয়োগ করে এবং এই বল কতকটা সৃষ্টিছাড়া ধরনের। কারণ, বলটা আকর্ষণও নয় বিকর্ষণ-বলও নয়, পরন্তু তড়িৎ-প্রবাহটার আড়-ভাবে (perpendicularly) অবস্থিত। আড়াআড়ি বল-প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া গেল এই প্রথম। এই পরীক্ষা থেকে আর একটা সিদ্ধান্তও আপনি এসে পড়লো। আমরা জানি ক্রিয়ামাত্রেরই সমান প্রতিক্রিয়া রয়েছে। সুতরাং বলতে পারা যায়, তড়িৎ-প্রবাহ যেমন চুম্বক-ধ্রুবের ওপর, চুম্বক-ধ্রুবও সেইরূপ তড়িৎ-প্রবাহের ওপর উল্টাদিকে সমান বল প্রয়োগ করবে। সুতরাং তড়িৎ-প্রবাহযুক্ত তারটা যদি স্বাধীন ভাবে চলবার সুযোগ পায় তবে চুম্বকের মত তারটাকেও উল্টাদিকে সরে যেতে দেখা যাবে। বস্তুতঃ ফ্যারাডের পরীক্ষা থেকে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

ফ্যারাডের আর একটা বিশিষ্ট পরীক্ষা থেকে তড়িৎ সম্বন্ধে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। পরীক্ষাটা হলো যৌগিক তরলপদার্থের বৈদ্যুৎ-বিশ্লেষণ সম্পর্কে ; আর তথ্যটা হলো এই যে, তড়িৎ জিনিসটা বস্তুত ক্রমভঙ্গহীন সরিল পদার্থ নয়, পরন্তু সাধারণ জড়পদার্থের মতই কণাময়,—অর্থাৎ তড়িতের গঠনেও ক্রমভঙ্গ রয়েছে। পরীক্ষার বিষয়টা এখন না তুলে তথ্যটার কথাটাই আগে আমরা বলবো। যৌগিক তরলপদার্থের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ লবণাক্ত জলের উল্লেখ করা যেতে পারে। খাদ্যরূপে আমরা যে লবণ ব্যবহার করি তা' একটা যৌগিক পদার্থ। ওর রাসায়নিক নাম সোডিয়ম-ক্লোরাইড ; কারণ রসায়ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, একটা সোডিয়ম-পরমাণু ও একটা ক্লোরিন-পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগের ফলে এক একটা লবণের পরমাণু গঠিত হয়েছে। কিন্তু জলের ভেতর দ্রব অবস্থায় লবণের অণুগুলি আস্ত থাকে না। আরহিনিয়স্‌ এই মত প্রচার করলেন যে, জলে দ্রবীভূত হতে গিয়ে যৌগিক অণুগুলির অনেকেই দু'টুকরা ভেঙ্গে যায়, ফলে সোডিয়ম এবং ক্লোরিনের পরমাণু পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে থাকে ; অধিকন্তু উভয় পরমাণুর অবস্থাই তখন তড়িদ্যুক্ত অবস্থা। সোডিয়ম-পরমাণু বহন করে খানিকটা ধন-তড়িৎ এবং ক্লোরিন-পরমাণুতে থাকে ঠিক সম-পরিমাণের ঋণ-তড়িৎ। সমপরিমাণের কারণ গোটা অণুর অবস্থাটা ছিল তড়িৎবিহীন অবস্থা। বিভক্ত অণুর এই ভ্রাম্যমাণ ও তড়িদ্যুক্ত অংশদ্বয়কে বলা যায়, 'আয়ন' (ion). বর্তমান ক্ষেত্রে সোডিয়ম ও ক্লোরিন-পরমাণুর প্রত্যেকেই এক একটি আয়ন, কিন্তু ক্ষেত্র-

ভেদে কোন কোন আয়ন একাধিক পরমাণুর সমষ্টিও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বেরিয়ম-ক্লোরাইড নামক যৌগিক পদার্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। বেরিয়মের ভ্যালেন্সি বা সঙ্গ-স্পৃহার মাত্রা হচ্ছে ২ বা সোডিয়মের দ্বিগুণ। সুতরাং বেরিয়ম-ক্লোরাইডের অণু গঠিত হয়েছে প্রতিটি বেরিয়ম-পরমাণুর সঙ্গে একজোড়া করে ক্লোরিন-পরমাণুর সংযোগের ফলে। জলে দ্রবীভূত অবস্থায় এই অণু ভেঙ্গে গিয়ে ধন-তড়িৎ বিশিষ্ট একটি বেরিয়ম-পরমাণু এবং সমমাত্রায় ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট একজোড়া ক্লোরিন-পরমাণুতে পরিণত হয় এবং ঐ অংশদ্বয়ের প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে জলের ভেতর বিচরণ করতে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে 'আয়ন' বলতে বোঝায় একটি বেরিয়ম-পরমাণু এবং একজোড়া ক্লোরিন-পরমাণুকে। প্রত্যেক স্থলেই অণুর ভাঙ্গনের ফলে আয়নের পরিণতি। এই ব্যাপারকে বলা যায় 'আয়নী ভবন' (ionisation)

জিজ্ঞাস্য হয়, যদি এক মাত্রার সঙ্গ-স্পৃহাবিশিষ্ট সোডিয়ম-পরমাণুর তড়িতের মাত্রা ১ ধরা যায় তবে দু'মাত্রার সঙ্গ-স্পৃহা-সম্পন্ন বেরিয়ম-পরমাণু কতটা তড়িৎ বহন করে থাকে? উক্ত উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, বেরিয়ম-পরমাণুর তড়িতের মাত্রা হবে ২। কারণ, সোডিয়ম-ক্লোরাইডের ক্লোরিন-পরমাণু বলছে, আমি বহন করি সোডিয়ম-পরমাণুর সমান তড়িৎ বা একমাত্রার তড়িৎ; সুতরাং বেরিয়ম-ক্লোরাইডের ক্লোরিন-পরমাণুযুগল বলবে আমরা উভয়ে বহন করি ২ মাত্রার তড়িৎ; সুতরাং বেরিয়ম-পরমাণু বলবে আমি একাই বহন করি ২ মাত্রার তড়িৎ, নইলে দুটি ক্লোরিন-পরমাণুর পাণিগ্রহণ করে' আমার অনুরূপ ক্ষুদ্র সংসারে তড়িৎ-বিহীন অবস্থা ঘটতে পারতো না। এইরূপ যুক্তি অবলম্বনে দেখতে পাওয়া যায় যে, ল্যান্থিয়ম নামক ধাতুর পরমাণুর সঙ্গে গ্রথিত হয়ে রয়েছে ৩ মাত্রার তড়িৎ। মোটের ওপর এরূপ একটা নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় যে, পরমাণুর সঙ্গ-স্পৃহার সঙ্গে তার তড়িতের মাত্রার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে—যে পরমাণুর সঙ্গ-স্পৃহা যত সে বহন ক'রেও থাকে সেই পরিমাণে তড়িৎ। এখন সঙ্গ-স্পৃহা নির্দেশ করতে হয় ১, ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যাদ্বারা সুতরাং পরমাণুদের তড়িতের মাত্রাও নির্দেশ করার প্রয়োজন ঐ সকল পূর্ণসংখ্যা দ্বারাই। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত এসে পড়ে যে, জড়দ্রব্যের মত তড়িৎপদার্থের গঠনও কণাময়। তড়িৎ-পদার্থ বিভাজ্য হলেও ওর বিভাজ্যতার একটা সীমা রয়েছে। সঙ্গ-স্পৃহা ১ পরিমিত এইরূপ আয়ন কিম্বা পরমাণু যতটা তড়িৎ তার অন্তরে বহন করে ঐ হচ্ছে ক্ষুদ্রতম তড়িৎ-কণা বা তড়িৎ-পদার্থের সূক্ষ্মতম মাপকাঠি। সোডিয়ম বা ক্লোরিন-পরমাণুর মত হাইড্রোজেন-পরমাণুরও সঙ্গ-স্পৃহা ১; সুতরাং হাইড্রোজেন-পরমাণুর সঙ্গে যতটা তড়িৎ গ্রথিত হয়ে রয়েছে তাকেই ক্ষুদ্রতম তড়িৎ-কণা রূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সর্ব্বাপেক্ষা হাল্কা পরমাণুই বহন করে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম তড়িতের মাত্রা; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত টেবলে হাইড্রোজেন-পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা যে ১ দ্বারা নির্দ্দেশ করা গিয়েছে তা' যুক্তিযুক্তই হয়েছে।

আরহিনিয়সের উক্ত মতবাদ একটা অনুমান মাত্র; কিন্তু এর আগেই ফ্যারাডের পরীক্ষা থেকে বৈদ্যুৎ-বিশ্লেষণ সম্বন্ধে যে নিয়মটা আবিষ্কৃত হয়েছিল তা'র থেকেই এই মতবাদ সমর্থন লাভ করেছে। আরহিনিয়সের উক্তি থেকে আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, লবণাক্ত জল বা অন্য কোন যৌগিক তরল পদার্থের ভেতর যদি তড়িৎ-ক্ষেত্র সৃষ্টি ক'রে—তড়িৎ-বল প্রয়োগ করা যায় তবে ধন-তড়িৎবিশিষ্ট আয়নগুলি দল বেঁধে ঐ বলের অভিমুখে এবং ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট আয়নগুলি তার উল্টাদিকে অভিযান সুরু করবে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, তরল পদার্থে তড়িৎ-স্রোত উৎপন্ন করার প্রণালীই হচ্ছে এইরূপ দ্বি-মুখী অভিযানের সৃষ্টি করা। প্রত্যেক আয়ন তার নির্দ্দিষ্ট তড়িতের মাত্রাকে বক্ষে ধারণ ক'রে, হয় তড়িৎ-বলের অভিমুখে নয় তা'র উল্টাদিকে ছুটে চলে এবং তারি ফলে তড়িৎ-প্রবাহ। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, বৈদ্যুৎ-বিশ্লেষণের ফলে যতটা ক'রে আয়ন (লবণ-জলের বেলায় সোডিয়ম-আয়ন ও ক্লোরিন-আয়ন) ঐ তরল পদার্থ থেকে উদ্ভূত হবে তাদের ওজন এবং তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা একই অনুপাতে বাড়তে থাকবে। এই নিয়মটাই ফ্যারাডের পরীক্ষা ও পরিমাপ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। কেন এই নিয়ম তার কতকটা ব্যাখ্যা পাই আমরা আরহিনিয়সের মতবাদ থেকে; এবং ফলে, আনুষঙ্গিকভাবে এই তথ্যটাও আবিষ্কৃত হলো যে, তড়িৎ-পদার্থও জড়দ্রব্যের মতই কণাময়। তড়িৎ-কণাগুলি জড়-পরমাণুর মতই অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; কিন্তু সূক্ষ্ম হলেও সসীম এবং জড়-পরমাণুদের মতই মস্ত কারবারী। উভয় শ্রেণীর কণাই সসীম মাপকাঠিরূপে কারবারের জগতে সমান মর্য্যাদার দাবি করে। বৈজ্ঞানিকগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো জড় এবং তড়িৎ উভয়ই কণাময় এবং এই কণাগুলি সসীম পদার্থ। সুতরাং এখন পর্য্যন্ত ব্যবহারিক সত্য খাঁটি সত্যের মর্য্যাদা দাবী ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো এবং গাণিতিক সত্যের একমাত্র প্রয়োজন অনুভূত হলো ব্যবহারিক সত্যগুলির বাস্তব রূপের কল্পনায় কোন ভুলভ্রান্তি না আসতে পারে সে-বিষয়ে সাবধান করার জন্য। দুই আর একে যে তিন হয় এ খুবই ঠিক কিন্তু এ-ঠিকের কোন মূল্যই থাকতো না যদি তিনটা জড়কণা বা তিনটা তড়িৎ-কণা সশরীরে বিদ্যমান থেকে এবং আমাদের অনুভবযোগ্য স্বরূপ নিয়ে গাণিতিকের ফরমূলার ভেতর উপস্থিত হতে না পারতো। ফলে এখন পর্য্যন্ত গাণিতিক বৈজ্ঞানিকের বাহন রূপেই কল্পিত হতে লাগলো।

[ক্রমশঃ]

প্রাক্তন স্বপ্ন (গল্প)

শ্রীবটকৃষ্ণ দাস

পথের বাঁকেই হঠাৎ ওর সুচরিতার সঙ্গে দেখা,…আশ্বিনে ধোয়া আকাশে এক টুক্‌রো উড়ো হাল্কা মেঘের মত একেবা আচমকা, আকস্মিক। এ রকম হঠাৎ দেখা হ'য়ে যাওয়াটা ব আশ্চর্য্য ঠেকে অপূর্ব্বর কাছে, এত আশ্চর্য্য যে বিশ্বাস কর পারা যায় না; অথচ এই অবিশ্বাস্য, অচিন্তনীয়, অপ্রত্যাশি আশ্চর্য্যটাই আজ হঠাৎ ওর সামনে এসে এমনভাবে চমক লাগি দিল যে, বিশ্বাস না ক'রেও কোনও উপায় নেই। ক্ষুদ্র থে ক্ষুদ্রতর ঘটনা, অথচ অপূর্ব্বর কাছে সেটা একটা মস্ত বড় হেঁয়ালি, যার ইঙ্গিতে ও বোবা হ'য়ে গেছে, অসাড় হ'য়ে গেছে, অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। কি করবে ও? কিছু একটা বল্‌তে হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু কিছু না বলাটাই যেন আরো সহজ ওর কাছে। একটা ভয়ঙ্কর দোটানায় পড়েছে অপূর্ব্ব, একটা বিশ্রী আবর্ত্তের ফেনিল উচ্ছ্বাসে যেন টল্‌মল্ করছে ও, কখন তলিয়ে যায় তার ঠিক নেই। সুচরিতা কিন্তু আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না, ডাকে—"অপূদা।" অপূর্ব্ব একটু হাল্কা হোল, খানিকটা নিশ্চিন্ততার ভেতর হঠাৎ যেন ও নিজেকে পারলো একটুখানি জানতে,—বিষাক্ত ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাবার পর রোগী যেমন নিজেকে একটু জানতে পারে, ঠিক সেই রকম। অপূর্ব্ব সুচরিতার মুখের দিকে চায়, দেখে,—সুচরিতার হাতে একটা মস্তবড় গোলাপ ফুলের তোড়া, আর তার ওপর ঢাকা জেলীর মত কোমল একটা হাল্‌কা রুমাল। মৃদু একটু হেসে সুচরিতা জিজ্ঞাসা করে—"খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছো, না?" অপূর্ব্ব একটু হাস্‌তে চেষ্টা ক'রেও পারে না, তাড়াতাড়ি জবাব দেয়—"একটু আশ্চর্য্য হ'য়েছি বৈ কি! আজ পাঁচ বছর পরে হঠাৎ দেখা।" সুচরিতার ঠোঁটে এক টুক্‌রো মরা, বর্ণহীন হাসি ভেসে ওঠে, মাথা নীচু ক'রে ও বলে—"আজ তোমার জন্মদিন, তাই আস্‌ছিলাম তোমায় ফুলগুলো দিতে,…মাঝখানের পাঁচটা বছর তো আর আসতে পারি নি।" বহুদিন পরে আজ হঠাৎ অপূর্ব্বর মনে হোল,—আজ ওর জন্মদিন। একেবারেই ভুলে গেছলো ও,…জন্মদিনের কথাটা শুনে মন্দ লাগলো না অপূর্ব্বর, বল্‌লো—"এসেছো যখন, তখন একবার বাড়ীতে চল সুচরিতা।" "না-না, বাড়ীতে আর এখন যাব না, অনেক কাজ ফেলে এসেছি পেছনে…ফুলগুলো নাও"—সুচরিতা ফুলগুলো তুলে দিলো অপূর্ব্বর হাতে। আবার এক মুহূর্ত্তের ছেদ…একটা অসন্নিবিষ্ট মুহূর্ত্তের মৃত্যু। নূতন মুহূর্ত্তের সূচনায় প্রথমেই কথা বল্‌লো অপূর্ব্ব—"সুচরিতা, চল বাড়ীতে গিয়ে একটু বসি।" সুচরিতার মনের এক অজ্ঞাত, অলক্ষিত আগ্নেয়গিরির গহ্বর ফেটে যেন একমুঠো বিষাক্ত গরম কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে চাইলো, একটা সকরুণ প্রবল উচ্ছ্বাস ওর মনের শান্ত, মরা নদী থেকে উপ্‌ছে পড়ে যেন ফেটে পড়তে চাইলো ওর দুটো চোখের শুক্‌নো তীরে, কোন রকমে বল্‌লো তাড়াতাড়ি—"না, না, অপূদা,…ও বাড়ীতে আর আমায় যেতে বলো না, তার চেয়ে চলো ঐ পার্কে গিয়ে বসি।"

কয়েক পা হেঁটে ওরা যখন পার্কে গিয়ে বসে, গোধূলির অস্তরাগে তখন সমস্ত আকাশটা রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। ওরা দু'জনে বসে আছে নিষ্প্রাণ উপস্থিতির মত,…ভুলে গেছে যে ওরা বসে আছে, বসে আছে অর্থহীন প্রয়োজনে। হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পাওয়া চেতনায় খানিকটা টাট্‌কা, গরম নিশ্বাস আছড়ে পড়ে ওদের অনুভূতির তোরণে। ওরা চমকে ওঠে হঠাৎ বিদ্যুতে খানিকটা ঝল্‌সানির মত, ভাবে—কিছু বলতেই হবে, অন্ততঃ কিছু বলাই প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে মগজের কামরায় কোন্ যাদুকরের চমক্ লাগানো যাদুর অপরূপ ছোঁয়ায় ঘুমিয়ে থাকা রাশি রাশি কথা যুগপৎ জেগে ওঠে, লাফিয়ে ওঠে, অস্থির হ'য়ে ওঠে বাইরের একটু আলো আর বাতাসের লোভে। অনেক কথার ঠেলাঠেলি আর ব্যস্ততায় উদ্‌ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে ওরা, কোনটা বলবে আগে আর কোন্‌টা শেষে? এই বিচার করতে করতেই সুচরিতার ঠোঁটের ওপর প্রথমেই বেজে ওঠে—"পাঁচ বছর আগের দিনগুলো মনে পড়ে অপূদা?" অপূর্ব্ব যেন কূল থেকে কূলে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ একটা অবলম্বন পায়,…সুচরিতার মুখের দিকে চেয়ে জবাব দেয়—"পড়ে; কিন্তু আজ সেটাই সকলের চেয়ে বড় পরিহাস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।" "ঠিক তাই"—সুচরিতার কোমল, মাংসবহুল বুক বেয়ে একটা কম্পমান দীর্ঘশ্বাস আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে, ওর বেদনার্ত্ত মনের অশরীরী প্রেতাত্মা, অস্পষ্টশ্রুত হাহাকার সেই দীর্ঘশ্বাস। আবার কিছুক্ষণের মূর্চ্ছা, মনের সজাগ চেতনার ওপর অবচেতনার খানিকটা হাল্‌কা ছায়া এগিয়ে আসে, আবার সরে যায়; রিক্ত বিরহী শিল্পীর বাঁশির মত সুচরিতার মনের মুক্ত রন্ধ্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসে গোটাকতক উদাস অশ্রুসিক্ত বাণীর সুসংলগ্ন সুসন্নিবেষ্ট টুক্‌রো—"কিন্তু, আজো যখন সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত, হাঁপিয়ে-পড়া মনটাকে একটু নির্জ্জনতার কোমল ছায়ায় ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই, তখন বারবার কেন সেই হারানো মরচে-পড়া দিনগুলোর সর্ব্বাঙ্গ থেকে রকমারী আলো ঠিক্‌রে এসে চোখ দুটো ঝল্‌সে দেয়, তা আজো বুঝে উঠতে পারিনি অপূদা।" সুচরিতার চোখের কোল দুটো চিক্‌চিক্ ক'রে ওঠে, কালো ভাসমান মেঘের আড়াল থেকে উজ্জ্বল তারার মত… ওর মনের উচ্ছৃঙ্খল মরুভূমির ওপর দিয়ে পাঁচবছরের জমা কালবৈশাখী ছুটে চলেছে হু-হু ক'রে। অপূর্ব্বর মন কিন্তু শান্ত, দৃঢ়, নিরুপদ্রব; ও সহজ, সরল, সাধারণ,—একেবারে নূতন, তাই বেশ শান্তস্বরেই ও বলে, "মিথ্যাকে বুঝতে গেলে মনকে অনেক মিথ্যা কৈফিয়তই দিতে হয় সুচরিতা।" "মিথ্যা?" জমাট বিস্ময়ে সুচরিতা আছড়ে পড়ে অপূর্ব্বর সর্ব্বাঙ্গে। অপূর্ব্ব হাসে, কৃষ্ণপক্ষের ম্লান তামাটে চাঁদের মত, জবাব দেয় "তা ছাড়া আর কি! দুটো মুখের রঙীন কথার প্রেরণায় যে মন দুটো কোন কূলের সন্ধান না নিয়েই পাল-ছেঁড়া নৌকার মত প্রবল জোয়ারে ভেসে চলেছিল, আজ হঠাৎ তা স্থির হয়ে গেছে কেন? একদিন যাকে প্রেম ব'লে ভুল করেছিলাম, তা প্রেম নয়…সে শুধ মহূর্ত্তের জ্বলে-ওঠা, মহূর্ত্তের উপচে-পড়া।"

"অপূদা" রুদ্ধ নিশ্বাসে চেঁচিয়ে ওঠে সুচরিতা। অপূর্ব্বর মধ্যে তবু কোন পরিবর্ত্তন নেই…ও যেন সাগরের পাষাণ-তীর, যার ওপর ঢেউ এসে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়লেও কোনও সাড়া

নেই। সুচরিতার বেদনা-পাণ্ডুর মুখের সহজ প্রকাশেও তাই ও জুলে ওঠে না, দৃঢ় কণ্ঠে বলে, "ঠিক তাই সুচরিতা; অপরিণত মন নিয়ে যে মিথ্যার পেছনে একদিন ছুটেছিলাম আমরা, সেই মিথ্যাই আজ চৈত্রের সূর্য্যের মত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের জীবনে। যা হয়েছে তা সবই মিথ্যে, আর আজ যেগুলো কারণে অকারণে দুঃস্বপ্নের মত চোখের সূক্ষ্মতম পাতায় পাতায় নেচে বেড়ায়, সেগুলো তার প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।"

সুচরিতা জ্বলে ওঠে, একফুল্‌কি আগুনের ছোঁয়ায় একরাশি টাটকা বারুদের মত। বলে,—"বাণীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত বাস্তব সুরের কোমল প্রাণ রঙীন সূর্য্যের একটুখানি সুস্নিগ্ধ উত্তাপের তৃষ্ণায় হাঁপিয়ে উঠেছিল, বিচ্ছেদের পরেও সেই প্রাণের সত্যিকারের স্পন্দন যদি কোনদিনই প্রতিধ্বনিত হোত তোমার সর্ব্বগ্রাসী মনের শূন্য আনাচে-কানাচে, তা হলে আজ তুমি এ কথা বলতে পারতে না অপূদা'। তোমার নিষ্ঠুর বুকের ভেতর এখনো যে প্রাণটা সজীব হয়ে আছে, তুমি ভুললেও, সে আজো ভোলেনি কিছুই; সে জানে, তোমার আর আমার মাঝখানে কত উচ্ছ্বসিত, কত পরিপূর্ণ সোণালী মুহূর্ত্তে দুটো অদৃশ্য অশরীরী মনের কত শতবার আলিঙ্গন হয়েছে, কত বোবা মূর্চ্ছিত মুহূর্ত্তের ভগ্নাংশে আমরা দুজনে দুজনকে লুঠ করে নিয়েছি শত সহস্র হাতে,—দুজনকে রিক্ত করে পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছি দুজনের কাছে।"

সুচরিতা কেঁদে ফেলে, সুপ্ত বেদনার আকস্মিক জাগরণের মর্ম্মান্তিক কশাঘাতে। অপূর্ব্ব তখনো পূর্ব্বের মত কঠিন, তাই বেশ সহজভাবেই বলে, "সে সবই একটা চমৎকার ফাঁকি, একটা অভিনব অভিনয়, তাই তার চিরমৃত্যু হওয়াই ভাল।" সুচরিতার দেরী হয় না উত্তর দিতে, সঙ্গে সঙ্গেই ওর কম্পিত ঠোঁট দুটোয় বেজে ওঠে "বাণীর নূপুর পায়ে দিয়ে তোমার দুটো ঠোঁটের সঙ্গমস্থলে সেদিন যে একটুখানি প্রাণের স্পন্দন বেজে উঠেছিল, আজ তার মৃত্যু হয়েছে জানি; তবু কোনও শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথির মনভোলানো তন্বী চাঁদের মায়ায়, বাসন্তিক মলয়ের নিশ্বাসের আবেশ-যন্ত্রণায়, কোনদিনই কি সে মাটির গর্ভ থেকে একটা আলো-বাতাসবঞ্চিত দুর্ব্বল চারার মত, তোমার মনে ভীরু ক্ষণস্থায়ী প্রাণকে নিয়ে এক ফোঁটা আনন্দেও বেঁচে ওঠে না?" "না, না, না", অপূর্ব্বর দৃঢ় জবাব। মিশ্‌কালো সাড়ীটার আঁচলে মুক্তোর মত ধব্‌ধবে অশ্রুকণাগুলোকে সযত্নে লুকিয়ে রেখে আস্তে আস্তে বললো সুচরিতা, "আমি অপূদা; যাবার সময় আশা-ভীরু মনে একটা অনুরোধ শুধু তোমায় করছি, ফুলগুলো যত্ন ক'রে রেখো, ওগুলো আমার অন্তরের অকৃত্রিম প্রীতি-উপহার, পাঁচ বছর আগে তোমার তিনটে জন্মোৎসবে যা দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার,...আর এই চিঠিটা পড়ো।" স্বেদাক্ত, উত্তপ্ত বুকের ওপর বক্ষোবাসের আড়ালে রেখে দেওয়া একটা নীলচে, খসখসে খাম বার্‌ করে ও দেয় অপূর্ব্বর হাতে, অপূর্ব্ব নিঃশব্দে গ্রহণ করে। সুচরিতা উঠতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় অপূর্ব্ব বললো, "আবার কবে আসবে সুচরিতা?"

"ঠিক জানি না; কালই আবার "ওঁ"র সঙ্গে ঝরিয়া যেতে হবে।"

পার্ক থেকে বেরিয়ে ওরা চললো সোজা রাস্তা ধরে, কম্পমান প্রদীপ-শিখার মত। রাস্তার ওপার দিয়ে ছুটন্ত একটা ট্যাক্সিকে ডেকে সুচরিতা উঠে বসে, বলে, "যদি কিছু ব্যথা দিয়ে থাকি, ক্ষমা করো অপূদা।" নেহাৎ সৌজন্য আর ভদ্রতার তাড়নায় সুশ্রী জবাব দেয় অপূর্ব্ব, "ওকথা ব'লে লজ্জা দিও না।" "আসি" সুচরিতার ট্যাক্সি ছুটে চললো—অপূর্ব্বর দৃষ্টিকে পছনে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গেই অপূর্ব্বর মনে পড়ে, রীতিমত প্রয়োজনীয় একটা কাজ এখনো বাকী আছে ওর। শাড়ী একখানা কিনতে হবে ওকে মানসীর জন্যে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেয় ও, তারপর উঠে বসে একটা ট্রামে। দোকানে গিয়ে অনেক বিচার-বিবেচনার পর কেনে একখানা শাড়ী, ওর মতে মানসীকে সকলের চেয়ে বেশী মানাবে যেটা। মানসীর বিদ্যুতের ঝল্‌সানির মত স্পষ্ট আর উজ্জ্বল দেহে অস্পষ্ট আর ধোঁয়াটে রঙের সাড়ীই মানায় ভালো।

মানসীর কাছে অপূর্ব্ব যখন এসে পৌছালো, রাত তখন প্রায় ন'টা। অপূর্ব্বর প্রতীক্ষায় থেকে মানসী তখন পিয়ানোয় ঠুং ঠাং ছন্দে নিজেকে হাল্‌কা ক'রে তুলছে, তরঙ্গায়িত ক'রে তুলছে, পল্লবিত ক'রে তুলছে। দরজার আড়ালে খুটখাট শব্দ, অপূর্ব্ব ঢুকলো ঘরে এসে। মানসী চঞ্চল হয়ে উঠলো, অপূর্ব্বর সামনে গিয়েই লাল গোলাপগুলোর দিকে চেয়ে বললো, How lovely! আমায় ফুলগুলো দেবেন?" "আপনার জন্যেই তো এনেছি, ফুল ফুলের পাশেই মানায় ভালো" নির্ব্বিবাদে, নিঃসঙ্কোচে নিশ্চিন্তে জবাব দিলো অপূর্ব্ব। অধীর আনন্দে মানসী ফুলগুলো ছিনিয়ে নিলো অপূর্ব্বর হাত থেকে, তারপর নিয়ে গেল নাকের কাছে,...এক মুহূর্ত্ত আঘ্রাণ নিয়ে আস্তে আস্তে ওর পরিপূর্ণ ঠোঁট দুটোয় একটা হাল্‌কা চুম্বন এনে রেখে দিলো একটা ফুলে, অতি সন্তর্পণে, সচেষ্ট সাবধানতায়, পাছে ওর চুম্বনের আঘাতে ফুলের কোমল পাঁপড়িগুলো নুয়ে পড়ে, ঝ'রে পড়ে বৃন্ত থেকে খসে। টেবলের ওপর ফুলদানিতে মানসী সুন্দর ক'রে তোড়াটা রাখলো সাজিয়ে। অপূর্ব্ব মানসীর হাতে সাড়ীটা দিলো,...বললো, "দেখুন, এবার পছন্দ হ'য়েছে তো?" বৈদ্যুত আলোর সামনে সাড়ীটা খুব ভাল করে নাড়াচাড়া ক'রে দেখে মানসী,...ওর চোখের ভেতর থেকে ঠিক্‌রে পড়ে গভীর তৃপ্তির উজ্জ্বল আলো,... খুব পছন্দ হয়েছে ওর, অপূর্ব্বর পাশে এসে বসে মানসী,...একেবারে পাশে। অপূর্ব্বর মনে তখন উন্মাদনার রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, একটা চুম্বনের তৃষ্ণায় হাঁপিয়ে উঠেছে ওর চির-তৃষ্ণার্ত্ত দুটো লোভী ঠোঁট; মানসীকে ও টেনে আনে একেবারে নিবিড়তম সংস্পর্শে,... ছড়িয়ে দেয় একটা উত্তপ্ত, প্রলম্বিত চুম্বন দ্বাদশীর চাঁদের মত মানসীর দু'টো ঠোঁটের সঙ্গমস্থলে,.. টেনে নেয়, শুষে নেয়, লুঠ করে নেয় মানসীর ঠোঁট দুটোর এক অজ্ঞাত, অদৃশ্য কোণ থেকে যত রাজ্যের সঞ্চিত মধু। মানসী বাধা দেয় না, নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়ে একটা অবলম্বনের মত অপূর্ব্বর একখানা হাত টেনে আনে একেবারে নিজের কোলের ভেতর।

উঃ, কি সাংঘাতিক গরম মানসীর কোলের ভেতরটা, অপূর্ব্ব

শিউরে ওঠে।······হঠাৎ অপূর্ব্ব নিজেকে মানসীর কাছ থেকে মুক্ত করে নেয়, বলে—"কাল কিন্তু আপনাকে আমার ওখানে যেতে হবে।"

"যাব" আবেশ-কম্পিত স্বরে জবাব দেয় মানসী। অপূর্ব্ব যায় বেরিয়ে।

ঘরে এসে এই সর্ব্বপ্রথম অপূর্ব্ব আবিষ্কার করে,—ও বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটা ইজি-চেয়ারের কোমল অঙ্কে ও নিজেকে বিলিয়ে দেয়,—তার পর চোখ দুটো দেয় বুজিয়ে, নিশ্চিন্ত আলস্যে গভীর শান্তিতে। মানসীর চুম্বিত, কম্পিত, আরক্ত ঠোঁট দুটোর কথাই মনে পড়তে লাগলো ওর বার বার,—সেই ঠোঁটে কত মধু, কত মদিরা। হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় সুচরিতার দেওয়া চিঠিটার কথা,···কোটের পকেট থেকে খামটা বার করে চিঠিটা ও ধরে চোখের সামনে, পড়ে···

"অপূদা,

স্বামীকেই সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে আজ রিক্ত হয়ে আছি; একদিন তোমাকেই সব দিয়েছিলাম, পেয়েও ছিলাম অনেক; সে সব আজ "প্রাক্তন স্বপ্নের" মতই মনে হয়। যুগল হিয়ার কল্পনা দিয়ে নীড় বেঁধেছিলাম একদিন, সে নীড় ভেঙে গেছে। জীবনের ক্ষেত্রে বীজ বপন করাই শুধু সার হোল, ফসল ফললো না। সে দুঃখ আজো বিষাক্ত গ্যাসের মত গুমরে গুমরে ওঠে মনে, জানি না কবে মুক্তি পাব। স্বামী থাকতেও অন্য কোনও পুরুষের চিন্তা করা মহাপাপ জানি, কিন্তু কি করব অপূদা, আমার অতীত আমার সমস্ত বর্ত্তমানকেই যে গ্রাস ক'রে নিয়েছে। যাক্, পুরাণো দিনের জের টেনে তোমায় ভারাক্রান্ত করতে চাই না, তুমি আমায় চিরদিনের জন্যে ভুলে যাবার চেষ্টা কর।

—সুচরিতা।"

অপূর্ব্ব একটু হাসে, তন্দ্রাজড়িত অবসাদের গুরুভারে নুয়ে পড়ে ওর দুটো ক্লান্ত চোখের পাতা, বিস্মৃতির শূন্যতায় লীন হয়ে যায় ওর সমস্ত চেতনা—বুঝতেই পারে না কখন, কোন এক অজ্ঞাত অসতর্ক মুহূর্ত্তে ওর শিথিল হাত থেকে চিঠিটা পড়ে যায় পাশের Waste Paper-box-এ।

প্রাচীন কলিকাতার বিশেষত্ব

শ্রীবিশ্বনাথ সেন, এ্যাটর্নী-এ্যাট-ল

কলিকাতা বঙ্গদেশের অতি প্রাচীন ও অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নগর। ইংরাজ-রাজত্বের বহু পূর্ব্ব হইতে ইহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসপাঠের দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে, মোগল-সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে রাজা টোডরমল সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য জরীপ বা সার্ভে করিয়া যে মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে কলিকাতার উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার সময়ে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক যে, "আইনি আকবরি" নামক পুস্তক প্রচলিত ছিল, তাহাতেও কলিকাতার পরিচয় পাওয়া যায়(১)। কলিকাতার ইতিহাস এখন হইতে সুরু নহে, ইহার বহু পূর্ব্বে কবি বিপ্রদাস চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রা সম্বন্ধে যে গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও কলিকাতার উল্লেখ আছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, কলিকাতার উৎপত্তি হিন্দুদিগের রাজত্বকালে হইয়াছে(২)। তবে এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতা অতি প্রাচীন নগর হইলেও ইহা নিজে একটি স্বতন্ত্র পরগণা ছিল না। এক সময়ে ইহা সপ্তগ্রাম অর্থাৎ বর্ত্তমান হুগলীর মালগুজারং সেরেস্তার অধীন ছিল। আরও দেখা যায় যে, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাঁহার সেনাপতি মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য বঙ্গদেশে আসেন। তখন তাঁহাকে নদীয়ার জমিদার ভবানন্দ, সাবর্ণ চৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত এবং বংশবেড়িয়ার রাজা জয়ানন্দ এই তিনজন যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার পারিতোষিক হিসাবে তিনি কলিকাতাকে উক্ত তিনজন ব্যক্তিকে জায়গীর স্বরূপ দান করেন। ইঁহারাই কলিকাতার আদিম মালিক (৩)। কলিকাতা এখন City of Palaces এবং বৃটিশ রাজত্বে দ্বিতীয় নগর বলিয়া বিখ্যাত। বর্ত্তমান কলিকাতার দৃশ্য হইতে প্রাচীন কলিকাতার কোন ধারণা করা যায় না। প্রাচীন কলিকাতার পরিমাণ (area) বর্ত্তমান কলিকাতা হইতে অনেক অংশে ক্ষুদ্র ছিল এবং সে সময়ে ইহা গ্রাম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। বর্ত্তমান কলিকাতা তিনটি গ্রামের সমষ্টি—সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা। কলিকাতার প্রাচীন মানচিত্র দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমানে ইহার কতখানি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে(৪)। বর্ত্তমান কলিকাতার উত্তর অংশই সুতানুটী অর্থাৎ উত্তরে মহারাষ্ট্র ডিচ্ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে বর্ত্তমান Minthouse পর্য্যন্ত যে অংশ, উহাই সুতানুটীর পরিমা। ভাগিয়ে অর্থাৎ Minthouse হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে Customs

(১) Statistical Account of Bengal, Vol. 1 page 381.

(২) Bengal District Gazetteer—24 Parganas page 26.

(৩) Calcutta Guide—S. C. Sarker. page 2.

(৪) Notes on Geography of Old Bengal—Monmohan Chakravarti—page, 284-5.

House পর্য্যন্ত প্রাচীন কলিকাতার পরিমা এবং তন্নিম্নে অর্থাৎ যে স্থানে বর্ত্তমান দুর্গ ও ময়দান উহা গোবিন্দপুরের চিহ্ন (৫)। নিম্নে প্রাচীন কলিকাতার একটি মানচিত্র দেওয়া গেল :—

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে কলিকাতার উল্লেখযোগ্য পরিচয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যকালে পাওয়া যায়। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হুগলী নগরে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির এজেণ্ট Charnock-এর সহিত মোগল কর্ম্মচারীদিগের মনোমালিন্য ঘটে। তাহার ফলে ইংরাজগণ হুগলী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ত্তমান কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে অর্থাৎ সুতানুটী গ্রামে আসিয়া কুঠি স্থাপন করেন। সুতানুটীর অর্থ সুতার হাট ; ইহাতে বুঝিতে পারা যায়—প্রাচীন কলিকাতা সহর ছিল না বটে কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে ইহার গুরুত্ব ছিল। বর্ত্তমান বড়বাজার তাহার স্পষ্ট পরিচয় এবং উহার মধ্যে "সুতাপটী" "তুলাপটী" প্রভৃতি স্থানের নাম প্রাচীন গৌরব জাহির করিতেছে।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে Charnock সাহেব যখন হুগলী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় কুঠি স্থাপন করিলেন, তখন কলিকাতার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। পাকা বাটী ছিল না বলিলেই চলে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে জঙ্গল ও পুষ্করিণীপূর্ণ অতি অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। অনেকে শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, কলিকাতার জঙ্গলে হিংস্র জন্তু ও পুষ্করিণীতে কুম্ভীর বাস করিত(৬)। যে স্থানে বর্ত্তমান ময়দান উহা পূর্ব্বে গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। কলিকাতার স্বাস্থ্য এতই মন্দ ছিল যে, Charnock সাহেব এখানে আসিবার অল্পদিন পরে বহুসংখ্যক ইংরাজের অকালমৃত্যু ঘটে। সেজন্য ইংরাজগণ ইহাকে Golgotha(৭) বলিত। কিন্তু এই সকল বাধাবিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও Charnock সাহেব এখানে সুচারু রূপে বাণিজ্য করিতে থাকেন, তাহার ফলে বহুসংখ্যক ইংরাজ আসিয়া এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করিলেন। ইহার পর ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে একটি ঘটনা হয়। যাহার দ্বারা ইংরাজগণ কলিকাতায় দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হইলেন। বর্দ্ধমান জেলার জনৈক জমিদার সুবসিংহ হঠাৎ মোগলদিগের উপর বিদ্রোহী হইয়া রহিম খাঁ নামক একজন আফগানের সহিত যোগদান করেন। ইংরাজগণ সেই সুযোগে তৎকালীন বঙ্গদেশের মোগল সুবাদার সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমের নিকট হইতে শান্তিরক্ষা ও শত্রু দমনের জন্য একটি দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেই উপলক্ষে ইংরাজদুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম বর্ত্তমান জেনারল পোষ্ট অফিস যে স্থানে আছে ঐ স্থানে নির্ম্মিত হয়(৮)। তাহার পর ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ
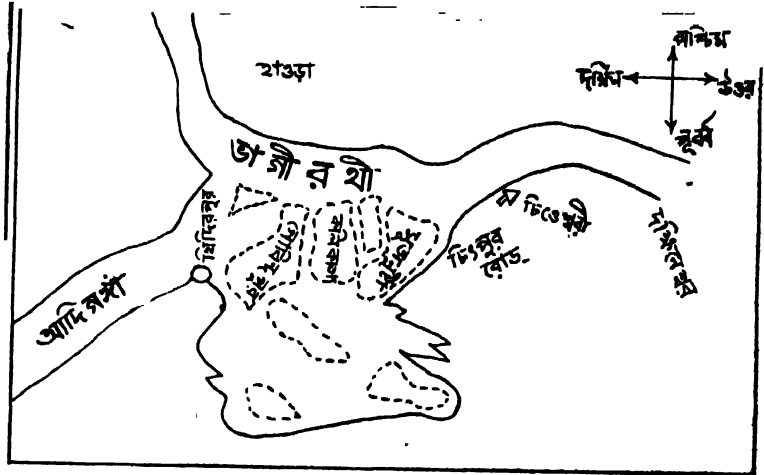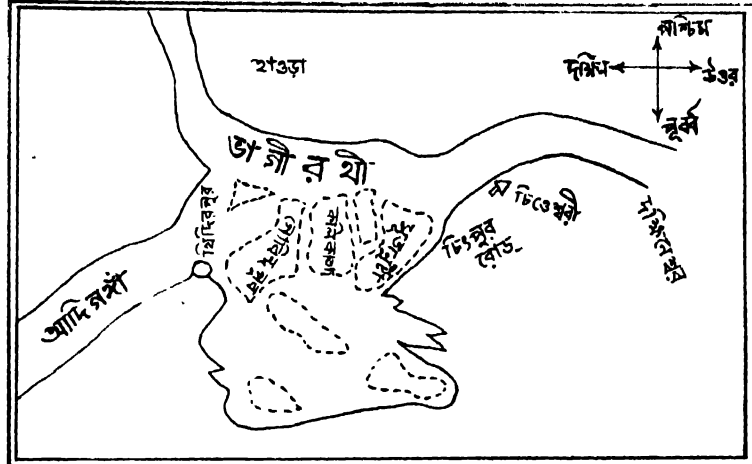
প্রাচীন কলিকাতা

অর্থাৎ তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬০০০ টাকা বাৎসরিক রাজস্ব বিনিময়ে গোবিন্দপুর, সুতানুটী ও কলিকাতা এই তিনখানি মৌজার জমিদারি স্বত্ব ক্রয় করিবার নিমিত্ত তৎকালীন নবাব প্রিন্স আজিম আমানের নিকট হইতে আজ্ঞাপত্র (letters patent) লয়েন এবং পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্মীকান্ত রায়ের নিকট হইতে একটি সনদমূলে তিনখানি মৌজার জমিদারী (dependent talukdari) স্বত্ব লাভ করেন। জায়গীর হস্তান্তরের অযোগ্য, সেই কারণে ইংরাজগণ উক্ত সনদমূলে মাত্র খাজনা আদায় করিবার অধিকার পাইলেন। অল্প কথায় তাঁহারা প্রজাস্বত্বের মালিক হইলেন। এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কালেক্টরীতে যে খাজনা দেওয়া হয়, তাহাকে rent বা ground rent বলে, উহা কিন্তু revenue নহে। ইংরাজদিগের এই জমিদারী স্বত্বই ক্রমশঃ বিশাল রাজত্বে পরিণত হইয়াছে (৯)। তাহার পর ইং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ২৩শে জুন তারিখে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের মালিক হইলেন। ঐ বৎসরই তাঁহারা তৎ-

(৫) সরল বাঙ্গালা অভিধান—সুবলচন্দ্র মিত্র—৩০৫ পৃষ্ঠা।

(৬) A place of mists, allegators and wild boars—Staendal's Historical Account of Calcutta page 208।

(৭) Place of skulls—District Gazetteer—24 Parganas—page 23.

Death overshadowed every living soul—Wilson's Early Annals of English in Bengal—page 208.

(৮) History of India—Meadows Taylor Page 396.

(৯) Constitutional Law—Sarbadhikary, page 350. Mayor of Lyons *vs.* East India Co. 1 M. I. A. 173 (271)

কালীন বঙ্গদেশের নবাব মিরজাফরের নিকট হইতে কলিকাতার চতুঃপার্শ্বস্থিত জমিসমূদয়ের জমিদারি স্বত্ব লাভ করেন। এবং এঁরা সেই উপলক্ষে প্রাচীন কলিকাতা অর্থাৎ সুতানুটী গ্রামটিকে সম্পূর্ণ লাখরাজ বা নিষ্কর স্বত্বে পরিণত করেন। তাহার পর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ পুরাতন দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুর গ্রামে বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; সেই সময় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বর্ত্তমান ময়দান প্রস্তুত হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে যতই সুদৃঢ়ভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন, কলিকাতা ততই সমৃদ্ধি লাভ করিল এবং ভারতের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা রাজধানী ছিল। ইহাই কলিকাতার সাধারণ ইতিহাস।

* * * *

রাজকার্য্য-পরিচালনা—

কলিকাতায় আধিপত্য স্থাপন করিবার বহু পূর্ব্বে ইংরাজগণ মান্দ্রাজ দখল করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা মান্দ্রাজের অধীন ছিল। ইংরাজ অধিকারের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ ইং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বহাল ছিল। ১৭০৭ হইতে ১৭৭৩ পর্য্যন্ত ইহা বোম্বাই ও মান্দ্রাজের মত একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেণ্ট একটি আইন(১০) প্রচার করেন—যদ্দ্বারা ইংরাজ-অধিকৃত সকল স্থানের মধ্যে কলিকাতা সর্ব্বোচ্চ প্রাধান্য লাভ করে এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ ব্যতীত অন্য সকল স্থান কলিকাতার অধীনে পরিগণিত হয়; এই উপলক্ষে কলিকাতার গভর্ণর "গভর্ণর জেনারেল" আখ্যা পাইয়াছিলেন ও কলিকাতা মুর্শিদাবাদের পরিবর্ত্তে বাংলাদেশের রাজধানী হইল। সেই সময়ে সরকারী মালখানা (Imperial Treasury) কলিকাতায় স্থাপিত হয়। কলিকাতার গভর্ণর জেনারেলের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার কার্য্য তদারক করিবার জন্য একটী ডেপুটির পদের সৃষ্টি হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার শাসন-ভার স্থায়ী ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট (Lieutenant) গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন, তাহাকে চলতি কথায় ছোটলাট বলা হইত। এই সময়ে আলিপুরে Belvedere নামক প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল; উহা Lieutenant গভর্ণরের বাস-স্থান ছিল। পূর্ব্বে গভর্ণর দুর্গে (fort) বাস করিতেন। বর্ত্তমান Government Palace লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ের পরিচালনা—

ইং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ অর্থাৎ তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর অধিপতি শাহ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। এই দেওয়ানি লাভই বৃটিশ সম্রাজ্য স্থাপনের বীজ (১১)। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ দেশীয় কর্ম্মচারিগণ ইংরাজদিগের তত্ত্বাবধানে কলিকাতা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব-স্থিত স্থানসমূহের রাজস্ব (ground rent) আদায় করিতেন। এই বিভাগের প্রধান হিসাবে একজন দেওয়ান ছিল। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যে এই রীতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। দেওয়ানের স্থানে একজন কালেক্টার নিযুক্ত হইলেন। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতার কলেক্টার এক ex-officio কর্ম্মচারী মাত্র। রাজস্ব বলিতে যাহা বুঝায় উহা ground rent মাত্র। সেই হেতু গভর্ণমেণ্ট ইস্তাহারমূলে কলিকাতার যে কোন অধিবাসী পূর্ব্বে ৩০ এবং বর্ত্তমানে ৩৫ বৎসরের ground rent একসঙ্গে দিয়া তাহার দখলী জমিসমূহ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কর করিয়া লইতে পারে। এ-স্থলে আরও বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতার ground rent একজন ডেপুটি দ্বারা আদায় হয় এবং তিনি ষ্ট্যাম্প ও আবগারি সংক্রান্ত সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করিতেন।(১২)

আইন-আদালত—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইং ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হুগলী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করেন। পরে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনখানি মৌজার জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন ও বহুসংখ্যক ইংরাজ কায়েমী ভাবে এখানে বসবাস আরম্ভ করেন। সেই উপলক্ষে তৎকালীন ইংলণ্ডের আইন অর্থাৎ Common Law ও Statutory Law উভয়েরই এদেশে প্রচার হইয়াছিল। বিদেশে বাণিজ্যক্ষেত্রে নিজ দেশীয় আইন প্রচার করিবার ক্ষমতা ইংরাজগণ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সনন্দ (charter) মূলে পাইয়াছিলেন এবং এই সনন্দমূলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার দখলস্থিত সমুদয় স্থানে নাবিক ও নৌ-যান সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারে ও ফ্যাক্টরী ও তথাকার কর্ম্মী সম্পর্কে ও বাণিজ্য বিষয়ে সকল ব্যাপারে ইংলণ্ডের প্রচলিত আইন-কানুন প্রচার করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়াছিলেন(১৩)। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে Charles II-এর সনন্দ (charter)-মূলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজ অধিকৃত সকল স্থানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রচার করিবার ক্ষমতা পান। কিন্তু সে সময়ে এদেশীয় অধিবাসী-দিগের উপর ইংলণ্ডের কোন প্রভুত্ব ছিল না, সুতরাং তৎকালীন ইংরাজ অধিবাসিগণই কেবলমাত্র ইংলণ্ডের আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হইতেন। বহুসংখ্যক ইংরাজ এখানে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করার হেতুও কিয়ৎ পরিমাণে ইংরাজী Common Law or Statutory Law এদেশে প্রচলনের ফলে বিলাতী আদালতের প্রয়োজন হয়। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতার জমিদার ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না, সুতরাং তৎকালীন জমিদারদিগের অনুকরণে কলিকাতায় একপ্রকার আদালতের সৃষ্টি হয় এবং তাহার কার্য্য-প্রণালীও (procedure) জমিদারদিগের আদালতের মত

(১০) Regulating Act of 1773 (13 Geo. III C. 63).

(১১) Aitchison Treaties (India) page 60 Courts & Legislative Authorities in India—Cowell page 23

(১২) District Gazetteer—24 Pargannas.

(১৩) Mayor of Lyons *vs.* East India Co. 1 M. I. A. 272.

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ কবি। সেই তাঁর প্রথম পরিচয়। তাঁর পরম পরিচয়ও ঐ—তিনি কবি। বিড়ম্বিত আমাদের জীবনের অন্তরে তার রসরূপটি তিনি উপলব্ধি করেচেন—সত্যের অন্তরালে শিবকে অনুভব করচেন এবং সুন্দরের রূপে সত্যকে তিনি ফুটিয়ে তুলেচেন তাঁর রচনায়—গানে, গল্পে, কাব্যে, নাট্যে, আবৃত্তিতে, ব্যাখ্যানে, অভিনয়ে।

কবি বলতে ঠিক কি বোঝায় ঠিক করে বোঝানো শক্ত। সোজা হিসেবে আমরা তাঁকে কবি বলি যিনি কবিতা রচনা করেন। অক্ষর গুণে গুণে মিল খুঁজে খুঁজে লিখলেও লেখা কবিতা হয় এবং হিসাব মত তার লেখককেও কবি বলতে হয়। ঐ সব কবিরা কিন্তু বেশী দিন ধরে কবিতা লিখতে পারেন না এবং কথাটা ভাবতে গেলে মনে হয় যে গাছের যেমন ফুল ফোটবার একটা সময় আছে কবিতা লেখবারও হয়ত সেই রকমের একটা বয়স আছে মানুষের। গাছের সঙ্গে এই ব্যাপারের সাদৃশ্য এই আছে যে মানুষও এই সময়ে তার অন্তরে বাহিরে সুন্দর হয়ে ওঠে এবং নিজে সুন্দর হয়ে অন্যকেও সে সুন্দর দেখে। এই বিশেষ বয়সে আমাদের যাঁরা কবিতা নাও লেখেন মনে মনে তাঁরাও গুন গুন করেন বা স্বপ্ন রচনা করেন নিজের খোসখেয়ালে। এই সঙ্গীত বা স্বপ্নের সম্পর্ক ধরেই সুন্দরের আবির্ভাব হয় মানুষের মনে এবং মনের গুণে শরীরে তার লাবণ্য ফুটে ওঠে। কবিতা লেখার এই প্রেরণা যার মধ্যে সাময়িক বা মরসুমী-ব্যাপার মাত্র নয়—ভেতরের তাগিদে যিনি কবিতা রচনা করেন, কবি পরিচয় তাঁরই সার্থক।

জগৎ জুড়ে উদার সুরে যে আনন্দগান বাজচে গভীর তার সুরটি ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে বেজেচে এবং সেই সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে চেয়েচেন তিনি নিজের তাঁর জীবনের। কবিতা লেখা সেই তাঁর সাধনার একটা বিমাত্রশষ্ট প্রকাশ এবং দেখা যায় যে মাত্র কবিতা লিখেই নিশ্চিন্ত হতে পারেননি তিনি। কবিতাত তিনি লিখেচেনই অধিকন্তু ছবি এঁকেচেন, গান গেয়েচেন, গল্প বলেচেন। নিজের লেখা কবিতা তিনি আবৃত্তি করেচেন—নিজের রচিত নাটক অভিনয় করেচেন। তিনি কথকতাও করেচেন অর্থাৎ কথায় কথায় নীতি ও ধর্ম্ম ব্যাখ্যান করেচেন। ঐ আবৃত্তি অভিনয় বা কথকতা যা তিনি করেচেন সে সবই নূতন ভাবে করেচেন —নূতন দ্যোতনা জাগিয়ে তুলেচেন তিনি তার মধ্যে দিয়ে। এই বিচিত্র সাধনায় সুন্দরকে তিনি জীবনে ফুটিয়ে তুলতে, আনন্দকে সহজ করে ধরতে চেয়েচেন। মানুষকে তিনি ভাল বেসেচেন, তাকে দেখে তার কথা শুনে নিজের মনে তিনি আনন্দ পেয়েচেন এবং কথা তার আলোকে ছায়ায়, রঙে রসে বিচিত্র করে রচনা করেচেন তিনি সাহিত্যে। তাঁর দিকে চেয়ে সুন্দরকে আমরা প্রত্যক্ষ করেচি এবং তাঁরই মধ্যে সুন্দরকে দিনে দিনে সুন্দরতর হয়ে উঠতে দেখেচি। সাধারণ ভাবে কবি বলতে যা বোঝায় রবীন্দ্রনাথকে কবি বলে আমরা তার চেয়ে অনেক বেশীই বুঝেচি। বাড়তির দিকের সেই হিসাব কিন্তু আজ আর বোঝাবার উপায় নেই—কবির সঙ্গে অনেকখানিই তার চলে গিয়েচে। তাহলেও যা তিনি রেখে গিয়েচেন অসামান্য অপূর্ব্ব তাঁর সেই সাহিত্য সাধনা।

সাহিত্য কথাটা সহিত শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত। অন্যের অনেকের সঙ্গে অন্তরে যিনি সংযুক্ত নন—সহানুভূতিশীল নন তাদের সম্পর্কে, সাহিত্যে তাঁর সাধনা মানুষের মন পর্য্যন্ত পৌছতে পারে না। অন্যকে যিনি ভাল দেখতে পান না সুন্দরের উপলব্ধি তাঁর পক্ষে সহজ নয়। অবশ্যই সব সময় চোখে দেখে সুন্দরের পরিচয় হয় না—মনে অনুভব করে নিতে হয়। বাপ মা ভাই বোন স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে সকলেরই আমাদের আছে এবং সকলেই আমরা তাদের ভালবাসি যদিও দেখতে তাঁদের অনেককেই ঠিক সুন্দর বলা যায় না। কিন্তু সুন্দর নয় বলে আত্মীয়দের সম্পর্কে আমাদের মনের ভালবাসা কম হয় না। কারণ তার এই যে চোখের দেখাকে এখানে আমরা বড় করে ধরিনে বা চরম বলে মানিনে, মন দিয়ে এই সব আত্মীয়দের মন আমরা অনুভব করিতে পারি এবং মনের সুবাদ ধরেই এদের আমরা সুন্দর দেখি এবং ভালও বাসি। মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার এই পরিচয় অলক্ষ্যে থাকে আমাদের মনে। এবং আত্মীয়দের সম্পর্কে এ পরিচয় আমরা অপেক্ষাকৃত সহজে পাই। এই মনই কবির সম্পদ্—তাঁর পরিচয়। অন্যকে অনেককে তিনি ভাল দেখেন ভালবাসেন এবং তাঁর সেই ভালবাসাই কবিকে সকলের আমাদের আপনার ক'রে দেয়। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তীদের জীবনে কবির প্রভাব প্রত্যক্ষ। নেপথ্যে থেকে কবি তাদের জীবনের গতি নির্দ্দেশ করে দেন—অলক্ষ্যে থেকে পরিচালিত করেন সে জীবনকে।

দুই

খুব কম বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। সেই প্রথম বয়সের তাঁর রচনার মধ্যে অর্থাৎ "মানসী"র আগে পর্য্যন্ত লিখিত তাঁর কবিতার মধ্যে নিজের তাঁর কথাই প্রাধান্য লাভ করেচে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' 'প্রভাত উৎসব' প্রভৃতি কবিতার কথা এই সম্পর্কে মনে করা যেতে পারে। উপলক্ষ্য হিসাবে ব্যতীত নিজের বাইরের প্রায় কিছুই ঐ সময়কার তাঁর রচনায় যথেষ্ট স্থান জুড়ে নেই। কারণ সম্ভবত তার এই যে নিজেকে ঐ সময়ে তিনি যেমন জানতেন নিজের বাইরের অনেক কিছুর সম্বন্ধেই তেমন পরিচয় তখন তাঁর হয়নি এবং তার সুযোগও তিনি তখন পাননি।

বাল্যকাল তাঁর কেটেচে চাকরদের হেফাজাতে, ফলে অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁর খেলার সাথী ছিল না। কিন্তু সে অভাব তিনি পুরণ করে নিয়েছিলেন নিজের খেয়ালখুসি মত সখা ও সাথী রচনা করে। ঐ সব সঙ্গীদের সঙ্গে রীতিমত আনন্দে দিন কেটেচে তাঁর। সেই জন্যই সেদিনের সেই তাঁর অভ্যাস বড় হয়েও জীবনে তিনি ভুলতে পারেননি এবং সারা জীবন ধরে' নিজের খেয়ালখুসি মত মানুষ রচনা করে গিয়েচেন তিনি।

ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে পৈতৃক জমিদারি পরিচালনার

তার নিয়ে কবিকে কলকাতার বাইরে পদ্মাতীরের পল্লী অঞ্চলে বাস করতে হয়েছিল। ঐ সময়ের আগে পর্য্যন্ত সময় তাঁর কেটেচে কলকাতা বা তারই মত ছোট বা বড় কোন না কোন সহর জায়গার ঔৎসুক্যহীন উদাসীন জনতার মধ্যে প্রায় নিঃসঙ্গ ভাবে। পিতার সঙ্গে হিমালয় প্রদেশে বা মেজদাদার সঙ্গে বোম্বাই প্রদেশে বা বিলাতে তিনি কিছুদিন ক'রে বাস করেচেন বটে কিন্তু সঙ্গীর অভাবে ঐ সব স্থানে বাসও প্রায় প্রবাসবাসের মতই অনুভূত হয়েচে কবির কাছে। ফলে তার আর যাই হোক সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েচে এবং দূরে থেকে আবছা দেখা অনেক মানুষের অনেক কথাই মনের তাঁর সৃজনী-প্রতিভা উস্‌কে দিয়েচে এবং নিজের মনে ঐ সব মানুষকে যেরূপ তিনি দিয়েচেন সে তাদের নিজেদেরও বিস্ময়ের কারণ হয়েচে—নিজেরা তারা নিজেদের তেমন সহজ ভাবে অনুভব করতে পারে নি যেমন করে কবি পরিচয় দিয়েচেন তাদের। ঐ পল্লী অঞ্চল শিলাইদহে কবি যেন তাঁর মনের মত জায়গা পেয়ে গেলেন। প্রতিবাসীদের সঙ্গে পল্লীবাসীদের আত্মীয়তার আদানপ্রদানে পল্লী-জীবনের মাধুর্য্য কবির মনে প্রচুর আনন্দ দিয়েচে। সেই সময়ে যারা তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করেচে, জীবনে নানাভাবে বিড়ম্বিত বলে অন্যের সহানুভূতির একান্ত প্রয়োজন অনেকেরই তাদের ছিল এবং কবির কাছে এসে অনায়াসে তারা তাঁর সহানুভূতি লাভ করেচেন। শান্তস্নিগ্ধ প্রকৃতি এবং কোমল শীতল তার আবেষ্টনের মধ্যে সহিষ্ণুসংযত মানুষের সমাজ—দুই-ই কবির মনে তাদের প্রভাব ফেলে গিয়েচে।

কবির দিন ঐসময়ে খুব আনন্দেই কেটেচে এবং তাঁর চিঠি-পত্রেও সেই আনন্দের কথা তিনি বলেচেন—না বলে থাকতে পারেন নি। সেই আনন্দের প্রেরণায় রচনার তাঁর নবজন্মের সূচনা দেখা যায়—নিজেকে ছাড়িয়ে অন্যের কথা নিয়ে লেখবার প্রেরণা ঐসময়ে তিনি অনুভব করেন। নাতি-চঞ্চল সেই জীবন-প্রবাহের অন্তরে তিনি যেন তাঁর কবিতার ছন্দ, তার গতি যতি, আবেগ আনন্দ অনুভব করলেন এবং নিজেকে অন্তরালে রেখে অন্যের কথা নিয়ে লেখা তাঁর আরম্ভ হল সেই সময় থেকে। অন্যের কথা বলবার জন্যই ঐ সময়ে কবিকে ছোট গল্প লিখতে হয়। ঐ অন্যের কথা তিনি বলেচেন সে কথাকে নিজের কথা করে নিয়ে এবং যা তিনি বলেচেন তা বলতে যে প্রচুর আনন্দ তিনি পেয়েচেন তাঁর লেখা পড়ে সে কথা আমরাও বেশ অনুভব করতে পারি।

শিলাইদহে বা সাজাদপুরে দীর্ঘদিন ধরে কবি নদীবক্ষে নৌকায় বাস করেচেন এবং শত প্রয়োজনে নদীর দুধারের গ্রামবাসী সব নরনারীদের নদীতে আসাযাওয়ার শত ফাঁকে পল্লীজীবনের যে বিচিত্র খণ্ডাংশ তাঁর সামনে ভেসে এসেচে গিয়েচে অন্তরের প্রীতিরসে অভিষিক্ত করে সেই জীবনের কথা দিয়েই তিনি তাঁর ছোট গল্প রচনা করেচেন। নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে রচিত কবির ঐ সব গল্প অনায়াসেই আমাদের মন স্পর্শ করে এবং লেখকের মনের আনন্দ রচনার যাদুমন্ত্রে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়। মানুষকে ভাল দেখে তাকে ভালবেসে লেখা এই সব গল্প পড়তে বোধ হয় চিরদিন ভাল লাগবে।

কবির গল্পে যে সব ঘটনার কথা আমরা পড়ি তেমন ভাবের ঘটনা অনেক সময়েই আমাদের আশেপাশে ঘটে। কিন্তু ঐ সব ঘটনার অন্তরে প্রচ্ছন্ন তার যে রূপটি প্রায় সময়েই আমাদের নজর এড়িয়ে যায় কারণ ঘটনার যেটুকু মানুষের মনে অগোচরে থাকে তার সম্পর্কে নিজেদের হিসাবে প্রায় সময়েই আমরা ভুল ক'রে বসি যেহেতু অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিক্‌টাই বিশেষ ভাবে আমাদের হিসাবে বড় হয়ে ছায়াপাত করে। গোড়াকার কথা হয়ত এই যে জীবনকে একটা যুদ্ধ বলেই আমরা মানতে শিখেচি এবং যুদ্ধক্ষেত্র বলেই জীবনের গৌরব বোধ করতে চাই আমরা অন্যকে বিপন্ন বিব্রত করবার সুযোগ তাই আমরা হারাতে চাইনে—অনেক সময়েই এবং তাকে বিড়ম্বিত দেখলেও খুসি হই আমরা মনে মনে। জীবনে যুদ্ধের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু সম্ভবত মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড় প্রয়োজন পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করা। সেই জন্যই হয় ত মনে অন্যের সম্পর্কে আমরা প্রীতি অনুভব করি। প্রত্যক্ষ বিরোধের অন্তরালে অন্যের সম্পর্কে তাঁর অন্তরে কবি মৈত্রীভাব অনুভব করেন এবং জীবনের তার যুদ্ধের ব্যাপারেও যথাসাধ্য সহায়তা করতে চান। পরস্পরের সম্পর্কে যে প্রীতি সত্যকার আমাদের জীবনে অনেক সময়েই আমরা অনুভব করতে পারিনে সেই প্রীতির উৎসমুখ তিনি খুলে দিতে চান অপ্রত্যক্ষ আমাদের মনে। অন্যের সম্পর্কে অন্তরের তাঁর এই সহানুভূতিতেই কবির পরিচয়। মানুষকে তিনি প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখেন না বলেই সমকক্ষ বলে মনে করতে পারেন এবং তার পরে অন্যের কথা তার ব্যথা বোঝা সহজ হয়ে যায় কবির পক্ষে। দরদ দিয়ে লেখা তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রীদের কথা নিজেদের অনেকানেক আত্মীয়দের চেয়ে আমাদের মনে বেশি জায়গা জুড়ে থাকে এবং অন্তরঙ্গ মহলে সত্যকার আত্মীয়ের মত ভাবেই তাদের কথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করি আমরা।

তিন

প্রত্যক্ষ ঘটনা অনেক সময়েই কবির গল্পের পটভূমিকা মাত্র এবং তাঁর গল্প হচ্চে মানুষের মনের ওপরে ঐ ঘটনার প্রভাব ফেলার, তার স্পর্শ বুলিয়ে দেওয়ার। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন গল্পের ঘটনার মধ্যে বেশ একটু অসাধারণত্ব আছে এবং বলা যেতে পারে যে, রাইচরণ যা করেছিল আমরা কেউ নিশ্চয় তা করতাম না। তা' হলেও কিন্তু আমরা বলতে পারিনে যে অন্যায় করেছিল রাইচরণ। কারণ বোঝা যায় যে, তার মনের ভাব যেমন ছিল তাতে ঐ যা সে করেছিল তা অসঙ্গত হয় নি। আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে না ব'লে আর কারো পক্ষে যে তা স্বাভাবিক হবে না এমন মনে করা সুস্থ প্রকৃতির লক্ষণ নয়।

তার পরিচয়ে কবি বলেছেন যে রাইচরণ ভদ্র ঘরের ছেলে। জন্মসংস্কারে তাই তার পক্ষে মনে করা সহজ ছিল যে অকারণে কারো মনোবেদনার কারণ হওয়া উচিত হবে না তার পক্ষে। গরীব বলে কিন্তু তার জীবনে শিক্ষার সুযোগ সে পায় নি। ফলে অবস্থার জটিলতার মধ্য দিয়ে তার বিচার করবার যোগ্যতা সে আয়ত্ত করতে পারে নি। শুধু যে শিক্ষার অভাব তার হয়েচে তা নয়—ছেলেবয়স থেকেই পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকে নিজের উদরান্নের সংস্থান করতে হয়েচে তাকে। সেই যাঁর কাজ করে

নিজের তার জীবিকা তাকে সংগ্রহ করতে হয়েচে—সেই মনিবের সুখ-দুঃখের ব্যাপারে নিজেকে কোনমতেই সে উদাসীন করে তুলতে পারে নি কোন দিন।

পরের কাজ হলেও নিজের কর্ত্তব্য রাইচরণ ঠিকমতই করে যাচ্ছিল। করবার তার কাজ অবশ্য তেমন শক্ত ছিল না, কারণ সে কাজ ছিল ছোট একটি ছেলেকে কোলে পিঠে করে বেড়ানো—তার খবরদারি করা। নিজের সে কাজ সে ঠিকমতই করে গিয়েছিল। তাই ঐ ছোট ছেলে বড় হয়ে উঠলেও ঐ বাড়ীর কাজে তার জবাব হল না। ক্রমে ঐ ছেলে আরো বড় হতে যখন আবার তার একটি ছেলে হ'ল তখন সেই শিশুটিকে 'মানুষ' করার ভারও গিয়ে পড়ল রাইচরণের ওপর। রাইচরণ নিজে তখন আর ছোট নয়—তাই ছোট ছেলের রকম সকম ধরণ-ধারণ তার কাছে বিচিত্র বলে মনে হতে লাগল এবং সেই অবস্থায় আনন্দের তার আতিশয্যে শিশুর মায়ের কাছে গিয়েও শিশুর বুদ্ধি ও চাতুর্য্যের তারিফ করে সন্তানের জননীকে পর্য্যন্ত বারবার সে চমৎকৃত করে দিতে লাগল।

ছেলের বাপ ছিলেন মুন্সেফ এবং পদ্মাতীরের কোন একটা সহরে বদলি হয়ে এসেছিলেন তিনি এক সময়ে। সেখানে বর্ষাকালে একদিন সকাল থেকে সমস্ত আকাশে মেঘ করে ছিল কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল না। রাইচরণের ইচ্ছা ছিল না যে আকাশের সে অবস্থায় খোকাবাবুকে নিয়ে সে বাইরে বেরোয় কিন্তু রোজকার মত তাকে গাড়ীতে চড়িয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য বিকেলের দিকে ছেলে বায়না ধরে বসল এবং নিজের ইচ্ছামত কাজ করবার অধিকার রাইচরণের ছিল না বলে ঠেলাগাড়ীতে খোকাবাবুকে চড়িয়ে নিয়ে বেরোতে হয়েছিল তাকে শেষ পর্য্যন্ত।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল কিন্তু ছেলে নিয়ে রাইচরণ বাড়ী ফিরল না। ছেলের মা বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এবং দিকে দিকে লোক ছুটল ছেলের খোঁজে। পদ্মার দিকে যে গিয়েছিল সে দেখল যে ভাঙাগলায় 'খোকা বাবু' 'খোকাবাবু আমার'—বলে ডাকতে ডাকতে অন্ধকার একটা জায়গার মধ্যে আবিষ্টের মত রাইচরণ কেবলই এদিক ওদিক করে বেড়াচ্ছে।

ছেলেকে আর পাওয়া গেল না এবং সকলেই বুঝলেন যে রাক্ষসী পদ্মাই তাকে উদরসাৎ করেচে। ছেলের মা'র কিন্তু কেমন সন্দেহ হতে লাগল যে ছেলের গায়ের গহনার লোভে হয়ত রাইচরণই তাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেচে। ছেলেকে ফিরিয়ে দেবার জন্য বার বার তাই তিনি রাইচরণকে অনুরোধ করলেন—মিনতি পর্য্যন্ত করলেন তার। রাইচরণ তাঁর সে অনুরোধ রাখতে পারল না—শুধু নিজের কপালে করাঘাত করল কিন্তু তা দেখে মনিব পত্নী তার খুসি হতে পারলেন না। শেষ পর্য্যন্ত তাই চাকরিতে তার জবাব হয়ে গেল এবং রাইচরণ সোজা তার দেশে চলে গেল—চাকরির আর কোন চেষ্টা করল না। কার জন্য চাকরি করবে সে? নিজের তার ছেলে ছিল না—হয়ই নি।

দেশে তার ঘর-বাড়ী ছিল এবং জমিজমাও কিছু ছিল। সেখানে গিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমে রাইচরণের একটি ছেলে হল এবং বেশি বয়সে সন্তান প্রসব করার দুর্ভোগ সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী তার মারা গেল সেই ধাক্কায়। ছেলের জন্মের পরে ছেলের মায়ের মৃত্যুর জন্য না হলেও ছেলের ওপরে প্রথম থেকেই রাইচরণের মন বিরূপ হয়ে উঠল। তার মনে হতে লাগল যে মনিবের তার ছেলের নিখোঁজ হওয়ার নিমিত্ত হওয়ার পরে নিজের তার পুত্র-সুখভোগ করা অত্যন্ত অসঙ্গত অন্যায়। ছেলের দিকে তাই রাইচরণ ফিরেও চাইত না এবং ছেলের এক পিসি যদি না সে সময়ে তার ভাইয়ের সংসারে থাকত তাহলে হয়ত অযত্নেই ছেলেটার প্রাণান্ত হত অকালে।

পিসির যত্নে ছেলে দিন দিন বড় হয়ে উঠতে লাগল এবং দেখে রাইচরণ অবাক হয়ে যেত যে ঐ শিশুও হামাগুড়ি দিয়ে চৌকাঠ পার হতে যায় এবং সে সময়ে তাকে কেউ আটকাতে আসচে বুঝলে খিলখিল করে কলহাস্য তুলে দ্রুত গতিতে কোন এক নিরাপদ স্থানে যাবার চেষ্টা করে। রাইচরণের মনে পড়তে লাগল যে তার খোকাবাবুও ঠিক ঐ করত এবং তাই দেখে মনে কতদিন সে প্রচুর কৌতুক অনুভব করচে এবং শিশুর মায়ের কাছে গিয়ে তার ঐ সব বাহাদুরির কথা আনন্দে গর্ব্বে সে ঘোষণা করেচে এবং বলেচে যে বড় হয়ে ছেলে তাঁর জজ হবে। এখন নিজের ছেলের কাণ্ড দেখে মনে দিন দিন রাইচরণের বিস্ময় বাড়তে লাগল। জজ্ হবার কোন সম্ভাবনা যার নেই সেও এমন করে কেন? কথাটা তার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করতে লাগল এবং স্বস্তি বোধ করতে পারল না সে কিছুতেই। এমন অবস্থায় একদিন যখন সে শুনল যে ছেলে তার পিসিকে 'পিচি' বলচে তখন ব্যাপারটা তার কাছে হঠাৎ যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল এবং তার মনে হল যে তার খোকাবাবুই আবার ফিরে এসেছে তার কাছে চোর বদনাম তার মুছে দেবার জন্য। মনে তার আর কোন সন্দেহ রইল না—কারণ সে ভাবল যে তাই যদি না হবে তা হলে এই অসময়ে বুড়া বয়সে তার ছেলে হতে যাবে কেন? আরো তার মনে হতে লাগল যে খোকাবাবুর মা নইলে বার বার তাকেই বা কেন বলচেন ছেলেকে তাঁর ফিরিয়ে দেবার জন্য? তার মনে হল যে মায়ের মন ঠিকই বুঝেছিল এবং সে স্থির করল যে ছেলের মাকে সে তাঁর ছেলে ফিরিয়ে দেবে।

অতঃপর রাইচরণ তার ছেলেকে নিয়ে পড়ল এবং নিজের অবস্থার অতিরিক্ত খরচপত্র করে সে তাকে মানুষ করতে আরম্ভ করল। ক্রমে ছেলে বড় হলে তার লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করবার জন্য দেশের তার জমিজমা সব বিক্রী করে রাইচরণ ছেলে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল এবং সেখানে ভাল একটা ছাত্রাবাসে ছেলেকে রেখে নিজের জন্য একটা চাকরী সে জুটিয়ে নিল। সেই ভাবে বেশ কিছুদিন কাটলে নিজের তার শরীরের অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়ে আসতে মনে তার হতে লাগল যে আর দেরী না করে যাদের ছেলে তাদের কাছে ছেলেকে পৌঁছে দেবে সে। অতঃপর তার পূর্ব্ব মনিবের ঠিকানা সংগ্রহ করে একদিন ছেলেকে নিয়ে রাইচরণ তাঁর বারাসতের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল।

রাইচরণের সঙ্গের সুদর্শন ছেলেটিকে দেখে তাকে নিজের ছেলে বলে গ্রহণ করতে অনুকুল বাবুর স্ত্রী কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করলেন না। অনুকুল বাবু কিন্তু অত সহজে মেনে নিতে পারলেন না ব্যাপারটা কিন্তু তিনিও তেমন কড়া হতে পারলেন না কারণ তাঁর ভয় হল যে ছেলে যে তাঁর সে কথা ঠিকমত প্রমাণ করতে না পারলে তার ফল হয়ত এই হবে যে স্ত্রীকে তাঁর দ্বিতীয়বার পুত্রহীনা করা হবে। সে অবস্থায় নিজের মনকে বোঝাবার তাঁর যুক্তি এই ছিল যে মিথ্যা বলবার রাইচরণের কোন কারণ ছিল না যেহেতু কোনদিক থেকেই কোন লাভের সম্ভাবনা তার ছিলনা ছেলেটিকে তাঁদের বলে দিয়ে যাবার মধ্যে। ছেলের দিকে চেয়েও তার স্নিগ্ধ নধরকান্তি দেখে নিজের ছেলে বলে তাকে গ্রহণ করতে কোন আপত্তির কারণ তিনি দেখতে পেলেন না। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেও তিনি জানলেন যে রাইচরণ বরাবরই চাকরের মত কাজ করে আসচে তার।

ছেলের মা তাঁর হারাধন ফিরে পেলেন এবং সেই আনন্দে রাইচরণের পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করে তিনি তাকে বাড়ীতে স্থান দিতেও প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু অতি-সাবধানী অনুকূল বাবু তাতে সম্মত হতে পারলেন না। তার মা-বাবার সেই মতভেদের মধ্যে রাইচরণের জন্য কিছু মাসাহারার বরাদ্দ করে দেবার প্রস্তাব করল ছেলে। শুনে অনুকূলবাবু খুসি হয়ে গেলেন এবং মনে করলেন যে অতঃপর রাইচরণের সম্পর্কে নিজের তাঁর কর্ত্তব্য তিনি করতে পারবেন।

রাইচরণ সেইখানেই দাড়িয়েছিল—দেখে শুনে সে ব্যাপার বুঝল সম্ভবত সেও মনে করেনি যে এমন হবে নিজের ছেলেকে অন্যের হাতে সঁপে দিয়ে নিজের পথ দেখতে হবে তাকে। কিন্তু তাই করবার প্রয়োজন যখন হল তখন দ্বিধামাত্র না করে ফেলনাকে ফেলে রেখে সে তার পুরোণ মনিববাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল—একবার ফিরেও চাইল না পিছনের দিকে। আত্মনিষ্ঠ এই মানুষটির ওপরে মনে আমাদের শ্রদ্ধা জাগিয়ে দিয়েচেন কবি তাই জীবনের তার বিড়ম্বনার জন্য অন্তরে আমরা বেদনা বোধ করেচি। তার কোন কথা রাইচরণ নিজে বলল না বলে তার ব্যথা বুঝতে চাইলেন না তিনি।

চার

যে চোখে আমরা অন্য সকলকে দেখি সেই চোখ দিয়ে কিন্তু আমরা নিজেদের দেখতে পাইনে। সে দেখবার জন্য মনের দরকার হয়। আরশিতে অবশ্য নিজেকে দেখা যায় কিন্তু সেই দেখা ঠিক প্রত্যক্ষ দেখা নয়— মনের সাহায্য নিয়ে দেখা। সেই ভাবের পরোক্ষ দৃষ্টির একটা কথা আছে সমস্যাপূরণ গল্পের নেপথ্যে।

ঝিকরকোটার কৃষ্ণদয়াল সরকার তাঁর শিক্ষিত পুত্র বিপিন-বিহারীর হাতে জমিদারির ভার দিয়ে বৃদ্ধবয়সে যখন কাশীবাসী হলেন, তখন দেশের যত অনাথ আতুর সকলে হায় হায় করতে লাগল কারণ গরীব দুঃখীর অমন বন্ধু সে সময়ে সেদিগরে আর কেউ ছিলেন না। জমিদারি হাতে নিয়ে এদিকে ছেলে দেখলেন যে বিস্তর জমি বিনা খাজনায় ছেড়ে দেওয়া আছে এবং কতলোকের যে খাজানা কমি করা হয়েছে তার আর সীমাসংখ্যা নেই। নূতন জমিদার স্থির করলেন যে অর্দ্ধেক জমিদারি তিনি লাখরাজে ছেড়ে রাখতে পারবেন না। প্রজারা বুঝল যে শক্তলোকের পাল্লায় পড়েচে তারা কিন্তু অমনি ছাড়তে পারলে না তারাও —কাশী পর্য্যন্ত দরবার করল। তাদের হয়ে কৃষ্ণদয়াল ছেলেকে চিঠি লিখলেন কিন্তু ছেলের জবাব পড়ে নিরস্ত হয়ে গেলেন। কথাটা তিনি বুঝলেন যে কাজের ভার যার ওপরে থাকবে ওপর থেকে তার সেই কাজে বাধা দিতে গেলে কাজই পণ্ড হবে। আরও তিনি ভেবে দেখলেন যে সেই জমিদারিই যদি তিনি চালাতে লাগলেন তা হলে আর এই কাশীবাসের ঘটা করার কি প্রয়োজন ছিল তাঁর?

কৃষ্ণদয়াল সরে দাঁড়ালেন এবং মামলা-মোকর্দ্দমা করে জমিদার তাঁর সম্পত্তির অনেকখানিই পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হলেন। গরীব প্রজা অনেকেই আনুগত্য স্বীকার করল, করল না কেবল একজন —আছিমদ্দি তার নাম। লোকটা আবার বিস্তর জমি বিনা খাজনায় ভোগদখল করে। তার কথাটা বিপিনবিহারী ঠিক সমজাতে পারলেন না এবং ঠিক ভাল বোধ হল না ব্যাপারটা তাঁর কাছে। সে যা হোক আছিমের সঙ্গে মোকর্দ্দমা আরম্ভ হয়ে গেল এবং শেষ হ'তে চাইল না সহজে। ফৌজদারি থেকে দেওয়ানী, মহকুমা থেকে জেলা এবং সেখান থেকে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গিয়ে উঠল মোকদ্দমা এবং জেরবার হয়ে পড়ল আছিম। কিন্তু তেজ তার তবু কমল না, এমন কি একদিন বাজারের মধ্যে জমিদারকে সামনে পেয়ে সে তাঁর ওপরে চড়াও হয়ে উঠেছিল এবং অবস্থা এমনি হয়েছিল যে আশ-পাশ থেকে লোকজন সব ছুটে এসে না পড়লে হয়ত একটা বক্তাবক্তি হয়ে যেত সেদিন সেইখানে। তেমন কিছু হল না বটে কিন্তু ঐ ব্যাপার থেকে যে ফৌজদারির সৃষ্টি হল জমিদার মনে করলেন যে তারই জোরে দুর্বিনীত তাঁর প্রজাকে তিনি একবারে ঠাণ্ডা করে দিতে পারবেন। মিটমাটের চেষ্টায় কিছু ভেট নিয়ে আছিমের মা একদিন জমিদার-বাড়ীতে গয়েছিল কিন্তু সেখানকার আবহাওয়ায় মধ্যে আশার কোন আশ্বাস সে পায় নি।

মামলার দিন অভাবনীয় এক কাণ্ড ঘটে গেল। শুনানী হয় হয় এমন সময়ে একজন লোক বাইরে থেকে এসে আদালতঘরে সসম্মানে উপবিষ্ট জমিদার বাবুর কাছে গিয়ে চুপে চুপে তাঁকে জানিয়ে দিল যে বাবা তাঁর বাইরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে রয়েচেন। কথাটা একবারে অবিশ্বাস্য কিন্তু কথাটা যে বলল সে জমিদার বাবুর প্রতিবাদ মানল না—বারবার তাঁকে ঐ একই কথা বলতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত ছেলেকে তাই উঠে গিয়ে দেখতে হল ব্যাপারটা কি এবং বাইরে আসতেই তিনি দেখলেন যে শুষ্ক শীর্ণদেহধারী তাঁর কাশীবাসী পিতা একখানি নামাবলি মাত্র গায়ে দিয়ে সত্যই একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাড়াতাড়ি গিয়ে জমিদার বাবু তাঁকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে, বাপ আছিমদ্দির বিরুদ্ধের ফৌজদারি মিটিয়ে ফেলবার কথা ছেলেকে বললেন। শুনে ছেলে প্রায় হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং কোন রকমে নিজেকে একটু সামলে বাপকে তাঁর সেই অভাবিত নির্দ্দেশের

কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি স্পষ্ট করেই বললেন যে আছিম তার ভাই।

রীতিমত মজাদার এই কাহিনীটি কিন্তু সমস্যাপূরণের গল্প নয় তার পটভূমিকা মাত্র। ব্যাপার এই যে জমিদার কৃষ্ণদয়াল অনেক রকমে অনেকের অনেক ভাল করেছিলেন এমন কি অযাচিত ভাবেও অনেকের উপকার তিনি করতেন। এই শেষোক্তদের মধ্যে একজন উকিল হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। দরিদ্রঘরের মেধাবী অথচ ভদ্রবংশোদ্ভব ছেলেটিকে, লেখাপড়া শিখিয়ে জমিদার তাঁকে ওকালতিতে বসিয়ে দেন। নিজের জীবনের ঐ অতীত ইতিহাস-টুকুর জন্য কিন্তু মনে উকিলের জটিল একটি কমপ্লেক্স জমে উঠছিল এবং ওকালতিতে যত তাঁর সুনাম হচ্ছিল মনের তাঁর অস্বস্তিও তত বেড়ে উঠছিল দিনেদিনে। ভেতরে ভেতরে কৃষ্ণদয়ালের ওপরে মন তাঁর নারাজ হয়ে উঠছিল। পরোক্ষভাবে তিনিই দায়ী মনের তাঁর অস্বস্তির জন্য—থামকা তাঁর ওপরে অতটা সদয় হবার কি প্রয়োজন তাঁর ছিল ?

সেদিন কাছারির গাছতলায় কৃষ্ণদয়ালের আবির্ভাবে দেশে রীতিমত একটা চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়েছিল এবং ইতরভদ্র সকলেই আলোচনা করছিলেন কথাটা। কৃষ্ণদয়াল তাঁর ছেলেকে যা বলেছিলেন কেউ তা শোনে নি কিন্তু অমন জবর ফৌজদারিটা ফেঁসে যাওয়ায় মনে মনে অনেকেই কল্পনা-জল্পনা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন তার কারণ সম্পর্কে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে সত্য কথাটা চাপা থাকল না—প্রকাশ হয়ে পড়ল। বুড়ো জমিদারের যৌবন কালের অনাচারের সেই পুরোনো কথাটা অনেকের কাছেই বিশেষ অস্বাভাবিক ঠেকে নি বরং ভুলে যাওয়া সেই কথাটা নিজের শিক্ষিত ছেলেকে বলবার জন্য কাশী থেকে ভদ্রলোকের সেই আসার অন্তরালের তাঁর সৎসাহসের জন্য অনেকেই বিশেষভাবে শ্রদ্ধাবোধ করেছিলেন তাঁদের জমিদারের ওপরে।

উকিলও মনে মনে খুসি হয়ে ছিলেন সব দেখে শুনে কিন্তু সে অন্য কারণে। মনের তাঁর সমস্যা মিটে গেল কারণ তিনি বুঝলেন যে তিনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে বড় রকমের একটা গলতি-গলদের কথা চাপা দেওয়ার জন্যই ঐ দানধ্যানের ভড়ং করতে হয়েছিল বেচারিকে।

পাঁচ

মানুষের মনের আর একটা কমপ্লেক্সের হিসাব আমরা পাই 'সদর-অন্দর' গল্পের পরোক্ষে। রাজা চিত্তরঞ্জনের উল্লেখযোগ্য কোন বদখেয়াল ছিল না এমন কি নিয়মিত সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে তিনি শয়ন-ভোজন করতেন। এই মানুষের হঠাৎ একবার থিয়েটার করবার সখ চাপল এবং অভিনয় ব্যাপারে সুদক্ষ অধিকন্তু সুদর্শন সুগায়ক বিপিনকিশোরকে পেয়ে ভদ্রলোক তাকে যেন একবারে লুফে নিলেন।

অভিনয়ের আয়োজন চলতে লাগল এবং বিপিনের যত্নে চেষ্টায় আয়োজন দিনে দিনে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হতে লাগল। ফল তার এই হল যে আর ঠিক সময়ে রাজা খেতে যেতে পারেন না এবং আখড়াই শেষ করে ফিরতেও মাঝে মাঝে তাঁর বেশ রাত হয়ে যায়। রাজার ঐ সব অনিয়ম অনাচার রাণী বসন্তকুমারী ঠিক প্রসন্ন মনে নিতে পারলেন না কিন্তু চেষ্টা করেও রাজাকে তিনি তাঁর আগের নিয়মের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। স্বামীর নিষ্কলুষ জীবনের একমাত্র কলুষ ঐ থিয়েটারি নেশার জন্য রাণী বিপিনকিশোরকেই দায়ী করলেন কারণ বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে বিপিনের জন্যই আখড়াইটা জমে উঠেছে। ফল তার হল পরোক্ষে এবং বিপিন দেখলেন যে রাত্রের তাঁর খাবার অনেক সময়েই আ-ঢাকা পড়ে থাকে এবং স্নানের পরে ছাড়া তাঁর কাপড়ও আ-কাচা থেকে যায় পরের দিন পর্য্যন্ত। ছোট-খাটো আরো কিছু কিছু অসুবিধা জমতে লাগল তাঁর এদিকে ওদিকে সেদিকে কিন্তু ফলে মুস্কিল তাঁর যতই বাড়ুক সমস্তই ভদ্রলোক নীরবে সহ্য করে যেতে লাগলেন—কাকেও জানতে দিলেন না তাঁর কোন কথা।

ইতিমধ্যে রাণী একদিন রাজাকে অনুরোধ করেছিলেন বিপিনকে বিদায় করে দেবার জন্য। রাণীর সে অনুরোধ রাজা রাখতে পারেন নি কিন্তু রাণীর কথা শুনে মনে মনে তিনি বরং একটু খুসিই হয়েছিলেন এই মনে করে যে তাঁর সুবিধার কথাই বিশেষ-ভাবে রাণীর চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে এবং সে পক্ষে একটু আধটু অসুবিধার সম্ভাবনা দেখা দিতেই বিপিনের ওপরে রাণীর মন নারাজ হয়ে উঠেছে। রাণীর মন বিপিনের ওপরে নারাজ হয়ে উঠছিল সত্য, কিন্তু সে রাজার কথা ভেবে নয়—নিজের কথা ভেবে। সেই কথাটা পরে রাজা বুঝলেন এবং বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় করে দিলেন তিনি বিপিনকে।

তার আগে যথাসময়ে রীতিমত আড়ম্বরের সঙ্গে থিয়েটার হয়ে গেল। আশ্চর্য্য অভিনয় করলেন বিপিনকিশোর এবং তাঁর সে কৃতিত্বে অন্য সকলের কথা চাপা পড়ে গেল। রাজা নিজেও অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন এবং মন্দ হয় নি তিনি যা করেছিলেন কিন্তু তাঁর সে সু-অভিনয়ও লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না—বিপিনের অভিনয় এত ভাল উতরে গেল। অন্য লোকের কথা থাক নিজে রাণী পর্য্যন্ত রাজাকে ডিঙিয়ে তাঁরই কাছে বিপিনের কথায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। শুনে রাজা গম্ভীর হয়ে গেলেন—ব্যাপারটি ঠিক মনঃপূত হল না তাঁর। অতঃপর আরো দু'একটা ছোটখাটো বিষয়ে বিপিনের সম্পর্কে রাণীর পক্ষ-পাতের পরিচয় তিনি আবিষ্কার করলেন। মনের তাঁর অপ্রসাদ গোকুলে বাড়তে লাগল। এমন সময়ে একদিন হঠাৎ তাঁর মনে হল যে চাকরবাকরদের সব সময়ে তিনি যেন ঠিক তাঁর হাতের কাছে পাচ্ছেন না এবং সেই কথা বলে সে দিন একজন চাকরকে ধমক দিতে সে বলে ফেলল যে রাণীর নির্দ্দেশ মত বিপিনবাবুর কাজ করতেই তার অনেক সময় কেটে যায় এবং সেই জন্যই অন্য অনেক কাজ করবার সময় সে পায় না। রাজা চাকরকে কিছু বললেন না—রাণীকেও না; শুধু বিপিনকে বিদায় করে দিলেন।

মনের সঙ্গে এই সহজ লুকোচুরি খেলার অবস্থাটা অপূর্ব্ব কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি তাঁর এই স্বচ্ছন্দ সুন্দর গল্পে।

ছয়

ভালবাসার কথা নিয়েও গল্প লিখেচেন রবীন্দ্রনাথ এবং পড়তে ভালই লাগে সেসব গল্প। মনের সম্পর্ক ধরেই ভালবাসার গতিও পরিণতির কথা তিনি লিখেচেন। ধনজন গৌরবের সংস্কারমুক্ত সাধারণ নরনারীর মধ্যে প্রেমের উন্মেষ ও বিকাশের পরিচয় আছে 'দালিয়া' গল্পে। গল্পটির পরিকল্পনায় এবং তার উপযোগী পরিবেশ রচনায় কবি তাঁর শিল্পী মনের সুন্দর নিদর্শন রেখে গিয়েচেন।

গল্প এই যে দেশের তরুণ রাজা কুটিরবাসিনী এক রমণীকে দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজের সত্য পরিচয় গোপন করে দালিয়া নাম নিয়ে দরিদ্রের ছদ্মবেশে তিনি সেই কুটির-বাসিনীর সঙ্গে আলাপ করেন। আলাপ ক্রমে জমে উঠতে লাগল এবং বয়সের ধর্মে প্রেমের সঞ্চার হল দুজনের মনে। নিজের পরিচয় যিনি সেই ভাবে গোপন করেছিলেন সেই রাজাও কিন্তু জানতেন না যে ঐ কুটিরবাসিনী তাঁর প্রণয়িণী, তাঁর ধীবর প্রজার মেয়ে নয়—সাজাদার কন্যা। নিজেও তরুণী নিজের সে পরিচয় তখন জানতেন না। সে তিনি জানলেন যখন একদিন জুলিখা সেই কুটিরে এসে নিজেকে আমিনার দিদি বলে পরিচয় দিলেন। সেই দিদিই বললেন যে অনেক খোঁজাখুজি করে তবে তিনি আমিনার সন্ধান পেয়েচেন। জুলিখা আরো বললেন যে দেশের রাজার চক্রান্তে বাপকে তাদের প্রাণ দিতে হয়েচে এবং সেই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজচে সে।

ধীবরের কুটিরে দালিয়ার আসা-যাওয়া জুলিখার ঠিক ভাল বোধ হয় নি কারণ তরুণ তরুণীর ঘনিষ্ঠতা যে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে শেষ হবে সে তা ঠিকই জানত এবং মনে করতে বেচারি স্বস্তি বোধ করতে পারে নি যে, সাজাদার মেয়ে আমিনা একজন বনচারী বর্ব্বরের অনুরাগিণী হবে। দালিয়ার সম্পর্কে আমিনাকে সে তাই সাবধান করে দিতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তখন আর তার সময় ছিল না কারণ আমিনার মনে ইতিমধ্যেই রঙ ধরে গিয়েছিল। ছোট বোনের সঙ্গে কথায় কথায় জুলিখা তার মনের ভাব বুঝল এবং সে আরো বুঝল যে বাদসাহীর গৌরব আমিনার কাছে গল্প-কথা মাত্র এবং সেই অলীকের মোহে আমিনা তার অন্তরের আবেগ মিথ্যা করে দিতে পারবে না। সে-জন্য জুলিখা অবশ্যই আমিনাকে দোষ দিতে পারল না কারণ নিজের দিয়েও সে বুঝেছিল যে সেই সীমান্ত প্রদেশের বনভূমির মধ্যে সাজাদির উপযুক্ত মর্য্যাদা কেউ তাঁদের দেয় না বা সে মর্য্যাদা দাবি করবার কোন সঙ্গত কারণও সেখানে তাঁদের নেই। বাধ্য হয়েই সেইখানে জীবন কাটাতে হচ্ছিল তাঁদের, কিন্তু আড়ম্বরবিহীন সেই তাদের জীবনেও আনন্দের সুযোগ ছিল। চারপাশের আকাশ জল আলোবাতাসের প্রীতি এবং মানুষের সম্পর্ক থেকে যে সহৃদয়তা তাঁরা পেয়ে আসছিল—সত্যকার সেই সমস্তকে মিথ্যা মনে করবার কোনই প্রয়োজন তাঁদের ছিল না। ফুল তার গন্ধ থেকে তাদের বঞ্চিত করে না—দখিন বাতাস তাদের শরীরে শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে যায়। সকাল সন্ধ্যায় আকাশের বর্ণবিন্যাস নিত্য-নূতন ভাবে মন তাদের রাঙিয়ে দেয়, নীল নির্ম্মল আকাশে চাঁদের হাসিও মধুর—ফেলনা নয় এদের কোনটাই। মনে ভাবতে যাই হোক আমিনা যে তার জীবনের অভিনব আস্বাদ পাচ্ছিল এবং ভাল লাগছিল সে জীবন তার সে পরিচয় জুলিখা আমিনার চোখে মুখে কথায় কাজে প্রত্যক্ষ করতে পারছিল। দেখতে দেখতে জুলিখার যুবতী-মনের নেপথ্য থেকেও কুলগর্ব্ব ও আভি-জাত্যাভিমান ফিকে হয়ে আসছিল এবং শেষে এমনও হল যে পুষ্পিত কৈলুতরুর ছায়ায় আমিনা-দালিয়ার বিরহ-মিলনের বিচিত্র লীলা দেখতে তারও ভাল লাগতে লাগল যদিও মন তার মাঝে মাঝে হাহাকার করে' উঠত আমিনার দিকে চেয়ে তার কথা ভেবে।

তরুণ-তরুণীর প্রেম ধীরে ধীরে তার পরিণতির পথে চলছিল কিন্তু মন জুলিখার অধীর হয়ে উঠছিল দিনে দিনে—পিতৃহত্যার প্রতিশোধে দেরি হয়ে যাচ্চে। সেই প্রতিশোধের মন্ত্রে সে আমিনাকেও দীক্ষিত করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু প্রথম প্রেমের পুলকে মন তার তখন প্রীতিতে ভরপুর এবং কোন একজনকে প্রাণে মারবার কথায়—মনে সে কোনই উৎসাহ বোধ করতে পারে নি। ব্যাপারটাকে আমিনা গুরুতর বলেই মনে করে নি এবং লালাচ্ছলে দালিয়ার কাছেও কথাটার উল্লেখ সে করেছিল বড় করে নিজের পরিচয় দিয়ে দালিয়াকে হকচকিয়ে দেবার ছেলে-মানুষিতে। কথাটা দালিয়া প্রথমে ঠিক সমঝাতে পারে নি, কিন্তু এত লোক থাকতে হঠাৎ দেশের রাজাকে হত্যা করবার কথাটা আমিনার মাথায় এল কেন সে কথাটা বোঝবার চেষ্টা না করে সে থাকতে পারেনি।

দুই বোনের কাছে অতঃপর একদিন খবর এল যে দেশের রাজা ধীবরের কুটিরে তাদের দুই বোনের সন্ধান পেয়েছেন এবং গোপনে আমিনাকে দেখে তার অনুরাগী হয়ে উঠেচেন। তারা আরো শুনল যে শীঘ্রই দুই বোনকে তাদের রাজবাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই অভাবিতভাবে বৈর-নির্য্যাতনের সুযোগ এসে উপস্থিত হওয়ায় মন জুলিখার অতিমাত্র উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং বিশেষ করে সে তার ছোট বোন্ আমিনাকে জানিয়ে দিল যে বোনেদের মধ্যে তাকেই বাবা তাদের সবচেয়ে বেশি ভাল বাসতেন এবং সম্ভবত সেইজন্যই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ শেষ পর্য্যন্ত তারই পক্ষে সুলভ হয়ে এল। রাজাকে হত্যা করার কথায় কিন্তু আমিনা বিশেষ উৎসাহ বোধ করতে পারছিল না কারণ সে বুঝেছিল যে সেই হত্যার চেষ্টা করার পরে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না তার পক্ষে এবং মরবার জন্য মন তার প্রস্তুত ছিল না তখন।

অতঃপর একদিন রীতিমত সমারোহের মধ্যে রাজবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল তারা দুইবোন। আমিনা আশা করেছিল যে, চিরদিনের জন্য ধীবরের কুটীর ছেড়ে যাবার আগে অন্ততঃ একবার দালিয়ার সঙ্গে তার দেখা হবে; কিন্তু দালিয়া যে সেই সেদিন এসেছিল তারপরে আর এ কয়দিনের মধ্যে তার আর দেখা নেই। মন আমিনার তাই ভাল ছিল না। কিন্তু দালিয়ার সম্পর্কে নিরাশ হ'য়ে রাজাকে হত্যা করবার জন্য সে তার মনস্থির করে ফেলল। রাজবাড়ীতে গিয়ে দুই বোন্ তারা দেখল যে, প্রকাণ্ড সভাঘরের মাঝখানে মসনদ-আসনে

রাজা বসে আছেন। পথে আসতে আসতে রাজাকে হত্যা করার সম্পর্কে মনে আমিনা যেটুকু সাহস সঞ্চয় করেছিল সভাঘরের বিচিত্র আলোক-সজ্জা ও বিপুল লোকসমাগম দেখে মনের তার সে সাহস নিমেষের মধ্যে যেন কোথায় উবে গেল এবং সেই ঘরের দোর ধ'রে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে—এক পা এগোবার সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত যেন সে হারিয়ে ফেলেচে। জুলিখা তার সে অবস্থা না বুঝেই তার আসন্ন কর্ত্তব্য সম্পর্কে শেষ বারের মত আমিনাকে উপদেশ দিয়ে একটু আগিয়ে গিয়ে সে দেখল যে, নিজের আসনে ব'সে রাজা সকৌতুকে হাসছেন। রাজার সঙ্গে তার চোখোচোখি হ'তেই জুলিখা তাঁকে চিনতে পারল এবং মনের তার আকস্মিক আনন্দে মুখ দিয়ে তার শুধু বেরিয়ে গেল—দালিয়া! সেই অসম্ভব জায়গায় অভাবিত ভাবে অতর্কিতে দয়িতের নাম শুনে এবং তারই সামনে রাজাসনে উপবিষ্টকেই সেই দয়িত বুঝে পুলকাবেগের আকস্মিক আতিশয্যে নিমেষের মধ্যে আমিনা সেই দোরের পাশেই মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ে গেল।

ত্রস্তে ব্যস্তে নিজের আসন ছেড়ে উঠে রাজা তখন সেইখানেই আমিনার মাথা কোলে তুলে নিয়ে তার শুশ্রূষায় অবহিত হলেন এবং একটু পরে আমিনা চোখ মেললে দালিয়ার সঙ্গে দিদির সঙ্গে তার চোখোচোখি হ'য়ে গেল। তিনজনেই তাঁরা তখন হাসছিলেন এবং নীরব সেই তাঁদের হাসির মধ্যে গল্পের শেষ হ'য়ে গেল।

এই সম্পর্কে এই গল্পের ছোট ভূমিকাটির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। রাজা-বাদশার ছেলে মেয়ের মধ্যে বিবাহের যে প্রস্তাবে একদিন আরাকানের বনভূমিতে রক্তগঙ্গা বয়ে গিয়েছিল রাজা-বাদশার সেই ছেলেমেয়ের অন্তরতর নিরুপাধি তরুণ-তরুণীকে নিয়ে কবি তাঁর এই অনবদ্য প্রেমের কাহিনীটি গেঁথে তুললেন। প্রেমের সাধনায় যারা অনায়াসে নিজেদের আভিজাত্য-অভিমান ভুলতে চেয়েছিল—সেই প্রেমের পরিণতির অবস্থায়—জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে—রাজা-রাণীর অভিনব ভূমিকায় অভিনয় করবার সময় এল তাদের। সেইক্ষণে আমিনা তার বুকের পাশে লুকোন ছুরি-খানি তার খাপের ভেতর থেকে একটু খুলতে ছুরির ফলায় ঝাড়ের বাতির আলো পড়ে যে ঝিলিক খেলে গেল—হাসি ফুটে উঠল যেন সেই তার চমকানির মধ্য দিয়ে এবং অভাবিত সেই হাসিই হয় ত কঠিন কঠোর কর্ম্ম-জীবনে তাদের সফলতার ইঙ্গিত দিয়ে গেল।

সাত

বাইরের ঘটনাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট গল্পের মধ্যে প্রাধান্য পেতে দেন নি। ঘটনার গৌরব তিনি রেখেছেন মানুষের মনে তার প্রভাব ফেলে পরিচয় দিয়ে তার। নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনা অনেক সময়েই তিনি করেন নি, কিন্তু তাদের মনের পরিচয় প্রায় সময়েই তিনি দিয়েছেন এবং সে পরিচয় তিনি দিয়েচেন তাঁর নিজের কথায় নয়—যাদের কথা বলচেন নিজেদের তাদের জবানীতে ও বাইরের ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণের মধ্যে দিয়ে। তাঁর গল্প, অন্ততঃ শিলাইদহ যুগের গল্প, সম্ভবতঃ সেই জন্যই পাঠকদের এত ভাল লাগে। মনের পরিচয় এই সবে গল্প যেমন মনোজ্ঞ তেমনি সুন্দর। এই সৌন্দর্য্য সম্ভবতঃ সেই আরো-সত্যের ব্যাপার যার ব্যাপারী ব'লে তাঁর শেষের দিকের রচনা গল্পস্বল্পের কুসুমির কাছে কবি নিজেকে কবুল করেচেন। আরো-সত্যের সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে কুসুমিকে তিনি বলেছেন যে, যেদিন সে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে সেদিন তার সম্পর্কের সত্য—তার দেহ এই পৃথিবীতে প'ড়ে থাকবে এবং তার সম্পর্কের আরো-সত্য—যার হিসেবে কবি তাকে পরীস্থানের পরী বলেছেন, সেই আরো-সত্য যে-কোথায় যাবে বা কি তার হবে কেউ আমরা তা' দেখতে পাব না।

শিলাইদহে কবির বাসের সময়টাই ছিল ছোট-গল্প লেখার স্বর্ণযুগ এবং ঐ পাঁচ বৎসরে যত গল্প তিনি লিখেচেন পরবর্ত্তী তাঁর পঁয়তাল্লিশ বৎসরের জীবনেও তিনি তার চেয়ে বেশী গল্প লেখেন নি—ঐ সময়ের পরে বছরের পর বছর কেটে গিয়েচে কিন্তু একটি গল্পও তিনি লেখেন নি। কিন্তু এ নিশ্চয় হতে পারত না গল্প লেখার জন্য আগেকার দিনে যে প্রেরণা তিনি অন্তরে পেয়েচেন তার আনন্দ যদি তিনি তাঁর পরবর্ত্তী জীবনেও অনুভব করতে পারতেন।

শেষের দিকে পঞ্চাশোর্দ্ধে সবুজ পত্র বেরোবার সময়ে আর একবার তিনি গল্প লেখার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। সে সময়ের গল্পের সঙ্গে আগের দিনের তাঁর গল্পের বেশ একটু তফাৎ দেখা যায়। শিলাইদহ যুগের গল্প রস-গর্ভ—অবান্তর কোন কথাই ঐ সব গল্পের মাধুর্য্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে নি এবং সব রকমের পাঠকই ঐ সব গল্প পড়ে আনন্দ অনুভব করতে পারেন। সবুজ পত্র যুগের গল্পে কিন্তু দেখা যায় যে, রসের সঙ্গে কষও জমে উঠেচে গল্পের অন্তরালে এবং গল্পের বেনামীতে লেখক তাঁর মতামত প্রকাশ করেচেন ঐ সময়ের রচনায়। হিসাবে পাওয়া যায় যে, ঐ সব গল্প রচনার সময়েই কবি তাঁর 'বলাকা' 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি রসসম্পদে সমৃদ্ধ ও সাহিত্য গৌরবে অপূর্ব্ব সব কবিতা গান রচনা করেচেন। আশ্চর্য্য এই যে, ঐ সব রচনার সম-পর্য্যায়ভুক্ত কোন ছোট গল্প তিনি ঐ সময়ে লেখেন নি। বেশ মনে হয় যে, ছোট গল্প লেখায় তাঁর প্রেরণা ফুরিয়ে গিয়েছিল ততদিনে এবং সম্ভবতঃ বাইরের তাগিদে লেখা ঐ সময়ের তাঁর গল্প সেই জন্যই রসসম্পদে আগেকার দিনের তাঁর গল্পের সমপর্য্যায়ভুক্ত হ'তে পারে নি।

আরো কথা এই সম্পর্কে যা আমাদের মনে হয় সে এই যে, সাহিত্যে ছোট-গল্পই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান নয় যদিও অনেক ভাল ছোট গল্প তিনি লিখেছেন। সন্দেহ হয় যে, মানুষের মনে দোলা দেবার ব্যাপারে ছোট গল্পের সার্থকতার সম্পর্কে হয়ত পরবর্ত্তীকালে মনে কবির সংশয় এসেছিল এবং সেই জন্যই কি না জানি কিন্তু আমরা দেখি যে কোন কোন তাঁর গল্পকে তিনি নাট্যরূপ দিয়েচেন এবং অনেক গল্প তিনি রচনা করেচেন কবিতায়। কবিতায় গল্প রচনা তিনি আগেও করেচেন এবং 'পুরাতন ভৃত্য' বা 'দুই বিঘা জমি'তে তার পরিচয় আছে : ঐ সব ও পরবর্ত্তীকালের ঐ ভাবের রচনার মধ্যে গল্প অবশ্যই আছে কিন্তু কবিতায় পরিবেশনের জন্যই হয়ত ঐ সব কথা আমাদের অত ভাল লাগে।

'কথা ও কাহিনী'র অনেক রচনাতেই গল্প-লেখকের চেয়ে কবির পরিচয়ই সমধিক ও সার্থক। মনে হয় যে, গল্প লিখে মনে একদিন আনন্দ পেয়েছেন ব'লে, গল্প লেখার তাগিদ কোন দিনই তিনি একবারে অবহেলা করতে পারেন নি। কিন্তু শেষের দিকে কবিতায় গল্প রচনা করে তিনি নিজের কবি-পরিচয়ই প্রতিষ্ঠা করে গিয়েচেন। একথাও এখানে বলে রাখা দরকার যে, প্রথম দিকের তাঁর গল্পের মধ্যে দিয়েও তাঁর কবি-প্রকৃতি বারবার আপনাকে জানান দিয়েচে!

হিসাব

শ্রীপ্রিয়লাল দাশ

শুভ্র লগনে কখন সহসা এই পৃথিবীর আলো
প্রথম প্রভাতে দেখিনু যবে লেগেছিল বড় ভালো,
আবেশ মাখানো নয়নযুগল, শৈশবের সে ছবি
লুকাইল তায় দিগঞ্চলের মেঘের মত সবই।
এল কৈশোর নিয়ে এল সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব সাথে
কণ্টকপথে চলিনু অভয়ে ঝঞ্ঝা করিয়ে মাথে।
এমনি যখন পুষ্প কুড়ায়ে চলেছি পথের মাঝে
বিশ্ব তখন ধরা দিল এসে অপূর্ব্ব এক সাজে।
এই ধরণীর সব কিছুতেই লাগলো কিসের নেশা
দৃষ্টি আমার রাঙিয়ে দিল কে, সবার সহিত মেশা
হোল মধুময়; অবাস্তরের রঙের পরশ লেগে
লাগলো শিহর চিত্তে আমার উঠলো ফাগুন জেগে
রইল আমেজ নবীন জীবন, সবার মুখেই হাসি,
এমুখ পানে চেয়ে সুরু হোল কত ভালবাসাবাসি
কত এল গেল কেহবা রহিল অভিমানে বুক ভ'রে
কেহ হাসি দিল নিমেষেই কারো পড়িল নয়ন ঝ'রে
মিলন বিরহে জীবন জোয়ারে কতনা রচিনু গান
জানি না তাহারা পৃথিবীর কাছে পাবে কি কখনো দাম!
এমনি করিয়া জীবন চলিল সহসা হঠাৎ দেখি
কঠিন কর্ম্মে আমারে ঘিরেছে বিস্ময়ে হেরি এ কি!
রঙিন স্বপন মিলে গেল ধীরে দিগঞ্চলের শেষে
কর্ম্মক্লান্ত শীর্ণ শ্রান্ত সর্ব্বহারার বেশে
দাঁড়িয়েছি কূলে আমার ভুবনে আসিবে আবার ঘিরে
সন্ধ্যার ছায়া থেমে যাবে বাঁশি চেয়ে রব নদীতীরে
কেহ অবশেষে ভিড়াবে তরণী তুলে নেবে হাতে ধরি'
ফুরাবে তখনি জটিল হিসাব ওপারে ভাসালে তরী।

হেমন্তলক্ষ্মী

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার নাগ

পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্রে সন্তর্পণ চরণসঞ্চারে
মেলিয়া আয়ত আঁখি বহুদূর দিগন্তের পারে
কুয়াসা গুণ্ঠন তুলি' সঙ্কুচিতা বধূটির মত
নীরবে দাঁড়ালে তুমি; ওই দুটি ঘন কৃষ্ণায়ত
উজল নয়নে আর নাহি দীপ্ত চকিত বিলাস।
শারদ প্রাতের সেই শুভ্রাকাশ স্নিগ্ধ স্মিত হাস
কোথায় মিলায়ে গেছে! ঝলকিছে দুটি আঁখিপাতে
নীহার অশ্রুর বিন্দু; শত কোটি বুভুক্ষুর সাথে
সমদুঃখভোগী মাতা! দয়াময়ী অন্নদাত্রী রূপে
হে কল্যাণি, দাঁড়াইলে সন্তর্পণে আজি চুপে চুপে।
দিগন্ত মুখরি'তোলা উচ্ছ্বসিত রাখালিয়া সুরে
তোমার বন্দনা বাজে! পূজা তব হৃদি-অন্তঃপুরে।
হৈমন্তিকা, হেমন্তের দয়াময়ী অপরূপা বধূ!
নয়নে অভয় বহি বক্ষে বহি নন্দনের মধু
দ্যুলোক ত্যজিয়া এলে ভূলোকের মাটির কুটিরে!
অসহায় আর্ত্ত যেথা অন্নহীন কেঁদে কেঁদে ফিরে!
দুঃখীর জননী অয়ি, বুভুক্ষুর অন্নপূর্ণা মাতা
কাব্যে তব মূর্ত্তি রচি' গাহি দেবি তব জয়গাথা।

বন্দনা করো

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

বন্দনা করো, বন্দনা করো লাঞ্ছিতা জননীরে
লোনা হ'য়ে গেল বক্ষের সুধা মিশিয়া নয়ননীরে।
স্বপ্ন তাঁহার হয়েছে ধূসর, মরু হয়ে গেছে শ্যাম প্রান্তর,
পল্লীর ছায়ে প্রেতের নৃত্য তটিনীর তীরে তীরে।

কে দেবে অন্ন কে হ'বে ধন্য কে দেবে অর্ঘ্য পায়ে
কে দূরীবে এই আত্মকলহ দুর্নীতি অন্যায়ে?
বিগত দিনের গৌরবকথা হৃদয়ে জাগায় দুঃসহ ব্যথা,
আঁধার নেমেছে দুটি পাখা মেলি তাজমহলেরও শিরে।

পুত্র যাঁহার ধ্যানী বুদ্ধ সুদূর মালয় পারে,
অহিংসা নীতি সাম্যের গীতি প্রচারিল দ্বারে দ্বারে।
ভুলি অতীতের মধুময় স্মৃতি উদার মন্ত্র শান্তি ও প্রীতি,
পীত-রাক্ষসী ধনলালসায় বক্ষ বিঁধিল তীরে।

জৈন ও শিখ, বৌদ্ধ ইহুদী, শূদ্র ও ব্রাহ্মণ,
জননীর পায়ে সঁপিও তোমার সকল শ্রেষ্ঠ ধন।
এস মুসলিম এস খৃষ্টান, ভুলি ভেদাভেদ মুছি অভিমান,
জাতি ও ধর্ম্ম এক হ'য়ে যাক্ মিলন মন্দিরে।

মন ও বন

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ

বনের কাঁটা তুল্‌তে পারি,—
মনের কাঁটা যায় না তোলা,
মরমে যা' রইল গাঁথা
সহজে তা' যায় কি ভোলা?
থাক্‌লো যাহা সুপ্ত হ'য়ে
যায়নি তাহা লুপ্ত হ'য়ে!
প্রাণের দ্বারে শিকল দিলে
কেমনে তা' যায় গো খোলা!

বনের আগুন সবাই দেখে
মনের আগুন যায় কি দেখা?
পেলাম যাহা—হিয়ার খাতার
পাতায় পাতায় রইলো লেখা!

লুকিয়ে রেখে প্রাণের ক্ষত
বেড়াই মেতে সবার মত।
সংসারের এই কর্ম্মশালায়
কতই যে ভাল হল শেখা!

বনের আঁধার—ক্ষণিক সে যে,
মনের আঁধার যায় কি ছুটে?
বিষাদ ঢাকা হৃদয়-গুহায়
রবির আলো আর কি ফুটে?
ঘনায় প্রাণে তিমির-রাতি,
নাইকো আহা, প্রাণের সাথী!
মনের মানুষ হারিয়ে গেলে
আর কি ধরায় সঙ্গী জুটে।

নবান্ন

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী

এবার হবে নবান্ন বাঙ্গালীর ঘরে
নর-নারায়ণ নাই ভরিবে কে থালা?
ফুলগুলি ফু'টে রয় কে রচিবে মালা
মানুষ কোথায় আছে দেবতার বরে?
তিথি ঘুরে পদে পদে অতিথি পলায়
শিবহীন যজ্ঞ মাঝে শৃগালের তাড়া
দেবতা মানুষ তাই হয়ে পথহারা
অন্ধের মতন চলে বেলা অবেলায়।
লালসা মিটাতে চায় অর্থহীন ক্ষুধা
অহঙ্কার নৃত্য করে অপমান সাথে
অন্নপূর্ণা আছে ঘরে অন্ন শুধু নাই— ;
দানব নবান্ন নিয়ে লুটে কত সুধা
ভক্তিহীন ফুল পড়ে ফলহীন মাথে
পূর্ণ আয়োজনে হায় নাহি রবে ঠাঁই!

চাঁদ চায়

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

(গান)

চাঁদ চায় আমার পানে,
আমি চাই চাঁদের পানে।
উভয়ে কি কথা হয় হৃদয় জানে।
সে কথায় চাঁদ মুচ্‌কে হাসে,
আমার হিয়া সুখে ভাসে,
আমি ও চাঁদ এমনি বাঁধা প্রাণে প্রাণে।

চাঁদ তো এম্‌নি হাসে যুগে যুগে,
কত বুক ভরিয়েছে সে অপার সুখে।
তবু সে আমারে চায়,
আমাতে কি গুণ সে পায়?
হিয়া তার উদাস তায় অবাক্ মানে।

কামারবুড়ো (গল্প)

শ্রীজনরঞ্জন রায়

হিঁদুরা যে কয় 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'—মিথ্যা কথা নয়! এই ধুপের মধ্যে কি বেরুনো যায়? ঝাঁপ খুললে যেন আগুন আসছে!—রহমতুল্লা আপন মনেই বলিয়া চলিয়াছে…তার মাথাটা বোধ হয় কিছু গরম হইয়া উঠিয়াছে। চালের বাতা হইতে সোলা চকমকি নিয়া সে তামাক সাজিতে বসিল। ওদিকে মোল্লাপাড়ায় খুব সোরগোল শোনা যাইতেছে। কলিমুদ্দিন হাজি বেলা দশটায় মারা গিয়াছে…এখনো কবর দেওয়া হয় নাই। রহমতুল্লা খানিকটা ভয়ে, খানিকটা ঘৃণায় বাহির হইতে চাহিতেছিল না। ভয়ে মানে খরচের ভয়ে…কফন্ থেকে ফতেহা—সব সে কেন ঘাড়ে চাপাইয়া নিবে? একবার বাহির হইলে আর রক্ষা নাই। লোকে তো জানে কলিমুদ্দিন না থাকিলে সে আজ পঞ্চাইত হইতে পারিত না…সে ধনী মানী কিছুই নয় শুধু চাষী।—কলিমুদ্দিন দিনকে রাত করিতে পারিত··রাতকে দিন! তার ভয়েই তো লোকে তাকে ভোট দিলে।…না দিলে তাদের ভিটে মাটি কি আর থাকিত?…ভায়ে ভায়ে, চাচা ভাজতের মামলা মোকদ্দমা বাধাইয়া সব বরবাদ করিয়া দিত।…দারোগা পুলিশ সব তার হাতে!… খাইবার কেউ ছিল না—কিন্তু লোভ ছিল আকণ্ঠ।…তার সঙ্গে ফুরান ছিল কুড়ি টাকা তা তো নিয়াছেই…তা ছাড়া থানায় যাতায়াত বলিয়া আরো আট টাকা…একখানা নতুন লুঙ্গি—শেষে সদরের বড় দারোগার নাম করিয়া তার পোষা খাসীটাকে পর্য্যন্ত খুলিয়া নিয়া গিয়াছে। উঃ! কলিমুদ্দিন না মরিলে দু'দিন পরে তার অবস্থা কি না হইত? কিন্তু—!

রহমতুল্লা যেন কাঁপিয়া উঠিল। গ্রামের কেহই কি এ কথা জানে না? জানিলে বোধ হয় এতক্ষণ খুব ঘোঁট বাধিত। তাইতো আগেই যাওয়া উচিত ছিল কফনের কি-ই বা খরচ? সে বাড়ি হইতেই শুনিতেছে তাহা নাকি কামারবুড়ো আনিয়া দিয়াছে।

ও কি ও?…কলিমুদ্দিন কটমট করিয়া তাহার দিকে চাহিতেছে। আর বলিতেছে—আমার কফন্ কেনার টাকা জুটছে না—তা এনে দিলে রামব্রহ্ম কামার। আর আমার টাকা ভরা হাতবাক্সটা তুই গায়েব কোরে ফেলবি?

রহমতুল্লা সেখানেই পড়িয়া গোঙাইতেছে:—তখন বৃদ্ধ রামব্রহ্ম কর্ম্মকার তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে। বদনাটা নিয়া সে তাড়াতাড়ি তার চোখে জলের ছাট দিতে লাগিল। রহমতুল্লা তাকাইল। কিন্তু তার আতঙ্ক যায় নাই। কলিমুদ্দিন এইমাত্র রামব্রহ্ম কর্ম্মকারের নাম করিয়া গিয়াছে—সেই রামব্রহ্ম সম্মুখে!

কিন্তু রামব্রহ্ম বলিল—পঞ্চাইত সাহেব চলেন—ওরা সব আমায় পাঠালে আপনার কাছে—আপনাকে যে আগে মাটি দিতে হবে।—তিনি তো আপনার খালু হোতেন।

রহমতুল্লা সামলাইয়া নিবার চেষ্টা করিতেছে।

কলিমুদ্দিন এই কয় বছর পূর্ব্বে আসিয়া এখানে ছোট একটা টুঙি তোলে। বহুপুরুষ আগে তাদের এখানে বাস ছিল। আসিয়া বলে সে হজ করিয়া আসিয়াছে। সে যেন চোখে মুখে কথা কহিতে মামলা মোকদ্দমা বাধাইতে অদ্বিতীয় ছিল। বৎসর পাঁচেক আগে রহমতুল্লার এক ফুফুকে নিকা করে। এক বছর হইল ফুফু মরিয়া গিয়াছে। কোনো ছেলেপুলে নাই।

সম্পর্কটা এইখানে। তাই কলিমুদ্দিন এবার অসুস্থ হইতেই রহমৎকে গোপনে ডাকিয়া হাতবাক্সটা রাখিতে দেয়—বলে সারিয়া উঠিয়া লইব। রহমৎ সামলাইয়া নিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। বলিল—কর্ম্মকার মশাই আপনি ভালই করলেন, শোক পেয়ে আমার মাথাটা কিছু খারাপ হয়ে গিয়েছিল, চলুন যাই, মাটি দেওয়ার তো বন্দোবস্ত করতে হবে।

যাইতে যাইতে সে রামব্রহ্মকে বলিল—হাজি সাহেব ভারি ঝগড়াটে লোক ছিল, তাকে মাটি দিতে সবাই আসবে না বোধ হয়।

কিন্তু সে আসিয়া দেখিল সে ছাড়া গ্রামের কোন মুসলমানের আসিতে বাকি নাই। মায় তার পঞ্চায়তি যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী পাশের গ্রামের মৃধারাও আসিয়াছে। কিন্তু কফন কিনিয়া আনিবার কেহই আগ্রহ দেখায় নাই এতই স্বজাতির অপ্রিয় ছিল লোকটি। বৃদ্ধ রামব্রহ্ম কর্ম্মকারের প্রাণটা কাঁদিয়া ওঠে, সে উহা কিনিয়া আনে।

…

সকালে রামব্রহ্মর কামারশালায় আস্তে আস্তে ভিড় জমিতেছে। মুসলমান চাষীরা কেহ লাঙ্গলের ফাল্, কেহ কাস্তে, কেহ কাটারি নিয়া মেরামত করিতে আসিয়া দল ভারি করিতেছে। গাড়ীর চাকায় হাল বসাইবার জন্য দূর থেকে যারা আসিয়াছে তাহারাও জমিয়া গিয়াছে। আজ কামারশালার হাপরে আগুন পড়ে নাই। কর্ম্মকারের আজ বিশ্বকর্ম্মা পূজা। পরনিন্দারূপ মুখরোচক আলোচনা চলিয়াছে, আর কামারশালার হরফিতে যে দাকাটা তামাক ছিল তাহা নিঃশেষ করিয়া কলিকার পর কলিকা চলিয়াছে। ছোড়ার দল বলিল—খালুর কবরে মাটি দেবার সময় এগিয়ে গেল রহমতুল্লা, কিন্তু ফতেহা করিল না? এবার তাকে শুধু একঘরে করা নয়, পঞ্চাইতিও খতম করিতে হবে। তাতে লাগবে কিছু খরচ, আমরা চাইলে বুড়ো তা না-দিয়ে পারবে না। ছেলের মতন আমাদের ভালবাসে। বৃদ্ধের দল বলিল—বিয়ে-সাদি সুখ-দুঃখে কামার বুড়ো চিরদিন আমাদের দিয়ে আসছে কিন্তু আমাদের দলাদলিতে তাকে টেনে আনলে খোদার কাছে কসুর করা হবে, সে একজন খোদার বান্দা।

এমন সময় দেখা গেল রামব্রহ্ম ও তার ছেলে দুইটা ঝুরি মাথায় নিয়া তাদের দিকে আসিতেছে, আর মুখে বলিতেছে সবুর করো ভাই সব সবুর করুন আপনারা। নিকটে আসিয়া বলিল—আমার পুজোর পর এ-দিকে আসছি দেখি কফনবাধা হাজি সাহেব ঐ নিম গাছটায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে, আমায় দেখে বললে—আজ আমায় একচল্লিশা কর্ম্মকার! আমার বুকটায় ভারি বাজল। তাই নিয়ে এলাম এই মুড়কি আর বাতাসা। আপনারা চলুন ভাই সব তার কবরখানায়, এ-সব দিয়ে ফতেহা করো।

রিভলবর

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

সুসভ্য যে কোন সহরের নোংরা অন্ধকারপ্রায় আবর্জ্জনাপঙ্কিল সরু গলির ওপর বিরাটকায় প্রাচীন বাড়ীগুলির একটি। নব্য কৃষ্টির স্পর্শ এখানে নেই, কিন্তু অপকৃষ্টির বিষাক্ত রসে এইসব গলি ঘুঁজির বাড়ীগুলিতে ক্ষতের সঞ্চার হয়েছে। সভ্যতার আলো পড়ে না এখানে, কেমনধারা নির্জীবতা সব সময় জমাট হ'য়ে থাকে। এই ধরণের যে কোন বাড়ীর অন্দরে গিয়ে খোঁজ করলেই দেখা যাবে অত্যন্ত সন্তর্পণে জুয়ার আড্ডা চলেছে। মুখোস-আঁটা বহু সাহসিক ভদ্রলোকই নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়ে নিতে এখানে এসে জমায়েত হয়েছেন।

এই ধরণের একখানা বাড়ীর পিছনদিককার চত্বরে একটি যুবককে দেখা গেল। মধ্যবয়স, গৌর, সমানুপাতিক সুকান্ত চেহারা। কালো স্যুট পরা। চোখ মুখ ম্লান নিরাশায় স্তিমিত এবং নিষ্প্রভ। হঠাৎ চোট খেয়ে বেশ খানিকটা মুষড়ে পড়েছে বলেই মনে হয়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণচন্দ্রের আলো এসে পিছনকার বাগানের পাথরে বাঁধানো পৈঠায় ঝকঝক করছে। যুবকটি তার পকেট থেকে অকস্মাৎ একটি রিভলবর বের করল। নির্জ্জন স্থান, তার ওপর নগ্ন চাঁদের আলোয় বিগত শতাব্দীর রোমান্টিক নায়কের মত মনে হ'ল

যুবককে ; ব্যর্থ প্রেমের বিরহে কিংবা অন্য কোন কারণে হয়তো যুবকটি আত্মহত্যা করবে। অনাবৃত রিভলবরের ফলাটা পরিষ্কার নিকেলের তৈরী ছিল—এখন সেটি মেঘের পটভূমিকায় বৈদ্যুতিক দীপ্তির মত চকমক করতে লাগলো।

সেই মুহূর্তে নাটকীয় ভঙ্গী নিয়ে একটি মেয়ে অন্দরের মধ্যে থেকে সেই চত্বরে বেরিয়ে এল, এবং তাড়িতদ্রুততায় যুবকটির হাত চেপে ধরলো। ভয়-চকিত মেয়েটিকে দেখে, মনে হ'ল, সে বেশ ঘাবড়ে গেছে। মেয়েটি পুষ্ট-যৌবন ; তবুও তনু লালিত্যে বেশ খানিকটা ভাঁটা দেখা যায়, জীবনের স্রোতোবেগ যেন শ্লথ ও শিথিল—সাধারণ দৃষ্টিতেই তা ধরা যায়। মনে হয়, মনের দিক থেকেও মেয়েটী চঞ্চল, বিধুর এবং বেদনাপ্রবণ।

মেয়েটি। আমি অনুরোধ করছি—আপনি ও ভাবে—এ কাজ করবেন না, আমি অনুরোধ করছি।

যুবক। (নিরুত্তর)।

মেয়েটি। কি চুপ ক'রে রইলেন যে—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকাচ্ছেন কি? আপনি ক্ষান্ত হোন। আপনি এ কাজ করতে পারবেন না। না—করবেন না এ কাজ।

যুবক। বেগ ইওর পার্ডন। আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কি ভেবেছেন, আমি কোন লোককে খুন করতে যাচ্ছি এই রিভলবর দিয়ে? হঠাৎ উচ্ছসিত হয়ে অনুরোধ করছেন, আবেগময়ী হয়ে আদেশ করছেন—কি ভেবেছেন বলুন ত? কোন লোককে খুন করছি আমি নাকি?

মেয়েটা। কোন্ লোককে মানে? আপনি কি নিজে—

যুবক। থামলেন কেন, বলুন—আমি কি? আমি কি নিজেই নিজেকে খুন করতে যাচ্ছিলাম—সাদা কথায় যাকে আত্মহত্যা বলে? ওঃ, এবার বুঝলাম আপনি আমার হাত চেপে ধরেছিলেন কেন?

মেয়েটী। আপনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন না?

যুবক। আকস্মিক অপঘটন কিছু না ঘটলে নিশ্চয়ই নয় বলতে পারি কেন না, বর্ত্তমানে আমার সে রকম কোন প্রবৃত্তি আদৌ নেই। অন্ততঃ মনের দিক থেকে ত' আমি তাই জানি। আপনার যদি এ রকম কিছু মনে হয়ে থাকে—তা' হ'লে স্বতন্ত্র কথা, আমার অবশ্য আত্মহত্যার কামনা নেই এখন।

মেয়েটী। ও—

যুবক। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগের কোন কারণ নেই। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি—আর আপনার ঐ নরম আঙুলগুলোর যথেষ্ট তারিফ করতে বাধ্য হচ্ছি—আমার কব্জিটা এখনো টন টন করছে।

মেয়েটী। পকেট থেকে হঠাৎ আপনি রিভলবরটি এমনভাবে বের করলেন কেন, জানতে পারি কি?

যুবক। বিশেষ প্রয়োজন আছে তার?

মেয়েটী। আমি ভাবলাম আপনি বুঝি আত্মহত্যাই ক'রে বসবেন, তাই ভয় পেয়ে বাধা দিতে এলাম। আপনি যখন বলছেন—আত্মহত্যার প্রবৃত্তি নেই, তখন আর অন্য কথা কি? অথচ—

যুবক। অথচ কেন আমি পকেট থেকে এমন অকস্মাৎ রিভলবরটি বের করলাম—এইত? আমি দেখতে চেয়েছিলাম পকেটে রিভলবরটি আছে না একেও খুইয়েছি এখানে।

মেয়েটী। তা—ওই অমন সহসা?

যুবক। হাঁ। কেননা অমন সহসাই ওর স্থিতি সম্পর্কে আমার মনে চেতনা জাগলো।

মেয়েটী। এটা আপনার কোন রকম যুক্তিই হ'ল না। অকারণে কারুর প্রতি প্রয়োগ করার মানস না করে পকেট থেকে অস্ত্রটি সহসা বের করা কোন লোকের পক্ষে সাধারণতঃ সম্ভব বলে মনে হয় না—অন্ততঃ সুস্থ অবস্থায়।

যুবক। উক্তির জোয়ারে আপনার যুক্তির জোরটা ভেসে যাচ্ছে। কেন সম্ভব নয় বলুন? আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি: ধরুন ষ্টেশনারী বাজারে গেছেন প্রসাধনের জিনিষপত্র কিনতে, হঠাৎ মনে হ'ল—পার্সটা কোথায়? সঙ্গে আছে ত? তখন যন্ত্র-চালিতের মত আকস্মিক অভিভাবে হাতটা ভ্যানিটী ব্যাগে কিংবা পাশ পকেটে চালান কিনা?

মেয়েটী। আপনি বলতে চান অকস্মাৎ রিভলবরটির কথা মনে পড়ায় আপনি সেটা চাঁদের আলোয় বের করে তাকাচ্ছিলেন ওর দিকে?

যুবক। কিন্তু আমি এর ব্যবহার করবোনা—এমন কথা বলিনি ত। এমন একটা সুন্দর অস্ত্র, বিংশ শতাব্দীতে সভ্য মানুষের এমন পরম সুহৃদ—একে কখনো অবজ্ঞা করা যায়? আমি ত' খুব শীঘ্রই এর উত্তম ব্যবহার করবো। মাষ্ট আই ইয়ুস ইট সুন।

মেয়েটী। এই ত' বললেন কোন লোককে বা নিজেকে সুট্ করতে চান না—তবে এর উত্তম ব্যবহার করবেন কি করে? রিভলবার দিয়ে কোন পাখী মারবার ধৃষ্টতা বোধ হয় আপনার হবে না—আশা করি।

যুবক। না, এ মুহূর্তে এর ব্যবহার সম্পর্কে কোনরকম প্রশ্ন উঠতে পারে না কেননা—এটা খালি, এতে একটিও কার্ত্তুজ নেই। আমি আশা করছি কাল এর ব্যবহার করবো চরম ব্যবহার।

মেয়েটী। (নিরুত্তর)

যুবক। এই রিভলবরটি অত্যন্ত চমৎকার ভাবে গড়া। এর ওপরকার শিল্পীসুলভ কারুকার্য্যের কথা বাদ দিয়েও এর গঠন প্রণালীর সৌকর্য্য আপনি একবার দেখুন—অপূর্ব্ব সুন্দর! এটা হারাতে তাই মন যায় না। দেখুন, নিজে হাতে ধরেই দেখুন না। বিশ্বাস করুন টোটা নেই!

মেয়েটী। (হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে) দেখলাম—সত্যিই সুন্দর। বিশেষ করে রিভলবরের মাঝখানে নিকেলের ওপর দামী পাথরটা বসানো—শিল্পীজনোচিত কিনা বলতে পারি না—বিলাসের আভিজাত্য বজায় হয়েছে নিঃসন্দেহে! পনেরো মিনিট আগে যদি জানতে পারতাম অস্ত্রটিতে গুলিভরা নেই, তাহলে এই নাটকটা ঘটতো না!

যুবক। নাটক? বেশ কথা বলেন আপনি! কিন্তু এ নাটক ত' আমার বেশ লাগলো।

মেয়েটী। আমরা যারা প্রতিনিয়ত নাটকের মধ্যে বাস করছি—নাটকীয় রূপে রসে ডুবে বসে রয়েছি—আমাদের কাছে নাটকের এসব দৃশ্যাবলী বড় পুরাণো আর বড় তেতো হয়ে গেছে।

যুবক। অর্থাৎ—

মেয়েটী। এই শতাব্দীর সভ্যতার একটা দিককে আমরা রূপায়িত করছি, দিন রাত করতে বাধ্য হচ্ছি বলাই বরং শ্রেয়ঃ।

যুবক। এই জুয়ার আড্ডায় ত' আপনারা কমিশন বেসিসে কাজ করেন এবং সে কাজ স্বেচ্ছায় নিয়েছেন বলেই আমাদের ধারণা।

মেয়েটী। বাইরে ঘটনাটি সেই রকম রঙেই প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের দৌর্ব্বল্যের সুযোগে বা ছোটখাটো রকমের কোন উপকার করে দিয়ে এখানকার কর্ম্মকর্ত্তারা আমাদের টেনে এনেছেন তাদের মধ্যে, আমরা আর যাতে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে না পারি, তাদের বিপক্ষে চলতে না পারি—তা তারা করেছে। আমাদের গোপন কিছুর সন্ধান এনে এরা আমাদের ওপর শোষণ নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। এক্সপ্লয়টেশনের জ্বলন্ত উদাহরণ যদি চান—তাহলে এই। এর চেয়ে মর্ম্মান্তিক এবং জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর হতে পারে না। অথচ এখানে যে কটি মেয়েকে ধরে রাখা হয়েছে—সকলেই আই. এ, বি-এ, পাশ করা। স্বাধীনতার ভঙ্গিতে তাদের চলবার সৌভাগ্য এখানে দেওয়া হল অথচ বাইরে বিজ্ঞাপনী কায়দায় চলছে—আমরা

চাকরী করছি এখানে নিজস্ব মর্জ্জিতে। জুয়ার আড্ডা চালু রাখতে গেলে মেয়েদের রাখতেই হবে। অভিনয়ের ছলে প্রচ্ছন্ন ক্যানভাসের জোরেই লোক আসবে এখানে; যেমন আপনারা এসে থাকেন। লোকটানার যন্ত্রের মত করে বিংশ শতাব্দীতে আমাদের মূল্য মিলছে—এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে! খেতে পরতে দেয় কোনরকমে, কিন্তু স্বাধীনভাবে সরে পড়তে দেয় না; নিয়মের নানা শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। আর নিজেরা চালু রেখেছে জুয়াকে। গভর্ণমেন্টের চোখকে ফাঁকী দিচ্ছে, পাওনাদারের বাকী ফেলছে, এবং কর্ম্মকর্ত্তারা লাল হয়ে যাচ্ছে। আমরাও এদের কবলে পড়ে তিল তিল করে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি। লেখাপড়া যথেষ্ট শিখেছি, স্বাধীন আকাঙ্ক্ষাও ছিল, কিন্তু জীবনে ছিদ্রের সন্ধান নিয়ে এরা চৈতন্যের চাবুক হাতে করে আমাদের কাবু করে ফেলেছে। নির্বিকার ভাবে আমরা তা' সহ্য করছি— কোন প্রতিবাদ নেই, প্রতীকারের কোন আশাও নেই!

যুবক। ভাবনার নতুন একটা দিক ত' আপনি খুলে দিলেন। এ নিয়ে এক পশলা হৈ-চৈ করা উচিত। আমরা জানি আপনারা কথা বলে আমাদের আটকে রেখে ফতুর করার কাজে সহায়তা করেন; মোটা রকমের রেসিয়ো ধরা আছে, তাই পান।

মেয়েটি। শুধু তাই নয়। আমাদের লাঞ্ছনার এখানেই শেষ নয়। আমাদের সাহায্যে জুয়াড়ীর আড্ডা জমে ঠিকই, লোককে টেনে আনবার ভার আমাদের, তাদের টাকা পয়সা শোষণ করবার কাজে আমাদের সহায়তাও করতে হয়, নিঃস্ব না হওয়া পর্য্যন্ত নানা ছলাকলায় তাদের রিক্ত করতে হয়; কিন্তু রেসিয়োর কথা যা বললেন সেটা ভুল। এখানে যারা বাঁধা মাইনেতে চাকরী করে তাদের অর্থও শোষণ করতে হয়। নব্বই টাকা মাইনের পাকা জোচ্চর নিধুরাম রোজ দু'পাঁচজন লোককে হারিয়ে যে হাজার টাকা কামিয়ে দিয়ে যায় বড়বাবুকে, সেই নিধুরামের নব্বই টাকাও হাত করতে হয় নানা রকম অভিনয় করে। সে টাকা বড়বাবুই পায়। সবটাই চুরি এখানে। এখানে এসে শাঁস নিয়ে ফেরবার সাধ্য কারো নেই। স্রেফ ধূসর মরুভূমি হয়ে যেতে হবে। বুঝলেন।

যুবক। আমি সেই নীতিকে ভেঙে দেবার জন্যেই উঠে এলাম আড্ডা থেকে। ট্যাক গড়ের মাঠ হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো উষর বা ধূসর—যাই বলুন হতে পারিনি। এই পাথর খচিত রিভলভরটি নিয়েই উঠে এলাম এখানে মনস্থির করবার জন্যে কি করা যায়! রিভলভর বাঁধা দিয়ে খেলব না, না ছুটে পালাবো এখান থেকে— তাই।

মেয়েটি। তাই আমাকেও ছুটতে হল এখানে। রিভলভর না থাকলে আমি এসে নাটকীয় ভাবে আপনার হাতখানা চেপে ধরতে যাবো কেন?

যুবক। বার বার ওই কথা বলছেন কেন বলুন ত? আপার কোমল হাতের কঠোর স্পর্শ আমার বেশ লাগলো। কেমন উত্তেজনাপ্রবণ, কেমন মোহময়।

মেয়েটি। আমার নিজের কথাইত বলে গেলাম এতক্ষণ। এবার যাবো। যাবার আগে আপনার রিভলভরটি হঠাৎ বের করার সঠিক কারণ শুনে যেতে চাই।

যুবক। উত্তর আমি সঠিক দিয়েছি। হঠাৎ ওর স্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন মনে এল—তাই।

মেয়েটি। এই যে বললেন – এর চরম ব্যবহার করবেন কাল না পরশু। সে কথাই শুনতে চাই।

যুবক। আমার পকেট শূন্য—এই মাত্র শুনলেন। তাই ভাবছি রিভলবরটি বিক্রী করে দেব। এবং সেই পয়সা নিয়ে কোনো ব্যবসায় ফেঁদে বসবো—ছোটখাটো রকমের। ধূপের ব্যবসায় কিংবা গামছা কিনে বিক্রী করবো পথে পথে। তবু এপথে আর নয়। আজ যখন হেরে গেলাম সব, মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল— সব খোয়ালাম এখানে এসে। চত্বরে এসে হঠাৎ রিভলবরের কথা মনে হল, চট করে পকেট থেকে বের করলাম. চোখের সামনে তুলে ধরলাম। সব সময় কার্ত্তুজবিহীন বয়ে এটিকে সঙ্গে রাখি আমি। বড় প্রিয় জিনিষ আমার। তুলে ধরে ভাবতে লাগলাম— কত টাকায় পাথরশুদ্ধ এই রিভলবরটি বিক্রয় করা যেতে পারে। সেই চিন্তার মধ্যে আপনি এসে বন্দী করলেন আমাকে।

মেয়েটি। আপনার বৈরাগ্য দশা উপস্থিত হয়েছিল—তাতো বুঝতে পারিনি। আমি যা ভেবেছিলাম, তা আগেই বলেছি। যাক্ আসুন, এক কাপ চা খেয়ে যান।

যুবক। কই রিভলবর আমার? দিন।

মেয়েটি। (চোখের নতুনরকম ইসারা করবার পর) ব্যস্ত হবেন না; ভাগ্য ফিরিয়ে দেবার মালিক আমরা। আসুন, এই রিভলবর বাঁধা দিয়েই বসুন আর একবার টেবিলে। মন বাঁধা দিয়ে ফেলেছেন এর মধ্যে— রিভলবরটি বাহ্যিক বস্তু মাত্র, এর জন্যে এত মায়া কিসের?

যুবক। অর্থাৎ?

মেয়েটি। অর্থাৎ, আমরা যার নুন খাই—তার গুণ না গাইলেও অমর্য্যাদা করি না। খদ্দের হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই— এই নীতি-বাদকে মানি।

যুবক। কি বলছেন আপনি? মানে—

মেয়েটি। কি আবার বলবো আমার সঙ্গে আসুন! বিংশ শতাব্দী অনেকদূর এগিয়েছে। আমরা সভ্যতার অগ্রদূত! আপনি পেছিয়ে পড়তে পারবেন না কোনমতে; আমার কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে আসুন। বুঝলেন?

যুবক। আমার রিভলবর?

মেয়েটি। রিভলবর আর আপনার নয়,—এখন আমি আপনার। ভাগ্যের চাকা নিয়তই ঘুরছে। টেবিলে বসবেন আসুন। মুখোস-আঁটা জাগতিক সভ্যতার সঙ্গে এগিয়ে আসুন।

কন্যা (গল্প)

শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

এক

ভাণ্ডারের দরজা খুলিয়া কাত্যায়নী গৃহে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণের জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া বাহিরে তাকাইলেন। দুপুরের খররৌদ্র নারিকেল পাতার উপর পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে। লিচু গাছের বড় ডালটায় সুপ্রীতির দুলিবার দোলনার দড়িটি ঝুলিতেছে, তক্তাখানিকে কেহ খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। এ-কয়দিন সুপ্রীতি ও-দিকে যায় নাই। অলক্ষিত আগত দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়াই কাত্যায়নী আপনা-আপনিই কহিলেন, "ষাট্ ষাট্, জন্ম জন্ম বাছা আমার সেই ঘর করুক।"

সুপ্রীতি চলিয়া গিয়াছে আজ চারিদিন হইল।

সুপ্রীতির বিবাহ হইয়াছে কয়দিন হইল। মুঙ্গেরে শ্বশুরালয়ে গিয়াছে। জোড়ে ফিরিতে এখনও কয়দিন বিলম্ব আছে।

বিগত বিবাহদিনের চিহ্ন এখনও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। টিনে টিনে ভরা রসগোল্লা, ঝুড়িতে ঝুড়িতে দরবেশ, ডালায় ডালায় ভরা লুচি এখনও ফুরাইয়া শেষ হয় নাই। দাসী চাকরের জলখাবার ইহা হইতেই চলিয়াছে। উত্তরের পুকুরে যাওয়া যায় না, যজ্ঞের বড় বড় কড়া, ডেক, বালতি, টব, ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে! পুকুরটা ঘি ও তেলে যেন গাজিয়া উঠিয়াছে।

চারিদিকে উৎসবজনিত বিশৃঙ্খলা গোছ করিতে করিতে দাসী-ভৃত্যগণকে উপদেশ দিতে কাত্যায়নী আপনার নিজস্ব এই ছোট ভাণ্ডারখানিতে এ কয়দিন প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার খাস ঝি মোক্ষদা কেবল ঝাঁট দিয়া মুছিয়া গেছে।

ছোট ড্রেসিং টেবলটার উপর সুপ্রীতির ব্যবহৃত পুরাণো ফিতা, কাঁটা, স্নো, ক্রীম, চিরুণী, ব্রাস, কত কি রহিয়াছে। সস্নেহ নয়নে কাত্যায়নী সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

শুব্ধ দুপুরে ক্লান্ত দাসীভৃত্যের দল তাহাদের মহালে বিশ্রাম করিতেছে। ঠাকুরদালানে পারাবতের কূজন স্পষ্ট ধ্বনিত হইতেছে। জানালা দিয়া দেখা যায় গোশালার সম্মুখে বড়গাভীটি সদ্যপ্রসূত বাচ্চাটির গা চাটিয়া দিতেছে।

কন্যার বিচ্ছেদ-বেদনায় নীরব দুপুরে কাত্যায়নীর মনটা যেন হু হু করিতে থাকে। সতেরো বৎসরের আবেষ্টনী ছাড়িয়া তাঁহার পরম আদরের সুপ্রীতি শ্বশুর-ঘর করিতে গিয়াছে।

এই বিবাহের জন্য কত চিন্তা, কত ভাবনা, কেমন করিয়া সুপাত্র পাওয়া যাইবে? কেমন ঘরে সুপ্রীতি পড়িবে? যাহাদের গৃহে সুপ্রীতি যাইবে তাহারা কেমন চক্ষে সুপ্রীতিকে দেখিবে? ইহাই ছিল কাত্যায়নীর ইদানিংকার বিশেষ চিন্তা। তাঁহার সকল চিন্তার অবসান করিয়া সুপ্রীতি সুপাত্রে উত্তম গৃহে পড়িয়াছে। দুইহাত জোড় করিয়া কাত্যায়নী উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন।

আই, এ পড়িবার সময় সুপ্রীতিকে দেখিয়া অনিল পছন্দ করিয়াছিল। অনিল তখন এম, এ,—ল' একসঙ্গে পড়িত। তাহার পর পাশ করিয়া মুন্সেফ হইয়া এখানে বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। দুইজন দুইজনকে পূর্ব্ব হইতে চিনিত। ভালবাসার বিয়ে। একটু সলজ্জ ক্ষীণহাসি মাতার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

আজকালকার দিন। ছেলেও কলেজে পড়ে। মেয়েও কলেজে পড়ে। দর্শসাক্ষাৎ হতেই পারে! তাহার পর যদি ভালবাসিয়া বিবাহ হয়, তবে তাহা সুখের কথাই।

সুপ্রীতির বিবাহ তো এমনি করিয়াই হইল। তাঁহাদের সেকালের কথায় 'যাচা পাত্র'।

সুপ্রীতির গর্ব্বভরা আনন্দোজ্জ্বল মুখ। জামাতা যেরূপ উচ্ছসিত হাসিভরা মুখে কথা কহিতেছিলেন তাহাতে মনে হয় উভয়ে উভয়ের প্রার্থিত ছিল। তাহাদের প্রণয় যেন সুগভীর হয়।

কাত্যায়নী ভাবিলেন, তাই বলিয়া কি তাঁহাদের প্রণয় সুগভীর হইত না? তাঁহাদের প্রণয়ের বন্ধন যে বাল্যপ্রীতির সুদৃঢবন্ধনে বাঁধা।

কাত্যায়নীর মনে হয় আপনার বিবাহের কথা। সুপ্রীতি যেমন তাহার চিরপরিচিত বাল্যের গৃহ ছাড়িয়া তাহার জন্মান্তর কালের নিজের গৃহে ঘর করিতে চলিয়া গেল, তিনিও তেমনি একদা তাঁহার আবাল্যপরিচিত গৃহ, তাঁহার স্নেহময় পিতার কোল ছাড়িয়া এই গৃহে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আরো পুত্রকন্যা রহিয়াছে। কিন্তু তিনি ছিলেন সেই গৃহের একমাত্র কন্যা। পিতার বক্ষের নিধি। পিতার সে ক্রন্দন কি ভুলিবার? স্বর্গগত পিতার কথা স্মরণ করিয়া প্রৌঢ়া কাত্যায়নীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

সেই গৃহ প্রায় তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি ও তাঁহার গৃহের সকলে যেমন সুপ্রীতির অশেষ কল্যাণ কামনা করিয়া, তাহার সেই গৃহ অক্ষয় হউক চাহিয়া, আবার তাহার অদর্শন-জনিত বিরহে আচ্ছন্ন হইয়া সস্নেহে তাহার পথ চাহিয়া আছেন! তেমনি সেখানেও সেদিন তাঁহার পথ চাহিয়া তাঁহার পিতা, তাঁহার বিমাতা সবাই আকুল হইয়াছিলেন। কারণ তিনি তাঁহাদের তখন একমাত্র কন্যা।

সেই গৃহ! সেই সুদূর বিহার প্রদেশের এক অখ্যাত গ্রাম কিষণগঞ্জে তাঁহার পিত্রালয়। চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

পিতা তাঁহার জন্মের দুই বৎসর পরে গয়ায় প্র্যাক্‌টিশের সুবিধা না হওয়ায় এই অখ্যাত নির্জ্জন প্রদেশে নূতন সাবডিভিশনাল কোর্ট খোলায় ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের আশায় প্র্যাক্‌টিশ করিতে আসিয়াছিলেন। পিতার সেই আশা পূর্ণ হইয়াছিল এইখানেই তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ও সূচনা আরম্ভ হইলেও এইখানেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়

তাঁহার মাতা? কাত্যায়নী দেবীর শৈশব যেন ফিরিয়া আসে। স্নেহময়ী তাঁহার মা। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সেই সুন্দর মুখের খানিকটা আবছায়া আজও তাঁহার মনে পড়ে। মায়ের সেইরূপের অংশ কাত্যায়নী দেবীও কিছু পাইয়াছেন।

কিন্তু রূপটাইতো তাঁহার প্রধান ছিল না, তাঁহার গুণের পরিমাণ এতই বেশী ছিল যে তাহা তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্যকে অধিকতর সুষমামণ্ডিত করিয়াছিল। আজ সহসা নূতন করিয়া মাতার গুণের কাহিনী কাত্যায়নীর মনে পড়িয়া যায়।—পিতার মুখে বহুবার যাহা শুনিয়াছেন, এবং শুনিয়া শুনিয়া যাহা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

নির্জ্জন গৃহতলে বসিয়া পড়িয়া কন্যা কাত্যায়নী সেই কথাই ভাবিতে থাকেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পরই যতীন্দ্রনাথের পিতা তাঁহাদের গ্রামের এক অবস্থাপন্ন বড় চাকুরেকে ধরিয়া পুত্রের চাকুরীর চেষ্টা করিতে থাকেন। তখন যতীন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে কয়মাস। কাত্যায়নীর মাতার বয়স তখন ১৪ বৎসর।

বাল্যকাল হইতেই যতীন্দ্রনাথের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। গ্রামের আর সবাই যাহা, তিনি তাহাদের হইতে উচ্চতরপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, ইহাই ছিল তাঁহার বাসনা।

ফাষ্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা আরো সুদৃঢ় হইয়াছিল। অকস্মাৎ পিতার এই ইচ্ছা তাঁহার সেই বাসনাকে প্রবল আঘাত করিল। মাতার দ্বারা তিনি পিতাকে জানাইলেন যে তিনি আরো পড়িতে চান। কিন্তু পিতা তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি বলিলেন, "আমার দ্বারা আর পড়ানো সম্ভব নয়, একটা পাশ তো করলে, এবার কাজ করতে চাল।"

রাসভারী গম্ভীর স্বামীকে আর অনুরোধ করিতে সাহস না করিয়া মাতা পুত্রকে বলিলেন, "তুই কাজের চেষ্টাই দেখ বাবা, যা একগুঁয়ে মানুষ যা একবার বলেছেন তা সে মত তো কিছুতেই টলবে না, মিথ্যে মনকষাকষি হবে।"

যতীন্দ্রনাথ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ওই রাম, শিবে, সন্তোষ, কালুর মত চারটি ভাত কোনরকমে নাকে মুখে গুঁজিয়া হাতে খাবারের কৌটা লইয়া সকাল ৮টায় ডেলি প্যাসেঞ্জারী, এবং মাসান্তে ৩০।৩৫ টাকা ঘরে লইয়া আসা? না, না, না, তাহা হইবে না। তেমন জীবন যাপন করিব না। পকেট হইতে একমুঠা টাকা তুলিয়া কাহাকেও দিতে মনে যাহাতে কষ্ট না হয়, তেমনি উপার্জ্জন করিব। চিরদিন মূর্খ হইয়া অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন? তাহা হইবে না। ক্ষুব্ধ অপমানিত পুত্রের চিন্তান্বিত মুখের পানে সাশ্রুনয়নে চাহিয়া মাতা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

গভীর রাত্রে বালিকা বধূ মৃন্ময়ী আসিয়া বিনিদ্রস্বামীর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তুমি যদি আরো পড়া করতে চাও তবে আমার গয়নাগুলো নাও না। অনেক তো আছে? বাবা তাহলে বোধ হয় রাগ করবেন না। তুমি বলে দেখ, উনি নিশ্চয় মত করবেন।"

কিন্তু বধূ জানিত না যে তাহার গহনা শ্বশুরের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত

শ্বশুরের তাহাতে মত হইল না উপরন্তু এই প্রস্তাবে তিনি অধিকতর বিরক্ত হইলেন। যত সব পাকা ছেলে মেয়ে।

ভিতরে ভিতরে পিতা-পুত্রের মনোমালিন্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। স্বামী-পুত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া মাতা অত্যন্ত উদ্বেগে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

তাঁহার আদেশ সত্বেও পুত্র কর্ম্মের কোন চেষ্টা করে না দেখিয়া অবাধ্য পুত্রের প্রতি পিতা ক্রুদ্ধ হইতে থাকেন এবং সেই প্রচ্ছন্ন ক্রোধের উত্তাপ মধ্যে মধ্যে পুত্রের অঙ্গে বর্ষিত হয়।

মাতা অত্যন্ত অশান্তিতে থাকিয়া স্বামীকে শান্ত করেন এবং পুত্রকে সান্ত্বনা দেন।

যতীন্দ্র কোনক্রমেই কলেজে ভর্ত্তি হইতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে দিন কাটাইতেছিলেন।

হঠাৎ কয়েক মাসের মধ্যে যতীন্দ্রের জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মৃন্ময়ী তখন পিত্রালয়ে গিয়াছে, সে আসন্নপ্রসবা। যতীন্দ্রের মাতৃ-বিয়োগ হইল। এবং অসন্তুষ্ট পিতা আকস্মিক শোকের আঘাতে একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। এবং সহসা একদিন সামান্য বাক্যান্তরের ফলে পুত্রকে তীব্র কটুভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "এমন ছেলের মুখ দেখতে চাই না তুমি আমার বাড়ী থেকে বেরোও।"

অভিমানী পুত্র জন্মের মত গৃহত্যাগের সংকল্প লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। আজ তাহার মাতা নাই কে তাহাকে ফিরাইবে?

যতীন্দ্র প্রথমে যাইয়া শ্বশুরালয়ে উঠিলেন। সহসা স্বামীকে আসিতে দেখিয়া উদ্বিগ্না মৃন্ময়ী বার বার প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাহিল কি হইয়াছে।

যতীন্দ্র পিতার বাক্য ও ব্যবহারের কথা অশ্রুপূর্ণ নয়নে জানাইয়া কহিলেন, "ছোটকাজ একটা দেখে শুনে নিতেই হবে দেখছি। পড়ার স্বপ্ন আমাকে ছাড়তেই হল অবশেষে।"

মৃন্ময়ী তাহার ক্রন্দন রোধ করিতে পারিল না বলিল, 'না না তুমি তোমার জীবনের সব চেয়ে বড় সাধটিকে নষ্ট করো না। আমার যা আছে তাই দিয়ে তুমি সুরু কর তারপর দেখা যাবে "

মৃন্ময়ী তাহার সঞ্চিত প্রায় ৬০৲ টাকা আনিয়া স্বামীকে দিল।

যতীন্দ্র যেন অকূলে কূল পাইল। সেই অর্থে সে কলিকাতায় যাইয়া অনেক চেষ্টায় কলেজে সিট জোগাড় করিল, মেসের ব্যবস্থাও হইল। বিবাহে প্রাপ্ত সোনার আংটি বোতামও বিক্রয় করিতে হইল।

একমাস কাটিবার পর যতীন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে দেখিলেন তাঁহার নামে মণি-অর্ডার আসিয়াছে। প্রেরিকা মৃন্ময়ী দেবী। শ্বশুরালয় হইতে আসে নাই। অন্য ঠিকানা।

চিঠি পাইয়া যতীন্দ্র জানিলেন যে ওই ঠিকানায় হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃন্ময়ীর "সখের বাগানের" স্বামী। পাড়ার একটি মেয়ের সহিত মৃন্ময়ী "সখেরবাগান" পাতাইয়াছিল। সেই মেয়েটি উপস্থিত সিমুলপোতায় রহিয়াছে, তাহার স্বামী অফিস হইতে টাকাটা পাঠাইয়াছেন।

মৃন্ময়ী লিখিয়াছে, "টাকাটা লইতে লজ্জা করিওনা, ইহা আমার নিজের টাকা, বাবা আমায় প্রতিমাসে হাতখরচের জন্য ১০৲ করিয়া দেন। আমার মা থাকিলে তিনি তোমার ভার লইতেন। আমার তো কোনও খরচ নাই। বৃথা জমা হয়। তোমার ব্যবহারে লাগিলে সার্থক হইবে।" তোমার বাবা যতদিন না তোমায় ডাকিয়া লইবেন ততদিন সেখানে আমিও যাইব না।"

এই সাহায্য যতীন্দ্রনাথের পরম সম্বল দাঁড়াইয়াছিল। বালিকা স্ত্রীর এই সাহায্য না পাইলে জীবনে হয়ত সাফল্যলাভ সম্ভব হইত না।

কাত্যায়নীর চক্ষুর সম্মুখে খগগঞ্জের বৃহৎ অট্টালিকা, মস্ত বাগান, বাঁধানো ইন্দারা, ফলের বাগান সব ভাসিয়া উঠিল।

মৃন্ময়ী প্রায় বছর চারি পিত্রালয়ে রহিলেন। যতীন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে আসিতেন। কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সেও চারি বৎসরের হইল।

চারি বৎসর পরে ইংলিশে অনার্স সহ বি, এ, পাশ করিয়া কলিকাতার নিকটস্থ আগড়পাড়া হাই স্কুলে ৬০৲ টাকা মাহিয়ানায় চাকুরী করিতে করিতে এম, এ,—ল, পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার কর্ম্মজীবনের লক্ষ্য স্থির হইয়া গিয়াছিল, ওকালতী।

কলিকাতা সহরের প্রতিষ্ঠাপন্ন উকীলের দল যতীন্দ্রের মনে আশা জাগাইয়াছিল।

এই সময়ে প্রথমা কন্যাটির মৃত্যু হওয়ায় শোকাতুরা মৃন্ময়ীকে যতীন্দ্র নিকটে রাখিলেন।

তিন

এম, এ,—ল, পাশ করিবার পর সঙ্গে অর্থ যাহা মাষ্টারী করিবার সময় জমিয়াছিল, তাহা লইয়া তিনি গয়ায় ওকালতী করিতে গেলেন। কারণ এতদিনে তাঁহার সে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার মত সহায়সম্বলহীন জুনিয়ারের পক্ষে কলিকাতা নগরীতে ওকালতীতে বসা সমুচিত হইবে না।

তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণও পরামর্শ দিলেন বিহারে যাইতে। সেখানে এখনও সুবিধা আছে। গয়ায় আসিয়া যতীন্দ্রনাথ প্র্যাকটিস আরম্ভ করিলেন। কিছু কিছু হইতে লাগিল, একেবারে অনশনে কাটিল না, তবে তেমন কিছু সুবিধা হইল না। এই সময়ে কাত্যায়নীর জন্ম হয়। ইহার দুই বৎসর পরে কিষণগঞ্জে নূতন সাবডিভিশন্যাল কোর্ট খুলিল এবং যতীন্দ্র এইখানে চলিয়া আসিলেন। এইখানেই তাঁহার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন সুরু হইল। আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে মৃন্ময়ীর গহনা, কাত্যায়নীর গহনা নূতন জামা কাপড় হইতে লাগিল।

জমি কেনা হইল, গৃহ-নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। যতীন্দ্র-নাথের সম্মুখে রঙ্গীন জীবন।

ইতিমধ্যে মৃন্ময়ীর একটি পুত্রসন্তান হইয়া নষ্ট হইয়া গেল। এবং বৎসর না ঘুরিতেই আবার একটি কন্যা সন্তান হইল।

মৃন্ময়ী ভিতরে বড় দুর্ব্বলতা বোধ করিতেন। জ্বর প্রায় প্রত্যহই হইত। কিন্তু স্বামীকে জানাইতে অবসর পাইতেন না। স্বামী দিবারাত্র কর্ম্মের মধ্যে যেন ডুবিয়া আছেন। নূতন উৎসাহ, নূতন প্রেরণা। যে জীবন তাঁহার কাম্য ছিল, তাহা যেন অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

তাহার পর যেদিন মৃন্ময়ী সহসা অজ্ঞান হইয়া গেলেন, সে এক বিপদের দিন। সারাদিন যতীন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া ডাক্তার, ঔষধ-পত্রের, পথ্যের বন্দোবস্ত করিলেন। দিবারাত্র স্ত্রী-সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু তখন অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। ভিতরের অস্বাভাবিক রক্তহীনতা মৃন্ময়ীকে একেবারে ক্ষয় করিয়া দিয়াছে। তিলে তিলে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া অভাবের সংসারে স্বামী ও কন্যাকে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন। সুসময় আসিল যখন, তখন তাহাকে বরণ করা তাঁহার জীবনে সম্ভব হইল না।

তাহার পর একদিন প্রভাতে কাত্যায়নী দেখিলেন তাঁহার মাকে সিন্দুর আলতা পরাইয়া, ফুলসাজে সাজাইয়া সমারোহ করিয়া কোথায় যেন লইয়া চলিয়া গেল। এতলোকের আনাগোনা কাজকর্ম্ম দেখিয়া কাত্যায়নী বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর মা আর ফিরিয়া আসেন নাই। ৭ বৎসরের শিশু কন্যার "মা কোথায়'? প্রশ্নের উত্তরে পিতা অশ্রুজলে ভাসিয়া নীরবে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেন। মাতৃহীনা কন্যার প্রতি যত্নের তাঁহার সীমা ছিল না। কতদিন প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া কাত্যায়নী দেখিয়াছেন, পিতা তাঁহার মুখপানে সজলনেত্রে চাহিয়া বসিয়া আছেন। স্নানাহারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি থাকিত।

কোর্ট হইতে আসিয়া টাকাগুলি কন্যার সম্মুখে ঢালিয়া দিতেন।

আনন্দিতা বালিকা সবগুলি টাকা আপনার ফ্রকের কোঁচড়ে তুলিয়া লইয়া বলিত "সবগুলো আমার তো বাবা ?"

দুইহাতে বক্ষে টানিয়া সস্নেহে মস্তক চুম্বন করিয়া পিতা বলিয়াছেন, "সবই তো তোমার মা, তুমি যে আমাদের সব"।

পিতার অত্যধিক স্নেহযত্নেও যেন মায়ের অভাব ঢাকা পড়িত না। খেলিতে খেলিতে ক্ষুধা পাইয়া যায়, কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। মা যেমন ক্ষুধা পাইবার আগেই ডাকিয়া খাওয়াইতেন তাহা তো আর হয় না।

অকস্মাৎ কত সময় কানের কাছে সেই মিষ্টি গলা বাজিয়া ওঠে, "কাতু খাবে এস বাবা।" বুকের মাঝে না জানা কেমন এক বেদনা বোধ হয়। দুই চক্ষু দিয়া হু হু করিয়া অকারণে জল বাহির হইয়া পড়ে। অকারণ কান্নার বায়নার আবদারে পিতাকে ব্যস্ত করিয়া তোলে।

এমনি করিয়া কতদিন যে কাটিয়া গেল মনে নাই। বাবা তাঁহাকে লইয়া দেশে আসিলেন। পিতামহের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারি শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দেশে আসিতে হইল। ইতিমধ্যে পিতার সহিত যতীন্দ্রের মনোমালিন্য মিটিয়াছিল।

সেই অচেনা বাটিতে অজানা অনেক লোক রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া, পিতাকে দেখিয়া, তাহারা কত কাঁদিল, কত দুঃখ প্রকাশ করিল।

তাহার পর ক্রিয়াকর্ম্মে গোলযোগে কয়দিন গেল। ক্রমে ভীড় কমিতে লাগিল। যাহারা রহিল তাহাদের সহিত বাবার কি সব কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। বাবা প্রথমে কাঁদিলেন, তাহার পর রাগ করিলেন। অবশেষে গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

তাহার পর একদিন কাত্যায়নী দেখিলেন, পিতা তাঁহাকে কত আদর করিলেন, কত নূতন জামা পুতুল খেলনা কিনিয়া দিলেন এবং তাহার পর দুইদিন তিনি বাটিতে থাকিবেন না বলিয়া কাত্যায়নীকে লক্ষ্মী হইয়া থাকিতে বলিয়া কোথায় যেন আরো কতজনের সহিত চলিয়া গেলেন।

চার

পিতা ও নূতন বিমাতার সহিত আবার কাত্যায়নী তাঁহাদের পুরাতন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়াই যেন মায়ের কথা নূতন করিয়া কাত্যায়নীর মনে হয়। নূতন মাতার কাছে তাহা বলিতে না পারিয়া কান্নার আবদারে তাহা প্রকাশ হয়। পিতামাতার স্নেহযত্নে ক্রমে বালিকা তাহার শোক ভুলিতে লাগিল।

তখন তিনি গৃহের একমাত্র কন্যা। তখনও নূতন মাতার সন্তানাদি হয় নাই। তিনিও কাত্যায়নীকে স্নেহ করিতেন।

পিতা তাঁহার নব-বিবাহের অপরাধে হয়ত অন্তরে লজ্জিত হইয়াছিলেন। তাই মৃন্ময়ীর স্মৃতিকণাটুকু অধিকতর আগ্রহে সমাদরে বুকে করিয়া রাখিতেন। নূতন বধূও ইহার ব্যতিক্রম করিতে সাহসী হইত না।

কাত্যায়নীর বয়স যখন দশ বৎসর তখন তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। যতীন্দ্র নাথ বড় দিনের বন্ধে স্ত্রী-কন্যা সহ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। "জু" গার্ডেনে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তথায় বারাসতের জমিদার-গৃহিণীর কাত্যায়নীকে দেখিয়া ভারি পছন্দ হয়। তিনি তাহাকে বধূ করিতে চাহেন। বলেন "আমার মাকে আমি কয় বছর হ'ল হারিয়েছি, এটি আমার মা হ'য়ে আমার শূন্য ঘর পূর্ণ করবে।"

"যতীন্দ্রনাথ খবর লইয়া জানিলেন, ঘর ও বর মনের মতই। তাহার পর মহাসমারোহের সহিত প্রতিষ্ঠাপন্ন উকীলের কন্যার সহিত জমিদারপুত্রের বিবাহ হইয়া গেল। অতীতের সেইদিন ? কি সে যত্ন ? কি সে আদর ? স্নেহময়ী শাশুড়ী, শ্বশুর ও গৃহস্থ পরিজনের স্নেহ-সম্ভ্রমের পাত্রী।

ধীরে ধীরে কতদিন গত হইয়াছে। শ্বশুর-শাশুড়ী পরলোকগত হইয়াছেন। এই বৃহৎ সংসারের তিনি কর্ত্রী হইয়াছেন।

তাঁহার পিতার মৃত্যুও হইয়াছে প্রায় ১৫।১৬ বৎসর।

শ্বশুরালয়ে স্নেহ যত্ন প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়া প্রৌঢ়া কাত্যায়নী আজও অভিমানিনী নববধূ। সামান্য ত্রুটীতে তাঁহার রাগ ও দুঃখের সীমা থাকে না। সে মানভঞ্জন করিতে স্বামী অজয়নাথ ছাড়া আর কেহ সাহসী হয় না।

পিতার স্নেহ সমভাবেই ছিল। তাঁহার অসংখ্য স্নেহপূর্ণ পত্রেই তাহার পরিচয় আছে। বিমাতার পত্রেও সে আভাস যেন পাওয়া যাইত। তাই এই দীর্ঘ ১৪।১৫ বৎসর জমিদারগৃহের বৃহৎ সংসারের জটিলতা ছাড়াইয়া পিতৃগৃহে না যাইতে পারিলেও মনে মনে তিনি স্থির নিশ্চয় জানেন যে তাঁহার কন্যাত্বের স্থায়ী মর্য্যাদার যে আসন কিষণগঞ্জের সংসারে একদিন পাতা হইয়াছিল, তাহা আজও অটুট আছে। শুধু তিনি দূরে থাকেন এবং ভ্রাতারা কর্ম্মে ব্যস্ত বলিয়া তাহা শুব্ধ হইয়া আছে। তাই মাতার পত্রও বিরল সংখ্যক হইয়াছে।

পিতার মৃত্যুর সময় তাঁহাকে কিছু আলাদা করিয়া দিয়া যান নাই বলিয়া অজয়নাথ কথায় কথায় একদিন রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "দ্বিতীয় পক্ষ বিয়ে ক'রে তোমার বাবা তোমার মায়ের সব কথাই একেবারে ভুলে গেছেন, তাই তোমার কথা তাঁর মনে হ'ল না। না হ'লে ন্যায়তঃ ও সম্পত্তিতে তোমারও কিছু অধিকার ছিল।"

রহস্যচ্ছলেও পিতার বা পিত্রালয়ের নিন্দা কাত্যায়নী সহ্য করিতে পারিতেন না।

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, "কেন এত খরচ ক'রে বিয়ে দিয়েছেন, এত বড় বিরাট সম্পত্তি আমার শ্বশুরের রয়েছে, তবে আমায় দেবার দরকার কি ? তাই দেন নি। তা ব'লে কি তাঁর সম্পত্তি থেকে আমার দরকার হ'লে কিছু পাব না ? ভাইরা আমার তেমন নয়।" কথা বাড়িবার ভয়ে অজয়নাথ জবাব দেন নাই ; তবে মুখে তাঁহার আসিয়াছিল যে, "১০ হাজার কি ১৫ হাজার খরচ ক'রে বিবাহ দিলে লাখ টাকার সম্পত্তিতে ঘা পড়ে না।

মুখে বলিয়াছিলেন, 'তা বটে।'

কাত্যায়নী পিতার স্বপক্ষে আরও ভাবিতেছিলেন বলিলেন, "আমার সাধে বাবা তত্ত্ব ক'রে পাঠাতে পারেন নি ব'লে ৫০০৲ টাকা পাঠিয়েছিলেন। তা ছাড়া নানারকমে তিনি কত দিয়েছেন, সেগুলো কি দেওয়া নয় ? সামান্য সামান্য কাজে তিনি ৪০।৫০৲ এর কম কখনও দেন নি। তবে ?" অজয় নাথ রাগাইলেন না, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দিয়েছেন তো বটেই, বেঁচে যত-দিন ছিলেন, খুবই দিয়েছেন, তবে এটাও জানতেন যে, ও দেওয়া ওইখানেই শেষ হবে।"

এ সকল পুরাতন কথা। কাত্যায়নী ভাবিতেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই ভ্রাতার বিবাহ হইয়াছে, নিমন্ত্রণে যাইতে না পারিলেও তিনি ভালমত উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন এবং তাহারা পরম সমাদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছে। সেদিক দিয়া সৌহার্দ্দ্য অক্ষুন্নই আছে।

পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রথম বড় কাজ সুপ্রীতির বিবাহ। ভাইদের ও মাকে তিনি অনেক করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিন্তু দূরে থাকায় তাহারা কেহ আসতে পারে নাই। সেজন্য চিঠিপত্র দিয়াছেন নিশ্চয়, এখনও তাহা আসিয়া পৌঁছায় নাই।

পুরাতন কথা ভাবিতে ভাবিতে বর্ত্তমানে আসিয়াও কাত্যায়নীর চমক ভাঙ্গে নাই। কতক্ষণ তিনি এমনি দিবাস্বপ্ন দেখিতেন তাহার ঠিক নাই, সহসা সরকারের কণ্ঠস্বরে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল।

সরকার দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "মা, মামার বাড়ি থেকে এখনি মণি-অডার এল, ২০৲ টাকা পাঠিয়েছেন। টাকাটা কি দিদিমণির উপহার পাওয়ার খাতায় লিখে রেখে জমা করে দেবো" ?

কাত্যায়নীর বিস্ময়ে কণ্ঠ চিরিয়া প্রশ্ন নির্গত হইল, "কত" ?

সরকার লজ্জিতমুখে মৃদু কাশিয়া গলা ঝাড়িয়া হাত কচলাইয়া নতমুখে একই কথার পুনরুক্তি করিল, "আজ্ঞে ২০৲ টাকা, মা"।

হঠাৎ অজয়নাথের মৃদুহাস্যযুক্ত ব্যঙ্গোক্তি বিস্ময়হতা কাত্যায়নীর কর্ণে বাজিয়া ওঠে "দেওয়া তো বটেই তবে ও দেওয়ার এখানেই শেষ হল বোধ হয়"।

কি নিদারুণ সত্য কথা।

কিন্তু? কিন্তু পিত্রালয়ের অমর্য্যাদা ভ্রাতার হীনচিত্ততায় যে নিজের অপমান! তিনি যে সেই গৃহের কন্যা!

কাত্যায়নী ভীরুচোখে একবার চারিদিকে চাহিলেন আর কেহ সেখানে উপস্থিত কি না। তাহার পর অন্যদিকে চাহিয়া ত্রস্তকণ্ঠে সরকারকে কহিলেন, "না না, সরকার মশাই, ওটা, আর খুকীর নামে জমা করবেন না। যা পাঠিয়েছে তার ডবল করে মিষ্টি খাবার জন্য টাকাটা আজই তাদের নামে পাঠিয়ে দেবেন!"

"আর···আর আমার নামে আমার ব্যাঙ্ক থেকে কাল ২০০৲ টাকা আপনি নিজে চেক নিয়ে গিয়ে ভাঙ্গিয়ে আনবেন, বুঝলেন?'

বর্ণসঙ্কর (গল্প)

শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র

সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরী-বাড়ীর স্তূপীকৃত ইট কাঠ পাথরের অন্তরাল হইতে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে শোনা যায় মাতৃ-আহ্বান—"তারা ব্রহ্মময়ী মা"—বোঝা যায় যে চৌধুরী-বংশের সপ্তপুরুষের নিম্নতম পুরুষ শ্যামাকান্ত চৌধুরী সন্ধ্যা-পূজা সাঙ্গ করিয়া "কারণ-বারি" পান করিতে সুরু করিলেন। চৌধুরীরা পুরুষানুক্রমে শক্তির উপাসক—কারণ-বারি পান করা তাঁহাদের পক্ষে দুষ্য নহে।

চৌধুরীদের সাতমহলা বাড়ী আজ মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিরাট প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে আজ বন্য কবুতর ও চামচিকার লীলাভূমি। মাঝে মাঝে দু একটা সুবিশাল স্তম্ভ অথবা দু-একটা সুউচ্চ প্রাচীর দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতীতকালের গৌরব-স্মৃতি বহন করিতেছে। নিস্তব্ধ শ্মশানের মত বিশাল বাড়ীর ঝোপে-ঝাড়ে দিনের বেলাতেই গ্রামসিংহ আর্ত্তস্বরে ধ্যান-মৌন কালের দেবতাকে প্রশ্ন করিতে থাকে—"কেয়াহুয়া—কেয়াহুয়া"—সেই অতীত গৌরব, সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সে কি হইল? স্তূপীকৃত নক্সাকাটা ইট, কাঠ, পাথর আজ নিতান্তই ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়বস্তু।

আসে—তিনশত বৎসর পূর্ব্বেকার এই জমীদার-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দর্শনকামনায় ঐতিহাসিকেরা যে আসে না তা নয়, আসে। শ্যামাকান্ত চৌধুরীর একমাত্র সন্তান সুবিমলকান্তি এম এ পড়ে—ইতিহাসে। প্রাচীন ও পুরাতত্ত্বের উপর প্রবল অনুরাগ। এই প্রাচীন জমীদার-বংশের ইতিবৃত্ত আবিষ্কার করিয়া সভ্য জগৎকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিবার স্বপ্ন দেখে। তাই ইট, পাথরের স্তূপের ভিতর অনুসন্ধান করিয়া ফিরে তাম্র অথবা প্রস্তর ফলক—শিলালিপি। তাহার সহিত তাহার সতীর্থগণও আসে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ফটো তোলে, সত্য-মিথ্যা জড়িত প্রাচীন কাহিনী শোনে, খায়, দায় চলিয়া যায়।

একবার ছাত্রদের সঙ্গে এক অধ্যাপকও আসিলেন।

অধ্যাপককে অভ্যর্থনা করিলেন স্বয়ং শ্যামাকান্ত চৌধুরী। দুধারে কালকসুন্দ বন, মূলা আর শিয়ালকাঁটার ঝোপ, মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ—সে পথের প্রান্তে বিস্তৃত রাজপথ। কিম্বদন্তী যে সেইখানেই না কি পূর্ব্বে চৌধুরী-বাড়ীর ছিল সিংহদুয়ার। শ্যামাকান্ত চৌধুরী সেইখানে দাঁড়াইয়া অধ্যাপককে অভ্যর্থনা করিলেন। মহাসমারোহে ঘরে আনিয়া বলিলেন, "কী বা দেখতে এসেছেন—সবই গেছে। সাতমহলা বাড়ীর এইটুকুই অবশেষ। শুনিচি এইটুকুই না কি দুর্য্যোধন চৌধুরীর খাসমহল ছিল—তিনিই এই চৌধুরী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সিংহের মত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন এই দুর্য্যোধন চৌধুরী। বর্শার এক আঘাতে এক বিশাল ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়া কোন এক মোগল বাদশাহের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ বাদশা প্রাণ-দাতাকে শুধু কটিদেশের উল্কাপিণ্ডের লৌহের নির্ম্মিত তরবারি উপহার দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে এই বিস্তৃত জমিদারী জায়গীর দিয়াছিলেন।

কক্ষপ্রাচীরগাত্রে অবলম্বিত সুদীর্ঘ তরবারিখানি নামাইয়া লইয়া শ্যামাকান্ত বলিলেন, "এই দেখুন, এই সেই তরোয়াল। এই যে দামাটের ওপর বাদশার নাম পর্য্যন্ত কোঁদা রয়েছে"—দুর্ব্বোধ ভাষায় কয়েকটি অক্ষর অধ্যাপক একবার শুধু দেখিয়া তরবারি ফিরাইয়া দিলেন। সেখানিকে পুনরায় যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে গম্ভীর স্বরে শ্যামাকান্ত বলিলেন, "সেদিনকার সঙ্গে আজকের কোন তুলনাই হয় না। দুর্য্যোধন চৌধুরীর আয় ছিল শুনিচি সালিয়ানা দেড় কোটি টাকা—আর সেই জায়গায় এখন দু'হাজারে এসে ঠেকেচে। ওই যে দেখছেন"—মুক্ত বাতায়ন-পথে শ্যামাকান্ত ধ্বংসাবশেষগুলির প্রতি অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।—'হাঁ ওই যে প্রকাণ্ড চারটে থাম রয়েছে, ওখানে ছিল দুধসায়র। দুর্য্যোধন চৌধুরীর স্ত্রী ওখানকার দীঘির ঘাটে বসে দুধে করতেন স্নান। অসামান্য ছিল তাঁর রূপ, শুনিচি তখনকার লোকে দুর্গাপ্রতিমা না দেখে তাঁকে দেখতে আসত। লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল বাংলার পদ্মিনী। সে রূপ পাছে দীঘির কালো জলে ময়লা হয়ে যায় তাই দুধে স্নান করতেন। দীঘির নাম হয়েছিল তাই দুধসায়র।"

অধ্যাপক বিস্মিতভাবে শুনিতে থাকেন অশ্রুতপূর্ব্ব কাহিনী। সুবিমল গর্ব্বভরে চাহে তাহার সহপাঠীদের দিকে। পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিগাথা গৌরবকাহিনী তাহার প্রতি শিরায় শিরায় আনে উন্মাদনা, প্রতি লোমকূপে জাগায় শিহরণ। তাহার সহপাঠীরা নীরব, বিস্ময়মুগ্ধ। একজন চুপি চুপি সুবিমলকে বলিল, "অশোকের শিলালিপি আর মারাঠাদের লুপ্ত ইতিহাস নাড়াচাড়া করার চেয়ে তুই এদিকে মন দে ভাই, চট করে নাম করে ফেলবি। অজন্তার গুহার চেয়ে তোদের বাড়ীর এই স্তম্ভগুলো কম বিস্ময়ের নয়।"

শ্যামাকান্ত বলিলেন, "কিন্তু মাত্র তিন পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরীদের অচঞ্চলা মা-লক্ষ্মী হলেন চঞ্চলা। তখন গদী পেয়েছেন দুর্য্যোধন চৌধুরীর পৌত্র দুর্জ্জয়নারায়ণ চৌধুরী—তিনি এই চৌধুরী-বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। নামেও যেমন ছিলেন দুর্জ্জয়, কাজেও ছিলেন তেমনি দুর্জ্জয়। তাঁহার অত্যাচারে সমস্ত জমিদারীর ভিতর উঠিয়াছিল হাহাকার। তাঁহার ভয়ে কেহ সুন্দরী তরুণীকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে পারিত না। কি জানি কখন দুর্জ্জয়-নারায়ণের দৃষ্টি বধূটির উপর পড়ে। কাহারও গৃহে সুন্দরী কন্যা থাকিলে সে নিত্য প্রভাতে কন্যার মৃত্যুকামনা না করিয়া জল গ্রহণ করিত না। একবার কাহারও উপর দুর্জ্জয়নারায়ণের দৃষ্টি পড়িলে আর তাহার রক্ষা ছিল না। নামে, কাজে, শক্তিতে, আকৃতিতে দুর্জ্জয়, দুর্জ্জয়নারায়ণ সেই দিনই সন্ধ্যাকালে সেই তরুণীকে তাঁহার প্রমোদ-কক্ষে পাঠাইবার জন্য শিবিকা এবং তরুণীর স্বামী অথবা পিতার প্রতি হুকুমনামা পাঠাইয়া দিতেন। মহাল পরিদর্শন করিতে যাওয়া তো দূরের কথা, সামান্য পথ বাহির হইলেই দুর্জ্জয়-নারায়ণের আগে আগে বাহির হইত অস্ত্রধারী সহস্র ঘোড়সওয়ার। সব্বার পিছনে তাঁহাকে পৃষ্ঠে লইয়া দুলকী চালে দেখা দিত কালাপাহাড়—দুর্জ্জয়-

নারায়ণের প্রিয় হস্তী, মেঘের মত কালো রং, পাহাড়ের মতই বিরাট বপু, সুবর্ণমণ্ডিত সুদীর্ঘ শুভ্র দন্ত, সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে থাকিত যুদ্ধবাদ্য - দামামা, নাকাড়া, টিকারা—ডু ডুম্ ডু-ডুম্ ট্রাম্...পথচারীদের পথ ছাড়িয়া দিবার সঙ্কেত। রাজার সঙ্গে প্রজা একসঙ্গে পথ চলিতে পারে না। আজিও লোকে দুর্জ্জয়নারায়ণের নামে ভয়ে শিহরিয়া উঠে।"

"তখন বাংলার নবাব বৃদ্ধ আলীবর্দ্দী খাঁ। বর্গীর অত্যাচারে সারা বাংলা সন্ত্রস্ত। অমন যে দুর্জ্জয়নারায়ণ তিনিও মারাঠা দস্যুদের ভয়ে তাঁহার যাবতীয় ধনরত্ন লুকাইয়া ফেলিলেন। কোথায় যে রাখিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তাহার কোন সন্ধান বলিয়া যাইতে পারেন নাই। সেই চৌধুরীদের পতন আরম্ভ হইল। অপরিমিত ধনরত্নের অভাবে চৌধুরীদের পূর্ব্বকার জৌলুশ আর কিছুতেই ফিরিয়া আসিল না।"

বিস্ময়-মুগ্ধ অধ্যাপক একমনে শুনিতেছিলেন। চোখের সামনে ভাসিতে-ছিল, অতীত যুগের অলিখিত ইতিহাস। গোলাকার আকাশচুম্বি গম্বুজের উপর নিশীথ রাত্রে দূরবীক্ষণ যন্ত্রহস্তে বসিয়া জ্যোতির্বেত্তা করিতেছেন, গ্রহ তারাপুঞ্জের সংখ্যা আয়তন নির্ণয়, দুধসায়র বাপীতটে শত সুন্দরী তুলিয়াছে আনন্দের কল-উচ্ছাস ··সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকারে কোন এক সুন্দরী হত-ভাগিনীকে দুর্জ্জয়নারায়ণের প্রমোদ-কক্ষে আনিবার জন্য নিঃশব্দে চলিয়াছে, কিংখাপে আবৃত শিবিকা...রাজপথে চলিয়াছেন দুর্জ্জয়নারায়ণ·· আগে পিছে সহস্র অস্ত্রধারী যোদ্ধা···বক্ষধমনী প্রবাহকে শীতল করিয়া তাঁহার রণ দামামা বাজিতেছে—ডু ডুম্ ট্রাম্—

শ্যামাকান্ত বলিলেন, "তবে তাঁর একটা গুণ ছিল। তিনি ছিলেন মস্ত তান্ত্রিক"-- বিস্মিত অধ্যাপক বলিলেন, "তান্ত্রিক?" গর্ব্বভরে শ্যামাকান্ত বলিলেন, "হ্যাঁ, এমনি যা তা ক'রে সাধনা করেন নি, রীতিমত পঞ্চমকার দিয়ে করতেন উপাসনা, এমন কি পঞ্চ-মুণ্ডির আসনে পারতেন বসতে। আর চেহারা ছিল কি ··হঠাৎ দেখলে, কাপালিক ব'লে মনে হ'ত। ওই যে দেয়ালের গায়ে ছবি দেখচেন—ওই তাঁর ছবি—"

অধ্যাপক ফিরিয়া দেখিলেন। সত্যই কাপালিক বলিয়া ভ্রম হয়। প্রকাণ্ড দেহ ··মাথায় সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ...মুখমণ্ডলে দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজী দ্বারা আচ্ছন্ন, পরিধানে রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র...গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। শ্যামাকান্তের কেশ বেশও সেইরূপ। অধ্যাপক একবার ছবির দিকে, একবার শ্যামাকান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তিনিই আপনার আদর্শ।"

শ্যামাকান্ত হাসিলেন, ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলিলেন, "ওই চেহারাতেই যা দেখচেন নয়তো সাধনার দিক থেকে আমি তাঁর পায়ের ধুলোর যোগ্য নই। একটু আধটু চর্চ্চা করি নয়তো তাঁর আসন গুলোতো আজও রয়েছে, আমার সাধ্য কি যে তাতে বসি।"

"কেন পারেন না।"

"আছড়ে মেরে ফেলবে না!"

প্রকৃত সিদ্ধ সাধক ভিন্ন কেহ সে আসনে বসিতে পারে না। বসিতে ভয় পায়। এমন কি সময় সময় আসনোপবিষ্ট ব্যক্তির প্রাণ পর্য্যন্ত আসন ভিতরস্থ নরকরোটির অশরীরী আত্মাদ্বারা নিহত হয়। বসিতে না পারার কারণটুকু ব্যক্ত করিয়া শ্যামাকান্ত বলিলেন,—তিনি নিজে হতে বসতে পারেন নি। প্রথম দিন আসনে বসবার সময় তাঁর গুরুদেব তান্ত্রিকাচার্য্য নিগমানন্দ আগমবাগীশ তাঁর মাথা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন—

অধ্যাপক একমনে শুনিয়া যান। মনে মনে হয়ত অবিশ্বাসের রেখাও আসিয়া পড়ে। ইতিহাসের অধ্যাপক তিনি—প্রত্নতাত্ত্বিক তিনি। শিলা-লিপির পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ লেখ পাঠ করিয়া বলিতে পারেন সেখানি কোন রাজার আমলের শিলালিপি, তাম্রফলক হাতে লইয়া বলিতে পারেন সেখানি কাহার অনুশাসন। ত্রি-শক্তির তত্ত্ব তাঁহার কাছে দুর্ব্বোধ বিষয়। তথাপি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আসন দেখাতে পারেন—যাকে আমরা দেখতে পারি—?"

"স্বচ্ছন্দে—আসুন আমার সঙ্গে।"

তৃণ-গুল্মলতা-আচ্ছাদিত শুঁড়িপথ। সে পথ দিয়া আগে আগে চলিলেন শ্যামাকান্ত, পিছনে অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ, সকলের পশ্চাতে সুবিমল। বনের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারিতে থাকে প্রাচীন শিল্পকলা—স্থপতিবিদ্যা···প্রাচীন সভ্যতার ইতিবৃত্ত। তারি চতুর্দ্দিকে ছাগলের নাদি, আর গরুর চোনার আল্পনা। ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরাল থেকে মানুষের মল করে সুগন্ধ বিস্তার।

একটা নাতিউচ্চ কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভের নিকট আসিয়া অধ্যাপক বলিলেন, "এটা কি কোন স্মৃতিস্তম্ভ?"

শ্যামাকান্ত হাসিলেন, বলিলেন "হ্যাঁ তা স্মৃতিস্তম্ভ বলতে পারেন। তবে এও সেই দুর্জ্জয়নারায়ণেরই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের স্মৃতিচিহ্ন। বিদ্রোহী প্রজার কণ্ঠকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন--পাষাণ-স্তম্ভের অন্তরালে লোকটার হয়েছিল জীবন্ত সমাধি।"

"হুঁ"—বলিয়া অধ্যাপক অগ্রসর হন।

শ্বেতপাথরের তৈয়ারী কয়েকটি বেদী। প্রত্যেক বেদীর চারিদিকে পাথরের তৈয়ারী জবার কেয়ারী সার্দ্ধ দুই শতাব্দীর প্রচণ্ড আঘাতে জবাগুলির দল ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু বর্ণ বিবর্ণ হয় নাই। শ্যামাকান্ত বলিলেন, "এই সেই আসন"—আসনের মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক বলিলেন, "ওখানটা অমন কালো কেন?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া শ্যামাকান্ত বলিলেন, "মানে চতুর্বর্ণের চারটি পুরুষের করোটি, আর মাঝখানে দিতে হয় এক ব্যভিচারিণী চণ্ডাল রমণীর করোটি— ওটি, সেইটি।"

অধ্যাপক বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যান। শতাব্দীর অন্তরাল হইতে শুনিতে পান শতশত হতভাগ্যের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, চোখের সামনে ভাসিতে থাকে স্কন্ধহীন কবন্ধের প্রতিমূর্ত্তি···সদ্যচ্ছিন্ন স্কন্ধদেশ বহিয়া ঝরিতেছে রক্তধারা ··

··· ··· ···

বিদায়কালে অধ্যাপক বলিলেন, "বুঝলে সুবিমল, ওই কালো পাথরের স্তম্ভটার ওপর আমার সন্দেহ হয়। সত্যিই হয়তো ওটার ভেতর কাউকে সমাধিস্থ করা হয় নি। আমার বিশ্বাস ওটার ভেতর এমন কিছু গুপ্ত-ভাবে রাখা হয়েচে, যা আবিষ্কৃত হলে একটা মস্ত ওলটপালট হয়ে যাবে। খুব সম্ভব দুর্জ্জয়নারায়ণ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ওইখানেই লুকিয়ে রেখেচেন। লোকের মনে ধাঁধা সৃষ্টি করবার জন্যে একটা মিথ্যা গল্প প্রচার করেছিলেন, কথাটা মিথ্যা নাও হইতে পারে। সুবিমল লাফাইয়া উঠিল! সপ্ত পুরুষের বিপুল ঐশ্বর্য্যসম্ভার তাহার করায়ত্ত না হইলেও এমন কিছু উহার ভিতর হইতে আবিষ্কৃত হইতে পারে যাহা অখ্যাত তাহাকে লইয়া যাইবে খ্যাতির উচ্চ শিখরে। হয়ত বাংলার ইতিহাসের বর্গীর হাঙ্গামার পৃষ্ঠাখানি আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইবে। শ্যামাকান্তের কাছে এই স্তম্ভ ভাঙ্গি-বার অনুমতি চাহিল।

শ্যামাকান্ত অনুমতি দিলেন। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহলও বড় কম নয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে গাঁতি হাতে আসিল পাথরকাটার দল। সুবিমল তাহাদের কাজে লাগাইয়া দিয়া অনতিদূরে একটা প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদীর উপর বসিয়া থাকে মুখেচোখে তাহার খেলা করিতে থাকে আশা ও উৎসাহের দীপ্তি।

প্রস্তর স্তম্ভ—লোহার গাঁতির আঘাতে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে। অব্যক্ত আর্ত্তনাদের মত একটানা একটা শব্দ উঠিতে থাকে—ঢং-ঢঙা-ঢং সুবিমলের অন্তরে ধমনীর স্পন্দন বাড়িতে থাকে। মনে হয় গুপ্ত স্থান হইতে লুপ্ত ইতিহাস তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

পাথর খুলিল। একখানা, দুইখানা—তারপর সবটা। কিন্তু সবটা খুলিয়া পড়িতেই পাথরকাটার দল আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সুবিমল ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে—কি"—তাহারা শুধু হাত তুলিয়া দেখাইয়া দিল।

প্রস্তর স্তম্ভের অন্তরে এক শৃঙ্খলাবদ্ধ কঙ্কাল। তাহার পদতলে মেহগিনি কাঠের তৈয়ারী একটা বাক্স এবং কালো শণের মত কতকগুলা কি! সুবিমল আগ্রহ সহকারে বাক্সটি তুলিয়া লইল। আড়াই শত বৎসরের অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় জীর্ণ বাক্স সহজেই খুলিয়া যায়। ভিতর হইতে বাহির হইল তুলট কাগজের একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। তাহাতে বড় বড় পরিষ্কার অক্ষরে কি যেন লেখা। সুবিমল পড়িতে লাগিল।

... ...

আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বকার এক ঘন দুর্য্যোগময়ী বর্ষণমুখর রজনীর লিখিত ইতিহাস—লেখক স্বয়ং দুর্জ্জয়নারায়ণ চৌধুরী। সুবিমল পড়িতে থাকে—আমার রক্ষিতা চণ্ডালিনী যখন সন্তান প্রসব করিয়া মারা গেল, তখন সেই দুর্য্যোগময়ী গভীর নিশীথে আমি একাকী সত্যই বিপদে পড়িলাম। প্রথম চিন্তা কি করিয়া নিজের এই দুরপনেয় কলঙ্ক গোপন করিব—দ্বিতীয় চিন্তা কি করিয়া এই সদ্যজাত শিশুর প্রাণ রক্ষা করিব। উপায়ান্তর না দেখিয়া গুপ্ত পথে প্রাসাদে ফিরিলাম। সেখানে আসিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলাম। গৃহিণী মৃত সন্তান প্রসব করিয়া অচৈতন্য পার্শ্বে তাঁহার প্রিয় পরিচারিকা যমুনা। গৃহিণী মৃতবৎসা—তাঁহার একটি সন্তানও জীবিত নাই। তিনি অন্তঃসত্ত্বা তাহা জানিতাম, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক আজই এই সময়ে প্রসব করিলেন। বুঝিলাম ইহা মা ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছা। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার কর্ত্তব্য স্থির করিলাম। সেই মৃত শিশুকে লইয়া যমুনাকে আমার অনুসরণ করিতে বলিলাম। তারপর গুপ্ত পথে পুনরায় প্রমোদ-কক্ষে ফিরিয়া গিয়া মৃতা চণ্ডালিনীর পাশে সেই মৃত শিশুকে রাখিলাম; আর তাহার সদ্যজাত সন্তানকে লইয়া গেলাম মূর্চ্ছিতা গৃহিণীর শয্যা-পার্শ্বে। কেহ সে কথা জানিল না। জানিলাম শুধু আমি—যমুনা আর ভগবান বলিয়া যদি কেহ থাকেন তো তিনি। আমি একথা কাহাকেও বলিব না—ভগবান্ নির্ব্বাক্—কিন্তু যমুনা? তাই রাত্রির অবসান হইবার পূর্ব্বে তাহার কণ্ঠকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করিয়া দিলাম, এই পাষাণ-স্তম্ভের অন্তরালে। আর এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম—ভবিষ্যতে কেহ এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে এই আশায়। ব্যাভিচারিণী চণ্ডাল-রমণীর মস্তক নিক্ষেপ করিলাম, আমার পঞ্চমুণ্ডির আসন মধ্যে। পরদিন প্রভাতে সকলে শুনিল গত রাত্রে আমার পুত্র সন্তান লাভ হইয়াছে। মহাসমারোহে নবজাত পুত্রের নামকরণ সম্পন্ন হইল। শিশুর নাম হইল—রাবণেশ্বর চৌধুরী—"

... ...

পড়া শেষ করিয়া সুবিমল ডাকিল—বাবা—

অন্দর মহল হইতে শ্যামাকান্ত উত্তর দিলেন, কিরে বেরুল নাকি কিছু—বলিয়া, "তারা ব্রহ্মময়ী"—নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পুত্রের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুবিমল নত মস্তকে তাঁহার হাতে সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকা তুলিয়া দিল। বিস্মিত শ্যামাকান্ত সুবিমলের হাত হইতে তাহা লইয়া পড়িতে সুরু করিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখে কৌতুহল ও আগ্রহের ভাব দেখা দিল। তারপর ক্রমশঃ তাঁহার মুখ গম্ভীর ও আরক্ত হইয়া উঠিল। পড়া শেষ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে প্রস্তর স্তম্ভেরদিকে আগাইয়া গেলেন। একবার শৃঙ্খলাবদ্ধ কঙ্কালের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর কঙ্কালের পাদমূলে পতিত ধূসর "শন"গুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেশ বুঝা যায় রমণীর কেশরাশি। সুদীর্ঘ কালের অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় আজ ধূসর-বিবর্ণ, কিন্তু একদিন তাহা ঘন কুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ ছিল। শ্যামাকান্ত ফিরিলেন। গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—ব্যাভিচারিণী চণ্ডালিনীর সন্তান, রাবণেশ্বর চৌধুরী—চৌধুরী বংশের চতুর্থ পুরুষ...হুঁ...তিনি আমার প্রপিতামহ—বলিয়া খটখট করিয়া খড়মের আওয়াজ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। সে শব্দ চৌধুরী বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যেন কোন এক অশরীরী ব্যঙ্গভরে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, 'হা-হা-হা"।

সুবিমল স্থাণুর মত বসিয়া থাকে। ইতিহাস—প্রাচীন সাক্ষী—অতীত কালের মৌনদেবতা—কথা কও। একবার বল যে, ইহা মিথ্যা। তুমি সত্য—মৃত্যুর মতই সত্য কিন্তু কিছুতেই তোমাকে আলোকের সম্মুখে প্রকাশ করা যায় না। যে অভিশপ্ত আত্মা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পাষাণ প্রাচীর অন্তরালে অবরুদ্ধ থাকিয়া গুমরিয়া মরিতেছিল, সে আজ সহসা যেন মুক্তি পাইয়া কোষমুক্ত শাণিত তরবারির আঘাতে চৌধুরী-বংশের মিথ্যা গর্ব্বকে ধূলিম্লান করিয়া বিজয়োল্লাসে অট্টহাসি হাসিতেছে।

দূরে সুবিমলের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, পাথরকাটার দল। বিস্মিত, কিন্তু স্থির; অচঞ্চল...যেন সারিবদ্ধ কালো গ্র্যানাইটের তৈয়ারী গ্রীক ভাস্করের খোদাই করা মূর্ত্তি। সুবিমল মাথা তুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিতেও পারিল না।

পাশাপাশি (গল্প)

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

ফুল আর কাঁটার ভিতরে যতই অসঙ্গতি থাক' না কেন, প্রকৃতির রাজ্যে এক সাথে তাদের দর্শন পাওয়াও দুর্লভ নয়, এক শাখাতেই তো থাকে গোলাপ আর কাঁটা; যে মৃণালে পদ্ম ফোটে কাঁটাও তো থাকে সেই মৃণালে।

তাই ত্রিতল অট্টালিকার পাশে ছোট খোলার ঘরখানা নিতান্ত বেমানান হ'লেও, পরস্পর থেকে খুব দূরত্ব রক্ষাও তারা করে নি। তবু পাছে বা ত্রিতলবাসীদের চোখে নিঃস্ব ঘরখানির অন্তর্নিহিত দৈন্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যায়, সেজন্যই বোধ হয় ওর দরজা-জানালাগুলোকে তৈরী করা হয়েছিল যথাসম্ভব ক্ষুদ্র আকারে; আর সে নিজে,—তারই চোখের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো ঐশ্বর্য্যের ওই বিরাট প্রতীকের সঙ্গে তুলনায় আপনার দারিদ্র্যকে বিশেষভাবে উপলব্ধি ক'রে লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল।

এই দুটী বাসস্থলের মত এদের অধিবাসীদের মধ্যেও ছিল আকাশ-পাতাল ব্যবধান, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উভয় স্থানের অধিবাসীদেরই ছিল কর্ম্মের উপযুক্ত দুটী বাহু আর অনুভবের উপযুক্ত একটী হৃদয়। প্রাসাদের অধিবাসিগণ এই অসামঞ্জস্যের লজ্জা ঘুচাবার জন্যই বোধ হয় বেশভূষায়, আহারে-বিহারে এবং কথাবার্ত্তায় কুটীরবাসীদের সঙ্গে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য যথাসম্ভব বজায় রেখে চলত!

কুটীরবাসী মজুরটী যখন দিনের পরিশ্রমের পর অপরিচ্ছন্ন দেহ আর শ্রান্ত মন নিয়ে ঘরে ফিরত, তখন প্রাসাদের অধিবাসীরা সাবানমাখা ও পাউডারঘসা দেহে নিজেদের মূল্যের চেয়ে মূল্যবান্ পোষাক এঁটে সেখান দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে যাবার সময় যেন একথাই প্রমাণ করে যেত যে, কুটীরবাসী আর প্রাসাদবাসীদের

মধ্যে পার্থক্য ওই কুটীর আর প্রাসাদের মতই দুর্লঙ্ঘ্য। কুটীর-বাসীরাও তাদের প্রতিবেশীদের প্রতি বিস্মিত ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে কথা যেন নীরবেই মেনে নিত, জানত না তারা যে বিধাতার সৃষ্ট মানুষে মানুষে প্রভেদ নেই—প্রভেদ মানুষেরই সৃষ্ট প্রাসাদে ও কুটীরে।

প্রাসাদ আর কুটীর! কাছাকাছি থেকেও তারা পরস্পর থেকে কত দূরে।···রোজ ভোরবেলা প্রাসাদের একটী সুপ্রশস্ত কক্ষে একখানি টেবিলের সম্মুখে বসে স্বামী-স্ত্রী যখন প্রাতরাশের আনন্দ উপভোগ করে তখন কুটীরের অধিবাসী মজুরটী নুণ দিয়ে চারটী পান্তা খেয়ে তার দিনমজুরীতে বেরিয়ে যায়, আর রাত্রে প্রায়ই যখন তাড়ি খেয়ে মাতাল হয়ে এসে বউকে ধরে আচ্ছা করে ঠেঙ্গানি দেয় তখন প্রাসাদের আলোকোদ্ভাসিত কক্ষে রেডিওতে গান জাগে—"আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে"···

প্রাসাদের মহিষী সুমিত্রা। আর লক্ষ্মী? সে-ও তার কুটীর-রাজ্যের রাণী বই কি!···মাঝে মাঝে তেতলার ঘরে যখন নূপুরের শব্দ জেগে ওঠে, লক্ষ্মী কৌতূহলী হয়ে তার ছোট্ট জানালাটীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—তেতলার উন্মুক্ত জানালার পানে তাকিয়ে থাকে। নৃত্যরতা সুমিত্রার দেহখানি এক একবার জানালার ভিতর দিয়ে দেখা যায়, পরক্ষণেই আবার আড়ালে চলে যায় নৃত্যের তালে তালে। লক্ষ্মী মনে মনে ভাবে স্বর্গ কি ওই প্রাসাদের চেয়েও দুর্লভ, দেবকন্যা কি নৃত্যরতা ওই তরুণীর চেয়েও সুখী?

সুমিত্রা আর লক্ষ্মী দুজনেই কাঁদছিল। সুমিত্রা কাঁদছিল মূল্যবান্ খাটের বুকে বিস্তৃত ততোধিক মূল্যবান্ বিছানার উপর এলিয়ে পড়ে। দু'হাতে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে সে কাঁদছিল। ক্রন্দনের বেগে পরিধানের মূল্যবান্ শাড়ীর ভাঁজগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল—এলো খোপাটা ভেঙ্গে সুগন্ধে ঘর গিয়েছিল পূর্ণ হয়ে।

লক্ষ্মীও কাঁদছিল। ঘরের মাঝে পা ছড়িয়ে বসে বেশ শব্দ করেই সে কাঁদছিল। কিন্তু তার কান্নার শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছিল কোলের শিশুটীর সুউচ্চ ক্রন্দনের রোলে।

সুমিত্রা কাঁদছিল স্বামীর উপর তীব্র অভিমানে। শুধু অভিমানই বা কেন দুঃখও তার অপরিসীম। নারীর জীবনে যে আঘাত সব চেয়ে মর্ম্মন্তুদ সুমিত্রা সেই আঘাতই আজ পেয়েছে। ধীরে ধীরে মাথা তুললে সুমিত্রা। অশ্রুধারা হিমানীশুভ্র গালের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে 'লিপ্‌ষ্টিক্'-মাখানো ঠোঁট স্পর্শ করেছে। হাতের কোমল রুমালখানা দিয়ে সাবধানে সে অশ্রুধারা মুছে ফেললে।

কিন্তু অশ্রুধারা মানে কই। তার প্রতি স্বামীর ভালবাসা যে কতটুকু সে পরিচয় আজ সুমিত্রা পেয়েছে। পেয়েছে বৈ কি! নইলে তার এত অনুরোধ তিনি কেমন করে উপেক্ষা করলেন। স্বামীর সত্যিকার ভালবাসা সুমিত্রা পায় নি। তার প্রতি স্বামীর এত আদর-যত্ন, তাঁর সপ্রেম বাণী ও সস্নেহ ব্যবহার সবই ছলনামাত্র—সবই প্রবঞ্চনা।

কারণটা গুরুতর। বহুদিন থেকেই বন্ধু বাসন্তী সুমিত্রাকে অনুরোধ জানাচ্ছিল তার ওখানে ওকে একবার যাবার জন্যে। দু' তিন দিন নানা উপলক্ষে নিমন্ত্রণও করেছিল তাদের। কিন্তু স্বামীর সময়ের অভাবেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারার অভদ্রতা সুমিত্রাকে স্বীকার করতে হ'য়েছে। বাসন্তী সুমিত্রার সহপাঠিনী। বিয়ের পর এক সহরে থাকা সত্ত্বেও উভয়ের দেখা হয় নি আর।

সেদিন সকালে অপ্রত্যাশিতভাবে বাসন্তী এসে সুমিত্রাকে বিস্মিত ও আনন্দিত করে দিলে। প্রাথমিক অভ্যর্থনা সাঙ্গ হলে সুমিত্রা বললে, "একা আসিস্ নি নিশ্চয়। সঙ্গের ভদ্রলোকটীকে কোথায় রেখে এলি?"

বাসন্তী আঙ্গুল দিয়ে মোটরের দিকে দেখিয়ে দিলে হেসে বললে, "গাড়ী পাহারা দিচ্ছেন।"

"আর গাড়ী পাহারা দিয়ে কাজ নেই—গাড়ীর অধিকারিণী-টীকেই এসে পাহারা দিন। আমি ওকে পাঠাচ্ছি ডেকে আনবার জন্যে।"

চা খাওয়া উপলক্ষ করে সকলে টেবিল ঘিরে বসে হাসিকলরবে আনন্দ-পরিহাসে আবহাওয়াকে মধুময় করে তুলল।

বাসন্তী বললে, "আমাকে একেবারেই ভুলে গেছিস সুমি, অবশ্য ভোলারই কথাই।" ব'লে সুমিত্রার স্বামীর দিকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলে।

সুমিত্রার ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির ঈষৎ আভা সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবার আগেই সে বললে, "ভুলে গেছি এ খবর তোকে কে দিলে?"

"সে জানাই যায়"—বাম ভ্রূ কুঞ্চিত করে বাসন্তী বললে, "তিন দিন নেমন্তন্ন করলুম, অনুরোধ জানালুম, গাড়ী পাঠিয়ে দিলুম, তবু একদিনও তোর দেখা মিললো কি? অগত্যা আমাকেই আসতে হ'ল। অবশ্য বিয়ে করলে সবাই একটা করে স্বামী পায়, কিন্তু তোর মত বন্ধুদের কেউ বিসর্জ্জন করে বলে জানা নেই।"

সুমিত্রার স্বামী সাহিত্যিক। তিনি বাসন্তীদেবীকে লক্ষ্য করে বললেন, "এটা কি জানেন? 'ভুলে থাকা, নয় তো সে ভোলা, বিস্মৃতির মর্ম্মে বসে রক্তে মোর দিয়েছে যে দোলা'।"

বাসন্তীর স্বামী অঙ্কের প্রফেসর। কবিত্বের চেয়ে হিসাব-নিকাশটাই তিনি বোঝেন ভাল, তাই বললেন, "আমাদের যুগল আগমনের সম্মান রক্ষার জন্যে আপনাদের কিন্তু একবার যুগল-মূর্তিতে return visit দেওয়া উচিত।"

সুমিত্রা সাগ্রহে বললে, "নিশ্চয়! দেব বৈ কি। আচ্ছা আসছে রোববার বিকেলেই—কি বল?" বলে সুমিত্রা স্বামীর অনুকূল উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

স্বামী হেসে সম্মতি দিলেন, "বেশ তো! এতে আর আপত্তি কি আছে।"

নির্দ্দিষ্টদিনে যথাসময়ে সাজসজ্জা সেরে দু'জনে যখন বাইরে যাবার উপক্রম করছে এমনি সময় টেলিফোনের ঘণ্টা সহসা বেজে উঠল। সুমিত্রা স্বামীর টেলিফোন ধরার ফাঁকে আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে সাজসজ্জাটা আর একবার যাচাই করে নিতে লাগল।

স্বামী ফিরে এসে ম্লান মুখে বললেন, "একটা বড্ড ভুল হয়ে গেছে, মিত্রা।"

জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাতেই স্বামী বললেন, "আজ সন্ধ্যায় আমাদের একটা বিশেষ জরুরী সাহিত্যসভা হবার কথা আছে।

আমি একেবারেই ভুলে ছিলাম, ওরা টেলিফোঁতে জানালে যে সবাই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

"তুমি জানিয়ে দিয়েছ যে যেতে পারবে না?"

"তা হয় না সুমিত্রা। আমি আগেই ওদের কথা দিয়েছিলাম, আমার ভরসাতেই বিশেষ করে এ সভার আয়োজন হচ্ছে। আমি না গেলে সবই নষ্ট হয়ে যাবে।"

"তাহ'লে কি করতে চাও?" সুমিত্রার নয়নকোণে প্রশ্নময় দৃষ্টি।

"আমাকে যেতেই হবে। তুমি কিছু মনে করো না মিত্রা আজ না হয় তুমি একাই যাও, আর একদিন দুজনে যাওয়া যাবে। কি করি বল? আগেই কথা দিয়ে ফেলেছি!"

"আর আমার কথার কি একটা দাম নেই?" সুমিত্রার আহত কণ্ঠ করুণ তীব্রতায় ছড়িয়ে পড়ল, "বাসন্তীকে কথা দিয়েছি, এখন যদি না যাই কি লজ্জার বিষয় হবে ভেবে দেখেছ?"

"ভেবেই বলছি মিত্রা, আমি সভায় না গেলে তার চেয়েও বেশী লজ্জার কারণ হবে।"

সুমিত্রা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। জড়োয়া গহনা আর জর্জ্জেট শাড়ী যেন ঝিকিমিকি হাস্যে তাকে বিদ্রূপ করছিল।

সুমিত্রা কাঁদবে না তো কি? তার সম্মান, তার অনুরোধ অপেক্ষা স্বামীর কাছে বড় হ'ল সাহিত্যসভা ও বন্ধুদের সাহচর্য্য। তার প্রতি স্বামীর এতদিনকার ভালবাসা সকলি অভিনয়, সকলই ছলনা! আবার বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল সুমিত্রা।

লক্ষ্মী কাঁদছিল ক্ষুধায়। নিজের ক্ষুধার জ্বালায় ততটা নয়—যতটা ক্ষুধার্ত্ত শিশুর নিষ্ফল ক্রন্দনের বেদনায়।

সকাল বেলা সেই যে পান্তা খেয়ে লক্ষ্মীর স্বামী দিনমজুরীতে বের হ'ল—সে-দিন সারা দিনরাত্রি এবং পরদিন সমস্তটা দিনেও আর তার দেখা মিলল না। ঘরে খাবার কিছুই ছিল না, কিন্তু ক্ষুধা-দানব সে-জন্য বিন্দুমাত্র দয়া প্রকাশ তো করলেই না বরং উপহাসের সুযোগ বুঝে যেন আরও প্রবলভাবে নিজের শক্তি প্রকাশ করতে লাগল। লক্ষ্মী সহ্য করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু শিশুটা কেঁদে সারা হ'ল। বুকে স্তন্য তার শুকিয়ে গেছে, তবু শুষ্ক স্তনটা শিশুর মুখে দিয়ে সে তাকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু সেও কি সম্ভব! এমনিভাবে সারাদিন কেটে গেলে, লক্ষ্মীর মনে পড়ল—একটা সিকি সে খোকার জন্য মানৎ ক'রে লুকিয়ে রেখেছিল। ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে লক্ষ্মী উঠে পড়ল, কিছুক্ষণ খুঁজে পেতে বের ক'রে আনল সিকিটাকে। কিন্তু এ যে মানতের সিকি! যদি খোকার কিছু অমঙ্গল হয়। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি আছে, খোকা যে না খেতে পেয়েই মরে যাবে। সিকিটা হাতে নিয়ে সে বের হবার উপক্রম করল। নিজের জন্য কিছু ভাবে না সে, কিন্তু খোকার জন্যে একটু দুধ তাকে কিনে আনতেই হবে।

সহসা ঝড়ের মত তার স্বামী এসে ঘরে ঢুকল। চোখ দুটো রক্তবর্ণ—চুলগুলো রুক্ষ—এলোমেলো—সে এক ভয়াবহ মূর্ত্তি। লক্ষ্মী মুহূর্ত্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল, পরক্ষণেই চিৎকার ক'রে বললে—"হ্যাঁ গা, তোমার আক্কেলখানা কি রকম? দু'দিন ধ'রে কোথায় ছিলে? ছেলেটা যে না খেয়ে আধমরা।"

স্বামী সে কথার জবাব না দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললে—"কোথায় যাচ্ছিলি তুই?"

স্বামীর মেজাজে লক্ষ্মী অবাক্ হ'ল, বললে, "ছেলের জন্য দুধ আনতে।"

"পয়সা বের কর, আমার দরকার আছে," বললে স্বামী,—তার চোখ দুটোতে ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি। দরকার তার সত্যিই ছিল। দু'দিন ধ'রে সে কিছুই রোজগার করতে পারে নি, তাড়িও খেতে পায় নি এক ফোঁটা।

"আমি পয়সা কোথায় পাব?" লক্ষ্মী সিকিটা লুকোতে চেষ্টা করলে।

স্বামী গর্জ্জন ক'রে উঠল, "ছেলের জন্য দুধ আনতে যাচ্ছিলি; পয়সা ছাড়া কোন্ বাপ তোকে দুধ দিত শুনি। দে বলছি, আমার মেজাজ ভাল নেই।"

রকম দেখে লক্ষ্মী ভয় পেল, বললে, "ভিক্ষে মেগে আনতুম, পয়সা কোথায় পাব!"

কিন্তু স্বামীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রয়োজনীয় পদার্থটার সন্ধান পেয়েছিল। এগিয়ে গিয়ে সে লক্ষ্মীর হাত চেপে ধরল, বললে, "এখনো দে বলছি।"

লক্ষ্মী হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রে বললে, "ছাড়ো ছাড়ো, ছেলে মরে যাচ্ছে—আর তুমি চাইছ তাড়ি খাবার পয়সা।"

পাগলের মত হেসে উঠল শিশুর পিতা। জোর ক'রে সিকিটা ছিনিয়ে নিয়ে আবার ঝড়ের মতই সে বের হ'য়ে গেল। তার প্রবল ধাক্কায় উপবাসক্লিষ্ট লক্ষ্মী যে শক্ত মেঝের উপর সজোরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা সে লক্ষ্যও করলে না।

উঠে বসে মেঝে পা ছড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্মী কাঁদলে। আঘাত পেয়ে কপালটা তার ফুলে উঠেছিল, তবু কেটে গিয়ে রক্ত বেরোয় নি। শিশুটা কাঁদছিল অবিশ্রান্তভাবে, কাঁদতে কাঁদতে গলা যেন তার ধরে এসেছিল।

হঠাৎ কি মনে হল লক্ষ্মীর। ছেলেটাকে বুকে নিয়ে সে ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়ল, টলতে টলতে দাঁড়ালো গিয়ে ওই ত্রিতল প্রাসাদের কাছে। মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ ক'রে লক্ষ্মী সোজা উপরে উঠে গেল।

সুমিত্রা তখন ঘর ছেড়ে সামনের খোলা বারান্দায় এসে দাড়িয়েছিল,—জলভরা দু'টা চোখের উদাস দৃষ্টিকে সুদূরে প্রসারিত ক'রে দিয়েছিল সে। লক্ষ্মী তার সামনে গিয়ে ক্রন্দন-কম্পিত কণ্ঠে বললে, "মা, কিছু খেতে দিন আমার ছেলেকে, নইলে ও মরে যাবে।"

সুমিত্রা অভিমানভরা উদাসকণ্ঠে বললে, "আমার কিছু দেবার কোন অধিকার নেই গো, আমি এ বাড়ীর কেউ নই।"

অবাক হ'য়ে লক্ষ্মী শুধু বললে, "সে কি মা?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা বুঝবে না—কেউ বুঝতে পারবে না আমার দুঃখ।" বেদনায় ভারী হ'য়ে এল সুমিত্রার কণ্ঠ। "যাও,

নীচে যাও, আমায় বিরক্ত করো না। আমার দুঃখ তোমরা কি বুঝবে ?"

নির্ব্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল লক্ষ্মী। বলবার তার অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু প্রকাশের ভাষা তার কোথায় ? কোন্ ভাষায় সে জানাবে, "ওগো দুঃখিনী, তোমার দুঃখ শুধু বিলাস, আর আমার দুঃখ নির্ম্মম, নিষ্ঠুর প্রয়োজন।"

নিজের ঘরে ফিরে এসে লক্ষ্মী পাথরের মত বসে রইল। অবিশ্রান্ত ক্রন্দনক্লান্ত শিশুটীর কণ্ঠ হ'তে এখন আর সুতীব্র মর্ম্মভেদী স্বর জাগছিল না—জাগছিল ভাঙ্গা ভাঙ্গা একটা অস্ফুট কাতরোক্তি। লক্ষ্মীও আর কাঁদছিল না, বসেই ছিল নিশ্চল হ'য়ে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। লক্ষ্মী আলোটাও জ্বাললে না। ঘন অন্ধকারের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে সে যেন লুপ্ত ক'রে দিতে চাইছিল।

হঠাৎ জানালার দিকে নজর পড়তেই লক্ষ্মী উঠে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালো। আকাশে চাঁদ উঠেছে। পৃথিবীর শত দুঃখ-দুর্দ্দশাকে উপেক্ষা ক'রে জ্যোৎস্নার সে কি হাসি! তেতলার জানালার দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে সে দেখতে পেলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দু'টী নরনারী।

সুমিত্রা আর তার স্বামী। চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোর নেশায় আর স্বামীর অনুতাপমাখানো আদরে সুমিত্রার সব দুঃখ—সব অভিমান নিঃশেষিত হ'য়ে গিয়েছে। তা'রা দু'টীতে দাঁড়িয়ে আছে হাতে হাত বেধে। একটা মৃদু মিষ্টি হাসির ঝঙ্কারও লক্ষ্মীর কাণে এসে আঘাত করল।

তাড়াতাড়ি আজ সে জানালাটা বন্ধ করে দিলে।

দেবী চৌধুরাণীর অনুশীলনতত্ত্ব

শ্রীরামশশী কর্ম্মকার

"বঙ্গ ভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি,
তাই তব কবি জয়ধ্বনি।"
—রবীন্দ্রনাথ

জাতীয় ভাষায় ও সাহিত্যে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, ধর্ম্ম ও নৈতিকতায়, সমাজে ও রাজনীতিক্ষেত্রে—সমস্ত দিকে যাহার মঙ্গলপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, যিনি ভিক্ষার্থী রূপে পরের দ্বারে উপস্থিত বাঙ্গালী শিক্ষার্থীকে আপনার ঘরে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, যিনি বাঙ্গালার প্রাণে অফুরন্ত আলো, সঙ্গীত ও বৈচিত্র্য ফুটিবার অবকাশ করিয়া দিয়াছিলেন, যিনি সব্যসাচীর ন্যায় এক হস্ত গঠনকার্য্যে অপর হস্ত নিবারণকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া বঙ্গসাহিত্যকে দ্রুত পরিণতি লাভে সমর্থ করিয়াছিলেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহনীয়কীর্ত্তি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অমর লেখনী হইতে যে-সকল সাহিত্য-রত্ন বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে 'দেবী চৌধুরাণী'র স্থান খুব উচ্চে। 'দেবী চৌধুরাণী' ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। তখন লেখকের বয়স ৪৬ বৎসর। পরিপক্ক মস্তিষ্ক হইতে ঊনবিংশ বৎসরের সাহিত্যানুশীলনের পর 'দেবী চৌধুরাণী' প্রসূত হইয়া সংসারধর্ম্মের—পারিবারিক ধর্ম্মের—সুদৃঢ় মতবাদ স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিয়াছে।

'দেবী চৌধুরাণী' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাসত্রয়ের অন্যতম। ভাষার ত্রুটি স্থানে স্থানে লক্ষিত হইলেও ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট গদ্যের নমুনার অভাব নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন,১ 'আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের সাধারণ নিয়মানুসারে বঙ্কিমের প্রতিভাশক্তি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পর যেন মন্দীভূত হইয়া আসিল। তৎপরে তিনি যে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভাষা ও চিত্রাঙ্কনশক্তির সেই পূর্ব্বকার উন্মাদিনী শক্তি নাই, সে সজীবতা নাই। তাঁহার দৃষ্টিও সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে পড়িতে লাগিল।'

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রকাশের তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-রচনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন—উপন্যাস-রচনার শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। মতিলাল দাস লিখিয়াছেন২—His last novel is Sitaram. In it we see the decline of the powers of the great artist. Bankim Chandra was conscious of this, so he did not lay his hand in novel-writing hereafter.'

'সীতারামের' সম্বন্ধে যে-কথাটি সত্য হইতেছে, তাহা 'দেবী চৌধুরাণী'র সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে না হইলেও কতকাংশে যে সত্য, তাহা গ্রন্থপাঠে স্থানে স্থানে ধরা যায়। উপন্যাসপাঠে পাঠকের মনে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়, 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'রাজসিংহ' সে-বিষয়ে পরিপূর্ণমাত্রায় সাফল্যলাভ করিয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী' নানাবিষয়ে উল্লিখিত গ্রন্থরাজি হইতে বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও উপন্যাসের মাদকতা বহু পরিমাণে হারাইয়া ফেলিয়াছে, ইহা পাঠকমাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির কার্য্যে এই গ্রন্থের মধ্যে বঙ্কিম যে অনেক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা নারীত্বের জন্য যে গৌরবময় পদ প্রস্তুত করিয়াছেন, আজ অর্দ্ধশতাব্দীর পরের প্রগতিবাদী কোন নবীন লেখক পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। জীবন্তচরিত্র অঙ্কন করিয়া অনেক আধুনিক ঔপন্যাসিক নব্যবাঙ্গালীর নিকট বাহবা পাইতেছেন, কিন্তু নারীত্বকে গৌরবান্বিত পদে অধিষ্ঠিত করিতে কেহই অদ্যাপি

১ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'।

২ 'Bankim Chandra: His Life and Art' p. 129.

সমর্থ হন নাই। 'চোখের বালি'র বিনোদিনী হইতে আরম্ভ করিয়া 'শেষ প্রশ্নে'র শিবানী পর্য্যন্ত প্রাণান্ত করিয়াও গৌরবলাভ করিয়াছে কি না সুধিগণের অবিদিত নাই।

'দেবী চৌধুরাণী'র চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া যে-সব চরিত্রের উল্লেখ করিলাম তাহাতে আমার ত্রুটি হইয়া থাকিলে, আমি পাঠকবর্গের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। বঙ্কিমের গ্রন্থ মধ্যেও এইরূপ চরিত্রের অসদ্ভাব নাই, জানি। কিন্তু 'চন্দ্রশেখরে'র শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের বহর এবং রোহিণীর মৃত্যুদণ্ড এই সকল চরিত্রের নিকৃষ্টত্ব প্রমাণ করিতেছে। বহুর জন্য, সমাজের জন্য, একের দণ্ড দিতে বঙ্কিমচন্দ্র কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ সমাজশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাঁর হাতে ন্যস্ত।৩ বালবিধবা রোহিণীর স্বাভাবিক নিয়মে পদস্খলন হইলেও বঙ্কিম তাহাকে সমর্থন কিম্বা সহানুভূতি কিছুই দেখাতে পারেন নাই বলিয়া সেনগুপ্ত মহাশয় অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু বারীন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'মানবতার প্রথম ঋষি'ও কি তাই করেন নাই? যথার্থ অপরাধীকে দণ্ড দিতে শরৎচন্দ্রও যে ছাড়েন নাই, অচলা ও কিরণময়ী যে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে তাহা সরস্বতী দেবীও লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ শরৎবন্দনায় তাঁহারই একজন সহযোগী দেখাইয়াছেন রমেশ ত শাস্ত্রাদি অবহেলা করে নাই; রমার স্বল্প দুর্ব্বলতাও কাশীতে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছে। শরৎচন্দ্রের গল্পে বাস্তবচিত্র আশেপাশে থাকিলেও উপন্যাসের মূলস্বর—ভারতীয় আদর্শবাদ। সংস্কার তাঁহার কামনা হইলেও, একেবারে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার কথা তিনি কোথাও বলেন নাই। বিধবা-বিবাহেও তাঁর বিশ্বাস থাকিলে, রমা ও রমেশের মিলন করাইয়া হয় ত তাহাদিগকে সুখী করিতে পারিতেন। সেইজন্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সহিত বলিতে হয় 'শরৎচন্দ্র বিপ্লবপন্থী নহেন সনাতনপন্থী'।৪

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর মতে শরৎচন্দ্রে সাহিত্য পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কারণ 'তাঁর মত দৃষ্টি নিয়ে দেশের মানুষের পানে কেউই চায় নি; তাঁর মত দরদ নিয়ে কেউ এগিয়ে আসে নি; সাহিত্যের সহিত তাই অপূর্ণতাই থেকে গিয়েছিল, সাহিত্য সত্যিকার রূপ ধরে মানুষের চোখের সামনে ফোটে নি।' 'এর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সাহিত্য ছিল কেবলমাত্র সাহিত্য, সে যুগের সাহিত্য কেবলমাত্র কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে ঘেরা থাকত। সেই অতীত যুগটাকে বঙ্কিমের যুগ বলা চলে।'৫ দেবী সরস্বতীর উল্লিখিত বাক্যে বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্য-মহারথিগণ যাঁহার রচনাকে ভাগীরথীর অমৃতধারার ন্যায় বলিয়াছেন, যিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি, সমালোচক, প্রবন্ধকার, প্রত্নতাত্ত্বিক, সমাজধর্ম্ম-রাষ্ট্রনীতিবিদ্ হইয়া বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; এবং 'মাতৃভাষার বন্ধ্যা দশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালীর যে কি মহৎ, কি চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন, সে-কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই।' বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাঙ্গালা উপন্যাস পূর্ণ-যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে।৬ ইহা নিরপেক্ষ সমালোচকপ্রবরের অভিমত।

কিন্তু আজকালকার কালচারবিলাসী—dilettante (আর্ট-ভক্ত?) বাঙ্গালীর মধ্যে জাতীয়তা ও সাহিত্য পরস্পর-বিরোধী। সাহিত্যে এখন বিশ্বজনীনতার নামে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।—ব্যক্তির খেয়াল খুসী সাহিত্যসৃষ্টি করিতে পারে না। ইউরোপীয় সাহিত্যে Spirit-এর উপর Matter জয়ী, তাহার অনুকরণে আধুনিক লেখকেরা ব্যস্ত।' তাই 'এই লেখকেরা আত্মভ্রষ্ট বস্তুনিগৃহীত সামাজিক সমস্যার অন্ধ তাড়নায় সনাতন ভাব-সত্য হইতে তিরস্কৃত। ইহারা স্বাধীন নয়, ইহারা জড়জীবী, চিৎশক্তিহীন, বর্ত্তমানের আবিল ও বিক্ষুব্ধ জলস্রোতের ক্ষণ-বুদ্বুদ—ইহাদের রচনা শতাব্দী পরে যুগবিশেষের দাহচিহ্ন মসীরেখার মতই মিলাইয়া যাইবে। অতি-আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এবং তাহার সম্বন্ধে রসিকের রসোচ্ছ্বাস দেখিলে মনে হয়, ইহারা কাব্যকে হারাইয়া ফেলিয়া সোনা ফেলিয়া আঁচলে গিরা দিতেছে'।৭ সুতরাং আধুনিক তথাকথিত মনস্তত্ত্বপূর্ণ উপন্যাসে দলনীকে ফেলিয়া শৈবালিনীকে আদর্শ করা হইলে, তাহা বঙ্কিমের দোষ নয়; দোষ তাঁহার যিনি কাচ ও কাঞ্চনের মধ্যে গ্রহণীয় বাছিতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বের ন্যায় বীরত্বের পূজা মানুষ এখনও করে। শরৎচন্দ্র বীরত্ব দেখেছেন বর্ম্মচর্ম্মপরা লোকে নয়, জীবনের ছোটখাট কাজে সাধারণ জীবনে। গৌরবের পরিমাপে তিনি নূতন বাটখারা প্রয়োগ করিয়াছেন।"৮ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের উক্ত বাক্যটি বঙ্কিমের সম্বন্ধেই যে বেশী খাটে তাহা দুই একটি উদাহরণ দেখিলেই প্রমাণিত হইবে। জয়সিংহ, ওসমান, হেমচন্দ্র, পশুপতি, প্রতাপ, মীরকাশেম, রাজসিংহ, মোবারক, ফৌজদার তোরাবখাঁ, এই সব বর্ম্মচর্ম্মপরা বীর, বঙ্কিমের উপন্যাসে থাকিলেও, সাধারণ গৃহস্থ জীবনের চিত্রের এবং গৃহস্থ বীরের আদর্শের অভাব নাই। কপালকুণ্ডলায়, বিষবৃক্ষে, ইন্দিরায়, রাধারাণীতে, রজনীতে, দেবীচৌধুরাণীতে বর্ম্মহীন জীবনের ছোটখাট কাজে সাধারণ জীবনে বীরত্ব প্রদর্শনে সমর্থ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্রচুর রহিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন কোন লেখক নাই যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ঋণী নন, একথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন। 'নূতন বাটখারা' সৃষ্টি বঙ্কিমের; শরৎচন্দ্রের নয়।

শ্রীযুক্ত জয়ন্তীকুমার দাশগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'His characters are all life-like, to be found in actual life,—no unreality. From real life Bankim

৩ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ভূমিকা' (নন্দলাল সেনগুপ্ত)।

৪ 'শরৎবন্দনা' p. 212.

৫ 'শরৎবন্দনা' p. 41.

৬ 'উপন্যাসের ধারা' (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৭ 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য' (মোহিতলাল মজুমদার)।

৮ 'শরৎবন্দনা' pp. 11-12.

gathered materials.'৯ অর্থাৎ বঙ্কিমের নায়ক-নায়িকা বাস্তবজীবন হইতে সংগৃহীত। ইহার পর দাশগুপ্ত বলিয়াছেন, 'Still he is not a realist like some of the modern novelists.' ৯ আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কেহ কেহ Miss Mayo-র ন্যায় বাস্তববাদী হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহারা সমাজের গ্লানিগুলির নগ্নমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াই—নিজেদের রচনা-শক্তিকে সার্থক করেন। ইহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় বলিয়াছেন—"রিয়ালিষ্ট সাহিত্যের স্রষ্টা যাঁহারা, তাঁহারা বস্তুর রূপকে হুবহু তার বাস্তবরূপেই দেখাইয়া থাকেন, সে রূপের সঙ্গে তাহাদের আবেগ, অনুভূতি অথবা কল্পনা মিশাইয়া থাকেন না। তাঁহারা বাস্তব জীবনের ফটোগ্রাফার; আর্টিষ্ট নহেন।"৯ক শরৎচন্দ্র সেরূপ রিয়ালিষ্ট নহেন। 'এ দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা' কিছু দেখি—ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড় পর্ব্বতকে পাহাড় পর্ব্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।১০ স্বয়ং শরৎচন্দ্র এইরূপ কথা বলিয়া ভগবান্ কর্ত্তৃক তিনি বিড়ম্বিত হউন আর না হউন, তিনি তাঁহার অন্ধ ভক্তজনকে সাংঘাতিকভাবে বিড়ম্বিত করিয়াছেন। তাঁহাব নিজের কথা, নিজের লেখায় মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। মহাশ্মশানের অন্ধকারের অপরূপ রূপ বর্ণনা 'সত্য কথা সোজা করিয়া বলা' নয়। নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তও তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। 'এ কথা সত্য নহে যে, জগৎকে তিনি অকবির দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, কিংবা···সাধারণ লোকে যাহা দেখিয়াছে, তার চেয়ে বেশী কিছু দেখেন নাই। সব কবির মতই তিনি জগৎ ও জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন অনেক কিছু, যা সাধারণ লোকের চোখে পড়ে না।'১১ শ্রেষ্ঠ লেখক মাত্রেই যাহা চোখে দেখেন ঠিক তেমনিটিই আঁকেন না, নিজের কল্পনানেত্র দ্বারা বস্তুর ভিতরকার সত্যও আবিষ্কার করিয়া তাহাও বিচিত্র রং দিয়া ফলিত করেন। Aldous Huxley তদীয় 'Music at Night' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন:—"They (Artists) receive from events much more than most men receive, and they can transmit what they have received with a particular penetrative force, which drives their communications deep into the reader's mind.'১২

বড় লেখক বাস্তবের উপর যে রংটুকু লাগাইয়া দেন, সেটুকুকেই Romance বলিয়া আধুনিকেরা তুচ্ছ করিতে চায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই বাস্তব-বর্ণনার মধ্যে অতি-প্রাকৃতের ছায়াপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।·· প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমের মধ্যে একটা তীব্র আবেগ ভরিয়া...তাহাকে রোমান্সের আবেষ্টনে ফেলিয়া এবং একটা আদর্শ প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে তাহার অবসান ঘটাইয়া সমস্ত ব্যাপারটিকে বাস্তব জগৎ হইতে অনেক উচ্চে···উঠাইয়া লইয়াছেন।১২ক 'শরৎচন্দ্রও বাস্তব-জীবনের অবিকল ছবি আঁকিয়া চোখের সম্মুখে ধরেন নাই,—সে ছবিকে তিনি হৃদয়ের রক্তে রঙাইয়াছেন, আবেগে তাহাকে কম্পিত করিয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি তাহাকে কল্পনানুভূতিতে রস পরিপ্লুত করিয়াছেন।' ১২খ 'পল্লী-সমাজে' লাঠিয়াল আকবর, এবং 'পণ্ডিত মহাশয়ে' বৃন্দাবন, অতিবাস্তবতার কতখানি মহিমা ধারণ করিয়াছে, তাহাও সকল পাঠকের নিকটই সুস্পষ্ট। সুস্পষ্ট হইলেও অসাধারণ বলিয়া অবিশ্বাস করা চলে না। Aldous Huxley বলিয়াছেন, "Good art possesses a kind of super truth—is more probable, more acceptable, more convincing than fact itself."১৩ হাক্স্লির এই কথার অর্থ মহাকবির ভাষায় কেমন সুন্দর বিবৃত হইয়াছে!—বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করিলেন—

> 'কহ মোরে সর্ব্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।'
> নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম।'
> 'জানি আমি, জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্ত্তিকথা,'
> কহিলা বাল্মীকি, 'তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
> সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে?
> পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।'
> নারদ কহিলা হাসি,—'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
> ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি—
> রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'১৪

Huxley গ্রন্থান্তরে স্পষ্টতর ভাষায় এই কথাটি বলিয়াছেন—"In the best art we perceive persons, things and situations more clearly than in life and as though they were in some way more real than realities themselves." ১৫ এই জন্যই উচ্চ লেখকের নাম হয় কবি,—ঋষি—তত্ত্বদর্শী। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার ঋষি—'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি। বারীন্দ্র ঘোষ বলিয়াছেন—'বাংলায় শরৎচন্দ্র মানবতার প্রথম ঋষি।'১৬ রবীন্দ্রনাথ—সত্যদ্রষ্টা মহর্ষি। ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ কবির মানসক্ষেত্রোদ্ভূত চরিত্রকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন এবং বুঝাইয়াছেন—"সত্যরক্ষা পূর্ব্বক বড় করিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয়। যেমনটি ঠিক তেমনি, লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে।'১৭ শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, তাহার পিছনে মনের দৃষ্টির যোগ না দিলে সৌন্দর্য্যকে বড় করিয়া দেখা যায় না। মনেরও আবার অনেক স্তর আছে। কেবল বুদ্ধির বিচার দিয়া আমরা যতটুকু দেখিতে পাই, তাহার সঙ্গে হৃদয়ভাব যোগ দিলে ক্ষেত্র আরো বাড়িয়া যায়—ধর্ম্মবুদ্ধি যোগ দিলে আরো অনেক দূর চোখে পড়ে, অধ্যাত্মদৃষ্টি খুলিয়া গেলে দৃষ্টিক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না।১৭ক বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম-বুদ্ধি যে কত প্রবল ছিল তাহা পাঠক মাত্রেই জানেন। রবীন্দ্র

৯ 'Life and Works of Bankimchandra.' ৯ক 'শরৎবন্দনা' p. 184. ১০ 'শ্রীকান্ত' ১ম পর্ব্ব। ১১ 'শরৎবন্দনা' p. 8. ১২ 'Music at Night' pp. 5-6. ১২ক 'বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' pp. 60, 64, by শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২খ নীহাররঞ্জন রায় in 'শরৎবন্দনা' p. 184, ১৩ 'Music at Night' p. 5. ১৪ 'ভাষা ও ছন্দ'—(কাহিনী) by রবীন্দ্রনাথ। ১৫ 'The Olive Tree,' p. 30. ১৬ 'শরৎবন্দনা' p. 36. ১৭ 'সাহিত্য' p. 16 by রবীন্দ্রনাথ। ১৭ক Ibid. pp. 16, 34.

নাথের অধ্যাত্মদৃষ্টির প্রমাণ আছে তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে। বঙ্কিমচন্দ্র তাই তাঁহার পাঠকবর্গকে শুধু আনন্দ দিতে চান নাই, চেয়েছিলেন 'to lift them above the common sordid atmosphere of everyday life.'১৮

যাঁহারা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি দ্বারা পাঠকের আনন্দ-বিধানকেই আর্টের একমাত্র উদ্দেশ্য বলেন, তাহাদের পূর্ণ সৌন্দর্য্যের জ্ঞান থাকিলে, সৌন্দর্য্যাঙ্কনের সঙ্গে মঙ্গলমূর্ত্তির অঙ্কনও পরিত্যক্ত হইবে না। লক্ষ্মী শুধু সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের দেবী নহেন, মঙ্গলেরও দেবী। সৌন্দর্য্যমূর্ত্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্ত্তি এবং মঙ্গলমূর্ত্তিই সৌন্দর্য্যের পূর্ণ স্বরূপ।১৮ক বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্য্যের পূর্ণমূর্ত্তি অঙ্কনের চেষ্টা করিয়াছেন।

'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী উৎকৃষ্ট নারী-চিত্রে পরিপূর্ণ। তিলোত্তমা, আয়েসা, দলনী, সূর্য্যমুখী, রাধারাণী, মৃণালিণী, ভ্রমর—বাঙ্গালীর আদর্শ নারী-চরিত্রের নিদর্শন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রফুল্ল, সত্যই চির-প্রফুল্ল মন্দারপ্রসূনের ন্যায় বঙ্গবাসীর প্রাণে চিরকাল আনন্দদান করিবে। জনৈক প্রাচীন সমালোচক বলিয়াছেন—'প্রফুল্ল চরিত্র একটা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়। উহাকে শাস্ত্রের মাপকাঠিতে কিংবা ইউরোপীয় দর্শনের মাপকাঠিতে মাপিলেও পাওয়া যাইবে না।' কিন্তু কেন? এলিজাবেথ-যুগের ইংরাজ সাহিত্যের নারী-আদর্শে যাহাদের নেত্রপাত করিবার সুযোগ ঘটে নাই, মহাভারতীয় ধর্ম্মব্যাধ উপাখ্যানের নারী-চিত্রে যাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই,—নব্য-যুগের নভেলী স্ত্রী-চরিত্রে যাহাদের চিত্তবিকার ঘটে, তাহাদের কাছে বঙ্কিমের আদর্শ সাংঘাতিক অস্বাভাবিক ঠেকিলে বিস্ময়ের বিষয় ছিল না। কিন্তু পাঁচকড়ি বাবুর ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তির এরূপ অভিমত অত্যন্ত বিস্ময়কর হইয়াছে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসটি অসাধারণ ঘটনাভারাক্রান্ত ও ধর্ম্মভাবগ্রস্ত হইলেও একটি বাস্তব জীবন-চিত্র বলিয়াই আমাদিগকে আকর্ষণ করে, এবং ইহার মধ্যে যে একটা প্রবল ভাবাবেগ বহিয়া গিয়াছে, তাহাই ইহার বাস্তব চিত্রের উপর একটা গভীরতা ও গৌরব আনিয়া দিয়াছে।"১৯ প্রথম মহাসমরের পর ইউরোপীয় সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা এমন প্রবলভাব ধারণ করিয়াছিল যে, সাহিত্যের প্রয়োজন যে লেখকের আনন্দের উপরেও আরো কিছু থাকিতে পারে তাহা অস্বীকৃত হইয়াছিল। সাহিত্যের মধ্যে কি থাকা উচিত, কোন্ বস্তু স্থায়ী সাহিত্যের সামগ্রী হইবার যোগ্য, পাশ্চাত্য স্কুলের পড়ুয়া আমরাও তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্যকে নির্বিচারে অনুসরণ করিয়াছি। তাই আজ আদর্শবাদ আমাদের চোখের বিষ না হোক কর্ণশূল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নব্য যুবকসম্প্রদায়ের জনৈক প্রতিষ্ঠাবান্ নেতা স্বমতনিষ্ঠ হইয়াও যে সত্য কথাটা বলিয়াছেন, তাহা তরুণদের,—ভবিষ্যৎ বাংলার নায়কদের—শ্রবণ করা উচিত :—"Progressive literature if it is of right type, must be realistic and should draw substance from the life of the people, both in its dark and bright sides. If must have two ideals before it, (i) it must stir up people and (ii) it should place the highest idea before the people."২০ অর্থাৎ যথার্থ প্রগতিশীল সাহিত্যে সমাজের যথার্থ প্রতিচ্ছবি থাকিবে এবং জাতিকে সর্ব্বোচ্চ ভাবধারা পান করাইয়া তাহার মধ্যে কর্ম্মের উন্মাদনা সৃষ্টি করিবে।

সাহিত্য যে স্বভাবানুগামী হইবে, তাহা আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কেহ বলিয়াছেন বলিয়া জানি না। 'উত্তর চরিতের সমালোচনায় বঙ্কিমের মতবাদ প্রকটিত হইয়াছে। ভূদেব বাবুকে একখানি পত্রের মধ্যেও বঙ্কিম যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িলেও বঙ্কিমের আর্টের জ্ঞান সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা অনেকটা দূর হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন—'The highest poetry is also the highest practical wisdom—the poetry of real life. There is more practical wisdom in Shakespeare's plays than Bacon's Essays or in any English writing whatever.'২১ লেখক wisdom শব্দ ব্যবহার করিয়া প্রকৃতির মধ্যে যাহা ঘটিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কি ঘটিতে পারে তাহার কথাও যে জানিতে বলিতেছেন, তাহা বোধ করি কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বলিয়া দিতে হইবে না। Shelley-ও তাই বলিয়াছেন—"A great poem is a fountain for ever overflowing with the waters of wisdom and delight.২১ক সেই জন্য বড় কবিরা যাহা লেখেন তাহা কখনও জাতির অতীত ও ভবিষ্যৎ সাহিত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। জাতির সনাতন বৈশিষ্ট্য ফল্গুধারার ন্যায় সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে প্রবাহিত থাকিবে। 'The works of our greatest poets are all episodes in that one great poem which the genius of man has created since the commencement of human history,' এ কথা স্বয়ং Lord Avebury বলিয়াছেন।২১খ

বড় কবি প্রকৃতির নগ্নরূপ অঙ্কণ করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তাহার গুপ্ত সৌন্দর্য্যও আবরণমুক্ত করিয়া দেখান; কখনও বা তাহা বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া আমাদের নয়ন মন মুগ্ধ করেন।* শুধু সাহিত্যে নয়, স্বভাবের উপরও মানব কারসাজি করিতে ছাড়ে না। নগ্ন, নিরাভরণ একটি বালিকা-দেহকে কত চেষ্টাশ্রম করিয়া, কত কল্পনা করিয়া রঙ্গে, বসনে, ভূষণে, হাবে, ভাবে বৈচিত্র্যসম্পন্ন

---

১৮ 'Calcutta Review', Octo. 1939, pp. 87-88.
১৮ক 'সাহিত্যে সৌন্দর্য্যবোধ' by রবীন্দ্রনাথ, ১৯ 'বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,' p. 130.

২০ 'Presidential Address'—Nabayuga Sahitya Sansad, Calcutta, published in the Daily Advance, Town Ed., 9/8/1939, Wednesday.

২১ Letter, dated Jajpur, Nov. 13, 1882.

২১ক Shelley, quoted in the essay on poetry in 'The Pleasures of Life', part 2. chap. 6, by Lord Avebury, ২১খ Ibid.

* 'Poetry lifts the veil from the beauty of the world, and throws over the most familiar objects the glow and halo of imagination.'—The Pleasures of Life, (Part 2, chap. 6) by Lord Avebury.

করিয়া মানব স্বীয় সৌন্দর্য্যবৃত্তিকে চরিতার্থ করে! আমার বিশ্বাস 'অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা'।২২

মহাকবির এই উক্তি কোন শক্তিশালী সাহিত্যিকই খণ্ডন করিতে বৃথা প্রয়াস পাইবেন না। সাহিত্যেও তেমনি। স্বভাবের মধ্যে সচরাচর যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই একমাত্র সত্য, তাহার অধিক অসাধারণ কিছুই ঘটিতে পারে না, এ ধারণা অজ্ঞজন-সুলভ। মানুষ তাহার কল্পনাশক্তির দ্বারা কোন স্বভাব-আলেখ্য সুন্দরতর করিয়া অঙ্কিত করিলে তাহা, এবং প্রকৃতির মধ্যে আকস্মিক হইলেও কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটিলে তাহাও, কোন মতে মিথ্যা বলিয়া ত্যাজ্য হইতে পারে না।

'যাহা কিছু ঘটে, তার নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্য-বস্তু বলিনে, তেমনি যা ঘটে না অথচ সমাজ ও প্রচলিত নীতির দিক্ দিয়ে ঘটিলে ভাল হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তাহার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের বেশী বিড়ম্বনা ঘটে,২৩ —এইরূপ একটা স্ব-বিরোধী (Self-contradictory) কথা বড় সাহিত্যিকের মুখে শোনাটাই বরং বিড়ম্বনা। কল্পনা উচ্ছৃঙ্খল হয় কখন? যখন লেখক কল্পনা দ্বারা রামের চরিত্র অঙ্কন করেন, তখন? না, যখন শিবনাথের চরিত্র চিত্রিত করেন তখন? ত্যাগে উচ্ছৃঙ্খলতা, না ভোগে? ভ্রমরের চরিত্রাঙ্কণে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় পাইয়াছে, না কিরণময়ীর চরিত্রবর্ণনে উচ্ছৃঙ্খলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে? সুতরাং উল্লিখিত মতের মূল্য স্বীকার করা যায় না। ডক্টর প্রিয়রঞ্জন সেন যথার্থই বলিয়াছেন—The standard of revolt is raised in every channel'২৪ "সেই ভালমন্দ, সেই উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন, শুধু এই উচিত-অনুচিতেই রোহিণীকে গোবিন্দলালের পিস্তলের লক্ষ্য করিয়া দাঁড় করাইয়াছিল। এই অসঙ্গত জবরদস্তি আধুনিক সাহিত্যিক স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না"।২৪ক বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে এইরূপ অসঙ্গত জবরদস্তি দেখাইবার পূর্ব্বে শরৎচন্দ্রের মত বিরাট সাহিত্যিকের একটু চিন্তা করা উচিত ছিল এবং কিরণময়ীকে উন্মাদগ্রস্ত করিয়া আর্ট কি সার্থকতা লাভ করিল তাহাও মনে রাখা উচিত ছিল।

'ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই।'২৪ক এইরূপ উক্তি দ্বারা কবিদের দুর্ল্লভ কল্পনাশক্তির প্রতি কটাক্ষ কখনও শোভনীয় হয় নাই। কল্পনাশক্তির অভাবে স্বয়ং শরৎচন্দ্রও বিভিন্ন জাতীয় চরিত্র অঙ্কণ করিয়া পাঠকবর্গকে বিমুগ্ধ করিতে পারিতেন না। এই কল্পনা না থাকিলে কি মহাকবি মধুসূদনের মধুচক্র রচিত হইত? 'Heavenly Muse' নামে কল্পনাকে মহাকবি Milton মহাকাব্য রচনার প্রারম্ভে আবাহন করিয়াছেন। ইহাকেই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 'প্রেয়সী' রূপে পুনঃপুনঃ সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন। এই শক্তির প্রভাবেই চণ্ডীদাস পদাবলী রচনা করিয়া শতবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিয়াছেন। এইরূপ প্রামাণিক দৃষ্টান্ত জগতের সাহিত্যে আছে। Plato বলিয়াছেন—"He who, having no touch of the Muse's madness in his soul, comes to the door and thinks he will get into the temple by the help of Art—he, I say, and his poetry are not admitted."২৫ মহাকবি সেক্সপীয়ার (Shakespeare) প্রেমিক এবং কবিকে এক পর্য্যায়ে আনিয়া বলিয়াছেন, উভয়েই—'Are of imagination all compact'.২৫ক বাগ্মিশ্রেষ্ঠ Cicero বলিয়াছেন—'A poet is ·····inspired by what we may call the spirit of divinity itself.'২৫খ এই সকল দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কাল্পনিক বলিয়া সকলের সকল কথা মিথ্যা বলা চলে না। জগতে কখন কি ঘটিতে পারে, কাহার মুখ দিয়া কোন্ সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা ধরা কঠিন। একদিন শরৎবাবুই শ্রীকান্তর মুখ দিয়া বলিয়াছিলেন—"যাহা চোখে দেখি না, তাহাই যে নাই, এমন কথাই বা কে জোর করিয়া বলিবে?২৬ যাহা আমি দেখি না কিম্বা জানি না, তাহা অধিকতর সূক্ষ্মদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ত দেখিতে পারেন? তবে কল্পনা-বিলাসী বলিয়া কবিকে গালি দেওয়া বৃথা। "দো দহান্ দারীম পূয়া হম্ চুন্ নায়,"—তাপস কবি রুমীর এই বাক্যের অর্থ, কবি মোহম্মদ বরকতুল্লাহ আমাদিগকে জানাইয়াছেন—কবির প্রাণ বাঁশীমাত্র; উহার একপ্রান্ত সেই সনাতন মহাগায়কের অধরে এবং অন্য প্রান্ত এই বিশ্বমানবের নিকট স্বর্গীয় সুরে অপূর্ব্ব অশ্রুত সঙ্গীতের আলাপ করে।'২৭

এই তৃণগুল্মের দেশে যে স্যার আশুতোষের ন্যায় শাল-মহীরুহের উদ্ভব হইয়াছিল, 'যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ'—শাস্ত্রবাক্যে বিমূঢ়িত হিংসাপরায়ণ জনসমাজের মধ্যে যে ত্যাগীশ্রেষ্ঠ শাক্যসিংহের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহা কি আকস্মিক নয়? এই, অনন্ত যুগ ধরিয়া এই অনন্ত কোটি মনুষ্য মধ্যে কয়জন মহামানব পৃথিবী-পৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়া জনসাধারণকে নূতন দীপ্তি দেখাইয়াছেন? সংখ্যালঘিষ্ঠ (minority) বলিয়া কি তাঁহাদিগকে, তাঁহাদের আদর্শকে, এমন কি তাঁহাদের স্মৃতিকে, পৃথিবী হইতে—পৃথিবীর সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হইবে?—তাহা কখনও হয় না। মানুষ যতই উদ্দামগতি অবলম্বন করুক, তাহার একটা প্রশমস্থান আছে,—এ ধারণা প্রত্যেক মানুষের কেন জীবজগতের সকলেরই আছে। সেই স্থানকেই আদর্শস্থান করিয়া মানুষ অগ্রসর হয়। এইটিই নীতি। ইউরোপীয় বালক 'Herculean strength' এর স্বপ্ন দেখে; হিন্দুবালক দেখে

২২ 'চৈতালি' (নারীপ্রতিমা) by রবীন্দ্রনাথ।

২৩ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্—নদীয়া শাখা, সন ১৩৩১ সালের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে শরৎচন্দ্রের অভিভাষণ।

২৪ Influence of Western Literature in Bengali Novels by Dr. Priyaranjan Sen.

২৪ক 'শ্রীকান্ত', ১ম পর্ব্ব।

২৫ Plato quoted by Lord Avebury in his 'Pleasures of Life', part 2, chap. 6.

২৫ক (২৫খ) Ibid.

২৬ শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব্ব p. 140.

২৭ 'পারস্যপ্রতিভা' by বরকতুল্লাহ।

ভীম-বিক্রমের, মুসলমান বালক দেখে সোরাব-রোস্তমের। কেহবা Bismark কিম্বা চাণক্যের স্তায় কূট-নীতিবিৎ হইতে চায়। এমনি সমস্ত দিকেই একটা করিয়া আদর্শ মানুষ চোখের সামনে আঁকিয়া রাখে। জীবনের কোন ক্ষেত্রে সেই আদর্শবাদকে অবহেলা করিয়া চলিতে চেষ্টা করাকে শুধু foolish নয় fatal না বলিয়াও পারি না। ভারতবর্ষ যে নূতন সভ্যতাকে ধ্রুবতারা করিয়া জীবনতরি ভাসাইয়া দিয়াছিল, সে সভ্যতাকে আদর্শ ধারণা করিয়াই করিয়াছিল। সুতরাং আদর্শবাদ অখণ্ডনীয়।

আদর্শ-অঙ্কন করাই উত্তম সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হওয়া উচিত। আদর্শবাদী বলিয়া কোন লেখকের নিন্দা হওয়া দূরের কথা, বরং যিনি আদর্শ ত্যাগ করিয়া গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার গ্রন্থ গ্রন্থোক্ত মতবাদের সঙ্গে সঙ্গেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। Lord Avebury উৎকৃষ্ট কাব্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"Poetry has been well called the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds, it is the light of life; the very image of life expressed in its eternal truth; it immortalises all that is best and most beautiful in the world."২৮ লর্ড এভেবরিবর্ণিত কাব্য যাঁহারা না লেখেন তাঁহারা second-rate কবি। Second-rate poets, like second-rate writers generally, fade gradually into dreamland; but the work of the true poet is immortal.—ইহা তিনিই বলিয়া দিয়াছেন। এইমত সর্ব্বসম্মত। শরৎচন্দ্রকে এই এই সংকট হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বুঝি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত দেখাইয়াছেন—'সমাজে যারা অনাদৃত, উপেক্ষিত, কিন্তু মনুষ্যত্বের খাঁটি আদর্শে যারা কারো চেয়ে ছোট নয়, তাদের লইয়াই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সংসার।' 'রিয়্যালিজমের প্রথম রূপদক্ষ ভাস্করকেও রোমান্টিক আখ্যা দিতে সেনগুপ্ত Walt Whitman-এর মত তুলিয়াছেন। শরৎচন্দ্র যে সম্পূর্ণ Realist নহেন, তাহা আমি আগে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তফাৎ বেশী নয়। যুগপ্রভাবে আদর্শের কতকটা বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রে যে Romanticism আছে তাহা ত সর্ব্ববাদিসম্মত। শরৎচন্দ্রেও তাহার অভাব নাই। তবে একটা প্রাচীন অপরটা আধুনিক। Aldous Huxley তদীয় প্রসিদ্ধ Music at Night গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"Modern Romanticism is the old Romanticism turned inside out, with its values reversed. Their plus is the modern minus; the modern good is the old bad. What then was black is now white, what was white is now black." (pp. 212-213). পূর্ব্বকালে যাহা ছিল উত্তম, আজ তাহা অধম হইয়াছে। নারীর সতীধর্ম্মের উপর প্রাচীন কালে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে অসীম শ্রদ্ধা ছিল। Milton তাঁহার Comus নাটকে Chastityর জয়গান করিয়াছেন। Shakespeare টার্কুইন-ধর্ষিতা Lucrece সম্বন্ধে বলিয়াছেন—But she hath lost a dearer thing than life"২৯

২৮ The Pleasures of Life, part 2 chap. 6.

২৯ The Rape of Lucrece, verse 99.

আত্মীয়-স্বজন যদিও 'Her body's stain her mind untainted clears"৩০ বলিয়া লিউক্রীসীর অপরাধ গ্রহণ করেন নাই, তথাপি সতীধর্ম্মপরায়ণা নারী সে মার্জ্জনা অস্বীকার করিয়াছিল এবং সতীত্ব হারানকে 'Hard misfortune' গণ্য করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিল—

"No, no" quoth she, "no dame, hereafter living,
By my excuse shall claim excuse's giving."(৩০)

সতীত্ব ছিল প্রাচীনভারতেও নারীর প্রাণস্বরূপ। আর আজ আশালতা দেবী শরৎচন্দ্রের কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল নায়িকাকে সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব যে কেবল সতীত্বের সহিত একান্ত এক নয় এবং এর চেয়ে ঢের বড় এবং ঢের সর্ব্বাঙ্গীন এ কথা সামাজিক এবং সাংসারিক দিক্ থেকে না হোক বুদ্ধির দিক্ থেকে কে না চট্ করে বুঝতে পারে?৩১ এবং কমল, কিরণময়ী ও রাজলক্ষ্মীর উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন 'বিবাহ অনেক ঘটনার মত একটী ঘটনামাত্র"।৩১ আশালতা দেবীর মতে বিবাহটার মত প্রেমটাও করিলেই হইল। 'গ্যেটে ছিলেন বিরাট প্রতিভাবান্ পুরুষ, কিন্তু তিনি ক'বার প্রেম করেচেন? কমল এতখানিই দাবী করচে।'—এই 'অখণ্ডনীয়' যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের সংজ্ঞাটা দিলে আমরা দেবীর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতাম। আশালতা দেবী যে বিজয়ার ডাক্তার-প্রেমকে লক্ষ্য করিতেছেন না তাহা নিশ্চিত। রাজলক্ষ্মীর শ্রীকান্ত-প্রেমটাও আশালতা দেবীর সম্মত বলিয়া মনে না। আশালতা দেবীর প্রেমের আদর্শ কমলে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কমল মাত্র তিন জনের সহিত তথাকথিত প্রেম করিয়াই যদি আদর্শস্থানীয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে বারবনিতাগণ এক জীবনে অসংখ্যবার প্রেম করিবার যোগ্যতা দেখাইয়া থাকে, তাহারা কি আশালতা দেবীর মতে নারীসমাজের ইষ্টদেবতা বলিয়া গণ্য হইবে? আজকাল film starদের প্রশংসাপত্র ব্যবসাদারদের নিকট বেদবাক্যের চেয়ে মূল্যবান্ হইয়াছে সত্য। কিন্তু এইটাই কি যথার্থ সত্য? রাজলক্ষ্মী পাঠকের সত্যিকার শ্রদ্ধা পাইল কখন? তাহার মধ্যে অন্নদাদিদির আবির্ভাবের পূর্ব্বে কি পিয়ারী বাইজি অত করিয়াও শ্রীকান্তের চক্ষেও বাইজীরূপেই প্রতিভাত হয় নাই? ত্যাগ মানুষকে বড় করে; সংযম মানুষকে প্রশংসার্হ করে, উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। 'চরিত্রহীনের' সাবিত্রী প্রশংসনীয়া কেন? যে-হেতু সে সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে।

এখন কথা হইল ত্যাগ ও সংযম যদি উভয়কালেই প্রশংসনীয় হয়, তাহা হইলে হাক্স্লির দ্বিবিধ Romanticism রহিল কই? সব ত একজাতীয় চরিত্র হইল!—না, হইল না। K. M. Das লিখিতেছেন—"Like Dickens he (Sarat) has peopled his creations with low class despised people. ৩২ শরৎ সম্বন্ধে দাস মহাশয়ের কথা যে সত্য তাহা সেনগুপ্ত স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অবশ্য বক্তব্য যে 'শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-

৩০ Ibid. verse 245.

৩১ শরৎবন্দনা p. 102,104.

৩২ 'Wertern Infiuence on Bengali Novels.'

সমূহের ব্যাপক আলোচনা করিতে গেলে, তাঁহার (এই) নূতন ও পুরাতন উভয় ধারাই লক্ষ্য করিতে হইবে'।৩৩ যেখানে তিনি পুরাতন ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন সেখানে পুরাতন সুরের প্রাধান্য আছে। সেখানে বঙ্কিমের সহিত তাঁহার কোন বিবাদ হইতে পারে না। যেখানে তিনি বহিঃসমুদ্রের স্রোত বহাইয়া বঙ্গসাহিত্যের গতিবেগ বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে নূতন ভাবের উত্তেজনা সুস্পষ্ট হইয়াছে। এইখানেই বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁহার অনেকখানি পার্থক্য। "এক দিনের কোন গভীর অপরাধও যে তার জীবনের আকাশকে নিশিদিন কালিমাময় করে রাখতে পারে না এবং এ কথা যে স্ত্রীলোকের পক্ষেও নিরতিশয় সত্য এ তিনি কোন ছলেই ঢেকে রাখতে চান নি।"৩৪ শরৎ সম্বন্ধে আশালতা দেবীর এই কথা প্রমাণ। সাবিত্রীকে দিয়া তিনি এই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য দেখাইয়াছেন। অভয়া দিদিকেও দিদির সম্মান দিতে শরৎচন্দ্র কুণ্ঠিত নন ; অথচ তিনিও বুকের মধ্যে অন্নদা দিদির দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছেন। রমা প্রেমাস্পদকে নিকটে বসাইয়া আহার করাইতে পারিয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য কাশীবাস করিতেও বাধ্য হইয়াছে। কমল অভুক্ত অতিথিকে নিজের জন্য রক্ষিত শাকান্নও দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। পিয়ারী বাইজীর সেবাপরায়ণতার সীমা নাই। পতিতার মধ্যে-এমনি করিয়া বহু গুণ, শরৎ ও শরৎপরবর্ত্তী সাহিত্যে দেখান হইতেছে। "অসুন্দরের মধ্যেও তিনি (শরৎ) সত্যসুন্দরের দেবোজ্জ্বল মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সব মন্দিরেই যে দেবতার আসন আছে, তাহাই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন।৩৫ শ্রীযুক্ত মৃণাল সর্ব্বাধিকারী শরৎচন্দ্রের যে কোন নায়ক-নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকের মধ্যে ঐ দেবোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, এবং অপরাপর চরিত্রের ত কথা নাই 'কমলের মধ্যেও অসামঞ্জস্য এবং অযৌক্তিক কোন আচরণই' তাঁহাদের চোখে পড়ে না। আমাদের ত পড়ে। ইন্দ্রনাথের মত নায়কে এবং রাজলক্ষ্মীর মত নায়িকায় অনেক সৌন্দর্য্য আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু সে স্বীকারোক্তি দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, ইন্দ্রনাথ তাহার পণ্ডিত মহাশয়ের টিকি কাটিয়াছিল বলিয়াই এবং রাজলক্ষ্মী পিয়ারী বাইজি হইয়াছিল বলিয়াই, তাহারা আজ শরৎ-সাহিত্যের পাঠকের কাছে দেবোপম হইয়া উঠিয়াছে। Lord Clive ভারতে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরাজ জাতির নিকট দেবমর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন, তিনি কিন্তু বাল্যকালে গির্জ্জার শিখরে চড়িয়া পথিকের উপর লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতেন। অতএব এখন কি generalise করা যাইবে যে, গির্জ্জার উপর হইতে ঢিল মারিয়া পথিকের কলসী ভাঙ্গিয়া দিলে Clive হইতে পারিবে ? সেরূপ generalisation মূর্খের কাজ। তেমনি কোন বিশেষ পতিতা ঘটনাচক্রে পড়িয়া কিম্বা দৈববশে পড়িয়া কিঞ্চিৎ সাধুতা দেখাইলে, সমস্ত পতিতাকে কি পরিবারমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলে মঙ্গল হইবে ? K. M. Das মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন, "Sabitri who though a fallen woman (fallen for causes for which she was not much to blame) has many lovable traits of character."৩৬ ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি বলিয়াছেন—'Not having personal knowledge of fallen women, we do not know whether there is any real Sabitri among them or not."৩৬ এ-সন্দেহ যে অনেকেরই আছে তাহা বলা বাহুল্য।

সুতরাং Aldous Huxley-র কথা খাঁটি সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র মন্দকে মন্দ করিয়াই দেখাইয়াছেন। এবং ভালকে আরো ভাল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শরৎ প্রভৃতি মন্দের মধ্যেও ভালর অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহাই change of vision.

একটা বিশেষ সমস্যা লইয়া প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদের মধ্যে বিচার করা যাক। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় একজন নিরপেক্ষ সমালোচক বলিতেছেন—'প্রেম সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি বরাবরই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব। বিবাহের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না হইলেও, সামাজিক অনুমোদনের ছাপ মারা না থাকিলেও, চিরাভ্যস্ত সংস্কারের খোলসবর্জ্জিত হইলেও প্রেমের যে একটা নৈসর্গিক মহত্ত্ব, একটা বিপুল আত্মলোপী আবেগ আছে সে-বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রথম বয়সের উপন্যাসেও বেশ সচেতন ছিলেন।'৩৭ শরৎচন্দ্রের স্ত্রীচরিত্রে এই সমাজ-নিরপেক্ষ স্বাধীন জীবনের সুস্পষ্ট স্ফুরণ হইয়াছে। ওদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন চরিত্রই সমাজকে অবহেলা করিতে পারে নাই। Bankim had social defects in mind, but did not attempt to over-ride society..."৩৮ সমাজের ত্রুটি যে তাঁহার চক্ষে ধরা পড়ে নাই, তাহা নহে ; কিন্তু সমাজ কোন মতে অবজ্ঞাত হইবে না। প্রেম যে নৈসর্গিক তাহা তিনি গোড়া হইতেই জানেন, কিন্তু প্রেমকেও সমাজের নিয়ম অবহেলা করিতে তিনি দিবেন না ! 'He liked love married or leading to marriage.'৩৮ তিলোত্তমার সহিত জগৎসিংহের প্রেমকে বঙ্কিম সার্থক করিয়াছেন ; কিন্তু আয়েসার এত বড় একনিষ্ঠ প্রেমও সমাজবিধিবিগর্হিত বলিয়া ব্যর্থ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। 'নবাবনন্দিনী' উপন্যাসে আয়েসাকে জগৎসিংহের সহিত মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়া দামোদরবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের নীতি-বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রমাণ করিয়াছেন। হরলাল পিতার ত্যাজ্যপুত্র হইয়াও রোহিণীকে বিধবা-বিবাহে সুখী করিতে নারাজ। কুন্দনন্দিনীকে 'শাস্ত্রসম্মত' বিধবাবিবাহ দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর গৃহে বিষবৃক্ষে ফল ধরাইলেন। রোহিণীর প্রতি, কুন্দনন্দিনীর প্রতি, এমন কি মতিবিবির প্রতিও বঙ্কিমের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই কারণ তাহারা সমাজদ্রোহী। আর শরৎচন্দ্র

৩৩ উপন্যাসের ধারা ১ম পরি, বা শরৎবন্দনা p. 140.

৩৪ শরৎবন্দনা p. 101.

৩৫ শরৎবন্দনা p. 94.

৩৬ The History of Bengali Literature p. 173.

৩৭ শরৎবন্দনা p. 148.

৩৮ 'The Life and Works of Bankim Chandra' by J. K. Dasgupta.

গভীর মমতা ও সমবেদনা দিয়া অচলা, কিরণময়ী, কমললতা, এমন কি অভয়াদিদিকে অঙ্কন করিয়াছেন। রাজলক্ষ্মীর রূপ ত' তাঁহার সৃষ্টিশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে।

বালবিধবার প্রকাণ্ড সমস্যা বঙ্কিম ও শরৎ উভয়েই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য রহিয়াছে। শরৎচন্দ্রে বঙ্কিমের নীতিনিষ্ঠা নাই ইহা স্পষ্ট। মানুষের দুঃখ-ব্যথা, স্খলন-পতনকে শরৎচন্দ্র সুগভীর সহানুভূতির রঙে চিত্রিত করিয়াছেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান হইতে উদ্ভূত উন্মার্গগামী সমাজকে দেশীয় সংস্কৃতির মহান্ ঐতিহ্যে উদ্দীপ্ত করাকেই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন৩৯ 'Bankim looked to his country's cultural heritage for inspiration' এ-কথা দাশগুপ্তও বলিয়াছেন। সুতরাং

জগতে ভাল ও মন্দ দুই-ই থাকিবে। সতী, সীতা, সাবিত্রীর সমকালে অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তীর কেন, রম্ভা, তিলোত্তমারও আবির্ভাব ঘটিবেই। সাহিত্যেও দলনীর সঙ্গে শৈবলিনীর, ভ্রমরের পার্শ্বে রোহিণীর, এমন কি সুরবালার সম্মুখে কিরণময়ীর চরিত্র-চিত্রণও সম্ভব হইবে। কিন্তু মন্দকে মন্দজ্ঞানে পরিহার করা দোষের হইবে কেন? পাপের সংস্রব ত্যাগ করাই ত' চিরন্তন নীতি। যদি বিনোদিনীকে রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্রের গৃহে আশ্রয়প্রার্থীনীরূপে না আনিতেন, ডাক্তার সুরেশ যদি মহিমের পল্লীভবনে গিয়া অচলার চঞ্চলচিত্তকে আরও চঞ্চল না করিত, পাপীয়সী রোহিণী যদি তাহার রূপের ছটা গোবিন্দলালের নয়নগোচর না করিত, তাহা হইলে যে-সব কুৎসিৎ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা ঘটিত না। পাপের আকর্ষণী-শক্তি প্রবল। আশার ন্যায় চরিত্র, অমরের ন্যায় চরিত্র, পাপের আকর্ষণ হইতে প্রিয়জনকে রক্ষা করিতে পারে নাই। পতনের পথটাই সুগম কি না। সেই জন্য পাপকে নিন্দা করিয়া দূরে পরিহার করিবারই বিধান বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দিয়াছেন। নবকুমার এই নীতিকে স্বীকার করিয়া মতিবিবির চক্ষু পরিতৃপ্ত করিবার জন্যও সে পথে চলিতেও স্বীকার করিল না। আর Lucrece স্বামীর বন্ধু বলিয়া Tarquinকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিল, অচলা গৃহদাহ ঘটাইল। পাপকে দূরে পরিহার করার প্রাচীন নীতি প্রাচীন কাল অপেক্ষা বর্ত্তমান কালে বেশী পালনীয় হইয়াছে। শুনা গিয়াছিল আমেরিকার ন্যায় সভ্যতার পীঠস্থানেও school girls দের মধ্যেও abortion case অসংখ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার হীন অনুকরণে স্ত্রী-স্বাধীনতা নামে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতেছি; এতদূর পাতিত্য হিন্দুর মধ্যে অনেকের ঘটিয়াছে যে, কুলবধূ হইতেছে বিতাড়িত কিম্বা অবজ্ঞাত আর সতীত্বের মর্য্যাদা হইতেছে, সম্পূর্ণরূপে ধূল্যবলুণ্ঠিত। আজ আর আমরা বন্ধুর সহিত বান্ধবীর নিভৃতালাপে, সহপাঠীর সহিত সহপাঠিনীর কুঞ্জবিহারে দোষ দেখিতে পাইতেছি না। এতটা পরিবর্ত্তন আমাদের ঘটিয়াছে। এইরূপ আচরণের অবশ্যম্ভাবী ফল কাহারও অবিদিত নাই। আমেরিকার ন্যায় অর্থ-নৈতিক সৌভাগ্য লাভেই মানুষ জীবনে সুখী হইতে পারে না। সেই অপেক্ষা প্রাণের সুখ যে অধিকতর কাম্য তাহা তর্কের বিষয় নয়। সেই সুখ পাইতে হইলে প্রাণের পবিত্রতার একান্ত প্রয়োজন; এবং সেই পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্যই নীতিচর্চ্চা আবশ্যক। 'রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ' ৪০ এই শিক্ষা সাধু সজ্জনের আচরণ দেখিয়া যেমন পাওয়া যায়, তেমনি সাধু সজ্জনের জীবনী পাঠ করিয়াও পাওয়া যায়। সেই জন্যই বিশেষ করিয়া সৎসাহিত্যের প্রয়োজন। যে সাহিত্য সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ এবং সত্য ও সুন্দরের জন্য সৃষ্ট, তাহা সৎসাহিত্য। সৎসাহিত্যের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। 'জাতীয়তাগঠন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্যগঠন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক'।৪১ আমাদের সাহিত্যকে জাতীয়তাগঠনের উপযোগী করিবার জন্য স্যার আশুতোষ যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করা উচিত। তিনি বলিয়াছেন, "দেশের জনসঙ্ঘকে যদি সৎপথে লইয়া যাইতে হয়—মানুষ করিয়া তুলিতে হয়—বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহাজাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইবে।...কোন্ পথে পরিচালিত হওয়ায় কোন্ জাতির কি উন্নতি হইয়াছে...বিশেষ-বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া, যদি সঙ্গত মনে হয়, এদেশের পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে সেই পথে আমাদের জাতিকে ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।...এই সঙ্গে দেখিতে হইবে, কোন্ পথে যাওয়ায়, কোন্ দুর্নীতির প্রশ্রয়বশতঃ ইউরোপীয় জাতির অধঃপতন ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে—সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কোন্ জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াও কোন্ কর্ম্মের দোষে অধঃপাতের অতলতলে নিপতিত হইয়াছে—পতনের সেই সেই কারণনিচয় অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া সেই সেই সর্ব্বনাশের হেতুগুলি পরিহার করিতে হইবে।"৪২ জনৈক ইউরোপীয় কবি গাহিয়াছেন— "What is good and fair,
Shall ever be our care;
Thus the burden of it rang,
That shall never be our care.
Which is neither good nor fair."৪৩

উত্তম সাহিত্যের উত্তম বিষয়বস্তু পাঠকের মনের উপর "a civilising and ennobling influence"৪৪ বিস্তার করে। বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত করিতে হইবে। কারণ দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে'।৪৫ ইহা রবীন্দ্রনাথের বাক্য। একথার সত্যতা জাপানে বিশেষ করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর তদীয় "চরিত-কথা" গ্রন্থে বলিয়াছেন, "বিদেশের ভাষা অবলম্বন করিয়া

৩৯ See 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা' p. 217 by নন্দলাল সেনগুপ্ত।

৪০ 'সাহিত্যদর্পণঃ'।

৪১ 'জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি' by স্যার আশুতোষ।

৪২ 'জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি' by স্যার আশুতোষ

৪৩ Theognis's Ode on the Marriage of Cadmus and Harmonia quoted by Lord Avebury in his Essay on Education.

৪৪ The Pleasures of Life, part. 1. chap. X,

৪৫ 'সঙ্কলন' P. 27. ৪৬ P. 34.

আমরা যে বড় হইতে পারিব না, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।"৪৬ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি আগ্রহ বা অনুগ্রহ দেখান নাই; তিনি তাঁহার সমস্ত জ্ঞান ও সঙ্গে সঙ্গে পরম শ্রদ্ধা সহকারে বঙ্গবাণীর পূজা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে বঙ্গের ইতরসাধারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশেরও যা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রই তাহার সুব্যবস্থা করেন। বঙ্কিমের পূর্ব্বে ইংরাজিপ্রিয় বাঙ্গালীর জ্ঞান ছিল "যে তাঁহাদের পাঠযোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না।··· ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি?"৪৭ কিন্তু বাঙ্গালীর এই আত্মাবমাননার ধারণা বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রই ইংরাজি শিক্ষার ও সাহিত্যের দ্বাবে ভিক্ষার্থিবেশে উপস্থিত বাঙ্গালীকে আপনার ঘরে ডাকিয়া আনেন। "আজ বঙ্গভাষা কেবল দৃঢ়বাসযোগ্য নহে, উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে—বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে'।৪৮ এই কথা বলিয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার পরম গৌরব প্রচার করিয়াছেন। "যাহা কিছু নীচ, যাহা কিছু সংকীর্ণ, যাহা কিছু অসৎ, ধর্ম্মভাববর্জ্জিত, তাহা উরগ-ক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় পরিহার করিয়া, যাহা সুন্দর, নির্ম্মল, নিষ্পাপ, মনোহর—যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, তাদৃশ সম্ভাবপুষ্প চয়ন করিয়া, সেই সদ্ভাবকুসুমে আমার জননী অনাদৃতা, উপেক্ষিতা বঙ্গবাণীকে অলঙ্কৃত" করিয়া মাতৃভক্ত সন্তানের ন্যায় মাতৃপূজা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ধন্য হইয়াছেন এবং বাঙ্গালী জাতিকে ধন্য করিয়াছেন। বঙ্কিমের সাহিত্য পাঠ করিয়া বাঙ্গালী সেদিন চরম দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। আজ সমাজ ও সাহিত্য আবার যেরূপ উদ্দাম গতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা রুদ্ধ করিবার জন্য পুনরায় বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিচর্চ্চা আবশ্যক হইয়াছে। তজ্জন্য বঙ্কিমের সাহিত্যালোচনার একান্ত প্রয়োজন।

'দেবীচৌধুরাণী' আদর্শবাদমূলক উপন্যাসরাজির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গার্হস্থ্যজীবনের মধ্যে নারীর নিষ্কাম কর্ম্মসাধনই যে নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম তাহা তিনি এই উপন্যাসে স্থাপন করিয়াছেন। "শকুন্তলার জীবনেও 'যেমন হয়ে থাকে' তপস্যার দ্বারা অবশেষে 'যেমন হওয়া ভালো'র মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।"৪৯ তেমনি সকলকে হইতে হইবে—হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এমনি করিয়াই এই উপন্যাসে একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে নানা ঘটনাবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া, নানান্ শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দিয়া, অবস্থার বিচিত্র পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, একটি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ কুলবধূরূপে—'গৃহিণীরূপে—গঠন করা হইয়াছে। গৃহই যে নারীর শ্রেষ্ঠ সাধনক্ষেত্র; সংসারধর্ম্মই যে স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, তাহা দেখান হইয়াছে।' সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এ পথে আসিতাম না।'৫০ এই বাক্যের মধ্যে সেই আদর্শবাদের বীজ নিহিত আছে। পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

এই জন্যই এই উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তি কোন পুরুষ হইতে পারে না। গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে সেই একটি নারীর অদ্ভুত প্রভাব কোন না কোন প্রকারে অল্প বিস্তর প্রকাশ পাইয়াছেই। কোন সমালোচক৫১ বলিয়াছেন- 'Brojeswar is the pivot round which the plot centres. The different crises in Devi's life are all very closely linked with him. He is the main spring behind all the activities of that spirited leader of philanthropic robbers'.—অর্থাৎ ব্রজকে কেন্দ্র করিয়া এই উপন্যাসখানা রচিত হইয়াছে।—ইহা ভুল। প্রফুল্লর জীবনের আলোচনায় স্বামী ব্রজেশ্বরকে কেন্দ্র বলিয়া ধরা যায়। কিন্তু গ্রন্থের দিক্ হইতে বলিতে গেলে বলিতে হয়, দেবীকে কেন্দ্র করিয়াই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই এ গ্রন্থের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন প্রধান ব্যক্তি দ্বারাই সাধিত হয়। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রধান ব্যক্তি দেবী চে স্বয়ং। সেই জন্যই গ্রন্থের নাম 'দেবী চৌধুরাণী।' ব্রজেশ্বরের বহুগুণ সত্ত্বেও, দেবীর বজরায় একজন শ্বেতকায় ব্যক্তির সম্মুখে বীরত্ব দেখাইতে পারিলেও, দেবীর বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে সে প্রায় সম্পূর্ণ ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে। গ্রন্থোক্ত ঘটনাবলীর সংঘটনে ও পরিণামে তাহার ব্যক্তিত্ব—স্বাধীন অভিব্যক্তি কোথাও বিশেষভাবে দৃষ্ট হয় নাই। প্রারম্ভে পিতার সম্মুখে ন্যায়ের পক্ষেও বাক্য ব্যবহারে অপারক, অন্তে পত্নীর বিশালতার কাছে সঙ্কুচিত। ব্রজেশ্বরকে যতটা উৎকৃষ্ট করিয়া অঙ্কন করা হউক না, কবি তাহাকে প্রাধান্য দিতে চান নাই; অন্যথা গ্রন্থের নামে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিবও অভিপ্রেত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র Stuart Mill প্রণীত Subjection of Women পড়িয়া অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়াছিলেন। জাতীয়তার উদ্বোধন করিতে হইলে নারীরও সমান মর্য্যাদা দরকার, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, এবং হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মমতকে লঙ্ঘন না করিয়া নারীকে বিরাট মর্য্যাদা দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহার উপন্যাস মোট ১৪ খানি; তন্মধ্যে ১০ খানি নায়িকার নামানুসারে নাম পাইয়াছে। 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ' এমন কি 'আনন্দমঠ' ভিন্নজাতীয় নামাঙ্কিত হইলেও নারীর প্রভাবমুক্ত নয়। 'চন্দ্রশেখরে' স্বামী চন্দ্রশেখরের চেয়ে শৈবলিনীর প্রভাব খুব বেশী। 'রাজসিংহে' রাণার প্রতাপের পার্শ্বে চঞ্চলকুমারীর তেজোময়ী মূর্ত্তি সব সময়েই ভাসিতে থাকে। শান্তি 'আনন্দমঠ'কে সত্যই আনন্দময় করিয়াছে। তাই বলি, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, বিশেষ করিয়া 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রধান চরিত্র নারী।

প্রাচীন প্রথা অনুসারে, প্রত্যেক গ্রন্থে নায়ক এবং নায়িকা, Hero and Heroine যদি একান্ত থাকা দরকার হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া ব্রজেশ্বরকে নায়ক এবং দেবীকে নায়িকা বলিতে হয়। কিন্তু আমরা 'দেবীচৌধুরাণী'তে 'দেবী'কেই প্রধান ব্যক্তি না বলিয়া পারি না। (ক্রমশঃ)

৪৬ 'চরিত-কথা' p. 34
৪৭ 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম' by হারাণচন্দ্র রক্ষিত
৪৮ আধুনিক সাহিত্য by রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৯ 'তপোবন' by রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫০ 'দেবীচৌধুরাণী part 2, chap. 8,
৫১ Prof. Amiya Kumar Sen M. A., (Cal. University) writes in the Cal. Review, Oct. 1939,

সম্রাট্ ও শ্রেষ্ঠী

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নয়

অনেক দিন পরে বিশ্বনাথকে সামনে বসিয়ে খাওয়ালেন। আজ কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেছে, নিজের মধ্যে একটা বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করছেন বিশ্বনাথ। মনের মধ্যে কোথায় একটা নিভৃত দুর্ব্বলতার বীজ পড়ে ছিল—এতদিন পরে সেটা যেন ফুলে ফলে রূপায়িত হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। বাইরে ভাঙন ধরেছে—অজগর সাপের মতো লালা হরিশরণের ঋণের বন্ধন চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরছে তাঁকে। অবশিষ্ট ছিল সোনাদীঘির মেলা—কুমারদহ রাজবংশের শেষ এক-চ্ছত্র আধিপত্য, কিন্তু তাও আজ হরিশরণের হাতে তুলে দিতে হল। কোথাও কিছু আর বাকী থাকবে না। তাই কি বিশ্বনাথের মন আজ আকস্মিক ভাবে ঘরের দিকে ফিরে গিয়েছে? তাই কি আজ মনে হচ্ছে অপর্ণার কাছে এমন একটা কিছু আছে যেখানে তাঁর শেষ আশ্রয়? রাত্রির অন্ধকারে ওঁরাও মেয়েদের মাংসস্তূপে কামনার আগুন লেলিহ হয়ে ওঠে—মদে আর মত্ততার মধ্যে রাঘবেন্দ্র রায় বর্ম্মার জড়তা-জীর্ণ রং-মহালে যেন দূরবিস্মৃত লক্ষ্ণৌয়ের সেই সরযূ বাঈজীর নূপুরের নিক্বণ শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই রাত যখন শেষ হয়, তখন, তখন? গ্লানি আর অবসাদ। মদ নয়, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল। আজ কি সমস্ত জীবনের ওপর থেকে সেই রাত প্রভাত হয়ে গেল? সে রাত কি আর কোনোদিন ফিরে আসবে না? এক পাত্র শীতল জলের মতো অপর্ণা কি সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে দেবে।

কিন্তু অপর্ণা। অপর্ণা ইংরেজী জানে, অপর্ণা নিজের বিদ্যার গর্ব্বে বিশ্বনাথকে ব্যঙ্গ করে।

অপর্ণার ব্যবহারে কিন্তু তার কিছুমাত্র আভাস পাওয়া গেল না।

বেলা পড়ে এসেছে; দিনান্তের আলোয় ধূসর হয়ে আসছে দিগ্‌দিগন্ত। দেউড়ির ভাঙ্গা সিংহ দুটো বিকেলের ম্লান আলোয় যেন ক্লান্ত বিষণ্ণতার প্রতিচ্ছবি। কাছারীবাড়ির কবুতরগুলো দূরের মাঠ থেকে ধান খাওয়া শেষ করে ফিরে আসছে। নীড় আর শাবকের জন্য ব্যাকুল উৎকণ্ঠা।

অসীম শ্রান্তিতে বিশ্বনাথ একখানা ডেক চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছিলেন। পাশে এসে দাঁড়ালেন অপর্ণা। স্নেহসিক্ত স্বরে বললেন, সারাদিন এমন পাগলের মতো ছুটোছুটি করে বেড়াও কেন?

নীড়মুখী কবুতরগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই নিরুৎসুক গলায় বিশ্বনাথ বললেন, কী করব?

করবার অনেক কিছু আছে, কিন্তু তুমি পথ খুঁজে পাচ্ছ না।

পথ খুঁজে পাচ্ছি না?—দেবীকোট রাজবংশের সামন্ত-রক্ত একবার চলকে উঠেই আবার নিরুত্তাপ হয়ে গেল। আলস্য আর অবসাদের মতো পাণ্ডুর সন্ধ্যা। সন্ধ্যার এত করুণ কোমল রূপ যেন আর কখনো বিশ্বনাথের চোখে পড়ে নি! আর সেই সন্ধ্যা মোহ ছড়িয়েছে—করুণ প্রশান্তি ছড়িয়েছে বিশ্বনাথের মনে।

না।—অপর্ণা তেমনি স্নেহ-মধুর গলাতে বললেন, পথ খুঁজে পাচ্ছ না তুমি। একটা কথা এখনো বুঝতে পারো নি। তিন শো বছর আগে পৃথিবী যা ছিল আজ আর তা নেই।

বিশ্বনাথ নির্ব্বোধ আর হতাশ চোখ মেলে অপর্ণার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কথাগুলোর অর্থ তিনি এখনো ধরে উঠতে পারছেন না। শুধু অনাসক্তভাবে তিনি অপর্ণার বক্তব্যের গতিটা লক্ষ্য করতে লাগলেন।

অপর্ণা লঘুভাবে আঙুলগুলো বুলোতে লাগলেন বিশ্বনাথের রুক্ষ অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে।

—আজ নতুন দিন। রাজার অধিকার আজ টলে গেছে, এটা লালা হরিশরণের যুগ। এযুগে হরিশরণদের জোর বেশি, তারা জিতবেই। তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও না, কিন্তু ব্যোমকেশ সব জানিয়ে গেছে আমাকে। সোণাদীঘির মেলা চলে গেল, এর পরে তুমি দাঁড়াবে কোনখানে?

—সোনাদীঘির মেলা চলে গেল!—ডেক চেয়ারের ওপর বিশ্বনাথ সোজা হয়ে উঠে বললেন, কখনোই না। তুমি দেখো অপর্ণা, ও মেলা কিছুতেই ওর ভোগে লাগবে না—কখনোই না। আমিও এবার দেখে নেব ওই বেণের বাচ্চাকে, দেখে নেব কার জোর কতখানি।

অপর্ণা সস্নেহ হাসলেন। শীতল একখানা স্নিগ্ধ হাত রাখলেন বিশ্বনাথের কপালে। আশ্চর্য, অপর্ণার হাতের স্পর্শ এত মধুর! মনের সমস্ত উত্তেজনা যেন ঝিমিয়ে মরে যায়—যেন ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

—কী করবে? লাঠালাঠি করবে, মেলা ভেঙে দেবে? কী লাভ হবে তাতে? ফৌজদারী। কে জিতবে তাতে? তোমার কত টাকার জোর আছে যে লড়াই করবে তুমি ওই বেণের বাচ্চার সঙ্গে? বরং তোমার যা আছে তাও শেষ হয়ে যাবে, জিত হবে কার?

বিশ্বনাথ চুপ করে রইলেন। এসব কথা কি কখনো ভাবেন নি তিনি? নিশ্চয় ভেবেছেন, অনেকবার ভেবেছেন। মনের দিক থেকে যতটা নির্ব্বোধই তিনি হোন না কেন, এসব অতি সাধারণ সত্যকে বুঝবার মতো বুদ্ধি তাঁর নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বোঝাটাই তো আর সব নয়। মদের পাত্রে যে মৃত্যুর বিষ ফেনিয়ে ওঠে—উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত রাত্রিগুলো যে নিয়তির মতো একটা নিষ্ঠুর আর অনিবার্য্য পরিণতির ইঙ্গিত করে—এ তথ্যকে তিনি চেতনা দিয়ে শিরাস্নায়ু দিয়েই অনুভব করেছেন। কিন্তু দেবীকোট রাজ-বংশের রক্ত। সে রক্ত একাধারে আশীর্ব্বাদ আর অভিশাপ। তীব্র বহ্নিজ্বালার মতো তা নিজেকে রাজমহিমায় জাগ্রত করে রাখে, আবার তীব্র বহ্নিজ্বালার মতোই ইন্ধনের দাবীতে সে নিজেকেই দাহন করতে থাকে। সমস্ত বুঝেও রক্তের মধ্যে সেই বংশক্রমের শৃঙ্খল-বন্ধন বিশ্বনাথ অনুভব করতে থাকেন। অপ্রতি-হত প্রতাপে রাজত্ব করো—নিজের ইচ্ছার ওপরে কোথাও রাশ টেনে দিয়ো না, ভেঙে চুরে সব শেষ করে দাও। রাজা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি—বিধাতার দূত। তাকে বাধা দিতে পারে কে, কে তাকে রুখতে পারে?

তাই বিশ্বনাথ বাধা দিলেন না, অপর্ণার কথার প্রত্যুত্তর দিলেন না। এর মধ্যে সত্য আছে। যা আর কারো কাছে শুনতে ভালো লাগত না—যা লাগত নিজের আত্মমর্য্যাদায়, অপর্ণার স্নেহস্নিগ্ধ পরিচর্য্যার সঙ্গে তা যেন একটা নতুন আবেদন নিয়ে মনের কাছে এসে দেখা দিল। দেউড়ির সীমা ছাড়িয়ে চোখের দৃষ্টি চলে যাচ্ছে দূর দিগন্তে। সিংহদ্বারের হিজলবন যেন গাঢ় কালীর রেখায় চক্রবালে আঁকা রয়েছে। ওই জঙ্গলে একদিন বাঘ থাকত, থাকত শঙ্খচূড়—নীল গাইকে পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরত অতিকায় ময়াল সাপ। আজ ওখানে রাখালেরা গোরু চরায়—বাঁশি বাজায়। কুমীরমারারা কাঞ্চন নদীর নীল জল থেকে কুমীরের বংশ উচ্ছন্ন করেছে—গোরু চরানো শেষ করে রাখালেরা ওই নদী সাঁতার দিয়ে ওপারের গ্রামে চলে যায়। তিনশো বছর! তিনশো বছর কেন, পঞ্চাশ বছর আগে যা ছিল, তাও কি আজ আছে? রামসুন্দর লালা একদিন কুমারদহ রাজবাড়িতে ঘোড়াকে চাল শেখাত, এ কথা আজ কি কারো মনে পড়বে কখনো?

হঠাৎ নিজের অত্যন্ত সজাগ মর্য্যাদাবোধ, দেবীকোটের রক্তের অনমনীয় ঔদ্ধত্য যেন কী একটা মন্ত্রবলে শান্ত হয়ে গেল। অত্যন্ত নতুন—অপ্রত্যাশিত গলায়, আশ্রয়ার্থীর মতো অসহায় স্বরে বিশ্বনাথ অপর্ণাকে বললেন, তুমি কী করতে বলো?

অপর্ণা জয়ের পূর্ব্বাভাস অনুভব করলেন—অনেক দিন পরে নিজের মধ্যে ফিরে এলেন তিনি। কুমারদহের অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ নয়—পার্টি অফিসের অপর্ণা, ভুখ-মিছিলের অপর্ণা।

—তুমি জমিদার, জমির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। আর সেই জমির মালিক যারা—জমি যারা চাষ করে, তারাই তো তোমার আপনার লোক। তাদের জোরেই তোমার জয় হবে। তুমি একা কেন?

—একা কেন?—বিশ্বনাথ যেন চমকে গেল। সত্যি তো—আজ কেন তাঁর এই নিঃসহায় একাকিত্ব। তাঁর অসংখ্য প্রজা যদি আজ এসে দাঁড়ায়—তা হলে তাঁর মতো শক্তি কার আছে। কোনো হরিশরণের সাধ্য নাই তাঁকে জয় করতে পারে।

অপর্ণা বললেন, তিনশো বছর ধরে ওদের অস্বীকার করে এসেছ তোমরা। ওদের কাছ থেকে শুধুই নিয়েছ, এতটুকুও ফিরিয়ে দাও নি। আজ একটুখানি ওদের কাছে নেমে এস—একবার ওদের স্বীকার করে নাও, দেখবে আর কোনো ভাবনা নেই। মনে রেখো ওদের আপনার জন যদি কেউ থাকে, তা হলে সে জমিদার—জমিদারের সঙ্গেই ওদের হাত মিলবে সকলের আগে। আর মহাজন! সে যে ওদের কতখানি শত্রু—তা বোঝবার দিনও ওদের আসছে।

বিশ্বনাথ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অপর্ণার মুখের দিকে। কিছু একটা বুঝতে পারছেন, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছেন না। বাইরে রক্তসন্ধ্যা। ক্রমে কালো হয়ে আসছে। আর আধো অন্ধকারে অপর্ণার মুখখানা সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু কী একটা সম্ভাবনা আর আশার সংকেতে সে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—বিশ্বনাথের অনুভূতির মধ্যে সেটা সঞ্চারিত হয়ে গেল।

—আচ্ছা ভেবে দেখব।—ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বিশ্বনাথ উঠে দাঁড়ালেন। উঠবার ইচ্ছা ছিল না, এই সন্ধ্যা আর অপর্ণাকে কেমন ভালো লাগছিল, কেমন যেন আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল চেতনাকে। কিন্তু উঠতেই হবে—অনেক কাজ। এ সব কথা পরে ভাবলেও চলবে, তার আগে ব্যোমকেশের সঙ্গে লালাজীর টাকাগুলো পৌঁছে দিতে হবে। রাত্রেই সদরে লোক না পাঠালে লাটের নীলাম রোধ করা যাবে না।

মন্থর বিষণ্ণ পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন বিশ্বনাথ, আগে আগে লণ্ঠন ধরে চলল মতিয়া। আর বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অপর্ণা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাঁধানো উঠোনের ওপর দিয়ে ভাবাতুর পায়ে বিশ্বনাথ এগিয়ে চললেন। অপর্ণার কথাগুলো মনের মধ্যে থেকে থেকে গুঞ্জন তুলছে—এতদিন পরে কোথায় যেন জাগিয়ে তুলছে একটা মৃদু অথচ তীব্র আলোড়ন। ওদের দাবীকে স্বীকার করে নিতে হবে, ওদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। কিন্তু কেমন করে? কেমন করে এই মিলন সম্ভব, কী ভাবে চলবে ওদের সঙ্গে হাত মেলানো, ওদের দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া। দেবীকোট রাজবংশ কারো দাবীকে স্বীকার করে না কোনো দিন, শুধু নিজের দাবীকেই প্রতিষ্ঠা করে যায়। তিনশো বছর ধরে আগুন আর রক্ত দিয়ে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে, আজ কি তার একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল?

কাছারী-বাড়ির সামনে আসতেই শোনা গেল ব্যোমকেশের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। তীব্র গলায় সে বলছে, না, এ অপমান চূড়ান্ত অপমান। কখনোই এ সহ্য করা যায় না। আমরা মরি নি এখনো।

কাছারীতে ঢুকে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে?

বিশ্বনাথকে দেখে ব্যোমকেশ তেমনি উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়াল। বললেন, এই যে হুজুর—নিজেই এসেছেন। শুনুন—এই মাণিক ঘোষের কাছেই ব্যাপারটা শুনুন।

মাণিক ঘোষ আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে সাষ্টাঙ্গে বিশ্বনাথকে প্রণাম করল। বিশ্বনাথের প্রজা—সোনাগঞ্জের হাটে দই ক্ষীর বিক্রী করে। মোটাসোটা মাঝারি বয়সের মানুষ। অত্যন্ত সাদা-সিধে লোক—জমিদারের অতিশয় অনুগত। কুমারদহ রাজবংশের প্রতি তার বংশানুক্রমিক শ্রদ্ধা—চার পুরুষ এখানে সে নিয়মিত ভাবে দই ক্ষীরের নজর আর যোগান দিয়ে আসছে।

—ব্যাপার কী মাণিক?

মাণিক সংকুচিত হয়ে গেল।—আজ্ঞে এই আলকাপের দল।

—আলকাপের দল?—বিশ্বনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। কী একটা কথা মনে পড়ে গেল চকিতের মধ্যে।—ঠিক ঠিক, আজ তো ওদের সোনাদীঘির মেলায় গান গাইবার কথা ছিল। আসে নি কি?

—আজ্ঞে আসবে কি?—ব্যোমকেশ সশব্দে ফেটে পড়ল: কেন আসবে তারা? নবীপুরের কাঁচা পয়সা—লালা হরিশরণ ওখানকার লাট সায়েব। এক একরাত পঁচিশ টাকা করে পাবে,

দশ টাকা দরে কেন তারা গান গাইতে আসরে সোনাদীঘির মেলায়?

বিশ্বনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, "ব্যোমকেশ তুমি থামো। যা বলবার তা মাণিক ঘোষকেই বলতে দাও। কী করেছে আল্‌কাপের দল?"

মাণিক ঘোষ বিব্রত বোধ করল। সোনাগঞ্জের হাটে সমস্ত ব্যাপারটার নীরব দর্শক ছিল সে, ব্যোমকেশের কাছে তারই খানিকটা সরল বর্ণনা দিয়েছিল। কিন্তু এর পেছনে এতখানি গোলমাল আছে, তা সে কল্পনাতে আনতে পারেনি। পারলে কখনই বলত না। সে ছাঁ-পোষা মানুষ, সকলের মন জুগিয়ে তাকে চলতে হয়। লালাজীর প্রতাপ তারও অবিদিত নয়। কুমার বিশ্বনাথের প্রতি তার আনুগত্য আছে, লালাজীকেও সে ভেট দিয়ে নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করে। ঐহিক এবং পারত্রিক জগতে তেত্রিশকোটি—তারও অনেক বেশী যত দেবতা আছে, সকলকেই তুষ্ট করবার জন্যেই সে প্রস্তুত।

বার কয়েক দ্বিধা করে টাক চুলকে মাণিক ঘোষ ব্যাপারটা বিবৃত করে ফেলল। ব্যোমকেশ কথার মধ্যেই বার বার লম্ফ-ঝম্প করতে লাগল, বলতে লাগল, এ অপমান সহ্য করে গেলে কুমারদহের আর মাথা তুলে দাঁড়াবার উপায় থাকবে না। আর বিশ্বনাথের সর্ব্বাঙ্গে হিংস্রতার দীপ্তি এমন ভাবে শিখায়িত হয়ে উঠল যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটিও কথা বেরোল না। এতক্ষণ ধরে অপর্ণার কথাগুলো মনের মধ্যে নেশার মতো যে প্রভাব বিস্তার করেছিল—মুহূর্ত্তের আগ্নেয়-কষাঘাতে তা মিলিয়ে গেল। প্রজাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিয়ে যদি লালাজীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তা হলে তার সুযোগ পরে ঢের পাওয়া যাবে, কিন্তু তার আগে—

বিশ্বনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দূরে ঢোলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—বহুকণ্ঠের সম্মিলিত চীৎকার ভেসে আসছে। কিন্তু একটু কান পেতে শুনলেই বোঝা যাবে—ওটা চীৎকার নয়, গান। কাল থেকে সোনাদীঘির মেলা, মেলার যাত্রীরা রাত্রে উৎসবের আয়োজন করেছে।

মাণিক ঘোষ বললে, রূপাপুরের কামারেরা খুব গান জমিয়ে বসেছে। ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি চলছে, আর তার সঙ্গেই—

রূপাপুরের কামারেরা! ঠিক। মুহূর্ত্তে বিশ্বনাথের মনের মধ্যে সব কিছুর সমাধান হয়ে গেল।

দাঁতে দাঁত চেপে বিশ্বনাথ বললেন, লাঠি ধরবে ওই রূপাপুরের কামারেরা। ভেঙে দেবে—উড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে। দেখব বেনের বাচ্চা এবার সোনা-দীঘির মেলা থেকে কত টাকা লুটে নিতে পারে।

মাণিক ঘোষ কথাটা শুনে শিউরে উঠল। মেলায় সে-ও দোকান নিয়ে এসেছে। মেলা যদি লুট হয়ে যায়, তা হলে তারও বিপদ্ কম নয়। তা ছাড়া মাণিক ঘোষের টাকায় নাকি শ্যাওলা পড়ে—এমন একটা জনশ্রুতি সর্ব্বসাধারণে চলিত আছে। অতএব বুদ্ধিমানের মতো কালই দোকান-পাট তুলে নেওয়া ভালো। তা ছাড়া বিশ্বনাথের মতলবটাও লালাজীকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। মাণিক ঘোষ সাধাসিধে নিরীহ মানুষ, কারও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। সুতরাং দু'জনকে খুসি করাই তার উচিত।

বিশ্বনাথ বললেন, ব্যোমকেশ, আমার সঙ্গে এস।

—কোথায়?

—চল, রূপাপুরের কামারদের খবরটা একবার নিয়ে আসা যাক।

কুমারদহ রাজবাড়ী থেকে সোনা-দীঘি মাত্র ছটাকখানেক পথ। একটা বড় আমবাগান, তারপরে ছোট একখানি তৃণবিরল কংকরমণ্ডিত মাঠ পেরোলেই দীঘির উঁচু পাড়টা চোখে পড়ে। আগে ওই পাড়টা ছিল পাহাড়ের মতো উঁচু—কিন্তু বছর বছর ওখানে মেলা বসাতে পাড়টা ধ্বসে ধ্বসে ঢালু আর জায়গায় জায়গায় প্রায় সমতল হয়ে গেছে।

দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সোনা-ফকিরের ভাঙা দরগা। ওপরে গম্বুজ নেই—প্রায় বারো আনী অংশেরই ছাদ ভেঙে পড়েছে। চারদিকে রাশি রাশি ইঁট আর পাথর ছড়ানো। দরগায় ঢুকবার প্রধান দরজার দু'পাশে সম-চতুষ্কোণ কতকগুলো কষ্টি-পাথর সাজানো—লাল লাল ছোট ইটের সঙ্গে বেমানান, দেখলেই বোঝা যায় স্থানান্তর থেকে সংগ্রহ করে ওদের ওখানে সগৌরবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু সগৌরবে নয়, বিজয়-গৌরবে। গৌড়-বঙ্গজয়ী মুসলমানের আক্রমণে বিধ্বস্ত দেবমন্দির থেকে সংগৃহীত শিলাখণ্ড। তাদের বুকে ক্ষয়ে আসা পদ্মের চিহ্ন এখনো দেখা যায়, দেবমূর্ত্তির অস্পষ্ট রেখাঙ্কন এখনো চোখে পড়ে। ঠিক সদর দরজার পেছনেই পাশাপাশি দুটি শ্বেত-পাথরের সমাধি। একটির ওপরে নানা রঙের কাচের টুকরো দিয়ে মিনে করা, সেটি সোনা-ফকিরের, পাশেরটি কার ইতিহাস সে কথা বলতে পারে। আর একপাশে কালো পাথরের একটা দীপাধার—ওখানে ফকিরের নামে বারোমাস 'চিরাগ' জ্বলে। তেল পড়ে পড়ে তার অর্দ্ধেকটাতে একটা পুরু কালো আস্তরণ জমে উঠেছে।

দরগাকে কেন্দ্র করে কোথাও উঁচু পাড়ের ওপর, কোথাও বা নীচের ইঁট পাথর ছড়ানো সমতল মাটিতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে মেলার ছাউনিগুলো মাথা তুলেছে। আর তারই একটা ছাউনিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে রূপাপুরের কামারেরা। এরই মধ্যে হাপর বসিয়েছে, আগুন জ্বালিয়েছে—সোনা-দীঘির উত্তরপাড়ে মেলায় যে-সমস্ত গাড়ি এসে আস্তানা গেড়েছে, এর মধ্যেই তাদের চাকাতে লোহার পাত পরিয়ে দিতে সুরু করেছে ওরা। ওদের দেখে এখন কে বুঝতে পারে যে, মেলা ভেঙে দেওয়াই ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তার জন্যে ওরা কুমার বিশ্বনাথের কাছ থেকে একশো টাকা আগাম বায়না নিয়েছে।

কিন্তু দুদিন পরে যা হবার তা হবে, আপাততঃ ওরা মনের আনন্দে গান জুড়ে দিয়েছে। তিন চারটে বড় বড় মশাল জ্বেলে পুঁতে দিয়েছে মাটিতে, চারদিকে গোল হয়ে ঘিরে বসেছে মেলার কৌতূহলী দর্শকের দল। সুরথ ঢোল বাজাচ্ছে, রামনাথ একটা করতাল পিটছে ঝম ঝম করে। একজন প্রাণপণে বেসুরো একটা বাঁশি বাজাচ্ছে, আর একজন দু' হাতে কতকগুলো ঘুঙুর নিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাল দেবার চেষ্টা করছে। আর মাঝখানে বসে সমস্বরে

গান জুড়েছে ভানী, কামিনী, কামারপাড়ার আরো তিন চারটি যুবতী আর প্রৌঢ়া। তাড়ির পাত্র চুমুকে চুমুকে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, গানের মধ্যে আসছে মত্ততার আমেজ। দর্শকেরা কখনো কখনো এক একটা অশ্লীল উক্তি করছে, কখনো বা বলে উঠছে, বাঃ—বাঃ—বাহবা!

তারই মধ্যে সবটার সুর কেটে দিয়ে একবার চকিত কলরব জেগে উঠল।

—জমিদার, জমিদার!

রসভঙ্গে বিরক্ত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে জনতা উঠে দাঁড়াল। গান বন্ধ করে মেয়েরা জড়োসড়ো হয়ে সরে বসল একপাশে। ঢোল, করতাল, বাঁশি আর ঘুঙুরের বাজনা মুহূর্ত্তে থেমে গেল।

বিশ্বনাথ ডাকলেন, ওস্তাদ!

সামনে এসে আভূমি অভিবাদন জানাল রামনাথ। পেছনে পেছনে এল সুরয, এল বৈজু।

—সব ঠিক আছে?

রামনাথ মাথা নীচু করে রইল। সুরযের পেশীতে লাগল হিংস্রতার মত্ত আন্দোলন। বৈজুর চোখ দু'টো সাপের মতো কুটিল আর বিষাক্ত হয়ে উঠল—মশালের রাঙা আগুন প্রতিফলিত হতে লাগল সেই চোখে।

জবাব দিলে বৈজু। শান্ত গলায় বললে, হাঁ হুজুর, সব ঠিক আছে। আপনার চাকর আমরা।

—বেশ, মনে থাকে যেন।—ঠোঁটের ওপর বিশ্বনাথের দাঁত চেপে পড়ল: কোনো ভাবনা নেই তোদের।

শেষ পর্য্যন্ত যা হবে, তার দায় আমার।

রামনাথের মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের ছায়া। কিন্তু সুরযের সমস্ত চেতনায় রূপাপুরের বিদ্রোহী পূর্ব্বপুরুষেরা সাড়া দিয়ে । অতীতের সম্রাট্ আর অতীতের সৈনিক।

বিশ্বনাথ বললেন, থামলে কেন, গান চলুক তোমাদের।

একজন কোথা থেকে এর মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার যোগাড় করে এনেছে। বিশ্বনাথ চেয়ারে ভালো করে চেপে বসলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখ পড়ে গেল ভানীর ওপর—এমন সুগঠিত, এমন পূর্ণায়ত! রাঘবেন্দ্র রায় বর্ম্মার লালসা আর লোভ উত্তর পুরুষের সমস্ত শিরা-স্নায়ুগুলোকে মাতাল করে দিলে। কোথায় রইল অপর্ণা, কোথায় রইল আসন্ন সন্ধ্যার সেই আবিষ্ট আচ্ছন্নতা। কী হবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে—কী হবে লালা হরিশরণের কথা ভেবে। আপাততঃ এই মুহূর্ত্তটাই সত্য, তার চেয়ে অনেক বেশি সত্য ভানীর এই উচ্ছলিত যৌবনশ্রী। বিশ্বনাথ ব্যোমকেশকে ইঙ্গিত করলেন দু বোতল মদ জোগাড় করে আনবার জন্যে—আর দু চোখের তীব্র নির্লজ্জ দৃষ্টি নিয়ে যেন গিলতে লাগলেন ভানীকে। ওপাশ থেকে বৈজুর সাপের মতো তীক্ষ্ণ চোখ বার বার এসে বিশ্বনাথের মুখের ওপর এসে পড়তে লাগল—আর কেউ না হোক, সে বিশ্বনাথকে বুঝতে পেরেছে।

বৈজু মৃদু হাসল। ভানী একদিন ঘটির ঘায়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। সে কথা বৈজু ভোলে নি—প্রতীক্ষা করে আছে। আজ তার প্রতিশোধের দিন ফিরে এসেছে হয়তো।

রাত বাড়তে লাগল। এল মদের পাত্র, শূন্য হয়ে চলল তাড়ির ভাঁড়। ওদিকে নিজের ঘরে বসে কী একখানা বই পড়তে পড়তে বার বার উৎকর্ণ হয়ে উঠতে লাগলেন অপর্ণা। জানলার ফাঁকে বাইরে শুধু কালো অন্ধকার—আকাশে জলন্ত সপ্তর্ষি। রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সোনাদীঘির দিক থেকে ঢোলের শব্দ আরো উত্তাল আর উন্মত্ত হয়ে উঠছে।

—ক্রমশঃ

বিজ্ঞান-জগৎ

ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পাঁচ

কিন্তু তার আগে তড়িৎ পদার্থের প্রকৃতি সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। কাচের নল রেশমের রুমালের সঙ্গে ঘষলে উভয়ই তাড়িদ্বস্ত হয়। এ কথা বলা হয় এই জন্য যে, ঘষবার পর দেখা যায়, প্রত্যেকেই ওরা কাগজের টুকরা এবং অন্যান্য হাল্কা পদার্থকে অনায়াসে আকর্ষণ ক'রে থাকে। অনুমান করতে হয়, ঘর্ষণের ফলে ঐ নলটা এবং রুমালখানা এমন কোন পদার্থের মালিক হয় যার ফলে ওদের ঐরূপ আকর্ষণ-ক্ষমতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই অজানা পদার্থের নাম তড়িৎ বা বিদ্যুৎ। আরো দেখা যায় যে, যদি দু'টা কাচের নলকে দু'খানা রেশমের রুমালে ঘষা যায় তবে কাচের নল দু'টা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং রেশমের রুমাল দু'খানাও পরস্পরকে বিকর্ষণ করে; কিন্তু প্রত্যেকটা কাচের নলই প্রত্যেকটা রুমালকে আকর্ষণ করে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, ঘর্ষণের ফলে কাচে ও রেশমে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয় তারা ভিন্ন প্রকৃতির। মোটের ওপর দু'প্রকার তড়িতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় এবং বলতে হয়, দু'টা সমজাতীয় তড়িৎবিশিষ্ট পদার্থ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিষম জাতীয় তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

উক্তপ্রকারের ঘর্ষিত কাচের তড়িৎকে বলা যায় ধন-তড়িৎ এবং রেশমের তড়িৎকে বলা যায় ঋণ-তড়িৎ। সুতরাং সংক্ষেপে বলতে পারা যায়—ধনে-ঋণে আকর্ষণ এবং ধনে-ধনে বা ঋণে-ঋণে বিকর্ষণ ঘটে। আরো দেখা যায় যে, ঘর্ষণের পর যদি কাচের নল ও রেশমের রুমালকে একত্র করা যায় তবে সংযুক্ত অবস্থায় ওরা বাইরের কোন পদার্থকে আকর্ষণ করে না, অর্থাৎ উভয় তড়িৎ

মিলে মিশে একটা তড়িৎবিহীন অবস্থা জ্ঞাপন করে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ঘর্ষণের ফলে যে ধন ও ঋণ তড়িতের আবির্ভাব হয় তারা পরিমাণে সমান এবং যদি সমপরিমাণে উভয় তড়িতের মিলন ঘটে তবে ওরা পরস্পরে কাটাকাটি ক'রে তড়িৎ-হীন অবস্থার সৃষ্টি করে। আরো দেখা গেছে যে, কেবল কাচের নল ও রেশমের রুমালই নয়, বিভিন্ন প্রকৃতির যে কোন পদার্থদ্বয়ের পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলেই একটায় ধন ও অপরটায় ঋণ তড়িতের উৎপত্তি হয় এবং পরিমাণেও ওরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের সমান। এর থেকে এবং অন্যান্য পরীক্ষা থেকেও সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জড়দ্রব্য মাত্রই উভয় জাতীয় তড়িতের আধার। যতক্ষণ ওর উভয় তড়িতের মাত্রা সমান থাকে ততক্ষণ ঐ জড় পদার্থে—উভয় তড়িতের কাটাকাটির ফলে—তড়িদ্ধর্মের বিকাশ হয় না। দু'টা বিভিন্ন পদার্থের ঘর্ষণের ফলে এই সমতা নষ্ট হয়—একটার ধন-তড়িৎ বেড়ে যায় এবং অপরটার সম পরিমাণে কমে যায়। যেটার বাড়ে সেটা ধন-তড়িতের এবং যেটার কমে সেটা সম পরিমাণে ঋণ-তড়িতের আধার হয়। সুতরাং পদার্থ বিশেষকে তড়িদ্বন্ত করার অর্থ দাঁড়ালো, ওর অন্তর্গত ধন ও ঋণ তড়িতের সমতা নষ্ট ক'রে ওদের মধ্যে কারুকে খানিকটা প্রাধান্য প্রদান।

কিন্তু তড়িৎ মূলতঃ কি পদার্থ তা' এই ধরনের সাধারণ পরীক্ষা থেকে জানতে পারা যায়না। তড়িতের গঠন কিরূপ? তড়িৎ কণামময় না কল্পিত ইথরের মত ক্রমভঙ্গহীন পদার্থ? তখনকার বৈজ্ঞানিকগণ ধ'রে নিয়েছিলেন যে, তড়িৎ এক প্রকার সরিল পদার্থ (Fluid) এই পদার্থ ক্রমভঙ্গহীন ও ভারহীন এবং এর অংশসমূহ পরস্পরকে বিকর্ষণ ক'রে থাকে। ভারহীন অনুমান করা হয়েছিল এই জন্য যে, তড়িৎবিশিষ্ট হওয়ায় ফলে পদার্থের ওজনে তাঁরা কোন তারতম্য দেখতে পান নি। ঘর্ষণের ফলে এইরূপে যে তড়িতের আবিষ্কার হলো তাকে বলা হয় ঘর্ষণজ তড়িৎ বা স্থির-তড়িৎ। স্থির-তড়িৎ বলা হয় এই জন্য যে, এইরূপ তড়িৎ বিশিষ্ট কোন পদার্থকে কোন তড়িৎ-অপরিচালক (Non-conductor) আধারের ভেতর রেখে দিলে ওর তড়িতের মাত্রা ঠিকই থেকে যায় এবং ঐ নির্দিষ্ট মাত্রা নিয়ে নানা পরীক্ষা করা চলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্যাল্‌বানি প্রবহমান তড়িতের অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন। এর কিছুদিন পরে ভলটা দেখালেন যে, একটা কাচের পাত্রে সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে তার ভেতর একটা তামার চাকৃতি ও একটা দস্তার চাকৃতি দাঁড় করিয়ে রাখলে তাম্রখণ্ডটা ধন-তড়িৎ এবং দস্তা-খণ্ড ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এইরূপ তড়িতাধারকে বলা যায় তড়িৎ-কোষ। আরো দেখা গেল যে, ঐ চাকৃতি দু'টাকে যদি একটা তামার তার (বা অন্য কোন তড়িৎ-পরিচালক পদার্থ) দ্বারা বাইরের দিক দিয়ে সংযুক্ত ক'রে দেওয়া যায় তবে এই চক্রের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হ'তে থাকে। প্রবল তড়িৎ-স্রোত পেতে হ'লে একটা তড়িৎকোষের বদলে পর পর সংযুক্ত বহু কোষ ব্যবহার করতে হয়। এইরূপ কোষের সমষ্টিকে বলা যায় বৈদ্যুৎ-ব্যাটারী।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে উরষ্টেড্ তড়িৎ-প্রবাহ সম্বন্ধে একটা বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর পরীক্ষা থেকে দেখা গেল যে তড়িৎ-প্রবাহ সমন্বিত একটা তামার তার চুম্বকের ওপর বিশিষ্ট ধরণের প্রভাব বিস্তার করে। একটা চুম্বক শলাকায় সুতা বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে স্বভাবতঃই শলাটা উত্তর-দক্ষিণ দিক্-বরাবর অবস্থান করে। উরষ্টেড্ দেখালেন যে, তড়িৎ-প্রবাহবিশিষ্ট একটা তারকে যদি চুম্বক-শলাকাটার সমান্তরাল ভাবে, এবং ওর ঠিক ওপরে বা নীচে ধ'রে রাখা যায়, তবে চুম্বকটা ঘুরে গিয়ে পূব-পশ্চিম দিক্-বরাবর অবস্থান করতে চায়। এর থেকে এইটা প্রতিপন্ন হলো যে, তড়িৎ-প্রবাহ চুম্বক-ধ্রুবের ওপর বলপ্রয়োগ করে. এবং এই বল কতকটা সৃষ্টিছাড়া ধরনের। কারণ, বলটা আকর্ষণও নয় বিকর্ষণ-বলও নয়, পরন্তু তড়িৎ-প্রবাহটার আড়-ভাবে (perpendicularly) অবস্থিত। আড়াআড়ি বল-প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া গেল এই প্রথম। এই পরীক্ষা থেকে আর একটা সিদ্ধান্তও আপনি এসে পড়লো। আমরা জানি ক্রিয়ামাত্রেরই সমান প্রতিক্রিয়া রয়েছে। সুতরাং বলতে পারা যায়, তড়িৎ-প্রবাহ যেমন চুম্বক-ধ্রুবের ওপর, চুম্বক-ধ্রুবও সেইরূপ তড়িৎ-প্রবাহের ওপর উল্টাদিকে সমান বল প্রয়োগ করবে। সুতরাং তড়িৎ-প্রবাহযুক্ত তারটা যদি স্বাধীন ভাবে চলবার সুযোগ পায় তবে চুম্বকের মত তারটাকেও উল্টাদিকে সরে যেতে দেখা যাবে। বস্তুতঃ ফ্যারাডের পরীক্ষা থেকে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

ফ্যারাডের আর একটা বিশিষ্ট পরীক্ষা থেকে তড়িৎ সম্বন্ধে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। পরীক্ষাটা হলো যৌগিক তরলপদার্থের বৈদ্যুৎ-বিশ্লেষণ সম্পর্কে ; আর তথ্যটা হলো এই যে, তড়িৎ জিনিসটা বস্তুত ক্রমভঙ্গহীন সরিল পদার্থ নয়, পরন্তু সাধারণ জড়পদার্থের মতই কণাময়,—অর্থাৎ তড়িতের গঠনেও ক্রমভঙ্গ রয়েছে। পরীক্ষার বিষয়টা এখন না তুলে তথ্যটার কথাটাই আগে আমরা বলবো। যৌগিক তরলপদার্থের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ লবণাক্ত জলের উল্লেখ করা যেতে পারে। খাদ্যরূপে আমরা যে লবণ ব্যবহার করি তা' একটা যৌগিক পদার্থ। ওর রাসায়নিক নাম সোডিয়ম-ক্লোরাইড ; কারণ রসায়ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, একটা সোডিয়ম-পরমাণু ও একটা ক্লোরিন-পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগের ফলে এক একটা লবণের পরমাণু গঠিত হয়েছে। কিন্তু জলের ভেতর দ্রব অবস্থায় লবণের অণুগুলি আস্ত থাকে না। আরহিনিয়স্ এই মত প্রচার করলেন যে, জলে দ্রবীভূত হতে গিয়ে যৌগিক অণুগুলির অনেকেই দু'টুকরা ভেঙ্গে যায়, ফলে সোডিয়ম এবং ক্লোরিনের পরমাণু পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে থাকে ; অধিকন্তু উভয় পরমাণুর অবস্থাই তখন তড়িদ্বন্ত অবস্থা। সোডিয়ম-পরমাণু বহন করে খানিকটা ধন-তড়িৎ এবং ক্লোরিন-পরমাণুতে থাকে ঠিক সম-পরিমাণের ঋণ-তড়িৎ। সমপরিমাণের কারণ গোটা অণুর অবস্থাটা ছিল তড়িৎবিহীন অবস্থা। বিভক্ত অণুর এই ভ্রাম্যমাণ ও তড়িদ্বন্ত অংশদ্বয়কে বলা যায়, 'আয়ন' (ion). বর্তমান ক্ষেত্রে সোডিয়ম ও ক্লোরিন-পরমাণুর প্রত্যেকেই এক একটি আয়ন, কিন্তু ক্ষেত্র-

ভেদে কোন কোন আয়ন একাধিক পরমাণুর সমষ্টিও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বেরিয়ম-ক্লোরাইড্ নামক যৌগিক পদার্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। বেরিয়মের ভ্যালেন্সি বা সঙ্গ-স্পৃহার মাত্রা হচ্ছে ২ বা সোডিয়মের দ্বিগুণ। সুতরাং বেরিয়ম-ক্লোরাইডের অণু গঠিত হয়েছে প্রতিটি বেরিয়ম-পরমাণুর সঙ্গে একজোড়া করে ক্লোরিন-পরমাণুর সংযোগের ফলে। জলে দ্রবীভূত অবস্থায় এই অণু ভেঙ্গে গিয়ে ধন-তড়িৎ বিশিষ্ট একটি বেরিয়ম-পরমাণু এবং সমমাত্রায় ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট একজোড়া ক্লোরিন-পরমাণুতে পরিণত হয় এবং ঐ অংশদ্বয়ের প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে জলের ভেতর বিচরণ করতে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে 'আয়ন' বলতে বোঝায় একটি বেরিয়ম-পরমাণু এবং একজোড়া ক্লোরিন-পরমাণুকে। প্রত্যেক স্থলেই অণুর ভাঙ্গনের ফলে আয়নের পরিণতি। এই ব্যাপারকে বলা যায় 'আয়নী ভবন' (ionisation)

জিজ্ঞাস্য হয়, যদি এক মাত্রার সঙ্গ-স্পৃহাবিশিষ্ট সোডিয়ম-পরমাণুর তড়িতের মাত্রা ১ ধরা যায় তবে দু'মাত্রার সঙ্গ-স্পৃহা-সম্পন্ন বেরিয়ম-পরমাণু কতটা তড়িৎ বহন করে থাকে? উক্ত উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, বেরিয়ম-পরমাণুর তড়িতের মাত্রা হবে ২। কারণ, সোডিয়ম-ক্লোরাইডের ক্লোরিন-পরমাণু বলছে, আমি বহন করি সোডিয়ম-পরমাণুর সমান তড়িৎ বা একমাত্রার তড়িৎ; সুতরাং বেরিয়ম-ক্লোরাইডের ক্লোরিন-পরমাণুযুগল বলবে আমরা উভয়ে বহন করি ২ মাত্রার তড়িৎ; সুতরাং বেরিয়ম-পরমাণু বলবে আমি একাই বহন করি ২ মাত্রার তড়িৎ, নইলে দুটি ক্লোরিন-পরমাণুর পাণিগ্রহণ করে' আমার অনুরূপ ক্ষুদ্র সংসারে তড়িৎ-বিহীন অবস্থা ঘটতে পারতো না। এইরূপ যুক্তি অবলম্বনে দেখতে পাওয়া যায় যে, ল্যান্থিয়ম নামক ধাতুর পরমাণুর সঙ্গে গ্রথিত হয়ে রয়েছে ৩ মাত্রার তড়িৎ। মোটের ওপর এরূপ একটা নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় যে, পরমাণুর সঙ্গ-স্পৃহার সঙ্গে তার তড়িতের মাত্রার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে—যে পরমাণুর সঙ্গ-স্পৃহা যত সে বহন ক'রেও থাকে সেই পরিমাণে তড়িৎ। এখন সঙ্গ-স্পৃহা নির্দ্দেশ করতে হয় ১, ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যাদ্বারা সুতরাং পরমাণুদের তড়িতের মাত্রাও নির্দ্দেশ করার প্রয়োজন ঐ সকল পূর্ণসংখ্যা দ্বারাই। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত এসে পড়ে যে, জড়দ্রব্যের মত তড়িৎপদার্থের গঠনও কণাময়। তড়িৎ-পদার্থ বিভাজ্য হলেও ওর বিভাজ্যতার একটা সীমা রয়েছে। সঙ্গ-স্পৃহা ১ পরিমিত এইরূপ আয়ন কিম্বা পরমাণু যতটা তড়িৎ তার অন্তরে বহন করে ঐ হচ্ছে ক্ষুদ্রতম তড়িৎ-কণা বা তড়িৎ-পদার্থের সূক্ষ্মতম মাপকাঠি। সোডিয়ম বা ক্লোরিন-পরমাণুর মত হাইড্রোজেন-পরমাণুরও সঙ্গ-স্পৃহা ১, সুতরাং হাইড্রোজেন-পরমাণুর সঙ্গে যতটা তড়িৎ গ্রথিত হয়ে রয়েছে তাকেই ক্ষুদ্রতম তড়িৎ-কণা রূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সর্ব্বাপেক্ষা হাল্কা পরমাণুই বহন করে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম তড়িতের মাত্রা; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত টেবলে হাইড্রোজেন-পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা যে ১ দ্বারা নির্দ্দেশ করা গিয়েছে তা' যুক্তিযুক্তই হয়েছে।

আরহিনিয়সের উক্ত মতবাদ একটা অনুমান মাত্র; কিন্তু এর আগেই ফ্যারাডের পরীক্ষা থেকে বৈদ্যুৎ-বিশ্লেষণ সম্বন্ধে যে নিয়মটা আবিষ্কৃত হয়েছিল তা'র থেকেই এই মতবাদ সমর্থন লাভ করেছে। আরহিনিয়সের উক্তি থেকে আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, লবণাক্ত জল বা অন্য কোন যৌগিক তরল পদার্থের ভেতর যদি তড়িৎ-ক্ষেত্র সৃষ্টি ক'রে—তড়িৎ-বল প্রয়োগ করা যায় তবে ধন-তড়িৎবিশিষ্ট আয়নগুলি দল বেঁধে ঐ বলের অভিমুখে এবং ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট আয়নগুলি তার উল্টাদিকে অভিযান সুরু করবে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, তরল পদার্থে তড়িৎ-স্রোত উৎপন্ন করার প্রণালীই হচ্ছে এইরূপ দ্বি-মুখী অভিযানের সৃষ্টি করা। প্রত্যেক আয়ন তার নির্দ্দিষ্ট তড়িতের মাত্রাকে বক্ষে ধারণ ক'রে হয় তড়িৎ-বলের অভিমুখে নয় তা'র উল্টাদিকে ছুটে চলে এবং তারি ফলে তড়িৎ-প্রবাহ। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, বৈদ্যুৎ-বিশ্লেষণের ফলে যতটা ক'রে আয়ন (লবণ-জলের বেলায় সোডিয়ম-আয়ন ও ক্লোরিন-আয়ন) ঐ তরল পদার্থ থেকে উদ্ভূত হবে তাদের ওজন এবং তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা একই অনুপাতে বাড়তে থাকবে। এই নিয়মটাই ফ্যারাডের পরীক্ষা ও পরিমাপ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। কেন এই নিয়ম তার কতকটা ব্যাখ্যা পাই আমরা আরহিনিয়সের মতবাদ থেকে; এবং ফলে, আনুষঙ্গিকভাবে এই তথ্যটাও আবিষ্কৃত হলো যে, তড়িৎ-পদার্থও জড়দ্রব্যের মতই কণাময়। তড়িৎ-কণাগুলি জড়-পরমাণুর মতই অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; কিন্তু সূক্ষ্ম হলেও সসীম এবং জড়-পরমাণুদের মতই মস্ত কারবারী। উভয় শ্রেণীর কণাই সসীম মাপকাঠিরূপে কারবারের জগতে সমান মর্য্যাদার দাবি করে। বৈজ্ঞানিকগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো জড় এবং তড়িৎ উভয়ই কণাময় এবং এই কণাগুলি সসীম পদার্থ। সুতরাং এখন পর্য্যন্ত ব্যবহারিক সত্য খাঁটি সত্যের মর্য্যাদা দাবী ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো এবং গাণিতিক সত্যের একমাত্র প্রয়োজন অনুভূত হলো ব্যবহারিক সত্যগুলির বাস্তব রূপের কল্পনায় কোন ভুলভ্রান্তি না আসতে পারে সে-বিষয়ে সাবধান করার জন্য। দুই আর একে যে তিন হয় এ খুবই ঠিক কিন্তু এ-ঠিকের কোন মূল্যই থাকতো না যদি তিনটা জড়কণা বা তিনটা তড়িৎ-কণা সশরীরে বিদ্যমান থেকে এবং আমাদের অনুভবযোগ্য স্বরূপ নিয়ে গাণিতিকের ফরমূলার ভেতর উপস্থিত হতে না পারতো। ফলে এখন পর্য্যন্ত গাণিতিক বৈজ্ঞানিকের বাহন রূপেই কল্পিত হতে লাগলো।

[ক্রমশঃ]

প্রাক্তন স্বপ্ন (গল্প)

শ্রীবটকৃষ্ণ দাস

পথের বাঁকেই হঠাৎ ওর সুচরিতার সঙ্গে দেখা।...আশ্বিনের ধোয়া আকাশে এক টুক্‌রো উড়ো হাল্কা মেঘের মত একেবারে আচমকা, আকস্মিক। এ রকম হঠাৎ দেখা হ'য়ে যাওয়াটা বড় আশ্চর্য্য ঠেকে অপূর্ব্বর কাছে, এত আশ্চর্য্য যে বিশ্বাস করতে পারা যায় না; অথচ এই অবিশ্বাস্য, অচিন্তনীয়, অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য্যটাই আজ হঠাৎ ওর সামনে এসে এমনভাবে চমক লাগিয়ে দিল যে, বিশ্বাস না ক'রেও কোনও উপায় নেই। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ঘটনা, অথচ অপূর্ব্বর কাছে সেটা একটা মস্ত বড় হেঁয়ালি, যার ইঙ্গিতে ও বোবা হ'য়ে গেছে, অসাড় হ'য়ে গেছে, অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। কি করবে ও? কিছু একটা বল্‌তে হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু কিছু না বলাটাই যেন আরো সহজ ওর কাছে। একটা ভয়ঙ্কর দোটানায় পড়েছে অপূর্ব্ব, একটা বিশ্রী আবর্ত্তের ফেনিল উচ্ছ্বাসে যেন টলমল করছে ও, কখন তলিয়ে যায় তার ঠিক নেই। সুচরিতা কিন্তু আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না, ডাকে—"অপূদা।" অপূর্ব্ব একটু হাল্কা হোল, খানিকটা নিশ্চিন্ততার ভেতর হঠাৎ যেন ও নিজেকে পারলো একটুখানি জানতে,—বিষাক্ত ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাবার পর রোগী যেমন নিজেকে একটু জানতে পারে, ঠিক সেই রকম। অপূর্ব্ব সুচরিতার মুখের দিকে চায়, দেখে,—সুচরিতার হাতে একটা মস্তবড় গোলাপ ফুলের তোড়া, আর তার ওপর ঢাকা জেলীর মত কোমল একটা হাল্‌কা রুমাল। মৃদু একটু হেসে সুচরিতা জিজ্ঞাসা করে—"খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছো, না?" অপূর্ব্ব একটু হাস্‌তে চেষ্টা ক'রেও পারে না, তাড়াতাড়ি জবাব দেয়—"একটু আশ্চর্য্য হ'য়েছি বৈ কি! আজ পাঁচ বছর পরে হঠাৎ দেখা।" সুচরিতার ঠোঁটে এক টুক্‌রো মরা, বর্ণহীন হাসি ভেসে ওঠে, মাথা নীচু ক'রে ও বলে—"আজ তোমার জন্মদিন, তাই আস্‌ছিলাম তোমায় ফুলগুলো দিতে,...মাঝখানের পাঁচটা বছর তো আর আসতে পারি নি।" বহুদিন পরে আজ হঠাৎ অপূর্ব্বর মনে হোল,—আজ ওর জন্মদিন। একেবারেই ভুলে গেছলো ও,...জন্মদিনের কথাটা শুনে মন্দ লাগলো না অপূর্ব্বর, বল্‌লো—"এসেছো যখন, তখন একবার বাড়ীতে চল সুচরিতা।" "না-না, বাড়ীতে আর এখন যাব না, অনেক কাজ ফেলে এসেছি পেছনে...ফুলগুলো নাও"—সুচরিতা ফুলগুলো তুলে দিলো অপূর্ব্বর হাতে। আবার এক মুহূর্ত্তের ছেদ...একটা অসন্নিবিষ্ট মুহূর্ত্তের মৃত্যু। নূতন মুহূর্ত্তের সূচনায় প্রথমেই কথা বল্‌লো অপূর্ব্ব—"সুচরিতা, চল বাড়ীতে গিয়ে একটু বসি।" সুচরিতার মনের এক অজ্ঞাত, অলক্ষিত আগ্নেয়গিরির গহ্বর ফেটে যেন একমুঠো বিষাক্ত গরম কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে চাইলো, একটা সকরুণ প্রবল উচ্ছ্বাস ওর মনের শান্ত, মরা নদী থেকে উপ্‌ছে পড়ে যেন ফেটে পড়তে চাইলো ওর দুটো চোখের শুক্‌নো তীরে, কোন রকমে বল্‌লো তাড়াতাড়ি—"না, না, অপূদা,...ও বাড়ীতে আর আমায় যেতে বলো না, তার চেয়ে চলো ঐ পার্কে গিয়ে বসি।"

কয়েক পা হেঁটে ওরা যখনই পার্কে গিয়ে বসে, গোধূলির অস্তরাগে তখন সমস্ত আকাশটা রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। ওরা দু'জনে বসে আছে নিষ্প্রাণ উপস্থিতির মত,...ভুলে গেছে যে ওরা বসে আছে, বসে আছে অর্থহীন প্রয়োজনে। হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পাওয়া চেতনার খানিকটা টাট্‌কা, গরম নিশ্বাস আছড়ে পড়ে ওদের অনুভূতির তোরণে। ওরা চমকে ওঠে হঠাৎ বিদ্যুতের খানিকটা ঝল্‌সানির মত, ভাবে—কিছু বলতে হবে, অন্ততঃ কিছু বলাই প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে মগজের কামরায় কোন্ যাদুকরের চমক লাগানো যাদুর অপরূপ ছোঁয়ায় ঘুমিয়ে থাকা রাশি রাশি কথা যুগপৎ জেগে ওঠে, লাফিয়ে ওঠে, অস্থির হ'য়ে ওঠে বাইরের একটু আলো আর বাতাসের লোভে। অনেক কথার ঠেলাঠেলি আর ব্যস্ততায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে ওরা, কোনটা বলবে আগে আর কোন্‌টা শেষে? এই বিচার করতে করতেই সুচরিতার ঠোঁটের ওপর প্রথমেই বেজে ওঠে—"পাচ বছর আগের দিনগুলো মনে পড়ে অপূদা?" অপূর্ব্ব যেন কূল থেকে কূলে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ একটা অবলম্বন পায়,...সুচরিতার মুখের দিকে চেয়ে জবাব দেয়—"পড়ে; কিন্তু আজ সেটাই সকলের চেয়ে বড় পরিহাস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।" "ঠিক তাই"—সুচরিতার কোমল, মাংসবহুল বুক বেয়ে একটা কম্পমান দীর্ঘশ্বাস আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে, ওর বেদনার্ত্ত মনের অশরীরী প্রেতাত্মা, অস্পষ্টশ্রুত হাহাকার সেই দীর্ঘশ্বাস। আবার কিছুক্ষণের মূর্চ্ছা, মনের সজাগ চেতনার ওপর অবচেতনার খানিকটা হাল্‌কা ছায়া এগিয়ে আসে, আবার সরে যায়; রিক্ত বিরহী শিল্পীর বাঁশির মত সুচরিতার মনের মুক্ত রন্ধ্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসে গোটাকতক উদাস অশ্রুসিক্ত বাণীর সুসংলগ্ন সুসন্নিবেষ্ট টুক্‌রো—"কিন্তু, আজো যখন সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত, হাঁপিয়ে-পড়া মনটাকে একটু নির্জ্জনতার কোমল ছায়ায় ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই, তখন বারবার কেন সেই হারানো মরচে-পড়া দিনগুলোর সর্ব্বাঙ্গ থেকে রকমারী আলো ঠিক্‌রে এসে চোখ দুটো ঝল্‌সে দেয়, তা আজো বুঝে উঠতে পারিনি অপূদা।" সুচরিতার চোখের কোল দুটো চিক্‌চিক্ ক'রে ওঠে, কালো ভাসমান মেঘের আড়াল থেকে উজ্জ্বল তারার মত...ওর মনের উচ্ছৃঙ্খল মরুভূমির ওপর দিয়ে পাঁচবছরের জমা কালবৈশাখী ছুটে চলেছে হু-হু ক'রে। অপূর্ব্বর মন কিন্তু শান্ত, দৃঢ়, নিরুপদ্রব; ও সহজ, সরল, সাধারণ,—একেবারে নূতন, তাই বেশ শান্তসুরেই ও বলে, "মিথ্যাকে বুঝতে গেলে মনকে অনেক মিথ্যা কৈফিয়তই দিতে হয় সুচরিতা।" "মিথ্যা?" জমাট বিস্ময়ে সুচরিতা আছড়ে পড়ে অপূর্ব্বর সর্ব্বাঙ্গে। অপূর্ব্ব হাসে, কৃষ্ণপক্ষের ম্লান তামাটে চাঁদের মত, জবাব দেয় "তা ছাড়া আর কি! দুটো মুখের রঙীন কথার প্রেরণায় যে মন দুটো কোন কূলের সন্ধান না নিয়েই পাল-ছেঁড়া নৌকার মত প্রবল জোয়ারে ভেসে চলেছিল, আজ হঠাৎ তা স্থির হয়ে গেছে কেন? একদিন যাকে প্রেম ব'লে ভুল করেছিলাম, তা প্রেম নয়,...সে শুধু মুহূর্ত্তের জ্বলে-ওঠা, মুহূর্ত্তের উপচে-পড়া।"

"অপূদা" রুদ্ধ নিশ্বাসে চেঁচিয়ে ওঠে সুচরিতা। অপূর্ব্বর মধ্যে তবু কোন পরিবর্ত্তন নেই.. ও যেন সাগরের পাষাণ-তীর, যার ওপর ঢেউ এসে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়লেও কোনও সাড়া

নেই। সুচরিতার বেদনা-পাণ্ডুর মুখের সহজ প্রকাশেও তাই ও ফুলে ওঠে না, দৃঢ় কণ্ঠে বলে, "ঠিক তাই সুচরিতা; অপরিণত মন নিয়ে যে মিথ্যার পেছনে একদিন ছুটেছিলাম আমরা, সেই মিথ্যাই আজ চৈত্রের সূর্য্যের মত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের জীবনে। যা হয়েছে তা সবই মিথ্যে, আর আজ যেগুলো কারণে অকারণে দুঃস্বপ্নের মত চোখের সূক্ষ্মতম পাতায় পাতায় নেচে বেড়ায়, সেগুলো তার প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।"

সুচরিতা জ্বলে ওঠে, একফুল্‌কি আগুনের ছোঁয়ায় একরাশি টাটকা বারুদের মত। বলে,—"বাণীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত বাস্তব সুরের কোমল প্রাণ রঙীন সূর্য্যের একটুখানি সুস্নিগ্ধ উত্তাপের তৃষ্ণায় হাঁপিয়ে উঠেছিল, বিচ্ছেদের পরেও সেই প্রাণের সত্যিকারের স্পন্দন যদি কোনদিনই প্রতিধ্বনিত হোত তোমার সর্ব্বগ্রাসী মনের শূন্য আনাচে-কানাচে, তা হলে আজ তুমি এ কথা বলতে পারতে না অপূদা'। তোমার নিষ্ঠুর বুকের ভেতর এখনো যে প্রাণটা সজীব হয়ে আছে, তুমি ভুললেও, সে আজো ভোলেনি কিছুই; সে জানে, তোমার আর আমার মাঝ-খানে কত উচ্ছ্বসিত, কত পরিপূর্ণ সোণালী মুহূর্ত্তে দুটো অদৃশ্য অশরীরী মনের কত শতবার আলিঙ্গন হয়েছে, কত বোবা মূর্চ্ছিত মুহূর্ত্তের ভগ্নাংশে আমরা দুজনে দুজনকে লুঠ করে নিয়েছি শত সহস্র হাতে,—দুজনকে রিক্ত করে পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছি দুজনের কাছে।"

সুচরিতা কেঁদে ফেলে, সুপ্ত বেদনার আকস্মিক জাগরণের মর্ম্মান্তিক কশাঘাতে। অপূর্ব্ব তখনো পূর্ব্বের মত কঠিন, তাই বেশ সহজভাবেই বলে, "সে সবই একটা চমৎকার ফাঁকি, একটা অভিনব অভিনয়, তাই তার চিরমৃত্যু হওয়াই ভাল।" সুচরিতার দেরী হয় না উত্তর দিতে, সঙ্গে সঙ্গেই ওর কম্পিত ঠোঁট দুটোয় বেজে ওঠে "বাণীর নূপুর পায়ে দিয়ে তোমার দুটো ঠোঁটের সঙ্গমস্থলে সেদিন যে একটুখানি প্রাণের স্পন্দন বেজে উঠেছিল, আজ তার মৃত্যু হয়েছে জানি; তবু কোনও শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথির মনভোলানো তন্বী চাঁদের মায়ায়, বাসন্তিক মলয়ের নিশ্বাসের আবেশ-যন্ত্রণায়, কোনদিনই কি সে মাটির গর্ভ থেকে একটা আলো-বাতাসবঞ্চিত দুর্ব্বল চারার মত, তোমার মনে ভীরু ক্ষণস্থায়ী প্রাণকে নিয়ে এক ফোঁটা আনন্দেও বেঁচে ওঠে না?" "না, না, না", অপূর্ব্বর দৃঢ় জবাব। মিশ্‌কালো সাড়ীটার আঁচলে মুক্তোর মত ধব্‌ধবে অশ্রুকণাগুলোকে সযত্নে লুকিয়ে রেখে আস্তে আস্তে বল্‌লো সুচরিতা, "আসি অপূদা; যাবার সময় আশা-ভীরু মনে একটা অনুরোধ শুধু তোমায় করছি, ফুলগুলো যত্ন ক'রে রেখো, ওগুলো আমার অন্তরের অকৃত্রিম প্রীতি-উপহার, পাঁচ বছর আগে তোমার তিন্‌টে জন্মোৎসবে যা দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার,...আর এই চিঠিটা পড়ো।" স্বেদাক্ত, উত্তপ্ত বুকের ওপর বক্ষোবাসের আড়ালে রেখে দেওয়া একটা নীলচে, খস্‌খসে খাম বার্‌ করে ও দেয় অপূর্ব্বর হাতে, অপূর্ব্ব নিঃশব্দে গ্রহণ করে। সুচরিতা উঠতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় অপূর্ব্ব বললো, "আবার কবে আসবে সুচরিতা?"

"ঠিক জানি না; কালই আবার "ওঁ"র সঙ্গে ঝরিয়া যেতে হবে।"

পার্ক থেকে বেরিয়ে ওরা চললো সোজা রাস্তা ধরে, কম্পমান প্রদীপ-শিখার মত। রাস্তার ওপার দিয়ে ছুটন্ত একটা ট্যাক্সিকে ডেকে সুচরিতা উঠে বসে, বলে, "যদি কিছু ব্যথা দিয়ে থাকি, ক্ষমা করো অপূদা।" নেহাৎ সৌজন্য আর ভদ্রতার তাড়নায় সুশ্রী জবাব দেয় অপূর্ব্ব, "ওকথা ব'লে লজ্জা দিও না।" "আসি" সুচরিতার ট্যাক্সি ছুটে চললো—অপূর্ব্বর দৃষ্টিকে পছনে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গেই অপূর্ব্বর মনে পড়ে, রীতিমত প্রয়োজনীয় একটা কাজ এখনো বাকী আছে ওর। শাড়ী একখানা কিনতে হবে ওকে মানসীর জন্মে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেয় ও, তারপর উঠে বসে একটা ট্রামে। দোকানে গিয়ে অনেক বিচার-বিবেচনার পর কেনে একখানা শাড়ী, ওর মতে মানসীকে সকলের চেয়ে বেশী মানাবে যেটা। মানসীর বিদ্যুতের ঝল্‌সানির মত স্পষ্ট আর উজ্জ্বল দেহে অস্পষ্ট আর ধোঁয়াটে রঙের সাড়ীই মানায় ভালো।

মানসীর কাছে অপূর্ব্ব যখন এসে পৌঁছালো, রাত তখন প্রায় ন'টা। অপূর্ব্বর প্রতীক্ষায় থেকে মানসী তখন পিয়ানোর ঠুং ঠাং ছন্দে নিজেকে হাল্‌কা ক'রে তুলছে, তরঙ্গায়িত ক'রে তুলছে, পল্লবিত ক'রে তুলছে। দরজার আড়ালে খুটুখাট্‌ শব্দ, অপূর্ব্ব ঢ়ুকলো ঘরে এসে। মানসী চঞ্চল হয়ে উঠলো, অপূর্ব্বর সামনে গিয়েই লাল গোলাপগুলোর দিকে চেয়ে বললো, How lovely: আমায় ফুলগুলো দেবেন?" "আপনার জন্মেই তো এনেছি, ফুল ফুলের পাশেই মানায় ভালো" নির্ব্বিবাদে, নিঃসঙ্কোচে নিশ্চিন্তে জবাব দিলো অপূর্ব্ব। অধীর আনন্দে মানসী ফুলগুলো ছিনিয়ে নিলো অপূর্ব্বর হাত থেকে, তারপর নিয়ে গেল নাকের কাছে,...এক মুহূর্ত্ত আঘ্রাণ নিয়ে আস্তে আস্তে ওর পরিপূর্ণ ঠোঁট দুটোয় একটা হাল্‌কা চুম্বন এনে রেখে দিলো একটা ফুলে, অতি সন্তর্পণে, সচেষ্ট সাবধানতায়, পাছে ওর চুম্বনের আঘাতে ফুলের কোমল পাঁপড়িগুলো নুয়ে পড়ে, ঝ'রে পড়ে বৃন্ত থেকে খসে। টেবলের ওপর ফুলদানিতে মানসী সুন্দর ক'রে তোড়াটা রাখলো সাজিয়ে। অপূর্ব্ব মানসীর হাতে সাড়ীটা দিলো,...বললো, "দেখুন, এবার পছন্দ হ'য়েছে তো?" বৈদ্যুত আলোর সামনে সাড়ীটা খুব ভাল করে নাড়াচাড়া ক'রে দেখে মানসী,...ওর চোখের ভেতর থেকে ঠিক্‌রে পড়ে গভীর তৃপ্তির উজ্জ্বল আলো,... খুব পছন্দ হয়েছে ওর, অপূর্ব্বর পাশে এসে বসে মানসী,...একেবারে পাশে। অপূর্ব্বর মনে তখন উন্মাদনার রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, একটা চুম্বনের তৃষ্ণায় হাঁপিয়ে উঠেছে ওর চির-তৃষ্ণার্ত্ত দুটো লোভী ঠোঁট; মানসীকে ও টেনে আনে একেবারে নিবিড়তম সংস্পর্শে,... ছড়িয়ে দেয় একটা উত্তপ্ত, প্রলম্বিত চুম্বন দ্বাদশীর চাঁদের মত মানসীর দু'টো ঠোঁটের সঙ্গমস্থলে,.. টেনে নেয়, শুষে নেয়, লুঠ করে নেয় মানসীর ঠোঁট দুটোর এক অজ্ঞাত, অদৃশ্য কোণ থেকে যত রাজ্যের সঞ্চিত মধু। মানসী বাধা দেয় না, নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়ে একটা অবলম্বনের মত অপূর্ব্বর এক-খানা হাত টেনে আনে একেবারে নিজের কোলের ভেতর।

উঃ, কি সাংঘাতিক গরম মানসীর কোলের ভেতরটা, অপূর্ব্ব

শিউরে ওঠে।……হঠাৎ অপূর্ব্ব নিজেকে মানসীর কাছ থেকে মুক্ত করে নেয়, বলে—"কাল কিন্তু আপনাকে আমার ওখানে যেতে হবে।"

"যাব" আবেশ-কম্পিত স্বরে জবাব দেয় মানসী। অপূর্ব্ব যায় বেরিয়ে।

ঘরে এসে এই সর্ব্বপ্রথম অপূর্ব্ব আবিষ্কার করে,—ও বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটা ইজি-চেয়ারের কোমল অঙ্কে ও নিজেকে বিলিয়ে দেয়,—তার পর চোখ দুটো দেয় বুজিয়ে, নিশ্চিন্ত আলস্যে গভীর শান্তিতে। মানসীর চুম্বিত, কম্পিত, আরক্ত ঠোঁট দুটোর কথাই মনে পড়তে লাগলো ওর বার বার,—সেই ঠোঁটে কত মধু, কত মদিরা। হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় সুচরিতার দেওয়া চিঠিটার কথা, কোটের পকেট থেকে খামটা বার করে চিঠিটা ও ধরে চোখের সামনে, পড়ে…

"অপূদা,

স্বামীকেই সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে আজ রিক্ত হয়ে আছি; একদিন তোমাকেই সব দিয়েছিলাম, পেয়েও ছিলাম অনেক; সে সব আজ "প্রাক্তন স্বপ্নের" মতই মনে হয়। যুগল হিয়ার কল্পনা দিয়ে নীড় বেঁধেছিলাম একদিন, সে নীড় ভেঙে গেছে। জীবনের ক্ষেত্রে বীজ বপন করাই শুধু সার হোল, ফসল ফল্‌লো না। সে দুঃখ আজো বিষাক্ত গ্যাসের মত গুমরে গুমরে ওঠে মনে, জানি না কবে মুক্তি পাব। স্বামী থাকতেও অন্য কোনও পুরুষের চিন্তা করা মহাপাপ জানি, কিন্তু কি করব অপূদা, আমার অতীত আমার সমস্ত বর্ত্তমানকেই যে গ্রাস ক'রে নিয়েছে। যাক্, পুরাণো দিনের জের টেনে তোমায় ভারাক্রান্ত করতে চাই না, তুমি আমায় চিরদিনের জন্যে ভুলে যাবার চেষ্টা কর।

—সুচরিতা।"

অপূর্ব্ব একটু হাসে, তন্দ্রাজড়িত অবসাদের গুরুভারে নুয়ে পড়ে ওর দুটো ক্লান্ত চোখের পাতা, বিস্মৃতির শূন্যতায় লীন হয়ে যায় ওর সমস্ত চেতনা—বুঝতেই পারে না কখন, কোন এক অজ্ঞাত অসতর্ক মুহূর্ত্তে ওর শিথিল হাত থেকে চিঠিটা পড়ে যায় পাশের Waste Paper-box-এ।

প্রাচীন কলিকাতার বিশেষত্ব

শ্রীবিশ্বনাথ সেন, এ্যাটর্নী-এ্যাট-ল

কলিকাতা বঙ্গদেশের অতি প্রাচীন ও অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নগর। ইংরাজ-রাজত্বের বহু পূর্ব্ব হইতে ইহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসপাঠের দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে, মোগল-সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে রাজা টোডরমল সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য জরীপ বা সার্ভে করিয়া যে মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে কলিকাতার উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার সময়ে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক যে, "আইনি আকবরি" নামক পুস্তক প্রচলিত ছিল, তাহাতেও কলিকাতার পরিচয় পাওয়া যায়(১)। কলিকাতার ইতিহাস এখন হইতে সুরু নহে, ইহার বহু পূর্ব্বে কবি বিপ্রদাস চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রা সম্বন্ধে যে গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও কলিকাতার উল্লেখ আছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, কলিকাতার উৎপত্তি হিন্দুদিগের রাজত্বকালে হইয়াছে(২)। তবে এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতা অতি প্রাচীন নগর হইলেও ইহা নিজে একটি স্বতন্ত্র পরগণা ছিল না। এক সময়ে ইহা সপ্তগ্রাম অর্থাৎ বর্ত্তমান হুগলীর মালগুজারি সেরেস্তার অধীন ছিল। আরও দেখা যায় যে, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাঁহার সেনাপতি মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য বঙ্গদেশে আসেন। তখন তাঁহাকে নদীয়ার জমিদার ভবানন্দ, সাবর্ণ চৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত এবং বংশবেড়িয়ার রাজা জয়ানন্দ এই তিনজন যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার পারিতোষিক হিসাবে তিনি কলিকাতাকে উক্ত তিনজন ব্যক্তিকে জায়গীর স্বরূপ দান করেন। ইহারাই কলিকাতার আদিম মালিক (৩)। কলিকাতা এখন City of Palaces এবং বৃটিশ রাজত্বে দ্বিতীয় নগর বলিয়া বিখ্যাত। বর্ত্তমান কলিকাতার দৃশ্য হইতে প্রাচীন কলিকাতার কোন ধারণা করা যায় না। প্রাচীন কলিকাতার পরিমাণ (area) বর্ত্তমান কলিকাতা হইতে অনেক অংশে ক্ষুদ্র ছিল এবং সে সময়ে ইহা গ্রাম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। বর্ত্তমান কলিকাতা তিনটি গ্রামের সমষ্টি—সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা। কলিকাতার প্রাচীন মানচিত্র দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমানে ইহার কতখানি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে(৪)। বর্ত্তমান কলিকাতার উত্তর অংশই সুতানুটী অর্থাৎ উত্তরে মহারাষ্ট্র ডিচ্ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে বর্ত্তমান Minthouse পর্য্যন্ত যে অংশ, উহাই সুতানুটীর পরিমা। তন্নিম্নে অর্থাৎ Minthouse হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে Customs

(১) Statistical Account of Bengal, Vol. 1 page 381.

(২) Bengal District Gazetteer—24 Pargannas page 26.

(৩) Calcutta Guide—S. C. Sarker. page 2.

(৪) Notes on Geography of Old Bengal—Monmohan Chakravarti—page, 284-5.

House পর্য্যন্ত প্রাচীন কলিকাতার পরিমা এবং তন্নিম্নে অর্থাৎ যে স্থানে বর্ত্তমান দুর্গ ও ময়দান উহা গোবিন্দপুরের চিহ্ন (৫)। নিম্নে প্রাচীন কলিকাতার একটি মানচিত্র দেওয়া গেল :—

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে কলিকাতার উল্লেখযোগ্য পরিচয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যকালে পাওয়া যায়। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হুগলী নগরে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির এজেণ্ট Charnock-এর সহিত মোগল কর্ম্মচারীদিগের মনোমালিন্য ঘটে। তাহার ফলে ইংরাজগণ হুগলী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ত্তমান কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে অর্থাৎ সুতানুটী গ্রামে আসিয়া কুঠি স্থাপন করেন। সুতানুটীর অর্থ সুতার হাট; ইহাতে বুঝিতে পারা যায়—প্রাচীন কলিকাতা সহর ছিল না বটে কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে ইহার গুরুত্ব ছিল। বর্ত্তমান বড়বাজার তাহার স্পষ্ট পরিচয় এবং উহার মধ্যে "সুতাপটী" "তুলাপটী" প্রভৃতি স্থানের নাম প্রাচীন গৌরব জাহির করিতেছে।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে Charnock সাহেব যখন হুগলী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় কুঠি স্থাপন করিলেন, তখন কলিকাতার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। পাকা বাটী ছিল না বলিলেই চলে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে জঙ্গল ও পুষ্করিণীপূর্ণ অতি অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। অনেকে শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, কলিকাতার জঙ্গলে হিংস্র জন্তু ও পুষ্করিণীতে কুম্ভীর বাস করিত(৬)। যে স্থানে বর্ত্তমান ময়দান উহা পূর্ব্বে গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। কলিকাতার স্বাস্থ্য এতই মন্দ ছিল যে, Charnock সাহেব এখানে আসিবার অল্পদিন পরে বহুসংখ্যক ইংরাজের অকালমৃত্যু ঘটে। সেজন্য ইংরাজগণ ইহাকে Golgotha(৭) বলিত। কিন্তু এই সকল বাধাবিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও Charnock সাহেব এখানে সুচারু রূপে বাণিজ্য করিতে থাকেন, তাহার ফলে বহুসংখ্যক ইংরাজ আসিয়া এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করিলেন। ইহার পর ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে একটি ঘটনা হয়। যাহার দ্বারা ইংরাজগণ কলিকাতায় দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হইলেন।

(৫) সরল বাঙ্গালা অভিধান—সুবলচন্দ্র মিত্র—৩০৫ পৃষ্ঠা।

(৬) A place of mists, allegators and wild boars—Staendal's Historical Account of Calcutta page 208।

(৭) Place of skulls—District Gazetteer—24 Parganas—page 23.

Death overshadowed every living soul—Wilson's Early Annals of English in Bengal—page 208.

বর্দ্ধমান জেলার জনৈক জমিদার সুবসিংহ হঠাৎ মোগলদিগের উপর বিদ্রোহী হইয়া রহিম খাঁ নামক একজন আফগানের সহিত যোগদান করেন। ইংরাজগণ সেই সুযোগে তৎকালীন বঙ্গদেশের মোগল সুবাদার সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমের নিকট হইতে শান্তিরক্ষা ও শত্রু দমনের জন্য একটি দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেই উপলক্ষে ইংরাজদুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম বর্ত্তমান জেনারল পোষ্ট অফিস যে স্থানে আছে ঐ স্থানে নির্ম্মিত হয়(৮)। তাহার পর ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ

প্রাচীন কলিকাতা

অর্থাৎ তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৩০০ টাকা বাৎসরিক রাজস্ব বিনিময়ে গোবিন্দপুর, সুতানুটী ও কলিকাতা এই তিনখানি মৌজার জমিদারি স্বত্ব ক্রয় করিবার নিমিত্ত তৎকালীন নবাব প্রিন্স আজিম আমানের নিকট হইতে আজ্ঞাপত্র (letters patent) লয়েন এবং পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্মীকান্ত রায়ের নিকট হইতে একটি সনদমূলে তিনখানি মৌজার জমিদারী (dependent talukdari) স্বত্ব লাভ করেন। জায়গীর হস্তান্তরের অযোগ্য, সেই কারণে ইংরাজগণ উক্ত সনদমূলে মাত্র খাজনা আদায় করিবার অধিকার পাইলেন। অল্প কথায় তাঁহারা প্রজাস্বত্বের মালিক হইলেন। এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতা ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কালেক্টরীতে যে খাজনা দেওয়া হয়, তাহাকে rent বা ground rent বলে, উহা কিন্তু revenue নহে। ইংরাজদিগের এই জমিদারী স্বত্বই ক্রমশঃ বিশাল রাজত্বে পরিণত হইয়াছে (৯)। তাহার পর ইং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ২৩শে জুন তারিখে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের মালিক হইলেন। ঐ বৎসরই তাঁহারা তৎ-

(৮) History of India—Meadows Taylor Page 396.

(৯) Constitutional Law—Sarbadhikary, page 350. Mayor of Lyons *vs.* East India Co. 1 M. I. A. 173 (271)

কালীন বঙ্গদেশের নবাব মিরজাফরের নিকট হইতে কলিকাতার চতুঃপার্শ্বস্থিত জমিসমুদয়ের জমিদারি স্বত্ব লাভ করেন। এবং এঁরা সেই উপলক্ষে প্রাচীন কলিকাতা অর্থাৎ সুতানুটী গ্রামটিকে সম্পূর্ণ লাখরাজ বা নিষ্কর স্বত্বে পরিণত করেন। তাহার পর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ পুরাতন দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুর গ্রামে বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; সেই সময় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বর্ত্তমান ময়দান প্রস্তুত হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে যতই সুদৃঢ়ভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন, কলিকাতা ততই সমৃদ্ধি লাভ করিল এবং ভারতের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা রাজধানী ছিল। ইহাই কলিকাতার সাধারণ ইতিহাস।

* * * *

রাজকার্য্য-পরিচালনা—

কলিকাতায় আধিপত্য স্থাপন করিবার বহু পূর্ব্বে ইংরাজগণ মান্দ্রাজ দখল করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা মান্দ্রাজের অধীন ছিল। ইংরাজ অধিকারের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ ইং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বহাল ছিল। ১৭০৭ হইতে ১৭৭৩ পর্য্যন্ত ইহা বোম্বাই ও মান্দ্রাজের মত একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেণ্ট একটি আইন(১০) প্রচার করেন—যদ্দ্বারা ইংরাজ-অধিকৃত সকল স্থানের মধ্যে কলিকাতা সর্ব্বোচ্চ প্রাধান্য লাভ করে এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ ব্যতীত অন্য সকল স্থান কলিকাতার অধীনে পরিগণিত হয়; এই উপলক্ষে কলিকাতার গভর্ণর "গভর্ণর জেনারেল" আখ্যা পাইয়াছিলেন ও কলিকাতা মুর্শিদাবাদের পরিবর্ত্তে বাংলাদেশের রাজধানী হইল। সেই সময়ে সরকারী মালখানা (Imperial Treasury) কলিকাতায় স্থাপিত হয়। কলিকাতার গভর্ণর জেনারেলের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার কার্য্য তদারক করিবার জন্য একটি ডেপুটির পদের সৃষ্টি হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার শাসন-ভার স্থায়ী ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট (Lieutenant) গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন, তাহাকে চলতি কথায় ছোটলাট বলা হইত। এই সময়ে আলিপুরে Belvedere নামক প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল; উহা Lieutenant গভর্ণরের বাস-স্থান ছিল। পূর্ব্বে গভর্ণর দুর্গে (fort) বাস করিতেন। বর্ত্তমান Government Palace লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ের পরিচালনা—

ইং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ অর্থাৎ তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর অধিপতি শাহ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। এই দেওয়ানি লাভই বৃটিশ সম্রাজ্য স্থাপনের বীজ (১১)। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ দেশীয় কর্ম্মচারিগণ ইংরাজদিগের তত্ত্বাবধানে কলিকাতা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত স্থানসমূহের রাজস্ব (ground rent) আদায় করিতেন। এই বিভাগের প্রধান হিসাবে একজন দেওয়ান ছিল। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যে এই রীতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। দেওয়ানের স্থানে একজন কালেক্টার নিযুক্ত হইলেন। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতার কলেক্টার এক ex-officio কর্ম্মচারী মাত্র। রাজস্ব বলিতে যাহা বুঝায় উহা ground rent মাত্র। সেই হেতু গভর্ণমেণ্ট ইস্তাহারমূলে কলিকাতার যে কোন অধিবাসী পূর্ব্বে ৩০ এবং বর্ত্তমানে ৩৫ বৎসরের ground rent একসঙ্গে দিয়া তাহার দখলী জমিসমূহ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কর করিয়া লইতে পারে। এ-স্থলে আরও বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতার ground rent একজন ডেপুটি দ্বারা আদায় হয় এবং তিনি ষ্ট্যাম্প ও আবগারি সংক্রান্ত সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করিতেন।(১২)

আইন-আদালত—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইং ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হুগলী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করেন। পরে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনখানি মৌজার জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন ও বহুসংখ্যক ইংরাজ কায়েমী ভাবে এখানে বসবাস আরম্ভ করেন। সেই উপলক্ষে তৎকালীন ইংলণ্ডের আইন অর্থাৎ Common Law ও Statutory Law উভয়েরই এদেশে প্রচার হইয়াছিল। বিদেশে বাণিজ্যক্ষেত্রে নিজ দেশীয় আইন প্রচার করিবার ক্ষমতা ইংরাজগণ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সনন্দ (charter) মূলে পাইয়াছিলেন এবং এই সনন্দমূলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার দখলস্থিত সমুদয় স্থানে নাবিক ও নৌ-যান সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারে ও ফ্যাক্টরী ও তথাকার কর্ম্মী সম্পর্কে ও বাণিজ্য বিষয়ে সকল ব্যাপারে ইংলণ্ডের প্রচলিত আইন-কানুন প্রচার করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়াছিলেন(১৩)। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে Charles II-এর সনন্দ (charter)-মূলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজ অধিকৃত সকল স্থানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রচার করিবার ক্ষমতা পান। কিন্তু সে সময়ে এদেশীয় অধিবাসী-দিগের উপর ইংলণ্ডের কোন প্রভুত্ব ছিল না, সুতরাং তৎকালীন ইংরাজ অধিবাসিগণই কেবলমাত্র ইংলণ্ডের আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হইতেন। বহুসংখ্যক ইংরাজ এখানে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করার হেতুও কিয়ৎ পরিমাণে ইংরাজী Common Law or Statutory Law এদেশে প্রচলনের ফলে বিলাতী আদালতের প্রয়োজন হয়। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতার জমিদার ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না, সুতরাং তৎকালীন জমিদারদিগের অনুকরণে কলিকাতায় একপ্রকার আদালতের সৃষ্টি হয় এবং তাহার কার্য্য-প্রণালীও (procedure) জমিদারদিগের আদালতের মত

(১০) Regulating Act of 1773 (13 Geo. III C. 63).

(১১) Aitchison Treaties (India) page 60 Courts & Legislative Authorities in India—Cowell page 23

(১২) District Gazetteer—24 Pargannas.

(১৩) Mayor of Lyons *vs.* East India Co. 1 M. I. A. 272.

ছিল। পারস্য ভাষা আদালতে ব্যবহার হইত এবং নথীপত্র-সমূহে লেখা হইত(১৪)। কিন্তু কলিকাতার এদেশীয় অধিবাসী-দিগের উপর কোম্পানীর আদালতের কোন ক্ষমতা (jurisdiction) ছিল না; উহাদের বিচার জনৈক মুসলমান কাজির দ্বারা হইত (১৫)। তাহার পর George I.-এর রাজত্বকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Director-গণ তৎকালীন কলিকাতা প্রভৃতি বৃটিশ-অধিকৃত স্থানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ে সুক্ষ্ম ও শীঘ্র বিচারের উত্তম বন্দোবস্ত না থাকার দরুণ রাজ্যশাসন-বিষয়ে অসুবিধাসমূহ ইংলণ্ডের অধীশ্বর অর্থাৎ Crownকে জানান। তাহার ফলে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় Mayor's Court স্থাপিত হয় (১৬)। Mayor's Court কোম্পানীর আদালত ছিল না, উহা Crown কোর্ট ছিল। এ-স্থলে বলা যাইতে পারে যে, Mayor's Court নাম হইতে বর্ত্তমান Old Court House Street-এর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এবং বর্ত্তমানে Dalhousie Square-এর উত্তর-পূর্ব্ব স্থানে যেখানে St. Andrew's Church অবস্থিত, উহা প্রাচীন কলিকাতার Mayor's Court-এর স্থান ছিল। Mayor's Court-এর ক্ষমতা (jurisdiction) এদেশীয় অধিবাসীদিগের উপর ছিল না, যদিও ইহা Crown Court ছিল। ইংলণ্ডের King's Bench-এর ন্যায় ইহা Court of Records ছিল এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সম্বন্ধে Probate ও Letters of Administration grant করিবার ক্ষমতা ইহার ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, Mayor's Court-এর এ-দেশীয় অধিবাসীদিগের উপর কোন বিচারক্ষমতা ছিল না। উহাদিগের জন্য কোম্পানিকর্ত্তৃক পরিচালিত সদর দেওয়ানি ও নিজামৎ আদালত ছিল। ফৌজদারী ব্যাপারের বিচারের জন্য Justices of Peace নামক কতিপয় বিচারাধ্যক্ষের পদ সৃষ্ট হয় (১৭), উঁহারা সকলে নিম্নোক্ত Government Court-এর উচ্চ কর্ম্মচারী। Mayor's Court-এর বিচারে আপিল Government Court শুনিতেন। উহার উপর King-in-Council ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে Government Court ফৌজদারী বিষয়ের বিচার করিতেন, স্বয়ং গভর্ণর সাহেব এই কোর্টের President ছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ এই কোর্টের বিচারকার্য্য চালাইতেন। ইহা ব্যতীত Government Court-এর অনেক অন্য অন্য কার্য্য ছিল(১৮)। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে Mayor's Court-এর এদেশীয় অধিবাসীদিগের উপর কোন বিচারক্ষমতা ছিল না, তবে তাহাদের মধ্যে পক্ষ একমত হইলে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য আদালতে নিবেদন জানাইতে পারিত।

ইং ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে একটি নূতন আইন (১৯) জারি হয় যদ্দারা কলিকাতায় Mayor's Court থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের বিচারের জন্য একটি Court of Request স্থাপিত হয় (১৯) এই Court of Request হইতে Small Causes Court-এর উৎপত্তি হইয়াছে।(২০)

ইহার পর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে Regulating Act (২১) প্রচলিত হয় এবং তাহাতে কলিকাতায় Supreme Court প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লিখিত থাকে। উক্ত আইন অনুযায়ী পর বৎসর অর্থাৎ ইং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট সম্বন্ধে Royal Charter (২২) ইং ২৬শে মার্চ্চ তারিখে প্রচার হয় এবং সেই সঙ্গে আমেরিকার অনুকরণে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সুপ্রীম কোর্টকে প্রাচীন কলিকাতার অন্যতম আশ্চর্য্যজনক বিশেষত্বগুলির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া যায়। সুপ্রীম কোর্ট King's Court ছিল সুতরাং তৎকালীন ইংলণ্ডের King's Bench-এর জজদিগের সকল ক্ষমতা উক্ত Charter মূলে পাইয়াছিল (২৩)। ইহার ক্ষমতা (Jurisdiction) ছিল অসীম। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, Mayor's Court-এর এদেশীয় অধিবাসীদিগের উপর কোনপ্রকার বিচারক্ষমতা ছিল না, কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট সম্বন্ধে সেরূপ কোন আর বাধাবিঘ্ন ছিল না। সমস্ত কলিকাতার ইংরাজ ও এদেশীয় অধিবাসীদিগের উপর ইহার বিচারক্ষমতা ছিল এবং বাহিরের, এমন কি, বঙ্গদেশের সীমান্তে ও ইংরেজদিগের উপর অনেক বিষয়ে ইহার বিচারক্ষমতা ছিল।(২৪) বর্ত্তমান হাইকোর্টের যে Writ of Habeas Corpus, Mandamous or Certoriore প্রভৃতি আজ্ঞা (order) জারির করিতে পারে উক্ত সকল ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের ছিল(২৫)। উহা King's

(১৪) Rules and Orders of the High Court—Ormond.

(১৫) Court's and Legislative Authorties in India—Cowell, page 12.

(১৬) 13 Geo. I.

(১৭) High placed officials or private persons appointed by special commission for keeping peace and enquire into and try felonies, misdemeanours.—Law Dictionary,—Ayer, Page 146.

(১৮) Courts and Legislative Authorities in India, Page 14.

(১৯) George II (26 Geo, II).

(২০) Act IX of 1850.

(২১) Slat 13 Geo 3, Cap 63, 1773.

(২২) Supreme Court Charter, dated the 26th March 1774.

(২৩) "To have such authority as the Justices of King's Bench in England," clause 4 of Charter dated the 6th May 1777.

(২৪) "It was vested with full power and authority to exercise civil, criminal, admiralty, eccelesiastical and equity jurisdiction over all His Majesty's subjects in the three provinces. It had power to veto laws.. ...the object was to place the whole government under the control of this court—Constitutional Law.—Sarbadhikary Page 364.

(২৫) হাইকোর্টের উক্ত ক্ষমতার বর্ত্তমানে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সবিশেষ জ্ঞানার্থে Criminal Procedure Code এর ৪৯১ ধারা ও Specific Relief Act (Act 1 of 1877) এর ৪৫ ধারা দ্রষ্টব্য।

Bench-এর প্রদত্ত। সুপ্রীম কোর্ট উক্ত ক্ষমতা এত বেশী ব্যবহার করিত যে উহাকে অপব্যয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার ফলে তৎকালীন কোম্পানীকর্ত্তৃক পরিচালিত সদর দেওয়ানি ও নিজামৎ আদালত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সুপ্রীম কোর্ট উক্ত আদালতদ্বয়কে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিত। এবং তৎকালীন জমিদারদিগের কার্য্যসম্পর্কে অনেক হুকুম (writ) জাহির করিয়া তাহাদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিত। ইহার Common Law ও Equity Jurisdiction ছিল। সুপ্রীম কোর্টের এইরূপ ক্ষমতা-অপব্যয় ক্রমে এতই অধিক পরিমাণে হইতেছিল যে ইং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেণ্ট আইনবলে উহা বন্ধ করিলেন(২৬)। সুপ্রীম কোর্ট ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল। তাহার পর বিলাতের নূতন আইন অনুযায়ী বর্ত্তমান High Court এর সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বোক্ত Court of Requestও ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আইন (২৭) অনুযায়ী Small Causes Courtএ পরিগণিত হইল। [ক্রমশঃ

(২৬) Declaratory Act 1781, 21 Geo. III, C 70).

(২৭) ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের ফলে ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল।

তোমারই

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

দিদির চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে হঠাৎ নেবে এল প্রকাণ্ড গম্ভীর হাওয়া! কথার ধারা গেল বদলে, হাল্‌কা কথার ঝর্ণাধারা হঠাৎ ভ'রে উঠল সাগরের গাম্ভীর্য্যে। পঞ্চমীর প্রতিমা যেন অষ্টমীর মহিষাসুরমর্দ্দিনী। ওরা দু'জনেই নীরব, কথার সুর বদলাবার আগে নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে যেন নতুন সুর বাঁধার পালা; এ যেন সেই শুভদৃষ্টির প্রথম পর্ব্ব, পর্ব্বতাকার ব্যবধান পেরিয়ে নীরব দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নতুন মেয়েটি নতুন মানুষ হয়ে ওঠে, নতুন পুরুষটিকে স্বামীর আসনে বসিয়ে।

ওদের মধ্যে চকিত নেমে আসা এই নিস্তব্ধতা লেখার মনের উপর গভীর রেখা টানল। বর্ত্তমানের একটা অস্পষ্ট পরিপূর্ণতার প্রভাব কাটিয়ে মনটা ওর ছুটোছুটি করতে আরম্ভ করল অতীতের বেদনার মধ্যে, অনাগত দিনের হিসেবের পাতায় পাতায়! মেয়েরা চিরকাল এমনি ধারাই সঞ্চয়ী। আজকের সন্ধ্যাটা নতুন সূর্য্যের আলোতে উদ্ভাসিত। এমনি ধারা সন্ধ্যাটাকে ও ধরে রাখবে মনের কোণে কোণে। আজকের সন্ধ্যাটাকে জানবে ফুলসজ্জা রাত্রের স্নিগ্ধতার ও মুগ্ধতার মধ্যে অপরিচিত স্বামীর স্পর্শের মতন! আজকের জ্যোতিকে ও জানবে ওর মনের স্বপ্ন সূর্য্যের আলোকে ম্লান করান জ্যোতির মতন, বিজয় তূর্য্যের গম্ভীর নিনাদের মতন, হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে।

জ্যোতি হঠাৎ অবাক্ হয়ে ওঠল গাম্ভীর্য্যের উত্তাপে লেখার মুখখানা দেখে। ওকে অনেকবার অনেকরকম ভাবে ও দেখেছে, কিন্তু আজকের ও যেন নতুন মানুষ, নতুন ওর রূপ, অপরূপ সুরে বাঁধা? নতুন ছন্দের বন্ধন ওর চারিধারে। তুলনা? তুলনা দেবার মতন কোন চেহারাই ওর মনে পড়ল না, কেবল অস্পষ্ট ওর কেবলই মনে হ'তে লাগল, কোথায় কোনদিন এমনি সুন্দর একটি মানুষ ও দেখেছে। এমনি একটি নারী ওর ভারী পরিচিত। মনকে অনেক প্রশ্ন করেও ও মনে করতে পারল না কোথায় দেখেছে, মনে করতে পারল না যে বাস্তবে কোনদিনও দেখে নি, দেখেছে নিজের মনের রঙিন কল্পনায় ভবিষ্যতের অস্পষ্টতার মধ্যে!

লেখাই আগে কথা বললে, 'কথা বুঝি হারিয়ে ফেললে?' হঠাৎ কি না, তাই জ্যোতি একটু চমকে উঠল।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'ভাগ্যিস মনটা চোখ কি নাক কি মুখের মতন স্পষ্ট নয়, অগোচর, শোনা যায় না কিম্বা যায় না দেখা!'

সুলেখা জিজ্ঞেস করলে, 'কেন, সেটাও বুঝি হারিয়েছ?'

'তাকে হারাইনি, সে হেরেছে। বার বার সে ফেরে পড়েছে, বার বার সে হেরে মরেছে।'

'কার কাছে?'

'যার কাছে সে আছে'। জ্যোতি বলে চলে 'এমন কারো কাছে, যারা কোনদিন হারে না, যারা কোনদিন নিজেকে হারাতে পারে না, পরাজয়ে যাদের গ্লানি, জয়ে যাদের আত্মতৃপ্তি, অজ্ঞেয় যারা তারা যাদের চক্ষুশূল।'···তারপর একটু হেসে, জ্যোতি বললে, 'নারীর কাছে'··

সুলেখাকে আঘাত করবে বলে জ্যোতি কোন কথাই বলে নি, বলেছিল সহজ একটা অভিমানের ইঙ্গিত করে। কিন্তু লেখার মনের ওপর হঠাৎ যেন দাগ পড়ল। সুগভীর দাগটা। সচেতন হ'য়ে উঠল সুলেখা, বুঝলে জ্যোতির কথা জীবন্ত প্রাণের অনন্ত অভিমান। বললে, 'তোমার কথায় অভিমানের ছোঁয়াচ, বেদনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।'

জ্যোতি হেসে বললে, 'তোমরা অত্যন্ত অদ্ভুত, কথার মানে করতে তোমরা বেশ জানো! স্পষ্ট কথা শুনলে তোমরা সেটাকে অস্পষ্ট ক'রে কানে তোল, প্রাণে তোমাদের সেটা আরো অস্পষ্ট হ'য়ে উঠে! আমার উক্তি কেবলই কথা নয়, তাতে অভিজ্ঞতার যুক্তি আছে।'

'কোন কামিনীর না কল্পনার?'

'অর্থাৎ?' জ্যোতি সকৌতুক প্রশ্ন করলে।

'অহেতুক তোমরা অনেক কিছুই কল্পনা কর। মেয়ে জাত-টাকে তোমরাই করেছ রহস্যময়ী, যখন দরকার হয় তখন আবার তোমরাই তাদের কর সহজ ও সোজা!'

থেমে আবার বললে, 'সুবিচারের চাইতে তাদের ওপর অবিচারই তোমরা কর বেশী।'

জ্যোতি বললে, 'অভিমানে ভেঙ্গে পড়ছ, বুঝতে পারছি, কিন্তু জীবনের আলোতে যদি ভালো করে দেখ' তাহ'লে হয়ত' সুবিচার অবিচারের কথাটা সহজ না হ'য়ে সমস্যাও থেকে যেতে পারে।' একটু পরে আবার ও বলে চলল, 'তোমাদের দোষ কোথায় জান? তোমরা সবই বোঝ কিন্তু যখন বোঝ তখন অতীতটা মনে বোঝা হ'য়ে যায়, বোঝবার দিন তখন পেরিয়ে গেছে। যখন কোন পুরুষ তোমাদের স্নেহ, প্রেম কিম্বা সহানুভূতির উত্তাপে নিজেদের উত্তপ্ত করবার জন্য আপনা থেকেই এগিয়ে আসে কাছে, তখন তোমরা তার কাছ থেকে প্রায়ই সরে যেতে থাক দূরে। কখনও নিজেদের অত্যন্ত সহজ করে দিয়ে, আবার কখন শক্ত করে নিয়ে। তোমরা এমনি ধারা অদ্ভুত যে ঠিক যে জিনিষটা তোমাদের কাছে পাবার জন্যে পুরুষ তোমাদের কাছে আসে, তোমরা ঠিক তার উল্টোটা দাও। নিজেদের তোমরা নিজেরাই কর রহস্যাবৃত, অথচ নিজেরাই যাও ঠ'কে'।

ঘরের মধ্যে করুণ একটা স্বর। লেখা অভিভূত, কেবলই শুনে চলে। জ্যোতি এই মানুষটিকে হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করেছে। ওর কেবলই মনে হয়েছে এর কাছে সব বলা যায়, ও সব বলবে। ওর যত কিছু অভিমান, ওর অতৃপ্ত মনটার যা কিছু কথা, যা কিছু ব্যথা, বেদনা। যতই ও বলে যায় ওর ভাষা ততই নির্ম্মম হ'য়ে ওঠে, ততই করুণ। ভৈরবীর মিষ্টতা, কোমল রেখাবের প্রাণস্পর্শী ঝঙ্কার কিন্তু সুদৃঢ়। কবে কোনদিন অকারণে ও পূর্ণিমাকে ভালোবেসে ছিল, কিন্তু তার আলো পায় নি, তারই ক্ষুব্ধ অভিমান ওর দৃষ্টিতে স্তব্ধ হ'য়ে আছে। সজাগ প্রহরীর মতন তা'রা ওর ভাষার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। পূর্ণিমাকে যে ভাবে জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে ও চেয়েছিল, পূর্ণিমার যে আলো ও চেয়েছিল কিন্তু পায়নি, আজ হঠাৎ ওর মনে হ'ল লেখার মধ্যে তার প্রাচুর্য্য। পূর্ণিমার কাছ থেকে যা ও শুনতে চাইত, আজ লেখার নিস্তব্ধতার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তা মেশানো আছে। পূর্ণিমার ওপর ওর জীবনের সবচেয়ে বড় অভিমান যা কিছু তা সবই আজ ও লেখাকে সুগভীর ও সুনিশ্চিত ভাবে জানিয়ে গেল। কথায় কথায় ও বলে গেল, ওর জীবনের প্রথম ভালোবাসার কথা, ওর জীবনের প্রথম নারীর কথা, ওর প্রথম বেদনার কথা।

পূর্ণিমার কথার পর্ব্ব চুকিয়ে দিয়ে ও চুপ করলে। মনটাকে লুকিয়ে ফেলল অতীতের আড়ালে। ঘরময় একটা গভীর প্রশ্ন ছড়িয়ে রইল মস্তবড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন বুকে নিয়ে।

সুলেখা ভাবতে লাগল, জ্যোতি আজ এত কথা ওকে কেন বললে?

ঘরটায় আবার গম্ভীর নিস্তব্ধতা। ঘরের কোণে কোণে ওর কথার গম্ভীর প্রতিধ্বনি। সুলেখা সচকিত হ'য়ে উঠল। আজকের দিনেই ওর মনটিকে জেনে নেবে। বললে, 'তোমার কথায় মনে হচ্ছে, পূর্ণিমার ওপর তোমার ভয়ানক অভিমান প্রত্যেক নারীর ওপর ভারী বুটশুদ্ধ লাথির পদাঘাতের মতন নির্ম্মম। পূর্ণিমার অবিচার প্রত্যেক মেয়েকে তোমার দৃষ্টিতে ক'রেছে অপরাধী। প্রত্যেক মেয়ের ওপর তোমার সুগভীর অভিমান করেছে রূপ পরিগ্রহ!' থেমে আবার বললে, 'এ যেন এক বিগ্রহকে প্রণাম ক'রে অন্যের কাছে ইনাম চাওয়া!'...

জ্যোতি বললে, 'রাজার মালঞ্চে যে বেল ফুল ফোটে আর গরীবের তুলসীমঞ্চের ধার ঘেঁসে যে বেল ফুল ফোটে, দু'টোর মধ্যে তারতম্য কি কিছু আছে? বেলফুল যে ভালোবাসে না, সে কোন বেলফুলই ভালোবাসে না, তা সে রাজার বাগানেই হ'ক আর গরীবের আঙিনাতেই হ'ক!...কিন্তু ও কথা থাক', জ্যোতি বলে চলে, 'তোমার মনে এ-কথা কেন জাগল যে, নারী জাতির প্রতি আমার অতিমাত্রায় অভিমান আছে! অভিমান মোটেই নেই, জোটেনি সৌভাগ্য তোমাদের চিনবার, তাই অভিমানের চেয়ে কৌতূহলই বেশী!'

'বুঝলাম' সুলেখা বললে, 'পূর্ণিমার ওপর তোমার অভিমান, কিন্তু নিজেকে দিয়ে বিচার করলে বুঝতে পারি, অভিমান ভাঙাবার সুযোগ তুমি তাকে দাওনি, হয়ত অভিযোগও করনি কেবলই মনে হচ্ছে আমার,' সুলেখা একটু থেমে আবার বলে চলে, 'অভিমানটা তোমার ভুলের ওপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছে!' লেখা যে ওর মনটা জানবার জন্যেই নিজেকে পূর্ণিমার আড়ালে রেখে ছুটে চলেছে, এ-কথা জ্যোতি ঠিক বুঝতে পারে না। ও নিজেকে নিয়েই মেতে ওঠে অন্যের মনের মধ্যে যেতে ওর সময় নেই। বললে, 'নারীর প্রতি তোমার সহানুভূতি বুঝতে পারি, কিন্তু নারী-আন্দোলন ও নারীর ভালবাসা এক জিনিষ নয়। এসেমব্লিতে যখন পিতার সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকারের প্রশ্ন ওঠে তখন নারী জাতির ব্রিফ্ ধ'রে যতই করবে চীৎকার, ততই পাবে বাহবা, পাবে হাততালি, কিন্তু দোহাই তোমার, পূর্ণিমার মনটাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বড় বড় কথার মালা গেঁথো না, নিজেকেও বোঝাতে পারবে না, আমার বোঝাও নামবে না'।

জ্যোতি থেমে থেমে বলে চলে, 'সাধারণ বিশ্লেষণে মেয়েরা উদার, কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে তা'রা সঙ্কীর্ণ। দু' জায়গায় তাদের দুই বিভিন্ন রূপ। বাইরে তা'রা নিজেদের যে পরিমাণে বাদ দেয় অন্তরে তা'রা নিজেদের সেই পরিমাণে চিনে নেয়। বাইরে তাদের কেবলই দেনা, ঘরে কেবলই পাওনা।

সমস্ত ঘরখানায় একটা থমথমে ভাব। সুন্দর ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরে আছে, বাইরে পাখীর একটানা সুন্দর সুর থেকে থেকে ভেসে আসছে। সুলেখা নিশ্চল পাথরের মতন সামনের লোকটির কথা শুনছে। আস্তে আস্তে মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস পড়ছে, চাপা কান্নার মতন।

জ্যোতি বলে চললো, 'অভিযোগ করছ অভিমান ভাঙাবার সুযোগ দিইনি। বলতে পারো লেখা মানুষ অভিমান করে কার কাছে? যাকে চিনি না, জানি না, তার ওপর হয় করব রাগ, নয় হব অসন্তুষ্ট। কিন্তু ঠিক মানুষটির কাছে যা করব তা ও দুটোর চাইতে স্বতন্ত্র। অভিমান মানুষ করে তারই কাছে যে অভিমান বোঝে—অভিমানটা এমনই জিনিষ যে চোখে আঙুল

দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয় না! আর তাছাড়া আমার অভিমান তুমি ভাঙাও বলে অভিমান করব?···সে ত ভালবাসা নয়, সে কেবলই ভালোবাসার অভিনয়। ভালোবাসতে পারি, অভিমানও করতে পারি কিন্তু সেই অভিমান আরোপ করে অপমান করতে পারি না'। সুলেখা অস্পষ্ট বললে, 'হয়ত' তোমার মনটাকে চেনবার সুযোগ তুমি তাকে দাওনি।' ওর শেষ কথাগুলো অস্পষ্ট হ'য়ে মিলিয়ে গেল!

'হাজারটি ছেলের মাঝখান থেকে যদি একটি ছেলে মা বলে ডাকে' জ্যোতি বললে, 'ছেলেটির মা ঠিক তাকে চিনে নেয়। হাজার বারের মধ্যে একটীবারও ভুল তার হয় না। ভালবাসাটাও ঠিক সেই রকম, সত্যিই যে ভালবাসে সে ভালবাসার প্রত্যেকটি রূপকে চিনে নেয় কোন ভুলই তার হয় না। অভিমানটাও ভালবাসার একটা অঙ্গ। যে ভালবাসার মধ্যে ভুলের স্থান আছে, হয় সেটা ভালো লাগা, না হয় অভিনয়, নয়ত কেবলই শরীরের আকর্ষণের প্রাচুর্য্যে মনের ওপর অসার প্রভাব।'

'তুটোই কি একই জিনিষ?.

'নয় কেন? ভালোবাসার ভিত্তি কোনখানে? বিচার করে দেখলেই বোঝা যাবে তুমি মানুষটাকে আমি মানুষটা ভালোবাসি না। আমার মধ্যে যে পৌরুষ, যে সৃষ্টির আনন্দ নিয়ে মত্ত, আমার যে মনটা সৃষ্টিকর্ত্তার একটা অংশ, সেই মানব ভালোবাসবে তোমার মধ্যেকার যে মাতৃত্ব তাকে। ভালোবাসার আরম্ভে মোহ শেষে সৃষ্টির আনন্দ। পুরুষ যখনই কোন মেয়েকে ভালবাসে তখন কল্পনায় তাকে একটা মনের মতন রূপে গড়ে নিয়ে তাকে ভালোবাসে! তা যদি না হত তাহ'লে সে যে কোন মেয়েকে ভালোবেসে সুখী হতে পারত! মেয়েতে মেয়েতে প্রভেদ দেহেতে নয়, পুরুষের কল্পনায়। একজন পুরুষ যখন ভালোবাসে তখনই সে দেখতে পায় মেয়েটীর দৃষ্টিতে তার নিজের স্বপ্ন-কাননের ছায়া। নিজের কল্পনার রঙে তাকে রঙীয়ে নেয়, নিজের আশার আলোকে তাকে নতুন রূপে চিনতে শেখে, অনবরত কেবলই ভাবতে থাকে, তুমি তুমি নও, তুমি আমার মানসী—আমার মানস-প্রতিমা। এমনি করে নিজের আকাঙ্ক্ষার আভরণে তাকে সাজিয়ে নিয়ে তাকে ভালোবাসে। জানতে চাও পুরুষের আশা কি, আকাঙ্ক্ষা কি, বাসনা কি? জানতে চাও, একটি মেয়েকে ভালোবেসে তার কাছে কি সে চায়? পুরুষের মনে সঙ্গোপনে লুকিয়ে আছে সৃষ্টির প্রবল আকাঙ্ক্ষা। সে চায় ভালোবেসে নারীর নারীত্বকে জাগিয়ে দিতে, তার মাতৃত্বকে মহিমান্বিত করতে। নারী হল তার সৃষ্টির অভিধানে অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাদের মধ্যেও আছে সৃষ্টির প্রবল আবেগ। পুরুষ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে চায় তার সেই আবেগকে নিজের আকাঙ্ক্ষার প্রবল স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে—সেই পথে যার পরিণামে পিতৃত্ব। বুঝলে তাহলে তুজনের সৃষ্টির ভিত্তির ওপরে গড়া যে ভালোবাসা, সে ভালোবাসায় রূপান্তর ঘটবে সন্তানের স্নেহে, এ এমন বড় কথা কি? তুয়ের মাঝে প্রভেদ তা হলে ভিত্তিতে নয় রূপে! তুটি ভালোবাসা হল একই আরম্ভের একই শেষ, তুই পরিণয়ের একই পরিণতি!'

সুলেখা নীরব শুনতে থাকে। জ্যোতি যেন দিক্‌হারা সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাস, সুলেখা পূর্ণিমার পূর্ণশশী। একের প্রভাবে অন্যের প্রবলতা। জ্যোতির কথায় আছে অতি সত্যের রূপ, আছে বলবার মাধুর্য্য, আছে গতি—সে গতি গতানুগতিক ধারার বাইরে, সুলেখার মনের সঙ্গে মিশিয়ে। তার মনের কোণে কোণে ওর কথার প্রতিধ্বনি। সুলেখা নীরব হয়ে তাই ভাবতে থাকে।

নীরবতায় ঘরখানা স্তব্ধ। হঠাৎ একটা তীব্র আলোর ঝলকানিতে উজ্জ্বল হয়ে সমস্ত ঘরখানা গভীর অন্ধকারে যেন স্তিমিত। বাইরে রাত্রি বাড়ছে।

[ক্রমশঃ

খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমান যুদ্ধে সামরিক প্রয়োজনে খাদ্যশস্যের অত্যন্ত টান পড়িয়াছে। তাহার উপরে এই বাঙ্গালা প্রদেশের শাসকদিগের অপরিণামদর্শিতার ফলে বাঙ্গালায় দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। এরূপ দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালায় আর কখনও দেখা দেয় নাই। এবারে দুর্ভিক্ষে প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক অনাহার ও কদাহারজনিত ক্লেশে শমনভবনে গমন করিতেছে। এখনও সেই ভীষণ মৃত্যুর বিরাম নাই এবং শীঘ্র যে ইহার বিরাম হইবে সেরূপ আশাও করা যাইতেছে না। সত্য বটে ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরে বাঙ্গালায় অনেক লোক ক্ষয় পাইয়াছিল। সেবৎসর প্রাকৃতিক কারণের সহিত বাঙ্গালার নূতন শাসকদিগের অবিমৃষ্যকারিতার সংযোগ হওয়ায় বাঙ্গালার এক-তৃতীয়াংশ লোক (স্থানে স্থানে অর্দ্ধেকেরও অধিক) লোক মরিয়াছিল। এবার প্রাকৃতিক কারণের প্রতিকূলতা হয় নাই। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরে খাদ্যশস্যেরই অনটন হইয়াছিল এবারকার মত প্রয়োজনীয় সর্ব্বপণ্যেরই অনটন ঘটে নাই। এবার রোগে লোক ঔষধ পর্য্যন্ত পাইতেছে না। পথ্যও প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছে। কাজেই লোক অধিক মরিতেছে। সেই জন্য আমি এরূপ দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালা দেশে কখনও হয় নাই বলিলাম।

মুখ্যতঃ খাদ্যশস্যের অভাবই বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহার জন্য দায়িত্ব কাহার বা কাহাদের এক্ষেত্রে আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কথা ব'লব না। যে কথা অনেকেই ব'লয়াছেন। যাহাহউক, একথা সত্য যে বৎসরাধিক পূর্ব্বে সরকার এবার বঙ্গদেশে খাদ্য শস্যের অভাব ঘটিবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন সেইজন্য তাঁহারা এদেশবাসীকে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য ফতোয়া জাহির করিয়াছেন। কিন্তু একরাত্রেই সেই হুকুম তামিল করা সম্ভবে না। কারণ বাঙ্গালার কৃষক এবং কৃষির যেরূপ অবস্থা তাহাতে জমি অধিক না হইলে অধিক ফসল উৎপাদন করা যাইতে পারে না। অভাবে মরণাপন্ন কৃষক ভোঁতা লাঙ্গল এবং অর্দ্ধমৃত বলদ লইয়া প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ করিলে ফসল অধিক উৎপন্ন করা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না! বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষি-পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। কাজেই অন্যদিকে শস্যের অধিক টান ধরিলে দেশের লোকের পক্ষে উহা পাওয়া কঠিন হইবেই।

কিন্তু চিরকাল বাঙ্গালার এ অবস্থা ছিল না। বাঙ্গালী জাতি ইংরাজ শাসনের পূর্ব্ববর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত কখনই খাদ্যশস্যের অভাব অনুভব করেন

নাই। ওর্ম্ম (Orme) লিখিয়া গিয়াছেন বাঙ্গালার এক ফার্দ্দিং দিলে একসের চাউল পাওয়া যাইত। (১) তখন এক শিলিং-এর মূল্য আট আনা ছিল মনে করিলে আট আনায় দুই মণ ১৫ সের চাউল মিলিত। সুতরাং একটি পয়সা দিলে দেড় সের চাউল মিলিত। ওর্ম্মের বিবরণ পাদটীকায় প্রদত্ত হইল। উহা তাঁহার সমসাময়িক লেখা সুতরাং উহাতে ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবলমাত্র ওর্ম্ম এই কথা বলেন নাই, ডাউ (Dow) প্রভৃতিও বাঙ্গালায় প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবার কথা বলিয়াছেন। ডাউ বলিয়াছেন যে বাঙ্গালাদেশ কৃষির অতি অনুকূল ক্ষেত্র। তিনি বলিয়াছেন যে প্রকৃতি এই বাঙ্গালাদেশকে যেন স্বহস্তে কৃষির সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২) অনেকের ধারণা বাঙ্গালা দেশে কস্মিনকালেও গোধূম জন্মিত না। ষ্টাভোর্নিয়াস লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালাদেশে অতি উত্তম গম জন্মিত। ঐ গম পূর্ব্বে বাটেভিয়ায় চালান যাইত কিন্তু পরে উত্তমাশা অন্তরীপের শস্যবাণিজ্যের সুবিধার জন্য বাঙ্গালার ঐ পণ্যের বহির্ব্বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। (৩) পূর্ণিয়া জিলায় অতি উত্তম গম উৎপন্ন হইত। তদ্ভিন্ন এই অঞ্চলে গোলমরিচ ও পিপুল এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ শস্য উৎপন্ন করা হইত, ইহা রেনেল তাঁহার জার্ণালে স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত করিয়াছেন। সরকার মামুদাবাদে গোলমরিচ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মিত। এই সরকার মামুদাবাদ উত্তর-পূর্ব্ব নদীয়া জিলার উত্তর-পশ্চিম, যশোহরের উত্তর-পশ্চিম-এ ফরিদপুর জিলার পশ্চিমাংশ লইয়া অবস্থিত ছিল। রেনেল আরও বলিয়াছেন বারাশত হইতে যশোহর পর্য্যন্ত সমস্ত অঞ্চলেই খোলা মাঠ ছিল। ঐ মাঠে অতি সুন্দরভাবে চাষ আবাদ হইত, এই অঞ্চলে ধান এবং ছোলা প্রভৃতি ভূরি পরিমাণে জন্মিত। (৪) কলিকাতা হইতে হাজিগঞ্জ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানেই ধান চাষ করা হইত। বারাসতের সন্নিহিত চালদাবেড়িয়ায় রেনেল অতি সুন্দর নারিকেলকুঞ্জ এবং পানের বরোজ দেখিয়াছিলেন। মহেশপুণ্ডার নালার ধারে বিস্তর ধান এবং কার্পাস জন্মিত। এই মহেশপুণ্ডা জলাঙ্গীর ৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। নদীয়া জিলার শ্রীরামপুর এবং গুড়গুড়ি অঞ্চলে অনেক খাদ্য উৎপন্ন করা হইত। (৫)

আলেকজাণ্ডার ডাউ, ওর্ম্ম ও রেনেল প্রভৃতি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী এবং বঙ্গদেশের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের কথা অবিশ্বাস করিবার কারণই নাই। এই সময়ে অন্যান্য য়ুরোপীয় পর্য্যটকের লেখা হইতেও এইরূপই পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় তৎকালে যে প্রভূত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইত তাহা অস্বীকার করা যায় না। মাষকলাই, মুগ, কলাই, ছোলা, অড়হর, বরবটী, যব, মটর, ধান, খেসারী প্রভৃতিও ভূরি পরিমাণে বাঙ্গালায় উৎপাদন করা হইত।(৬) এই সকল খাদ্যশস্যের মূল তখন এখনকার তুলনায় নামমাত্র ছিল। কলাইয়ের মন ছিল তিন আনা। খেসারীর মূল্য আরও কম ছিল। রেনেলের জার্ণাল পাঠে জানা যায় যে বীরভূম জেলায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচুর কার্পাস-তুলা উৎপন্ন হইত। বরবকগঞ্জে কার্পাস অনেক জন্মিত। সুবর্ণ কুঠীর পার্শ্বস্থ স্বরূপসিং অঞ্চলে প্রচুর কার্পাস জন্মিত।(৭) এই অঞ্চল হইতেই ঢাকা জিলায় বস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য কার্পাস তুলা নীত হইত। ঢাকা জিলাতেও কার্পাস উৎপন্ন হইত। রেনেলের জার্ণাল পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারা যায়। জেমস্ রেনেল ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গপ্রদেশের সার্ভেয়ার-জেনারেল নিযুক্ত হন। সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ যে বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য তাহা অস্বীকার করা যায় না। বাঙ্গালাদেশে তখন প্রচুর চিনিও উৎপন্ন হইত। ফলে বাঙ্গালা চিরকালই অন্যান্য দেশের অন্ন যোগাইয়াছে। বাঙ্গালাকে কখনই খাদ্যশস্যের জন্য অন্যের নিকট হাত পাতিতে হয় নাই।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয়। রবার্ট ওর্ম্ম তৎপূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সওদাগরী অফিসে চাকুরী করিতেন। সুতরাং তিনি তখনকার পণ্যের মূল্য কিরূপ ছিল তাহা ভাল জানিতেন। তাঁহার প্রণীত History of Military Transactions of the British Nation in Indostan পলাশীর যুদ্ধের পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং ইংরাজ এদেশের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিবার সময় এদেশে খাদ্যশস্যের কিরূপ প্রাচুর্য্য ছিল, উহার কিরূপ বাজারদর ছিল, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি যে লিখিয়া গিয়াছেন যে বাঙ্গালায় এক ফার্দ্দিং দিলে দেড় সের চাউল পাওয়া যায়,—তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

ষাট, পয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমরাই দেখিয়াছি যে বাঙ্গালার বাজারে চাউল পাঁচসিকা, দেড় টাকা মন বিকাইত। তখন ভেটে চাউল নামক একপ্রকার চাউল প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইত। উহা মোটা চাউল এবং দুই শ্রেণীর ছিল। একশ্রেণীর নাম ভেটে আর একশ্রেণীর নাম দুধে-ভেটে। তখন কলছাঁটা চাউল ছিল না। ভেটে চাউল একটু লাল এবং দুধে ভেটে সম্পূর্ণ সাদা ছিল। উভয় চাউলই সুস্বাদু ছিল। গরীব লোকেরা লাল ভেটেই খাইত। উহা বড়জোর পাঁচসিকা মণ বিকাইত। তৎপূর্ব্বে বায়দা চাউল নামক একপ্রকার চাউল দশ আনা, বার আনা মণ বিকাইত—পূর্ব্বজগণের মুখে উহা প্রায় শুনা যাইত। ডাইল, কলাই, বেগুণ এবং তরিতরকারী তদনুপাতে সস্তা ছিল। কাজেই তখন অন্নকষ্ট ছিল না।

কেহ কেহ বলেন যে তখন খাদ্যদ্রব্য যেমন সুলভ ছিল, পয়সা সেইরূপ দুর্লভ ছিল। কাজেই লোকের অন্নকষ্ট ছিল। অনেক ইংরাজ একথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদের প্রকাণ্ড ভুল। কারণ মুদ্রামূল্য তখন অধিক থাকায় লোকে যাহা পাইত তাহাতেই তাহাদের স্বচ্ছন্দে সংসার চলিত। তখন একজন দিনমজুর প্রতিদিন ছয় পয়সা করিয়া পারিশ্রমিক পাইত, ইহা সত্য। কিন্তু সেই ছয় পয়সা দিয়া তাহারা নয় সের চাউল কিনিতে পারিত এবং মজুররা এক বেলা আহার পাইত। এখন বার আনা করিয়া দিনমজুরী করিয়াও তাহারা প্রতিদিন দেড় সেরের অধিক চাউল পায় না। ঐ ছয় পয়সায় কলাই, খেসারী প্রভৃতি ডাইল প্রায় অর্দ্ধ মণ পাইত। তখন সরিষার তৈলের মূল্য ছিল টাকায় ২৫ সের। অর্থাৎ প্রায় আড়াই পয়সা সের। সুতরাং দিনমজুরের এক দিনের রোজগার ২ সের তৈলের অধিক। এখন সে মজুরী করিয়া দেড় পোয়া তৈল পায়। সুতরাং

(১) Rice which makes the greater part of their food is produced in such plenty in the lower parts of the province, that it is often sold at the rate of two pounds for a farthing; a number of other arable grains and a still greater variety of fruits and culinary vegetables as well as spices of their diet are raised with equal ease etc. Vide Military Transactions of the British Nation in Indostan, Vol. II. Page 4.

(২) It seems marked out by the hand of nature as the most advantageous region of the earth for agriculture. —Dow's Hindusthan, Vol. I, CXXVI.

(৩) Stavornius—Voyage to the East Indies, Vol. I p. 391.

(৪) Rennel's Journals, p. 78.

(৫) Ibid. p. 15.

(৬) ধান, চাল, মাষ, মুগ, ছোলা, অড়হর
মসুরাদি, বরবটী বাটুলা, মটর।
দেধান, মাড়ায়া, কোদা, চিনা, ভুয়া যব।
ভারতচন্দ্র, মানসিংহ।

(৭) Rennel's Journals p. 109—111.

তখন দিনমজুরদিগের অবস্থা অধিক ভাল ছিল কি এখন অধিক ভাল হইয়াছে, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখুন। তখন কেবল কাপড়ের মূল্য অন্যান্য জিনিষের মূল্য অপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু অনেকে ঘরে চরকায় সুতা কাটিয়া তাহাতে কাপড় বুনিয়া পরিত,—তখনকারকালে এখনকার লোকের মত ঘরে ছুঁচার কীর্ত্তন বাহিরে কোঁচার পত্তন ছিল না। কাজেই লোকের অভাব মোটেই হইত না। চাষীরা যেমন অল্প মূল্যে শস্য বিক্রয় করিত, তেমনই অল্প মূল্যে অন্যান্য সকল জিনিষ কিনিত। তখন এক একজন চাষীর জোতে গড়ে এখনকার চাষীদের প্রায় তিন গুণ জমি থাকিত। তখন বিবিধ শ্রমশিল্পে অনেক লোক খাটিত। কাজেই জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য এত চাপ পড়ে নাই। এখন শিল্পলোপ হেতু সকলেই চাষ-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতেছে, ফলে চাষের জমি নানাভাবে বিভক্ত হইয়া চটকজ্য মাংসে পরিণত হইতেছে। কাজেই তখনকার চাষীদিগের অবস্থা ভাল ছিল। তখন একজন চাষীর ৫টি ছেলে থাকিলে সবাই পৈতৃক জোত-জমি বিভক্ত করিয়া লইত না,—অন্য শিল্পকার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিত। তখন জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের ব্যয় অল্প ছিল এবং দেশে শিল্প ছিল বলিয়া জনসাধারণের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। ষাট পয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমরা তাহার অনেক নমুনা দেখিয়াছি। সুতরাং বাঙ্গালা খাদ্যশস্য উৎপাদনে বরাবর অবহিত ছিল, বাঙ্গালীর আহারাদি বিষয়ে কোন অভাব ছিল না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক ভারতে অধিকার স্থাপন হইতে বাঙ্গালা দেশে এই দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়। বাঙ্গালার শিল্প ধীরে ধীরে লোপ পাইতে থাকে,—খাদ্যের ফসল উৎপাদন সঙ্কুচিত করিয়া বাণিজ্য-ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়, খাদ্যশস্য বিদেশে ক্রমাগতই অধিক পরিমাণে চালান যাইতে থাকে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য, বিশেষতঃ, চাউল, যব প্রভৃতি বিদেশে চালান যাইত, তাহা অপেক্ষা এখন অনেক অধিক ঐ সকল পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। খাদ্যশস্যের চাষ কমিতেছে, খাইবার লোক বাড়িতেছে। তাহার উপর দেশীয় শ্রমশিল্পের বিলোপ হেতু বুভুক্ষুদিগের দল পুষ্ট হইতেছে। কিন্তু সরকার শ্রমশিল্প প্রবর্ত্তন ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইয়া আসিতেছেন, কৃষির উন্নতির জন্যও বিশেষ কিছুই করেন নাই। তাঁহারা কৃষির উন্নতির জন্য সামান্য যাহা কিছু করিতেছেন, তাহাতে দেশীয় কৃষির উন্নতি কিছু মাত্রও সাধিত হইতেছে না। তাঁহারা বাঙ্গালার নানাস্থানে কৃষি বিভাগের অধীনে অনেকগুলি কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পূর্ব্ব অঞ্চলে ৭টি জিলার মধ্যে মাত্র ৫টি জিলাতে সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে। পশ্চিম অঞ্চলে ১১টি জিলার মধ্যে ছয়টি জিলায় এবং উত্তর অঞ্চলে ৭টি জিলাতে ৮টি সরকারী কৃষিক্ষেত্র বিদ্যমান। কিন্তু উহাতে যে সকল পরীক্ষা হয়, দেশের অশিক্ষিত চাষীরা তাহার কিছুই জানিতে পারে না। তাহাদিগকে উহা জানাইবার বা উহার সুফল দেখাইবার কোন চেষ্টাই এ যাবৎ করা হয় নাই। তাহাদের রিপোর্ট কৃষকরা জানিতে ও বুঝিতে পারে না। যে ভাষায় উহা লিখিত হয় ভারতীয় চাষীরা তাহার কিছুই বুঝে না। চাষীদিগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন বোধ হয় বর্ণজ্ঞানবিহীন মূর্খ, বৈজ্ঞানিক চাষের মর্ম্ম তাহারা বুঝিবে এরূপ আশা করাই মূর্খতা। সরকারী কৃষিশালায় সকল বিষয়ের পরীক্ষা করা হয় নাই। তাহা করিবার আয়োজনও নাই। ভারতীয় সরকারী কৃষিশালায় প্রধানতঃ চা, কফি, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি কয়েক প্রকার কৃষি ও পণ্যের চাষ হইয়া থাকে। বঙ্গীয় সরকারী কৃষিশালায় অধিকন্তু কয়েক প্রকার ধানের ও ইক্ষুর সম্বন্ধে পরীক্ষা হইয়াছে। ডাইলের পরীক্ষা অধিক হয় নাই। তরিতরকারীর ফলন এবং গুণবৃদ্ধির জন্য কি পরীক্ষা হইয়াছে, তাহা কেহই জানে না। খাদ্যশস্যের মধ্যে ফলও গণনীয়। কিন্তু ফলের চাষের উন্নতি-সাধনের জন্য বিশেষ কিছু করা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। কানপুরের এইচ, বি, বোটানিক্যাল এণ্ড টেক্‌নলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে পরীক্ষার দ্বারা পেঁপিয়ার মধ্যে যে পেপেন নামক অরিষ্ট আছে, তাহা অনেক বর্দ্ধিত করিবার পরীক্ষা সফল হইয়াছে। ইহার ফলে প্রত্যেক পেপিয়া গাছ হইতে প্রতি বৎসর ১।৫ পাউণ্ড করিয়া পেপেন নামক ঔষধ পাওয়া যায়। এক একর (৩বিঘা) জমিতে ৫০০ পাঁচ শত পেঁপে গাছ উৎপাদন করিলে ১ শত পাউণ্ড পেপেন পাওয়া যায়। উহার মূল্য ৮ শত টাকার কম নহে। এখন বরং অধিক। অর্থাৎ কেবল পেঁপের চাষ করিলে প্রতি বিঘায় বাৎসরিক ২ শত ৬৭ টাকা পর্য্যন্ত আয় হইতে পারে। ইহা ভিন্ন আর একটা দিক্‌ দিয়াও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এই ম্যালেরিয়া-প্লাবিত বঙ্গদেশে বহুলোকই প্লীহা যকৃতের বিকৃতিফলে অজীর্ণ রোগে অত্যন্ত কষ্ট পায়। ইহারা যদি পেঁপের তরকারী খায়, তাহা হইলে অনেকটা উপকার পায়। কিন্তু এ বিষয়ে বাঙ্গালী জাতি যেমন উদাসীন, সরকারও তেমনি উদাসীন। দেশীয়েরাও কৃষি ব্যাপারে আপনাদের ইষ্ট দর্শন করেন না।

বাঙ্গালায় সরকারের ২৭টি কৃষিশালা ভিন্ন বঙ্গদেশে আরও নামে মাত্র ২ শত ৫১টি বেসরকারী কৃষিশালা বা বৈজ্ঞানিক খামার আছে। উহার অধিকাংশই গতানুগতিক ভাবে বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্য পরিচালিত করিয়া থাকেন। উহার মধ্যে ৬টি পূর্ব্ব অঞ্চলে ১৮৬টি পশ্চিমাঞ্চলে এবং ৫৯টি উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত। উহার মধ্যে তিনটির আয়তন ২ শত হইতে ৫ শত বিঘা এবং একটির আয়তন ১৮ শত বিঘা। সমৃদ্ধ জমিদারগণ কর্ত্তৃক ইহা পরিচালিত হইতেছে। এগুলি সমস্ত রাজসাহী জিলায় অবস্থিত। কিন্তু ইহাদের কোনটিরই কার্য্যফল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। বাঙ্গালীর খাদ্যদ্রব্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে কেবল ধান গম প্রভৃতির উন্নতি সাধনে অবহিত হইলে চলিবে না, তরিতরকারী, শাক-শব্জীরও উন্নতি করিতে হইবে। এই সকল কৃষিশালায় সরকারী কৃষিশালায় যাহা পরীক্ষাসিদ্ধ তাহারই অনুবর্ত্তন করা হইয়া থাকে। স্বাধীনভাবে কোন অনুসন্ধান-কার্য্য পরিচালিত হয় কি না, তাহা আমি জানি না। এবিষয়ে ইহার পরিচালকবর্গের অসুবিধা আছে তাহা আমি জানি। কিন্তু তাহা হইলেও সামান্যভাবে কিছু করা কর্ত্তব্য। ইহার স্বত্বাধিকারীরা সাধারণ কৃষক অপেক্ষা শিক্ষিত। পাশ্চাত্য খণ্ডে কৃষকরাই স্বাধীনভাবে কৃষির অনেক উন্নতি করিয়াছে। যে গোরু বাছুরের ডাকে সাড়া দেয় না, সে যে ভেড়ার ডাকে সাড়া দিবে ইহা আশা করা যায় না। দেশের কৃষির উন্নতি করিব এইরূপ ব্রত লইয়াই এই সকল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সকল সময় লাভ-লোকসান খতাইলে চলে না। শিক্ষিত শ্রেণীরও কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করা বিধেয়। তা না করিলে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না।

আসল কথা কি সরকার কি দেশীয় লোকেরা কৃষির প্রকৃত উন্নতি সাধন বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বিষয়ে কেবল মাত্র ফতোয়া দিলে কোন লাভ হইবে না।

স্বাধীন য়ুরোপীয় দেশে জনসাধারণই চেষ্টা করিয়া কৃষির উন্নতি সাধন করিয়াছে। বৌসিংগণ্ট (Bousingault) নামক জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক, লাইবিগ্‌ নামক একজন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক এবং জন চেনেট লইস নামক জনৈক ইংরাজ ভূস্বামীই প্রথমে য়ুরোপে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষির উন্নতি পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সে আজ প্রায় একশত বৎসরের কথা। কিন্তু এই একশত বৎসরেই ঐ সকল দেশে কৃষির প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। আমাদের দেশের লোক এ-বিষয়ে কিছুই করেন নাই, সুতরাং আমাদের যে দুর্দ্দশার একশেষ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? ভারতবর্ষ অধীন দেশ। শাসকেরা এদেশবাসীদিগকে কৃষির উন্নতির কথা জানান নাই, পরাধীন ভারতবাসী উহা জানিবার চেষ্টাও করে নাই। ইহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতের শ্রমশিল্পের বিলোপের ফলেই বহুলোক বেকার অবস্থায় নীত হইতেছিল। লোক জঠরজ্বালায় কৃষিকার্য্যে (লাভদর্শন না

হইলেও) আত্মনিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সরকারও বনজঙ্গল উচ্ছিন্ন করিয়া নূতন কৃষিক্ষেত্রের প্রসারসাধন করিতে থাকেন। বনজঙ্গল উচ্ছিন্ন হওয়াতে বারিপাতের অল্পতা ঘটে এবং জমির উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস পায়। সে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক একদল বণিকই ভারতের ভাগ্যবিধাতা হইয়া পড়িয়াছিল। বণিকরা স্বভাবতঃ স্বার্থপরায়ণ হইয়া থাকে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকরাও তাহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কাজেই তদানীন্তন সরকার পক্ষ হইতে কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। ভারতের মুসলমান শাসন ভাঙ্গিয়া পড়িবার পূর্ব্ব হইতেই ভারতবাসীরা মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সেই জন্য তাহারা আপনাদের হিতাহিত অনুধাবন করিতে পারে নাই। কাজেই উভয় পক্ষের দোষেই ভারতের এই দুর্দ্দশার বটবীজ উপ্ত হইয়াছিল। এখন আমরাই তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলভোগ করিতেছি।

কিন্তু আর এ বিষয়ে উদাসীন থাকা চলে না। লীগপন্থী মন্ত্রিমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রীত ধান পাথর প্রভৃতি মিশ্রিত চাউল খাইয়াও যদি এ দেশের লোকের চৈতন্য না জন্মে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এ দেশের লোকের আর উদ্ধারের উপায় নাই। সরকারী কর্ম্মচারীদিগের অনবধানতা অথবা অযোগ্যতার ফলে এবার বাঙ্গালায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, তাহার সহজে উপশান্তি হইবে না। সেইজন্য আমরা বলি যে এখন এদেশের লোকের যতদূর সম্ভব অধিক খাদ্যবস্তু উৎপাদনের চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

কিন্তু উপায় কি? কি উপায় অবলম্বন করিলে খাদ্যশস্য অধিক উৎপন্ন হইতে পারে এবং এই সমস্যার স্থায়ীভাবে সমাধান হইতে পারে তাহাই সকলের চিন্তনীয় হইয়াছে। আমাদের চিন্তায় অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি এদেশে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে কৃষকদিগের জোতের জমি বৃদ্ধি করিতে এবং লাঙ্গল ও বলদের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। জোতের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে জমির উপর চাপ কমাইতে হইবে তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এদেশে শ্রমশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও প্রসার সাধন করা চাই। তাহা করিলে কতক লোক অধিক অর্থলাভের আশায় অনিশ্চিতফলপ্রদ এবং অর্দ্ধাশনজনক কৃষি ত্যাগ করিয়া শ্রমশিল্পসেবায় রত হইবে। ফলে চাষীর সংখ্যা কমিলে কৃষকের জোতের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। জমি বৃদ্ধি পাইলেই কৃষকের অবস্থা ফিরিবে। কৃষকের অবস্থা ফিরিলেই তাহারা খাইতে পাইবে, বলীবর্দ্দকেও খাওয়াইতে পারিবে এবং জমিতে সার দিতে পারিবে। ফলে শস্যের উৎপত্তি কিছু না কিছু বাড়িবেই। তাহা হইলে 'খাদ্যশস্য অধিক উৎপাদন কর' এই উপদেশ সার্থক হইবে। এজন্য কৃষক সম্প্রদায়কে সুশিক্ষা প্রদান করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক কৃষি ভালভাবে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে একসঙ্গে অন্ততঃ এক জন কৃষকের জোতে অন্ততঃ একশত একর বা তিনশত বিঘা জমি রাখা চাই। কলের লাঙ্গল (Tractor) দ্বারা চাষ করা হইবে। কলের লাঙ্গলের সাহায্যে এক ফুট গভীর করিয়া জমির চাষ করা যায়। দেশীয় বলীবর্দ্দবাহিত লাঙ্গলে ছয় ইঞ্চির অধিক গভীর চাষ দেওয়া সম্ভব নহে। ক্ষেত্র বিশেষে গভীর চাষ হিতজনক না হইয়া অনিষ্টকর হইয়া থাকে। সেরূপ ক্ষেত্র অধিক নহে। একটা বাষ্পচালিত কলের লাঙ্গলের সাহায্যে একজন লোক তিনশত বিঘা অনায়াসে ভাল করিয়া চাষ করিতে পারে। বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দ এবং লাঙ্গলের সাহায্যে একটা লোক একদিনে বড় জোর ৫ বিঘার অধিক জমি চাষ করিতে পারে না। সুতরাং উভয়ের পার্থক্য কত তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। জমিতে গভীর চাষ দিয়া যদি উহাতে রাসায়নিক সার দেওয়া যায়, তাহা হইলে জমির ফসলের পরিমাণ সহজেই তিনগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। ভারতবাসীর আর আপদ্‌কালে সামরিকদিগকে খাদ্য যোগাইতে কষ্ট হইবে না। রুশিয়ায় ইহার পরীক্ষা হইয়াছে। জার শাসিত রুশিয়ায় কৃষিবলের অবস্থা ভারতীয় কৃষিবলের অবস্থার ন্যায় অথবা এতদপেক্ষাও হীন ছিল। যুদ্ধজনিত অতিকষ্টে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তথায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিদ্রোহের পরবর্ত্তী ফল বিশেষ ভাল হয় নাই। উহার ফলে ভূম্যধিকারীদিগকে উচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি সাধিত হয় নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর রুশীয় সরকার যখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্ত্তিত করিয়া শ্রমশিল্পের উন্নতিসাধনে রত হন তখন সমস্ত জমি সরকারের করিয়া এবং কৃষকদিগকে শ্রমিকে পরিণত করিয়া যে ব্যবস্থা করেন, তাহাতে জমির উপর চাপ কমিয়া যায় এবং বহু কৃষক কলে শ্রমিকের কার্য্য করিতে যায়। যাহারা হল কর্ষণ করিত তাহাদিগকে সম্মিলিত ভাবে চাষ করিতে বাধ্য করা হয়। ঐ কার্য্য করিতে রুশিয়া যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিল তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত। এস্থলে তাহার আলোচনা করিব না। ভারতে তাহা প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব হইবে না, যুক্তিসঙ্গতও হইবে না। তবে উহার একটা দিক এই যে যতদিন শ্রমশিল্পের দিকে লোকদিগকে নিয়োগ করা না হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিস্তার না করা হইয়াছিল, ততদিন কিছুই হয় নাই। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে এই শিক্ষাটি সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু বৃটিশ সরকার তাহা করিতে সম্মত হইবেন কি? তাঁহারা কি ভারতকে বর্ত্তমান রুশিয়ার ন্যায় শ্রমশিল্পপ্রধান করিতে সহায়তা করিবেন?

সমস্যা সঙ্গীন। ভারত রুশিয়া নহে, রুশিয়াও ভারত নহে। উভয় দেশের ঐতিহ্য এবং অবদানপরম্পরা বিভিন্ন। এরূপ অবস্থায় রুশিয়ায় যে ব্যবস্থা সফল হইয়াছে ভারতে তাহা সফল হইবে কি না তাহাও বিবেচ্য। উভয় রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা এক নহে। সুতরাং রুশিয়ার ব্যবস্থা যে ভারতে সর্ব্বতোভাবে খাটিবে ইহা বলা না যাইলেও অনেক বিষয়ে খাটিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যথা, কৃষির উন্নতি করিতে হইলে শ্রমশিল্পের এবং সার্ব্বজনীন জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন। ইহা না হইলে কেবল অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে বলিলে স্থায়ী লাভ হইবে না। আজ কতক পতিত জমি আবাদ করিলে কিছু লাভ হয়ত হইবে, কিন্তু লোকবৃদ্ধি ও অন্যান্য ব্যাপারে আবার অল্পদিন পরেই একই অবস্থা উপস্থিত হইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক ভারত অধিকারের পর হইতে এ পর্য্যন্ত কৃষিক্ষেত্রের অনেক প্রসার সাধিত হইয়াছে কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। যদি হইত তাহা হইলে আজ এই দুর্দ্দশা হইত না। অথচ সরকার কর্ত্তৃক সামরিক প্রয়োজনে অত্যধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য ক্রয় যে এই দুর্দ্দশার কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু আপদ্‌কালের জন্য ব্যবস্থাও করিয়া রাখিতে হয়। ভারতে যদি অধিক শস্য উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে সে ব্যবস্থা করা কঠিন হইত না। সত্য বটে সমগ্র পৃথিবীতে যত চাউল উৎপন্ন হয়, তাহার এক-তৃতীয়াংশ ভারতে জন্মে। ইহাও সত্য যে যে বাঙ্গালায় এককালে প্রয়োজনের অনেক অধিক চাউল উৎপন্ন হইত, সেই বাঙ্গালায় আজ অন্নাভাবে লোক মরিতেছে এবং বহু লোক ধানে-চালে খাইতেছে। সেইজন্য বলি, ফসলের উৎপাদন বর্দ্ধন করা আবশ্যক। অন্যথা কিছু হইবে না।

এবার ভদ্রলোকদিগের কষ্ট অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। বহু লোক প্রত্যহ মরিতেছেন। আমার মনে হয় তাঁহারা যদি তাহাদের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে খাদ্যশস্য, তরিতরকারী উৎপাদন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এত দুর্গতি হইত না। এখন অনেকেই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। এখন উপায় করিবার পথও আর নাই। কৃষিকর্ম্মে বড় কম লাভ হয় না। কাণপুরের হারকোর্ট বাটলার টেকনলজিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক মিষ্টার এইচ, ডি, সেন একবার হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে ৫০ বিঘা জমিতে টমেটো চাষ করিলে ৮ হাজার ৮ শত ৬০ টাকা খরচখরচা বাদ লাভ হয়। অর্থাৎ এক কাঠা জমিতে বার্ষিক প্রায় ৯ টাকা লাভ হয়। যদি ৫ টাকাও লাভ হয় তাহা হইলে ত সেটা সম্পূর্ণ লাভ। এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে বলিব। বাঙ্গালী এখনও এ বিষয়ে মনোযোগী হউন।

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

কলিকাতা ও পূর্ব্ব বাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব

সম্প্রতি কার্ত্তিকের গোড়া হইতে পূর্ব্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের যে সকল সংবাদ আমাদের দপ্তরে আসিয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়—বিশেষ করিয়া নোয়াখালি, ফরিদপুর ও ময়মনসিং অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার অত্যধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। উপযুক্ত কুইনাইন ও পথ্যের অভাবে রোগ প্রশমিত হওয়া দূরের কথা, ইতিমধ্যেই ইহা সংক্রামক আকারে দেখা দিয়াছে। কলিকাতার পূর্ব্বাঞ্চলেও এইরূপ সংক্রামক ম্যালেরিয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে মৃত্যুহার প্রায় লক্ষাধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার মূলে যেমন একদিকে রহিয়াছে যুদ্ধজনিত খাদ্যাভাব, অন্যদিকে তেমনি রহিয়াছে করপোরেশন ও মিউনিসিপালিটিগুলির কার্য্যপরিচালনার অযোগ্যতা। যে আকারে এই ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে, তাহার তুলনায় গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কুইনাইন বণ্টনও উল্লেখের বাহিরে। বাঙ্গালী আজ নানাভাবে মরিতে বসিয়াছে; ম্যালেরিয়া তাহার মধ্যে প্রধানতম একটি। অথচ আগাগোড়া লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহা হইতে বাংলাকে বাচাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট অদ্যাবধি এইদিকে কোনরূপ প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেন নাই। কলিকাতা ও পূর্ব্ব বাংলার ম্যালেরিয়ায় ইতিমধ্যেই প্রায় লক্ষাধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট এই সংক্রামণের জন্য কি করিতেছেন?

কমলাঘাটে অগ্নিকাণ্ড

ঢাকা বিক্রমপুরের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র কমলাঘাটে সম্প্রতি ২৬শে অক্টোবর রাত্রিতে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ২২৫টি গুদাম এবং বহুসংখ্যক গৃহস্থ বাড়ী জ্বলিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। কমলাঘাট পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র। এত বড় অগ্নিকাণ্ড ইতিপূর্ব্বে কখনো পূর্ব্ববঙ্গের কোথাও ঘটিতে দেখা যায় নাই। ইহার ফলে প্রায় দুই কোটি টাকারও উপরে ক্ষতি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়—সরকারী গুদামের প্রায় লক্ষ মণ ধান, চাউল, পাঁচ হাজার মণ লবণ, নয় শত বস্তা চিনি এবং প্রচুর কেরোসিন তেল প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়াছে। এই সর্ব্বনাশকর অগ্নিকাণ্ডে সমগ্র ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর ও ময়মনসিং অঞ্চলের ব্যবসায়ের যে কি প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। কেহ কেহ এই অগ্নিকাণ্ডকে সাম্প্রদায়িক প্রক্রিয়া বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মূল কারণ এখনও বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় নাই। সরকারী মহল হইতে আমরা অবিলম্বে তাহা জানিবার প্রত্যাশায় রহিলাম।

কংগ্রেস সাহিত্য-সঙ্ঘ

গত ১৮ই কার্ত্তিক শনিবার সায়াহ্নে কলেজ ষ্ট্রীটস্থ কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে ছাত্রকর্ম্মী, কংগ্রেসকর্ম্মী এবং সাহিত্যিকবৃন্দের এক প্রতিনিধি স্থানীয় সম্মেলনে "কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ" নামে একটি নূতন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। এবং দেশের সাম্প্রতিক দুর্দ্দশা ও বিপন্ন সংস্কৃতির উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস জাতি ও সাহিত্যকে সংহত ও রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা বর্ণনা করেন।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনমূলক কর্ম্মসূচী অনুযায়ী আলোচ্য সঙ্ঘ বৃহত্তর দেশের কাজে আসিলে শান্তির কথা। ভয় হয়, বাংলার অধিবাসীদের মতো এই সঙ্ঘের জীবনকালও স্বল্পকাল-স্থায়ী না হয়! সজনীবাবুর প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির উপর অনেকখানি ভরসা রাখি।

পরলোকে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন

গত ৮ই কার্ত্তিক বুধবার রাত্রি ১০-৫০ মিনিটের সময় কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন তাঁহার চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ কল্পতরু ভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ওয়ার্কস্-এর স্বত্বাধিকারী এবং বিশ্বনাথ আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয় ও হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। বাংলার আয়ুর্ব্বেদীয় ষ্টেট্ মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। বাংলা ১২৮৪ (ইং ১৮৭৭) সালের ১৩ই আশ্বিন শুক্রবার বারাণসীধামে গণনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ বিদ্যাকল্পদ্রুম এবং মাতার নাম সৌদামিনী দেবী।

গণনাথ সেনের পরলোকগমনে বাংলা, তথা ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ-জগতের যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। আমরা তাঁহার স্বর্গত আত্মার চিরশান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।

শ্রীমতী রেখা দেবী

কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের মহিলা বিভাগের পরিচালিকা এবং মাসিক বঙ্গশ্রী পত্রিকার অন্তঃপুর বিভাগের প্রাক্তন লেখিকা হিসাবে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে শ্রীমতী রেখাদেবীর প্রতিষ্ঠা আছে। সম্প্রতি তিনি বাংলা দেশ হইতে প্রথম মহিলা কর্ম্মী হিসাবে লণ্ডনের বেতারকেন্দ্রে বাংলা বিভাগের ভার লইয়া গিয়াছেন। বাংলার নারী সমাজে তিনি যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ভারতের বাহিরে সুদূর লণ্ডনেও তিনি বাংলার ততখানি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ইহাই আমরা আশা করি।

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন

সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বাপর বৎসরের ন্যায় এবারও মিঃ রুজভেল্ট নির্ব্বাচনপ্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান। তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় রিপাব্লিকান দল হইতে দাঁড়ান মিঃ ডিউই। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন, ৩৯৫টি ভোট সমেত ৩৪টি ষ্টেটে ডিউইকে পরাজিত করিয়া মিঃ রুজভেল্ট এই চতুর্থবারের জন্য পুনরায় প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৩৬টি নির্ব্বাচনী ভোট সমেত ১৪টি ষ্টেটে মিঃ ডিউই রুজভেল্টের পুরোভাগে ছিলেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গীন ভোটে তিনি পরাজিত হন।—নিউইয়র্ক হইতে বলা হইয়াছে, রুজভেল্ট পুনর্নির্ব্বাচিত হওয়ার অর্থ হইল [illegible] প্রতিষ্ঠানে পূর্ণভাবে স্থান [illegible]

ফ্রান্স ও চীনের সহিত সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট

—এই ভিত্তিতে ভারত সম্পর্কে গণতন্ত্রী রুজভেল্ট কার্য্যকরী প্রচেষ্টা কিছু করিবেন কি ?

১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালের নোবেল পুরস্কার

ষ্টকহলমের ২৬শে অক্টোবরের এক সংবাদে ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালের নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। শরীর-বিজ্ঞান ও ঔষধের জন্য ১৯৪৩ সালের পুরস্কার পাইয়াছেন—কোপেনহেগেনের প্রফেসার কেনরিক ডাম ও মিশুরীর অন্তর্গত সেণ্ট লুইর প্রফেসার এডওয়ার্ড এডেনবার্ট ডয়সী। ১৯৪৪ সালের উক্ত পুরস্কার পাইয়াছেন সেণ্টলুইর প্রফেসর এমেরিটাস জোসেফ এরলেঙ্গার ও নিউইয়র্কের প্রফেসার হার্ব্বার্ট গেসার। দুই বৎসরই সম্মিলিত পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে। বিভিন্ন স্নায়ুর কার্য্যকলাপের পার্থক্য সম্পর্কিত গবেষণার জন্য শেষোক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়। 'কে' ভিটামিন আবিষ্কারের জন্য প্রফেসার ডামকে ১৯৪৩ সালের নোবেল পুরস্কারের অর্দ্ধেক এবং এই ভিটামিনের রাসায়নিক কার্য্য কলাপের গবেষণার জন্য প্রফেসার ডয়সীকে অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ দেওয়া হইয়াছে। শাকসব্জী, চর্ব্বি ও পালংশাকে 'কে' ভিটামিন রহিয়াছে। ডয়সী ও ডাম কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো-কেমিক্যাল ইনষ্টিটিউটে এই ভিটামিন আবিষ্কার করেন। গবেষণাগারে মুরগীর শাবককে বিভিন্ন খাদ্য দিয়া এবং সে সম্পর্কে ধারাবাহিক গবেষণা দ্বারাই 'কে' ভিটামিন আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। রক্তহীনতা দূরীকরণ ও রক্তের জমাট বৃদ্ধির জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। দন্তক্ষয় রোগ দূরীকরণের জন্যও উহার প্রয়োজন আছে।

'জুইশ ডোমিনিয়ন অব প্যালেষ্টাইন লীগ'

প্যালেষ্টাইনকে একটি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন ইহুদী রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য লর্ড ষ্ট্র্যাবলগির সভাপতিত্বে একটি নূতন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া লণ্ডন হইতে ৬ই নভেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ। প্রতিষ্ঠানটি প্রধানতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রভাবশালী ইহুদীদিগের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে; উহার নাম হইবে—'জুইশ ডোমিনিয়ন অব প্যালেষ্টাইন লীগ।'

লীগের সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ন্যায়, সাধারণ স্বার্থ ও আদর্শের ভিত্তিতে বৃটিশ ও ইহুদীদের মধ্যে সখ্য স্থাপন এবং প্যালেষ্টাইন উপনিবেশ ও প্রতিবেশী আরব দেশসমূহের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতায় উৎসাহ দেওয়া এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এবং প্যালেষ্টাইনে প্রতিষ্ঠানের শাখাসমূহ খোলা হইবে এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেই ইহার সদস্য হইতে পারিবেন। পার্লামেন্টের সদস্য স্যার প্যাট্রিক হানন, ফিল্ড মার্শাল স্যার ফিলিপ চেটউড এবং লেডি ওয়েজউড্ প্রতিষ্ঠানের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট্ হইয়াছেন। বিভিন্ন দলের কতিপয় লর্ড ও পার্লামেন্টের সদস্য প্রতিষ্ঠানের সদস্য তালিকায় আছেন।

জেনারেল ষ্টিলওয়েলের অপসারণ

সম্প্রতি জেনারেল ষ্টিলওয়েল তাঁহার কার্য্যপদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন। বিগত ৩১শে অক্টোবর 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকায় ব্রুক্ এ্যাট্কিনসনের একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—মার্শাল চিয়াং কাইসেকের চাপে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জেনারেল ষ্টিলওয়েলকে অপসারিত করিতে সম্মত হন। মার্শাল চিয়াং কাইসেক এবং জেনারেল ষ্টিলওয়েলের মধ্যে প্রধান বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল এই জন্য যে, ষ্টিলওয়েল কালবিলম্ব না করিয়া চীনে জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন। কিন্তু মার্শাল চিয়াংয়ের সেরূপ অভিপ্রায় ছিল না। ষ্টিলওয়েলের সহযোগী মিঃ ডারেল বেরিগানও সম্প্রতি চীন-ব্রহ্ম-ভারত রণাঙ্গন হইতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জেনারেল ষ্টিলওয়েলের অপসারণ সম্পর্কে ভিতরের ব্যাপার বিবৃত করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন: চীন হইতে জেনারেল ষ্টিলওয়েলকে নিতান্ত ব্যক্তিত্বের প্রশ্নেই সরাইয়া আনা হইয়াছে। উহা না করিয়া উপায় ছিল না। জেনারেল চিয়াংকাইসেক রাষ্ট্রপতি; সেদিক হইতে তাঁহার (ষ্টিলওয়েলকে সরাইবার) ইচ্ছাকে মানিয়া লইতে হইয়াছে! প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলেন যে, ষ্টিলওয়েলকে সমমর্য্যাদাসম্পন্ন অপর একটি পদে নিযুক্ত করা হইবে।

রুমানিয়ায় নূতন গভর্ণমেণ্ট্

গত ৪ঠা নভেম্বর রুমানিয়া রেডিও হইতে প্রচারিত এক রাজকীয় ঘোষণায় রুমানিয়ায় নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠনের কথা

প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন মন্ত্রিসভায় আছেন: মন্ত্রিমণ্ডলের প্রেসিডেণ্ট ও অস্থায়ী-সমরসচিব জেনারেল কনষ্টাণ্টাইন সানাটেস্কু; মন্ত্রিমণ্ডলের ভাইস প্রেসিডেণ্ট পিটার গ্রোজা; পররাষ্ট্র সচিব কনষ্টাণ্টাইন ভিসোনাউ; এবং সমর উৎপাদন-সচিব কনষ্টাণ্টাইন রাতিনাউ। প্রকাশিত সংবাদ-পরিচিতি হইতে দেখা যায়: আগষ্ট মাসের শেষে রুমানিয়া যখন যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করে এবং এণ্টিনেস্কুর কর্ত্তৃত্বের অবসান হয়, তখন জেনারেল সানাটেস্কু নূতন গভর্ণমেণ্টের গঠন করেন। ন্যাশনালিষ্ট পার্টির সদস্য মিঃ গ্রোজা যুদ্ধপূর্ব্ব গভর্ণমেণ্টগুলির আমলে বিভিন্ন মন্ত্রিসভায় স্থান পাইয়াছিলেন। ভিসোনাউ একজন বিখ্যাত কূটনীতিবিদ; মস্কোতে সম্প্রতি কিছুদিন পূর্ব্বে যে যুদ্ধবিরতি প্রতিনিধিদল পাঠানো হইয়াছিল, ভিসোনাউ তাঁহাদের মধ্যে একজন। এতদ্ব্যতীত রাতিনাউ গত ১২ বৎসরকাল ধরিয়া প্রধান মন্ত্রী হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন।

বর্ণবৈষম্য না গুণবৈষম্য

কোম্পানী, ব্যাটেলিয়ন অথবা রেজিমেণ্টের পরিচালনা ভার পাইবার অযোগ্যতা দর্শাইয়া ফ্রান্সের মার্কিন নিগ্রো সৈন্যবৃন্দের অধিকার লাভের দাবীর উত্তরে সম্প্রতি জেনারেল আইসেনহাওয়ার ইউরোপীয় রণাঙ্গনে নিগ্রো সৈন্যদের আশা আকাঙ্ক্ষার এক বিস্তৃত সীমারেখা টানিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে, একমাত্র প্রথম লেফটানাণ্টের পদ ভিন্ন তাহাদের বেশী আশা করা স্বপ্ন মাত্র। ইহার উপর মন্তব্য করিয়া নিগ্রো দৈনিকপত্র 'পিট্সবার্গ কুরিয়ার' বলেন: কোম্পানী, ব্যাটেলিয়ন, রেজিমেণ্ট ও ব্রিগেড সর্ব্বদাই শ্বেতকায় ব্যক্তিরা পরিচালনা করিবে, জেনারেল আইসেন হাওয়ারের ইহাই সার কথা।—বর্ত্তমান সংস্কৃতিপূর্ণ যুগে গুণোপযুক্ততার দাবীতে এখনও এই শাদাকালোর বৈষম্য ঘুচিল না; ইহাকে সভ্য ভাষায় কি বলা যায়? ইহার পিছনে গণতন্ত্রের ক্ষীণমাত্র পরাকাষ্ঠাও দেখা যায় কি?

বুলগেরিয়ার সহিত চুক্তি

গত ২৯শে অক্টোবর রাত্রিতে বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রুশিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সাম্প্রতিক চুক্তির অন্যতম প্রধান সর্ত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ত্ত এইরূপ: বুলগেরিয় সৈন্যবাহিণী ও সরকারী কর্ম্মচারীরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া ত্যাগ করিবে এবং বুলগেরিয়া কর্ত্তৃক অধিকৃত গ্রীস ও যুগোশ্লোভিয়ার এলাকা-সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার আইনমূলক ও শাসন বিষয়ক ব্যবস্থা অবশ্যই প্রত্যাহার করিতে হইবে। চুক্তির খসরায় এইরূপও বলা হইয়াছে যে, বুলগেরিয়া অবিলম্বে গ্রীক ও যুগোশ্লাভ অধিবাসীদের জন্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিবে। ইহা গ্রীসের ও যুগোশ্লাভিয়ার ক্ষতিপূরণের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।—বুলগেরিয়া সোভিয়েট ও অন্যান্য মিত্রপক্ষীয় বাহিনীকে বুলগেরিয়ার মধ্যে স্বাধীনভাবে পরিচালনার সুযোগ দিবে। মিত্র সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সাধারণ নির্দ্দেশমত প্রয়োজনীয় স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সাহায্য দিতে বুলগেরিয়া বাধ্য থাকিবে। জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ শেষ হইলে বুলগেরিয়ার সশস্ত্র বাহিনীকে ভাঙ্গিয়া মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ মিশনের তত্ত্বাবধানে শান্তিকালীন অবস্থায় আনিতে হইবে।—যুদ্ধবিরতির সর্ত্তানুসারে বুলগেরিয় গভর্ণমেণ্ট বুলগেরিয়াস্থ জার্ম্মাণ সৈন্যদের নিরস্ত্র করিবার এবং জার্ম্মাণ ও তাহার অধীন রাষ্ট্রবর্গের অধিবাসীদের আটক করিবার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত—অবিলম্বে বুলগেরিয়ায় সমস্ত ফ্যাসিষ্টপন্থী রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতেছে, সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে; এবং যুদ্ধের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্পত্তির যে ক্ষতি হইয়াছে, বুলগেরিয়াকে তাহা পূরণ করিতে হইবে। বুলগেরিয়ান বাণিজ্য জাহাজ সমূহ সোভিয়েট হাই কমাণ্ডের নিয়ন্ত্রনাধীনে থাকিবে।

মহাযুদ্ধের গতিপথে

ভারত-সীমান্ত—

এই বৎসর শীত পড়িবার প্রাক্কালেই জাপানী বিমান পুনরায় ভারত সীমান্তে দেখা দিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ সামান্য হইলেও কক্সবাজারে পুনরায় জাপানী বোমা বর্ষিত হইয়াছে। যাহাতে জাপানীরা চট্টগ্রাম ও কলিকাতা অঞ্চলে ভবিষ্যতে বিমাণ আক্রমণ করিতে সুযোগ না পায়, সেই উদ্দেশ্যে মিত্রপক্ষ আরাকান অঞ্চলে জাপানীদিগকে অনবরত বিব্রত রাখিবার জন্য ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছেন। এইরূপ আশা করা যায় যে, নৌবহর ও বিমানের সাহায্যে রেঙ্গুন আক্রমণ ও ইরাবতী দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশের যে পরিকল্পনা মিত্রপক্ষের আছে, শীঘ্রই তাহার কার্য্যকারিতা দেখা যাইবে। বঙ্গোপসাগর ধরিয়া ব্রহ্ম অভিযানের পরিকল্পনাও মিত্রপক্ষ করিতেছেন।

উত্তর-ব্রহ্ম-রণাঙ্গন—

সম্প্রতি ভামো অধিকারের উদ্দেশ্যে চীনব্রহ্মপথ উন্মুক্ত করিবার জন্য মিত্রপক্ষের অভিযান চলিয়াছে। চীন সৈন্যদল মিচিনা-ভামো সড়ক ধরিয়া দক্ষিণমুখী অভিযানে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এতদ্ভিন্ন ৩৬তম বৃটিশ ডিভিসন মগাউং-মান্দালয় রেলপথ সোজা কাথা অভিমুখে ৪৬ মাইল অতিক্রম করিয়াছে। উত্তর-ব্রহ্মযুদ্ধে এড্মিরাল মাউণ্ট ব্যাটনের অভিযান-তৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চীন-রণাঙ্গন—

জাপানীরা চীনের কিউলিন অধিকারের জন্য অনবরত আগাইয়া চলিয়াছে। কিউলিন সহর কাংশি প্রদেশের রাজধানী ও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মস্কোর 'ওয়ার এ্যাণ্ড দি ওয়ার্কিং ক্লাশ' পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, 'চীনের কোনো কোনো রণাঙ্গণে কার্য্যতঃ যুদ্ধবিরতির অবস্থা দেখা যাইতেছে। এই অবস্থা চীনের প্রতিক্রিয়াশীল এবং পরাজিতের মনোবৃত্তিসুলভ ব্যক্তিদের চেষ্টায় ঘটিয়াছে, এবং জাপানীরা এই অবস্থার স্থিতিকাল বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।' ওয়াকিবহাল মহলে উক্ত পত্রের কোনো কোনো মন্তব্য গৃহীত না হইলেও এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে,

মিত্রপক্ষের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্যের অভাবে চীনকে বাধ্য হইয়াই বিশেষ অঞ্চলগুলিতে যুদ্ধাভিযানে নিরত হইতে হইয়াছে।

পূর্ব্ব-রণাঙ্গন—

শীতকালীন অভিযান আরম্ভ করিবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। পূর্ব্ব রণাঙ্গণে সোভিয়েট বাহিনী নরওয়ে হইতে যুগোশ্লাভিয়া পর্য্যন্ত প্রায় দেড় হাজার মাইল বিস্তৃত রণক্ষেত্র জুড়িয়া উত্তরে ও দক্ষিণে একই সঙ্গে আক্রমণ চালাইয়াছে। লালফৌজের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব আগাগোড়া উল্লেখযোগ্য। নরওয়ের বহু অঞ্চল ইতিমধ্যেই তাহারা নাৎসী-কবলমুক্ত করিয়াছে। এদিকে ফিনল্যাণ্ডে জার্ম্মাণবাহিনীর সহিত ফিন সেনাবাহিনীর সংগ্রাম চলিতেছে, এবং ফিন সৈন্যেরা ইতিমধ্যে উত্তর মেরু অঞ্চলে ভুয়োটমো অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় জেনারেল চার্নিয়াকোভস্কীর বাহিনীর অভিযান প্রতিরোধের জন্য জার্ম্মানরা তাহাদের বৃহত্তর শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে। সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষনের সম্মুখে জার্ম্মাণীর পাল্টা আক্রমণ ক্রমাগত ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। এদিকে ওয়ারশ'র উপকণ্ঠ প্রাগা হইতে আক্রমণ চালাইয়া লালফৌজ ও পোলিশবাহিনী একটি রেলওয়ে ষ্টেশন দখল করিয়াছে। গত ৭ই নভেম্বর রাত্রে জার্ম্মাণ ওভারসীজ নিউজ এজেন্সীর সামরিক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, হাঙ্গেরিয়ান রাজধানী বুদাপেষ্টের পাশ কাটাইয়া লালফৌজের সাঁড়াসী অভিযান বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং বুদাপেষ্টের পূর্ব্ব ও উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে নূতন আক্রমণ সুরু হইয়াছে। জার্ম্মাণ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সামরিক সংবাদদাতা কর্ণেল ফন হ্যামার বুদাপেষ্টের পূর্ব্বস্থ রণাঙ্গনে তিৎসা নদীর উপরে দুইটি নূতন সোভিয়েট সেতু-মুখ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এদিকে চেকো-শ্লোভাকিয়ায় রুশবাহিনীর ক্রম-অগ্রগতি অব্যাহতভাবেই চলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পশ্চিম রণাঙ্গণে রয়টারের সংবাদদাতা জার্ম্মাণীর নতুন গোপন অস্ত্রের আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া বহুতর ভীতি-বাক্যের অবতারণা করিয়াছিল, কিন্তু সোভিয়েটকে সে সম্পর্কে উচাটন হইতে দেখা যায় নাই। নির্ভীক লালফৌজ সর্ব্বত্র নিজেদের শৌর্য্যের পরিচয় দিয়া চলিয়াছে। ইতিমধ্যে রুশ-জার্ম্মাণীর পুণর্মৈত্রী স্থাপিত না হইলে বলা যায়, অদূর ভবিষ্যতে লালফৌজের কাছে জার্ম্মাণবাহিনী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

পশ্চিম-রণাঙ্গন—

সুপ্রীম হেড কোয়ার্টার হইতে প্রচারিত বিগত ৯ই নভেম্বরের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, ভালচেরেন দ্বীপে ভ্রাউভেনপোল্ডার জার্ম্মাণ কবল মুক্ত হইয়াছে। মিত্রপক্ষের হেড কোয়ার্টার হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল প্যাটনের আক্রমণ পঁ-আ-মোসোঁর পূর্ব্বদিকে দশ মাইল ব্যাপী রণাঙ্গণ জুড়িয়া সম্প্রসারিত হইয়াছে। গোলন্দাজবাহিনীর প্রবল বোমাবর্ষণের ফলে জালাকুত ও ফ্রেজ্বা সম্পূর্ণ অধিকৃত হইয়াছে; মার্কিণ সৈন্য-দল গুরুত্বপূর্ণ সহর সাতো সার্লি হইতে চার মাইলেরও কম দূরে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছে। জেনারেল প্যাটনের তৃতীয় আর্ম্মি সংশ্লিষ্ট রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানান যে, তৃতীয় আর্ম্মির পদাতিক সৈন্যগণ মেৎস এবং নাঁসির মধ্যবর্ত্তী ১৩টি সহর অধিকার করিয়াছে। মার্কিণ বিমানবহর শমিডট অঞ্চলে প্রতি-পক্ষের কামান সমাবেশের উপর বোমা বর্ষণ করিয়া স্থলবাহিনীর সহায়তা করে। উত্তরদিকে কিন্তু মার্শাল মন্টগোমারীর সৈন্যদল মোয়েরদিক অঞ্চলে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে এবং হল্যাণ্ডে জার্ম্মাণদের একটি ঘাঁটি উচ্ছেদ করিয়াছে।

বল্কান-রণাঙ্গন—

গ্রীক গণবাহিনী ও বৃটিশ সৈন্যদের সম্মিলিত অভিযানে যুগো-শ্লাভিয়ায় লালফৌজের উপস্থিতিতে গ্রীস হইতে জার্ম্মাণগণ পশ্চাদ্ধাবন করিতে বাধ্য হইয়াছে। লালফৌজের সহিত সম্মিলিত ভাবে মার্শাল টিটোর বাহিনী যুগোশ্লাভিয়ার জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। সাম্প্রতিক সংবাদে বুলগেরিয়ার সহিত মিত্রশক্তির চুক্তি সাক্ষরের কথা জানা গিয়াছে, বর্ত্তমানে বুলগেরিয়ার বাহিনী যুগোশ্লাভ সৈন্যদের সহিত এক যোগে ম্যাসিডোনিয়ায় জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়াছে।

জার্ম্মাণভূমিতে মিত্রসেনার আক্রমণ—

সম্প্রতি জার্ম্মাণ ইউবোটের উপদ্রব একরূপ বন্ধ হইয়াছে এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে মিত্রবাহিনী জার্ম্মাণভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল বলেন যে, সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মিত্রশক্তির সামনে জার্ম্মাণ-বিমানজনিত যে ঘোরতর বিপদের আশঙ্কা ছিল, জার্ম্মাণবাহিনীর সেই বিমান উপদ্রবও বিদূরিত হইয়াছে। জার্ম্মাণভূমিতে বিমান হইতে মিত্রপক্ষের অগ্নিবর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ চার্চ্চিল বলেন, যে ১৯৪৪ সালে এই সকল শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে; কিন্তু সে জন্য কেহ যেন ১৯৬৫ সালেই মিত্রপক্ষের জয়লাভ বা ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে মনে করিয়া কর্ম্মো-দ্যমে শিথিলতা না আনেন।

বিভিন্ন রণাঙ্গণের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, চক্রশক্তির আশু পরাজয় অবধারিত। অথচ ইহার মধ্যে স্পষ্ট যেন একটা 'কিন্তু' রহিয়া গিয়াছে। মিত্রশক্তির জয়ের সূচনা দর্শাইয়া রয়টার যতই সংবাদ পরিবেশন করিতেছে, মিঃ চার্চ্চিলের কণ্ঠে যেন ততই 'যথাশীঘ্র যুদ্ধাবসান'-এর দিনগুলি ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িতেছে। ১৯৪৪ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল—এই প্রলম্বিত একবৎসর একমাস মধ্যেও যে যুদ্ধের এই দুঃসহ বিভীষিকা নিশ্চিহ্ন হইতে পারে এবং পুনরায় শান্তির আবির্ভাবে বিশ্বব্যাপী জনমানবগণ স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে পারে, এমন কোন আশার চিহ্ন চার্চ্চিল সাহেব দেখেন না। তবে কি বুঝিতে হইবে, সর্ব্বত্রই চক্রশক্তি এখনও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই? অথবা কি বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারেও অস্ত্রযুদ্ধ দ্বারা এক পক্ষ অপর পক্ষকে সহজে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারিবেন না?

পুস্তক ও আলোচনা

(ক) **বাংলার ছেলে** (শিশুনাটিকা)
শ্রীসতীকুমার নাগ ।৹

(খ) **ভারতের চিঠি :** পার্ল বাক্‌কে
শ্রীঅদ্বৈতমল্ল বর্ম্মণ ৸৹

(গ) **কবিতা** : ১৩৫০—শামসুদ্দীন ৸৹

(ঘ) **মিছিল** (কাব্য সংকলন) ২৲

চয়নিকা পাব্লিশিং হাউস, ৪২ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(ক) লেখক ও সাংবাদিক হিসাবে সতীকুমার নাগ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ধনবৈষম্যের অপকৃষ্টতায় আমাদের সমাজ আজ যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারই পটভূমিকায় রচিত 'বাংলার ছেলে'। একদিকে জমিদারী ধন-সংরক্ষণ, অন্য দিকে বাংলার নিষ্পেষিত প্রাণ-প্রতিভা,—শাশ্বত এই দ্বন্দ্বের উপর ভিত্তি করিয়া স্বল্প আয়তনে লেখক অতি নিপুণভাবে গ্রন্থের চরিত্র-গুলিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পাঠে ও অভিনয়ে শিশুরা আনন্দ পাইবে সন্দেহ নাই। তবে যে-ধনতন্ত্রবাদের উপরে গ্রন্থের ভিত্তি, তাহা শিশুমনে কতখানি গৃহীত হইবে, বলা শক্ত।

(খ) পত্রানুকরণে লিখিত 'ভারতের চিঠি'তে লেখক নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তা পার্ল বাক্‌কে উদ্দেশ করিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রাচ্য-প্রতীচ্য ধর্ম্মের যেরূপ সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিচারশীল মননশীলতারই পরিচয় পাই! অদ্বৈতবাবু সাম্প্রতিক যুগের সত্যিকারের একজন শক্তি-শালী লেখক, আয়তনে সংকীর্ণ হইলেও গ্রন্থখানি তাহাই প্রমাণ করে।

(গ) রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা কাব্যসাহিত্যে 'আধুনিকতা'র যে হাওয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে কোনো কোনো 'ধার করা মননশীল' কবির রচনা অমার্জ্জনীয় অপরাধে দোষী। কবি সামসুদ্দিন সে দলের নহেন। সূক্ষ্মদৃষ্টি ও নতুন প্রকাশভঙ্গীমার রূপ-সাধনা তাঁহার মধ্যে যে অভিসিঞ্চিত, আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহারই সাক্ষি দেয়। কবির ক্রমোন্নতি কামনা করি।

(ঘ) রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া সাম্প্রতিক যুগের অন্যূন তেতাল্লিশজন লেখকের কবিতা 'মিছিল'এ স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি আধুনিক হইলেও শ্রেষ্ঠতর। পরবর্ত্তী সংস্করণে আরও উন্নত রচনা দ্বারা 'মিছিল' সমৃদ্ধ হইবে, ইহাই আশা করি।

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

পুরুষ প্রকৃতি : নাটক। সুবোধকুমার দাস প্রণীত। সত্যবতী পাব্লিশিং হাউস, ৫-ডি, রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা। মূল্য ২৲ মাত্র।

লেখক নবীন। কিন্তু সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ উল্লেখযোগ্য। যে শ্রমলব্ধ সময়ের ব্যয়ে তিনি নাট্য রচনা করিয়াছেন, তাহা ছোট গল্প রচনায় প্রযোজিত হইলে লেখক কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন বলিয়া মনে করা যায়। ভূমিকায় প্রকাশ, গ্রন্থের সাম্প্রতিক সংস্করণে লেখক কিছুই বলিতে পারেন নাই। দুঃখ-দায়ক। বর্ত্তমান কাগজসঙ্কটের দিনে এইরূপ প্রকাশ-দীনতা নীতিশোভন নয়। গ্রন্থের সর্ব্বত্র নারী-বিদ্বেষে পূর্ণ। সমাপ্তির দিকে অনেকটা সুর বদলাইবার প্রয়াস আছে। তরল বিষয়বস্তুর উপরে কালিক্ষয়ের দিন অতিবাহিত। দেশ, কাল ও জীবনে আজ যে নতুন সুরের ধ্বনি উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে 'পুরুষপ্রকৃতি'র বাণী জনসমাজের কানে যাইয়া পৌঁছিবে কিনা সন্দেহ! ভবিষ্যৎ রচনাকালে লেখক অনেকখানি আত্মস্থ হইলে আশ্বস্ত হইবার কথা।

শ্রীবীরেন্দ্র গুপ্ত

রাজা সীতারাম রায় (ঐতিহাসিক নাটক) শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার, কবিভূষণ প্রণীত। প্রকাশক—ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

মুগল রাজত্বকালে বাঙ্গালার সুবেদারদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া বাঙ্গালাদেশের কতিপয় জমিদার রাজা উপাধি লয়েন। সীতারাম সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পাঞ্জা সহিযুক্ত ফরমান লইয়া বাঙ্গালার সমুদ্রোপকূল অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি অমিত বিক্রমে ফিরিঙ্গী, আরাকান, মগ ও অন্যান্য দস্যুকে পীড়ন করিয়া রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এতদসত্ত্বেও সীতারাম রায়ের ইতিহাসও ব্যর্থতার ইতিহাস। এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, পরশ্রীকাতর বিশ্বাসঘাতক-দলই এই জন্য প্রধানতঃ দায়ী। বিশ্বাসঘাতকদলই বাঙ্গালার ইতিহাসকে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করিয়াছে। সীতারামরায়ও বিশ্বাসঘাতকদলের হাত এড়াইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত মজুমদার ইহাই এই নাটকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাটকের গতি অব্যাহত রাখার জন্য তাহাকে স্থানে স্থানে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত ঘটনার অঙ্গহানি হয় নাই।
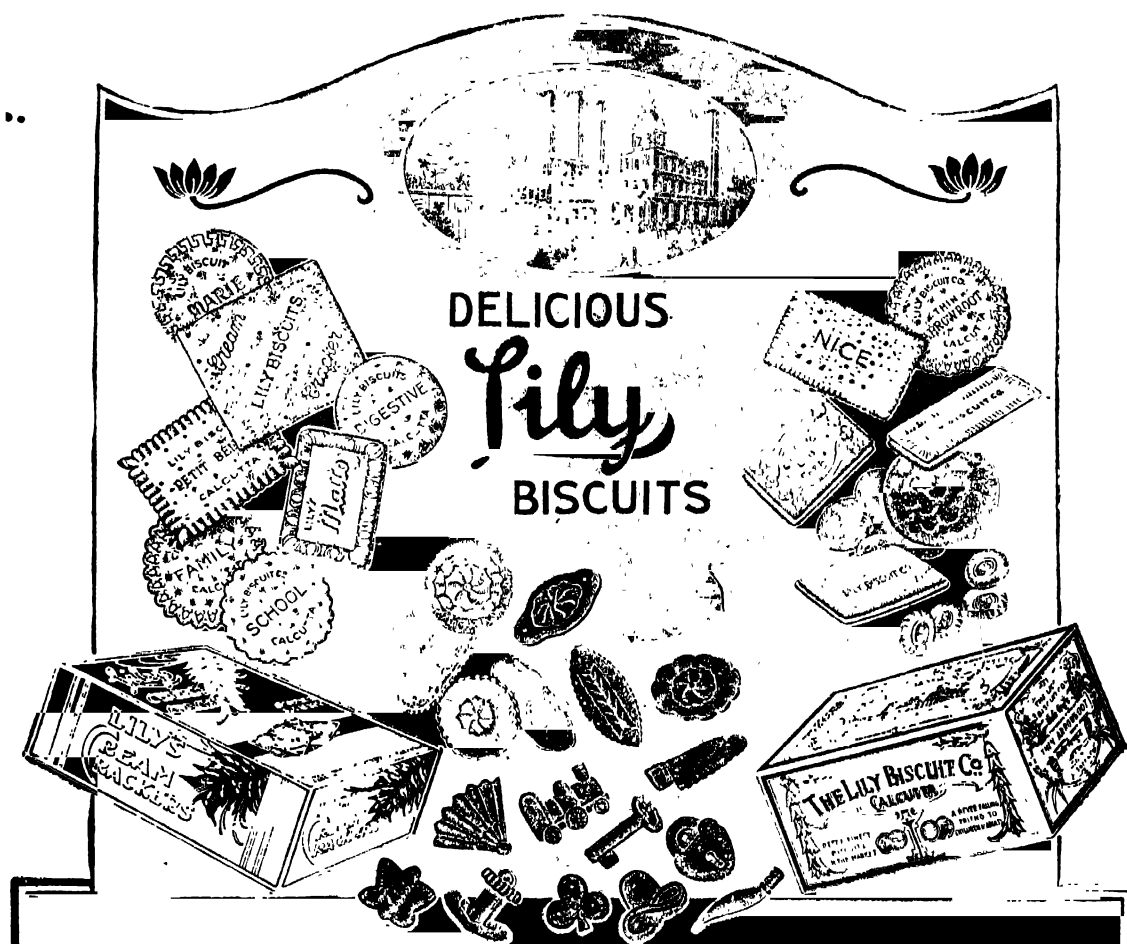
শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

কে. ডি. আমায়াও কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ—৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস